আনন্দমেলা
পূজাবার্ষিকী
১৩৯৮

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - মাধব রায়

স্ক্যান করেছেন - মাধব রায়

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com
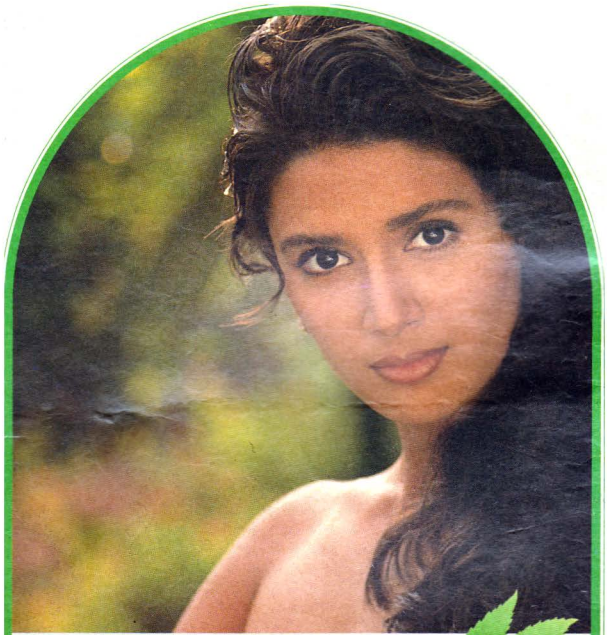
এমনি যাদু নবীন ত্বকে
হার মানাল বসন্তকে
NEW IMPROVED
Margo®
MARGO SKIN
BEAUTIFUL SKIN
কোমল, যেন ভোরের তারার আলো...
নবীন, যেন প্রথম ফাল্গুনের পাতা।
সজীব, তরুণ ত্বক।
প্রকৃতি যেন তার যত্নের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে।
পরিচর্যা করছে নিমতেল দিয়ে। যুগ যুগ ধ'রে।
সেই নিমতেলের গুণে ভরা মার্গোই আপনার ত্বকের আপনজন।
মার্গোস্নান সজীব, স্নিগ্ধ। আর স্নানের পরে
ত্বক যেন বসন্তকেও হার মানায়।
মার্গো ত্বক। সুন্দর ত্বক।

সূচিপত্র

অপ্রকাশিত কবিতা ও গল্প

বাবা যখন । বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২০
বেড়াল তপস্বিনী । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ২১

বিশেষ নিবন্ধ

প্রাচীনতম রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি : মালতী-পুঁথি । পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৮
সময়ের গুহাচিত্র । জয়া মিত্র ৪৩২

উপন্যাস

সেই অদৃশ্য লোকটি । বিমল কর ৫২
কাকাবাবু হেরে গেলেন । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৯২
ছায়াময় । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৩২
দলবদলের আগে । মতি নন্দী ১৬৯
অর্জুন বেড়িয়ে এল । সমরেশ মজুমদার ২১২
মা এক নির্ভীক সৈনিক । শৈলেন ঘোষ ৩০০
পাণ্ডব গোয়েন্দা । ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৩৮৮
চাঁদের রক্ত । দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮৪

বড়গল্প

হরি যাকে রাখেন । আশাপূর্ণা দেবী ৬
কঙ্কগড়ের কঙ্কাল । সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ২৬৮
থরহরির কীর্তি । দুলেন্দ্র ভৌমিক ৪৪৪

গল্প

দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিকতা, না স্নেহাতুর পিতা । শিবশঙ্কর মিত্র ৩১
আদালতের আদিখ্যেতা । লীলা মজুমদার ৪৫
ডাকাতের বউ । অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪
মালয়েশিয়ার টিয়া । অরবিন্দ গুহ ১৬৫
পা নিয়ে বিপাক । বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩৪
কৃপা । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩৪৯
চোখের সামনে । আনন্দ বাগচী ৩৫৩
ময়না ও টিপু সুলতান । এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ৩৬২
এমনটি কেউ ভাবেনি । সমরজিৎ কর ৪৭৪
কেলেঙ্কারি । হিমানীশ গোস্বামী ৫১৭
রোবু আর ভুতো । সিদ্ধার্থ ঘোষ ৫২৪
ব্যাঙপুকুর । শিবতোষ ঘোষ ৫২৮
ঘাটিপান্তার দেশে । আবুল বাশার ৫৩২

বাজলো বুঝি আলোর বেণু
মাতলো রে ভুবন

আমাদের একমাত্র বিপণি :

আদি রাজলক্ষ্মী
শিল্পমন্দির

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
১২২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২ ফোন : ২৭-৫২৭৬

Creative/9124

দমদম বিমান বন্দরের অদূরে ২৭ বিঘা এলাকা জুড়ে গড়ে উঠছে এক আধুনিক আবাসন প্রকল্প — কৃষ্ণকুঞ্জ। দূষণমুক্ত পরিবেশে, সবুজের সমারোহে এ যেন এক স্বপ্নপ্রদেশ।

৫৭৬ টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ১৮২ টি ফ্ল্যাট শুধুমাত্র অনাবাসী ভারতীয়দের জন্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যাবস্থাপত্রও তাঁদের উপযুক্ত। ফ্ল্যাটে রয়েছে ডিস এ্যান্টেনা ও কেবল টিভির সংযোগ। দেশী বিদেশী টিভি প্রোগ্রাম ও ফিল্ম ঘরে বসেই দেখতে পাওয়া যাবে। ইলেকট্রনিক ইন্টারকম সিস্টেম, অত্যাধুনিক মেডিকেয়ার সেন্টার, কম্যুনিটি হল, ক্লাব, ইংরাজী মিডিয়াম স্কুল, পার্ক ... ব্যবস্থার কমতি নেই। দোতলা শপিং কমপ্লেক্সে থাকছে হাজারো জিনিসের দোকান।

হলিডে হোম — কলকাতায় ছুটি কাটানোর জন্যে, বা ভবিষ্যতে দেশে ফিরে বাস করার জন্যেই হোক, কৃষ্ণকুঞ্জের ফ্ল্যাট এক অব্যর্থ বিনিয়োগ যা লাভজনক হতে বাধ্য। তাই পূজোর শুভেচ্ছার সঙ্গে বিদেশে আপনার প্রিয়জনকে একটি সুখবরও পাঠান — কৃষ্ণকুঞ্জের খবর দিন।

আমাদের অফিস থেকে পুরো বিবরণ, দাম ও পেমেন্ট পদ্ধতি সংগ্রহ করুন।

ছোটকাকু
কৃষ্ণকুঞ্জের ছবি।
বাবা বলেছে ওর
বিলেতের বাড়ীর
মত বিউটিফুল।
নানা

Krishna Kunj

PROMOTERS :

KK ESTATE & DEVELOPERS LTD.

34A, Metcalfe Street. Suite No 4F, Calcutta 700 013
Tel : (91-33) 26 8655/26 1610 Fax : (91-33) 20 9673
Tlx : 021-7615 NINA IN

কবিতা ও ছড়া

বাবু তো বাবু । অন্নদাশঙ্কর রায় ২৫ **ভানুমতী** । অরুণ মিত্র ২৬ **আকাশ-যুদ্ধ** । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২৬ **এক সকালে** । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২৭ **প্রশ্ন ও উত্তর** । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৪২ **পাখি ও পথিক** । জয় গোস্বামী ৪৩ **বাসন্তী রঙের শালুকের জন্যে অষ্টক** । শক্তি চট্টোপাধ্যায় ২৮৭ **পৃথিবীর শেষ কয়েকটি পেঙ্গুইনের সঙ্গে** । অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২৮৭ **সবাই ভাল** । প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ২৮৭ **পাখিরা** । সুনীল বসু ৪৩১ **কনিষ্কের মুণ্ডলাভ** । সরল দে ৪৩১ **তুলি, অলি, তিতলি** । সাধনা মুখোপাধ্যায় ৪৩১ **দেখো এসে পড়ার টেবিলে** । প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৬২ **চিনতে পারো** । শ্যামলকান্তি দাশ ৪৬২ **বর্ণমালা বাংলা আমার** । রত্নেশ্বর হাজরা ৪৭৩ **ইচ্ছে করে** । আশিস সান্যাল ৪৭৩ **এঁকেবেঁকে এক নদী** । রতনতনু ঘাটী ৪৭৩

জ্ঞান-বিজ্ঞান

আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের ধারণা কীভাবে এল ।
অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪
মরুভূমির তরুলতা । চঞ্চল পাল ২০৯
ইলেকট্রনিক গেমসের আশ্চর্য দুনিয়া । অনীশ দেব ২৯৫
বুদ্ধিমান কম্পিউটার । পথিক গুহ ৩৪৫
আশ্চর্য অপটিক্যাল ফাইবার । পার্থসারথি চক্রবর্তী ৩৮৫
ফিরে এল বিপন্ন সরীসৃপ । গৌতম চক্রবর্তী ৪৪১

অভিযান ও ভ্রমণ

স্বর্ণ শহরের সন্ধানে । অরূপরতন ভট্টাচার্য ৮৯
রহস্য-রোমাঞ্চের ভ্রমণ । কল্যাণ চক্রবর্তী ২৯০

খেলাধুলো

বিশ্বনাথন আনন্দ আমাদের গর্ব । মানস চক্রবর্তী ২৫০
বল নিয়ে ভেলকি দেখাত যে ছেলেটি । রূপক সাহা ২৫২
বিশ্বের একনম্বর টেনিস খেলোয়াড় হতে চাই ।
লিয়েন্ডার পেজ ২৫৭
রবি শাস্ত্রীই আমার আদর্শ ক্রিকেটার । সৌরভ গাঙ্গুলি ২৬২
বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া 'ফেভারিট' । তানাজি সেনগুপ্ত ২৬৪

খেলার পোস্টার

পল গাসকোয়েন ২৪৯, সঞ্জয় মঞ্জরেকর ২৬০, মাইকেল স্টিখ ২৬১

চিত্রকাহিনী

শার্লক হোমস-এর গল্প : সর্বনাশা উত্তরাধিকার ৩৬৯, খ্যাতির ইতিহাস ৪৬৩, গাবলু ৪৭৯, গোপন রহস্য... অন্ধকার রাত্রি ৫২১

অন্যান্য আকর্ষণ

ছুটির অ্যালবাম । রত্নাকর ১৩০, ২৬৭, ২৯৪, ৪৮২
কুইজ । নিল ও'ব্রায়েন ২৪৩, **শব্দসন্ধান** । বাক্‌পতি ৩৩৮
যে নামেই ডাকো ধাঁধা ধাঁধাই । সত্যসন্ধ ৩৪০

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

সম্পাদক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিমান মাশুল : উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দু' টাকা

দাম : বাহান্ন টাকা

শিল্পনৈপুণ্যে
আজও অদ্বিতীয়

রাজলক্ষ্মী
শিল্প
মন্দির
জুয়েলার্স

১০১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট
কলিকাতা-১২
ফোন : ২৭-৮৫০৯

আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।
এটাই কোলকাতার সর্বাপেক্ষা পুরাতন
রাজলক্ষ্মী শিল্পমন্দির
প্রোঃ সন্তোষচন্দ্র কর্মকার

SOLAR

বড়গল্প

হরি যাকে রাখেন

আশাপূর্ণা দেবী

ছবি : দেবাশিস দেব

যেমন হয়। পতাকির ভাগ্যে সর্বদাই যা হয়ে থাকে। চটিজোড়াটা হাতে নিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে বেরোতে গিয়েও বিপদ এড়ানো গেল না। পড়তেই হল বাঘের মুখে।

না পড়ে উপায় আছে? কেমন মোক্ষম জায়গাটিতে ওই 'বৈঠকখানা' নামের ঘরটি বানিয়ে রেখেছিলেন পতাকির ঠাকুরদা। 'বৈঠক' বলে তো কোনও কিছুর বালাই নেই, শুধু উদয়াস্ত একা ঘাঁটি আগলে বসে থাকেন জ্যেষ্ঠ পুত্তুরটি! এই এখানের বাগনান কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দয়ালহরি দেবনাথ। পতাকি অবশ্যই মনে-মনে নামটাকে একটু 'প্রুফ কারেকশন' করে বলে 'ভয়ালহরি ভূতনাথ'!

তা তিনি পতাকির ওই বিড়ালগতি থেকেও কী করে যেন সাড়া পেয়ে তাঁর নিজস্ব খানদানি গলায় হাঁক দিয়ে উঠলেন, "কে র‍্যা! কে ওখানে?"

উঃ। জেঠু কী সেই যারা 'মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ' তাদের দলের কেউ?

রাগে-দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে পতাকির।

ভোর সকালে বিলু চুপিচুপি একটা মোক্ষম খবর দিয়ে গিয়ে বলে গেছে, "যত তাড়াতাড়ি পারবি আমাদের সেখানে চলে আসবি। আমি, প্রদীপ, সুনন্দ, ভোম্বল চারজনেই ওখানে থাকছি। আর পারিস তো তোদের থার্মোমিটার টা নিয়ে যাস। আমাদের কারও বাড়িতেই আছে কি না সন্দেহ। তোদের বাড়িতে নিশ্চয় আছে। তোর জেঠুর ব্যাপার। দেরি করবি না।"

বিলু, সুনন্দ, প্রদীপ, ভোম্বল চারজনেই সেখানে গিয়ে বসে আছে, আর

SUPER CHAMPS
COLLECTION
SCHEME
FREE
স্পোর্টস্টার স্টিকার
সুপার মজা! সুপার বিস্ময়!
সংগ্রহ করুন 24 টি স্টিকার।
নিয়ে যান অভাবনীয় উপহার।
এই নিন, সবই এখানে। নতুন হাজমোলা ক্যান্ডির 25 টির 'সুপারচ্যাম্পস' প্যাক যার ভেতরে আছে আপনার প্রিয় সুপারস্টার স্টিকার। ইমরান খান, ইভান লেন্ডেল, স্টেফি গ্রাফ এবং আরো আরো অনেকের।
হ্যাঁ, সব্বাই আপনারই অপেক্ষায়। স্রেফ, 5 টি স্টিকার জোগাড় করুন এবং ভরে তুলুন আপনার চমৎকার, আকর্ষণীয় 'সুপারচ্যাম্পস' অ্যালবাম। শুধু কি তাই, আপনাকে রোমাঞ্চকর হাজমোলা ক্যান্ডি ক্লাবের সদস্যও ক'রে নেওয়া হবে। (বিশদ বিবরণ আছে প্রতি 'সুপারচ্যাম্পস' প্যাকের ভেতরে)।
শীগ্গির! শুরু করুন 'সুপারচ্যাম্পস' সংগ্রহ করতে। হ্যাঁ, আজ থেকেই, এখন থেকেই।
Hajmola®
CANDY
SUPER CHAMPS
SURPRIZE
সবার আগে অ্যালবাম পুরো করেছেন এমন 1000 জনকে
COLLECT 24 SPORTSTAR STICKERS AND COMPLETE THE ALBUM.
টক্-মিষ্টি
Hajmola®
CANDY
everest/d91/DIL/69 ben
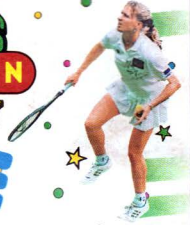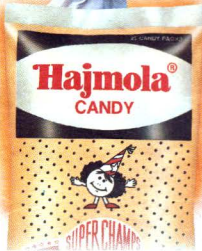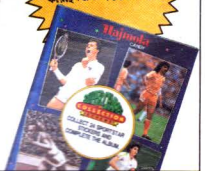
পতাকি কিনা—ওঃ।

বাড়ি থেকে বেরোবার যে আর দ্বিতীয় কোনও পথও নেই ছাই! এই দরজাটিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। অথচ সব বাড়িতেই 'খিড়কি দরজা' বলে একটা জিনিস আছে। থাকে। থাকাই নিয়ম।

কিন্তু জেঠুর নিয়ম আলাদা! তাঁরও এই বাড়িতে ছিল তেমন একখানা দরজা, কিন্তু জেঠু তার পাল্লা দুটোয় পেরেক ঠুকে সেঁটে রেখে দিয়েছেন।

কারণ?

কারণ নাকি পাড়ার যত বিচ্ছু ছেলেরা জেঠুর সাধের বাগানের 'দফা গয়া' করে দেয়। ফুলগাছ থেকে ফুলগুলো ছিঁড়লে বা ফলের গাছ থেকে দুটো পাঁচটা ফল ছিঁড়ে নিলে দফা-গয়া'র কী আছে, পতাকির সেটা বুদ্ধির অগম্য। ওগুলো কি গাছেই থাকবার জিনিস? তা কে সে-কথা বোঝাতে যাবে ভয়ালহরিকে?

বেগতিক অবস্থায় পাঁচিল ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ারও উপায় রাখেননি জেঠু। বাড়ির সারা পাঁচিলে কাঁটাতার। তা ছাড়াও ভাঙা কাচের টুকরো পোঁতা! কাজেই বেরোতে হলেই 'কে র‍্যা? কে ওখানে?'

উঃ। কী একখানা গলার স্বর! শোনামাত্রই যেন কানের মধ্যে ড্রাম বেজে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণের মধ্যেও। কিন্তু আজকের এই দিনেও কি পতাকি থতমত খেয়ে বলে বসবে, "কেউ না! ইয়ে আমি! একটু বাগান দেখতে বেরোচ্ছিলাম। কত ফুল হয়েছে, ইস্!"

নাঃ, কখনও নয়। আজ বেরোতেই হবে!

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা বীর ভাবের উদয় হয় পতাকির। কেন? কী জন্যে? এত কিসের ভয়? সব্বাই বেশ যখন ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে বেরোতে পায় আর পতাকির ভাগ্যেই বেরোতে হলেই পুলিশি জেরায় জেরবার হতে হওয়া!

"কোথায় যাচ্ছিস? কী জন্যে যাচ্ছিস? কাদের কাছে যাচ্ছিস? কখন ফিরবি?"

এইসব মাথায় জ্বালা ধরানো প্রশ্ন! পুলিশি জেরা আর কাকে বলে?

উঃ, কত কৌশলে থার্মোমিটারটা বাগিয়ে ফেলে পকেটে পুরে রেডি হয়ে বেরোচ্ছিল। ওই বাগানোটা ও চুপিচুপি সারবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ফাঁস হয়েই গেল। সারাবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও জিনিসটা না পেয়ে, শেষমেশ জেঠির কাছে গিয়ে বলতেই হল, "থার্মোমিটার জিনিসটা কী এমন দামি? অ্যাঁ সোনার, না হিরের? তাই লুকিয়ে লকারে তুলে রাখতে হয়? দরকারের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না।"

জেঠি অবাক হয়ে বললেন, "কী? তোদের ওই 'জ্বরকাঠি'টা খুঁজছিস? তাকে আবার লকারে তুলে রাখতে কার দরকার পড়েছে? তোর জেঠুর 'হোমিও বাক্স'র মধ্যেই তো থাকে। তাই আছে।"

এঃ! ইস! ঠিক তো! ওখানেই যেন থাকে মনে হচ্ছে এখন। আর পতাকি কি না লেপ-বিছানা তুলে রাখবার 'চালি' থেকে মায় জেঠির ঘুঁটে-কয়লার ঝুড়ির মধ্যে পর্যন্ত খুঁজে হন্যে হল!

তা জেঠি কি শুধু জিনিসটার সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হবেন? কেন সেটার সন্ধান হচ্ছিল তার সন্ধান নেবেন না? শিউরে উঠেই সন্ধান নিলেন, "জ্বরকাঠি খুঁজছিস কেন রে? শরীর খারাপ না কি? অ পাতুকি?"

উচ্চারণের সুবিধার জন্য জেঠি থার্মোমিটারকে বলেন, 'জ্বরকাঠি', হোমিওপ্যাথিকে বলেন 'হোমিও', পোস্টকার্ডকে 'পোস্টোকেস্ট', পতাকিকে 'পাতুকি'।

তা পতাকি প্রায় পাতুকির মতোই গুরুজনের ওপর তম্বি করে বলে ওঠে, "শরীর খারাপ হতে যাবে কী দুঃখে? কেন, বাড়ির কোনও একটা জিনিসে দরকার পড়তে পারে না? খুঁজে না পেলে রাগ হয় না?"

জেঠি চোখ কপালে তুলে বলেন, "ও মা! জ্বরকাঠি আবার জ্বর দেখা ছাড়া কোন কর্মে লাগে? এতখানি বয়েসে তো দেখিনি অন্য কিছু! কী কাজ? অ্যাঁ।"

পতাকির উভয় সঙ্কট। যদি সাতসতেরো কথার মধ্যে যাওয়ার বদলে, একটু বানিয়ে বলে, "হ্যাঁ একটু যেন কেমন জ্বর-জ্বর লাগছে। দেখে নিই একবার। তা হলেই মানিয়ে যায়, ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু... তা হলে তো বেরনোরও বারোটা বেজে যায়।"

এই শুনে জেঠি কী আর চোখছাড়া করবেন পতাকিকে? মিনিটে-মিনিটে এসে গায়ে-কপালে হাত দিয়ে দেখতে থাকবেন না! 'ছ্যাঁক-ছ্যাঁক' করছে কি না। এবং ছ্যাঁক-ছ্যাঁকের ছায়ামাত্রও আবিষ্কার করতে পেরে না উঠলেও বলবেন, "গা তো পাথর। তা হোক আজ আর ভাতটা খেয়ে কাজ নেই, দু'খানা রুটিই খাস।"

তা ছাড়া জেঠুর কানেও কি কথাটা না তুলে ছাড়বেন? অতএব সঙ্গে-সঙ্গে জেঠুর হোমিও বাক্সর আক্রমণের মুখে পড়তে হবে। এই ভয়েই বলতে হয়েছে, একটা দরকারি কাজে দরকার। তো এখন আবার সেই সাতসতেরোর ফাঁদে পড়া। জ্বরকাঠি আবার কোন কর্মে লাগে রে? তো সেও ম্যানেজ করে ফেলা হয়েছে। চোখমুখ বেশ ঘোরালো করে বলতে হয়েছে, "সে তুমি বুঝবে না জেঠি! ইস্কুলে সায়েন্সের ক্লাসে একটা জিনিস টেস্ট করতে হবে।"

অবশ্য এটুকুতেও পুরো ম্যানেজ হয়নি। 'সায়েন্স' আর 'টেস্ট' এই দুটো শব্দে বেশ কাবু হয়ে গিয়েও জেঠি বলেছিলেন, "তা হ্যাঁ রে পাতুকি, এখন তো তোদের গ্রীষ্মের ছুটি চলছে? ইস্কুলের ক্লাস হচ্ছে কী করে?"

উঃ। এত কূটকচালে প্রশ্নও মাথায় আসে এঁদের।

আবার বোঝাতে হয়, সারের বাড়ি গিয়ে শিখতে হবে। না গেলে পরীক্ষায় নম্বর কাটা যাবে।

ব্যস! তাতেই কাজ হয়েছিল। আর মাত্র আধ মিনিট সময় ম্যানেজ করতে পারলেই চৌকাঠ পার হয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু হল না। জেঠুর গলার স্বর বেজে উঠল, "কে র‍্যা? কে ওখানে?"

হঠাৎ বীরত্ব জেগে ওঠা পতাকি হঠাৎই বুক টান করে জোর গলায় বলে উঠল, "কে আবার? আমি। আমি ছাড়া বাড়িতে আর আছে কে?"

কথাটার সঙ্গে-সঙ্গেই খটাখট খড়মের আওয়াজ উঠল। তার মানে জেঠু তাঁর বাবার আমলের হাত-পা ছড়ানো আরাম কেদারাটি থেকে উঠলেন। অতএব চলে আসবেন। কিছুদিন থেকে জেঠু চটি ছেড়ে খড়ম ধরেছেন। বয়েস বাড়লেই নাকি এটি করতে হয়। মেরুদণ্ড সোজা থাকে।

আর কত সোজা হওয়া দরকার মেরুদণ্ডের? ভগবান জানেন আর জেঠুই জানেন। খড়ম খটখটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন, যেন একখানা সতেজ শালগাছ।

এবার পতাকির আপাদমস্তক অবলোকন করে বলে উঠলেন, "আপনি ছাড়া আর কেউ এসে বাড়িতে সেঁধোতে পারে না। পদশব্দহীন পদপাতে যারা ঢুকে আসে?"

"ওঃ। আমায় বলা হচ্ছে চোর?"

"কী আশ্চর্য তোমায় বলা হবে কেন? নিঃশব্দে চুপিচুপি যারা আসা-যাওয়া করে, তাদের কথা হচ্ছে!"

পতাকি এখনও বীরত্বের অনুভূতিতে আছে, তাই তেমনই সতেজ গলায় বলে, "তা উপায় কী? বেরোতে দেখলেই তো 'কোথায়', 'কেন', 'কাদের কাছে', 'কী কাজে', 'কখন' এইসব জেরায় পড়তে হয়! এত জেনে কী হয় আপনার? বুঝি না!"

"ও, বোঝো না?"

দয়ালহরি তাঁর কাঁচাপাকা গোলালো-গোলালো সুপুষ্ট গোঁফ জোড়াটির ফাঁকে একটু দয়াল-হাসি হেসে বলেন, "তা হলে পষ্ট করে বুঝিয়েই দিতে হয়। 'কোন কাজে যাচ্ছ, কোন দিকে যাচ্ছ, কাদের কাছে যাচ্ছ' এ-সবের হদিস একটু জেনে রাখা দরকার বইকী! জানা থাকলে, খোঁজবার প্রয়োজন হলে, বেআন্দাজি সারা বাগনান তল্লাশ না করে, আন্দাজমতো জায়গায় খোঁজ করা যায়, সেই তল্লাটে কেউ গাড়ি চাপা পড়েছে কি না, খুন হয়েছে কি না, লেভেল ক্রসিংয়ের গেট গলিয়ে বেপরোয়া লাইন পার হতে গিয়ে রেলগাড়ির চাকায় কাটা পড়েছে কি না..."

"কী, এইসব খোঁজ করতে হবে?"

হঠাৎ জেঠির গলার স্বর শোনা যায়, জোরালো গলা। "ষাট! ষাট! বালাই ষাট! এইসব অলুক্ষুনে কথা মুখে আনছ তুমি?"

একটু আগে পতাকির চড়াগলার আওয়াজ পেয়ে জেঠি কাজ ফেলে অকুস্থলে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কাজেই দয়ালহরির কথাগুলির সব কানে ঢুকে পড়েছে তাঁর।

জেঠু অবশ্য অকুতোভয়। বলেন, "তা মুখে আনতে হল বইকী! পতাকিবাবু যখন রেগে-রেগে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়, কেন, কী বৃত্তান্তর মানেটা কী? তখন মানেটা একটু বোঝাতেই হয়। ওর বাপ-মা ছেলেটিকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে, তার একটা দায়িত্ব নেই? তেমন কিছু ঘটলে, লাশটাও তো তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।"

কথাটা হচ্ছে এই: পতাকির বাবার বদলির চাকরি, আজ এখানে তো কাল সেখানে, কাজেই ছেলের পড়াশুনোর সুবিধার জন্য দেশের বাড়িতে নিঃসন্তান দাদার কাছে রেখে দিয়েছেন তাকে। তো দেশের বাড়ি হলেও বাগনান কিছু আর সচরাচর দেশের বাড়ির মতো অজ পাড়াগাঁ নয়? নগরই। তা ছাড়া দাদা এখানের কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। কত নামডাক, মানসম্মান। ভদ্রলোকের

দায়িত্ববোধ প্রবল বলেই তো?

সেই দায়িত্ববোধের দাপটে পতাকি বেচারির জীবন মহানিশা!

তবে ওই জেঠি! অন্ধকারে আলো। তিনিও 'কোথায়? কেন? কী করতে? কখন?' -এর ধাক্কা ধরেন, তবে যা হোক একটু বোঝালে বোঝেন। এবং সবসময় পতাকিরই 'ফরে'। তাই দয়ালহরির ওই ভয়াল কথায় খুব রেগে উঠে বলে ওঠেন, "আবার ওইসব ছাইপাঁশ কথা? দুর্গা! দুর্গা! আহা, বেচারা ছুটির সময় একটু খেলতে যাবে না? নিজে খেলতে না ওর বয়েসে? নিজেই তো বলো পাড়ার লোকে তোমায় বলত 'গেছোবানর'। না রে পাতুকি, তুই বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যা! তো দেরি করিস না বাবা! কেমন? রোদ চড়া হওয়ার আগেই চলে আসবি। কেমন? ঘোলের শরবত করে রাখব।... তাড়াতাড়ি আসবি তো? অ্যাঁ? লেবেল ক্রসিং-এ যাবি না তো? আমায় ছুঁয়ে বলে যা।"

"না, না! ওদিকে কে যাচ্ছে?"

বলে পতাকি এখন বীরদর্পে বেরিয়ে যায়।

জেঠু যদি ওইসব অলুক্ষুনে কথাগুলো বলে না বসতেন, তা হলে জেঠি রাগের মাথায় এই মোক্ষম সময় গেছোবানর প্রসঙ্গটি তুলে বসে জেঠুকে আপাতত এমন বেকায়দায় ফেলে বসতে পারতেন না।

পতাকি বেরিয়ে যেতেই দয়ালহরি বলে ওঠেন, "তুমিই ছেলেটার পরকাল ঝরঝরে করে দিচ্ছ!"

জেঠি বেজার গলায় বলেন, "হ্যাঁ দিচ্ছি! মা-ছাড়া হয়ে আছে ছেলেটা! একটু মায়ামমতা দেখাব না?"

"মা-ছাড়া হয়ে আছে, যত পারো দই, ক্ষীর, মণ্ডা-মেঠাই, মাখন, মিছরি খাওয়াওগে। তাই বলে কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে দেখতে হবে না?"

"দেখবে দ্যাখো! অপয়া অলুক্ষুনে কথা কেন এই শনিবারের সক্কালে?"

॥ ২ ॥

তা শনিবারের সকালটা বোধ হয় অপয়াই! অন্তত আজ পতাকির পক্ষে। যদিবা জেঠির দৌলতে বেরিয়ে পড়া গেল, তবু আবার এক গাড্ডায় পড়ে বসতে হল! তাদের নিজস্ব জায়গা সেই 'সেখানে' যাওয়ার মুখে মেঠো রাস্তায় বাংলা-সারের মুখোমুখি। তাঁরও গরমের

ছুটি ! তাই মনের আনন্দে সকালবেলা বাড়ির গোরুর কচি বাছুরটার গলায় একটা হালকা দড়ি বেঁধে নিয়ে এই বাবুইবাগানের মাঠে টেনে এনেছেন কচি ঘাস খাওয়াতে। এখানটায় অনেক ঘাস।

বাংলা-সার মানেই সেই গজাল-গজাল দাঁতে খিকখিকে হাসি। মাঠের মাঝখানে মুখোমুখি। না দেখার ভান করার ফন্দি খাটে না। থার্মোমিটারের কেস ভরা পকেটটাকে সাবধান করে হাফ নিচু হয়ে একটা পেন্নামও ঠুকতে হয়।

"সার। আপনি ! ইয়ে নিজে গোরু নিয়ে..."

সার তাঁর বিখ্যাত দাঁতের পাটি উঁচিয়ে বলেন, "হ্যাঁ। চরাতে বেরিয়েছি। এতে আর আশ্চয্যি হচ্ছিস কেন রে ? এটাই তো আমার পেশা ! বাছুর চরানো। একপালকে বড় করে তুলে ধর্মের নামে ছেড়ে দিই, মাঠ খুঁজে চরে খেতে, আবার একপাল নিয়ে চরাতে বসি। তো পঞ্চগব্যের একটিমাত্র গব্যকে দেখছি যে ? এমন দলছুট কেন ?"

বাংলা-সার এদের নামকরণ করে রেখেছেন 'পঞ্চগব্য'। বিলু, প্রদীপ, সুনন্দ, ভোম্বল আর এই পতাকি ! এরা একই সেকশনের। সারের ভাষ্য, "যে ভাবে সর্বদা পাঁচজনে একসঙ্গে সেঁটে থাকো বাবা তোমরা, মনে হয় পাঁচে মিলে একটি সেট্ ! তো 'পঞ্চপাণ্ডব' বলাটা গর্হিত, তাতে তাঁদের অবমাননা করা। 'পঞ্চরত্ন' বললেও রত্নের অপমান। 'পঞ্চভূত' বললে আবার মানের ভুল ঘটে। 'পঞ্চগব্যই বেস্ট।"

পতাকি বেজার মুখে বলেছিল, "পঞ্চগব্য মানে ?"

"সে কী রে ? পঞ্চগব্য মানে জানিস না ? গব্যঘৃত মানে জানিস তো ? না তাও জানিস না ?"

"তা জানব না কেন ? দেখেওছি তো !"

"দেখেছিস ? বলিস কী রে ? তোদের আমলে ? দূর ! যা দেখেছিস, সে হচ্ছে দালদা ঘৃত। আসলে গোরু থেকে গব্য। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময়, চোনা—এই হচ্ছে পঞ্চগব্য। বুঝলি ? তা দলের মধ্যে তোকে ওই গোময় বলেই মনে হয়। খ্যা-খ্যা খিকখিক।"

এই হচ্ছেন বাংলা-সার !

এই ভয়ঙ্কর মহামুহূর্তে কিনা ইনি।

বিপদ থেকে ত্রাণ পেতে বলে ওঠে পতাকি, "সার, ওই ওদিকটায় খুব ঘাস আছে। অনেক ঘাস। ওই যে ওদিকে—কচি কচি—"

বলেই উলটো পাক খেয়ে ছুট !

ওঃ। কার মুখ দেখে উঠেছিল আজ পতাকি। শুভ কাজে কেবলই বাধা।

শুভকাজ ?

তা নয়ই বা কেন ? একটা মারকাটারি শুভ কাজই। অথচ সেখানে কত কী ঘটনা ঘটে গেল এতক্ষণে, ওরা চারজন তারিয়ে-তারিয়ে অনুভব করছে, আর পতাকি এখনও পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতেই পারল না ! উঃ। বাংলা-সার ঠিকই বলেন, ওই পঞ্চগব্যের চার নম্বর ভাগটি পতাকিই ! তা নইলে কিনা ভোম্বলটাও যাকে নাকি বাংলা-সারের মতে পঞ্চগব্যের পঞ্চমটাই বলা যায়। এক কলসি দুধে যার একফোঁটা পড়লেও সবটাই বরবাদ্। অকর্মার ঢেঁকি একখানা। সেও গিয়ে আসর জমিয়ে বসে আছে। আর পতাকি !

তা ওদের আসরটি আবার এমন জায়গায় যে, ছোটবারও জো নেই। অনেকখানি থেকে গঙ্গার ধারের বালির চড়া।

আসলে জায়গাটা ওদের আবিষ্কারই বলা যায়। অথবা ভাগ্যলব্ধ।

গঙ্গার ভাঙনে—গোকুল সাহার মস্ত বড় মুদির দোকানখানার সামনেটা সব ভেসে যাওয়ায় গোকুল মাথা চাপড়াতে-চাপড়াতে অনেকখানি দূরে উঁচু জমিতে আবার দোকান বসিয়ে নিয়েছে। ভেসে যাওয়া দোকানের পেছন দিকে গুদামঘরটি কিন্তু বেশ খানিকটা ডাঁটো আছে এখনও। ভাঙন আরও না বাড়া পর্যন্ত হয়তো থাকবে। সেই ঘরটিই এদের ক্লাব। অন্য জনমনিষ্যির আসার সম্ভাবনা নেই। আর অন্য অনেক বন্ধুও এদের নেই। এই পাঁচজন।

তো ওরাই সুবিধা পেলেই এখানে এসে আড্ডা জমায়। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় নিয়ে জোর আলোচনা করে, আর যত মহা-মহা লোকেদের দোষ-ঘাট নিয়ে প্রাণখুলে সমালোচনা করে। ভবিষ্যতে দেশটাকে কীভাবে গড়ে তোলা যায়, তার প্ল্যানও তৈরি করে।

তবে প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভবিষ্যতে নিজেরা কে কী হবে!

প্রদীপ অনেক আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে, সে ডাক্তার হবে, আর এমন একটা ওষুধ আবিষ্কার করবে যেটা কোনও রোগ-অসুখের ওষুধ নয়, ওষুধ হচ্ছে রোগ-অসুখ না হওয়ার। তার মানে 'প্রতিরোধ বটিকা'। শিশুকে ছেলেবেলা থেকে খাওয়াতে হবে। খাওয়াতে থাকলে কখনও কোনও অসুখই করবে না আর।

সুনন্দ?

সুনন্দ তো কবে থেকেই ঠিক করে রেখেছে যে এঞ্জিনিয়ার হবে। এবং এমন একরকমের চলমান বাড়ি আবিষ্কার করবে, যেটা একাধারে বাড়ি, গাড়ি, স্টিমলঞ্চ। মানে, তোমার বাসস্থানটি যথেচ্ছ চলেফিরে বেড়াতে পারবে, জলে, স্থলে, সর্বত্র। অবশ্য খুব হালকা হবে, আর এমন কিছু বেশি দামও হবে না। সাধারণ মানুষের 'গৃহসমস্যা', 'যানবাহন সমস্যা', 'সময় সমস্যা'–সব মিটবে তার থেকে বলেই এই আবিষ্কার-চিন্তা।

বিলু চায় কৃষিবিজ্ঞানী হতে। সে একটুকরো জমির মধ্যে অনেক বেশি ফসল ফলাবার উপায় আর ওষুধ আবিষ্কার করবে। আর চাষিবাসীদের যতটা সম্ভব কম কষ্ট হয় তার পদ্ধতিও আবিষ্কার করবে। বিলু বলে, "আমরা তো আরাম করে বসে খাই। দেখেছিস তো ওদের কষ্ট? জলে ভিজে, রোদে পুড়ে, কাদায় লাঙল চালিয়ে প্রাণপাত একেবারে!"

ভোম্বলের অবশ্য একেবারে অন্য বাসনা। সে একটা নামকরা দাবাড়ু হবে। বিশ্বরেকর্ড ছাপিয়ে দেবে। এখন থেকে তার প্র্যাকটিসও চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কিনা সুযোগ-সুবিধা এবং উৎসাহ দেওয়ার লোকের বড় অভাব। তাই তেমন এগোচ্ছে না। এমন কপাল বেচারার, বাড়িতে একবাড়ি লোক, কিন্তু একজনও কেউ দাবা খেলতে জানে না। বাবা, কাকা, দাদারা তাস খেলবেন হরদম, মাছ ধরতে বসবেন ছুটি হলেই, কিন্তু দাবার ঘুঁটিও চেনেন না। নেহাত এই বন্ধুদের একটু-একটু শিখিয়ে নিয়েছে তাই আশায় বুক বেঁধে বসে আছে! কবে কখন হঠাৎ কপাল খুলে যায়। যায়ও তো কতজনের!

কিন্তু পতাকি?

সে এখনও কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। সে প্রায় রোজই এক-একবার ভবিষ্যৎ বদলায়।

তবে সবই তো এখন সুদূরে। স্কুলের গণ্ডিটা পার না হওয়া পর্যন্ত কিছুই হবে না।

॥ ৩ ॥

বালির চড়া ভেঙে, সামনের দিকে গোকুল সাহাবাবুর মুদির দোকানের জলের ধারে বসে যাওয়া অংশটার ইট-কাঠ মাড়িয়ে পেছনের সেই গুদামঘরের চালার সামনের চাতালে এসে পড়া মাত্রই, সাড়া পেয়ে বিলু চালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বলে উঠল, "এতক্ষণে এলি তুই? কী ব্যাপার রে পতাকি? আর আমরা সেই তখন থেকে তোর জন্যে—"

"আমার কথা আর বলিস না। আমার যা অবস্থা..."

পতাকি প্রায় কেঁদেই ফেলে।

সুনন্দও বেরিয়ে আসে।

বলে ওঠে, "ঠিক আছে। ঠিক আছে! এসে গেছিস তো? ওটা এনেছিস তো? দে।"

পতাকি হঠাৎ হকচকিয়ে বলে, "কী এনেছি?"

"কেন থার্মোমিটার! বিলু বলে আসেনি?"

"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

প্যান্টের পকেট থেকে সাবধানে বের করে দেয়।

"গুড। উঃ, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে লোকটার। দেখিগে কত ওঠে।"

আবার ঢুকে যায় ভেতরে।

বিলু বলে ওঠে, "জ্বর আর হবে না? ভাবতে পারিস একটা রক্তমাংসের তৈরি মানুষ অজ্ঞান হয়ে খোলা আকাশের নীচে পড়ে আছে, আর তার ওপর দিয়ে এক-দু' ঘণ্টা জোর বিষ্টি হয়ে যাচ্ছে! আমরা তো এসে দেখে ভাবলাম নির্ঘাত কেউ শত্রুতা করে আমাদের এই ক্লাবঘরের সামনে একটা মড়াকে ফেলে রেখে গেছে। খুনের মড়া কি না তাই বা কে জানে! ...তো যখন দেখা গেল মরেনি, বেঁচে আছে, মনে হল আমরাই বুঝি মড়া থেকে বেঁচে উঠলাম।

আহা! সেই প্রথম দৃশ্যটিই দেখতে পেল না পতাকি!

"প্রথমে কে দেখল রে?"

"আমি আর প্রদীপ।"

"অত সকালে এসেছিলি?"

"সেই তো মজা! সেই যে ঠাকুমা বলে, রাখে হরি মারে কে? তাই।"

"প্রদীপটার নাকি কাল সন্ধের বিষ্টির সময় কেবলই মনে হয়েছে এত বিষ্টিতে আমাদের ক্লাবঘরের চালাটার কী দশা হচ্ছে! তাই ভোর হতে-হতেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আর যা করে, পথে আসতে-আসতে আমায় ডেকে নিয়ে সাইকেলে তুলে নিয়েছে। তো এসে দেখি, চালাখানা ঠিকই আছে। মানে ঝড় তো হয়নি, শুধুই বিষ্টি। কিন্তু সামনে ওই দৃশ্য। তারপর আর কি! বোঁ করে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে আর সবাইকে খবরটা দিয়ে এলাম।"

পতাকি বলল, "বেঁচে আছে এই আশ্চর্য!"

"খুব দুঃখী বলে বোধ হয়। দুঃখীদের জান খুব কড়া হয় রে।"

চালার মধ্যে ঢুকে এসে পতাকি দেখতে পেল লোকটাকে—তাদের নিজেদের বসবার জন্য এখানে যে একখানা ইঁদুরে খাবলানো গর্ত-গর্ত শতরঞ্চি আনা আছে, সেইটা পেতে শোওয়ানো হয়েছে। প্রদীপ তার মাথার কাছে বসে কপালে জলপটি দিয়ে, একটা পাটকরা পুরনো খবরের কাগজ নেড়ে নেড়ে বাতাস করছে। ভোম্বল বোকার মতো বসে আছে করুণ মুখে।

সুনন্দ থার্মোমিটারটা ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, "একশো চার।"

প্রদীপ বলল, "আরও বেড়েছিল। জলপটি দিয়ে একটু কমল মনে হয়।"

জলপটিটা বোধ হয় প্রদীপের রুমাল একখানা।

ঘরটা অবশ্য গুদামঘর। জানলা-দরজার বালাই বলতে শুধু একটা

মাত্র দরজাই। তবে তিন পাটের বড় দরজা। বড়-বড় বস্তা ঢোকাবার মতো! তো সেইটা খোলা থাকাতেই ঘরে হু-হু করে গঙ্গার হাওয়া আসছে, আর আলোও ঢুকছে। মস্ত ঘর।

লোকটার বয়েস মাঝারি। কালো কুচ্ছিত চেহারা। মুখে খোঁচা-খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। চুলগুলোও কাঁচাপাকা কদমছাঁট। পরনে একটা ফালা-ফালা ছেঁড়া লুঙ্গি, আর তার থেকেও ফালা ফালা একটা ময়লা ফতুয়া।

প্রদীপ বলল, "মনে হচ্ছে লোকটাকে কেউ দেদার পিটিয়েছে।"

জেলপালানো আসামিটাসামি নয় তো?

ভোম্বল তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "না না। জেল-এর পোশাক তো অন্য রকম। ডোরাকাটা-ডোরাকাটা।"

"তুই তো সব জানিস।"

"সিনেমায় দেখিস না?"

"জ্ঞান ফিরলে বোঝা যাবে কে, কী বৃত্তান্ত। এখন তো জ্বরে বেহুঁশ।"

পতাকি বলে ওঠে, "জ্বর কমানোর ট্যাবলেট তো আছে। আমার কাছে পয়সা আছে। আমার তো সাইকেল চড়া চলবে না, কেউ যদি..."

হ্যাঁ, বেচারি পতাকির জেঠুর কড়া শাসন, "সাইকেল-ফাইকেল নয়। পড়ে আছাড় খেয়ে ঠ্যাং ভাঙলে দেখবে কে? চড়তে হয় সাইকেল রিকশা চড়ো।"

প্রদীপ বলল, "আরে বিলু যখন সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল, বাড়ি থেকে বোরিক, তুলো, আয়োডিন আর দুটো ট্যাবলেট এনেছিল চুপিচুপি। বলল, ওর মা'র জন্যে কবে নাকি এসেছিল, দুটো পড়ে আছে দেখেছিল।"

"তো দে তা হলে খাইয়ে?"

"না রে, একদম খালিপেটে খাওয়া ঠিক নয়। লোকটার পেটের চেহারাটা দেখছিস? যেন একটা গর্ত! মনে হচ্ছে যেন সাতদিন খায়নি। এত খালিপেটে খেলে উলটো ফল হবে।"

প্রদীপ ভবিষ্যতে ডাক্তার হবে, তাই এখন থেকেই ডাক্তারির এটা-সেটা শিখে ফেলেছে।

কিন্তু এখন এ-অবস্থায় কী খাবে? খেতে পারবে?

"যদি একটু দুধ পাওয়া যেত রে—ফোঁটা-ফোঁটা খাইয়ে—কিন্তু কারও বাড়ি থেকে তো চুপিচুপি দুধ আনা সম্ভব নয়। তা হলেই জেরা। তা হলেই জানাজানি। জানাজানি হলে যে কোন দিক থেকে কী বিপদ আসবে কে জানে! আমাদের যে কী বিপদ! করতে যাও জেরা।"

পতাকি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "যা বলেছিস। কিন্তু তোদেরও ওই জেরা?"

"নয় আবার? ওই তো বিলু বলল ওই জিনিস ক'টা হাতিয়ে আনতে কী কম কৌশল করতে হয়েছে?"

"তা হলে? লোকটাকে বাঁচাবার কী উপায়?"

সকলেই কাতর, চিন্তিত।

॥ ৪ ॥

তা রাখে হরি মারে কে? এটা অলীক কথা নয়। সত্যিই। তা নয়তো প্রদীপরাই বা সাতসকালে বালির চড়া ভেঙে চলে আসবে কেন? আসে তো বিকেলে। কিংবা স্কুলের কোনও ছুটির দিনে হলে যদিবা সকালে। তাও বাবা, কাকা, দাদারা, মানে ডেলি প্যাসেঞ্জারের যাত্রীরা বেরিয়ে গেলে তবে। গত সন্ধ্যার বৃষ্টির কথা ভেবেই না হঠাৎ...

ওঃ। ভাগ্যিস। ওইভাবে রোদ চড়ে ওঠা বেলা পর্যন্ত বাইরে পড়ে থাকলে লোকটা নির্ঘাত মরে যেত। লোকটার মরে যাওয়াটা যেন খুব একটা বড়রকমের লোকসান বলে মনে হচ্ছে এদের। তা হচ্ছিল বলেই বোধ হয় এমন একটা ঘটনা ঘটল। ভগবান প্রেরিত হয়ে একটা দেবদূত এসে হাজির হল।

তা দেবদূতই।

যদিও দেবদূতের চেহারাটি কেলেকিষ্টি একটি নেংটি ইঁদুরের মতো, আর পরনে কেবলমাত্র একটি গামছা।

সেই মূর্তিটি, যাকে বলে সহসা একেবারে এই চালাঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বলে ওঠে, "দাদাবাবুরা আজ ভোর সকাল থেকেই এখেনে কী করতেছ গো?"

"অ্যাঁ? এ কী? তুই কে?"

"এজ্ঞে আমারে চেনছেন না?...তোমাদের ইস্কুলের ম্যাস্টারবাবুর বাড়ির রাখাল গো। খ্যাঁদা! ইস্কুল খোলা থাকলে নিত্যদিন ম্যাস্টারবাবুর নেগে তেনার ঘর থেকে দুদ নি' যাই। দেখেন নাই?"

ওঃ, তাই তো বটে। বাংলা-সার খাঁটি গব্য দুগ্ধপানের জন্য নাকি গোটাতিনেক গোরু পুষেছেন। সেটাই তাঁর টিফিন স্বরূপ বাড়ি থেকে যায়। নিয়ে যায় এই ছেলেটা।

তা তখন তো খ্যাঁদার পরনে একটা গেঞ্জি আর ইজের থাকে। এখন এ কী সাজ?

খ্যাঁদা অগ্রাহ্যভরে বলে, "গোরু চরাতে আসব কি বাবু সেজে? গোরু গুলানকে ছেড়ে দে ধুলায় শোব, বসব, কিন্তু তোমরা এখেনে কী করো গো? নিত্যদিন বাবুই বাগানের মাঠে গোরু চরাতে এসে দেকি তোমরা পাঁচজনা ইদিকে কোতায় যেন আসো! আজ দেকচি ভোর সকাল থেকে আসা-যাওয়া, ছাইকেল নে ছুটাছুটি! বোমাটোমা বানাও নাকি গো? হি হি হি।"

"অ্যাই, মারব এক থাপ্পড়!"

খুব রেগে গিয়ে সুনন্দ বলে, "যা ভাগ! আমাদের কথায় তোর দরকার কী? বোমা বানাচ্ছি? ভারী আসপদ্দা দেখছি।"

খ্যাঁদা একটু মলিন হয়ে গিয়ে বলে, ওটা তো তামাশা করে বললুম। দেখে মনে লাগল, "খুব ব্যস্ততা। তো মন হল যদি তোমাদের কোনও কম্মে লাগি।"

প্রদীপ হাতের কাগজটা নামিয়ে রেখে সরে এসে বলে, "এই কথা মনে হল তোর? সত্যি?"

"সত্যি! সত্যি। সত্যি। এই তিন সত্যিক! বিশ্বেস করো। খ্যাঁদা একটা তুচ্ছ মানুষ বটেক। তো দাদু বলত তুচ্ছু একটা পিপীলিকাও মানুষের কাজে লাগতে পারে।"

"বাঃ। তোর দাদু তো বেশ ভাল কথা শিখিয়েছেন। তো একটা কম্মে লাগতে পারিস? কিন্তু কাউকে বলা চলবে না। বলে ফেলবি না তো? একটা মানুষের মরা-বাঁচার ব্যাপার। বলে ফেললেই খতম!"

ছেলেটা দু' হাতে দুটো কান ধরে বলে, "মা গঙ্গা সাক্ষী।"

"দ্যাখ। একটা লোক—" বলেই সংক্ষেপে আর দ্রুত ঘটনাটা খাঁদার কাছে বিবৃত করে বলে ওঠে প্রদীপ, "একটু দুধ পেলে লোকটার প্রাণ বাঁচে। তোর ম্যাস্টারবাবুর বাড়ি থেকে তোর নিজের নাম করে একটু চেয়ে আনতে পারবি? খবরদার, কার জন্যে সে-কথা ফাঁস করবি না।"

"বললুম না, মা-গঙ্গা সাক্ষী।"

তারপর ফিক করে একটু হেসে ফেলে বলে, "নিজের নাম করে? খ্যাঁদাকে দুদ খাওয়াবার নেগে বসে আচে যে ম্যাস্টার গিন্নি। তো ও নিয়ে ভাবতে হবেনি। তিনটে গোরু তো অ্যাখন আমার হাতে। তিনটের বাঁট থেকে একটুক-একটুক করে দুইয়ে নিলেই এক গেলাস হয়ে যাবে।

সদ্য দোয়া গরম দুদ, খেলে বলশক্তি বেশি পাবে। তো দ্যাও একখান পাত্তর।"

"পাত্তর !"

"হ্যাঁ, একটা বাটি কি ডেচকিমতো কিচু। নচেৎ দুইব কিসে ?"

"সেরেছে ! এখানে আবার বাটি ডেকচি কোথায় ?"

"এখানে আসবাবের মধ্যে তো ওই শতরঞ্চিখানি। আর নিয়ে আসার মধ্যে জলের বোতল। তো বোতলে তো আর দুধ দোয়া যায় না।"

খ্যাঁদা লোকটাকে দেখে মলিনভাবে বলে, "ঠোঁট শুকোচ্চে। একটুক জল দাও। দুদ পেলেই খাবে। কিন্তুক—আনি কিসে ?"

এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে ওঠে, "ওখানে উই ইটের ওপর ওটা কী বসানো বটে ?"

"কই ? ওটা ? আরে ওটা তো—"

'হ্যাঁ, সেটি হচ্ছে একটি পুরনো বিস্কুটের টিন। যাতে ভোম্বলের প্রাণের দাবার ঘুঁটিগুলি সুরক্ষিত। এটিও এই ক্লাবঘরেই থাকে। বাড়ি থেকে রোজ আনা তো এক ফ্যাসাদ। পাছে ইঁদুরে নিয়ে যায় তাই কাগজের বাক্স থেকে ট্র্যান্সফার করে ওর মধ্যে। বোধ হয় তিন প্রজন্ম আগের একটা 'হান্টলি পামার'-এর বিস্কুটের টিন। বাইরেটা মরচে ধরা মতো। ভোম্বলের ঠাকুমা তাঁর ভাঁড়ারে তস্যকাল থেকে চিরকাল তেজপাতা রাখেন। তো সেটি হাতানোতেই কী কম শোরগোল উঠেছিল বাড়িতে ? ঠাকুমা চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করেছিলেন। তবে বাড়ির লোকেরা যখন জানতে পারলেন জিনিসটা কী, হাসির ঢেউ পড়ে গেল। কেউ আর চোর ধরতে চেষ্টা করল না। তদবধি জিনিসটা এখানেই।

খ্যাঁদা বলে ওঠে, "ওর মদ্যে কী আচে ? সেটা ঢালা করে, ওটাই দ্যাও না। ধুয়ে নিয়ে ছুট্টে একটুক দুদ দুইয়ে আনি।"

"ধুবি কিসে ?"

"ক্যানো ? মা-গঙ্গা আচে কী করতে ?"

"না, না, গঙ্গায় দূষণ—" ভোম্বল বলে ওঠে, "আমার এই জলের বোতলে একটু জল আছে। নে।"

তারপর ?

তারপর সদ্য দোয়া হাতে গরম ফেনা ভর্তি দুধ এসে যায় এবং খ্যাঁদা আনীত একটি পেঁপের ডালকে ড্রপার হিসাবে ব্যবহার করে লোকটাকে দিব্যি বেশ খানিকটা দুধ খাইয়ে ফেলা যায়। কৌশল কেরামতি, সবটাই খ্যাঁদার। এটা তার ধাতস্থ। কচি বাছুরগুলোর অসুখ করলে মা'র বাঁট থেকে দুধ টানতে পারে না বলে, এইভাবে তাদের দুধ খাইয়ে চাঙ্গা করে খ্যাঁদা।

গোরু তিনটেকে একলা মাঠে ছেড়ে রেখে এসেছে বলে ছটফট করছিল খ্যাঁদা, তবু তার মধ্যেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল, "আবার ও-বেলা দুদ আনব। আর তোমাদের ওই কৌটোটা লাগবে না, ঘর থেকে আমার খাবার জলের ঘটিটা করে নে আসব।"

"কিন্তু এইখানেই কী শেষ ? যাওয়ার আগে অত ছটফটানির মধ্যেও বলে গেল, মানুষটার পায়ের গাঁটটা দেখে মনে হতেচে, হাড় মচকেচে। য্যাখন আসব, হাড় জোড়ার পাতা এনে বেঁদে দে যাব।"

এর পরও কি বলা হবে না ছেলেটা 'ছদ্মবেশী দেবদূত'!

অতঃপর ঘরের দৃশ্যে দ্রুত বদল।

সাধে কি আর বিলু বলেছিল, দুঃখীর জান বড় কড়া।

তা না হলে, সেই পেঁপের ডালের চোঙাবাহিত খানিকটা সদ্য দোহা দুধ, আর একটা ট্যাবলেট, ম্যাজিকের মতো কাজ করে ?

ঘণ্টাখানেক পরেই লোকটার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। অর্থাৎ এই পাঁচটা ছেলেরও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ায়।

আবার লোকটা যখন বাকশক্তি অর্জন করে নিজের কাহিনী বিবৃত করে, তখন নতুন করে এদের মধ্যে প্রায় কম্প দিয়ে জ্বর আসে। লোকটা বলে কী ! যা সন্দেহ করা যাচ্ছিল সত্যিই তাই। হ্যাঁ, নিজের পরিচয় অকপটেই জানাল লোকটা। বলল, "আপনারা আমার জীবনদাতা ! আপনাদের কাছে মিছে কথা কইব না। সবই জানাচ্ছি।"

কিন্তু যা জানাল, সেটা কী লোকসমাজে জানাবার ?

লোকটার নাম কংসারি হাজারি। আস্তানা ওই রূপনারায়ণের ওপারে। পেশা চুরি। বলল, "হ্যাঁ বাবারা, ওটাই পেশা। নেশার দায়ে নয়, পেটের দায়ে। উপার্জনের কোনও পথ না পেয়ে শেষমেশ এই পথ।"

তা বেচারির মানসিক অবস্থা তখন মরিয়া। না খেতে পেয়ে মা আর ছোট ভাইটা কচুর ডাঁটা সেদ্ধ করে খেতে গিয়ে ভুল করে কী বিষাক্ত গাছড়া খেয়ে

ভেদবমি হয়ে মরেছে, আর নতুন বউটা ভয়ে, দুঃখে, রাগে পালিয়ে গেছে।

এ-লোকের আবার জেলের ভয় ? তবে লোকটা তো আর চালাকচতুর বুদ্ধিমান চোর নয়, এ হচ্ছে নেহাত বোকা মুখ্যু ছিঁচকে চোর। ওই ছিঁচকেমি করে মাঝে-মাঝে পেট চালায়, আর মাঝে-মাঝে ধরা পড়ে যাওয়ায় জেলখানার ভাতে পেট চলে।

তো সম্প্রতি জেল থেকে ছাড়ান পেয়ে ভেবেছিল, আর চুরি নয়। কিন্তু এমনই ভাগ্য কিছুতেই কোনও কাজ জুটল না। কাজেই আবার ঢুকছিল একটা বাড়ির পাঁচিল টপকে, ধরা পড়ে গেল।

আর ধরা পড়ে গেলে চোরের ভাগ্যে যা হয়! চোরের মার খাওয়া। তাই হল। বলে, "ওই যে ওই গঙ্গার ধারের মস্ত লাল বাড়িটা ? ওর মধ্যেই সেঁদোতে গেছলাম বাবারা ! তো কে জানত কুকুর আছে ? তার জন্যেই ধরা পড়া। তারপর যে পেরেছে হাতের সুখ করে নিয়েছে। পথচলতি লোকও গোলমাল দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে একহাত নিয়ে মজা মেরেছে।"

তবু ছুটে পালিয়ে এসেছিল লোকটা। 'চোরের ছুট' বলে কথা ! গোকুল সাহার ওই গঙ্গার ভাঙনে ভেসে যাওয়া দোকানটার পেছনের গুদামঘরের চালাটার সন্ধান তার জানা ছিল, ভেবেছিল কোনওমতে পালিয়ে এসে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগার কপাল, আসবার মুখে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল, আর সেই সময় জোর তলবে বৃষ্টি নামল। তারপর তো আর জ্ঞানগম্যি ছিল না।

লোকটা যে চোর, এ ভেবে কারও মনের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব এল না। বরং যেন বেঁচে উঠে এই পাঁচ-পাঁচখানা মাথাকে কিনে বসেছে। বর্তে গেছে এরা লোকটার জ্ঞান ফিরেছে আর কথা বলতে পেরেছে বলে। কিন্তু যা বলে গেছে খ্যাঁদা। পায়ে চোট লেগেছে, উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কাতরভাবে বলেছে, "বেচারি একটু দাঁড়াবার ক্ষ্যামতা থাকলেই কংসারি আবার ছুট মেরে সটকাত বাবারা, কিন্তু বড় বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে।"

তা কংসারির পা শুধু যে কংসারিকেই বেকায়দায় ফেলেছে তা নয়, এই পাঁচটা ছেলেকেও ফেলে দিয়েছে। তবু—তাদের মধ্যে একটা নতুন ধরনের আনন্দের উত্তেজনা। একটা প্রায়-মরা লোককে তারা বাঁচাতে পেরেছে, এ এক আলাদা সুখ। তবে তাকে সুস্থ করে তুলতে সমস্যা অনেক। প্রথম তো, বেশ কিছু সাজসরঞ্জাম জিনিসপত্র চাই, একটা অসুস্থ অনড় লোককে দু-পাঁচদিন পুষতে। তা ছাড়া গোপনীয়তার প্রশ্ন। সেটা জরুরি।

কারণ, এরা যখন বলেছিল, তোমায় আমরা না হয় ধরাধরি করে রিকশায় উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাই, লোকটা ডুকরে উঠে বলেছিল, "বরং আমার গলায় একখানা কাটারির কোপ দ্যান বাবারা, তবু হাসপাতালে দেবেন না। হাসপাতালে গেলেই আবার সন্দ করে জেলে ঠেলে দেবে। আর আপনাদেরও বিপদে পড়তে হবে।"

ভেবে দেখল, কথাটা ঠিক।

তা হলে এখন এইখানেই লোকটাকে দু-একদিন রেখে পুষতে হবে ! তার জন্য জিনিস চাই। তা ছাড়া দিনে পালা করে বাড়ি থেকে খেয়েটেয়ে এসে যা হোক করে ম্যানেজ করতে পারলেও রাত্তিরে আগলানোর সমস্যা।

সেটাই প্রধান সমস্যা।

তবু ব্যাপারটা যখন দারুণ জরুরি, একটা কিছু তো করতেই হবে।

প্রদীপ বলল, "আমার মতে সবাই মিলে একসঙ্গে থাকার কোনও মানে হয়

না। সেও পালা করেই চালাতে হবে। ধর, আজ আমার আর সুনন্দর বন্ধুর কাকার বিয়েতে হাওড়ায় বরযাত্রী যেতে হবে। রাতে ফেরা হবে না। বাড়ি থেকে অবশ্য বরযাত্রীর সাজ সেজেই বেরোতে হবে। তারপর উলটো পাক খেয়ে..."

তো আজ যদি প্রদীপ আর সুনন্দকে বন্ধুর কাকার বিয়েতে হাওড়ায় গিয়ে রাতে থাকতে বাধ্য হতে হয়, আগামীকাল বিলু আর ভোম্বলেরই বা বন্ধুর দিদির বিয়েতে শালকেয় গিয়ে রাত কাটাতে বাধ্য হতে বাধা কী?

তৃতীয় দিনে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হতে পারবে।

তবে পতাকিকে কেউ এই বিয়ে পার্টির মধ্যে রাখার কথা ভাবতেই পারে না। হ্যা হ্যা করে হেসে বলে, "তোর আর উপায় কী? তোর যে জেঠু। দয়ালহরির নেকনজরে থাকা। সেই নজর এড়িয়ে? ওরে বাপ।"

ভারী দুঃখ হয় পতাকির। কিন্তু জানে কথাটা মিথ্যে নয়। শুধু 'একটা বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন' বলে ছাড়ান পাওয়ার উপায় নেই তার। সেই বন্ধুর নাড়ি-নক্ষত্র জানাতে হবে না জেঠুকে?

প্রদীপ বলে ওঠে, "যাক, দুটো রাতের ব্যবস্থা তো হয়ে গেল, এখন জিনিসগুলো! একটা লিস্ট করে ফেলেছি, এখন যে সেটা নিজের-নিজের বাড়ি থেকে আনতে পারা যায়। নিতান্ত দরকারি জিনিসেরই লিস্ট করেছি। এর মধ্যে দুটো গেঞ্জি আর দুটো পায়জামা আমার নিজের থেকেই সাপ্লাই দিতে পারব। বাকি জিনিসগুলো তোদের চারজনকে যে করে হোক ম্যানেজ করতে হবে।"

"কই, লিস্টটা দেখি," বলে উঠল বিলু।

প্রদীপ বলল, "কাদাখোঁচা করে লিখেছি, পড়তে পারবি না। বলেই যাই শোন। (১) একসেট বিছানা। অর্থাৎ একটা তোশক, একটা বালিশ, একটা চাদর আর একটা কম্বল। ছেঁড়াখোঁড়া যাই হোক। কম্বলটা চাই। আবার যদি জ্বরটর আসে। (২) দুধ গরম করার জন্য একটা সসপ্যান। (৩) ভাত রান্না করার জন্য একটা ছোট ডেক্‌চি। ভাতটা তো খাওয়াতেই হবে, নচেৎ পায়ে-গায়ে বল আসবে কী করে? (৪) খাবার জন্য একটা থালা, গেলাস, বাটি। (৫) আপাতত দিনতিনেকের মতো চাল, ডাল, আলু, নুন, হলুদ, তেল। (৬) সম্ভব হলে একটু চায়ের ব্যবস্থা। এ আর তোরা চারজনে ভাগ করে আনতে পারবি না?"

সুনন্দ বলল, "ব্যাপার তো সামান্যই। কিছু তো কিনে নিতে পারলেও হয়। কিন্তু কার আর পকেটে কত রেস্ত বল? ওষুধ-তষুধ, অন্য খরচ তো থাকবেই কিছু। কিন্তু মুশকিল কী জানিস? বাড়ি থেকে কিছু হারালেই বাড়ির কাজের লোকটাকে সন্দেহ করতে বসবে সবাই। এই এক ভাবনা! দেখেছি তো। কিছু একটা দেখতে না পেলেই ধরে নেওয়া হয় নিশ্চয় ও নিয়েছে।"

বিলু বলল, "আমারও সেই একই প্রবলেম। তা ছাড়া, ছোটখাটো জিনিস যদিবা সরানো যায়, বিছানাপত্তর? ও বাবা। পিসির চোখ এড়ানো অসম্ভব।"

ভোম্বল বলে উঠল, "আমাদের বাড়ি থেকে? একখানা চায়ের চামচও সরানো যাবে না বাবা! তা হলে বুড়ি বাড়ি মাথায় করবেন, গলা আকাশে তুলবেন। বলেন নাকি চোখে ছানি পড়েছে। অথচ চোখের আড়াল দিয়ে একটা ছুঁচ গলাতে যাও? হুঁঃ। আমি কোনও গ্যারান্টি দিতে পারব না বাবা।"

পতাকি বলে ওঠে, "আমার বাড়িতে ওদিকে নো প্রবলেম। আমি একাই সব সাপ্লাই করতে পারি। শুধু গুছিয়ে একটা গল্প বানাতে পারলেই হল। কিন্তু আসল প্রবলেম হচ্ছে পাচার করা। ভয়ালহরি বাড়িতে থাকার সময় তো প্রশ্নের বাইরে।"

ওরা বলে উঠল, "গল্প বানানোর কথা কী বললি?"

"গল্প? ও, জেঠির কাছে যদি বেশ করুণ-করুণ মুখ করে বলি, একটা নেহাত গরিব দুঃখী লোকের মরণবাঁচন অভাবের জন্যে এগুলো দরকার, জেঠি একটার জায়গায় দুটো দেবেন। পুরনোর বদলে আস্ত দেবেন। তিনদিনের যুগ্যি চাইলে দশদিনের মতো দিয়ে দেবেন, কিন্তু ওই। পাচার করাই প্রবলেম। গেটে তো সর্বদাই ভয়ালহরি! তবে যদি সন্ধে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে কাজ সারতে পারিস। ওই সময়টুকু হচ্ছে ভয়ালহরির সান্ধ্য-ভ্রমণের টাইম। স্বাস্থ্য টাইট রাখার জন্যে হণ্টন-ব্যবস্থা। ঠিক সেই সময়টুকুর মধ্যে কেল্লা ফতে করতে পারলে, ব্যস। অবশ্য বলছি না, জেঠু লোকটা কিপ্‌টে কি কাউকে কিছু দিতে নারাজ। মোটেই তা নন, কিন্তু ওই। জেরা। শুধু 'একটা গরিব লোক' বলে

জেঠিকে হাত করা যায়, জেঠুকে নয়। সেই গরিব লোকটা কে, কী বৃত্তান্ত, তার সঙ্গে আমার যোগাযোগের সূত্রটি কী, সে আসল গরিব, না সাজা গরিব, এইসব তথ্য সম্পূর্ণ জানা দরকার তাঁর। তা হলেই ভাব ? বেচারি কংসারিকে হয়তো তার বদলে আবার জেলে গিয়ে ঘানি টানতে হবে। তার থেকে গোপনীয়তাই সেফ।"

কংসারি সব শুনতে-শুনতে বলে ওঠে, "কংসারির জন্যে এত চিন্তা বাবারা ? একটা নিকৃষ্ট জীব মাত্তর। আমারে বিদেয় দিন—"

পাঁচজনেই বকে ওঠে, "থামো তো। কে নিকৃষ্ট, কে উৎকৃষ্ট তার হিসাব আছে ? সামান্য একটু অপরাধে যারা জলজ্যান্ত একটা মানুষকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলতে পারে, তারা খুব উৎকৃষ্ট জীব, কেমন ? তোমাকে আমরা সারিয়ে না তুলে বিদেয়টিদেয় দিচ্ছি না!"

পতাকি বলে ওঠে, "তোরা কেউ একটা সাইকেল নিয়ে জাস্ট সন্ধে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে আমাদের ওখানে চলে আসবি। সব ঠিক করা থাকবে। চাপিয়ে দেব। কথাটা মনে থাকবে তো ? না হলেই 'ম্যাসাকার'! এই রে, সাড়ে বারোটা বেজে গেল। বাড়ি থেকে সকাল সাড়ে সাতটায় বেরিয়েছি। ওরে বাবা রে, এতক্ষণ কী যে ঘটছে বাড়িতে ! চললাম। যাবি কেউ ঠিক সময়ে। তোরা বেশ রাতে থাকতে পাবি এখানে, ইস। আমার যা খারাপ লাগছে।" যেন সত্যিই ওরা বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়ার স্বাদ পেতে যাচ্ছে, শুধু পতাকিই বঞ্চিত।...তাই "তোরা যাস তা হলে ?"

কিন্তু কেউ কি যেতে পেরেছিল সেই ঠিক সময়ে ? কংসারি নামের লোকটার জন্য যা কিছু আনার কথা নিয়ে এসে এখানে জমা করেছিল ? না, পুরো লোকটাই এখান থেকে হাওয়া হয়ে গেল ? কাউকে আর রাতে পাহারা দিতে থাকতে হল না ?"

বালির চড়া ভেঙে রাস্তায় উঠে একটা সাইকেল রিকশায় চেপেও বেলা একটার আগে বাড়িতে এসে পৌঁছতে পারল না পতাকি ! বাড়িতে ? না, বাড়ির দরজার বাইরে, মোড়ের কাছাকাছি। দাঁড়িয়ে আছেন দয়ালহরি দেবনাথ।

তো ভাইপোকে দেখামাত্রই কি তার ওপর বকুনির ঝড় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি ?

না তো ! ঠিক নিজস্ব স্টাইলে একবার তার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে গোঁফের ফাঁকে সেই হাসিটুকু হেসে বলে উঠলেন, "এ কী ! একেবারে আস্ত সুস্থ একা নিজে নামছ ? সাইকেল রিকশাটাকে দেখে ভাবলাম, আস্ত সুস্থ ! বোধ হয় পাঁচজনে ধরাধরি করে নামাবে। সঙ্গে-সঙ্গেই হসপিটালে চলে যেতে হবে। থানায় আর হসপিটালে খবর দেওয়া রয়েছে তো। এই যে টাকাপয়সা নিয়ে রেডিই রয়েছি।" বলে বুকপকেটটা একবার থাবড়ালেন দয়ালহরি।

যদিও বেচারি পতাকির মনে-মনে খুবই অপরাধবোধ ছিল। খুব বেশি বকুনি খেতে হলেও গায়ে লাগত না। বরং বোধ হয় ভালই লাগত। স্বস্তি হত। কিন্তু তার বদলে এই।

পতাকি ছিটকে উঠে বলে, "ওঃ। তাই হলেই দেখছি আপনার পক্ষে ভাল হত।"

"আলবাত !"

দয়ালহরি দরাজ গলায় বলেন, "একটা কিম্ভূত আচরণেরও তবু একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকত। যুক্তিহীন কাজ একদম বরদাস্ত করতে পারি না আমি। তা যাওয়া হয়েছিল কোথায় ? শ্মশানে-টশানে

না কি ? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে বোধ হয় কোনও মড়া-ফড়া পুড়িয়ে এলে ! যাক, চলো, চলো, বাড়ির মধ্যে । জেঠিকে একবার দর্শন দেবে চলো । তিনি হয়তো এতক্ষণে মনে-মনে লেভেল ক্রসিং-এর ধারে বসে তোমার কাটা মুণ্ডুটি নিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন ।" বলতে-বলতে ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে আনেন পতাকিকে ।

"উঃ, আর কত সহ্য হয় ?"

রাগের চোটে গোপনীয়তার প্রশ্ন ভুলে মেরে দেয় পতাকি । সতেজে বলে ওঠে, "পোড়াবার মতো একখানা মড়াকে বাঁচিয়ে তোলা হচ্ছিল এতক্ষণ । বুঝলেন ?"

"অ্যাঁ । তাই নাকি ? মড়া বাঁচিয়ে তোলার মন্ত্রতন্ত্রও শিখে ফেলেছ নাকি ? ও পতাকির জেঠি, শোনো, শোনো ।"

জেঠি ডুকরে ওঠেন, "ফিরেছিস ? বাঁচলাম ? কোথায় ছিলি বাবা এতক্ষণ ? সকাল থেকে না খাওয়া, না নাওয়া—ভেবে মরছি ।"

যাক, এটা তবু একটা ভদ্রমতো ভাষা ! ন্যায্য আক্ষেপ । মনটা নরম হয়ে যায় । অতএব পতাকি সকাল থেকে যা কিছু ঘটেছে সব ঘটনা গড়গড়িয়ে বলে চলে । না বলে পারছিল না তো । মায় সেই খ্যাঁদার অবদানকাহিনী পর্যন্ত ।

দয়ালহরি বলে ওঠেন, "আরে বাবা, একেবারে মেল ট্রেন চালিয়ে যাচ্ছ যে ? একটু আস্তে । মাথায় ঢুকতে দাও । কী বললে ? লোকটা মার খেতে খেতে ছুটে এসে তোমাদের সেই গঙ্গাতীরবর্তী আড্ডাখানার সামনে প্রায় মরে পড়েছিল ? তার ওপর আবার কালকের সেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়েছে ঘণ্টাখানেক ধরে । আচ্ছা জান তো লোকটার ? এততেও ওর মরার মতো —"

পতাকি রাগের গলায় বলে, "দুঃখী বলেই তাই । দুঃখীদের প্রাণ কড়া হয় । কীরকম দুঃখী জানেন ?" উত্তেজিত হয় পতাকি, "শুধু একটু চুরি করতে গিয়েছিল, তাও করেনি । সেই জন্যে বেচারাকে সব্বাই মিলে একেবারে চোরের মার মেরে শেষ করে ছেড়েছে ।"

"অ্যাঁ, কী বললে ? হা হা হা । ও পতাকির জেঠি, ছেলেটা বলে কী ? চোর টাকে সবাই মিলে চোরের মার মেরেছে ! কী আশ্চর্য কাণ্ড !"

পতাকি ক্ষুব্ধভাবে বলে ওঠে, "আপনার তো সব কিছুতেই ঠাট্টা ।...চোর বলে কি মানুষ নয় ?"
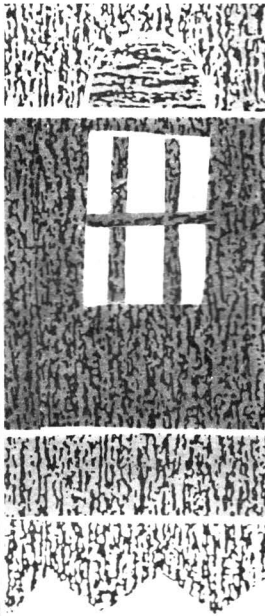
"আরেব্বাস ! সে-কথা কে বলেছে, তবু চোরকে চোরের মার মারবেই লোকে । এটাই মানুষের স্বধর্ম ! ভাবে আহা মুফতে কেমন হাতের সুখ করে নেওয়া যায় । লোকটা পিটুনি খেয়ে খুন হয়ে গেলেও যখন কারও ফাঁসি হয় না । চোরের গা, হাত, পা-কে কেউ রক্তমাংসের বলে মনেই করে না । কিন্তু তোমরা তো বাপু তাকে মানুষ বলেই গণ্য করেছিলে মনে হচ্ছে, তা হলে তার সঙ্গে মানুষ তুল্য ব্যবহার করলে কই ?"

"তার মানে ?"

"তার মানে, লোকটার একশো চার পাঁচ জ্বর দেখেও তোমরা পাঁচজন আনাড়িতে তার চিকিৎসা করতে বসলে । যাদের নাকি নাড়িজ্ঞান পর্যন্ত নেই । এর নাম হচ্ছে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া । একটা ঘোড়ার রোগব্যাধি হলে ঘোড়ার ডাক্তার ডাকা হয় । গোরুর অসুখ করলে 'গো-বদ্যি' । যে-কোনও পশুরই অসুখের জন্যে পশু চিকিৎসকের ডাক পড়ে । আর এ একটা মানুষ, তার জন্যে একটা ডাক্তারের ডাক পড়ল না ? আর রাখছ কোথায় ? না ওই গোকুল সাহার তলিয়ে যাওয়া দোকান-ধারে । রাতারাতি হঠাৎ আর একটি ধস নামলেই, ব্যস । একেবারে সবান্ধব সলিল সমাধি !"

কেটে-কেটে কথা ।

কথা তো নয়, যেন কেটে-কেটে নুন দেওয়া !

আর কত অপমান সইবে পতাকি ? বলে উঠবে না—আহা । কী বুদ্ধি ! ডাক্তার ডাকতে গেলে লোকটার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যাবে না ? তার মানেই সব খতম । আর ওখানে ছাড়া একটা

চোরকে আবার কোথায় পুষতে পাব ? কে দেবে তাকে থাকতে ?

দয়ালহরি বলে ওঠেন, "অন্যের ধার ধারবার দরকার কী ? তোমার নিজের বাপ-ঠাকুরদার একখানা বাড়িনেই ? তাতে খানকয়েক খালি ঘর পড়ে থাকে, তোমার জানা নেই ?"

"অ্যাঁ ! কী বলছেন ! আমার বাপ ঠাকুরদার—মানে এই বাড়িতে ?"

পতাকি হাঁ।

দয়ালহরি বলেন, "অসুবিধাটা কী ? রোগীর সেবক হিসাবে—রাতে তোমার ফ্রেণ্ডরাও থেকে যেতে পারেন কেউ কেউ !"

পতাকি বলে ওঠে, "আর পুলিশ যদি টের পায় ? তখন তো আপনারই বিপদ! যদি বলে, ও আপনার কে ? ও কীরকম লোক..."

"বিপদ। দয়ালহরি দেবনাথের ? তাঁর বিপদ ঘটাবার সাধ্য স্বয়ং হরি ছাড়া আর কারও নেই, বুঝলে হে পতাকিচরণ ? যদি বলে, ও কে ? তার উত্তর তো আছেই। আমার আত্মীয়। আর লোকটা কীরকম ? সেও তো বলা যাবে, লোকটা চুরি কথাটার বানানই জানে না !"

পতাকি একটু অবাক হয়ে বলে, "কিন্তু আপনি তো কখনও মিছে কথা বলেন না।"

"এই দ্যাখো, এর মধ্যে মিছেটা কোথায় ? ও যখন মানুষ, তখন নিশ্চয়ই আমার আত্মীয়ই। পড়োনি, 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।'...আর ওই বানানের কথা ? সেও তো সেন্ট পার্সেন্ট সত্যি ! জানে ও বানান ? অক্ষর-পরিচয় আছে ওর ? কাঁচকলা। ব্যস। তাড়াতাড়ি নাওয়া-খাওয়া করে জেঠিকে ছুটি দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক তোমার সেই ভি আই পি গেস্টটিকে নিয়ে আসতে। তা বলে ভেবো না চিরকাল তোমার গেস্টটিকে বসিয়ে খাওয়াব ! হাড়ে একটু মাংস গজানো পর্যন্ত। ব্যস। খেটে খাও দাদু। তা মালির কাজ এমন কিছু শক্ত নয়। ভক্তি থাকলেই শিখে নেওয়া যায়।"

তার মানেই চোর কংসারির ভবিষ্যৎটি সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়ে গেল। তার মানেই হরি যাকে রাখেন। হরি যদি আবার দয়াল হন, তা হলে তো কথাই নেই।

পতাকি কি তার জেঠু বাগনান কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল দয়ালহরি দেবনাথ নামটির রূপান্তর নিয়ে পুনর্বিবেচনা করবে ? না করলে তো তার নিজের ওই জেঠির ডাকা নামটাই আসল হয়ে দাঁড়াবে।

অপ্রকাশিত কবিতা

বাবা যখন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১.

বাবা যখন খেয়েদেয়ে
চেয়ারখানায় হেলান দিয়ে
চক্ষু বুজে চুরুট টানে
মজে গিয়ে নিজের গানে
তখন বোধ হয়, পুলক লহর খেলচে কত
বাবার গায়ে।

২.

দেখলে হয় না রগড়টা কি ?
(হ্যাঁ) বাবার হিসেব থাকে নাকি ?
পকেট থেকে একটি নিয়ে
বলব বেড়াল গেছে খেয়ে
ঐ ছেলেটার উপদ্রবে ছিষ্টি নষ্ট
জানেন নাকি ?

৩.

হাঃ হাঃ বড়ই মজা
আমিই বা কে, কেই বা রাজা
এক টানেতে এত ধোঁয়া
জেঠার মুখেও যায় না পাওয়া
(এই) ধোঁয়ায় চড়ে পরির দেশে হাজির হ'তে
পারি সোজা।

৪.

কে না আসে ? বাবাই যে-রে !!
ধোঁয়ায় ঘরটা গেছে ভরে
হুলোও আসে তাঁরই সঙ্গে
হেলিয়ে লেজটা নানা রঙ্গে
(বাবা) কুকুরপেটা কল্লে বুঝি, দোষটা চাপাই
কার বা ঘাড়ে ?

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শিরোনামবিহীন চার স্তবকের এই কৌতুক-কবিতাটি সম্প্রতি তাঁর একটি অতি পুরনো খাতার মধ্যে পাওয়া গেছে। অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, বিভূতিভূষণ এক সময় ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। খাতাটিতে সেই শিল্পকর্মের কিছু পরিচয় আছে। তারই মাঝে দুটি পৃষ্ঠায় কবিতাটি লেখা। প্রত্যেক স্তবকের পাশে পেন্সিলে আঁকা ছবি। অনুমান, কবিতাটি দ্বিতীয় দশকে লেখা, ১৯২৩-২৪ সাল নাগাদ।

বিভূতিভূষণের ভ্রাতুষ্পুত্র অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায় ও সুশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে কবিতাটি প্রকাশ করা সম্ভব হল।

বেড়াল-তপস্বিনী

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

ভাই সমু,

অনেকদিন তোর কাছে চিঠি লিখিনি। তুইও তো আজকাল সেরকম চিঠি লিখিস না। তোরা এখন ভুবনেশ্বরে আছিস বলে দেখা হয় না। ভুবনেশ্বর থেকে পুরী আর কতটুকু ? ইচ্ছে করলেই সমুদ্র দেখতে পাস। শেষ চিঠিতে লিখেছিলি, কয়েকবার সমুদ্র দেখে এসেছিস, কিন্তু দেখা করিসনি। কেন করলি না ? শুনেছি, নুলিয়ারা খুব ভাল লোক। যত্ন করে স্নান করিয়ে দেয়। তুই এত ভিতু যে, সাহস করে আর স্নান করতেই পারলি না। আমার কথা আর কী বলব ? এত বয়স হল তবু সমুদ্র দেখা আর হল না। পুজোর সময় বাড়ির লোক সবাই বাইরে যায়। সে আর কোথায় ? সাঁওতাল পরগনা, শিমুলতলা, দেওঘর, ঝাঁঝা, একবার গোমোও গিয়েছিলাম। আসানসোল থেকে বেশি দূর নয়। এসব জায়গা যে খারাপ, আমি তা বলছি না। কিন্তু কোথাও সমুদ্র নেই। দু-একটি ঝরনা বা ছোট পাহাড়ি নদী। দেখতে মন্দ নয়। এসব নদীতে দেখবি ছোট-ছোট মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবই ভাল বুঝি। কিন্তু তাই বলে নদী তো আর সমুদ্র নয়। তবু আমি একবার প্রায় সমুদ্রে চলে গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত একটি মেয়ের দোষে যাওয়া হল

না। গোলমাল হয়ে গেল। কী করে গোলমাল হল, সে কথা শোন। তোকে প্রথম থেকেই বলছি।

গেল বছর ভাদ্র মাস। কলকাতা স্যাঁতস্যাঁত করছে। মাঝে-মাঝে রোদ্দুর উঠছে, আর বৃষ্টি। অর্থাৎ, ছাতা নিয়ে বেরোওনি তো মরেছ। আর ছাতা নিয়ে বেরিয়েছ তো একটুও বৃষ্টি হবে না। একদিন সকালে উঠে দেখলাম, মেঘ কেটে গিয়েছে, রোদে চারদিক ঝলমল করছে। ভাবলুম, পাড়ায় ঘুরে আসি। কিন্তু কোথায় যাব ? তোরা তো এখন এখানে নেই। এমনিই রাস্তায় দু-চারটে পাক দিয়ে আবার যেই ফিরে বাড়ির দিকে এগোচ্ছি, অমনি দেখলাম একটা দমকল ঘন্টা বাজাতে-বাজাতে আমাদের গলির মধ্যে ঢুকে গিয়ে দাঁড়াল। দমকলকে দাঁড়াতে দেখে পিলপিল করে লোক ছুটল। আমিও ভাবলাম, বোধ হয় আগুন লেগেছে। আমি যখন দু' ক্লাস নীচে পড়তাম, তখন একবার আগুন-লাগা দেখেছিলাম। একটা বস্তির চালে আগুন লেগে গেল। ভাবলাম, এবারও বোধ হয় সেরকম কিছু হবে। লোকজন ঠেলে গলিতে ভেতরে ঢুকে দেখি, একটা বাড়ির সামনে দমকল দাঁড়িয়ে আছে। তেতলার বারান্দায় রেলিঙের ওপর উপুড় হয়ে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে। আর দমকলের একজন লোক সিঁড়ি লাগিয়ে কিছুটা উঠে তার কথা শোনবার চেষ্টা করছে। বাড়ির লোকও এখানে-ওখানে ছড়ানো। তারাও হাঁ করে চেয়ে আছে। বারান্দার সামনে কী একটা লতা বারান্দাকে কিছুটা ঢেকে রেখেছে। তার পাশে একটা শিউলি গাছ। তার মগডালের কাছে একটা বেড়াল বসে ম্যাঁও ম্যাঁও করে ডাকছে।

উঁচুতে বেড়ালটা কী করে উঠল, ভেবে পেলাম না। বোধ হয় পাশের কার্নিস থেকে লাফিয়ে পড়েছিল, এখন আর নামবার পথ নেই। এমন সময় একজন মোটা লোক বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর মেয়েটিকে বললেন, "খুকি, এসব কী হচ্ছে ? তুই তোর বেড়ালের জন্য দমকলকে খবর দিয়েছিস ? বেড়ালগুলোকে আজই দূর করে দেব। যত্ত সব..... !" খুকি এই ধমকানিতে একটুও দমল না। বলল, "কী হয়েছে বাবা ? বেড়ালরা কি মানুষ না। আর এই তো দমকলের কাজ। বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করা।"

এই কথায় লোকজনের মধ্যে হাসি খেলে গেল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ছোকরা চেঁচিয়ে বলল, "ঠিক আছে খুকি। লড়ে যাও। আমরাও দেখছি।" খুকি এসব কথায় কর্ণপাত করল না। দমকলের লোকটিকে বলল, "বেড়ালটা তো হাতের কাছে এসে গিয়েছে। একটু চেষ্টা করলেই ধরতে
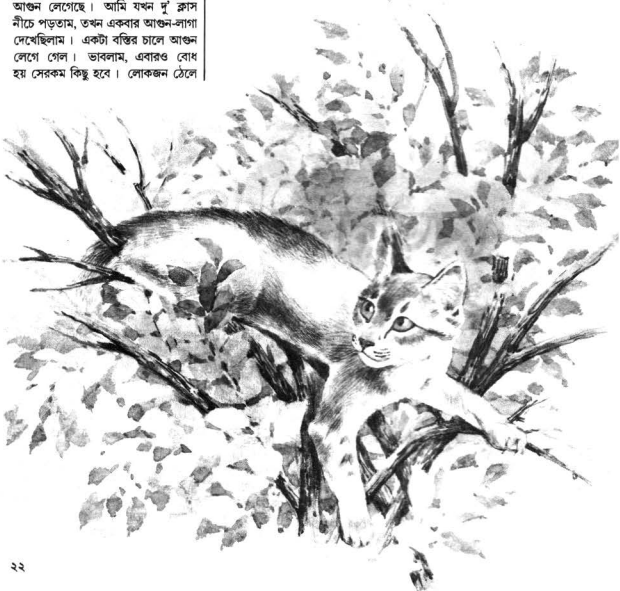
পারবেন।" লোকটি কী ভেবে সিঁড়িতে আর-এক ধাপ উঠল। তারপর হাতটা বাড়াতেই বেড়ালটা বলল, ফ্যাঁস! যেন আর একটু এগোলেই লোকটাকে কামড়ে দেবে।

খুকি বলল, "লালটু, চুপ কর। দুষ্টুমি করবি না।" তারপর ভিড়ের উদ্দেশে বলল, "আপনারা সরে যান না দয়া করে। আপনাদের ভয়ে আমার লালটু নামতে পারছে না।" একটি লোকও নড়ল না। কিছুক্ষণ পরে দাঁড়িয়ে-থাকা কিছু লোক ক্লান্ত হয়ে সরে গেল। দমকলের লোকটি হতাশভাবে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল। এর মধ্যে বাড়ির বারান্দায় একটা বড় বাটিতে করে দুধ এনে রাখা হল। মেয়েটি বলল, "লালটু, দ্যাখো, তোমার জন্য কী এসেছে। নেমে খাও।" লালটুর বোধ হয় খিদে ছিল না। সে দুধের দিকে তাকিয়েও দেখল না। দমকলের লোকটি খানিক পরে লালটুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, "আয় আয়, তু-তু। দ্যাখ, তোর জন্য কত দুধ!" মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল, "ওকে তু-তু বলবেন না। ও কি কুকুর?" এর মধ্যে হঠাৎ এক কাণ্ড। লালটু লেজ ফুলিয়ে গাছের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। পাশের বাড়ির নেকি, একটা নোংরা বেড়াল কমন বারান্দায় এসে ঢুকে গুটিগুটি দুধের বাটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে লালটু বলল, ম্যাঁও। তারপর কী হল বোঝা গেল না। মনে হল, একটা লাল কামানের গোলা নীচের বারান্দায় এসে পড়ল। আর নেকি তৎক্ষণাৎ প্রাণভয়ে উধাও হয়ে গেল। মেয়েটি বলল, "ওমা, ফিরে এসেছিস? তোর জন্য মাছের মুড়ো রেখে দিয়েছি, খাবি আয়।" বলে বেড়ালকে কাঁধের ওপর তুলে ভেতরে চলে গেল। ভিড় হালকা হয়ে গেল।

পরদিন খেলতে যাওয়ার সময় দেখলাম, মেয়েটি আবার সেই লাল বেড়াল কাঁধে করে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বললাম, "তোমার বেড়াল কেমন আছে খুকি?" মেয়েটি সে কথার কোনও উত্তর দিল না। বলল, "তুমি কোন স্কুলে পড়ো?" আমি সে-কথার জবাব না দিয়ে বললাম, "তুমি কোন ইস্কুলে পড়ো?" সে পাড়ার একটা ইস্কুলের নাম বলল। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "কোন ক্লাসে পড়ো?" দেখলাম, সে আমার চেয়ে এক ক্লাস নীচে পড়ে। তারপর মেয়েটি চোখ পাকিয়ে আমাকে বলল, "তুমি কোথায় পড়ো?" আমি বললাম, "জুবিলি অ্যাকাডেমি।" মেয়েটি বলল, "সে তো বুঝতেই পেরেছি। সেইজন্য 'স্কুল'কে 'ইস্কুল' বলছিলে।" তারপর বেড়ালটাকে বলল, "তুই বড় হয়ে কখনও স্কুলকে ইস্কুল বলবি না, বুঝলি।" বেড়ালটা একবার মিঁউ বলল, অর্থাৎ বুঝতে পেরেছে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "জানো, আমার ছ'টা বেড়াল আছে। খুব বুদ্ধি। ভাবছি, আর-একটু বড় হলে জুবিলি অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে দেব।" তুই বল সমু, এটা কি অপমান নয়। আমি রেগেমেগে চলে এলাম।

পরে ক'দিন খুব বৃষ্টি হল। আমার সঙ্গে খুকির আর দেখাই হল না। বৃষ্টির তিন-চারদিন পর রোদ্দুর উঠল। একেবারে ঝকমকে দিন। জানিস তো, এর পর মনটা কীরকম ভাল হয়ে যায়। শত্রুকেও ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে করে না। এর পর রবিবার আমার মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল। এত ভাল দিন, চারদিক এমন ঝকঝক করছে যে, আমি তাকে ক্ষমা করে ফেললাম। কাছে গিয়ে বললাম, "কী খুকি, চিনতে পারছ? তোমার যে আর দেখাই নেই।" খুকি বলল, "খবরদার, আমাকে খুকি বলবে না।

আমার নাম জানো না? আমার নাম তাপসী। তোমাকে যদি সমু বলে না ডেকে খোকা বলে ডাকি, সেটা কি ভাল হবে?" আমি আর ও-রাস্তায় গেলাম না বুঝেছিস। আমি শুধু বললাম, "তাপসী নাম তো খুব ভাল। এ নাম কে দিল তোমাকে? তাপসী কথার অর্থ জানো?" সে বলল, "তা আর জানি না। তবে শোনো, আমার নাম কী করে তাপসী হল। আমি সবসময় বেড়াল নিয়ে থাকতাম বলে বাড়ির লোকে আমাকে বেড়াল-তপস্বিনী বলত। অর্থাৎ, যে তপস্বিনী সবসময় বেড়াল নিয়ে থাকে। আমার মেজোমামা বললেন, তপস্বিনী বলে তো তোকে ডাক: যাবে না। তার চাইতে তাপসী নাম রাখি তোর। আমার বাড়ির সকলেরই তাপসী নামটা পছন্দ হয়ে গেল। আমার অবশ্য হল না। তবে নিজের নাম কারই বা পছন্দ হয়? পাড়ার লোক কেউ কেউ আমাকে বলে 'বেড়ালের মা'। আমি অবশ্য সেসব গ্রাহ্য করি না।"

এইসময় পুব দিক থেকে বাতাস উঠল। আকাশে একটুকরো কালো মেঘ। মেয়েটি সেই দিকে তাকিয়ে বলল, "এরকম দিনে সমুদ্র দেখতে ভারী মজা।" আমি বললাম, "সমুদ্রে যাওয়া কি সহজ কথা? তোমাকে দেখাচ্ছি দাঁড়াও।" এই বলে একছুটে সে বাড়ির ভেতর থেকে একটা ছেঁড়া ম্যাপের বই নিয়ে এল। তার পাতাগুলো খুব আলগা হয়ে গেছে। কোনওটা ছিঁড়েও গেছে। সে আমাকে বলল, "পড়ে দ্যাখো।" এই বলে ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল রাখল। তাকিয়ে দেখলাম, লেখা রয়েছে ডায়মন্ড হারবার। তার খুব কাছেই লেখা আছে বঙ্গোপসাগর। তাপসী সেই দিকে আঙুল দিয়ে বলল, "দ্যাখো, ডায়মন্ড হারবারের কত কাছে বঙ্গোপসাগর। ডায়মন্ড হারবার তো বেশি দূরে নয়। সেখানে গেলেই বঙ্গোপসাগরে যাওয়া হয়। তাপসী ইংরেজি স্কুলে গেলে কী হয়? আমি তো তার থেকে ওপরে পড়ি। আমাকে অনেক বেশি জানতে হয়। আমি বললাম, "ম্যাপে এক জায়গা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে অনেকটা দূর।" তাপসী বলল, "তাতে কী হয়েছে, আমরা ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে নৌকো ভাড়া করে সমুদ্রে চলে যাব।" আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। বললাম, "সমুদ্রে কত বড়-বড় ঢেউ তুমি জানো?" তাপসী বলল, "তাতে কী হয়েছে? নৌকোয়, না হয়, স্টিমারে যাব।" ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে পৌঁছই, তারপর দেখা যাবে। ডায়মন্ড হারবারে কত লোক বেড়াতে যায়, দেখেছ তো? তাই ঠিক হল, আসছে রবিবারেই সুবিধে। তাপসীর মা-বাবা সেদিন সকালে ব্যারাকপুরে নেমন্তন্ন খেতে যাবেন। ফিরতে সন্ধে হবে। আমার বাড়ির লোক? তারা আর কী ভাববে? ভাববে, সমস্ত দিন আড্ডা। ফিরলে খুব বকুনি লাগাবে, এই পর্যন্ত। হয়তো বলবে, এইবার তোমার জন্মদিনে সুকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী তোমায় দেব ভেবেছিলাম, তা আর হল না। তা আর কী করা যাবে! সমুদ্র একবার দেখলেই জীবন সার্থক হয়ে যাবে। তখন আর এসব কথা মনে পড়বে না।

রবিবার এল। তাপসীর মা-বাবা সকাল আটটায় চলে গেলেন। আমার বাড়ির লোক রবিবার দিন আমার কোনও খোঁজখবর করে না। বললাম, "দুপুরে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।" মা বললেন, "যাও, কিন্তু বেশি খেয়ো না। তোমার আবার ভাল খাবার দেখলে কিছু মনে থাকে না। সামনেই পরীক্ষা, মনে রেখো।" আমি কিছু না বলে সেখান থেকে চলে এলাম। ন'টা নাগাদ তাপসী আর আমি জিনিসপত্র নিয়ে ডায়মন্ড হারবার রোডের মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে বাস ধরব। সত্যিই তো আর নেমন্তন্ন নেই। দুপুরে খিদে পাবে। তাই বাড়ি থেকে আধখানা পাউরুটি আর একটা পেয়ারা নিয়ে এসেছিলাম। তাপসী বলেছিল, তার বাড়িতে শনিবার রাতে মাছের চপ ভাজা হবে। পারলে দুটো সরিয়ে রাখবে। বলবে, বেড়ালদের খাওয়াবে। তাপসী বলল যে, সে তিনটে চপ নিয়ে এসেছে। আগের দিন রাতে খেয়ে দেখেছে, দিব্যি। চপে আবার কিশমিশ দেওয়া আছে। চুপ করে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। অনেক পরে একটা বাস এল। খুব ভিড়। আমি বললাম, "রোক্‌কে, রোক্‌কে।" কিন্তু বোধ হয় দুটো বাচ্চা দেখেই ওটা আর দাঁড়াল না। জোরে চালিয়ে দিল। আমি তো বড়। আমি তাপসীর দিকে তাকিয়ে বললাম, "ভয় কী, একটা গিয়েছে, আরও আসবে।" এল বটে, তবে অনেকক্ষণ পরে। এ ড্রাইভার বেশ ভাল, দূর থেকে দেখি আস্তে-আস্তে স্পিড কমিয়ে দিল। তাপসীকে বললাম, "চলো, এগিয়ে যাই, বাসে উঠবে না?" এই বলতে বলতে বাসটা এসে দাঁড়াল। আমি তাপসীকে বললাম, "চলো, উঠে পড়ি।" কিন্তু তাপসী উত্তর দিল না। রাস্তার ড্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখি, সেখানে একটা বেড়ালের বাচ্চা, কোনও বাড়ি থেকে বোধ হয় ফেলে দিয়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়েই তাপসী পিছন দিকে হাঁটতে লাগল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরলাম। আমি তার হাত ধরতেই তাপসী ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। বারে বারে মাথা নেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "লালটুকে ছেড়ে আমি একটুও থাকতে পারব না। ওর খিদে পেলে ওকে কে মনে করে দুধ খাওয়াবে?" বলে বাড়ির দিকে দৌড় লাগাল। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

তবেই বুঝে দ্যাখ। মেয়েদের কথা শুনে কোনও কাজ করতে নেই। তারা নিজেরাই কী করছে জানে না। তুই তো আমার ছোড়দিকে দেখেছিস। সেও ঠিক এইরকম। গেল বছর তার বিয়ে হয়েছে। তুই তো এখানে ছিলি না, তাই নেমন্তন্ন খেতে পারিসনি। ছোড়দি বিয়ের আগে কত বাহারি শাড়ি আর কী কী সব গয়না পরল। তারপর বিয়ে হয়ে গেলে যাওয়ার দিন খুব কাঁদতে লাগল। তুই তো জানিস, ছোড়দি আমাকে দেখতে পারত না। কতবার বাবার কাছে বলে দিয়ে আমাকে বকুনি খাইয়েছে। শেষ অবধি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বলল, "ওরে আমি কী করে একা থাকব, তোরা কেউ থাকবি না।" কান্না আর থামেই না। শেষে সবাই তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গাড়িতে তুলল। তারপর আবার ক'দিন পরে বাড়িতে এল খুব গয়নাগাটি পরে। আমার দিকে তাকিয়ে শুধু একবার বলল, "কী রে।" তারপর ওপরে উঠে গিয়ে বড়দের দলে একেবারে বেমালুম মিশে গেল। আমার দিকে আর তাকিয়েও দেখল না। বুঝলি, মেয়েরাই এরকম হয়। এর পর তাপসীর সঙ্গে দেখা হলে, তার পা মাড়িয়ে দেব। ঝগড়া করলে, আমিও ঝগড়া করব। তুই সমু, কিছুতেই মেয়েদের কথায় বিশ্বাস করবি না।

চিঠিটা বড় হয়ে গেল। বোধ হয় মাশুল বেশি লাগবে। পোস্টাপিসে গেলে বোঝা যাবে কত ভারী হয়েছে। তুইও আমাকে এরকম বড় চিঠি লিখিস। কেমন?

ইতি
প্যাংলা

ছবি : বিমল দাস

বাবু তো বাবু

অন্নদাশঙ্কর রায়

বাবু তো বাবু গোকুলবাবু
বলত লোকে সেকালে
সেসব বাবু লুপ্ত যেমন
ডাইনোসর একালে ।
গেলেন বাবু বৃন্দাবনে
সঙ্গে গেল নফর
হুকুম হল, ছড়াও টাকা
রাজপথের ওপর ।
দুঃখীজনের ভিড় জমে যায়
যে যা পারে লোটে
"রাজাবাবু কি জয়,"
হাজার মুখে ফোটে ।
বিশটি দিনে বিশটি হাজার
টাকার হলে শ্রাদ্ধ
জমিদারির খাজনাখানায়
টান পড়তে বাধ্য ।

কাশীধামে গেলেন বাবু
সঙ্গে গেল নফর
হুকুম হল, দাও আধুলি
রাজপথের ওপর ।
দুঃখীজনের ভিড় জমে যায়
যে যা পারে লোটে
"জয় বাবুজি ! জয় বাবুজি !"
হাজার মুখে ফোটে ।
বিশটি দিনে দশটি হাজার
টাকার হলে শ্রাদ্ধ
জমিদারির খাজনাখানায়
টান পড়তে বাধ্য ।

পুরীধামে গেলেন বাবু
সঙ্গে গেল নফর
হুকুম হল, ছড়াও সিকি
রাজপথের ওপর ।
দুঃখীজনের ভিড় জমে যায়
যে যা পারে লোটে
"বাবু তো বাবু গোকুলবাবু",
হাজার মুখে ফোটে ।
বিশটি দিনে পাঁচটি হাজার
টাকার হলে শ্রাদ্ধ
জমিদারির খাজনাখানায়
টান পড়তে বাধ্য ।

বাবু গেলেন নবদ্বীপে
সঙ্গে গেল নফর
হুকুম হল, পয়সা ছড়াও
রাজপথের ওপর ।
দুঃখীজনের ভিড় জমে যায়
যে যা পারে লোটে
"বেঁচে থাকো, গোকুলচাঁদ,"
হাজার মুখে ফোটে ।
দশটি দিনে একটি হাজার
টাকার হলে শ্রাদ্ধ
জমিদারির খাজনাখানায়
টান পড়তে বাধ্য !

জমিদারি উঠল লাটে
শেষটা হল নিলাম
বাবু বলেন, "কৃষ্ণের ধন
কৃষ্ণকেই দিলাম ।"

ছবি : দেবাশিস দেব
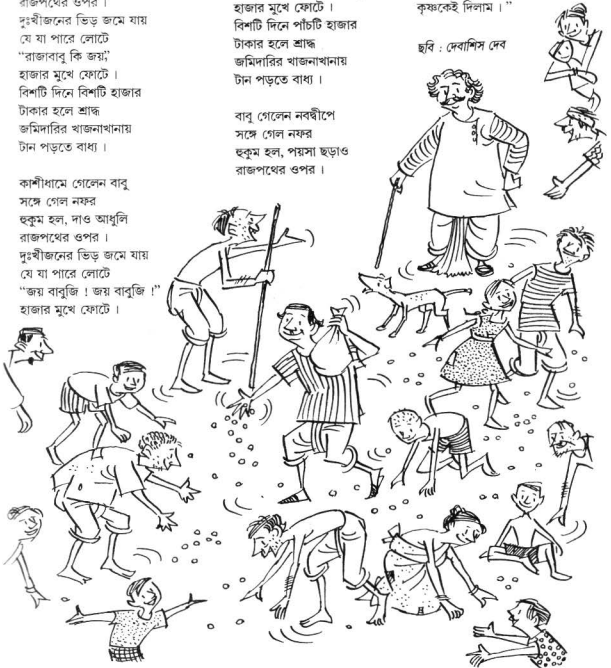
ভানুমতী

অরুণ মিত্র

পাথর ওড়ে পাথর,
লরির চাকা গাঁইতি শাবল
ওড়ায় তাদের খাবল খাবল,
একটু যদি লাগে আঁচড়
তক্ষুনি হায় গা-গতর
ককিয়ে ওঠে রক্ত ছোটে
বাঁচার যত শিকড়বাকড়
ছিড়তে থাকে পটাং পটাং,
ঝাঁকায় ধরে গাছের গোড়া
পেল্লায় এক ওরাং ওটাং।
আমি চেঁচাই পরিত্রাহি
বাঁচায় এমন কেউ কি নাহি ?

হঠাৎ দেখি পাথর ওড়া
অন্যরকম
কেমন যেন নরম-নরম,
গায়ের ওপর পাথুরে ছোঁয়া
কেমন যেন রোঁয়া-রোঁয়া।
ওমা এ যে পালক !

কে ছুঁয়েছে কে ছুঁয়েছে পাথরগুলোকে ?
বুলা ছুঁয়েছে,
বুলার মুঠোর ফুসমন্তর বুলিয়ে দিয়েছে।
পাথরগুলো হয়ে গেল পালক
ঘুরঘুট্টি অন্ধকারটা আলোক।

ও বুলা রে ও বুলা,
ভাগ্যিস তুই ছিলি
তাই তো আমার জান বাঁচিয়ে দিলি,
পড়লি কী যে ফুসমন্তর শোলোক
পাথর হল পালক,
নেচে নেচে আমি বাজাই ঢোলক,
ও বুলা রে বুলা ভানুমতী বুলা।

আকাশ-যুদ্ধ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এই দেখি মেঘ ঘনাচ্ছে, ফের
এই দেখি মেঘ পালায় দূরে।
তার মানেই তো অন্ধকারের
পর্দা ছিঁড়ে আকাশ জুড়ে
উঠবে আবার জয়-জয় রব,
তামাম বিশ্বে জাগিয়ে সাড়া
ডুবিয়ে দেবে ঘরবাড়ি সব
স্বর্ণবর্ণ আলোর ধারা।

উর্ধ্বাকাশে চলছে লড়াই,
নীচের থেকে আমরাও তাই
বলছি, লড়ো, জোরসে লড়ো,
মেঘের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।

বলছি কাকে, সেইটে কন্ তো।
হয়নি পুজোর কিচ্ছু কেনা,
ঝড়বাদলের বাড়বাড়ন্ত
এখন মশাই ভাল্লাগে না।
তাই বলি, ও সুজ্জিমামা,
এইবারে ঘাড়ধাক্কা লাগাও,
তোমায় দেব নতুন জামা,
মেঘগুলোকে তাড়িয়ে দাও।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

এক সকালে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আছিপুরের গঙ্গার ধারে
যেখানে ঠিক নদীর বাঁক—

ছিঁড়ে ফেলে দড়িদড়া
ভেঙে চতুষ্পাঠীর বেড়া
করতে এল প্রাতর্ভ্রমণ
পত্রভোজন বংশের এক
শ্রীমান বর্কর শর্মণ

পাঠশালাতে হয়ে বন্দি
কাঁহাতক আর সমাসসন্ধি
এক বাঁধা গৎ
গেলা যায় খালি
ঘাস-বিচালি ঘাস-বিচালি
ফেলে রেখে ঘরের বাইরে
আসল জগৎ

পেরিয়ে এসে দোকানবাজার
গঙ্গার ধারে মজার মজার
দেখল শ্রীমান হরেকরকম
আজব কাণ্ডকারখানা
হল এমন আহ্লাদে সে আটখানা
মুখ থেকে তার বেরিয়ে এল :
"কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্ ।"

ডাঙায় উঠে গলদা চিংড়ি
জগিং করে রন্‌পায়
জলতরঙ্গে বাজছিল বেশ ঠুংরি
হঠাৎ সেটা বদলে গিয়ে টপ্পায়
জমে উঠল জলসা

যে গাছে হয় বিস্তর ফলসা
পোকামাকড় ধরবার ছুতোয়
তার একটা নিচু ডালে
এক মাকড়সা আপন মনে
বুনছিল জাল মিহি সুতোয়
ছড়িয়ে তার লম্বা ঠ্যাং

হাঁটু মুড়ে অবাক হয়ে একটা ব্যাং
দেখছিল খেল্ ভানুমতীর
কালকের কুচ্ছিত শুঁয়োপোকা
আজকে হঠাৎ আলটপকা
রূপ নিয়েছে প্রজাপতির

ঘাসের ডগায় ঠেকিয়ে পেট
ঠিক যেন এক জঙ্গি জেট
বসে বসে ঢুলছিল এক গঙ্গাফড়িং
মনে করতে পারছিল না ঠিক
ক্যালেন্ডারে কত তারিখ
ক'টায় টেক্ অফ্
কোথায় ল্যান্ডিং

বালির ওপর হাঁটছে থপথপ
প্যাটন ট্যাঙ্কে গলিয়ে দেহ
ভিতুর একশেষ একটি কচ্ছপ
সবাই শত্রু তার সন্দেহ
ডাকাবুকো একটা কাঁকড়া
থাকলেও তার নানান ফ্যাঁকড়া
কাউকে কুছ পরোয়া নেহি
ভাবখানা তাই রণং-দেহি
গল্পের শেষটা সাধুসজ্জন
বলেন যাকে চর্বিতচর্বণ—

আছিপুরের গঙ্গার ধারে
দেখা গেল পরের দিন
সবাই হাজির একজন মিসিং
চোখের জলের মতন ঠিক
রোদ্দুর লেগে করছে চিক্ চিক্
চারটে খুর আর দুটো শিং

কাকে পণ্ডিত বলছেন, মশাই
ও লোকটা তো বাজারের কসাই ।

ছবি : *বিমল দাস*
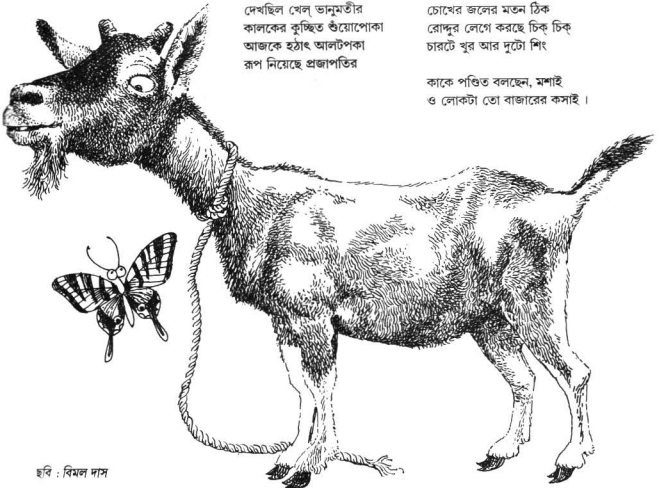
প্রাচীনতম রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি মালতী-পুঁথি

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
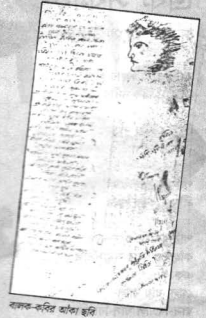
বালক-কবির আঁকা ছবি

বালক রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চা শুরু হয়েছিল একখানি নীল কাগজের খাতায়। সেই খাতার পর তিনি জোগাড় করেছিলেন একটি বাঁধানো লেট্‌স ডায়েরি, তাতে তিনি বোলপুরের 'তৃণহীন কঙ্কর শয্যায়' বসে লিখেছিলেন বীররসাত্মক কাব্য 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'। তাঁর আরও তিনটি বিখ্যাত বাল্যরচনা 'ভারতভূমি', 'অভিলাষ', 'হিন্দুমেলার উপহার'-এর প্রাথমিক খসড়া সম্ভবত এই ডায়েরিতেই লিখিত হয়। কিন্তু নীল কাগজের খাতা ও লেট্‌স ডায়েরি—দুটি পাণ্ডুলিপিই বালককবি অসাবধানে হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তীকালে 'জীবনস্মৃতি'তে কৌতুকচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাঁধানো লেট্‌স ডায়ারিটাও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল খাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া যায় নাই।'

রবীন্দ্র-গবেষকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নীল খাতা ও লেট্‌স ডায়েরির পরবর্তী তৃতীয় পাণ্ডুলিপি যা এ-যাবৎ পাওয়া গেছে তা হল 'মালতী-পুঁথি'। এই পাণ্ডুলিপিটিও সুদীর্ঘকাল বিস্মৃতির আড়ালে ছিল, কবির তিরোধানের কিছুকাল পর তা আবার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বর্তমানে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারের (Archives) শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে সেটি পরম যত্নে ও সমাদরে সংরক্ষিত। এখন তার

তরুণ রবীন্দ্রনাথ

পরিচয় ২৩১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, যার সবচেয়ে আগে জায়গা পাওয়ার কথা, দেরিতে পাওয়ার জন্যই প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির এই অবস্থা। এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছ'শোরও বেশি।

১৯৪২ সালের শেষদিকে সিমলায় দিল্লির লেডি আরউইন কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপিকা মালতী সেন বিশ্বভারতীর শিক্ষা-পাঠভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহন সেনের মারফত এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি-খাতাটি রবীন্দ্রভবনকে উপহারস্বরূপ পাঠান। মালতী দেবীর কাছ থেকে পুঁথির যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় তা হল—মালতী দেবীর প্রথম জীবন কাটে অধুনা পাকিস্তানের লাহোরে। তাঁর ভাই সুধীন্দ্রকুমার সেন ছিলেন সেখানকার অধিবাসী। রবীন্দ্রানুরাগী এই মানুষটির বাড়ি হয়ে উঠেছিল সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র। ১৯১৯ সালে সুধীন্দ্রকুমারের মৃত্যু ঘটে। বহুকাল পর ১৯৩৬ সালে লাহোর ত্যাগের আগে মালতী দেবী তাঁর ভাইয়ের সাহিত্য-সংগ্রহের মধ্যে থেকে পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন। লাহোরের স্মৃতি জড়িয়ে থাকায় মালতী দেবী পুঁথিটির নাম দিতে চেয়েছিলেন 'লাহোর-পুঁথি'। কিন্তু রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষ মালতী দেবীর উপহার বলে পাণ্ডুলিপিটির নাম দেন 'মালতী-পুঁথি'। রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসে পাণ্ডুলিপিটি এই নামেই সুপরিচিত।

রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষণের পর প্রবোধচন্দ্র সেন, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন দেব, কানাই সামন্ত প্রমুখ অধ্যাপক ও গবেষক মালতী-পুঁথি সম্পর্কে নানাভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁদের সেই আলোচনা রবীন্দ্রভবন থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা' ও
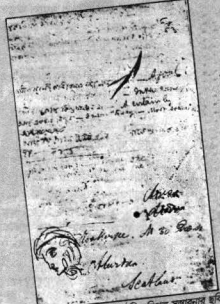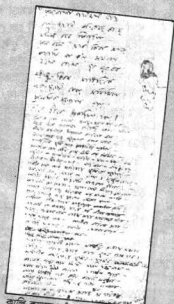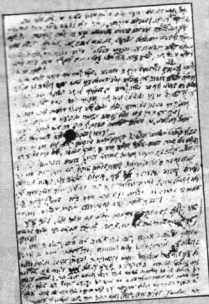
'ঝাঁসীর রানী' প্রবন্ধের খসড়া

কালি-কলমে আঁকা ছবি ও লেখা

লেখার খাতায় ফুটে উঠেছিল বিপুল সম্ভাবনার ছবি

'রবীন্দ্রবীক্ষা' নামে পত্রিকা দুটিতে বিধৃত। পাণ্ডুলিপি-খাতা কীভাবে লাহোরবাসী সুধীন্দ্রকুমারের কাছে পৌঁছল তার হদিস অবশ্য কেউ দিতে পারেননি। তবে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুমান, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিদাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী শরৎকুমারী এক সময় লাহোরে থাকতেন। সে-কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'লাহোরিণী' বলে নানা জায়গায় অভিহিত করেছেন। হয়তো তিনিই কোনও সময় শরৎকুমারীকে ওই পাণ্ডুলিপি-খাতাটি উপহার দেন এবং তাঁর কাছ থেকেই সম্ভবত মালতী-পুঁথি সুধীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে।

মালতী-পুঁথির রচনাকাল আনুমানিক ১৮৭৪ থেকে ১৮৮২-৮৩ সাল, অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের ১৩ থেকে ২১-২২ বছর বয়সের সাহিত্যচর্চার নিদর্শন এই পাণ্ডুলিপি। তবে ওই সময়ে প্রকাশিত কবির সব রচনারই খসড়া এই পাণ্ডুলিপি খাতায় লিখিত হয়নি—যেমন 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য। এর পৃথক পাণ্ডুলিপি আমরা পেয়েছি। আবার অনেক রচনার পাণ্ডুলিপি এ-যাবৎ অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। রবীন্দ্রজীবনের এক সঙ্কটকালে মালতী-পুঁথি রচনার সূত্রপাত হয়। 'দশটা-চারটার আন্দামান' বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর তখন বিচ্ছেদ ঘটেছে—বাড়িতেই ব্যবস্থা হয়েছে বিদ্যাচর্চার। দাদারা তাঁর সম্বন্ধে আর

কাদম্বরী দেবী

কোনও আশা রাখেননি—তাঁরা সে -সময় ভর্ৎসনা করাও ছেড়েছেন। বড়দিদি সৌদামিনী বলেছেন, আমরা সবাই আশা করেছিলাম বড় হলে রবি মানুষের মতো হবে, কিন্তু তার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হয়ে গেল। এই অবস্থায় আত্মসম্মান বজায় রাখার একটিমাত্র পথ বা ক্ষেত্র কিশোর-কবির সামনে বাকি ছিল—'কোনও কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।' (সাহিত্যের সঙ্গী : জীবনস্মৃতি) ওই 'কবিতার খাতা'-ই হল আমাদের আলোচ্য মালতী-পুঁথি। কবির সেদিনের অশান্ত মনের আবেগ-উচ্ছ্বাস, হতাশা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে এর পাতায়-পাতায়। সে-সময় তাঁর পাঠচর্চা ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গী হয়ে উঠেছিল ওই পাণ্ডুলিপি-খাতাখানি। সেই সাহিত্যচর্চার সাক্ষী ছিলেন তাঁর নতুন-বউঠান জ্যোতিদাদার পত্নী কাদম্বরী দেবী। মালতী-পুঁথিতেই রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালে তাঁর 'শৈশব-সংগীত' কাব্যের প্রথম খসড়া করেন—১৮৮৪ সালের মে মাসে তা সদ্যপ্রয়াতা নতুন-বউঠানকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে লেখেন—'এ কবিতাগুলিও তোমাকে দিলাম। বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্নেহের স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে।' এইভাবে মালতী-পুঁথির রচনাগুলির সঙ্গে কবিজীবনের স্নেহ-মধুর স্মৃতি সম্পৃক্ত। দিবারাত্রির সঙ্গীরূপে পাণ্ডুলিপি-খাতাটি তাঁর সঙ্গে থেকেছে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, আমেদাবাদ-বোম্বাইয়ে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের বাসায়, এমনকী, কবির প্রথম বিলেত-বাসকালেও। আবার

কখনও স্বদেশে নদীবক্ষে, নৌকোয়। সেই 'কাঁচাবয়সে অল্প সম্বলে অদ্ভুত কীর্তি' রচনার যে তাগিদ তিনি অনুভব করেছেন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই পাণ্ডুলিপিখানিতে।

এখন 'মালতী-পুঁথি'-তে রবীন্দ্রনাথের কোন-কোন রচনার খসড়া লিখিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন মালতী-পুঁথির সমকালে রবীন্দ্রনাথের কোন-কোন রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে মালতী-পুঁথির খসড়াগুলির বৃত্তান্ত আলোচনা করা যাবে। ১৮৭৪ থেকে ১৮৮২-৮৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকায় আছে কবি-কাহিনী (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০), বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), রুদ্রচন্ড (১৮৮১), য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), সন্ধ্যা-সংগীত (১৮৮২), কাল-মৃগয়া (১৮৮২), বউ-ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), শৈশব-সংগীত (১৮৮৪) প্রভৃতি। এখন দেখা যাক, উল্লিখিত কোন- কোন গ্রন্থের খসড়া মালতী-পুঁথি তে আছে।

(১) 'শৈশব-সংগীত' কাব্যের তিনটি সম্পূর্ণ ও তিনটি আংশিক কবিতার খসড়া। ৫৪ পৃষ্ঠায় শৈশব-সংগীত কবিতাটি লিখিত—ডান পাশে লেখা আছে 'বোটে লিখিয়াছি—মঙ্গলবার ২৪ আশ্বিন ১৮৭৭।' এটিই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম তারিখ দেওয়া কবিতা।

(২)'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ১২ সংখ্যক কবিতা।

(৩) 'ভগ্নহৃদয়' গীতিনাট্যকাব্যের ৩৪ সর্গের মধ্যে আটটি সর্গের খসড়া। ভগ্নহৃদয় -এর উপহাররূপে ব্যবহৃত বিখ্যাত গান 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'-এর খসড়ারূপ আছে পুঁথির ২৬ পৃষ্ঠায়। সেই রূপটি এইরকম— 'তুমি যদি হও মোর সংসারের ধ্রবতারা তা হলে কখনও আর হব নাক পথহারা।'

(৪) 'রুদ্রচণ্ড' রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক। এর দুটি গানের খসড়া আছে মালতী-পুঁথিতে—গান দুটি হল (ক) বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল, (খ) তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল।

(৫) 'কবিকাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম রবীন্দ্র-রচনা। এর প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের খসড়া পুঁথির আটটি পৃষ্ঠায় লিখিত।

(৬) 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের 'উপহার' কবিতাটির প্রাথমিক খসড়া। গ্রন্থটি কবির বড়দিদি সৌদামিনী দেবীকে উৎসর্গীকৃত।

(৭)'সন্ধ্যা-সংগীত' কাব্যের 'দুদিন' নামে কবিতার খসড়া বিলেতে রচিত। কবিতাটি প্রথমে 'শ্রী দিকশূন্য ভট্টাচার্য' ছদ্মনামে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

(৮) 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' ভ্রমণবৃত্তান্তে উদ্ধৃত সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত একটি কৌতুক কবিতার প্রতিলিপি আছে মালতী-পুঁথিতে। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত।

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগবিহগপ্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজনবশে কিছু হয় না—
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।
পিতা মাতা ভ্রাতা নবশিশু অনাথা ছট কোরে
বিরাজে জাহাজে মসিমলিন কোর্তা বুট পোরে।
সিগারে উদ্গারে মুহুমুহু মহা ধূমলহরী, সুখস্বপ্নে
আপ্নে বড় চতুর মানে হরি হরি'।
ফিমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে—
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে।
বিহারে নীহারে বিবিজনসনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিরে এসে দেশে গলকলর (Collar) বেশে হটহটে—
গৃহে ঢোকে রোখে, উলগতনু দেখে বড় চটে।
মহা আড়ী শাড়ী নিরখি, চুল দাড়ী সব ছিঁড়ে,
দুটা-লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।

(৯) রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে মরাঠি ভক্তিবাদী সন্ত ও কবি তুকারামের রচিত কিছু অভঙ্গ বা ভজন-গানের যে অনুবাদ করেছিলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ, তারও প্রতিলিপি আছে মালতী-পুঁথিতে।

মালতী-পুঁথিতে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাভ্যাসের বিবরণও পাওয়া যায়। যেমন—

(১০) ৪৯ সংখ্যক পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে লিখিত সাপ্তাহিক পাঠক্রম। এই পাঠক্রমে সংস্কৃত-পাঠের গুরুত্ব লক্ষণীয়।

(১১) দেবনাগরীলিপিতে বিদ্যাসাগর-রচিত 'কথামালা'র প্রথম গল্পের স্বচ্ছন্দ সংস্কৃতানুবাদ। প্রতিটি বাক্যই ত্রুটিপূর্ণ।

(১২) কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও 'কুমারসম্ভব'-এর অনুবাদ।

(১৩) টমাস মুর-এর 'আইরিশ মেলোডিজ', বায়রন-এর 'চাইল্ড হ্যারল্ডস পিলগ্রিমেজ'-এর অনুবাদ।

কাব্যরচনা, বিদ্যাভ্যাস ছাড়াও অন্যান্য রচনা ও প্রসঙ্গের খসড়া আছে মালতী-পুঁথিতে :

(১৪) 'ঝাঁন্সীর রানী' নামে খণ্ডিত গদ্যরচনা।

(১৫) তৎকালীন সাহিত্যিক-সংস্থা 'সারস্বত-সমাজ'-এর প্রথম অধিবেশনের কবিলিখিত প্রতিবেদনলিপি।

(১৬) ৫৩ পৃষ্ঠায় আছে প্ল্যানচেট-চর্চার পেন্সিলে লেখা প্রতিবেদন।

(১৭) 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ ও সমালোচনার সূত্রপাতের নিদর্শন।

(১৮) 'ভালো যদি বাস সখি কি দিব গো আর'—এই বিখ্যাত গানের খসড়া।

(১৯) জীবনসায়াহ্নে যে রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পীরূপে জগৎজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন, তার ভূমিকা রচিত হয়েছে মালতী-পুঁথির পাতায়। কালি-কলমে নানা জায়গায় এঁকেছেন মানুষের মুখ, প্রধানত নারীর। সেইসঙ্গে হিজিবিজি আঁচড়ে অর্থহীন নকশা।

মালতী-পুঁথিতে রচিত কিছু-কিছু খসড়ার বৃত্তান্ত দেওয়া হল। দেখা গেল, এই পাণ্ডুলিপি-খাতায় ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সাহিত্যসাধনার বহুবিচিত্র নিদর্শন—সেইসঙ্গে কবির তৎকালীন জীবনের নানা ভাবনাচিন্তার অভিব্যক্তি।

Monday	Eng.Prose, Geomet.Eng.History, Sanskrit.
Tuesday	Grammar, Algebra, His.of India, Sanskrit.
Wednesday	Eng.Prose, Arithmetic, Geography.Phys.,Do.
Thursday	Grammar, Mensuration & Algebra, England History, Do.
Friday	Eng.Prose (?), Arithmetic, General Geography, Do.
Saturday	Do, Geomet.,History of India, Do.
Sunday	Exercises.

রবীন্দ্রনাথের সাপ্তাহিক পাঠক্রম

পুঁথির প্রতিলিপি

বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। এই রচনাটির জন্য সনৎকুমার বাগচি, তুষারকান্তি সিংহ ও আশিস হাজরার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিকতা, না স্নেহাতুর পিতা

শিবশঙ্কর মিত্র

সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-প্রকল্পের মাঝখানে গভীর বনে এক পিতা-পুত্রের কাহিনী।

বাংলায় বহুকাল থেকে দুটি প্রবাদ চালু আছে যাতে পিতা-পুত্র দু'জনের চরিত্রের দিকটা তুলে ধরে। ব্যাপক এই প্রবাদ। সুন্দরবনের মানুষও এই দুটি প্রবাদ হামেশাই বলে উৎসাহিত করে বা কটাক্ষ করে :

বাপকা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া।
কুচ নহে তো রহে থোড়া-থোড়া ॥

বাপের মতো বাপ হলে তবেই ছেলেকে 'বাপকা-বেটা' বলে। প্রবাদের সবটা বলেই না। হয়তো অতিরিক্ত হয় বলে বাকিটা ভুলেই গেছে। বাবার ছেলে যদি বাবার প্রধান গুণগুলির অধিকারী হয়, তবেই তাকে এই বুলি দিয়ে পরিচিতি দেয়।

ঠিক একই ভাবে পিতা-পুত্রেরপরিচিতি হিসাবে আর-একটি সনাতন প্রবাদ চালু আছে, 'ওঝার বেটা বনগোরু'। বাপের গুণমুগ্ধ হোক বা না হোক, বাপের কোনও গুণই সে প্রাপ্ত হয় না। যেমন কিনা 'পণ্ডিতস্য মূর্খ'।

কিন্তু সামাজিক জীবনে এই দুই অভিধা অনুযায়ী সব কিছু ঘটে না।

সুন্দরবনের এই বাপের নাম, কালীপদ মণ্ডল। বয়স ৫৫ বছর হলেও যৌবনের কোনও দীপ্তি হারায়নি—যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। দেহের অমিতশালী শক্তি যেন উঠতে-বসতে ছিটকে বেরোচ্ছে! পরিণত বয়সের কোনও চিহ্ন যেন নেই।

সাহসও তার দুরন্ত। বাঘের সঙ্গে দেখা হলে সে দুরন্তপনায় উগ্রতার কোনও সীমা ছিল না যেন। একাই

এগিয়ে যেত। সঙ্গে দু-চারজন সঙ্গী থাকলে তো কোনও কথাই ছিল না। গণ-ধোলাইয়ের ভয়ে ভীত বাঘকে বীর পদক্ষেপে সরে পড়বার জন্য আড়ালে যেতে বাধ্য করত।

সুন্দরবনের এ-ধরনের মানুষকে সহসাই বনোয়ালি বা বাউলে করে নিয়েছিল লোকে। জীবিকার জন্য কালীপদও এই পথ ক্রমশ বেছে নিতে থাকে। কোনও দলকে, তা কাঠুরিয়ার দল, মাছের সাঁই, বা মৌলিদের সাঁইকে বাঘের রোখ সামলাতে কালীপদর প্রায়ই ডাক পড়ে। কালীপদর এই অর্থকরী ব্যবসা যেন ফুলেফেঁপে ওঠে।

কিন্তু এই কাজে কালীপদর এক খাঁকতি ছিল। বাউলের বাঘের সামনে শুধু দুর্জয় এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ও বনে বাঘের চালচলন এবং ঘোরাফেরার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকলেই হয় না! বাউলকে মজাদার গল্পকারও হতে হয়।

সব দলের সববারেই বা সবসময়ই বাঘের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। এই সময় বাউলেকে সুন্দরবনের বিষয়ে, বা লোকেদের সাংসারিক জীবনের চমকপ্রদ ঘটনা নিয়ে টুকটাক চুটকি হাসি-ঠাট্টার গল্প বলতে পারার ক্ষমতা ও অভ্যাস থাকা দরকার।

কেননা এই নিরিবিলি সময়ে বা টুকটাক কাজে রত থাকার সময়ে সুন্দরবনে ভীতি পেয়ে বসে সাধারণ মানুষকে। মন হয়ে ওঠে সন্ত্রস্ত। মজাদার হাসির গল্পই তখন মনুষের মনকে চাঙ্গা রাখতে পারে।

কালীপদর বাউলে-জীবনে এই ঘাটতি ছিল। কাজেই তার রমরমা ব্যবসায় ঢিলে পড়ে। সংসার তাতে চলবে কী করে ভেবে, বাউলেগিরি ছেড়ে ধীরে-ধীরে এখন নিজেই বনে বিনা-পাশে বা পাশ নিয়ে দু-একজনকে ডেকে মাছ ধরার কাজে নেমে পড়েছে।

এই সুযোগে তাঁর বড় ছেলেকে এখন বনের কারবারে সড়গড় করে তুলতে চায় কালীপদ। বড় ছেলের বয়স বছর ২২ হবে। দেহে বাপের মতো জোয়ান না হলেও, তার মনের সাহসের ইঙ্গিত বাপ এরই মধ্যে একটু-আধটু পেয়েছে। কাজেই বড় ছেলে রবি মণ্ডলকে এই কাজে টেনে নিয়ে যায় এবার বাপের দায়িত্ব পালন করতে।

এদিকে রবি মণ্ডল তার বাপের অদম্য সাহস ও দুর্ধর্ষ দৈহিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও সেদিকে ওর মন টানে না। সে দেখেছে, ও-পথে বাপে পারেনি সাংসারিক চাহিদার টান সামলাতে।

তাই বলে সে ওঝার বেটা বনগোরু নয়। বাপের মনের গভীরে যে প্রেরণা ছিল, সবার চেয়ে বড় হয়ে ওঠার অদম্য তাগিদ—রবি মণ্ডল সেই গুণের অধিকারী হয়েছে। সে বাপের এই গুণে সমৃদ্ধ হয়ে এমন এক পথ ধরবে যাতে সে সাংসারিক অনটন সহজেই মেটাতে পারে। পারবে সে, নিশ্চয় সে পারবে! কে যেন গোসাবার এক অভিজ্ঞ লোক তাকে বলেছে, যোগ্যতার দ্বার কেউ রুদ্ধ করতে পারে না, পারে না!

মায়ের এক মহাগুণের অধিকারী হয়ে রবি মণ্ডল সুন্দর রান্না করতে পারে। শুধু তাই নয়, মায়ের মতোই রান্না করে অন্যকে খাওয়াতে বড্ড ভালবাসে। এতে যে কত পড়শি তাদের একান্ত আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠেছে, তা বলার নয়! এমনই একজন ঠাকুর মণ্ডল।

সেদিন ১৯৯০ সালের ভরা ভাদ্র মাস। ঘোরতর বর্ষার দাপট চলেছে। কালীপদর বাড়ি গোসাবাগঞ্জের ১০-১২ মাইল দক্ষিণে আমলামেথি গ্রামে। আমলামেথির এক জলধারা দিয়ে গোমর নদীতে আসা যায়। সেখান থেকে মাত্র কয়েক বাঁক দক্ষিণে এগিয়ে পিরখাল বনের পাশ দিয়ে ব্যাঘ্র-প্রকল্পের মধ্যমণি 'চামটা' বন।

আমলামেথি গ্রামের দক্ষিণ অংশে একটি মাছের খঁটি। মাছ শুকিয়ে এরা চালান দেয় কলকাতায়। সেই খঁটির কাছেই কালীপদর বাড়ি। বলা যায়, এদের বাড়ি আমলামেথির শেষ প্রান্তে। জীবন ও জীবিকার জন্য এরা একান্তভাবে সুন্দরবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ওরা বেরিয়েছে এক ছোট ডিঙি নিয়ে। 'চরাগাজি' বনের এক শিষখালে। শিষখাল তো বনের জোয়ার-ভাটা খেলে বনের মধ্যে সমতলের সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

তখন সবে জোয়ার এসেছে। বেলা ন'টা-দশটা হবে। সবে ঝিরঝির করে শিষখালের জল জোয়ারে বাড়ছে।

ডিঙিতে আমলামেথির তিনজন। হাল ধরেছে ঠাকুর মণ্ডল। এক পা তার খোঁড়া। তা হলে কী হবে! ভারী ওস্তাদ হাল ধরতে আর নদীর স্রোতের প্রথম জোয়ার-ভাটার শিরা ধরে ঠিকমতো এগোতে। বড় ছেলের টানে সে কালীপদর সংসারে যেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে উঠেছে, তার ওপর সুন্দরবনের খালে মাছ ধরতে তার উৎসাহের অন্ত নেই।

ডিঙির মাঝখানে বসে কালীপদ মাছ ধরার কায়দা সব ঠিক করছে ও নির্দেশ দিচ্ছে।

শিষখালের মুখে আসতেই দেখে, যে-চরানি জল আছে তার নীচে বেশ পাঁক আছে পলিমাটির। এ-অবস্থায় কালীপদ কী করবে তা ঠাকুর সব জানে। ডিঙি স্তিমিত করে দিয়েছে। কালীপদও তার দীর্ঘ লম্বা পায়ে জলে নেমে পড়েই কয়েকটা কাঁকড়া ধরে নেয়।

কাঁকড়া মাছ দিয়ে 'থোপ' চার বানিয়ে তা ছড়িয়ে দেবে খালের চরান-জলে। তখন তার ছেলে রবি মণ্ডল খেপলা-জাল দিয়ে পারশে মাছের ঝাঁক ধরবে।

ওদিকের গলুইতে গুড়োর মাথায় বসে রবি খেপলা জাল ঠিকমতো ধরে নিচ্ছে, যাতে মুহূর্তের মধ্যে কোমর-জলে নেমে জাল মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে গোল করে ফেলতে পারে পারশে মাছের ঝাঁকে। তার পা দুটো ঝুলছে শিষখালের মাঝ-বরাবর।

তিনজনের সবাই মাছ ধরা নিয়ে এমন নিবিষ্ট যে, পরিপার্শ্ব সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন, অন্যমনস্ক!

এমন অন্যমনস্কতার সুযোগ গ্রহণ করতে কোনও শিকারি-বাঘ ছাড়ে না।

শিকারি-বাঘ বলছি বটে, ব্যাঘ্র-প্রকল্প সুন্দরবনে চালু হওয়ার পর সম্প্রতি পিরখালি বনে চারটি বাঘ ঘোরাফেরা করছে। এদের সব ক'টি সবে মায়ের কোলছাড়া হয়েছে। এদের মায়েরা প্রথম-প্রথম নিজে একাই শিকার করে ডেরায় এনে খাওয়াত। তারপর সঙ্গে করে শিকারে নিয়ে মাঝপথে ওদের রেখে যেত। দূরে কোথাও শিকার করে নিয়ে এসে তারপর খাওয়াত। এর কিছুদিন পরে মায়ের শিকারের ওতপাতা জায়গা অবধি বাচ্চারা মায়ের সঙ্গে এগোতে চাইলেও কিছুতেই যেতে দিত না। সেখানেই বসে মায়ের শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কাণ্ডকারখানা দেখতে হত।

এইভাবে শিকার করা শেখাতে পারলেও দুটি জিনিস ওদের শেখাতে পারত না। প্রথমত, শিকারের দিকে চুপিসারে এগোতে হলে নিজের গায়ের তীব্র গন্ধ যাতে শিকারের নাকে না যায় বাঘকে সর্বদাই শিকারের দিক থেকে আসা বাতাসের মুখোমুখি হয়ে এগোতে হয়। ভাষা না থাকলে শুধু ইশারায় বোঝানো বা শেখানো দায় এই কৌশল।

দ্বিতীয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিষ্কার ভাষা ছাড়া এটা বোঝানো বা শেখানো আরও কষ্টকর। ওস্তাদ

শিকারি-বাঘ আগেই ভাল করে ঠিক করে নেয়, কোন পথে শিকার নিয়ে সে নিরাপদে ফিরবে ! আগে থেকেই চিন্তা করে ঠিক করা সরে পড়বার পথ—এ-বিষয়ে ভাষা ছাড়া শেখানো প্রায় অসম্ভব।

কাজেই এই দুটি বিষয় মায়েরা বাচ্চাদের ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতা থেকে নিজে ঠকে ও ঠেকে শিখে নেওয়ার দায়িত্বের ওপর ছেড়ে দেয়।

ফলে এইসব নব-যৌবন প্রাপ্ত বাঘ না ভেবে-চিন্তে যেমন-তেমনভাবে আক্রমণ করে যায়। যেন আক্রমণ করাই একমাত্র নেশা হয়ে ওঠে এই বয়সে !

করেছেও তাই এবার। বগড়া ঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে এসে সহসা বেপরোয়া আক্রমণ।

ঝাঁপিয়ে পড়বে তো পড়েছে ডিঙির গলুইতে রবি মণ্ডলের ওপর। গলুইয়ের শীর্ণ জায়গায় কোনওমতে চার পায়ে ভর করেছে বটে। কিন্তু টাল সামলাতে গিয়ে রবির গায়ে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কার সঙ্গে-সঙ্গে বাঘের হুঙ্কার ও গর্জনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে রবি তার ঝোলানো পা নিয়ে প্রায় কোমর-জলে পড়ে। পড়েই দু' পায়ে জলের তলায় খুঁটি নিতে চায় ! বাঘের আক্রমণের সময়ে ক্ষিপ্রতার তুলনা নেই ! পড়বার অবকাশ দেয় না।

বাঘও ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝোঁকেই প্রচণ্ড থাবার আঘাত করে রবির মাথায়। আঘাত করেই গলা লম্বা করে তার হিংস্র মুখের দো-পাটির চার বিশাল 'কুকুরে-দাঁত' দিয়ে রবির ঘাড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে কামড় বসিয়েছে। বসিয়েছে বটে, কিন্তু সেও সঙ্গে-সঙ্গে জলে।

বনোয়ালি বাপ একাই বাঘের সঙ্গে লড়তে অভ্যস্ত। মাত্র ছ'-সাত হাত দূরে জলে দাঁড়িয়ে প্রলয়কাণ্ডটা দেখা মাত্র ক্ষিপ্ত ও মত্ত হয়ে ওঠে। হাতের একগোছ পারশে মাছ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লম্বা-লম্বা পায়ে যেন জলের ওপর উড়ে এসে বাঘের পিঠের ওপর পড়ে। পড়েই বাঘের পেটের তলায় বজ্র-বাঁধন দেয়—পায়ের কেঁচকি। কিন্তু এবার ! হাতের কাছে কিছুই পায় না। চোখের সামনে মাথায় বাঁধা গামছার ফেটি ঝুলছে। একটানে খুলে নিয়ে জলের তলায় বাঘের গলায় বাঁধছে। দেবে না কিছুতেই বাপকা বেটাকে মুখে ধরে সুন্দরবনের মানুষখেকোকে পালাতে।

এদিকে বাঘ নিরুপায় ! বনোয়ালির ওজনে ও দাপটে হিংস্রতম জীবের পিঠ জলের তলায় দেবে গেছে। শুধু পিঠ নয়,

নাক-মুখও জলের তলায় বুঝি দেবে যেতে চায়। মুখে শক্তিশালী দাঁতের কামড়ে রবি ঝুলছে।

ততক্ষণে শক্তিশালী গামছার বাঁধনে টান পড়েছে। বাঘ দিশেহারা। মৃত্যুভয় ! মানুষখেকোরও মৃত্যুভয় সুন্দরবনে !

কোনও পথ না পেয়ে দ্রুত শিকার মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বাঁচতে চায় ! বাপে দ্যাখে তার বেটা তলিয়ে যাচ্ছে। শক্তিশালী পায়ের কেঁচকি ও গামছার বজ্র বাঁধন আলগা হয়ে যায় বেটার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে। সেই মুহূর্তের সুযোগে বাঘটিও ঝমাত করে সরে পড়ে প্রাণে বেঁচে পালায়।

দ্রুত জলের ভেতর হাত নামিয়ে ছেলেকে টেনে তুলে বাবা দ্যাখে—ছেলে মৃত।

খোঁড়া ঠাকুর মণ্ডল বোঠে-হালে বসে দূর থেকে ছটফট করছিল—এই জীবন-মরণ লড়াইয়ের ডিঙিকে বেহাল করেও দিতে পারে না ! খোঁড়া পায়ে সেখানে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়তেও অক্ষম ! তার আফসোস যেন ফেটে পড়ে—এই সংগ্রামে সে অংশ গ্রহণ করতে পারল না।

গলুইতে রবি মণ্ডলের দেহখানা রাখতেই ঠাকুর এবার বোঠে-হাল শক্ত হাতে ধরে তীর-বেগে ডিঙি চালিয়ে দেয় জোয়ারের শিরা ধরে গোসাবা-মুখো। দুগ্যোদেয়ানি খালে পড়ে বাতাসের সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি পাল টাঙিয়ে শক্ত হাতে হাল ধরেছে। ডিঙির গতি চড়চড় করে জানাতে শুরু করেছে।

কালীপদ তখনও গজরাচ্ছে—কখনও বিড়বিড় করে, কখনও বা সশব্দে, কখনও বা নিঃশব্দে, শুধু ঠোঁট নাড়িয়ে !

হালের দিকে একদৃষ্টিতে বড়-বড় চোখে নজর রেখে পাথরের মূর্তির মতো নিথর ঠাকুর। ভাবে, আজ কী দেখলাম ! বনোয়ালি বাপের দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিকতাকে, না স্নেহাতুর পিতাকে !

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের ধারণা কীভাবে এল

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌরজগৎ সম্পর্কে আজকের ধারণা হল, গ্রহগুলো ঘুরছে সূর্যের চারদিকে। একে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বলা হয় 'সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব'। কিন্তু এরকম একটা তত্ত্বে পৌঁছতে বহু বছর সময় লেগেছে। বিশ্বের কেন্দ্রস্থল হিসাবে পৃথিবীকেই কল্পনা করা হত, আর ভাবা হত সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমন্বিত নভোমণ্ডল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ কেমন করে ধীরে-ধীরে হল তারই কিছু আলোচনা এখানে করব।

বুদ্ধির উন্মেষ হওয়ার পর মানুষ তার নিজের দেখা প্রাণী ও উদ্ভিদে ভরা বাসভূমির নাম দিল পৃথিবী, আর নক্ষত্রখচিত নীল চন্দ্রাতপের নাম ছিল আকাশ। মানুষ দেখল দিগন্তরেখায় পৃথিবী শেষ হয়ে আকাশ আরম্ভ হয়েছে, তার ধারণা হল পৃথিবী চ্যাপটা থালার মতো সমতলভূমি। তারপর ধীরে-ধীরে সভ্যতার সূত্রপাত হল, ভারত, চিন, ব্যাবিলন, গ্রিস, মিশর প্রভৃতি দেশে। এইসব আদি সভ্যতার দেশের মানুষ চন্দ্র, সূর্য ছাড়াও অন্য অনেক জ্যোতিষ্কের সঙ্গে পরিচিত হল, বুঝল গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভেদ। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে তারা গ্রহ হিসাবেই চিনল। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও গতিবিধি নিয়ে সেই আদি যুগে মানুষ যেসব কাল্পনিক আখ্যান রচনা করেছিল, সেগুলি লিপিবদ্ধ আছে হিন্দু পুরাণে, মিশরীয়, আসিরীয়, গ্রিস ও চিন দেশের পুরাণে। গল্পগুলো ভারী সুন্দর, জ্যোতিষ্কদেরই কথা রহস্যের অন্তরালে বলা আছে।

ছ'-সাত হাজার বছর পূর্বেকার বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় আচার্যদের জ্যোতিষ্কচর্চা অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়েছে এবং প্রভূত উন্নতিও হয়েছে। যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়াই ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা এমন অনেক বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন, যা পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্রের সাহায্যে আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয়দের জ্যোতির্বিদ্যা পাশ্চাত্য দেশে স্বীকৃতি পায়নি। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর ভারতে গণিত-জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি একরকম স্তব্ধ হয়ে গেল, কিন্তু ফলিত জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা শেষ হল না। ফলিত জ্যোতির্বিদ্যার জন্য যতটুকু গণিত-জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজন, তার ব্যবহার অবশ্য আজও আছে।

ইতিমধ্যে গ্রিস থেকে ক্রমান্বয়ে পশ্চিম ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ছড়িয়ে পড়ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর পশ্চিম ইউরোপে মানযন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি হচ্ছিল। যন্ত্র-যুগের সূচনা থেকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গণিত-জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

কেপলার

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর নাম মনে পড়ে, তিনি হলেন গ্রিসের থালেস (খ্রিস্টপূর্ব ৬২৪—৫৪৭)। তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে খুব ভালবাসতেন। তাঁর সম্পর্কে একটা গল্প চালু আছে। একদিন রাত্রে আকাশের তারা দেখতে-দেখতে থালেস এমন বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন যে, পথ চলতে গিয়ে একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে যান। তাঁকে উদ্ধার করেন এক পরিচারিকা। সাধারণ মানুষ তাঁকে একেবারে পাগল ভাবত, কারণ তিনি একটা দুঃসাহসিক উক্তি করেছিলেন। থালেস বলেছিলেন, বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বরকে টেনে আনার কোনও প্রয়োজন নেই। জাগতিক কাণ্ডকারখানার মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা, আর তা জানবার জন্য

প্রয়োজন হল সাধারণ জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি। ২,৫০০ বছর আগে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে এভাবে কথা বলা মোটেই সহজ ছিল না। মানুষের ভাবনায় তিনি আনলেন এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর মতে, সৃষ্টির মূল উপাদান হল জল, আর এই পৃথিবী ভাসছে জলের ওপরে। থালেসের এই ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই এখন আর গ্রাহ্য নয়, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হল তাঁর বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিজ্ঞানীর মতো। তাঁকে গবেষণামূলক বিজ্ঞানের পথিকৃৎ বললে ভুল হবে না।
গ্রিসের পিথাগোরাস (খ্রিস্টপূর্ব ৫৭০—৫০০) আর একটি স্মরণীয় নাম। ইনি একই সঙ্গে দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, বাদ্যযন্ত্রে কোন সুরটি বেজে উঠবে তা নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের ওপর। এর অর্থ হল সঙ্গীতের সুর নির্ভর করছে সংখ্যার

প্লেটো

ওপরে। পিথাগোরাসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জগতের সব কিছুর মূলে রয়েছে এই সংখ্যা। বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যাতেও তিনি এমনই সংখ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারের বাদ্যযন্ত্রে যেমন এক-একটি দৈর্ঘ্যে এক-একটি সুর, তেমনই এক-একটি সুর পৃথিবী থেকে চন্দ্রে, চন্দ্র থেকে বুধে, বুধ থেকে শুক্রে, শুক্র থেকে সূর্যে, সূর্য থেকে মঙ্গলে, মঙ্গল থেকে বৃহস্পতিতে, বৃহস্পতি থেকে শনিতে, আর শনি থেকে স্থির নক্ষত্রের মণ্ডলে। এই সুর একমাত্র শুনতে পান বিধাতাপুরুষ। পৃথিবীর নশ্বর মানুষ এই সুর শুনতে পায় না। পিথাগোরাসের বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা ছিল এরকম।
পিথাগোরাসের শিষ্য ছিলেন ফিলোলাউস (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০—৪০০)। তিনি শোনালেন সম্পূর্ণ এক নতুন কথা—পৃথিবী যে শুধু গোল তাই নয়, এর একটা গতিও আছে। তাই বলে তিনি কিন্তু ভাবতে পারেননি যে, পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে, যা ভাবতে পারলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক ব্যাখ্যাই সহজ হয়ে যেত। তার পরিবর্তে তিনি ভাবলেন, পৃথিবীও বিশেষ একটি গোলককে ঘুরছে, অবস্থানটাকে তুলনা করা যেতে পারে ঘুরন্ত নাগরদোলার সঙ্গে।
এর পরে আর একজন গ্রিক জ্যোতির্বিদ আরও উন্নত ভাবনাচিন্তার পরিচয় দিলেন, তিনি হলেন হেরাক্লিডিস (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৮—৩১৫)। তিনি বললেন, পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে লাট্টুর মতো ঘুরছে, আর পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির ফলেই গোটা আকাশটা ঘুরছে বলে মনে হয়। তাঁর বিশ্বতত্ত্বটি হল এরকম : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, বুধ ও শুক্র সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, আর ঘূর্ণ্যমান গ্রহ দুটি সহ সূর্য

টলেমি

ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। বাকি তিনটি, অর্থাৎ মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি পৃথিবীর চারদিকে পৃথক-পৃথক গোলকে ঘুরছে। হেরাক্লিডিস অন্তত দুটি গ্রহকে সূর্যের চারদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, যেটা বিশ্বতত্ত্বে আংশিক সত্য।
কিন্তু এর পরে ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্র রচনা করলেন প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৮—৩৪৭) ও অ্যারিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪—৩২২)। প্লেটো ভাবতেন, এই বিশ্বের আকার হবে নিটোল একটি গোলক, আর গতিপথটি হবে নিখুঁত বৃত্তাকার। প্লেটোর মতে, গোলক হচ্ছে ত্রুটিহীনতার একমাত্র নিদর্শন, বিশ্বসৃষ্টিতে কোথাও কোনও ত্রুটি নেই, আর সবার ওপরে রয়েছেন সেই সৃষ্টিকর্তা, যিনি সর্বশক্তিমান। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ-ধরনের একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করলে, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার আর কোনও প্রয়োজনই

থাকে না। প্লেটোর এই তত্ত্বকেই আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন অ্যারিস্টটল। প্রাচীন গ্রিসে অ্যারিস্টটলের চেয়ে বড় পণ্ডিত আর কেউ জন্মেছিলেন কি না খুবই সন্দেহ।
অ্যারিস্টটলের বিশ্বতত্ত্বটি হল এইরকম : বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী, আর এই পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে ন'টি কেন্দ্রীয় স্বচ্ছ গোলক, একটির ওপরে আর-একটি, অনেকটা পেঁয়াজের খোসার মতো। চন্দ্র, সূর্য ও শনি গ্রহ পর্যন্ত সাতটি গোলক, আর শনির পরে বাইরের দিকে দুটি গোলকে আছে স্থির নক্ষত্র, আর তারও বাইরের গোলকে রয়েছেন তিনি, যিনি এইসব গোলককে চালিত করেন, সেই পরম চালক বা ঈশ্বর। পরবর্তী প্রায় ১,৫০০ বছর ধরে এই গোলকভিত্তিক বিশ্বতত্ত্বের পরিকল্পনা বেঁচে রইল, তার বড় কারণ হল সে-যুগে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের দারুণ প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল, বিজ্ঞান ও দর্শনের চিন্তাভাবনায়।
এর পরেই বিশ্বতত্ত্বে যাঁর নাম মনে আসে তিনি হলেন, অনেকের মতে প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক, তাঁর নাম অ্যারিস্টার্কাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩১০—২৩০)। তিনি প্রমাণ করে বলতে পেরেছিলেন, সূর্যের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। তাঁর মনে এই প্রশ্ন উঠেছিল, এই বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবী না সূর্য ? তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল, সূর্য এই বিশ্বের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তার মানেই হল ভূকেন্দ্রিক বিশ্ব নয়, সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের তত্ত্ব।
প্রাচীন যুগের ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব পরিকল্পনায় সর্বশেষ যে নামটি করতে হয়, তা হল ক্লডিয়াস টলেমি (খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় শতক)। গ্রিস দেশে অ্যারিস্টটলের পরে জ্যোতির্বিদ্যার সবচেয়ে বড় প্রতিভা ছিলেন টলেমি,. তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলেও তাঁর দান অসামান্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল 'অ্যালমাজেস্ট' (Almagest) নামে একটি জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ রচনা। মধ্যযুগে জ্যোতির্বিদরা এই গ্রন্থকে 'জ্যোতির্বিদ্যার বাইবেল' মনে করতেন—টলেমির সময় থেকে কোপারনিকাসের সময় পর্যন্ত প্রায় ১,২০০ বছর ধরে গ্রন্থটিকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। টলেমির বিশ্বতত্ত্বটি হল
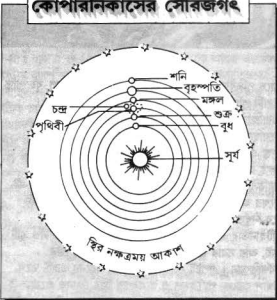
ছ'-সাত হাজার বছর পূর্বেকার বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় আচার্যদের জ্যোতিষ্কচর্চা অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়েছে এবং প্রভূত উন্নতিও হয়েছে। যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়াই ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা এমন অনেক বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন, যা পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্রের সাহায্যে আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে।

এইরকম : বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী, আর গ্রহগুলি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে বিভিন্ন বৃত্তাকারে। গ্রহগুলির অনিয়মিত চালচলনকে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি পরিবৃত্তের কল্পনা করেন। এর দৃষ্টান্ত হল নাগরদোলা। চাকার মতো একটা মস্ত বড় নাগরদোলা ঘুরছে, আর চাকার 'রিম' থেকে ঝুলছে দর্শকদের বসবার আসন। এখন কল্পনা করতে হবে যে,

চিত্রণ : নীলরতন মাইতি
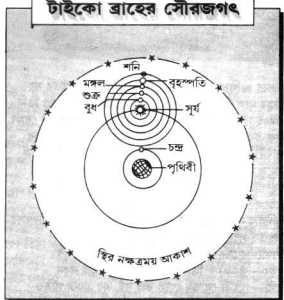
নাগরদোলার বড় চাকাটাও ঘুরছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে এই আসনগুলোও ছোট-ছোট চক্রে ঘুরে চলেছে। নাগরদোলার বড় চাকার কেন্দ্র থেকে ঘুরন্ত আসনগুলোকে যেমন দেখায়, পৃথিবী থেকে তাকিয়ে গ্রহগুলোর গতিও ঠিক তেমনই দেখা যায়।

পাশ্চাত্যে টলেমির ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের চিত্রই প্রায় ১,২০০ বছর ধরে মানুষের মনে বাসা বেঁধে ছিল। এই অচলায়তনটিকে ভাঙার কাজে প্রথম যিনি হাত দিলেন, তাঁর নাম নিকোলাস কোপারনিকাস (খ্রিস্টাব্দ ১৪৭৩—১৫৪৩)। তাঁর জন্ম ইউরোপের পোল্যান্ড-এ। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্ররা থাকে পৃথিবী থেকে বহু দূরে, তবু এই সুদীর্ঘ পথে প্রতিদিন একবার পৃথিবীর চারদিক ঘুরে আসছে, এটা কীভাবে সম্ভব ? এই প্রশ্ন কোপারনিকাসের মনে এল। তিনি বহুদিন এইসব নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন এবং পরে বুঝলেন এটা সম্ভব নয়, আসলে সূর্যই এক জায়গায় স্থিরভাবে অবস্থান করছে। আর পৃথিবী প্রতিদিন একবার লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে। সেই জন্যই আকাশের সব জ্যোতিষ্ককে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। এইভাবে পাক খেতে-খেতে পৃথিবী এক বৃত্তাকার পথে এগিয়ে গিয়ে নিয়মিত গতিতে সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসছে। অন্যান্য গ্রহও বৃত্তাকার পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, আর নক্ষত্ররা সুদূর মহাকাশে সূর্যের মতো স্থির। এই বিশ্বতত্ত্বটি প্রকৃতপক্ষে অন্য ধরনের। কিন্তু তখনকার দিনে পৃথিবীকে কেন্দ্রচ্যুত করা ছিল ধর্মবিরোধী, তাই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বহুকাল গোপন রেখে মৃত্যুর ঠিক আগে একটি স্বরচিত গ্রন্থে তা প্রকাশ করে যান। এই বিশ্বতত্ত্বের পরিকল্পনায় কোপারনিকাস নতুন একটি দিগন্তকে আভাসিত করে তুললেন। এতকাল মানুষ জেনে এসেছিল তার প্রিয় আবাসভূমি এই পৃথিবীই হল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল। কোপারনিকাসের তত্ত্ব এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করল।

কোপারনিকাসের পরেই এলেন টাইকো ব্রাহে (খ্রিস্টাব্দ ১৫৪৬—১৬০৬)। এঁর জন্মস্থান ডেনমার্ক। টাইকো ব্রাহে-কে বলা হয় আধুনিক পর্যবেক্ষণমূলক

নিউটন

জ্যোতির্বিদ্যার জনক। তাঁর আকাশ পর্যবেক্ষণ ছিল নিখুঁত ও নির্ভুল। কোপারনিকাসের বিশ্বতত্ত্বে টাইকোর বিশ্বাস ছিল না। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, এই ধরনের চিন্তাকেও তিনি পাপ বলে মনে করতেন। তিনি নিজস্ব একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন, সেটা হল এইরকম : গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকেই ঘুরছে এবং ঘূর্ণ্যমান গ্রহগুলিসহ সূর্য ও চন্দ্র ঘুরছে
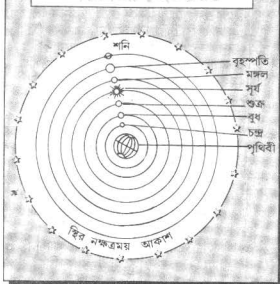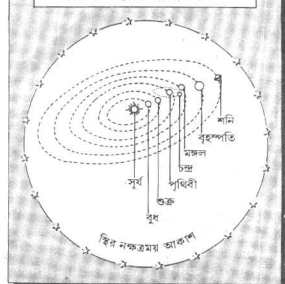
ULKA 13145-BEN

পৃথিবীর চারদিকে।

এর পরে কোপারনিকাসের তত্ত্বটিকে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন, তিনি হলেন গিয়োভ্যানো ব্রুনো (খ্রিস্টাব্দ ১৫৪৮—১৬০০)। এঁর জন্ম ইতালিতে। ইনি ইউরোপের নানা জায়গায় কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু এ-তত্ত্ব ছিল বাইবেল-বিরোধী, তাই অনেকে আপত্তি করতে লাগলেন। তখন ব্রুনো বললেন, শুধুমাত্র ধর্মীয় উপদেশের জন্যই বাইবেল অনুসরণ করতে হবে, কিন্তু কখনওই জ্যোতির্বিদ্যার ধ্যান-ধারণার জন্য নয়। এসব কথা সেই সময়ের রোমান ক্যাথলিক গির্জার পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত ছিল। পরিশেষে রোমান ক্যাথলিক গির্জার বিচারকমণ্ডলীর কাছে ব্রুনো অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। ১৬০০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ব্রুনোকে সকলের সামনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। এই ঘটনা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক নিদারুণ কলঙ্কজনক ঘটনা হয়ে থেকে গেল।

কোপারনিকাস সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি গ্রহগুলির অনিয়মিত চলাফেরার পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এই ব্যাপারটি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে যিনি সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বটিকে একেবারে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তাঁর নাম জোহান কেপলার (খ্রিস্টাব্দ ১৫৭১—১৬৩০), জন্ম জার্মানিতে। দারিদ্র্যের মধ্যেই বড় হয়েছেন। চার বছর বয়সে এমন মারাত্মক অসুখে পড়েছিলেন যে, বাঁ হাতটি বেশ খানিকটা অবশ এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। এইজন্য তাঁর আকাশ পর্যবেক্ষণ করার সামর্থ্য ছিল না। ১৬০০ সালে টাইকো ব্রাহের সঙ্গে কেপলারের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। টাইকোর সংগৃহীত পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য কেপলারের হাতে আসার পরেই শুরু হল তাঁর আসল জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণা। এতকাল পর্যন্ত কোনও জ্যোতির্বিদই ভাবতে পারেননি যে, আকাশে গ্রহগুলির গতি বৃত্তাকার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে, কেপলারও প্রথমে তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু অঙ্ক কষে দেখলেন, অঙ্কের ফলের সঙ্গে পর্যবেক্ষণের ফল কিছুতেই মিলছে না, কোপারনিকাসের তত্ত্ব দিয়েও সেই মিল হচ্ছে না। এই মিল ঘটাবার চেষ্টা চলল সুদীর্ঘ আটটি বছর ধরে, কিন্তু পারলেন না। তখন কেপলারের মনে এমন ভাবনা এল, গ্রহগুলির কক্ষপথ বৃত্ত না হয়ে উপবৃত্ত-ও তো হতে পারে। তারপরে অঙ্ক কষে দেখলেন, আশ্চর্য, এবারে অঙ্কের ফল আর পর্যবেক্ষণের ফল পুরোপুরি মিলে গেছে। আসল কথা হল, বৃত্তের ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার বাধাটিই ছিল সত্যিকারের বড় বাধা, এই বাধাটা কেটে যাওয়ার পরে কেপলারের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো আর কষ্টসাধ্য ব্যাপার রইল না। কেপলার গ্রহের গতির সঠিক ব্যাখ্যা করলেন, মূল কথাটা হল এরকম : পৃথিবীসমেত সব গ্রহই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু ঘোরাটা বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার। প্রায় ২,০০০ বছর ধরে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে একটা অচলায়তন তৈরি হয়েছিল, আর এর শেষ আশ্রয় ছিল টলেমির তত্ত্বে। এই অচলায়তনটিতে প্রথম ভাঙন ধরালেন কোপারনিকাস, আর কেপলার তাকে একেবারে ধূলিসাৎ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করলেন নতুন সত্য।

এর পরে যাঁর দুঃসাহসী অনুসন্ধিৎসা, আকাশ পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিভূমিতে একেবারে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম, তিনি হলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি (১৫৬৪—১৬৪২)। মনে রাখতে হবে, শেকসপিয়র ও তাঁর

গ্যালিলেও

জন্ম একই বছরে, আর নিউটনের জন্ম ও তাঁর মৃত্যু একই বছরে। গ্যালিলেওর জন্ম ইতালিতে। গ্যালিলেওকে বলা হয় সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কোপারনিকাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৪৩ সালে, কিন্তু এই নতুন তত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে তেমন আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়নি। তারপরে কেপলারের গাণিতিক সূত্রও সেই সাবেকি ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বের বিশ্বাসকে টলাতে পারেনি। গ্যালিলেওই প্রথম, যিনি এই পুরনো বিশ্বাসকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন, আর কোপারনিকাসের তত্ত্বের সপক্ষে এক নতুন বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি রচনা করলেন। গ্যালিলেও তাঁর দূরবিনের মধ্য দিয়ে আকাশের জ্যোতিষ্ক সর্বপ্রথম পর্যবেক্ষণ করলেন ১৬০৯ সালে—এই

সাধারণত বলা হয়ে থাকে, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুরু নিউটন থেকে। কিন্তু এই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। এই চার স্তম্ভের নাম কোপারনিকাস, টাইকো ব্রাহে, কেপলার এবং গ্যালিলেও। এঁরাই জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এক নতুন পথে চালিত করেছিলেন।

কোপারনিকাস

ঘটনাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন একটি যুগের সূত্রপাত বলা হয়। এতদিন পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হত শুধুমাত্র চোখের দেখার ওপরে। এই প্রথম দূরবিনের মাধ্যমে আকাশের জ্যোতিষ্ককে একেবারে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চোখের সামনে নামিয়ে আনলেন গ্যালিলেও। দূরবিন দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন প্রথমে চন্দ্র, তারপরে বৃহস্পতি, আবিষ্কার করলেন বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ। এর পরে পর্যবেক্ষণ করলেন শুক্র, দেখলেন চন্দ্রের যেমন হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, যাকে বলা হয় চন্দ্রের কলা, তেমনই আছে শুক্রেরও। শুক্রকে কখনও দেখায় পরিপূর্ণ চাকতির মতো, আবার কখনও ফালির মতো। এই আবিষ্কারের পরেই গ্যালিলেও নিঃসন্দেহ হলেন যে, কোপারনিকাসের তত্ত্ব সঠিক, আর টলেমির তত্ত্ব ভুল। এসব আবিষ্কারের প্রতিটিই বড় ভয়ানক, তখনকার গোঁড়া রোমান-ক্যাথলিকদের পক্ষে এই বক্তব্য মেনে নেওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে ১৬৩৩ সালের ২০ জুন গ্যালিলেওর বিচার শুরু হল। বিচারে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তিনদিন ধরে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে।

ভূকেন্দ্রিক ও সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের সমস্ত তর্ক ও বিতর্কের সম্পূর্ণ অবসান ঘটালেন নিউটন (১৬৪২—১৭২৭)। নিউটন আবিষ্কার করলেন মহাকর্ষশক্তি এবং তার নিয়মকানুন। এর ফলে গ্রহগুলির গতিবিধির যাবতীয় হিসাব নির্ভুল হয়ে গেল। এখন আর কোনও প্রশ্নই রইল না যে, পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলি আপন-আপন উপবৃত্তাকার কক্ষে সূর্যের চারদিকে পথ-পরিক্রমা করে এবং সেইসঙ্গে তাদের নিজেদের দেহের ভেতরের কোনও অক্ষ অবলম্বনে লাটুর মতো পাক খায়। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুরু নিউটন থেকে। কিন্তু এই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। এই চার স্তম্ভের নাম কোপারনিকাস, টাইকো ব্রাহে, কেপলার এবং গ্যালিলেও। এঁরাই জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এক নতুন পথে চালিত করেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এঁরা চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

ইউরেকা ফোর্বস থেকে আপনাদেরই বন্ধু, ঘরদোর ধূলোময়লা থেকে মুক্ত রাখার সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায়টি হাতেকলমে দেখিয়ে দিতে বাড়িতে এলেন ব'লে।

আজকালের মধ্যেই যে কোনদিন ইউরেকা ফোর্ব্সের সেলসম্যান আপনার দরজারও ঘণ্টিটি বাজাবেন আর পরিচিতি-কার্ড দেখিয়ে নিজের পরিচয় দেবেন।

ভদ্রলোককে দেখলেই মনে ভরসার সঞ্চার হয়, আর হওয়াটাই স্বাভাবিক। ভারতে এইধরণের বিক্রীসংস্থাগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় ও সর্বাধিক সফল, তিনি যে তারই অন্যতম সদস্য। এঁদের পেছনে আরো রয়েছে নির্ভরযোগ্য বিক্রীপরবর্তী সেবার আশ্বাস।

আজকের দিনে সমস্যা কি একটা? ধূলো, নোংরা, দূষিত জল. তাছাড়া কাজের লোকের অভাব - এতসবের সমাধান করতেই উনি পেশ করবেন অতি-আধুনিক কিছু ঘরকন্নার উপযোগী উৎপাদন।

অনুপম দুটি উৎপাদন আপনাদের প্রদর্শন করে দেখাবার জন্য ওঁর কাছেই আছে : **ইউরোক্লীন** বহুপযোগী পরিচ্ছন্নতা-প্রণালী, যা ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের চেয়েও বেশী কাজের এবং **অ্যাকোয়াগার্ড**, কলের পাইপে জুড়বার মত এক ওয়াটার ফিল্টার-কাম্-পিউরিফায়ার।

ইউরোক্লীন আপনার ঘরদোরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধূলোময়লাও বিনা আয়াসে দূর করে। যার কথা আপনার জানাই নেই তেমন নোংরাও সাফ করে।

অ্যাকোয়াগার্ডের কল্যাণে সুইচ চালাবার পর কল খুললেই আপনি পেয়ে যান পুরোপুরি পরিষ্কার, পুরোপুরি নিরাপদ পানীয় জল - খালি সুইচটি টেপার ওয়াস্তা - সে আপনার কলের জল যতই জীবাণুকিল্‌বিলে হোকনা কেন।

ইউরেকা ফোর্বসের সেল্‌সম্যান আপনার ঘরেই হাতেকলমে আপনাকে দেখিয়ে দেবেন কি করে এইসব উৎপাদনগুলি আপনার সংসারে প্রবর্তন করে আধুনিকতম ঝরঝরে পরিচ্ছন্নতা ও টগ্‌বগে স্বাস্থ্যের জোয়ার। আর আপনার জন্যে গড়ে দেয় ঝকঝকে তকতকে রোগবালাই থেকে নিরাপদ নূতন এক দুনিয়া।

ঘুরতে ঘুরতে কবে কতদিনে আপনার বাড়ি আসবেন, তার জন্য অপেক্ষা কেন? শীগগিরই এসে পড়ার জন্যে আপনিই সরাসরি ইউরেকা ফোর্ব্সের সঙ্গে যোগাযোগ করুননা! লিখুন - ইউরেকা ফোর্ব্স লিমিটেড,
পোঃ বক্স ৯৩৬, জি. পি. ও, বম্বে ৪০০ ০০১।

ইউরোক্লীন
বহুপযোগী পরিচ্ছন্নতা-প্রণালী
ভ্যাকুয়াম ক্লীনারের চেয়েও যা অনেক বেশী

অ্যাকোয়াগার্ড
কলের পাইপে জুড়বার এক
ওয়াটারফিল্টার-কাম্-পিউরিফায়ার

ইউরেকা ফোর্ব্‌স লিমিটেড
পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর আধুনিক উপায়ের মধ্যে অগ্রসর

89/EFL/188 B2bn

প্রশ্ন ও উত্তর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চাকরি পাবে মোহনকুমার সব-কিছু ঠিকঠাক
প্রথম দিনেই আছাড় খেয়ে নাক ফুলে জয়ঢাক !
দু' দিন বাদে অফিস গেলে কী হল তার দশা ?
নাক-সরু এক স্বপনকুমার তার চেয়ারে বসা !
কেন এমন হল, আহা, কেন এমন হল
কোন দোষে হায় মোহনবাবুর চাকরিখানা গেল ?

রকেট চালিয়ে বাঙালির ছেলে পাড়ি দেবে নাকি চাঁদে ?
বিজয়কুমার পুরোপুরি রেডি, তবু কি ফ্যাসাদ বাধে ?
জুতোয় একটা পেরেক উঠেছে, সে খেয়াল নেই তার
বেলুনের মতো ফোস্কা পড়ল পায়ে জুতো রাখা ভার
খালি পায়ে কেউ চাঁদে যায় নাকি, রকেট নিল না তাকে
বিজয়কুমার ফ্যালফ্যাল করে আকাশে তাকিয়ে থাকে !
কেন এমনটি হল যে আহা রে, কেন এমনটি হল ?
বাঙালির কত নাম হত, তবু সুযোগ ফস্কে গেল !

লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল পুঁটিরাম
এইটুকু কাগজের পাঁচ লাখ টাকা দাম !
আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচে ধেই ধেই
টিকিটটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নামে যেই
কোথা থেকে ঝড় এল, পুঁটিরাম নিঃস্ব
টিকিটটা পাখি হয়ে হল অদৃশ্য ।
হায় হায় একী হল, এমনটি কেন হল ?
পুঁটিরাম ভ্যাবারাম, সব টাকা জলে গেল !

উত্তর : সাড়ে এগারো বছর বয়েসে পর পর দু দিন তিনতলার জানলা থেকে রাস্তায় আমের খোসা ছুঁড়ে ফেলেছিল কে ? মোহনকুমার, আবার কে ?
দশ বছর তিন মাস বয়েসে একটা বেড়াল ছানার গায়ে আলপিন ফুটিয়ে দিয়েছিল কে ? বিজয়কুমার, আবার কে ?
তেরো বছর পাঁচ মাস বয়েসে এক বন্ধুর একটা ডিটেকটিভ গল্পের বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা চুপিচুপি ছিঁড়ে দিয়েছিল কে ? পুঁটিরাম, আবার কে ?
এতদিন পর সেই রাস্তা, বেড়ালছানা ও বই প্রতিশোধ নিল !

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

পাখি ও পথিক

জয় গোস্বামী

শাক দিয়ে সে মাছ ঢেকেছে, সাজ করেছে পরচুলায়
দাগ কেটে সে ভাগ করেছে এই মাটি আর ওই ধুলায়

হাঁকডাকে সে কাক মারে আর আখগাছে সে নাক ঘষে
মাথাধরার মলম খাবে বেচারি এক রাক্ষসের

সন্ধে হলেই জ্যোৎস্না খাবে একদমে তিন তিন খুরি
কেউ তা দেখে ফেললে দেবে থুক থুক থুক থুককুড়ি

ভালমানুষ দেখলে পরে ভেংচি কাটবে শখ করে
মিষ্টি কথায় গাল দেবে সে,যেয়ো না ওর চক্করে

এমন লোককে সামাল দেবে কোথায় তেমন লোক কোথায়
যত্ন করে ধ্বংস হচ্ছে, নিজেই নিজের যোগ্যতায়

কিন্তু তোমরা যা বলছ সব কী কথা আর কোন কথা
বাইরে থেকে যা দেখছ তার কোথাও আছে অন্যথা

মিষ্টি একটি পাখি আছে, যে-পাখি তার ঘর ভুলায়
সেই পাখিটির নাম লেখে সে এই মাটি আর ওই ধুলায়

দেখেছি এক বর্ষা রাতে সেই পাখিটি ঘোর শীতে
দুই ডানা তার ছড়িয়ে আছে—লোকটি ঘুমোয় বৃষ্টিতে

বৃষ্টি যখন শেষ হয়েছে গান এসেছে দূর ভাষায়
তাকিয়ে দেখি আকাশ ভরে ভোরবেলাটি সুর ভাষায়

ঠিক তখনই, হে প্রকৃতি, দেখতে পেলাম, পাগল-প্রায়
পথিকটিকে আঁকড়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে তার বাসায়…

ছবি : সুব্রত চৌধুরী
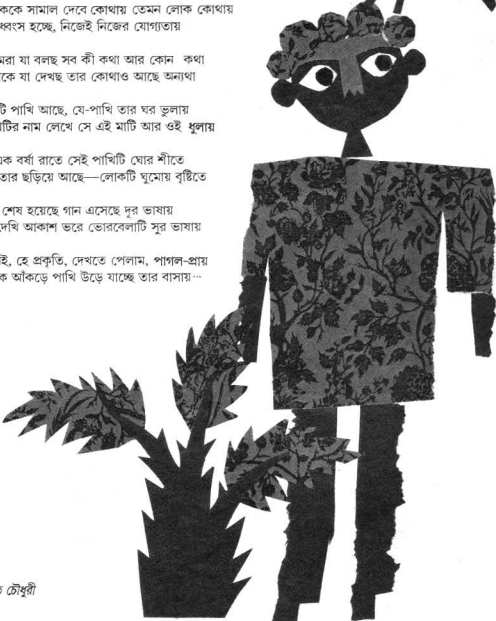
আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে দেশ ছেয়ে গেল
ঘরে ঘরে চারিদিকে
মায়ের পূজার শাঁখ বাজল !

মায়ের পূজার শাঁখ বেজে উঠল—যে পূজার পাঁচটি দিনের জন্যে প্রতিটি বাঙালীই সারাটি বছর দিন গোনে। নতুন জামাকাপড়, সোনা-দানা, আসবাবপত্র এইসব কি কি কেনাকাটার ঘটা শুরু করবে তার পরিকল্পনা ক'রে রাখে—কিন্তু, যে কোনো মূল্যবান বস্তু শুধু কিনলেই তো হল না, তার নিরাপত্তারও তো ব্যবস্থা থাকা চাই।

তবে, ঘরে যদি একটা গোদরেজ স্টোরওয়েল থাকে তাহলে তো কথাই নেই—কারণ, এ যে হয় দারুণ নিরাপদ, মজবুত ও শক্তপোক্ত, আর চলেও বছরের পর বছর। হ্যাঁ, আপনার ঘরেও আছে নিশ্চয়ই এই গোদরেজ স্টোরওয়েল ? এখনও যদি না থাকে তাহলে এবারের পূজোয়ই নিয়ে আসুন—আপনার সারাজীবনের সঙ্গী হবে এ !
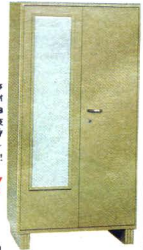
ULKA 13393 BEN

আদালতের আদিখ্যেতা

লীলা মজুমদার

এটা একেবারে হালের গল্প না হলেও, ঠিক এই সময়ই দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় এই ধরনের একটা কিছু ঘটে গেলে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এখানকার পরিবেশটাই এ-ধরনের ব্যাপারকে যেন ডেকে আনে এবং এ-দেশেই এসব ঘটেছে বলে হরদম শোনা যায়। শোনা কথার সত্যি-মিথ্যা নিয়ে আমি হলপ করে কিছু বলতে পারব না ; আমি কোনও দায়িত্বই নিচ্ছি না ; ঘটলেও আমার আপত্তি নেই ; না ঘটলেও দুঃখ নেই। আমার বানানো গল্পে কত সময় চাই কি এর চাইতেও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে। কাজেই ও তর্কে ছাড়ান দাও। আগে গল্পটা শোনো।

সকলেই জানে যে, পৃথিবীর সব বিখ্যাত গির্জা, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি সম্পত্তির নিরাপত্তার ও যত্নআত্তির জন্য সরকার খুব সতর্ক থাকেন। অনুদান দেন, পাহারার বন্দোবস্ত করেন। তার কারণ মন্দির মসজিদের প্রাচীন মূর্তি বা অন্য শিল্পকর্মের আন্তর্জাতিক বাজারে যেমন চাহিদা, তেমনই মূল্য। পৃথিবী জুড়ে এই ব্যবসা চলেছে। পুণ্যদ্রব্যে আর পণ্যদ্রব্যে তফাত থাকছে না।

আরও ব্যাপার আছে। নামকরা প্রাচীন মন্দিরে দর্শকের আর ভক্তের নিত্যি ভিড় লেগে থাকে। যাঁরা আসেন তাঁরা কেউ খালি হাতে আসেন না, রোজ দু-চার টাকার দর্শনী থেকে হাজার-হাজার টাকা মন্দিরের তহবিলে জমা পড়ে। অনেকে সোনা-রুপোর পুজোর বাসন, হিরে-জহরতের গয়নাগাটি ঠাকুরের চরণে দিয়ে যান। তার হিসাবও মন্দিরের তহবিলের খাতায় জমা পড়ে। সেজন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত আছেন।

দেবতাকে ঠকানো চাট্টিখানি কথা নয়, তার চেয়ে অনেক সহজে মানুষকে ঠকানো যায়। অবিশ্বাসী নরাধম ঠগ এবং চোররা ভাবতে পারে যে, ভগবানের কেরদানি একদিন বেরোবে। তিনি ভাবছেন খুব বুদ্ধি করে লোকচক্ষুর অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে। সেবায়েতরা সাজিয়ে-গুজিয়ে যা দেখাবেন লোকে তারই পায়ে গড় করবে, ধনরত্ন ঢেলে দেবে। তারা ভাবছে বুঝি এতেই সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তাই হবে না ছাই ! একদিকে গরিব ভক্তদের বাড়িতে হাজার অভাব। পেটভরে খাওয়া দূরে থাকুক, কোলের ছেলের রোগের সময় মুখে একটা ওষুধ পড়ে না। অন্যদিকে ভগবানের বড়মানুষি দেখে গা জ্বলে যায়। চন্দনের খাটে শোয়া, রেশমের কাপড়

গায়ে, গয়নাগাটি। চারবেলা ক্ষীর সর দামি-দামি ফলের ভোগ। সুগন্ধি তেলে-ভরা দীপাধার, দশ গণ্ডা কাজের লোক, পাইক-বরকন্দাজ, হাতি, ঘোড়া—ভাবলেও হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। তার ওপর নিরাপত্তার জন্য সরকারি ব্যবস্থা।

আশা করি পাঠকরা ভাবছে না যে, এই গল্পে আমার নিজের কোনও ভূমিকা আছে। এই ব্যাপারটা কোথায় এবং কবে ঘটেছিল, এমনকী, আদৌ ঘটেছিল কি না, তা আমি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করব না। কে কোথায় আমার নামে মানহানি মোকদ্দমা ঠুকে দিলেই তো গেছি! ওইসব আইন-আদালতকে আমি বেজায় ভয় করি। একবার ভিড়ের রাস্তায় একটা ছোট মেয়ে ছুটে এসে আমাদের গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল। আমরা তাকে তুলে হাসপাতালে দিয়ে সুস্থ করে তুললাম। কিন্তু পুলিশ আমাদের চালকের নামে কেস ঠুসে দিল। আমাকেও ডাকল। গিয়ে দেখি আসামি হল ড্রাইভার, কিন্তু আহত ব্যক্তির, কিংবা তার আত্মীয়স্বজনের পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না! তাই অবশেষে আমাকেই তাদের পক্ষে সাক্ষী দিতে দাঁড় করিয়ে দিল! শেষ পর্যন্ত ড্রাইভার বেকসুর খালাস পেল! আমার মতো অভিজ্ঞ লোক ছাড়া এ-গল্প লিখবেটা কে?

মন্দিরের নাম, অবস্থান এবং ঘটনার সন-তারিখ গোপন করলাম। তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক না থাকলেও, তফাতে থাকাই ভাল মনে হল। আগাগোড়া সবটা জগাইদা নামে আমাদের পাড়ার একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শোনা। অকুস্থল কলকাতা থেকে অনেক দূরে, বিখ্যাত এক মন্দিরে। একজন গরিব তীর্থযাত্রী, অর্থাৎ জগাইদা বড়লোকদের ভিড়ের জন্য তাঁর সামান্য পুজো দিতে না পেরে ঠিক করেছিলেন রাত থাকতে পুণ্য পুকুরে একটা ডুব দিয়ে, ঠাকুরমশাই দেখা দেওয়ামাত্র আর কেউ তাঁর নাগাল পাওয়ার আগেই, তাঁর পায়ে পড়বেন। মন্দিরে পৌঁছে দেখেন যাত্রীদের অপেক্ষা করবার জায়গায় জনমানুষ নেই, ঠাকুরমশাইয়ের আসবারও সময় হয়নি।

ভাল কথা, আমার বলে রাখা উচিত যে, যাঁর কাছে ব্যাপারটা শুনেছিলাম, অর্থাৎ জগাইদা, সেকালে শুধু ঘোর নাস্তিক ছিলেন না, তার ওপর দারুণ মিথ্যাবাদীও ছিলেন। অবিশ্যি যা ঘটেছে সেটাই খুব সত্যি, আর যেটা ঘটেছে বলে শুনিনি সেটাই একেবারে মিথ্যা, এ-কথা আমি মানিনি, মানি না, মানব না।

যাকগে, এখন জগাইদার ব্যাপারটাই বলি। যাত্রীদের অপেক্ষা করবার জায়গাটাতে কিছু বাঁধানো বসবার জায়গা আছে। জগাইদা তারই এক কোণে বসে পড়লেন। আগের দু' দিন নানা দ্রষ্টব্য স্থানে ঘুরেছেন; ভক্তিভরে নয়। তিনি খবরের কাগজের রিপোর্টার; মেটিরিয়েল সংগ্রহ করা তাঁর কর্তব্য, তাতে ভুল থাকলেও চলবে না; কাজেই সদাই চোখ-কান খুলে রাখতে হবে, তা নাস্তিকই হোন আর যাই হোন।

মোট কথা বসে-বসে ঢুল এসে গেছিল। তাই পরবর্তী ঘটনাগুলোর কতটা চাক্ষুষ দেখেছেন আর কতটা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা বলা শক্ত।

হঠাৎ কানে এল কেমন একটা ধুপধাপ শব্দ—"ধর, ধর! পাকড়ো, পাকড়ো!" ধড়মড় করে চোখ খুলে যা দেখলেন, তাতে তিনি মুচ্ছো যান আর কি! যেখানকার ধুলোকে পর্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করে মুখ্যু লোকরা মুঠো-মুঠো তুলে, কপালে ঠেকিয়ে, আঁচলে বেঁধে বাড়ি নিয়ে যায়, সেখানে কিনা পুলিশ পেয়াদা, ধরপাকড়, কর্কশ কণ্ঠে গালাগাল! এসব
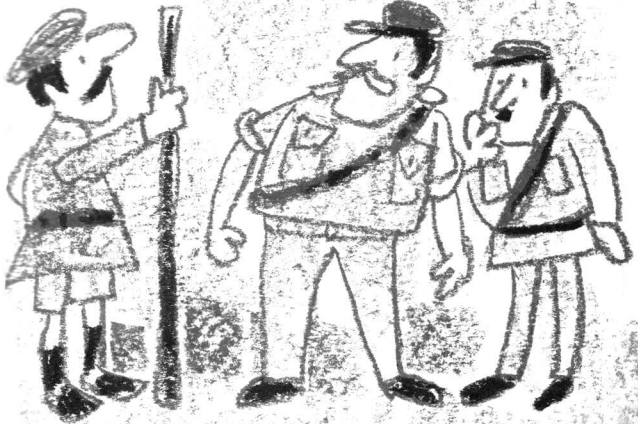
আবার কী ? যেখানে সমস্কিতে অং-বং দেহি-দেহি ছাড়া কিছু কানে আসার কথা নয়, সেখানে ওইসব অকথ্য গালিগালাজ কার মুখে শুনছেন ?

চোখ কচলে চেয়ে দেখেন, চারদিকে পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ ! সাদা পোশাক কনস্টেবল, খাকি পোশাক, বন্দুক ট্যাঁকে বড় অফিসার, লাঠি-সোঁটা, ধমক-ধামক ! এসব কি সত্যি, না দুঃস্বপ্ন ? দু'জন গেরুয়া পরা, খালি গা, ন্যাড়া মাথায় লম্বা টিকি লোকের হাতে হাতকড়া পরানো হচ্ছে। একজন লম্বা, ফরসা, সুন্দরমুখ মানুষ, পরনে তার সাদা থান-ধুতি, গায়ে সাদা চাদর, কপালে একটা চাঁদের মতো কাটা দাগ। তারও হাতে হাতকড়া, মুখে একটু মুচকি হাসি। তাকে দেখেই কেন জানি জগাইদা ভালবেসে ফেললেন। মন্দ লোক দেখলে কেন জানি মনটা তাঁর নরম হয়ে আসে।

তিনি ওই ছায়া-ছায়া জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে এদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলেন। চোর-ছ্যাঁচড়ের ব্যাপার সর্বদা তাঁর মনকে টানে। এগিয়ে এসে বললেন, "কী ব্যাপার ? এদের ধরাবাঁধা হচ্ছে কেন, এই পবিত্র জায়গায় ?"

পুলিশের কর্তা খেঁকিয়ে বললেন, "আরে রেখে দিন মশাই, পবিত্র জায়গা ! এখানে রোজ যত আইনভঙ্গকারী, ঠগ জোচ্চোর বদমাইশের আগমন হয়, তাদের লাইন করে দাঁড় করালে, পৃথিবীটার চারদিকে দু'বার বেড় দিয়ে আসা যায় ! ভয় নেই মশাই, এক্ষুনি এদের আইনমতো বিচার হবে। ভক্তজনের হাড় জুড়োবে।"

জগাইদা বললেন, "নালিশ হবে, ওয়ারান্ট বেরোবে, উকিল লাগবে, কোর্টে যেতে হবে, হিয়ারিং হবে, প্রমাণ হবে, তবে তো জেলে ঢুসবেন।"

অফিসার বললেন, "আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। মন্দিরের আলাদা আদালত আছে। সেখানে বিচার হবে। ভয় নেই, দেশের আইনমতোই বিচার হবে। আপিলও করা যায় ইচ্ছে হলে।"

এইখানে বেঁটে কালো বেটন বগলে যে ছোট অফিসার তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তাঁর কানে-কানে কী যেন বলাতে, বড়সায়েব বললেন, "ও হ্যাঁ, ভাল কথা। একজন সাক্ষী দরকার, এমন কেউ যে চাক্ষুষভাবে সব দেখেছে এবং অকুস্থলে উপস্থিত ছিল। তা এই শেষ রাতে আপনাকে ছাড়া তো কাউকে দেখছি না। আশা করি আপনি খুশি মনেই রাজি হবেন ?"

জগাইদা লাফিয়ে উঠলেন। তিনি তো তাই চান। তারপর 'লোমহর্ষক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা' যা একখানা ঝাড়বেন। অবিশ্যি স্থানকালপাত্র বদলে। গোলমালের মধ্যে জগাইদা নেই। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে দোষ কী ? ঢুলতে-ঢুলতে যা দেখেছিলেন এবং এতক্ষণ যাকে স্বপ্ন বলে ভাবছিলেন—সেটাই তা হলে সত্যি !

কেমন যেন জাদুবলে শরীর-মন থেকে সব ভয়-ভাবনা দূর হয়ে গেল। দেহে একশো পাগলা হাতির বল পেলেন আর মন হয়ে উঠল অকুতোভয়, অর্থাৎ কুছ পরোয়া নেই এবং আই ডোন্ট কেয়ার কানাকড়ি ! তিনি বুক চাপড়ে বললেন, "আলবত রাজি আছি ! সব দেখেছি, সব-শুনেছি। হলপ করতে হবে নাকি ?"

অফিসার ক্লান্ত ভাবে সামনের সিটে বসে পড়ে, হাত-চাপা দিয়ে একটা হাই তুলে বললেন, "কিছু মনে করবেন না ব্রাদার, আপনার ওপরেই সব নির্ভর করছে। ইয়ে আমার বুট জোড়া একটু খুলে রাখলে আপনার আপত্তি নেই তো ? পা ফুলে ঢোল ; রক্ত-চলাচল বন্ধ। সেই কখন থেকে মন্দ লোকদের খোঁজে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছি, সে আর কী

এ হোলো
আপনার
ত্বক যা
আপনি
দেখছেন

সেই
একই
ত্বক যা
ম্যাক্সিমাম
ক্লেনজার
দেখছে

সত্যি বলতে কি ত্বকের লোমকূপের গভীরে ঢুকে থাকা ময়লা বা বাসি মেকআপ সাবান আর জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়না. উল্টে সাবান আপনার ত্বকের দরকারি তেল ধুয়ে ফেলে আপনার ত্বককে শুকনো ও খসখসে করে তোলে।

আসলে আপনার দরকার ল্যাকমের তৈরী ম্যাক্সিমাম ক্লেনজার্স। এগুলি মৃদু অথচ নিশ্চিতরূপে,আপনার ত্বকের লোমকূপের গভীরে ঢুকে থাকা ময়লা আর মেকআপ বের করে দিতে পারে, যে গভীরতায় সাবান কখনও পৌছাতে পারেনা।

ম্যাক্সিমাম ডীপ পোর ক্লেনজীং মিল্ক সাধারণ বা শুষ্ক ত্বকের পক্ষে আদর্শ ক্লেনজার। শুধু পরিষ্কার করাই নয়, এটি আপনার ত্বককে পুষ্টিও জোগায়, যাতে আপনার ত্বক হয়ে ওঠে পরিষ্কার, মোলায়েম ও উজ্জ্বল।

ম্যাক্সিমাম ক্লেনজার ফর অয়েলী স্কিন, তৈলাক্ত ত্বকের অতিরিক্ত তেল আর মৃত কোষের আবরণকেও সরিয়ে দেয়। এর মৃদু, অ্যালকোহল-মুক্ত ফর্মুলা আপনার ত্বককে করে তোলে নির্মল ও ঝরঝরে তরতাজা।
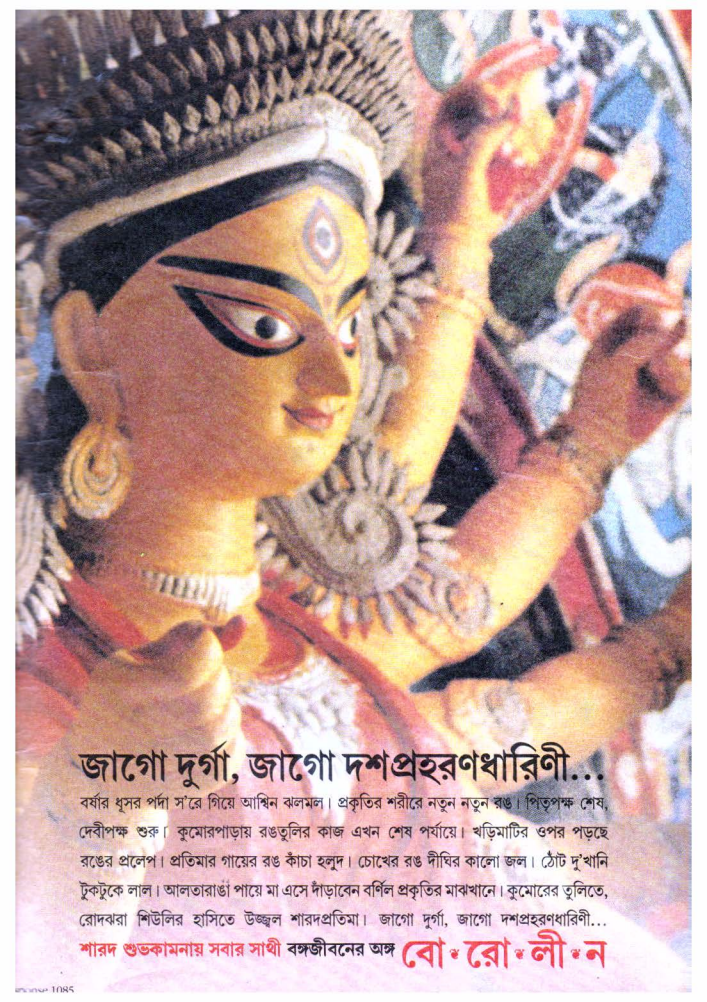
ম্যাক্সিমাম ক্লেনজার্স

MAXIMUM
CLEANSERS

জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী...
বর্ষার ধূসর পর্দা স'রে গিয়ে আশ্বিন ঝলমল। প্রকৃতির শরীরে নতুন নতুন রঙ। পিতৃপক্ষ শেষ, দেবীপক্ষ শুরু। কুমোরপাড়ায় রঙতুলির কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। খড়িমাটির ওপর পড়ছে রঙের প্রলেপ। প্রতিমার গায়ের রঙ কাঁচা হলুদ। চোখের রঙ দীঘির কালো জল। ঠোঁট দু'খানি টুকটুকে লাল। আলতারাঙা পায়ে মা এসে দাঁড়াবেন বর্ণিল প্রকৃতির মাঝখানে। কুমোরের তুলিতে, রোদঝরা শিউলির হাসিতে উজ্জ্বল শারদপ্রতিমা। জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী...
শারদ শুভকামনায় সবার সাথী বঙ্গজীবনের অঙ্গ বো•রো•লী•ন

বলব ! অথচ এরা হয়তো নির্দোষ। আসল অপরাধী এতক্ষণে ভোল বদলে পগার পার—অ্যাঁ, কিছু বললেন ?"

জগাইদা বললেন, "বলিনি এতক্ষণ। আপনি সুযোগ দিলেই বলব। সবার আগে এটুকু আবার বলে রাখি যে, বসে থেকে-থেকে ঢুল এসে যাচ্ছিল, তাই কতটা স্বপ্ন দেখেছি আর কতটা চাক্ষুষ ঘটেছে তা আমি হলপ করে বলতে পারব না। তবু তাদের আমার সামনে হাজির করলে শনাক্ত করবার চেষ্টা করতে পারি।"

অফিসার ততক্ষণে বুটজুতো আর কালো মোজাজোড়া খুলে, চিপকোনো আঙুলগুলোকে কুড়িমুড়ি করে বোধ হয় ঝিঁঝি-ধরাটা সারাবার চেষ্টা করছিলেন। একটু হেসে বললেন, "কী দেখেছিলেন দয়া করে একটু বলবেন কী ? আপনার মতো সদাশয় মানুষকে পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি।"

তাই শুনেই জগাইদা মনে-মনে সিঁটিয়ে উঠলেন। গালিগালাজ, শান দেওয়া কথা, চিবিয়ে-চিবিয়ে প্রশ্ন, এসবের কী করে মোকাবিলা করতে হয়, সেটা তাঁকে অনেকবার ঠেকে শিখতে হয়েছে। তবে হয়তো পায়ে আরাম লাগছে বলে এঁর মেজাজ নরম হয়ে গেছে।

জগাইদা বললেন, "মনে থাকে যেন সবটা আধাঘুমো অবস্থায় দেখা, কেমন যেন আবছা ঘোরেল। শুনুন তবে।

"আমি যেন দেখলাম একজন খুব দয়ালু লোক একটা পেতলের বড় হাঁড়ার মুখ খুলে তার মধ্যে থেকে সোনা-রুপোর টাকাকড়ি, গয়নাগাটি দু' হাতে বের করছেন আর একটা ছিচকেপানা চেহারার লোককে দান করছেন, আর সে-লোকটা মুচকি হেসে তাঁর পায়ে মাথা ঠুকছে। দেখে আমারও মনের মধ্যিখানে কেমন আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। মনে হতে লাগল আমিও ওইরকম মাথা ঠুকি।"

কাষ্ঠ হেসে অফিসার বললেন, "তা হলে আপনিও কিছুমিছু পাবেন, এইরকম একটা আশা ছিল না কি ?"

জগাইদা চটে গেলেন। "দেখুন, মশকরা করতে আমি আসিনি। ভাবলাম আমার সাহায্যে যদি একজন দাগি চোরের হাত থেকে মন্দিরের সম্পত্তি রক্ষা পায়, তা হলে আমার জীবন সার্থক হয়।"

অফিসার খুশি হয়ে বললেন, "ঠিক তাই। নইলে কি আর মিছিমিছি আমাদের এত-এত মাইনে দেয় যে, লোকের চোখ টাটায় আর তারা বানিয়ে-বানিয়ে পাঁচ

কথা বলে। স্রেফ হিংসে, তা ছাড়া কী ?

"সে যাই হোক, আপাতত চোর বাছাধনের দলবল নিয়ে কেউ দেবতা, কেউ ভক্ত সেজে হাত সাফাই করা বন্ধ করে দেওয়া যাক। আমার লোকজন তাদের নিয়ে অপেক্ষা করছে। চেহারা দেখে ঘাবড়াবেন না যেন। ওইসব শখের যাত্রাদলে এর চাইতেও ভাল-ভাল ভগবানের চেহারা দেখা যায়। চলুন, জানেন তো মন্দিরের নিজস্ব বিশেষ আদালত আছে। সেখানে সত্যিকার উকিল ব্যারিস্টার শুনানি নিয়ে থাকেন। আপনার কোনও ভয় নেই। আপনি নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে যেমন-যেমন দেখেছেন, বলে যাবেন।"

ওই হলঘরটার লাগোয়া উঠোনে একটা বড় অ্যাসেটেলিন বাতি জ্বলছিল। তখনও ওসব জায়গায় বিজলি পৌঁছয়নি। ওইখানে একটা চাতালে বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়েছে দেখা গেল। তারই পেছনে মন্দিরের প্রবেশদ্বার।

একসারি ফরসা লোক দু' হাত একসঙ্গে করে দড়ি বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গে লাঠিসোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের লোক। অফিসার বললেন, "এদের চিনতে পারছেন ?"

জগাইদা মাথা নেড়ে বললেন, "না তো। একবার মাত্র দেখেছি, একটু আগে। তাও আধো অন্ধকারে। ওই দাড়িওলা মানুষটি কী সব বকাবকি করছিলেন আর ওই হাঁড়িটা থেকে ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে কী যেন বের করে ওই কালা মানিক দু'জনের কোঁচড় ভরে দিচ্ছিলেন। অতটা দূর থেকে ঘুমচোখে তার বেশি মালুম দেয়নি। ওই সময় লাঠিসোঁটা নিয়ে আপনার লোকরা হাজির। আবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ কেন ?"

অফিসার হাসলেন। "আপনি তো যেচে সাক্ষী দিলেন। একজন নিরপেক্ষ বাইরের লোকের সাক্ষী পাওয়া গেল। এবার কেস ঠুসে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। বাবা! এক মাস ধরে আমার লোকরা ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। চোর ধরা কি চাট্টিখানিক কথা ! জামাই-আপ্যায়নের বাবা ! সাক্ষী রে, ওয়ারান্ট রে ! এই ব্যাপারটা নাকি প্রায়ই হয়। অ্যাদ্দিন বাদে হাতেনাতে ধরা গেল। আপনার জবানিতে লেখা হল। এবার আমাদের অতিথিশালায় আরাম করবেন বিনা খরচে। সকালে আমাদের আদালতে কেস হবে। সাক্ষীসাবুদ সব জোগাড় হয়ে গেল। দুপুরের আগে ব্যাপারটা চুকেবুকে যাবে। তখন আপনি আরাম করে পুজো দেবেন। ক্লাস-ওয়ান প্রসাদ পাবেন মন্দির কমিটির সম্মানিত

অতিথি হয়ে। তার আগে আমাদের লোকজনরা কেসটা গুছিয়ে রাখবে।"

জগাইদা বলেন ওর বর্তমান সাফল্যের একমাত্র কারণই হল যে, কখন চুপ করে থাকতে হয় আর কখন মুখ খুলতে হয়, তা তিনি খুব ভাল করেই জানেন। এই গুণটি থাকার দরুনই তিনি এখন সাফল্যের শৈলশিখরে বসে একরকম পা দোলাচ্ছেন। অর্থাৎ উপযুক্ত বয়সে মোটা গ্র্যাচুইটি সহকারে অবসর নিয়ে, নিজের নানা অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার গল্প করে আমাদের মনোরঞ্জন আর নিজের কালযাপন করছেন। খবুরে-কাগুজে লোকদের ব্যাপারই আলাদা। সে যাই হোক, আয়েস করে স্নান-বিশ্রাম ইত্যাদি সেরে যথাসময়ে একজন আরদালির সঙ্গে মন্দিরের ছোট আদালতে সবাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভারিক্কে চেহারার জজ কালো পোশাক আর মাথায় সাদা পরচুলা পরে উঁচু আসনে গম্ভীর মুখে বসে আছেন। তাঁর ভাবসাব দেখে সেই কাক্কেশ্বর কুচকুচের গল্পটা মনে পড়াতে, জগাইদার বেজায় হাসি পেল। তাই তাঁকে কী যেন বলা হল ভাল করে শুনতে না পেলেও, যা-যা দেখেছিলেন তার হুবহু বর্ণনা দিলেন।

দু'জন কেরানি-প্যাটার্নের লোক বোধ হয় সব কথা টুকে রাখছিল। আশা করা যায় বানানটানান ঠিক হচ্ছিল। টেপ করার যুগ আসেনি।

তারপর মন্দির পক্ষের উকিলমশাই অপরাধের একটা বিস্তারিত বিবৃতি দিলেন। তাঁর সামনের দুটো দাঁত অনুপস্থিত থাকাতে, ফক-ফক করে অনেক কথা বেরিয়ে যাচ্ছিল, তবু যা বললেন তার থেকে মনে হল একদল দুষ্কৃতী নানা সময়ে নানা মন্দিরে নানা ছদ্মবেশ ধরে, নানা ভাবে ধাপ্পা দিয়ে, যা পারে হাতিয়ে নিয়ে, কোনও ক্লু না রেখে, বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়।

পুলিশ বলে কথা! ডালকুত্তার মতো আমাদের গুপ্তচররা ওদের পেছনে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়িয়েছে। দুঃখের বিষয় হাতেনাতে এর আর কোনও প্রমাণ পায়নি, বা সত্যি কথা বলতে কি, কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর দেখা পায়নি। আপনিই প্রথম এবং সেই যথেষ্ট। এবার আসামিদের হাজির করা হোক।

তারপর যা হল, উফ, তারই বর্ণনা লিখে জগাইদার কেল্লা ফতে করে দিতে পারবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে-কথা পরে হবে। আপাতত আসামিদের পাঁচজনকে দড়িবাঁধা অবস্থায় আদালতে উপস্থিত করা হল। তাদের সাজপোশাক দেখে কারও মনে কোনও সন্দেহ রইল না যে, এরা সত্যি যাত্রা পার্টির লোক, নয়তো সেইরকমই সেজে এসেছে।

গোড়ার লোকটি ফরসা লম্বা চুলে রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো, বেশ সুন্দর দেখতে আর চোর হোক যাই হোক, জগাইদার ভারী মনে ধরে গেল। নাম জিজ্ঞেস করতে সে বলল, "আমাকে নানা লোকে নানা নামে ডাকে—।"

"তা তো ডাকবেই, নইলে খাতায় সে-নামটা উঠে যাবে যে। আসল নামটা কী শুনি, বন্ধুরা কী বলে?"

হেসে বললে, "শ্রীহরি!"

উকিল চটে গেলেন, "ও আবার নাম হল নাকি?"

জজ বললেন, "তা হবে না কেন? শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় বলে একজন লেখক আছেন, আমি শুনেছি।"

আসামি বলল, "নয় তো ডাকনাম ভগবানও লিখতে পারো।"

সকলে ভারী বিরক্ত, কিন্তু আদালতের সময় নষ্ট করতে কেউ চান না বলে ১ নং কে ছেড়ে, বেঁটেখাটো খেমো চেহারার দুই শাগরেদ, তাদের নাম বলল নন্দী আর ভৃঙ্গি। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তারপরের ছেঁড়া কাপড় পরা লোকটি নাকি ওদের উকিল। মানে, যাত্রায় বোধ হয় উকিল সাজে।

সবাই যখন শুনানি নিয়ে ব্যস্ত, ৫নং আসামি কেমন করে কে জানে, দড়ি আলগা করে ভেগেছে! দরজার পাহারাকে বলে গেছে নাকি রথের ঘোড়াদের দানাপানি দিতে হবে। একটু পরেই ফিরবে।

জজ বললেন, "এমন আজব মামলা জন্মে শুনিনি। আসামি পক্ষের উকিলের কিছু বলার আছে কি? তবে আমি এ-কথা মনে করিয়ে দিতে বাধ্য শ্রীভগবান ও তাঁর অনুচররা এত বেআইনি কাজ করেন কেন?"

আসামির উকিল বললেন, "শ্রীভগবান ও তাঁর অনুচররা স্বর্গবাসী পৃথিবীর তুচ্ছতর নিয়মের ঊর্ধ্বে। সেসব তাঁরা মানেন না।"

সরকারি উকিলও বললেন, "তা, তিনি যদি খাট পালঙ্কে সজ্জিত মন্দিরে বাস করতে পারেন আর চারবেলা নানারকম সুখাদ্য সাঁটাতে পারেন, তা হলে তাঁরা পৃথিবীর নিয়ম ভাঙলে কাঠগড়াতেই বা দাঁড়াবেন না কেন? দানের কলসির মুখ যে ভাঙা সেটা তো ঠিক? শ্রী ভগবান যে ধনরত্ন বের করে চ্যালাদের কাছে পাচার করেছেন, সেটাও নিশ্চয় তাদের সার্চ করলেই প্রমাণ হবে।"

জজ হুকুম দিলেন, "হাঁড়িটা আনা হোক, তল্লাশিটাও হয়ে যাক। তেজ সিং!"

তেজ সিং অস্ত্রধারী পুলিশ। সে বললে, "আজ্ঞে হুজুর, এই দেখুন হাঁড়ির মুখে কাটার কোনও চিহ্ন নেই আর ওঁদের তো বডি সার্চ অনেকবার করেছি। বলেন তো···"

জজ বললেন,"থাক! এরা সবাই হয় যাত্রাদলের কিংবা পাগলা গারদের বাসিন্দা, সন্দেহ নেই। আমি এদের বেকসুর খালাস করে দিলাম। পাগলা গারদের পাহারাদাররা ডিউটিতে ঘুমোয় কি না সেটা দেখা আমার কাজ নয়। কোর্ট ডিসমিস!" এই বলে উঠে পড়ে, একগাল হেসে জগাইদাকে বললেন, "চলুন, মিছামিছি অনেক কষ্ট দিলাম। এরা খুব ভাল নিরামিষ লাঞ্চ দেয়। আরে ও কী!"

চার ঘোড়ায়-টানা একটা রথ নিঃশব্দে এসে খোলা প্রাঙ্গণে থামল। আসামিদের দড়িদড়া খুলেই দেওয়া হয়েছিল। তারা সকলে নিমেষের মধ্যে রথে উঠে পড়ল।

সবার শেষে শ্রীভগবান বলে লোকটি জগাইদার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তোমার রূপকথাটিতে লিখো যে, মিছিমিছি মানুষ চোর-ছ্যাচড় হয় না। হাঁড়িতে পুঁজি না করে, ধনরত্নগুলো গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিলে অনেক বেশি পুণ্যি হয়।"

এই বলেই তিনি রথে উঠে পড়লেন। মন্দিরের চুড়োর পাশ দিয়ে এক ঝলক আলো এসে রথের ওপর পড়ল। তারপরেই রথসুদ্ধ সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। জগাইদার কাছে এই আশ্চর্য ব্যাপারের কথা শুনে বাড়ির সকলেই ক্যাঁওম্যাও করে উঠল, "ইস! শ্রীভগবানকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও আমাদের নালিশগুলোর কিচ্ছু শোনালে না? তুমি কী"?

জগাইদা বললেন, "কী করি, ব্যাপার দেখে থুতনিটা ঝুলে পড়েছিল। সেটাকে যথাস্থানে টেনে তুলবার আগেই সব ভোঁ-ভোঁ! কী আর করি? দুপুরে আচ্ছা করে সাঁটিয়ে ট্রেন ধরলাম।"

"ওমা, ঠাকুর দেখে এলে না?"

"আবার কী ঠাকুর দেখব? ওই জ্যান্ত ঠাকুর দেখার পর? তোরা কী রে!"

ছবি : দেবাশিস দেব

সম্পূর্ণ উপন্যাস

সেই অদৃশ্য লোকটি

বিমল কর

বর্ষার পালা শেষ হয়ে আশ্বিন পড়েছিল। বৃষ্টি তবু বিদায় নেয়নি। মাঝে-মাঝেই এক-আধ পশলা জোর বৃষ্টি হচ্ছিল।

তারাপদ পর-পর দু' দিন আটকে পড়ল বৃষ্টিতে। একেবারে বিকেলের শেষে এমন ঝমাঝম বৃষ্টি নেমে গেল দু' দিনই যে, সে আর কিকিরার কাছে আসতেই পারল না।

আজ কোথাও কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। অফিস থেকে সোজা কিকিরার বাড়ি এসে হাজির তারাপদ।

এসে যা দেখল তাতে চমৎকৃত হল।

কিকিরা যথারীতি তাঁর বসার ঘরেই ছিলেন। এই ঘরটিকে তারাপদরা বলে জাদুঘর। এখানে না আছে কী! দেওয়াল জুড়ে নানান জিনিস, মাটিতেও পা রাখার জায়গা নেই।

নিজের সেই সিংহাসন-মার্কা চেয়ারে কিকিরা বসে ছিলেন। সামনে এক মোড়া। মোড়ার ওপর তুলোর গদি। গদির ওপর কিকিরার বাঁ পা। পায়ের সঙ্গে দড়ির ফাঁস। অবশ্য কিকিরার বাঁ পায়ের পাতা থেকে গোড়ালির অনেকটা ওপর পর্যন্ত মোটা করে ক্রেপ ব্যান্ডেজ জড়ানো। দড়ির ফাঁসটা গোড়ালির ওপর দিকে বাঁধা। আলগা করে। সেই দড়ি এক বিচিত্র কায়দায় মাথার ওপর ঝোলানো চাকার মধ্যে গলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গলিয়ে দড়ির অন্য প্রান্তটা ঝুলিয়ে একেবারে কিকিরার বাঁ হাতের সামনে। মানে,

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

কিকিরা যখন দড়ি টানছেন, তাঁর বাঁ পা উঠে যাচ্ছে, যখন দড়ি আলগা করছেন, পা এসে মোড়ার ওপর পড়ছে।

কিকিরার ডান হাতে তাঁর পছন্দের চুরুট। দেখতে আঙুলের মতন সরু-সরু। চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধটা কিন্তু বিশ্রী।

তারাপদ যেন কতই বিমোহিত—বাহবা দিয়ে বলল, "দারুণ সার। এ-জিনিস আপনিই পারেন।"

কিকিরা সাদামাটা গলায় বললেন, "পুলি-সিস্টেম।"

"পাঙ্খা-কুলি সিস্টেম!"

"পাঙ্খা-কুলি দেখেছ?"

"চোখে দেখিনি, ছবিতে দেখেছি। ইলেকট্রিসিটির যুগে পাঙ্খা-কুলি আর কোথায় দেখতে পাব!"

"জ্ঞানের রাজা! ইলেকট্রিসিটির যুগ! এ-দেশে এখনও কেরাসিন তেলের যুগ চলছে। যাও না একবার ভেতর দিকের গাঁ-গ্রামে।"

"ভুল হয়েছে সার।" তারাপদ যেন চট করে অপরাধ স্বীকার করে নিল।

"বাঁশবেড়ের হিরুবাবুর নাম শুনেছ? মস্ত বড় শিকারি। এক সময় হাতি ধরে বেড়াতেন। বিরাট ওস্তাদ। হিরুবাবুর কথা হল, ইলেকট্রিক মানেই সর্বনাশ। ওতে চোখ খারাপ হয়, মাথা নষ্ট হয়।"

"তাই নাকি?"

"হিরুবাবু বলেন, রেড়ির তেলের যুগটাই ছিল বেস্ট। রেড়ির যুগ গিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মতন মানুষও গিয়েছেন।"

তারাপদ হাসতে-হাসতে প্রায় মাটিতেই বসে পড়ে আর কি!

কিকিরা হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বার দুই পায়ের দড়ি টানাটানির খেলা খেলে নিলেন।

হাসি থামলে তারাপদ বলল, "সার, আপনার লেগ কেমন?"

"পুল করতে পারছি। চাঁদু ডাক্তার কী বলে হে?"

"তিন হপ্তা নড়াচড়া চলবে না। মানে বাইরে বেরোতে পারবেন না।"

"তি-ন হপ্তা! আজ তো মাত্র দশ দিন হল তারাপদ, আরও দশ-বারো দিন! আমি পারব না।"

"পারব না বললে চলবে কেন, সার! কে আপনাকে খানা-খন্দে পা গলাতে বলেছিল! গোড়ালির হাড় ভাঙেনি—এই যথেষ্ট। পা মচকানোর ব্যথা সারতে সময় লাগে!"

"চাঁদু জ্বরজ্বালা, আমাশার ডাক্তার, হাড়গোড়ের সে কী বোঝে?"

তারাপদ রগড় করে বলল, "বলব চাঁদুকে। বলব, তুই বোগাস! কিস্যু জানিস না।"

কিকিরা একটু হেসে কথা পালটে বললেন, "বোসো। চা-টা খাও।" বলে চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন। ধোঁয়া আসছিল না। জোরে-জোরে টান মেরে ধোঁয়া বের করলেন।

তারাপদ বসে পড়েছে ততক্ষণে। মুখ মুছে নিচ্ছিল রুমালে।

কিকিরা নিজেই বললেন, "চাঁদুকে কাল-পরশু একবার পাঠিয়ে দিয়ো।… আমি তিরিশ হাজার টাকা লোকসান দিতে পারব না।"

খেয়াল করে কথাটা শোনেনি তারাপদ, তবে কানে গিয়েছিল। টাকার অঙ্কটা মাথায় ঢোকেনি। সে কিকিরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

"থারটি থাউজেন্ড ইজ এনাফ।" কিকিরা আবার বললেন।

তারাপদ বোকার মতন বলল, "তি-রি-শ হাজার!"

"এখন তিরিশ, পরে হাজার পঞ্চাশও হতে পারে।"

তারাপদ এবার যেন ধাতে এল। রসিকতা করে বলল, "আপনার লেগ-প্রাইস… ? মানে ইনসিওরেন্সের কোনও কমপেনসেসান…"

"দুঃ।" কিকিরা অদ্ভুতভাবে 'দুঃ' বললেন।

"লটারি পাচ্ছেন!"

"নো।"

"তা হলে ব্যাপারটা কী? তিরিশ হাজারের সঙ্গে আপনার পা মচকানোর সম্পর্কটা কোথায়?"

কিকিরা বললেন, "কাগজ-টাগজ পড়া হয় মশাইয়ের?"

"হয়। তবে 'পড়া না-বলে চোখ বুলনো বলতে পারেন। কাগজে পাঠ্য বলতে তো মন্ত্রী-সংবাদ…!"

"বুঝেছি। তা একবার ওখানে যাও। ওই যে দেওয়ালে ঝোলানো বাস্কেট দেখছ, ওর মধ্যে তিনটে কাগজ আছে। নিয়ে এসো।"

তারাপদ উঠল।

কিকিরার এই ঘরে না আছে কী? চোর-বাজারের দোকানও এমন বিচিত্র নয়। চন্দন কি সাধে বলে, ওল্ড কিউরিয়োসিটি শপ! সেকেলে গ্রামোফোন, পাদরিটুপি, দেওয়াল ঘড়ি, পায়রা-ওড়ানো বাক্স, ম্যাজিক পিস্তল, কালো আলখাল্লা, পুতুল, ভাঙা বেহালা, তরোয়াল, কাচের মস্ত বড় বল, আরও কত কী!

দেওয়ালে এক মাদুর-কাঠির সরু টুকরি আটকানো ছিল। তারাপদ কাগজ নিয়ে ফিরে এল।

কিকিরা বললেন, "লাল পেনসিলে দাগ দেওয়া আছে। দ্যাখো।"

তারাপদ খবরের কাগজগুলো দেখল। তিন দিনের কাগজ। তারিখ আলাদা। দু'-তিন দিন বাদ-বাদ তারিখ। কাগজ একই।

লাল পেন্সিলের দাগ-দেওয়া জায়গাটা বের করে নিল সে।

"এটা কী, সার ?"

"পড়ো।"

"মনে-মনে, না, জোরে-জোরে ?"

"জোরে-জোরে।"

তারাপদ পড়তে লাগল : "আমি লোচন দত্ত, পুরা নাম ত্রিলোচন দত্ত, সাতাশের এক, যদু বড়াল লেন, কলকাতা বারোর নিবাসী, এই মর্মে জানাইতেছি যে—জনৈক প্রতারক আমার ছোট ভাই মোহন দত্ত সাজিয়া নানা জনের সঙ্গে প্রতারণা করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাইতেছি। আমার ভাই মোহন দত্ত উনিশশো পঁচাশি সালে একুশে অগস্ট মারা গিয়াছে। আমার অন্য কোনও ভাই নাই। আমাদের উক্ত নম্বরের বসতবাটী এবং দত্ত অ্যান্ড সন্স-এর একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি ও আমার দুই নাবালক পুত্র—বিশ্বনাথ ও যোগনাথ। মোহন দত্ত আর জীবিত নাই। ওই নামে কেহ যদি কোথাও আমাদের তরফ হইতে ব্যক্তিগত, ব্যবসায়গত ও সম্পত্তিগত কোনও কাজ-কারবার করেন, আমরা তাহার জন্য দায়ী থাকিব না। উপরন্তু কেহ যদি প্রতারক মোহন দত্ত নামের মানুষটির বিস্তারিত খবরাখবর দেন ও তাহাকে ধরাইয়া দেন—আমাদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে প্রতিশ্রুতি দিতেছি। যোগাযোগের ঠিকানা : সাতাশের এক, যদু বড়াল লেন, কলকাতা বারো। সময় : সকাল আটটা হইতে বেলা দশটা।"

তারাপদ পড়া শেষ করেও যেন ভাল বুঝল না। মনে-মনে আবার পড়ে নিচ্ছিল।

শেষে তারাপদ বলল, "বাব্বা! বিরাট নোটিস। লিগ্যাল নোটিস নাকি ?"

কিকিরা বললেন, "লিগ্যাল নোটিস নয় বলেই মনে হচ্ছে। বয়ানটা উকিলের মতন। ব্যক্তিগত বিজ্ঞপ্তি ওটা।"

"সব দিনেই কি একই বয়ান ? মানে তিন দিনের কাগজে ?"

"হ্যাঁ।"

"শুধু বাংলা কাগজেই ?"

"ইংরিজি আমি দেখিনি। মনে হয়, অন্য বাংলা কাগজ আর ইংরিজি কাগজেও আছে। কোন কাগজ কার চোখে পড়বে—বলা তো যায় না।"

তারাপদ বলল, "তবে এই আপনার ত্রিশ হাজার ?"

"ইয়েস সার।"

"আপনি স্বপ্ন দেখছেন কিকিরা। টাকা অত শস্তা নয়।"

কিকিরা বললেন, "নো সার, আমি ড্রিমিং করছি না। ড্রিলিং করছি। মানে রহস্যটা বোঝার জন্যে জমি খুঁড়ছি। তুমি ঠিক বলেছ, টাকা অত শস্তা নয়। নয় বলেই তো ব্যাপারটা কঠিন। তুমি কি ভাবছ, লোচন দত্ত টাকার হরিলুঠ দেওয়ার জন্যে কেঁদে মরছে !"

"আমি কিছুই ভাবছি না। শুধু দেখছি, লোচন দত্ত এক আহাম্মক আর আপনিও পাগল !"

এমন সময় বগলা এল। চা আর হিঙের কচুরি, কুমড়ো-আলুর ছক্কা এনেছে।

অফিস থেকে ফিরছে তারাপদ। খিদে পেয়েছিল জোর। কচুরির ডিশটা তাড়াতাড়ি টেনে নিল। চলে গেল বগলা।

কিকিরা বললেন, "ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢোকেনি ?"

"একেবারেই নয়।"

"একটা মরা লোক চার-পাঁচ বছর পরে ফিরে আসে কেমন করে ?"

"আসে না। মরা লোকের ভূত আসতে পারে।"

"তা ছাড়া—ওই লেখাটা পড়ে বোঝা যাচ্ছে, কোনও জাল মোহন দত্ত নানান ধান্দা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধান্দা বৈষয়িক হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে।"

তারাপদ মাথা নাড়ল। মোহন দত্ত সম্পর্কে তার খুব যে একটা আগ্রহ রয়েছে—মনে হল না।

চা খেতে-খেতে কিকিরা বললেন, "একটা জিনিস নজর করেছ ?"

"কী ?"

"লোচন দত্ত এমনভাবে লিখেছে যেন সে এই মোহন দত্তকে—মানে প্রতারক জালিয়াত মোহনকে চোখে দেখেনি এখন পর্যন্ত, শুধু তার কথা শুনেছে।"

তারাপদ কচুরি খেতে-খেতে জড়ানো জিভে বলল, "হতেই পারে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে কিকিরা ! আমার নাম করেই অন্য একটা লোক যদি মানুষ ঠকিয়ে বেড়ায়—বেড়াতেই পারে—তাকে আমি চোখে না দেখতেও পারি। অন্য কেউ এসে আমায় বলতে পারে কথাটা…।"

কিকিরা বললেন, "তোমার কথা হচ্ছে না, হচ্ছে লোচন দত্ত আর মোহন দত্তের কথা। তুমি ভুলে যেয়ো না, মরা মানুষ আবার জ্যান্ত হয়ে ফিরে এসে লোক ঠকিয়ে বেড়াবে—এটা খুব ইজি কাজ নয়। কথা হল, কাদের ঠকাচ্ছে ? যাদের ঠকাচ্ছে তারা যদি লোচনদের জানাশোনা লোক হয়—তবে সেই বোকা, বুদ্ধুগুলো কি জানে না যে, মোহন অনেক আগেই মারা গিয়েছে ?"

তারাপদ বলল, "হয়তো লোচনের অপরিচিতদের ঠকাচ্ছে !"

"যুক্তি হিসাবে সেটাই হতে পারে। কিন্তু কথা হল, কেন ঠকাবে ? যে-লোক অন্যকে ঠকাচ্ছে—তার উদ্দেশ্য কী ? যে ঠকছে তারই বা কী দায় পড়েছে ঠকার ! ধরো, রামবাবু বলে একটা লোককে জাল মোহন ঠকাবার চেষ্টা করছে। কেন করছে ? আর রামবাবু কি এতই বোকা যে, ঠকবার আগে একবার লোচনদের খোঁজ-খবর করবে না ? বাড়ি, সম্পত্তি, দোকান-সংক্রান্ত যদি কিছু হয়—তবে এইসব জিনিস এমনই যে, লোকে এই ধরনের জিনিসের সঙ্গে কোনও কারবার করতে হলে ভাল করে খোঁজ-খবর নেয়। খোঁজ নিলেই মোহন ধরা পড়ে যাবে।"

"তাই তো যাচ্ছে।"

"যাচ্ছে কি না আমি জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। তিরিশ হাজার টাকা পুরস্কার কেউ এমনি-এমনি দেয় না। জাল লোক ধরতে নয়। তার জন্যে থানা-পুলিশ আছে। লোচন থানায় ডায়েরি করিয়েছে ? কেন সে কাগজে সরাসরি লিগ্যাল নোটিস না দিয়ে এইরকম একটা ব্যক্তিগত বিজ্ঞপ্তি ছাপল !"

চা খাওয়া শুরু করেছিল তারাপদ। বলল, "আপনিই বলুন, কেন ?"

কিকিরা বললেন, "আমি ভেবে দেখেছি, দুটো কারণে হতে পারে। প্রথম কারণ, বড়াল লেনের লোচনবাবুটি মোহনচাঁদকে ধরতে চাইছে। নিজেই সে জানিয়েছে, জালিয়াত মোহনকে ধরে দিতে হবে। দ্বিতীয় কারণ, মোহন লোকটাকে সে ভয় পাচ্ছে।"

"জাল মানুষকে ভয় ?"

"যদি জাল না হয়।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "কী বলছেন আপনি ! লোচন সাল-সময় দিয়ে তার ভাইয়ের মরার খবর জানাচ্ছে, তবু বলছেন এ জাল মোহন নয় !"

কিকিরা চা খেতে-খেতে স্বাভাবিক গলায় বললেন, "তুমি জাল প্রতাপচাঁদ, ভাওয়াল মামলা—এসব শুনেছ ? নিশ্চয় শোনোনি। শুনলে এত অবাক হতে না। দীনরাম মামলার কথাও শোনোনি। বম্বের মামলা। দীনরামকে পাক্কা আট বছর মামলা লড়তে হয়েছিল, সে আসল দীনরাম প্রমাণ করতে।"

"সার, ভাওয়াল মামলার কথা আমি শুনেছি। সে তো সাঙ্ঘাতিক ষড়যন্ত্র ছিল।"

মার্সিডিজ-এ পরিবর্তনের এটাই সময়

ঈগল। সেই কোম্পানী যা ভারতবর্ষে ক্যাসেরোলের চিন্তা প্রথম এনেছিল। এরাই
এবার আপনাদের দিচ্ছে মার্সিডিজ, যাতে আছে চরম উৎকর্ষের ছোঁয়া।
মার্সিডিজ। এমনকী জার্মানিরাও এতে গর্বিত হবেন।

মার্সিডিজের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আকারে পাচ্ছেন মনোরম রঙ ও অনুপম নক
বাহার। আপনার পছন্দের জন্য আছে তিনটি সাইজ, যাদেরকে একের ওপর এক
থাকথাক সাজিয়েও রাখা যায়।

মার্সিডিজের ট্রিপল লকিং ঢাকনা খুলুন, দেখতে পাবেন বিচ্ছেদযো
দুটি স্টেনলেস স্টীলের ইনার, যাতে দুরকমের ডিশ ঘণ্টার প
ঘণ্টা হাতেগরম থাকে। কারণ হ'ল মার্সিডিজের পেটেন্ট ক
অপরিবাহী পলিইনসুলাক্স®। এই ইনারগুলো
সাফসাফাই রাখাও খুব সহজ।
মার্সিডিজ — ঈগলের উপহার। তাপের
অপরিবাহিতার জগতে ৩৩ বছরেরও বেশী
অভিজ্ঞতার বিশ্বস্ত নাম এবং সারা বিশ্বের ৬৪টি
দেশের কোটি কোটি পরিতৃপ্ত ক্রেতাদের যা প্রত্যা
ঠিক তাই।

ঈগল এস্টেট, তালেগাঁও ৪১০ ৫০৭, জিলা পুনে, মহারাস্ট্র। ঈগল আপনার অনেক কাজে আসবে।

কিকিরা বললেন, "লোচনও যে সাঙ্ঘাতিক ষড়যন্ত্র করেনি তুমি কেমন করে বুঝলে ?"

তারাপদ চা খেতে শুরু করেছিল, বলল, "লোচনের কাছে নিশ্চয় ডেথ সার্টিফিকেটের প্রমাণ আছে··· ।"

"প্রমাণ থাকতে পারে, নাও পারে। আর ডেথ সার্টিফিকেট ? টাকায় কী না হয়। তা ছাড়া, ছোটখাটো কোনও জায়গায় অজ গাঁ-গ্রামে মারা গেলে ডেথ সার্টিফিকেট বড় একটা থাকে না। থানায় জানিয়ে দিলেই হয়। তা ছাড়া, কোথায় কখন কী অবস্থায় মোহন মারা গিয়েছে না জানলে কোনও কিছুই বলা যায় না। ধরো, ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে দশ-বিশটা লোক মারা গেল। তার মধ্যে অনেকের যা হাল হল—মাংসের খানিকটা তাল—মাথা নেই, হাত নেই, পা নেই—কোনওরকমেই ট্রেস করা গেল না তারা কারা। তাদেরই পুড়িয়ে ফেলা হল। শনাক্তকরণই তো হল না। কী করে তুমি তাদের যথার্থ সার্টিফিকেট পাবে ! কে দেবে ! থানাতেই বা কী লেখা থাকবে ?"

তারাপদ এসব কিছু জানে না। চুপ করে থাকল।

কিকিরা বললেন, "মোহনের মতন ঘটনা এ-দেশে কখনও-সখনও ঘটে। আমরা তার খবর পাই না। মানে, আমি বলছি—মারা গেছে বলে সবাই যাকে জানে, সেই মরা লোক আবার ফিরে এসেছে।"

তারাপদ এবার খানিকটা কৌতূহল বোধ করল। বলল, "আপনি বলতে চাইছেন, মোহন মারা যায়নি ?"

"না, না, এত তাড়াতাড়ি তা কেমন করে বলা যাবে ?"

"তা হলে বলা যাক, মোহন মারা না যেতেও পারে !"

"হতে পারে।"

"এখন তবে কী করতে চান ?"

"মোহন অনুসন্ধান।··· লোচন দত্তর সঙ্গে আমাদের দেখা করতে হবে। ওই যে লিখেছে, যোগাযোগ—সেই যোগাযোগটা করতে হবে আগে। দেখতে হবে লোচন কার-কার কাছ থেকে জেনেছে যে, এক জাল মোহন তাদের সঙ্গে দেখা করেছে। দেখা করলেও কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ? লোচন নিজে মোহনকে কোথাও' আচমকা দেখেছে কি না ? বা মোহনই কোনওভাবে লোচনকে নিজেই জানিয়েছে কি না যে, সে হাজির হয়েছে। লোচন এর মধ্যে থানা-পুলিশ করেছে, কি করেনি !" চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন কিকিরা। হাতের পাশেই এক গোল টেবিল। পুরনো টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে টুকটাক অনেক কিছুই পড়ে আছে টেবিলে।

তারাপদ পেট ভরে কচুরি খেয়েছিল। চা খেতে-খেতে ঢেকুর তুলল। বলল, "আপনি এখন লোচনের সঙ্গে দেখা করতে চান ?"

"ইয়েস সার।"

"কেমন করে ?"

"লেম ম্যান, লিম্পিং-লিম্পিং করে···· ।"

তারাপদ হেসে ফেলল, "খোঁড়া মানুষ খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ?"

"উপায় কী ?"

"চাঁদু শুনলে রাগ করবে সার।"

"চাঁদু ক্যান ওয়েট, তিরিশ হাজার যদি ওয়েট না করে ? কে জানছে এরই মধ্যে কত লোক লোচনের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে ! টাকার লোভ বড় লোভ।"

"লোচন কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভও তো লাগাতে পারে। কলকাতায় এখন ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিস হয়েছে।"

"আমরাও তো এজেন্সি খুলেছি : কে·টি·সি—কিকিরা, তারাপদ, চন্দন। হেড অফিস আমার বাড়ি।"

তারাপদ হাসতে-হাসতে বলল, "সার, আমি কেটিসি-র নাম দিয়েছি কুটুস। দয়া করে একটা প্যাড ছাপিয়ে নিন এবার, আর শ' খানেক ভিজিটিং কার্ড।" বলে তারাপদ চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। সিগারেটের প্যাকেট হাতড়াতে লাগল পকেটে।

কিকিরা বললেন, "হবে। শনৈঃ শনৈঃ। ধৈর্যং ধরতি বালকঃ।··· এবার কাজের কথা বলি।"

"বলুন", তারাপদ সিগারেট ধরিয়ে নিল।

"আমি এর মধ্যে বাড়িতে বসে-বসে দু-একটা গোড়ার কাজ সেরে রেখেছি।"

"বাঃ ! ফা-স্-ট কেলাস।"

"গলিটার খোঁজ নিতে বগলাকে পাঠিয়ে দিলাম। আমার কাছে কলকাতা কর্পোরেশনের স্ট্রিট ডাইরেক্টরি আছে।"

"গলিটা কোথায় ?"

"বউবাজার থানার মধ্যে।"

"কেমন গলি ?"

"পুরনো শহরের পুরনো গলি। লোচনদের বাড়িও পুরনো। তবে বেশ বড়। বনেদি বাড়ি ছিল বোধ হয়। এখন সামনের দিকে ভেঙেচুরে গিয়েছে।"

"লোচনকে দেখা গেল ?"

"না। বগলা শুধু গলিটার খোঁজ নিয়ে বাড়ি দেখে চলে এসেছে।"

"আর কী সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, সার ?"

"লোচনের ছেলে দুটি যমজ। তার মধ্যে একটিকে—কেউ বা কারা একবার চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। একবেলা আটকে রেখে আবার ফেরতও দিয়ে গিয়েছে। ঘটনাটা মাস-দুই আগেকার।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "সে কী ! ছেলে চুরি ?"

"লোচনের বাড়িতে এখন মস্ত এক পালোয়ানকে আনা হয়েছে। সে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। ওদের বাড়ির কুকুরটাও বাইরে ছাড়া থাকে। মানে, লোচন হালফিল খুব সাবধান হয়ে গিয়েছে।··· তা কাল-পরশু নাগাদ চলো একবার, নিজের চোখে দেখে আসি।"

তারাপদ মাথা নাড়ল। সে রাজি।

॥ ২॥

তারাপদকে সঙ্গে করে কিকিরা রবিবার বেলা ন'টা নাগাদ যদু বড়াল লেনে হাজির।

শরৎকালের আকাশ। ঝকঝকে রোদ মাঝে-মাঝে সামান্য চাপা পড়ছে, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল মাঝে-মাঝে। তুলোর আঁশের মতন বৃষ্টি এই এল, এই গেল। আবার রোদ।

গলিটা পুরনো তো বটেই—কিন্তু সরু নয়, মোটামুটি চওড়া। গাড়ি ঘোড়া আসা-যাওয়া করতে কোনও অসুবিধা হয় না। বাড়িগুলোও দোতলা-তেতলা। কোনও-কোনওটা জীর্ণ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আবার কোনওটা বেশ পাকাপোক্ত। ওরই মধ্যে একটা বাড়ি নতুন করে সারিয়ে রংচঙ করা হচ্ছিল।

গলির মধ্যে রোদও ছিল, ছায়াও ছিল। রাস্তা সামান্য ভিজে-ভিজে। দু-চারটে মামুলি দোকান। লন্ড্রি, চায়ের, মুদিখানার, তেলেভাজার দোকানও রয়েছে একটা।

কিকিরা ঠিকানা মতন বাড়িটার সামনে এসে রিকশা ছেড়ে দিলেন। বগলা যা বলেছিল, মোটামুটি ঠিক। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। অবশ্য পাঁচিলের দশ আনাই ভেঙে পড়েছে। ইট একেবারে শ্যাওলা-ধরা। বাড়ি ঢোকার মুখে এক ভাঙা ফটক। ফটকটা বন্ধ হয় না। খোলাই থাকে। ফটকের একপাশে থামের ওপর কোনওকালে আলোর ব্যবস্থা ছিল, এখন নিতান্তই একটা লোহার বাঁকানো পাইপ খাড়া হয়ে আছে।

ফটক দিয়ে ঢুকতেই খানিকটা মাঠ। একেবারে জংলা চেহারা। নিম আর কুলগাছ। একপাশে ফুলগাছের ঝোপ। শিউলিগাছ, করবী। মাঠে জলকাদা, ঘাস। ডান দিকে দরোয়ানের ঘর ছিল আগে। এখন ভাঙা ঝুপড়ি।

গজ চল্লিশ হয়তো হবে না, মাঠটুকু পেরিয়েই দোতলা বাড়ি। বাড়ি সেকেলে। চেহারাতেই সেটা বোঝা যায়। কাঠের খড়খড়ি,

লোহার নকশাদারি রেলিং, বড়-বড় থাম, কাচের শার্সি। বাড়ির নানান জায়গায় ভাঙা-চোরা। বাইরে থেকে বেশ বিবর্ণ দেখায়। মাঠের একপাশে একটা ভাঙা টালির শেড। জায়গাটা নোংরা হয়ে রয়েছে।

তারাপদকে নিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বিশ-ত্রিশ পা এগোতে-না-এগোতেই কার গলা শোনা গেল।

"এ বাবু ?"

কিকিরারা দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাকালেন।

বাড়ির চওড়া থামের আড়াল থেকে একটা লোক এগিয়ে আসছিল। কুস্তিগিরের মতন চেহারা। পরনে মালকোঁচা-মারা ধুতি, খাটো বহরের। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। গেঞ্জিটা রং করা। মাথা প্রায় ন্যাড়া।

কাছে এলে বোঝা গেল, লোকটা পালোয়ানই বটে। বুকের ছাতি, পায়ের গোছ, হাতের পেশী দেখার মতনই। সেইসঙ্গে তার পইতেটাও। গলা থেকে পেট পর্যন্ত লম্বা। লোকটার কপালে চন্দন, কানের লতিতে চন্দন।

কাছে এসে লোকটা বলল, "কাঁহা যাইয়ে গা?"

কিকিরা বললেন, "বাবুসে ভেট করনা হ্যায়।"

"কোন বাবু ?"

"বড়া বাবু ! লোচনবাবু !" বুদ্ধি করেই বললেন কিকিরা।

"কেয়া নাম আপলোকগা ?"

কিকিরা বললেন, "কিকিরা !"

"কেয়া ?"

"কি-কি-রা !"

"কিক্কিরিয়া !" বলে লোকটা কেমন সন্দেহের চোখে দেখল কিকিরাদের। তারপর বলল, "ঠাহের যাইয়ে।"

কিকিরাদের দাঁড়াতে বলে লোকটা বাড়ির দিকে চলে গেল।

কিকিরা রঙ্গ করে বললেন, "কোন বাবু ?" বলেই কৌতূহল হল। "এ-বাড়িতে আর ক'জন বাবু থাকে হে ?"

এতক্ষণ পরে কুকুরের ডাক শোনা গেল। মনে হল, কুকুর এখন কাছাকাছি কোথাও নেই। হয়তো বাড়ির পেছন দিকে, বা দোতলায়।

কিকিরার সাজপোশাক যথারীতি খানিকটা বিচিত্র। আলখাল্লা ধরনের জামা, সরু প্যান্ট। মানুষটি যেমন রোগা তেমনই লম্বা। এই পোশাকে তাঁকে আরও লম্বা দেখায়। মাথায় একরাশ চুল, বড়-বড়, প্রায় কাঁধ ছুঁয়েছে। কিকিরার হাতে বেতের লাঠি ছিল। পায়ে ক্রেপ ব্যান্ডেজ। পায়ে চটি।

তারাপদ বলল, "কিকিরা, এই বাড়ি দেখে তো মনে হচ্ছে—ভেরি ওল্ড। কুইন ভিক্টোরিয়া আমলের নাকি ?"

কিকিরা বললেন, "হতে পারে। অন্তত জর্জ দ্য ফিফথের আমলের তো হবেই।" বলে চারপাশ দেখিয়ে বললেন, "বাড়িটার সামনে কত জায়গা দেখেছ! পুরনো দিনের বাড়ি না হলে কলকাতা শহরে এত জায়গা ফেলে কেউ বাড়ি করে! এখন এই জমিরই কী দাম! লোচন দত্তরা ধনী লোক ছিল হে। ধনী আর বনেদি। আমার মনে হচ্ছে, একসময় এ-বাড়িতে নিজেদের ঘোড়া আর গাড়িও থাকত! ওই শেডটা বোধ হয় ঘোড়ার আস্তাবল ছিল এক সময়।"

"কী করে বুঝলেন ?"

"এরকম আমি দেখেছি। তা ছাড়া একটা ভাঙা চাকা পড়ে আছে একপাশে।"

আরও দু-চারটে কথা শেষ হতে-না-হতেই পালোয়ান ফিরে এল।

"আইয়ে।"

কিকিরা পা বাড়ালেন। সামনে পালোয়ানজি।

হাঁটতে-হাঁটতে কিকিরা হঠাৎ বললেন, "এ পালহানজি ! দেশ গাঁও কাঁহা তুমহারা ?"

"ছাপরা জিলা ! ...লাটোয়া গাঁও।"

"আচ্ছা ! কলকাত্তামে নায়া মালুম !"

"নেহি বাবু ! পাঁচ সাল হো গিয়া না !"

কিকিরা দু-চার কথা আরও জেনে নিলেন। পালোয়ানের নাম, হরিপ্রসাদ। আগে সে জানবাজারে থাকত। লখিয়াবাবুর বাড়িতে দরোয়ান ছিল।

সিঁড়ি কয়েক ধাপ। তারপর ঢাকা বারান্দা। বারান্দার গায়ে-গায়ে তিন-চারটে ঘর।

পালোয়ান হরিপ্রসাদ কিকিরাদের নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসাল।

কিকিরারা কাঠের চেয়ারে বসলেন।

ঘরটা বড়। জানলা-দরজাও বেশ বড়-বড়। কড়ি কাঠ থেকে লোহার রড ঝুলছে। রডের সঙ্গে পাখা লাগানো। গুটি দুই বাতি ঝুলছিল উঁচু থেকে। ঘরে আসবাবপত্র বলতে এক জোড়া কাঠের আলমারি। রাজ্যের জঞ্জাল জমিয়ে রাখলে যেমন হয়—আলমারির মধ্যেটা সেইরকম দেখাচ্ছিল। পাল্লার কাচ অর্ধেক ভাঙা। গোটা কয়েক কাঠের চেয়ার, আর তক্তপোশের ওপর পাতা ময়লা ফরাস ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা দেখা যায় না। একটা ক্যারম বোর্ড একপাশে রাখা। টিনের একটা কৌটোও রয়েছে বোর্ডের পাশে। দেওয়ালে এক মস্তবড় ছবি। বোধ হয় দত্ত-বাড়ির কোনও প্রাচীন কর্তার। দেওয়ালে এক কাগজ সাঁটা রয়েছে। সাদা কাগজের ওপর রং দিয়ে লেখা 'ক্যারম প্রতিযোগিতা'। গোটা দুয়েক ছেঁড়া-ফাটা ক্যালেন্ডার। ঘরের চেহারা থেকে বেশ বোঝা যায়—এটা ঝড়তি-পড়তি ঘর। মামুলি লোকজনদেরই বসানো হয়।

লোচন দত্ত ঘরে এল। প্রথম নজরেই আন্দাজ হয় বয়েস বেশি নয় লোচনের।

কিকিরা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন।

লোচন দত্তর পরনে দামি চেককাটা লুঙ্গি। গায়ে ফতুয়া। এক হাতে সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, অন্য হাতে চাবির গোছা। মনে হল, চাবির গোছা ছাড়া তিনি কোথাও নড়েন না।

লোচনের চেহারা দেখে কিকিরার ধারণা হল ওর বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ। স্বাস্থ্য মজবুত। গায়ের রং তামাটে। মুখটা চৌকোনো ধাঁচের, শক্ত। দুটো চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বড়-বড় চোখ। খানিকটা রুক্ষ। চতুর বলেও মনে হচ্ছিল। মাথার চুল কোঁকড়ানো, মাঝখানে সিঁথি। গোঁফ রয়েছে। গলায় সোনার সরু হার।

ঘরে ঢুকে লোচন দত্ত একবার পাখার দিকে তাকাল। "আহা, পাখাটা খুলে দিয়ে যায়নি। যত্ত সব গাধা আহম্মক।" বলতে-বলতে নিজেই পাখার সুইচে হাত দিল।

পাখা চলতে শুরু করল।

লোচন এবার একটা চেয়ারে বসতে-বসতে বলল, "আপনারা ?"

কিকিরা বললেন, "আপনার কাছে এসেছি।"

"কি ব্যাপারে ?"

"খবরের কাগজে আপনি একটা নোটিস দিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল।"

"অন্য কেউ এসেছিল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ?"

"দু'জন। দু'দিনে দু'জন! দু'জনের কাউকেই আমার পছন্দ হয়নি। একজন বোধ হয়—একসময় হোটেলে কাজ করত। সিকিউরিটির কাজ।"

"আমরা আপনার সঙ্গে ওই নোটিসের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।"

লোচন চাবির গোছাটা কোলের ওপর রাখল। দেখল

কিকিরাকে। মনে হল না, খুশি হয়েছে।

"মশাইয়ের নাম ?"

"কিঙ্কর কিশোর রায়।" বলে কিকিরা তারাপদকে দেখালেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর সরল গলায় বললেন, "লোকে আমাকে কিকিরা বলেই জানে।"

"কী ? কিকিরা ?" লোচন অবাক।

"কিঙ্কর-এর কি, কিশোর-এর কি, আর রায়-এর রা।" কিকিরা মজা-মজা মুখ করে হাসলেন। "আজকাল সবাই ছোট-র ভক্ত। ফ্যানটাসটিক-কে বলে 'ফ্যানটা', ওয়ান্ডারফুল-কে 'ওয়ান্ডা'। নামের বেলাতেও তাই। ডিপি, বিবি, কেজি। বড় নাম বারবার বলতে কষ্ট হয়।"

"আচ্ছা-আচ্ছা ! তা মশাইয়ের কী করা হয় ?"

কিকিরা অমায়িক মুখ করে হাসলেন। "আমার পেশা বলে কিছু নেই। একসময় ম্যাজিক দেখাতাম। লোকে বলত, 'কিকিরা দ্য ওয়ান্ডার' ! এখন আর ওসব বিদ্যে জাহির করি না। একটা বই লিখছি : প্রাচীন ভারতের ইন্দ্রজাল বিদ্যা। ...সেকালে নানা শাস্ত্রে কাব্যে..."

কিকিরাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে লোচন বিরক্ত হয়ে বলল, "না না, প্রাচীন ইন্দ্রজাল-টিন্দ্রজাল আমি ছাপব না।" বলে বেশ কঠিনভাবে কিকিরার দিকে তাকাল। "আপনি বললেন, কাগজ দেখে এসেছেন। এখন বলছেন ইন্দ্রজাল... ! আশ্চর্য ব্যাপার মশাই। আমি ইন্দ্রজাল দেখার জন্যে গাঁটের পয়সা খরচ করে কাগজে নোটিস ছাপিনি।"

কিকিরা হাসি-হাসি মুখেই বললেন, "আজ্ঞে না। আমি বই ছাপাবার জন্যে আপনার কাছে আসিনি ! আমি জানি, আপনি ছাপাখানার ব্যবসা করেন।"

"হ্যাঁ। আমাদের সত্তর বছরের ব্যবসা। দত্ত অ্যান্ড সন্স।"

"বিখ্যাত ছাপাখানা। ফেমাস ! ধর্মতলায় আপনাদের বিরাট প্রেস। আপনারা বিশাল-বিশাল কাজ করতেন। সরকারি, বেসরকারি। একবার সি আর দাশের স্পিচ ছেপেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অভিভাষণ..."

লোচন কেমন অবাক হয়ে গেল। হ্যাঁ করে কিকিরাকে দেখছিল।

তারাপদ মনে-মনে হাসছিল। কিকিরা অতি চতুর। আসার আগে লোচন দত্তর কাজ-কারবারের খোঁজ করে নিয়েছেন তবে। অবশ্য যত না খোঁজ করছেন তার চেয়ে বেশি গুল-গাপ্পা ঝাড়ছেন লোচন দত্তর কাছে। সি আর দাশ, শ্যামাপ্রসাদ—বোধ হয় বাজে কথা।

লোচন বলল, "সি আর দাশের কথা আপনি জানলেন কেমন করে ?"

"আপনি জানেন না ?" কিকিরা যেন কতই অবাক।

"আমার বাবা জানতে পারতেন। আমি কেমন করে জানব। ...তবে হ্যাঁ আমাদের প্রেসের অফিসঘরে কয়েকটা সার্টিফিকেট টাঙানো আছে। বড়-বড় কাজ-কারবার যখন করেছি, সার্টিফিকেট পেয়েছি। দু-একটা ফোটোও আছে। নেতাজি একবার আমাদের প্রেসে এসেছিলেন। ইয়ে—কী নাম যেন, অ্যাক্টর—ওই যে, আহা কী যেন নামটা..."

"শিশিরকুমার !"

"না না, শিশির ভাদুড়ী নন, মিত্তির, মিত্তির।"

"নরেশ মিত্তির।"

"তাঁরও ফোটো আছে। জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধু ছিলেন।"

কিকিরা আড়চোখে তারাপদকে দেখলেন।

লোচন বলল, "ছাপাখানার কথা থাক। ছাপাখানার জন্যে আমি কাউকে ডাকিনি।"

"জানি সার। আপনি মোহনবাবু সম্পর্কে খোঁজ-খবর চান।"

"হ্যাঁ।"

"আমি আদতে ম্যাজিশিয়ান হলেও মাঝেসাঝে এই ধরনের খোঁজখবর রাখার কাজও করি।"

"গোয়েন্দা ?"

"না সার। আসল গোয়েন্দা নই।"

"তবে ?"

"পাতি গোয়েন্দা।" কিকিরা হাসলেন মজার মুখ করে। "আপনি আমায় ওয়ার্থলেস মনে করবেন না। আমি কাপালিক ধরেছি, রাজবাড়ির কাজও করেছি। সত্যি বলতে কি, আপনি আমায় একটু লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছেন।"

"লোভ ?" লোচন সিগারেটের প্যাকেটটা খুলতে-খুলতে বলল।

"তিরিশ হাজার টাকার লোভ !"

"ও !"

"মোহন দত্তকে, মানে জাল মোহন দত্তকে আমি খুঁজে বের করতে চাই।"

লোচন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে যেন বিদ্রূপ করে হাসল। "আপনি জাল মোহনকে খুঁজে বের করবেন ! বলেন কী মশাই ! আপনি তো বললেন, পাতি গোয়েন্দা। আমি ভাবছি একটা আসল গোয়েন্দা ভাড়া করব।"

কিকিরা হাসিমুখেই জবাব দিলেন, "তা করতে পারেন। শাঁটুলদাকেই করুন।"

"শাঁটুল ! কে শাঁটুল ?"

"শার্লকদাকে আমি শাঁটুলদা বলি !"

লোচন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত-মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, "না না, ওসব শাঁটুল-মাটুল আমার চাই না।"

কিকিরা হঠাৎ হাত বাড়ালেন। "সার, একবার আপনার দেশলাইটা দেবেন ?"

"দেশলাই !"

"মানে, আমি একটা বিড়ি ধরাব।"

"বিড়ি !"

"চুরুট !"

লোচন যেন বিরক্ত হয়েই দেশলাইটা ছুঁড়ে দিল।

কিকিরা ততক্ষণে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন। চুরুট বের করছেন। দেশলাইটা এসে তাঁর পায়ের কাছে পড়ল। তারাপদ কুড়িয়ে নিল দেশলাই।

কিকিরা কোটের পকেট থেকে হাত বের করলেন। দেশলাই দিল তারাপদ। চুরুট ধরিয়ে কিকিরা বললেন, "কাগজে যা ছেপেছেন তাতে তো বলেছিলেন—যে-কোনও লোকই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। বিশেষ করে কাউকে তো আসতে বলেননি। তা হলে এই খোঁড়া পা নিয়ে আসতাম না। কাজটা ঠিক করেননি, দত্তবাবু ! কথায় কাজে মিল থাকা দরকার ! ...তা ঠিক আছে। চলি। এই নিন আপনার দেশলাই !" বলে কিকিরা উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে ছুঁড়ে দিলেন দেশলাই।

লোচন দেশলাইয়ের বাক্সটা লোফার জন্যে হাত বাড়াল। কোথায় দেশলাই ! পায়ের কাছে ঠং করে কী যেন একটা পড়ল।

নিচু হয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করে লোচন জিনিসটা তুলে নিল। তুলে নিয়েই অবাক। চকচক করছে। সোনা নাকি ? "কী এটা ?"

"সোনার মেডেল... !"

"মে-ডে-ল ?"

"আরও দেখবেন ! এই দেখুন আমার ডান হাত। ফাঁকা। দেখছেন ? ভাল করেই দেখুন সার ! ...নিন, আরও একটা মেডেল।" এবারের জিনিসটা লোচনের কোলে গিয়ে পড়ল। "আরও চাই ? আচ্ছা—এই নিন আরও একটা। এটা স্বয়ং গভর্নর সাহেব দিয়েছিলেন। ছ'আনা সোনা আছে—গিনি গোল্ড !"

লোচন রীতিমতন ঘাবড়ে গিয়েছিল। বলল, "থাক থাক... ।"

"না সার, কিকিরা হল জেনুইন। ফাঁকিবাজি পাবেন না। আরও কিছু শো করব ? দেখবেন ? দিন না আপনার চাবির গোছাটা। হাওয়া করে দেব।"

লোচন তার চাবির গোছা মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলল। "না না, চাবির গোছা থাক। আপনি..."

"আমি কিকিরা দ্য গ্রেট। ম্যাগনিফিসিয়ান্ট ম্যাজিশিয়ান। ডাক ডিটেকটিভ—মানে পাতি গোয়েন্দা।"

লোচন বেশ বিমূঢ়।

কিকিরা বললেন, "দিন দত্তমশাই, মেডেলগুলো ফেরত দিন। ...তারাপদ, ওগুলো নিয়ে নাও।"

তারাপদ এগিয়ে গিয়ে মেডেলগুলো নিয়ে নিল।

"তা হলে চলি সার !"

লোচন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনারা কি সত্যিই জাল মোহনকে ধরে দেওয়ার জন্যে এসেছেন ?"

"ভদ্রলোকের এক কথা। কাগজ দেখে এসেছি। কাজ করতে পারলে তিরিশ হাজার টাকা, নয়তো তিরিশ পয়সাও নয়।"

লোচন যেন কী ভাবল। "পারবেন ?"

"চেষ্টা করব।"

"বসুন।"

কিকিরা বসলেন, ইশারায় বসতে বললেন তারাপদকে।

লোচন খানিকক্ষণ যেন কিছু ভাবল। তারপর বলল, "মোহন আমার ছোট ভাই। সহোদর ভাই নয়। জ্যাঠামশাই ওকে পোষ্য নিয়েছিলেন। মানে জ্যাঠার ছেলেমেয়ে ছিল না। আমার জন্মের দু-তিন বছর পরে এক বন্ধুর ছেলেকে পোষ্য নেন। বন্ধু মারা যান। ...তা মোহন আমার ভাই-ই। আমরা দুটি ভাই ছিলাম। মোহন আজ পাঁচ বছর হল মারা গিয়েছে। নাইনটিন এইট্টি ফাইভে।"

"অগস্ট মাসে ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় ?"

"সেসব কথা পরে। এখন যা বলছি শুনুন। ...আজ মাস দেড়-দুই হল একটা লোক আমার ছোট ভাই মোহন সেজে নানা জায়গায় ঝঞ্ঝাট করে বেড়াচ্ছে।"

"আপনি তাকে চোখে দেখেছেন ? মানে, যে-লোকটা ঝঞ্ঝাট করে বেড়াচ্ছে, তাকে দেখেছেন ?"

"না, আমি দেখিনি।"

"তা হলে ?"

লোচন অন্যমনস্কভাবে আরও একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "আমি খবর পাচ্ছি।"

"কোত্থেকে খবর পাচ্ছেন ?"

"এর-ওর কাছ থেকে।"

"যেমন ? নাম বলুন ? ঠিকানা ?"

ধোঁয়া গিলে লোচন বলল, "মাস দেড়েক আগে একদিন আমার এক আত্মীয়, সম্পর্কে মাসতুতো দাদা, রাত্তিরে ফোন করে প্রথম খবরটা দিল।"

লোচনের কথা শেষ হয়নি, আচমকা এক ছোকরা ঘরে ঢুকল। ঘন মেরুন রঙের গেঞ্জি গায়ে—স্পোর্টস গেঞ্জি, পরনে সাদা প্যান্ট। চোখে বাহারি গগলস। হাতে একটা লম্বা মতন বাক্স। বাজনার। বলল, "জামাইবাবু, দিদি আপনাকে ডাকছে। ফোন এসেছে। তাড়াতাড়ি যান।" বলে ছোকরা কিকিরাদের দেখল

কৌতূহলের সঙ্গে, তারপর চলে গেল।

লোচন নিজেই বলল, "আমার ছোট শ্যালক, জ্যোতি। ভাল গিটার বাজায়। কোথাও চলল। বাজাতে বোধ হয়। ...আপনারা বসুন। আমি আসছি।"

লোচন চলে গেল।

॥ ৩ ॥

লোচন দত্ত ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তারাপদ সামান্য অপেক্ষা করল, তারপর দু'হাত জোড় করে নিচু গলায় বলল, "সার, আপনি সত্যিই গ্রেট, আমাকেও হাঁ করে দিয়েছেন। এত কথা জানলেন কেমন করে ?"

কিকিরা মুচকি-মুচকি হাসছিলেন। বললেন, "তোমরা অল্পতেই হাঁ হও। হাঁ হওয়ার কিছু নেই। বগলাকে পাঠিয়েছিলাম বড়াল গলি আর লোচনের খবর নিতে। বগলা যা খবর দিল আগেই বলেছি। একটা কথা বোধ হয় বলতে ভুলে গিয়েছি। ও শুনেছিল, বাবুদের ছাপাখানা আছে ধর্মতলায়। তা আমার কাছে গোটা দুয়েক পুরনো টেলিফোন-পাঁজি আছে, যাকে তোমরা বলো ডাইরেক্টরি। দুটোই বছর কয়েকের পুরনো। খুব ইউসফুল জিনিস হে তারাবাবু, তুমি ওটা ঘাঁটাঘাঁটি করলে অনেক কিছু পেয়ে যাবে। সেইজন্যেই রেখেছি।"

"আপনি পেলেন ?"

"পেলাম। দেখলাম লেখা আছে : দত্ত অ্যান্ড সন্স। প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। ধর্মতলা স্ট্রিট...। ছাপাখানার ফোন নম্বর। পরের লাইনে লেখা : ডিরেক্টর এল· দত্ত। রেসিডেন্স ফোন নম্বর... এত এত। ব্যস—সহজ জিনিসটা বেরিয়ে গেল। লোচন দত্ত ছাপাখানার ডিরেক্টর। তার বাড়ির ফোন নম্বর সো অ্যান্ড সো।"

"সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি দত্তদের ছাপাখানা সম্পর্কে যেসব গল্প ঝাড়ছিলেন..."

"সেরেফ গপ্পই। লোচন দত্ত নিজেই বলল, তাদের ছাপাখানা সত্তর বছরের। মানে বেশ পুরনো। মামুলি ছাপাখানা সত্তর বছর টিকে থাকে না তারাপদ। তা ছাড়া চোখ বুজে ডাউন দ্য মেমারি লেন করলাম। ধর্মতলা স্ট্রিট আমার খুব চেনা রাস্তা। মনে হল, এরকম একটা নামের সাইন বোর্ড যেন দেখেছি। মৌলালির কাছাকাছি হবে।"

তারাপদ ঠাট্টা করে বলল, "সি আর দাশকেও দেখেছেন নাকি ?"

কিকিরা হাসতে লাগলেন। "ছবি দেখেছি। দেশবন্ধু মারা যান—উনিশশো পঁচিশ-টচিশ হবে। তখন আমি কোথায়, লোচনই বা কোথায় ? আর কোথায় বা তাদের প্রেস !"

তারাপদ যেন মজাটা উপভোগ করছিল। কিকিরা লোককে বোকা বানাতে ওস্তাদ। ম্যাজিশিয়ান বলে কথা !

"আপনি কি খেলা দেখাবার জন্যে ওইসব মেডেল পকেটে পুরে এনেছিলেন ?"

"রাইট ! ম্যাজিশিয়ানদের পকেট কখনও ফাঁকা থাকে না। হুডিনি সাহেব বলতেন, আমাদের ফাঁকা পকেটে ঘুরতে নেই, জাদুকরের জাত যায়। অন্তত একটা রুমাল বা তাসের প্যাকেটও রেখো।"

"পকেটে আর কী-কী আছে ?"

"তেমন কিছু না। রুমাল আর আই-পিন।"

"আপনি ভাগ্যবান। ম্যাজিকটা কাজে লেগে গেল।"

"লেগে যেত। সাধারণ মানুষের কাছে দুটো জিনিস লেগে যাওয়ার নাইনটি পার্সেন্ট চান্স। হাত দেখা আর ম্যাজিক।" বলে কিকিরা হাসতে লাগলেন। আমার কাছে আরও একটা তুরুপের তাস ছিল। দরকার হল না।"

পায়ের শব্দ শোনা গেল।

পালোয়ান হরিপ্রসাদ এসে হাজির। বলল, "আইয়ে...।"

তারাপদ অবাক হল। 'আইয়ে' মানে ? লোচন কি তাদের পালোয়ান দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে ? বলল, "কাঁহা ?"

"দপ্তরমে। দুসরা কামরা।"

কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন। "চলো, অফিস ঘরে ডাক পড়েছে।"

তারাপদও উঠে পড়ল।

ঢাকা বারান্দায় খানিকটা এগোলেই দোতলার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশ দিয়ে দশ পা হাঁটলেই অফিস ঘর।

কিকিরাদের অফিস ঘরে পৌঁছে দিয়ে পালোয়ানজি চলে গেল।

অফিস ঘরে লোচন দত্ত বসে ছিল। বলল, "আসুন। এই ঘরে বসেই আমি কাজের কথাবার্তা বলি। এটা আমার বসার ঘর অফিস ঘর দুইই। বসুন আপনারা। আগের ঘরটায় এখন আমার ছেলেরা পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে ক্যারম খেলতে বসবে। ওদের নাকি ক্যারম কম্পিটিশান চলছে। ছেলেপুলের কাণ্ড। বসুন আপনারা। চা খান।"

ছেলের কথা উঠলেও কিকিরা লোচনের ছেলে চুরি যাওয়ার কথা তুললেন না।

এই ঘরটা মাঝারি। মোটামুটি সাজানো-গোছানো। সোফা-সেটি চেয়ার। একপাশে লোচন দত্তর কাজকর্মের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদিআঁটা চেয়ার। দেওয়াল-আলমারিতে নানান জিনিস। ফোনও রয়েছে ঘরে। দেওয়ালে গান্ধীজি আর রামকৃষ্ণের ছবি। চমৎকার একটা ক্যালেন্ডার।

কিকিরারা সোফায় বসলেন। টিপয়ের ওপর দু' কাপ চা আর প্লেটে কিছু বিস্কুট।

"নিন, চা খান।"

লোচন দত্তর ব্যবহারও খানিকটা পালটে গিয়েছিল। আগের মতন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিল না কিকিরাদের। খাতির করে চা খাওয়াচ্ছে।

কিকিরা চায়ের কাপ তুলে নিলেন। "কাজের কথা আগে সেরে নিই দত্তমশাই ?"

"হ্যাঁ, সেরে নিন। আমার আবার তাড়া আছে। রবিবার হলেও একবার বেরোতে হবে।"

"আপনি বলছিলেন, আপনার এক আত্মীয় প্রথমে মোহনের খবরটা দেয়।"

"হ্যাঁ। আমার এক ডিসট্যান্ট রিলেশান। মাসতুতো ভাই হয় সম্পর্কে।"

"মাস দেড়েক আগের ঘটনা বলছিলেন..."

"ওইরকমই। রাতের দিকে ফোন করে বলল ব্যাপারটা।"

"আত্মীয়ের নাম-ঠিকানা ? প্লিজ, সার এক টুকরো কাগজ যদি দেন !"

টেবিলের ওপর কাগজ ছিল। কিকিরার ইশারায় তারাপদ উঠে গিয়ে কাগজ নিল। ডট পেন তার পকেটেই ছিল।

ফিরে এসে বসল তারাপদ।

লোচন বলল, "নাম অনিল। অনিলচন্দ্র দেব। ঠিকানা—দীনেন্দ্র স্ট্রিট। বাড়ির নম্বর একশো বত্রিশ বাই ওয়ান বোধ হয়।"

"নম্বরটা ঠিক মনে পড়ছে না ?"

"ওইরকমই। শ্যামবাজারের দিকে।"

"কী করেন ভদ্রলোক ?"

"মেশিনারির ডিলার। অফিস মিশন রো-তে।"

"কী বললেন উনি ?"

লোচন সিগারেট ধরিয়ে নিল। বলল, "অনিলদা বলল, একটা লোক দু'দিন ধরে বাড়িতে তাকে ফোন করে বলছে যে, সে মোহন।"

তন্তুশ্রী
বাংলার তাঁত
বাংলার শাড়ি
শান্তিপুরী
ধনেখালি
বেগমপুরী
জামদানী
বালুচরী
সিল্ক টাঙ্গাইল
পলিয়েস্টার
স্যুটিং শার্টিং
ড্রেস মেটিরিয়াল
এবং রেডিমেড
Samriddhi

"মাত্র ওইটুকু ?"

"না। বলছে যে, সে মরেনি। বেঁচে আছে। তার মরার খবর মিথ্যে।"

"এ-কথা কেন বলছে ?"

"আমি জানি না। তবে সে বলতে চাইছে, আমি মিথ্যে করে তার মরার খবর রটিয়েছি। সে বেঁচে আছে।"

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন। তারাপদ অনিলচন্দ্রের নাম-ঠিকানা টুকে নিয়েছিল আগেই। চা খাচ্ছিল।

কিকিরা বললেন, "আর কিছু ?"

"না।"

একটু থেমে কিকিরা এবার বললেন, "অনিলবাবুর সঙ্গে আপনি দেখা করেননি ?"

"করেছিলাম। আলাদা কিছু জানতে পারিনি।"

"অনিলবাবুর কী মনে হয়েছে ?"

"অনিলদা বলল, পাঁচ-ছ' বছর পরে তো গলার স্বর মনে থাকার কথা নয়। তবে লোকটা আমাদের বাড়ি সম্পর্কে যা-যা খবর দিল দু-পাঁচটা, তা ঠিকই।"

কিকিরা চা শেষ করলেন। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "এর পর ? মানে অন্য আর কাদের সঙ্গে মোহন যোগাযোগ করেছে ?"

লোচন বললেন, "আমাদের এক মামা আছেন। মায়ের খুড়তুতো ভাই। বয়েস হয়েছে। ডাক্তারি করতেন। মানে চাকরি করতেন করপোরেশানে। রিটায়ার্ড। তাঁকেও লোকটা ফোন করেছিল।"

"মামার নাম ? ঠিকানা ?"

"পি সি সেন। প্রফুল্ল সেন। ঠিকানা শোভাবাজার।" লোচন ঠিকানা দিল।

"মামাকেও সেই একই কথা," লোচন বলল, "সে বেঁচে আছে। আমি নাকি মিথ্যে করে তার মরার খবর রটনা করেছি।"

"আপনার মামা তাকে আসতে বললেন না বাড়িতে ?"

"মামা বলেছিলেন। ও আসবে না।"

"কেন ?"

"বলল, আসার বিপদ আছে।"

"আপনার মামার কী মনে হল লোকটার কথা শুনে ?"

লোচন একটা পেনসিল তুলে নিয়ে ঘাড়ের কাছটায় চুলকে নিতে-নিতে বলল, "মামার ধারণা হল, লোকটা চিট, তবে আমাদের বাড়ির খবরাখবর রাখে।"

কিকিরা বললেন, "এর পর ? মানে আর কার-কার সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছে ?"

লোচন খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, "আরও তিন-চারজনের সঙ্গে। তার মধ্যে রয়েছে আমার বন্ধু ভবানী ; আমার শ্বশুরবাড়ির তরফের বলতে বড় শ্যালক ; আমাদের প্রেসের পুরনো ম্যানেজার তুলসীবাবু, এই পাড়ার মিহিরকাকা।"

"পুরো নাম-ঠিকানাগুলো বলবেন দয়া করে ?"

লোচন তার বন্ধু ভবানীর কথা বলল। ভবানী সরকারি চাকরি করে, থাকে ক্রিক রো-তে। শ্বশুরবাড়ির বড় শ্যালকের নাম সতীশ চন্দ্র। সে থাকে বাগবাজারে। আলাদাই থাকে সতীশদা।

কথার মাঝখানে ফোন এল।

লোচন ফোন তুলল, সাড়া দিল, তারপর বলল, "ধরো, ওপরে তোমার মেজদিকে দিচ্ছি।" বলে নীচের ফোনের লাইন ওপরে জুড়ে দিল। দিয়ে নীচের ফোন নামিয়ে রাখল।

তারাপদ নাম-ঠিকানা টুকে নিচ্ছিল।

"আপনাদের প্রেসের ম্যানেজার ?" কিকিরা বলল।

"তুলসীবাবু। তুলসী সিংহ। আমরা 'তুলসীকাকা' বলতাম। কাকা বছর চার-পাঁচ হল বাড়িতেই বসে আছেন। বয়েস হয়েছে। তা পঁয়ষট্টির বেশিই হবে। উনি শেষের দিকে বার কয়েক বড়-বড় অসুখে পড়েন। শেষে হার্টের গোলমাল। তার ওপর চোখে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। ছানি কাটানো হল একটা। কাজ হল না। কাকা রিটায়ার করলেন।"

"কোথায় থাকেন ?"

"পটুয়াটোলা লেনে। ...কাকা বাড়িতে একাই থাকেন। বিধবা এক ভাইঝি দেখাশোনা করে। কাকা বিয়ে-থা করেননি। নিজের বলতে কেউ নেই। মানুষটি খুব ভাল। ধার্মিক। একমাত্র কাকার কাছেই লোকটা একদিন হাজির হয়েছিল।"

"সামনাসামনি ?"

"হ্যাঁ। বৃষ্টির মধ্যে সন্ধের পর।"

"তুলসীবাবু তাকে দেখেছেন ?"

"সামান্য দেখেছেন। যে-মানুষের চোখ নেই বললেই চলে—তার দেখা আর না-দেখা সমান।"

"তবু তিনি কী বললেন ?"

"মোহনের মতনই লেগেছে তাঁর।"

"ও !... তা সেই লোকটা সরাসরি দেখা বলতে এই যা তুলসীবাবুর সঙ্গেই করেছেন ? অন্যদের বেলায়..."

"ফোন। চিঠি।"

"চিঠি ?"

"চিঠিও লিখেছে দু-একজনকে। সেই চিঠি আমি দেখেছি। হাতের লেখা খানিকটা মিলে যায়।"

কিকিরা অবাক হলেন। তারাপদর দিকে তাকালেন।

তারাপদ বলল, "দু-চার বছর পরেও কারও হাতের লেখা দেখলে তার পুরনো হাতের লেখার সঙ্গে মেলাতে গেলে মুশকিল হয়ে পড়ে। অবশ্য খুব চেনা হাতের লেখা হলে অন্য কথা।"

"হাতের লেখা নকল করাও কঠিন নয়। সই জাল, হাতের লেখা জাল—এ তো আকছার হয়।" লোচন বলল।

কিকিরা কথা পালটে নিলেন। "আর-একজনের কথা বলছিলেন আপনি, পাড়ার লোক।"

"মিহিরকাকা। উনি এই পাড়াতেই থাকেন। একটা ছোট পার্ক আছে ওদিকে। বাচ্চাদের পার্ক। পার্কের গায়েই ওঁর বাড়ি। মিহিরকাকা উকিল মানুষ। বাবার বন্ধু ছিলেন। ওকালতি মন্দ করতেন না, তবে ওঁর শখ হল নাটক করার। এখানে একটা পুরনো ক্লাব আছে নাটকের, 'ইভনিং ক্লাব'। মিহিরকাকা আজ বছর দশ-পনেরো ক্লাব নিয়ে মেতে আছেন। পয়সাওলা বাড়ির ছেলে। চিন্তা-ভাবনা নেই। তবু মিহিরকাকা একসময় যাও-বা কোর্টে আসা-যাওয়া করতেন, বছর কয়েক তাও করেন না।"

"কেন ?"

"ওঁর ডান হাত অ্যামপুট করতে হয়েছে। গাড়ির সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।"

"ইস !"

"ওকালতি প্রায় ছেড়ে দিলেও ক্লাব ছাড়েননি। ক্লাবই এখন ধ্যান-জ্ঞান।"

"জাল মোহন কি ওঁর কাছে গিয়েছিল ?"

"না। ফোনে কথা বলেছে।"

"কী বলেছে ?"

"সে বেঁচে আছে। এখন কলকাতায় রয়েছে।"

"লোকটার উদ্দেশ্য কী ?"

"জানি না। সে-ই জানে। তবে আমার মনে হচ্ছে, লোকটা ভয় দেখিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়।"

কিকিরা ভেবেছিলেন লোচন ছেলে-চুরির কথা তুলবে। তুলল না। সামান্য অবাকই হলেন তিনি। খানিকক্ষণ কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "মোহন কোথায় কীভাবে মারা যায় ?"

লোচন যেন সামান্য ইতস্তত করল। বার কয়েক দেখল

কিকিরাকে। হতাশ, করুণ মুখ করল কেমন। আবার সিগারেট ধরাল। বলল, "ঘটনার কথা ভাবতে গেলে আমার কী যে হয়ে যায় মশাই, সারা গা ভয়ে শিউরে ওঠে। মনে হয়, কোনও দুঃস্বপ্ন দেখছি।" লোচন চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। আবার বলল, "আমাদের দুই ভাইয়েরই বেড়াবার শখ ছিল। ছুটিছাটায় তো বটেই—এমনিতেও হুট করে বেরিয়ে পড়তাম কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে। সেবার আমরা চারজন একটা জায়গায় বেড়াতে যাই। জায়গাটা আপনারা চিনবেন না। বালিয়া জেলার ছোট্ট এক জায়গায়। জঙ্গল আর ছোট-ছোট পাহাড়। গাছপালা, পাখি তো কতই! তার সঙ্গে ছিল এক ঝরনা, ছোট ঝরনা, ঝরনার শেষে একটা লেক। ওখানকার ভাষায় বলে 'তাল'। বোধ হয় 'তলাও' শব্দ থেকে। বর্ষার শেষ সময় গিয়েছিলাম আমরা। অগস্ট মাসে। ...যা বলছিলাম, 'সারাও তাল' বলে যে লেকটা আছে—তার কাছাকাছি এক মামুলি সরকারি ডাকবাংলোয় আমরা উঠেছিলাম। দিন পাঁচ-সাত থাকার কথা।"

"আপনারা চারজন কে-কে ছিলেন?"

"আমি, মোহন, আমার মেজো শ্যালক, আর মোহনের এক বন্ধু।"

"তারপর?"

"একদিন আমরা ঝরনা দেখতে পাহাড়ের ওপরে গেলাম। পাহাড় যে খুব উঁচু তা নয়। তবে বড় রাফ। খাড়াই পাহাড়। পাথরে ভর্তি। ওপরে গাছপালার ঝোপ। বেশিরভাগ গাছই ঝোপ ধরনের।"

"আপনারা চারজনেই গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। চারজনেই। ...পাহাড়ের মাথার কাছে এক জায়গায় যেখান থেকে ঝরনার জল নামছে, সেখানে পা রাখাই কষ্টের। পাথর, ঝোপ, শ্যাওলা, জংলা গাছ। ...আমি মোহনকে বারণ করেছিলাম আর না-এগোতে। আমার কথা শুনল না। সে এগিয়ে গেল। আমার মেজো শ্যালক আর মোহনের বন্ধু খানিকটা পেছনেই ছিল। মোহন এগিয়ে যাচ্ছে দেখে বাধ্য হয়ে আমিও গেলাম। হঠাৎ একেবারে ঝরনার মুখের কাছে গিয়ে মোহনের পা পিছলে গেল।" লোচন যেন শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল, দৃশ্যটা সে দেখতে পাচ্ছে এখনও।

কিকিরা আর তারাপদ কোনও কথা বললেন না।

নিজেকে সামলে নিয়ে শেষে লোচন বলল, "ঝরনার জলের সঙ্গে পড়তে-পড়তে সে কোথায় যে আটকে গেল পাথরে, ঝোপঝাড়ে— তা আর আমরা দেখতে পেলাম না।"

"আপনারা কী করলেন?"

"নীচে নেমে লোকজন জুটিয়ে আনলাম। মোহনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পুরো একটা দিন কেটে গেল। দেড় দিনের মাথায় তাকে উদ্ধার করা গেল। পাথর আর জলের মধ্যে ঘন শ্যাওলার তলায় আটকে রয়েছে। পড়ার সময় তার যা জখম হয়েছিল—তা তো হয়েই ছিল, তার ওপর জলের স্রোতে এখানে-ওখানে ধাক্কা খেতে-খেতে মোহনের চোখমুখ মাথা বলতে কিছুই প্রায় ছিল না। রক্তমাংসের একটা তাল। জলের মধ্যে পড়ে ছিল বলে পোকামাকড় তার গা ছেঁকে ধরেছে। সারা শরীর ভাঙাচোরা, মাংস খাবলে নিয়েছে যেন কোনও জন্তুজানোয়ারে। সে দৃশ্য বীভৎস!"

"মোহনকে চেনা যাচ্ছিল?"

"কষ্ট হচ্ছিল। তবে আমি চিনতে পেরেছিলাম।"

"আপনার শ্যালক আর মোহনের বন্ধু?"

"তারাও চিনেছিল।"

"মোহনকে আপনারা ওখানেই দাহ করেন?"

"হ্যাঁ। কাছেই। এক ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিল মাইল তিনেক তফাতে। পুলিশ-থানাতেও খবর দেওয়া হয়।"

"কাগজপত্র আছে?"

"না। ডাক্তারের সার্টিফিকেট থানায় জমা নিয়ে নেয়। তার একটা কপি পরে আমি আনিয়েছি।"

"আপনার মেজো শ্যালক এখন কোথায়?"

"ডুয়ার্সের চা বাগানে। সেখানে চাকরি করে।"

"মোহনের বন্ধু?"

"সে চলে গিয়েছিল দিল্লিতে। সেখানে চাকরি করত। তারপর কোথায় আছে আমি জানি না।"

"আপনি কি এদের কোনও খবর দিয়েছেন?"

"মেজো শ্যালককে চিঠি লিখেছি। মোহনের বন্ধুর ঠিকানা আমি জানি না। ...কলকাতায় তাদের কেউ নেই।"

কিকিরা খানিকক্ষণ কোনও কথা বললেন না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মোহনের কোনও ফোটো হাতের কাছে আছে?"

"না, হাতের কাছে নেই। তবে ওই দেওয়ালে—ওই ছবিটা দেখতে পারেন। আমরা দুই ভাই-ই রয়েছি ফোটোতে।"

কিকিরা এগিয়ে দেওয়ালের কাছে গেলেন। ফোটোটা দেখলেন কিছুক্ষণ।

"আজ আমরা যাই। পরে আপনার কাছে আবার আসছি।" বলে কিকিরা ইশারায় তারাপদকে উঠতে বললেন।

॥ ৪ ॥

চন্দন ঘরে আসতেই কিকিরা বললেন, "কী ব্যাপার হে, নাটকের মাঝখানে তোমার আবির্ভাব। বলি এটা কি দাশরথি পার্টির যাত্রা।" বলে রঙ্গ করে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকলেন চন্দনের দিকে। কে যে দাশরথি তিনি বললেন না।

চন্দন মাথা মুছতে লাগল। ইলশেগুঁড়ির মতন বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। দু-দশ ফোঁটা জল গায়ে-মাথায় লেগেছে তার। মাথা মুছতে-মুছতে চন্দন বলল, "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন আপনারা, আমার তো সে আহ্লাদ করার সময় নেই। ডিউটি ডিউটি ডিউটি। লাইফ হেল করে ছেড়ে দিল। ওপরঅলা গিয়েছেন দিল্লি, সেমিনার করতে, যত ঝঞ্ঝাট আমার। আসছে জন্মে যেন আর ডাক্তার না হই।"

"কী হতে চাও?" কিকিরা মজা করে বললেন, "কম্পাউন্ডার?"

"আজ্ঞে না, বরং ম্যাজিশিয়ান হব। ভড়কি মেরে বাজিমাত। কত হাততালি। কাগজে ছবি।"

"তাই হবে। এখন বোসো। চা-টা খাও।"

কিকিরার ঘরে তিনি আর তারাপদ। সন্ধে হয়েছে সবে। আজকের দিনটায় মোটামুটি আরাম লাগছিল। গরম নেই, ঘাম নেই, বাদলাও না থাকার মতন। শরৎকাল যেন পুরোপুরি দেখা দিচ্ছে।

"আপনার পা কেমন?"

"ও-কে।"

"আপনি বাইরে বেরোতে শুরু করেছেন শুনলাম?"

"এই মাঝে-মাঝে!"

"চালাকি করবেন না কিকিরা। আমি সব জানি। রবিবারে আপনি সফর করতে বেরিয়েছিলেন। গতকালও টহল মেরে এসেছেন।"

কিকিরা অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "যাচ্চলে, আমার তো খেয়ালই থাকে না। বুড়ো হয়ে ভীমরতি হয়েছে আমার। ...তা স্যান্ডেলউড, ইয়ে মানে—তিরিশ হাজার টাকার ব্যাপারটা তোমায় বলেনি তারাপদ?" কিকিরা বললেন বটে বোকা সেজে, কিন্তু তিনি জানেন, তারাপদর কাছ থেকে সব খবরই পেয়েছে চন্দন।

তারাপদ চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

চন্দন বলল, "যা ইচ্ছে আপনি করুন, সার। কিন্তু আপনার পায়ের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি না। পরে যখন ব্যথায় কাতরাবেন, আমি নেই।"

কিকিরা হেসে-হেসে জবাব দিলেন, "পাগল নাকি! আমি তোমার অ্যাডভাইস ছাড়া কিছু করি নাকি? তবে কি জানো, তিরিশ হাজারের লোভটা সামলাতে পারিনি বলে দু'দিন বাড়ির বাইরে বেরিয়েছি। খুব সাবধানে। ওয়াকিং করিনি বললেই হয়, সঙ্গে ছড়ি রেখেছি। প্রথম দিন তারাপদ ছিল। ...তুমি সব শুনেছ তো?"

"লোচন দত্ত শুনেছি।"

"কাল একবার উত্তরে গিয়েছিলাম। বাগবাজার আর দিনেন্দ্র স্ট্রিট।"

চন্দন বসল। বসে হাত বাড়িয়ে তারাপদর সামনে রাখা প্লেট থেকে একটা শিঙাড়া তুলে নিল।

কিকিরা নিজেই বললেন, "দিনেন্দ্র স্ট্রিটে থাকেন লোচনের মাসতুতো দাদা। অনিলচন্দ্র দেব, অনিলদা। মাসতুতো হলেও ঠিক নিজের মাসির নয়। মায়ের খুড়তুতো দিদির ছেলে। বয়েস হয়েছে। পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হবে। অনিলচন্দ্র সেরে একবার সতীশবাবুর কাছে গেলাম। সতীশবাবু লোচনের বড় শ্যালক। থাকেন বাগবাজারে। আলাদাভাবেই থাকেন, মানে লোচনের নিজের শ্যালক হলেও, নিজেদের পৈতৃক বাড়িতে থাকেন না। ভাড়া বাড়িতে থাকেন।"

চন্দন বলল, "দেখুন কিকিরা, আমি তারার মুখে গোড়ার কথা সব শুনেছি। সব ব্যাপারে আপনি নাক গলাতে যান কেন?"

মজা করে কিকিরা বললেন, "নাক এখনও গলাইনি; শুধু গন্ধটা শুঁকছি। ...তা ছাড়া তিরিশ হাজার ফেলনা নয় আজকের দিনে। আমি গরিব মানুষ। যদি থার্টি থাউজেন্ড পেয়ে যাই...।"

"কচু পাবেন। ওসব ধাপ্পাবাজি আমি অনেক দেখেছি।"

"তুমি আগে থেকেই সব মাটি করে দিচ্ছ! কথাগুলো যদি না শোনো, ব্যাপারটার মধ্যে কী আছে বুঝবে কেমন করে?"

চন্দন আর কথা বলল না।

কিকিরা সামান্য সময় চুপ করে থেকে বললেন, "ব্যাপারটা যা ভাবছ তা নয়। এর মধ্যে সামথিং হ্যাজ....!"

বগলা চা নিয়ে এসেছিল চন্দনের জন্য। তারাপদদের চা তখনও শেষ হয়নি।

চা নিতে-নিতে কিকিরার দিকে তাকাল চন্দন। বলল, "সামথিং তো সব ব্যাপারেই থাকে। তা বলে আপনি খোঁড়া পায়ে নেচে বেড়াবেন!"

কিকিরা কথাটা শুনলেন, পাত্তা দিলেন না।

চন্দন নিজের ঝোঁকেই বলল, "আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, আপনার উচিত ছিল ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিসে নেমে পড়া। বিস্তর পয়সা কামাতেন। আজকাল ও-লাইনে অনেক কদর।"

কিকিরা বললেন, "নেক্সট লাইফ, মানে পরের জন্মে চেষ্টা করব। এখন আমার কথাটা শোনো।"

চন্দন আর কিছু বলল না।

কিকিরা বললেন, "বলছিলাম অনিলবাবুর কথা। বাড়িতে গিয়েই ধরলাম তাঁকে। বললাম, আমি লোচনবাবুর হয়ে কাজ করছি। ভদ্রলোক আমাকে পাত্তাই দিতে চান না। পরে ফোন করলেন লোচনকে। জেনুইন পার্টি আমি। শেষে কথা বললেন।"

"কী বললেন?" তারাপদ বলল।

"বললেন টেলিফোন কল বার-দুই হয়েছে। টেলিফোনে গলা শুনে তিনি আন্দাজ করতে পারেননি ওটা মোহনের গলা কি না! এত বছর পর কারও গলার স্বর মনে রাখা অসম্ভব। তার ওপর লাইনে শব্দ হচ্ছিল। পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছিল বোধ হয়
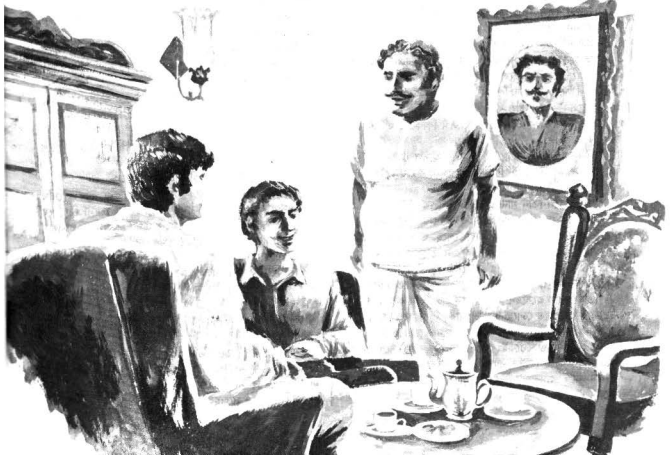
কেউ।"

"অনিলবাবুর মোট কথাটা কী?"

"বললেন, মোহন কি না তা তিনি জানেন না, তবে লোকটা লোচনদের ঘর-বাড়ি পরিবার ছাপাখানা সম্পর্কে যা-যা বলল, দু-দশটা কথা, তা ঠিকই। মানে অনিলবাবু যতটা জানেন।"

চন্দন তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, "এটা কোনও কথা হল কিকিরা? ইনফরমেশান জোগাড় করা কঠিন নাকি?"

কিকিরা বললেন, "কোনও-কোনও জিনিস খুঁজে বের করা কঠিন। মানে, আমি বলছি—কোনও লোক বা বাড়ির সম্পর্কে আমরা যখন খোঁজখবর করি, ওপর-ওপরই করি। হয়তো খানিকটা খুঁটিয়েও করলাম—কিন্তু সেটা কতটা হতে পারে। তোমার মা-বাবা-ভাই-বোন ঘরবাড়ি সম্পর্কে তুমি যা জানো, যতটা জানো, দেখেছ ছেলেবেলা থেকে—আমি বা তারাপদ ততটা কি জানতে পারি? পারি না।"

চন্দন বলল, "জাল মোহন কি সব কথা বলতে পেরেছে?"

"সব কথা নয়। সে-অবস্থাও ছিল না। মোহন দত্ত-পরিবার সম্পর্কে, নিজের বাবা আর কাকা, মানে লোচনের বাবা সম্বন্ধে দু-চার কথা যা বলেছে, তা ঠিক।"

"একটু শুনি?"

"যেমন ধরো সে বলেছে, তার বছর চার বয়েসে তাকে দত্তক নেন রামকৃষ্ণ দত্ত, মানে লোচনের জ্যাঠামশাই। লোচনের বয়েস তখন বারো-টারো। মোহন নামটা রামকৃষ্ণরই দেওয়া। আগে তার নাম ছিল গোপাল। নিজের বাবার সম্পর্কে এইটুকু তার ভাসা-ভাসা মনে আছে যে, ভদ্রলোক বড় গরিব ছিলেন, সামান্য একটা কাজ করতেন। স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। ....তা রামকৃষ্ণর বন্ধু ছিলেন ভদ্রলোক। গোপালের নিজের বাবার টিবি রোগ হয়। বাড়াবাড়ি। উনি মারাও যান। মারা যাওয়ার আগে রামকৃষ্ণকে বলেন, ছেলেটিকে নিয়ে নিতে। রামকৃষ্ণর ছেলেপুলে ছিল না। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী গোপালকে দত্তক নিয়ে নেন। পোষ্যও বলতে পারো।"

তারাপদ বলল, "অনিলবাবু এসব জানেন?"

"জানেন। শুনেছেন।"

"আর কী বলল মোহন?"

"লোচনের বাবার অসুখের কথা। দু-দু'বার এমন অসুখ হয়েছিল যে, মারা যেতে বসেছিলেন। লোচনের মা দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে পা হড়কে হাত-পা ভেঙেছিলেন—সে-কথাও বলেছে।"

চন্দন আর তারাপদ সিগারেট ধরাল। কিকিরাও একটা চেয়ে নিলেন।

"অনিলবাবুর কী ধারণা, এই লোকটা আসল মোহন?"

মাথা নাড়তে-নাড়তে কিকিরা বললেন, "না। তাঁর ধারণা লোকটা জাল।"

"আসল বলে তিনি মানতে চাইছেন না কেন?"

"যে-জন্যে তোমরাও মানতে চাইছ না। মরা মানুষ কেমন করে ফিরে আসবে? মোহন যে মারা গেছে তার প্রমাণ রয়েছে হাতেনাতে। লোচন ছাড়াও বাকি দু'জন তাকে মরতে দেখেছে, লোচনের মেজো শ্যালক আর মোহনের বন্ধু।"

তারাপদ বলল, "অনিলবাবু শেষ পর্যন্ত কী বলতে চাইলেন?"

"তিনি অবাক হয়েছেন ঠিকই, তবে এই ফোন করা মোহনকে ভদ্রলোক জালিয়াত জোচ্চোর ছাড়া আর কিছু ভাবতে রাজি না।"

চন্দন কোনও কথা বলল না। তারাপদও চুপচাপ।

কিকিরা নিজের থেকেই বললেন, "অনিলবাবু সেরে গেলাম সতীশবাবুর কাছে। উনি থাকেন বাগবাজারে। পৈতৃক বাড়িতে থাকেন না। বাগবাজারে একটা বাড়ির দোতলা ভাড়া নিয়ে থাকেন।"

"পৈতৃক বাড়ি কী দোষ করল?"

"সেটা কি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি? নিজেদের ফ্যামিলির ব্যাপার। ...সতীশবাবু মানুষটি কিন্তু সজ্জন। ভাল। বছর পঞ্চান্ন বয়েস হয়েছে। একটা ওষুধ কোম্পানিতে কেমিস্ট। পরিবার বলতে স্ত্রী আর ছেলে। ছেলে কলেজে পড়ায়। বিয়ে-থা এখনও হয়নি।"

"সতীশবাবু কী বললেন?"

"বললেন অনেক কথাই। মোহনের গলার স্বর তিনি ধরতে পারেননি ঠিকই, তবে দু-পাঁচটা কথা প্রমাণ হিসাবে যা বললেন, তা ঠিকই। সতীশবাবু বেশ আশ্চর্যই হলেন। উনি বললেন, দেখুন, ও-বাড়ির সব খোঁজখবর আমি রাখি না, কুটুমবাড়ির নাড়ির খবর, হাঁড়ির খবর রেখে আমার কী লাভ! তবে হ্যাঁ, আমাদের জামাইয়ের বাবা যেদিন মারা গেলেন সেদিন কলকাতা যে জলে ডুবে ছিল, তা আমার মনে আছে। ওদের ছাপাখানায় আগুন লেগে অনেক ক্ষতি হয়েছিল সেটাও আমি জানি। ....এইরকম কয়েকটা কথা মোহন যা বলেছে—সতীশবাবু স্বীকার করে নিলেন সত্যি বলেই।"

"সতীশবাবুর ধারণা, এ-মোহন তবে আসল?"

"না, সে-কথা তিনি কেমন করে বলবেন।"

"তবে?"

"তবে এটা তিনি স্পষ্টই বললেন, মোহন ছেলেটিকে তাঁর খুবই ভাল লাগত। হাসিখুশি ছেলে, আচার-ব্যবহার সুন্দর। চট করে নজর কেড়ে নিত। মোহন কিন্তু স্বভাবে খুব ভীতু ছিল। সাবধানী ছিল। বেপরোয়া ধরনের ছেলে সে একেবারেই ছিল না। চলন্ত ট্রামে-বাসে সে লাফিয়ে উঠত কি না সন্দেহ। ময়দানে বড় খেলা থাকলে গণ্ডগোলের ভয়ে সে মাঠে যেত না। রেডিয়ো শুনত, টিভি দেখত। এই ছেলে যে কেমন করে ঝরনা-নামা দেখতে পাহাড়ের মাথায় উঠবে, উঠে অমন বিপজ্জনক জায়গায় যাবে—সতীশবাবুর তা মাথায় ঢোকেনি। বললেন, একেই বলে নিয়তির টান মশাই, নিয়তি তাকে টানছিল···।"

চন্দন হঠাৎ বলল, "ওর কি ভারটিগো রোগ ছিল? তা থাকলে মাথা ঘুরে যেতে পারে।"

কিকিরা বললেন, "সে-খবর নিইনি।"

তারাপদ বলল, "সতীশবাবুর কথা থেকে কি আপনার মনে হল, ওঁর মনে কোনও সন্দেহ আছে?"

"সন্দেহের কথা কেমন করে বলবেন! তবে আমার মনে হল, ব্যাপারটা এমনই যে, সতীশবাবু মনে-মনে মেনে নিতে পারেননি।"

"লোচন সম্পর্কে বললেন কিছু?"

"না। নিজের ভগিনীপতি সম্পর্কে চুপচাপ দেখলাম। বেশি কিছু বললেন না। হয়তো এড়িয়ে গেলেন।"

চন্দন বলল, "আপনার কী মনে হচ্ছে?"

"ভাবছি। এখনও অনেকের সঙ্গে দেখা করা বাকি। দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। মুশকিল কী জানো চাঁদু, যে দু'জন বড় সাক্ষী ছিল, তাদের একজন এখন চা-বাগানে, অন্যজন বেপাত্তা। ঘটনা যে-সময় ঘটেছে তখন ওরা ওখানে ছিল। ওরাই বলতে পারে।"

বাধা দিয়ে তারাপদ বলল, "সার, অন্য দু'জন কাছে ছিল কিন্তু পাশে বা গায়ের কাছে ছিল না। আমার যতদূর মনে হচ্ছে লোচন সেইরকমই বলেছিল।"

চন্দন বলল, "সতীশবাবুর কী ধারণা, এই লোকটা মোহন হলেও হতে পারে?"

"না। তা নয়; তবে তিনি ধোঁকা খেয়েছেন। ....মরা মানুষ ফিরে আসে না—এটা সবাই বোঝে। কথা হল, মোহন সত্যিই মারা গিয়েছে কি না?"

"সতীশবাবুরও সন্দেহ রয়েছে?"

"বাইরে প্রকাশ করলেন না, ভেতরে মনে হল, কোনও একটা সন্দেহ আছে।"

চন্দন আর তারাপদ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

কিকিরা তাঁর মচকানো পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন নিজে। দেখালেন চন্দনকে, "হাঁটতে পারি। ব্যথা কম। বেশি হাঁটাচলা করলে ব্যথা বাড়ে।"

"আপনি তা হলে বেশি হাঁটাচলা করছেন ?"

হাসলেন কিকিরা, ছেলেমানুষ যেমন করে মিথ্যে গল্প সাজায়, অবিকল সেইভাবে বললেন, "না, কোথায় ? রিকশায়-রিকশায় ঘুরি। আজকাল আবার অটো বেরিয়েছে।" বলে অন্য কথায় চলে গেলেন। "কাল আমি তুলসীবাবুর কাছে যাব। পটুয়াটোলা লেন। উনি ম্যানেজার ছিলেন দত্ত কোম্পানির ছাপাখানার। তুলসীবাবুই একমাত্র লোক যিনি জাল মোহনকে সামনাসামনি দেখেছেন। দেখি তিনি কী বলেন ?"

"আরও তো আছে।"

"হ্যাঁ, ভবানী আর সেই উকিল মিহিরবাবু, থিয়েটার-পাগলা।"

"সবই কি একদিনে সারবেন ?"

"তা বোধ হয় হবে না। দেখি ! একটা কথা আমায় বড় ভাবাচ্ছে হে ! তোমরা নিশ্চয় লক্ষ করেছ, যে দু'জন লোক লোচনদের সঙ্গে ছিল তখন—মানে ঘটনার সময়, তাদের কেউ আর কলকাতায় নেই। একজন চলে গিয়েছে চা-বাগানে, অন্যজন কোথায় কেউ জানে না। তার চেয়েও যা আশ্চর্যের ব্যাপার, লোচনের মেজো শ্যালক আগে কলকাতাতেই থাকত। ঘটনার পর সে চা-বাগানে চলে গিয়েছে চাকরি নিয়ে। সতীশবাবুই আমাকে বললেন। মোহনের বন্ধু সম্পর্কে অবশ্য তিনি কিছু জানেন না। আমি ভাবছি, এই দুটো লোককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, না, তারা নিজেরাই সরে গেছে। লাখ টাকার প্রশ্ন হে ! জবাবটা কে দেবে ?"

॥ ৫ ॥

পরের দিন কিকিরা এলেন তুলসীবাবুর বাড়ি। সঙ্গে তারাপদ। বিকেল শেষ করেই এসেছেন।

পটুয়াটোলা গলির যে-বাড়িতে তুলসীবাবু থাকেন—তার চেহারা দেখলে মনে হয়, বাড়িটা এই বুঝি ভেঙে পড়বে। ওই বাড়িতেই তিন-চার ঘর ভাড়াটে। তুলসীবাবু থাকেন দোতলার একপাশে।

তুলসীবাবু যে-ঘরে থাকেন সেই ঘরেই কিকিরাদের বসতে হল। একটা খাট, টেবিল, চেয়ার আর বেতের মোড়া। কাঠের এক আলমারি একপাশে। ঘর ছোট, জানলা মাঝারি। দরজা-জানলার পাল্লায় রং বলে কিছু নেই আর। দেওয়ালে চুনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

তুলসীবাবু কলঘরে গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন।

মানুষটির যত না বয়েস হয়েছে তার চেয়েও বুড়োটে দেখায়। রোগা চেহারা, মাথার চুল সাদা, চোখে গোল-গোল চশমা। পরনে ধুতি আর গায়ে ফতুয়া।

পাখা চলছিল, আলোও জ্বালা ছিল।

কিকিরারা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন।

তুলসীবাবু ভাল দেখতে পান না। ছানি-কাটানো চোখটা প্রায় অন্ধ। ঠাওর করে দেখতে-দেখতে বললেন, "কে আপনারা ?"

কিকিরা নিজেদের পরিচয় দিলেন। বললেন, লোচনবাবুর মুখ থেকে ওঁর কথা শুনে তাঁরা আসছেন।

তুলসীবাবু সরল মানুষ, ঘোর-প্যাঁচ বড় বোঝেন না। বললেন, "বড়দা পাঠিয়েছে ?"

কিকিরা বললেন, "না, তিনি পাঠাননি। তাঁর মুখে আপনার কথা শুনে আসছি।"

"ও ! তা আমি কী করতে পারি ?"

"আপনি খবরের কাগজ দেখেন ?"

"দেখি। পড়তে কষ্ট হয়। আতস কাচ চোখে লাগিয়ে পড়ি খানিকটা।"

কিকিরা কাগজের নাম বললেন। পকেটে ছিল একটা পুরনো কাগজ। বললেন, "লোচনবাবু কাগজে একটা নোটিস ছেপেছেন। জানেন আপনি ? না, পড়ব ! কাগজ সঙ্গে করে এনেছি।"

তুলসীবাবু মাথা নাড়লেন। "আমি দেখেছি। প্রাণকেষ্টও আমাকে বলেছে।"

"প্রাণকেষ্ট কে ?"

"ছাপাখানায় কাজ করে। পিয়ন। সে কাছাকাছি থাকে। প্রায়ই আসে আমার কাছে। সে বলছিল।"

"তা হলে তো আপনি সবই জানেন।"

"ওটা জানি।"

"লোচনবাবু বলছিলেন, মোহন নাম নিয়ে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।"

মাথা নাড়লেন তুলসীবাবু, "এসেছিল। আমি তো একটা চিঠি লিখে প্রাণকেষ্টর হাত দিয়ে বড়দাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"যে এসেছিল সে কি মোহন ?"

তুলসীবাবু খাটের ওপর বসেছেন ততক্ষণে। ভদ্রলোকের অভ্যেস হল হাঁটু মুড়ে আসন করে বসা। সেইভাবেই বসেছেন। হাতে গামছা। ছোট। বোধ হয় ভিজে। পায়ের চেটো মোছাও তাঁর অভ্যেস। পা মুছতে-মুছতে বললেন, "চোখে ভাল দেখি না। ঘরের বাতিটাও জোরালো নয়। যে-ছেলেটি এসেছিল তাকে দেখে ছোড়দা বলেই মনে হচ্ছিল। বুঝতে অসুবিধেই হয়। গালে দাড়ি রেখেছে। চোখে চশমা। ক' বছর পরে আচমকা দেখা। ছোড়দা নেই জানি, হঠাৎ তাকে দেখবই বা কেমন করে ? ভূত বলে চমকে উঠতে হয়। যথার্থ কথা বলতে কী—আমি এমনই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যে, ভাল করে কিছু বুঝিনি।"

তারাপদ কিকিরার মুখের দিকে তাকাল। তারপর চোখ ফিরিয়ে তুলসীবাবুর দিকে। "আপনার ভাইঝিও তো দেখেছেন।" তারাপদ বলল।

"মায়া ! হ্যাঁ, মায়াও দেখেছে।"

"উনি কী বললেন ?"

"ও বলল, মোহন।"

"উনি চিনলেন ?"

তুলসীবাবু বললেন, "এসেছিল আমার কাছে, আসা-যাওয়ার পথে মায়ার সঙ্গে দেখা। দেখেছে ঠিকই। তবে ভুল না ঠিক—আমি তো বলতে পারব না।"

তারাপদ ঘরের বাতিটা দেখছিল, সত্যিই বড় টিমটিমে, ষাট পাওয়ারের বাল্ব হবে বড়জোর। তার ওপর পুরনো। হলুদ-হলুদ দেখায়। বাইরের একফালি বারান্দায় যা আলো তা আরও কম। তুলসীবাবুর ভাইঝি ঠিক দেখেছে কি না কে জানে !

কিকিরা তুলসীবাবুকে দেখছিলেন। বললেন, "আপনার কি মনে হল, এখানে যে-লোকটি এসেছিল—সে মোহন হলেও হতে পারে ?"

তুলসীবাবু যেন কিছু ভাবছিলেন ; বললেন, "দেখুন, মরা মানুষ আর তো ফিরে আসে না। ছোড়দা ফিরে আসবে কে ভাবতে পারে ! তবু ওরই মধ্যে যে-সময়টুকু ও ছিল—আমার মনে হচ্ছিল ছোড়দা হলেও হতে পারে।"

"কেন মনে হচ্ছিল ?"

"কথা শুনে। আমাকে ওরা 'কাকা' বলে ডাকে। ছোড়দা বরাবর কাকাবাবু বলত, বড়দা 'কাকা' বা 'তুলসীকাকা' বলে। দেখলাম ও আমাকে কাকাবাবুই বলছে। গলার স্বর আমি ঠিক বুঝিনি। ছেলেটি বড় কাসছিল। তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজে গলা বসে গিয়েছে।"

আপনার ত্বকের প্রতি চন্দ্রিকার সাতটি অঙ্গীকার

চন্দ্রিকা প্রকৃতিকে আপনার ত্বকের যত্ন নেবার কাজে লাগায়। এতে কোনও জন্তুর চর্বি নেই। গ্লিসারিণে সমৃদ্ধ এর ফেনা আপনার ত্বককে উজ্জ্বল স্বাস্থ্য সম্পন্ন করতে লালন পালন করে। পঞ্চাশ বছর ধরে লাখ লাখ লোক এর ওপর বিশ্বাস রাখে, এমন কি আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি দেশেও চন্দ্রিকা রপ্তানী হয়। এখন আপনি আবিস্কার করুন এর কারণ কি।

নারিকেলের তেল

আপনার ত্বকের পুষ্টি বাড়ায়, নরম রাখে আর তামাটে রঙ্ হাল্কা করে।

গ্লিসারিণ

আপনার ত্বককে সারা বছর মসৃণ ও নমনীয় রাখে।

বুনো আদা

আপনার ত্বককে আরাম দেয় এবং সংক্রামক রোগ ও ফুস্কুড়ির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

কমলা তেল

ত্বকের ছিদ্রকে সঙ্কুচিত করে ও ব্রণ বা মেচেতা থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে।

লেবুর খোসার তেল

তাজা ও ঠাণ্ডা অনুভূতি আনে। এবং সেই সঙ্গে ত্বক সংকোচক কাজের জন্য অনেক গভীরে প্রবেশ করতে পারে এমন ঘন ফেনা তৈরী করে।

চন্দনের তেল

আপনার ত্বককে শীতল, তাজা ও মৃদু সুগন্ধময় করে রাখে।

চাল মুগরার তেল

ত্বকের কোনও রকম সমস্যা, ফুস্কুড়ী বা অন্য কোনও রোগের আক্রমন থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

MAA COMMUNICATIONS 1543 BEN

কিকিরা বললেন, "মাত্র এই, না আর কিছু আছে ?"

"আছে।" তুলসীবাবু মাথা হেলিয়ে বললেন, "ছোড়দা থাকতে প্রেসে যারা কাজকর্ম করত তাদের সকলের নাম বলল ছেলেটি। কে কোথায় কাজ করত তাও বলল। ওদের কথা জিজ্ঞেস করল।"

"তারা সবাই এখনও আছে প্রেসে ?"

"না। একজন নিজেই চলে গিয়ে একটা ছোট ছাপাখানা খুলেছে। আর-একজন মারা গেছে।"

"অন্য কথা কী বলল !"

"রং-এর কাজের জন্যে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মেশিন কেনা হয়েছিল। ছোড়দা মারা যাওয়ার আগে সেটা চালু করা যাচ্ছিল না। সেই মেশিনের কথা জিজ্ঞেস করল।"

"সবই ছাপাখানার কথা ?"

"বাড়ির কথাও বলছিল।"

"কী কথা ?"

"ছোড়দার শখ ছিল পাখি পোষার। বাড়িতে মস্ত খাঁচা ছিল দুটো। পাখি রাখত। তা ছাড়া, ওর ঘর—যে-ঘরে ও থাকত—তার কথাও বলল।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "ও কি এ-ঘরে বসেনি ?"

"না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।"

"আপনি বসতে বলেননি ?"

"না বোধ হয়। আমি তখন নিজের হুঁশে ছিলাম না। কী দেখছি, কী শুনছি— ভাল করে বুঝতেই পারছিলাম না। বিশ্বাসও হচ্ছিল না।"

তুলসীবাবু যে রীতিমতন বিভ্রমে পড়েছিলেন, তাঁর কথা থেকে বোঝাই যাচ্ছিল।

কিকিরা বললেন, "মোহনের এমন কোনও চিহ্ন ছিল শরীরে, ধরুন মুখে, কপালে, গলায় বা অন্য কোথাও, যা চোখে দেখা যায় ? আপনি কি সেরকম কিছু দেখেছিলেন ?"

তুলসীবাবু মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "তখন এসব কথা মনে হয়নি। তবে মনে হচ্ছে, কপালের ডান পাশে বড় আঁচিলটা চোখে পড়েছিল। সঠিক করে কিছু বলতে পারব না মশাই।"

গামছাটা খাটের মাথায় রেখে দিলেন তুলসীবাবু। চোখের চশমার কাচ মুছলেন। ছানি-কাটা চোখটার জন্য চশমার যে কাচ রয়েছে— সেটা যেমন মোটা তেমনই ঘোলাটে রঙের। চশমা চোখে দিলেন উনি।

কিকিরা বললেন, "আপনি দত্তদের প্রেসে কতদিন কাজ করেছেন ?"

আঙুল দিয়ে মাথার সাদা চুল গুছিয়ে নিতে-নিতে তুলসীবাবু বললেন, "আটত্রিশ বছর।"

"আটত্রিশ...।"

"যখন ঢুকেছিলাম তখন ছেলে-ছোকরা ছিলাম। যখন চলে এলাম তখন বুড়ো। আমি ছাপাখানায় ঢুকেছিলাম বিল-কেরানি হয়ে। হিসাবপত্র লিখতাম খাতায়, বিল তৈরি করতাম, আদায় দেখতাম। ওইভাবেই ধীরে-ধীরে ছাপাখানার কাজকর্মের অনেক কিছু শিখলাম। বড়বাবু বেঁচে থাকতেই আমি ছোট ম্যানেজার। তখন বড় ম্যানেজার ছিলেন শচীনবাবু।"

"বড়বাবু মানে রামকৃষ্ণ দত্ত ?"

"হ্যাঁ। বড় ভাই রামকৃষ্ণ, ছোট ভাই শ্যামকৃষ্ণ।"

"রামকৃষ্ণ কেমন মানুষ ছিলেন ?"

"খুব ভাল মানুষ। সদাশিব। শ্যামকৃষ্ণ ছিলেন কাজের মানুষ। তাঁর কথামতনই প্রেস চলত। কাজ বুঝতেন। বড়বাবুর ছিল নানা জায়গায় জানাশোনা। তাঁর খাতির ছিল। সেই খাতিরে আমরা বড়-বড় কাজ ধরতাম। মোদ্দা কথাটা কি জানেন বাবু, ছাপাখানা শুরু করেন বড়বাবুর বাবা। তখন যা ছিল, ছেলেদের হাতে পড়ে

তার দশগুণ বেড়ে যায়।"

কিকিরা বললেন, "রামকৃষ্ণ যে মোহনকে পোষ্য নিয়েছিলেন এ-কথা নিশ্চয়ই জানেন ?"

"সে আর জানব না !"

"ভাইয়ে-ভাইয়ে সদ্ভাব ছিল ?"

"ভালই ছিল।...তবে কী জানেন, নদীর ওপর দেখে তল বোঝা যায় না।"

"লোচনবাবু আর মোহনবাবুর মধ্যে... ?"

কিকিরা তাকিয়ে থাকলেন তুলসীবাবুর মুখের দিকে। লক্ষ করছিলেন।

তুলসীবাবু বললেন, "এঁদের মধ্যেও ভাব ছিল। অন্তত বাইরের কথা বলতে পারি। ভেতরের কথা কেমন করে বলব ?...দু'জনে দু' ধাতের। বড়দা ব্যবসা বুঝতেন, ছোড়দা ছিল খামখেয়ালি।"

কিকিরা বুঝতে পারলেন, তুলসীবাবু ভেতরের কথা গোপন করতে চাইছেন। এ-সময় ওঁকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

কিকিরা বললেন, "মোহনকে আপনি পছন্দ করতেন না ?"

"সে কী ! মালিক বলে কথা। ছোটবাবু খানিকটা ছেলেমানুষ ছিলেন। তবে ভালমানুষ।"

কিকিরা আবার কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তা আপনি কী মনে করেন ? মোহন নামে যে-লোকটি এসেছিল সে জাল জোচ্চোর ? কোনও মতলব নিয়ে এসেছিল ?"

তুলসীবাবু সঙ্গে-সঙ্গে কথার জবাব দিলেন না, পরে মাথা নেড়ে-নেড়ে বললেন, "মরা মানুষ কেমন করে ফিরে আসে ?"

"তা হলে এই লোকটা জাল ?"

তুলসীবাবু কিছুই বললেন না।

কিকিরাই আবার বললেন, "আপনার কি মনে হয় কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা এসেছিল ? কিছু বলল সে ?"

"না। সে আমায় একটা কথাই বারবার বলেছে। সে মোহন।"

কিকিরা কথা ঘোরালেন। বললেন, "আচ্ছা তুলসীবাবু, একটা কথা। মোহনের বয়েস হয়েছিল। সে যদি বছর পাঁচেক আগে মারা গিয়ে থাকে, তার বয়েস তখন তিরিশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। দত্ত-পরিবারে এতদিন পর্যন্ত কোনও ছেলে কি আইবুড়ো থাকে ? মোহনের বিয়ে হয়নি কেন ?"

তুলসীবাবু বললেন, "কথাবার্তা হচ্ছিল। বড়দার ঠিক পছন্দ মতন মেয়ে জুটছিল না।"

কিকিরা এবার একটু হাসলেন। ইশারা করলেন তারাপদকে। উঠতে বললেন। নিজেও উঠে পড়েছিলেন। বললেন, "দত্তদের ছাপাখানার আয় কেমন ?"

তুলসীবাবু বলব কি বলব-না করে বললেন, "কাজ ভালই হয়। হালে বছর কয়েক খানিকটা মন্দা যাচ্ছে। আজকাল সব পালটে যাচ্ছে মশাই। ছাপাখানাও ভাল-ভাল হচ্ছে। তা যাই হোক, পুরনো খানিকটা কদর তো থাকেই। আমার মনে হয়, বছরে লাখখানেক টাকার বেশি বই কম আয় ছিল না ছাপাখানা থেকে।"

"আয় তবে মন্দ কী !...আচ্ছা, ছাপাখানার ওপর-ওপর ভ্যালুয়েশন কত হবে ?"

তুলসীবাবু মাথা নাড়লেন। "আমি বলতে পারব না।"

"মোহনের অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তির মালিক তো লোচনবাবুরা ?"

মাথা নোয়ালেন তুলসীবাবু। "হ্যাঁ।"

"মোহন না থাকলে ষোলোআনা লাভটা তবে লোচনবাবুর ?"

তুলসীবাবু কিছু বললেন না।

কিকিরাও আর দাঁড়ালেন না ঘরে। তারাপদকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

॥ ৬ ॥

কয়েকটা দিন কিকিরা যে কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়ালেন তিনিই জানেন। সকাল-বিকেল দু'বেলাতেই তাঁর টহল চলছিল।

সেদিন তারাপদ আর চন্দন এল বিকেলের দিকে, এসে দেখল, কিকিরা নিজের মনে পেশেন্স খেলছেন। আসলে অভ্যাসবশে খেলছেন, মনে-মনে কিন্তু ভাবছেন কিছু। এটা তাঁর অভ্যাস। ওদের দেখে তাস গুটিয়ে নিলেন কিকিরা।

চন্দন বলল, "কী ব্যাপার, আপনি ঘরে বসে আছেন ? রাউন্ডে যাননি ? মানে রোঁদে ?"

ঠাট্টা করেই কথাটা বলেছিল চন্দন। তারাপদর মুখে সে শুনেছে, কিকিরা যেন জাল মোহন ধরার জন্যে খেপে গিয়েছেন। হরদম ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাইরে। তারাপদ দু'দিন এসে দেখা পায়নি তাঁর, অপেক্ষা করে-করে ফিরে গিয়েছে।

কিকিরা বললেন, "না, আজ বেরোইনি ; ঘাড়ে রদ্দা খেয়েছি। ব্যথা।"

চন্দন বলল, "মানে ? লোচন দত্তর পালোয়ান আপনাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে ?"

"না না," কিকিরা বললেন, "লোচন কেন হবে, এক বেটা ভূত। ট্রাম থেকে নেমেছি, কোত্থেকে একটা ভূত ছুটতে-ছুটতে এসে ঘাড়ে পড়ল। তারপর হতভাগা লাফ মেরে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ে চলে গেল।"

"সে কী ? আপনি তো ট্রামের চাকার তলায় চলে যেতেন সার ?"

"নাইন্টি পার্সেন্ট চান্স ছিল। কিন্তু লেগ ব্রেক দিলাম...।"

"লেগ ব্রেক," চন্দন অবাক-অবাক মুখ করে বলল, "ওটা তো ক্রিকেটের ব্যাপার। আপনি কি ক্রিকেটও খেলেছেন ? বোলার ছিলেন ?"

মাথা নাড়তে কষ্ট হল কিকিরার, তবু সামান্য মাথা নেড়ে বললেন, "নো স্যান্যাল উড, নো। সাহেবদের ওই রাবিশ খেলা আমি কখনও খেলিনি। ওর চেয়ে আমাদের গুপো ডাংগুলি অনেক ভাল।...আমি আমার পায়ের কথা বলছিলাম। লেগটায় ব্রেক মেরে নিজেকে সামলে নিলাম। হাতে লাঠিও ছিল।"

চন্দন হাসতে-হাসতে বলল, "মাঝে-মাঝে আপনার লেগের ব্রেক ফেল করে যায়, এই যা দুঃখ ! খানাখন্দে গিয়ে পড়েন।"

কিকিরা বললেন, "ভগবানের রাজ্যে সবই মাঝে-মাঝে ফেল করে হে ! লেগও করে, হার্টও করে।"

তারাপদ জোরে হেসে উঠল। চন্দনও হেসে ফেলল।

হাসি-তামাশা শেষ হলে তারাপদ বলল, "সার, আপনার কথামতন আমি লোচনবাবুর বন্ধু ভবানীর খোঁজ লাগিয়েছিলাম। ক্রিক রোয়ে আমাদের অফিসের বিশ্বাসদা থাকেন। সিনিয়ার লোক। উনি বললেন, ভবানী একটা জুয়াড়ি। চারদিকে দেনা করে বেড়ায়। ওর কথার কোনও দাম নেই। লোচনকেও চেনেন বিশ্বাসদা। দুই বন্ধুতে খুব ভাব। ভবানী বোধ হয় টাকা ধার নেয় লোচনের কাছ থেকে।"

কিকিরা বললেন, "লোচনের পার্টি বলছ ! তা হতে পারে।"

"মোহন নামের ভেজাল লোকটা ভবানীকে কেন ধরল বলুন তো ?"

"বোধ হয় বন্ধুকে দিয়ে বলালে লোচন আরও তটস্থ হবে—এইজন্যে। আর কী হতে পারে।"

চন্দন বলল, "আপনি কোথায়-কোথায় ঘুরছিলেন ? পেলেন কিছু ?"

কিকিরা যে এর মধ্যে লোচনের কাছে বার দুই গিয়েছেন—ওরা জানত। দত্তদের প্রেসেও কিকিরা উঁকিঝুঁকি মেরেছেন। মোহনের ফোটোও পেয়েছেন লোচনের কাছ থেকে। এই খবরগুলো তারাপদর জানা ছিল। তারাপদর মুখ থেকে চন্দনও শুনেছে।

কিকিরা বললেন, "দুটো কাজ করেছি। একটাও অবশ্য

পুরোপুরি সারা হয়নি, তবু হয়েছে খানিকটা।"

"যেমন ?"

"উকিল এবং নাটক-পাগলা মিহিরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কথাও হয়েছে অল্পস্বল্প। আগামীকাল আমায় যেতে বলেছেন বাড়িতে।...কাল ওঁর ক্লাবের ছুটি। কোনও কাজ নেই।"

"দ্বিতীয়টা কী ?"

"মোহনের সেই বন্ধুর খবর জোগাড় করেছি।"

তারাপদ বলল, "খবর পেয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। ওর নাম অমলেন্দু। অমলেন্দু গুপ্ত। ডাকনাম— সিতু। লোচন পুরো নামটা বলতে পারেনি। বা চায়নি। বারবার বলেছে, মোহনের ওই বন্ধুটি নতুন। সে ভাল করে চেনে না। সেবারই প্রথম তাদের সঙ্গে গিয়েছিল।"

"আপনি খবর জোগাড় করলেন কেমন করে ?"

"ঘুরে-ঘুরে। মোহনের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে। অমলেন্দুর বাড়ির ঠিকানা ছিল দমদম চিড়িয়া মোড়। সেখানে সে একাই একটা ঘর ভাড়া করে থাকত। তার মা ছিল বর্ধমানের মানকরে। অমলেন্দু পেশায় ছিল ফোটোগ্রাফার। চাকরি-বাকরি করত না। একটা দোকানে মাঝে-মাঝে বসত, আর নিজের তোলা ছবি বিক্রি করত কাগজে, ম্যাগাজিনে। একা মানুষ, চলে যেত।"

চন্দন বলল, "তা সে দিল্লি চলে গেল কেন ?"

"চাকরি পেয়েছিল। একটা ম্যাগাজিনে। ইংরেজি ম্যাগাজিন।"

"এখনও দিল্লিতে ?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন সাবধানে। "না, দিল্লিতে নেই।"

"কোথায় সে ?"

"দিল্লির ঠিকানা যে-বন্ধু জানত, সে বলল— মাস কয়েক আগেও অমলেন্দু দিল্লিতে ছিল। চিঠি পেয়েছে তার। তারপর চিঠিপত্র আর পায়নি। খবর নিয়ে জেনেছে দিল্লিতে সে নেই।"

বগলা চা নিয়ে এল।

তারাপদদের চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। বলল, "পরে খাবার আনছে।"

কিকিরা বললেন, "মোহনের খুবই বন্ধু ছিল অমলেন্দু। সকলেই বলল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, লোচন দত্ত এই ছোকরার কথায় অনেক কিছু চেপে গেল কেন ? অমলেন্দুর কথা সে ভাল করেই জানত। জানে। অথচ এমন ভাব করল লোচন, যেন সে ভাল করে চেনেই না অমলেন্দুকে।"

চন্দন বলল, "অমলেন্দু যে দিল্লি চলে গেল— এটা কি সত্যি-সত্যি চাকরি পেয়ে ? না, সে সরে গেল ?"

"মানে ? কী বলতে চাইছ ?"

"বলছি, লোচন কি তাকে সরাবার ব্যবস্থা করল ?...যদি করে থাকে, কেন করল ?"

কিকিরা বললেন, "সেটাই তো কথা হে ! মোহন মারা যাওয়ার পর একজন গেল চা-বাগানে, আর-একজন দিল্লিতে। এই দু'জনেই বড় সাক্ষী। লোচন না হয় নিজের শ্যালকটিকে সরাল, অমলেন্দুকে সরাল কেমন করে ?"

তারাপদ বলল, "সার, লোচন এসব করবে কেন ? করতে পারে, যদি সে দোষী হয় !"

"তা তো ঠিকই।"

"আপনি তবে বলছেন লোচন দোষী ?"

কিকিরা বললেন, "মুখে বললে তো হবে না, প্রমাণ চাই।...আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, লোচনের মেজো শ্যালক কাজকর্ম তেমন কিছু করত না। লোচন তাকে নিজেদের বাড়ির কাজকর্মে খাটাত। তা শ্যালককে না হয় সে সরিয়ে দিল চা-বাগানে। দিতেই পারে। শ্যালক তো তার ভগিনীপতির স্বার্থ দেখবে ! কিন্তু অমলেন্দু ? এটা আমি বুঝতে পারছি না। সে নিজেই চলে গেল কাজ পেয়ে ? না, লোচন তাকে টাকাপয়সা দিয়ে বশ করল ?"

চন্দন বলল, "তা আপনার পুরো হিসাবটাই হল, আপনি লোচনকে কালপ্রিট ভাবছেন।"

"হ্যাঁ।"

"যদি সে দোষী না হয় ?"

"বলতে পারছি না। লোচনকে আমি সন্দেহ করছি। সে অনেক মিথ্যে কথা বলেছে। বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যানটা লোচনই করেছিল।"

"কে বলল ?"

"লোচন নিজেই বলেছে। প্রথমে সে অন্য কথা বলছিল। কথায়-কথায় স্বীকার করে ফেলল, বেড়াতে যাওয়ার কথাটা তার মাথাতেই এসেছিল।"

"জায়গাটাও কি সে বেছে নিয়েছিল ?"

"না বোধ হয়। তবে, যেখানেই যাক, তার একটা মতলব থাকতে পারে। সে শুধু সুযোগ খুঁজছিল। কোনওরকমে একটা সুযোগ পেলে সেটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে।"

"আপনি সার, লোচনকে বড় বেশি সন্দেহ করছেন।"

কিকিরা মাথা হেলালেন। বললেন, "করছি, কারণ— মোহন মারা গেলে একমাত্র লোচনেরই লাভ। পুরো বিষয়-সম্পত্তি, ছাপাখানার মালিকানা তার। স্বার্থ তার। সন্দেহ তাকে ছাড়া অন্য কাকে করব ?"

চন্দন বলল, "কিন্তু যদি এমন হয়— এটা সত্যিই দুর্ঘটনা, মোহন অসাবধানে ছিল, পা হড়কে পড়ে গিয়েছে ! নিত্যদিন কত অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে, আমরা তার কিছু খোঁজ তো রাখি। সাধারণ ব্যাপার, তবু অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেল।" বলে চন্দন একটু থামল, চা খেল দু' চুমুক, তারপর হঠাৎ বলল, "এই যে আপনি ট্রামের চাকার তলায় চলে যাচ্ছিলেন, বরাতজোরে বেঁচে গেলেন, যদি বরাত একটু মন্দ হত— কী অবস্থা দাঁড়াত, সার ?"

কিকিরা একটু হাসলেন। পকেটে হাত ডুবিয়ে বললেন, "আমার বাড়িতে কে বা কেউ একটা ফ্লাইং লেটার ফেলে গিয়েছে।"

"ফ্লাইং লেটার··· !" তারাপদ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

"উড়ো চিঠি।" বলতে-বলতে পকেট থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিলেন তারাপদর দিকে।

তারাপদ হাত বাড়িয়ে খামটা নিল। সাদা খাম। মুখ ছেঁড়া। খামের ওপর কোনও নাম লেখা নেই। খামের মধ্যে একটুকরো কাগজ। তারাপদ কাগজটা বের করল। পড়ল।

"জোরে-জোরে পড়ো।"

তারাপদ পড়ল : "দাদু, আর নয়। নিজের চরকায় তেল দিন। বাড়াবাড়ি করলে বিপদে পড়বেন।" পড়া শেষ করে সে অবাক হয়ে বলল, "এ কী ! এ-চিঠি কেমন করে এল ? কে দিয়ে গেল ?" বলতে-বলতে চিঠিটা চন্দনের দিকে এগিয়ে দিল।

কিকিরা বললেন, "আমার ফ্ল্যাটের সদর দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গিয়েছে।"

"কে, কবে ?"

"কে, তা জানি না। চিঠিটা গতকাল পাওয়া গেছে।"

চন্দন বলল, "এ তো মনে হচ্ছে পাড়ার মস্তান টাইপের ছেলের কাজ। দাদু— আপনাকে দাদু বলেছে।"

কিকিরা মাথার সাদা চুল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বললেন, "আদর করে বলেছে হে ! একমাথা সাদা চুল। তা বলুক। কথাটা হল, আমি কার চরকায় তেল দিচ্ছি— এ-কথা সে জানল কেমন করে ? লোচন ছাড়া অন্য যারা জানে তাদের মধ্যে রয়েছেন অনিলবাবু, সতীশবাবু, প্রফুল্ল-ডাক্তার, তুলসীবাবু। ভবানীকে দেখিনি। আর মিহিরবাবুর সঙ্গে আমার এখনও সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়নি।"

তারাপদ বলল,"আপনার ঠিকানা এরা সবাই জানে ?"

"লোচন জানে। আর কাউকে তো ঠিকানা বলিনি।"

"এ কি তবে লোচনের কাজ ? সে কোনও ভাড়াটে লোক লাগিয়েছে !" তারাপদ ধাঁধায় পড়ে গেল। তাকাল চন্দনের দিকে। বলল, "ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত তো ! লোচন নিজেই খবরের কাগজে নোটিস ছাপছে, জাল মোহনকে ধরে দিলে তিরিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে বলছে, আবার সেই লোকই কিকিরাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছে। ব্যাপারটা কী ! আমি তো কিছুই বুঝছি না।"

চন্দনও বুঝতে পারছিল না। বলল, "যে-লোকটা ট্রাম লাইনের কাছে আপনাকে ধাক্কা মেরেছিল— সে কি এইসবের মধ্যে আছে, কিকিরা ?"

কিকিরা বললেন, "বলতে পারছি না। লোকটাকে আমি দেখেছি। বাঙালি। তবে উটকো ধরনের। চেহারা দেখে গুণ্ডা-বদমাশ মনে হয় না। আহম্মক মনে হয়।"

"ও বাঙালি, আপনি কেমন করে বুঝলেন ?"

"ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল। আমি সামলে নেওয়ার পর ও নিজেও সামলে নিল নিজেকে। তারপর 'সরি' বলে ছুটে গিয়ে ট্রামে উঠে পড়ল।"

"সরি কি বাংলা শব্দ, সার ?"

"আজকাল সবাই সরি বলে। বাজারের মাছঅলারাও। ওর 'ছরি' বলা শুনে বাঙালি মনে হল।"

তারাপদ বলল, "ছেড়ে দিন বাঙালি-অবাঙালি ! আদত কথাটা কী তাই বলুন ? কী মনে হয় আপনার ? এই উড়ো চিঠির মানে কী ? লোচন কি আপনাকে নিয়ে খেলা করছে ?"

কিকিরা কিছু বললেন না।

চন্দন বলল, "সার, আমার পরামর্শ হল— আপনি আর একলা-একলা খোঁড়া পা নিয়ে ঘোরাফেরা করবেন না। সঙ্গে আমাদের রাখবেন। তারাকে সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যাবেন না। নেভার।"

কিকিরা বললেন, "কাল একবার মিহিরবাবুর কাছে যাব। তারাপদকে সঙ্গে নিয়েই।"

॥ ৭ ॥

মিহিরবাবু মানুষটিকে দেখলে খোলামেলাই মনে হয়। চেহারাটি ভালই, কিন্তু মাথায় সামান্য খাটো, একটু নধর গোছের। মাথার চুল পাকেনি। সামান্য টাক পড়তে শুরু হয়েছে। গোলগাল মুখ। চোখে চশমা। পান-জর্দা-সিগারেট—কোনওটাই বাদ যায় না। কথা বলেন অনর্গল। তবে তারই মধ্যে যা নজর করার করে নিতে পারেন। বাইরে বোঝা যায় না ; ভেতরে তিনি কিন্তু বুদ্ধিমান এবং চতুর। গায়ে পাতলা একটা চাদর মতন থাকে। কাটা হাতটাকে ঢেকে রাখেন।

কিকিরা আর তারাপদকে তিনি খানিকটা বাজিয়ে নিলেন প্রথমে। কিকিরাও কম যান না। কথা বলার ভঙ্গিতে তিনি মিহিরবাবুকে হাসিয়ে ছাড়লেন। দু-একটা খুচরো ম্যাজিকও দেখিয়ে দিলেন সামনে বসে। লাইটার উড়িয়ে দিলেন টেবিল থেকে, আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। মিহিরবাবুর লাইটারের শখ রয়েছে। দু-দুটো লাইটার সামনেই পড়ে ছিল। সিগারেটের প্যাকেটও।

মিহিরবাবু যে-ঘরে বসে ছিলেন, সেটি তাঁর নিজস্ব বৈঠকখানা। সাজানো-গোছানো। দেওয়ালে 'ইভনিং ক্লাবের' নাটকের ফোটো, একপাশে দুটো 'কাপ'। শিশির ভাদুড়ীর বড় ছবি একটা। বইয়ের আলমারিতে ঠাসা বই আর বাঁধানো মাসিক পত্রিকা। আইনের বই একটাও নেই।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মিহিরবাবু পান বিলি করলেন কিকিরাদের। নিজেও পান-জর্দা মুখে পুরে এবার কাজের কথা পাড়লেন। বললেন, "তা মশাই, আপনি তো ম্যাজিক-মাস্টার। হঠাৎ এই গোয়েন্দাগিরিতে নামলেন কেন ?"

কিকিরা অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "ইচ্ছে করে নামিনি, সার। এই যে আমার লেজুড়টিকে দেখছেন, এর পাল্লায় পড়ে হেভেন থেকে ফল করতে হয়েছে।"

"ফল ?"

"আজ্ঞে, ফ্রম ম্যাজিক টু গোয়েন্দা। জাদুবিদ্যা থেকে পাতি গোয়েন্দাগিরিতে পড়ে যেতে হল।"

মিহিরবাবু হেসে উঠলেন। "আচ্ছা ! ফল ফ্রম ম্যাজিক। ...তা আমাদের ক্লাবের যে শো হচ্ছে— পুজোর পর। কালীপুজোতে। তাতে একটু খেলা দেখান না। ক্লাসিকাল ম্যাজিক। ধরুন ঘণ্টাখানেক। বেশ জমে যাবে।"

কিকিরা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আমি আর খেলা দেখাই না। বাঁ হাতটা কমজোরি হয়ে গেছে। সুইফ্‌টনেস নেই। অন্য কাউকে ব্যবস্থা করে দেব, আপনি ভাববেন না।"

নিজেদের ক্লাবের খানিকটা গুণগান গেয়ে মিহিরবাবু বললেন, "আসবেন একদিন ক্লাবে। সোমবার বাদে। কাছেই আমাদের ইভনিং ক্লাব, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গায়েই।"

মিহিরবাবু এবার আসল কথা পাড়লেন। বললেন, "কাজের কথা শুরু করা যাক কিঙ্করবাবু ! বলুন, আমি কী করতে পারি ?"

কিকিরা হেসে বললেন, "সার, আমায় বাবু-টাবু বলবেন না। স্রেফ কিকিরা।"

"অতি উত্তম ! তাই হবে।"

"আপনার কাছে আমি কেন এসেছি, আগেই আপনাকে জানিয়েছি। লোচনবাবুর নোটিস, তিরিশ হাজার টাকা পুরস্কার— সবই বলেছি...।"

"হ্যাঁ, কাগজে আমি দেখেছি।"

"নোটিসের বয়ানটা কি আপনি করে দিয়েছিলেন ?"

"না। মনে হয় অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছে, নিজেও করতে পারে।"

"লোচনবাবু আপনার কাছে এর মধ্যে ক'বার এসেছেন ?"

মিহিরবাবু পান চিবোতে-চিবোতে বললেন, "নিজে একবারও নয়। আমিই ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তখনই এসেছিল ; তারপর আর নয়।"

"মোহনের কথা বলতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"...চিঠি দেখালাম।"

তারাপদ চুপ করে বসে কথা শুনছিল। হঠাৎ বলল, "মোহনবাবু কেমন লোক ?"

মিহিরবাবু পিঠ সামান্য সোজা করে বসলেন। বললেন, "খাশা ছেলে। চমৎকার। অতি চমৎকার। ভদ্র, বিনয়ী, হাসিখুশি। আমার ইভনিং ক্লাবের একজন ইম্পর্ট্যান্ট মেম্বার। আমার এক চেলা। আমাদের রিলেশানটা ছিল বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মতন ; যদিও সম্পর্কে খুড়ো-ভাইপো। ও আমাদের অনেক কাজ করত। থিয়েটারের আগে স্টেজ ভাড়া, সেট সেটিংয়ের ব্যবস্থা, সুভেনির ছাপা—অনেক কাজ রে ভাই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ।"

"নিজে কি অভিনয় করত ?"

"না। একবার মাত্র করেছে," বলে দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখালেন। বললেন, "আমরা লাস্ট ইয়ারে একটা ড্রামা করেছিলাম। ডিটেক্‌শান স্টোরি। গোয়েন্দা গল্পের নাটক। ইংরেজি নাটক থেকে গল্পটা নিয়েছিলাম। আমিই লিখেছিলাম নাটকটা। নাম ছিল 'বিষের ধোঁয়া'। শরদিন্দু বাঁড়ুজ্যের একটা নভেল আছে ওই নামে। সেটা নয়। নামেই যা মিল। নাথিং এল্‌স।...ইয়ে, কী বলছিলাম—সেই নাটকে মোহনকে দিয়ে জোর করে একটা পার্ট করিয়েছিলাম। সামান্য পার্ট। যাও না ভাই, দেওয়ালে টাঙানো ছবিটা দ্যাখো। গ্রুপ ফোটো।"

তারাপদ উঠে গেল ফোটো দেখতে। কিকিরার কাছে সে

মোহনের ফোটো দেখেছে। সামান্য কৌতূহল হচ্ছিল অভিনেতা মোহনকে দেখতে।

কিকিরা কথা বলছিলেন মিহিরবাবুর সঙ্গে। বললেন, "ঘটনাটা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয় ?"

মিহিরবাবু চুপ করে থাকলেন প্রথমে। একটা সিগারেটও ধরিয়ে নিলেন। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন খানিকটা। পরে বললেন, "দেখুন কিকিরামশাই, দত্ত-ফ্যামিলি আমাদের প্রতিবেশী। তিন-চারপুরুষ ধরে একই পাড়ায় আছি। খানিকটা তো ওদের কথা জানি। একসময় দত্তরা বেশ ধনী ছিল। পরে অবস্থা খানিকটা পড়ে যায়। রামকৃষ্ণদা আর শ্যামকৃষ্ণদা ছাপাখানার ব্যবসাটাকে বাড়িয়ে আবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিল। একেবারে যে আন্‌সাকসেসফুল হয়েছিল তাও নয়। পরে যে কী হয়েছিল আমি বলতে পারব না, তবে রামদা শ্যামদা মারা যাওয়ার পর থেকেই ব্যবসা পড়ে যাচ্ছিল। শুনেছি, লোচন বিস্তর দেনা করেছে। ছাপাখানার মেশিনপত্রও সে বেচে দিয়েছে দু-একটা। ...ওদের ভেতরকার ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে যাইনি। আমার এক পুরনো মক্কেলের কাছে জানতে পারলাম, লোচন বেনামে জমি কিনেছে বেহালায়, সেখানে নাকি একটা সিনেমা হাউসও করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে।"

"লোচনবাবুর কি অনেক দেনা ?"

"বলতে পারব না। খানিকটা দেনা তো আছেই।"

"সম্পত্তির ভাগিদার কি দুই ভাই ?"

"হ্যাঁ। সমান-সমান।"

"মোহন তো পোষ্যপুত্র ?"

"তা হোক। তবু। রামকৃষ্ণদা তাঁর স্বোপার্জিত সমস্ত কিছু মোহনকে দিয়ে গিয়েছেন।"

"আপনি জানেন ?"

"জানি।...আরও জানি, লোচন তাদের পৈত্রিক বাড়ির সামনের জমিটুকু বেচে দেওয়ার জন্যে দালাল লাগিয়েছে।"

"কবে থেকে ?"

"হালে।"

কিকিরা বললেন, "মোহনের মৃত্যু সম্পর্কে আপনার কী মনে হয় ?"

মিহিরবাবু মাথা নাড়লেন। যেন বলতে চাইলেন, তিনি আর কী বলবেন ?

"মোহন মারা গিয়েছে ?" কিকিরা বললেন।

"তাই শুনেছি।"

"আপনি কি নিশ্চিত ?"

"অফিসিয়ালি মৃত বলতে পারেন।"

"তবে এই লোকটা কে ? এই যে ফোন করছে, চিঠি লিখছে, তুলসীবাবুর সঙ্গে দেখা করছে, এ কে ?"

মিহিরবাবু কিছু বললেন না।

তারাপদ ডাকল, "একবার এদিকে আসবেন, সার ?"

কিকিরা উঠে গেলেন।

তারাপদ বলল, "'বিষের ধোঁয়া' নাটকের গ্রুপ ফোটো। মোহনকে চিনতে পারেন ? আমি তো পারলাম না।"

কিকিরা দেখলেন। নাটক শেষ হওয়ার পর পাত্রপাত্রীরা যে-যেমন সাজ পরেছিল, মেক-আপ নিয়েছিল—সেই পোশাক আর বেশবাস নিয়েই ফোটোটা তোলা। কিকিরা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন। চিনতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত এক দাড়িওলা বুড়োটে গোছের লোক দেখে তাঁর সন্দেহ হল। কাঁধে কাপড়ের মস্ত ঝোলা নিয়ে যারা পাড়ায়-পাড়ায় পুরনো খবরের কাগজ, কাগজ কিনে বেড়ায়—অবিকল সেই বেশ। মাথায় গামছা বাঁধা। অর্ধেকটা কপাল ঢাকা পড়েছে গামছায়।

কিকিরা বললেন, "এই কাগজওলা।" বলে মিহিরবাবুর দিকে
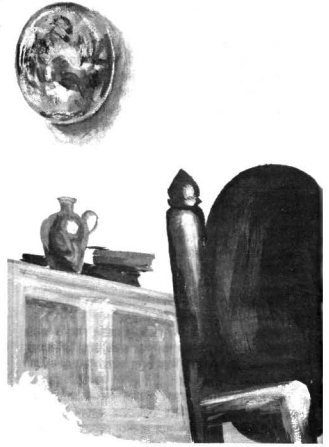
তাকালেন ঘুরে গিয়ে। "এই কাগজওলা মোহন ? বেশ মেক-আপ নিয়েছে তো ?"

মিহিরবাবু হাসছিলেন। মাথা নাড়লেন। বললেন, "না। আপনি ভুল করলেন। ম্যাজিক চলল না মশাই। ওই ফোটোর মধ্যে একজনকে দেখুন—ক্লাউন সেজে দাঁড়িয়ে আছে। ও-ই মোহন। ...ওকে দিয়ে সার্কাসের ক্লাউনের ছোট্ট পার্ট করিয়েছিলাম।"

কিকিরা আবার ছবি দেখলেন, 'বাঃ' বললেন। "চেনা যায় না। ঠকে গেলাম।" বলে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। বসলেন। বললেন, "এই জাল মোহনের আবির্ভাব কেন সার, বলতে পারেন ?"

মিহিরবাবু হেসে বললেন, "গোয়েন্দা আপনি। আমি কী বলব ?"

কিকিরা একদৃষ্টে মিহিরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, বোধ হয় লক্ষ করছিলেন কিছু। শেষে বললেন, "আমারও ধারণা মোহন মারা গিয়েছে। কিন্তু সে বোধ হয় পা পিছলে পড়ে যায়নি, তাকে পাহাড়ের বিশ্রী জায়গা থেকে ঝরনার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। জলের স্রোতের সঙ্গে মোহন নীচে গড়িয়ে গিয়েছে।"

মিহিরবাবু কোনও কথা বললেন না। শুনলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল।

কিকিরা নিজেই বললেন, "এ-কাজ লোচন ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না।"

"কেন ?"

"মোহন যখন পড়ে যায় তখন তার পাশে লোচন ছাড়া কেউ ছিল না। অন্য দু'জন—লোচনের মেজো শ্যালক আর মোহনের বন্ধু খানিকটা পেছনে ছিল। ঝোপঝাড় পাথরের আড়ালও থাকতে

পারে। তারা কিছু দেখতে পায়নি।"

কিকিরার কথা শেষ হওয়ার আগেই মিহিরবাবু বললেন, "আপনার অনুমান ঠিক হতে পারে। তবে আইন অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য করে না। প্রমাণ কী যে, লোচন তার ছোট ভাইকে ঝরনার মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ?"

কিকিরা স্বীকার করে নিলেন, প্রমাণ কিছু নেই।

মিহিরবাবু বললেন, "প্রমাণ ছাড়া কাউকে খুনি হিসাবে ধরা যায় না। প্রমাণটাই আসল। লোচন যে খুনি এ-কথা আপনি প্রমাণ করবেন কেমন করে ?" বলে একটু থেমে আবার বললেন, "নিজের সব কাজ লোচন পরিপাটি করে গুছিয়ে নিয়েছে। দেহাতি ডাক্তারের সার্টিফিকেট, আইডেনটিফিকেশান, থানা—সবই সে গুছিয়ে সেরে রেখেছে। এখন আপনি কেমন করে লোচনকে খুনি বলে সাব্যস্ত করবেন ?"

কিকিরা মাথার চুল ঘাঁটিতে-ঘাঁটতে বললেন, "পারছি কোথায় ? পারছি না সার। এই জিনিসটাও আমার খুব অবাক লাগছে। চার-পাঁচ বছর পরে হঠাৎ জাল মোহনের আবির্ভাবই কেন ঘটল ? কে ঘটাল ? লোচন এত ভয়ই বা পেয়ে গেল কেন যে, ত্রিশ হাজার টাকা ঘর থেকে বের করে দিতে রাজি হল ?"

মিহিরবাবু বললেন, "লোচন ভেবেচিন্তে কাজ করে, বোকা নয়।"

"সেটা বোঝা যাচ্ছে। আসলে লোচন চাইছে এই জাল মোহনের রহস্যটা উদ্ধার করতে।

"মানে সে বুঝতে পেরেছে, এমন কেউ তার সঙ্গে শত্রুতা করছে, যে আসল ঘটনাটা জানে। এই লোকটাকে সে ধরতে চায়।"

"আসল ঘটনা জানতে পারে মাত্র দু'জন। লোচনের মেজো শ্যালক, আর মোহনের বন্ধু। তাদের কাউকেই তো পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে লোচনের মেজো শ্যালক ভগ্নীপতির দলে বলে মনে হয়। আর মোহনের বন্ধুর তো কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।"

"আপনি খোঁজ করেছেন ?"

"অনেক। নামটা জানতে পেরেছি। তার দেশ গ্রামের কথাও জানতে পেরেছি। সে দিল্লিতে ছিল তাও ঠিক। তারপর আর কিছু পারিনি।"

মিহিরবাবুর সামনে জলের গ্লাস ছিল। গ্লাসের ঢাকা সরিয়ে জল খেলেন। বললেন পরে, "কী নাম তার ?"

"অমলেন্দু..."

"তার কোনও ফোটো দেখেছেন ?"

"না।"

"দেখতে চান ?...ওই গ্রুপ ফোটোটার কাছেই যান, আবার 'বিষের ধোঁয়া'। মাঝখানে একজনকে দেখবেন, শিকারির পোশাক পরা, হাতে বন্দুক। ভাল চেহারা। ওই হল অমল—অমলেন্দু। মোহনের বন্ধু।"

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, "মোহনের বন্ধুও নাটক করত ?"

"করত কী মশাই ! ভাল করত। গুড অ্যাক্টর। গলা ভাল। ভয়েস পালটাতে পারত অদ্ভুতভাবে। ওকে যে-কোনও মেক-আপে মানিয়ে যেত।...যান, গিয়ে দেখে আসুন ছবিটা।"

কিকিরা উঠলেন। তারাপদ তখনও ফিরে এসে বসেনি। ছবি দেখছে, ঘর দেখছিল।

দু'জনেই যখন দেওয়ালে টাঙানো বিষের ধোঁয়ার গ্রুপ ফোটো দেখছে, মিহিরবাবু আচমকা বললেন, "আপনারা ওই ফোটোর মানুষটাকে দেখে নিন। তারপর আসল মানুষটাকে যদি একদিন দেখতে পান, অবাক হবেন না।"

কিকিরা আর তারাপদ ঘাড় ঘোরাল। দেখল, মিহিরবাবু চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। মুখের সেই হাসি নেই, সহজ ভাবটাও দেখা যাচ্ছে না। কেমন যেন গম্ভীর, শক্ত মুখ।

॥ ৮ ॥

বাড়ি ফিরে চন্দনকে পাওয়া গেল। সে অপেক্ষা করছিল। সামান্য রাত হয়েছে।

কিকিরা বললেন, "বোসো, একেবারে খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরো।"

পোশাক পালটে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলেন কিকিরারা। চন্দন বলল, "কী সার ? কতটা এগুলো ?" চন্দনের বলার মধ্যে একটু ঠাট্টার ভাব ছিল।

কিকিরা প্রথমে জবাব দিলেন না। পরে বললেন, "অমলেন্দু !"

"কে অমলেন্দু ? মোহনের বন্ধু ?"

"হ্যাঁ। মোহনের বন্ধু।" বলে তারাপদর দিকে তাকালেন কিকিরা। "তারাপদ, তুমি এতদিনে এমন একজনকে দেখলে—যিনি অনেক কিছুর খোঁজ রাখেন। মিহিরবাবুর কথা বলছি। পাকা লোক। উনি কিন্তু জানেন এই অমলেন্দু ছোকরা কোথায় আছে। ...তারাপদ, মিহিরবাবুর মতলবটা কী ?"

তারাপদ মাথা নাড়ল। "বুঝতে পারছি না।"

চুপচাপ। কথা বলল না কেউ কিছুক্ষণ। শেষে চন্দন বলল, "অমলেন্দু তা হলে এখন কলকাতায় ?"

কিকিরা বললেন,"তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অমলেন্দু শুধু কলকাতায় নেই, এই ঘটনাগুলো সেই ঘটাচ্ছে।"

"আপনি ফোনের কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ, সে ফোন করছে। তুলসীবাবুর কাছে সে-ই গিয়েছিল। মিহিরবাবুর কথা থেকে বোঝা গেল, ও শুধু ভাল অভিনেতা নয়, ভাল মেক-আপ নিতে, গলার স্বর পালটাতেও পারে।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "আর-একটা জিনিস লক্ষ করেছেন ? জাল মোহন ফোন করেছে চার জায়গায়, নিজে গিয়ে হাজির হয়েছে এক জায়গায়, আর চিঠি লিখেছে মাত্র এক জায়গায়—ওই মিহিরবাবুর কাছে। কেন ? ফোনে গলা শোনা যায় চোখে দেখা যায় না। জাল মোহন এমনই একজনের কাছে সশরীরে দেখা দিয়েছিল, যে প্রায় অন্ধ। ছানি-কাটানো চোখ। তাও দেখা দিয়েছিল সন্ধেবেলায়, টিমটিমে আলোর মধ্যে। আর চিঠি লিখেছে ওই মিহিরবাবুর কাছে। শুধুমাত্র তাঁকেই চিঠি লিখতে গেল কেন ?"

চন্দন খেতে-খেতে বলল, "তোরা চিঠি দেখতে চাসনি ?"

"না। দেখতে চেয়ে লাভই বা কী হত ? আমরা তো হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট নই। তা ছাড়া মোহনের আগের হাতের লেখাও চিনি না। সেই লেখা পাব কোথায় ? তার চেয়ে লোচনের কথাই স্বীকার করে নেওয়া ভাল। লোচন বলেছে, দেখতে তো একইরকম। মিহিরবাবু ওকে চিঠি দেখিয়েছেন।"

চন্দন যেন ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। মিহিরবাবুর কাছে এই জাল মোহনের হাতের লেখা দেখে লোচন স্বীকার করে নিয়েছে—লেখাটা মোহনের বলেই মনে হচ্ছে। আশ্চর্য কাণ্ড ! এখানে তারাপদরা আর কী করতে পারে নতুন করে ?

কিকিরা বললেন, "চাঁদু, এখন আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে মিহিরবাবু এর মধ্যে আছেন। তিনি কোনও প্যাঁচ খেলছেন।"

"কেমন ?"

"কে-ম-ন !...তুমি পুতুলনাচ দেখেছ ! একটা লোক পরদার আড়াল থেকে লুকিয়ে পুতুল খেলা দেখায় ? দেখেছ নিশ্চয়। মিহিরবাবু বোধ হয় সেই লোক। তিনিই নাচাচ্ছেন জাল মোহনকে।"

"মিহিরবাবুর স্বার্থ ?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "বুঝতে পারছি না। লোচন আর মোহনের মধ্যে মিহিরবাবু কেন ? তাঁর কিসের স্বার্থ ? তিনি তো তৃতীয় ব্যক্তি।"

তারাপদ বলল, "মোহনকে উনি খুবই ভালবাসতেন।"

চন্দন বলল, "মিহিরবাবু মানুষটি কেমন ? মানে আসল চেহারাটি কেমন ?"

"খারাপ বলে তো মনে হল না," কিকিরা বললেন খেতে-খেতে, "গুড ম্যান। নাটক-পাগল। কথাবার্তায় মাই ডিয়ার। মানুষটিকে ভালই লাগে। তা ছাড়া বড় ফ্যামিলির ছেলে। নিজেরাও বেশ সচ্ছল। পড়াশোনা-করা মানুষ। ওঁর নিজের কোনও স্বার্থ থাকার কথা নয়।"

"তবে ?"

"সেটাই বুঝতে পারছি না।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "মোহনের হয়ে উনি লড়ছেন না তো ?"

"মানে ?"

"আমি বলছিলাম, মোহনের পক্ষ নিয়ে উনি লড়ছেন না তো ?"

চন্দন বলল, "উকিলরা বরাবরই তাদের মক্কেলের পক্ষ নিয়ে লড়ে। কিন্তু এখানে মক্কেল কই ? সে তো মারা গিয়েছে। মরা মানুষের পক্ষ নিয়ে লড়া। তাতে লাভ। মোহনের হয়ে যদি কেউ মিহিরবাবুকে লড়াতে চায় অন্য কথা। তেমন কেউ নেই। মোহনের স্ত্রী নয়, নিজের কেউ নয়..."

কিকিরা হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "তারাপদ, তুমি একটা জিনিস লক্ষ করেছ। মিহিরবাবু বারবার বলছিলেন, যদি ধরে নেওয়া যায় লোচনই খুনি—তবে তা প্রমাণ করা যাবে কেমন করে ?...ওঁর কথা থেকে মনে হচ্ছিল, লোচনকে উনি পুরোপুরি সন্দেহ করলেও এমন কোনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছেন না— যা দিয়ে বলা যায়, লোচন খুনি।"

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল কিকিরার। উঠে পড়লেন। বাইরে গেলেন হাত-মুখ ধুতে।

তারাপদ বলল, "চাঁদু, কেসটা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। মিহিরবাবু জটটাকে আরও পাকিয়ে দিলেন।"

চন্দন বলল, "ওই অমলেন্দুকে ট্রেস করতে পারিস না ? খোঁজ লাগা।"

"আমি পারব না। কোথায় খোঁজ করব ?"

"চেষ্টা কর।"

তারাপদ কিছু বলল না। এ-কাজ তার পক্ষে অসম্ভব। কোথায় খোঁজ করবে অমলেন্দুর ?

কিকিরা হাত মুছতে-মুছতে ফিরে এলেন। বললেন, "মিহিরবাবুই এখন এক নম্বর হল তারাপদ। ভদ্রলোকের ওপর নজর রাখা দরকার। উনিই যে কলকাঠি নাড়ছেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই। তবে কী উদ্দেশ্যে, তা বুঝতে পারছি না।" বলেই কিকিরা কী ভেবে বললেন, "ইভনিং ক্লাবটা কোথায় যেন ? ওই পাড়াতেই না !"

তারাপদ বলল, "হ্যাঁ। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছেই।"

"ওদের বোধ হয় রোজই রিহার্সাল হয়। সোমবার বাদে। আজ সোমবার ছিল। মিহিরবাবুর ছুটি। কাল থেকে দু-তিনদিন ইভনিং ক্লাবের ওপর নজরদারি লাগাও তো !"

"তাতে লাভ কী হবে ?"

"কিছুই নয়। যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই—বুঝলে কিনা ! কে বলতে পারে, অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল..."

"আপনি কি পাগল ? অমলেন্দু যাবে ইভনিং ক্লাবে ?"

"যেতেও তো পারে। ধরো রাত্তিরবেলায় দাড়ি, চশমা লাগিয়ে গা ঢাকা দিয়ে মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল ?"

"সে তো বাড়িতেও যেতে পারে।"

"তা পারে। তবে আমার মনে হয়, বাড়ির চেয়ে ইভনিং ক্লাব সেফ।"

"কী বলছেন সার ? অত লোকের মধ্যে..."

"না, অত লোক নয়। রিহার্সাল ভাঙার পর—সবাই যখন চলে যায়, মিহিরবাবু বাড়ি ফেরেন, তখন যদি দেখা হয় ?"

চন্দন বলল, "আপনি বাঁকাপথে নাক দেখাচ্ছেন। অমলেন্দুর সঙ্গে মিহিরবাবু ওভাবে যোগাযোগ করেন বলে আমারও মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে, কাল একবার আমি আর তারা ইভনিং ক্লাবের দিকে ঘোরাফেরা করে আসব। আপনি বরং মিহিরবাবুকে আরও একটু জপান।"

ঘাড় হেলালেন কিকিরা। "জপাব। তবে দু-একটা দিন পরে। ওঁর একটা জিনিস আমি নিয়ে এসেছি, ফেরত দিতে যাব।"

"কী জিনিস ?"

"ওঁর টেবিলের ওপর থেকে লাইটারটা নিয়ে চলে এসেছি। জাপানি লাইটার। ভেরি স্মল অ্যান্ড বিউটিফুল !" বলে কিকিরা হাসলেন।

চন্দন বলল, "নিয়ে এসেছেন মানে হাত সাফাই করেছেন ?"

"ম্যাজিশিয়ানস হ্যান্ড !"

"আপনাকে চোর বলবে সার।"

"বলবে না। আমি আসল ফেরত দেব, তার সঙ্গে সুদ। মানে আরও একটা লাইটার, ভাল লাইটার হে, বেলজিয়ান, লাইটার জ্বললেই তার গায়ের তিনটে রং খেলা করবে। নিভিয়ে দিলেই আবার যে-কে-সেই। কে· পি· সাহার দোকানে পাওয়া যায়। প্রায় দু'শো টাকা দাম। মিহিরবাবুকে প্রেজেন্ট করব। বলব—সার, এ গিফট ফ্রম কিকিরা দ্য গ্রেট ম্যাজিশিয়ান।" বলে কিকিরা হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসির গূঢ় অর্থটা বোঝা গেল না।

॥ ৯ ॥

ইভনিং ক্লাবের ওপর দিন দুই নজর রাখার চেষ্টা করল তারাপদরা। পার্কের গায়েই বাড়ি। পুরনো আমলের। ভাঙা ফটক, বিশ-ত্রিশ হাত মাঠ, দু-চারটে মামুলি ফুলগাছ, সিঁড়ি—তারই এপাশে-ওপাশে নানান কারবার। কোথাও ফ্রিজ মেরামতি হয়, কোথাও বাঁধাইখানা, একপাশে এক ছোট ছাপাখানা, মায় সাইনবোর্ড লেখার দোকানও। ছাপোষা ভাড়াটেও আছে। ওই বাড়ির ভেতরে কোথায় কী আছে বোঝা অসম্ভব। বাড়িও বড়। দোতলা। দোতলার একপাশে হলঘরের মতন ঘরে ইভনিং ক্লাবের আসর। অন্যপাশে এক সিনেমা কোম্পানির অফিস। পেছন দিকে হয়তো ভাড়াটে, গুদাম সবই আছে।

তারাপদ দোতলায় যায়নি, নীচে ছিল। চন্দন গিয়ে দেখে এল ওপরটা। এসে বলল, "এ-বাড়িতে কাউকে খুঁজে বের করা কঠিন। হরদম লোক আসছে-যাচ্ছে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। তবে সন্ধের পর লোকের আসা-যাওয়া কম। কাজ-কারবারের জায়গাগুলো তখন বন্ধ হয়ে যায়। প্রেসটা খোলা থাকে রাত সাতটা-আটটা পর্যন্ত।

বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি না করে বাড়িটার মুখোমুখি পার্কে বসেই প্রথম দিন নজর রাখল তারাপদরা। কোনও লাভ হল না। বোঝাই যায় না, কারা ইভনিং ক্লাবে রিহার্সাল দিতে আসছে। তবে দোতলা থেকে ক্লাব ঘরের হল্লা মাঝে-মাঝে পার্ক পর্যন্ত ভেসে আসছিল।

প্রথম দিন মিহিরবাবু বেরোলেন পৌনে ন'টা নাগাদ। সঙ্গে আরও তিন-চারজন লোক। মিহিরবাবুর শাগরেদ। ক্লাবের লোক। খানিকটা গল্পগুজব সেরে মিহিরবাবু রিকশায় উঠলেন। দ্বিতীয় দিনে মিহিরবাবুর বেরোতে-বেরোতে ন'টা।

চন্দন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। বলল, "দুর, এ হয় নাকি ? রোজ এভাবে পার্কে এসে বসে থাকা যায় ?"

তারাপদ গা এলিয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। ঠাট্টা করে বলল, "পার্কে লোকে হাওয়া খেতেই আসে। কত লোক বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বসে আছে দেখছিস না ! আমরা তো লেটে আসি।"

চন্দন বলল, "পার্কে বসে হাওয়া খায় বুড়োরা, আর নিষ্কর্মারা। আমি নিষ্কর্মা নই।"

তারাপদ বলল, "কী করবি বল। কিকিরার খেয়াল। আর-একটা দিন দেখে নিই ; তারপর আর নয়।"

তৃতীয় দিনে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল।

মিহিরবাবু যথারীতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে দু'জন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। ঘড়িতে তখন ন'টা বাজতে চলেছে। হঠাৎ একটা মোটরবাইক এসে থামল। থামামাত্র বিকট এক শব্দ। তারপর চোখের পলকে মোটরবাইক হাওয়া। খানিকটা ধোঁয়া। কেমন এক গন্ধ।

চন্দন আর তারাপদ ছুটল।

মিহিরবাবু তাঁর দুই সঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে। খানিকটা সরে গিয়েছেন।

তারাপদ দেখল, মিহিরবাবু আর তাঁর সঙ্গীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ধর্মতলা স্ট্রিটের দিকে তাকিয়ে আছেন। মোটরবাইকটা ওদিকেই পালিয়েছে।

মিহিরবাবু চোখ ফেরাতেই তারাপদকে দেখতে পেলেন।

তারাপদ বলল, "ব্যাপার কী ? আপনার কোথাও লাগেনি তো ?"

মিহিরবাবু তারাপদকে দেখলেন। চিনতে পারলেন। অবাকও হলেন, "তুমি এখানে ?"

তারাপদ বলল, "আমরা এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। আমার বন্ধু চন্দন। ডাক্তার।"

"ও !" বলে মিহিরবাবু তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকালেন, "তাপস, কাল তুমি কোঠারিবাবুকে বলে দেবে, তাদের ঝগড়া তারা হয় ঘরে বসে, না হয় মাঠে গিয়ে মিটিয়ে আসুক। এভাবে বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি করে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল করলে ভাল হবে না। এটা পাঁচজনের রুজি-রোজগারের জায়গা। যখন-তখন দুমদাম এখানে চলবে না। আমি কিন্তু থানায় খবর দিয়ে দুটোকেই ধরিয়ে দেব।"

তারাপদ কিছুই বুঝল না।

মিহিরবাবুর এক সঙ্গী রিকশা ডাকতে কয়েক পা এগিয়ে গেল। অন্য সঙ্গী বলল, "মিহিরদা, কাল আমি আসতে পারব না। বাগনান যেতে হবে। মাকে নিয়ে। ছোটমামার অসুখ।"

"ঠিক আছে। কাল তোমার জায়গায় প্রক্সি চালিয়ে দেব। কী হয়েছে মামার ?"

"হার্ট প্রবলেম !"

"কত বয়েস ?"

"সিক্সটি ফাইভ।"

"ঠিক আছে, তুমি দু-একদিন না আসতে পারো। তুমি না হয় এখন যাও।"

"সুকুমার আসুক।"

"রিকশা ওই তো একটা আসছে। ডাকো সুকুমারকে।" উলটো দিক থেকে একটা রিকশা আসছিল।

সুকুমারকে ডাকতে হল না, অন্য একটা রিকশা নিয়েই সে আসছিল।

মিহিরবাবু সামান্য অপেক্ষা করলেন।

সুকুমার সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "তোমরা তবে যাও। আমি এদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।"

সুকুমার চলে গেল।

রিকশা থাকল দাঁড়িয়ে, চেনা রিকশা বোধ হয়। অন্য রিকশাটা হাত সাত-দশ দূরে।

মিহিরবাবু তারাপদর দিকে তাকালেন। "তুমি এদিকে ?"

"আমার বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। ও ডাক্তার। আমরা তালতলা থেকে ফিরছি।...ব্যাপারটা কী হল বলুন তো ?"

"ও কিছু নয়। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলা। এই বাড়িটায় কোঠারির একটা ছেলে থাকে—জলসা করে বেড়ায়। আর ওই মোটরবাইকের ছেলেটা হল মলঙ্গা লেনের। ওটা বাপের পয়সায় খায় আর ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দু'জনের মধ্যে কোনও ঝগড়া আছে পুরনো। মাঝে-সাঝে পটকা ফাটিয়ে একে অন্যকে শাসিয়ে যায়।"

"পটকা ?"

"ওই বোমা-পটকা !"

"তা বলে আপনাদের গায়ের সামনে বোমা ফাটিয়ে যাবে ?"

"ফটকের কাছেই ফাটাতে গিয়েছিল। আমাদের বোধ হয় নজর করতে পারেনি।"

"আমরা ভাবলাম..."

"তা ভাবতেই পারো। যা দিনকাল ! তবে কী জানো ভাই, আমার গায়ে হাত তোলার মতন মানুষ এ-পাড়াতে নেই। বউবাজার পাড়ার পুরনো লোক হে, মাস্টার। দু-একজন ইয়ে আমাদেরও আছে।" বলে হাসতে লাগলেন।

চন্দন কৌতূহলের সঙ্গে মানুষটিকে দেখছিল। পান চিবোতে-চিবোতে দিব্যি খোশগল্প করে যাচ্ছেন ভদ্রলোক।

"তোমার সেই ম্যাজিশিয়ানের খবর কী ?"

তারাপদ সতর্ক হয়ে বলল, "এমনিতে ভালই। তবে পা নিয়ে..."

"পা ! পায়েও খেলা আছে নাকি হে ! হাতের খেলাটা তো ভালই তোমার গুরুদেবের।" মিহিরবাবু ঠোঁট চেপে হাসলেন, "ওঁকে বলো, আমার লাইটারটা ফেরত দিয়ে যেতে !"

তারাপদ অপ্রস্তুত। সামলে নিয়ে চালাকি করে বলল, "উনি নিজেই বলছিলেন সেদিন একটা ইয়ে হয়ে গেছে..."

"ম্যাজিক ?"

"না, মানে... ঠিক যে কোনও পারপাস ছিল তা নয় ! ভুলো মনে..."

"বুঝেছি।...তা ওঁকে আসতে বলো।"

"উনি আসবেন। বলেছেন আসলের সঙ্গে সুদ নিয়ে আসবেন।"

"সুদ ?"

তারাপদ হাসল। বলল, "কিকিরা বড় ভালমানুষ। সত্যিই উনি বড় ম্যাজিশিয়ান ছিলেন।"

"হুঁ ! তা যে-কাজ হাতে নিয়েছেন সেটা তো ম্যাজিশিয়ানের কর্ম নয়, ভাই। যার সঙ্গে রণে নামতে চাইছেন, সেই লোকটাও কম নয়।"

চন্দন কিছু বলল না। তারাপদর হাত টিপল আড়ালে।

তারাপদ বলল, "কিকিরা এখন অমলেন্দুর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।"

"তাই নাকি ?"

"সার ?"

"বলো।"

"কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলব ?"

"বলে ফেলো।"

"অমলেন্দু আপনার কাছে আসে ?"

মিহিরবাবু সামান্য সময় তাকিয়ে থাকলেন তারাপদর দিকে। পরে বললেন, "আমি তো সেদিনই বলে দিয়েছি, সময় মতন তাকে তোমরা দেখলেও দেখতে পারো।"

রিকশাঅলা ঘণ্টি বাজাল।

মিহিরবাবু তাকালেন একবার। তারাপদকে বললেন, "চলি ভায়া। ম্যাজিশিয়ানকে তাড়াতাড়ি আসতে বলো।"

চলে গেলেন মিহিরবাবু।

চন্দন কয়েক মুহূর্ত রিকশাটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ফেরাল। তারাপদকে বলল, "চল, আমরা ওই রিকশাটা ধরি। আমি মেসের কাছে নেমে যাব। তুই চলে যাস হোটেল পর্যন্ত।"

অন্য রিকশাটা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, মিহিরবাবু চলে যাওয়ার পর সে তার রিকশার হাতল তুলে নিচ্ছিল।

তারাপদ আর চন্দন দু-পাঁচ পা এগিয়ে গিয়ে রিকশাঅলাকে বলল, "এই, রোখ যাও। যানা হ্যায়...।"

রিকশাঅলা রিকশা থামাল না। "দুসরা গাড়ি দেখিয়ে।"

"কাহে ?"

মাথা নাড়ল রিকশাঅলা। সে যাবে না।

তারাপদ বলল, "তুমি বাপ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে চুপচাপ ; এখন বলছ যাবে না। তোমার মরজি।"

"হামকো পেট দুখাতা হ্যায়। নেহি জায়গা।"

তারাপদ চন্দনকে বলল, "কারবার দেখছিস ! এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল—আর আমরা যাব বলতেই বেটা পেট-ব্যথার অজুহাত খাড়া করল ! ব্যাটা মহা বদমাশ তো।" বলে তারাপদ রিকশার কাছ থেকে সরে আসছিল।

চন্দন হাত ধরল তারাপদর। "দাঁড়া ! ওর পেট-ব্যথা আমি দেখাচ্ছি।" বলে সোজা দু'-পা এগিয়ে রিকশার হাতল ধরে ফেলল। এই, রিকশা উতারো। পেট দুখাতা হ্যায় ? ঠিক হ্যায় থানা মে চলো...। হাম থানাকা বাবু। আ যাও..."

রিকশাঅলা ভয় পেয়ে গেল। বোধ হয় ক' মুহূর্ত মাত্র হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর অদ্ভুত কাণ্ড করল। রিকশার হাতল ফেলে দিয়ে দে দৌড়। ক্রিক রোয়ের গলি দিয়ে ছুট।

চন্দনরাও কম হতভম্ব হল না। এরকম হবে তারা ভাবতেই পারেনি। রিকশাঅলা পালাল।

তারাপদ বলল, "কী হল রে ?"

চন্দন বলল, "আশ্চর্য ! ব্যাটা পালাল কেন ? ও কে রে ?"

তারাপদর কেমন খটকা লাগল চন্দনের কথায়। "লোকটা অমলেন্দু নয় তো ?"

"রাবিশ। অমলেন্দু রিকশাঅলা হবে কেন ? এ-ব্যাটা রিয়েল-রিয়েল রিকশাঅলা। কিন্তু ব্যাপারটা কী হল ? মিহিরবাবুর ফেরার পথে কেউ নজর রাখছে নাকি ?

॥ ১০ ॥

নিজের বৈঠকখানাতেই ছিলেন মিহিরবাবু ; সাদরে অভ্যর্থনা করলেন কিকিরাদের। কিকিরা আর তারাপদর সঙ্গে চন্দনও এসেছে আজ।

মিহিরবাবু বললেন, "আসুন ম্যাজিকবাবু ! আসুন। বসুন।" বলে রহস্যময় চোখ করে চন্দনকে ইশারা করলেন। "এটি কি আপনার দু' নম্বর অ্যাসিস্ট্যান্ট ?"

কিকিরা যেন কতই লজ্জা পেয়েছেন এমন মুখ করে বললেন, "আজ্ঞে, ঠিক তা নয়, আমার এজেন্সির পার্টনার ?"

"পার্টনার ! কী এজেন্সি আপনার ?"

"কুটুস !"

"কুটুস ! তার মানে ?"

"সার, হওয়া উচিত ছিল কিকিরা-তারাপদ-চন্দন, ছোট করে কে· টি· সি। তারাপদ একটু পালটে নিয়ে নাম দিয়েছে 'কুটুস'।"

মিহিরবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসি আর থামতে চায় না। শেষে বললেন, "রিয়েলি, আপনি ফানি লোক মশাই। বসুন-বসুন। তোমরা বসো। সিট ডাউন।··· তা ম্যাজিকমশাই, থিয়েটারে আমরা আজকাল ডিরেক্টর, মিউজিক, আলোকসম্পাত

রাখি। আপনার এ দুটি বোধ হয় তাই, সঙ্গীত আর আলো, তাই না?"

কিকিরা হাতজোড় করে বললেন, "থিয়েটারের খোঁজ আমি রাখি না সার। সেই বড়বাবু, মানে শিশিরবাবুর আমলে রাখতাম।"

মিহিরবাবু মজার মুখ করে দেখলেন কিকিরাকে, চোখের ভঙ্গি থেকে মনে হল, তিনি যেন ঠাট্টা করে বলছেন, তাই নাকি?

কিকিরা এবার পকেট থেকে দুটো লাইটার বের করে মিহিরবাবুর সামনে টেবিলে রাখলেন। বললেন, "সার, আমায় আপনি মাফ করবেন। ম্যাজিশিয়ানদের হাত বড় চঞ্চল। লোভ সামলাতে পারে না। নো থিফিং সার, জাস্ট মজাফ্যায়িং···!"

"থিফিং? মানে?"

"মানে, ইয়ে, বলছি চুরি করিনি সার, মজাফ্যায়িং—মানে ইয়ে মজা করেছিলাম।"

মিহিরবাবু আবার হেসে উঠলেন জোরে। বিষম খান আর কি! কাসি সামলে শেষে বললেন কোনওরকমে, "মশাই, আপনি আমায় নাকের জলে চোখের জলে করে ফেললেন! ইংরেজরা এদেশে থাকলে আপনাকে শূলে চড়াত।"

"থাকল কোথায়! তাড়িয়ে ছাড়লাম···।"

"বেশ করলেন। তা একটু চা হোক।" বলে কিকিরা টেবিলের সঙ্গে লাগানো ঘণ্টি-বোতাম বাজালেন। মানে, খবর গেল ভেতরে। দুটো লাইটার কেন? নিয়েছিলেন একটা, দিচ্ছেন দুটো।"

"একটা সার আমার প্রণামী! উপহার। বেলজিয়ান লাইটার। যখন জ্বলে তখন লাইটারটার বডিও কালারফুল হয়ে যায়। বেশ দেখতে। দেখুন না!"

মিহিরবাবু নতুন লাইটারটা জ্বেলে দেখলেন। দেখতে ভাল—তবে সামান্য বড়। ছোট সিগারেটের প্যাকেটের সাইজ। খুশি হলেন। "দাম কত?"

"দামের জন্যে কী সার!···এটা হল টেবল লাইটার, মানে টেবিলে রাখার। সাইজটা একটু বড় দেখছেন না!"

"না না, তবু···"

"প্লিজ! এটা আমার গুরুদক্ষিণা।"

"গুরুদক্ষিণা?" মিহিরবাবু অবাক।

চন্দন আর তারাপদ মুখ টিপে হাসছিল।

বাড়ির ভেতর থেকে কাজের লোক এল। দাঁড়াল এসে। মিহিরবাবু চায়ের কথা বললেন। তারপর বললেন, "জলুকে বলে দিস, কেউ এলে যেন বলে দেয়, আজ দেখা হবে না, আমি ব্যস্ত রয়েছি। কাল সকালে আসতে।"

লোকটি চলে গেল।

মিহিরবাবু ডিবে থেকে পান তুলে নিতে-নিতে বললেন, "কিকিরাবাবু, আপনি মজাদার লোক, ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যান, আবার গোয়েন্দা। ম্যাজিশিয়ান-গোয়েন্দা। তা এ-সবই না হয় মানলুম। কিন্তু মশাই, আপনার গুরুদক্ষিণার ব্যাপারটা তো বুঝলাম না?"

কিকিরা অমায়িক মুখ করে হাসলেন। "বোঝার কী আছে?"

"নেই?"

"না সার।"

"আপনি মশাই আমার পেছনে দুই চেলাকে লাগিয়েছেন?" বলে তারাপদদের দেখালেন।

সঙ্গে-সঙ্গে জিভ বের করে নিজের কান মললেন কিকিরা। "ছিঃ ছিঃ, আপনি বলছেন কী! আপনার পেছনে লোক লাগাব! না না, আপনি ভুল বুঝছেন। আমাদের একটু দেখার ইচ্ছে হয়েছিল—অমলেন্দু আপনার সঙ্গে ওই ক্লাবের আশেপাশে দেখা করে কি না! কৌতূহল মাত্র।···তা এক রিকশাওলা···" বলতে-বলতে কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন। বললেন,

"রিকশাওলার কথাটা বলো তো?"

তারাপদ বলল সব।

মিহিরবাবু শুনলেন। চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। কপাল কুঁচকে দুশ্চিন্তার ভান করলেন। পরে বললেন, "ব্যাপারটা নতুন মনে হচ্ছে! তা পাড়ার মধ্যে আমাকে কাবু করার সাহস কার হবে? লোচনেরও হবে না।"

"ধরুন, ও যদি আপনার ওপর নজর রাখার জন্যে···"

মিহিরবাবু এবার সকৌতুক মুখে বললেন, "না, আপনারা ভুল করছেন। রিকশাওলা আমারই লোক। ক'দিন ধরে ওকে রাখছি। একটু নজর রাখে।"

কিকিরা থ হয়ে গেলেন। "আপনার লোক?"

"হুঁ।"

"আমাকে সার কে যেন শাসিয়েছে উড়ো চিঠি দিয়ে। বলেছে, 'দাদু তুমি নিজের চরকায় তেল দাও'।"

তারাপদ বলল, "একটা উটকো লোক এসে কিকিরাকে ট্রামের ওপর ঠেলে ফেলে দিতে গিয়েছিল।"

মিহিরবাবু কিছু বললেন না। জর্দা মুখে দিলেন।

কিকিরা বললেন, "লোচনের সঙ্গে আমি গত পরশু দেখা করেছিলাম।"

পান-জর্দা মুখে মিহিরবাবু শঙ্কিত গলায় বললেন, "অমলেন্দুর কথা বলেছেন নাকি?"

"পাগল নাকি! তা আমি বলি?"

"তবে কী বললেন?"

"বললাম, জাল মোহনকে প্রায় ধরে ফেলেছি। আর দু-চারটে দিন।"

"বিশ্বাস করল?"

"বুঝতে পারলাম না। তবে জাল মোহনকে দেখতে ওর খুব আগ্রহ।"

"দেখিয়ে দিন।"

কিকিরা একটু হাসলেন। বললেন, "লোচনকে নিয়ে একটু খেলা খেলতে চাই। এখন আপনার দয়া।"

"দয়া?" সন্দেহের চোখে কিকিরাকে দেখলেন মিহিরবাবু, "আপনার মতলবটা কী মশাই? খোলসা করে বলুন তো!"

কিকিরা হাত বাড়িয়ে মিহিরবাবুর সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিলেন। যেন কিছুই নয়, ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, সার, "আমার মতলব ভেরি সিম্‌পল। আমি লোচনকে আপনার এখানে হাজির করাতে চাই।"

এরকম একটা মামুলি কথা শুনতে হবে, মিহিরবাবু ভাবেননি। খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, "এর মধ্যে দয়া করার কী আছে, মশাই? লোচন থাকে কাছেই। ক'-পা দূরে; পাড়ার ছেলে, তাকে হাজির করাতে চান, করাবেন।"

"সেইসঙ্গে আপনাকে যে একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"মোহনকে এখানে হাজির করাতে হবে।"

"মোহন?" মিহিরবাবু অবাক। "মোহনকে আমি কোথায় পাব?"

কিকিরা সিগারেটে টান মেরে ধোঁয়া গিললেন। কাসলেন অল্প। তারাপদ আর চন্দনকে এক পলক নজর করে নিলেন। আবার মিহিরবাবুর দিকে তাকালেন। বললেন, "আপনি ছাড়া এ-কাজ কে করবে! আপনিই পারেন।"

"ধ্যুত মশাই, আমি কি ভগবান? না, আপনার মতন ম্যাজিশিয়ান যে, মরা মানুষ আবার জ্যান্ত করতে পারি?"

"আপনি সার আসল। মানে আপনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র।"

"তার মানে?"

"তার মানে, এই রহস্যের চাবিকাঠিটি আপনার হাতে। আপনি যতক্ষণ না তালাটা খুলে দিচ্ছেন, কিস্যু করার নেই।"

মিহিরবাবু চুপ। তাকিয়ে থাকলেন কিকিরার দিকে। শেষে বললেন, "মোহনকে আমি কোথায় পাব! সে আর নেই।" বলার সঙ্গে-সঙ্গে মিহিরবাবুর চোখ-মুখ কঠিন হয়ে উঠল। কেমন যেন হতাশ, ক্রুদ্ধ!

কিকিরা বললেন, "জাল মোহনের কথা বলছি। আমি জানি আসল মোহন আর নেই।"

মিহিরবাবু কথা বললেন না। তাঁর মুখ আরও থমথমে হয়ে উঠল। দুটি চোখ যেন কঠিন হল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

কিকিরা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শেষে মিহিরবাবু বললেন, "আপনি কি সব বুঝতে পেরেছেন?"

মাথা হেলিয়ে কিকিরা বললেন, "খানিকটা। আমি বুঝতে পেরেছি এই জাল মোহনকে আপনি এনেছেন? ঠিক কি না?"

মিহিরবাবু তাকিয়ে থাকলেন অন্যদিকে। তবে মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, তিনিই এনেছেন।

কিকিরা বললেন, "লোচনকে আপনি সব দিক থেকে কোণঠাসা করে ফেলতে চান, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

মিহিরবাবু এবার যেন আচমকা জ্বলে উঠলেন। বললেন, "সে খুনি। মার্ডারার। শয়তান।"
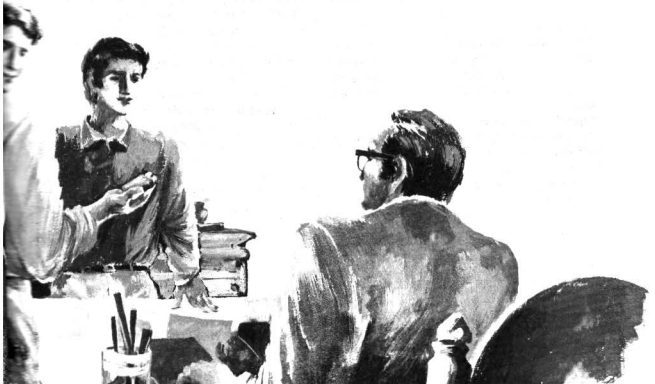
"আপনি কি শুধু খুনি লোকটাকে ধরার জন্যে এত চেষ্টা করছেন ?"

মিহিরবাবুর আর যেন ধৈর্য থাকল না। বললেন, "শুধু খুনি বলে···· ? না, তার চেয়েও বেশি। আপনি কেমন করে জানবেন মোহনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী ছিল ! আপনি জানেন না। আমি ওকে নিজের ছোট ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালবাসতাম। বলতে পারেন, ছেলের মতনই। ও এত ভাল, সরল, শান্ত ছিল। সবাই ওকে ভালবাসত। তা ছাড়া রামদা, মানে মোহনের বাবা আমায় বিশ্বাস করতেন, স্নেহ করতেন। তিনি আমায় বারবার বলেছেন, 'মিহির, সংসার বড় খারাপ জায়গা, আমার ছেলেটাকে তুমি দেখো।' আমি তখন অত কিছু ভাবিনি, বলেছিলাম, 'আপনি ভাবছেন কেন, নিশ্চয় দেখব।'"

মিহিরবাবু থেমে গেলেন। কে যেন আসছিল।

বাড়ির লোক ঘরে এল। চা রেখে গেল টেবিলের ওপর। চায়ের সঙ্গে কিছু প্যাসট্রি।

মিহিরবাবু বললেন, "নিন, চা খান····যা বলছিলাম। সংসার বড় অদ্ভুত জায়গা। এখানে কী না হয়। আমি তো কিছুকাল ওকালতি করেছি। ক্রিমিনালও না ঘেঁটেছি এমন নয়। লোচন একটা পাক্কা ক্রিমিনাল। মোহনকে সে মেরেছে। হি হ্যাজ কিল্ড হিম।"

"আমারও তাই সন্দেহ।"

"সন্দেহ নয়, সত্যি। ····আপনি বলবেন, প্রমাণ কী ? প্রমাণ নেই। লোচন অত্যন্ত চালাক, ওর মগজ ক্রিমিনালের। ভাইকে খুন করার পর ও এমনভাবে জিনিসগুলো ওর তরফে সাজিয়ে নিয়েছে যে, আইনমাফিক ওকে ধরবার উপায় রাখেনি। আইন প্রমাণ চায়—অনুমান, সন্দেহ এসব স্বীকার করে না। লোচন এক দেহাতি ডাক্তারের ডেথ সার্টিফিকেট জোগাড় করেছে। থানা আর ডাক্তারকে টাকাও খাইয়েছে নিশ্চয়। আইডেনটিটিফিকেশান করিয়ে নিয়েছে ওর মেজো শ্যালক আর অমলেন্দুকে দিয়ে। সব পথ ও মেরে রেখেছে।"

"তা হলে ?"

"তা হলেও সব চাপা দেওয়া যায় না। আইন, আইন, মানুষ, মানুষ। অমলেন্দুর মুখে সব শুনে আমি বুঝতে পারি, লোচন কেমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে এ-কাজ করেছে।"

"অমলেন্দু কী বলেছে ?"

"বলেছে, ঝরনা দেখতে যাওয়ার প্ল্যানটা লোচনের। অবশ্য তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। কিন্তু পাহাড়ের যে-জায়গায় মোহনকে সে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে মোহন যেতে চায়নি। মোহন বরাবরই ভিতু ধরনের। সাবধানী। লোচন তাকে ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।"

"অমলেন্দুরা কাছে ছিল না ?"

"না। যাওয়ার সময় পাহাড়ের মাথায় লোচনের মেজো শ্যালক চালাকি করে এক জায়গায় বসে পড়ল। বলল, পায়ের শিরায় টান ধরে গিয়েছে, একটু ম্যাসাজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। সে অমলেন্দুকে ছুতো করে কিছুক্ষণ আটকে রাখল। ততক্ষণে লোচন আর মোহন অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ গজ এগিয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া পাহাড়ি জায়গা, ওরা খানিকটা আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। লোচন যখন মোহনকে ঠেলে দেয় ঝরনার স্রোতে, তখন আশেপাশে কেউ ছিল না।"

চন্দন বলল, "একেবারে প্ল্যান্ড ব্যাপার।"

"একেবারে ছক কেটে খুন করা। ····আমার মনে হয় না, মোহনের বডি যখন দেড়দিন পরে পাওয়া গেল—ওকে পোস্টমর্টেম করলেও প্রমাণ করা যেত এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, অন্য কিছু ?" বলে চন্দনের দিকে তাকালেন মিহিরবাবু।

চন্দন বলল, "আমারও মনে হয় না, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে বলা যেত কেউ মোহনকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ঝরনার স্রোত, জল, পাহাড়, পাথর, খানাখন্দ—শরীরের কোন জখম কেমন করে হয়েছে তা বলা যেমন মুশকিল ছিল,তেমনই বলা যেত না, ওটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, কিলিং। আমারও তাই মনে হয়। তা ছাড়া ডেডবডিও পাওয়া গেছে প্রায় দেড়দিনের মাথায়। ···তা পোস্টমর্টেম যখন হয়নি, হওয়া সম্ভব ছিল না ওখানে, তখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ !"

মিহিরবাবু বললেন, "আমি এসব কথা অমলেন্দুর মুখে শুনেছি।"

"ও কি আপনাকে আগেই এসব কথা বলেছিল ?"

"ফিরে এসেই বলেছিল। মোহনকে সে খুবই ভালবাসত। তবে হ্যাঁ—গোড়ায় তার সন্দেহ ততটা হয়নি। আমার হয়েছিল। আমি যখন বারবার তাকে খুঁচিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, তখনই তার সন্দেহ হতে লাগল।"

কিকিরা বললেন, "ও দিল্লি চলে গেল কেন ? ঘটনাটার পরই যেন পালাল।"

"একটা কাজ পেয়ে গেল। তা ছাড়া আমিও ওকে চলে যেতে বললুম। বলা কি যায়, কোনও কারণে যদি লোচনের সন্দেহ হয় ওর ওপর, তাতে বিপদ হতে পারে।"

তারাপদ কথা বলল এবার। বলল, "তখন থেকেই কি আপনি···"

তারাপদকে কথা শেষ করতে না দিয়েই মিহিরবাবু বললেন, "অমলেন্দু দিল্লি যাওয়ার আগে আমি তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলুম, একদিন না একদিন—এই খুনের শোধ আমরা নেব। লোচনকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাব।"

কিকিরা বললেন, "আজ পাঁচ বছর ধরে আপনারা সে-চেষ্টা করেছেন ?"

"হ্যাঁ, পাঁচ বছর ধরে। ধীরে-ধীরে। ····লোচনকে ভুলে যেতে দিয়েছি তখনকার ঘটনা। ভুলে যেতে দিয়েছি তার ওপর কোনও সন্দেহ রয়েছে কারও। সে ভাবতেই পারেনি তার কোনও চরম শত্রু আছে, যে তাকে খুনের মামলায় আসামি করতে পারে। সে এই ক' বছর নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে, সম্পত্তি ভোগ করেছে। নিজের খেয়ালে যা পেরেছে বেচেছে, দেনা বাড়িয়েছে, এমনকী অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার তোড়জোড় করছে নতুন বাড়ি করে। আর আমি তলায়-তলায় নিজের কাজ করে গিয়েছি।"

চা শেষ হল কিকিরাদের। একটা পান নিলেন তিনি।

মিহিরবাবু অন্যমনস্কভাবে সিগারেট নিলেন। লাইটার জ্বালিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন কিকিরা।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মিহিরবাবু বললেন, "আমি তাড়াহুড়ো করে কিছু করিনি। ধৈর্য ধরে ধীরে-ধীরে করতে হয়েছে যা করার। একদিকে লোচন যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটিয়েছে, ভেবেছে সে নিরাপদ, তার কোনও ভয় নেই, অন্যদিকে তার গলায় ফাঁস বাঁধার সবরকম চেষ্টা আমি গুছিয়ে নিয়েছি।"

কিকিরা বললেন, "আপনি জাল মোহনকে আসল মোহন করতে চেয়েছেন বুদ্ধি করে।"

"হ্যাঁ। জালকে আসল করা যায় না। কিন্তু ধোঁকা দেওয়া যায়।"

তারাপদ বলল, "অনিলবাবু, সতীশবাবু, তুলসীবাবু—মানে এদের সকলকে আপনিই বেছে নিয়েছিলেন ?"

মিহিরবাবু মাথা নাড়লেন। "ভেবে-ভেবে এদেরই বেছে নিয়েছিলাম। এরা কেউ লোচনের আত্মীয়, কেউ বন্ধু, কেউ পুরনো কর্মচারী। লোচন যখন এদের কাছ থেকে একে-একে মোহনের কথা শুনবে, ধাঁধায় পড়ে যাবে। পাপের মন যার, সে কি আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে ! লোচনের এখন মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। তার ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে।"

কিকিরা বললেন, "আপনাকে অনেক খবর জোগাড় করতে হয়েছে।"

"অনেক। লোচনরা আমাদের প্রতিবেশী। তাদের বাইরের খবর কম-বেশি আমি জানি। তা ছাড়া রামদার কাছে শুনেছি নানা কথা। ...তবু বাড়ির ভেতরের খবর ? সেসব তো আমার অত জানা নেই। এক-এক করে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এখান-ওখান থেকে সেগুলো জোগাড় করতে হয়েছে কাঠখড় পুড়িয়ে। ওই খবরগুলো যদি না জানা থাকে, নকল মোহনকে আসল মোহন বলে ধোঁকা দিয়ে চালানোর চেষ্টা করা যেত না।"

"ছাপাখানার খবরও নিয়েছেন দেখছি ?"

"নিয়েছি। না নিলে কেমন করে লোচন আর তুলসীবাবু ধোঁকা খাবে !"

"তুলসীবাবুর কাছে আপনি অমলেন্দুকে মোহন সাজিয়ে পাঠিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ। কারণ তুলসীবাবু লোচনের বিশ্বস্ত কর্মচারী। কর্মচারী বিশ্বস্ত হলেও, ভদ্রলোক এখন চোখে ভাল দেখেন না। এই সুযোগটা নিয়েছি। তা ছাড়া আপনাকে আগেই বলেছি, অমলেন্দু মেক-আপটা ভাল নিতে পারে ; গলার স্বর পালটাবারও ক্ষমতা রয়েছে ওর। ...শুনতে চান তো শুনিয়ে দিতে পারি।"

তারাপদ বলল, "শুনি একটু।"

মিহিরবাবু তাঁর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের তালা-লাগানো ড্রয়ার খুলে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার মেশিন আর টেপ বের করলেন। দেখেই বোঝা গেল, বিদেশি মেশিন।

"এখন যার গলা শুনবেন এটা আসলে অমলেন্দুর, কিন্তু নকল মোহনের।" বলে মিহিরবাবু মেশিন চালিয়ে দিলেন। ব্যাটারি তাজাই ছিল। টেপ বাজতে লাগল। তারাপদরা ঝুঁকে পড়ে শুনতে লাগল নকল মোহনের গলা।

কিছুক্ষণ পরে মিহিরবাবু বললেন, "এই গলার সঙ্গে আসল মোহনের গলার স্বর আপনারা চট করে ঠাওর করতে পারবেন না। শোনাচ্ছি সেই আসল গলা।"

মেশিন থেকে ক্যাসেটটা খুলে নিয়ে অন্য একটা ক্যাসেট ঢুকিয়ে দিলেন মিহিরবাবু। বললেন, "এই গলাটা আসল মোহনের। তবে এখানে যা শুনবেন—সেটা আমাদের নাটক থেকে। মাঝে-মাঝে শখ করে আমরা নাটকের কিছু-কিছু অংশ টেপ করে রাখি। শুনুন এবার।"

মেশিন চালিয়ে দিলেন মিহিরবাবু।

দু'জনের গলার স্বরের পার্থক্য ধরা সত্যিই মুশকিলের। হয়তো বারবার শুনলে ধরা যেতে পারে। নয়তো ধরা যাবে না।

কিকিরা বললেন, "বুঝেছি। আর দরকার নেই।"

মেশিন বন্ধ করলেন মিহিরবাবু। বললেন, "অমলেন্দু প্র্যাকটিস করে গলাটা ধরেছে বেশ।"

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "হাতের লেখা ? সেটাও কী....."

মিহিরবাবু একটু হাসলেন। বললেন, "মোহন আমাদের নাটকের সময় রিহার্সাল দেওয়ার কপি তৈরি করত। পার্ট মুখস্থ করার কপি লিখত। তার হাতের লেখা আমার কাছে অনেক আছে। অমলেন্দুকে দিয়ে দিনের পর দিন তা নকল করিয়েছি।"

"এখানে ?"

"না, দিল্লিতে থাকতেই এসব করেছে অমলেন্দু। এ-কাজ দু-একদিনে হয় না। সময় লাগে।"

কিকিরা চুপ করে থাকলেন। মিহিরবাবুর ধৈর্য ও অধ্যবসায়কে প্রশংসা করতে হয়। বুদ্ধিকেও।

শেষমেশ কিকিরা বললেন, "আপনি এত কষ্ট করলেন যে-জন্যে, তার চৌদ্দ আনাই কাজে লেগেছে। লোচনকে চারপাশ থেকে আপনি চেপে ধরেছেন। সে ভয় পেয়েছে। ভীষণ অশান্তির মধ্যে রয়েছে।"

"আমি তাই চেয়েছিলাম। চারদিক থেকে প্রেশার দিয়ে ওর মনের ডিফেন্সটা আগে ভেঙে দিতে...."

"বাকি দু' আনা কাজই আসল। তাই না, সার ?...ওটা আমায় করতে দিন।"

"কী কাজ ?"

"লোচনকে আমি আপনার কাছে নিয়ে আসতে চাই। ...ওকে এখানে আনার পর বাকি কাজটাও আপনি করবেন।"

"সে আসবে ?"

"মনে হয় আসবে। জাল মোহনকে ধরার জন্যে সে উন্মাদ। লোচন বুঝতে পেরেছে, এই জাল মোহনকে ধরতে না-পারা পর্যন্ত তার শান্তি হবে না। যদি নকল মোহন এইভাবেই থেকে যায়, সে তাকে জ্বালাবে। দিনের পর দিন।"

মিহিরবাবু কী যেন ভাবলেন। বললেন, "লোচনকে আপনি আনবেন কেমন করে ?"

কিকিরা রহস্যময় হাসি হাসলেন। "আনব। সে-দায়িত্ব আমার।"

"আপনি বলবেন, জাল মোহন আমার কাছে আসা-যাওয়া করে, এই তো ?"

"ধরেছেন ঠিক। বলব, জাল মোহন আপনার কাছে হালে বার কয়েক এসেছে। সে চাইছে আপনার পরামর্শ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা কিছু একটা লাগিয়ে দিতে। তাকে ভয় দেখাব। বলব, মামলা যদি একবার লেগে যায়—এ সেই দীনরাম মামলার মতন হয়ে যাবে। কত বছর চলবে কেউ জানে না।" বলে কিকিরা হাত বাড়িয়ে ডিবে থেকে একটা পান নিলেন। বললেন, "লোচনের কাগজে নোটিস ছাপার উদ্দেশ্য কী ছিল ? কী চেয়েছিল সে ? চেয়েছিল জাল মোহনের খোঁজ ! কে সে, কোথায় আছে, কী তার মতলব, দেখে নিতে। তা সার, এখন যদি লোচন সেই জাল মোহনকে সরাসরি হাতে পায়, ছাড়বে কেন ?"

মিহিরবাবু মাথা হেলালেন। "বেশ, আনুন। কিন্তু..."

"কিন্তুর কিছু নেই। আপনি তৈরি থাকুন। একেবারে পাকাপাকিভাবে।" বলে কিকিরা ইঙ্গিতে কিছু বুঝিয়ে দিলেন।

মিহিরবাবু ভাবলেন কিছুক্ষণ। "কবে আনবেন লোচনকে ?"

"আপনি বলুন ?"

"আসছে বুধবার আনুন। আমি ক্লাবে যাব না।"

"সন্ধেবেলাতেই আসব।"

"আসুন। ...আমি তৈরি থাকব।"

॥ ১১ ॥

আসার কথা ছিল সন্ধে সাতটা নাগাদ, ঘড়িতে সোয়া সাতটা বেজে যাওয়ার পরও লোচন আসছে না দেখে মিহিরবাবু চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। ব্যবস্থা তিনি সবই করে রেখেছেন, এখন শুধু লোচনের অপেক্ষা।

সাড়ে সাতটা নাগাদ কিকিরা এলেন। সঙ্গে লোচন। তারাপদও ছিল।

ঘরে ঢুকেই লোচন উত্তেজিত গলায় বলল, "এ-সমস্ত কী হচ্ছে মিহিরকাকা ? শেষ পর্যন্ত আপনি.... !"

মিহিরবাবু স্বাভাবিক গলায় বললেন, "বোসো। আমি আবার কী করলাম হে ?"

লোচন উত্তেজিত। ক্রুদ্ধ। বলল, "এরা বলছেন, আপনি একটা চোর-জোচ্চোরকে বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে দিচ্ছেন ?"

মিহিরবাবু হাসিমুখে বললেন, "আমি উকিল মানুষ, আমার কাছে সাধুও যা, চোরও তাই। মক্কেলের জাত-বিচার থাকে না।"

"আপনি ওকালতি ছেড়ে দিয়েছেন ?"

"তা দিয়েছি। তবে মাঝে-মাঝে পুরনো মক্কেলদের অ্যাডভাইস

দিতে হয় বইকী ! কমলা ছাড়লেও কমলি কি আর ছাড়ে ! বোসো বোসো। দাঁড়িয়ে আছ কেন ?"

লোচন বসল না। রাগের গলায় বলল, "এঁরা বলছেন, আপনার এখানে সেই জোচ্চোরটা লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে ?"

মিহিরবাবু শান্তভাবেই বললেন, "আগে বোসো। তুমি তো এসেই রাগারাগি শুরু করলে ! বোসো আগে, তারপর তোমার কথা শুনি।"

লোচন বসল।

কিকিরারা আগেই বসে পড়েছিলেন। বসে পড়ে অন্যমনস্কভাবে টেবিল থেকে সেই নতুন লাইটারটা তুলে নিয়ে জ্বালালেন। নিভিয়ে দিলেন আবার।

মিহিরবাবু বললেন, "এবার বলো, কী বলছিলে ?

লোচন বলল, "আমি সেই জোচ্চোর লোকটার কথা বলছি।"

"মোহনের কথা ?"

"কে মোহন ? জাল-জালিয়াত একটা লোককে আপনি মোহন বলছেন ?"

"জাল-জালিয়াত···· !" মিহিরবাবু বললেন। বলে মাথা নাড়লেন, "তুমি বলছ জাল-জালিয়াত। সে বলছে, ও মোটেই জাল নয়।"

"ও বলছে ! ও কে ?·····আপনি মোহনকে চেনেন না ? তাকে ছেলেবেলা থেকে দেখেননি ? মোহন না আপনার আদরের ছেলে ছিল !"

মাথা হেলিয়ে মিহিরবাবু বললেন, "মোহনকে আমি সব দিক দিয়েই ভাল করে চিনি বলেই বলছি, ও মোহন !"

লোচন একেবারে হতভম্ব। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মিহিরবাবুর দিকে। কী বলবে যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। ক্রমেই তার মাথায় যেন রক্ত চড়তে লাগল। চেঁচিয়ে বলল, "আপনি বলছেন মোহন। আশ্চর্য ! আপনি একটা জালিয়াতকে মোহন বলছেন ?"

"তুমি কি ভাবছ, আমার মাথা খারাপ হয়েছে ?"

রাগে যেন ফেটে পড়ল লোচন। "আপনি, আপনি একটা জালিয়াতকে কেমন করে মোহন ভাবছেন আমি জানি না।"

"প্রমাণ না পেলে ভাবতাম না।"

"প্রমাণ ? কী বলছেন ? সত্যিই আপনার মাথার গোলমাল হয়েছে। আপনি কি সেই চিঠির হাতের লেখার কথা বলছেন ? ওটা কোনও প্রমাণ ?"

মিহিরবাবু বললেন, "লেখা না হয় নকল হল, কিন্তু মোহনের বন্ধুবান্ধব।" বলে তিনি বইয়ের আলমারির দিকে হাত তুলে কী যেন দেখালেন। বললেন, "ওই যে ওখানে যে-ছেলেটি বসে আছে সে মোহনের ছেলেবেলার বন্ধু।"

লোচন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। আলমারির পাশ ঘেঁষে আড়ালে চন্দন বসে ছিল। তাকে দেখল লোচন। অচেনা মানুষ।

মিহিরবাবু বললেন, "ওকে জিজ্ঞেস করো ?"

জিজ্ঞেস করতে হল না। চন্দনকে শেখানো ছিল। সে নিজেই বলল, "মোহনদা আমার স্কুলের বন্ধু। আমরা সেন্ট পল্স স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম। তখন আমি পিসির কাছে গড়পারে থাকতাম। আমার চেয়ে এক বছরের সিনিয়ার ছিল মোহনদা। সিনিয়ার হলেও বন্ধু ছিল। কলেজে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে যাই। মোহনদা সেন্ট পল্সেই ছিল, আমি স্কটিশে·····। তারপর আমি ডাক্তারিতে····"

লোচন অদ্ভুত চোখে চন্দনকে দেখছিল।

চন্দন বলল, "আমি এখন ডাক্তার। মোহনদা····"

"কোথায় বাড়ি আপনার ?" লোচন বলল হঠাৎ।

"বাড়ি বহরমপুর। এখানে থাকি কোয়ার্টারে, মেডিকেল মেস····"

"আপনি মোহনকে দেখেছেন ?"

"দেখব মানে ? কী বলছেন আপনি ! আগে প্রায়ই দেখাশোনা হত, তারপর আর হয়নি। শুনেছিলাম মোহনদা মারা গেছে। সেটাই জানতাম। হঠাৎ মাসখানেক আগে দেখা। ট্রামে। আমি অবাক।"

লোচন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ার মতন করে দাঁড়িয়ে পড়ল। "বাজে কথা। মিথ্যে কথা। মোহন নয়। মোহন হতেই পারে না।"

"মানে ! মোহনদা নয় !·····আলবাত মোহনদা। আমরা ট্রাম থেকে নেমে চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম। কত পুরনো গল্প হল !"

অবিশ্বাসের মুখ করে লোচন বলল, "কখনওই নয়। এ-সবই সাজানো।" বলে মিহিরবাবুর দিকে তাকাল। "আপনি ওকে মিথ্যে সাক্ষী সাজিয়েছেন।"

"আমি ! কেন ?"

"ওই জালিয়াত আপনাকে ব্রাইব করেছে। ছিঃ ছিঃ, মিহিরকাকা····ছিঃ !"

মিহিরবাবু শান্তভাবেই বললেন, "লোচন, আমাদের পরিবারের কাউকে টাকা দিয়ে এ-পর্যন্ত কেউ কেনেনি। তুমি খুব খারাপ কথা বললে। অন্য সময় হলে তোমাকে আমি এখানে দাঁড়াতে দিতাম না।···যাকগে, সাক্ষীও শুধু একা নয়, আরও আছে।"

চন্দন সঙ্গে-সঙ্গে বললে, "আছে বইকী ! মোহনদাকে নিয়ে আজ ক'দিন আমি অন্তত চার-পাঁচ জায়গায় গিয়েছি। আদিত্য, হরিহর, বিজন···· সকলেই আমাদের বন্ধু। ওরা সবাই শুনেছিল মোহনদা মারা গিয়েছে। আজ জানতে পারছে, খবরটা ভুল।"

লোচন মিহিরবাবুর দিকে তাকাল। রাগে গা জ্বলছে, চোখ লাল। গলার স্বর রুক্ষ। বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি একটা জাল লোকের হয়ে মামলা সাজাচ্ছেন।"

"হ্যাঁ, সাজাচ্ছি। তবে জাল লোকের হয়ে নয়, আসল লোকের হয়ে।···হয়তো এ-নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। চিঠিটাও জাল বলে ভেবে নিতাম। কিন্তু মোহন জাল নয়। জাল হলে ও বারবার আমার কাছে আসত না। মাঝে-মাঝে এখন সে এখানে আসছে। ওর পুরনো জানাশোনা লোকেদেরও আনছে সঙ্গে করে। আমি এখন কনভিন্‌স্‌ড যে, জাল নয়, এই মোহনই আসল।"

"অসম্ভব। হতেই পারে না।"

"তুমি যতই অসম্ভব বলো, আমি মনে করছি, মোহন মারা যায়নি। সে বেঁচে আছে। আর এখন সে কলকাতায়।"

লোচন পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠল। "কোথায় সে ! ডেকে আনুন তাকে। আমার সামনে এসে দাঁড়াক। দেখি সে কেমন মোহন ?"

কিকিরা এমন মুখ করে বসে থাকলেন যেন তিনি নীরব দর্শক। অবশ্য চোখে-চোখে যেন কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন মিহিরবাবুকে।

মিহিরবাবু বললেন, "লোচন, তুমি যদি মোহনকে দেখতে চাও দেখাতে পারি। কিন্তু আমি বলি কী, দেখাটা আদালতে হওয়াই ভাল।"

লোচন কাঁপছিল। বলল, "মিহিরকাকা, আমাকে আপনারা ব্ল্যাকমেইল করতে চান ? লোচন দত্ত অত সহজে ভয় পায় না।"

"তোমায় কেন ব্ল্যাকমেইল করব হে ?"

"করেছেন। আপনি না করুন আপনার মক্কেল করেছে। জাল মোহন। আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। নেয়নি ?"

এবার কিকিরা কথা বললেন। মাথা নেড়ে বললেন, "ওটা আপনারই চাল দত্তবাবু ! একবেলার জন্যে ছেলেকে ভবানীপুর পাঠিয়েছিলেন, আপনার এক ভায়রার বাড়ি। নিজেই ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে দেখাতে চাইছিলেন জাল মোহন আপনাকে ব্ল্যাক-মেইল করতে চায়।"

লোচন থতমত খেয়ে গেল। "আমি ? আমি আমার ছেলেকে সরিয়ে রেখেছিলাম ? কে বলল ?"

"আপনার পালোয়ান দরোয়ান। একশো টাকা খসিয়ে খবরটা পেয়েছি। তারপর ভবানীপুরেও খোঁজ করেছি।.....আপনি মশাই, ডালে-ডালে যান, গোয়িং ব্রাঞ্চেস, আর আমি যাই পাতায়-পাতায়, গোয়িং লিফ...।"

লোচন থরথর করে কাঁপছিল। খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "ভাঁড়ামি করবেন না। আমার ছেলেকে আমি সরাইনি।"

"কেন মিথ্যে কথা বলছেন দত্তবাবু ! ধোপে টিকবে না।"

"তাই নাকি !" লোচন যেন ব্যঙ্গ করে হাসল।" আপনাদের মোহন ধোপে টিকবে ?"

"টিকবে না ?"

"না, না, না। নেভার। এ-জন্মে নয়। হাজার চেষ্টা করলেও নয়।"

"নয় কেন ? এত সাক্ষী-সবুদ, তবু নয় ?"

"বলছি,নয়। মোহন নেই। সে ফিরে আসতে পারে না।"

কিকিরা বললেন, "মোহন ফিরে এসেছে। আপনি কি তাকে দেখতে চান ?"

লোচন থতমত খেয়ে গেল। কী বলছে ওই ম্যাজিকওলা ! লোকটার গালে থাপ্পড় মারার জন্যে হাত উঠে যাচ্ছিল লোচনের। বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠে সে বলল, "হ্যাঁ, চাই। দেখান তাকে।"

কিকিরা মিহিরবাবুর দিকে তাকালেন।

মিহিরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ধীরে-ধীরে। বললেন, "দেখাচ্ছি। সে এখানেই আছে। আনছি তাকে।" বলে উনি ডান দিকে এগোলেন। পরদা ফেলা ছিল। পরদা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

লোচন একেবারে খেপে গিয়েছিল। নিজের মনে চেঁচাতে লাগল, গালমন্দ শুরু করল কিকিরা আর মিহিরবাবুকে।

কিকিরা বললেন, "অনর্থক চেঁচাচ্ছেন কেন ? দু' দণ্ড অপেক্ষা করতে পারছেন না ? মোহনকে আগে দেখুন !"

"শাট আপ ! মোহনকে দেখুন ? আপনারা আমায় মোহন দেখাবেন ? যত্তসব ধাপ্পাবাজ চোর-জোচ্চোরের দল ! আপনাদের আমি কোর্টে নিয়ে যাব।"

"যাবেন। তার আগে মোহনকে দেখুন।"

"আমায় মোহন দেখাবেন ! বেশ, দেখান। তবে জেনে রাখবেন—সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে না। মোহনও আর ফিরে আসবে না। আমার চোখের সামনে সে মারা গেছে।"

"মারা গেছে ! ...আপনিই তাকে আর কত মারবেন দত্তবাবু ! এতকাল তো মেরেই এসেছেন। এবার জ্যান্ত হতে দিন।"

লোচন যেন বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলল হঠাৎ। উত্তেজনার মাথায় চেঁচিয়ে উঠল, "না, সে জ্যান্ত হবে না। আমি তাকে মেরেছি।"

কিকিরা যেন হাসলেন। "আপনি স্বীকার করলেন আপনি মোহনকে মেরেছেন।"

"করলাম। মুখে করলাম। তাতে আমার কী হবে ! আপনারা আমার কী করবেন মশাই ! পুলিশে নিয়ে যাবেন ? বলব, বাজে কথা, আমি কিছু বলিনি। কোর্ট-কাছারি করবেন ? বলব, বানানো কথা সব......।"

লোচনের কথা শেষ হল না, মিহিরবাবু ঘরে এলেন। সঙ্গে অমলেন্দু।

অমলেন্দুকে দেখে লোচন যেন বুঝতেই পারল না, কাকে দেখছে ? চেনা, না, অচেনা কাউকে। স্তম্ভিত। মুখে আর কথা নেই।

মিহিরবাবু লোচনকে বললেন, "একে চেনো না ? অমলেন্দু। মোহনের বন্ধু। তোমাদের সঙ্গে সেদিন ছিল।"

লোচনের মুখ কালো হয়ে উঠেছিল। গলা কাঠ। বলল, "ও এখানে কেন ? কোত্থেকে এসেছে ?"

কিকিরা ততক্ষণে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সেই বেলজিয়ান টেবিল লাইটার তুলে নিয়েছেন। তুলে নিয়ে মিহিরবাবুকে বললেন, "এই নিন সার। এটা রেখে দিন যত্ন করে। টেপ হয়ে গেছে সব কথাবার্তা। দত্তমশাই স্বীকার করছেন—নিজের ভাইকে তিনি মেরেছেন।" বলে কিকিরা লাইটার-টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলেন।

লোচন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। সে বুঝতে পারছিল না কী করবে ! পালাবে, না, কিকিরার হাত থেকে জিনিসটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

মিহিরবাবু বললেন, "লোচন, ওই টেপে তোমার স্বীকারোক্তি ধরা থাকল। আর দু' নম্বর প্রমাণ, সাক্ষী থাকল এই অমলেন্দু। তুমি মোহনকে ধাক্কা দিয়ে ঝরনার স্রোতে ফেলে দিয়েছিলে। এবার তুমি কেমন করে বাঁচো তা আমরা দেখব। তুমি বাঁচতে পারবে না। ভাইকে তুমি মেরেছ। তুমি ভেবেছিলে তুমিই একমাত্র চালাক লোক, তোমায় কেউ ধরতে পারবে না। তুমি ধরা পড়েছ। পাঁচ বছরের চেষ্টা আজ আমার সফল হয়েছে।"

লোচন পালাবার চেষ্টা করল। পারল না। অমলেন্দু যেন লাফ মেরে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল।
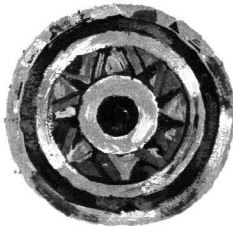
ডাকাতের বউ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

রিয়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে কাঁদতে পারছে না। সে যে আর ছোট নেই, মা পই-পই করে বলেছে। "তুমি এখন বড় হয়ে গিয়েছ রিয়া—বুঝতে শেখো। স্কুলের মিস কী লিখেছে খাতায় দ্যাখো। তুমি বন্ধুদের সঙ্গে কেবল গল্প করো। তোমার পড়ায় আগ্রহ কম। একা তোমাকে বসিয়ে রেখেও রেহাই নেই। দেওয়ালের সঙ্গেও তুমি কথা বলো। এত কথা কি থাকতে পারে বলো। একদণ্ড চুপ করে থাকতে পারো না। তোমার যে কী হবে!"

বড় হয়ে গেলে ভয় পেতে নেই সে জানে। মানুষজনের ভিড়। তাকে স্কুলবাস থেকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কুন্তিদি কোথাও আছে। মানুষজনের ভিড়—সবাই বাস ধরার জন্য হন্যে হয়ে যে যার বাসের আশায় দাঁড়িয়ে আছে। শেডের নীচে যদি থাকে! না নেই। সেই বুড়িটা শুয়ে আছে। নোংরা কাঁথা-বালিশ, আর কেমন ভ্যাপসা গন্ধ। এক মগ জল শিয়রে। দেখলেই গা শিরশির করে। সে ওদিকে তাকাতেও পারছে না। কুন্তিদিই তাকে বলেছে, ভয় পাচ্ছ কেন রিয়াদি—মানুষকে শেষ পর্যন্ত তো একদিন-না-একদিন ঠাকুরের কাছে যেতেই হয়। বুড়িটা ঠাকুরের কাছে যাবে বলে বের হয়ে পড়েছে।

রিয়া কাঁদতে পারছে না। কাঁদলেই ধরা পড়ে যাবে। তোমার কী হয়েছে খুকি? কোথায় থাকো? তোমাকে কেউ নিতে আসেনি! তখন তার আরও কান্না পায়। কুন্তিদির একদম বুদ্ধি নেই। তুমি বুঝবে না, একা কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! গাছপালা, জঙ্গল কত কিছু

আছে। বস্তায় পুরে কেউ আমাকে নিয়ে গেলে, বাবা-মা'র কষ্ট হবে না! তুমি সেটা বোঝো না কেন! আর তখনই দেখল, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। কুন্তিদি কী বোকা! বাবা বাসের ভাড়া দিয়ে যায়, কিছুতেই বাসে উঠবে না। এতটা রাস্তা হেঁটে এলে দেরি তো হবেই!

সে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুন্তিকে আঁচড়ে-কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল। এভাবে যে এতটা দেরি হয়ে যাবে বুঝতে পারেনি কুন্তি। আর রিয়া খেপে গিয়ে তখন বলল, "দাঁড়াও, মাকে বলে দেব।"

ব্যস, এতেই জব্দ কুন্তি। তার তখন নানা অজুহাত—কী করে যে রিয়াদিকে খুশি করবে। এটা তো ঠিক, বাসে এলে রিয়াদিকে একা পড়তে হত না। সে বাসে না এসে হেঁটে আসে বলে দেরি হয়ে যায়। রোজ হয় না। তবে একদিন হলেও দোষের।

সে বলল, "রিয়াদি টিফিন খেয়েছ?"

এবারে রিয়াও জব্দ। ধরা পড়ে যাবে। টিফিন না খেলে মা রাগ করে। মা'র এক কথা, এ-মেয়েকে নিয়ে আমি কী করব। টিফিন খায় না। কোন সকালে একটু দুধ, দুটো সন্দেশ মুখে দিয়ে গেছে, এত বেলা পর্যন্ত কিছু আর মুখে দেওয়ার নাম নেই। ডিম-সেদ্ধ, সন্দেশ, কলা, আপেল যেমনকার সব পড়ে আছে!

এই হল জ্বালা। তার স্কুল সকালে, মা'র স্কুল দুপুরে। বাড়ি ফিরেই মা বলবে, "কুন্তি, রিয়া টিফিন খেয়েছে?"

কুন্তিদি বলবে, "না, খায়নি।"

"খায়নি? রিয়া, রিয়া..." মা'র মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে তখন! "তুমি বাঁচবে কী করে। কিছু খাও না, কিছু মুখে দিতে চাও না, খিদে, তেষ্টা কি সব যমের দুয়ারে দিয়েছ। তুমি আমাকে আর কত জ্বালাবে। আমার একদম বাঁচতে ইচ্ছে হয় না।" কখনও খেপে গিয়ে গুম-গুম করে পিঠে কিল বসিয়ে দেবে।"বলো, খাবে কি না। কী হয় তোমার।"

রিয়া বলবে, "মনে থাকে না।"

"খেতে মনে থাকে না! খেতে কারও মনে থাকে না হয়, শোনো, তোমার মেয়ে কী বলছে। এক দণ্ড চুপচাপ বসে টিফিনটুকু খাবে তাও তেনার সময় হয় না।"

রিয়া রেগে গেলে বলবে, "আমার খিদে পায় না।"

"খিদে পায় না! দেখাচ্ছি খিদে পায় না কী করে। কালোমেঘের পাতা নিয়ে আয় তো কুন্তি। রোজ দু' বেলা রস করে খাওয়া। খিদে পায় না কী করে দেখি।"

বাড়িতে এতসব হুজ্জোতির ভয়ে রিয়া কুন্তিদিকে বলবে, "তুমি খাবে? খাও না। আমার একদম খেতে ইচ্ছে করছে না। এত খাওয়া যায়!"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে খুলে টিফিনের বাক্সটা এবার খুলে ধরবে রিয়া। চারপাশ দেখবে। কেউ দেখে ফেললে কুন্তিদিকে মা আস্ত রাখবে না। কুন্তি বলল, "ও মা কিছুই ছোঁওনি। কী হবে এ মেয়ের! দিদিমণি জানলে আস্ত রাখবে তোমায়! শিগগির খেয়ে নাও। দিদিমণি জানো স্কুলে যায়নি। গেলেই ব্যাগ থেকে খুলে টিফিনের বাক্সখানা বের করে দেখবে। শিগগির খেয়ে নাও।" কুন্তি দিদিমণির ভয় দেখিয়ে বাগে আনতে চাইল রিয়াকে। "এত খাওয়া যায়!" কেমন ওক দেওয়ার মতো টিফিনের দিকে তাকিয়ে বলল রিয়া, "তুমি কিন্তু বোলো না, টিফিন খাইনি।" এক টুকরো আপেল মুখে ফেলে বলল, "এবারে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল কুন্তিদি। রাস্তার লোক দেখে ফেলতে পারে।"

কুন্তির ক্ষুধায় কাতর মুখখানি রিয়াকে বোধ হয় কষ্ট দেয়। সেই সকালে, দু'খানা হাতে-সেঁকা রুটি আর এক কাপ চা। তারপর কাজের তো শেষ নেই। কাচাকাচি, বাসন মাজা, ঘর মোছা, বেসিন ধোওয়া, জানলা-দরজা মোছা, গ্রিল মোছা—এক দণ্ড সময় পায় না কুন্তিদি। রান্নাবান্না প্রায় সবটাই মা করে রেখে যান। তার আর কুন্তির জন্য বেড়ে রেখে যান। তার আলাদা, কুন্তিদির আলাদা। ভাত, ডাল, ভাজা, কুচো মাছের ঝোল। কুন্তিদি যখন খায়, সে দেখে। তার পোনা মাছের বিশাল টুকরো থেকে সে কিছুটা কুন্তিদিকে তুলে দেবেই। কুন্তিদি তখন কী খুশি! বলবে, "আমায় আবার দিলে কেন! এত খাওয়া যায়!"

কুন্তি বলল, "না খাব না, আমার খিদে নেই।"

"আচ্ছা বাবা, বলব না। হল তো। একা বাসস্ট্যান্ডে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! আমার ভয় করে না। কান্নাকাটি করলে লোক জড়ো হত না!"

"আর হবে না রিয়াদি।"

"বলছি তো, বলব না। তুমি খাও। না খেলে বলে দেব। তুমি পয়সা মারছ।"

"পয়সা মারলাম কোথায়?"

"বারে, বাসে আস না কেন! বাবা তো যাওয়া-আসার পয়সা দেয়। তুমি বাসে আসো না কেন, হেঁটে আসো কেন। হেঁটে এলে দেরি হবে না। কত দূর!"

কুন্তির সঙ্গে এভাবেই সব বিষয়ে শেষ পর্যন্ত রফা হয়ে যায়। কুন্তিও বলবে না, রিয়া টিফিন খায়নি—রিয়াও বলবে না, কুন্তিদি হেঁটে এসে বাসের পয়সা বাঁচায়।

রিয়া বলবে, "তুমি ভারী কিপ্টে।" তা বলতেই পারে। সকালে এত কাজের তাড়া, দাদাবাবু বলবে, রুটি আর করতে হবে না। একটা টাকা দিয়ে বলবে, পাউরুটি নিয়ে আসবি। চা আর পাউরুটি। কুন্তি খুব খুশি। কিন্তু পাউরুটি আর কেন যে কেনা হয় না। রিয়া টের পায়, কুন্তিদি তার বাক্সের মধ্যে টাকাটি সযত্নে রেখে দিয়েছে। কিছুই খেল না—কী যে খারাপ লাগে তখন! কুন্তিদির বরটাই বা কী। মাসে-মাসে এসে সব সাফ করে নিয়ে যাবে—রেগে গেলে রিয়া বলবে, "তোমার বর এলে ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

"আমার বর আবার কী দোষ করল?"

"করেনি বলছ—তোমাকে খেতে দেয় না। পরের বাড়িতে ফেলে রাখে, তোমার কষ্ট হয় না!"

"রিয়াদি, আমার বরটা না ডাকাত।"

"ডাকাত!" দুই চোখ বড় করে বলবে, "ডাকাতের বউ তুমি!"

"হ্যাঁ ডাকাতের বউ। আমাকে সোজা মনে কর না। বরের ঠ্যাং ভেঙে দিলে এক ফুঁয়ে তোমাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে জান।"

রিয়া তখন ভয়ে-ভয়ে তাকায়। কুন্তির মুখে মজার হাসি। ডাকাতের নামেও রিয়াদি জব্দ। রিয়া কিছুতেই কুন্তির কাছছাড়া হয় না। সে যেখানে রিয়া সেখানে। সারাটা দিন পায়ে-পায়ে ঘুর-ঘুর করবে। বিশাল বাড়িটায় সে আর রিয়া। দুপুরে রিয়াদিকে বলবে, এবারে ঘুমোও লক্ষ্মী সোনা হয়ে। আমি নীচেই আছি। রিয়ার যে কী হয়, সে কিছুতেই খাটে শুতে চাইবে না। যদি জানলায় ডাকাত এসে দাঁড়ায়, এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয়, তখন তো সে হাওয়া হয়ে যাবে। চুপিচুপি দেখবে, কুন্তিদি কোথায়! কুন্তিদি কী করছে।

"আরে কী হল, যাও, শুয়ে পড়োগে। না ঘুমোলেও আমার দোষ হবে, জানো!"

"আমার ভয় করছে।"

কুন্তি হেসে গড়িয়ে পড়ে। এত হাসতে পারে। আর মা বাড়িতে এলেই কুন্তিদির ব্যাজার মুখ। কথা কম বলে, কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছাদ থেকে জামা-কাপড় তুলে আনে। সব ভাঁজ করে রাখে। ডাইং ক্লিনিকে শাড়ি, শায়া, জামা,

প্যান্ট ইস্তিরি করার জন্য দিয়ে আসে। তার স্কুলের ফ্রকও। একবার একটা ফ্রক বাতাসে উড়ে গেল কোথায়। কি হেনস্থা কুন্তিদির। মা-র চোপা শুরু হয়ে যায়, "এত করে বলি, ক্লিপ এঁটে দিবি—কানে যদি কথা ওঠে।" কুন্তিদি কখনও রা করে না। আচ্ছা, তুমি কি বলতে পারো না, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেলে আমি কী করব! বলতে পারো না, তুমি ডাকাতের বউ। এক ফুঁয়ে সবাইকে উড়িয়ে দিতে পারে তোমার বর। তোমার বর সোজা মানুষ না!"

কুন্তি দেখল দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিয়াদি। শুতে যাচ্ছে না। সে আর কী করে! সে এক গ্লাস জল নিল। আসন পাতল—পরিপাটি করে খেতে বসল আসনপিঁড়ি হয়ে। খাওয়ার মধ্যে এত মাধুর্য থাকে, রিয়া নিজে খেতে বসে কেন টের পায় না! ইচ্ছে হয় কুন্তিদির মতো খেতে। বড় যত্ন নিয়ে খায়। সকাল-দুপুর যেন এই খাওয়াটুকুর অপেক্ষাতেই থাকে। ডাল দিয়ে সব ভাত মেখে নিয়েছে। কুচো মাছ সড়সড় করে খাচ্ছে। কাঁটা বাছছে না। খাচ্ছে আর খাচ্ছে। বড় নিবিষ্টমনে খাচ্ছে। বেশ দেরি হয় খেতে। যেন শেষ হয়ে গেলেই বিপাকে পড়ে যাবে। রিয়ার চোখে কেন যে জল চলে আসে!

থালার বাইরে ইতস্তত দু-একটা ভাত, ভাতের কণা পড়ে আছে। কুন্তিদি তাও আঙুলে আলগা করে তুলে খেল। ডালের বাটি চাটছে। থালা চাটছে। রিয়ার কেন যে মনে হল, কুন্তিদির পেট ভরেনি। আর দুটো ভাত হলে বেশ যেন পেট ভরত। কাঁচালঙ্কা ঘসে ভাত খায় বলে হুসহাস করছে—আর জল খাচ্ছে। ঝালের জন্য, না, জল খেলে পেট ভরে কোনটা রিয়া বুঝতে পারে না। রিয়া না পেরে দৌড়ে গেল ফ্রিজের কাছে। কুন্তিদির পেট ভরেনি—সে টেনে বের করল স্টিলের বাটি। বিকালে মা তার জন্য পায়েস করে রেখে গিয়েছে। খুরিতে মিষ্টি। সে সব টেনে নিয়ে গিয়ে কুন্তিদির পাতে ঢেলে দিল। বলল, "খাও।"

হা-হা করে উঠল কুন্তি!

"এটা কী করলে রিয়াদি!"

"তুমি খাও না!"

"আমাকে আস্ত রাখবে দিদিমণি! সব শেষ। কে খেল। দিদিমণি তোমাকে কী খেতে দেবে! আমি কী যে করি, যাই কোথায়?" কুন্তি বড়ই ফাঁপরে পড়ে গেল।

"তুমি খাও না।"

"খাই আর মরি। আমাকে চোর, ছ্যাঁচোড় ভাবুক।"

"খাও বলছি। না খেলে বলে দেব, আমার কাছ থেকে পাউডার নিয়ে মাখো। স্নো মাখো।"

কুন্তি কী যে করে। তা বর এলে একরাত থাকে। অনেকদূর থেকে আসে। একটা পা খোঁড়া। ট্রেনে কাটা পড়েছিল—সেটা কীভাবে, সে জানে না। সিঁড়ির ঘরে বর এসে থাকে। কুন্তির তখনই কেন যে শখ হয়, একটু গন্ধ-সাবান মাখে, স্নো-পাউডার মুখে দেয়। আলতা পরারও শখ। রিয়ার তখন বান্দা কুন্তিদি।

"রিয়াদি গন্ধ-সাবান হবে?"

"এই নাও।"

"রিয়াদি, পাউডার হবে?"

"এই নাও।"

"কাউকে বোলো না রিয়াদি। বললে কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দেবে।"

"তুমি নাও তো। কেবল তাড়িয়ে দেবে, তাড়িয়ে দেবে করছে।"

সেই কুন্তি সত্যি ফাঁপরে পড়ে গেল। কী অজুহাত দেখাবে—পায়েস কোথায়, মিষ্টি কোথায়! কে খেল! সে এঁটোপাত

যখন ব্যথা করে, কার কথা মনে পড়ে?

অমৃতাঞ্জন। প্রায় একশ বছর ধরে, মাথা-ধরা, পিঠে ব্যথা, মচকানো—শরীরের যাবতীয় ব্যথা-বেদনায় অমৃতাঞ্জন আরাম দিয়ে এসেছে। নির্ভরযোগ্য স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন সারা জীবন ধ'রে আপনার বিশ্বস্ত সেবক।

অমৃতাঞ্জন

পেইন্ বাম

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড

O&M 1782 BEN

থেকে তুলেও রাখতে পারছে না। রিয়া তেমনই দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রিয়া একবার কুন্তিদিকে দেখছে, একবার জানলা দেখছে—যদি ডাকাত এসে জানলায় দাঁড়ায়। দাঁড়ালেই যেন বলবে, না আমি খুব ভাল মেয়ে। দুষ্টুমি করি না। কুন্তিদিকে ডেকে দেব। কুন্তিদি খাচ্ছে।

রিয়া বলল, "কী বসে থাকলে কেন মাথায় হাত দিয়ে? খাও।"

কুন্তি খেল। না খেয়ে উপায়ও নেই। ফেলে তো দিতে পারে না। এমন সুস্বাদু খাবার সে ফেলে দিতে পারে! ভাত হল লক্ষ্মী—তার ওপর পরমান্ন, দেবদেবীর ভোগে লাগে। সে খেল, তবে স্বস্তি পেল না। রিয়াকে বলল, "কী যে হবে না!"

"কী আবার হবে! বলব, জানো মা, জানলায় না ডাকাত, পায়েস খেয়ে চলে গেল। কিচ্ছু বলল না।"

"রিয়াদি, বোকার মতো কথা বোলো না।"

"তুমি বোকার মতো কথা বলবে না।" রিয়া খেপে গেল। "পায়েস খেলে মন খুশি হয় না! হোক না ডাকাত—সে তো মানুষ।"

"রিয়াদি, ডাকাত তোমার বাড়িতে পায়েস খেতে এসেছিল। আর জায়গা পেল না!"

কুন্তি এঁটো বাসন কলতলায় নিয়ে যাচ্ছে। মন ভাল নেই। সে বলতেও পারবে না, রিয়াদি দিলে আমি কী করব! আমি কি চেয়েছি! রিয়াদিকে জিজ্ঞেস করো না। ঘুণাক্ষরেও জানি না, রিয়াদি এমন তাজ্জব কাণ্ড একটা করবে।

রিয়া কুন্তির সঙ্গে-সঙ্গে— কুন্তি যেখানে রিয়া সেখানে। কুন্তি বুঝতে পারে, ডাকাতের ভয়ে কাবু। তার বর ডাকাত, সে ডাকাতের বউ বলে হয়তো ঠিক করেনি। ডাকাত হলে তো বেঁচে যেত। ঘরে বসে থাকেন, বাঁশের ঝুড়ি বানান, বাজারে বিক্রি করে আর কয়টা পয়সা হয়। ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে চলে এসেছে। মাসকাবারে এলে, দাদাবাবু সব টাকাটাই তাকে দেন। সেও কিছু পয়সা বাঁচিয়ে রাখে তার খরচ থেকে। চুপিচুপি তাও দিয়ে দেয়। তার তো কোনও খরচ নেই। একবার একটা আলতার শিশি কিনে ফ্যাসাদ। কোথায় পেলে, কে দিল। পয়সা পেলে কোথায়!

রিয়াদি বলছে, "কেন, ডাকাত আমাদের বাড়িতে পায়েস খেতে আসতে পারে না? ডাকাতের কি পায়েস খেতে ইচ্ছে হয় না?"

"জানবে কী করে, তোমার মা পায়েস করে রেখে গিয়েছেন। ডাকাত তো আর অন্তর্যামী নন।"

"ডাকাত সব পারে। তুমি জানো, ডাকাতদের রনপা থাকে। ওতে ভর করে তারা হিল্লি-দিল্লি চলে যেতে পারে। তোমার বর যদি চলে আসে। মন খারাপ হয় না, তুমি এখানে পড়ে আছ—আসতেই পারে। মা তোমাকে পেট ভরে খেতে দেয় না, এসে যদি টের পায়—তোমার পেট ভরেছে কুন্তিদি।"

"ভরবে না কেন! কিন্তু এখন কী করি! দিদিমণি বাড়ি মাথায় করবে। পায়েস, মিষ্টি সব শেষ। কে খেল!"

রিয়া বলল, "আচ্ছা, ধরোই না, বাড়িতে যদি ডাকাত পড়ে—তখন তো ডাকাতেরা সব লুটপাট করে নিয়ে যায়। মানুষ মেরে রেখে যায়। আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কত কিছু করতে পারত! সেখানে ডাকাত পায়েস খেতে পেয়ে খুশি। ভুলেই গিয়েছে, ডাকাতি করতে এসেছে। মা, দ্যাখো আমার বুদ্ধির তারিফ করবে। তুমি একদম ভাববে না। এসো, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন।" কুন্তি কী যে বলে!

আজ আর রিয়াদি দুষ্টুমি করছে না। রিয়াদিকে ঘুম পাড়ানো যে কী ঝকমারি—সে হাড়ে-হাড়ে তা টের পায়। রিয়াদি খেয়েদেয়ে মিস হয়ে যায়। ঘরে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। হাতে একটা পেনসিল, দেওয়ালকে বলবে, "কী, অঙ্ক হল! অঙ্ক করতে এতক্ষণ লাগে?" টেবিলকে বলবে, "আবার কথা বলছ—কথা বললে, কান ধরে বের করে দেব। অঙ্ক এখনও হল না। ওখানে কে? ও, তুমি!" আসলে রিয়াদির তখন নজর পাখাটার দিকে। পাখাটাকে বলবে, কাল আসেনি কেন! পেট ব্যথা! দরখাস্ত করতে বলবে তোমার বাবাকে। বলবে, মিস বলেছেন।"

সেই রিয়াদি তার কাছছাড়া হচ্ছে না। কুন্তি বলল, "ডাকাতের বউ আছে বাড়িতে, ভয় কী। ডাকাতরা কখনও তাদের বউকে ঘাঁটায় না। ডাকাতরা কাউকে ভয় পায় না। বউদের খুব ভয় পায়। যাও না শুয়ে পড়ো। আমি আসছি।"

"না, তুমি চলো। আমার ভয় করছে।"

কুন্তি ফের বলল, "যতবড় ডাকাতই হোক, ডাকাতরা বউদের ভয় পায় জানো! রিয়াদি তুমি শুতে যাও। জানলায় কেউ এলে বলবে, কুন্তিদিকে ডাকব! তখনই সুড়সুড় করে পালাবে। যাও না। আমার কত কাজ, না ঘুমোলে দিদিমণি এসে বলবে না, রিয়া দুপুরে ঘুমিয়েছে? তখন কী জবাব দেব বলো?"

"না, তুমি চলো।" রিয়া কুন্তির কাছ থেকে নড়ছে না। জেদ।

"দাঁড়াও।" কুন্তি ছাদে উঠে গেল। জামাকাপড় তুলে আনল রোদ থেকে। পড়ল তো মরল। ঘুমই ভাঙে না তার। ঝড়-বৃষ্টির দিন, কখন আকাশ মেঘলা হবে, ঝড় উঠবে, কে জানে! সে ছাদে গেল। রিয়াও লাফিয়ে-লাফিয়ে ছাদে গেল। নেমে এল কুন্তি ছাদ থেকে—পেছনে-পেছনে রিয়া। সেও জামাকাপড় নিয়েছে। কাঁধে-হাতে একেবারে জামাকাপড়ে জাপটাজাপটি হয়ে আছে, জড়িয়ে না যায় এবং উবু হয়ে পড়ে গেলে কেলেঙ্কারি। কুন্তি হাত ধরে রেখেছে।

"আমার হাত ধরছ কেন! আমি কি ছোট! বড় হয়ে গিয়েছি না।"

"তা ঠিক, রিয়াদি বড় হয়ে গিয়েছে!" কুন্তি হাসল। আসলে অকারণ বায়না শুরু করলে, কাঁদতে থাকলে, দিদিমণি বলবে, "রিয়া, তুমি বড় হয়ে গিয়েছ। কাঁদতে লজ্জা করে না! লোকে শুনলে কী ভাববে। এতবড় মেয়ে এখনও বায়না করে, কাঁদে।"

কুন্তি নামার সময় বলল, "বড় যখন হয়েছ, শুয়ে পড়গে। কথা শুনতে হয়। পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করছ কেন! আমার কত কাজ।"তারপরই ফের পায়েস-মিষ্টির কথা মনে পড়লে মুখ ব্যাজার হয়ে গেল। কী যে বলবে! "কোথায় গেল। কে খেল!" সে বলতে পারে, "রিয়াদি দিল, আমি কী করব।"

"ও দিল, আর তুই খেতে পারলি! বাচ্চা মেয়েটা বিকালে কী খাবে ভাবলি না। এত পেটুক তুই। তোকে কী কম খেতে দিই! ও কি বোঝে কিছু?"

কুন্তি আলনায় জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখার সময় বলল, "রিয়াদি, আজ তো আমাদের দু'জনের কপালেই আছে। কী করবে বল তো! ডাকাতে পায়েস খেয়ে গিয়েছে, আর কিছু খেল না!"

রিয়া বলল, "ঘরে পায়েস ছিল খেয়েছে, রসগোল্লা ছিল খেয়েছে। আর কী আছে যে, খাবে। পেলে নিশ্চয়ই খেত।"

"রিয়াদি শোনো! বোকার মতো কথা বলবে না। বোকার মতো কথা বললে তুমিও মরবে, আমিও মরব, বুঝলে!"

"তবে কী বলব।"

"বলবে তুমি পায়েস, রসগোল্লা

খেয়েছ।"

"খেলে তুমি, আর বলব আমি খেয়েছি! বাঃ বেশ তো!"

"আমি বলেছিলাম, পায়েস দাও খাই।"

"থালা চাটছিলে কেন তবে।"

"থালা চাটতে পারব না!"

"না, পেট না ভরলে, থালা চাটে। আমি চাটি? বাবা চাটে? মা চাটে? বল! তুমি চুপ করে থাকলে কেন। তোমার বর যদি এসে জানলায় দেখতে পায়, তুমি থালা চাটছ বসে-বসে, তার রাগ হবে না? আমাকে রেগে গিয়ে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে না!"

"আসবে কী করে! খোঁড়া লোক, মাসে একবার আসে, কত কষ্ট জানো। খোঁড়া মানুষের কত কষ্ট তুমি বুঝবে না।"

"ধ্যাত, তুমি না কুন্তিদি সত্যি বোকা আছ। ডাকাতদের রণ-পা থাকে জানো! তারা কত দূর-দূর পলকে চলে যায়। দ্যাখোনি সমুদ্র ডিঙিয়ে গেল রামভক্ত পবনপুত্র। ডাকাতরা তো মা-কালীর ভক্ত হয় জানো! কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—ইয়া গোঁফ, ঝাঁকড়া চুল—তোমার বর যে আসে, ওটা তো তার ছদ্মবেশ। তুমি তো ভালই জানো। এসে যদি দেখে, ডাকাতের বউ থালা চাটছে, রাগ হবে না তার? দিয়ে কী দোষ করলাম বুঝি না বাপু।" রিয়া গালে হাত রেখে সত্যি চিন্তিত হয়ে পড়ল যেন।

"দোষ কিছু করোনি রিয়াদি। দোষ আমার কপালের। চলো শোবে। না ঘুমোলে কিন্তু ডাকাতকে ডেকে পাঠাব বলে দিলাম।"

রিয়া বলল, "আচ্ছা, কুন্তিদি, তুমি কি পায়েস-রসগোল্লা খেতে পারো না, তোমার কী খেতে ইচ্ছে হয় না। তুমি বলতে পারো না, আমার ইচ্ছে হল খেলাম। মা বকুক না, তুমি চুপ করে থাকবে। কত বকতে পারে দেখব। আমার না এত খারাপ লাগে।"

"ঘুমোবে না, ডাকব আমার বরকে?"

কুন্তি মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। রিয়া খাটে বসে পা দোলাচ্ছে। জানলা খোলা—তারপর মাঠ, মাঠ পার হলে জঙ্গল এবং গাছপালা, দূরের আকাশে পাখি উড়ছে। ঘুড়ি উড়ছে—এমন সুন্দর দুপুরে ঘুমোতে ইচ্ছে করে? কিন্তু এই জানলাটা বন্ধ করে দিলে হয় না! আজ কেন যে মনে হল, রিয়ার সেই ডাকাত চলে আসতে পারে—ডাকাতেরা তো চারপাশে ঘোরাফেরা করে—সুযোগ পেলেই লুণ্ঠন করে—এসব মনে হলে সে ডাকল, কুন্তিদি, তোমার বর ডাকাত বলছ, কই তোমার তো হাতে কিছু নেই। এক জোড়া শাঁখা ছাড়া কিছু নেই! ডাকাতরা তো বউদের জন্য কত সোনার অলঙ্কার নিয়ে আসে। গুপ্তধনের খোঁজ তো তারাই রাখে।"

"আমার আছে। পরি না।"

"কেন পরো না।"

"বর যে পছন্দ করে না। কাচের চুড়ি কিনে দিয়েছিল জানো। সোনালি রঙের কাচের চুড়ি। ডাকাতের বউ অলঙ্কার পরলে ধরা পড়ে যাবে না। পুলিশ থানা—তখন কে ছোটাছুটি করবে বলো?"

"আর কি কিনে দিয়েছিল?"

"কাচের চুড়ি, কানের মাকড়ি, এক শিশি আলতা। আমাদের ওখানে মেলা হয় জানো। মেলাতে কত কিছু পাওয়া যায়। ষষ্ঠীতলার মেলা। জিলিপি ভাজার গন্ধ। এক ঠোঙা জিলিপি কিনে আমি আর আমার বর গাছের নীচে বসে খেতাম। মেলায় ঘোরতাম। তখন তো তার ঠ্যাং খোঁড়া হয়নি। রেলে পা কাটা যায়নি। জোয়ান মানুষটা খাটতে পারত অসুরের মতো—মেলায় গেলে আমরা জিলিপি খেতাম, সার্কাস দেখতাম—নদীর পাড়ে বসে থাকতাম। ডুগডুগি বাজিয়ে যেত কনক বাউল, দেখলেই বলত, আরে কুন্তি না। তোর যে কথা ছিল, আশ্রমে ফুল দিয়ে আসবি, বকুল ফুল, গেলি না তো। রাধাগোবিন্দের গলায় জানো আমি বছরে একবার বকুল ফুলের মালা দিয়েছি। গরিব বাবার পেরমায়ু চেয়েছি, বরের জন্য সোহাগ চেয়েছি—মেলা থেকে ফিরতে সাঁঝ লেগে যেত। দূর থেকে দেখতাম—বাড়ির উঠোনে সেই বড় তেঁতুলগাছটা—কি ছিল না—রাজার বাড়ি বলতে পারো। মানুষটা খাটতে পারত অসুরের মতো।"

চোখ বুজে আসছে কুন্তির। বলছে, "রাজার বাড়ি বলতে পারো।"

রিয়া খাট থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে, সত্যি কুন্তিদির মুখখানা বড়ই সুন্দর। রাজরানি হতে পারত। কেন যে হল না! ডাকাতের বউ হয়ে গেল। সে ডাকল, "কুন্তিদি।"

কুন্তি সাড়া দিল। "হুঁ।"

"তারপর?"

"তারপর, পায়ে আলতা, মুখে পাউডার, ডুরে শাড়ি পরে বসে থাকতাম—তার আশায়। সে গিয়েছে তেপান্তরের মাঠে। আসার সময় শাপলা ফুল আনবে বলে গিয়েছে।"

"শাপলা ফুল দিয়ে কী হয় কুন্তিদি?"

"শাপলা ফুল দিয়ে ঘর সাজাবার কথা।"

"শাপলা ফুল কি?"

"পদ্ম ফুলের মতো। বড় পাতা হয় না, ছোট পাতা হয় শাপলা ফুলের। জলে ভেসে থাকে। পাখিরা উড়ে এসে বসে। পোকামাকড় খায়। কি সুন্দর লাগে দেখতে—বিলের জল, ঢেউ, পদ্মাপারে ঘর—ঘরে ফেরা নৌকায় লণ্ঠন দুলছে। বর কিনে এনেছে ইলিশ মাছ। মাছের ঝোল, ভাত। নৌকা বাইছে। আমি বসে থাকি পাটাতনে। দু' পার দেখা যায় না। বিলের জল ছলাত-ছলাত করে..."

"তারপর?"

"তারপর প্লাবনে সব ভেসে গেল!"

"প্লাবন কি কুন্তিদি?"

"প্লাবন হল গে বন্যা। নদী ফুঁসে উঠল—রাজবাড়ি ভেঙে পড়ল নদীর জলে। তারপর নদী গেল মজে।"

"তারপর?"

"রাজা গেল শিকারে। একটা ধনেশ পাখি ধরে আনল। পাখিটা পোষা হয়ে গেল—উড়তে থাকল—রাজা পিছু ধায়। তারপর গর্তে পড়ে ঠ্যাং খোঁড়া।"

"ও কুন্তিদি, ঘুমিয়ে পড়ছ কেন?"

"হুঁ!"

"ঘুমিয়ে পড়ছ কেন, ডাকাতের কী হল?"

"ডাকাত আর আসবে না। তুমি ঘুমোও। ডাকাতকে বলে দিয়েছি, রিয়াদি ঘুমোবে—এখন এসে তাকে জ্বালাতন কোরো না। রিয়াদি বড় হোক, বড় হতে দাও—তারপর যত খুশি জ্বালিয়ো।"

"আর আসবে না তবে?"

"আসবে না কেন? বড় হলে আসবে। রিয়াদি আমার মতো তোমায়ও একদিন ডাকাতের পাল্লায় পড়ে যেতে হবে।"

"কেন পড়ে যেতে হবে! আমি কিন্তু ঘুমোব না। ডাকাত আসুক না, ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।"

"মেয়েদের অদৃষ্ট রিয়াদি। সবাই যে যার মতো একজন ডাকাত খুঁজে বেড়ায়। ডাকাতের খপ্পরে পড়ে যেতে হয়। তারপর হয় কুন্তিদি, না হয় তোমার মা।" কুন্তি তারপর ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোতে থাকল। রিয়া বারবার ডেকেও সাড়া পেল না।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

স্বর্ণ-শহরের সন্ধানে

অরূপরতন ভট্টাচার্য

স্বপ্ন দেখারও একটা সীমা আছে। কিন্তু এ-কাহিনী স্বপ্নের সেই সীমারেখাকেও অতিক্রম করে যায়। যত তুমি ভাবতে পারো, তার চেয়ে সে অনেক আরও। কোনও সন্দেহ নেই, কল্পনারও একটা হিসাব থাকে। কিন্তু সে-হিসাবও কখনও-কখনও ওলটপালট হয়ে যায়। খবরটা নিয়ে এলেন হারমান কোর্টিস। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মেকসিকোর টেনোকটিটলান থেকে স্পেনে ফিরে এলেন। ধন-সম্পদে ভরা দেশ। সেখানকার খবর মানেই প্রাচুর্য, বৈভব আর ঈর্ষার খবর। ইউরোপের মানুষ তা চিন্তাতেও আনতে পারেনি। সর্বশক্তিমান শাসক মন্টেজুমার কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন মূল্যবান উপহার-সামগ্রী। গাড়ির চাকা যেমন বড় হবে, অনেকটা সেইরকম বড় সূর্যের মতো একটা চাকতি—ভাবতে পারা যায়, পুরোটা সোনার তৈরি, সেইসঙ্গে একটা রুপোর তৈরি চাঁদের মতো বিরাট ঝকঝকে আর-একটা চাকতি। এখানেই শেষ নয়, সঙ্গে আরও পেলেন সূক্ষ্ম কারুকার্য-করা ২০টা সোনার হাঁস আর অনেক গয়নাগাটি। এক-একটার চেহারা এক-একরকম জীবজন্তুর মতো—কোনওটা বাঘ, কোনওটা সিংহ, কোনওটা কুকুর, কোনওটা-বা আবার বানর।

কোর্টিস পশ্চিম সাগর পেরিয়ে এমন একটা ভূখণ্ডের সন্ধান পেয়েছিলেন, যার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, এসবও বোধ হয় সোনার তৈরি। সোনা নামটা শুনলেই কেমন মনে হয় না! তখন সব নজর চলে যায় ওই দুটো অক্ষরে মোড়া শব্দটার আকরের পেছনে।

স্পেনে সোনা সংগ্রহের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। স্পেনের রাজা তখন ছিলেন প্রথম চার্লস। স্পেনের ভাগ্য ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি জেনারেল ফ্রানসিস্‌কো পিজারোকে এক অভিযানের দলনেতা নির্বাচন করলেন। নতুন পৃথিবীর সন্ধানে যাত্রা শুরু হল। ১৫৩১

আদ্যিকালের নৌকোয় টিটিকাকা হ্রদ পেরোচ্ছেন আদিবাসীরা। ওপরে, সোনার তৈরি প্রত্নসামগ্রী

খ্রিস্টাব্দে—পিজারো ভেসে পড়লেন। সঙ্গে রইল কিছু ঘোড়া আর ১৮৫ জন সৈনিক। পানামায় তিনি ক'টা দিনের জন্য দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আবার পেরুর দক্ষিণ দিকে এগোতে আরম্ভ করলেন। ইন্‌কা সাম্রাজ্যের উত্তর সীমায় এসে পৌঁছতে তাঁর আর কয়েক সপ্তাহ সময় লাগল।

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ইনকাদের বিশাল রাজত্ব। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তা পৌঁছেছিল উন্নতির শীর্ষে। একাধিক নগর সভ্যতার পত্তন হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চল জুড়ে তারা শুধু শহর গড়ে তোলেনি, সুদূর আন্দিজ পর্বতমালা, এমনকী, দুর্গম আমাজন নদীর অববাহিকার ঘন জঙ্গলের মধ্যেও তারা বড়-বড় শহর তৈরি করে।

এই সাম্রাজ্যের রাজধানীর সংখ্যা ছিল দুই। উত্তরের রাজধানীটির নাম কুইট্টু—এখন নাম বদলে গিয়ে হয়েছে কুইটো। এটি বর্তমানে ইকুয়েডরের রাজধানী। অন্যটি পেরুরও দক্ষিণ দিকে, নাম কুজকো।

ইনকাদের যিনি শাসক, তাঁর পরিচয়ও ইনকা নামে, উত্তর-দক্ষিণের দুটি রাজধানীর মধ্যে তিনি দক্ষিণ দিকের রাজধানীতে থাকতেন। প্রাচুর্য থাকলে যা হয়, তিনি মারা যাওয়ার পরে তাঁকে সোনার সাজে সাজিয়ে পূর্বপুরুষদের মন্দিরে স্থাপন করা হত। সেইসঙ্গে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্যও। যিনি বসবেন তাঁর জায়গায়, তিনি আবার নতুন করে সংগ্রহ করবেন ধনদৌলত, বাড়াবেন তাঁর ঐশ্বর্য।

ইনকারা বিশ্বাস করত যে, তারা সবাই সূর্যের সন্তান। সোনার কোনও আর্থিক মূল্য তাদের কাছে ছিল না, কিন্তু তাদের মনে হত সোনা যেন সূর্যের প্রতীক।

ইনকাদের যিনি শাসক, তাঁকে মনে করা হত সূর্যের বংশধর এবং দেবতা জ্ঞানে সবাই তাঁকে পুজো করত।

লোভ আর লালসায় স্পেন থেকে এরকম একটি দেশে এসে পৌঁছলেন পিজারো। সংবাদ-সংগ্রাহকেরা দ্রুত সূর্যের বংশধর আটাহুয়ালপার কাছে পিজারোর আগমনবার্তা জানাল। আটাহুয়ালপা আর দেরি করলেন না। তিনি উচ্চ পদমর্যাদায় অভিষিক্ত একদল ধর্মযাজক আর পরিবারের একদল সদস্যকে পাঠিয়ে দিলেন আগন্তুকদের অভ্যর্থনার জন্য। আটাহুয়ালপার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি নিজেই এগিয়ে চললেন। যদি বিনা রক্তপাতে এই দেশ তিনি জয় করতে পারেন তো ভাল, না হলে এরকম স্বর্ণমূল্য তাঁকে জীবন দিয়েও পেতে হবে।

দূতেরা ছুটে গেল। খবর পৌঁছল রাজপ্রাসাদে। —স্পেনের আগন্তুকেরা এগিয়ে আসছে রাজপ্রাসাদের দিকে, উদ্দেশ্য বন্ধুত্বস্থাপন।

পরে বিকেলবেলায় পিজারো ও তাঁর সঙ্গীরা ইনকার রাজপ্রাসাদের সামনে বিরাট চত্বরে এসে জমা হলেন। তার তিনদিক ঘিরে হাজার-হাজার ইন্‌কা সৈন্য। হাতে বল্লম আর তীর-ধনুক। পিজারো এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা যে কিছুটা বিচলিত হননি তা নয়। এত বড় সৈন্যবাহিনী, সবাই সশস্ত্র, এদের মোকাবিলা করা সহজ হবে না।

বুদ্ধি খেলে গেল পিজারোর মাথায়। তা হলে ঘোড়াই হোক বাজির শেষ কৌশল, দাবার কিস্তি। তিনি ইন্‌কা সৈন্যবাহিনীর চোখের সামনেই তাঁবু খাটালেন এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ শুরু করলেন। দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। আটাহুয়ালপাকে বন্দি করে তাঁকে যদি জামিনস্বরূপ আটকে রাখা যায়, তা হলে কেমন হয়?

পরের দিন আটাহুয়ালপা শিবিকায় চড়ে এলেন পিজারোর কাছে। সে এক দেখবার মতো শোভাযাত্রা। মণিমুক্তোয় শিবিকাটি অলঙ্কৃত। শিবিকায় বসে রয়েছেন আটাহুয়ালপা। আজানুলম্বিত পোশাক খাঁটি সোনায় উজ্জ্বল। মাথায় রত্নখচিত সোনার মুকুট, দু' হাতে কাজ করা দামি বলয়, কানে প্রায় দু' কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত বড় আকারের দুল—তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

পিজারোও এগোচ্ছেন। এক মুহূর্ত পরে যেখানে প্রীতি-বিনিময়ের কথা, সেখানে হঠাৎই সমস্ত রীতিনীতি, সৌজন্য, শিষ্টাচার অগ্রাহ্য করে পিজারো ঘোষণা করলেন, "আমি স্পেনের রাজার দূত হিসাবে এসেছি, তিনিই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট। এই অন্ধকার বর্বর রাজ্যকে আমি স্পেনের অধীনে নিয়ে আসব এবং তোমাদের ধর্মান্তরিত করব।"

তিনি একটা সাদা রুমাল ফেলে দিলেন আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দলের সবাই ছদ্মবেশ খুলে দুর্দম গতিতে ইন্‌কাদের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেন। লুকনো অস্ত্র হাতে উঠল, গুলি চলতে লাগল ইন্‌কার সৈন্যদের লক্ষ্য করে।

একেবারে অপ্রস্তুত একটা পরিবেশ। ইন্‌কা সৈন্যরা আত্মরক্ষার সামান্য সুযোগটুকুও পেল না। ৩০০০ সৈন্য সেইখানেই মারা পড়ল। আটাহুয়ালপা বন্দি হলেন, শুরু হল লুঠতরাজ।

আটাহুয়ালপাকে যে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল তা ছিল ৫×৭ মিটারের মতো। এই ঘরটার চারপাশে মাটি থেকে তিন মিটার উঁচুতে একটা লাইন টেনে ইন্‌কাদের বলা হয়েছিল, এই ঘরে ওই লাইন পর্যন্ত সোনা দিয়ে ভরে দিতে হবে। তবেই মুক্তি পাবে তোমাদের শাসক। সময় দেওয়া হল মাত্র দু'মাস।

আটাহুয়ালপা ছিলেন ইনকাদের শাসক, সূর্যের বংশধর। তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য রাজ্যের চারধার থেকে সোনা এসে জড়ো হতে লাগল। ১০, ১৫ বা ২০ গ্রাম নয়, হিসাব কষে দেখা যায়, প্রয়োজন ৪ লক্ষ কিলোগ্রাম সোনা—তবেই শর্ত পূরণ হওয়া সম্ভব।

ইন্‌কারা তাদের কথা রেখে চলছিল। কিন্তু পিজারো বুঝেছিলেন, কোনওমতেই আটাহুয়ালপাকে মুক্ত করা চলবে না।

পিজারো জেনারেল মানুষ। তাঁর কাছে করুণা বা প্রাণভিক্ষা অর্থহীন। তিনি বুঝলেন,মৃত্যুদণ্ডেই একমাত্র নিশ্চিন্ত থাকা যায়। ফলে আটাহুয়ালপা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

আটাহুয়ালপাকে আগে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হল। তারপর জনসমক্ষে হাজার-হাজার সমর্থকের সামনে তিনি নিহত হলেন।

পিজারোর উদ্দেশ্য ছিল আটাহুয়ালপাকে সরিয়ে দিতে পারলে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা আরও সহজ হবে।

ইন্‌কারা যখন আটাহুয়ালপার মৃত্যু-সংবাদ শুনল, সঙ্গে-সঙ্গে সোনার জোগান বন্ধ হয়ে গেল। বেশিরভাগ সোনা হয় পুঁতে ফেলা হল জঙ্গলে, নয়তো লুকিয়ে রাখা হল গুহার গভীরে। কিছু গেল নদী বা হ্রদের জলে। যাজকেরা সূর্যমন্দির থেকে প্রচুর সোনা আর পান্না সরিয়ে তা আগ্নেয়গিরির গিরিখাতের মধ্যে রেখে দিলেন।

সমগ্র রাজ্যে সোনা লুকিয়ে ফেলা নিয়ে এই যে কিংবদন্তি, এ থেকেই এসেছে নানা কাহিনী এবং উপাখ্যান। প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে একটি সম্ভাব্য কাহিনী হ্রদ টিটিকাকাকে নিয়ে। এই হ্রদ ১৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩৯১৮ মিটার। হ্রদটির অবস্থান পেরু আর বোলিভিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ইনকাদের বিশ্বাস, টিটিকাকা হ্রদের একটি দ্বীপে সূর্যদেবতা প্রথম ইন্‌কা সৃষ্টি করেন।

Garcilaso de la Vega লিখেছেন,

স্থানীয় লোকেরা সেখানে একটি সুন্দর সোনার মন্দির তৈরি করেছিলেন। সেই মন্দিরের দেওয়াল সোনার পাত দিয়ে মোড়া। প্রতি বছর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নৈবেদ্য আসত। প্রভূত পরিমাণে সোনা, রুপো এই মন্দিরে পাঠানো হত।

শোনা যায়, ধর্মযাজকেরা নৌকোয় করে হ্রদের মধ্যে গিয়ে সেসব জলে নিক্ষেপ করতেন। এখানে জলের গভীরতা প্রায় ১৮০ মিটার।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জলের গভীরে হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণরাশি উদ্ধারের জন্য নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, ডুবুরি নামানো থেকে হ্রদের জল ছেঁচে ফেলা পর্যন্ত। কিন্তু কোনও পরিকল্পনাই কার্যকর হয়নি।

১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে অ্যামব্রোসিয়াস ডালফিঙ্গার নামে এক জার্মান স্বর্ণ-মানুষ এল-ডোরাডোর অনুসন্ধানে যাত্রা শুরু করল। স্পেনের সম্রাট প্রথম চার্লস্ কথা দিলেন, ভেনিজুয়েলার শাসনভার ছেড়ে দেবেন তাঁর জার্মান শ্রেষ্ঠীদের ওপরে। জার্মানরা ভেনিজুয়েলার তরুণ শাসনকর্তা হিসেবে পাঠাল ডালফিঙ্গারকে। ডালফিঙ্গার ১৮০ জন সঙ্গী নিয়ে স্বর্ণরহস্য উন্মোচনের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করলেন। মারাকাইবো হ্রদে তিনি এল-ডোরাডোর কাহিনী শুনতে পেলেন।

গুয়াটাভিটা নামে একটি পবিত্র হ্রদ ছিল। হ্রদের ধারে বিশিষ্ট শাসক স্বর্ণময় মানুষ এল-ডোরাডোর শহর। সেই শহরের মধ্যিখানে একটি মন্দির ছিল। মন্দিরের ভেতরে যত মূর্তি, ভাবলে অবাক হওয়ার কথা, সবই সোনার তৈরি। এইসব মূর্তির চোখে পান্না বসানো।

এই ধরনের কাহিনী শুনে উত্তেজনায় কে না লাফিয়ে উঠবে? ডালফিঙ্গারও এগিয়ে চললেন। কিন্তু বিনা বাধায় নয়। ক্রমে-ক্রমে তাঁর দলের লোকজনের সংখ্যা কমে যেতে লাগল। বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ হয়ে তিনিও মারা পড়লেন। কিন্তু প্রাণ নিয়ে যাঁরা ফিরলেন, এল-ডোরাডো সম্পর্কে তাঁরা খবরও সংগ্রহ করে আনলেন।

ফলে পুনরায় অভিযান। ডালফিঙ্গারের স্থলাভিষিক্ত হলেন হোহারমুথ। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে ডালফিঙ্গারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি আবার এগোলেন। আরও গুছিয়ে এগোতে হবে। সুতরাং দলের লোকজন বাড়ানো দরকার। ডালফিঙ্গারের লোকবল ছিল ১৮০, এবার হল ৪০৯। কিন্তু এত উদ্যোগ, আয়োজন সত্ত্বেও তিনিও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন।

অবশেষে গঞ্জালেস জিমিনেজ ডি কুইসেডা পরিচালিত ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দের অভিযানটি প্রথম সাফল্যের মুখ দেখল। এই অভিযানটি শুরু হল ভেনিজুয়েলা থেকে। সঙ্গে ৮০০ জন লোক নিয়ে দলনেতা এগিয়ে চললেন। এক বছর অমানুষিক পরিশ্রম, সীমাহীন প্রতিকূলতা, ৮০০ সৈন্যের সংখ্যা তখন নেমে এসেছে ২০০-তে, অভিযান শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রাপ্তির সীমারেখায় এসে পৌঁছে গেল। কয়েকটি গ্রাম অধিকার করলেন কুইসেডা। খোঁজ মিলল কোথায় আছে স্বর্ণভাণ্ডার আর পান্নারাশি।

এঁরাই উপাসনা করতেন সূর্যদেবতার

কুইসেডা এক এল-ডোরাডোর সন্ধান পেলেন। সেখানে নতুন রাজাকে অভিষেকের সময়ে স্বর্ণরেণুতে ঢেকে দেওয়া হয়। তারপর গুয়াটাভিটা হ্রদে স্নান সমাপন এবং স্বর্ণরেণু বিসর্জন। তবে এই অঞ্চলকে নিয়েই যে এল-ডোরাডো, কুইসেডার সে-কথা একবারও মনে হয়নি। এল-ডোরাডোর সন্ধানে কুইসেডা আরও দু'বার অভিযান চালান, কিন্তু কোনওবারই তিনি সফল হননি।

১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণ-শহর মানোয়ার খোঁজে র‍্যালে একটা অভিযান চালালেন। না, স্বর্ণশহর মানোয়া তিনি খুঁজে পাননি, কিন্তু মিথ্যা বিবরণ দিয়ে তিনি মানোয়ার কাহিনী প্রকাশ করলেন।

ফল যা হওয়ার তাই হল। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর জেল হল।

১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে আবার অভিযান শুরু হল। কিন্তু এবারেও অভিযান সুখের হল না। ত্রিনিদাদের কাছে র‍্যালে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলেও মারা পড়ল। র‍্যালের আর কোনও উপায় ছিল না। তিনি ফিরে এলেন ইংল্যান্ডে। কিন্তু চূড়ান্ত পরিণতি কী দাঁড়াবে, বুঝতে বোধ হয় তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। তাঁকে বন্দি করা হল এবং তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

প্রতিটি শতাব্দীতেই এল-ডোরাডোর অনুসন্ধানে বারবার অভিযান চলেছে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কর্নেল পার্সি ফাসেট নামে এক ইংরেজ অভিযান চালাতে গিয়ে সম্ভবত স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে নিহত হন।

ফাসেট যে-অঞ্চলের কথা বলে গেছেন, আধুনিক মানুষের কাছে সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজও দুরধিগম্য। হয়তো স্বর্ণশহর লুকিয়ে আছে ব্রাজিলের সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কাকাবাবু হেরে গেলেন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গাড়ির দরজাটা বন্ধ হওয়ার পর কাকাবাবু জানলার কাচ খুলে একবার ওপর দিকে তাকালেন। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সন্তু। মনখারাপের ভাবটা সে কিছুতেই লুকোতে পারছে না। কাকাবাবু বাইরে যাচ্ছেন, কিন্তু এবার সঙ্গে যেতে পারছে না সন্তু। কিছুতেই সম্ভব নয়। পরশু থেকে তার পরীক্ষা আরম্ভ।

কাকাবাবু বারবার বলেছেন, তিনি এবার কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছেন না। কোনও রহস্য-টহস্যের ব্যাপার নেই। এমনিই বেড়াতে যাচ্ছেন বিমানের সঙ্গে। বড়জোর দিনসাতেক থাকবেন। সন্তু তাতেও কোনও সান্ত্বনা পায়নি। কাকাবাবু যেখানেই যান, সেখানেই কিছু-না-কিছু একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটে যায়।

কাকাবাবু ওপরের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন। সন্তুও হাত নাড়ল বটে, কিন্তু তার মুখে হাসি ফুটল না।

কাকাবাবু বসেছেন সামনে ড্রাইভারের পাশে। পেছনে বিমান আর তার স্ত্রী দীপা। গাড়ি চলতে শুরু করার পর বিমান বলল, "সন্তু বেচারা এল না বটে, কিন্তু ও কি এখন পড়াশোনায় মন বসাতে পারবে?"

কাকাবাবু বললেন, "আজ সকালটা ছটফট করবে বটে, তারপর ঠিক মন বসে যাবে। পরীক্ষার একটা ভয় তো আছে।"

বিমান বলল, "না, কাকাবাবু, আজকাল দেখেছি ছেলেমেয়েরা

পরীক্ষার আগে বিশেষ ভয়টয় পায় না। এখন সব সিস্টেম তো পালটে গেছে। বেশি মুখস্থ করারও দরকার হয় না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ছোটবেলার কথা মনে আছে, ইস্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার আগে প্রতি বছর ভয়ে বুক কাঁপত। প্রত্যেকবার মনে হত, এবার ঠিক ফেল করব! তাই শেষের দিনটায় ভাবতাম, ফেলই যখন করব, তখন আর পড়ে কী হবে? তাই টেক্সট-বইয়ের বদলে সেদিন গল্পের বই পড়তাম।"

বিমান বলল, "তারপর প্রত্যেক বছরই ফার্স্ট হতেন। সবাই জানে, আপনি জীবনে কখনও শেষ পরীক্ষায় সেকেন্ড হননি।"

কাকাবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "ও একটা বাজে গুজব বুঝলে! শেষের দিকে দু-একবার ফার্স্ট হয়েছিলাম, তাই অনেকে বলে আমি প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি।"

দীপা জিজ্ঞেস করল, "সত্যিই আপনি কখনও সেকেন্ড-থার্ড হয়েছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেকবার। প্রত্যেকবার আমি ফার্স্ট হব, এমন স্বার্থপর আমি নই। অন্যরা কী দোষ করেছে? আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল সুপ্রিয়, সে এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে বড় কাজ করে। সে কখনও সেকেন্ড হলে তার চেয়ে আমার বেশি কষ্ট হত।"

দীপা বলল, "তাই আপনি ইচ্ছে করে তাকে ফার্স্ট করাতেন?"

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, "আরে না, না! সে আমার চেয়ে অনেক ভাল ছেলে ছিল। স্কুলে আমি ছিলাম বেশ ফাঁকিবাজ। ক্লাসের পড়ার বইয়ের চেয়ে গল্পের বই পড়ার দিকে ঝোঁক ছিল খুব। আর খুব কবিতা মুখস্থ করতাম।"

দীপা বলল, "আমি তো স্কুলে পড়াই। আমি লক্ষ করেছি। যেসব ছেলেমেয়ে শুধু টেক্সট-বুক মুখস্থ না করে নানারকম বাইরের বই পড়ে, তারাই কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট হয়। তারা অনেক বেশি শেখে।"

বিমান বলল, "আর ছোটবেলায় কবিতা মুখস্থ করলে তা মানুষ কখনও ভোলে না। আমি ক্লাস সিক্সে পড়বার সময় সুকুমার রায়ের সব কবিতা মুখস্থ করেছিলাম। ক্লাস এইটে উঠে পুরো 'মেঘনাদ বধ কাব্য'। আজও সবটা মনে আছে। দেখবে? 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি, বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে, তখন কহ গো দেবী অমৃতভাষিণী...'"

দীপা বলল, "থাক, থাক, তোমাকে আর পরীক্ষা দিতে হবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "কহ গো দেবী, না 'কহ হে দেবী'?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কহ হে দেবী! বাঃ, আপনার তো বেশ মনে আছে!"

দীপা বলল, "আর কয়েকটা দিন পরে, সন্তুর পরীক্ষাটা হয়ে গেলে আমরা যদি যেতাম ভাল হত। সন্তু থাকলে বেশ মজা হয়।"

বিমান বলল, "দেরি করবার যে উপায় নেই। সামনের সোমবার থেকে বাড়িটা ভাঙতে শুরু করবে।"

দীপা বলল, "অত পুরনো বাড়ি। ভাঙবার সময় সাপটাপ বেরোবে না তো?"

বিমান গম্ভীর মুখ করে বলল, "বলা যায় না। শুনেছি, একতলার ঘরগুলো বহুদিন বন্ধ আছে। সেখান থেকে অজগর কিংবা পাইথন বেরোতে পারে। আর তহবিলখানার দিকে ভূত-পেত্নি তো আছেই, সে বেচারারা কোথায় যাবে কে জানে!"

দীপা বলল, "আমি সোমবারের আগেই ফিরতে চাই। বাড়ি ভাঙা-টাঙা আমি দেখতে পারব না!"

গাড়িটা এলগিন রোডে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বাড়ির কাছেই আর-একটা বাড়ির সামনে থামল। বিমান ড্রাইভারকে বলল, "দু'বার হর্ন দাও।"

এখান থেকে আর-একজনকে তুলে নেওয়া হবে। এর নাম অসিত ধর। বিমানের এক বন্ধুর সূত্রে চেনা। এই অসিত ধর বছরের অনেকটা সময় ইংল্যান্ড-আমেরিকায় থাকে। পুরনো দামি জিনিসপত্র কেনাবেচার ব্যবসা আছে, ইংরেজিতে যেগুলোকে বলে অ্যান্টিক। বেশ ভাল ব্যবসা।

অসিত ধর তৈরিই ছিল, হর্ন শুনে নেমে এল।

খয়েরি রঙের স্যুট পরা বেশ ফিটফাট চেহারা। চোখে সানগ্লাস। সঙ্গে একটা বড় ব্যাগ আর ক্যামেরা।

বিমান কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে দেওয়ার জন্য বলল, "অসিতবাবু, ইনি হচ্ছেন মিঃ রাজা রায়চৌধুরী। খুব বিখ্যাত লোক, আমরা এঁকে কাকাবাবু বলি।"

মুখ দেখেই বোঝা গেল, অসিত ধর কাকাবাবুর নাম আগে শোনেনি। কাকাবাবু সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে ইংরেজি কায়দায় বলল, "গ্ল্যাড টু মিট ইউ!"

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, "নমস্কার!"

বিমান অসিত ধরকে পেছনের সিটে তুলে নিল। গাড়ি আবার চলতে শুরু করলে বিমান বলল, "কাকাবাবু, ইনি পুরনো ফার্নিচার, ঘড়ি, ছবিটবির ব্যবসা করেন। আমাদের আলিনগরের বাড়ির সব কিছুই তো বেচে দেব, ইনি দেখতে যাচ্ছেন যদি কিছু পছন্দ হয়।"

অসিত ধর বলল, "ঠিক সেজন্যও নয়। এমনিই বেড়ানো হবে। অনেকদিন তো কলকাতার বাইরে যাওয়া হয় না, প্রায় সারা বছরই বিদেশে কাটাতে হয়।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বিমান, তোমাদের এই বাড়িটা কতদিনের পুরনো?"

দীপা বলল, "ওটা কিন্তু বিমানদের নিজের বাড়ি নয়। মামাবাড়ি। ওর একমাত্র মামা গত বছর মারা গেলেন। তাঁর কোনও ছেলেপুলে ছিল না। তাই বিমানরা তিন ভাই ওই সম্পত্তি পেয়েছে।"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, প্রায় ফাঁকতালে পেয়ে গেছি বলতে পারেন। আমার মামা খুব কিপ্পুস ছিলেন। অত বড় বাড়িতে একা-একা থাকতেন, আমাদের কখনও যেতেও বলতেন না। ছোটবেলা কয়েকবার গেছি, ভাল করে কথাও বলতেন না আমাদের সঙ্গে। সেই মামা চুরাশি বছর বেঁচে তারপর মারা গেলেন। ও-বাড়ি যে আমরা কখনও পাব, তা ভাবিওনি। মামার মৃত্যুর পর জানা গেল, তিনি কোনও উইল করেননি। তাই মামার উকিল আমাদের তিন ভাইকে ডেকে সম্পত্তি দিয়ে দিল।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মামা বিয়ে করেননি?"

"হ্যাঁ করেছিলেন। এক সময় উনি বিলেতে থাকতেন, তখন মেমসাহেব বউ ছিল। সেই মেম-মামিমা এদেশে আসেননি। তিনিও এতদিনে আর বেঁচে নেই বোধ হয়। আমার আর-একজন মামা ছিলেন, ছোটমামা। তিনি তাঁর বিয়ের ঠিক আগের দিন ওই বাড়িতেই মারা যান। এসব অবশ্য আমার জন্মের আগেকার কথা। আমার মা তো বলেন যে, ছোটমামাকে নাকি ওই বাড়িতে ভূতে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছিল।"

দীপা বলল, "মা কিন্তু খুব বিশ্বাসের সঙ্গেই বলেন কথাটা!"

অসিত ধর বলল, "সব পুরনো বাড়ি সম্পর্কেই এরকম কিছু ভূতের গল্প থাকে। সেগুলো খুব ইন্টারেস্টিং হয়।"

বিমান বলল, "বাড়িটা ঠিক কতদিনের পুরনো তা বলতে পারব না। তবে দুশো বছর তো হবেই। আমার মামাদের এক পূর্বপুরুষ নবাব আলিবর্দির কাছ থেকে জায়গির পেয়ে এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন শুনেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আলিবর্দি? তা হলে তো আড়াইশো বছর আগে। আলিবর্দি মারা গেছেন সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে।"

দীপা বলল, "তার মানে পলাশি যুদ্ধেরও আগে"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা তো হবেই। আলিবর্দির নাতি
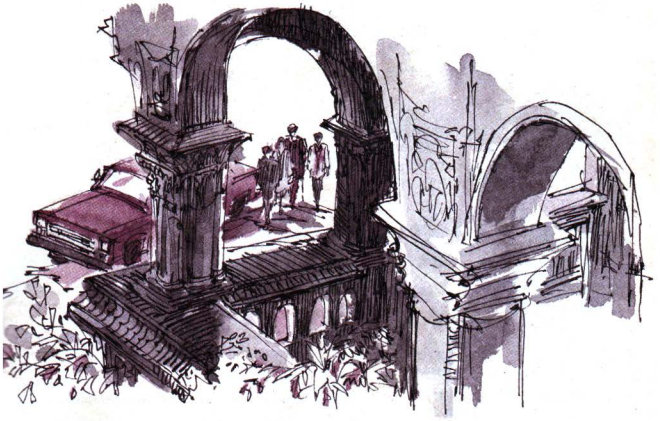
সিরাজউদ্দৌল্লা, নবাবি করেছিলেন মাত্র চোদ্দ মাস।"

অসিত ধর বলল, "ইতিহাসের সাল-তারিখ আপনার তো বেশ মুখস্থ থাকে।"

বিমান বলল, "সন্তু এসব পটাপট বলে দিতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুর কাছে শুনে-শুনেই তো আমারও মুখস্থ হয়ে গেছে। তা এত পুরনো বাড়ি ? আমাদের দেশে এত পুরনো বাড়ি খুব কমই আছে।"

অসিত ধর বলল, "এত পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলবেন ? ইউরোপে এইসব বাড়ি ওরা খুব যত্ন করে রেখে দেয়। যার বাড়ি সে ভাঙতে চাইলেও গভর্নমেন্ট বাধা দেয়।"

দীপা বলল, "অত বড় বাড়ি ঠিকঠাক রাখার মতন সাধ্য আছে নাকি আমাদের !"

অসিত ধর বলল, "ফরাসি দেশে পুরনো আমলের রাজা-মহারাজা বা জমিদারদের বিরাট-বিরাট বাড়িগুলোকে বলে শাতো। এইরকম অনেকগুলো শাতো আমি দেখেছি। সেখানে ঢুকতেই চারশো-পাঁচশো বছরের ইতিহাস ফিল করা যায়।"

বিমান বলল, "কুচবিহারের রাজাদের বাড়িটা দেখেছেন, অত চমৎকার একটা প্রাসাদ, সেটারই কী ভাঙাচোরা অবস্থা এখন। ফরাসি দেশের শাতোগুলোর চেয়ে সেই রাজপ্রাসাদ কোনও অংশে কম সুন্দর ছিল না।"

গাড়িটা কলকাতা ছাড়িয়ে বালি ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোডে পড়েছে। মেঘলা-মেঘলা আকাশ, গরম নেই, বেড়াবার পক্ষে খুব ভাল সময়।

অসিত ধর ফরাসি দেশের শাতোর গল্প শোনাতে লাগল।

বর্ধমানের কাছাকাছি এসে হঠাৎ বৃষ্টি নামল। সে একেবারে সাঙ্ঘাতিক বৃষ্টি। চতুর্দিক অন্ধকার। এই বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানোও বিপজ্জনক। সেইজন্য ওরা আশ্রয় নিল রাস্তার পাশে এক ধাবায়। গরম-গরম রুটি আর মাংস খাওয়া হল।

বৃষ্টির তেজ কমল প্রায় এক ঘন্টা পরে, তাও পুরোপুরি থামল না। রাস্তার অনেক জায়গায় জল জমে গেছে, গাড়ি চালাতে হল আস্তে-আস্তে।

বীরভূম জেলায় ঢুকে বড় রাস্তা ছেড়ে একটা সরু, কাঁচা রাস্তায় ঢুকতে হল। সে-রাস্তায় আবার খুব কাদা। দু'বার গাড়ির চাকা বসে গেল। দীপাকে শুধু গাড়িতে বসিয়ে অন্যরা সবাই গাড়ি ঠেলে তুলল।

অসিত ধর সাহেবি ধরনের মানুষ। তার ঝকঝকে পালিশ করা জুতো কাদায় একেবারে মাখামাখি। প্যান্টেও কাদা লেগেছে।

বিমান বলল, "ইস, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। আমি গত সপ্তাহেও একবার এসেছিলাম, তখন রাস্তা এত খারাপ ছিল না।"

অসিত ধর বলল, "কষ্ট আবার কী ! আমার তো বেশ মজা লাগছে। বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে।"

বিমান বলল, "আজ আর বৃষ্টি থামবে না মনে হচ্ছে। আজ সন্ধেবেলা ভূতের গল্প খুব জমবে। পুরনো বাড়িতে এমনিতেই অন্ধকারে গা-ছমছম করে।"

দীপা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এই খবর্দার, ভূতটুতের কথা একদম উচ্চারণ করা চলবে না।"

অসিত ধর খানিকটা অবাক হয়ে বলল, "আপনি ভূত বিশ্বাস করেন নাকি ?"

দীপা বলল, "মোটেই করি না। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি। কিন্তু ওসব গল্পটল্প শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগে না !"

বিমান বলল, "দীপা বিশ্বাস করে না বটে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে ভূতের নাম করলেই ও ঠকঠক করে কাঁপে। অসিতবাবু, আপনি ভূতটুত মানেন না নিশ্চয়ই ?"

"আমার কল্পনা, ঝলমলে উজ্জ্বল রূপে অনন্যা
তুই তো আমার প্রেরণা..."
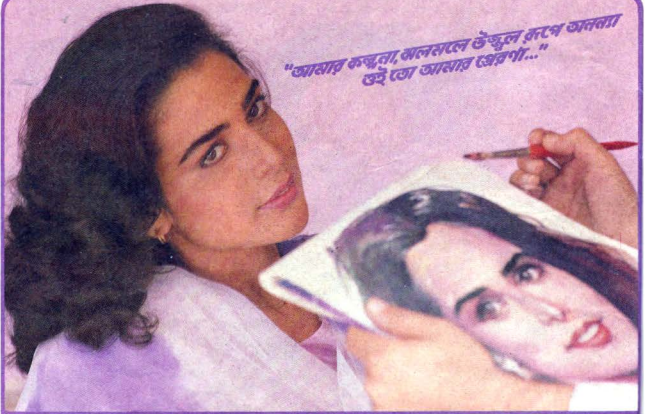
কল্পনার ঐ ঝলমলে উজ্জ্বল রূপ, যে কোনো শিল্পমণ্ডিত রচনার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ও যে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী-রই কলাকৃতি।

"শিগ্‌গির করো না"। উচ্ছ্বসিত কল্পনা তো হেসেই অস্থির। কিন্তু অরুণ একেবারে বিহ্বল হয়ে ওর দিকে তাকিয়েই আছে, কিছুতেই চোখ সরাতে পারছে না। ঐ কেরামতি ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী ছাড়া আর কিছুর হতেই পারে না।
মাত্র দু মাসেই যে তা কল্পনার রূপকে প্রাকৃতিক কোমলতা দিয়ে অমন ঝলমলে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। ঐভাবেই নিয়মিত ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী লাগালে, কল্পনার ঐ প্রেরণাদায়ক রূপ অম্লান থাকবে, সবসময়। অরুণ যখন অমন আকর্ষণীয় প্রেরণা পেয়েই গেছে, তখন আর প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্যে কেন আর মাথা ঘামায়। কল্পনার মত ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী দিয়ে আপনিও আপনার রূপে ঝলমলে উজ্জ্বলতা আনতে পারেন, আপনিও কারুর প্রেরণা হয়ে উঠতে পারেন।

জরুরী এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীতে এমন এক অনন্য ফর্মুলা আছে, যা উল্লেখযোগ্যভাবে দু'রকম উপায়ে কাজ ক'রে আপনাকে স্বাভাবিক ভাবেই ক'রে তোলে আরো উজ্জ্বল, আরো ঝলমলে। প্রথমতঃ এটি ত্বকের একেবারে গভীরে প্রবেশ ক'রে, ত্বক ময়লা

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীর আগে

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীর পরে

করার প্রক্রিয়াকে ভেতর থেকেই এমনভাবে প্রতিরোধ করতে থাকে, যা করা অন্য কোনো ক্রীমের সাধ্য নেই।

দ্বিতীয়তঃ, এর দ্বিগুণ সানস্ক্রীন ক্রিয়া রঙ ময়লা ক'রে দেওয়া প্রখর রোদের হাত থেকে ত্বককে রাখে পুরোপুরি সুরক্ষিত।

সেজন্যেই তো, ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে যে নতুন ত্বকের পরত ফুটে বেরোয়, তা হয় কত উজ্জ্বল, আর কত ঝলমলে। প্রতিদিনে দু'বার করে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী লাগান, আর ত্বকে পান, চিরকালের জন্যে স্বাভাবিক উজ্জ্বল রঙ . . . কোমলতায় গড়া, সৌন্দর্যে ভরা।

ব্যবহারের নিয়ম –

হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে মুখমণ্ডল, ঘাড়, গলা ও বাহুতে অল্প অল্প ক্রীম লাগান। হাতটি ওপরের দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হালকাভাবে মালিশ করুন।
ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী প্রভাব দেখাতে শুরু করলেই হয়তো আপনার ত্বক সামান্য চিন্‌চিন্‌ করতে পারে, তার জন্যে ঘাবড়াবেন না; খুব শিগ্‌গিরই তা ঠিক হয়ে যাবে।

সহজেই শুষে যায় –

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী এখন আগের চেয়েও বেশী মোলায়েম, বেশী মসৃণ হয়েছে। তাই তো, ত্বকে এটি অনেক ভাল করে, আর একেবারে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে . . . আর ত্বকও তা শুষে নেয় অতি সহজে।

লাগিয়ে দেখুন না, আপনিও পরিষ্কার বুঝতে পারবেন তফাৎটা আর কিছু দিনের মধ্যেই রঙরূপেও সে তফাৎটা ধরা পড়ে; আপনার মন আনন্দে উঠবে ভরে। ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী সম্বন্ধে যদি আরো কিছু জানার থাকে তাহলে এই ঠিকানায় লিখুন : শ্রীমতি কবিতা কুমার, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী পরামর্শদাত্রী, পোঃ আঃ বক্স ৭৫৮, বম্বে - ৪০০ ০২১.

নতুন বেশি মোলায়েম

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী

ফেয়ারনেস ক্রীম

প্রকৃতির কোমলতায় রঙ এমন উজ্জ্বল ঝলমলে করে...যা সবার নজরে পড়ে!

INTAS FAL 67 2719 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদ

অসিত ধর বলল, "এত ভাল-ভাল ভূতের গল্প শুনেছি যে, সত্যি বলে মানতে ইচ্ছে করে। ভূত দেখার ইচ্ছেও আছে খুব। ক্যামেরা এনেছি, ভূত দেখলেই ছবি তুলে ফেলব। ফরেনে সেই ছবি দেখলে হইচই পড়ে যাবে।"

কাকাবাবু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার হেসে বললেন, "ভূতের ছবি? এটা তো বেশ ভাল আইডিয়া! ভূতের গল্পগুলোতে শুধু আঁকা ছবি থাকে, ফোটোগ্রাফ কেউ কখনও দেখেনি!"

গাড়ির ড্রাইভার বিলাস সারা রাস্তা কোনও কথাই বলেনি। এবারে সেও আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে বলল, "সার, ওদের ছবি তোলা যায় না। আমার এক কাকা একবার চেষ্টা করেছিল, ক্যামেরার ফিলিম সব সাদা হয়ে গেল।"

বিমান উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "বিলাস, তোমার কাকা নিজের চোখে ভূত দেখেছেন নাকি?"

বিলাস বলল, "হ্যাঁ, সার। আমিও তো দেখেছি। আমি তখন কাকার পাশে ছিলাম!"

বিমান বলল, "বাঃ বাঃ! এই তো একজন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গেল। রাত্তিরবেলা ভাল করে শুনিও তো ঘটনাটা!"

দীপা বলল, "আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর।"

অসিত ধর বলল, "আমি এমন ক্যামেরা এনেছি, তাতে পুরো অন্ধকারেও ছবি তোলা যায়। ভূত দেখা গেলে তার ছবি উঠবেই!"

কাকাবাবু বললেন, "এবার মনে হচ্ছে, আমরা এসে গেছি!"

॥ ২ ॥

গাড়িটা একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল সেই বিশাল প্রাসাদ। রোদ্দুর নেই বলে বিকেলবেলাতেই সন্ধে-সন্ধে ভাব। সেই ম্লান আলোয় বাড়িটাকে মনে হয় আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিক থেকে আর-একদিকের যেন শেষ নেই।

কাকাবাবু মহাবিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, "এত বড় বাড়ি, আমি যে আগে ধারণাই করতে পারিনি।"

অসিত বলল, "এ যে প্রায় কাস্‌ল।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একবার ওড়িশার একটা পুরনো আমলের ফাঁকা রাজবাড়িতে থেকেছিলাম। কিন্তু সে-বাড়িটাও এত বড় নয়।"

অসিত বলল, "এমন একটা গর্জাস বাড়ি ভেঙে ফেলবেন? খুবই অন্যায় কথা কিন্তু!"

বিমান বলল, "কী করি বলুন! এ-বাড়ি এমনিতেই ভেঙে পড়ছে। পুরো মেরামত না করলে আর রক্ষা করা যাবে না। তার জন্য লক্ষ-লক্ষ টাকা দরকার, সে-টাকা কোথায় পাব বলুন।"

দীপা বলল, "মাঠের মধ্যে এরকম একটা জগদ্দল-মার্কা বাড়ি রেখেই বা লাভ কী? আমরা তো কেউ এখানে থাকতে আসব না!"

বিমান বলল, "আমার আর দু' ভাইয়ের মধ্যে একজন থাকে দিল্লিতে, আর-একজন জাপানে। তারাও কেউ দায়িত্ব নিতে চায় না। তারাই আমাকে বলেছে বিক্রি করে দিতে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "যিনি কিনেছেন, তিনিএটা ভেঙে ফেলতে চাইছেন কেন?"

বিমান বলল, "কিনেছেন এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক। তাঁর পাইপের কারখানা আছে আসানসোলে। এ-বাড়িটা ভেঙে তিনি এখানে আর একটা কারখানা তৈরি করবেন।"

অসিত বলল, "এত চমৎকার একটা প্যালেসের বদলে হবে চিমনিওয়ালা কারখানা! ছি, ছি!"

কাকাবাবু বললেন, "ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, 'ওল্ড অর্ডার চেইঞ্জেথ, ইলডিং প্লেস টু নিউ'!"

দীপা বলল, "রবীন্দ্রনাথেরও লেখা আছে, 'হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে।'"

গাড়ির শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছে দু'জন লোক। একজনের বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, অন্যজন বেশ বৃদ্ধ।

বৃদ্ধটিকে বিমান বলল, "রঘুদা, মালপত্রগুলো নামিয়ে নাও, আর শিগগির চায়ের জল চাপাতে বলো। চা, দুধ,চিনি আমি সঙ্গে এনেছি।"

গাড়ি থেকে নেমে কাকাবাবুকে বলল, "আসুন, আগে আমাদের ঘরগুলো দেখে নিই।"

সামনেই একটা বিরাট সিংহ-দরজা। দু' পাশের দুটো পাথরের সিংহ একেবারে ভাঙা। লোহার গেটটা কিন্তু অটুট আছে। ভেতরে এককালে নিশ্চয় বাগান ছিল, এখন জংলা হয়ে আছে। তারপর ধাপেধাপে অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে গেছে, মুর্শিদাবাদের নবাব প্যালেসের মতন।

কাকাবাবু ক্রাচ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যেতেই অসিত এগিয়ে এসে ভদ্রতা করে বলল, "আমি আপনাকে সাহায্য করব?"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। দরকার হবে না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আমার কোনও কষ্ট হয় না। নামার সময় বরং কিছুটা অসুবিধা হয়।"

বিমান বলল, "আরও সিঁড়ি আছে। এটা একতলা। একতলার ঘরগুলো ব্যবহার করা যায় না। আবর্জনায় ভর্তি। দোতলায় চার-পাঁচখানা ঘর মোটামুটি ঠিক আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে কাছাকাছি নদী আছে নিশ্চয়ই?"

দীপা বলল, "না, নদী-টদি নেই ধারেকাছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আগেকার দিনে সাধারণত নদীর ধারেই এরকম বড় বাড়ি তৈরি করা হত।"

বিমান বলল, "ঠিক বলেছেন, শুনেছি, আগে একটা নদী ছিল। সেটা শুকিয়ে গেছে অনেকদিন। তবে দিঘি আছে দুটো বেশ বড় বড়।"

দোতলায় উঠে এসে বিমান বলল, "আমাদের ঘরগুলো অবশ্য পাশাপাশি হবে না। এদিকে দুটো আছে ব্যবহার করা যায়। আর একটা একটু দূরে।"

অসিত সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আপনারা এদিকে থাকুন। আমাকে দূরের ঘরটা দিন।"

বিমান বলল, "ঠিক আছে। কাকাবাবু আমাদের পাশেই থাকবেন। তাতে দীপার যদি ভূতের ভয় একটু কমে।"

একটা ঘরের তালা খুলে বিমান সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

কাকাবাবু বললেন, "ইলেকট্রিসিটি আছে, যাঃ, তা হলে তো অনেকটাই রহস্য চলে গেল। এসব জায়গায় টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলবে, হঠাৎ ঝড়ে সেই লণ্ঠন উলটে গিয়ে ভেঙে যাবে, তবেই তো মজা!"

দীপা বলল, "ইলেকট্রিসিটি না থাকলে আমি আসতাম নাকি? রাত্তিরবেলা আলোর চেয়েও বেশি দরকার ফ্যান। ফ্যান না চললে আমি ঘুমোতেই পারি না।"

ঘরটায় আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই। একটা মাঝারি ধরনের খাট, একটা দেওয়াল-আলমারি আর কয়েকটা চেয়ার। একটা ছোট শ্বেত পাথরের টেবিল। ঘরটা অবশ্য অন্য সাধারণ ঘরের চারখানা ঘরের সমান। এত জায়গা খালি পড়ে আছে যে মনে হয়, সেখানে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়।

অসিত চেয়ারগুলো আর খাটটায় একবার হাত বুলিয়ে বলল, "এগুলো তো তেমন পুরনো নয়।"

বিমান বলল, "আগেকার জিনিস তেমন কিছু নেই। অনেক নষ্ট হয়ে গেছে, আমার বড়মামা বেশ কিছু ফার্নিচার বিক্রিও করে দিয়েছেন। জমিদারি-টমিদারি তো কিছু আর ছিল না, অন্য আয়ও

ছিল না, বড়মামা এখানকার জিনিসপত্র বিক্রি করে খরচ চালাতেন।"

কাকাবাবু বললেন, "উনি বৃদ্ধ বয়েসেও একা থাকতেন এত বড় বাড়িতে ?"

বিমান বলল, "আগে দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন ছিল কয়েকজন। এখানে থেকে কোনও লাভ নেই বলে তারাও চলে গেছে আস্তে-আস্তে। বড়মামা মাঝে-মাঝে যেতেন কলকাতায়। আমাদের বাড়ি থাকতেন না, উঠতেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। কিছু একটা ব্যবসা করতেন শুনেছি, তবে সে-ব্যবসা সাকসেসফুল হয়নি কখনও। টাকাটাই নষ্ট হয়েছে শুধু।"

দীপা বলল, "আসলে পাগল ছিলেন, সেটা হল না।"

বিমান হেসে বলল, "ঠিক পাগল নয়, পাগলাটে ! আমার বাবা তো বলেন, আমাদের মামাবাড়ির সবাই ছিটগ্রস্ত ! আমার মা সুদ্ধু !"

দীপা আবার বলল, "তোমাদের এক দাদু একেবারে বদ্ধ পাগল ছিলেন না ?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, ক্রিশ্চান-দাদু ! তাঁর গল্প পরে বলব ! পুরনো বংশগুলোতে যেন কিছু একটা অভিশাপ লাগে, আস্তে-আস্তে শেষ হয়ে যায় এইরকমভাবে। বড়মামার মৃত্যুর পর রাও-বংশও শেষ হয়ে গেল !"

কাকাবাবু বললেন, "রাও !"

বিমান বলল, "টাইটেল শুনলে অবাঙালি মনে হয় তো ? আমার মামারা অবাঙালিই ছিলেন এককালে। নবাবি আমলে বাংলাদেশে এসে সেট্‌ল করেছিলেন। হয়তো লড়াই করে নবাব আলিবর্দিকে খুশি করেছিলেন।"

অসিত বলল, "এইসব পুরনো বাড়িতে গুপ্তধন-টুপ্তধন থাকে অনেক সময়। দেখুন বাড়ি ভাঙার সময় কিছু পেয়ে যেতেও পারেন !"

বিমান বলল, "সে গুড়ে বালি ! আমার ছোট ভাই, যে জাপানে থাকে, সেই ধীমানের মাথাতেও এই চিন্তা এসেছিল। বাড়িটা আমাদের ভাগে পড়বার পর শ্রীমান একবার এসেছিল এখানে। আমরা দু' ভাই সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। দামি জিনিস প্রায় কিছুই নেই। আগেই যে-যা পেরেছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ-বাড়িতে সুড়ঙ্গ-টুড়ঙ্গ কিছু নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "যাক, বাঁচা গেছে ! সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটাচলা করা আমার পক্ষে বড্ড কষ্টকর ! অথচ আমার এমনই ভাগ্য, কতবার যে সুড়ঙ্গ দিয়ে পালাতে হয়েছে কিংবা চোর তাড়া করতে হয়েছে তার ঠিক নেই ! এখানে এসে গুপ্তধনও খুঁজতে হবে না, সুড়ঙ্গতেও ঢুকতে হবে না !"

অসিত বলল, "সুড়ঙ্গ যে নেই, সে-বিষয়ে আপনি শিওর হলেন কী করে ? হয়তো আপনারা খুঁজে পাননি। আগেকার দিনে গোপনে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা তো থাকতই !"

বিমান বলল, "সেরকম কিছু থাকলে আমার মা অন্তত জানতেন। আমার মা তো জন্মেছেন এই বাড়িতে। মায়ের কাছে গল্প শুনেছি, ওঁদের ছোটবেলা থেকেই গুপ্তধন আর সুড়ঙ্গ খোঁজা শুরু হয়েছিল। আমার ছোটমামা অনেক দেওয়াল ভেঙে ফেলেছেন। নাঃ, ওসব কিছু নেই।"

অসিত ছোট শ্বেত পাথরের টেবিলটা টোকা মেরে পরীক্ষা করে বলল, "এটা মন্দ নয়। তবে মাত্র ষাট-সত্তর বছরের পুরনো। চলুন, আমার ঘরটা দেখা যাক।"

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর কাকাবাবু ঘরটার পেছন দিকের একটা জানলা খুললেন। অনেকদিন এ-জানলা খোলা হয়নি বোঝা যায়। বড় পেতলের ছিটকিনি আঁটা, খুলতে বেশ জোর লাগল।

জানলাটা খুলতেই এমন একটা সরু আর তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেল যে, কাকাবাবু চমকে উঠলেন। তারপর ঝটাপট শব্দে উড়ে গেল একটা চিল। জানলার বাইরেই চিলটা বাসা করেছে, জানলা খোলায় সে বেশ বিরক্ত হয়েছে।

জানলা দিয়ে একটা সুন্দর দৃশ্য দেখা গেল।

বৃষ্টি থেমে গেছে, পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আকাশ। কাছেই একটা মস্ত বড় ঝিল, সেখানে ফুটে আছে অজস্র পদ্মফুল। ঝিলের ওপারের আকাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। দারুণ লাল রঙের ছড়াছড়ি। আকাশ থেকে লাল-লাল শিখা এসে পড়েছে পদ্মফুলগুলোর ওপর।

কাকাবাবু মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য।

একটু পরে দরজার কাছ থেকে একজন বলল, "সার, চা দেওয়া হয়েছে। আপনাকে ডাকছেন !"

কাকাবাবু পেছন ফিরে দেখলেন অল্পবয়েসী কাজের লোকটিকে।

কাকাবাবু বললেন, "চলো, যাচ্ছি।"

বারান্দাটা প্রায় একটা রাস্তার মতন চওড়া, তার পাশে-পাশে ঘর। কাকাবাবু ডান দিকে একটুখানি গিয়েই দেখতে পেলেন ডাইনিং-রুম। এ-ঘরেও প্রায় বিশেষ কিছুই নেই, একটা বড় কাঠের টেবিল আর কয়েকখানা সাধারণ চেয়ার, দেওয়ালের গায়ে একটা কাচ-ভাঙা আলমারি। টেবিলটার পালিশ উঠে গেছে। জমিদারবাড়িতে এসব একেবারেই মানায় না !

অসিত টেবিল-চেয়ারগুলোয় হাত বুলিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "আপনার মামা ভাল-ভাল জিনিস সব বিক্রি করে দিয়ে বাজে ফার্নিচারে ভরিয়ে রেখে গেছেন বাড়িটা। আমার ঘরে যে খাটটা রয়েছে, সেটার দাম একশো টাকাও হবে না।"

বিমান লজ্জা পেয়ে বলল, "আপনি তা হলে আমাদের ঘরটায় এসেই থাকুন। সেখানে একটা পুরনো পালঙ্ক আছে।"

অসিত বলল, "না, না, তার দরকার নেই। ঘরটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। জানলা দিয়ে অনেকখানি ফাঁকা মাঠ দেখা যায়, দূরে একটা জঙ্গল।"

দীপা বলল, "খাবারগুলো জুড়িয়ে যাবে, আগে খেয়ে নিন।"

দু'জন কাজের লোক টেবিলের ওপর কয়েকটা প্লেট সাজিয়ে দিয়ে গেল। একটাতে হ্যামবার্গার, একটাতে প্যাটিস, একটাতে সন্দেশ।

কাকাবাবু বললেন, "এ কী, এর মধ্যে এতসব খাবার জোগাড় করলে কী করে ?"

দীপা বলল, "আমি সব জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখানে কী পাওয়া যাবে না যাবে তার ঠিক নেই।"

বিমান বলল, "দীপা গাড়ি ভর্তি করে ভাল চাল, মুগের ডাল, পাঁপড়, আচার, চিজ, মাখন এইসব নিয়ে এসেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "খাওয়াদাওয়া তা হলে বেশ ভালই হবে মনে হচ্ছে !"

বিমান বলল, "কালকে দিঘিতে জাল ফেলিয়ে মাছ ধরব।"

অসিত একটা হ্যামবার্গারে কামড় দিয়ে বলল, "চা-টা খাওয়ার পর আমরা পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে দেখব।"

বিমান বলল, "সন্ধে হয়ে গেল। সব জায়গায় কিন্তু আলো নেই। ইলেকট্রিক রয়েছে মাত্র চার-পাঁচখানা ঘরে।"

অসিত বলল, "আমার কাছে বড় টর্চ আছে।"

বিমান বলল, "ঠিক আছে, আমরা যতটা পারি দেখব। তবে সারা বাড়িটা কাল দিনের আলোতেই ভাল দেখা যাবে।"

কাকাবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "এতদিনের পুরনো বাড়ি, এখানে সেকালের কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই ?"

বিমান বলল, "সেরকম কিচ্ছু নেই। আমি ছেলেবেলায় এসে কয়েকমাস তলোয়ার আর বর্শা দেখেছিলাম। কিছু বন্দুক-পিস্তল ছিল। কিন্তু সবই বিক্রি হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত বড়মামার ঘরে একটা রাইফেল ছিল। সেটাও আমি থানায় জমা দিয়ে দিয়েছি।

আমাদের কলকাতার বাড়িতে রাইফেল রাখার কোনও মানে হয় না। এখানে থাকলে চুরি হয়ে যেত!"

অসিত বলল,"পুরনো ফায়ার আর্মসের অনেক দাম হয়। ইস, আমাকে একবার দেখালেন না!"

দীপা বলল, "হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা দু'খানা ছুরিও পাওয়া গিয়েছিল। সে দুটো আমরা রেখে দিয়েছি।"

অসিত ব্যস্ত হয়ে বলল, "কই, কই, দেখান তো?"

দীপা বলল, "সে দুটো কলকাতার বাড়িতে রয়েছে। আর-একটা বেশ ছোট্ট সুন্দর পাথরের বাক্সও পেয়েছিলাম। দেখলেই মনে হয়, গয়নার বাক্স। কিন্তু তার মধ্যে একটুকরো গয়নাও নেই!"

বিমান বলল, "বড়মামা তো অনেকদিন বেঁচেছেন, দামি জিনিস সবই বিক্রি করে দিয়ে গেছেন।"

অসিত বলল, "খালি গয়নার বাক্সেরও অনেক দাম হতে পারে। সেটা কতদিনের পুরনো সেটা দেখতে হবে।"

দীপা জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কী করে বোঝেন কতদিনের পুরনো?"

অসিত বলল, "তা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। সামান্য একটুকরো কাগজও পরীক্ষা করে বলা যায়, কতদিন আগে সেটা তৈরি হয়েছিল।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "মনে করো দীপা, তোমার ওই গয়নার বাক্সটা ছিল বেগম নূরজাহানের, তা হলেই ওটার দাম হয়ে যাবে অনেক লক্ষ টাকা। আমি কলকাতায় একটা বাড়িতে একটা সাধারণ কাচের দোয়াত দেখেছিলাম, সেই দোয়াতটা সম্রাট নেপোলিয়ান ব্যবহার করতেন। সেইজন্যই সেটার অনেক দাম।"

অসিত বলল, "ওই দোয়াতটা কোন বাড়িতে আছে আমি জানি। আমি পাঁচ লক্ষ টাকা দাম দিতে চেয়েছিলাম, তাও তারা বিক্রি করতে রাজি হয়নি।"

চা-পর্ব শেষ হতে সবাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বারান্দাটা দু'দিকেই চলে গেছে অনেকখানি। বিমান বলল, "ডান দিকটায় অনেকখানি ভাঙা। ছাদ খসে পড়েছে। বিশেষ কিছু দেখার নেই। চলুন, বাঁ দিকটা দেখা যাক।"

অসিত বলল, "চলুন, পরে ডান দিকটাও দেখব।"

অন্ধকার হয়ে গেছে বাইরেটা, আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। শুধু কাকাবাবুর ক্রাচের আওয়াজ হতে লাগল খট খট করে। পর পর ঘরগুলোর দরজা বন্ধ। কোনওটাতেই তালা নেই, বিমান দরজা ঠেলে ঠেলে খুলে দেখতে লাগল। তিন-চারখানা ঘরে কিছুই নেই। একটা ঘরে অনেকগুলো ভাঙা চেয়ার-টেবিল উলটোপালটা করে রাখা। একটা ঝাড়লণ্ঠন চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। মনে হয়, ওপর থেকে একদিন খসে পড়েছিল, তারপর আর কেউ সেটাতে হাত দেয়নি।

অসিত জিনিসগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

দীপা খানিকটা অধৈর্যের সঙ্গে বলল, "ওগুলো কালকে ভাল করে দেখবেন। এখন চলুন, তাড়াতাড়ি একবার চক্কর দিয়ে আসা যাক।"

অসিত ঝাড়লণ্ঠনের একটা প্রিজ্‌ম তুলে নিয়ে এসে বলল, "ঠিক আছে, চলুন।"

আর-একটা ঘরে রয়েছে শুধু বালিশ আর তোশক। লাল মখমলের কয়েকটা তাকিয়া বেশ দামি মনে হলেও সেগুলো ছিঁড়ে তুলো বেরিয়ে এসেছে।

দীপা বলল, "এই ঘরটায় কী বিশ্রী বোঁটকা গন্ধ। এখানে কোনও বাঘ-টাঘ লুকিয়ে নেই তো?"

কাকাবাবুর সঙ্গেও টর্চ রয়েছে। তিনি ওপরের দিকে আলো ফেলে বললেন,"ওই দ্যাখো, কত চামচিকে বাসা বেঁধে আছে। চামচিকের এইরকম গন্ধ হয়!"

দীপা বলল, "চলো, চলো, শিগগির এখান থেকে বেরিয়ে চলো !"

আর-একটুখানি যাওয়ার পর বারান্দাটা একদিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে ছাতের দিকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে, একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। পাশে একটা খালি ঘর, তার দরজা খোলা।

সেখানে দাঁড়িয়ে বিমান বলল, "আমার ছোটমামা এখান থেকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন।"

দীপা বলল, "পড়ে গিয়েছিলেন, না ঠেলে মেরে ফেলা হয়েছিল ?"

বিমান বলল, "অনেকে তা-ই বলে। কিন্তু শুধু-শুধু কেউ ঠেলে ফেলবে কেন ?"

দীপা বলল, "তোমার মা-ও তো বলেন, কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল !"

অসিত বারান্দার রেলিংটায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এটা তো বেশ মজবুতই রয়েছে এখনও, এখান দিয়ে শুধু-শুধু কারও পড়ে যাওয়া তো স্বাভাবিক নয় !"

বিমান বলল, "মোট কথা, কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কি না, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি !"

কাকাবাবু বললেন, "বিমান, তোমার ওই ছোটমামা কতদিন আগে মারা গেছেন ?"

বিমান বলল, "প্রায় কুড়ি বছর !"

কাকাবাবু বললেন, "ওঃ অতদিন আগে। তা হলে আর ওই ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই। এখন তো আর ওই রহস্যের সমাধান করা যাবে না !"

অসিত জিজ্ঞেস করল, "ওপরের সিঁড়িটা ছাদে গেছে ? নিশ্চয়ই মস্ত বড় ছাদ।"

বিমান বলল, "ছাদে একখানা ঘর আছে, সেটাই ছিল আমাদের ক্রিশ্চান-দাদুর ঘর। সেটা বছরের পর বছর তালাবন্ধই পড়ে থাকে।"

দীপা বেশ জোরে বলে উঠল, "ওখানে এখন যাওয়া হবে না। না, না, কিছুতেই না। দিনের বেলা দেখবেন।"

অসিত বলল, "ছাদে যেতে তো ভালই লাগবে। বাইরেটাও অনেকখানি দেখা যাবে।"

দীপা আবার সেইরকম ভাবে বলল, "কাল সকালে।"

অসিত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় পাশের খালি ঘরটায় কিসের যেন একটা শব্দ হল।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল চারজনই।

বিমান টর্চ সেদিকে ফিরিয়ে বলল, "কে ?"

আর কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই।

আর এগোতে যেতেই দীপা হাত চেপে ধরে বলল, "এই, তুমি ভেতরে যেয়ো না !"

বিমান বলল, "দাঁড়াও, দেখি ভেতরে কী আছে। তুমি শব্দ শোনোনি ?"

অসিত এগিয়ে গিয়ে টর্চের জোরালো আলো ফেলতেই দেখা গেল, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছায়ামূর্তি। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, খালি গা। আলোয় যেন চকচক করে উঠল তার দু' চোখ।

দীপা "ও মা গো" বলে আর্ত চিৎকার করে উঠল।

অসিত নিজের টর্চটা ফেলে দিয়ে চিৎকার করে বলল, "আপনারা কেউ আলোটা ধরুন তো ! ক্যামেরা ! আমি ক্যামেরা বার করছি।"

কাকাবাবু ততক্ষণে পকেটের রিভলভারে হাত দিয়েছেন, ওটা সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকে। কিন্তু তিনি রিভলভারটা বার করলেন না। সেই মূর্তিটা ছুটে এল ওদের দিকে। বিমান আর দীপাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল সিঁড়ির দিকে। কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করেও পারলেন না।

বিমান আর দীপা দু'জনেই দারুণ ভয় পেয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

অসিত ততক্ষণে ক্যামেরা খুলে বলল, "চলে গেল ? ভূতটা চলে গেল ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "ঘরটার এক কোণে একটা বিছানা পাতা আছে। ভূতেরা বিছানা পেতে শোয়, এমন কখনও শুনিনি।"

সত্যিই এবার দেখা গেল, ঘরের মধ্যে রয়েছে একটা মাদুর, বালিশ, ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। কিছু এঁটো শালপাতা, একটা কলকে।

কাকাবাবু বললেন, "আমরা বোধ হয় কারও ঘুম ভাঙিয়েছি। আমাদের চেয়েও ও বেচারা ভয় পেয়েছে বেশি !"

অসিত বলল, "যাঃ ! প্রথম ভূতটা ফসকে গেল।"

বিমান উঠে দাঁড়িয়ে এবার মেজাজ গরম করে বলল, "এখানে কে থাকবে ? কারও তো থাকার কথা নয় !"

সে গলা চড়িয়ে ডাকল, "রঘুদা ! ভানু !"

দু-তিনবার ডাকতেই ছুটতে-ছুটতে এল অল্প বয়েসী কাজের ছেলেটি।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "ভানু, এখানে কে থাকে ?"

ভানু বলল, "কেউ না তো !"

বিমান প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "কেউ থাকে না তো কার বিছানা পাতা রয়েছে ? ভূতে পেতেছে ?"

ভানু ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বলল, "তা হলে বোধ হয় দিনু পাগলাটা !"

"দিনু পাগলাটা মানে ?"

"এত বড় বাড়ি, সব ঘরে তো নজর রাখা যায় না। খুব বৃষ্টিবাদলা হলে গ্রামের কিছু লোক এ-ঘরে ও-ঘরে এসে শুয়ে থাকে।"

"তার মানে, যার খুশি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে ? রাত্তিরবেলা বাইরের সব দরজা বন্ধ করে রাখতে পারো না ?"

"পেছন দিকের অনেকগুলো দরজাই একেবারে ভাঙা। বন্ধ করব কী করে ? এই সিঁড়িটার নীচের দরজাটা পুরোটাই নেই !"

কাকাবাবু বললেন, "কয়েকদিন পর বাড়িটা পুরোটাই ভেঙে ফেলা হবে। এই ক'টা দিন গ্রামের লোক যদি শুতে যায়, শুয়ে নিক না। ক্ষতি কী ?"

দীপা বলল, "ওমা, যে-সে এসে ঢুকে পড়বে ! দোতলায় উঠে আসবে ? তারপর যদি রাত্তিরবেলা আমাদের গলা টিপে মেরে ফেলে ?"

বিমান বলল, "ভানু, যেমন করে হোক, এই সিঁড়ির মুখটা আটকাও ? একতলায় তো অনেক ভাঙা দরজা-জানলা পড়ে আছে, সেইগুলো দিয়ে যা হোক একটা কিছু করো ! কেউ যেন ওপরে আসতে না পারে।"

॥ ৩ ॥

রাত্তিরে খাওয়ার আগে বারান্দায় কয়েকখানা চেয়ার পেতে নানারকম গল্প হল অনেকক্ষণ। এদিকের কয়েকটা ঘরে ইলেকট্রিকের আলো থাকলেও নিভে গেল একটু বাদেই। গ্রামের দিকে লোডশেডিং হয় শহরের চেয়েও বেশি। এক-এক সময় দু-তিনদিন একটানা কারেন্ট থাকে না।

দীপা বলল, "এই রে, সারারাত অন্ধকারে থাকতে হবে ! পাখাও ঘুরবে না !"

বিমান বলল, "বৃষ্টির জন্য গরম অনেক কমে গেছে। একটা হ্যাজাক বাতি জ্বেলে আনব ?"

অসিত বলল, "এখন থাক। এই তো বেশ লাগবে। পরে খাওয়ার সময় হ্যাজাক দরকার হবে।"

বিমান বলল, "তখন একটা নিরীহ লোককে দেখে আমরা কী ভয় পেয়ে গেলাম ! লজ্জার কথা !"

দীপা বলল, "সব সময় আমাকে দোষ দাও। কিন্তু তুমিই বেশি ভয় পেয়েছিলে !"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, আমরা কেউই তো ভূতে বিশ্বাস করি না। এমনকী, দীপাও মানে যে, ভূত বলে কিছু নেই। মানুষ মরে গেলে আর কোনওরকমেই তার পৃথিবীতে ফিরে আসার উপায় নেই, এ তো আমরা সবাই জানি। তবু ভয় পাই কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা ভূতের ভয় পাই না। আমরা অন্ধকারকে ভয় পাই। এটা বহু যুগের সংস্কারের ব্যাপার।"

দীপা বলল, "শুধু অন্ধকারের জন্যই ভয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "দিনের বেলায় রোদ্দুরের আলোয় তুমি যদি দ্যাখো একটা জীবন্ত কঙ্কাল খটখটিয়ে আসছে, তা দেখে কি তোমার ভয় হবে ? বরং তোমার হাসি পাবে। কারণ, তুমি জানো, কোনও কঙ্কালের পক্ষে হাঁটা সহজ নয়। কেউ নিশ্চয়ই কোনও কায়দা করে তোমাকে ঠকাতে চাইছে। কিংবা ধরো, এখানে একশো পাওয়ারের একটা বাল্‌ব জ্বলছে, তার মধ্যে যদি একটা ঘোমটাপরা পেত্নি এসে পড়ে, তা হলে তুমি কি ভয় পাবে ? তুমি অমনি জিজ্ঞেস করবে, 'অ্যাই, তুই কে রে ? এখানে ন্যাকামি করছিস ?'"

অসিত বলল, "যেসব দেশে লোডশেডিং হয় না, সমস্ত গ্রামেও আলো জ্বলে, সেসব দেশ থেকে ভূত পালিয়ে গেছে চিরকালের জন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "অন্ধকার সম্পর্কে বহু যুগ আগেকার ভয় এখনও আমাদের রক্তের মধ্যে রয়ে গেছে। অন্ধকারে বিপদ আসতে পারে যে-কোনও দিক থেকে। যে-বিপদটাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না। সেটা সম্পর্কে আমাদের যুক্তিও গুলিয়ে যায়।"

অসিত বলল, "আমারও প্রথমটা লোকটাকে দেখে বুকটা কেঁপে উঠেছিল, স্বীকার করতে লজ্জা নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ভাগ্যিস আমি বিছানাটা দেখতে পেয়েছিলাম, তাই লোকটাকে গুলি করিনি !"

অসিত বেশ অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, "গুলি করতেন মানে ? আপনার কাছে কি রিভলভার-টিভলভার আছে নাকি ?"

বিমান বলল, "বাঃ, আপনি রাজা রায়চৌধুরী, মানে কাকাবাবু সম্পর্কে কিছু জানেন না ? ওঁর কত শত্রু। সব সময় একটা অস্ত্র তো সঙ্গে রাখতে হবেই !"

অসিত আবার জিজ্ঞেস করল, "ওঁর এত শত্রু কেন ? উনি কী করেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কথা থাক। বিমান, তুমি যে তখন বললে, ছাদের ঘরে তোমার এক ক্রিশ্চান-দাদু থাকতেন। তিনি সত্যিই ক্রিশ্চান ছিলেন ?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, উনি ছিলেন আমার মায়ের এক কাকা। ঠিক আপন নন, একটু দূর সম্পর্কের। উনি এ-বাড়িতেই থাকতেন। শুনেছি অনেক লেখাপড়া করেছিলেন। এখানে কাছাকাছি ক্রিশ্চান মিশনারিদের একটা চার্চ আছে। সেখানে কিছু দিন যাতায়াত করতে-করতে উনি হঠাৎ দীক্ষা নিয়ে ফেললেন। ওঁর আগে নাম ছিল ধর্মনারায়ণ রাও, দীক্ষা নেওয়ার পর নাম হল গ্রেগরি রাও।"

"তাই নিয়ে খুব গোলমাল হয়েছিল নিশ্চয়ই !"

"তা তো হবেই। আগেকার দিনের ব্যাপার। ধর্ম বদল করার ব্যাপারটা কেউ সহজে মেনে নিতে পারত না। এ-বাড়ির যিনি তখন কর্তা ছিলেন, তিনি এত রেগে গেলেন যে, সেই গ্রেগরি রাওকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে। শুধু তাই নয়, হুকুম দেওয়া হল যে, সে এই জেলাতেই কোথাও থাকতে পারবে না। এ-বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও যেন কেউ না জানতে পারে। গ্রেগরি রাও নিরুদ্দেশে চলে গেলেন।"

দীপা বলল, "তারপর তো অনেক বছর পর তাঁকে বম্বে না কোথায় আবার খুঁজে পাওয়া গেল !"

বিমান বলল, "আমাকে বলতে দাও না ! আমার মামাবাড়ির ব্যাপার আমি তোমার থেকে ভাল জানি। গ্রেগরি রাও নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর অনেকদিন তার কোনও খবর পাওয়া যায়নি, কেউ খবর জানতেও চায়নি !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "উনি বিয়ে-টিয়ে করেননি ?"

"না। কখনও চাকরিবাকরিও করেননি, টাকা রোজগার করতেও শেখেননি। এ-বাড়িতে তাঁর কোনও দরকারও হত না সে-আমলে। তিনি কোথায় চলে গেলেন কে জানে। প্রায় বছরদশেক বাদে আমার মায়ের বাবা, তার মানে আমার দাদু একবার কী কাজে গিয়েছিলেন বম্বেতে। সেখান থেকে বেড়াতে গেলেন গোয়ার পাঞ্জিম শহরে। যে হোটেলে উঠলেন, তার ম্যানেজার বাঙালি। তিনি আমার দাদুকে আগে থেকেই চিনতেন। কথায়-কথায় সেই ম্যানেজার বললেন, 'আপনাদের বংশের একজন মানুষ এখানে খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছেন। তিনি খুব অসুস্থ, বিনা চিকিৎসায়, না খেতে পেয়ে মারা যাবার উপক্রম।'"

"গ্রেগরি রাও গোয়া চলে গিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় তাঁর এত অভিমান হয়েছিল যে, বাংলা থেকে যত দূরে সম্ভব তিনি চলে যেতে চেয়েছিলেন। গোয়াতে অনেক বড়-বড় চার্চ আছে জানেন নিশ্চয়ই। সেইরকম একটা চার্চে আশ্রয় পেয়েছিলেন গ্রেগরি রাও। সেখানে একজন পর্তুগিজ পাদ্রি তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, দু'জনে থাকতেন এক বাড়িতে। তারপর সেই পর্তুগিজ পাদ্রির সঙ্গে চার্চের কী যেন গণ্ডগোল হল, তিনি চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে থাকতে লাগলেন আলাদাভাবে। গ্রেগরি রাও কিন্তু তাঁকে ছাড়লেন না, তিনিও চার্চ ছেড়ে দিয়ে সেই পাদ্রির সঙ্গেই রয়ে গেলেন। আমার দাদু যখন গোয়ায় গেলেন, তখন সেই পাদ্রিও মারা গেছেন, গ্রেগরি রাও একা থাকেন।"

"হোটেলের ম্যানেজারের কাছে এইসব কথা শুনে তোমার দাদু গেলেন গ্রেগরি রাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে ?"

"প্রথমে দাদু রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন, ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ও রাও পরিবারের কেউ না ! কিন্তু আমার দিদিমা ছিলেন খুব দয়ালু। তিনি প্রচুর দান-ধ্যান করতেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'আচ্ছা, একজন লোক অসুস্থ অবস্থায় একা একা পড়ে আছে, তাকে সাহায্য করবে না ? তা কি হয় ? সে মারা গেলে লোকে তো বলবে রাও বংশের একজন মানুষ না খেয়ে মরেছে ! আমাদের বাড়িতে তো কত লোক এমনই থাকে, খায়।' দিদিমার অনুরোধে দাদু গেলেন দেখা করতে। পাঞ্জিম থেকে খানিকটা দূরে, কালাংগুটে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, গ্রেগরি রাওয়ের আস্তানা তখন একজন লোকের বাড়ির আস্তাবলে। সেখানকার লোকে তার গ্রেগরি নামটাও জানে না। সবাই বলে বাঙালিবাবু। আমার দাদু গিয়ে কী দেখলেন জানেন ?"

"কী ?"

"গ্রেগরি রাও তখন বদ্ধ পাগল। তাঁর অন্য কোনও অসুখ নেই। এমনই পাগল যে, মানুষ চিনতেও পারেন না। দাদুকেও চিনতে পারলেন না। পর্তুগিজ ভাষায় কী সব বিড়বিড় করতে

লাগলেন। দাদু ভেবেছিলেন, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করে আসবেন। কিন্তু দিদিমা বললেন,'ওই পাগলাকে টাকা দিয়ে কী হবে ? ওঁর তো টাকা-পয়সা সম্পর্কেও কোনও জ্ঞান নেই। ওঁর হাতে টাকা দিলে দু'দিনেই অন্য লোকরা লুটেপুটে নেবে।' তখন ঠিক হল, সেই পাগলকে সঙ্গে নিয়ে আসা হবে এখানে। কিন্তু পাগলকে আনা কি সহজ ? তাঁর ওই আস্তাবলের ঘরের মধ্যে নানারকমের নুড়িপাথর, ঝিনুক, পুঁতির মালা, ছেঁড়াখোঁড়া বইপত্র ছড়ানো। এইসব হল ওই পাগলের সম্পত্তি। তাঁকে ঘর থেকে বার করা যায় না, ওইসব জিনিস বুকে চেপে ধরে চিৎকার করতে থাকেন। দাদু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। দিদিমার দয়াতেই শেষ পর্যন্ত লোকজন জুটিয়ে ওই ঘরের সমস্ত হাবিজাবি জিনিসপত্রসমেত গ্রেগরি রাওকে নিয়ে আসা হল বীরভূমের এই বাড়িতে। চিকিৎসার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার-কবিরাজরা বললেন, ওঁর ভাল হওয়ার আর কোনও আশা নেই। বাড়িতে একটা পাগল রাখা তো সোজা কথা নয়। সেইজন্য তাঁকে রাখা হল ওই ছাদের ঘরটায়। ওখানেই তিনি আপনমনে থাকতেন। এখানে আসার পর এগারো বছর বেঁচে ছিলেন।"

অসিত জিজ্ঞেস করল, "এইসব ঘটনা আপনি কার কাছে শুনেছেন ! আপনার মা'র কাছে ?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, মা'র কাছে তো অনেকবার শুনেছি। আমার দিদিমার কাছেও শুনেছি। খুব ছোটবেলায় আমি ওই পাগলাদাদুকে দেখেছিও। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দেখলেই দাঁত খিঁচিয়ে মারতে আসতেন। ওঁর ভয়ে আমরা ছাদে যেতাম না। সারা মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, মাথার চুল জট পাকানো, চেহারাটাও হয়ে গিয়েছিল ভয়ঙ্কর। তবে ছাদ থেকে কখনও নীচে নেমে আসতেন না বলে আর কোনও ভয় ছিল না।"

"এগারো বছর ওই ছাদের ঘরে ছিলেন ?"

"তাই তো শুনেছি। একদিনের জন্যও কেউ ওঁকে ঘর থেকে বার করতে পারেনি। ওই ঘরের সঙ্গেই একটা বাথরুম তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল সেইজন্য। বাড়ির একজন কাজের লোক রোজ ওঁর ঘরের সামনে খাবার দিয়ে আসত। সেও ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকত না। একদিন নাকি পাগলাদাদু তার হাত কামড়ে দিয়েছিল !"

দীপা বলল, "তোমার ছোটমামার কথাটা বলো।"

বিমান বলল, "হ্যাঁ। একমাত্র আমার ছোটমামার সঙ্গেই ওই পাগলাদাদুর কিছুটা ভাব ছিল। ছোটমামা ছিলেন অনেকটা আমার দিদিমার মতন। মায়া-দয়া ছিল খুব। প্রথম থেকেই তিনি পাগলাদাদুর সেবা করতেন। সাহস করে ওঁর ঘরে ঢুকে জোর করে কয়েকদিন ওঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছেন। বুঝতেই পারছেন, ঘরখানা অসম্ভব নোংরা হয়ে উঠেছিল দিনের পর দিন। অনেকটা যেন সিংহের খাঁচার মতন। ভয়ে কোনও কাজের লোক ঢোকে না। ছোটমামাই শুধু ঢুকতেন, এবং জমিদারের ছেলে হয়েও তিনি নিজের হাতে সে-ঘরের ময়লা পরিষ্কার করেছেন কয়েকবার। পাগলাদাদু নাকি ছোটমামার মাথায় হাত দিয়ে কী সব যেন বলতেন, তা বোঝা যেত না কিছুই, কিন্তু মনে হত যেন আশীর্বাদ করছেন। কিন্তু পাগলের ব্যাপার তো। হঠাৎ একদিন মেজাজ বদলে গেল। ছোটমামা সেদিন ঘরটা একটু গুছিয়ে দিচ্ছেন,

পাগলাদাদু আচমকা খেপে গিয়ে প্রথমে ছোটমামাকে এক লাথি কষালেন। চিৎকার করে বললেন, 'শয়তান, তুই আমার ঘরে জিনিস চুরি করতে এসেছিস ? সাত রাজার ধন এক মানিক আছে আমার কাছে। দেব না ! কাউকে দেব না !' তারপর হাতের বড় বড় নোখ দিয়ে ছোটমামার গাল চিরে দিলেন। বোধ হয় চোখ দুটোও গেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ছোটমামা কোনওক্রমে পালিয়ে আসে। তারপর থেকে দিদিমা ছোটমামাকে ওপরে যেতে বারণ করে দিয়েছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "বাবাঃ, সাঙ্ঘাতিক পাগল ছিলেন তো !"

বিমান বলল, "অথচ কিন্তু লেখাপড়া জানতেন বেশ। পাগল অবস্থাতেও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করতেন। বাইবেলের শ্লোক বলতেন। কিন্তু লোকজন দেখলেই হিংস্র হয়ে উঠতেন।"

অসিত বলল, "হুঁ। তা হলে মনে হচ্ছে, উনিই আপনার ছোটমামাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ওঁর কাছে কোনও দামি জিনিস আছে সেটা টের পেয়ে আপনার ছোটমামা রাত্তিরবেলা চুরি করতে গিয়েছিলেন। পাগল জেগে উঠে তাঁকে ঠেলে নীচে ফেলে দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক বছর আগেকার ব্যাপার। এখন আর এ-নিয়ে গবেষণা করে কোনও লাভ নেই।"

বিমান একগাল হেসে বলল, "তা ছাড়া ওঁর ঘরে দামি জিনিস কিছু ছিল না। ওটা পাগলের প্রলাপ।"

অসিত বলল, "নানারকম পাথর, ঝিনুক ছিল বলছিলেন। তার মধ্যে কোনও-কোনওটা খুব দামি হতে পারে।"

বিমান বলল, "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না ! সেগুলো সব ওই ঘরের মধ্যেই আছে, কাল সকালে দেখবেন। নদীর ধারে কিংবা সমুদ্রের ধারে যে নানারকম ছোট-ছোট নুড়িপাথর থাকে, অনেকে কুড়িয়ে আনে, ওই পাথরগুলো সেরকম। আর কিছু ঝিনুক। তাও সমুদ্রের ধার থেকে কুড়নো, তার মধ্যে আবার অনেকগুলোই ভাঙা। আর ছিল পুঁতির মালা, অনেকগুলো। নানান রঙের, কিন্তু অতি সাধারণ পুঁতি। ক্রিশ্চানদের রোজারি বলে একরকম জপের মালা থাকে, ওঁর বোধ হয় সেইরকম মালা জমানো শখ ছিল !"

দীপা বলল, "ওইসব পুঁতিটুতির মধ্যে দু-একটা হিরে-মুক্তোও থেকে যেতে পারে।"

বিমান বলল, "সেসব কী আর কম খুঁজে দেখা হয়েছে। জমিদারি চলে যাওয়ার পর যখন এই বংশের রোজগার বন্ধ হয়ে যায়, তখন হ্যাংলার মতন সবাই সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে কোথাও কোনও দামি জিনিস আছে কি না ! বড়মামা চেয়ার-টেবিল বিক্রি করতে শুরু করেছিলেন, তাতেই বুঝতে পারছ, দামি জিনিস আর কিছু বাকি ছিল না।"

অসিত জিজ্ঞেস করল, "আপনার পাগলাদাদুর ঘরের জিনিসপত্রগুলো আপনি নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছেন ?"

"অনেকবার। আমার ছোটভাই একজন স্যাকরা ডেকে এনে পুঁতির মালাগুলো দেখিয়েছে। সেই স্যাকরা বলেছিল, ওইসব মালার দাম দশ টাকাও হবে না। আমাদের আগেও অনেকে দেখেছে। তবে পাগলাদাদু মারা যাওয়ার আগে কেউ ঘরে ঢুকে দেখেনি। উনি মারা যাওয়ার পরেও কয়েক মাস ভয়ে কেউ ও-ঘরে ঢোকেনি।"

"তখনও ভয় ছিল কেন ?"

"ওঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা যে ভয়াবহ। আগেই বলেছি, বাড়ির একজন কাজের লোক রোজ ওঁকে খাবার দিয়ে আসত। সেই লোকটি এক সময় ছুটি নেয় দেশে যাওয়ার জন্য। আর একজনের ওপর ভার দিয়ে যায়। সেই লোকটা পর-পর দু'দিন দেখে যে খাবার বাইরে পড়ে আছে, পাগলাদাদু কিছু খাননি। সে ভেবেছিল, পাগলের খেয়াল। কাউকে বলেনি কিছু। তৃতীয় দিনেও ওইরকম খাবার পড়ে থাকতে দেখে সে কয়েকবার ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়াশব্দ পায়নি। তখন সে জানিয়েছিল বড়মামুকে। বড়মামু পাত্তা দেননি, বলেছিলেন, 'খিদে পেলে ঠিক খাবে।' দিদিমা তখন বেঁচে নেই, ওই পাগলের জন্য বাড়িতে কারও কোনও মায়া-দয়া ছিল না। আরও দু'দিন পর বিশ্রী গন্ধ পেয়ে দরজা ভাঙা হল। পাগলাদাদু অন্তত তিন দিন ধরে ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছেন। শীতকাল ছিল, খুব
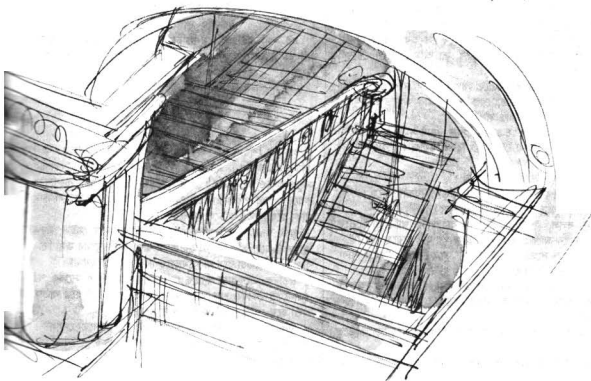
শীত ছিল সেবার, তাই আগে গন্ধ পাওয়া যায়নি। এইরকমভাবে মৃত্যু হলে নানারকম ভয়ের গল্প রটে যায়। কাজের লোকেরা ধরেই নিল পাগলাদাদু অপঘাতে মরে ভূত হয়েছেন। একে ছিলেন হিংস্র পাগল, তার ওপরে ভূত, কেউ আর ওই ঘরের ধারেকাছে যায় ? ঘরটা সেইরকমই পড়ে আছে। এখনও নাকি ছাদে মাঝে-মাঝে শব্দ হয় রাত্তিরে, এরা বলে যে পাগলা-সাহেবের ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

দীপা কান খাড়া করে বলল, "চুপ, চুপ। শোনো, ওপরে কিসের শব্দ হচ্ছে না ?"

সবাই শোনার চেষ্টা করল। বিমান বলল, "ধ্যাত ! কোথায় শব্দ ? এখনও তোমার ভূত-প্রেতের ভয় গেল না ?"

অসিত বলল, "বোধ হয় নীচে কোনও শব্দ হয়েছে, আপনি ভেবেছেন ছাদে। এরকম হয়। আচ্ছা, বিমানবাবু, আপনার ওই পাগলাদাদু যখন মারা যান, তখনও কি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল ?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ ! আপনি ভাবছেন, কেউ তাঁকে মেরে ফেলেছিল ? তা নয় ! দরজা বন্ধই ছিল।"

দীপা বলল, "থাক, আর ওসব কথার দরকার নেই। কতকালের পুরনো ব্যাপার !"

একজন কাজের লোক এই সময় এসে জানাল যে, খাবার তৈরি হয়ে গেছে।

সবাই এবার উঠে গেল খাবার ঘরে। টেবিলের ওপর পাঁচখানা প্লেট পাতা রয়েছে।

কাকাবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, "আমরা তো চারজন। পাঁচজনের ব্যবস্থা কেন ? আর কেউ আসবে ?"

বিমান হেসে বলল, "না, আর কেউ নেই। এটা এ-বাড়ির একটা অনেককালের নিয়ম। খাবার সময় একটা জায়গা সব সময় বেশি রাখা হত। যদি হঠাৎ কোনও অতিথি এসে পড়ে !"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, বেশ ভাল নিয়ম তো।"

দীপা বলল, "আমার কিন্তু ভাল লাগে না। একটা খালি প্লেট দেখলে বারবার মনে হয়, এক্ষুনি বুঝি কেউ আসবে। বারবার দরজার দিকে চোখ চলে যায়।"

বিমান বলল, "আমাদের বাড়িতে কিন্তু এরকম অনেকবার হয়েছে। খেতে বসেছি, এমন সময় কোনও খুড়তুতো কিংবা মাসতুতো ভাই এসে পড়ল। আমরা অমনই বলি, এসো, এসো, খেতে বসে যাও। প্লেট সাজানো দেখে সে অবাক হয়ে যায়। তখন আমরা বলি, তুমি যে আসবে, তা আমরা আগে থেকেই জানতাম !"

দীপা খাবার পরিবেশন করতে লাগল। পদ বেশি নেই। সরু চালের সাদা ধপধপে ভাত, বেগুনভাজা আর আলুভাজা, মুর্গির ঝোল। ঝোলটার চমৎকার স্বাদ।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় কোথায় যেন ধুড়ুম-ধড়াম শব্দ হল। বেশ জোর আওয়াজ। চমকে উঠল সবাই।

বিমান চেঁচিয়ে উঠল, "ভানু, ভানু !"

অল্প বয়েসী কাজের ছেলেটি এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "ও কিসের শব্দ রে ?"

ভানু বলল, "পশ্চিম দিকের বারান্দাটা খানিকটা ভেঙে পড়ল। মাঝে-মাঝেই ভাঙছে। আজ খুব বৃষ্টি হয়েছে তো।"

দীপা সঙ্গে-সঙ্গেই চোখ ওপরে তুলে বলল, "ওরে বাবা, এদিকটাও ভাঙবে না তো ?"

বিমান বলল, "না, না, সে-ভয় নেই। এদিকের অংশটা মজবুত আছে। কয়েক বছর আগে সারানোও হয়েছিল খানিকটা !"

দীপা তবু বলল, "কেন যে সাধ করে এই ভুতুড়ে বাড়িতে আসা !"

ভানু চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবে, তারপর তোমাদের এ-বাড়িতে যারা কাজ করত, তাদের কী হবে ? তারা বেকার হয়ে যাবে ?"

বিমান বলল, "ওদের জন্য ব্যবস্থা করেছি। এখন এখানে কাজ করে পাঁচজন। তাদের মধ্যে দু'জন খুবই বুড়ো হয়ে গেছে, তাদের কিছু টাকা দিয়ে রিটায়ার করিয়ে দেব, তারা নিজেদের দেশের বাড়িতে ফিরে যাবে। আর তিনজন এখানে যে পাইপের কারখানা হবে, তাতে চাকরি পাবে। যিনি এ-জায়গাটা কিনেছেন, তিনি ওদের চাকরি দিতে রাজি হয়েছেন।"

অসিত বলল, "এদিকের বারান্দারও অনেক টালি খসে গেছে। আর কিছুদিনের মধ্যে পুরো বাড়িটাই নিজে-নিজে ভেঙে পড়ত।"

খাওয়ার পর আর বেশিক্ষণ গল্প হল না। যে যার নিজের ঘরে শুতে চলে গেল।

কাকাবাবু পোশাক পালটে পাজামা-পাঞ্জাবি পরলেন। এক্ষুনি তাঁর শুতে ইচ্ছে করছে না। তিনি বাইরের দিকের জানলাটার কাছে দাঁড়ালেন।

বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশ এখনও মেঘলা। বাইরের কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তবু হাওয়া দিচ্ছে বেশ।

যখন একদম একলা থাকেন, তখন কাকাবাবু গুনগুন করে গান করেন। তাঁর এই গানের কথা কেউ জানে না। এ একেবারে তাঁর নিজস্ব অদ্ভুত গান। কোনও বিখ্যাত কবিতায় তিনি নিজে সুর লাগিয়ে দেন।

এখন তিনি সুর দিতে লাগলেন সুকুমার রায়ের একটি কবিতায় :

শুনেছ কী বলে গেল
সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি
আকাশের গায়ে নাকি
টক টক গন্ধ...
(আ-হা-হা-হা- না-না-না-না)
টক টক থাকে নাকো
হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে
তখন দেখেছি চেটে
একেবারে মিষ্টি !

এই গানটাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানারকমভাবে গাইতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে। তারপর আর-একটা গানে সুর দিলেন :

আম আছে, জাম আছে
আর আছে কদবেল
সবসে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল, জাঁদরেল...

গানটান শেষ করার পর কাকাবাবু বিছানায় চলে এলেন। তবু তাঁর ঘুম এল না। নানারকম কথা ভাবতে লাগলেন। একবার সন্তুর কথাও মনে এল। সন্তু কি এখন রাত জেগে পড়াশোনা করছে ? ওর পরীক্ষা মাত্র তিনদিনের। এখানে তার বেশিদিন থাকা হলে সন্তু ঠিক চলে আসবে !

ঘণ্টা দু-এক কেটে গেল, তবু ঘুম আসার নাম নেই। নতুন জায়গায় এলে তাঁর এরকম হয় প্রথম রাত্তিরটা। ঘুমের জন্য তিনি ব্যস্ত নন। একটা রাত না ঘুমোলেও কোনও ক্ষতি হয় না।

চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ। এইসব গ্রাম-দেশে সন্ধের পর এমনিতেই কোনও শব্দ থাকে না। আজ ভাল বৃষ্টি হয়ে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সবাই আরাম করে ঘুমোচ্ছে।

এক সময় ছাদে তিনি অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেলেন। কাকাবাবুর কান খুব তীক্ষ্ণ, সামান্য শব্দও তিনি শুনতে পান। মনে হচ্ছে, ছাদে কেউ হাঁটছে।

কাকাবাবু আর-একটুক্ষণ শুনলেন। কোনও সন্দেহ নেই, কোনও মানুষের পায়ের শব্দ। এ-বাড়ির দরজা-জানলা এতই ভাঙা যে, চোর-টোরের ঢুকে পড়া খুব স্বাভাবিক। কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়িটা একেবারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে, এ-গ্রামের চোরেরা এসে যা পাবে তাই নিয়ে যেতে চাইবে। ভাঙা চেয়ার-টেবিল কিংবা পুরনো লোহাও বিক্রি হয়।

এর পর একটা চাপা ঝনঝন শব্দ হতে লাগল। যেন কোনও লোহার শিকল ধরে টানাটানি করা হচ্ছে। একটু পরেই আবার বদলে গেল শব্দটা। খট খট খট। কেউ যেন কিছু ভাঙার চেষ্টা করছে।

কাকাবাবু খাট থেকে নেমে পড়লেন। তিনি কৌতূহল দমন করতে পারছেন না। ছাদে নানারকম শব্দ হলে তিনি ঘুমোবেন কী করে?

বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা নিয়ে পাঞ্জাবির পকেটে ভরলেন। এক হাতে নিলেন টর্চ। তারপর ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে এগোলেন।

দরজাটা খোলার সময় ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। কাকাবাবু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বেরোলেন বাইরে। লম্বা-টানা বারান্দাটা পুরো অন্ধকার। কাকাবাবু দেওয়ালের একটা সুইচ টিপে দেখলেন, এখনও লোডশেডিং।

কাকাবাবুর পক্ষে নিঃশব্দে চলার কোনও উপায় নেই। ক্রাচের শব্দ হবেই। এত রাত্তিরে যেন বেশি জোর শব্দ হচ্ছে খট-খট করে।

বিমানদের ঘরের দরজা খুলে গেল।

বিমান মুখ বাড়িয়ে বলল, "কে? কে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি।"

"এ কী, কাকাবাবু! কোথায় যাচ্ছেন?"

"একটু ভূত দেখে আসি।"

"অ্যাঁ? কী বললেন?"

"ছাদে একটা শব্দ হচ্ছে। যদি ভূত-টুত হয়, তা হলে একবার দেখে চক্ষু সার্থক করে আসি।"

"না, না, কাকাবাবু, এত রাত্তিরে ছাদে যাবেন না।"

"ঘুম আসছে না। আমার একটু পায়চারি করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"দাঁড়ান, তা হলে আমিও যাব আপনার সঙ্গে। চটিটা পরে আসছি!"

পাশ থেকে দীপা বলল, "আমি একলা এই অন্ধকারের মধ্যে থাকব নাকি? ওরে বাবা রে, না, কিছুতেই না!"

বিমান বলল, "তা হলে তুমিও চলো।"

দীপা বলল, "আমি এখন কিছুতেই ছাদে যেতে পারব না। তোমাদেরও যেতে হবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "বিমান, তুমি থাকো। আমি দেখে আসছি। কোনও চিন্তা নেই।"

বিমান তবু চেষ্টা করল কাকাবাবুকে থামাবার। কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন।

টর্চের আলো ফেলে-ফেলে তিনি দেখছেন। খানিকটা পরে অসিতের ঘর। কাকাবাবু একবার ভাবলেন, অসিত যদি জেগে থাকে, তা হলে তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। দরজাটা ঠেলা দিলেন আলতো করে। সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। শব্দ শুনে অসিত জাগেনি, তার গাঢ় ঘুম।

ছাদে ওঠার সিঁড়িটার কাছে এসে কাকাবাবু থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর ক্রাচের আওয়াজ আর বিমানের কথাবার্তা শুনে চোরের সজাগ হয়ে যাওয়ার কথা। সে যদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাতে চায়, কাকাবাবুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাবে। সে ইচ্ছে করেও কাকাবাবুকে ঠেলে দিতে পারে।

কাকাবাবু এবার রিভলভারটা বার করে তৈরি রাখলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। সামান্য একটা চোর ধরার জন্য এতটা ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না। কিন্তু এই ধরনের উত্তেজনা বোধ করতে কাকাবাবুর ভাল লাগে।

ছাদের দরজাটা একেবারে হাট করে খোলা। যদি দরজার পাশেই কেউ লুকিয়ে থাকে, সেইজন্য কাকাবাবু টর্চ দিয়ে দেখে নিলেন ভাল করে। একটা ক্রাচ বাড়িয়ে দিলেন প্রথমে। কেউ কিছু করল না।

এবার কাকাবাবু ঢুকে পড়লেন ছাদে।

কেউ কোথাও নেই। শব্দটা থেমে গেছে অনেক আগেই। এত বড় ছাদ যে, অন্য দিক দিয়ে পাঁচিল টপকে কারও পক্ষে পালিয়ে যাওয়া খুবই সহজ।

ছাদের ঘর সাধারণত সিঁড়ির পাশেই থাকে। এটা কিন্তু তা নয়। সিঁড়ি থেকে অনেকটা দূরে, মাঝামাঝি জায়গায় বেশ বড় একটা ঘর। এক সময় বেশ যত্ন করে তৈরি করা হয়েছিল। চার-পাঁচখানা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, তারপর দরজা। কাকাবাবু সেদিকে এগিয়ে যেতে-যেতে আন্দাজ করলেন যে, এই ঘরটার প্রায় নীচেই দোতলায় তাঁর ঘর।

এ-ঘরের দরজাটা বেশ শক্তপোক্ত রয়েছে এখনও। আগেকার দিনের কায়দা অনুযায়ী সেই দরজার তলার দিকে একটা শিকল, ওপর দিকে একটা শিকল। দুটো শিকলেই তালা দেওয়া। পেতলের বেশ বড় তালা।

কেউ একজন এই শিকল খোলার ও তালা ভাঙার চেষ্টা করেছিল।

কাকাবাবু টর্চ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সিঁড়ির নীচটা ভাল করে দেখলেন। বৃষ্টিতে ছাদে জল জমেনি বটে, তবে অনেক দিনের পুরু ধুলো ভিজে দইয়ের মতন হয়ে আছে। তার ওপর পায়ের ছাপ।

কাকাবাবু যদি শার্লক হোমসের মতন গোয়েন্দা হতেন, তা হলে সেই পায়ের ছাপ মাপবার চেষ্টা করতেন বসে পড়ে। কিন্তু ওসব তাঁর ধাতে পোষায় না। তিনি শুধু লক্ষ করলেন, আসা ও যাওয়ার দু'রকম ছাপ। যে এসেছিল, সে এসেছিল পা টিপে-টিপে, গোড়ালির ছাপ পড়েনি। আর যাওয়ার সময় গেছে দৌড়ে। একটু দূরে গিয়েই মিলিয়ে গেছে, সেখানটায় শ্যাওলা।

কাকাবাবু মনে-মনে বললেন, বিমানের পাগলাদাদু বেশ ভালই থাকবার জায়গা পেয়েছিল। এই ঘরটাই এ-বাড়ির শ্রেষ্ঠ ঘর বলা যায়। চতুর্দিক খোলা। আজ যদি জ্যোৎস্না থাকত, তা হলে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যেত।

কাকাবাবু নীচে নেমে আসার পরই বিমানের গলা শোনা গেল। সে দরজার কাছেই ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "কী হল কাকাবাবু?"

কাকাবাবু হালকা গলায় বললেন, "ভূত দেখা আমার ভাগ্যে নেই। তোমার পাগলাদাদুকে দেখা গেল না। ওখানে কেউ নেই!"

॥ ৪ ॥

সকালবেলা চায়ের পাট শেষ করার পর বিমান বলল, "চলুন, এবার আপনাদের সারা বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখানো যাক। প্রথমে কোনদিকে যাবেন? নীচের তলা থেকে শুরু করব"

অসিত বলল, "না, না, আগে ছাদের ঘরটা দেখব। ওই ঘরটা সম্পর্কে এমন গল্প বলেছেন যে, কৌতূহলে ছটফট করছি।"

দীপা বলল, "সেই ভাল। আগে ছাদটা ঘুরে আসা যাক।"

বিমান তার ব্যাগ থেকে একটা চাবির তাড়া বার করল। তাতে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটা চাবি।

সর্বজনচিত্তজয়ী

বর্ত্তমান গোলাকার প্যাকের সঙ্গে.

নতুন সুবিধাজনক ছিমছাম্ | চারকোনা | প্যাকে পরিবেশিত হচ্ছে

গন্ধে-বর্ণে-পরিমাণে-দামে কোনো তফাৎ নেই

অরোশিখার আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

অদিতি • মন্ত্র

রোজ • অরোশ্রী

প্রস্তুতকারক
অরোশিখা আগরবাতিজ্
উদাভি • পণ্ডিচেরী-৬০৫০০২

পরিবেশক :
শ্রীসুভাষ পারফ্যুমারী ওয়ার্কস
৩/বি, গাঙ্গুলি লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

Topaz-SPW 2.90

অসিত ভুরু তুলে বলল, "এত চাবি ?"

বিমান বলল, "আগে তো সব ঘরের জন্যই তালা-চাবি লাগত। এখন অবশ্য অনেক চাবিই কাজে লাগে না।"

দীপা বলল,"কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল। ছাদে তো তালা লাগাতে পারোনি !"

বিমান বলল, "ছাদের দরজার একটা পাল্লা যে ভাঙা !"

অসিত বলল, "অ্যাঁ ! কাল চোর এসেছিল ? কখন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তখন রাত প্রায় দুটো।"

অসিত বলল, "আমি কিছু টের পাইনি তো ! একবার ঘুমিয়ে পড়লে আমার আর ঘুম ভাঙে না।"

সবাই মিলে চলে এল ছাদে। আগের দিন অনেকক্ষণ বৃষ্টি হলে পরের দিনের সকালটা বেশি ফরসা দেখায়। ঝকঝক করছে রোদ। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে।

একদিকের ছাদের কার্নিসে একটা বেশ বড়, খয়েরি রঙের ল্যাজ-ঝোলা পাখি বসে আছে চুপটি করে।

দীপা জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী পাখি ?"

কাকাবাবু বললেন, "ইষ্টকুটুম।"

দীপা বলল, "কী সুন্দর পাখিটা ! ইষ্টকুটুমের নামই শুনেছি, দেখিনি কখনও। ওর একটা ছবি তুলে রাখব, ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। দেখবেন যেন পাখিটা উড়ে না যায় !"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "সে-দায়িত্ব কিন্তু আমরা নিতে পারব না।"

দীপা ক্যামেরা আনবার জন্য নীচে ছুটে যেতেই পাখিটা উড়ে চলে গেল !

বিমান বলল, "যাঃ !"

অসিত পাখির দিকে মনোযোগ দেয়নি। সে এগিয়ে গেল ঘরটার দিকে। কাকাবাবু তার পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞেস করলেন,"আপনি যে অ্যান্টিকের ব্যবসা করেন, আপনার কি কলকাতায় কোনও দোকান আছে ?"

অসিত বলল, "না। দোকান-টোকানে বসা আমার পোষায় না। লন্ডনের এক অ্যান্টিক ডিলারের সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ আছে। আমি নানা দেশ ঘুরে-ঘুরে খাঁটি জিনিস জোগাড় করি। সে বিক্রি করে। অস্ট্রেলিয়াতেও একটা দোকানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, ওরা খুব কেনে।"

বিমান চাবির তোড়া থেকে এই পাগলাদাদুর ঘরের তালার চাবি খুঁজছে।

কাকাবাবু বললেন, "এই ঘরটায় এত বড় আর শক্ত পেতলের তালা কেন ? অন্য ঘরে তো দেখিনি !"

বিমান বলল, "কী জানি ! অনেকদিন ধরে এখানে এ-তালাই ছিল, তাই রয়ে গেছে। এ-ঘরটায় দামি জিনিস কিছু না থাকলেও একটা খাট আছে, একটা অনেকগুলি ড্রয়ারওয়ালা টেবিল আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "খাট আছে ? বাঃ, তা হলে আজ রাত্তিরে আমি এ-ঘরেই থাকব।"

বিমান বলল, "না, না, তা হয় নাকি ? ছাদের ওপর আপনি একা-একা থাকবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "এটাই তো এ-বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর ঘর। আমার এখানেই থাকতে ভাল লাগবে। খাট যখন আছে, একটা তোশক আর বালিশ এনে দিলেই চলবে।"

অসিত বলল, "থাকার পক্ষে এই ঘরটা কিন্তু সত্যি আইডিয়াল !"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আমি কিন্তু আগে বুক করেছি।"

অনেকগুলো চাবি লাগিয়ে-লাগিয়ে দেখার পর ঠিক-ঠিক দুটো চাবি খুঁজে পাওয়া গেল। বিমান পেতলের তালা দুটো খুলছে। কাকাবাবু দেখলেন, সিঁড়ির নীচে একটা ইট পড়ে আছে, তালার গায়েও খানিকটা ইটের গুঁড়ো লেগে আছে। কাল যে চোর এসেছিল, সে এই ইট মেরে তালা ভাঙার চেষ্টা করেছিল।

দরজার ওপর আর নীচের শিকল খুলে একটা ধাক্কা মারার পর ভেতর থেকে একটা পচা গন্ধ বেরিয়ে এল।

বিমান একটা ভয়ের শব্দ করে পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

কাকাবাবু হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "তোমার পাগলাদাদু এই ঘরে মরে পচে ছিলেন, তুমি কি ভাবছ, সেই গন্ধ এখনও আছে ? তারপর তো এই ঘরে অনেকে ঢুকেছিল, তুমিই বলেছ !"

অসিতেরও মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

বিমান লজ্জা পেয়ে বলল, "আমি নিজেই তো চার-পাঁচবার ঢুকেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই কোনও ইঁদুর-টিঁদুর মরে আছে।"

অসিত বলল, "জানলাগুলো সব বন্ধ। খুলে দিলে হাওয়া আসবে।"

এই সময় ছাদের দরজার কাছে ভানু নামের কাজের লোকটি এসে ডাকল, "দাদাবাবু !"

বিমান মুখ ফিরিয়ে দেখল, ভানুর সঙ্গে আর-একজন লোক এসেছে। ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কাঁধে ঝোলানো একটি ব্যাগ।

কাকাবাবু ঘরটার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, বিমান তাঁকে ডেকে বলল, "কাকাবাবু, আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। এর নাম ব্রজেন হালদার। আমার ছোটবেলার বন্ধু। এই গ্রামের স্কুলে ইংরেজি পড়ায়। আপনি আসবেন শুনে ও খুব ধরেছিল আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য। আপনার খুব ভক্ত।"

কাকাবাবু সিঁড়ি থেকে নেমে এলেন।

ইংরেজির মাস্টারটি ছুটে এসে কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর গদগদ স্বরে বলল, "আপনিই কাকাবাবু ! সন্তু কোথায় ?"

কাকাবাবু বিব্রতভাবে পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, "সন্তু আসেনি।"

ব্রজেন বলল, "সন্তুকে ছাড়া আপনি কোথাও যান নাকি ? আমার ধারণা ছিল, সন্তু সব সময় আপনার সঙ্গে থাকে।"

বিমান বলল, "সন্তুর এখন পরীক্ষা চলছে, সে আসতে পারেনি।"

ব্রজেন চোখ বড় করে বলল, "সন্তু পরীক্ষাও দেয় ? অন্য ছেলেদের মতন ?"

বিমান বলল, "কেন, সন্তু পরীক্ষা দেবে না কেন ?"

ব্রজেন বলল, "আমার ধারণা ছিল, সন্তু একটা গল্পের চরিত্র, তাকে পরীক্ষা-টরিক্ষা দিতে হয় না। সে সব সময় অ্যাডভেঞ্চার করে বেড়ায়।"

কাকাবাবু ও বিমান দু'জনেই হেসে উঠলেন।

বিমান বলল, "সন্তু গল্পের চরিত্র হবে কেন ? সন্তু আমাদের পাড়ায় থাকে, বাচ্চা বয়েস থেকে তাকে চিনি।"

ব্রজেন কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার এতদিন ধারণা ছিল, কাকাবাবু বলে সত্যিকারের কেউ নেই। লেখকদের বানানো ব্যাপার। বিমান যখন প্রথম বলল, "আপনি এখানে আসবেন, আমি বিশ্বাসই করিনি।"

বিমান বলল, "ছুঁয়ে দেখবি নাকি সত্যি কি না !"

ব্রজেন বলল, "ইস, আমার ছেলেটাকে আনলাম না। আমার ছেলে একেবারে পাগলের মতন আপনার ভক্ত। ও আপনার অটোগ্রাফ নিলে কত খুশি হত ! একটা কথা বলব, সার ? একবার

দয়া করে আমাদের বাড়িতে যাবেন ? সামান্য পাঁচ মিনিটের জন্য ?"

বিমান বলল, "ঠিক আছে, বিকেলের দিকে আমরা একবার বেড়াতে বেরোব। তখন তোমার বাড়িটাও ঘুরে আসব। তোমার বাড়িতে একবার আচারের তেল দিয়ে মাখা মুড়ি খেয়েছিলাম, মনে আছে, দারুণ লেগেছিল। সেইরকম মুড়ি খাওয়াবে ?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! মুড়ির মতন সামান্য জিনিস, তা কি উনি খাবেন ?"

"হ্যাঁ, খাবেন। কাকাবাবু মুড়ি ভালবাসেন। আর কোনও খাবার-টাবার রাখার দরকার নেই কিন্তু।"

কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাল ব্রজেন। কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, যাব।"

ব্রজেন বলল, "আমার বাড়ি খুব কাছে। এখান থেকে দেখা যায়। আসুন, দেখবেন।"

বিমান বলল, "ঠিক আছে। বিকেলবেলা তো যাচ্ছিই !"

ব্রজেন তবু বলল, "কাকাবাবুকে আমার বাড়িটা দেখিয়ে রাখি।"

প্রায় জোর করেই ব্রজেন ওদের নিয়ে গেল পাঁচিলের দিকে। পেছন দিকে পদ্মফুলে ভরা দিঘিটার ডানপাশে অনেক গাছপালা, প্রায় জঙ্গলের মতন। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে ব্রজেন বলল, "ওই যে দেখুন, শিমুলগাছটার ফাঁক দিয়ে..."

বাড়িটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, তবু কাকাবাবু ও বিমান একসঙ্গে বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি।"

ব্রজেন বলল, "আমাদের ওখান থেকে এই বাড়িটাকে মনে হয় একটা পাহাড়ের মতন। দিগন্ত ঢেকে থাকে। এই বাড়িটার জন্যই আমাদের গ্রামের অনেক নাম। কত দূরদূর থেকে লোকে এই বাড়িটা দেখতে আসে। এত বিখ্যাত একটা বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে, ছি ছি, কী লজ্জার কথা বলুন তো ! আমার যদি সেরকম টাকা থাকত, আমি এ-বাড়িটা কিনে নিতাম।"

কাকাবাবু বললেন, "এটা সত্যিই খুব দুঃখের কথা। তবে বাড়িটা তো ভেঙেই পড়ছে ক্রমশ।"

ব্রজেন বলল, "ঐতিহাসিক বাড়ি ! এখানে আলিবর্দি আর সিরাজউদ্দৌল্লা এসে থেকে গেছেন !"

বিমান বলল, "এসব আবার তুমি কোথা থেকে পেলে ?"

ব্রজেন বলল, "নবাব আলিবর্দির আমলের বাড়ি নয় এটা ? বর্গির হাঙ্গামার সময় নবাব আলিবর্দি তাঁর নাতিকে নিয়ে একসময় পালিয়ে এসেছিলেন এদিকে। এ-বাড়িতে রাত কাটিয়েছেন।"

বিমান হেসে বলল, "এসব গালগল্প। কোনও প্রমাণ নেই।"

ব্রজেন জোর দিয়ে বলল, "রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অনেকেই যে এসেছিলেন, তা নিশ্চয়ই জানো !"

বিমান বলল, "তা যাই বলো। এ-বাড়ি মেরামত করার সাধ্য আমার নেই।"

ব্রজেন বেশি কথা বলতে ভালবাসে। সে বাড়িটা সম্পর্কে অনেক কথা বলে যেতে লাগল। কাকাবাবু খানিকটা অস্থির বোধ করলেন।

দীপা ফিরে এসে বলল, "এই ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছ ? খুঁজেই পেলাম না !"

বিমান বলল, "তোমার পাখি কবে উড়ে গেছে। আর ক্যামেরা দিয়ে কী হবে ?"

দীপা বলল, "তবু বলো না ক্যামেরাটা কোথায় ? আমি ছাদে তোমাদের ছবি তুলব।"

এই সময় ঘরটার মধ্যে ঘটাং করে একটা জোর শব্দ হল।

বিমান বলল, "এই যে, ওখানে মেঝের অনেক পাথর আলগা আছে। দীপা, দ্যাখো তো, অসিতবাবুকে একটু বলে দাও।"

দীপা ঢুকে গেল সেই ঘরের মধ্যে।

ব্রজেন প্রসঙ্গ পালটে বলল, "আচ্ছা কাকাবাবু, আপনার 'উল্কা রহস্য'-এর প্রথম দিকে আপনি যে জাটিঙ্গা পাখিদের কথা বলেছিলেন, পরে সেই পাখিদের রহস্য সম্পর্কে তো আর কিছু জানা গেল না। পাখিগুলো আগুন দেখলে ইচ্ছে করে ঝাঁপ দেয় কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "জাটিঙ্গার পাখিদের রহস্যের এখনও কোনও মীমাংসা হয়নি।"

বিমান বলল, "আচ্ছা ব্রজেন, বিকেলে তো তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছিই। তখন এসব কথা আলোচনা হবে। এখন আমাদের কিছু কাজ আছে।"

ব্রজেন বলল, "ছি, ছি, হঠাৎ এসে তোমাদের ডিস্টার্ব করলাম। এই ছাদটা আমার খুব ভাল লাগে। রঘুদাকে বলে মাঝে-মাঝে আমি এখানে এসে বসে থাকি। আচ্ছা, আসি তা হলে এখন। বিকেলে কিন্তু ঠিক আসতে হবে !"

ব্রজেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার পর বিমান বলল, "আমি ছোটবেলায় যখন মামার বাড়ি আসতাম তখন ওর সঙ্গে ভাব হয়েছিল। আমরা একই বয়েসী।"

কাকাবাবু বললেন, "চলো, এবার তোমার পাগলাদাদুর ঘরটা দেখা যাক।"

ঘরটা খুব ছোট নয়। এক সময় বেশ যত্ন করেই তৈরি করা হয়েছিল। মেঝেতে শ্বেত পাথরের টালি বসানো। সেগুলো মাঝে-মাঝে ভেঙে গিয়ে গর্ত হয়ে গেছে এখন। একপাশে একটা বড় খাট পাতা। কয়েকটা ঘুণ-ধরা কাঠের বাক্স। সারা ঘরে ছড়ানো ছেঁড়া পুঁতির মালা, ঝিনুক, ছোট-ছোট শাঁখ, প্রচুর ছেঁড়াখোঁড়া বই, পুরনো খবরের কাগজ, কয়েকটা ম্যাপ।

অসিত ঘরের একটা জানলা খুলে দিয়েছে, তাতেই প্রচুর রোদ এসেছে। পচা গন্ধটা নেই।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "ইঁদুরটা দেখতে পেলেন ?"

দীপা ভয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "ইঁদুর ! ইঁদুর কোথায় ?"

অসিত হেসে বলল, "না, না, ইঁদুর-টিঁদুর দেখতে পাইনি। ওটা আসলে বন্ধ ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ !"

দীপা বিরক্তভাবে বলল, "এই রাজ্যের ঝিনুক-মিনুকগুলো ঘরের মধ্যে জমিয়ে রেখেছ কেন তোমরা এতদিন ? ঝেঁটিয়ে বার করে দেওয়া উচিত ছিল।"

বিমান বলল, "যদি এর মধ্যে কোনওটা দামি হয়, সেইজন্য কেউ ফেলেনি।"

অসিত একটা ঝিনুক তুলে নিয়ে জোর করে টিপে ভেঙে ফেলল। তারপর হাসতে-হাসতে বলল, "এগুলো অতি সাধারণ। কোনও দাম নেই।"

কাকাবাবু একটা ছেঁড়া বই তুলে নিয়ে দেখলেন, সেটা একটা শেকসপিয়রের নাটক।

বিমান বলল, "আপনার কী মনে হয়, অসিতবাবু, এ-ঘরে কোনও দামি জিনিস থাকতে পারে ? বহুবার সার্চ করে দেখা হয়েছে। আমার বড়মামু মেঝে খুঁড়ে-খুঁড়েও দেখেছেন। কেউ কিছু পায়নি।"

অসিত বলল, "দামি জিনিস কিছু থাকলেও অন্য কেউ আগেই নিয়ে নিয়েছে। এখন যা পড়ে আছে, সবই রদ্দি জিনিস। আবর্জনা। মোটামুটি সবই তো দেখলাম।"

দীপা বলল, "মার্বেলের টালিগুলোর কিছু দাম হতে পারত, তাও তো সবই প্রায় ভাঙা।"

বিমান বলল, "কাকাবাবু, আপনি এই ঘরে থাকবেন বলছিলেন ? দেখলেন তো কীরকম নোংরা !"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। একটু ঝাঁট-টাট দিয়ে নিলেই চলবে। চতুর্দিকে জানলা। সবক'টা খুলে দিলে..."

অসিত হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল "ওই বন্ধ জানলাটার কাছে ওটা কী দেখুন তো ? চকচক করছে ?"

সবাই ফিরে তাকাল। সত্যি, যে-জানলাটা খোলা, তার ঠিক উলটো দিকের জানলাটার পাশে কী যেন চকচক করছে হিরের মতন।"

অসিত সেদিকে এগোবার আগেই কাকাবাবু বললেন, "আমি দেখছি।"

ক্রাচ বগলে নিয়ে দু' পা এগোলেন কাকাবাবু। তৃতীয়বার একটা ক্রাচ একটা পাথরের ওপর ফেলতেই সেটা নড়বড় করতে-করতে সম্পূর্ণ উলটে গেল। তার নীচে একটা বড় গর্ত। ক্রাচটা পিছলে ঢুকে গেল সেই গর্তের মধ্যে। কাকাবাবু তাল সামলাতে পারলেন না। তিনি পড়ে গেলেন, দেওয়ালে খুব জোর ঠুকে গেল তাঁর মাথা। গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে তাঁর একটা পা। কিন্তু কাকাবাবু উঠতে পারলেন না, তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

॥ ৫ ॥

জানলা দিয়ে এসে পড়েছে সকালের আলো। কাছেই ডেকে চলেছে একটা চিল। অনেক দূরে কারা যেন কথা বলছে। খুব মিষ্টি এক ঝলক বাতাসের স্পর্শে কাকাবাবু চোখ মেলে তাকালেন।

প্রথমে তিনি বুঝতেই পারলেন না, এটা কোন দিন। তিনি কতক্ষণ শুয়ে আছেন। মাথাটা ভারী মনে হতেই হাত দিয়ে দেখলেন অনেকখানি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তারপর তিনি টের পেলেন তাঁর যে-টা ভাল পা, সেই পা-টাতেও খুব ব্যথা।

ওই পায়ের ব্যথাটার জন্যই কাকাবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। যাঃ, এই পা-টাও ভাঙল নাকি ? তা হলে সারাজীবনের মতন একেবারে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে ?

তিনি ডাকলেন, "বিমান, বিমান !" ঘরে ঢুকল দীপা।

খাটের কাছে এসে বলল, "আপনার ঘুম ভাঙাইনি। চা দেব ? এখন কেমন লাগছে ? খুব ব্যথা আছে ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমার কী হয়েছিল বলো তো ?"

দীপা চোখ বড়-বড় করে বলল, "উঃ, কী কাণ্ড ! যা ভয় পেয়েছিলাম। ছাদের ঘরটায় আপনি পা পিছলে পড়ে গেলেন। পাথরের টালিগুলো সব আলগা হয়ে আছে। একটাতে তো আমিও পড়ে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে !" কাকাবাবু মনে করার চেষ্টা করে বললেন, "হ্যাঁ, আছাড় খেয়েছিলাম। একটা পাথর উলটে গেল !"

দীপা বলল, "আপনার মাথা ফেটে রক্তারক্তি। তখনও বুঝতে পারিনি যে পায়ে কিছু হয়েছে। কিন্তু আপনার একটু জ্ঞান ফিরতেই আপনি পা-টা চেপে ধরে আঃ আঃ করতে লাগলেন। মনে হল যেন পায়েই বেশি যন্ত্রণা হচ্ছে ..."

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "কী হয়েছে আমার পায়ে ? কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার ?"

দীপা বলল, "ভাগ্যিস সেরকম কিছু হয়নি। বিমান ঘাবড়ে গিয়ে পানাগড় চলে গেল। এ-গ্রামে ভাল ডাক্তার নেই। একজন বড় ডাক্তার নিয়ে এল পানাগড় থেকে। তিনি আবার অর্থোপেডিক সার্জেন। খুব ভাল করে দেখে বললেন, পায়ে কিছু হয়নি, শুধু বুড়ো আঙুলের নখ আধখানা উড়ে গেছে। সেইজন্যই অত ব্যথা। তবে, আপনার মাথায় তিনটে স্টিচ করতে হয়েছে, রক্ত বেরিয়েছে অনেকটা।"

কাকাবাবু এবার যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "মাথায় তিনটে সেলাই এমন কিছু নয়। পায়ে তা হলে বড়রকমের কোনও ক্ষতি হয়নি।"

"বাঃ, আর্ধেকটা নখ উড়ে গেছে, তাও কম নাকি ?"

"নখ উড়ে গেলে আবার নখ হবে। এটা কবে হয়েছে? আজ, না কাল, না পরশু?"

"কাল সকালে।"

"তা হলে তারপর কাল সারা দিন আমি কী করলাম?"

"বাঃ, এত বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট হল, তারপরও কি আপনি ঘুরে বেড়াবেন নাকি? আপনার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে ডাক্তার আপনাকে ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়েছিলেন। তার মধ্যেও আপনি জেগে উঠছিলেন মাঝে-মাঝে।"

"সেসব কিছু মনে পড়ছে না। এমন বিচ্ছিরিভাবে আছাড় খেয়ে তোমাদের খুব বিপদে ফেললাম।"

"আমাদের আবার কী বিপদ?"

"বিপদ মানে দুশ্চিন্তা।"

"হ্যাঁ, দুশ্চিন্তা তো হয়েছিল খুবই। কিন্তু ডাক্তারটি খুব ভাল। উনি অনেকক্ষণ ছিলেন। আপনার নাম জানেন আগে থেকে। উনি বলে গেছেন যে, ভয়ের কিছু নেই। উনি আজ আবার আসবেন।"

"বিমান কোথায়?"

"বাড়ি ভাঙার লোকজন সব আসতে শুরু করেছে। এ-বাড়ির নতুন মালিকও এসেছে, বিমান তার সঙ্গে কথা বলছে। লোকটা বলে কী জানেন? বলল, আপনারা এপাশটায় থাকুন, আমরা অন্যপাশটা ভাঙতে শুরু করে দিই। আমি বলে দিয়েছি, তা চলবে না। আমরা চলে গেলে তারপর ওসব শুরু হোকগে। আমি আওয়াজ সহ্য করতে পারব না।"

এতক্ষণে কাকাবাবুর মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটল।

তিনি বললেন, "বাড়ির একদিকে আমরা থাকব, আর-একটা দিক ভাঙা শুরু হয়ে যাবে, এটা সত্যিই অদ্ভুত। আর বুঝি দেরি করতে পারছে না?"

এই সময় বিমান ঘরে ঢুকে বলল, "কাকাবাবু! অল রাইট? ওফ্! আমার এ-বাড়িতে আপনার যদি বড়রকম কোনও ক্ষতি হত, তা হলে সারাজীবন আমার দুঃখের শেষ থাকত না।"

দীপা বলল, "বলেছিলাম না এটা একটা অপয়া বাড়ি। আর ওপরের ওই ঘরটা, ওটা একটা ভুতুড়ে ঘর। ঢুকলেই গা ছমছম করে। ওই ঘরটাই আগে ভেঙে ফেলা উচিত।"

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। তা যে কোনও জায়গায় হতে পারে।"

চা এল। কাকাবাবু চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন।

বিমান বলল, "অসিত আপনার কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারল না।"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "অসিত চলে গেছে?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, আজ ভোরবেলাই চলে গেল। আমাদের গাড়ি পানাগড়ে গিয়ে ওকে ট্রেন ধরিয়ে দেবে। সেই গাড়িতেই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসবে।"

"কেন, এত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন?"

"ও বলল, আর থেকে তো কোনও লাভ নেই। এ-বাড়ির সব কিছুই ওর দেখা হয়ে গেছে। কলকাতায় কাজও আছে কী একটা।"

"ওর পছন্দমতন জিনিসপত্র কিছু পেল? ভাল কোনও অ্যান্টিক?"

"ও বলল, দামি জিনিস কিছু নেই। বড়মামু সবই বেচে দিয়েছে। শুধু কয়েকটা ঘড়ি, বুঝলেন কাকাবাবু, একতলায় গুদামঘরগুলোয় কয়েকটা ভাঙা দেওয়াল ঘড়ি পড়ে ছিল, একেবারেই অকেজো, ভেতরে কলকব্জা নেই। সেইগুলো দেখে অসিত বলল, পুরনো ঘড়ির কিছু দাম আছে বিদেশে। আমি তো ওগুলো একেবারে ফেলেই দেব ঠিক করেছিলাম। আর একটা ক্যামেরা। আগেকার দিনের একরকম প্লেট ক্যামেরা ছিল, তেপায়া স্ট্যান্ডের ওপর দাঁড় করিয়ে, মাথায় কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে ছবি তোলা হত, সেই ছিল একটা। তা-ও ভাঙা, বহুকাল ব্যবহার করা হয়নি। এই ক্যামেরাও তো ফিল্‌ম দিয়ে ছবি তোলা যায় না, কাচের প্লেট লাগত, সে-প্লেটও পাওয়া যায় না। ওটাও ফেলে দেওয়ারই জিনিস ছিল। কিন্তু অসিত বলল, "ওটার জন্য এক হাজার টাকা দাম দেবে। আমি অবাক! আর একটা ড্রেসিং টেবিলের হাতল। টেবিলটা নেই, শুধু কাচের হাতলটা পড়ে ছিল, সেটাও ওর পছন্দ। সব মিলিয়ে তিন হাজার টাকা দাম ধরেছে। যা পাওয়া যায় তাই লাভ!"

"ইস, জিনিসগুলো আমার দেখা হল না। সব নিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। এক জায়গায় প্যাক করে দেওয়া হয়েছে। তবে আপনাকে বলছি কাকাবাবু, একদমই রদ্দি জিনিস। আমাদের দেশে কেউ এক পয়সাও দাম দিত না। হয়তো বাতিকগ্রস্ত সাহেবরা কিনতে পারেন। শুনেছি অস্ট্রেলিয়ানরা এইসব জিনিস বাড়িতে ছড়িয়ে রাখে, যাতে লোকে ভাবে ওদের বয়স অনেক পুরনো।"

"ওপরের ঘরে কিছু পায়নি অসিত?"

"নাঃ! সারা দুপুর ধরে প্রতিটি জিনিস তন্ন-তন্ন করে দেখেছে। প্রতিটি ঝিনুক, পুঁতি, কাচের টুকরো। ওর কাছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছিল, আর একটা কী যেন চোখে লাগাবার যন্ত্র, সব কিছু দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। সব বাজে জিনিস। শুধু বলল, খাটের চারটে পায়ার কিছু দাম আছে। অনেকরকম লতাপাতার কাজ রয়েছে, ওরকম এখন পাওয়া যায় না। তবে, অসিত কাঠের জিনিস ফেলে না। ও বলল, কলকাতায় অ্যান্টিক ডিলাররা ওই চারটে পায়ার জন্য অন্তত দু' হাজার টাকা দিতে পারে।"

দীপা বলল, "যাই বলো, প্লেট ক্যামেরাটার দাম আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল। আমি শুনেছি, পুরনো ক্যামেরার অনেক দাম হয়।"

বিমান বলল, "আরে, ওই ক্যামেরাটা যে ছিল, তাই তো জানতুম না। একতলার একটা ভাঙা ঘরে অনেক আবর্জনার মধ্যে পড়ে ছিল। অসিতই তো খুঁজে বার করল। অসিত না দেখতে পেলে আমি ওটাকে ক্যামেরা বলে চিনতেই পারতুম না। আর সব বাজে জিনিসের সঙ্গে চলে যেত!"

কাকাবাবু বললেন, "অসিতের বাড়ি গেলে ওই ঘড়ি আর ক্যামেরা দেখতে দেবে নিশ্চয়ই?"

বিমান বলল, "তা দেবে না কেন? ও বলে গেল, আগামী পনেরো তারিখে ওর টিকিট কাটা আছে। লন্ডনে যাবে। তার আগে পর্যন্ত কলকাতাতেই থাকবে।"

কাকাবাবুর গায়ের ওপর একটা পাতলা চাদর দেওয়া ছিল। সেটা সরিয়ে ফেলে তিনি খাট থেকে নামবার জন্য পা বাড়ালেন।

দীপা অমনই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "ও কী করছেন? ও কী করছেন? নামবেন না!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "কেন, নামব না কেন?"

দীপা বলল, "এই অবস্থায় আপনি হাঁটাচলা করবেন নাকি? না, না, শুয়ে থাকুন।"

কাকাবাবু বললেন, "সামান্য একটু মাথা ফেটে গেছে আর পায়ের আধখানা নখ ভেঙে গেছে বলে আমি শুয়ে থাকব নাকি? এ তো ভারী আশ্চর্য কথা!"

বিমান বলল, "কাকাবাবুকে তুমি আটকাতে পারবে না। এর চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থায় কাকাবাবু পাহাড়ে পর্যন্ত উঠেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। তারপর ছাদের ঘরে যাব। সে ঘরটা তো আমার দেখাই হয়নি!"

ঠিক আধ ঘণ্টা পরে কাকাবাবু পোশাক বদলে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বগলে ক্রাচ কিন্তু খালি পা।

বিমানকে দেখে বললেন, "ব্যথার জন্য পায়ে জুতো পরতে পারলাম না। আমার রবারের চটিটাতেও সুবিধে হচ্ছে না। তোমাদের একজোড়া চটি দিতে পারো ?"

বিমানের চটি পায়ে গলিয়ে কাকাবাবু উঠে এলেন ছাদে। বিমান তাড়াতাড়ি তালা খুলে দিল। ঘরের একটা জানলা খোলাই ছিল, রাত্তিরে সেখান থেকে বৃষ্টির ছাট এসেছে, মেঝেতে একটু একটু জল জমে আছে।

কাকাবাবু প্রথমেই ভাঙা পাথরটার দিকে তাকালেন।

পাথরটা আর ঠিকমতন লাগানো হয়নি, সেখানে একটা গর্ত। এই ঘরের মেঝেতে কোনও দামি জিনিস পোঁতা আছে কি না তা জানার জন্য গর্ত খুঁড়েও দেখা হয়েছিল। গর্তটার ওপরে পাথরখানা ঠিক মাপমতন বসেনি।

বিমান বলল, "সাবধান, কাকাবাবু, আরও অনেক পাথর আলগা আছে !"

কাকাবাবু বললেন, "এরকম বাজে অ্যাকসিডেন্ট আমার কখনও হয়নি।"

তারপর তিনি ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

দীপা জিজ্ঞেস করল, "এত যে সব বইটই রয়েছে, এগুলোর কোনও দাম নেই।"

বিমান বলল, "এসব ছেঁড়াখোঁড়া বই কে কিনবে ? কিলো দরে পুরনো কাগজওয়ালার কাছে বিক্রি করতে পারো, কিন্তু কলকাতা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে ?"

দীপা একটা বই তুলে নিয়ে বলল, "এই বইটা তো তেমন ছেঁড়েনি। মলাট ঠিক আছে।"

বিমান বলল, "ওখানা তো বাইবেল ! বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। বড়-বড় হোটেলের প্রত্যেক ঘরে একখানা করে বাইবেল থাকে, খুব সুন্দর ছাপা আর বাঁধাই, যে-খুশি নিয়ে যেতে পারে।"

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো পাশে রেখে মেঝেতে বসে পড়লেন। চারদিকে ঝিনুক আর পুঁতির মালা ছড়ানো। আগে তিনি দেখতে লাগলেন বইগুলো। অনেকগুলোই বাইবেল। ইংরিজিতে আর পর্তুগিজ ভাষায়। কিছু ধর্মের বই। কিছু পত্রপত্রিকা। বেশ কয়েকটি নাটক। অনেক বইয়ের পাতা ছেঁড়া। এসব বইয়ের সত্যিই কোনও দাম নেই। কিছু হাতের লেখা কাগজও রয়েছে। সেগুলো কিছুই প্রায় পড়া যায় না। বিমানের খ্রিস্টান-দাদু বোধ হয় পাগল অবস্থায় এসব লিখেছিলেন।

দীপা পুঁতির মালা কয়েকটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছে।

বিমান বলল, "আর কতবার দেখবে ? অনেকবার তো দেখেছ ? ওগুলো খুবই সাধারণ। কোনও দাম নেই।"

কাকাবাবু কয়েকটা ঝিনুক তুলে নিয়ে দেখলেন। খাটের নীচে, ঘরের কোণে কোণে রাশিরাশি ঝিনুক।

দীপা বলল, "পাগলাদাদু ঝিনুক কুড়িয়ে-কুড়িয়ে মুক্তো খুঁজতেন বোধ হয়। দু-একটা মুক্তোটুক্তো আমাদের জন্য রেখে যেতে পারলেন না ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই ঘর থেকে কোনও দামি জিনিস আগে পাওয়া গেছে কি ?"

বিমান বলল, "আমি যতদূর জানি, কিছুই পাওয়া যায়নি।"

কাকাবাবু একটা কালো রঙের চৌকো ছোট বাক্স দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওটার মধ্যে কী ছিল ?"

দীপা ঠোঁট উলটে বলল, "ওটাও তো আমি খালিই দেখেছি। ভেতরে একটা মোহর-টোহরও নেই। একটা প্লাস্টার অব প্যারিসের যিশু-মূর্তি ছিল, তাও ভাঙা।"

কাকাবাবু বাক্সটা খুলে দেখলেন, খুবই পুরনো বাক্স, ভেতরটায় একসময় লাল ভেলভেটের লাইনিং ছিল, এখন তা কুচি-কুচি হয়ে গেছে।

দীপা বলল, "দেখলে মনে হয় গয়নার বাক্স।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরকম এক বাক্সভর্তি গয়না থাকলে তা তো আগে থেকে হাওয়া হয়ে যাবেই। তা ছাড়া গির্জার পাদ্রির সঙ্গে উনি থাকতেন, গয়না পাবেন কোথায় ?"

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা, জানলার কাছে একটা খুব চকচকে জিনিস দেখে এগোতে গিয়ে আমি যে আছাড় খেয়ে পড়লাম, সেটা কী ছিল ?"

বিমান বলল, "সেটাও কিছুই না। একটা প্রিজমের টুকরো। রোদ পড়ে সেটা ঝকঝক করছিল।"

দীপা বলল, "ওই যে কতকগুলো লম্বা-লম্বা ম্যাপ রয়েছে, ওগুলোর কোনওটার মধ্যে কোনও গুপ্তধনের সঙ্কেত নেই তো ? উনি বলতেন, কেন যে ওঁর কাছে সাত রাজার ধন এক মানিক আছে ?"

বিমান বলল, "ওসব পাগলের প্রলাপ। যার কাছে সত্যিকারের দামি জিনিস থাকে, সে কি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলে ? ম্যাপগুলো হাতে আঁকা নয়, সাধারণ ছাপা ম্যাপ। এ-ম্যাপ সব জায়গায় পাওয়া যায়।"

একটা লম্বা করে গোটানো ম্যাপ সে তুলে দিল কাকাবাবুর হাতে। কাকাবাবু দেখলেন, সেটা গোয়া, দমন আর দিউ এই তিন জায়গার ম্যাপ। ওইগুলি ছিল পর্তুগিজ কলোনি। আর-একটা ম্যাপ মহারাষ্ট্রের। একটা দক্ষিণ ভারতের। দুটো একই রকম ম্যাপ পশ্চিম ইউরোপের। কোনও ম্যাপেই কিছু আলাদা দাগটাগ নেই।

কাকাবাবু বললেন, "এর মধ্যে গুপ্তধনের সঙ্কেত থাকলেও তা বোঝার সাধ্য নেই আমাদের।"

বিমান বলল, "ছোটবেলায় আমার পাগলাদাদুর গলায় ঝোলানো একটা সোনার ক্রস দেখতাম। সেটাই বোধ হয় ওঁর একমাত্র দামি জিনিস ছিল। সেটা উনি গলা থেকে কক্ষনো খুলতেন না। মাঝে-মাঝে তিনি সেটায় চুমু খেতেন।"

দীপা বলল, "সেটা কে নিল ?"

বিমান বলল, "কে জানে কে নিয়েছে ! ওঁর মৃত্যুর সময় তো আমি এখানে ছিলাম না !"

কাকাবাবু বললেন, "চলো, এ-ঘরের সব কিছু দেখা হয়ে গেছে। এবার নীচে যাওয়া যাক ! একটা মজার ব্যাপার কী জানো, পরশুদিন রাত্তিরবেলা আমি এই ছাদে একা-একা ঘুরে গেলাম, তখন ভূতের দেখা পেলাম না। অথচ দিনের বেলা এই ঘরের মধ্যে আমাকে ভূতে ঠেলা মারল ?"

দীপা চমকে উঠে বলল, "আপনাকে ভূতে ঠেলা মেরেছে।"

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন, "তবে কি আমি এমনি-এমনি পড়ে গেলাম ?"

দীপা বলল, "না, না, আমি তো আপনার পাশেই ছিলাম। কেউ আপনাকে ঠেলা মারেনি।"

নীচে নেমে আসার পর খবর পাওয়া গেল যে, পানাগড় থেকে ডাক্তারবাবু এসেছেন।

ডাক্তারের নাম শিবেন সেনশর্মা, বয়েস বেশ কম, সুন্দর চেহারা। কাকাবাবুকে দেখে বলল, "এ কী, আপনি হাঁটাচলা শুরু করেছেন ? পায়ের আঙুলে ব্যথা নেই ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। ব্যথা আছে। তবে শুয়ে থাকলে ব্যথার কথাটা বেশি মনে পড়ে।"

ডাক্তার কাকাবাবুর মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতটা পরীক্ষা করল, আবার বেঁধে দিল নতুন ব্যাণ্ডেজ। তারপর পা দেখে একটু চিন্তিতভাবে বলল, "আঙুলটা একটু ফুলেছে কেন ? আর-একটা ইঞ্জেকশান দিতে হবে। আপনার কিন্তু এইরকম পা নিয়ে এখন হাঁটাচলা করা উচিত নয়। একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার।"

দীপা বিমানকে বলল, "চলো, কাল আমরা কলকাতায় ফিরে

যাই। আর এখানে থেকে কী হবে?"

বিমান বলল, "চলো, আমার আপত্তি নেই। নতুন মালিক বাড়িটা ভাঙার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে..."

ডাক্তার হাত ধুতে-ধুতে বলল, "এই বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে...আচ্ছা, আপনাদের পরিবারে একটা চুনির মালা ছিল, যেটা নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা উপহার দিয়েছিলেন আপনাদের এক পূর্ব পুরুষকে, সেটা একবার দেখতে পারি?"

বিমান ভুরু তুলে বলল, "নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার দেওয়া চুনির মালা? আমি কখনও শুনিনি তো সে মালার কথা!"

ডাক্তার বলল, "সে কী! আমি আমাদের বাড়িতে গল্প শুনেছি। আপনাদের বাড়িতে একজন ক্রিশ্চান হয়েছিলেন, তিনি সেই মালাটা চুরি করে পালিয়েছিলেন। তারপর গোয়াতে গিয়ে সেটা বিক্রি করতে যেতেই ধরা পড়ে যান। তাই না?"

বিমান হেসে বলল, "ওসব গল্পই। ক্রিশ্চান-দাদু কিছু চুরি করেননি। গোয়াতে গিয়ে ধরাও পড়েননি।"

ডাক্তার বলল, "তিনি তো পাগল হয়ে গিয়েছিলেন? এ বাড়িতে এসে আবার কী করে সেই মালাটা হাতিয়ে লুকিয়ে ফেলেন।"

দীপা বলল, "সেটাই তবে সাত রাজার ধন এক মানিক। নবাব সিরাজের দেওয়া চুনির মালা!

বিমান বলল, "ধ্যাত! আমি কোনওদিন সেরকম মালার কথা শুনিনি। আমার মা'র কাছেও শুনিনি।"

ডাক্তার বলল, "আমাদের এদিকে কিন্তু অনেকেই শুনেছে। 'কান্না আর রক্ত' নামে একটা যাত্রা হয়, সেটাতেও আপনাদের এ-বাড়ির চুনির মালার কথা আছে। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা মালাটা আপনাদের এক পূর্বপুরুষের বিয়েতে উপহার দিয়েছিলেন। সিরাজকে যেদিন মেরে ফেলা হয় মুর্শিদাবাদে, সেদিন আপনাদের এই বাড়িতে মালাটা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছিল!"

কাকাবাবুর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।

বিমান বলল, "গাঁজাখুরি গল্প আর কাকে বলে!"

ডাক্তার বলল, "কান্না-টান্নার ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই বানানো। কিন্তু এরকম একটা ঐতিহাসিক মালা আপনাদের এখানে বোধ হয় সত্যিই ছিল। সেটার খোঁজ পাননি? আপনার পাগলাদাদু তো ছাদের ওপরে একটা ঘরে থাকতেন। সেই ঘরটা খুঁজে দেখেছেন ভাল করে?"

বিমান কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আর কি খুঁজতে কিছু বাকি আছে? আমার আগে আরও কতজন ও ঘরের সব কিছু ওলটপালট করে দেখেছে!"

দীপা বলল, "তবু, মনে করো, ওই ঘরে যদি অত দামি জিনিসটা থেকে যায়? আমরা চলে যাব...নতুন মালিক এসে বাড়ি ভাঙার সময় যদি পেয়ে যায় সেটা? তা হলে কি আর আমাদের দেবে?"

বিমান এবার খানিকটা বিরক্তভাবে বলে উঠল, "বলছি ওরকম কিছু দামি জিনিস এখানে নেই। কোনও এক সময় থাকলেও বড় মামু সব বিক্রি করে দিয়ে গেছেন। ঠিক আছে, সন্দেহ মেটাবার জন্য ছাদের ঘরটা আজ আমি নিজেই ভাঙব। লোক ডাকিয়ে দেওয়াল ভেঙে,মেঝের পাথর সরিয়ে দেখা হবে! তারপর নিশ্চিন্ত হবে তো!"

॥ ৬ ॥

পরদিন কলকাতায় ফেরার পথে কাকাবাবুর একটু-একটু জ্বর হল।

বিমান আর দীপা বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। মাথায় আর পায়ে চোট লাগার পর প্রথম দু'দিন জ্বর আসেনি, এখন হঠাৎ জ্বর হল কেন? সেপটিক-টেপটিক হয়নি তো!

কাকাবাবু বললেন,"না, না, চিন্তার কিছু নেই। ছাদের ঘরটা যখন ভাঙা হচ্ছিল, তখন প্রচুর ধুলো উড়ছিল তো। ধুলোতে আমার অ্যালার্জি আছে, তার জন্যই জ্বর হয়েছে। কমে যাবে একদিন বাদেই।"

বিমান বলল, "দেখলেন তো, শুধু-শুধু ছাদের ঘরটা ভাঙাতে হল আমাকে। আমার পয়সা খরচ হল, পাওয়া গেল কিছু?"

দীপা বলল, "মারবেল-টালিগুলো তো পাওয়া গেল কয়েকটা। ওরও কিছু দাম আছে। আগেকার দিনের ইটালিয়ান মারবেল, এখন অনেক দাম।"

বিমান বলল,"যাই হোক, এবার এসে মোটামুটি লাভই হল। বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার পরেও পুরনো চেয়ার-টেবিল, কিছু পাথর, কিছু ভাঙা জিনিসপত্র মিলিয়ে আরও প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকা পাওয়া যাবে। অসিত ধর যে ভাঙা ক্যামেরা আর ঘড়িগুলো কিনল, সেগুলোর জন্য আমি তো একটা পয়সাও পাব ভাবিনি!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, অসিত ধর কি নবাব সিরাজের দেওয়া চুনির মালার গল্পটা শুনেছিল?"

বিমান বলল, "ও-গল্প আমিই তো আগে শুনিনি। বাড়িতে গিয়েই মাকে জিজ্ঞেস করব।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "যাত্রার গল্পটা বেশ বানিয়েছে। মুর্শিদাবাদে খুন করা হল নবাব সিরাজকে, আর বীরভূমে তোমাদের বাড়িতে তাঁর দুঃখে মালা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।"

দীপা বলল, "রক্ত আর কান্না! এই যাত্রাটা কলকাতায় এলে আমি দেখব।"

গাড়িতে বাকি রাস্তা আর বিশেষ কিছু কথা হল না। কাকাবাবু জ্বরের ঘোরে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাড়ির সামনে পৌঁছবার পরও কাকাবাবুর ঘুম ভাঙেনি। বিমান একটু ঠেলা দিয়ে বলল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু, এসে গেছি!"

কাকাবাবু জেগে উঠে বললেন, "ওহ্! খুব ঘুমিয়েছি তো! তাতেই জ্বরটা কমে গেছে মনে হচ্ছে।"

দীপা বলল, "শরীর দুর্বল লাগছে? আপনি ওপরে উঠতে পারবেন, না বিমান আপনাকে তুলে দিয়ে আসবে?"

কাকাবাবু বললেন, "শরীর ঠিক আছে।"

ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন, তারপর বললেন, "যাওয়ার সময় অসিত আমাদের সঙ্গে ছিল। ফেরার সময়েও সে সঙ্গে থাকলে ভাল লাগত। সে যে হঠাৎ আগেই ফিরে এল, এটা তোমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়নি, বিমান?"

বিমান বলল, "না, না। সত্যি তার একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। বিদেশ থেকে কেউ আসবে। আপনার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেনি বলে বারবার ক্ষমা চেয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, এতে আর ক্ষমা চাইবার কী আছে। ঠিক আছে, নবাব সিরাজের চুনির হারটা সম্পর্কে তোমার মা কী বলেন, আমাকে জানিয়ো!"

বিকেল চারটে, সন্তু এখনও ফেরেনি। কাকাবাবু ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর আর ঘুম এল না, শুয়ে-শুয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করতে লাগলেন।

সন্ধের একটু আগেই সন্তু বাড়ি এল। কাকাবাবু ফিরে এসেছেন শুনেই সে ছুটে এল কাকাবাবুর ঘরে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছেন কাকাবাবু।

সন্তু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে কী হল, কাকাবাবু? পুরনো বাড়ি, কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেল?"

কাকাবাবু এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর পরীক্ষা কেমন হচ্ছে রে?"

"বেশ ভালই। সোজা-সোজা কোশ্চেন এসেছে।"

"আর ক'টা পরীক্ষা বাকি আছে ?"

"আর মোটে একটা। কালকেই শেষ !"

"ঠিক আছে, এখন পড়াশোনা কর। কাল পরীক্ষা হয়ে গেলে ওখানকার গল্প বলব।"

"একটুখানি বলো না। ওখানে মারামারি হয়েছিল ?"

"এখন তোর মাথায় ওসব ঢোকাতে হবে না। মন দিয়ে পড়ে পরীক্ষাটা শেষ কর। তারপর তোকে কয়েকটা কাজ করতে হবে।"

সন্তু চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু পুলিশ কমিশনার আর হোম সেক্রেটারিকে দুটো ফোন করলেন।

তারপরেই বিমানের ফোন এল।

"আপনার শরীর কেমন আছে, কাকাবাবু ? জ্বরটর বাড়েনি তো ?"

"না না, এখন একদম ভাল হয়ে গেছি। কোনও চিন্তা কোরো না।"

"সেই রক্তঝরা চুনির মালাটার কথা মাকে জিজ্ঞেস করলুম। মা আমাকে আগে বলেননি, এখন মা'র মনে পড়ল। ছোটবেলায় মা ওইরকম একটা মালার কথা শুনেছিলেন। তবে, মা নিজেও সেটা কখনও দেখেননি।"

"তা হলে নবাবের মালা তোমাদের বাড়িতে সত্যিই ছিল ?"

"সত্যিও হতে পারে, গল্পও হতে পারে। মা ও-বাড়ির মেয়ে, মা পর্যন্ত নিজের চোখে দেখেননি। সেরকম মালা থাকলেও পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেই সেটা বিক্রি হয়ে গেছে।"

"ওইরকম একটা ঐতিহাসিক মালা কে কিনল ? ওইসব জিনিস আমাদের মিউজিয়ামে থাকা উচিত।"

"আমার কিন্তু এখনও ধারণা, ওটা গুজব।"

ফোন রেখে দিয়ে কাকাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। কিছু একটা ধাঁধার যেন উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। রাত্তিরে তাঁর ভাল করে ঘুম হল না।

সকালে চা-টা খেয়েই তিনি বেরিয়ে পড়লেন ট্যাক্সি নিয়ে। এলগিন রোডে অসিত ধরের বাড়ির কাছে এসে থামলেন।

ট্যাক্সি ছেড়ে তিনি প্রথমে রাস্তা থেকে দেখলেন বাড়িটা। একটু পুরনো ধরনের তিনতলা বাড়ি। একতলায় সামনের দিকে কয়েকটা দোকান। দরজার পাশে তিন-চারটে নেমপ্লেট। অসিত ধর থাকেন তিনতলায়।

সামনের গেটটা খোলা। কাকাবাবু সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে এলেন। দোতলায় তিনখানা ফ্ল্যাট, তিনতলায় মোটে একটা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা ছোট বারান্দা, পাশের একটা জানলা দিয়ে দেখা যায় যে বাড়িটার পেছনে একটা ছোট্ট বাগান রয়েছে।

দরজার বেলে আঙুল রাখলেন কাকাবাবু।

অসিত ধর নিজেই দরজা খুলল। কাকাবাবুকে দেখে সে একটুও অবাক হয়নি। হাসিমুখে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আসুন, আসুন ? কেমন আছেন এখন ? মাথার চোটটা..."

কাকাবাবু মাথার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলেছেন কলকাতায় ফেরার আগেই। পায়ের আঙুলে সেলোটেপ জড়ানো, জুতো পরতে গেলে ব্যথা লাগে বলে আজও চটি পরে এসেছেন।

কাকাবাবু বললেন, "কোনও খবর না দিয়ে এসে পড়লাম।"

অসিত বলল, "তাতে কী হয়েছে ? আমি মোটেই ব্যস্ত ছিলাম না। আসুন, ভেতরে অসুন।"

বসবার ঘরটি জিনিসপত্রে ঠাসা। কোনওরকমে মাঝখানে একটা সোফা-সেট রাখা হয়েছে, আর সব দেওয়ালের ধারে-ধারে অনেকরকমের মূর্তি, পাথরের, ব্রোঞ্জের, পেতলের। মাটির ওপর জড়ো করে রাখা আছে প্রচুর স্ট্যাম্পের অ্যালবাম, বই, ছবি। কোনও কিছুই নতুন নয়, সবই পুরনো।

সাদা প্যান্ট আর নীল রঙের একটা টি-শার্ট পরে আছে অসিত,

তার চেহারা সুন্দর, যে-কোনও পোশাকে তাকে মানায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নেবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি অনেককাল ধূমপান ছেড়ে দিয়েছি।"

অসিত বলল, "তা হলে কী খাবেন ? চা, কফি ? আমার কাজের লোকটি বাইরে গেছে, আমি নিজেই অবশ্য বানিয়ে দিতে পারি। আমি এখানে একাই থাকি, বছরে ছ' মাসের বেশি তো বিদেশেই কাটাতে হয়।"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না, বসুন। আমি কিছু খাব না।"

"আপনারা কালকেই ফিরেছেন, খবর পেয়েছি। বিমান ফোন করেছিল। ওদের বাড়ি থেকে আমি যে ভাঙা ক্যামেরা আর ঘড়ি এনেছি, সেগুলো আপনি দেখতে চান ?"

"না।"

"দেখতে চান না ? বিমান বলছিল...আপনার সম্পর্কে আমি আগে বিশেষ কিছু জানতাম না। ওখানে গিয়ে বিমানের মুখেই শুনেছি, আপনি প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার করেছেন, অনেক মিস্ট্রি সল্‌ভ করেছেন।"

কাকাবাবু কড়া চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন অসিতের দিকে। এ পর্যন্ত তিনি অসিতের সঙ্গে আপনি বলে কথা বলছিলেন, এবার তিনি তুমিতে নেমে এলেন।

ধমকের সুরে বললেন, "তুমি এটা শোনোনি যে, আমার গায়ে কেউ হাত তুললে আমি তাকে ক্ষমা করি না ?"

অসিত যেন বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল। আস্তে-আস্তে বলল, "তার মানে ?"

"আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, কেউ যদি আমার দিকে রিভলভার তোলে, কিংবা কেউ যদি আমাকে শারীরিকভাবে আঘাত করে, তবে তাকে আমি শাস্তি দিতে ছাড়ি না।"

"আমি আপনার দিকে রিভলভারও তুলিনি, আপনার গায়ে হাতও ছোঁয়াইনি। তা হলে হঠাৎ এসব কথা আমাকে বলছেন কেন ?"

"তুমি ফাঁদ পেতে আমাকে আঘাত দিয়েছ !"

"তার মানে ?"

"তার মানে তুমি ভালই জানো। ছাদের ঘরটার মেঝেতে কয়েক জায়গায় গর্ত খোঁড়া ছিল। সেইরকম একটা গর্তের মুখে তুমি আলগা করে একটা পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলে। তুমি জানতে, সেখানে আমার ক্রাচটা পড়লেই উলটে যাবে। আমি যাতে সেদিকে তাড়াহুড়ো করে যাই, সেইজন্য তুমি জানলার ধারে একটা প্রিজমের টুকরো রেখেছিলে। রোদ পড়ে সেটা ঝকমক করছিল।"

"আমি এতসব করতে যাব কেন ? আপনাকে আঘাত দিয়ে লাভ কী ?"

"এর একটাই মাত্র কারণ হতে পারে। তিনতলার ঘরটা তুমি আসার আগে নিজে ভাল করে সার্চ করতে চেয়েছিলে। আগের রাত্তিরে তুমি ছাদে উঠে তালাটা ভাঙার চেষ্টা করেছিলে। পারোনি। পরের দিন সকালে তোমার একটা সুবিধা হয়ে গেল। একজন ইংরেজির মাস্টার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে অনেকটা সময় নিয়ে নিল। তুমি আমার আগে ঘরে ঢুকে গেলে। তুমি অ্যান্টিকের ব্যবসা করো, নিশ্চয় কোনও দামি জিনিস তোমার নজরে পড়ে গিয়েছিল। আমি যাতে সেটা দেখতে না পাই, সেইজন্যই তুমি আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে !"

"আমি যদি বলি, এ-সবই আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা ? আপনি যা বললেন, এক বিন্দুও প্রমাণ করতে পারবেন ? আপনার মাথায় চোট লেগেছিল, তারপর দেখছি, এখনও আপনার মাথা ঠিক হয়নি। আপনি ভাল করে ডাক্তার দেখান !"

"অসিত ধর, কথা ঘোরাবার চেষ্টা কোরো না! রাজা রায়চৌধুরীর চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না !"

অসিত এবার হা-হা করে হেসে উঠল। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবেন, তাই না ? ঠিক আছে, আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। আপনি যা বললেন, তা সবই সত্যি। তবে, এসব প্রমাণ করতে হলে আপনাকে জানাতে হবে, ওই ছাদের ঘর থেকে আমি কী নিয়েছি ! হ্যাঁ, সত্যিই আমি একটা মহা মূল্যবান জিনিস পেয়েছি ওই ছাদের ঘর থেকে। বছরের পর বছর জিনিসটা ওই ঘরে রয়েছে, এর আগে যারা খুঁজেছে, কেউ সেটা চিনতে পারেনি। সেটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার। সুতরাং সেটা আমিই নেব, এটা তো স্বাভাবিক। সেটা কী, আপনি হাজার চেষ্টা করলেও বুঝতে পারবেন না !"

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন, "সেটা দেখলে আমিও হয়তো চিনতে পারতাম।"

অসিত বলল, "সে চান্স আমি দেব কেন ? আপনি আর আমি দু'জনেই বাইরের লোক। বিমানরা তো এত বছর ধরে খোঁজাখুঁজি করেও সেটা পায়নি !"

কাকাবাবু আদেশের সুরে বললেন, "সে-জিনিসটা আমি একবার দেখতে চাই।"

অসিত তা গ্রাহ্য না করে বলল, "বা-বা-বা-বা ! আপনি চাইলেই সেটা আমি দেখাব ? আপনাকে তো আমি চ্যালেঞ্জ জানালাম। অন্য কারও কাছে আমি স্বীকারই করব না যে, কিছু নিয়েছি। বিমান আপনার কাছে কোনও অভিযোগ করেছে ? পুরনো ঘড়ি, ক্যামেরাগুলো আমি দাম দিয়ে কিনে নিয়েছি। সে জানে, আমি আর কিছু আনিনি।"

"তোমার জন্য আমার মাথা ফেটেছে। পায়ের নখ আধখানা উড়ে গেছে।"

"জানলার ধারে একটা ঝকঝকে কাচ দেখে আপনি লোভীর মতন সেটা ধরতে গেলেন কেন ? আপনি অত তাড়াহুড়ো না করলে পড়ে যেতেন না ! সুতরাং ওটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।"

"আমি অজ্ঞান হয়ে যেতেই অন্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সেই ফাঁকে তুমি জিনিসটা সরিয়ে ফেললে ?"

"কী সরালাম ?"

কাকাবাবু আবার চুপ করে যেতেই অসিত হা-হা করে অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল।

এই সময় ফ্ল্যাটে একজন বেশ তাগড়া চেহারার লোক ঢুকল। লোকটি যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। নাকের নীচে মস্ত বড় গোঁফ।

অসিত বলল, "কিষন, এসেছিস ? দু' কাপ কফি বানা বেশ ভাল করে।"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "কিষনের হাতের কফি খেয়ে দেখুন, খুব ভাল করে। আমি যখন বিদেশে থাকি, তখন কিষনই আমার ফ্ল্যাটটা পাহারা দেয়। খুব বিশ্বাসী লোক।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নাঃ, আমি কফি খাব না !"

অসিত মিটিমিটি দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বলল, "আপনি কী ভাবছেন, বলে দেব ? পুলিশ দিয়ে আমার ফ্ল্যাটটা সার্চ করাবেন, তাই তো ? পুলিশের বড়কর্তাদের সঙ্গে আপনার চেনা আছে। কিন্তু পুলিশের বাপের সাধ্য নেই বিনা অভিযোগে কারও বাড়ি সার্চ করার। ঠিক আছে, ধরে নিলাম, আপনার কথা শুনে পুলিশ কোনও মিথ্যে অভিযোগ এনে আমার বাড়ি সার্চ করল। তা হলেও সেই জিনিসটা চিনতে পারার মতন বুদ্ধি পুলিশেরও নেই !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার মনের কথা বোঝা এত সহজ ? আমি জানি, এমনি-এমনি তোমার বাড়ি সার্চ করানো যাবে না। কিন্তু আমি আর-একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি। সেই দামি জিনিসটা

তুমি এদেশে রাখবে না, বিদেশে নিয়ে বিক্রি করবার চেষ্টা করবে। তুমি এদেশ ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে এয়ারপোর্টে যাতে তোমাকে তন্ন-তন্ন করে সার্চ করানো যায়, সে ব্যবস্থা করব। পুরনো আমলের দামি জিনিস বিদেশে নিয়ে যাওয়া বেআইনি, তা জানো নিশ্চয়ই ?"

অসিত ঠোঁট উলটে বলল, "আই ডোন্ট কেয়ার ! আমি প্লেনের টিকিট বুক করে রেখেছি। যেদিন যাওয়ার কথা, সেদিন ঠিক চলে যাব, কেউ আমায় আটকাতে পারবে না !"

তিনতলা থেকে নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলেন কাকাবাবু। বুকটা খালি-খালি লাগছে। অসিতের কাছে যেন তিনি হেরে গেলেন। ওকে তিনি যতটা চালাক ভেবেছিলেন, ও তার চেয়েও অনেক বেশি ধুরন্ধর। নিজেই চট করে স্বীকার করল যে, একটা খুব দামি জিনিস পেয়ে গেছে। কাকাবাবু ভেবেছিলেন, অনেক চাপ দিয়ে কথাটা আদায় করতে হবে। তার বদলে ও হাসতে-হাসতে চ্যালেঞ্জ জানাল !

জিনিসটা কী হতে পারে ?

নবাব সিরাজের দেওয়া সেই চুনির মালা ? ছাদের ঘরে একটা পুরনো গয়নার বাক্স ছিল ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে মালাটা থাকলে আগে আর কেউ নিশ্চয়ই দেখতে পেত ! চুনি পাথর উজ্জ্বল লাল রঙের হয়। সাধারণ পুঁতির মালার সঙ্গে তার অনেক তফাত ! বিমানের মামারা অনেককালের জমিদার বংশ, হিরে-মুক্তো-চুনি-পান্না চিনতে ওদের কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অনেকেই ওই ঘরটা খুঁজেছে, সেরকম দামি জিনিস কেউ-না-কেউ দেখতে পেতই !

ছোট কোনও মূর্তি ? তিন-চারশো বছরের পুরনো কোনও মূর্তি হলে তার দামও অনেক হতে পারে। ও ঘরে দু-একটা ভাঙা মূর্তি ছিল যিশু খ্রিস্টের, সেগুলো মোটেই দামি নয়। খাটের তলায় আর কোনও মূর্তি পড়ে ছিল ?

জিনিসটা যাই-ই হোক, সেটা উদ্ধার করা যাবে কী করে ? বিমানরা কোনও অভিযোগ করেনি। জিনিসটা কী তা না জানলে অভিযোগ করবেই বা কী করে ? অসিত ফাঁদ পেতে তাঁর মাথা ফাটিয়েছে, সেটাও তো প্রমাণ করা অসম্ভব। ছাদের ঘরটা একেবারে ভেঙে ফেলা হয়েছে। গর্তের ওপর পাথর চাপা দিয়ে রাখার ব্যাপারটাও এখন কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে, কাকাবাবুরই সাবধানে পা ফেলা উচিত ছিল।

ভাবতে-ভাবতে কাকাবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তিনি মনে-মনে বললেন, তবু অসিত ধরকে শাস্তি পেতেই হবে।

একটা ট্যাক্সি পেয়ে তখনই বাড়ি না ফিরে কাকাবাবু চলে এলেন লালবাজারে। পুলিশ কমিশনার তাঁর বন্ধুস্থানীয়, দু'জনেই এক বয়েসী।

কমিশনার-সাহেবের ঘরে ভিড় ছিল, কাকাবাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভিড় ফাঁকা হলে কাকাবাবু বললেন, "এক কাপ কফি দিতে বলো,তোমাকে মন দিয়ে কিছু কথা শুনতে হবে।"

সব শোনার পর কমিশনার-সাহেব বললেন, "রাজা, আমি যে এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। কী জিনিস চুরি করেছে, তা বুঝতে না পারলে একটা লোককে চোর বলি কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে নিজের মুখে আমার কাছে স্বীকার করেছে।"

কমিশনার বললেন, "হয়তো, সেটাও মিথ্যে কথা। তোমার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করতে চাইছে। বাড়ির মালিকই বলেছে, ও-ঘরে দামি জিনিস কিছু ছিল না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও কিছু একটা পেয়েছে। ঘরে ঢুকেই ওর অভিজ্ঞ চোখে সেটা নজরে পড়েছে। তাই ও আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল !" কমিশনার-সাহেব বললেন, "খুব ছোট জিনিস, মনে করো,একটা স্ট্যাম্প, তাও খুব দামি হতে পারে। কিংবা খুব ছোট একটা মূর্তি। কিন্তু ডেফিনিট কোনও অভিযোগ না থাকলে তো এসব কিছু খোঁজ নেওয়া যায় না। আমি বরং একটা কাজ করতে পারি। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি, অসিত ধর লোকটা কেমন। আগে কোনও বেআইনি কাজ করেছে কি না। আজ রাত্তিরের মধ্যেই তুমি সব জেনে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "গোয়াতে এখন পুলিশের কর্তা ডি. সিল্‌ভা না ? তার ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা আমাকে দাও।" বাড়িতে ফিরে কাকাবাবু দেখলেন দীপা এসে তাঁর বউদির সঙ্গে গল্প করছে। কাকাবাবুকে দেখে সে বলে উঠল, "এর মধ্যেই টো-টো করে বেড়াচ্ছেন ? ডাক্তার আপনাকে বিশ্রাম নিতে বলেছিল না ?"

সন্তুর মা অবাক হয়ে বললেন, "ডাক্তার...কেন, কী হয়েছিল ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "চিন্তার কিছু নেই বউদি। এবারে কোনও গুণ্ডা, ডাকাত কিংবা অপরাধচক্রের নায়কের পাল্লায় পড়িনি। এমনিই পড়ে গিয়ে মাথায় একটু চোট লেগেছিল।"

তারপর তিনি দীপাকে বললেন, "তুমি একবার আমাদের ঘরে এসো তো ! তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।"

ঘরে এসে দীপাকে তিনি একটা ইজিচেয়ারে বসতে বসলেন। ঘরের সবক'টা জানলা বন্ধ করে দিতে অন্ধকার হয়ে গেল। মাঝখানের একটা আলো জ্বেলে দিলেন। তারপর কাকাবাবু এককোণে দাঁড়িয়ে বললেন, "দীপা, তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে শুধু। আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করব, তা মনে করবার চেষ্টা করবে। ছোটখাটো, খুঁটিনাটি সব কিছু। তোমাদের এই বাড়িটার ছাদের ঘরে সেদিন সকালবেলা তুমি আমার চেয়ে আগে ঢুকেছিলে। ঢুকে তুমি কী দেখলে ?"

দীপা বলল, "অসিতবাবু আগে থেকেই সেই ঘরের মধ্যে ছিলেন।"

"সে কী করছিল ?"

"অসিতবাবু খুব ব্যস্ত হয়ে সবকিছু উলটেপালটে দেখছিলেন।"

"সবকিছু মানে ?"

"ঝিনুক, পুঁতির মালা, বই, ম্যাপ, টেবিলের ড্রয়ার..."

"সবগুলোই একসঙ্গে দেখছিলেন ?"

"তাই তো মনে হল। অন্যদের আগেই তিনি সব দেখে নিতে চান।"

"কোনও জিনিসটা উনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন ?"

"না। খালি বলছিলেন, বাজে, বাজে, ঝুটো মাল !"

"আর-একটু ভাল করে ভাবো। কোন জিনিসটা বেশি করে দেখছিলেন ? ঝিনুক, বই..."

"পুঁতির মালা। প্রত্যেকটা মালা তুলে-তুলে চোখের সামনে দেখছিলেন আর ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলেন মাটিতে..."

"খাটের ওপর বিছানা-বালিশ ছিল। আমি পরের দিন গিয়ে দেখেছি, বালিশটা ফালা-ফালা করে ছেঁড়া। তুলো বার করা। তুমিও সেরকম দেখেছিলে, না বালিশটা তখন আস্ত ছিল ?"

"বালিশটা ছেঁড়াই ছিল। অনেকদিন থেকেই ছেঁড়া।"

"তোশকও ছেঁড়া ?"

"হ্যাঁ। ছেঁড়া ছিল।

"ঘরের মেঝেটা কীরকম ছিল ?"

"মাঝে-মাঝে গর্ত ছিল। পাথর তোলা ছিল।"

"আমি যেখানে পড়ে গেলাম, সেখানেও গর্ত ছিল, না পাথর বসানো ছিল ?"

"মনে নেই।"

"মনে করার চেষ্টা করো !"

"আমি ওদিকটা ভাল করে দেখিনি।"

কাকাবাবু এগিয়ে এসে দীপার চোখের সামনে একটা হাত রেখে খুব নরম গলায় বললেন, "আর-একটু মনে করার চেষ্টা করো।"

"আর কিছু মনে পড়ছে না, কাকাবাবু !"

"ভাবো। খুব একমনে ভাবো।"

"হ্যাঁ, আমি জানলার কাছে যাচ্ছিলাম, তখন অসিতবাবু আমার হাত ধরে টেনে বসালেন, এদিকে দেখুন। এই আয়নার বাক্সটা দেখুন ! আমাকে জানলার দিকে যেতে দেয়নি ! জানলার দিকে গেলে আমিও আপনার মতন আছাড় খেয়ে পড়তাম।"

"তা হলে অসিত জানত যে,ওদিকে গর্তের ওপর একটা পাথর আলগা করে বসানো আছে। কিংবা সেটা সে নিজেই বসিয়েছে।"

কাকাবাবু এবার সব জানলা খুলে আলো নিভিয়ে দিলেন।

দীপা চোখ বিস্ফারিত করে বসে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "অসিতবাবু জেনেশুনে ইচ্ছে করে আপনাকে আছাড় খাইয়েছে ? কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর তোমরা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে। সেই সুযোগে অসিত ঘর থেকে কোনও দামি জিনিস সরিয়ে ফেলতে পারে অনায়াসে, তাই না ?"

দীপা প্রায় আর্তনাদের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "কী সরিয়ে ফেলেছে ? নবাবের দেওয়া সেই চুনির মালা ?"

কাকাবাবু বললন, "সেটা যদি অসিত ঘরে ঢোকামাত্র খুঁজে নিতে পারে, তা হলে সে দোষ তোমাদের। তোমরা অনেকে মিলে ওই ঘরে অনেকবার খোঁজাখুঁজি করেছ, কিন্তু দামি জিনিস কিছুই পাওনি। এমনকী, ওই চুনির মালাটার কথা তোমরা জানতেই না। সুতরাং অসিত যদি ওটা আবিষ্কার করে থাকে, তা হলে সেটা তার কৃতিত্ব !"

দীপা বলল, "পাগল দাদুটা হয়তো মালাটা এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল, যা কেউ ধারণাই করতে পারেনি। পাগলদের মতিগতি কি বোঝা যায় ? ইস, অমন দামি জিনিসটা অসিত ধর নিয়ে নিল ? আমাদের ঠকাল ? ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া যায় না ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও। সে যে নিয়েছে, তার কোনও প্রমাণ আছে ? ওরকম একটা মালা ছিল কি না, তারই তো ঠিক নেই। হুট করে কি কাউকে চোর বলা যায় ? তুমি এক কাজ করো। বাড়ি গিয়ে বিমানকে জিজ্ঞেস করো, ওই ঘরটায় কী কী জিনিস ছিল, তার কোনও লিস্ট বানানো আছে কি না ! যদি সেরকম না থাকে, তা হলে বিমানকে একটা লিস্ট বানাতে বলো—ও তো ওই ঘরে বেশ কয়েকবার ঢুকেছে, যা যা জিনিস দেখেছে সব মনে করে লিখতে বলো। যেসব জিনিসকে মনে হয় আজেবাজে, তাও যেন বাদ না দেয় ! তুমি যেমন মেঝের গর্তটার কথা ভুলে গিয়েছিলে, সেরকম কিছুও ভুললে চলবে না।"

দীপা ঠোঁট উলটে বলল, "ওর আমার চেয়েও ভুলো মন।"

দীপা চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু নিজের টেবিলের কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজে একটা টেলিগ্রামের ফর্ম বার করলেন। তারপর গোয়ার পুলিশের কর্তার কাছে কয়েকটা খবর জানতে চেয়ে লিখলেন অনেকখানি। বাড়ির কাজের লোকটির হাতে টাকা দিয়ে টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিলেন পোস্ট অফিসে।

সন্ধেবেলাতে পুলিশ কমিশনার ফোন করলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী, এবার তো মনে হচ্ছে, তোমার পুরো ব্যাপারটা ওইল্ড গুজ চেইজ।"

কাকাবাবু শুকনো গলায় বললেন,"কেন ?"

কমিশনার-সাহেব বললেন, "অসিত ধর সম্পর্কে সমস্ত খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। তার নামে কোনও অভিযোগ নেই। সে কখনও জেল খাটেনি, চুরি-জোচ্চুরির কোনও কেস তার নামে কখনও ওঠেনি। পাড়ার লোক তাকে নির্ঝঞ্ঝাট, ভদ্রলোক বলে জানে। যদিও সে পাড়ায় লোকদের সঙ্গে তেমন মেশে না। সে প্রায়ই বিদেশে যায়, সেখানে তার ব্যবসা আছে। তার পাসপোর্টেও কোনও গোলমাল নেই। শিগগিরই আবার বিদেশে যাবে, তার টিকিট কাটা আছে। এরকম লোককে তো পুলিশ কোনও কারণেই ধরতে পারে না !"

"আমি তো তোমাকে ধরতে বলিনি।"

"এরকম লোককে তুমিই বা সন্দেহ করছ কেন ?"

"দ্যাখো, সন্দেহ যখন আমার মনে জেগেছে, তখন নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।"

"আরও একটা ব্যাপার। আমি আজ বীরভূমের এস. পি.-কে ফোন করেছিলাম। মজার কথা কী জানো, এস. পি -র নাম চঞ্চল দত্ত, সে নাকি বীরভূমের ওই রাও-পরিবারের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। নবাবের উপহার দেওয়া পান্নার মালাটার কথা চঞ্চলও জানে।"

"পান্না নয়, চুনির মালা।"

"তাই নাকি ? ও যে বলল, পান্না ?

"চুনি হচ্ছে লাল রঙের, আর পান্না সবুজ। দুটো একেবারে দু'রকম।"

"তাই নাকি ? আমি আবার অত চুনি-পান্না চিনি না। চঞ্চলও বোধ হয় গুলিয়ে ফেলেছে। যাই হোক, চঞ্চল ওই মালাটার কথা শুনেছে। এখন তো ওটার দাম হবে কয়েক কোটি টাকা। আজও কেউ মালাটা খুঁজে পায়নি। এখন তো বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে, কোনও দেওয়ালের গর্ত থেকে কোনও মিস্তিরি-মজুর পেয়ে যেতে পারে। চঞ্চলকে বলেছি নজর রাখতে।"

"বেশ,ভাল কথা।"

"শোনো রাজা, অসিত ধর যদি লোভের বশে ছোটখাটো কোনও জিনিস হাতসাফাই করে ওখান থেকে নিয়েও থাকে, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কী দরকার ? বিমান তো কোনও অভিযোগ করেনি।"

"সেটা ঠিক। আমার মাথা ঘামাবার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু সে আমার চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছে কেন, তা জানতে হবে না ? সে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে বিমানের কাছ থেকে কয়েকটা ভাঙা জিনিসপত্র কিনেছে। বিমান তাতেই খুশি। কিন্তু আমার পায়ের নখ আধখানা কেন উড়ে গেল, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব না ?"

"তোমার পায়ের নখ উড়ে গেছে ? সেটা আবার কী ব্যাপার ? কিছু বলেননি তো ?"

"থাক, পরে বলব। এখন আপাতত আমি নিজেই মাথা ঘামাই।"

সন্তু শেষ পরীক্ষা দিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে একটা সিনেমা দেখে ফিরল রাত সাড়ে আটটায়। এসেই কাকাবাবুর ঘরে ঢুকে বলল, "এবার বলো ! কী হল বীরভূমে !"

কাকাবাবু একটা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন ঘর অন্ধকার করে। উঠে আলো জ্বাললেন। তারপর বললেন, "বলছি। কাল সকাল থেকে তোকে একটা কাজ করতে হবে, সন্তু। একটা লোককে সারাদিন ফলো করতে পারবি ? পুলিশের সাহায্য পাওয়া যাবে না। লোকটি তোকে চেনে না, এই একটা সুবিধে আছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকে ফলো করব ? লোকটিকে আমি চিনব কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি লোকটির বাড়ি আর লোকটিকে চিনিয়ে দেব। সারাদিনে ও কোথায় কোথায় যায়, কার কার সঙ্গে দেখা করে, সব তোকে নোট করতে হবে।"

"লোকটা যদি গাড়ি করে যায় ?"

"সেও একটা সমস্যা বটে। তোকে ট্যাক্সি ভাড়ার জন্য টাকা

দিতে পারি, কিন্তু কলকাতা শহরে যে ঠিক সময়মতন ট্যাক্সি পাওয়াই যায় না।"

"আমি মোটর সাইকেল চালাতে শিখে গেছি। বিমানদার মোটর সাইকেলটা চেয়ে নেব ?"

"চালাতে শিখেছিস ? তোর তো এখনও লাইসেন্স হয়নি ?"

"না।"

"তা হলে চালাতে হবে না। তা ছাড়া মোটর সাইকেলে বড্ড আওয়াজ হয়। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এমনিই দ্যাখ যতটা পারিস। উপস্থিত বুদ্ধি খাটাবি।"

এর পর কাকাবাবু প্রথম থেকে বলতে শুরু করলেন সন্তুকে। পুরনো আমলের বিশাল বাড়ি, ভূতের ভয়, ছাদের ওপর পাগলা দাদুর ঘর...।

অনেকটা যখন বলা হয়েছে, সেই সময় ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। সন্তুই ফোনটা ধরে বলল, "কাকাবাবু, তোমাকে চাইছে।"

কাকাবাবু রিসিভারটা নিয়ে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে একটা হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

কাকাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি আবার বললেন, "হ্যালো, কে ?"

এবার ওদিক থেকে একজন বলল, "সরি, মিঃ রায়চৌধুরী। হঠাৎ হাসি পেয়ে গিয়েছিল। সকালে আপনি যখন রাগারাগি করছিলেন, সেই মুখখানা মনে পড়ে গেল কিনা! যাই হোক, ভেবেচিন্তে কিছু পেলেন ?"

অসিত ধরের গলা!

কাকাবাবু বললেন, "না, কিছু পাইনি।"

"অনেকের মুখেই শুনেছি, আপনার নাকি দারুণ বুদ্ধি। অনেক রহস্যের সমাধান করেছেন। এবার তা হলে আপনার ওপর টেক্কা দিলুম, কী বলুন!"

"আমার চেয়ে যাদের বুদ্ধি বেশি, তাদের আমি শ্রদ্ধা করি। তোমার কাছে আমি হেরে গেলে তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাব। তবে, তিনতলার ঘরখানা তুমি আর আমি যদি একসঙ্গে দেখতাম, তা হলেই আসল বুদ্ধির পরীক্ষা হত। তুমি অন্যায়ভাবে আমাকে সরিয়ে দিয়েছ।"

"সে-চান্সটা আমাকে নিতেই হয়েছে। তবে আপনার চিন্তার বোঝাটা আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি। ওই যে সিরাজউদ্দৌল্লার দেওয়া একটা চুনির মালার কথা এখন শোনা যাচ্ছে, সেটা কিন্তু আমি নিইনি! মালা জাতীয় কোনও কিছু আমি নিইনি, এ-বিষয়ে আপনাকে আমি ওয়ার্ড অব অনার দিতে পারি।"

"মালাটা ছিঁড়ে পাথরগুলো আলাদা করে নিলেও তার দাম একই থাকে। আলাদা-আলাদাভাবে পাথরগুলো লুকিয়ে রাখাও সোজা।"

"হা-হা-হা! মিঃ রায়চৌধুরী, অত সোজা নয়! ভাবুন, ভাবুন, হাল ছেড়ে দেবেন না, ভাবুন, ভেবে যান!"

কাকাবাবু আর কিছু বলার আগেই ফোন রেখে দিল অসিত।

অপমানে কাকাবাবুর মুখটা কালো হয়ে গেল।

॥ ৭ ॥

সকাল আটটা থেকে এলগিন রোডে অসিত ধরের বাড়ির উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে সন্তু। কাকাবাবু আসেননি, বাড়ির নাম্বার আর অসিত ধরের চেহারার একটা নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল, তবু অসিত ধরের দেখা নেই। এমনিতে সন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে পারে, কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে তার পায়ে ব্যথা করছে। এক-একবার একটা ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিচ্ছে। সে একবার ভাবল, ট্রাফিক পুলিশরা সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকে কী করে ?

সকালবেলায় সবাই ব্যস্ত, কতরকম মানুষ যাচ্ছে হনহনিয়ে। সন্তুই শুধু দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। অন্যরা কী ভাবছে? কেউ যদি তাকে সন্দেহ করে ?

কাছাকাছি কোনও চায়ের দোকানও নেই যে, সেখানে গিয়ে বসবে।

সন্তু একটা ছাই রঙের প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরে এসেছে। ইচ্ছে করে বেশি রংচঙে পোশাক পরেনি, যাতে তার প্রতি লোকের দৃষ্টি না পড়ে। কাঁধে ঝোলানো একটা সাধারণ ব্যাগ, তাতে রয়েছে দু-একখানা গল্পের বই, আর ক্যামেরা।

প্রায় সাড়ে ন'টার সময় অসিত ধর নেমে এল রাস্তায়। স্যুট-টাই পরা, পুরোদস্তুর সাহেবি পোশাক পরা, হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। সন্তু রাস্তা পেরিয়ে তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

অসিত প্রথমে হাত তুলে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামাবার চেষ্টা করল। সেটা থামল না। তখন সে হাঁটতে লাগল বাঁ দিকে।

নেতাজি সুভাষ বসুর বাড়ির সামনে দু'খানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। সন্তুর মনটা নেচে উঠল আনন্দে। একেই বলে ভাগ্য। একসঙ্গে দু'খানা ট্যাক্সি, সন্তুর কোনও অসুবিধাই হবে না।

অসিত প্রথম ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে জানলা দিয়ে দু-একটা কথা বলল। ড্রাইভারটি রাজি হয়ে খুলে দিল দরজা।

সে ট্যাক্সিটা স্টার্ট করার পরই সন্তু ঝট করে উঠে পড়ল দ্বিতীয়টায়। এ-ট্যাক্সির ড্রাইভার মিটার ঘোরাবার আগে সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে ?"

সন্তু ব্যস্তভাবে বলল, "জলদি, জলদি, ওই সামনের ট্যাক্সিটাকে ফলো করুন।"

ড্রাইভারটি ভুরু তুলে বলল, "তার মানে ?"

সন্তু বলল, "ওই ট্যাক্সিটাকে ফলো করুন! দূরে চলে যাবে।"

ড্রাইভারটি বলল, "কেন, ফলো করব কেন ?"

সন্তু অস্থির হয়ে বলল, "কী মুশকিল! বলছি যে, ট্যাক্সিটা হারিয়ে যাবে, শিগগির চলুন।

"ইয়ার্কি হচ্ছে ?"

"আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করব কেন ? আমার কাছে টাকা আছে, আমি ভাড়া যত লাগে দেব, আপনি ট্যাক্সি চালাবেন।"

"কই, দেখি টাকা।"

"এই তো দেখুন না। এবার দয়া করে তাড়াতাড়ি চলুন। স্পিড নিন। আগের গাড়িটাকে ধরতে হবে।"

"কেন, ধরতে হবে কেন ?"

"ওই ট্যাক্সিতে একজন...একজন ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল বসে আছে।"

"ওই লোকটা যদি ক্রিমিনাল হয়, তা হলে তুমি কে ?"

"আমি, আমি মানে, আমার বিশেষ দরকার।"

"চোর-পুলিশ খেলা হচ্ছে ? নামো, নামো আমার গাড়ি থেকে।"

তর্ক করে লাভ নেই। অসিতকে নিয়ে অন্য ট্যাক্সিটা রাস্তার গাড়ির ভিড়ে মিলিয়ে গেছে। ড্রাইভারটাকে একটা ভেংচি কেটে সন্তু নেমে পড়ল।

কত ইংরেজি বইতে সে পড়েছে কিংবা বিদেশি সিনেমায় দেখেছে যে, রাস্তায় ঝট করে একটা ট্যাক্সি ধরে আগের গাড়িটাকে ফলো করতে বললে, ড্রাইভার বিনা বাক্যব্যয়ে অমনই ফলো করে। কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভারগুলো এক-একটি জ্যাঠামশাই! কোথায় যাবে, কেন যাবে, সব জিজ্ঞেস করা চাই।

প্রথম চেষ্টাতেই ব্যর্থ। সন্তু বিরক্ত মুখে হাঁটতে লাগল। শম্ভুনাথ হাসপাতালের কাছে আর-একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্তুর একটা কথা মনে পড়ল। অসিত ট্যাক্সিতে ওঠার

সময় বলেছিল, বউবাজার। সেখানে গিয়ে একবার খুঁজে দেখা যেতে পারে। যদিও বউবাজার স্ট্রিট চেনা রাস্তা, সেখানে অসিত এর মধ্যে কোন্ বাড়িতে ঢুকে পড়বে কে জানে। তবু চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই ট্যাক্সির কাছে গিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বউবাজার যাবেন ?"

ড্রাইভারটি সন্তুর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোনও রুগি যাবে ? কিসের রুগি ?"

সন্তু বলল, "না, অন্য কেউ যাবে না। আমি একা যাব।"

ড্রাইভারটি বলল, "বাসে চলে যাও। অনেক শস্তা পড়বে !"

এবার সন্তু বুঝল। তার বয়েসী ছেলেরা কলকাতা শহরে একা একা ট্যাক্সি চড়ে না, ট্রামে-বাসে যায়। তাই ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। কিন্তু ট্রামে-বাসে চেপে কি কাউকে ফলো করা যায় ?

আর-একটু হাঁটতে-হাঁটতে সন্তুর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। কলকাতায় এখন তো গাড়িও ভাড়া পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় সে Rent A Car সাইনবোর্ড দেখেছে। কাকাবাবু তাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিয়েছেন, এই টাকায় সারাদিনের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করা যেতে পারে অনায়াসে।

এদিকে কোথায় Rent A Car আছে ? খুব দরকারের সময় ঠিক সেই জিনিসটাই পাওয়া যায় না। আগে থেকেই এসব চিন্তা করা উচিত ছিল। যাই হোক, কাকাবাবু বলেছেন উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে। কোনও পেট্রোল পাম্পে গেলে ওরা নিশ্চয়ই গাড়ির খবর দিতে পারবে।

ভবানীপুরের দিকে একটা পেট্রোল পাম্প আছে। কিন্তু সেখানে জিজ্ঞেস করতে হল না, পাম্পের পাশেই সন্তু একটা গাড়ি ভাড়ার সাইন বোর্ড দেখতে পেল। সেখানে ব্যবস্থা হয়ে গেল সহজেই। ড্রাইভার সমেত গাড়ি পাওয়া যাবে, ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দিতে হবে। আড়াইশো টাকা জমা দিয়ে দিল সন্তু। তার বেশি ভাড়া হলে বাড়ি পৌঁছেও দেওয়া যায়।

একটা নতুন গাড়িই পাওয়া গেল। ড্রাইভারটি তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েসের, বেশ চটপটে ধরনের। গাড়িতে ওঠার পর সন্তু যেন নিজের বয়েসের চেয়েও বড় হয়ে গেল। গাড়িটাকে নিজের গাড়ি বলে মনে করা যায়।

সে বলল, "প্রথমে বউবাজার চলুন।"

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "বউবাজারে কোথায় ?"

সন্তু বলল, "কোথায় মানে ? বউবাজার মানে বউবাজার !"

ড্রাইভার বলল, "বউবাজার রাস্তাটা তো শিয়ালদা থেকে আরম্ভ আর ডালহাউসিতে শেষ। সেইজন্যই জিজ্ঞেস করছি, কোন্ দিকে যাব !"

সন্তু বলল, "শিয়ালদা থেকে শুরু করুন, ডালহাউসি পর্যন্ত চলুন ! আর-একটা কথা শুনে রাখুন। আমি টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করেছি, আমি যেখানে খুশি যাব। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, এসব কিছু জিজ্ঞেস করবেন না !"

গাড়িটা শিয়ালদার দিক থেকে বউবাজারে ঢুকে চলে এল রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত। তারপর ড্রাইভারটি জিজ্ঞেস করল, "এবার ?"

সন্তু নিজেই বুঝতে পারছে না, এত বড় রাস্তায় কোথায় সে অসিতকে খুঁজবে। কোন্ বাড়িতে সে গেছে, তা জানা অসম্ভব। কিন্তু এখন ফিরে গিয়ে কাকাবাবুকে যদি বলতে হয়, অসিতকে সে হারিয়ে ফেলেছে, তার চেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না।

সে ড্রাইভারটিকে বলল, "গাড়ি ঘুরিয়ে নিন, আবার শিয়ালদার দিকে চলুন।"

গাড়িটা আবার শিয়ালদার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তখন সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "থামান, থামান!"

ড্রাইভারটি ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল।

উলটো দিকে একটা ট্যাক্সি থেমে আছে। সন্তু সেদিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টিতে। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

অসিত যখন এলগিন রোডে ট্যাক্সি চাপে, সেই সময়টার দৃশ্যটুকু সে প্রাণপণে নিখুঁতভাবে মনে করার চেষ্টা করছিল। ট্যাক্সিটার নাম্বার সে ভাল করে দেখেনি, কিন্তু শেষে দুটো জিরো ছিল। আর ড্রাইভারটির মুখে তিন-চারদিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। এই তো সেই ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিটার মিটার ডাউন করা, আর ড্রাইভারটি এমনভাবে গা এলিয়ে দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে যে বোঝা যায়, কেউ তাকে ভাড়া করে রেখেছে। এই ড্রাইভারের কাছ থেকে কায়দা করে জেনে নেওয়া যায়, অসিত কোথায় নেমেছে।

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় গয়নার দোকানের সামনে। আবার বুক কেঁপে উঠল সন্তুর। নবাবের সেই চুনির মালা এখানে বিক্রি করতে এসেছে অসিত?

গাড়ি থেকে নেমে অন্য ফুটপাথে চলে এল সন্তু। দোকানটার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। হ্যাঁ, ঠিক, একটু ভেতর দিকে চেয়ারে বসে আছে অসিত, মন দিয়ে কথা বলছে একজনের সঙ্গে।

খবরটা এক্ষুনি জানানো দরকার কাকাবাবুকে। টেলিফোন
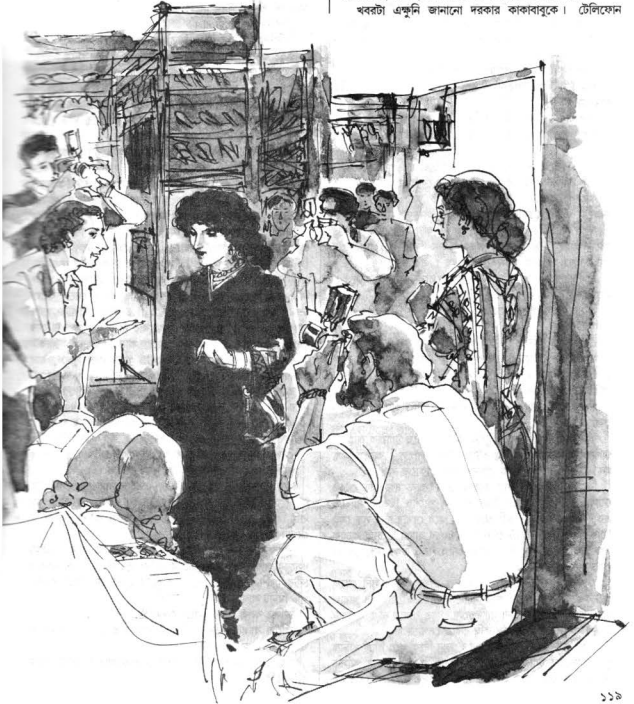
পাওয়া যাবে কোথায় ? ইংরেজি ছবিতে দেখা যায়, ওদের দেশের রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাবলিক টেলিফোনের কাচের ঘর থাকে। আমাদের দেশে সেসব কিছু নেই। পোস্ট অফিসে ফোন করা যায়, কিন্তু সেখানে সব সময় লোক থাকে। কেউ টেলিফোন করলে অন্যরা কান খাড়া করে সব কথা শোনে।

বেশি দূরে যাওয়া যাবে না, অসিত যদি বেরিয়ে পড়ে।

কাছাকাছি একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে সন্তু কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "একটা ফোন করতে দেবেন ? আমার খুব দরকার। যা পয়সা লাগে দেব।"

দোকানের একজন কর্মচারী বলল, "দু' টাকা।"

সন্তু ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে মনে-মনে বলতে লাগল, হে ভগবান, যেন নাম্বারটা পাওয়া যায়। টেলিফোনের দেবতা কে ? বিশ্বকর্মা ? হে বিশ্বকর্মা, যেন নাম্বারটা পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি।

একেবারেই পাওয়া গেল। কাকাবাবুর গলা শুনেই সন্তু বলল, "কাকাবাবু, পার্টি এখন বউবাজারে একটা গয়নার দোকানে, পার্টি অনেকক্ষণ কথা বলছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দোকানটার নাম কী ?"

সন্তু উঁকি দিয়ে দোকানটার নাম দেখে নিয়ে বলল, "এস. পি. জুয়েলার্স !"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। তুই নজর রাখ।"

সন্তু বলল, "আমি আর ওকে চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছি না !"

ফোন রেখে সন্তু দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে এসে বসল। ট্যাক্সিটা থেমে আছে। অসিতের বেরোবার নাম নেই।

কাঁধের ঝোলা থেকে সন্তু একটা বই আর ক্যামেরাটা বার করল। এমনিই গয়নার দোকানটার ছবি তুলল দু'খানা।

সন্তুর গাড়িটার একটু আগেই আর-একটা সাদা রঙের গাড়ি থেমে আছে। তাতে বসে আছে দু'জন লোক। লোক দুটো পেছন ফিরে মাঝে-মাঝে সন্তুকে দেখছে। এরা কারা ?

মিনিটদশেক বাদে গয়নার দোকান থেকে বেরোল অসিত। হাতে সেই কালো ব্যাগ। ওই ব্যাগভর্তি কি হার বিক্রির টাকা ?

অসিত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল, তারপর একটা সিগারেট ধরাল।

সেই ফাঁকে অসিতের একটা ছবি তুলে নিল সন্তু।

সামনের সাদা গাড়িটা থেকে একজন লোক নেমে গিয়ে ঢুকে গেল ওই গয়নার দোকানে। অসিতের ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিতেই সাদা গাড়িটাও চলতে শুরু করল।

সন্তু অবাক হয়ে গেল। এই সাদা গাড়িটাও অসিতকে ফলো করছে নাকি ?

বউবাজার আর কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের কাছে ট্রাফিক জ্যাম। গাড়িগুলো নড়ছে না। সন্তু ছটফট করতে লাগল। অসিত কিন্তু মন দিয়ে একটা বই পড়ছে, কোনওদিকে তাকাচ্ছে না।

কিসের জন্য এমন জ্যাম হয়েছে দেখার জন্য সন্তু গাড়ি থেকে নেমে গেল। অসিতের ট্যাক্সিটা ডান পাশের দ্বিতীয় সারিতে একটু এগিয়ে আছে। অসিতকে ভাল করে দেখার জন্য সন্তু সেই ট্যাক্সির পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। অসিতের ব্যাগে নিশ্চয়ই কয়েক লক্ষ টাকা আছে, তবু জ্যাম নিয়ে তার কোনও চিন্তা নেই, সে বই পড়ে যাচ্ছে মন দিয়ে।

একেবারে সামনের দিকে এসে সন্তু দেখল একটা লরি থেকে অনেকগুলো বস্তা পড়ে গেছে মাটিতে, লরিটাও বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে, সেইজন্য অন্য গাড়িগুলো যেতে পারছে না। একজন পুলিশ কনস্টেবল এসে হম্বি-তম্বি করছে সেখানে।

একটু বাদে রাস্তা পরিষ্কার হল। ডান দিকে ঘুরে গিয়ে খানিক দূরে অসিতের ট্যাক্সিটা থামল। পাশেই একটা ব্যাঙ্ক। অসিত ওখানে টাকাগুলো জমা দেবে ? সত্যিই অসিত ঢুকে গেল ব্যাঙ্কের মধ্যে।

অন্য সাদা গাড়িটাও এখানে থেমেছে। তার থেকে কালো চশমা পরা একজন লোক নেমে ব্যাঙ্কের মধ্যে চলে গেল অসিতের পেছন-পেছন। এই সাদা গাড়ির লোকেরা কি অসিতের কাছ থেকে টাকাগুলো কেড়ে নেওয়ার মতলবে আছে ? ব্যাঙ্কের ভেতরে গিয়ে ডাকাতি করবে ?

অসিত ট্যাক্সিটা ছাড়েনি। কাকাবাবু বলেছেন অসিত কোথায় যায়, কার সঙ্গে দেখা করে, সেইসব লক্ষ রাখতে। অসিত ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে গেলে তো সন্তু বাধা দিতে পারবে না ? ডাকাতরা অসিতের ওপর হামলা করলেই বা সে কী করবে ?

সন্তু গাড়িতেই বসে রইল। একটা বই খুলেও পড়তে পারল না। প্রত্যেক মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে ব্যাঙ্কের মধ্যে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাবে।

সেরকম কিছুই হল না।

মিনিটদশেক বাদে অসিত বেরিয়ে এল ব্যাঙ্ক থেকে। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে আবার সে চারদিকটা একবার দেখে দিল। সন্তু মাথাটা নিচু করে নিল, যাতে তার দিকে অসিতের নজর না পড়ে।

অসিতের ট্যাক্সি এবার চলতে লাগল উত্তর কলকাতার দিকে। আবার অসিত বই খুলে পড়তে শুরু করেছে। সন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সাদা গাড়িটাও আসছে পেছনে-পেছনে।

কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া ছাড়িয়ে গিয়ে অসিতের ট্যাক্সি থামল একটা বড় জুতোর দোকানের সামনে। সন্তুকে অবাক করে অসিত ঢুকে গেল সেই জুতোর দোকানের মধ্যে। এটা কি জুতো কেনার সময় ? বড়-বড় চোর ডাকাতদের কারও হঠাৎ জুতো কেনার শখ হয়, এটা কেমন যেন অদ্ভুত।

জুতোর দোকানে সবাই ঢুকতে পারে। সন্তু নিজের জন্য একটা চটিই না হয় কিনে ফেলবে। সেও ভেতরে চলে এল।

দোকানটাতে বেশ ভিড়। সেল্‌সম্যানরা সবাই ব্যস্ত। অসিত একটা জায়গায় বসল, কিন্তু সন্তু আর কোনও চেয়ার খালি পেল না। সে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। সাদা গাড়ি থেকে কালো চশমা পরা লোকটাও নেমে এসেছে। চশমায় লোকটার চোখ ঢাকা, কোন দিকে তাকায় তা বোঝা যায় না। এই লোকটা কার ওপর নজর রাখছে ? এমনকী হতে পারে যে, এই লোকটা অসিতের বডি গার্ড ? কিন্তু বডি গার্ড গাড়ি করে ঘুরছে, আর অসিত কেন ট্যাক্সিতে ? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

অসিত হাতের কালো ব্যাগটা পাশে না রেখে কোলের ওপর নিয়ে বসে আছে। সন্তু এসে দাঁড়াল ঠিক তার পেছনে।

একটু বাদে একজন সেল্‌সম্যান এল অসিতের কাছে। অসিত গম্ভীরভাবে বলল, "চটি দেখান। বাড়িতে পরার ভাল চটি।"

সেল্‌সম্যান বলল, "আপনার পায়ের মাপটা দেখি, সার !"

অসিত পা থেকে জুতো-মোজা খুলে ফেলল।

সেল্‌সম্যানটি দু' জোড়া চটি আনতেই অসিত সেগুলো পায়ে না দিয়েই বিরক্তভাবে বলল, "এগুলো কী এনেছেন ? আমি কম দামি জিনিস চাইনি। সবচেয়ে ভাল ডিজাইনের কী কী চটি আছে দেখান !"

সেল্‌সম্যানটি বলল, "ভেতর থেকে আনতে হবে। একটু বসবেন সার ? আপনার পায়ের সাইজ দশ নম্বর। দশ নম্বরের চটির বেশি ডিজাইন নেই। পেছনের গোডাউন থেকে আনব, পাঁচ মিনিট লাগবে।"

অসিত বলল, "ঠিক আছে, আনুন !"

কালো ব্যাগটা খুলে একটা বই বার করে সে পড়তে লাগল ওইটুকু সময় কাটাবার জন্য।

সন্তু উঁকি মেরে দেখল, বইটার প্রত্যেক পাতার তলায়-তলায় রঙিন ছবি।

এই সময় একটা কাণ্ড ঘটল। দারুণ সাজগোজ করে একজন খুব ফরসা মহিলা ঢুকলেন সেই দোকানে। সঙ্গে ছোটখাটো একটা দল। মহিলার মুখখানা কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল সন্তুর।

দোকানের সব লোক ফিসফাস করতে লাগল। অনেকে সেই মহিলার কাছে এগিয়ে গেল। একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, ডিম্‌পল ! ডিম্‌পল !

মহিলাটি হিন্দি সিনেমার নায়িকা। সন্তু হিন্দি সিনেমা দেখে না, কিন্তু সারা কলকাতার দেওয়ালে এইসব নায়িকার এত ছবি থাকে যে, মুখগুলো চেনা হয়ে যায়।

হিন্দি সিনেমার নায়িকা এই দোকানে এসেছে জুতো কিনতে, তাই হইচই পড়ে গেল সারা পাড়ায়। দোকানের বাইরে ভিড় জমে গেল। দোকানের ম্যানেজার বলল, "ছবি তুলে রাখতে হবে, ক্যামেরা, ক্যামেরা !"

দু-তিনটে ক্যামেরা বেরিয়ে পড়ল।

অসিত হিন্দি সিনেমার নায়িকাটিকে গ্রাহ্য করল না। একবার শুধু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আবার মন দিল বইয়ের পাতায়।

বাইরে থেকেও অনেক লোক ক্যামেরা নিয়ে ঢুকে এল। সবাইকে ছবি তুলতে দিতে হবে। নায়িকাটির তাতে কোনও আপত্তি নেই। দোকানের ঠিক মাঝখানে তিনি পোজ দিয়ে দাঁড়ালেন। অনেকগুলি ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বাল্‌ব জ্বলে উঠল।

সন্তুই বা এই সুযোগ ছাড়বে কেন ? সেও তার ক্যামেরা বার করল। কিন্তু নায়িকার ছবি তুলল মোটে একটা, আর তিনখানা ছবি তুলল শুধু অসিতের। এত ফ্ল্যাশ জ্বলছে যে, অসিত কোনও সন্দেহ করল না। অসিতের খুব ক্লোজআপ ছবি তুলে নিল সন্তু, যদিও এত ছবি কী কাজে লাগবে সে জানে না, কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে।

সেই নায়িকাকে নিয়ে সবাই এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, অসিতের কাছে আর কেউ এলই না। অসিত ঘড়ি দেখল, দশ মিনিট কেটে গেছে।

বেশ রাগের সঙ্গে সে আবার মোজা-জুতো পরল, তারপর গটমট করে বেরিয়ে গেল।

সন্তু ভেবেছিল, জুতো কেনাটা একটা ছুতো, অসিত নিশ্চয়ই এখানে কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। জুতো কেনার ছলে কোনও গোপন কথা বলা কিংবা কোনও জিনিস পাচার করে দেওয়া সহজ।

কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। কালো ব্যাগটা নিয়ে অসিত আবার ট্যাক্সিতে উঠে গেল।

এ-পাড়ায় অনেক জুতোর দোকান। কিন্তু অন্য কোনও দোকানে আর গেল না অসিত। জুতো কেনার দরকার নেই, না খুব রেগে গেছে ?

এবার অসিতের গাড়ি চলে এল ডালহাউসিতে। ট্রেনের টিকিটের বড় অফিসটার সামনে থামল। ট্রেনের টিকিট কাটবে ? কোথাকার টিকিট কাটছে, সেটা জানা খুব দরকার। সন্তুও ঢুকে পড়ল সেখানে। টিকিট কাটার অনেকগুলো লাইন। অসিত কিন্তু কোনও লাইনে দাঁড়াল না। একপাশের একটা ছোট দরজা দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। সন্তুও সেখান দিয়ে ঢুকতে যেতে একজন লোক তাকে আটকাল। ভেতরে যাওয়া নিষেধ। অসিত নিশ্চয়ই কোনও চেনা লোকের নাম বলেছে। ভেতর থেকে সে টিকিট কাটাবে।

অগত্যা সন্তুকে ঘোরাঘুরি করতে হল বাইরে। সাদা গাড়ির কালো চশমা পরা লোকটাও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

সেখান থেকে বেরিয়ে অসিত গেল সার্কুলার রোড আর ল্যান্সডাউনের মোড়ের কাছে একটা দোকানে। এখানে পুরনো দামি-দামি জিনিস বিক্রি হয়। অ্যান্টিকের দোকান। অসিতেরও এই ব্যবসা। দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মাত্র মিনিটপাঁচেক কথা বলল, কিছু নিল না কিংবা দিল না। অন্তত দেখা গেল না সেরকম কিছু। কাউন্টারের লোকটা তার চেনা, সে হাসিমুখে বারবার অসিতকে হাত ধরে টেনে ভেতরে বসাবার চেষ্টা করল, অসিত বলল,"সময় নেই, খুব ব্যস্ত আছি।"

দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা। আকাশে গনগনে রোদ। প্রথম-প্রথম সন্তু যতটা উত্তেজনা বোধ করছিল, এখন তা অনেকটা থিতিয়ে আসছে। অসিত কোথায় কেন যাচ্ছে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সন্তু আর কী করতে পারে ? এর চেয়ে বেশি কাছাকাছি গেলে অসিত বুঝে যাবে।

থিয়েটার রোডের দুটো দোকানেও থামল অসিত। একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকে লিফ্‌ট দিয়ে ছ' তলায় উঠে গেল। সন্তু সাহস করে একই লিফ্‌টে উঠে গেল ওর সঙ্গে। অসিত বাঁ দিকের একটা ফ্ল্যাটে বেল বাজাল। দরজা খুলে একজন অসিতকে দেখে কী যেন বলল আনন্দের সঙ্গে। লোকটা যেন অসিতেরই অপেক্ষায় ছিল। সন্তু তাড়াতাড়ি ডান দিকের একটা অচেনা ফ্ল্যাটে বেল বাজাল, তার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। অসিত তার দিকে মনোযোগ দেয়নি, ওদিকের লোকটি অসিতকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল, এদিকের ফ্ল্যাটের দরজা তখনও খুলল না, বোধ হয় ভেতরে কেউ নেই। সন্তু আর দেরি না করে নেমে গেল নীচে।

অসিত কিন্তু ট্যাক্সিটা ছাড়েনি। সাদা গাড়িটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

এবার আধ ঘন্টা বাদে নীচে নামল অসিত। এর মধ্যে সন্তু গাড়িতে বসে-বসে তার নোট বুকে টুকে নিয়েছে অসিত কোথায়-কোথায় গেছে। গয়নার দোকান, ব্যাঙ্ক, জুতোর দোকান, রেলের টিকিটের অফিস, অ্যান্টিক শপ, ফোটোগ্রাফি শপ, ঘড়ির দোকান, থিয়েটার রোডের 'বলাকা' বাড়ির ফ্ল্যাট নং ৬বি।

ট্যাক্সিটা খুব কাছেই একটা হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এই হোটেলটার বাইরের বাগানে অনেকগুলো রঙিন ছাতা পোঁতা আছে। তার নীচে একটা করে টেবিল। অসিত বসল সেরকম একটা টেবিলে। বোঝা যাচ্ছে, এবার সে লাঞ্চ খাবে।

সন্তুরও খিদে পেয়ে গেছে। পকেটে এখনও আড়াইশো টাকা আছে। সেও এখানে খেয়ে নিতে পারে। গাড়ির ড্রাইভারকে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি খেয়ে এসেছেন ? আপনি এখন খাবেন ?"

ড্রাইভারটি বলল, সে খেয়ে-দেয়েই ডিউটি করতে এসেছে। এখন কিছু খাবে না।

সন্তু হোটেলের বাগানে অসিতের থেকে খানিকটা দূরের একটা ছাতার তলায় বসল। বেয়ারা আসবার পর সে অর্ডার দিল তন্দুরি নান আর রেশমি কাবাব। এত বড় হোটেলে সন্তু আগে কখনও একা একা খায়নি। তার বয়েসী আর কেউ নেইও এখানে।

অসিতের টেবিলে এসে বসল দুটি মেয়ে। একজনের বয়েস সতেরো-আঠারো, আর একজনের তিরিশের কাছাকাছি। আগে থেকেই ওদের আসার কথা ছিল। না, এখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে বেশ ভালরকম চেনা, তা বোঝা গেল !

এবার কোটের পকেট থেকে একটা লাল পাথরের মালা বার করল অসিত। সন্তুর চোখ দুটো ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম। এই সেই নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার দেওয়া চুনির হার ! এরকম সবার সামনে বার করে দেখাচ্ছে অসিত ? অবশ্য এখানে অন্য কেউ ওটার কথা জানে না।

একজন বেয়ারা ওদের টেবিলে অর্ডার নিতে এসেও হাঁ করে মালাটা দেখতে লাগল। মেয়ে দুটিও এ একবার, ও একবার মালাটা হাতে নিয়ে দেখছে।

সন্তু একটা জয়ের নিশ্বাস ফেলল। যাক, ওই বিখ্যাত মালাটা যে অসিত চুরি করেছে, তা প্রমাণ হয়ে গেল। নিজের চোখেই তো দেখল সন্তু। এর পর কাকাবাবু যা করবার করবেন।

ক্যামেরাটা বার করে যেন এমনিই নাড়াচাড়া করছে, এমন ভান করে সন্তু খচাখচ কয়েকটা ছবি তুলে ফেলল ওই টেবিলের। মেয়ে দুটির ছবি তোলা থাক, পরে কাজে লাগবে।

সাদা গাড়ির কালো চশমা পরা লোকটাকে এখন আবার দেখা গেল এখানে। সে কোনও টেবিলে বসল না, শুধু একবার পাশ দিয়ে ঘুরে গেল। সন্তু তারও ছবি তুলে নিল চট করে। এ-লোকটা যদি গুণ্ডা হয়, তা হলে একেও পরে চেনা যাবে। অবশ্য কালো চশমার জন্য তার মুখখানা ভাল বোঝা যাচ্ছে না। তবে লম্বা, গাঁট্টাগোট্টা চেহারাটা গুণ্ডাদেরই মতন।

অসিত তার কালো রঙের ব্যাগটা পাশে নামিয়ে রাখেনি, এখানেও কোলের ওপর রেখেছে। ব্যাগটাতে আরও কী আছে? টাকা? এমনকী,হতে পারে যে, এই মেয়ে দুটো চুনির হারটার দাম আগেই দিয়ে দিয়েছে, অসিত ব্যাঙ্ক থেকে সেই চেক ভাঙিয়ে নিল?

ওরা অনেক খাবারের অর্ডার দিয়েছে। সন্তু আস্তে-আস্তে খেতে লাগল। বেশ খানিকটা সময় লাগবে মনে হচ্ছে। সন্তু এক গেলাস লস্যি নিল।

কালো চশমা-পরা লোকটা দূরে ঘোরাঘুরি করছে। ওর কাছে যদি রিভলভার থাকে, তা হলে তো এখন ওই দামি চুনির হারটা কেড়ে নেওয়া কিছুই নয়। লোকটা নিচ্ছে না কেন?

যে-মেয়েটির কম বয়েস, সে এখন মালাটা গলায় পরে আছে। রোদ্দুরে ঝকঝক করছে লাল রঙের পাথরগুলো।

ওদের খাওয়া শেষ হতে দেরি আছে। সন্তু ঝট করে একবার উঠে গেল। বাগানের এই রেস্তরাঁর একপাশেই হোটেল। এখানে লোক থাকে। লবিতে ফোন রয়েছে কয়েকটা। সন্তু পয়সা ফেলে ফোন করল বাড়িতে।

কাকাবাবু নেই, মা ধরলেন ফোন।

সন্তু একটু নিরাশ হয়ে বলল, "কাকাবাবু নেই? ফিরলেই বলবে, গ্রিনভিউ হোটেল, একটি সতেরো বছর বয়েসী মেয়ে, চুনির মালা!"

মা দারুণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বললি?"

সন্তু বলল, "মনে রাখতে পারবে না? গ্রিনভিউ হোটেল, একটি সতেরো বছর বয়েসী মেয়ে..."

"তার মানে কী?"

"তোমাকে মানে বুঝতে হবে না। শুধু কথাগুলো মনে রাখবে!"

"গ্রিনভিউ হোটেল? তুই সেখানে কী করছিস?"

"কাজ আছে। কাজ আছে।'

"একটা সতেরো বছরের মেয়ে?" তার সঙ্গে তোর কী করে ভাব হল? সন্তু, ওইসব হোটেলের মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে তোকে কে বলেছে?"

"আঃ, কে বলেছে যে আমার সঙ্গে ভাব হয়েছে? তার সঙ্গে আমার কোনও কথাই হয়নি!"

"তবে তার কথা বলছিস কেন?"

"তা তুমি বুঝবে না। শুধু কথাগুলো মনে রাখবে।"

"তুই দুপুরে বাড়িতে খেতে আসবি না?"

"না।"

ফোন রেখে সন্তু আবার তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

ওরা বিল মেটাচ্ছে। সন্তু আগেই বিল দিয়ে দিয়েছে, নিজের থলেটা তুলে নিয়ে চলে গেল এক কোণে।

ওরা খাবার টেবিল ছেড়ে চলে গেল হোটেলের লবির দিকে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল লিফটের সামনে। ওই হোটেলেরই কোনও ঘরে মেয়ে দুটি থাকে তা হলে! কেননা, অল্প বয়সী মেয়েটি চাবি চেয়ে আনল কাউন্টার থেকে।

লিফট থামার পর অল্প বয়েসী মেয়েটি ঢুকে গেল, অসিত আর অন্য মহিলাটি গেল না। দূর থেকে সন্তু দেখল, সেই কম বয়েসী মেয়েটির গলায় দুলছে চুনির মালা।

অন্য মহিলাটি ও অসিত হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের ট্যাক্সিতে উঠল।

সন্তু একবার ভাবল, বাচ্চা মেয়েটা হোটেলের ঘরে একলা থাকবে, ওর কাছ থেকে এখন যদি চুনির মালাটা কেউ কেড়ে নেয়? সন্তুর কি উচিত মেয়েটার ঘরের বাইরে পাহারা দেওয়া? কিন্তু মেয়েটা লিফটে উঠে কোন্ তলায়, কত নম্বর ঘরে গেল কে জানে!

তা ছাড়া কাকাবাবু তাকে বলেছেন, অসিতকে ফলো করতে।

অসিতদের ট্যাক্সি এল নিউ মার্কেটে। এখানে বিভিন্ন দোকানে ঘুরে ঘুরে ওরা গেঞ্জি, রুমাল, মোজা কিনল অনেক। এক দোকান থেকে চটিও কিনল অসিত। সন্তু পেছন-পেছন ঘুরছে, তার আর কিছুই করার নেই।

নিউ মার্কেটে কেনাকাটা সেরে অসিত সেই মহিলাকে নিয়ে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে চলে এল গঙ্গার ধারে। খানিকটা যাওয়ার পর এক জায়গায় ট্যাক্সিটা থামাল। তার থেকে নেমে এবার অসিত ভাড়া মিটিয়ে দিল, খালি ট্যাক্সিটা ঘুরে চলে গেল উলটো দিকে।

গঙ্গার ধার দিয়ে অলসভাবে পাশাপাশি হাঁটছে অসিত আর সেই মহিলাটি। দু'জনে মাথা নেড়ে কী যেন বলছে। কেউ রাস্তা দিয়ে আস্তে-আস্তে হাঁটলে, তাকে গাড়ি নিয়ে ফলো করা যায় না। সেটা বিচ্ছিরি দেখায়। সন্তুও গাড়িটাকে এক জায়গায় থামতে বলে নেমে পড়ল। অসিত এখনও তাকে লক্ষ করেনি। একবারও তার দিকে ফিরে চায়নি। একজন ছোট ছেলে অনুসরণ করবে, এরকমটা কেউ ভাবতে পারে না।

সন্তু ঠিক করল, "অসিতের খুব কাছাকাছি গিয়ে হাঁটবে। ওরা কী কথা বলছে, তা শোনার চেষ্টা করবে।"

কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। ওদের কাছাকাছি যেতেই অসিত সেই মহিলাকে নিয়ে একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল জলের ধারে। সেখানে একটা নৌকো থেমে আছে। নৌকোর মাঝির সঙ্গে দু-একটা কী কথা বলে ওরা নৌকোয় উঠে গেল, মাঝিটিও দড়ি খুলে দিল। সন্তু মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। এবার কী করা যায়? কাছাকাছি আর কোনও নৌকো নেই। একটু দূরেই গোটা দু-এক জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। অসিতদের নৌকোটা সেইদিকেই যাচ্ছে, একটু বাদেই জাহাজের আড়ালে চলে যাবে।

সেই সাদা রঙের গাড়িটাকে অনেকক্ষণ দেখেনি সন্তু। হঠাৎ কোথা থেকে খুব জোরে এসে থামল। কালো চশমা পরে লোকটি নেমে এসে দৌড়ে গঙ্গার ধারে রেলিং-এর কাছে গিয়ে দেখল অসিতদের নৌকোটা। মনে হল, এই লোকটাও খুব হতাশ হয়েছে। গাড়ি নিয়ে তো কোনও নৌকোকে ফলো করা যায় না। গঙ্গায় আরও অনেক নৌকো ভাসছে, কিন্তু এখানে ঘাটের কাছে একটাও নেই।

কালো চশমা-পরা লোকটা আবার ফিরে এল নিজের গাড়ির কাছে। একবার যেন সন্তুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। কিংবা অন্য কোনও কারণেও হাসতে পারে। তার গাড়িটা স্টার্ট নিয়েই ফুল স্পিডে চলে গেল হাওড়া ব্রিজের দিকে।

সন্তু ক্যামেরা বার করে নৌকোটার ছবি তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু শাটার টেপা গেল না। তার মানে ফিল্ম শেষ।

সন্তুর মনে হল, আর অসিতকে ফলো করা মানে বৃথা চেষ্টা। শুধু-শুধু গাড়ি-ভাড়া বাড়বে। নৌকো থেকে অসিত কোথায়

নামবে, তার কি কোনও ঠিক আছে ? গঙ্গার ওপারে চলে যেতে পারে।

গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভারটি জিজ্ঞেস করল, "এবার কোথায় যাব ? ট্যাক্সিটা তো চলে গেল, লোকটাকে এখন কোথায় পাবেন ?"

সন্তু ধমক দিয়ে বলল, "আপনাকে বলেছি না, কোথায় যাব, কেন যাব জিজ্ঞেস করবেন না। এখন আমার বাড়িতে চলুন।"

ড্রাইভারটি ধমক খেয়েও মজা করে বলল, "আপনার বাড়ি কোথায়, সেটা কি আমার জানার কথা ? আপনি কি রাজভবনে থাকেন ?"

সন্তু বলল, "সোজা চলুন। তারপর বাঁ দিকে।"

একদম বাড়ির সামনে না গিয়ে কাছাকাছি এসে গাড়িটাকে ছেড়ে দিল সন্তু। বাড়ি চিনিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ড্রাইভারকে আর কিছু টাকা দিতে হল।

সন্তুদের পাড়াতেই একটা ফোটোগ্রাফির দোকান আছে, সেখানে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিল্ম ডেভেলাপ করে প্রিন্ট দেয়। সন্তুর নতুন ক্যামেরা, তাই ছবিগুলো দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। ফিল্মের রোলটা খুলে সেখানে জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল সন্তু।

॥ ৮ ॥

কাকাবাবু সন্তুর প্রথম ফোন পাওয়ার পরই বেরিয়ে গিয়েছিলেন, দুপুরে আর বাড়িতে আসেননি। ফিরলেন প্রায় রাত আটটার সময়।

সারা দিনের রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সন্তু ছটফট করছিল। কাকাবাবু না ফিরলে সে বাড়ি থেকে বেরুতে পারছিল না। একবার শুধু দৌড়ে গিয়ে ছবিগুলো নিয়ে এসেছে। অনেকগুলো ছবিই উঠেছে বেশ ভাল।

কাকাবাবু ক্লান্ত হয়ে ফিরেছিলেন। প্রথমেই স্নান করলেন, তারপর নিজের ঘরে এক কাপ কফি নিয়ে বসার পর সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমি সকাল পৌনে দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত অসিত ধরকে ফলো করেছি, তারপর ওকে হারিয়ে ফেললাম। আর কোনও উপায় ছিল না। এতে কোনও কাজ হল কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "তুই আগাগোড়া দারুণ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিস। কোনও পেশাদার গোয়েন্দাও এত ভালভাবে কাজটা করতে পারত না।"

সন্তু বলল, "চুনির মালাটা যে অসিত ধর নিয়েছে, সেটা তো বোঝা গেছে। সেই মালাটা আছে গ্রিন ভিউ হোটেলে একটা মেয়ের কাছে। সেটা কী করে উদ্ধার হবে ?"

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন, "ও মালাটা নকল !"

সন্তু আঁতকে উঠে বলল, "অ্যাঁ ? নকল ? কী করে জানা গেল ?"

কাকাবাবু বললেন, "অসিত ধর অতি চালাক। ও জানত, ওকে ফলো করা হবে। তাই আগাগোড়া তোদের সঙ্গে মজা করেছে। বউবাজারে গয়নার দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, সেখানে সে কোনও মালা বিক্রি করেনি, কিছু কেনেওনি। চোরাই চুনির মালার জন্য সে-দোকান সার্চ করা হয়েছিল, সব কর্মচারীরা একবাক্যে বলেছে, ওরকম কোনও মালা দোকানে আসেনি। অসিত ওখানে কয়েকটা আংটি নিয়ে দর করছিল। শেষ পর্যন্ত কিছু কেনেনি অবশ্য ! ব্যাঙ্কে গিয়েও সে কোনও চেক কিংবা টাকা জমা দেয়নি, শুধু দু' হাজার টাকা তুলেছে। সেটা কিছুই না। থিয়েটার রোডে একটা বাড়িতে যে-ফ্ল্যাটে গিয়েছিল, সেই ফ্ল্যাটের মালিক অসিতের মামা হন। অসিত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেই ভদ্রলোক আগে পুলিশে কাজ করতেন, এখন রিটায়ার করেছেন। তাঁকে কোনওক্রমেই সন্দেহ করা যায় না।

সন্তু বলল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও ! অসিত ধর যে থিয়েটার রোডের একটা বাড়িতে গিয়েছিল, সেটা তো তোমাকে এখনও বলিনি। তুমি জানলে কী করে ?"

কাকাবাবু কয়েক পলক সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুই সাদা গাড়িটা দেখিসনি ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি ! ওটা কাদের গাড়ি ?"

"পুলিশের গাড়ি !"

"আমি তো ভেবেছিলাম গুণ্ডাদের। কালো চশমা-পরা লোকটাকে আমার গুণ্ডা মনে হয়েছিল !"

"অনেক সময় গুণ্ডা আর সাধারণ পুলিশদের চেহারার তফাত বোঝা যায় না। সাদা গাড়িতে সাদা পোশাকের পুলিশ ছিল।"

হঠাৎ সন্তুর খুব অভিমান হল। পুলিশই যদি সারাদিন অসিতকে ফলো করে যাবে, তা হলে সন্তুর এত কষ্ট করার কী দরকার ছিল ?

সন্তু অভিযোগের সুরে বলল, "পুলিশ ছিল, তা হলে কাকাবাবু, তুমি আমাকে পাঠালে কেন ?"

কাকাবাবু সন্তুর তোলা ছবিগুলো দেখতে-দেখতে বললেন, "পুলিশ যে যাবে, তা আমি আগে জানতাম না রে সন্তু। পুলিশ কমিশনার বলেছিল, অসিতের ব্যাপারে আমাকে কোনও সাহায্য করতে পারবে না। তবু সে গোয়েন্দা দফতরকে বলে অসিতের পেছনে লোক লাগিয়েছিল। আমি পরে জেনেছি। তোর যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেদিকেও নজর রেখেছিল পুলিশ। যাই হোক, তুই যেমনভাবে দেখেছিস, তেমনভাবে তো পুলিশ দেখতে পারে না। তুই আজ পাকা ডিটেকটিভের মতন কাজ করেছিস। পুলিশ তো এত ছবি তোলেনি !"

সন্তু তবু নিরাশ গলায় বলল, "চুনির মালাটা নকল ? আমি ভেবেছিলাম..."

কাকাবাবু বললেন, "আমি নিজে গ্রিন ভিউ হোটেলে সে মেয়েটির ঘরে গিয়ে দেখেছি। মেয়েটির নাম রাজিয়া। ওর মায়ের নাম নাজিয়া সুলতানা। ওরা লন্ডনে থাকে, কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। অসিত লন্ডনেই ওদের চেনে। মেয়েটিকে একটা মালা উপহার দিয়েছে, সেটা চুনি তো নয়ই, আসল পাথরও নয়, ঝুটো। তোদের ঠকাবার জন্যই অমনভাবে দেখিয়ে-দেখিয়ে অসিত মালাটা ওকে দিয়েছে।"

সন্তু বলল, "তা হলে অসিত ধর বীরভূমের সেই পুরনো বাড়ি থেকে কী চুরি করেছে, তা জানা গেল না ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ ! জানা গেল না। আমার মাথাতেও কিছুই আসছে না। হয়তো ও কিছুই চুরি করেনি। আগাগোড়াই আমাদের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করছে।"

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল এ-বাড়ির কাজের লোক রঘু। সাড়ে ন'টা প্রায় বাজে। সন্তু ভাবল, রঘু নিশ্চয়ই খেতে যাওয়ার জন্য তাড়া দিতে এসেছে।

রঘু বলল, "নীচে একজন ভদ্রলোক ডাকছে। ওপরে আসবার জন্য খুব পেড়াপিড়ি করছে !"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "এত রাতে আবার কে ওপরে আসতে চায় ! দেখে আয় তো, সন্তু !"

সন্তু নীচে চলে গেল। সদর দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি মারতেই সে দারুণ চমকে গেল। এরকম অবাক সে কখনও হয়নি।"

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অসিত ধর !

অসিত হেসে বলল, "তোমার নামই তো সন্তু, তাই না ? আজ সারাদিন কলকাতা দেখা হল কেমন ? মাঝে-মাঝে সারা শহরটা এরকম ঘুরে দেখা ভাল !"

সন্তুর মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরোল না।

অসিত সন্তুর মাথার চুলে হাত দিয়ে আদর করে বলল, "তুমি খুব ব্রাইট বয়। চলো, তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি !"

সন্তু প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতন অসিতকে নিয়ে এল ওপরে। অসিতের ব্যবহারের মধ্যে অপছন্দ করার কিছু নেই।

কাকাবাবুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অসিত বেশ নাটকীয়ভাবে বলল, "নমস্কার, মিঃ রায়চৌধুরী, নমস্কার। ভাল আছেন ? পায়ের ব্যথাটা কমেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "নমস্কার। আসুন, ভেতরে এসে বসুন।"

অসিত একটা সোফায় এসে বসল। এখানেও তার হাতে সেই কালো ব্যাগ। সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে বলল, "তা হলে কী ঠিক হল শেষ পর্যন্ত ? বোঝা গেল কিছু ? আমি বিমানদের বীরভূমের বাড়ি থেকে কিছু চুরি করেছি, না করিনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি হার স্বীকার করছি। আমি এখনও কিছু বুঝতে পারিনি। হয়তো আপনাকে মিথ্যে সন্দেহ করেছি।"

অসিত হা-হা করে খুব জোরে হেসে উঠল, তারপর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বলল, "আপনি হার স্বীকার করছেন তা হলে ? আপনি বিখ্যাত লোক, আপনি অনেক রহস্যের সমাধান করেছেন শুনেছি। আপনার মুখে হার-স্বীকারের কথা শোনাটা একটা নতুন ব্যাপার, কী বলুন ?"

কাকাবাবু বললেন, "নিজের ভুল স্বীকার করতে আমার কোনও লজ্জা নেই। আপনি তা হলে কিছু নেননি ওখান থেকে ?"

"হ্যাঁ, নিয়েছি !"

"নিয়েছেন ? সত্যি, কিছু নিয়েছেন ?"

"সে-কথা তো আপনার কাছে আগেই স্বীকার করেছি ! আসল প্রশ্ন ছিল, আমি কী নিয়েছি ? এবার বলে দিই ?"

"আগে বলুন, সে-জিনিসটা কোথায় লুকনো ছিল ?"

"হুঁ ! সেটাই বড় কথা। আগে অনেকেই খুঁজেছে। সব্বাই বোকা ! চোখ থাকলেও অনেকে অনেক জিনিস দেখতে পায় না। মিঃ রায়চৌধুরী, আপনার কি মনে আছে যে, বিমানকে আমি বলেছিলাম, তার পাগলা-ঠাকুর্দার ঘরের খাটের যে চারটে পায়া, সেগুলো বেশ দামি ?"

"সেই খাটের পায়াগুলো আমিও দেখেছি। কাঠের ওপর নানারকম কারুকার্য করা। সেগুলোর কিছু দাম পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই !"

"আপনি আসল ব্যাপারটাই দেখেননি, মিঃ রায়চৌধুরী। ও ঘরে ঢোকা মাত্র আমি চিনতে পেরেছিলাম। ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে বড় লোকেরা ওই ধরনের খাটের পায়া ব্যবহার করত দুশো-আড়াইশো বছর আগে। ওই খাটের পায়াগুলো মাঝখান থেকে খোলা যায়। ভেতরে গর্ত থাকে। সেই গর্তে বড়লোকেরা দামি-দামি জিনিস লুকিয়ে রাখত।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "আমার আবার পরাজয় ! অসিত ঠিকই বলেছে, খাটের পায়ার মধ্যে দামি জিনিস লুকিয়ে রাখার একটা প্রথা এক সময় ছিল ইউরোপে। বিমানরা তা জানে না। আমিও খেয়াল করিনি। কারণ আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আসল দামি জিনিস অসিত আগেই নিয়ে চলে গিয়েছে !"

অসিত বলল, "এমন কিছু দামি জিনিস নয়। নবাবের দেওয়া চুনির মালা-টালা যে একেবারে বাজে গপ্পো, তা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ? হিরে-জহরত নিয়ে যারা কারবার করে, তারা এসব খবর রাখে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এরকম চুনির মালার কথা কেউ শোনেনি। আমার ধারণা, নবাব সিরাজ যদি সেরকম কোনও মালা দিয়েও থাকেন, তা হলেও ও-বাড়ির কোনও পূর্ব পুরুষ পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেই সেটা বিক্রি করে দিয়েছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। অমন একটা মালা ও-বাড়ির দূর সম্পর্কের আত্মীয় এক পাগলের ঘরে থাকা সম্ভব নয় !"

অসিত বলল, "কিন্তু ওই ধরনের খাটের পায়া দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, ভেতরে কিছু লুকনো আছে ! খাটটা বেশ ভারী, সেটা তুলে পায়াগুলো খুলে দেখতে গেলে অনেকটা সময় লাগবে। সেইজন্যই আপনাকে ও-ঘর থেকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল, তাই আপনাকে আমি একটা আছাড় খাইয়েছিলাম। আমি দুঃখিত। তবে, আপনার যে অত জোরে লাগবে, পায়ের আধখানা নখ উড়ে যাবে, তা আমি বুঝিনি। ভেবেছিলাম, আপনার মাথায় খানিকটা চোট লাগবে, সবাই আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে !"

কাকাবাবু বললেন, "তাই-ই হয়েছিল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। বিমানরা ব্যস্ত হয়ে আমাকে ও-ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, ডাক্তার ডাকল..."

অসিত বলল, "সেউ সুযোগে আমি নিরিবিলিতে ঘরখানা ভাল করে খুঁজলাম, খাটের পায়া চারটেও খুলে দেখলাম।"

এবার অসিত কালো ব্যাগটা খুলে বার করল একগাদা পুরনো কাগজ। সেগুলো গোল করে গোটানো।

কাগজগুলো কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে অসিত বলল, "এগুলো বাজে কাগজ নয়। নানারকম জমির দলিল। বিমানবাবুকে পড়ে দেখতে বলবেন। হয়তো উনি আরও কিছু সম্পত্তি পেয়ে যেতে পারেন। ওঁর মামাদের যে অন্য জায়গাতেও জমিটমি ছিল, তা বোধ হয় উনি জানতেন না !"

কাকাবাবু একটা দলিল খুলে দেখলেন।

অসিত বলল, "তিনখানা খাটের পায়ায় এইসব দলিল ছিল। আর একখানায়..."

অসিত কোটের পকেটে হাত দিয়ে বার করল দুটো কাগজের মোড়ক। একটাতে রয়েছে চারখানা ছোট ক্রস। ক্রিশ্চান পাদ্রিরা যেগুলো গলায় ঝোলান।

অসিত বলল, "ধুলো জমে গেলেও এগুলো সোনার তৈরি। একটার পেছনে লেখা রয়েছে সেন্ট জোসেফ চার্চ, গোয়া। মনে হয়, বিমানবাবুর পাগলা-দাদুর গুরু ছিলেন যে পাদ্রি, তাঁর জিনিস।"

আর-একটা কাগজের মোড়ক খুলে অসিত জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কি চিনতে পারছেন ?"

কাকাবাবু মোড়কটি হাতে নিলেন। সন্তু পাশ থেকে হুমড়ি খেয়ে দেখে বলে উঠল, "এগুলো তো পুঁতি !"

অসিত হেসে বলল, "ছাদের ওই ঘরটায় অনেক ঝিনুক ছিল, পুঁতির মালা ছিল মনে আছে ? পাগলের খেয়াল, অত পুঁতির মালা জমিয়ে তিনি হয়তো অন্যদের ঠকাতে চাইতেন। কিন্তু এগুলো পুঁতি নয়, খাঁটি মুক্তো !"

কাকাবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, "মুক্তো ? এত ছোট-ছোট ?"

অসিত বলল, "হ্যাঁ, মুক্তো। আমি গয়নার দোকানে দেখিয়েছি। পুরনো খবরের কাগজ খুললে দেখতে পাবেন, বছর চল্লিশেক আগে গোয়ার সমুদ্রের ধারে কিছু-কিছু ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো পাওয়া যাচ্ছিল। তাই নিয়ে হইচই হয়েছিল খুব। দলে-দলে লোক ছুটে গিয়েছিল গোয়ায়। সবাই ঝিনুক কুড়োতে শুরু করল। বিমানের পাগলা-দাদুটিও ঝিনুক কুড়িয়েছিলেন অনেক। এই বারোটা মুক্তো তিনি পেয়েছিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "সেইজন্যই ঘরে অত ঝিনুক !"

অসিত বলল, "মুক্তো পেয়ে তিনি ঝিনুকগুলোও ফেলেননি। চার-পাঁচশো ঝিনুক খুললে একটা মুক্তো পাওয়া যেত ! তবে, এগুলো মুক্তো হলেও কিন্তু তেমন দামি নয়। জাপানে এরকম মুক্তো অনেক পাওয়া যায়। এক-একটার দাম বড়জোর পাঁচশো টাকা।"

কাকাবাবু বললেন, "পাগলা-দাদু এগুলো কাউকে দিয়েও যাননি, কেউ খুঁজেও পায়নি !"

অসিত বলল, "তা হলে এগুলো আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার ?"

কাকাবাবু বললেন, "অবশ্যই। বিমানরা এগুলোর অস্তিত্বই জানে না। কাঠের পায়াগুলো এমনিই বিক্রি করে দিত কোনও কাঠের মিস্তিরির কাছে। সুতরাং এগুলো তোমারই প্রাপ্য !"

অসিত কালো ব্যাগটা বন্ধ করে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আমি চোর নই। অন্যের জিনিস আমি নেব কেন ? এই চারটে সোনার ক্রস আর বারোটা মুক্তোর দাম বেশ কয়েক হাজার টাকা তো হবেই। এর কিছু আমি চাই না। এগুলো আপনি সব বিমানবাবুদের দিয়ে দেবেন !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি দেব কেন ? তুমিই নিজে দিয়ে এসো।"

অসিত বলল, "আপনি দিলে আপনিও খানিকটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব পাবেন। আপনি বলবেন যে, আপনি সন্দেহ করেছিলেন বলেই আমি এগুলো ফেরত দিয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো কৃতিত্ব চাই না। আমি তো স্বীকারই করছি যে, আমি তোমার কাছে হেরে গিয়েছি।"

অসিত বলল, "তবু এগুলো আপনার কাছেই থাক। বিমানবাবুর সঙ্গে দেখা করার আমি সময় পাব না।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অসিত সন্তুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

সন্তুর কাঁধে চাপড় মেরে বলল, "জানি, এই ছেলেটির মনের মধ্যে এখন কোন্ কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। ও ভাবছে, খাটের পায়ার মধ্যে আরও কিছু ছিল কি ? আরও কোনও দামি জিনিস সেটা আমি নিয়ে পালাচ্ছি !"

সন্তু ঠিক সেই কথাটা ভাবছিল, তাই লজ্জা পেল।

অসিত বলল, "কী হে সন্তু, আমায় সার্চ করে দেখবে নাকি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না ! এই দামি জিনিসগুলো তুমি নিজে থেকে ফেরত দিয়ে গেলে। অন্য কেউ হলে হয়তো দিত না। কেউ কিছু জানতেও পারত না।"

অসিত বলল, "খাটের পায়ার মধ্যে অন্য আর কিছু ছিল না। এটা একেবারে ধ্রুব সত্য। এ-বিষয়ে আমি ওয়ার্ড অব অনার দিয়ে যাচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই !"

অসিত বলল, "এবার আমি চলি ! আপনাকে নিয়ে আমি খানিকটা মজা করেছি, এই ছেলেটাকে আজ সারাদিন কলকাতা শহরে ঘুরপাক খাইয়েছি। এজন্য আশা করি আমার ওপর রাগ পুষে রাখবেন না। তবে, আপনার পায়ের ওই আঘাতটার জন্য আমি দুঃখিত। সত্যি দুঃখিত ! একদিন আসবেন আমাদের বাড়িতে। অনেক পুরনো-পুরনো জিনিস আছে, দেখে আপনার ভাল লাগবে। আচ্ছা, নমস্কার !"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই ওকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়।"

অসিত হাসিমুখে বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে লাগল।

এই লোকটা কাকাবাবুকে হারিয়ে দিয়ে গেল, কাকাবাবু কিছুই করতে পারলেন না, এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না সন্তু। এরকম আগে কোনওদিন হয়নি। লোকটা অতি ধুরন্ধর।

সদর দরজাটা বন্ধ রয়েছে। আর পাঁচখানা সিঁড়ি মাত্র বাকি, এই সময় সন্তু তাড়াহুড়ো করে আগে যাওয়ার ভান করে অসিতের পায়ে পা দিয়ে একটা ল্যাং মারল।

অসিত ধড়াম করে আছাড় খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। তার হাত থেকে ছিটকে গেল কালো ব্যাগটা।

সন্তু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ইস, কী হল ? আপনার লাগল ? ইস, ছি-ছি-ছি, আমি দেখতে পাইনি। আমি ভাবলুম, আগে গিয়ে

দরজাটা খুলে দেব।"

অসিতের বেশ লেগেছে। তার নাক দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছে। আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে সে রুমাল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল।

কালো ব্যাগটা খুলে গিয়েছে। তার থেকে বেরিয়ে এসেছে শুধু একটা বই। আর কিছু নেই। সন্তু নিজেই ব্যাগটা তুলে নিয়ে একবার ঝাড়ল। লোকটা সত্যি কথাই বলেছে তা হলে, ব্যাগে আর কিছু লুকিয়ে রাখেনি।

অসিত চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "তোমার কাকাবাবুকে আমি আছাড় খাইয়েছিলাম, তুমি আমাকে ফেলে দিয়ে তার শোধ নিলে, তাই না ? স্মার্ট বয়। ঠিক আছে, এজন্য তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।"

বইটা কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরল অসিত। বেরিয়ে এল রাস্তায়। এ-বেলাও সে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ট্যাক্সিতে উঠে অসিত বলল, "কাটাকুটি তো ? এর পর নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধুত্ব হবে !"

ট্যাক্সিটা স্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে সন্তু উঠে এল কাকাবাবুর ঘরে।

কাকাবাবু সন্তুর তোলা ছবিগুলো মন দিয়ে দেখছেন। টেব্‌ল ল্যাম্প জ্বেলে একখানা ছবি ভাল করে দেখার জন্য সেই আলোর নীচে ধরলেন। জুতোর দোকানে সন্তু যে ছবি তুলেছিল, তার একটা। ছবিটা খুব স্পষ্ট। দোকানে অনেক ভিড়, তার মধ্যে বসে অসিত বই পড়ে যাচ্ছে।

ড্রয়ার থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে কাকাবাবু ছবিটাকে আরও বড় করে দেখতে লাগলেন। আপনমনে বললেন, "লোকটার সত্যিই খুব বুদ্ধি, না রে সন্তু ? আমাদের একেবারে জব্দ করে দিয়ে গেল। জিনিসগুলো পর্যন্ত ফেরত দিয়ে গেল ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, অসিত ধর নিজেও কি ক্রিশ্চান ? সব সময় বাইবেল নিয়ে ঘোরে কেন ?"

কাকাবাবু যেন শুনতেই পেলেন না সন্তুর কথাটা। তিনি ছবিটার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন।

সন্তু বলল, "আমি সারাদিন ওকে ওই বইটা পড়তে দেখেছি। খুব ভক্ত ক্রিশ্চান !"

কাকাবাবু হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "অ্যাঁ ? কী বললি ?"

সন্তু বলল, "অসিত ধর কি ক্রিশ্চান ? এইমাত্র ওর ব্যাগটা খুলে গেল, দেখলাম শুধু একটা বাইবেল..."

কাকাবাবু বিস্ফারিত চোখে সন্তুর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন। হাতের ছবিটা আবার দেখলেন।

তারপর নিজের গালে পটাশ করে এক চড় মেরে বললেন, "হোয়াট আ ব্লাডি ফুল আই অ্যাম !"

তারপর প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, "সন্তু, লোকটা চলে গেল ? শিগগির চল, ওকে ধরতে হবে !"

ক্রাচ না নিয়ে কাকাবাবু লাফিয়ে বেরোতে যাচ্ছিলেন, সন্তু তাড়াতাড়ি ক্রাচ দুটো ওঁর বগলে গুঁজে দিল। কাকাবাবু সিঁড়ি দিয়ে এমনভাবে হুড়মুড়িয়ে নামতে লাগলেন, সন্তুর ভয় হল উনি পড়ে না যান।

রাস্তায় এসেই কাকাবাবু চিৎকার করে বললেন, "ট্যাক্সি ! শিগগির একটা ট্যাক্সি ডাক।"

রাত প্রায় দশটা বাজে। এখন সহজে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। হাজরার মোড়ের দিকে যেতে হবে। কাকাবাবুর এত ধৈর্য নেই। অস্থিরভাবে বলতে লাগলেন, "আঃ দেরি হয়ে যাচ্ছে, যে-কোনও উপায়ে একটা ট্যাক্সি···"

এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামল ওদের সামনে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমান জিজ্ঞেস করলেন, "কাকাবাবু, কোথায় যাচ্ছেন ?"

বিমানকে দেখে খুশি হওয়ার বদলে কাকাবাবু বললেন, "ইডিয়েট !"

নিজেই দরজা খুলে গাড়িতে উঠে পড়ে ধমকে বললেন, "শিগগির চলো, এলগিন রোড।"

বিমান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কেন ? কী হয়েছে ?"

কাকাবাবু আবার বললেন, "তুমি একটা আস্ত গবেট। পাগলা-দাদুর ঘরটা অতবার খুঁজে দেখেছিলে, কিন্তু অত একটা দামি জিনিস যে চোখের সামনে পড়ে আছে, তা বুঝতে পারোনি ? যার দাম কয়েক কোটি টাকা !"

বিমানের পাশে-বসা দীপা প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, "অ্যাঁ ? কয়েক কোটি টাকা ? সেই চুনির মালা ?"

কাকাবাবু বললেন, "মালা না ছাই ! সে মালা পাওয়া গেলেও তার দাম হত কয়েক হাজার মাত্র। আর এর দাম দশ কোটি টাকা তো হবেই। শুধু টাকা দিয়েও এর দাম কষা যায় না !"

বিমান বলল, "কী জিনিস ? কী জিনিস ?"

কাকাবাবু বললেন, "আগে অসিতের বাড়ি চলো !"

বিমান গাড়ির স্পিড দারুণ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "কী জিনিস, কাকাবাবু, বলুন, বলুন !"

কাকাবাবু বললেন, "একখানা বাইবেল !"

দীপা যেন অগাধ জলে পড়ে গিয়ে বলল, "বাইবেল ? তার আবার অত দাম হয় নাকি ? পাগলা-দাদুর ঘরে তো অনেকগুলো বাইবেল ছিল ?"

এবার সন্তু ফিসফিস করে বলল, "গুটেনবার্গ বাইবেল ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই দ্যাখো, সন্তুও জানে। অথচ তোমরা জানো না ?"

দীপা বলল, "গুটেনবার্গ বাইবেল কী রে, সন্তু ? আমরা তো জানি বাইবেল বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। তা হলে ওটার অত দাম কেন ?"

সন্তু বলল, "গুটেনবার্গ বাইবেল হল পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম ছাপা বই। আমি এনসাইক্লোপিডিয়াতে পড়েছি, সে বাইবেল এখন পাওয়া যায় না। সেই বাইবেল পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস। কালেক্টারস আইটেম। কিছুদিন আগে একখানা পাওয়া গিয়েছিল, লন্ডনে নিলামে সেটার দাম উঠেছিল দশ কোটি টাকা।"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথম ছাপা বই নয়। সাহেবদের অনেক আগে জাপান আর কোরিয়ার লোকেরা কাঠের ব্লক দিয়ে বই ছাপা শিখেছিল।"

বিমান বলল, "আমি যতদূর জানি, ইউরোপে প্রথম বই ছাপে ক্যাক্সটন।"

কাকাবাবু বললেন, "সে তো ইংল্যান্ডে। গুটেনবার্গ তারও আগে। জোহান গুটেনবার্গ ছিলেন একজন জার্মান। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন মেটাল টাইপ। সেই টাইপ সাজিয়ে বই ছাপা। এতকাল তাই-ই চলেছে। গুটেনবার্গ ছিলেন সত্যিকারের প্রতিভাবান। কিন্তু তাঁর টাকাপয়সা ছিল না। অন্যের কাছ থেকে ধার করে একটা প্রেস বানিয়েছিলেন। নিজের আবিষ্কার করা টাইপ দিয়ে মাত্র কয়েকখানা বাইবেল ছাপার পরেই তাঁর প্রেস বিক্রি হয়ে যায়। ১৪৫৫ সালে সেই প্রথম ছাপা কয়েকখানা বাইবেল পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ বই।"

দীপা প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতন ঢলে পড়ে গিয়ে বলল, "দশ কোটি টাকা ? ওঃ ওঃ ওঃ ! আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল ?"

বিমান বলল, "পাগলা-দাদুর ঘরে আরও অনেক বাইবেলের সঙ্গে গুটেনবার্গ বাইবেল মিশে ছিল ? আমরা চিনব কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "অসিতের অভিজ্ঞ চোখ। এক নজর

দেখেই চিনেছে। ল্যাটিন ভাষায় লেখা, প্রত্যেক পাতার নীচে হাতে আঁকা রঙিন ছবি।"

বিমান বলল, "আমার পাগলা-দাদু ওই বাইবেল পেলেন কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "গোয়া। সেই জোসেফ চার্চ। আমার আগেই মনে পড়া উচিত ছিল। ওই বাইবেলের এক কপি গোয়ার সেন্ট জোসেফ চার্চে সযত্নে রাখা ছিল। অনেক বছর আগে সেটা রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে যায়। অনেক বইতে এ-কথা লেখা আছে। খুব সম্ভবত তোমার পাগলা-দাদুর যিনি গুরু ছিলেন, তিনি সেটা সরিয়েছিলেন। বিক্রি করতে পারেননি কিংবা চাননি। তিনি মারা যাওয়ার পর সেটা তোমার পাগলা-দাদুর কাছে আসে।"

রাত্তিরবেলা ফাঁকা রাস্তা, গাড়ি চলছে দারুণ জোরে। এলগিন রোড প্রায় এসে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "অসিতের কী সাহস, আমার বাড়িতে, আমার সামনে সেই বাইবেল নিয়ে বসে ছিল। অন্য জিনিসগুলো ফেরত দেওয়ার নাম করে ধোঁকা দিয়ে গেল আমাকে। সন্তু যদি জুতোর দোকানে অত ভাল ছবি না তুলত, আর বাইবেলের কথা না বলত, তা হলে আমিও কিছুই বুঝতে পারতাম না! ছবিতে অসিতের হাতে যে-বই, সেই পাতাটার ছবি আমি আগে দেখেছি।"

সন্তু বলল, "সারাদিন ও বাইবেলটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছে। কেউ কিছু সন্দেহ করেনি।"

গাড়িটা জোরে ব্রেক কষলো অসিতের বাড়ির সামনে। সবাই হুড়মুড় করে নামল গাড়ি থেকে।

সদর দরজা বন্ধ। তিনতলায় আলো জ্বলছে না। বিমান ঘন-ঘন বেল বাজাতেই দোতলার বারান্দা থেকে একজন বলল, "কে?"

বিমান বলল, "দরজাটা খুলে দিন, পুলিশ।"

লোকটি এসে দরজা খুলতেই সবাই তাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

এত গোলমাল শুনে তিনতলায় ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে কাজের লোকটি।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "বাবু কোথায়? অসিতবাবু?"

লোকটি অবাক হয়ে বলল, "বাবু তো চলে গিয়েছে।"

"কোথায়?"

"বিলেত চলে গিয়েছেন, বাবু!"

"বিলেত গিয়েছেন? কখন?"

"সাড়ে আটটার সময় সুটকেস নিয়ে চলে গেলেন।"

কাকাবাবু ততক্ষণে ঢুকে পড়েছেন ফ্ল্যাটের মধ্যে। সন্তুও সব ঘর খুঁজে দেখল। অসিত ধর কোথাও নেই।

কাকাবাবু বললেন, "এখান থেকেই সে আমার বাড়িতে গিয়েছিল। তারপর চলে গিয়েছে। রাত সাড়ে বারোটার সময় এয়ার ইন্ডিয়ার একটা ফ্লাইট আছে দমদম থেকে। এখনও গেলে তাকে ধরা যেতে পারে।"

সন্তু বলল, "আর যদি ট্রেনে বম্বে কিংবা দিল্লি যায়? সেখান থেকে প্লেনে ওঠে? আজ ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়েছিল!"

কাকাবাবু বললেন, "ট্রেনে গেলে এখন তাকে ধরার কোনও উপায় নেই। বম্বে-দিল্লি এয়ারপোর্টে জানিয়ে দিতে হবে। তার আগে দমদম গিয়ে একবার দেখা যাক। হয়তো ট্রেনের টিকিট কাটাও তার ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা।"

সবাই দুমদাম করে নেমে এল নীচে। গাড়িতে উঠেই বিমান বলল, "সবাই সিট ধরে বসে থাকো। আমি খুব জোরে চালাব। হঠাৎ ব্রেক কষলে ঝাঁকুনি লাগবে।"

দীপা বলল, "অ্যাকসিডেন্ট কোরো না। মরে গেলে আর অত টাকা পেয়েই বা লাভ কী হবে?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "বাইবেলটা পাওয়া গেলেও তার টাকা তোমরা পাবে না!"

বিমান বলল, "আগে তো জিনিসটা উদ্ধার করা হোক। তারপর ওসব চিন্তা করা যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "বইটা একবার দেশের বাইরে নিয়ে গেলে আর উদ্ধারের কোনও আশা নেই। এ-দেশের কাস্টমস বা পুলিশের লোকেরা ও-বই দেখে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ।"

বাকি রাস্তা প্রায় কেউ কোনও কথা বলল না। গাড়ি ছুটল ঝড়ের বেগে। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল এয়ারপোর্টে।

বিদেশের যাত্রীরা যেখান থেকে চেক ইন করে, সেখানে বাইরের লোকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। কাকাবাবু সেই গেটের কাছে যেতেই একজন বন্দুকধারী রক্ষী তাঁকে আটকাল। কাকাবাবু তাকে ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করতেই আর একজন রক্ষী এসে বলল, "কী করছেন? আপনাকে অ্যারেস্ট করা হবে!"

এইসব সাধারণ রক্ষী কাকাবাবুকে চেনে না। জোর করে ভেতরে ঢোকা যাবে না।

খানিকটা দূরেই দেখা গেল, সিকিউরিটি চেকের লাইন। তার সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে অসিত। সে-ও কাকাবাবুদের দেখতে পেল। তার মুখে কোনও ভয়ের ছাপ ফুটল না। বরং সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে সে একটা হাত তুলে কাকাবাবুর উদ্দেশে বলল, "টা-টা!"

তারপর সে ঢুকে গেল ভেতরে।

এখনও কিছুটা সময় আছে। একবার প্লেন ছেড়ে গেলে আর কিছু করা যাবে না।

কাকাবাবু একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেন, "এয়ারপোর্টে যে এস· পি থাকেন, তাঁর নাম নজরুল ইসলাম না? নামটা আমার মনে আছে।"

পুলিশটি বলল, "হ্যাঁ।"

"সেই নজরুল ইসলাম সাহেব কোথায়?"

"তিনি কোয়ার্টারে আছেন।"

"শিগগির একবার তাঁকে ডাকুন। বিশেষ দরকার।"

"কী দরকার আমাকে বলুন! যে-কেউ বললেই কি আমাদের বড় সাহেবকে এয়ারপোর্টে আসতে হবে?"

প্রতিটি মিনিট মূল্যবান। অকারণ তর্ক করে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।

কাকাবাবু এবার একটা ক্রাচ তুলে সাঙ্ঘাতিক রাগের সঙ্গে বললেন, "এবার আমি ক্রাচ ভাঙব, অনেক কিছু ভেঙে হাঙ্গামা বাধাব, তখন এস· পি-কে আসতেই হবে। যান, নজরুল ইসলামকে বলুন, আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। আমি পুলিশ কমিশনারের বন্ধু। আমার বিশেষ প্রয়োজনে ডাকছি। শিগগির যান।"

কাকাবাবু এবার একটা টেলিফোন বুথে পুলিশ কমিশনারকে ফোন করলেন বাড়িতে। তিনি বাড়িতে নেই। এক জায়গায় নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছেন। সেখানকার টেলিফোন নাম্বার জানিয়ে দিয়েছেন বাড়িতে।

সেই নাম্বারে ফোন করলেন কাকাবাবু। একজন লোক ধরে বলল, "হ্যাঁ, তিনি আছেন, ডেকে দিচ্ছি।"

তারপর আর কেউ আসে না। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। ধৈর্য হারিয়ে কাকাবাবু বারবার ক্রাচটা ঠুকছেন মাটিতে। বাড়ি থেকেই এই ফোনটা করা উচিত ছিল, তখন মনে পড়েনি।

একটু পরে একজন বলল, "হ্যালো।"

পুলিশ কমিশনারের গলা চিনতে পেরেই কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "এখানে এত বড় একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে, আর তুমি আরাম করে নেমন্তন্ন খাচ্ছ?"

পুলিশ কমিশনার হেসে বললেন, "আরে, রাজা, কী ব্যাপার বলো আগে! নেমন্তন্ন খেতে এসে কী দোষ করলাম ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেই অসিত ধর, তুমি তো তখন বিশ্বাস করোনি, সে একটা দশ কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ নিয়ে পালাচ্ছে !"

কমিশনার বললেন, "অ্যাঁ! দশ কোটি টাকা! ঠিক বলছ ? আমি এক্ষুনি চলে আসব এয়ারপোর্টে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আসতে-আসতে পাখি উড়ে যাবে। প্লেন ছাড়বে এক্ষুনি। দরকার হলে ওকে প্লেনের ভেতরে গিয়েও গ্রেফতার করতে হবে। সেই ব্যবস্থা করো।"

এই সময় নজরুল ইসলাম চলে এলেন সেখানে। তিনি বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আমি তো আপনাকে চিনি। কী ব্যাপার বলুন তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই ফোনে কথা বলুন !"

পুলিশ কমিশনার কী সব নির্দেশ দিতে লাগলেন, আর নজরুল ইসলাম বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ সার! না সার! ইয়েস সার। অবশ্যই সার !"

ফোন রেখে দিয়ে তিনি কাকাবাবুকে বললেন, "চলুন !"

অন্যদের সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে নজরুল ইসলাম কাকাবাবুকে তুলে নিলেন নিজের জিপে। সেই জিপ চলে এল এয়ারপোর্টের টারম্যাকে।

বিশাল প্লেনটা দাঁড়িয়ে আছে বেশ খানিকটা দূরে। সিঁড়ির কাছে লাইন দিয়েছে যাত্রীরা। অসিতের সামনে দশ-বারোজন রয়েছে।

জিপটা একেবারে কাছে এসে থামল। কাকাবাবু নেমে গিয়ে অসিতের কাঁধে হাত দিয়ে শান্তভাবে বললেন, "বইটা দাও !"

অসিত মুখ ফিরিয়ে বলল, "শেষ পর্যন্ত বুঝেছেন তা হলে ? অনেক দেরি হল, তাই না ? আমি এক্ষুনি প্লেনে উঠব। আমাকে আটকাবার কোনও ক্ষমতা আপনার নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "বইটা জাতীয় সম্পত্তি। একশো বছরের বেশি পুরনো কোনও বই দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় না। এটা বেআইনি !"

নজরুল ইসলাম বললেন, "আপনি লাইন থেকে বেরিয়ে আসুন। বইটা না দিলে আপনাকে অ্যারেস্ট করব।"

অসিত এবার কটমট করে দু'জনের দিকে তাকাল। তারপর ব্যাগটা খুলে বইটা হাতে নিয়েই ব্যাগটা ছুড়ে মারল কাকাবাবুর মুখে।

কাকাবাবু এরকম কিছুর জন্য তৈরি ছিলেন, ব্যাগটা তাঁর মুখে লাগল না, তার আগেই লুফে নিলেন সেটা।

অসিত ফস করে পকেট থেকে একটা লাইটার বার করে চিৎকার করে বলল, "দেব না। বইটা পুড়িয়ে ফেলব। দেব না !"

গণ্ডগোল দেখে ভয়ে অন্য যাত্রীরা ছিটকে সরে গেল দূরে! দু'জন সিকিউরিটি গার্ড রাইফেল তুলল। নজরুল ইসলামও রিভলভার বার করে উঁচিয়ে ধরলেন অসিতের দিকে।

অসিত বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠল, "খবর্দার! আমার কাছ থেকে কাড়তে এলেই এটা আমি পুড়িয়ে শেষ করে দেব। নষ্ট করে দেব।"

নজরুল ইসলাম বললেন, "আপনি পাগল নাকি ? আমি যদি গুলি করি। এক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি শেষ হয়ে যাবেন। বইটার কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, গুলি করার কোনও দরকার নেই। আমি জানি, অসিত কিছুতেই ও বই নষ্ট করবে না। ও বইয়ের মর্ম অসিত জানে। দাও, অসিত, বইটা আমাকে দাও।"

অসিত বলল, "দেব না, দেব না, কিছুতেই দেব না। এটা আমার আবিষ্কার! আমি ছাড়া কেউ খুঁজে পায়নি। এত বছর ধরে পড়ে ছিল।"

কাকাবাবু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "দাও, অসিত বইটা দাও !"

অসিত বলল, "কাছে এলে আমি আপনাকে শেষ করে দেব। খুন করব।"

কাকাবাবু তবু আর-একটু এগিয়ে বললেন, "দাও, অসিত! আমি জানি, তুমি মানুষ খুন করতে পারো না।"

অসিত এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। কাঁদতে-কাঁদতে বসে পড়ল মাটিতে। বইটা ছুড়ে দিল সামনের দিকে।

কাকাবাবু বইটা তুলে নিয়ে কপালে ছোঁয়ালেন।

তারপর নজরুল ইসলামের হাতে বইটা দিয়ে বললেন, "সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বইটা আপনাকে দিলাম। এটা সারা দেশের সম্পদ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে জমা থাকবে, সব মানুষ দেখতে পাবে।"

তারপর তিনি অসিতের হাত ধরে বললেন, "ওঠো, অসিত। তুমিই এটা আবিষ্কার করেছ। আবিষ্কারক হিসেবে তোমার নামই লেখা থাকবে। তোমার জন্যই তো আমরা এটা পেলাম।"

অসিতকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কাকাবাবু।

সর্দির জন্য

মাথার যন্ত্রনায়

গাঁটের ব্যথায়

স্নায়ু পীড়ায়

নানা মলমে করে যা, একা করে

ইউথেরিয়া

একাই একশ।

কেননা ইউথেরিয়া এমন এক বিশেষ ফরমূলায় তৈরী যা শুধু মাথাব্যথা বা সর্দিতেই চটপট আরাম দেয় না, গাঁটের ব্যথা, পেশীর যন্ত্রনার দাওয়াই হিসেবেও অব্যর্থ। যেমন বড়দের তেমনি ছোটদের ত্বকেও ইউথেরিয়া শতকরা একশভাগ নিরাপদ। তাই, হাতের কাছেই রাখুন ইউথেরিয়া— পরিবারের প্রতিরক্ষা।

ব্যথা বেদনায় চটজলদি পারিবারিক প্রতিরক্ষা

বেঙ্গল কেমিক্যালস্ এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ

(ভারত সরকারের উদ্যোগ)

ASP/BCPL-2/89

ছুটির অ্যালবাম

রত্নাকর

এখন আকাশ একেবারে নীল, মাঝে-মাঝে সাদা মেঘের নৌকো ভেসে চলেছে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে। শিশিরের বিন্দু সকালবেলার রোদে ঘাসের মাথায় হিরের কুচির মতো চকচক করছে। কাশফুলের সাদায় হেসে ছত্তির হয়ে যাচ্ছে মাঠের পর মাঠ। শিউলিতলায় সকালবেলা এত সাদা ফুল ছড়িয়ে আছে যে, দেখে মনে হচ্ছে গত রাত্রে বুঝি বরফ পড়েছিল! সেই বরফের কিছু-কিছু এখনও ছড়িয়ে আছে বুঝি শিউলিতলায়, সকালের সোনালি রোদ্দুর গায়ে মাখবে বলে। আর ক'দিন পরেই তোমাদের স্কুলে ছুটির ঘণ্টা পড়ে যাবে। পুজোর ছুটি। অঙ্কের খাতা, ভূগোলের মানচিত্র, ইতিহাসের সাল-তারিখ, বাংলা ব্যাকরণের সন্ধি-সমাসরা সব্বাই বেড়াতে চলে যাবে খেয়ালখুশির দেশে। এমনকী, তোমাদের ছোট ভাইবোনেদের বইয়ের দশকিয়া-শতকিয়া, ঐক্য-বাক্য-মাণিক্যেরাও চুপটি করে খেলাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবে পুতুলদের রকমসকম। তার মানে ছুটি, শুধুই আনন্দ। আর এই অনাবিল আনন্দের সঙ্গে আমরাও তোমাদের পুজোর ছুটিকে ভরিয়ে দিতে চাই পরিপূর্ণ আনন্দে। তাই আমাদের এই 'ছুটির অ্যালবাম'-এর পরিকল্পনা। প্রথমেই বলে রাখি, তোমরা কিন্তু আগেভাগেই এইসব মজার-মজার খেলার সমাধান দেখে নিয়ো না। নিজেরা চেষ্টা করো মাথা খাটিয়ে সঠিক সমাধান বের করতে। তবেই না আনন্দ!

ক্রিকেট মাঠের কথা বাদ দিয়েও তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই, বড়রা অনেকেই নানা ধরনের টুপি পরেন। আর তোমরা ছোটরাও নানারকমের, নানা রঙের টুপি পরো। বাজারে তোমাদের জন্য রয়েছে হাজাররকমের টুপি। তোমাদের জন্য এই যে ধাঁধানো ছবি,
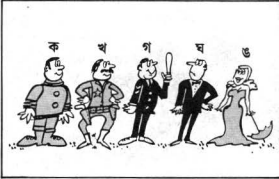
এতে দ্যাখো রয়েছে মোট পাঁচটি টুপি। ওপরে যে পাঁচজন মানুষের ছবি রয়েছে, তাদের পোশাক-আশাক দেখে তোমাকে ঠিক করতে হবে কোন টুপিটি কার? একদম তাড়াহুড়ো না করে ভেবেচিন্তে বলো দেখি!

এখন আর চাঁদ নিয়ে রূপকথার দিন নেই। মানুষ কবে তার আপন বুদ্ধিবলে চাঁদ থেকে ঘুরে এসেছে। কিন্তু চাঁদ নিয়ে একটা মজার খেলা খেলতে তো কোনও মানা নেই। তবে একটা গোটা গোল চাঁদ নিয়ে নয়। আমরা এই খেলাটার নাম দিতে পারি 'আধখানা চাঁদের খেলা'। তবে একটা আধখানা চাঁদ নয়, দুটো আধখানা চাঁদ নিয়ে এই খেলাটার পরিকল্পনা। খেলাটা খুবই সোজা, একটু চেষ্টা করলেই
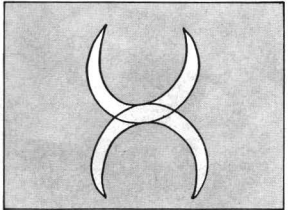
করে ফেলতে পারবে। কাগজ থেকে পেনসিল না তুলে এবং একই লাইনের ওপর দিয়ে দু'বার লাইন না টেনে এই দুটো আধখানা চাঁদের ছবি এঁকে ফেলতে হবে। খেলাটা এতই সোজা যে, তাই আর এর কোনও সমাধান দিলাম না। তুমি চেষ্টা করলেই পারবে। আর তুমি যখন পেরে যাবে, তারপর বন্ধুদের করতে বলবে।

(সমাধান ৫১৬ পাতায়)

ছবির অ্যালবাম

রত্নাকর

তোমরা সবাই গল্প শুনতে খুব ভালবাস। গল্প শুনতে শুরু করলে আর উঠতেই চাও না। শুধুই প্রশ্ন করো, "তারপর কী হল ? তারপর কী হল ?" এই দেখেই তো মা-ঠাকুমারা আদর করে তোমাদের বলেন, 'গল্প শোনার পোকা'। এই খেলায় একটি ছোট্ট গল্প আছে। গল্পটা আমি বলছি না আগেভাগে। আমি শুধু চারটি
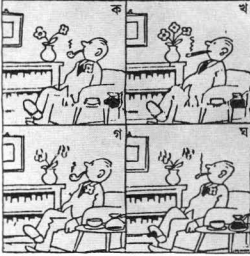
ছবি তুলে দিলাম। ছবিগুলো কিন্তু গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সাজানো নেই। যদি তুমি ছবিগুলো ঠিকভাবে সাজাতে পারো তা হলে একটা ছোট্ট গল্প পেয়ে যাবে ছবিটি থেকে। দ্যাখো চেষ্টা করে।

হকি খেলাও দারুণ মজার। তোমরা অনেকেই হকি খেলো পাড়ার মাঠে। এখন হকি খেলা নিয়েই তৈরি করেছি এই মজার খেলাটা। তোমাদের সামনে দ্যাখো মোট পাঁচজন হকি-খেলোয়াড়ের হকি-স্টিক হাতে বল মারতে উদ্যত ছবি। বাঁ দিকে যে কালো ছবিটি রয়েছে, এই ছবিটি আসলে ওই পাঁচজন হকি-খেলোয়াড়ের মধ্যে একজনের ছায়া। এই ছায়াটি ক, খ, গ, ঘ—কোন হকি খেলোয়াড়ের, চটপট বলো দেখি !
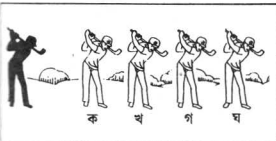
অঙ্ক নিয়ে একটা খেলা হোক এবার। অঙ্কে তোমরা অনেকেই একশোর মধ্যে একশো পাও। তোমাদের অনেকেরই আবার সবচেয়ে ভাল লাগে অঙ্ক করতে। যারা অঙ্কের মজা চটপট ধরতে পারো তারা সব সময়ই এইরকম দারুণ-দারুণ অঙ্কের খেলাই পছন্দ করবে। এবার অঙ্কের খেলাটা হল, তিনটে বর্গক্ষেত্রের একটি করে সেট তৈরি করা হয়েছে। এরকম তিনটে সেট রয়েছে। প্রত্যেক সেটের বর্গক্ষেত্রগুলির মধ্যে নানারকম সংখ্যা বসানো আছে। কিন্তু সব সংখ্যাই একটা নিয়ম মেনে রয়েছে। কী সেই নিয়ম, তা বলব না। মাথা খাটিয়ে তোমাকে বের করতে হবে ডান দিকের সেটটির মধ্যের ফাঁকা বর্গক্ষেত্রের মধ্যে কোন সংখ্যাটি বসবে।
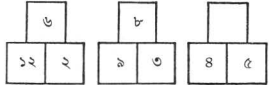
৪

এখন যে খেলাটা খেলব, সেটি হল বৃত্তের খেলা। তোমরা তো বৃত্ত আঁকতেই পারো। এখন দ্যাখো, ছবিটিতে ক, খ, গ—তিনটি টুকরো। প্রথম করতে হবে কি, তিনটি টুকরোকে কেটে পাতলা বোর্ডের সঙ্গে সেঁটে নাও আঠা দিয়ে, তারপর ভালভাবে কেটে নাও। ব্যস, এবার খেলাটা তৈরি। এই তিনটি টুকরোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন তিনটি বৃত্ত তৈরি হয়। না, না,
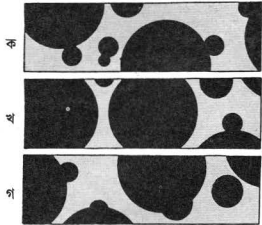
খেলাটা আদৌ কঠিন নয়। বেশ তো, তোমাদের সুবিধের জন্য একটা সূত্র দিয়ে রাখছি চুপিচুপি। সূত্রটি হল— যে তিনটি বৃত্ত পাওয়া যাবে, সেই বৃত্ত তিনটি কিন্তু একই মাপের হবে না।

(সমাধান ৫১৬ পাতায়)

ভূতপ্রেতের সঙ্গে
শিমুলগড়ের পুরনো
"আমার নাম
ছায়াময়
আজ অমাবস্যা
চন্দ্র সূর্য
কথার নড়চড়
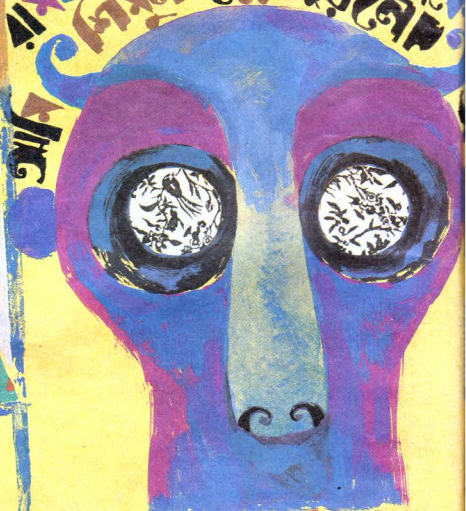
সম্পূর্ণ উপন্যাস

ছায়াময়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পেশকার গগন সাঁপুইয়ের বাড়িতে মাঝরাতে এক চোর ধরা পড়ল। চোরকে চোর, তার ওপর আবার আহাম্মকও। পালানোর অনেক পথ ছিল। সাঁপুইবাড়ি হচ্ছে শিমুলগড় গাঁয়ের পুব প্রান্তে, তারপরই দিক-দিগন্ত খোলা। মাঠ-ময়দান-জঙ্গল-জলা। কে খুঁজতে যেত সেখানে! তা না করে আহাম্মকটা গগন সাঁপুইয়ের লাকড়ির ঘরে সেঁদিয়ে বসে ছিল।

এক হিসাবে চোরটাকে ভালই বলতে হবে। গুলি-বন্দুক, ছোরা-ছুরি বা লাঠি-সোঁটা বের করেনি, সেসব ছিলও না তার কাছে। দুরবস্থায় পড়েছে—তাই দেখলেই বোঝা যায়। গায়ে একটা নীল ছেঁড়া হাফশার্ট, আর পরনে একখানা তালিমারা পাতলুন। পায়ে ফুটোফাটা একজোড়া কেড্‌স জুতো। দু'হাতে একখানা চামড়ার থলি জাপটে ধরে বসে ছিল।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

গগনের বন্দুক আছে, গোটা কয়েক পাইক আছে, তিন-তিনটে জোয়ান ছেলে আছে, দুটো বাঘা দিশি সড়ানে কুকুর আছে। আহাম্মক না হলে সাঁপুইবাড়িতে চোর ঢোকে কখনও ? মাঝরাতে চেঁচামেচি শুনে গাঁয়ের লোক জড়ো হল। তবে বাইরের লোকের সাহায্য দরকার হল না। গগনের পাইকরাই লাকড়ির ঘর থেকে চোরটাকে টেনে বের করল।

গাঁয়ের মাতব্বরদের দেখে গগন আপ্যায়ন করে বলল, "আসুন, আসুন আপনারা। দেশের অরাজকতাটা একবার স্বচক্ষে দেখে যান। এই সুভাষ বোস, গান্ধীজি, সি. আর. দাশ, মাইকেল, মাতঙ্গিনী হাজরা, রবি ঠাকুরের দেশের কী হাল হয়েছে দেখুন। আইন শৃঙ্খলার কী নিদারুণ অবনতি ; এ যে দিনে ডাকাতি ! এ যে পুকুরচুরি ! তবে হ্যাঁ, ধর্মের কল আজও বাতাসে নড়ে। যেমন কর্ম তেমন ফল—মহাকবির এই বাণী আজও মিথ্যে হয়ে যায়নি। বাতাসে কান পাতলে আজও শুনতে পাবেন ভগবানের দৈববাণী, 'সাধু সাবধান ! সাধু সাবধান' !"

পটল গাঙ্গুলি বিচক্ষণ মানুষ, গঞ্জের সবাই খুব মানে। উঠোনের ওপর গগনের এগিয়ে দেওয়া কাঠের চেয়ারে জুত করে বসে হ্যাজাকের আলোয় চোরটাকে ভাল করে দেখলেন। নিতান্তই অল্প বয়স। কুড়ি-বাইশের বেশি হবে না। চেহারাটা একসময়ে হয়তো মন্দ ছিল না, কিন্তু অভাবে, কষ্টে একেবারে চিম্‌সে মেরে গেছে। গাল-বসা, চোখের কোলে কালি। পটল বললেন, "ও গগন, তা চোরে তোমার নিল কী ?"

"সেসব তো এখনও হিসাব কষে মিলিয়ে দেখা হয়নি। তবে একটা থলি দেখতে পাচ্ছি।"

"থলিতে কী আছে ?"

গগন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "কী আর থাকবে। গরিবের যথাসর্বস্ব। যা কিছু তিলতিল করে জমিয়ে তুলেছিলাম, বুকের বিন্দু-বিন্দু রক্ত জল করে আমার দুধের বাছাদের জন্য যে খুদকুঁড়োর ব্যবস্থা রেখে যেতে চেয়েছিলাম, তার সবটুকুই তো ওই থলিতে। হক্কের ধন মেসো, ধর্মের রোজগার, তাই ব্যাটা পালাতে পারেনি।"

নটবর ঘোষ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "থলিটা রেখেছিলে কোথায় ?"

গগন মাথা নেড়ে বলল, "থলি আমার নয়। দামি চামড়ার জিনিস। মনে হচ্ছে, ছোকরা থলিটা কোনও বাড়ি থেকে চুরি করে এনেছে।"

হেডসার বিজয় মল্লিক বললেন, "কী কী চুরি গেছে তা কি হিসাব করে দেখেছ ?"

গগন মাথা নেড়ে বলে, "দেখার সময় পেলুম কই ! যা-কিছু সরিয়েছে তা ওই থলির মধ্যেই আছে মনে হয়। তবে সঙ্গে কোনও শাগরেদ ছিল কি না বলতে পারি না। যদি তার হাত দিয়ে কিছু চালান করে দিয়ে থাকে তবে আলাদা কথা। সেসবও হিসাব করে খতিয়ে দেখতে হবে।"

গগনের লোকেরা আরও দুটো হ্যাজাক জ্বেলে নিয়ে এল। বিয়েবাড়ির মতো রোশনাই হল তাতে। সেই আলোয় দেখা গেল, চোর-ছেলেটা ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। মুখে বাক্য নেই। দুটো পাইক বাঘা হাতে তার দুটো কনুইয়ের কাছে চেপে ধরে আছে। হুকুম পেলেই তারা ছোকরার ওপর ডলাইমলাই রদ্দা-কিল শুরু করতে পারে।

তার সুযোগও এসে গেল হঠাৎ। বলা নেই কওয়া নেই, রোগা চোরটা হঠাৎ হাঁচোড়পাঁচোড় করে পাইক দুটোর হাত ছাড়িয়ে ঝটকা মেরে পালানোর ক্ষীণ একটা চেষ্টা করল যেন। পারবে কেন ? পাইক দুটোর বজ্রমুষ্টি ছাড়ানোর সাধ্যই তার ছিল না, আর ছাড়ালেও চারদিকে ত্রিশ-চল্লিশজন মানুষের বেড়া ভেদ করবেই বা সে কী করে ? তার এই বেয়াদবিতে পাইক দুটো দু'দিক থেকে

এখনই দেখে বলছি ধর্ম

তার কোমরে আর পিঠে এমন দু'খানা হাঁটুর গুঁতো দিল যে, ছোকরা ককিয়ে উঠে যন্ত্রণায় বসে পড়ল মাটিতে। পাইক দুটো এত অল্পে খুশি নয়, তারা দু'দিক থেকে পর পর ক'খানা রদ্দা বসাল তার ঘাড়ে। ছোকরা একেবারেই নেতিয়ে পড়ল এবার। চোখ উলটে গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

গগন সাঁপুই শশব্যস্তে বলল, "ওরে করিস কী ঃ থাক, থাক, মারধর করিসনি। চোর ধরা আমাদের কাজ বটে, কিন্তু তার বিচার আর শাসনের ভার আমাদের ওপর নেই রে বাবা। সেসব সরকারবাহাদুর বুঝবেন, আর বুঝবেন গাঁয়ের মোড়লরা। আমাদের কী দরকার পাপের বোঝা ভারী করে ? গাঁয়ের মান্যগণ্য মানুষেরা এসেছেন, পরিস্থিতিটা তাঁদের বিচার করতে দে।"

বলতে-বলতে গগন সাঁপুই সজ্ঞাহীন ছেলেটির শিথিল হাতের বাঁধন থেকে অতি সাবধানে থলিটা তুলে নিল। বেশ ভারী থলি। গগনকেও বেশ কসরত করতে হল থলিখানা তুলে নিতে। থলির ভিতরে ধাতব জিনিসের ঝনৎকার শুনে নটবর ঘোষ কৌতূহলী হয়ে বলে উঠল, "দেখি-দেখি, কী আছে থলিতে !"

গগন জিভ কেটে মোলায়েম হেসে বলে "ওই অনুরোধটি করবেন না নটবরখুড়ো। চারদিকে শত্রুর কুনজর। এত জোড়া চোখের সামনে আমি এ জিনিস খুলে দেখাতে পারব না। কাল সকালের দিকে আসবেন, এক ফাঁকে দেখিয়ে দেব'খন। তেমন কিছু নয়, গরিবের বাড়িতে আর কীই-বা থাকবে।"

বিজয় মল্লিক আমতা-আমতা করে বললেন, "তবু একবার দেখে নেওয়া ভাল হে গগন। থলিতে অন্য বাড়ির চোরাই জিনিসও তো থাকতে পারে। তখন আবার তুমি ফেঁসে যাবে।"

"যে আজ্ঞে। এখনই দেখে বলছি ধর্মত ন্যায্যত আমারই জিনিস কি না। ওরে ভুতো, টর্চটা একটু ধর তো থলির মুখটায়।"

ভুতো টর্চ ধরল। গগন সাঁপুই থলির মুখটা একটু ফাঁক করে উঁকি মেরেই বলে উঠল, "নিয্যস আমারই জিনিস বটে মশাইরা। এ-সবই আমার বুকের রক্ত জল করে জোগাড় করা। ওরে, তোরা ছোকরার চোখে-মুখে জল দিয়ে লাকড়ির ঘরেই পুরে রাখ।"

ঠিক এই সময়ে ভিড়ের ওদিক থেকে একটা 'ববম্-ববম্' শব্দ উঠল। শব্দটা সকলেরই চেনা। এ-হল গে কালী কাপালিক। তবে কিনা গেঁয়ো যোগী, ভিখ পায় না, কালী কাপালিককেও এই গঞ্জ এলাকার কেউ বিশেষ মানে না। কালী একসময়ে ছিল কালীচরণ গোপ। বাজারের সত্যচরণের মুদির দোকানে কাজ করত। চুরি ধরা পড়ায় সত্যচরণ তাড়িয়ে দেয়, কালীর বাবা নরহরিও তাকে ত্যজ্যপুত্তুর করে। কালী নাকি তারপর তন্ত্র শিখতে কামাখ্যা চলে যায়। কয়েক বছর হল ফিরেছে। পরনে রক্তাম্বর, মাথায় জটা, মুখে পেল্লায় দাড়ি-গোঁফ। বাড়িতে ঠাঁই হয়নি। এখন বটতলার পুরনো ইটভাঁটার কাছে আস্তানা গেড়ে আছে। শাগরেদও আছে কয়েকজন। কেউ পাত্তা না দিলেও কালী গঞ্জের সব ব্যাপারেই নাক গলায়। মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। সে শাপশাপান্ত করে, বাণ-টান মারে, তবে তাতে বিশেষ কারও ক্ষতি হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

ভিড় ঠেলে পেল্লায় চেহারার কালী সামনে এসে দাঁড়াল। কোমরে হাত দিয়ে ভূপতিত চোরের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "হুঁ, সন্ধেবেলাতেই ছোকরাকে সাবধান করে বলে দিয়েছিলুম, ওরে আজ অমাবস্যা, তায় তোর গ্রহবৈগুণ্য আছে, আজ বাড়ি যা। তা শুনল না। নিয়তি কেন বাধ্যতে। চন্দ্র-সূর্য এদিক-ওদিক হয়, কিন্তু কালী কাপালিকের কথার নড়চড় হওয়ার জো নেই।"

পটল গাঙ্গুলি ভ্রূ কুঁচকে বলে, "চিনিস নাকি ওকে?"

কালী পটল গাঙ্গুলিকে একটু সমঝে চলে। অনেককাল আগে এই পটল গাঙ্গুলির একটা গোরু নিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়ে দু'আনা

জামদানী
টাঙ্গাইল
বেগমপুরী
ধনেখালি
সূতী ও
সিল্ক শাড়ী
এবং ড্রেস
মেটেরিয়ালস্

পয়সা রোজগার করে শিবরাত্রির মেলায় শোনপাপড়ি খেয়েছিল। তার ফলে খুব খড়ম-পেটা হয়েছিল গাঙ্গুলির হাতে। আজও ব্যথাটা কপালের বাঁ ধারে চিনচিন করে। কালী গলাখাঁকারি দিয়ে বলে, "চিনব কী করে! সন্ধেবেলা এসে আমার আস্তানায় ভিড়ে পড়েছিল। বলছিল, কোথাও যাওয়ার আছে যেন। একটু রাত করে বেরোবে। সন্ধেটা কাটিয়ে যেতে চায়। সঙ্গে ওই একখানা চামড়ার ব্যাগ ছিল।"

পটল গাঙ্গুলি বলে উঠল, "ওই ব্যাগটা কি, দ্যাখ তো।"

কালী গগনের হাতের ব্যাগখানা দেখে বলল, "ওইটেই, ভিতরে বেশ ভারী জিনিস আছে। ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল।"

গগন সাঁপুই অমায়িক হাসি হেসে বলল, "ভুল দেখেছ কালী। ব্যাগের মধ্যে তখন জিনিস-টিনিস ছিল না, তবে এখন হয়েছে। ওরে ভুতো, ব্যাগখানা তোর মায়ের হেফাজতে দিয়ে আয় তো!"

ভুতো এসে ব্যাগটা নিয়ে যেতেই বিজয় মল্লিক বলল, "গগন, পুলিশে একটা খবর পাঠানো ভাল।"

গগন মাথা নেড়ে বলে, "যে আজ্ঞে, সকালবেলাতেই ভল্টাকে পাঠিয়ে দেব'খন ফাঁড়িতে। ও নিয়ে ভাববেন না।"

কালী কাপালিক গগনের দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে হঠাৎ ফিচিক করে একটু হেসে বলল, "গগনবাবু, তোমার লাল গোরুটা শুনেছি ভাল দুধ দিচ্ছে আজকাল। সকালের দিকে আমার রোজ আধসেরটাক দুধ লাগে। বুঝেছ!"

গগন একটু অবাক হয়ে বলে, "দুধ! হঠাৎ এই মাঝরাতে চোরের গোলমালে দুধের কথা ওঠে কেন রে কালী?"

"ওঠাও বলেই ওঠে। কাল সকাল থেকেই বরাদ্দ রেখো। আমার এক চেলা ঘটি নিয়ে আসবে।"

গগন ঠাট্টার হাসি হেসে বলল, "শোনো কথা! ওরে যা-যা, এখন বিদেয় হ। দুধের কথা পরে ভেবে দেখা যাবে।"

কালী কাপালিক একটা হাঃ-হাঃ অট্টহাসি হেসে বলল, "আরও কথা আছে হে গগনচন্দ্র সাঁপুই। ইটভাঁটার পাশে বটতলার আস্তানাটা অনেকদিন ধরে বাঁধিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে। ভগবান তো তোমায় মেলাই দিয়েছেন। কালী কাপালিকের জন্য এটুকু করলে আখেরে তোমার ভালই হবে। বুঝলে?"

এই চোর ধরার আসরে দুধ আর আস্তানা বাঁধানোর আবদার কালী কেন তুলছে তা কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তবে কালীর সাহসটা যে বড্ড বেড়েছে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আগে তো গঞ্জের পুরনো লোকেদের কারও মুখের ওপর এরকম বেয়াদবি গলায় কথা বলত না!

পটল গাঙ্গুলি বেশ চটে গিয়ে বললেন, "ওরে কালী, তোর হঠাৎ হলটা কী? এ যে আরশোলাও হঠাৎ পক্ষী হয়ে উঠল দেখছি!"

গগন সাঁপুই কাতর কণ্ঠে বলল, "দেখুন, আপনারাই দেখুন, কী অবিচারটাই না আমার ওপর হচ্ছে। এত বড় একটা চুরির ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই আবার..."

কালী আরও একটা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভিড়ের পেছন থেকে একটা বাজখাঁই গলা বন্দুকের মতো গর্জে উঠল, "অ্যাই বোকা, দূর হ এখান থেকে!"

গলাটা কালী কাপালিকের পচাঁশি বছর বয়সী বাবা হরনাথের। কালী আজও তার বাপকে যমের মতো ভয় পায়। এক ধমকেই সে সুড়সুড় করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে একটু চাপাস্বরে গগনকে বলে গেল, "আজ যাচ্ছি, কিন্তু কাল আবার দেখা হবে।"

চোর ধরার পর্ব একরকম শেষ হয়েছে। চোরটাকে পাইকরা আবার ধরাধরি করে লাকড়ির ঘরে তুলে নিয়ে গেল। একে-একে লোকেরা ফিরে যাচ্ছে। পটল গাঙ্গুলি আর বিজয় মল্লিকও উঠে পড়লেন।

নটবর ঘোষ যাওয়ার আগে বলল, "তোমার বাড়িতে কী করে যে চোরটা ঢুকল সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। এ তো বাড়ি নয়, দুর্গ।"

কাঁচুমাচু মুখে গগন বলল, "নিত্যানন্দ ঘোষালের জমির ওই বেলগাছটাই যত নষ্টের গোড়া। দেখুন না, ওই তো দেখা যাচ্ছে। আগে এত বাড়বাড়ন্ত ছিল না গাছটার, এবার হয়েছে। গাছের ডাল বেয়ে এগিয়ে ওই খড়ের গাদায় ঝাঁপ খেয়ে পড়েছিল বোধহয়। আপনারা সবাই মিলে বলে-কয়ে বুঝিয়ে গাছটা কাটিয়ে ফেলতে ঘোষালকে রাজি করান। আমি অনেক বলেছি, ঘোষাল কথাটা কানেই তোলে না।"

"বেলগাছ কাটতে নেই হে বাপু। তুমি বরং আরও একটু সজাগ থেকো। এক চোর যখন ঢুকেছে, আরও চোর এল বলে।"

লোকজন সব বিদেয় হয়ে যাওয়ার পর গগন সাঁপুই পাইকদের ডেকে বলল, "ওরে, আর দেরি নয়, ছোকরার জ্ঞান ফেরার আগেই ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে রথতলার মাঠে রেখে আয়। থানা-পুলিশের হাঙ্গামা কে করতে যাবে বাবা! জ্ঞান ফিরলে বাছাধন আপনিই চম্পট দেবে'খন। যা-যা, তাড়াতাড়ি কর। একটু চুপিচুপি কাজ সারিস বাবা, কেউ টের পেলে আবার পাঁচটা কথা উঠবে।"

লক্ষ্মণ পাইক একটু হতাশ হয়ে বলল, "ছেড়ে দেবেন! এই চোরটার পেট থেকে যে অনেক কথা টেনে বের করা যেত। চোরদের পেছনে দল থাকে। পুরো দলটাকেই ধরা যেত তা হলে!"

গগন ঘনঘন মাথা নেড়ে বলে, "ওরে বাবা, চন্দ্র-সূর্য যতদিন আছে পৃথিবীতে চোর-ছ্যাঁচড়ও ততদিন থাকবে। কত আর ধরবি? আমি শান্তিপ্রিয় লোক, চোর ধরে আরও গোলমালে পড়তে চাই না। আপদ বিদেয় হলেই বাঁচি। চল, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।"

লক্ষ্মণ পাইক বলবান লোক। একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "লোক-লশকর লাগবে না, বড়বাবু। আপনাকেও সঙ্গে যেতে হবে না। চোরটা একেবারেই হালকা-পলকা। আমি একাই কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে রেখে আসছি।"

"তাই যা বাবা, পাঁচটা টাকা বকশিশ পাবি।"

লক্ষ্মণ পাইক লাকড়ির ঘরে ঢুকে রোগা ছেলেটার সংজ্ঞাহীন দেহটি বাস্তবিকই ভাঁজ করা চাদরের মতো ডান কাঁধে ফেলে রওনা হল। রথতলার মাঠ বেশি দূরে নয়। রায়বাবুদের আমবাগান পেরোলেই বাঁশঝাড়। তারপরেই রথতলা। জোরকদমে হাঁটলে পাঁচ মিনিটের রাস্তাও নয়।

নিশুত রাত। চারদিক নিঝুম। লক্ষ্মণের বাঁ হাতে টর্চ। মাঝে-মাঝে আলো ফেলে সে অন্ধকার বাঁশঝাড়টা পেরিয়ে রথতলায় পৌঁছে গেল। চারধারে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ছোকরাকে হড়াম করে ফেলে দিল ঘাসের ওপর।

ফিরে যাওয়ার আগে লক্ষ্মণ অন্ধকারে একটু দাঁড়িয়ে রইল। তার মাথাটা যদিও নিরেট এবং ভাবনা-চিন্তা তার মাথায় বিশেষ খেলে না, তবু এখন সে এই ছোকরার কথাটা একটু ভাবছে। এই মাঠে পড়ে থাকলে একে সাপে কাটতে পারে, শেয়ালে কামড়াতে পারে, ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করতে পারে। লক্ষ্মণ তার মনিবের হুকুম তামিল করেছে বটে, কিন্তু তার মনটা কেন যেন খুঁত-খুঁত করছে।

একটু আনমনা ছিল লক্ষ্মণ, হঠাৎ ঘোর অন্ধকার থেকে একটা লম্বা হাত এগিয়ে এসে তার কাঁধে আলতোভাবে পড়ল।

"কে রে শয়তান?" বলে লক্ষ্মণ বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে তার বিশাল হাতে একখানা মোক্ষম ঘুসি চালাল। ঘুসিটা কোথাও লাগল

না। উলটে বরং ঘুসির তাল সামলাতে না পেরে লক্ষ্মণ নিজেই বেসামাল হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তখন দু'খানা লোহার মতো হাত তাকে ধরে তুলল। কে যেন বলল, "ঘাবড়ে যেয়ো না, মাথা ঠাণ্ডা করো। কথা আছে।"

কেমন যেন ফ্যাসফেসে গলা। সাপের শিসের মতো। শুনলে ভয়-ভয় করে। লক্ষ্মণ একটু ঘাবড়ে গিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

"সে কথা পরে হবে।"

লক্ষ্মণ টের পেয়েছে, লোকটার গায়ে বেজায় জোর। তার চেয়েও বেশি। সে সতর্ক গলায় বলল, "কথা কিসের? আমাকে এখনই ফিরতে হবে। দাঁড়ান, টর্চটা পড়ে গেছে, তুলি।"

"টর্চটা আমার পায়ের নীচে আছে। যাওয়ার সময় পাবে। কিন্তু যাওয়ার আগে কয়েকটা কথার জবাব দিয়ে যেতে হবে।"

"আপনি বোধহয় এই চোরটার শাগরেদ!"

"হতেও পারে। এখন বলো তো, ওকে এখানে ফেলে যাওয়ার মানেটা কী?"

"গগনবাবু বললেন তাই ফেলে যাচ্ছি। তিনি পুলিশের হাঙ্গামা চান না। তাঁর দয়ার শরীর, ছোকরাকে পালানোরও পথ করে দিলেন। জ্ঞান ফিরে এলে চলে যাবে।"

লোকটা হাত-দুই তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। তবে বেশ লম্বা চেহারা এটা বোঝা যাচ্ছে। লোকটা ফ্যাসফেসে রক্ত-জল-করা সেই গলায় বলল, "ও যে চোর তা ঠিক জানো?"

লক্ষ্মণ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "নিয্যস চোর। চোরাই জিনিস অবধি পাওয়া গেছে।"

"কী জিনিস?"

"তা আমি জানি না। গগনবাবু জানে।"

"রাত-পাহারায় কি তুমি ছিলে?"

"আমি আর শম্ভু।"

"চোর কীভাবে ঢুকল জানো?"

"বেলগাছের ডাল বেয়ে এসে খড়ের গাদায় লাফিয়ে নামে। কুকুরগুলো তখনই চেঁচাতে শুরু করে। আমরাও লাঠি আর বল্লম নিয়ে দৌড়ে যাই।"

"গিয়ে কী দেখলে?"

"কিছু দেখিনি। তবে খড় ছিটিয়ে পড়ে ছিল। কুকুরগুলো লাকড়ির ঘরের দিকে দৌড়ে গেল।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? বাড়ির সবাই উঠে পড়ল। চেঁচামেচি হতে লাগল। চোরও ধরা পড়ে গেল।"

"তা হলে চোরটা চুরি করল কখন?"

"তার মানে?"

"খড়ের গাদায় লাফিয়ে নামতেই কুকুরগুলো চেঁচিয়ে ওঠে, তোমরাও তাড়া করে গেলে, বাড়ির লোকও উঠে পড়ল আর চোর গিয়ে ঢুকল লাকড়ির ঘরে। এই তো! তা হলে চুরি করার সময়টা সে পেল কখন? চুরি করতে হলে দরজা বা জানলা ভাঙতে হবে বা সিঁদ দিয়ে ঘরে ঢুকতে হবে, তারপর আবার সিন্দুক ভাঙাভাঙি আছে। তাই না?"

লক্ষ্মণ একটু জব্দ হয়ে গেল। তারপর বলল, "কথাটা ভেবে দেখিনি। চুরিটুরিও করিনি কখনও।"

"তুমি এ-গাঁয়ে নতুন, তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এই মোটে ছ'মাস হল গগনবাবুর চাকরিতে ঢুকেছি।"

"গগন কেমন লোক তা জানো?

"আজ্ঞে না। জানার দরকারই বা কী? যার নুন খাই তারই গুণ গাই।"

"খুব ভাল কথা। কিন্তু বিনা বিচারে ছেলেটাকে মারধর করা কি ঠিক হয়েছে?"

লক্ষ্মণ মাথা চুলকে বলল, "ছোকরা পালানোর চেষ্টা করছিল যে!"

"তোমার গায়ে বেশ জোর আছে। যেসব রদ্দা মারছিলে তাতে রোগা ছেলেটা মরেও যেতে পারত। মরে গেছেও হয়তো।"

লক্ষ্মণ জিভ কেটে বলে, "আজ্ঞে না। মরেনি। শ্বাস চলছে। বুকও ধুকধুক করছে।"

"ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো। তবে আমার সঙ্গে যে তোমার কথা হয়েছে তা যেন কাকপক্ষীতেও টের না পায়।"

আমতা-আমতা করে লক্ষ্মণ বলে, "কিন্তু আপনি কে?"

"আমি এ-গাঁয়ের এক পুরনো ভূত। দশ বছর আগে মারা গেছি।"

লক্ষ্মণের মুখে প্রথমটায় বাক্য সরল না। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "কী যে বলেন! জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছি, মানুষ।"

"না, দেখতে পাচ্ছ না। যা-দেখছ তা ভুল দেখছ। এই যে টর্চটা নাও। সরে পড়ো।"

॥ ২ ॥

আঙুল দিয়ে বাতাসে আঁকিবুকি কাটা আর বিড়বিড় করা রামবাবুর পুরনো স্বভাব। বাতাসে আঁকিবুকি করে কী লেখেন কেউ জানে না, অনেকে বলে, 'আঁক কষেন।' অনেকে বলে, 'ছবি আঁকেন। অনেকে বলে, 'ভূতপ্রেতের সঙ্গে সঙ্কেতে কথা কন।' দু-চারজন বলে, 'ওটা হচ্ছে ওর বায়ু।' আসল কথাটা অবশ্য পুরনো দু-চারজন লোকেরই জানা আছে। রামপদ বিশ্বাস যৌবনে হাত-টাত দেখে বেড়াতেন। ভাল করে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন

করবেন বলে কাশীতে গিয়ে এক মস্ত জ্যোতিষীর শাগরেদি করতে থাকেন। বেশ শিখে ফেলেছিলেন শাস্ত্রটা। হঠাৎ একদিন নিজের জন্মকুণ্ডলীটা গ্রাম থেকে আনিয়ে বিচার করতে বসলেন। আর তখনই চক্ষুস্থির। গ্রহ-সংস্থান যা দেখলেন তাতে তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ অতীব অন্ধকার। এ-কোষ্ঠীতে কিছুই হওয়ার নয়। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানাভাবে বিচার করলেন। কিন্তু যা দেখলেন তাতে ভরসা হওয়ার মতো কিছু নেই। হতাশ হয়ে তিনি হাল ছাড়লেন বটে, কিন্তু কোষ্ঠীর চিন্তা তাঁর মাথা থেকে গেল না। দিনরাত ভাবতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে কাগজে, তারপর দেওয়ালে বা মেঝেতেও নিজের ছকটা এঁকে একমনে চেয়ে থাকতেন। বিড়বিড় করে বলতেন, "নাঃ, রবি অত নীচস্থ···ইস, শনিটাও যদি এক ঘর তফাত হত···মঙ্গলটার তো খুবই খারাপ অবস্থা দেখছি··· !" সেই থেকে রামবাবুর মাথাটা একটু কেমন-ধারা হয়ে গেল। যখন হাতের কাছে কাগজ-কলম বা দেওয়াল-টেওয়াল জোটে না তখন তিনি বাতাসেই নিজের কোষ্ঠীর ছক আঁকতে থাকেন আর বিড়বিড় করেন। তবে নিজের কোষ্ঠীর ফলটা খুব মিলে গেছে তাঁর। কিছুই হয়নি রামবাবুর, ঘুরে-ঘুরে বেড়ান আর বিড়বিড় করেন আর বাতাসে আঁকিবুকি কাটেন।

তবু রামবাবুর কাছে পাঁচটা গাঁ-গঞ্জের লোক আসে এবং যাতায়াত করে। তার কারণ, রামবাবু মাঝেমধ্যে ফস্ করে এমন এক-একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেন যা অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যায়। তাঁর মুখ থেকে যদি কখনও ওরকম এক-আধটা কথা বেরিয়ে পড়ে সেই আশায় অনেক দূর-দূর থেকে লোক এসে তাঁর বাড়িতে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকে। এই তো মাত্র বছর-দুই আগে ফটিক কুণ্ডুর দেউলিয়া হওয়ার দশা হয়েছিল। ফটিক রামবাবুর বাড়ির মাটি কামড়ে দিন-রাত পড়ে থাকত। অবশেষে একদিন রামবাবু রাত বারোটায় বাতাসে ঢ্যাঁড়া কাটতে-কাটতে ঘরের বাইরে এলেন। বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে ফটিক বসে-বসে মাথায় হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। রামবাবু তার দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "ফটিক, বাড়ি যাও। পরশুদিন বেলা বারোটার মধ্যে খবর পেয়ে যাবে।"

শশব্যস্তে ফটিক বলল, "কিসের খবর ?"

"যে খবর পাওয়ার জন্য হাঁ করে বসে আছ। যাও, ভাল করে খেয়েদেয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোওগে। রাহু ছেড়েছে, বৃহস্পতির বাঁকা ভাব সোজা হয়েছে, আর চিন্তা কী ?"

রামবাবুর কথা একেবারে সোনা হয়ে ফলল। পরের-পরের দিন দশটা নাগাদ ফটিকের লটারি জেতার খবর এল। দু'লাখ টাকা। এখন ফটিকের পাথরে পাঁচ কিল। সেই টাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে এখন ফলাও অবস্থা, বোল-বোলাও ব্যাপার।

চৌধুরীবাড়ির নতুন জামাই এক দুপুরে শ্বশুরবাড়িতে খেতে বসেছে। রামবাবু রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে সোজা জামাইয়ের সামনে হাজির। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "চৌধুরীমশাই, দিব্যি জামাইটি হয়েছে আপনার। ফরসা রং, রাজপুত্তুরের মতো মুখ, টানা-টানা চোখ, দু'খানা হাত, কিন্তু পা কি একখানা কম ?"

নগেন চৌধুরী এমনিতেই রামবাবুকে পছন্দ করেন না, তার ওপর তাঁর এই উটকো আগমনে তিনি চটে গিয়ে বললেন, "একখানা পা মানে ? খোঁড়া-খুঁতো জামাই শস্তায় ঘরে এনেছি বলে ভাবছ ? নগেন চৌধুরী অত পিচেশ নয়। নগদ দশটি হাজার টাকা বরপণ, একখানা মোটর সাইকেল, রেডিও, চল্লিশ ভরি সোনা, আলমারি, ফার্নিচার····বুঝলে ! জামাই শস্তায় হয়নি। বাইরে তোমরা কেপ্পন বলে আমার বদনাম রটাও, সে আমি জানি। তা বলে এত কেপ্পন নই যে, কানা-খোঁড়া ধরে এনে মেয়ের বিয়ে দেব। ও জামাই, এই বেয়াদবটাকে তোমার দুটো ঠ্যাং বের করে

দেখিয়ে দাও তো !"

জামাই কিছু হতভম্ব হয়ে বিচি সমেত একটা কাঁটালের কোয়া গিলে ফেলল। তারপর ভয়ে-ভয়ে দুটো পা বের করে দেখাল।

রামবাবু বিমর্ষ হয়ে বললেন, "নাঃ, ডান ঠ্যাংটা তো হাঁটুর নীচ থেকে নেই দেখছি। তাতে অবশ্য তেমন ক্ষতি নেই, এক ঠ্যাঙেই দিব্যি কাজ চলে যাবে।"

নগেন চৌধুরী মহা খাপ্পা হয়ে বললেন, "চোখের মাথা খেয়েছ নাকি ? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ দুটো ঠ্যাং ! তবু বলছ !" বলেই গলা একটু নামিয়ে বললেন, "কী বলতে চাও সে আমি বুঝেছি। এই কথাই তো বলতে চাইছ যে, বাপ-মা মরা ভাইঝিটাকে কেন ধরেবেঁধে ওই কানা সাতকড়ির সঙ্গে বিয়ে দিলাম ! ওরে বাবা, সে কি আর শস্তা খোঁজার জন্য ! গাঁয়ের পাঁচটা লোক জানে বিয়ের রাতে দশরথ দত্ত নগদ পাঁচ হাজারের জন্য অত চাপাচাপি না করলে ঘটনাটা ঘটতই না। দশরথ দেমাক দেখিয়ে ছেলে তুলে নিয়ে গেল, তখন মেয়েটা লগ্নভ্রষ্টা হয় দেখে কানা সাতকড়ির সঙ্গে বিয়ে দিই। তবে আমি জানি, লোকে কথাটা বিশ্বাস করে না। তারা বলে বেড়ায়, দশরথের সঙ্গে নাকি আমি আগেই সাঁট করে রেখেছিলাম, আর সাতকড়ির সঙ্গেও নাকি বোঝাপড়া ছিল। আমার কুচ্ছো গাইতে হলধর গায়েন পালা অবধি বেঁধে শিবরাত্তিরের মেলার সময় আসর জমিয়ে ছিল। ছিঃ, ছিঃ কী বদনামই না করতে পারো তোমরা !"

রামবাবু এত কথা কানে নিলেন না। দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "ঠ্যাং একটাই, তাতে ভুল নেই। সামনের অমাবস্যার পর বিয়ে হলে এ-জামাই আপনি অনেক শস্তায় পেতেন। একেবারে জলের দর।"

এই ঘটনার দু'দিন পর অমাবস্যা ছিল। নগেন চৌধুরীর জামাই শিমুলগড়ে গাড়ি ধরতে গিয়ে চাকার তলায় পড়ে ডান পা খোয়াল। এখন ক্রাচ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বুড়ো গৌরগোবিন্দর বয়স বিরানব্বই পেরিয়ে তিরানব্বইতে পড়ল। গত দশটি বছর গৌরগোবিন্দ ধৈর্য ধরে আছেন যদি তাঁর সম্পর্কে এক-আধটা কথা রামের মুখ থেকে বেরোয়। আজ অবধি বেরোয়নি। গৌরগোবিন্দ সকালে উঠে পান্তাটি খেয়েই একখানা মাদুর বগলে করে এসে রামবাবুর দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় চেপে বসে যান। গ্রীষ্মে ফুরফুরে বাতাস থাকে, শীতে থাকে রোদ। বসে দিব্যি আরামে ঝিমুনি এসে যায়। দুপুরে নাতনি এসে ডাকলে গিয়ে চাট্টি ভাত খেয়ে নেন, তারপর একখানা বালিশ বগলে করে নিয়ে এসে এখানেই দিবানিদ্রাটি সেরে নেন। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে যান। একেবারে রুটিন। নিবারণ পুততুণ্ড একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "গৌরদাদু, বিরানব্বই পেরোবার পরও কি মানুষের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে ?"

গৌরগোবিন্দ একঝুড়ি আসল দাঁত দেখিয়ে হেসে বললেন, "ওরে, আমি যে আর মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের বেশি বাঁচব না সে আমিও জানি। তাই বলে কি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব ?"

এ-কথার পর আর কার কী বলার থাকতে পারে ?

আজ ভোরবেলায় গৌরগোবিন্দ যথারীতি দক্ষিণের বারান্দায় মাদুর পেতে বসে আছেন। দিব্যি হাওয়া দিচ্ছে। শরৎকালের মিঠে রোদটাও পড়েছে পায়ের ওপর। কিন্তু গৌরগোবিন্দের আজ ঝিমুনিটা আসতে চাইছে না। কাল রাতে গাঁয়ে চোর ঢুকেছিল, সেই খবরটা পাওয়া ইস্তক মনটা কেমন চুপসে গেছে। বেশ বুকের পাটাওয়ালা চোর, ঢুকতে গেছে গগন সাঁপুইয়ের বাড়ি। আর কে না জানে যে, গগন সাঁপুই হল সাক্ষাৎ কেউটে ? তবে চোর ধরা পড়ার একটা ভাল দিকও আছে। সেইটেই ভাবছিলেন তিনি।

উঠোনের আগড় ঠেলে নটবর ঘোষকে ঢুকতে দেখে গৌরগোবিন্দ খুশি হলেন। গাঁয়ের পাঁচটা খবর এবং পাঁচ গাঁয়ের খবর ওর কাছেই পাওয়া যায়। বছর দুই আগে নটবর ঘোষের জ্যাঠা পাঁচুগোপাল মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে সদরে যাচ্ছিল, স্টেশনে রাম বিশ্বেসের সঙ্গে দেখা হতেই রাম বাতাসে ঢ্যাঁড়া কাটতে-কাটতে বলল, "খুব যে যাচ্ছ ! বলি উইল-টুইল করা আছে ? আর উইল করেই বা কী হবে। তোমার ধনসম্পত্তি তো পিঁপড়েরা খাবে বাবা। তবে একটা কথা, খুব দুর্যোগ হবে, বুঝলে ! ভয়ানক দুর্যোগ। রেলগাড়ি অবধি না ভেসে যায় !"

পাঁচুগোপালের জরুরি মামলা। রামের কথায় কান দেওয়ার ফুরসত নেই। তাই পাত্তা দিল না। সেই রাতে সত্যিই ভয়ঙ্কর দুর্যোগ দেখা দিল। যেমন ঝড় তেমনই বৃষ্টি। রাত দশটার আপ ট্রেন শিমুলগড়ে ঢোকার মাইল দুই আগে কলস নদীর ব্রিজ ভেঙে স্রোতে খানিকটা ভেসে গেল। সাক্ষ্য দিয়ে পাঁচুগোপাল আর ফিরল না। কিন্তু মুশকিল হল, চিরকুমার পাঁচুগোপালের যা কিছু বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিশান হল নটবর ঘোষ। হলে কী হয়, পাঁচুগোপালের টাকাপয়সা আর সোনাদানা সব লুকিয়ে রাখা আছে। কাকপক্ষীতেও জানে না। কোথায় আছে তা খুঁজে বের করা শিবের অসাধ্য। পাঁচুগোপাল জ্যাঠার লুকনো সম্পত্তির হদিস করতে নিত্যি এসে এখানে ধরনা দেয়। কিন্তু সুবিধে হয়নি। রাম গুপ্তধনের ব্যাপারে একেবারে চুপ। নটবর একবার কালী কাপালিকের কাছেও গিয়েছিল। কালী নরকরোটিতে করে সিদ্ধি খেতে-খেতে হাঃ হাঃ করে হেসে বলেছিল, "আপনার জ্যাঠার ভূত তো নিত্যি আমার কাছে আসে। সুলুকসন্ধান সবই জানি। তবে মশাই, বটতলায় মায়ের থানটা আগে বাঁধিয়ে দিন, গুপ্তধনের হদিস একেবারে হাতে-হাতে দিয়ে দেব। আপনার জ্যাঠারও তাই ইচ্ছে কিনা।"

মায়ের থান বাঁধানোর কথায় নটবর পিছিয়ে গেল। এখনও পিছিয়েই আছে। কালী কাপালিক মাঝে-মাঝেই হানা দিয়ে বলে যায়, "মশাই, কাজটা কিন্তু ভাল করছেন না। আপনার জ্যাঠা কুপিত হচ্ছেন। ক'টা টাকাই বা লাগবে ? গোটা কয়েক ইট, এক চিমটি সিমেন্ট আর একটা রাজমিস্ত্রির একটুখানি যা খরচ, তার বদলে সাত-আট লাখ টাকার সোনাদানা—এ-সুযোগ কেউ ছাড়ে !"

গৌরগোবিন্দ হাতছানি দিয়ে নটবরকে ডাকলেন।

"গৌর-ঠাকুরদা যে !" বলে নটবর এসে মাদুরের এককোণে চেপে বসে বলল, "আচ্ছা ঠাকুরদা, এই বয়সে এই পাকা আপেলটির মতো চেহারা নিয়ে ঘুরতে তোমার লজ্জা হয় না ? এখনও বত্রিশ পাটি দাঁত, মাথাভর্তি কালো চুল, টানটান চামড়া, বলি বুড়ো হচ্ছ না কেন বলো তো ! এ তো খুব অন্যায্য কাজ হচ্ছে ঠাকুরদা ! প্রকৃতির নিয়মকানুন সব উলটে দিতে চাও নাকি ? সেটা যে গর্হিত ব্যাপার হবে !"

গৌরগোবিন্দ একগাল হেসে বললেন, "হব রে বাবা, আমিও বুড়ো হব। আর বিশ-পঁচিশটা বছর একটু সবুর কর, দেখতে পাবি। সব ব্যাপারেই অত তাড়াহুড়ো করতে নেই। কত সাধ-আহ্লাদ, শখ-শৌখিনতা বাকি রয়ে গেছে আমার !"

নটবর চোখ কপালে তুলে বলল, "এখনও বাকি ! তা বাকিটা কী-কী আছে বলো তো ঠাকুরদা ?"

"আছে রে আছে। এই ধর না, আজ অবধি কাশী গিয়ে উঠতে পারলাম না। তারপর ধর, এখনও আমার বত্রিশটা মামলার রায় বেরনো বাকি। তারপর ধর, সেই ছেলেবেলা থেকে শুনেছি, হলদে চিনি দিয়ে বাঁকিপুরের ক্ষীর নাকি অমৃত—তা সেটাও আজ অবধি চেখে দেখিনি। তারপর ধর, ফি-বছর যেসব লটারির টিকিট কাটছি তার একটাতেও প্রাইজ মারতে পারিনি। তারপর রাঙি গাইটার দুধ খাওয়ার জন্য কবে থেকে আশা করে আছি, দেবে-দেবে করছে, দিচ্ছে না। আরও কত আছে। তা সব একে-একে হোক। তারপর ধীরেসুস্থে বুড়ো হওয়ার কথা ভাবব'খন। অত হুড়ো দিসনি বাপ।"

"কিন্তু বয়সটা কত হল সে খেয়াল আছে ?"

গৌরগোবিন্দ খাড়া হয়ে বললেন, "আমার বয়সটার দিকে তোদের অত নজর কেন রে ? পীতাম্বর যে একশো পেরিয়ে এক গণ্ডা বছর টিকে দিব্যি হেসেখেলে পাঁঠার মুড়ো চিবিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা তোদের পোড়া চোখে পড়ে না নাকি ? কুঞ্জপুরের শৈলেন ঘোষ—সেও কি কম যাচ্ছে ! আমার হিসাবমতো তার এখন একশো সাত । তা শৈলেন বাকিটা রাখছে কী বল তো ! গেল হপ্তায় নবাবগঞ্জে হাট করতে এসে গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে গেল, নিজের চোখে দেখা । পরশুদিন সারা রাত জেগে কলসি গাঁয়ে ভট্ট অপেরার যাত্রা দেখেছে, দু'মাস আগেও ফুটবল মাঠে গিয়ে কুঞ্জপুরের হয়ে মেলা নাচানাচি করে এসেছে—তা এদের বেলায় কি চোখ বুজে থাকিস ?"

নটবর ঘোষ সবেগে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, "ওটা কাজের কথা নয় । সব জিনিসেরই একটা সময় আছে । তোমার মধুগুলগুলি গাছের আমগুলো যদি জষ্টি মাসে না পাকে তবে কি তুমি খুশি হও ? খেতের ধান সময়মতো না পাকলে তোমার মেজাজখানা কেমনধারা হবে বলো তো ! এও হচ্ছে সেই কথা । তিরানব্বই বছর বয়সে বত্রিশখানা দাঁত, টানটান চামড়া, মাথা ভর্তি চুল নিয়ে গটগট করে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তোমার আক্কেলটা কী বলো তো ! আম পাকে, ধান পাকে, আর মানুষ পাকবে না ?"

গৌরগোবিন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মধুগুলগুলি আমের কথা বলে খারাপ করে দিলি তো মেজাজটা । গাছ ঝেঁপে আম এসেছিল এবার । চোর- ছোকরাদের জ্বালায় কি একটাও মুখে দিতে পেরেছি ! কী চোরটাই হয়েছে গাঁয়ে বাপ । তোরা সব করিসটা কী ? এই তো গগনের বাড়ি কাল অতবড় চুরিটা হয়ে গেল ! শিমুলগড় কি চোরের মামাবাড়ি হয়ে উঠল বাপ ? তা চোরটাকে তোরা করলি কী ?"

এবার নটবর ঘোষের দীর্ঘশ্বাস ফেলার পালা । দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেঁটমুণ্ডু হয়ে সে বলল, "সে-কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না ঠাকুরদা । গগনের নাকি দয়ার শরীর, চোরের দুঃখে তার প্রাণটা বড্ড কেঁদেছিল । তাই ছেড়ে দিয়েছে ।"

গৌরগোবিন্দ ফের খাড়া হয়ে বসে চোখ কপালে তুলে বলেন, "অ্যাঁ ! ছেড়ে দিয়েছে ! সে কী রে ! একটা আস্ত চোরকে ছেড়ে দিলে !"

"চোরটা নাকি বড্ড কান্নাকাটি করছিল, তাইতে বাড়ির কারও ঘুম হচ্ছিল না । তাই নাকি ছেড়ে দিয়ে সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে ।"

গৌরগোবিন্দ মুখে একটা আফসোসের চুক-চুক শব্দ করে বললেন, "ইস ! এ তো বড় ক্ষতি হয়ে গেল দেখছি ! শিমুলগড়ের একটা নিয়ম আছে তো রে বাপ । সেই পুরনো আমল থেকে প্রথা চলে আসছে, চোর ধরা পড়লে তাকে দিয়ে যত পারো বেগার খাটিয়ে নাও । খেতে নিড়েন দেওয়াও, খানিকটা মাটি কুপিয়ে নাও, বাড়ির পানাপুকুরের পানা পরিষ্কার করাও, আগাছা সাফ করিয়ে নাও, এমনকী আগের দিনে বুড়ো-বুড়িরা চোরকে দিয়ে পাকা চুলও বাছিয়ে নিত । আমি তো চোরের খবর শুনে ঠিক করে রেখেছি, তিনটে গাছের নারকোল পাড়িয়ে নেব, পাঁচখানা বড়-বড় মশারি কাচাব, কুয়োর পাড়টা পিছল হয়েছে, সেটা ঝামা দিয়ে ঘষিয়ে নেব, আর গোয়াল ঘরখানা ভাল করে সাফ করিয়ে নেব । না না, গগন কাজটা মোটেই ভাল করেনি ।"

মুখখানা বেজার করে নটবর ঘোষ বলল, "চোরটার সঙ্গে আমারও একটু দরকার ছিল । এ-চোর তো যে-সে চোর নয় । গগনের বাড়ি হল কেল্লা । তার ওপর পাইক আছে, কুকুর আছে, লোক-লশকর আছে । সেসব অগ্রাহ্যি করে চোর যখন গগনের বাড়ি ঢুকে সিন্দুক ভেঙে জিনিস হাপিস করেছে তখন একে ক্ষণজন্মা পুরুষ বলতেই হয় । আমি তখন থেকেই ঠিক করে রেখেছি, জ্যাঠার ধনসম্পত্তি কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে তা একে দিয়েই খুঁজিয়ে বের করব । এর যা এলেম এ ঠিক পারবে । তা বরাতটাই আমার খারাপ । সকালে চোরের সন্ধানে গিয়ে শুনি, এই বৃত্তান্ত ।"

গৌরগোবিন্দ দুঃখ করে বললেন, "এঃ, কতবড় সুযোগটা হাতছাড়া হল বল তো ! আমার পাঁচ-পাঁচখানা মশারি কাচা হয়ে যেত, ঝুনো নারকোলগুলো গাছ থেকে নামানো যেত, তোর জ্যাঠার ধনসম্পত্তিরও একটা সুলুকসন্ধান এই ফাঁকে হয়ে যেতে পারত । আজকাল ভাল চোর পাওয়া কি সোজা কথা রে ! এখনকার তো সব ছ্যাঁচড়া চোর । আগের দিনে চুরিটা ছিল এক মস্ত বিদ্যে । পিঠে চোর, সিধু চোর, হরিপদ চোর—কী সব চোর ছিল সে আমলে ! কত মন্তর-তন্তর জানত, হাতের কাজ ছিল কত সাফ, তেমনই ছিল বুদ্ধি আর সাহস । সবই দিনকে দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে ।"

বিরক্ত মুখে নটবর বলে, "এমন ঠ্যাঁটা ব্যাটাও কি কখনও কেউ দেখেছ ? আমরা দুটি ভাই সেই কবে থেকে জ্যাঠার সম্পত্তি তাক করে বসে আছি, অথচ টাকা-পয়সা নিয়ে একটা শ্বাস অবধি ফেলে গেল না ! কেবল বলত, যদি সজ্জন হও, যদি দয়ালু হও, যদি ভাল লোক হয়ে উঠতে পারো, তবে ঠিক খুঁজে পাবে । তা আমরা কি কিছু খারাপ লোক, বলো তো ঠাকুরদা ?"

গৌরগোবিন্দ মাথা নেড়ে দুঃখের সঙ্গে বললেন, "ওইটেই তো পাঁচুগোপালের দোষ ছিল রে, বড্ড বেশি ভালমানুষ । কলিযুগে কি অত বেশি ভাল হলে চলে ! একটি মিথ্যে কথা বলবে না, অন্যের একটি পয়সা এধার-ওধার করবে না, কথা দিলে প্রাণপণে কথা রাখবে, ছলচাতুরির বালাই নেই, বাবুগিরি নেই, মাছমাংস অবধি খেত না, গরিবকে দু'হাতে পয়সা বিলোত—এসব করেই তো বারোটা বাজাল তোদের । সেই পাপের শাস্তিও তো ভগবান হাতে-হাতে দিলেন, কলস নদীতে রেলগাড়ি ভেসে গেল, লাশটা অবধি পাওয়া গেল না ।"

নটবর মাথা নেড়ে বলে, "আমরাও সেই কথাই বলি, অতি ভাল তো ভাল নয় । এই আমার কথাই ধরো না কেন, আমি ভাল বটে, কিন্তু জ্যাঠার মতো আহাম্মক তো নই । এই তো গতকালই মাছওয়ালা নিতাই প্রামাণিকের কাছ থেকে সাত টাকার মাছ কিনে দাম দিতে দশটা টাকা দিয়েছি । তা নিতাই তখন খদ্দের নিয়ে এত ব্যস্ত যে, ভুল করে তিন টাকার বদলে সাত টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছে । আমিও কথাটি না বলে টাকাটি ট্যাঁকে গুঁজে চলে এলাম । কারণ কী জানো ? ওই ভুলটা হয়তো বা ভাগ্যলক্ষ্মীরই কৃপা ! নিতাই ওজনে ঠকায়, চড়া দাম হাঁকে, তারও একটা কর্মফল হয়তো ওই সাত টাকায় কাটল, কী বলো ? জ্যাঠা হলে আহাম্মকের মতো নিজেই তার বাড়ি গিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে আসত । এই যে আমি বন্ধক রেখে লোককে টাকা ধার দিই, জ্যাঠা এটা একদম সহ্য করতে পারত না । কিন্তু কাজটা কি খারাপ ? গরিব-দুঃখী ঘটিটা, বটিটা, আংটিটা, দুলটা বন্ধক রেখে টাকা নেয়, এতে অধর্মের কী আছে বলো ! এ তো এক ধরনের পরোপকারই হল । তাদেরও পেট ভরল, আমারও সুদ থেকে দুটো পয়সা হল ।"

গৌরগোবিন্দ একগাল হেসে গলাটা একটু খাটো করে বললেন, "তা সোনাদানা কেমন কামালি বাপ ? এক-দেড়শো ভরি হবে ?"

নটবর লজ্জায় নববধূর মতো মাথা নামিয়ে বলে, "অত নয় । তবে তোমাদের আশীর্বাদে খুব খারাপও হয়নি ।"

এই সময়ে উঠোনের আগড় ঠেলে লম্বা-চওড়া একটা লোক ঢুকল । খালি গা, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, হাতে একখানা পেতলের গুল বসানো লম্বা লাঠি ।

গৌরগোবিন্দ সচকিত হয়ে বলেন, "কে রে ওটা ?"

"ঘাবড়াও মাত ঠাকুরদা, ও হল গগনের পাইক । ওরে ও

লক্ষ্মণ, বলি খবর-টবর আছে কিছু ?"

লক্ষ্মণের মুখখানা কেমন ভ্যাবলামতো। চোখে-মুখে কেমন একটা ভয়-খাওয়া ভাব। কাছে এসে যখন দাঁড়াল তখনও একটু হাঁপাচ্ছে। ভাঙা গলায় বলল, "আচ্ছা, এই গাঁয়ে কি খুব ভূতের উপদ্রব আছে মশাই ?"

গৌরগোবিন্দ ফের খাড়া হয়ে বললেন, "ভূত তো মেলাই আছে বাপু। শিমুলগড়ের ভূত তো বিখ্যাত। কিন্তু তোমাকে হঠাৎ ভূতে পেল কেন ? কিছু দেখেছ-টেখেছ নাকি ?"

লক্ষ্মণ একটু মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে, সেটা বলতে পারব না। বলা বারণ। তবে সেটা বড় অশৈলী কাণ্ড।"

গৌরগোবিন্দ সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, "পেটে কথা রাখতে নেই। কথা রাখলেই পেটের গণ্ডগোল হয়। কলেরা অবধি হতে দেখেছি।"

লক্ষ্মণ একটু ভড়কে গিয়ে বলে, "কলেরা !"

"কলেরা, সান্নিপাতিক, শূলব্যথা। কী বলিস রে নটবর ?"

"একেবারে নিয্যস কথা। আরে লক্ষ্মণভায়া, দাঁড়িয়ে কেন ? বোসো, বোসো। আমরা তো সবাই তোমার কথা বলাবলি করি। হ্যাঁ বটে, গগন এতদিনে পয়সা খরচ করে একখানা লোক রেখেছে বটে। যেমন তেজ তেমনই সাহস। বুঝলে গৌরঠাকুরদা, কালকের চোরটাকে তো এই লক্ষ্মণই সাপটে ধরেছিল। নইলে সে কি যে-সে চোর, ঠিক পাঁকাল মাছটির মতো পিছলে বেরিয়ে যেত থলিটি নিয়ে। লক্ষ্মণ খুব এলেমদার লোক। কাছে-পিঠে এমন একখানা লোক থাকলে বল-ভরসা হয়।"

লক্ষ্মণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাদুরের এককোণে বারান্দা থেকে পা ঝুলিয়ে বসল। কাঁধের গামছা দিয়ে কপালটা একটু মুছে নিয়ে বলল, "আমার সাহসের কথা আর বলবেন না, গায়ের জোরের কথাও আর না তোলাই ভাল। কাল রাতে যা কাণ্ড হল, যত ভাবছি তত বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। গগনবাবুর চাকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। এ-গাঁয়ে আর নয়।"

গৌরগোবিন্দ মাথা নেড়ে বলেন, "ভুল করছ হে বাপু। এ গাঁয়ের জল-হাওয়া খুব ভাল। কত লোক এখানে হাওয়া বদলাতে আসে। আর ভূতের কথা যদি বলো তো বলি, শিমুলগড়ের ভূতের যে এত নামডাক, তাও তো এমনই নয়। এমন ভদ্র, পরোপকারী, ভাল আর শান্ত ভূত আর কোথাও পাবে না। বিশেষ করে বাইরের লোকের সঙ্গে বেয়াদবি করাটা তাদের রেওয়াজই নয়। তবে হ্যাঁ, বিশেষ কারণ থাকলে অন্য কথা। আর নতুন ভূতেরা একটু-আধটু মজা করে বটে, তবে সেটা ধরতে নেই।"

লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বলে, "না না, নতুন ভূত নয়। ইনি পুরনো ভূত। গায়ে পেল্লায় জোর।"

নটবর চোখ কপালে তুলে, "ভূতের গায়ে জোর ! সে কী গো ! ভূত তো শুনেছি বায়ুভূত জিনিস। ধোঁয়া বা গ্যাস জাতীয় বস্তু দিয়ে তৈরি ফঙ্গবেনে ব্যাপার। তা গায়ের জোরটা বুঝলে কী করে ? ভূতের সঙ্গে কুস্তি করলে নাকি ?"

লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি নিজের দু' কান স্পর্শ করে জিভ কেটে বলে, "তেনার সঙ্গে কুস্তি যেন কখনও করতে না হয়, এই আশীর্বাদটুকু করবেন। যা একটু ছোটখাটো ঝাঁকুনি দিয়েছেন তাতেই হাড়গোড় কিছু আলগা হয়ে রয়েছে। সারা রাত্তির ঘুমোতে পারিনি। রামবাবুর কাছে ব্যাপারটা বলে একটা নিদান নিতেই আসা।"

গৌরগোবিন্দ আরও একটু ঝুঁকে বলেন, "তা ভূতের সঙ্গে তোমার লাগল কী নিয়ে ? শিমুলগড়ের ভূতেরা তো বাপু সাত চড়ে রা করে না। তা ইনি কুপিত হলেন কেন ? বাসী কাপড়ে বটতলায় যাওনি তো ! এঁটো মুখে তুলসীগাছ ছোঁওনি তো ! না কি অন্য কোনও অনাচার !"

লক্ষ্মণ হতাশ গলায় বলে, "না গো বুড়োবাবা, ওসব অনাচার কিছুই করিনি। দোষের মধ্যে মনিবের হুকুম তামিল করতে

গিয়েছিলাম। আমার কী দোষ বলো! মানছি যে, চোরটাকে মারধোর করা ঠিক কাজ হয়নি। চোরটারও মতিভ্রম, পালানোর চেষ্টাই বা কেন করল কে জানে! তবে এটুকু বলতে পারি বুড়োবাবা যে, সে মরেনি। যখন তাকে বটতলার মাঠে নিয়ে ফেললুম তখনও বুক ধুকপুক করছিল।"

নটবর ঘোষ উত্তেজনায় প্রায় দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে, "অ্যাঁ! বটতলার মাঠে নিয়ে ফেললে, মানে! ফেলার মতো কী হল?"

গৌরগোবিন্দও বেশ উত্তেজিত গলায় বললেন, "চোর কি ফ্যালনা জিনিস হে! অমন জিনিস হাতের মুঠোয় পেয়েও কেউ হাতছাড়া করে! কত কাজ হয়ে যেত! তা ফেলতে গেলে কেন বাপু? জন্মেও শুনিনি কেউ কখনও চোর ফ্যালে।"

লক্ষ্মণ যথেষ্ট ঘাবড়ে গেছে। মুখখানা ফ্যাকাসেপানা দেখাচ্ছে। আমতা-আমতা করে বলে, "চোর যে ফ্যালনা জিনিস নয় তা এখানে এসেই শিখলাম মশাই। নাক মলছি, কান মলছি, আর ইহজীবনে চোরকে হেলাফেলা করব না। রাতের তিনিও সে-কথাই বলছিলেন কিনা!"

গৌরগোবিন্দ একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "তা এই তেনাকে কেমন দেখলে বলো তো! পুরনো ভূত সব ক'জনকেই চিনি। বলি তিনুকে দ্যাখোনি তো! তিনুর গায়েও সাঙ্ঘাতিক জোর ছিল, মুগুরের বদলে রোজ সকালে দু' খানা আস্ত ঢেঁকি দু' হাতে নিয়ে বনবন করে ঘুরিয়ে মুগুর ভাঁজত। তবে বড্ড গবেট ছিল, খুব ভিতুও। গায়ে জোর থাকলে কী হয়, কেউ চোখ রাঙালেই লেজ গুটোত।"

লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বলে, "তা হলে ইনি তিনি নন। চুরি নিয়ে যখন আমাকে জেরা করছিলেন, তখনই বুঝেছিলাম এঁর খুব বুদ্ধি।"

নটবর বলল, "চুরি নিয়ে কী জেরা করল হে?"

লক্ষ্মণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "তিনিই আমার চোখ খুলে দিলেন। তবে সে মশাই অনেক কথা। আমি বড্ড ভয় পেয়েছি। লক্ষ্মণ পাইকের বুকে ভয় বলে বস্তু ছিল না কখনও। কাল রাত থেকে হল। এখানে আমার আর পোষাবে না মশাই। রামবাবুর কাছে তাই হাতটা গোনাতে এসেছি।"

শুনে গৌরগোবিন্দ খুব অট্টহাসি হেসে বললেন, "কত বছর রামের পেছনে ফেউ হয়ে লেগে আছি জানো? আজ অবধি মুখের কথাটি খসাতে পারিনি। তবে বেড়ালের ভাগ্যে কারও-কারও শিকে ছেঁড়ে দেখেছি। তোমারও কপাল ভাল থাকলে রামের মুখ থেকে বাক্যি বেরোবে।"

এমন সময় উঠোনের অন্যদিককার একখানা ঘরের দরজা খুলে রাম বিশ্বাস বেরিয়ে এলেন। ডান হাতে অবিরল ঢ্যাঁড়া কেটে যাচ্ছেন, আর মুখে অনর্গল বিড়বিড়।

লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে জোড়হাতে রামবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার সমস্যার একটা বিহিত করে দেন আজ্ঞে। আমার বড় বিপদ যাচ্ছে।"

রামবাবু ভ্রূ কুঁচকে লক্ষ্মণের দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, "ক'দিন শ্রীঘর বাস করা হয়েছে বলো তো! বছর পাঁচেক নাকি?"

লক্ষ্মণ এত ঘাবড়ে গেল যে, প্রথমটায় মুখে বাক্য সরল না। চোখ দুটো কেমন গোল্লা পাকিয়ে গেল ভয়ে। তারপর একটু ভাঙা গলায় বলল, "মোট তিন বছর। সবই তো আপনি জানেন, লুকোছাপা করব না। জেল যে খেটেছি তা পুরো নিজের দোষে নয়। লালু দাসের দলে ভিড়েছিলুম পেটের দায়ে। ঘরে বুড়ো বাপ, রোগা মা, তিনটে আইবুড়ো বোন, কী করব বলুন। মোট চারটে ডাকাতিতে ছিলুম বটে, কিন্তু দলে থাকাই সার। আমাকে তেমন দায়িত্বের কাজ দিত না, শুধু বাইরে পাহারায় রাখত। শেষে নারায়ণপুরে লালু ধরা পড়ল। মামলায় মোট পাঁচ বছর জেল হল তার। তা লালু দাসের মতো লোকেরা কি আর জেল খাটে! আমাকে ডেকে বলল, 'তোকে মাসে-মাসে চারশো করে টাকা দেব, আমার হয়ে জেল খাটবি।' পেটের দায়ে রাজি হয়েছিলাম। তবে পুরো মেয়াদ খাটতে হয়নি। তিন বছর পর ছেড়ে দিল। লালু দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বদনামের ভাগী হলাম গে আমি। নিজের গাঁয়ে অবধি ঢুকতে পারি না।"

রামবাবুর চেহারাটি ছোটখাটো, রংখানা ফরসা, মাথায় একটু টাক, তিনি অতি দ্রুত বাতাসে ঢ্যাঁড়া কাটতে-কাটতে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে-করতে আপনমনে বললেন, "একজনের নামের আদ্যক্ষর ন। আর-একজনের দুটো হাতই বাঁ হাত। হুঁহুঁ, হুঁহুঁ, এ তো ঘোর বিপদের লক্ষণ দেখছি। অর্থই অনর্থের মূল।"

কথাটা কাকে বলা তা বোঝা গেল না ঠিকই। কিন্তু সবাই একটু তটস্থ হল। নটবর, গৌরগোবিন্দ এবং লক্ষ্মণ ছাড়াও দশ-বারোজন মানুষ ইতিমধ্যেই উঠোনের চারদিকে জমায়েত হয়েছে। সবাই এদিক-ওদিক চাওয়াচাওয়ি করছে। বিপদের কথায় সকলেরই মুখ শুকনো। এর মধ্যেই লক্ষ্মণ হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে সোজা গিয়ে নটবর ঘোষের সামনে দাঁড়িয়ে বাঘের গলায় গর্জন করে উঠল, "নটবরবাবু।"

লক্ষ্মণের এই চেহারা দেখে আতঙ্কিত হয়ে নটবর ঘোষ বলল, "অ্যাঁ!"

"আপনার নামের আদ্যক্ষর ন।"

নটবর বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বলে, "কে বলল ন?"

"আপনি নটবর।"

নটবর সবেগে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, "কখনও নয়। ভুল শুনেছ ভাই। আমার নাম হল গে হলধর। বিশ্বাস না হয় এই গৌর ঠাকুরদাকেই জিজ্ঞেস করো।"

লক্ষ্মণ পাইক তার দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে দাঁতে-দাঁত ঘষে বলল, "চালাকি হচ্ছে? আমি নিজের কানে শুনেছি আপনার নাম নটবর।"

নটবর দাওয়ার ভেতর দিকে সরে বসে বলে, "আহা-হা, অত খেপেছ কেন ভায়া, নটবর বলে মাঝে-মাঝে ভুল করে কেউ-কেউ ডাকে বটে, তবে দেখতে হবে যে, কোন ন। মূর্ধন্য ণ না দন্ত্য ন। তোমাকে কিন্তু আগেভাগেই বলে রাখছি বাপু, দন্ত্য ন হলে কিন্তু মিলবে না। আমার নটবর হল মূর্ধন্য ণ দিয়ে। যাও না, ওই রামের কাছেই জেনে এসো না কোন ন।"

"আপনার হাত দুটো দেখি। আমার মনে হচ্ছে আপনার দুটো হাতই বাঁ হাত।"

নটবর তার হাত দু'খানা পিছমোড়া করে রেখে আতঙ্কের গলায় বলে, "মোটেই নয় বাপু। আমার বাঁ হাতই নেই। দুটোই ডান হাত।"

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ কাছেপিঠে প্রচণ্ড বজ্রাঘাতের শব্দের মতো শব্দ হল, "ব্যোম...ব্যোম...ব্যোম কালী! খেয়ে লে মা, সব খেয়ে লে! সব খেয়ে ফ্যাল বেটি করালবদনী। গরিব-বড়লোক, সাধু-চোর, কালো-ধলো—সব ব্যাটাকে ধরে খেয়ে লে মা জননী। কড়মড়িয়ে খা মা, চিবিয়ে-চিবিয়ে খা, ছিবড়ে ফেলিসনি মা। সব গাপ করে দে।"

ওই বিকট শব্দে লক্ষ্মণ পাইক অবধি ঘাবড়ে গিয়ে হাঁ করে চেয়ে ছিল। সেই ফাঁকে নটবর ঘোষ দাওয়া থেকে নেমে সুট করে কচুবনের ভেতরে সেঁদিয়ে পালিয়ে গেল।

কালী কাপালিক রাম বিশ্বাসের বাড়িতে কখনও ঢোকে না। রামবাবুর ওপর তার একটা পুরনো রাগ আছে। বহুকাল আগে, কালী যখন কাপালিক হয়নি, তখন রামবাবু একবার তাকে বলেছিলেন, 'ওরে, সামনের জন্মে তুই তো দেখছি বাদুড় হবি।'

এই কথায় কালী প্রথমটায় ভীষণ ভয় খেয়ে যায়। অনেক কাকুতিমিনতি করতে থাকে, 'ও রামবাবু, বাদুড় নয়, আমায় বরং সামনের জন্মে বানর করে দিন, তাও ভাল। বাদুড় হলে আমি মরে যাব। ও রামবাবু, আপনার পায়ে পড়ি।' পঞ্চানন সরখেল কাছেই ছিলেন, তিনি বললেন, 'তা বাপু কালী, বাদুড়ের চেয়ে কি বানর হওয়া ভাল? বাদুড়ের তো দু'খানা ডানা আছে, কত ঘুরেটুরে বেড়াতে পারে, আর বানর তো তাঁদড়ের একশেষ। এই সেদিনও আমার বাগানের তিন কাঁদি কলার সর্বনাশ করে গেছে। এ গাঁয়ে আর বানরের সংখ্যা বাড়ানো উচিত হবে না।' কালী তখন রেগেমেগে বলল, 'বাদুড় যে মুখ দিয়ে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তা কি জানেন! ওয়াক থুঃ। আমি কিছুতেই বাদুড় হতে পারব না। রামবাবু, একটা ব্যবস্থা করে দিন। কুকুর-বেড়াল সব হতে রাজি আছি, শুধু ওই বাদুড়টা পারব না।' রাম বিশ্বাস অবশ্য সে-কথায় কান দেননি। শুধু বলেছেন, 'যা দেখতে পাচ্ছি তাই বলেছি বাপু, ওর আর নড়চড় নেই।'

সেই থেকে রামবাবুর ওপর কালীর রাগ। সে এ-বাড়ির উঠোন মাড়ায় না কখনও। তবে মাঝে-মাঝে আসে আর বাইরে দাঁড়িয়ে 'ব্যোম কালী, ব্যোম কালী' করে যায়।

আজ কালীর চেহারাটা কিন্তু ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। মাথার চুল সব ফণা ধরে আছে, দাড়ি-গোঁফ সব যেন ফুলেফেঁপে উঠেছে, রোষকষায়িত লোচন। রামবাবুর উঠোনের দিকে চেয়ে হাতের শূলখানা ওপরে তুলে বিকট স্বরে বলল, "এ-গ্রাম উচ্ছন্নে যাবে। অসুখ হয়ে মরবে, আগুন লাগবে, ভূমিকম্প হবে। এত বড় পাপের জায়গা আর নেই হে। সবার আগে যাবে ওই গগন সাঁপুই।"

কালীকে সবাই অল্পবিস্তর চেনে, তাই সবাই চুপচাপ বসে রইল। তবে লক্ষ্মণ পাইক এ-গাঁয়ে নতুন লোক। সে মনিবের নাম শুনে দু' কদম এগিয়ে বলল, "কেন হে, গগন সাঁপুই আগে যাবে কেন?"

কালী অট্টহাস্য করে, "এ যে লক্ষ্মণ দরোয়ান দেখছি! বলি, আজ সকাল থেকে আমাকে যে আধসের করে দুধ পাঠানোর কথা ছিল, তার কী হল? আর মায়ের থান বাঁধানোর ইটের ব্যবস্থা? দেব নাকি সব ফাঁস করে? গগন সাঁপুইকে বলিস, কাজটা সে মোটেই ভাল করেনি। আমার আখড়ায় দেড় হাজার ভূত মন্তর দিয়ে আটকে রেখেছি। সবক'টা কাঁচাখেকো অপদেবতা। একসঙ্গে যদি ছেড়ে দিই সারা গাঁ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে কিন্তু।"

রোগামতো পটল সাহা কাঁটালগাছতলায় বসে ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ বলে উঠল, "কিন্তু আমরা যে শুনতে পাই তোমারই নাকি বেজায় ভূতের ভয়! সেই ভয়ে তুমি শ্মশানমশানে অবধি যাও না, মড়ার ওপর বসে তপস্যা কখনও করোনি!"

কালী কাপালিক আর-একটা অট্টহাসি হেসে নিয়ে বলে, "শবসাধনা! সে আমার কোন যুগে সারা হয়ে গেছে। আর শ্মশানের কথা বলছিস! আমার যখন এইটুকু বয়স তখন থেকে রথতলার শ্মশানে যাতায়াত। নন্দ কাপালিকের সঙ্গে তো সেখানেই ভাবসাব হল, মন্তর দিলেন। বুঝলে পটলবাবু, এইজন্যেই কথায় বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। আমি যদি অন্য গাঁয়ের লোক হতুম, তা হলে এই তোমরাই দু'বেলা গিয়ে পেন্নাম ঠুকতে। তবে আমিও ছাড়বার পাত্র নই, কালী কাপালিক যে কী জিনিস তা একদিন এ-গাঁয়ের লোককে টের পাইয়ে ছাড়ব। আরও একটা কথা পেট-খোলসা করে বলেই দিচ্ছি। পাপ কখনও গোপন থাকে না।" এই বলে কালী লক্ষ্মণের দিকে চেয়ে মৃদু একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, "তোমার মনিবকেও কথাটা বোলো হে দরোয়ান। পাপ কখনও গোপন থাকে না। আমার কাছে সব খবরই আছে। বিকেল অবধি দেখব। যদি গগনের সুমতি হয় তবে কড়ার মতো কাজ করবে। আর যদি না করে তবে কাল সকালে সারা গাঁয়ে খবরটা রটে যাবে। থানা-পুলিশ হলে আমাকে দোষ দিয়ো না বাপু।"

কালী কাপালিক চলে গেলে সবাই একটু হাঁফ ছেড়ে নড়েচড়ে বসল।

কালী মনসাতলা পেরনোর আগেই গৌরগোবিন্দ পা চালিয়ে ধরে ফেললেন, "ওরে ও কালী, দাঁড়া বাবা, দাঁড়া। কথা আছে।"

কালী বিরক্ত হয়ে ফিরে দাঁড়াল, "আবার কিসের কথা!"

গৌরগোবিন্দ দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলেন, "একটু দুধের জন্য তোর এত হেনস্থা, এ যে চোখে দেখা যায় না রে! আমার কেলে গোরুর দুধ খাবি এক গেলাস? অ্যাই বড় আধসেরি গেলাস।" বলে গৌরগোবিন্দ দুই হাতে গেলাসের মাপ দেখিয়ে মিটিমিটি হাসলেন, "আর গোরু, দেখলেও ভিরমি খাবি। যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। হাতির মতো পেল্লায় চেহারা, তেল চুকচুকে গায়ে রোদ পিছলে যায়। আর দুধের কথা যদি তুলিস বাপ, তা হলে বলব, অমন দুধ একমাত্র বুঝি রাজাগজাদেরই জোটে। যেমন ঘন, তেমনই মিষ্টি, আর তেমনই খাসা গন্ধটি। খাবি বাপ একটি গেলাস? গরম, ফেনায় ভর্তি, সরে-ভরা দুধ?"

কালী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তোমার মতলব আছে ঠাকুরদা।"

একগাল হেসে গৌরগোবিন্দ বলেন, "দূর পাগলা, মতলব আবার কী রে? দুটো কথা-টথা কইব বসে, সেই তো এইটুকু থেকে দেখছি তোকে। আয়, আয়।"

নিজের বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই গৌরগোবিন্দ হাঁক পাড়লেন, "ওরে, তাড়াতাড়ি এক গেলাস দুধ নিয়ে আয় তো! আধসেরি গেলাসে, ভর্তি করে দিস। সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ এরা সব, কুপিত হলেই বারোটা বাজিয়ে দেবে।"

দাওয়ায় কালীকে আসন পেতে যত্ন করে বসালেন গৌরগোবিন্দ। দুধও এসে গেল। কালীকে দুধটা খানিক খাওয়ার সময় দিয়ে গৌরগোবিন্দ গলাটা খাটো করে বললেন, "তা হলে কথাটা আসলে এই! মানে গগন সাঁপুই একখানা দাঁও মেরেছে!"

কালী নিমীলিত নয়নে চেয়ে বলে, "দুধটি বড্ড খাসা ঠাকুরদা, এর যা দাম দিতে হবে তাও আমি জানি। শোনো, কথাটা পাঁচকান কোরো না। ও ছোকরা মোটেই চোর নয়। থলির মধ্যে দুশো এগারোখানা মোহর ছিল। গগন সেটিই গাপ করেছে। ছোকরার কী মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, কেন যে গগনের বাড়ি সেঁধোতে গেল।"

গৌরগোবিন্দ চোখ কপালে তুলে বলেন, "দুশো এগারোখানা! দেখলি থলি খুলে?"

"থলি খুলতে হবে কেন ঠাকুরদা! আমার কি অন্তর্দৃষ্টি নেই? বাইরে থেকেই দেখলুম, থলির ভেতর মোহর। দুশো এগারোখানা। তবে ভোগে লাগল না।"

"তার মানে?"

"ছোকরাকে রাতেই মেরে লাশ গুম করে দিয়েছে কিনা। কাল রাতেই ছোকরার প্রেতাত্মা এসে বলে গেল।"

॥ ৩ ॥

নিজের নাম নিয়ে একটু দুঃখ আছে অলঙ্কারের। নামটার মধ্যে কি মেয়ে-মেয়ে গন্ধ? বন্ধুরা তা বলে না অবশ্য, কিন্তু তার কেন যেন মনে হয় নামটা বড্ড মেয়েলি। নাম ছাড়াও আরও নানারকমের দুঃখ আছে অলঙ্কারের। যেমন, তার গায়ে তত জোর নেই যাতে সে বুক্কাকে হারিয়ে দিতে পারে। তাকে ন'পাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল টিমে কিছুতেই কেন যে নেয় না! তার বাবার তত পয়সা নেই যে, চাটুজ্যেবাড়ির ছেলে চঞ্চলের মতো

একখানা এয়ারগান তাকে কিনে দেন। চঞ্চল তার এয়ারগানটা, অলঙ্কারকে ছুঁতেও দেয় না। অলঙ্কারের আর-একটা দুঃখ মা-বাবার কাছে কিছু চাইলেই সবসময়েই শুনতে হয়, "না, হবে না। আমাদের পয়সা নেই।" নেই-নেই শুনতে-শুনতে অলঙ্কারের কান পচে গেল। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ বা পরশপাথর পেলে তার একটু সুবিধা হত। সে অবশ্য খুব বেশি কিছু চাইত না। বিশ্বকর্মা পুজোর সময় কয়েকখানা রঙিন ঘুড়ি আর লাটাই, কয়েকটা লাট্টু, কিছু মার্বেল, পুজোয় নতুন জুতো এইসব।

অলঙ্কারদের বাড়ি পুবপাড়ায়। দোতলা মিষ্টি একটা মাটির বাড়িতে তারা থাকে। বাড়ির সামনে একটু বাগান আর পেছনে ঘন বাঁশঝাড়। দোতলার ছোট্ট একটা কুঠুরিতে অলঙ্কার একা থাকে। সেখানে তার যত বইপত্র আর কিছু খেলার জিনিস। তার বইগুলো সবই পুরনো আর ছেঁড়াখোঁড়া। উঁচু ক্লাসে যারা উঠে যায় তাদের বই শস্তায় কিনে আনেন বাবা। তার খেলার জিনিসও বেশি কিছু নেই। একটা বল, দুটো ফাটা লাটিম, তক্তা দিয়ে বানানো একটা ব্যাট, একটা গুলতি, একটা ধনুক, একটা বাঁশি। ব্যস। তার জন্মদিনও হয় না কখনও। হলে টুকটাক দু-একটা উপহার পাওয়া যেত। দুঃখের বিষয়, তার যেসব বন্ধুর জন্মদিন হয়, তাদের বাড়িতে নেমন্তন্নেও যেতে পারে না অলঙ্কার। কারণ উপহার কেনার পয়সাই যে নেই তাদের।

দুঃখ যেমন আছে তেমনই কিছু সুখও আছে তার। ফুটবল খেলতে, সাঁতার কাটতে তার দারুণ ভাল লাগে। ভাল লাগে বৃষ্টি পড়লে, শীতকালে রোদ উঠলে, আকাশে রামধনু দেখলে। সকালে যখন পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে, তখনও তার খুব আনন্দ হয়। অলঙ্কারের আরও একটা গোপন সুখের ব্যাপার আছে। সে খুব খুঁজতে ভালবাসে। না, কোনও হারানো জিনিস নয়। সে এমনিতেই মাঠেঘাটে, জঙ্গলে, জলায় আপনমনে খোঁজে আর খোঁজে। হয়তো একটা অদ্ভুত পাথর, কখনও-বা কারও হারানো পয়সা, অদ্ভুত চেহারার অচেনা গাছের চারা, ভাঙা পুতুল বা এরকম কিছু যখন পেয়ে যায় তখন খুব একটা আনন্দ হয় তার। খুঁজতে-খুঁজতে এই গ্রাম আর তার আশপাশের সব অন্ধিসন্ধি তার জানা হয়ে গেছে।

আজ ভোর-রাতে ঘুমের মধ্যে একটা আজগুবি ব্যাপার ঘটল। নিজের দোতলা ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল সে। এ-ঘরে জানলার বদলে ছোট ঘুলঘুলি আছে দুটো। মাথার কাছের ঘুলঘুলি দিয়ে কে যেন তাকে বলছিল, "বাঁশঝাড়ের পেছনে যে জঙ্গলটা আছে, সেখানে চলে যাও। সেখানে একটা জিনিস আছে।"

অলঙ্কার পাশ ফিরে ঘুমের মধ্যেই বলল, "কী জিনিস ?"

"দেখতেই পাবে।"

"আপনি কে ?"

"আমি শিমুলগড়ের পুরনো ভূত। আমার নাম ছায়াময়।"

ভূত শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল অলঙ্কারের। সে উঠে বসল। দেখল, বাইরে ভোর-ভোর হয়ে আসছে। খুব পাখি ডাকছে। ঘুলঘুলি দিয়ে অবশ্য কাউকেই দেখা গেল না। স্বপ্ন স্বপ্নই, তাকে পাত্তা দিতে নেই। অলঙ্কারও দিল না। সে রোজকার মতো সকালে উঠে দাঁত মেজে পড়তে বসল। চাট্টি মুড়ি খেল। তারপর মায়ের অনুমতি নিয়ে বেরোল খেলতে। আজ ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবস বলে ছুটি। বেরোবার মুখেই হঠাৎ তার স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল।

বাঁশঝাড়ের পেছনের জঙ্গলে একটা জিনিস আছে ! কিন্তু কীই বা থাকবে ? গতকালও ইস্কুল থেকে ফেরার পথে জঙ্গলটা ঘুরে এসেছে। প্রায়ই যায়। ওই জঙ্গলটা তার খুব প্রিয় জায়গা।

আজ পুবপাড়ায় জোর ডাংগুলি খেলা হবে। সেদিকেই মনটা টানছিল অলঙ্কারের। তবু শেষ অবধি ঠিক করল জঙ্গলটায় পাঁচ মিনিটের জন্য ঘুরে আসবে।

বাঁশঝাড়টা বিরাট বড়। একদিন নাকি এই বাঁশঝাড় তাদের বংশেরই সম্পত্তি ছিল। তবে শরিকে-শরিকে বাঁশঝাড়ের মালিকানা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হওয়ায় এখনও এটা বিশেষ কারও সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি। কেউ এখানকার বাঁশ কাটে না। ফলে ভেতরটা বেশ জমাট অন্ধকার। বাঁশপাতা পড়ে-পড়ে কার্পেটের মতো নরম একটা আস্তরণ হয়েছে মাটির ওপর। বাঁশঝাড় পেরিয়ে একটা আগাছার জঙ্গল। বড় গাছও বিস্তর আছে। এ হচ্ছে সাহাবাবুদের পোড়োবাড়ির বাগান। জঙ্গলটা অলঙ্কার নিজের হাতের তেলোর মতোই চেনে। সে চারদিকে চোখ রেখে জঙ্গলের এধার থেকে ওধার ঘুরতে লাগল। তারপর হঠাৎ মস্ত মহানিম গাছটার তলায় চোখ পড়তেই সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। গাছতলায় খানিকটা পরিষ্কার ঘাসজমি আছে। এখানে বসে অলঙ্কার বাঁশি বাজায় মাঝে-মাঝে। এখন সেখানে একটা লোক শুয়ে আছে। মরে গেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। তবে কাত হয়ে, ভাঁজ-করা হাতের ওপর মাথা রেখে গুটিসুটি হয়ে শোওয়ার ভঙ্গি দেখে মারা গেছে বলে মনে হয় না। লোকটা রোগা চেহারার, লম্বা চুল আছে, গালে অল্প দাড়ি।

অলঙ্কার পায়ে-পায়ে এগিয়ে গিয়ে লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে একবার গলাখাঁকারি দিল। প্রথমে আস্তে। তারপর জোরে। কাজ হল না দেখে নিচু হয়ে বলল, "আপনি কি ঘুমোচ্ছেন ! এখানে কিন্তু শেয়াল আছে। আর খুব কাঠপিঁপড়ে।"

হঠাৎ লোকটা চোখ চাইল। তাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসেই বলল, "আ-আমি কোথায় ? আমি এখানে কেন ?"

অলঙ্কার একটু হেসে বলে, "আপনি এখানে কী করে এলেন তা আপনি নিজেই ভুলে গেছেন ? খুব ভুলো মন তো আপনার !"

লোকটির বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি হবে না। নিজের ঘাড়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "মাথাটা বোধ হয় গুলিয়ে গেছে। এখানে যে কী করে এলাম !" বলে লোকটা শুকনো মুখে অলঙ্কারের দিকে চেয়ে ফের বলে, "আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। সাঙ্ঘাতিক খিদে। কিছু খেতে দিতে পারো ?"

অলঙ্কার ম্লানমুখে বলল, "তবেই তো মুশকিল। আমাদের বাড়িতে কিচ্ছু খাবার থাকে না যে ! আমাদের কত খিদে পায়, আমরা তখন জল খাই খুব করে। আমাদের পাতে কিছু ফেলা যায় না বলে আমাদের বাড়িতে কাক-কুকুর-বেড়ালরা পর্যন্ত আসে না। আমরা কোনও জিনিসের খোসা ফেলি না, ছিবড়ে ফেলি না। আমার বাবা সজনে ডাঁটা চিবিয়ে অবধি গিলে ফেলেন। আমি চিনেবাদাম পেলে তা ওপরের শক্ত খোসাটাসুদ্ধু চিবিয়ে খেয়ে নিই।"

ছেলেটা অবাক হয়ে চেয়ে ভয়-খাওয়া গলায় বলে, "ও বাবা, ওসব তো আমি পারব না। কিন্তু খিদেটা যে সহ্য করা যাচ্ছে না আর।"

"কেন, আপনার কাছে পয়সা নেই ?"

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলে, "ছিল। এখন আর নেই। অনেক ছিল। কেড়ে নিয়েছে।"

"কে কাড়ল ? ডাকাত !"

ছেলেটা ঠোঁট উলটে বলল, "তাই হবে। ভাল চিনি না। তবে তোমাদের এই অঞ্চলটাই খুব খারাপ জায়গা।"

অলঙ্কার একটু ম্লানমুখ করে বলে, "আমার বাবারও তাই মত। আপনার কি অনেক টাকা ছিল ?"

ছেলেটা করুণ হেসে বলে, "হ্যাঁ, অনেক। সে তুমি ভাবতেও পারবে না।"

"এখানে একটা কাশীর পেয়ারাগাছ আছে। চমৎকার পেয়ারা হয়। তবে গাঁয়ের ছেলেরা সব পেড়ে খেয়ে যায়। গতকাল

দেখেছি, তিনটে অবশিষ্ট আছে। এনে দেব ?"

"পেয়ারা ! তাই দাও। জল পাওয়া যাবে তো !"

"হ্যাঁ। জল যত চাই। আমাদের বাড়ি ওই বাঁশঝাড়টার ওধারে। কুয়ো আছে। আগে পেয়ারা পেড়ে আনি, তারপর বাড়ি নিয়ে যাব আপনাকে।"

গাছে তিনটে পেয়ারাই ছিল। অলঙ্কার পেড়ে নিয়ে এল। বেশ বড় পাকা হলুদ পেয়ারা। ছেলেটা একটাও কথা না বলে কপকপ করে মুহূর্তের মধ্যে খেয়ে ফেলল তিনটেই। খুব খিদে পেলে খাবে বলে অলঙ্কার পেয়ারা তিনটে গাছ থেকে পাড়েনি। ভাগ্যিস পাড়েনি। খিদের যে কী কষ্ট তা তো সে জানে।

ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে অলঙ্কার যখন বাড়ির দিকে আসছিল তখন তার একটু ভয়-ভয় করছিল। তাদের বাড়িতে একমাত্র পাওনাদারেরা ছাড়া আর কেউ আসে না। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে কটূ-কাটব্য করে যায়। এ ছাড়া, কোনও অতিথি-অভ্যাগত, এমনকী আত্মীয়স্বজন অবধি কেউ আসেনি কখনও। বাইরের কোনও লোক এসে তাদের বাড়িতে খায়ওনি কোনওদিন। নিজের বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে আনতেও ভয় পায় অলঙ্কার। আজ হঠাৎ এই উটকো লোকটাকে দেখলে তার মা-বাবা কি খুব রেগে যাবেন তার ওপর ? তার মা-বাবা খুবই রাগী এবং ভীষণ গম্ভীর। কখনও তাঁদের মুখে হাসি দেখা যায় না। অলঙ্কার তাঁদের একমাত্র ছেলে হওয়া সত্ত্বেও সেও কখনও মা বা বাবার তেমন আদর বা আশকারা পায় না। তাদের বাড়িতে কোনও আনন্দ নেই, ফুর্তি নেই, হাসি নেই, গান নেই। এরকম বাড়িতে বাইরের কাউকে নিয়ে যেতে ভয় লাগবে না ? এখন বাবা বাড়ি নেই, মা আছেন। মা যদি রেগে যান !

মা অবশ্য রাগলেন না। অলঙ্কারের রোগামতো মা কুয়োর ধারে কাপড় কাচতে বসেছেন। অলঙ্কারের সঙ্গে ছেলেটাকে আসতে দেখে কাচা থামিয়ে অবাক হয়ে চাইলেন।

অলঙ্কার ভয়ে-ভয়ে বলল, "মা, এঁর সব চুরি হয়ে গেছে। জঙ্গলে পড়ে ছিলেন।"

অলঙ্কারের মা অধরা উঠে মাথায় একটু ঘোমটা টেনে বললেন, "এ তো বড় ঘরের ছেলে মনে হচ্ছে ! যাও বাবা, দাওয়ায় গিয়ে বোসো। ওরে অলঙ্কার, চটের আসনটা পেতে দে তো !"

মায়ের এই কথাটুকুতেই অলঙ্কারের বুক আনন্দে ভেসে গেল। মাকে সে যত রাগী আর বদমেজাজি ভাবে ততটা নন তা হলে ! সে তাড়াতাড়ি আসন পেতে বসতে দিল ছেলেটাকে। চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কিন্তু বলেননি।"

"আমার নাম ইন্দ্রজিৎ রায়।"

"ইন্দ্রদা, আমাদের বাড়িতে কিন্তু আপনার খুব অসুবিধে হবে।"

ইন্দ্র মাথা নেড়ে বলে, "অসুবিধে তোমাদেরই হবে বোধ হয়। তবে আমি এ-গাঁয়ে বেশিক্ষণ থাকব না। একটু জিরিয়ে নিয়েই চলে যাব। আগে একটু জল দাও।"

ইন্দ্র প্রায় আধঘটি জল খেয়ে নিল। অধরা দুটো বাতাসা এনে বললেন, "এ-দুটো খাও বাবা। মনে হচ্ছে খুব খিদে পেয়েছে।"

বাতাসা দুটো কচমচিয়ে খেয়ে ইন্দ্র বলল, "এখন খিদেটা সহ্যের মধ্যে এসে গেছে।"

"তবে আর-একটু সহ্য করো বাবা ! আমি কচুসেদ্ধ দিয়ে ভাত বসাচ্ছি। আর ঝিঙের ঝোল। দুটি গরম ভাত খাও।"

"কিন্তু আমি যে আর বেশিক্ষণ এখানে থাকব না মাসিমা। আমাকে চলে যেতে হবে।"

অধরা করুণ চোখে ছেলেটার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, খুব দুর্বল। এ-শরীরে কি হাঁটতে পারবে ? দুটি খেয়ে নিলে গায়ে একটু জোর পেতে।"

ইন্দ্র সভয়ে মাথা নেড়ে বলে, "না, দেরি হয়ে যাবে। না পালালে আমার রক্ষে নেই।"

"তুমি কি ভয় পেয়েছ বাবা ?"

ইন্দ্র নীরবে মাথা নেড়ে জানাল যে, সে ভয় পেয়েছে।

অধরা কী বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময়ে বাইরে থেকে একটা ভারী গলার হাঁক শোনা গেল, "বলি ও হরিপদ, বাড়ি আছিস ? হরিপদ-ও-ও- "

অলঙ্কার শখ করে জঙ্গল থেকে একটা নতুন ধরনের ফণিমনসা এনে উঠোনের বেড়া হবে বলে লাগিয়েছিল। সেগুলো এখন বুকসমান বেড়ে উঠে প্রায় নিশ্ছিদ্র একটা আড়াল তৈরি করেছে। বাইরে থেকে উঠোনটা আর কারও নজরে পড়ে না। লোকটাকে দেখা গেল না বটে, কিন্তু গলা শুনে অধরা আর অলঙ্কারের মুখ শুকোল।

ইন্দ্র চকিতে মুখ তুলে বলল, "লোকটা কে বলো তো !"

অলঙ্কার ম্লানমুখে বলে, "ও হচ্ছে হরিশ সামন্ত। গগন সাঁপুইয়ের খাজাঞ্চি। তাগাদায় এসেছে।"

"গগন সাঁপুই !" বলে ইন্দ্র ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর টপ করে উঠে ঘরে ঢুকে কপাটের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। হরিশ সামন্ত ততক্ষণে ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, পাশে শম্ভু পাইক।

অধরা ইন্দ্রর কাণ্ড নীরবে দেখলেন, কিন্তু কোনও ভাবান্তর হল না। হরিশের দিকে চেয়ে শান্ত গলায় বললেন, "উনি তো বাড়ি নেই।"

হরিশ একটু খিঁচিয়ে উঠে বলে, "যখনই আসি তখনই শুনি বাড়ি নেই ! সাতসকালে গেল কোন চুলোয় ? যাকগে, সে এলে বোলো বাবু এত্তেলা দিয়েছেন। এবেলাই যেন একবার হুজুরের কাছে গিয়ে হাজির হয়। সুদে-আসলে তার মেলা টাকা বাকি পড়েছে। বুঝলে ?"

"বুঝেছি। এলে বলব'খন।"

"আর-একটা কথা। মন দিয়ে শোনো। আজ আদায় উসুলের জন্য আসা নয়। বাবুর একটা জরুরি কাজ করে দিতে হবে। ভয় খেয়ে যেন আবার গা-ঢাকা না দেয়। বরং কাজটা করে দিলে কিছু পেয়েও যাবে। বুঝলে ?"

"বুঝেছি।"

হরিশ সামন্ত চলে যাওয়ার পর ইন্দ্র বেরিয়ে এল। তার মুখে-চোখে আতঙ্কের গভীর ছাপ। সে অলঙ্কারকে জিজ্ঞেস করল, "কী কাজের জন্য তোমার বাবাকে খুঁজছে ওরা ?"

ঠোঁট উলটে অলঙ্কার বলে, "কে জানে ! তবে বাবার তো সোনার দোকান ছিল, গয়না বানাতেন। এখন আর ব্যবসা ভাল চলে না। গগনজ্যাঠা মাঝে-মাঝে সোনা গলানোর জন্য বাবাকে ডাকেন।"

ইন্দ্রর মুখ থেকে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যেন সরে গেল। সাদা ফ্যাকাসে মুখে সে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "গলিয়ে ফেলবে ! গলিয়ে ফেলবে !"

অধরা একদৃষ্টে দেখছিলেন ইন্দ্রকে। হঠাৎ একটু হেসে বললেন, "শোনো বাবা ইন্দ্র, তুমি অত ভয় পেয়ো না। ওপাশে একটা পুকুর আছে। ভাল করে স্নান করে এসো তো। তারপর খেয়ে একটু ঘুমোও। তোমার কোনও ভয় নেই। মাথা ঠাণ্ডা না করলে মাথায় বুদ্ধি আসবে কেমন করে ?"

ইন্দ্র মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু ওরা যে আমার সব মোহর গলিয়ে ফেলবে !"

অধরা অবাক হয়ে বলেন, "তোমার মোহর ? মোহর তুমি কোথায় পেলে বাবা ? আর তা গগনবাবুর কাছেই বা গেল কী করে ?"

"সে-কথা বলতে অনেক সময় লাগবে।"

"তবে এখন থাক। আগে স্নান-খাওয়া হোক। তারপর কথা।"

"কিন্তু ততক্ষণে..."

অধরা মাথা নেড়ে বললেন, "ভয় নেই। সোনা যাতে না গলে তার ব্যবস্থা হবে। এ-গাঁয়ে স্বর্ণকার মাত্র একজন, তিনি ওই অলঙ্কারের বাবা। তিনি না গেলে ও সোনা গলবে না।"

ইন্দ্র বেজার মুখে খানিকক্ষণ বসে রইল। অলঙ্কারই তাকে ঠেলে তুলে পুকুর থেকে স্নান করিয়ে আনল। দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে ভাল করে ভাত খেতে পারল না সে। বোধ হয় এসব সামান্য খাবার খাওয়ার অভ্যাসও নেই।

দুপুরে হরিপদ ফিরে ঘরে অতিথি দেখে অবাক। তবে অলঙ্কার যা ভয় করছিল তা কিন্তু হল না। হরিপদ রেগেও গেলেন না, বিরক্তও হলেন না। আবার যে খুশি হলেন, তাও নয়। অধরা বললেন, "ও ছেলেটি সম্পর্কে সব বুঝিয়ে বলছি। তুমি আগে স্নান-খাওয়া করে নাও।"

হরিপদর স্নান-খাওয়া সারা হলে চারজন গোল হয়ে বসল। ইন্দ্র খুব নিচু গলায় বলতে শুরু করল, "আমার নাম ইন্দ্রজিৎ রায়। আমি খুব শিশুকালে আমার মা-বাবার সঙ্গে বিদেশে চলে গিয়েছিলাম। এখন আমি লন্ডনের এক মস্ত লাইব্রেরিতে চাকরি করি। আমার কাজ হল পুরনো পুঁথিপত্র সংরক্ষণ এবং সেগুলোর মাইক্রোফিল্ম তুলে রাখা। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে নানা ভাষার পুঁথি দলিল-দস্তাবেজ বা চিঠিপত্র আমাদের লাইব্রেরি সংগ্রহ করে রাখে। তার মধ্যে বাংলাভাষার পুঁথিও অনেক আছে। একদিন হঠাৎ একটি পুঁথির মাইক্রোফিল্ম করতে গিয়ে আমি একটা মজার জিনিস লক্ষ করি। পুঁথিটা পদ্যে লেখা এক দিশি বাঙালি রাজার জীবনী। মজার জিনিস হচ্ছে রাজার গুণাবলী সম্পর্কে বাড়াবাড়ি সব বিবরণ। রাজা নাকি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। তিনি নাকি সশরীরে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে অনায়াসে যাতায়াত করে থাকেন। তাঁর নাকি পক্ষিরাজ ঘোড়া এবং পুষ্পক রথও আছে। তাঁর ওপর মা লক্ষ্মীর নাকি এমনই দয়া যে, রোজ নিশুতরাতে একটা প্যাঁচা নাকি আকাশ থেকে উড়ে এসে রাজবাড়ির ছাদে একটি করে সোনার টাকা ফেলে যেত, রাজা ভোরবেলা ছাদে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে আনতেন। বোধ হয় রাজার কোনও চাটুকার সভাসদ জীবনীটা লেখেন। লেখকের নাম চন্দ্রকুমার। আর রাজার নাম মহেন্দ্রপ্রতাপ। আপনারা কি শুনেছেন এঁর নাম? প্রায় দেড়শো বছর আগে শিমুলগড়ের দক্ষিণে রায়দিঘিতে তাঁর রাজত্ব ছিল।"

হরিপদ সচকিত হয়ে বলেন, "শুনব না কেন? বাপ-পিতামহের কাছে ঢের শুনেছি। ওই সোনার টাকার কথাও এ-অঞ্চলের সবাই জানে। তবে রাজাগজার গল্পে অনেক জল মেশানো থাকে। কেউ বিশ্বাস করে; আবার কেউ করে না।"

ইন্দ্র মাথা নেড়ে বলে, "ঠিকই বলেছেন। আমিও তাই পুঁথিটাকে প্রথমে গুরুত্ব দিইনি। তবে পুঁথির শেষদিকে কয়েকটা অদ্ভুত ধরনের ছড়া ছিল। অনেকটা ধাঁধার মতো। আমার মনে হল, সেগুলো কোনও সঙ্কেতবাক্য। পুরনো পুঁথিপত্র থেকে সঙ্কেতবাক্য উদ্ধার করার একটা নেশা আমার আছে। সেই ছড়াগুলো নাড়াচাড়া করে বুঝলাম, চন্দ্রকুমার চাটুকার হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক এবং ভাষার ওপর তাঁর দখলও চমৎকার। আমি দু' দিন দু' রাত্তির ধরে সেইসব ছড়ার অর্থ উদ্ধার করে দেখলাম, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের আসল চরিত্র কীরকম সেসব কথা চন্দ্রকুমার খুব সাবধানে প্রকাশ করেছেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা, ইংরেজের খয়ের খাঁ, প্রজারা তাঁকে মোটেই পছন্দ করে না। রাজা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতিরও ছিলেন। মহেন্দ্রপ্রতাপের প্রপিতামহ প্রাসাদের নীচে শ'খানেক গুপ্ত প্রকোষ্ঠ তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। এই প্রকোষ্ঠগুলো আসলে ভুলভুলাইয়া বা গোলকধাঁধা। রাজ্য আক্রান্ত হলে লুকিয়ে থাকার জন্য এবং মূল্যবান ধনসম্পত্তি নিরাপদে রাখার জন্যই সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল। সে নাকি এমন গোলকধাঁধা যে, একবার সেখানে ঢুকলে বেরিয়ে আসা ছিল সাঙ্ঘাতিক কঠিন। সেই পাতালপুরী কতটা নিরাপদ তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য মহেন্দ্রপ্রতাপ নাকি মাঝেমধ্যে এক-আধজন দাস বা দাসীকে সেখানে নামিয়ে দিতেন। তাদের কেউই শেষ অবধি বেরিয়ে আসতে পারত না। মাটির নীচে বেভুল ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে খিদে-তেষ্টায় মরে পড়ে থাকত। সেইসব মৃতদেহ উদ্ধার বা সৎকার করা হত না। সেইসব দাস-দাসীর প্রেতাত্মারা যখ হয়ে গুপ্তধন পাহারা দিত। পুঁথির শেষে গুপ্তধনের হদিসও চন্দ্রকুমার দিয়েছেন। দিয়ে বলেছেন, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ অত্যন্ত কৃপণ, কুটিল, বায়ুগ্রস্ত ও সন্দেহপ্রবণ। রাজার নির্দেশেই চন্দ্রকুমার গুপ্তধনের নির্দেশ লিখে রাখছেন বটে, কিন্তু তাঁর একটা ভয় হচ্ছে। ভয় হল, রাজা যদি গুপ্তধনের সঠিক নির্দেশই চন্দ্রকুমারকে দিয়ে থাকেন, তা হলে খবরটা যাতে গোপন থাকে তার জন্য তিনি চন্দ্রকুমারকে অবশ্যই হত্যা করবেন। আর যদি ইচ্ছে করেই ভুল নির্দেশ দিয়ে থাকেন তা হলে চন্দ্রকুমার বেঁচে যাবেন। চন্দ্রকুমারের বিবরণ থেকে জানা যায়, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের মোহর জমানোর নেশা ছিল। পৃথিবীর নানা জায়গার মোহর তিনি সংগ্রহ করতেন। অনেক দুষ্প্রাপ্য মোহরও তার মধ্যে ছিল। সেইসব ঐতিহাসিক মোহরের দাম শুধু সোনার দামে নয়। ঐতিহাসিক মূল্য ধরলে এক-একটার দামই লাখ-লাখ টাকা। যদি কোনও বোকা লোকের হাতে সেগুলো যায় তবে সে আহাম্মকের মতো তা সোনার দরে ছেড়ে দেবে বা গলিয়ে ফেলবে। সেক্ষেত্রে অনেক মূল্যবান তথ্য আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন। সেই ভয়ে আমি পুঁথিটার শেষ অংশটা কপি করে নিয়ে খুব তাড়াহুড়ো করে ভারতবর্ষে চলে আসি। এদেশ সম্পর্কে আমার তেমন কিছুই জানা নেই।"

হরিপদ, অধরা আর অলঙ্কার সম্মোহিত হয়ে শুনছিল। হঠাৎ হরিপদ একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "শুনেছি, আমাদের বংশের কে একজন যেন মহেন্দ্রপ্রতাপের দরবারে স্বর্ণকারের কাজ করতেন। নামটা বোধ হয় নকুড়।"

ইন্দ্র একটু অবাক হয়ে বলে, "হ্যাঁ, নকুড় কর্মকার মোহরের ব্যাপারে খুব জানবুঝদার লোক ছিলেন। বণিক বা দালালরা যেসব মোহর নিয়ে আসত তা নকুড় কর্মকার পরীক্ষা করে দেখে কিনতে বললেই রাজা কিনতেন।"

অলঙ্কার একটু ধৈর্য হারিয়ে বলল, "তারপর ইন্দ্রদা?"

ইন্দ্রর চেহারাটা এখন আর তেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে না। পেটের কথা খোলসা করে বলতে পেরে তার মুখে একটা রক্তাভা এসেছে। সে একটু চিন্তা করে বলল, "লন্ডন থেকে রওনা হওয়ার আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা আপাতত উহ্য থাক। কিন্তু এদেশে পা দিয়েই আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। আমি শুনেছি এদেশের সরকার খুব ঢিলেঢালা, কোনও কাজেই তাদের গা নেই। তাই আমি গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারে তাদের অনুমতি চাইনি। এসব ব্যাপারে এদেশে বেসরকারি উদ্যোগেই কাজ চটপট হয়। আমি আমার পোর্টেবল তাঁবু আর যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিলাম লন্ডন থেকেই। দু-একজন বিশ্বস্ত সাহায্যকারী খুঁজতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয়েছে। একগাদা ফড়ে আর দালাল পেছনে লাগল। যাই হোক, কোনওরকমে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে আমি একাই শেষ অবধি রায়দিঘিতে হাজির হই। কিন্তু কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার একটু পরেই আমার মনে হচ্ছিল, কেউ যেন আমার পিছু নিয়েছে। সারাক্ষণ নজর রাখছে আমাকে। খুব অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করি। রায়দিঘিতে এসে দেখি, রাজপ্রাসাদ বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অনেকখানি জুড়ে একটা জংলা জায়গা। সাপখোপের বাসা। মাঝখানে একটা ধ্বংসস্তূপ। কাছেপিঠে লোকালয় বলতে এই

শিমুলগড়, তা সেটাও দেড় মাইল দূরে। আমি খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে ক্যাম্প খাটিয়ে আমার কাজ শুরু করলাম। প্রথম জায়গাটা মাপজোখ করা এবং নিশানা ঠিক করা। প্রাসাদের যা অবস্থা তাতে মাটির নীচের সব প্রকোষ্ঠই ভেঙে ধসে গেছে। সুতরাং ভুলভুলাইয়ার পথ ধরে যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু চন্দ্রকুমারের বিবরণে সেই পথের কথাই আছে! ফলে আমার কাজ বহুগুণ বেড়ে গেল। চন্দ্রকুমার একটা জয়স্তম্ভের কথা বলেছেন। তার নীচের প্রকোষ্ঠেই মোহর থাকার কথা। কিন্তু জয়স্তম্ভ যে কোথায় ছিল তা কে জানে। সারাদিন মাপজোখ আর খোঁড়াখুঁড়িতে অমানুষিক পরিশ্রম যাচ্ছে। তার চেয়েও ভয়ের কথা, চন্দ্রকুমারকে যদি রাজা ইচ্ছে করেই ভুল নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তা হলে আমার গোটা পরিশ্রমই পণ্ডশ্রম হবে। জল এবং খাবারের বেশ অভাব হচ্ছিল। কাজ করতে-করতে খাওয়ার কথা মনেও থাকত না। অনিয়মে এবং এদেশের জলে আমার পেট খারাপ হল, শরীর ভেঙে যেতে লাগল। আমি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। যে-কথাটা এতক্ষণ বলিনি সেটা হল, রায়দিঘিতে ক্যাম্পে থাকার সময় আমার কিন্তু সারাক্ষণই মনে হত, আমি ঠিক একা নই। কেউ যেন আড়াল থেকে আমার ওপর নজর রাখছে। রাত্রিবেলা আমি তাঁবুর আশেপাশে পায়ের শব্দ পেতাম যেন। উঠে টর্চ জ্বেলে, কাউকে দেখতে পেতাম না! যখন অসুস্থ হয়ে পড়লাম তখন একদিন জ্বরের ঘোরের মধ্যে শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে, নিমগাছে যে গুলঞ্চ হয়ে আছে সেটা চিবিয়ে খেলে সেরে যাবে।

"আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন সত্যিই নিম-গুলঞ্চ খেয়ে শরীর অনেকটা সুস্থ হল। তারপর আরও দু'দিন দু'রকম পাতার নাম শুনলাম, কুলেখাড়া আর থানকুনি। কোথায় আছে তাও বলে দিল। খেয়ে আরও একটু উপকার হল। কিন্তু, কথা হল, লোকটা কে? তার মতলবটাই বা কী। একদিন নিশুতরাতে তার আগমন টের পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কে?' জবাবে সে বলল, 'আমি ছায়াময়।'"

অলঙ্কার অবাক হয়ে বলে, "ছায়াময়? আরে, আজ সকালে তো ছায়াময়ই আমাকে বলল, বাঁশঝাড়ের পেছনের জঙ্গলে একটা জিনিস পাবে! আমি গিয়ে আপনাকে দেখতে পেলাম।"

ইন্দ্র মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলে, "তা হলে বলতেই হবে, সে যদি মানুষ হয়, তবে খুব মহৎ মানুষ, আর যদি ভূত হয়, তবে খুব উপকারী ভূত।"

"তারপর বলুন।"

"দিন কুড়ি দিনরাত খেটে অবশেষে বিজয়স্তম্ভের একটা আভাস পেলাম। পাওয়ার ড্রিল দিয়ে গর্ত করে ভেতরে আলো ফেলে গর্ভগৃহ পাওয়া গেল। সেখানে ধুলোময়লা রাবিশের স্তূপ। কোনওরকমে ফোকরটা বড় করে নীচে নেমে বিস্তর ময়লা সরিয়ে তবে পেতলের কলসিটা পাওয়া গেল। মোহর সমেত।"

অধরা কথার মাঝখানে বলে ওঠেন, "বাবা ইন্দ্র, তোমার গলা শুকিয়ে গেছে, একটু ঠাণ্ডা জল খেয়ে নাও।"

জল খেয়ে ইন্দ্র বলল, "অনেক মেহনত করে বিকেলে সেই কলসিটা ওপরে তুলে আনলাম। তাঁবুতে এনে মোহর বের করে দেখলাম, সত্যিই অমূল্য সব মোহর। পাঁচ-সাতটা তো খুবই দুষ্প্রাপ্য। মোহরগুলো দেখে আমি এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলাম যে, চারদিকে তাকাবার মতো অবস্থাও নয়। এক-এক করে গুনে দেখলাম মোট দুশো এগারোখানা আছে। আমার হিসাবে কয়েক কোটি টাকার সম্পদ। গুনে যখন শেষ করেছি, তখন হঠাৎ তাঁবুর দরজা থেকে একটা মোলায়েম গলা বলে উঠল, 'হ্যাঁ, দুশো এগারোখানাই আছে।' চমকে তাকিয়ে দেখি, শূল হাতে দাড়ি-গোঁফওয়ালা এক বিশাল মূর্তি। চোখ দু'খানা জুলজুল করছে, মুখে একখানা বাঁকা হাসি। পরনে টকটকে লাল রঙের একটা পোশাক। তাকে দেখে প্রথমটায় ভীষণ চমকে গেলেও টপ করে সামলেও নিলাম। তা হলে এই লোকটাই ছায়াময়! এইই আড়াল থেকে আমার গতিবিধি নজরে রাখছিল এবং আমার কিছু উপকারও করেছে। কিন্তু আসল সময়ে ঠিক এসে হাজির হয়েছে সশরীরে! আমি যখন মোহরগুলো একটা চামড়ার ব্যাগে পুরছিলাম, লোকটা হাত বাড়িয়ে বলল, 'দিয়ে দে, দিয়ে দে, ও মায়ের জিনিস, মায়ের কাছেই থাকবে। তুই কেন পাপের ভাগী হতে যাস?' লোকটা যে জালি তাতে সন্দেহ নেই। আমি হঠাৎ উঠে লোকটাকে একটা ঘুসি মারলাম। বিদেশে আমি বকসিং-টকসিং করেছি বটে, কিন্তু এখন না খেয়ে অসুখে ভুগে আমার শরীর খুব দুর্বল। কিন্তু এদেশের লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য ও সহ্যশক্তি এতই খারাপ যে, আমার সেই দুর্বল ঘুসিতেই লোকটা ঘুরে পড়ে গেল। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে দেখি, একটু দূরে আরও একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় কাপালিকের চেলা। সে আমাকে দেখে তেড়ে এল। আমি বিপদ বুঝে জঙ্গলে ঢুকে গা ঢাকা দিলাম। একটু অন্ধকার হতেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অনেক কষ্টে শিমুলগড়ে পৌঁছই। গায়ে তখন একরত্তি শক্তি নেই, খিদেয়-তেষ্টায় ভেতরটা কাঠ হয়ে আছে। কারও বাড়িতে আশ্রয় চাইতে আমার সাহস হল না। কে কেমন লোক কে জানে! অত মোহর নিয়ে কোনও বিপদের মধ্যে পা বাড়ানো ঠিক নয়। আমি একটা আমবাগানে ঢুকে সেখানেই রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা আমার কর্তব্য ভেবে দেখব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু কপাল খারাপ। যখন একটা গাছতলায় বসে গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, তখনই কয়েকটা কুকুর তেড়ে এল। অগত্যা গাছে উঠলাম। পাশেই একটা বাড়ি। গাছের একটা মোটা ডাল বাড়ির দেওয়ালের ওপাশে ঝুঁকে পড়েছে, ভেতরে একটা খড়ের

গাদা। ভাবলাম যদি খড়ের গাদায় লাফিয়ে পড়তে পারি, তা হলে আরামে রাতটা কাটানো যাবে। কিন্তু যেদিন ভাগ্য মন্দ হয় সেদিন সব ব্যাপারেই বাধা আসে। খড়ের গাদায় লাফিয়ে নামতেই কুকুর আর দরোয়ানের তাড়া খেয়ে একটা ঘরে ঢুকলাম। একদম ইঁদুরকলে ধরা পড়ে যেতে হল। মোহর গেল, মার খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আর কিছু মনে নেই। সকালে অলঙ্কার গিয়ে আমাকে নিয়ে আসে।"

হরিপদ মাথা নেড়ে বলেন, "তা হলে এই হল ব্যাপার! গগন সাঁপুই যা রটাচ্ছে তা যে সত্যি নয়, তা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। চোর নাকি তার যথাসর্বস্ব নিয়ে পালাচ্ছিল। ও-বাড়িতে চোরের চৌদ্দ পুরুষের সাধ্যি নেই যে, সেঁধোয়। কুকুর, দরোয়ান, তিনটে জোয়ান ছেলে, লোকলশকর তো আছেই, তার ওপর তার দরজা-জানলা সব কেল্লার মতো মজবুত, এই পুরু ইস্পাতের সিন্দুক। এ-তল্লাটের কোনও চোর ও-বাড়িতে নাক গলাবে না। আর আমার যখন ডাক পড়েছে তখন সন্দেহ নেই গগন বাটপাড়ি করা সোনা তাড়াতাড়ি গলিয়ে ফেলতে চাইছে।"

ইন্দ্র ফ্যাকাসে মুখে বলে, "তা হলে সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হয়ে যাবে। যেমন করেই হোক ওই মোহর রক্ষা করা দরকার। পৃথিবীর বহু মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা ওসব মোহর লুফে নেবে।"

অলঙ্কার বলল, "আচ্ছা, পুলিশে জানালে কেমন হয়?"

ইন্দ্র ম্লানমুখে বলে, "আমি সরকারি অনুমতি ছাড়াই খোঁড়াখুঁড়ি করেছি, তাই আইন বোধ হয় আমার পক্ষে নেই।"

হরিপদও মাথা নেড়ে বলে, "তা ছাড়া পুলিশের সঙ্গেও গগনের সাঁট আছে। মোহরও এতক্ষণে গোপন জায়গায় হাপিস হয়ে গেছে। পুলিশ ইচ্ছে করলেও কিছু করতে পারবে না।"

ইন্দ্র করুণ স্বরে বলে, "তা হলে?"

হরিপদ উঠে গায়ে জামা চড়াতে-চড়াতে বলে, "আমি গগনের বাড়ি যাচ্ছি। একমাত্র আমাকেই সে মোহরগুলো বের করে দেখাবে। চোরাই মোহর যত তাড়াতাড়ি গলিয়ে ফেলা যায় ততই তার পক্ষে নিরাপদ। তবে তুমি ভেবো না ইন্দ্র। মোহর যাতে না গলানো হয় সে-চেষ্টা আমি করব। আর-একটা কথা, তোমাকে কিন্তু একটু গা-ঢাকা দিয়েই থাকতে হবে। গাঁয়ের পাঁচজন যেন দেখতে না পায়। দেখলে একটা শোরগোল হবে। আর গগনের কানে গেলে সে হয়তো তার দুই ভাড়াটে খুনে কালু আর পীতাম্বরকে লেলিয়ে দেবে।"

"তারা কারা?"

"তারা এ-গাঁয়ের লোক নয়। নিকুঞ্জপুরে থাকে। সেখানে গিয়েই গোপন খবরটা পেলুম। এরা পয়সা পেলে নানা কুকর্ম করে দেয়। আগে গগন কখনও তাদের ডাকেনি। আজই হঠাৎ শুনলুম, কালু আর পীতাম্বরকে নাকি ডাকিয়ে এনেছে গগন। কেন কে জানে! তবে তুমি সশরীরে এ-গাঁয়ে আছ জানলে গগন আর ঝুঁকি নেবে না। তার ওপর গাঁয়ের লোকের কাছে তুমি চোর বলে প্রতিপন্ন হয়েই আছ। তোমার এখন চারদিকে বিপদ।"

"তাই দেখছি।" বলে ইন্দ্র বিষণ্ণ মুখে বসে রইল। তারপর শুকনো মুখে বলল, "নিজের বিপদ নিয়ে আমি তত ভাবছি না। মোহরগুলো নষ্ট না হলেই হল।"

হরিপদ একটু হেসে বলে, "ও-মোহরের ওপর আমারও একটু দরদ আছে হে। নকুড় কর্মকারের নামটা যখন জড়িয়ে আছে তখন ও-বস্তু নিয়ে হেলাফেলা করার উপায় আমার নেই। তবে কতটা কী করতে পারব তা ভগবান জানেন।"

ইন্দ্র বলে, "মোহরগুলো যে গগনের নয়, ওটা যে আমি রায়দিঘি রাজবাড়ি থেকে উদ্ধার করেছি, তার কিন্তু একজন সাক্ষী আছে। সে ওই কাপালিক।"

হরিপদ একটু হেসে বলে, "সেও মহা ধুরন্ধর লোক। তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। দুটো টাকা হাতে দিয়ে যদি তাকে বলতে বলো যে, সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে, তো সে তাই বলবে। ওসব লোকের কথার কোনও দাম নেই।"

"তবু আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে।"

হরিপদ বেরিয়ে যাওয়ার পর অধরা বলল, "দুপুরে তো কিছুই খাওনি বাবা। ভাত নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করেছ। একটু সাগু ভিজিয়ে রেখেছি, গাছের পাকা মর্তমান কলা আর মধু দিয়ে খাবে?"

ইন্দ্র একটু হেসে বলল, "দিন।"

সাগুর ফলার তার খুব খারাপ লাগল না।

খাওয়াদাওয়ার পর ইন্দ্র অলঙ্কারকে বলল, "আমাকে একটা ছদ্মবেশের ব্যবস্থা করে দিতে পারো? একটু বেরনো দরকার। হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব।"

অলঙ্কার একটু ভেবে বলে, "আপনি তো বাবার একটা লুঙ্গি পরে আছেন। গায়ে একটা গামছা জড়িয়ে নিলে চাষিবাসির মতো লাগবে। তবে আপনার রংটা তো ফরসা, একটু ভুষো কালি মেখে নিলে হয়ে যাবে।"

"মন্দ বলোনি। সহজ-সরল ছদ্মবেশই ভাল। নকল দাড়ি-গোঁফ লাগালে লোকের সন্দেহ হতে পারে।"

মতলব শুনে অধরা প্রথমটায় বারণ করলেও পরে বললেন, "তা হলে অলঙ্কারকেও সঙ্গে নাও বাবা। ও তো গাঁ চেনে। বিপদ হলে খবরটা দিতে পারবে।"

॥ ৪ ॥

গগন সাঁপুইয়ের বাড়ির পেছন দিকে ঢেঁকিঘরের দাওয়ায় দুটি লোক উবু হয়ে বসা। দু'জনেরই বেশ মজবুত কালো চেহারা। গগন সামনেই দাঁড়িয়ে। বসা লোক দুটোর একজন কালু, অন্যজন পীতাম্বর। কালু কথা-টথা বেশি বলে না। ভ্যাজর-ভ্যাজর করা তার আসে না। সে হল কাজের লোক। তবে পীতাম্বর বেশ বলিয়ে-কইয়ে মানুষ। পীতাম্বরের সঙ্গে গগনের একটু দরাদরি হচ্ছিল।

পীতাম্বর বলল, "রেটটা কি খুব বেশি মনে হচ্ছে গগনবাবু? বাজারের অবস্থা তো দেখছেন! কোন জিনিসটার দর এক জায়গায় পড়ে আছে বলতে পারেন? চাল, ডাল, নুন, তেল, আটা ময়দা, জামা-কাপড়—সব কিছুর দরই তো ঠেলে উঠছে! আমরাই বা তা হলে পুরনো রেটে কী করে কাজ করি বলুন?"

গগন একগাল হেসে বলে, "ওরে বাবা, এ তো আর খুনখারাপি নয় যে, দেড়শো টাকা হাঁকছিস। একটা পাজি লোককে একটু শুধু কড়কে দেওয়া, আর আলতো হাতে দু-চারটে চড়-চাপড় মারা। ধরলাম না হয়, মুখে যেসব বাক্যি বলবি তার জন্য পাঁচটা টাকাই নিলি। আর চড়চাপড় ধর, টাকায় একটা করে। কিছু কম রেট হল? ধর, যদি দশটা চড়ই কষাস তা হলে হল দশ টাকা, আর বকাঝকা চোখ রাঙানোর জন্য পাঁচ টাকা। তার ওপর না হয় আরও পাঁচটা টাকাই বকশিশ বলে দিচ্ছি। একুনে কুড়ি টাকা।"

পীতাম্বর হা-হা করে হেসে বলে, "এ তো সেই সত্যযুগের রেট বলছেন কর্তা। টাকায় একটা চড় কি পোষায় বলুন! আর ধমক-চমক তো এমন হওয়া চাই, যাতে লোকটার পিলে চমকে যায়! তা সেরকম ধমক-চমক চোখ রাঙানোর জন্য দরটাও একটু বেশি দিতে হবে বইকী! তার ওপর লোকটা আবার কাপালিক, মারণ-উচাটন জানে, বাণ-টান মারতে পারে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি মশাই, অত অল্প রেটে কাজ করতে গিয়ে কাপালিককে চটাতে পারব না।"

গগন শশব্যস্তে বলে, "ওরে না না। সে মোটে কাপালিকই নয়। এক নম্বরের ভণ্ড। এইটুকু বয়স থেকে চিনি। মারণ-উচাটন জানলে কবে এ-গাঁ শ্মশান করে ছেড়ে দিত। এসব নয় রে বাবা। তবে লোকটা পাজি। আমি বাবা নিরীহ মানুষ, তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব না। সে আমার গোরুর দুধ চায়, তার মায়ের থানে মন্দির তুলে দিতে বলে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার চিরকালই হয়ে আসছে, নতুন কথা কী? শোষণ, উৎপীড়ন, নির্যাতন—এসব আর কতদিন সহ্য করা যায় বল তো! দে বাবা, একটা অসহায় লোককে একটা শয়তানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দে। ভগবান তোদের মঙ্গল করবেন। কুড়ি না হয়, ওই পঁচিশই দেব। দশটা চড়ের দরকার নেই, গোটা দুই কম দিলেও হবে। তবে দাঁত কড়মড় করে চোখ পাকিয়ে হুমকিটা ভালরকম দেওয়া চাই। ওই সেবার ভট্ট কোম্পানির 'রাবণবধে' রাবণ যেমনধারা হনুমানকে দেখে করেছিল। দেখিসনি বুঝি? সে একেবারে রক্তজল-করা জিনিস।"

পীতাম্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলে, "ভাল জিনিসের জন্য একটু উপুড়হস্ত হতে হয় মশাই। কাঁচাখেকো কাপালিকের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিচ্ছেন, চড়চাপড় চাইছেন, রাবণের পার্ট চাইছেন, মাত্র পঁচিশটি টাকায় কি এত হয় কর্তা? হুঁঃ! এর ওপর কর্মফলের জন্য যে ভোগান্তি আছে, তার দামটা কে দেবে মশাই? আপনারা তো মশাই দু-পাঁচশো টাকা ফেলে দিয়ে হুকুম জারি করেই খালাস, ওমুকের লাশ ফেলে দিয়ে আয়, তমুকের ঘরে আগুন দিয়ে দে, ওমুকের খেতের ধান লোপাট কর, তমুকের মরাই ফাঁক করে দিয়ে আয়। ইদিকে এসব করতে গিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতায় তো আর আমাদের নামে ভাল-ভাল সব কথা লেখা হচ্ছে না। সেখানেও তো নামের পাশে ঘনঘন ঢ্যাঁড়া পড়ছে। এসব অপকর্মের জন্য নরকবাসের মেয়াদও তো বাড়ছেই মশাই! কুম্ভীপাকে শুনেছি, হাঁড়িতে ভরে সেদ্ধ করে, বিষ্ঠার চৌবাচ্চায় ফেলে রাখে বছরের পর বছর, কাঁটাওলা বেত দিয়ে পেটায়। তা মশাই সেসব ব্যাপারের জন্য দামটা কে দেবে? পাপ-তাপ কাটাতে আমাদের যে মাসে একবার করে কালীঘাট যেতে হয়, তারকেশ্বরে হত্যে দিতে হয় তার খরচটাই বা উঠছে কোত্থেকে? কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণেও গিয়ে একবার মাথা মুড়িয়ে আসতে হবে, তা তারও রাহাখরচা আছে। আপনারা তো কাজ বাগিয়ে খালাস, এখন মন্বতে মরুক কেলো আর পীতাম্বর। না কর্তা, অত শস্তায় হচ্ছে না। আমাদের পরকালটার কথাও একটু ভাববেন।"

গগন ভারী অমায়িক গলায় বলে, "ওরে বাবা, ভগবান কি আর কানা নাকি? বলি হ্যাঁ বাবা পীতাম্বর, একটা পাজি লোককে টিট করলেও কি পাপ হয়? তা হলে বলছ যে, রাবণকে মেরে রামচন্দ্রেরও পাপ হয়েছিল? নাকি দুর্যোধনকে মেরে ভীমের? পাজি বদমাশদের ঠাণ্ডা করলে ভগবান খুশি হয়ে তোদের আর পাঁচটা পাপই হয়তো কেটেকুটে দিলেন খাতা থেকে। তা ছাড়া দুর্বলকে রক্ষা করা তো মহাপুণ্যের কাজ। বিনি মাগনা করে দিলে তো খুবই ভাল, তাতে যদি না পোষায় তা হলে একটা ন্যায্য দরই নে। আমার দিকটাও একটু ভেবে বল বাবা, যাতে তোরও পুণ্যি হয়, আমার ট্যাঁকটাও বাঁচে।"

পীতাম্বর একটু গুম হয়ে থেকে বলে, "ওই চড়পিছু চারটে করে টাকা ফেলে দেবেন, আর চোখ রাঙানোর জন্য কুড়িটি টাকা। এর নীচে আর হচ্ছে না। আর চড়চাপড় অত হিসাব করে দেওয়া যায় না, দু-চারটে এদিক-ওদিক হতে পারে। ধরুন দুই চড়েই যদি কাজ হয়ে যায় তা হলে আট চড়ের কোনও দরকার নেই। আবার আটে কাজ না হলে দশ-বারোটাও চালাতে হতে পারে। তা কম-বেশি আমরা ধরছি না। ওই আট চড়ের বাবদ বত্রিশটা টাকা ধরে দেবেন। যদি রাজি থাকেন তো চিঁড়ে-দই আনতে বলুন, আমাদের তাড়া আছে। সেই আবার গঙ্গানগরে

এক বাড়িতে আগুন দিতে হবে আজ রাতেই। আপনার কাজটা সেরেই গঙ্গানগর রওনা হতে হবে। অনেকটা পথ।"

গগন একটু অবাক হয়ে বলে, "চিঁড়ে-দইয়ের কথা কী বললি বাপ? ঠিক যেন বুঝতে পারলুম না।"

পীতাম্বর আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "কাজ হাতে নিলে আমরা মক্কেলের পয়সায় একটু ফলার করি। ওইটেই রীতি। এর মানে হল, কাজটা আমরা হাতে নিচ্ছি। দু'জনের জন্য দু' ধামা চিঁড়ে, দু' ডেলা গুড়, সেরটাক দই, আর চারটি পাকা কলা। আর মায়ের পুজোর জন্য পাঁচ সিকে করে দু'জনের মোট আড়াই টাকা।

"বাপ রে! তোদের আস্পা বড় কম নয় দেখছি।"

"আপনি মশাই এত কেপ্পন কেন বলুন তো! সেই নিকুঞ্জপুর থেকে টেনে এনে তো ছুঁচো মেরে আমাদের হাত গন্ধ করাচ্ছেন। খুনখারাপি, আগুন দেওয়া-টেওয়া বড় কাজ নয়। এইসব কম টাকার কাজ আজকাল আর আমরা করি না। তার ওপর যা দরাদরি লাগিয়েছেন, এ তো পোষাচ্ছে না মশাই।"

"রাগ করিসনি বাপ। চিঁড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। পাইক-বরকন্দাজ তো আমারও আছে, কিন্তু তারা সব গেঁয়ো যোগী। কালী কাপালিক তাদের মোটেই ভয় খায় না। উলটে চোটপাট করে। কাজটা কিন্তু ভাল করে করা চাই। যেন আর কখনও রা কাড়তে না পারে। মুখ একেবারে বন্ধ করে দিবি।"

গগন হাঁকডাক করে চিঁড়ে-দই সব আনিয়ে ফেলল। কালু আর পীতাম্বর যখন ফলারে বসেছে তখন কাজের লোক কেষ্ট এসে খবর দিল, হরিপদ কর্মকার এসেছে। গগন শশব্যস্তে বাইরে বেরিয়ে এল।

একগাল হেসে গগন বলল, "এসেছিস ভাই হরিপদ! আয়, বিপদের দিনে তুই ছাড়া আর আমার কে আছে বল? ভেতরে চল ভাই, একটু গোপন শলাপরামর্শ আছে।"

হরিপদকে ঘরে ঢুকিয়ে খিল এঁটে গগন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "বিপদ যখন আসে তখন চতুর্দিক থেকেই আসে। শুনেছিস তো, কাল রাতে এক সাঙ্ঘাতিক চোর ঢুকেছিল বাড়িতে! সে কী চোর রে বাবা, এইটুকুন বয়স, কিন্তু তার বুদ্ধি আর কেরামতির বলিহারি যাই। দু-দুটো বাঘা কুকুর, পাইক, বাড়িসুদ্ধু এত লোকজন, মজবুত দরজা-জানলা কিছুই তাকে রুখতে পারেনি। ঘরে ঢুকে সিন্দুক ভেঙে যথাসর্বস্ব নিয়ে পালিয়েই গিয়েছিল প্রায়। মা মঙ্গলচণ্ডীই রক্ষা করেছেন। এ কী দিনকাল পড়ল রে হরিপদ? এ যে বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা! কলিযুগের শেষদিকটায় নাকি চোর-বাটপাড়দের খুব বাড়বাড়ন্ত হবে। তাই হচ্ছে দেখছি। ওদিকে বিজ্ঞানের যা অগ্রগতি হচ্ছে শুনতে পাই সেটাও ভয়েরই ব্যাপার। বিজ্ঞানের কলকাঠি সব চোরদের হাতেই চলে যাচ্ছে বুঝি! নইলে এত লোককে ঘুম পাড়িয়ে নিঃসাড়ে কাজটা যে কী করে সেরে ফেলল, সেইটেই ভেবে পাচ্ছি না। তাই ভাবছি সোনাদানা আর ঘরে রাখা ঠিক নয়। মুকুন্দপুরের বিশু হাজরার চালকলটা কিনব-কিনব করছিলাম, বায়নাপত্তরও হয়ে আছে। বিশু হাজরাও চাপ দিচ্ছে খুব। তাই ভাবছি, আর দেরি নয়, ঘরের সোনার ওপর যখন চোর-ছ্যাঁচড়ের নজর পড়েছে, তখন ও জিনিস না রাখাই ভাল। ধানকল তো আর চোরে নিতে পারবে না, কী বলিস?"

হরিপদ কাঁচুমাচু মুখে বলে, "আজ্ঞে, তা তো বটেই।"

গগন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "নেইও বেশি কিছু। ঠাকুরদার আমলের গোটাকয় মোহর। স্মৃতিচিহ্নই একরকম। কতকালের জিনিস। গঞ্জের শাবলরাম মাড়োয়ারির সঙ্গে কথাও হয়েছে। তবে সে সেয়ানা লোক। বলে কিনা, পুরনো আমলের মোহরে নাকি মেলা ধুলোময়লা ঢুকে থাকত। সত্যি নাকি রে?"

হরিপদ মাথা নেড়ে বলে, "আজ্ঞে, অতি সত্যি কথা। সে আমলে সোনার শোধনের তেমন ব্যবস্থা ছিল না তো।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গগন বলে, "মাড়োয়ারিও তাই বলছে রে। সে বলেছে, মোহর গলিয়ে শোধন করে খাঁটি সোনার বাট দিলে সে নগদ টাকায় কিনে নেবে। তুই ভাই, চটপট কাজটা করে দে। মাড়োয়ারির পো কাল বাদে পরশুই নাকি দেশে চলে যাবে। তার মেয়ের বিয়ে। সোনাদানার তারও বড় দরকার। তোর জিনিসপত্তর আজই নিয়ে চলে আয়। কোণের ঘরে বসে কাজ করবি।"

হরিপদ একটু উদাস মুখে বলে, "আগে মোহরগুলো তো দেখি।"

গগন তার লোহার আলমারি খুলে চমৎকার চামড়ার ব্যাগখানা বের করল। একটু দুঃখী মুখে বলল, "তুই ছাড়া বিশ্বাসী লোকই বা আর পাব কোথায়। কাজটা করে দে, থোক পঞ্চাশটা টাকা দেব'খন। তবে আজ রাতেই কাজ সেরে ফেলা চাই।"

গগন হরিপদর হাতে কয়েকখানা মোহর দিতে সে সেগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। বিকেলের আলো মরে এসেছে। গগনের ঘরে জানলা-দরজাও বড্ড কম। তবু আবছা আলোতেও সে যা দেখল, তাতে ইন্দ্রর কথায় আর সন্দেহ নেই। সে গগনের দিকে চেয়ে বলে, "গগনবাবু, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।"

"অভয় মানে! তোর আবার ভয়ের আছেটা কী?"

"বলছি, এ-মোহর গলিয়ে আপনি যা সোনা পাবেন, সেটা এমন কিছু নয়। পান অনেক বাদ যাবে। কিন্তু..."

গগন ব্যগ্র গলায় বলে, "কিন্তুটা আবার কী রে?"

"ভাবছি ভগবান যাকে দেন তাকে ছপ্পর ফুঁড়েই বুঝি দেন। আপনার কপালটা খুবই ভাল।"

গগনের মুখে একটা লোভনীয় ভাব জেগে উঠলেও মনের ভাব চেপে রেখে সে গম্ভীর হয়ে বলে, "কপালের কথা বলছিস হরিপদ! ঘরের সোনা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর বলছিস ভগবান ছপ্পর ফুঁড়ে দিচ্ছেন! এত দুঃখেও বুঝি আমার হাসিই পাচ্ছে। তা হ্যাঁ রে হরিপদ, একটু ঝেড়ে কাশবি বাবা? তাপিত এ প্রাণটা জুড়োবার মতো কোনও লক্ষণ কি দেখছিস রে ভাই? মেঘের কোলে কি আবার কোনওদিন রোদ হাসবে রে?"

হরিপদ মাথা নেড়ে বলে, "বলে লাভ কী গগনবাবু? গরিবের কথায় আপনার হয়তো প্রত্যয় হবে না। পেটের দায়ে উঞ্ছবৃত্তি করে-করে মানুষ হিসাবে আমাদের দামই কমে গেছে।"

গগন হরিপদর হাতটা খপ করে জাপটে ধরে বলে, "আর দগ্ধে মারিস না ভাই। বলে ফ্যাল।"

হরিপদ মাথা চুলকে বলে, "যা বলব তা বিশ্বাস হবে তো?"

"খুব হবে। বলেই দ্যাখ না। তোর হল জহুরির চোখ। আজ না হয় আতান্তরে পড়ে তোর দুর্দশা যাচ্ছে। কিন্তু গুণী লোকের কি কদর না হয়ে উপায় আছে রে! তোরও একদিন মেঘের কোলে রোদ হাসবে, দেখিস।"

"আমার রোদ হাসবে কি না জানি না, তবে আপনার রোদ তো একেবারে হা-হা করে অট্টহাসি হাসতে লেগেছে গগনবাবু। এ যা জিনিস দেখালেন তাতে আমার ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। তবে ভগবানের একটা দোষ কী জানেন গগনবাবু, তিনি বড্ড একচোখো লোক। তিনি কেবল তেলা মাথাতেই তেল দেন। এই যে মনে করুন আপনি, আপনার ঘরদোরে তো মা-লক্ষ্মী একেবারে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, পুকুরভরা মাছ, তবু এই দুষ্প্রাপ্য মোহরের থলিটাও যেন আপনাকে না দিলেই ভগবানের চলছিল না। এর একখানা মোহর পেলেই আমার—শুধু আমার কেন, এই গোটা গাঁয়ের ভাগ্য ফিরে যেত, তা জানেন? আমার সব ধারকর্জ শোধ হয়েও সাতপুরুষের বন্দোবস্ত হয়ে যেত।"

গগন আকুল হয়ে বলে, "ওরে, ওরকম বলিসনি। আর একটু ঝেড়ে কাশ ভাই, পেট-খোলসা করে বল। তোর সেই পঞ্চাশ টাকা ধার তো! বেড়ে-বেড়ে শ'চারেক হয়েছে। এই আজই সেই ধার আমি বাতিল করে দিচ্ছি। কাগজপত্র হাতের কাছেই আছে। দাঁড়া।"

এই বলে গগন আলমারি খুলে কোথা থেকে একখানা কাগজ বার করে হরিপদকে দেখিয়ে নিয়ে ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। তারপর বলল, "এবার বল ভাই। তোর পাওনাও মার যাবে না। পঞ্চাশের জায়গায় একশো দেব।"

হরিপদ গলাখাঁকারি দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "কিছু মনে করবেন না গগনবাবু, আমি হলুম গে নকুড় কর্মকারের নাতির নাতি। নকুড় কর্মকার ছিলেন রায়দিঘির রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের খাস স্বর্ণকার। আমরা এইসব পুরনো মোহর, ধাতুর জিনিস, গয়নাগাটির জহুরি। আমাদের বংশের ধারা এখনও লোপ পায়নি। এই মোহর সম্পর্কে আমার মত যদি সত্যিই চান তা হলে উপযুক্ত নজরানাও দিতে হবে। পুরো পাঁচটি হাজার টাকা।"

গগন চোখ উলটে ধপাস করে চৌকির ওপর বসে পড়ে বলে, "ওরে, আমার চোখেমুখে জল দে। এ যে হরিপদর বেশ ধরে ঘরে ঢুকেছে এক ডাকাত!"

"ঘাবড়াবেন না গগনবাবু। এইসব মোহরের আসল দাম শুনলে পাঁচ হাজার টাকাকে আপনার স্রেফ এক টিপ নস্যি বলে মনে হবে।"

চোখ পিটপিট করে গগন বলে, "সত্যি বলছিস তো! ধোঁকা যদি দিস তা হলে কিন্তু...।"

একটু থেমে হরিপদ বলে, "ধোঁকা দেওয়ার মতো বুকের জোর আমার নেই। দরকার হলে আমার গর্দান নেবেন। কালু আর পীতাম্বর তো আপনার হাতেই আছে।"

গগন ধড়মড় করে উঠে বলে, "আহা, আবার ও-কথা কেন? কালু আর পীতাম্বর এই পথ দিয়েই কোথায় যাচ্ছিল, খিদে-তেষ্টায় কাহিল, এসে হাজির হল। তা আমি তো ফেলতে পারি না, শত হলেও অতিথি। একটু ফলার করেই চলে যাবে। কথাটা চাউর করার দরকার নেই। হ্যাঁ, এখন মোহরের কথাটা হোক!"

"হবে। মোহর সম্পর্কে আপনাকে যা বলব তার জন্য পাঁচটি হাজার টাকা এখনই আগাম দিতে হবে গগনবাবু। নইলে মুখ খোলা সম্ভব নয়। এ-আমাদের বংশগত বিদ্যে। বিনা পয়সায় হবে না।"

গগন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত চোখে চেয়ে থেকে বলে, "কুলুঙ্গিতে মা-কালীর একটা ফোটো আছে দেখছিস? ওই ফোটো ছুঁয়ে বল যে, সত্যি কথা বলছিস।"

হরিপদ ফোটো ছুঁয়ে বলে, "সত্যি কথাই বলছি।"

"পাঁচ হাজার টাকা কত টাকায় হয় জানিস? একখানা-একখানা করে গুনলে গুনতে কত সময় লাগে জানিস? জন্মে কখনও দেখেছিস পাঁচ হাজার টাকা একসঙ্গে?"

হরিপদ একটু বিজ্ঞ হাসি হেসে বলে, "আপনি এই মোহর নিয়ে গঞ্জের নব কর্মকার বা বসন্ত সেকরার কাছে গিয়ে যদি হাজির হন তা হলে তারা চটপট মোহর গলিয়ে দেবে, মূর্খরা তো জানেও না যে, এইসব মোহর এক-একখানার দামই লাখ-লাখ টাকা। আমাকে না ডেকে যদি তাদের কাউকে ডাকতেন, তা হলে আপনার লাভ হত লবডঙ্কা।"

গগন চোখের পলক ফেলতে ভুলে গিয়ে বলল, "কত টাকা বললি?"

"লাখ-লাখ টাকা। সব মোহরের সমান নয়। এক-এক আমলের মোহরের দাম এক-একরকম। এগুলো সবই ঐতিহাসিক জিনিস! দুনিয়ার সমঝদাররা পেলে লুফে নেবে। তবে হুট বলে বিক্রি করতে বেরোবেন না যেন। তাতে বিপদ আছে। পুলিশ জানতে পারলে খপ করে ধরে ফাটকে দিয়ে দেবে। এর বাজার আলাদা। চোরাপথে ছাড়া বিক্রি করা যাবেও না। কিন্তু কথা অনেক হয়ে গেছে। যদি হরিপদ কর্মকারের মাথা ধার নেন তবে তার দক্ষিণা আগে দিয়ে নিন।"

গগনের হাত-পা কাঁপছে উত্তেজনায়। কাঁপা গলাতেই সে বলে, "ওরে, আর একটু বল। শুনি। এ যে অমাবস্যায় চাঁদের উদয়!"

"বলতে পারি। কিন্তু আগে দক্ষিণা।"

গগন ফের আলমারি খুলল এবং কম্পিত হাতে সত্যিই পাঁচ হাজার টাকা গুনে হরিপদর হাতে দিয়ে বলে, "যদি আমাকে ঘোল খাইয়ে থাকিস তা হলে নির্বংশ ভিটেছাড়া করে দেব কিন্তু।"

"সে জানি।" বলে হরিপদ টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজল। তারপর বলল, "মশাই, আমি যদি লোকটা তেমন খারাপই হতুম, তা হলে এই মোহরের আসল দাম কি বলতুম আপনাকে? বরং এর একখানা সোনার দামে কিনে নিয়ে গিয়ে লাখ টাকা কামিয়ে নিতুম। সে তুলনায় পাঁচ হাজার টাকা কি টাকা হল?"

গগন একটা শ্বাস ফেলে বলে, "না, তুই ভাল লোক। তোর মনটাও সাদা। এবার মোহরের কথা বল।"

হরিপদ মোহরগুলো মেঝের ওপর উপুড় করে ঢেলে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বলল, "মোট দু'শো এগারোখানা আছে, তাই না?"

গগন একখানা শ্বাস ছেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"এর মধ্যে নানা জাত আর চেহারার মোহর দেখতে পাচ্ছেন তো! কোনওটা তেকোনা, কোনওটা ইংরেজি 'ডি' অক্ষরের মতো, কোনওটা ছ'কোনা, কোনওটা পিরামিডের মতো—এগুলোই পুরনো। হাজার দেড় হাজার বছর আগেকার। এগুলোর দামই সবচেয়ে বেশি। গোলগুলো তত পুরনো নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এগুলোও কম যায় না। এগুলো যদি গলিয়ে ফেলতেন গগনবাবু, তা হলে যে কী সর্বনাশই হত!"

"পাগল নাকি! গলানোর কথা আর উচ্চারণও করিস না, খবরদার।"

হরিপদ মাথা চুলকে বলে, "কিন্তু মুশকিল কী জানেন, এসব যে অতি সাঙ্ঘাতিক মূল্যবান জিনিস!"

"বুঝতে পারছি রে। তা হ্যাঁ রে, দু'শো এগারোর সঙ্গে লাখ-লাখ গুণ দিলে কত হয়?"

"তার লেখাজোখা নেই গগনবাবু, লেখাজোখা নেই। আর সেইটেই তো হয়েছে মুশকিল।"

গগন তেড়ে উঠে বলে, "কেন, দু'শো এগারোর সঙ্গে লাখ-লাখ গুণ দিতে আবার মুশকিল কিসের? আজকাল তো শুনি গুণ দেওয়ার যন্ত্র বেরিয়ে গেছে! ক্যারেক্টার না ক্যালেন্ডার কী যেন বলে!"

"ক্যালকুলেটার।"

"তবে? ওই যন্ত্র একটা কিনে এনে ঝটপট গুণ দিয়ে ফেলব। মুশকিল কিসের?"

"গুণ তো দেবেন। গুণ দিয়ে কূলও করতে পারবেন না। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। এত টাকার জিনিস আপনার ঘরে আছে জানলে যে এ-বাড়িতে ভাগাড়ে শকুন পড়ার মতো দশা হবে! ডাকাতরা দল বেঁধে আসবে যে! কুকুর, বন্দুক, দরোয়ান দিয়ে কি ঠেকাতে পারবেন? গাঁয়ে-গঞ্জে কোটি-কোটি টাকার জিনিস তো মোটেই নিরাপদ নয়।"

গগন চোখ স্থির করে বলে, "কত বললি?"

"কোটি-কোটি।"

"ভুল শুনছি না তো! কোটি-কোটি?"

"বহু কোটি গগনবাবু। আর ভয়ও সেখানেই।"

গগন হঠাৎ আলমারি খুলে একটা মস্ত ভোজালি বের করে

ফেলল। তারপর তার মুখ-চোখ গেল একেবারে পালটে। গোলপানা অমায়িক মুখখানা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল, চোখে সাপের ক্রূরতা। চাপা গলায় গগন বলে, "মোহরের খবর তুই ছাড়া আর কেউ জানে না। তোকে মেরে পাতালঘরে পুঁতে রেখে দিলেই তো হয়।"

হরিপদ দু'পা পেছিয়ে গিয়ে সভয়ে বলে, "আজ্ঞে, আমার কাছ থেকে পাঁচকান হবে না। সে ভয় নেই। কিন্তু আপনারও বুদ্ধির বলিহারি যাই। এই হরিপদ কর্মকার ছাড়া ও-মোহর বেচবেন কী করে? মোহরের সমঝদার পাবেন কোথায়? এ-তল্লাটে তেমন সেকরা একজনও নেই যে, এইসব মোহরের আসল দাম কত তা বলতে পারে। যদিবা শহরে-গঞ্জে কাউকে পেয়েও যান সে আপনাকে বেজায় ঠকিয়ে দেবে বা মোহরের গন্ধ পেয়ে পেছনে গুণ্ডা-বদমাশ লেলিয়ে দেবে। কাজটা সহজ নয় গগনবাবু।

গগন সঙ্গে-সঙ্গে ভোজালিটা খাপে ভরে আলমারিতে রেখে একগাল হেসে বলে, "ওরে, রাগ করলি নাকি? আমি তোকে পরীক্ষা করলাম।"

হরিপদ মাথা নেড়ে বলে, "আমার আর পরীক্ষায় কাজ নেই মশাই, ঢের শিক্ষা হয়েছে। আমার পৈতৃক প্রাণের দাম মোহরের চেয়েও বেশি। আমি আপনার কাজ করতে পারব না। এই নিন, আপনার পাঁচ হাজার টাকা ফেরত নিন।"

এই বলে ট্যাঁক থেকে টাকা বের করে হরিপদ গগনের দিকে ছুঁড়ে দিল।

গগন ভারী লজ্জিত হয়ে বলে, "অমন করিসনি রে হরিপদ। একটা মানুষের মাথাটা একটু হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছিল বলে তুই এই বিপদে তাকে ত্যাগ করবি? তুই তো তেমন মানুষ নোস রে।"

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন না। আর বিশ্বাস না করলে এই মোহর হাতবদল করা আপনার কর্ম নয়। পাঁচ হাজার টাকায় তো আর মাথা কিনে নেননি।"

গগনবাবু পুনর্মূষিক হয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বলে, "দাঁড়া ভাই, দাঁড়া। আমারও মনে হচ্ছিল যেন, পাঁচ হাজার টাকাটা বড্ড কমই হয়ে গেল। তোকে আমি আরও দশ হাজার দিচ্ছি ভাই, আমাকে বিপদে ফেলে যাস না।"

"না মশাই, আপনার ভাবগতিক ভাল ঠেকছে না। এখন ছেড়ে দিচ্ছেন, কিন্তু পরে বিপদে ফেলবেন।"

"আচ্ছা, আরও দশ। মোট পঁচিশ হাজার দিলে হবে? না, তাও গাল উঠছে না, তোর? ঠিক আছে, আরও পাঁচ ধরে দিচ্ছি না হয়।"

বলে গগন আলমারি থেকে টাকার বান্ডিল বের করে মোট ত্রিশ হাজার টাকা গুনে দিয়ে বলল, "এবার একটু খুশি হ ভাই। কিন্তু কথা দে, তোর মুখ থেকে মোহরের খবর কাকপক্ষিতেও জানবে না। মা কালীর ফোটোটা ছুঁয়েই বল একবার।"

হরিপদ কালীর ফোটো ছুঁয়ে বলে, "জানবে না। আপনি মোহরগুলো গুনে-গুনে ব্যাগে ভরে আলমারিতে তুলে রাখুন। আলমারির চাবি সাবধানে রাখবেন। আর চারদিকে ভাল করে চোখ রাখা দরকার।"

"তা আর বলতে! তবে বড় ভয়ও ধরিয়ে দিয়ে যাচ্ছিস। আজ রাতে আর ঘুম হবে না যে রে।"

"ঘুম কম হওয়াই ভাল। সজাগ থাকাও দরকার। আমিও বাড়ি গিয়ে একটু ভাবি গে।"

"যা, ভাই যা। ভাল করে ভাব। কত যেন বললি? কোটি-কোটি না কী যেন! ঠিক শুনেছি তো!"

"ঠিকই শুনেছেন। এবার আমি যাই, দরজাটা খুলে দিন।"

আলমারি বন্ধ করে চাবি ট্যাঁকে গুঁজে গগন দরজা খুলে দিল।

হরিপদ গগনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বাজারে গিয়ে চাল, ডাল, তেল, নুন, আনাজ কিনে ফেলল। একশিশি ঘি অবধি। বাড়িতে ফিরে যখন বাজার ঢেলে ফেলল, তখন অধরা অবাক, "এ কী গো! এ যে বিয়ের বাজার!"

"এতদিনে ভগবান বুঝি মুখ তুলে একটু চাইলেন। বেশ ভাল করে রান্নাবান্না করো তো। আমি একটু ঘুরে আসছি।"

"আবার কোথায় যাচ্ছ?"

"জামাকাপড়ের দোকানে। তোমার জন্য শাড়ি, অলঙ্কারের জন্য প্যান্ট আর জামা নিয়ে আসি। ফিরে এসে সব বলব'খন। এখন সময় নেই। সন্ধে অনেকক্ষণ হয়েছে, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।"

॥ ৫ ॥

অঙ্কের সার রাসমোহনবাবু খুবই ভুলোমনের মানুষ। কাছাকোঁচা ঠিক থাকে না, এক রাস্তায় যেতে আর-এক রাস্তায় চলে যান, বৃষ্টির দিনে ছাতা নিতে গিয়ে ভুল করে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, প্রায়ই চকের বদলে পকেট থেকে কলম বের করে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষতে চেষ্টা করেন। বাজার করতে গিয়ে আজ রাসমোহনবাবু ভুল করে বাজার করার বদলে নব হাজামের কাছে বসে দাড়িটি কামিয়ে নিলেন। নব অবশ্য মিনমিন করে একবার বলল, "সকালেই তো একবার কামিয়ে দিয়েছি, আবার বিকেলেই কেন কামানোর দরকার পড়ল কে জানে বাবা। আপনি তো তিন দিন বাদে-বাদে কামান।" দাড়ি কামিয়ে রাসমোহনবাবু খুশিমনে বাড়ি ফিরছিলেন। সন্ধের মুখে বটতলায় হঠাৎ খপ করে কে যেন পেছন থেকে তাঁর হাত চেপে ধরে বলে উঠল, "আপনার যে দুটো হাতই বাঁ হাত মশাই!"

রাসমোহনবাবু খুবই চমকে গিয়ে পেছন ফিরে একটা হুমদো চেহারার লোককে আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "আমাকে কি অ্যারেস্ট করলেন দারোগাবাবু? কিন্তু খুনটা তো আমি করিনি। কে করেছে তাও জানি না। আসলে কেউ খুন হয়েছে কি না তাও বলতে পারব না।"

লক্ষ্মণ পাইক বিরক্ত হয়ে বলে, "খুনখারাপির কথা উঠছে কিসে? আসল কথাটাই চেপে যাচ্ছেন মশাই, আপনার দুটো হাতই যে বাঁ হাত!"

এ-কথায় রাসমোহনবাবু খুবই চিন্তিতভাবে তাঁর হাত দু'খানার দিকে তাকালেন। অন্ধকারে ভাল দেখতে পেলেন না। অত্যন্ত উদ্বেগের গলায় বললেন, "তাই তো! এ তো খুব গোলমেলে ব্যাপার দেখছি। এঃ, দু-দুটো বাঁ হাত নিয়ে আমি এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ তো ভুলটা ধরেও দেয়নি! ডান হাতের কাজ তা হলে এতকাল আমি বাঁ হাতেই করে এসেছি! ছিঃ ছিঃ! একেবারে খেয়াল করিনি তো! এখন কী হবে? এ তো খুব মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি!"

লক্ষ্মণ তার টর্চটা একবার পট করে জ্বেলে রাসমোহনের হাত দুটো দেখে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বলে, "না মশাই, আপনারও তো দেখছি দুটো দু'রকমেরই হাত। তা হলে দুই বাঁ-হাতওয়ালা লোকটা কোথায় গা-ঢাকা দিল বলুন তো! আচ্ছা আপনার নাম কি দন্ত্য ন দিয়ে শুরু?"

রাসমোহন সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, "দন্ত্য ন? দাঁড়ান-দাঁড়ান, একটু ভেবে দেখতে হবে। যতদূর মনে পড়ছে আমার নাম রাসমোহন নস্কর। রাসমোহন তো দন্ত্য ন দিয়ে শুরু হচ্ছে না মশাই। তা দন্ত্য ন দিয়ে শুরু হলে কি কিছু সুবিধে হত?"

লক্ষ্মণ ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলে, "সেই সকাল থেকে দন্ত্য ন আর বাঁ হাত খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে পড়লাম মশাই। তা লোক দুটো যে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে সেটাই বুঝতে পারছি না। নাঃ, আরও দেখতে হচ্ছে।"

লক্ষ্মণ হনহন করে এগিয়ে গেল। রাসমোহনবাবু খুবই চিন্তিতভাবে নিজের বাড়ি মনে করে ভুলবশত স্কুলের অন্ধকার দালানে উঠে একটা ক্লাসঘর ফাঁকা পেয়ে সেখানে ঢুকে বসে রইলেন।

নগেন মুদি সবে দোকান বন্ধ করার তোড়জোড় করছিল, এমন সময় লক্ষ্মণ এসে লাঠি বাগিয়ে দাঁড়াল, "এই যে নগেনবাবু, তোমার নাম তো দন্ত্য ন দিয়েই শুরু হে!"

নগেন রোগাভোগা রগচটা লোক। খিঁচিয়ে উঠে বলে, "তাতে কী হয়েছে? দন্ত্য ন দিয়ে শুরু হলে কি নামটা পচে গেছে? নাকি তোমার পাকা ধানে মই পড়েছে?"

লক্ষ্মণ বুক চিতিয়ে বলে, "তুমি লোক সুবিধের নও বাপু। যাদের নাম দন্ত্য ন দিয়ে শুরু হয়, তারা খুব খারাপ লোক।"

নগেন দোকানের ঝাঁপটা পটাং করে ফেলে ফোঁস করে ওঠে, "তোমার মাথায় একটু ছিটআছে নাকি! দন্ত্য ন দিয়ে নামের লোক যদি খারাপই হয়, বাপু তা হলে নগেন কেন, ন্যাপলা নেই নাকি? ওই যে নেপাল সাহা দু' বেলা খদ্দেরের গলা কাটছে, ঝলমলে দোকান সাজিয়ে সাপের পাঁচ পা দেখেছে, তার কাছে যাও না। গিয়ে একবার বীরত্বটা দেখিয়ে এসো দেখি, কেমন মানুষ বুঝি তা হলে! আর শুধু নেপালই বা কেন, ওই যে নবকেষ্ট, মাছ বেচে লাল হয়ে গেল, তার দাঁড়িপাল্লা কখনও উলটে দেখেছ? জন্মে কখনও কাউকে পাল্লার ফের দেখায় না, তার পাল্লার নীচে অন্তত দেড়শো গ্রাম চুম্বক লোহা সাঁটা আছে। যাও না তার কাছে। হুঁঃ, উনি আমাকে দন্ত্য ন চেনাতে এসেছেন!"

লক্ষ্মণ একটু ফাঁপড়ে পড়ল। দন্ত্য ন দিয়ে বিস্তর লোক পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কোনটা আসল দন্ত্য ন, তা বোঝা কঠিন। আর বাঁ-হাতওলা লোকটা যে কোথায় ঘাপটি মেরেছে তাই বা কে জানে বাবা। তবে লক্ষ্মণ সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয়।

ইটখোলার দিকে কদমতলায় হাঁদুর পান-বিড়ির দোকানে দুটো লোক পান কিনতে দাঁড়িয়েছে। টেমির আলোয় তাদের ভাল ঠাহর হচ্ছে না, কিন্তু পেছন থেকে দেখে বেশ লম্বা-চওড়া মনে হল। লক্ষ্মণ কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল, দু'জনের কোমরেই দু'খানা ল্যাজা গোঁজা রয়েছে। এরা লোক সুবিধের বলে মনে হল না তার। আর বেঁটে লোকটা তার ডান হাতখানা কি ইচ্ছে করেই একটু আড়াল করতে চাইছে? ওটি কি আসলে বাঁ হাত? দুটো হাতই কি তবে বাঁ? লক্ষ্মণ অবশ্য হুট করে গিয়ে লোকটাকে যাচাই করতে সাহস পেল না। সে সাত ঘাটের জল খেয়ে মানুষ চিনেছে। এই টেমির আলোতেও এদের পাশ-ফেরানো মুখ দেখে সে বুঝে গেল, এরা লাশটাস নামায়। লক্ষ্মণ একটু দূর থেকে নজর রাখতে লাগল। গতিবিধিটা একটু দেখতে হবে।

সেই থেকে গৌরগোবিন্দর মনটা আবার ফিঙেপাখির মতো নাচানাচি করছে। অনেকদিন বাদে শিমুলগড়ে একখানা জম্পেশ ঘটনা ঘটেছে বটে। গুম খুন আর দু'শো এগারোখানা মোহর। কালী কাপালিকটা ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে বটে, তার মধ্যে কি আর একটু-আধটু সত্যি কথার ভেজাল একেবারেই থাকবে না? গৌরগোবিন্দর মন বলছে, কথাটা একেবারে ফ্যালনা নয়। তা কালী কাপালিককে সকালে একঘটি দুধ খাইয়ে কথাটা আদায় করার পর গৌরগোবিন্দ ভেবেছিলেন ঘটনাটা চেপে রাখবেন। কারণ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন, কোনও-কোনও খবর চেপে রাখতে পারলে আখেরে তা থেকে লাভই হয়। সেই ছেলেবেলায়, সদিপিসির অম্বুবাচীর দিন ভুল করে এক ডেলা গুড় খেয়ে ফেলার কথা চেপে রেখেছিলেন বলেই দু' গণ্ডা পয়সা আদায় হয়েছিল। তাঁর মেজোখুড়ো যে তামাক খেতেন সে-কথাটা দাদুর কাছে চেপে যেতেন বলেই খুড়োমশাইয়ের কাছ থেকে যখন-তখন ঘুড়িটা লাটিমটা আদায় হত। সেইসব পুরনো কথা ভেবে মোহর আর গুম খুনের ব্যাপারটাও চেপেই রেখেছিলেন গৌরগোবিন্দ। কিন্তু, গোপন কথা অতি সাঙ্ঘাতিক জিনিস। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁর পেট ফেঁপে চোঁয়া ঢেকুর উঠতে লাগল। গায়ে ঘাম হতে লাগল। কানে দু'শো এগারোখানা মোহরের ঝনঝন শব্দে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। শরীরে আইঢাই, ঘনঘন জল খেতে হচ্ছিল। সে এক ভারী অস্বস্তিকর অবস্থা। গৌরগোবিন্দ তাই ছাতা নিয়ে বাড়ি-বাড়ি বেরিয়ে পড়লেন। বিজয় মল্লিক, পটল গাঙ্গুলি, নটবর ঘোষ, গাঁয়ের আরও সব মাতব্বরদের খবরটা দেওয়ার পর পেটের বায়ু নেমে গেল, গায়ের ঘাম শুকোল, কানের শব্দটাও বন্ধ হল।

কিন্তু মুশকিল হল কথাটা কেউ গায়ে মাখছে না। কালীটা তো গাড়ল আর আহাম্মক, আজগুবি সব কথা বলে বেড়ায়, তার কথায় প্রত্যয় হবে কার? সবাই শুনে হাসছে। হারান সরকার তো বলেই বসল, "তোমারও কি একটু বয়সের দোষ দেখা দিচ্ছে নাকি গো গৌরঠাকুরদা! নইলে কালীর কথায় মেতে উঠলে কেন?"

তবে যে-যাই বলুক, ভগবানের দয়ায় কালীর মুখ থেকে যদি এই একটা সত্যি কথাও জন্মে বেরিয়ে থাকে, তা হলে গাঁয়ে কী হুলুস্থুলুটাই না পড়ে যাবে! সেই কথা ভেবে মনটা সত্যিই আজ নেচে বেড়াচ্ছে গৌরগোবিন্দর। কতকাল পরে এই ঝিমধরা, ম্যাদাটে মার্কা, মরা গাঁয়ে একটা জম্পেশ ঘটনা ঘটেছে! ক'টা দিন গাঁ একটু গরম থাকবে। মাঝেমধ্যে উত্তরের মাঠে সার্কাস এলে যেমন হয়, রথের মেলা বা মহাকালীর পুজোয় যেমন একটু বেশ গরম থাকে গাঁ, অনেকটা তেমনই। তবে ভেতরে গুহ্য কথা থাকায় এটার স্বাদই আলাদা। খুন! চোরাই মোহর! উঃ, খুব জমে গেছে ব্যাপারটা। একেবারে লঙ্কার আচারের মতো। ঝাল-ঝাল, টক-টক, মিষ্টি-মিষ্টি। ভাবতে-ভাবতে দুপুরে আর ঘুমটাই হল না গৌরগোবিন্দর।

সন্ধেবেলায় এইসব বৃত্তান্ত নিয়েই আজ চণ্ডীমণ্ডপে একটা জমায়েত বসেছে। মাতব্বররা সবাই আছেন। মধ্যমণি পটল গাঙ্গুলি বেশ জমিয়ে বসে বললেন, "সব শোনো তোমরা, গৌরঠাকুরদা আজ কালী কাপালিকের কাছে এক আজগুবি গল্প শুনে এসেছেন। কালকে গগনের বাড়ি যে চোর ছোকরাটা ঢুকেছিল সে নাকি খুন হয়েছে, আর তার আত্মা নাকি আমাদের কালী কাপালিকের কাছে এসে গভীর রাতে নাকিকান্না কেঁদে গেছে যে, তার থলিতে দু'শো এগারোখানা মোহর ছিল। সেসব নাকি গগন গাপ করেছে।"

পরান সরকার মুখখানা তেতো করে বলল, "অ। তা এই আষাঢ়ে গল্প শোনার জন্যই কি হাঁটুর ব্যথা নিয়ে এতদূর নেংচে-নেংচে এলাম! ওই কালী তো কত কী বলে বেড়ায়! নাঃ, যাই, গিয়ে হাঁটুতে একটু সেঁক-তাপ দিই গে।"

নটবর ঘোষ বলে ওঠে, "আমারও একটা সমস্যা হয়েছে। গগনের ওই গুণ্ডা পাইক লক্ষ্মণটা বড় হুড়ো দিচ্ছে আমায়। রাম বিশ্বাসদা আজ সকালে একটু সাঁটে কী একটা কথা বলেছিল, সেই থেকে সে বড় হামলা করছে আমার ওপর। আমার নাকি দুটো হাতই বাঁ হাত, আমার নামের আদ্যক্ষর দন্ত্য ন বলে নাকি আমি লোক খুব খারাপ। আমি আপনাদের কাছে এর একটা বিহিত চাই। এ তো বড় অরাজকতা হয়ে উঠল মশাই।"

হারু সরখেল বলে উঠল, "কথাটা মিথ্যে নয়। আমাকেও আজ চৌপর দিন লক্ষ্মণকে বোঝাতে হয়েছে যে, আমার নাম নাড়ু নয়, হারু। ব্যাটা কিছুতেই বুঝতে চায় না।"

ঠিক এ-সময়ে হঠাৎ একটা রাখাল ছেলে দৌড়তে-দৌড়তে এসে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে থমকে দাঁড়াল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, "দাদুরা সব এখানে বসে রয়েছ! ওদিকে যে কালী কাপালিকের

পেটাই হচ্ছে !"

শুনে মাতব্বররা সব হাঁ-হাঁ করে ওঠে। পটল গাঙ্গুলি বলে ওঠেন, "পেটাচ্ছে মানে ! কে পেটাচ্ছে রে ছোকরা ? কেনই বা পেটাচ্ছে ?"

রাখাল ছেলেটা বলে, "ভিন গাঁয়ের লোক।"

নটবর ঘোষ হঠাৎ লাফ দিয়ে খাড়া হয়ে বলে, "কেন, বাইরের লোক এসে কালীকে পেটাবে কেন ? শিমুলগড় কি মরে গেছে ? কালী এ-গাঁয়ের লোক, পেটাতে হলে তাকে আমরা পেটাব। চলুন তো সবাই, দেখে আসি ব্যাপারটা ! এ কি অরাজকতা নাকি ?"

রাখাল ছেলেটা বলে, "উদিকে যেয়ো না কর্তা। বাইরের লোক হলেও তাঁরা হলেন কালু আর পীতাম্বর।"

নাম দুটো শুনেই সভাটা হঠাৎ ঠাণ্ডা মেরে নিশ্চুপ হয়ে গেল। নটবর ঘোষ আবার ভিড়ের মধ্যে টুপ করে বসে গা-ঢাকা দিল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে গৌরগোবিন্দ হঠাৎ ঝিমুনি কাটিয়ে খাড়া হলেন, "কালীকে পেটাচ্ছে ! সর্বনাশ ! সে যে আমাদের রাজসাক্ষী ! কালী খুন-টুন হয়ে গেলে যে মামলার কিনারা হবে না ! এ যে সব ভেস্তে যাবে দেখছি।"

বলে হাতের লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে গৌরগোবিন্দ চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নেমে তাঁর জুতো খুঁজতে লাগলেন ব্যস্ত হয়ে।

বিজয় মল্লিক হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, "করো কী ঠাকুরদা, তারা দুটি যে সাক্ষাৎ যমের স্যাঙাত ! মহাকালীর পুজোয় ওই কালুটা যে এক হাতে এক কোপে মোষের গলা নামিয়ে দেয়, দ্যাখোনি ? আর পীতাম্বরটা তো চরকির মতো তলোয়ার ঘোরায়।"

গৌরগোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠে বলেন, "তা বলে রাজসাক্ষী হাতছাড়া করব ? এতদিন বাদে একটা ঘটনা ঘটল গাঁয়ে, সেটার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেব ? আর কালু-পীতাম্বর যখন আসরে নেমে পড়েছে তখন বলতেই হবে বাপু, কালী কাপালিকের কথায় একটু যেন সত্যি কথাও আছে। না বাপু, আমাকে দেখতেই হচ্ছে ব্যাপারটা।"

রাম বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপের এককোণে বসে বাতাসে ট্যাঁড়া কাটছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "কালীর এখনই মৃত্যুযোগ নেই, সকালেই কপালটা দেখেছি ভাল করে।"

গৌরগোবিন্দ আর কোনও দৃকপাত না করে ছুটতে লাগলেন।

ইটখোলায় কালী কাপালিকের থানে দৃশ্যটা একটু অন্যরকম। যেমনটা ভাবা গিয়েছিল তেমনটি নয়।

সন্ধেবেলায় কালী একটু সিদ্ধি-টিদ্ধি খায়। বাণ মারে, ব্যোম-ব্যোম করে আর তার তিন-চারজন চেলা ধুনির আগুনে রান্না চাপায়।

বেশ শান্ত নিরিবিলি জায়গা। হাওয়া দিচ্ছে। চারদিক বেশ খোলামেলা। কালী তার শিষ্যদের বলছিল, "গগন ব্যাটার বুকের পাটা দেখলি তো ! কী এমন চাইলুম রে বাবা ! চোরাই মোহরগুলোর কথা তো পাপমুখে উচ্চারণও করিনি। এমনকী খুনটার কথাও চেপে গেছি। তা তার একটা দাম দিবি না ? নিজের জন্য কী চেয়েছি ? পাঁচটা ভক্ত আসবে, ভদ্রলোকেরা আসবে, তীর্থ হিসাবে শিমুলগড়েরই নাম হবে। কয়েক হাজার ইট আর কয়েক বস্তা সিমেন্ট হলেই হয়ে যেত। তার বদলে কয়েক বস্তা পুণ্যি ! আর আধসের করে দুধ—সেটাও তার বড্ড বেশি মনে হল নাকি রে ? ভক্তকে দুধ খাওয়ালে ভগবান খুশি হন, সেইটেই বুঝল না ব্যাটা পাপী।"

অন্ধকারে বাবলাবনের ভেতরের শুঁড়িপথটা দিয়ে দুটো ছায়ামূর্তি আসছিল। তারা আড়াল থেকে কথাটা শুনতে পেল। শুনে পীতাম্বর একখানা হাঁক পাড়ল, "এই যে, খাওয়াচ্ছি তোমাকে দুধ ! আর ইটের বন্দোবস্তও হচ্ছে।"

কালী প্রথমটায় কিছু বুঝে উঠবার আগেই পেল্লায় চেহারার

দুটো লোক এসে তার ওপর পড়ল। গালে বিশাল এক থাবড়া খেয়ে কালী চেঁচিয়ে উঠল, "মেরে ফেললে রে!"

চেলারা ফটাফট আড়ালে সরে গেল। চেঁচামেচি শুনে আশপাশ থেকে ছুটে এল কিছু লোক। তবে তারা বেশি এগিয়ে এল না। কালু আর পীতাম্বরকে সবাই চেনে।

কালু পর-পর আরও দু'খানা চড় কষাতেই পীতাম্বর বলে উঠল, "আহা, খামোখা চড়গুলো খরচা করছিস কেন? বত্রিশটা টাকার বেশি তো আর কঞ্জুষটার কাছ থেকে আদায় হবে না। আটখানা কড়ার।" এই বলে ভূপাতিত কালীর দিকে চেয়ে একটা বড় করে দম নিয়ে বিকট গলায় বলে উঠল, "এখন যদি হাড়িকাঠে ফেলে মায়ের নামে তোর গলাখানা নামিয়ে দিই তা হলে কী হয়? গুণ্ডামি আর গা-জোয়ারি তা হ'লে কোথায় থাকবে রে পাষণ্ড? ভাল-ভাল মানুষদের ওপর হামলা করে দুধ আর ইট-সিমেন্ট আদায় করছিস যে বড়, অ্যাঁ! গগন সাঁপুইয়ের টাকা বেশি দেখেছিস?"

কালী উঠল না। উঠলেই বিপদ। শুয়ে-শুয়েই বলল, "টাকা কোথায় গো পীতাম্বরদাদা? সব মোহর।

কালু একটা রদ্দা তুলেছিল, পীতাম্বরও কড়কে দেবে বলে হাঁ করেছিল, থেমে গেল দু'জনেই। "মোহর!"

কালী এবার উঠে বসে গা থেকে একটু ধুলো ঝেড়ে নিয়ে বলল, "সবই বুঝি গো পীতাম্বরদাদা, দিনকাল খারাপই পড়েছে। নইলে ওই ছুঁচোটার হয়ে এই শস্তার কাজে নামবার লোক তো তোমরা নও। তা কতয় রফা হল গগনের সঙ্গে?"

পীতাম্বর গম্ভীর গলায় বলে, "তা দিয়ে তোর কী দরকার? মুখ সামলে কথা বলবি।"

কালী দুঃখের গলায় বলে, "সে তোমরা না বললেও আন্দাজ করতে কষ্ট নেই। খুব বেশি হলে পাঁচ-সাতশো টাকায় রফা হয়েছে। আর কাল রাতেই কিনা পাষণ্ডটা দু'শো এগারোখানা মোহর বেমালুম গাপ করে ফেলল ভালমানুষ ছোকরাটার কাছ থেকে। ধর্মে সবই সইছে আজকাল হে। দু'শো এগারোখানা মোহর গাপ করে সেই ছোকরাকে মেরে কোথায় গুম করে ফেলল কে জানে! আমার দোষ হয়েছে কী জানো, মোহরের বৃত্তান্ত আমি জেনে ফেলেছিলুম। সে-কথা যাক, দিনকাল খারাপ পড়েছে বুঝতে পারছি, তোমাদের মতো বড়দরের ওস্তাদেরা যখন পাঁচ-সাতশো বা হাজার টাকায় কাজে নামছ তখন আকালই পড়েছে বলা যায়। তবে কিনা, মোহরগুলো গগনের ন্যায্য পাওনা নয়। কিন্তু সে-কথা তাকে বলবার সাহসটা আছে কার বলো?"

পীতাম্বর কালুর দিকে চেয়ে বলে, "দরটা বড্ড কমই হয়ে গেছে না রে?"

কালু খুব গম্ভীর মুখে বলে, "তোর আক্কেল যে কবে হবে! অত কমে কেন যে এত মেহনত খরচা করলি! চড়প্রতি দশ টাকা করে ধরলে হত।"

পীতাম্বর দুটো হাত ঝেড়ে চাপা গলায় বলে, "যা হয়েছে তা তো হয়েই গেছে। আর একটাও চড় খরচ করার দরকার নেই। বকাঝকাও নয়। বাহান্ন টাকার কাজ আমরা তুলে দিয়েছি।"

কালু বলল, "তার বেশিই হয়ে গেছে।"

পীতাম্বর দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল। তারপর কালীর দিকে চেয়ে বলে, "যাঃ, খুব বেঁচে গেলি আজ। এবার বৃত্তান্তটা একটু খোলসা করে বল তো!"

কালী ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বড়-বড় চোখে চেয়ে বলল, "কী বললে পীতাম্বরদাদা! কানে কি ভুল শুনলুম আমি! বাহান্ন টাকা! মোটে বাহান্ন টাকায় তোমাদের মতো রুস্তম আজকাল হাত নোংরা করছে! এ যে ঘোর কলিকাল পড়ে গেল গো! এতে যে আমারও বেজায় অপমান হয়ে গেল! মাত্র বাহান্ন টাকায় আমার গায়ে হাত তুললে তোমরা!"

পীতাম্বর একটা হুঙ্কার দিয়ে বলে, "বেশি বুকনি দিলে মুখ তুবড়ে দেব বলছি!"

কালু বলে ওঠে, "উহুঁ উহুঁ, আর নয়। টাকা উসুল হয়ে এখন কিন্তু বেজায় লোকসান যাচ্ছে আমাদের।"

পীতাম্বর সঙ্গে-সঙ্গে নরম হয়ে বলে, "তা বটে, ওরে কালী, বাহান্ন টাকার কথা তুলে আর আঁতে ঘা দিস না। ওই হাড়কেপ্পনটার সঙ্গে দরাদরিতে যাওয়াই ভুল হয়েছে। এখন সুদে-আসলে লোকসানটা তুলতে হবে।"

কালী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সে আর তোমরা পারবে না। সকলের চোখের সামনে দু'শো এগারোখানা মোহর যে-মানুষ হাতিয়ে নিতে পারে, তার সঙ্গে এঁটে ওঠা তোমাদের মতো ভালমানুষদের কর্ম নয়। আর এ-গাঁয়ের লোকগুলোও সব চোখে ঠুলি-আঁটা ঘানির বলদ। খুন করে লাশটা কোথায় গুম করল সেটা অবধি খুঁজে দেখল না। ছোকরার আত্মাটা এই সন্ধেবেলাতেও এসে কত কাঁদাকাটা করে গেছে। একটু আগেই তো তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তোমরা এসে হুজ্জত শুরু করায় ভয় খেয়ে তফাত হয়েছে। আমার আধসের দুধ আর কয়েকখানা ইট বড় করে দেখলে পীতাম্বরদাদা, কালুভাই! ওদিকে যে পুকুরচুরি হয়ে গেল, সে-খবর রাখলে না! লোকটা কত বড় পিচাশ একবার ভেবে দ্যাখো, দু'শো এগারোখানা মোহর ট্যাঁকে গুঁজেও যে মাত্র বাহান্ন টাকায় তোমাদের কেনা গোলাম করে রাখতে চাইছে! আর শুধু কী তাই, ওই দ্যাখো, তোমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য লক্ষ্মণ পাইককে পাঠিয়েছে! ওই যে, বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে!"

পীতাম্বর আর কালু চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়াতেই বাবলাতলা থেকে লক্ষ্মণ বেরিয়ে এসে পীতাম্বরের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "অনেক আগেই আন্দাজ করেছিলাম যে, তুমিই সেই লোক! আর লুকোছাপা করে লাভ নেই বাপু! আমি আবছা আলোতেও ঠিক বুঝতে পেরেছি, তোমার দুটো হাতই বাঁ হাত।"

পীতাম্বর এ-কথায় এমন অবাক হয়ে গেল যে, তার মুখে কথা জোগাল না। খানিকক্ষণ লাগল সামলে উঠতে। তারপর বাঘা গলায় বলল, "কী বললি রে হনুমান?"

লক্ষ্মণ বিন্দুমাত্র ভয় না খেয়ে একটু হেসেই বলল, "সারাদিনের পরিশ্রম আজ সার্থক। রাম বিশ্বাসের কথা কি মিথ্যে হওয়ার যো আছে! দুটো বাঁ-হাতওলা লোক থাকতেই হবে!"

পীতাম্বর নিজের হাত দু'খানা চোখের সামনে তুলে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলে, "কোথায় রে দুটো বাঁ হাত! আর থাকলে আমি তা এতদিনে টের পেতুম না! আচ্ছা নিরেট তো তুই দেখছি! আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে এসে এখন আবোলতাবোল বলে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করছিস হতভাগা! দেখাচ্ছি মজা!"

দু'হাতে বজ্রমুষ্টি পাকিয়ে পীতাম্বর লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করতেই কালু তার হাত চেপে ধরে বলল, "কত লোকসান যাচ্ছে খেয়াল করেছিস? এখন কিল-চড় খরচা করলে তার দামটা দেবে কে? বাহান্ন টাকার একটি পয়সাও কি বেশি আদায় হবে?"

"তা বটে!" বলে পীতাম্বর বন্ধ-করা মুঠি খুলে, দমটা ছেড়ে ক্লান্ত গলায় বলে, "গাড়লটা বলছে কিনা আমার দুটোই বাঁ হাত! সেই জন্ম থেকে বাঁ-ডান দুই হাত নিয়ে বাস করে এলুম, হঠাৎ রাতারাতি জলজ্যান্ত হাতটা বদলে যাবে! এই যে ভাল করে দেখে নে আহাম্মক, ডান-বাঁ জ্ঞান যদি থেকে থাকে, তবে ভাল করে পরখ করে নে। তোর কপালের খুব জোর, এই দুটো হাতের ঘুসো তোকে খেতে হয়নি। নইলে..."

পীতাম্বরের মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ লাঠি হাতে

একটা লম্বা সিড়িঙ্গে মূর্তি বাবলাবনের শুঁড়িপথটা দিয়ে ধেয়ে এল, "মারবে মানে ? মজা পেয়েছ ? এ কি মগের মুলুক ? আমার রাজসাক্ষী মারলে অত বড় বাটপাড়ি আর খুনের কিনারা করবে কে ?"

বলতে-বলতেই গৌরগোবিন্দ হাতের মজবুত লাঠিটা তুলে পটাং-পটাং করে পেটাতে লাগলেন। পীতাম্বর আর কালু বহুকাল কারও হাতে মার-টার খায়নি। সবাই তাদের সমঝে চলে, কেউ গায়ে হাত তুলবার সাহসই পায় না। ফলে তারা এত অবাক হয়ে গেল যে, নিজেদের বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই করতে পারল না। উপরন্তু মার না খেয়ে-খেয়ে এমন অনভ্যাস হয়ে গেছে যে, দু'জনেই প্রথম চোটের লাঠির বাড়িটা খেয়েই 'বাবা রে' বলে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে কুমড়ো গড়াগড়ি দিতে লাগল।

"বলি ও কালী, তুই ভাল আছিস তো বাপ ! চোট-টোট লাগেনি তো ! কোথায় পালালি বাবা ? ভয় নেই রে, গুণ্ডা দুটোকে দিয়েছি ঠাণ্ডা করে। ওই দ্যাখ, কেমন চিতপটাং হয়ে পড়ে আছে।"

ঠিক এই সময়ে কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল, "এই বয়সেও বেশ ভাল হাত আপনার। লাঠিখানা বেশ গুছিয়ে ধরেছিলেন বটে। ঠিক এরকমটা দেখা যায় না।"

গৌরগোবিন্দ তেড়ে উঠলেন, "বয়সটা আবার কোথায় দেখলে হে। কিসের বয়স ? বয়সের কথা ওঠেই বা কেন ? আর লাঠি ধরারই বা কী নতুন কায়দা দেখলে ? চিরকাল লাঠিহাতে ঘুরে বেড়ালুম !"

"আজ্ঞে, তা বটে। কিন্তু যার দুটো হাতই বাঁ হাত, তার পক্ষে ওভাবে জুতসই করে বাগিয়ে ধরে লাঠি চালানো তো বড় সোজা কথা নয় কিনা !"

গৌরগোবিন্দ একটু ঝুঁকে লোকটাকে ঠাহর করে নিয়ে বললেন, "অ, তুমি গগন সাঁপুইয়ের সেই পাইক লক্ষ্মণ বুঝি ! সকাল থেকে বাঁ হাতের ফেরে পড়ে আছ দেখছি ! তা কালীর ঠেক-এ তোমার আবার কী দরকার ? অ্যাঁ ! সাক্ষী গুম করতে এসেছ ? দেখাচ্ছি মজা, দাঁড়াও..."

পটাং করে লাঠির একখানা ঘা ঘাড়ে পড়তেই লক্ষ্মণ আর কালবিলম্ব না করে চোঁচা দৌড় লাগাল।

"ও কালী, তুই কোথায় বাবা ?"

কালী অবশ্য গৌরগোবিন্দর ডাক শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু জবাব দেওয়ার মতো অবস্থা তার নয়।

ঘটনাটা হল, কালু আর পীতাম্বর এসে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলায় কালী একটু গা-ঢাকা দিতে চেয়েছিল। মোহর আর খুনের ঘটনাটা এদের কাছে প্রকাশ করে ফেললে গগনের কাছ থেকে আর কিছু আদায়ের আশা নেই। কথাটা একটু প্রকাশ হয়েছে, ভাল। বাকিটুকু চাপা থাকলে গগনের ওপর একটা চাপ হয়। তাতে আদায় উসুলের সুবিধা। নইলে গুণ্ডা দুটো সব গুপ্ত কথা জেনে নিয়ে আগেভাগে গিয়ে গগনের ট্যাঁক ফাঁক করতে লেগে যাবে। বরাতজোরে একটু সুবিধাও হয়ে গেল কালীর। গৌর ঠাকুরদা এসে গুণ্ডা দুটোকে ঘায়েল করেছে। কালী এই ফাঁকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পেছনের কাঁটাবন দিয়ে সটকে সটান গগনের বাড়ি গিয়ে উঠবার তাল করেছিল।

কিন্তু কাঁটাবনে ঢুকতেই, ওরে বাপ ! সামনেই ঘন কাঁটাবনে দুটো পেল্লায় চেহারার আবছা মূর্তি দাঁড়িয়ে ! তারা অবশ্য কালী কাপালিককে গ্রাহ্যও করছিল না। কী একটা ব্যাপার নিয়ে দু'জনের একটা রাগারাগি তর্কাতর্কি হচ্ছে। অন্ধকার কালীর চোখ-সওয়া, যেটা তার পিলে চমকে দিল তা হল লোক দুটোর পোশাক। জরিটরি দেওয়া পোশাক পরনে, মাথায় আবার মুকুটগোছের কী যেন আছে, গলায় মুক্তোমালার মতো মালা, হাতে আবার বালা-টালাও দেখা যাচ্ছে। যাত্রাদলে যেমন দেখা যায় আর কি ! কিন্তু এ-গাঁয়ে বা আশেপাশে কোথাও এখন কোনও যাত্রাপালা হওয়ার কথা নেই। এরা এল কোত্থেকে ?

কালী সুট করে গাছের আড়ালে সরে দাঁড়াল।

লম্বা-চওড়া আর বেশি ঝলমলে পোশাক-পরা লোকটা বলছে, "তুমি অত্যন্ত বেয়াদব এবং বিশ্বাসঘাতক। যেভাবে তুমি আমাকে পাতালঘরে টেনে নামিয়ে পেছন থেকে ছোরা বসিয়েছিলে তা কাপুরুষ এবং নরাধমরাই একমাত্র পারে।"

অন্য লোকটা একটু নরম গলায় বলে, "মহারাজ, আপনাকে না মারলে যে আমাকেই মরতে হত। আপনার মতলবটা তো আমি আগেই আঁচ করেছিলাম কিনা। আত্মরক্ষার জন্য খুন করা শাস্ত্রে অপরাধ নয়।"

"কিন্তু রাজ-হত্যার মানে কী জানো চন্দ্রকুমার ? রাজা হচ্ছে পিতার সমান। তাকে হত্যা করে তুমি পিতৃঘ্ন হয়েছ। তুমি চিরকাল আমার অন্নে প্রতিপালিত হয়েছ, আমার নুন খেয়েছ, রাজসভায় যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছ আমারই বদান্যতায়। তার প্রতিদান কি এই ? তোমাকে মারতে চেয়েছিলাম এটাই বা কে বলল ? তোমাকে পাতালঘরে নেমে দেখাতে চেয়েছিলাম সুড়ঙ্গগুলো কীরকম।"

"আজ্ঞে না, মহারাজ। মোহরের হদিস যখনই আপনি আমাকে দিয়ে দিলেন, তখনই বুঝলুম যে, আমার আয়ু আর বেশিদিন নয়। তাই আমি সঙ্গে গোপনে একখানা ধারালো ছোরা রাখতুম। যেদিন আপনি নিজে সঙ্গে করে মহা সমাদরে আমাকে পাতালঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন, সেদিনই আমি ঠিক করেছিলুম, যদি নামি আপনাকে নিয়েই নামব। প্রাসাদে গর্ভগৃহে নামবার গুপ্ত সিঁড়িতে আপনি আমাকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে ভারী দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। আমি সঙ্গে-সঙ্গে লাফ দিয়ে আপনাকে টেনে নামিয়ে এনে ষড়যন্ত্রটা ওখানেই শেষ করে দিই।"

"তুমি বোধ হয় ধরাও পড়োনি ?"

"আজ্ঞে না, মহারাজ। আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আপনি হঠাৎ বৈরাগ্যবশত নিরুদ্দেশ হয়েছেন এটাই রটনা হয়েছিল। তবে আমি নিমকহারাম নই। গুপ্তধনের হদিসসহ পুঁথিখানা আমি আপনার পুত্র বিজয়প্রতাপকে হস্তান্তর করেছিলাম। আমি নিজে কিন্তু গুপ্তধন হরণের চেষ্টা করিনি।"

মহারাজ দাঁত কড়মড় করে বললেন, "করলেও লাভ হত না। আমি নিজে যখ হয়ে দেড়শো বছর মোহরের কলসিতে ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে ছিলুম। মাঝে-মাঝে যে বেরিয়ে এসে তোমার ঘাড় মটকাতে ইচ্ছে করত না, তা নয়। কিন্তু মোহরগুলো এমন চুম্বকের মতো আমাকে আটকে রেখেছিল যে, বেরোবার সাধ্যই হয়নি।"

চন্দ্রকুমার একটু যেন মিচকে হাসি হেসে বললেন, "আজ্ঞে সেটা আমি জানতুম। আপনার পক্ষে ওই মোহর ছেড়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব ছিল বলেই আমি নিশ্চিন্তমনে নিরানব্বই বছর অবধি বেঁচে হেসেখেলে আয়ুষ্কালটা কাটিয়ে গেছি। মোহরের মোহ ছিল না বলেই পেরেছি।"

মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমার পুত্র বা পৌত্ররাও তো কেউ গুপ্তধনের খোঁজ করেনি !"

"না মহারাজ। তারা ও-পুঁথি উলটেও দেখেনি। দেখলেও সঙ্কেত উদ্ধার করতে পারত না। আমার জীবিতকালেই ও-পুঁথি নিরুদ্দেশ হয়। তাতে আমিও বেঁচেছি আর আপনিও নিরুদ্বেগে দেড়শো বছর মোহরের মধ্যে ডুবে থাকতে পেরেছেন।"

"কথাটা সত্যি। মোহর অতি আশ্চর্য জিনিস। তার মধ্যে ডুবে থেকে কখন যে দেড়শোটা বছর কেটে গেল তা টেরই পেলাম না। বেরিয়ে এসেই আমি তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছি কাল থেকে।"

"জানি মহারাজ। আপনার ভয়েই আমি কাল থেকে নানা

জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি। শেষে এই নিরিবিলি কাঁটাবনে এসে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করেছিলাম। হাতে একটা জরুরি কাজ ছিল, নইলে আমি অনেক দূরে কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতাম।"

মহারাজ যেন কিছুটা নরম হয়ে বললেন, "শোনো চন্দ্রকুমার, আমার মনে হচ্ছে তোমার প্রতি আমি একটু অবিচারই করে ফেলেছি। এতদিন পরে আমি আর সেই পুরনো রাগ পুষে রাখতে চাই না। বরং তোমার সাহায্যই আমার প্রয়োজন। তুমি পণ্ডিত মানুষ, বলতে পারো, দেড়শো বছর ধরে আমার মোহর আগলে রাখার প্রয়াস এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল কেন?"

"ব্যর্থ হবে কেন মহারাজ?"

মহারাজ রাজকীয় কণ্ঠে হুঙ্কার করে উঠলেন, "আলবাত হয়েছে। কোথাকার কে একটা অজ্ঞাতকুলশীল এসে আমাকে সুদ্ধু মোহরের ঘড়া গর্ভগৃহ থেকে টেনে বের করে আনল, আমি তাকে বৃশ্চিক হয়ে দংশন করলাম, সাপ হয়ে হুমকি দিলাম, কিম্ভূত মূর্তি ধরে নাচানাচি করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তা হলে কি যখ হয়ে নিজস্ব ধনসম্পত্তি পাহারা দেওয়ার কোনও দামই নেই?"

"অবশ্যই আছে মহারাজ। কোনও অনধিকারী ওই কলসি উদ্ধার করতে গেলে আপনার প্রক্রিয়ায় কাজ হত। কিন্তু অধিকারী যদি উদ্ধার করে তা হলে যখের কিছুই করার থাকে না।"

রাজা আবার ধমকে উঠলেন, "কে অধিকারী? ওই ছোকরাটা?"

"অবশ্যই মহারাজ, সে আপনার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।"

মহারাজ অতিশয় বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "বলো কী হে চন্দ্রকুমার?"

"আপনার বংশতালিকা আমার তৈরিই আছে। আপনার পুত্র বিজয়প্রতাপ, তস্য পুত্র রাঘবেন্দ্রপ্রতাপ, তস্য পুত্র নরেন্দ্রপ্রতাপ, তস্য পুত্র তপেন্দ্রপ্রতাপ, তস্য পুত্র রবীন্দ্রপ্রতাপ, এবং তস্য পুত্র এই ইন্দ্রজিৎপ্রতাপ। ইন্দ্রজিৎ ও তস্য পিতা অবশ্য ম্লেচ্ছদেশে বসবাস করেন। বিলেতে।"

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ একটু উদ্বেগের গলায় বললেন, "কিন্তু আমার এই উত্তরপুরুষেরা ওইসব মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য মোহরের কদর বুঝবে তো! রক্ষা করতে পারবে তো!"

চন্দ্রকুমার একটু চিন্তিত গলায় বললেন, "সেটা বলা কঠিন। আপনার উত্তরপুরুষেরা যদি মোহর নয়ছয় বা অপব্যবহার করে, তা হলেও আপনার আর কিছুই করার নেই। মোহরের কথা ভুলে যান মহারাজ।"

মহারাজ আর্তনাদ করে উঠলেন, "বলো কী হে চন্দ্রকুমার! কত কষ্ট করে, কত অধ্যবসায়ে, কত ধৈর্যে কত অর্থব্যয়ে আমি সারা পৃথিবী থেকে মোহর সংগ্রহ করেছি। ওই মোহরের জন্য তোমার হাতে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছি। পর-পর দেড়শো বছর যখ হয়ে মোহর পাহারা দিয়েছি, এসব করেছি কি মোহরের কথা ভুলে যাওয়ার জন্য?"

"মহারাজ, মোহরের মধ্যে মোহ শব্দটাও লক্ষ করবেন। ওই মোহে পড়ে আপনি যথোপযুক্ত প্রজানুরঞ্জন করেননি, বহু নিরীহ মানুষের প্রাণনাশ করেছেন, আমাকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ওই মোহরের মধ্যে কোন মঙ্গল নিহিত আছে? আপনার উত্তরপুরুষ যা খুশি করুক, আপনি চোখ বুজে থাকুন।"

মহারাজ হাহাকার করে উঠে বললেন, "তোমার কথায় যে আমার আবার মরে যেতে ইচ্ছে করছে চন্দ্রকুমার! মরার আগে তোমাকেও হত্যা করতে ইচ্ছে করছে! আমার মোহর... আমার মোহর..."

ঠিক এই সময়ে কালী কাপালিক আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রক্তাম্বরের খুঁটে দুটি চোখ মুছে নিয়ে বলল, "আহা, এ-জায়গাটায় যা পার্ট করলেন মশাই, চোখের জল রাখতে পারলুম না। পালাটিও বেঁধেছেন ভারী চমৎকার। কোন অপেরা বলুন তো! কবে নাগাদ নামছে পালাটা?"

দুই ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে কালীর দিয়ে চেয়ে রইল।

কালী বিগলিত মুখে বলে, "আমিও এককালে পার্ট-টার্ট করতুম। অনেকদিন আর সাধন-ভজনে মেতে গিয়ে ওসব হয়নি। তা এ যা পালা দেখছি, একটা কাপালিকের পার্ট অনায়াসে ঢোকানো যায়। আর আমাকে তো দেখছেন, মেকআপও নিতে হবে না। আড়াল থেকে শুনছিলুম মশাই, তখনই ভেবে ফেললুম এ-পালায় যদি একখানা চান্স পাই তা হলে কাপালিকের কেরামতি দেখিয়ে দেব। কিন্তু বড্ড হালফিলের ঘটনা মশাই, এত তাড়াতাড়ি পালাটা বাঁধল কে?"

মহারাজ বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, "চন্দ্রকুমার, এ-লোকটা কে?"

"এ এক ভ্রষ্টাচারী, মহারাজ। কাপালিক সেজে থাকে।"

হঠাৎ দুই বিকট ছায়ামূর্তি ভোজবাজির মতো বাতাসে মিলিয়ে গেল।

কালীর মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল লহমায়। চোখের সামনে যা দেখল, নিজের কানে যা শুনল তা কি তা হলে যাত্রার পালা নয়? কাঁটাবনে ঢুকে যাত্রার মহড়া দেওয়াটাও তো কেমন-কেমন ঠেকছে যেন! আর ঘটনাটা! বাপ রে!

কালী বিকট স্বরে চেঁচাতে লাগল, "ভূঃ...ভূঃ...ভূঃ...ভূঃ..."

ঠিক এই সময়ে বাজারের দিকটাতেও একটা শোরগোল উঠল, "চোর! চোর!"

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "এই তো! এই তো সেই কাল রাতের চোরটা! গগন সাঁপুইয়ের বাড়িতে ধরা পড়েছিল! আজ আবার ভোল পালটে কার সর্বনাশ করতে ঘুরঘুর করছিল!"

চোরের বৃত্তান্ত শুনে চণ্ডীমণ্ডপের আসর ভেঙে মাতব্বররাও ছুটে এলেন। শিমুলগড়ের মতো ঠাণ্ডা জায়গায় কী উৎপাতই না শুরু হয়েছে! তবে হ্যাঁ, এসব কিছু হলে পরে সময়টা কাটে ভাল।

চোর শুনে গৌরগোবিন্দও লাঠি হাতে দৌড়ে এলেন। অত্যন্ত রাগের গলায় বলতে লাগলেন, "এ কি গগনের চোরটা নাকি? তার তো খুন হওয়ার কথা! কোন আক্কেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এরকম হলে তো বড়ই মুশকিল। একবার খুন হয়ে গেলে ফের আবার ধরা পড়ে কোন আহাম্মক! সব হিসাব আমার গণ্ডগোল হয়ে গেল দেখছি!"

নটবর ঘোষ চাপা গলায় বলে, "খুব জমে গেছে কিন্তু ঠাকুরদা।"

॥ ৬ ॥

রাত্রিবেলাটাই ভয়ের সময়। ঘরে লাখ-লাখ, কোটি-কোটি টাকার মোহর। গগন সাঁপুইয়ের টাকা আছে বটে, কিন্তু এত টাকার কথা সে জীবনেও ভাবতে পারেনি। ভগবান যখন দিলেন, তখন এ-টাকাটা ঘরে রাখতে পারলে হয়। চারদিকে চুরি, ডাকাতি, জোচ্চুরি, বাটপাড়িতে কলির ভরা একেবারে ভরভরন্ত। হরিপদ বিদায় হওয়ার পরই ঘরে ডবল তালা লাগিয়ে চাবি কোমরে গুঁজে গগন বেরোল নিজের বাড়ির চারদিকটা ঘুরে দেখতে।

নাঃ, উঁচু দেওয়াল থাকলে কী হয়, এ-দেওয়াল টপকানো কঠিন কাজ নয়। দুটো কুকুর আছে বটে, কিন্তু জানোয়ার আর কতটাই বা কী করতে পারে! পাইক আর কাজের লোকজন আছে বটে, কিন্তু লোকবলটা মোটেই যথেষ্ট নয়। ডাকাত যদি পড়ে

তবে মহড়া নেওয়ার ক্ষমতা এদের নেই। দরজা-জানলা খুবই মজবুত কিন্তু অভেদ্য নয়। বড়জোর দুর্ভেদ্য বলা যায়। শালবল্লা দিয়ে গুঁতো মারলেই মড়মড় করে ভেঙে পড়বে। বাড়িতে দু-দুটো বন্দুক আছে, কিন্তু ডাকাতরা যদি সাত-আটটা বন্দুক নিয়ে আসে, তা হলে? নাঃ, বাড়ির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় মোটেই খুশি হল না গগন। দিনের আলো ফুরোবার আগেই আরও পাকা ব্যবস্থা করা দরকার। বাড়িতে যত লাঠি, দা, কুড়ুল, কাটারি, টাঙি, ট্যাটা, বল্লম, সড়কি, ছোরাছুরি ছিল, গগন সব বের করে জড়ো করল দাওয়ায়। বাড়ির লোককে ডেকে বলল, "ডাকাত পড়ার কথা আছে। সবাই খুব সাবধান। প্রত্যেকেই অস্ত্র রাখবে হাতে।"

তিন ছেলের দু'জন বন্দুক হাতে সন্ধে থেকেই মোতায়েন রইল দাওয়ায়। পাইক আর কাজের লোকজনদেরও সজাগ করে দেওয়া হল। একজন কাজের লোক তীর-ধনুক নিয়ে ঘরের চালে উঠে বসে রইল।

গগন ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় খিল এঁটে মোহরের থলিটা বের করে গুনে দেখল। নাঃ, দু'শো এগারোখানাই আছে। তারপর দরজায় তিন ডবল তালা লাগিয়ে এক হাতে রাম-দা অন্য হাতে বল্লম নিয়ে উঠোনে পায়চারি করতে লাগল। তবু ব্যবস্থাটা তার মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না। পাশেই নারায়ণপুর গাঁয়ে কয়েক ঘর লেঠেল চাষি বাস করে। কাল সকালেই তাদের কয়েকজনকে আনিয়ে নিতে হবে।

ঘরের চাল থেকে হঠাৎ ধনুকধারী কাজের লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "ওই আসছে!"

গগন একটা লাফ দিয়ে উঠল, "কে! কে আসছে রে? কার আবার মরার সাধ হল? কোন নরাধম এগিয়ে আসছিস মৃত্যুমুখে? আজ যদি তোর মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া না খেলি তো আমার নাম গগনই নয়..."

বলতে-বলতে গগন ছুটে সদর দরজার বাইরে গিয়ে রাম-দা ঘোরাতে-ঘোরাতে চেঁচিয়ে উঠল, "আয়! আয়! আজই কীচক বধ হয়ে যাক।"

যে-লোকটা সদর দরজার কাছ বরাবর চলে এসেছিল, সে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "রক্ষে করুন কর্তাবাবু! আমি লক্ষ্মণ।"

গগন উদ্যত রাম-দা নামিয়ে বলল, "লক্ষ্মণ, তুই কোথা থেকে?"

"আজ্ঞে, একটু খবর আছে। ভাল খবর। চোরটা ধরা পড়েছে।"

গগন হকচকিয়ে গিয়ে বলে, "ধরা পড়েছে মানে! তার তো ধরা পড়ার কথা নয়।"

লক্ষ্মণ নিজের ঘাড়ে হাত বোলাতে-বোলাতে বলে, "ছেড়ে দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল কর্তাবাবু। চোরের স্বভাব যাবে কোথায়! কু-মতলব নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল, গাঁয়ের লোকেরা ধরে চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে গেছে। লোক জড়ো হয়েছে মেলা।"

গগন বিরক্ত হয়ে বলে, "আচ্ছা আহম্মক তো! ছেড়ে দিয়েছি; চলে যা। ফের ঘোরাফেরা করতে এল কেন?"

"আজ্ঞে, মোহর-টোহর নিয়ে কীসব কথাও হচ্ছে যেন। আমার ঘাড়ে বড় চোট হয়েছে বলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ঘাড়ে মালিশ করতে হবে।"

মোহর নিয়ে কথা! গগনের বুকটা একটু দুলে উঠল। সে ভেবে নিয়েছিল, ছোকরা কোথা থেকে চুরি করে মোহর নিয়ে পালাচ্ছিল। বেকায়দায় তার বাড়িতে ঢুকে ধরা পড়ে যায়। যে পরিমাণে ভয় খেয়ে গিয়েছিল তাতে তার এ-তল্লাটে থাকার কথাই নয়। যদিও চোরের কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না, তবু কথাটা পাঁচকান হওয়া ভাল নয়। ভগবান যখন ছপ্পর ফুঁড়ে দিলেনই এখন ভালয়-ভালয় শেষরক্ষা হলে হয়।

ভগবানকে ডাকতে-না-ডাকতেই ঘরের চাল থেকে কাজের লোকটা আবার চেঁচাল, "ওই আসছে!"

"কে! কে! কোন ডাকাত! কোন গুণ্ডা! কোন বদমাশ..."

সদর দরজার বাইরে দুই বিশাল চেহারার লোক এসে দাঁড়াল। তাদের একজন অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল, "কাজটা কি ভাল করলেন গগনবাবু?"

গগন উদ্যত বল্লমখানা নামিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলে, "পীতাম্বর নাকি রে?"

পীতাম্বর অত্যন্ত করুণ গলায় বলে, "সবাই যে ছ্যাঃ-ছ্যাঃ করছে গগনবাবু! আমাদের মান-ইজ্জত যে আর রাখলেন না আপনি! এমনকী কালী কাপালিক অবধি নাক সিঁটকে বলল, 'মাত্র বাহান্ন টাকায় আমার গায়ে হাত তুললে তোমরা! যার ঘরে দু'শো এগারোখানা মোহর সে মাত্র বাহান্ন টাকায় তোমাদের মতো রুস্তমকে কিনে নিল!' এখন আপনিই বলুন গগনবাবু, আপনার জন্য কীরকম অপমানিত হতে হল আমাদের!"

চোখ কপালে তুলে গগন বলে, "মোহর! অ্যাঁ! মোহর! তাও আবার দু'শো এগারোখানা! কালীর এই গল্প বিশ্বাস করে এলি তোরা? কালী দশটা কথা বললে তার মধ্যে এগারোটা মিথ্যে কথা থাকে! মোহর আমি জন্মেও দেখিনি রে ভাই, কেমন দেখতে হয় তাই জানি না। গোল না চৌকো, তেকোনা না চারকোনা কে জানে বাবা!"

পীতাম্বর গম্ভীরতর গলায় বলে, "সেটা মিথ্যে না সত্যি তা জানি না। তবে বাহান্ন টাকাটা তো আর মিথ্যে নয়। বড্ড শস্তার দরে ফেলে দিলেন আমাদের। জাতও গেল, পেটও ভরল না। সবাই জানল, কালু আর পীতাম্বর আজকাল ছিঁচকে কাজ করে বেড়ায়। কেউ পুঁছবে আর আমাদের?"

গগন গদগদ হয়ে বলল, "আয় রে ভাই, ভেতরে আয়। লোকসান যা হয়েছে পুষিয়ে দিচ্ছি। মানীর মান দিতে আমি জানি রে ভাই। আয়, আয়, পেছনের উঠোনে নিরিবিলিতে গিয়ে একটু কথা কই।"

পেছনের উঠোনে দুটো মোড়ায় দু'জনকে সমাদর করে বসিয়ে গগন একটু হেঁ-হেঁ করে নিয়ে বলে, "কত চাই তোদের বল তো!"

পীতাম্বর আর কালু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিয়ে আর-একটু গম্ভীর হয়ে গেল। পীতাম্বর গলাখাঁকারি দিয়ে বলে, "যে-কাজে আমাদের পাঠিয়েছিলেন তার দরুন দুটি হাজার টাকা আমাদের পাওনা হয়। আপনি বোধ হয় মানুষকে ওষুধ করতে পারেন, নইলে বাহান্ন টাকায় রাজি হওয়ার বান্দা আমরা নই। যখন আপনার সঙ্গে দরাদরি হচ্ছিল তখন আমার মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছিল মশাই।"

গগন অবাক হয়ে বলে, "কিন্তু তুই যে নিজে মুখেই দেড়শো টাকা চেয়েছিলি ভাই।"

"সেও ওই ওষুধের গুণে। আমাদের ন্যায্য দর দু' হাজার।"

গগন একটু বিগলিত হেসে বলে, "তাই পাবি রে, তাই পাবি। তবে আর-একটা ছোটখাটো কাজও করে দিতে হবে যে ওস্তাদ। তার দরুন আলাদা চুক্তি।"

"কাজ! আজ যে আমাদের দম ফুরিয়ে গেছে গগনবাবু। আপনারই আহম্মকি। কালী কাপালিকের যে লাঠিয়াল আছে সে-কথাটা আগে বলতে হয়। আমরা তৈরি থাকলে ব্যাটার চোদ্দপুরুষের সাধ্যি ছিল না অমন বেমক্কা লাঠিবাজি করে যায়। আচমকা যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে পটাং-পটাং করে এমন ঘা-কতক চোখের পলকে বসিয়ে দিল যে, মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে, কাঁধের হাড়েও চোট।"

গগন অবাক হয়ে বলে, "কালীর লাঠিয়াল! এ যে নটে শাকের ক্যাশমেমোর কথা বলছিস! পায়জামার কি বুক পকেট হয় রে? ইঁদুরের কি কখনও শুঁড় হয় দেখেছিস? না কি খরগোশের শিং!"

পীতাম্বর মাথা নেড়ে বলে, "সে আমরা বলতে পারব না। তবে সিড়িঙ্গে লম্বা একটা লোক ইয়া বড় লাঠি নিয়ে এসে আমাদের ওপর খুব হামলা করেছে মশাই। অবিশ্যি আমাদের হাতে পার পাবে না। গায়ের ব্যথাটা মজলেই আমরা তার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে যাব। তবে আজ আর কাজের কথা বলবেন না। টাকাটা ফেলে দিন। বাড়ি যাই।"

গগন গনগনে মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তোরা দুটোই পুরুষের সমাজে কুলাঙ্গার। মস্তানি করতে গিয়ে লাঠি খেয়ে এসেছিস, তোদের ধুতির কাছা খুলে ঘোমটা দেওয়া উচিত। তার ওপর টাকা চাইছিস! দেব পাঁচ গাঁয়ে রটিয়ে তোদের এই কলঙ্কের কথা? ভাল চাস তো কাজটা উদ্ধার করে দে। নইলে দেব কিন্তু ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে।"

পীতাম্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "আপনি খুব নটঘটে লোক মশাই। তা কাজটা কী? টাকা কত?"

"কাল রাতে একটা চোর ধরা পড়েছিল আমার বাড়িতে। সর্বস্ব নিয়ে পালাচ্ছিল। তো তাকে ধরেও মায়া করে ছেড়ে দিই। শুনলুম সে নাকি এখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে এ-গাঁয়ের আমার শত্তুরদের সঙ্গে ঘোঁট পাকাচ্ছে। আমার তো শত্তুরের অভাব নেই। খেটেখুটে দুটো পয়সা করব তার কি যো আছে? অমনই লোকের চোখ টাটাবে। তার ওপর ছোকরা আমার ঘরে ঢুকে সব খোঁজখবর নিয়ে গেছে। এখন কী করে তার ঠিক নেই। গাঁয়ের লোককেও হাত করল, তারপর গিয়ে ডাকাতের দলে খবর দিল, যা হোক, একটা কিছু লোকসান সে আমার করবেই। এখন ভাবছি, বেঘোরে আমার প্রাণটাই যায় কি না। তা বাবা, এ-ছোকরাটার একটা ব্যবস্থা তোদের করতেই হবে। জখম-হওয়া সাপ বা বাঘের শেষ রাখতে নেই।"

"খুনের মামলা নাকি মশাই?"

"সে তোরা যা ভাল বুঝবি করবি। পাপমুখে কথাটা উচ্চারণ করি কী করে? তবে তার মুখ চিরকালের মতো বন্ধ না করলেই নয়। দরাদরি করব না ভাই, আগের দু' হাজার আর থোক আরও পাঁচ হাজার টাকা পাবি। কিন্তু আজই কাজটা উদ্ধার করতে হবে। এখনই।"

কালু কুট করে একটা চিমটি কাটল পীতাম্বরকে। পীতাম্বর মাথা নেড়ে বলে, "আমাদের মানমর্যাদার কথাটা কি ভুলে গেলেন! তার ওপর সদ্য লাঠি খেয়ে এসেছি। গায়ের ব্যথাটাও মরেনি। খুনের বাবদ মোট দশটি হাজার টাকা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন গিয়ে। রাজি থাকলে চিঁড়ে-দই আনতে বলে দিন তাড়াতাড়ি। আমাদের আবার অনেকটা পথ যেতে হবে। ঘরে আগুন দেওয়ার আরও একটা কাজ রয়েছে হাতে। আর পুরো টাকাটাই আগাম ফেলুন।"

গগন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আজ যে আমার ঘরের মা-লক্ষ্মীর বেরিয়ে যাওয়ারই দিন। তাই হবে বাপ, যা চাচ্ছিস তাই দেব। কিন্তু চিঁড়ে-দই কি আর সহ্য হবে? একটু আগেই তো খেয়ে গেলি! উপর্যুপরি খাওয়া কি ভাল! বদহজম হয়ে শেষে কাজ গুবলেট করে দিবি না তো! জিনিস না হয় অন্যের, কিন্তু নৌকো তো তোর নিজের, নাকি রে? তা যা ভাল বুঝবি করবি।"

পীতাম্বর মাথা নেড়ে বলে, "চিঁড়ে-দই না হলে আমরা কাজে হাতই দিই না। প্রত্যেক কাজের আগে চিঁড়ে-দই।"

তাই হল। আবার সাপটে চিঁড়ে-দই খেয়ে বারো হাজার টাকা ট্যাঁকে গুঁজে কালু আর পীতাম্বর 'দুর্গা দুর্গতিনাশিনী' বলে রওনা হয়ে পড়ল।

গগন আর দেরি করল না। সদর দরজা এঁটে একটা পুরনো ভাঙা ঢেঁকিগাছ ধরাধরি করে এনে দরজায় ঠেকনো দিল। তার ওপর একটা উদূখল চাপাল। বাড়ির মেয়েদের হুড়ো দিয়ে রাতের খাওয়া আগেভাগে সারিয়ে নিল। সবাইকে সজাগ থাকতে বলে নিজে মোহরের ঘরে ঢুকে দরজা ভাল করে এঁটে একটা ভারী আলমারি দিয়ে দরজা চেপে দিল। রাম-দা আর বল্লম হাতে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। মাঝে-মধ্যে অবশ্য মোহর বের করে গুনে দেখছিল সে। নাঃ, দু'শো এগারোখানাই আছে। কাগজ-কলম নিয়ে লক্ষ-লক্ষর সঙ্গে দু'শো এগারো গুণ দিয়ে দেখল, কোটি-কোটিই হয়। টাকাটা ভগবান বড্ড বেশিই দিয়ে ফেলেছেন। তা না হবে কেন, গগন তো লোক খারাপ নয়। সেই গেল বছর একটা কানা ভিখিরিকে পুরনো কেলে কম্বলটা দেয়নি সে? চার বছর আগে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় একঘটি খাঁটি মোষের দুধ ঢেলে আসেনি সে? আরও আছে। গগনের মুনিষ প্যালারাম খেতের কাজে বেগার খাটতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মারা গেলে তার বউ যখন এসে কেঁদে পড়ল, তখন প্যালারামের তিনশো টাকা ঋণের ওপর যে ন'শো টাকা সুদ হয়েছিল, তার পাঁচটা টাকা সুদ থেকে কমিয়ে দেয়নি গগন? এত ভাল-ভাল কাজ করার পরও যদি ভগবান মুখ তুলে না চান, তবে আর দুনিয়াতে ধর্ম বলে কিছু থাকে নাকি?

রাত কি খুব গভীর হয়ে গেল? চারদিকটা কেমন ছমছম করছে যেন! এখন হেমন্তের সময়, রাতে শিশির পড়ে। চারদিকটা এত ছমছম করছে যে, শিশির পড়ার টুপটাপ শব্দও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বাইরে যারা পাহারায় আছে তারা কি সবাই ঘুমিয়ে পড়ল? রাম-দাখানা দু-একবার ঘোরাল গগন। বল্লমখানা একটু লোফালুফি করে নিল। দুটোরই বেশ ওজন। হাত ব্যথা করছে। তা করুক। হাতে অস্ত্র থাকলে একটা বল-ভরসা হয়। মাঝে-মাঝে মোহর বের করে গুনে দেখছে গগন। নাঃ, দু'শো এগারোখানাই আছে।

হঠাৎ গায়ে একটু কাঁটা দিল গগনের। ঘরে কি সে একা! আর কেউ ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই তো! একটা শ্বাস ফেলার শব্দ হল যেন! গগন তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর চারদিকটা ভাল করে টর্চ জেলে দেখে নিল। লুকোবার তেমন জায়গা নেই এ-ঘরে। তবু চৌকির তলায় বাক্স-প্যাঁটরা সরিয়ে দেখল, আলমারির পাশের ফাঁকে দেখল, পাটাতনে উঠেও দেখে নিল। কেউ নেই। ঘরে সে একাই বটে।

কিন্তু রাতটা যে বড্ড বেশি নিশুত হয়ে উঠল! এখনও তো ভাল করে ন'টাও বাজেনি! তা হলে এমন নিশুতরাতের মতো লাগছে কেন? বাড়ির কারও যে কাশি বা নাকডাকারও শব্দ হচ্ছে না! গগন ঘটি থেকে একটু জল মুখে দিল। গলাটা বড্ড শুকিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ফিচিক করে একটা হাসির শব্দ হল না!

গগন রাম-দাখানা ঝট করে তুলে বলল, "কে রে?"

অমনই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। গগন বাঘের মতো চারদিকটা হুটপাট করে দেখল। কেউ নেই। গগন একবার হাঁক মারল, "ওরে ভণ্টা! নিতাই! শম্ভু! তোরা সব জেগে আছিস তো!"

কেউ সাড়া দিল না। গগন লক্ষ করল, তার গলাটা কেমন কেঁপে-কেঁপে গেল, তেমন আওয়াজ বেরোল না। সে আবার জল খাওয়ার জন্য ঘটিটা তুলতেই কে যেন-খুব চাপা স্বরে বলে উঠল, "কোথায় মোহর?"

ঘটিটা চলকে গেল। গগন ঘটি রেখে বিদ্যুদ্বেগে রাম-দা তুলে প্রাণপণে বনবন করে ঘোরাতে লাগল, "কে? কার এমন বুকের পাটা যে, সিংহের গুহায় ঢুকেছিস? যদি মরদ হোস তো বেরিয়ে আয়! দু' টুকরো করে কেটে ফেলব, যদি খবর্দার মোহরে নজর দিয়েছিস তো...!"

ফের একটা দীর্ঘশ্বাস।

গগন ভারী খাঁড়াখানা আর ঘোরাতে পারছিল না। হাঁফ ধরে গেছে। দুর্বল হাত থেকে খাঁড়াখানা ঝনাত করে মেঝেয় পড়ে গেল, গগন পড়ল তার ওপর। ধারালো খাঁড়ায় ঘ্যাঁচ করে তার ডান হাঁটুর নীচে খানিকটা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। রক্তকে অবশ্য গ্রাহ্য করল না গগন। খাঁড়া টেনে তুলে ফের দাঁড়াল। দু' চোখে খুনির দৃষ্টি।

খুব খুশখুশে গলায় কে যেন বলে উঠল, "আসছে!"

গগন ফের খাঁড়া মাথার ওপর তুলে ঘোরাতে-ঘোরাতে বলে উঠল, "কে আসছে রে পাষণ্ড? অ্যাঁ! কে আসে? মেরে ফেলে দেব কিন্তু! একদম খুন করে ফেলে দেব মা-কালীর দিব্যি!"

বলতে-বলতে খাঁড়ার ভারে টাল সামলাতে না পেরে গগন গিয়ে সোজা দেওয়ালে ধাক্কা খেল। এবার খাঁড়ায় তার বাঁ হাতের কব্জি অনেকটা ফাঁক হয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল।

ফের কে যেন ফ্যাসফেসে গলায় বলে, "ওই এল।"

গগন আর পারছে না। সে খাঁড়া ফেলে বল্লম দিয়ে চারদিকে হাওয়ায় খোঁচাতে লাগল। মেঝেয় নিজের রক্তে পিছলে গিয়ে সে ফের খাঁড়ায় হোঁচট খেল। বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা প্রায় অর্ধেক নেমে গেল তার।

গগন কষ্টেসৃষ্টে ফের উঠল। এক হাতে খাঁড়া অন্য হাতে বল্লম। কিন্তু তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বেজায়। হাঁফাতে-হাঁফাতে সে বলল, "আয় দেখি, কে আসবি! আয় না! গর্দান চলে যাবে কিন্তু! বাইরে আমার লোক আছে। ডাকব কিন্তু! বন্দুক আছে, দেখাব? কুকুর আছে, এমন কামড়াবে যে..."

"কত মোহর!"

গগন ফের বনবন করে রাম-দা ঘোরাতে গেল।

॥ ৭ ॥

চণ্ডীমণ্ডপে আজ বেজায় গণ্ডগোল। কাল রাতের চোরটা ফের আজ ধরা পড়েছে। বাজারে নটবর ঘোষের ভাই হলধর ঘোষের মিষ্টির দোকানে ঢুকে জল খেতে চেয়েছিল। তাতে কারও সন্দেহ হয়নি। জল খেয়ে হঠাৎ বলে বসেছে, "থ্যাঙ্ক ইউ!"

চাষাভুষোর মুখে 'থ্যাঙ্ক ইউ' শুনেই হলধর ঘোষ উঠে ছোকরাকে ধরেছে, "কে রে তুই! সাতজন্মে কেউ কখনও চাষার মুখে ইংরেজি শুনেছে? তুই যে বড় ফটাস করে ইংরেজি ফোটালি! বলি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস নাকি? আজকাল গাঁয়ে-গঞ্জে স্কুল খোলার এই ফল হচ্ছে বুঝি! অ্যাঁ!"

ছোকরার হাতখানা চেপে ধরেছিল হলধর, তা হাত থেকে খানিকটা ভুষো কালি উঠে এল তার হাতে। আর ছোকরার ফরসা রংটাও বেরিয়ে পড়ল একটুখানি। তখনই চেঁচামেচি। "চোর, চোর! সেই চোর!"

ছোকরা পালাতে পারল না। সঙ্গে একটা স্যাঙাত ছিল বাচ্চামতো। সে অবশ্য পালাল।

ছোকরাকে চণ্ডীমণ্ডপে এনে একটা খুঁটির সঙ্গে কষে বাঁধা হয়েছে। মাতব্বররা সব জাঁকিয়ে বসেছেন।

নটবর ঘোষ গলা তুলে বলে, "চোরকে ছেড়ে দেওয়াটা গগনের মোটেই উচিত কাজ হয়নি। ছেড়ে দিল বলেই তো ফের গাঁয়ে ঢুকে মতলব আঁটছিল!"

গৌরগোবিন্দ বললেন, "আহা, এ তো অন্য চোরও হতে পারে বাপু! আমি তো শুনেছি কালকের চোরটা খুন হয়েছে!"

বিজয় মল্লিক বললেন, "না ঠাকুরদা, এ সেই চোর। আমরা সাক্ষী আছি। এর বুকের পাটা আছে বাপু। একবার ধরা পড়েও শিক্ষা হয়নি! ওরে ও ছোকরা, বলি পেছনে দলবল আছে নাকি? এত সাহস না হলে হয় কী করে তোর!"

খাঁদু বিশ্বাস বলল, "শিমুলগড়ে ফাল হয়ে ঢুকেছ, এবার যে সুঁচ হয়ে বেরোতে হবে!"

হলধর হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "বেরোতে দিচ্ছে কে? এইখানেই মেরে পুঁতে ফেলব। আজকাল গাঁয়ে-গঞ্জে চোর-ডাকাত ধরা পড়লে পুলিশে দেওয়ারও রেওয়াজ নেই। মেরে পুঁতে ফেলছে সবাই। যাদের মন নরম তারা বরং বাড়ি গিয়ে হরিনাম করুন।"

নটবর বলে, "হলধর কথাটা খারাপ বলেনি। পুলিশে দিয়ে লাভ নেই। ওসব বন্দোবস্ত আছে। হাজত থেকে বেরিয়ে ফের দুষ্কর্মে লেগে পড়বে। আমাদের সকলের ঘরেই খুদকুঁড়ো সোনাদানা আছে। সর্বদা ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়।"

মাতব্বররা অনেকেই মাথা নেড়ে সায় দিলেন, "তা বটে।"

হরি গাঙ্গুলি বললেন, "সে যা হোক, কিছু একটা করতে হবে। তবে চোরের একটা বিচারও হওয়া দরকার। পাঁচজন মাতব্বর যখন আমরা আছি, একটা বিচার হয়ে যাক।"

প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল বলে উঠল, "কিন্তু সওয়াল-জবাব হবে কী করে! চোরটা যে বড্ড নেতিয়ে পড়েছে, দেখছ না! ঘাড় যে লটরপটর করছে!"

হলধর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "দু'খানা পেল্লায় চড় কষালেই ফের খাড়া হয়ে যাবে ঘাড়। কালকেও তো এরকমই নেতিয়ে পড়ার ভান করেছিল।"

হলধর গিয়ে ছোকরার কাছে দাঁড়িয়ে একটা পেল্লায় চড় তুলে ফেলেছিল। এমন সময় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এল কালী কাপালিক।

"ওরে, মারিসনে! মারিসনে! মহাপাতক হয়ে যাবে! এ যে মহেন্দ্রপ্রতাপের বংশধর!"

সভা কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ মেরে গেল।

পটল গাঙ্গুলি বললেন, "তার মানে?"

কালী কাপালিকের চুলদাড়ি সব উড়ছে, সর্বাঙ্গে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ার দাগ। রক্তাম্বরও ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। মণ্ডপে উঠে ছোকরাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে হাতের শূলটা আপসে নিয়ে বলে, "রায়দিঘির রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নাম শোনোনি নাকি? এ-হল তার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। আকাশে এখনও চন্দ্র-সূর্য ওঠে, কালীর সব কথাই মিছে বলে ধোরো না। এ-কথাটা বিশ্বাস করো। এ চোর-ছ্যাঁচড় নয়।"

সবাই একটু হকচকিয়ে গেছে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। একটা গুঞ্জনও উঠল নতুন করে।

হলধর থাপ্পড়টা নামিয়ে নিয়ে বলল, "তুই তো গঙ্গাজলের মতো মিথ্যে কথা বলিস! এর সঙ্গে তোর সাঁট আছে।"

পটল গাঙ্গুলি বললেন, "ওরে কালী, এ যে মহেন্দ্রপ্রতাপের বংশধর তার প্রমাণ কী? প্রমাণ নইলে আমার হাতে তোর লাঞ্ছনা আছে।"

"প্রমাণ আছে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের ছেলে হল বিজয়প্রতাপ, তস্য পুত্র রাঘবেন্দ্রপ্রতাপ, তস্য পুত্র নরেন্দ্রপ্রতাপ, তস্য পুত্র তপেন্দ্রপ্রতাপ, সত্য পুত্র রবীন্দ্রপ্রতাপ এবং তস্য পুত্র এই ইন্দ্রজিৎপ্রতাপ। একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। স্বয়ং চন্দ্রকুমারের মুখ থেকে শোনা।"

কে যেন বলে ওঠে, "ব্যাটা গুল ঝাড়ছে।"

ঠিক এই সময়ে ছেলে অলঙ্কারকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে উঠে এল হরিপদ। হাতজোড় করে বলল, "মাতব্বররা অপরাধ নেবেন না। কালী কাপালিক মিছে কথা বলছে না। যতদূর জানি, ইনি সত্যিই মহেন্দ্রপ্রতাপের বংশধর। কপালের ফেরে পড়ে নির্দোষ লোক আমাদের হাতে অপমান হচ্ছেন।"

হরিপদ গরিব হলেও সৎ মানুষ বলে সবাই জানে। পটল গাঙ্গুলি বললেন, "তুমি যখন বলছ তখন একটা কিন্তু থাকছে। রায়দিঘির রাজা মানে শিমুলগড়ও তাঁর রাজত্বের মধ্যে ছিল। আমরা—মানে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন রায়দিঘিরই প্রজা। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ইনি তো মানী লোক। কিন্তু হাওয়াই কথায় তো হবে না, নিরেট প্রমাণ চাই যে। ওরে ও হলধর, ওর বাঁধনটা খুলে দে। বসতে দে। একটু জলটলও দিয়ে নে আগে।"

তাড়াতাড়ি বাঁধন খুলে ইন্দ্রজিৎকে বসানো হল। ছুটে গিয়ে অলঙ্কার একভাঁড় জল নিয়ে এল। সেটা খেয়ে ইন্দ্রজিৎ কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে জিরিয়ে নিল। তারপর চোখ খুলে বলল, "প্রমাণ আছে। দলিলের কপি আমি সঙ্গেই এনেছি। রায়দিঘির রাজবাড়ির চত্বরে আমার তাঁবুতে রয়েছে। কেউ যদি গিয়ে নিয়ে আসতে পারে তো এখনই দেখাতে পারি।"

গৌরগোবিন্দ খাড়া হয়ে বসে বললেন, "পারবে না মানে! আলবাত পারবে। সাইকেলে চলে গেলে কতটুকু আর রাস্তা! তুমি বাপু একটু জিরোও, আমরা লোক পাঠাচ্ছি।"

সবাই সায় দিয়ে উঠল। কয়েকজন ছেলেছোকরা তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে পড়ল সাইকেল নিয়ে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গোটা তাঁবু সহ সব জিনিস এনে ফেলল তারা।

গৌরগোবিন্দ তাঁর বাড়ি থেকে একটু গরম দুধ আনিয়ে দিয়েছেন এর মধ্যে। ইন্দ্রজিৎ সেটা শেষ করে তার হ্যাভারস্যাক থেকে কাগজপত্র বের করে বলল, "এই হচ্ছে আমাদের দলিল। বাবার কাছেই ছিল, আমি ফোটোকপি করে এনেছি। আর এই দেখুন, আমার পাশপোর্ট, আমি যথার্থই রবীন্দ্রপ্রতাপের ছেলে ইন্দ্রজিৎপ্রতাপ, মহেন্দ্রপ্রতাপের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।"

পটল গাঙ্গুলি শশব্যস্তে বললেন, "তুমি কি বিলেতে থাকো নাকি বাবা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বিলেত শুনে সকলেই একটু ভড়কে কেমনধারা হয়ে গেল। পটল গাঙ্গুলি মাথা নেড়ে বললেন, "তা হলে ঠিকই আছে। আমিও শুনেছিলাম, রাজবাড়ির উত্তরপুরুষেরা বিলেতে থাকে।"

গৌরগোবিন্দ বললেন, "আমি তো এর দাদু তপেন্দ্রপ্রতাপ আর তস্য পিতা নরেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে রীতিমত ওঠাবসা করেছি। রবীন্দ্রপ্রতাপকেও এইটুকু দেখেছি ওদের কলকাতার বাড়িতে। এ তো দেখছি সেই মুখ, সেই চোখ। তবে স্বাস্থ্যটা হয়নি তেমন। তপেন্দ্রপ্রতাপ তো ইয়া জোয়ান ছিল।"

চারদিকে একটা সমীহের ভাব ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে একটু অনুশোচনাও। হলধর একটু চুকচুক শব্দ করে বলল, "কাজটা বড় ভুল হয়ে গেছে রাজাবাবু। মাফ করে দেবেন।"

ইন্দ্র মাথা নেড়ে বলে, "আমাকে রাজাগজা বলবেন না। আমি সাধারণ মানুষ, খেটে খাই। আমি যে রাজবংশের ছেলে তাও আমার জানা ছিল না। চন্দ্রকুমারের লেখা একটা পুরনো পুঁথি থেকে লুকনো মোহরের সন্ধান জেনে এদেশে আসার সিদ্ধান্ত নিই। তখনই আমার বাবা আমাকে জানালেন, রায়দিঘির রাজবাড়ির আসল উত্তরাধিকারী আমরাই। ভেবেছিলাম মোহর উদ্ধার করে সেগুলো বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পাঠাব। বিক্রি করলে অনেক টাকা পাওয়া যেত ঠিকই, কিন্তু টাকার চেয়েও মোহরগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। বিক্রি না করলেও অবশ্য মোহরগুলো থেকে আমার অনেক আয় হত। ভেবেছিলাম, আমার পূর্বপুরুষ মহেন্দ্রপ্রতাপ তো প্রজাদের বঞ্চিত করেই মোহর জমিয়েছিলেন, সুতরাং আমি এই অঞ্চলের মানুষের জন্য কিছু করব। অলঙ্কারের মতো বাচ্চা ছেলেরা এখানে ভাল খেতে-পরতে পায় না, গাঁয়ে হাসপাতাল নেই, খাওয়ার জলের ব্যবস্থা ভাল নয়। এগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু মোহরগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল।"

সবার আগে নটবর ঘোষ লাফিয়ে উঠল, "গেল মানে! আমরা আছি কী করতে?"

সকলেই হাঁ-হাঁ করে সায় দিয়ে উঠল।

ঠিক এই সময়ে বাইরের জমাট অন্ধকার থেকে হঠাৎ যমদূতের মতো দুই মূর্তি চণ্ডীমণ্ডপে উঠে এল। হাতে বিরাট-বিরাট দুটো ছোরা হ্যারিকেনের আলোতেও ঝলসে উঠল।

কে যেন আতঙ্কের গলায় বলে উঠল, "ওরে বাবা! এ যে কালু আর পীতাম্বর!"

সঙ্গে-সঙ্গে গোটা চণ্ডীমণ্ডপে একটা হুলুস্থুলু হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। পালানোর জন্য এমন ঠেলাঠেলি যে, এ-ওর ঘাড়ে পড়ছে। যারা নেমে পড়তে পারল তারা তাড়াতাড়িতে ভুল জুতো পরে এবং কেউ-কেউ জুতো ফেলেই চোঁ-চা পালাল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মণ্ডপ একেবারে ফাঁকা। শুধু পটল গাঙ্গুলি, গৌরগোবিন্দ, হরিপদ, অলঙ্কার আর ইন্দ্রজিৎ। তারা কেউ নড়েনি।

পীতাম্বর চেঁচিয়ে উঠল, "এই যে! এই ছোকরাটা!"

কালু বলে, "দে ভুকিয়ে। ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

পীতাম্বর ছোরাটা কপালে ঠেকিয়ে বলল, "এই যে দিই। জয় মা..."

কিন্তু মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই গৌরগোবিন্দর পাকা বাঁশের ভারী লাঠি পটাং করে তার মাথায় পড়ল।

"বাপ রে!" বলে বসে পড়ল পীতাম্বর।

কালু অবাক হয়ে বলে, "এরও লেঠেল আছে দেখছি। সকলেরই যদি লেঠেল থাকে তা হলে কাজকর্ম চলে কিসে?"

কিন্তু তাকেও আর কথা বলতে হল না। গৌরগোবিন্দর লাঠি পটাং করে তার কাঁধে পড়ল।

"উরেব্বাস!" বলে বসে পড়ে কালু।

তারপর কিছুক্ষণ শুধু পটাং-পটাং লাঠির শব্দ হল। কালু আর পীতাম্বর ফের অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। একেবারে চিতপটাং।

গৌরগোবিন্দ দুঃখ করে বললেন, "সন্ধেবেলা একবার ভূত ঝেড়ে দিয়েছি। তাতেও দেখছি আক্কেল হয়নি! ওরে তোরা সব কোথায় পালালি? আয় আয়, ভয় নেই। এ দুটি বাঘ নয় রে, শেয়াল।"

কালী কাপালিকের চারদিকে নজর। একটু তফাত হয়েছিল। গুণ্ডা দুটো ঘায়েল হয়েছে দেখে সবার আগে এসে সে পীতাম্বরকে একটু যেন গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "আহা, বড় হ্যাপা গেছে এদের গো। আর লাঞ্ছনাটাও দেখতে হয়..." বলতে-বলতেই নজরটা চলে গেল ট্যাঁকে। জামা উঠে গিয়ে ট্যাঁকের ফোলাটা দেখা যাচ্ছে। পীতাম্বরের ট্যাঁক থেকে বারো হাজার টাকার বান্ডিলটা বের করে সে চোখের পলকে রক্তাম্বরের ভেতরে চালান দিয়ে দিল, "মায়ের মন্দিরটা এবার তা হলে হচ্ছেই! জয় মা..."

এদিকে গগনের ঘরে গগনের অবস্থা খুবই কাহিল। ইতিমধ্যে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে তার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, বল্লমের খোঁচায় তার পেট একটু ছ্যাঁদা হয়েছে। চোখে ঝাপসা দেখছে গগন। দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই বলে সে সারা ঘরে হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে আর বলছে, "খবর্দারি! খবর্দারি! একদম জানে মেরে দেব কিন্তু! ভগবানের দেওয়া মোহর। যে ছোঁবে তার অসুখ হবে। খবর্দারি..."

খাঁড়াটা হামা দেওয়ার সময়েও হাতছাড়া করেনি গগন, ঘষটে-ঘষটে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কে যেন আলতো হাতে খাঁড়াটা তুলে নিয়ে দেওয়ালের গজালে ঝুলিয়ে রাখল। গগন বলল, "কে?"

তারপরই গগন স্থির হয়ে গেল। সে শুনতে পেল, তার ঘরে দুটো লোক কথা কইছে।

একজন বলল, "বৎস চন্দ্রকুমার, একটা রহস্য ভেদ করে দেবে? আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি বায়ুভূত হয়েও দিব্যি পার্থিব জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে পারছ। এইমাত্র ভারী খড়্গখানা তুলে ফেললে। কিন্তু আমার হাত-পাগুলো এমনই ধোঁয়াটে যে কই আমি তো তোমার মতো পারছি না!"

"আজ্ঞে মহারাজ, দেড়শো বছর মোহরে ডুবে থেকে আপনার কোনও ব্যায়ামই হয়নি যে। তাই এখনও ধোঁয়াটে মেরে আছেন। আর আমি বাইরের খোলামেলা আলো-হাওয়ায় ঘুরে বেড়াই বলে আমার কিছু পোষ্টাই হয়েছে। তা ছাড়া নিয়মিত অভ্যাস ও অনুশীলনে আমি বায়বীয় শরীরকে যথেষ্ট ঘনীভূত করে তুলতে পারি। সেটা না পারলে আপনার ছ' নম্বর উত্তরপুরুষকে বাঁচাতে পারতাম না। তাকে ঘাড়ে করে মাইলটাক বইতে হয়েছে কাল রাতে। তারও আগে থেকে তাকে নানারকম সাহায্য করে আসছি। এমনকী বিলেত অবধি ধাওয়া করে আমার পুঁথিটা উদ্ধার করে তার হাতের নাগালে আমিই এগিয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে কিন্তু নিমকহারাম বলতে পারবেন না মহারাজ।"

"আরে না, না। তোমার কাজকর্ম যতই দেখছি ততই সন্তুষ্ট হচ্ছি। তা এ-লোকটাকে কি তুমি মেরে ফেলবে?"

"আজ্ঞে না মহারাজ, পৃথিবীতে আর-একটা যখ বাড়াতে চাই না। আপনার ষষ্ঠ উত্তরপুরুষের ওপর অন্যায় হামলা করায় এ-শাস্তি ওর পাওনাই ছিল।"

"ও, ভাল কথা চন্দ্রকুমার, আমার সেই উত্তরপুরুষটি কোথায়? সে নিরাপদে আছে তো!"

"ব্যস্ত হবেন না মহারাজ। ছোকরা একটু বিপদের মধ্যেই আছে। তবে জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিপদআপদ ঘটা ভাল। তাতে মানুষ শক্তপোক্ত হয়, আত্মরক্ষা করতে শেখে, বুদ্ধি আর

কৌশল বৃদ্ধি পায়, বাস্তববোধ জেগে ওঠে।"

চোখের রক্ত মুছে গগন ভাল করে চেয়ে হাঁ করে রইল। তার সামনে ঘরের মধ্যে দুটো বিশাল মূর্তি দাঁড়িয়ে। দু'জনেরই পরনে ঝলমলে রাজাগজার পোশাক। গগন হুঙ্কার দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলা দিয়ে চিঁচিঁ শব্দ বেরোল, "ওরে চোর, তোরা এ-ঘরে ঢুকলি কী করে?"

তার কথায় কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না। গগন দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে খাঁড়াখানা দেওয়াল থেকে টেনে হঠাৎ আচমকা ঘ্যাচাং করে এককোপে কেটে ফেলল একজনকে।

"আহা হা, চন্দ্রকুমার! তোমাকে যে একেবারে দু'-আধখানা করে কেটে ফেলল! সর্বনাশ!"

চন্দ্রকুমার একটু হেসে বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, ঘনীভূত অবস্থায় ছিলাম কিনা! তাই কেটে ফেলতে পেরেছে। তবে জুড়ে নিতে দেরি হবে না।"

চন্দ্রকুমারের শরীরের নীচের অংশটি আলাদা হয়ে সারা ঘরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। চন্দ্রকুমার বললেন, "আমার ওই অংশটি কিছু দুষ্ট প্রকৃতির..." বলতে-বলতে তিনি গিয়ে ওই অংশটি আবার প্যান্ট পরার মতো সহজেই জুড়ে নিলেন শরীরে।

গগন সাঁপুই খাঁড়াসমেত ফের মেঝের ওপর পড়ে গেছে। বিড়বিড় করে সে বহুকাল আগে শোনা 'কর্ণার্জুন' নাটকের একখানা সংলাপ বলে যাচ্ছে, "চলে গেলি একবিঘাতিনী, মরণের নামমাত্র করিয়া প্রচার, কিরীটীর কিরীট ছুঁইয়া?"

"ওহে গগন!"

গগন দু'খানা হাত জোড় করে বলে, "যে আজ্ঞে।"

"কেমন বুঝছ?"

"আজ্ঞে, আপনাদের সঙ্গে এঁটে উঠব না।"

"মোহরের থলিটা যে এবার বের করতে হবে ভায়া।"

গগন খুব অবাক গলায় বলে, "মোহর! হুজুর, মোহরটা আবার কোথায় দেখলেন? কু-লোকে কু-কথা রটায়।"

"তোমার চেয়ে কু-লোক আর কে আছে বাপু? একটু আগে তুমি মহারাজের ষষ্ঠ উত্তরপুরুষকে খুন করতে দুটো খুনিকে পাঠিয়েছ। তুমি অন্যায়ভাবে পরস্বাপহরণ করেছ।"

"আজ্ঞে না হুজুর, আমি পরের অপকার করিনি। আর সেই চোর যে মহারাজের কেউ হন, তাও জানতুম না কিনা!"

"কিন্তু মোহর!"

গগন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, "আজ্ঞে, ভগবান দিয়েছেন। তাই..."

"এই যে মহারাজকে দেখছ, ইনি মোহরের খপ্পরে পড়ে দেড়শো বছর পাতাল-ঘরে মাটিচাপা ছিলেন।"

গগন ডুকরে উঠল, "ওরে বাবা, আমি মোটে বদ্ধ জায়গা সইতে পারি না। ছেলেবেলায় একবার পাতকুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম, সেই থেকে বেজায় ভয়।"

"তা হলে উঠে পড়ো গগন! মোহর বের করে ফ্যালো।"

গগন হাতজোড় করে বলে, "বড্ড লোকসান হয়ে যাবে যে!"

"মোহর তো আলমারি খুলে আমিই বের করতে পারি। কিন্তু তাতে তো তোমার প্রায়শ্চিত্ত হবে না গগন। ওঠো। আর দেরি নয়। তারা আসছে।"

"হুজুর, বড্ড গরিব হয়ে যাব যে। কোটি-কোটি টাকা থেকে একেবারে পপাতধরণীতলে! দু-চারখানা যদি রাখতে দেন।"

"দু'শো এগারোখানা মোহর গুনে দিতে হবে। ওঠো।"

"আজ্ঞে, মাজায় বড় ব্যথা। দাঁড়াতে পারছি না।"

"তা হলে হামাগুড়ি দাও। তুমি দুর্বিনীত, হামাগুড়ি দিলে কিছু বিনয় প্রকাশ পাবে।

গগন মোহরের থলি নিয়ে যখন হামাগুড়ি দিয়ে বেরোল, তখন উঠোনে বহু লোক জমায়েত হয়েছে। অনেক মশাল জ্বলছে। ভিড়ের মাঝখানে রোগা ছেলেটা দাঁড়িয়ে।

গগন সিঁড়িতে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়ে গেল। মোহরের থলিটা উঁচুতে তুলে ধরে বলল, "বড্ড গরিব হয়ে গেলাম, আজ্ঞে।"

লাঠি হাতে একটা লোক দু'পা এগিয়ে এসে বলল, "গগনবাবু, দুটো বাঁ-হাতওলা লোক এই এতক্ষণে খুঁজে পেলাম। কথাটা সারাদিন মাথায় চক্কর দিচ্ছিল। আপনারই মশাই, দুটোই বাঁ হাত। ডান হাতেও তো আপনি অশুচি কাজই করেন। কাজেই ওটাও বাঁ হাতই।" বলে লক্ষ্মণ পাইক চারদিকে একবার চাইল, "আর দন্ত্য ন দিয়ে নামের আদ্যক্ষর..."

নটবর ঘোষ টপ করে মাথাটা নামিয়ে ফেলায় লক্ষ্মণ বলে উঠল, "আপনিও খারাপ লোক নটবরবাবু। তবে এ-আদ্যক্ষর আপনার নামের নয়। নামটা আমারই। আমার পিতৃদত্ত নাম নরহরি। নামটা ভুলে গিয়েছিলাম।"

গাঁ-সুদ্ধ লোক হেসে উঠল।

মালয়েশিয়ার টিয়া

অরবিন্দ গুহ
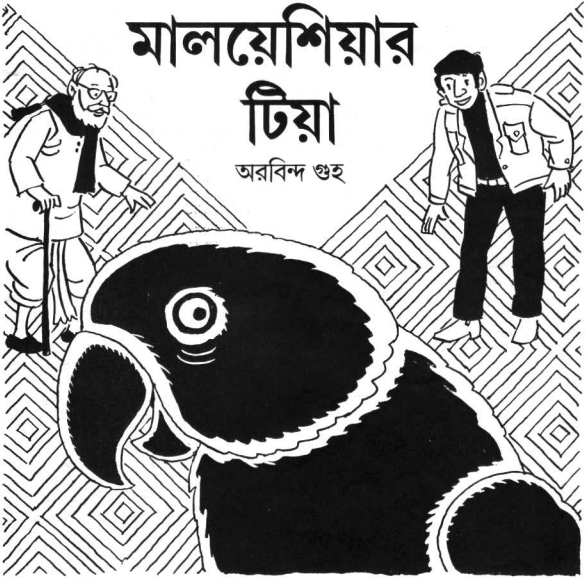
বাড়িতে কেউ নেই নাকি ? অস্থির হয়ে ভোম্বল আরও একবার ডোর-বেল টিপল। কিন্তু, নাঃ, দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনই বন্ধ রইল। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

দরজায় কড়া আছে। অগত্যা ভোম্বল জোরে কড়া নাড়তে লাগল।

সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল। নকুল দরজা খুলে দিয়েছে।

ভোম্বল বিরক্ত হয়ে বলল, "এতক্ষণ ধরে ডোর-বেল বাজাচ্ছি, শুনতে পাসনি ?"

নকুল বলল, "কী করে শুনব ? ডোর-বেলটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। মিস্তিরিকে খবর দিয়েছি। তা লাটসাহেবের আর আসার সময় হচ্ছে না।"

ভেতরে ঢুকে ভোম্বল বলল, "দাদু কোথায় ?"

নকুল বলল, "বেরিয়েছেন। এখনই ফিরে আসবেন।"

বলতে-না-বলতে সুধাকান্তবাবু এলেন। ভোম্বলকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, "আরে বোস, বোস।"

হাতের লাঠিখানা নকুলের হাতে দিলেন সুধাকান্তবাবু। তারপর গায়ের পাঞ্জাবি খুললেন। সেটাও নকুলের হাতে দিলেন। লাঠি আর পাঞ্জাবি নকুল জায়গামতো রেখে দিল।

বাড়ির সব কাজের ভার নকুলের হাতে। সুধাকান্তবাবুর বাড়িতে আর কেউ নেই। তা সব কাজেই নকুল খুব ওস্তাদ।

ভোম্বল বসল চেয়ারে। সুধাকান্তবাবু খাটে হাঁটু মুড়ে বসলেন। সুধাকান্তবাবুর বুক পর্যন্ত দাড়ি। নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে সুধাকান্তবাবু বললেন, "বুঝলি ভোম্বল, নিজের দাড়িতে হাত বুলনোর মতো সুখ আর কিছুতে নেই।"

ভোম্বল হাসিমুখে বলল, "তোমার সুখ নিয়ে তুমি থাকো। কিন্তু তোমার ডোর-বেল যে অকেজো হয়ে আছে, সে-খবর কি তোমার জানা আছে ?"

সুধাকান্তবাবু বললেন, "খুব জানা আছে। হাড়ে-হাড়ে জানা আছে। মিস্তিরি আসে, মেরামত করে দিয়ে যায়, দিনকয়েক ঠিকঠাক। আবার বিগড়ে যায়, আবার মিস্তিরি আসে, আবার..."

হাত তুলে দাদুকে থামিয়ে দিয়ে ভোম্বল বলল, "দেশি ডোর-বেল, দেশি মিস্তিরি, এইরকমই তো হবে। তুমি যদি রাজি হও তো বলো, আমি একটা জার্মান

ডোর-বেল লাগিয়ে দিয়ে যাই, দেখবে কী জিনিস।"

সুধাকান্তবাবু বললেন, "তা জার্মান ডোর-বেল খারাপ হলে এখানে জার্মান মিস্তিরি কোথায় পাব?"

ভোম্বল ঘাড় নেড়ে বলল, "জার্মান ডোর-বেল কখনও খারাপ হয় না। ওসব জিনিসের হিম্মতই আলাদা। তুমি একবার রাজি হয়ে দেখো।"

সুধাকান্তবাবু আপত্তি করে বললেন, "না বাপু, ওসব থাক, আমি পারতপক্ষে বিদেশি জিনিস ব্যবহার করি না। আমার ঘরে কোনও বিদেশি জিনিস দেখতে পাচ্ছিস?"

ভোম্বল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এই তো হল মুশকিল। তুমি পারতপক্ষে ঘরে কোনও বিদেশি জিনিস রাখো না, আমি পারতপক্ষে ঘরে কোনও দেশি জিনিস রাখি না।"

ঘড়িতে ঢং-ঢং করে সাতটা বাজল। শুনে ভোম্বল বলল, "এই তো তোমার দেশি ঘড়ির আওয়াজ। কী বিশ্রী আওয়াজ।"

সুধাকান্তবাবু হা-হা করে হাসলেন। বললেন, "আর তোর ঘরের সুইস ঘড়িতে সাতটা বাজলে একটা কোকিল যখন সাতবার কুহু-কুহু করে তখন সেটাও আমার দারুণ বিশ্রী লাগে। ঘোর বর্ষাতেও কোকিলের কুহু-কুহু-কুহু-কুহু— কী জঘন্য। তা সে যাকগে। তোর এই নতুন প্যান্ট কোন দেশের?"

ভোম্বল সগর্বে বলল, "বেলজিয়ামের প্যান্ট।"

"শার্টটাও কি বেলজিয়ামের?"

ভোম্বল ঘাড় নেড়ে বলল, "নাঃ, এটা নরওয়ের।"

সুধাকান্তবাবু অবাক হয়ে বললেন, "তা কলকাতায় বসে এসব তুই জোগাড় করিস কী করে?"

ভোম্বল ঘাড় হেলিয়ে বলল, "দাদু, সুলুকসন্ধান জানলে কলকাতায় বসে জগতের সব জিনিস পাওয়া যায়। খরচ একটু বেশি পড়ে, এই যা। অবশ্য কখনও-কখনও ঠকতেও হয়।"

"কীরকম?"

হতাশ হয়ে ভোম্বল বলল, "আর বোলো না, ঠক-জোচ্চোরে দেশ ভরে গেল। একবার একটা চেকোস্লোভাকিয়ার কুকুরের বাচ্চা কিনলাম, পরে ধরা পড়ল সেটা আহিরীটোলার রাস্তার নেড়িকুত্তার বাচ্চা। ধরা পড়ার পর আর কি রাখি? দুর-দুর করে তাড়িয়ে দিলাম।"

জিভে-দাঁতে চুকচুক শব্দ করে সুধাকান্তবাবু বললেন, "তোর ঘরে তা হলে বিদেশি জ্যান্ত কিছু নেই?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভোম্বল বলল, "না দাদু, নেই। সেই তো আমার একটা মস্ত দুঃখ।"

নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে সুধাকান্তবাবু বললেন, "তা এ-দুঃখ বোধ হয় তোর চিরকাল থেকে যাবে। বিদেশি ঘড়ি বা ফ্রিজ, কাপ-প্লেট, কোট-প্যান্ট, চাদর কিংবা পরদা, টিভি কিংবা ভি সি আর—এসব জোগাড় করা যত সোজা, আফ্রিকার সিংহ কিংবা উত্তর মেরুর ভালুক জোগাড় করা বোধ হয় তত সোজা নয়।"

ভোম্বল মরিয়া হয়ে বলল, "উত্তর মেরুর ভালুকের দরকার নেই, কিন্তু তুমি চেষ্টা করলে আফ্রিকার সিংহ পেতে পারো।"

অবাক হয়ে সুধাকান্তবাবু বললেন, "কী করে?"

ভোম্বল বলল, "তোমার মেয়ে-জামাই তো আফ্রিকায় থাকে, আমার কথা তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না, কিন্তু তুমি যদি তাদের লিখে দাও..."

থামিয়ে দিয়ে সুধাকান্তবাবু বললেন, "তোর মাথাটা একেবারে গেছে। না হলে নিজের মা-বাবাকে আমার মেয়ে-জামাই বলছিস? আমার মনে হচ্ছে তোর মাথাটাও বিদেশি জিনিস।"

ঢোক গিলে ভোম্বল বলল, "আচ্ছা দাদু, তোমার মেয়ে-জামাইকে, উঁহু, উঁহু, আমার মা-বাবাকে তুমি কি আমার জন্য আফ্রিকা থেকে একটা সিংহ পাঠাতে লিখতে পারো না?"

সুধাকান্তবাবু অনায়াসে বললেন, "পারি। কিন্তু তার আগে তোকে একটা কাজ করতে হবে।"

ভরসা পেয়ে ভোম্বল জিজ্ঞেস করল, "কী কাজ?"

দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে সুধাকান্তবাবু বললেন, "আমাকে পাগলাগারদে ভর্তি করে দিতে হবে।"

ভোম্বল উঠে পড়ল। নাঃ, আফ্রিকার সিংহের কোনও আশা নেই।

সুধাকান্তবাবু বললেন, "ওরে, ওসব পাগলামি বাদ দে। আগেও হাজারবার বলেছি, আবার বলছি, আমার মতো দাড়ি রাখ, দাড়ি রাখ। বুক পর্যন্ত দাড়ি ছাড়া কি পুরুষমানুষকে মানায়?"

ভোম্বল হাতজোড় করে বলল, "আগেও হাজারবার বলেছি, আবার বলছি, তোমার পায়ে পড়ি দাদু, তুমি আমাকে তোমার মতো দাড়ি রাখতে বোলো না, ও আমি কিছুতেই পারব না। আজ চলি।"

হতাশ হয়ে সুধাকান্তবাবু নিজের দাড়িতে আঙুল চালাতে লাগলেন।

সাতদিন কেটে গেল, মিস্তিরির দেখা নেই। ডোর-বেল যেমন বিকল তেমনই বিকল হয়ে আছে।

দুপুরবেলা। খাওয়াদাওয়া সেরে সুধাকান্তবাবু মহাভারত পড়ছিলেন। ভেতরের বারান্দায় নকুল ঘুমোচ্ছে।

দরজার কড়া ঠকঠক করে উঠল। হয়তো মিস্তিরি বাবাজি দয়া করে এসেছে।

সুধাকান্তবাবু নিজেই উঠে দরজা খুললেন। না, মিস্তিরি না। হাতে খাঁচার মধ্যে একটা টিয়া নিয়ে কে একজন অচেনা মানুষ।

সুধাকান্তবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে। নাঃ, ঠিক অচেনা তো নয়, একটু যেন চেনা-চেনা লাগছে। কে?

হাতের খাঁচাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে লোকটি ঢিপ করে প্রণাম করল সুধাকান্তবাবুকে। বলল, "আমাকে চিনতে পারলেন না কাকাবাবু? আমার নাম সুদেব। আমার বাবার নাম ব্যোমকেশ মজুমদার।"

সুদেবকে জড়িয়ে ধরলেন সুধাকান্তবাবু। বললেন, "কত বড় হয়ে গিয়েছ, কতকাল পরে দেখলাম, চিনব কী করে? শুনেছিলাম তুমি যেন বাইরে কোথায় থাকো। এসো, এসো, ভেতরে এসে বোসো।"

খাঁচা হাতে নিয়ে ভেতরে এল সুদেব। চেয়ারে বসল। সুধাকান্তবাবু খাটে বসলেন।

সুদেব বলল, "হ্যাঁ, আমি বাইরেই থাকি। কুয়ালালামপুরে। মালয়েশিয়ায়।"

সুদেব সুধাকান্তের বাল্যবন্ধু ব্যোমকেশের ছেলে। সুধাকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যোমকেশ কেমন আছে?"

"ভাল আছেন। বাবা তো আমার সঙ্গেই থাকেন। দু' দিনের জন্য আপিসের কাজে কলকাতায় এসেছি। বাবা পইপই করে আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছেন।"

সুধাকান্তবাবু খুশি হয়ে ঘাড় দোলাতে-দোলাতে বললেন, "তা তো বলবেই, তা তো বলবেই। কিন্তু তুমি খাঁচায় টিয়া নিয়ে ঘোরাঘুরি করছ কেন?"

সুদেব হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, "ঘোরাঘুরি করছি না। এটা আপনার জন্য

নিয়ে এসেছি। আপনার জন্য কিছু একটা উপহার নিয়ে আসার জন্য মন আঁকুপাকু করছিল, কী নিয়ে যাই, কী নিয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে মালয়েশিয়ার টিয়া নিয়ে এলাম। মালয়েশিয়ার টিয়া তো বিশ্ববিখ্যাত।"

সুধাকান্তবাবু সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মালয়েশিয়ার টিয়ার নাম আমিও খুব শুনেছি। কিন্তু জীবনে কখনও দেখিনি। দেখি, একটু ভাল করে দেখি।"

মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। টিয়াটার শরীরের ওপরদিক একেবারে ঝলমলে সবুজ। পিঠ নীল, মাথার দু'দিক নীল, শরীরের সঙ্গে ডানা যেখানে জুড়ে আছে সেখানেও নীল। নীচের দিক হলদে-সবুজ। লেজ সবুজ ; লেজের ডগা সরু, হলদে। নাকের গর্ত থেকে চোখ পর্যন্ত মিহি কালো রেখা। থুতনি কালো, ওপরের ঠোঁট লাল, নীচের ঠোঁট ঈষৎ কালো।

দেখে মুগ্ধ হয়ে সুধাকান্তবাবু দাড়িতে আঙুল বোলাতে-বোলাতে বললেন, "বাঃ, বাঃ, একটা দেখার মতো জিনিস বটে। সাধে কি আর মালয়েশিয়ার টিয়ার এত নাম !"

সুদেব খুশি হয়ে বলল, "যাক, আপনার পছন্দ হয়েছে, আমার খুব আনন্দ হল। এখন তো মাঝারি সাইজের আছে, পরে আরও বাড়বে, প্রায় ফর্টি সেন্টিমিটার লম্বা হবে, তখন রূপ আরও খুলে যাবে। দেখে চোখ ফেরাতে পারবেন না। কাকাবাবু, এবার তা হলে উঠি।"

"আবার কবে আসবে ?"

"আবার কবে আসব কে জানে ! আজ রাত্তিরেই প্লেনে উঠতে হবে।"

যাওয়ার আগে সুদেব বলল, "আর-একটা কথা কাকাবাবু। দেখছেন ও মানুষের গলা কী চমৎকার নকল করতে পারে। সব টিয়াই অবশ্য মানুষের গলা নকল করতে পারে, কিন্তু মালয়েশিয়ার টিয়ার মতো আর কোনও টিয়া পারে না।"

সুদেব চলে যাওয়ার পর নকুলকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন সুধাকান্তবাবু। দেখেশুনে নকুলও খুব খুশি।

সুধাকান্তবাবু দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, "বুঝলি নকুল, এবার ভোম্বল যেদিন আসবে সেদিন বুঝবে জবর খবর কাকে বলে। আমার ঘরে মালয়েশিয়ার টিয়া—এ কী সোজা কথা রে ?"

কিন্তু দিনের পর দিন যায়, ভোম্বলের দেখা নেই। অসুখ-বিসুখ করেনি তো ? নাঃ, তা হলে কেউ-না-কেউ একটা খবর দিয়ে যেত। হয়তো জরুরি কাজে আটকে পড়েছে। দু-একদিন দেখা যাক।

দু-একদিন বাদে ভোম্বল এসে হাজির। বলল, "দাদু, জবর খবর আছে।"

কোথায় সুধাকান্তবাবু জবর খবর দেবেন, না, ভোম্বলই জবর খবর নিয়ে এসেছে।

"কী ?"

ভোম্বল বলল, "তিন বছরের জন্য প্যারিস যাচ্ছি। আপিস থেকে পাঠাচ্ছে। জবর খবর না ?"

সুধাকান্তবাবু বললেন, "জবর খবর তো বটেই। তা এই তিন বছর সুরমা কোথায় থাকবে ?"

"বাঃ, ও আবার কোথায় থাকবে,

আমার সঙ্গেই যাবে, বউয়ের যাওয়া-আসার খরচ-টরচও আপিসই দিচ্ছে।"

সুধাকান্তবাবু মহানন্দে দাড়িতে হাত দিয়ে বললেন, "বাঃ, বাঃ, খাসা আপিস, দিলদরিয়া আপিস, এমন না হলে আবার আপিস! তা বাপু, আমারও একটা জবর খবর আছে।"

ভোম্বল ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমার আবার জবর খবর কী?"

সুধাকান্তবাবু সরাসরি বললেন, "মালয়েশিয়ার টিয়া। আমার ঘরে এসে গিয়েছে। আমার ঘরে বিদেশি জ্যান্ত প্রাণী—জবর খবর নয়?"

কথাটা আর কেউ বললে ভোম্বল বিশ্বাস করত না। কিন্তু সুধাকান্তবাবুর মুখে মিথ্যে কথা অসম্ভব।

ভোম্বলকে ধীরেসুস্থে সুধাকান্তবাবু মালয়েশিয়ার টিয়ার বৃত্তান্ত শোনালেন। ভোম্বল মেনে নিল, জবর খবরই বটে।

সুধাকান্তবাবু বললেন, "চল, নিজের চোখে দেখবি চল।"

ভেতরে এসে বারান্দায় ভোম্বল নিজের চোখে দেখল মালয়েশিয়ার খাঁচায় মালয়েশিয়ার টিয়া।

ভোম্বল আর লোভ সামলাতে পারল না। ব্যাকুল হয়ে বলল, "দাদু, তুমি এই মালয়েশিয়ার টিয়াটা আমাকে দিয়ে দাও।"

নিজের দাড়িতে আঙুল চালাতে-চালাতে সুধাকান্তবাবু বললেন, "দিতে পারি। কিন্তু একটি শর্তে।"

"কী শর্ত?"

সুধাকান্তবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "তুই যেদিন আমার মতো বুক পর্যন্ত দাড়ি রাখবি সেদিনই আমার এই মালয়েশিয়ার টিয়া মালয়েশিয়ার খাঁচা সমেত আমি তোকে দিয়ে দেব। কথা দিলাম। পাকা কথা।"

ভোম্বল চিন্তায় পড়ে গেল। দাড়ি রাখতে হবে? বুক পর্যন্ত দাড়ি? কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু মালয়েশিয়ার টিয়ার লোভে ভোম্বল শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। বলল, "ঠিক আছে। তাই রাখব। কিন্তু দাদু, অতবড় দাড়ি করতে কতদিন লাগবে?"

সুধাকান্তবাবু বললেন, "আড়াই বছরেই হয়ে যায়। তিন বছরে আরও ভাল হবে। তিন বছর প্যারিসে দাড়ি রাখবি, দাড়ি নিয়ে প্যারিস থেকে ফিরে আসবি, ব্যস, খুশি হয়ে মালয়েশিয়ার টিয়া তোকে দিয়ে দেব।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভোম্বল বলল, "তাই হবে। চলি দাদু, অনেক গোছগাছ আছে, কালই রওনা হতে হবে।"

প্যারিস থেকে সুধাকান্তবাবুকে ঘন-ঘন চিঠি লিখতে লাগল ভোম্বল। চিঠিতে শুধু নিজের দাড়ির কথা আর মালয়েশিয়ার টিয়ার কথা। ভোম্বলকে ঘন-ঘন চিঠির উত্তর দিতে লাগলেন সুধাকান্তবাবু। উত্তরে শুধু ভোম্বলের দাড়ির কথা আর মালয়েশিয়ার টিয়ার কথা। ভোম্বলের দাড়ি আর মালয়েশিয়ার টিয়া ছাড়া দু'জনের কাছে জগতের আর সব কিছু অবান্তর।

দেখতে-দেখতে তিন বছর কেটে গেল।

কলকাতায় ফিরেই ভোম্বল চলে এল সুধাকান্তবাবুর বাড়িতে। ভোম্বল কথা রেখেছে, বুক পর্যন্ত চমৎকার দাড়ি। ভোম্বলের চেহারায় দাড়ি মানিয়েছে চমৎকার।

সুধাকান্তবাবু মুগ্ধ হয়ে বললেন, "ভোম্বল, তোকে আগের কালের খানদানি ফরাসি পুরুষমানুষের মতো দেখাচ্ছে। তোর দিকে তাকালে চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না। শাবাশ। তুই বুক পর্যন্ত দাড়ি রেখেছিস, আমিও খুশি হয়ে মালয়েশিয়ার টিয়া তোকে দিয়ে দিচ্ছি।"

নকুলকে ডেকে টিয়া আনতে বলে দিলেন সুধাকান্তবাবু। হুকুম তামিল করল নকুল। নিজের চোখে দেখে ভোম্বলের মনে হল এই তিন বছরে মালয়েশিয়ার টিয়ার জেল্লা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। এই তিন বছর প্যারিসে বসে ভোম্বল মালয়েশিয়ার টিয়ার স্বপ্ন দেখেছে। এতদিনে স্বপ্ন সফল।

একটা ট্যাক্সি ডেকে ভোম্বল মালয়েশিয়ার টিয়া নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেল।

তিনদিন বাদে ভোম্বলের দরজার জার্মান ডোর-বেল বেজে উঠল। সুধাকান্তবাবু এসেছেন। এই তিনদিনেই সুধাকান্তবাবুর চেহারা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।

দরজা খুলে দিল সুরমা। সুধাকান্তবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "আরে দাদু, বলাকওয়া নেই, হঠাৎ আপনি, কী ব্যাপার, আসুন, আসুন। ভেতরে আসুন।"

ভেতরে ঢুকে সাজানো-গোছানো ঘরে বিদেশি সোফায় বসলেন সুধাকান্তবাবু।

সরমা বলল, "কেকের সঙ্গে কী খাবেন, চা, না কফি?"

সুধাকান্তবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "কিছু খাব না। গলা দিয়ে কিছু নামবে না। ভোম্বল বাড়িতে আছে?"

"আছে। স্নান করতে ঢুকেছে। খবর দিচ্ছি।"

খবর পেয়ে স্নান সেরে তাড়াতাড়ি চলে এল ভোম্বল। পরনে ফরাসি পোশাক, বুক পর্যন্ত দাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে সুধাকান্তবাবুর চোখে জল এসে গেল।

ভোম্বল করুণ গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে দাদু?"

সুধাকান্তবাবু মিনমিন করে বললেন, "আজ তিনদিন কিছু খাইনি, তিনরাত ঘুমোইনি।"

"কী ব্যাপার?"

সুধাকান্তবাবু ভোম্বলের দু' হাত ধরে হাউ-হাউ করে বললেন, "ভোম্বল, তোকে আমি ঠকিয়েছি, আমার কথায় বিশ্বাস করে তুই বুক পর্যন্ত দাড়ি রেখেছিস, কিন্তু আমি তোকে মালয়েশিয়ার টিয়া দিইনি, দিতে পারিনি!"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। তুই প্যারিসে যাওয়ার ছ' মাস বাদেই মালয়েশিয়ার টিয়াটা মরে গেল। অগত্যা বাজার থেকে একটা মেদিনীপুরের টিয়া এনে খাঁচায় রেখেছি।" সুধাকান্তবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "কোথায় মালয়েশিয়া আর কোথায় মেদিনীপুর!"

সুধাকান্তবাবুর পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে ভোম্বল নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

সুধাকান্তবাবু ডুকরে উঠলেন, "অনুতাপে আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে। তোকে আমি ঠকিয়েছি। তিনদিন কিছু খাইনি, তিনরাত ঘুমোইনি।"

মেদিনীপুরের টিয়া বারান্দায় মানুষের গলা নকল করে বলে উঠল, "রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ।"

সেদিকে কান না দিয়ে ভোম্বল বলল, "দাদু, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে খাও, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও। আমি ঠকিনি।"

"অ্যাঁ? কী বলছিস?"

ভোম্বল হি-হি করে হাসল। বলল, "বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। আরে, দাড়ি-ফাড়ি রাখা কি আমার পোষায়? এই দ্যাখো, নিজের চোখে দ্যাখো।"

বলে ভোম্বল নিজের দু' হাত কানের কাছে নিয়ে দাড়ি খুলে ফেলে টেবিলে রাখল। বলল, "নকল দাড়ি। কিন্তু আসল বিদেশি জিনিস। প্যারিসে কিনেছি।"

ছবি : দেবাশিস দেব

সম্পূর্ণ উপন্যাস

দলবদলের আগে

মতি নন্দী
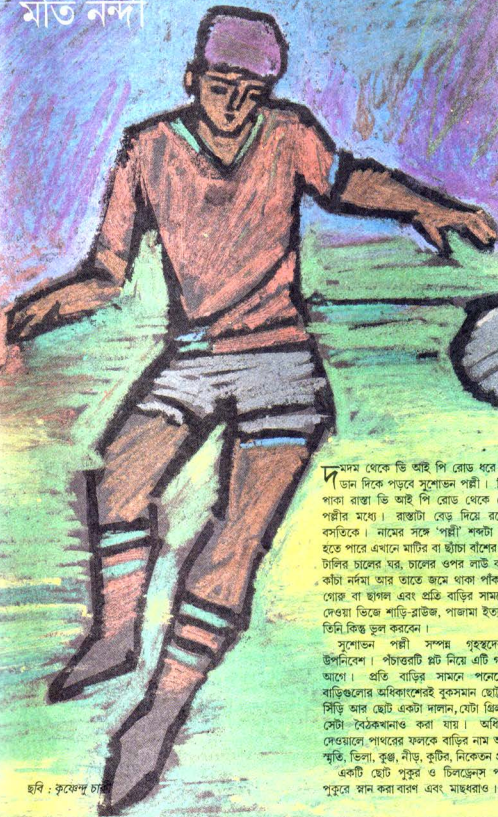
দমদম থেকে ভি আই পি রোড ধরে কলকাতার দিকে যেতে ডান দিকে পড়বে সুশোভন পল্লী। তিরিশ ফুট চওড়া একটা পাকা রাস্তা ভি আই পি রোড থেকে বেরিয়ে ঢুকে গেছে এই পল্লীর মধ্যে। রাস্তাটা বেড় দিয়ে রয়েছে বাইশ বিঘার এই বসতিকে। নামের সঙ্গে 'পল্লী' শব্দটা থাকায় অনেকেরই মনে হতে পারে এখানে মাটির বা ছ্যাঁচা বাঁশের দেওয়াল দেওয়া খড় বা টালির চালের ঘর, চালের ওপর লাউ বা কুমড়োগাছের পাতা, কাঁচা নর্দমা আর তাতে জমে থাকা পাঁক, দড়িতে বাঁধা দু-চারটে গোরু বা ছাগল এবং প্রতি বাড়ির সামনে কুকুর আর শুকোতে দেওয়া ভিজে শাড়ি-ব্লাউজ, পাজামা ইত্যাদি দেখা যাবে, তা হলে তিনি কিন্তু ভুল করবেন।

সুশোভন পল্লী সম্পন্ন গৃহস্থদের একটা ছোটখাটো উপনিবেশ। পঁচাত্তরটি প্লট নিয়ে এটি গড়ে উঠেছিল কুড়ি বছর আগে। প্রতি বাড়ির সামনে পনেরো ফুট চওড়া রাস্তা, বাড়িগুলোর অধিকাংশেরই বুকসমান ছোট্ট লোহার ফটক, তারপর সিঁড়ি আর ছোট একটা দালান, যেটা গ্রিল ঘেরা। চেয়ার পেতে সেটা বৈঠকখানাও করা যায়। অধিকাংশ ফটকের পাশের দেওয়ালে পাথরের ফলকে বাড়ির নাম আর নম্বর। নামের সঙ্গে স্মৃতি, ভিলা, কুঞ্জ, নীড়, কুটির, নিকেতন প্রভৃতি যোগ করা।

একটি ছোট পুকুর ও চিলড্রেন্‌স পার্ক আছে সুশোভনে। পুকুরে স্নান করা বারণ এবং মাছধরাও। তবে পুঁটি ও মৌরলা

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ছাড়া আর কিছু যে নেই, সে-সম্পর্কে পল্লীর বাসিন্দারা নিশ্চিত। কেননা, মাছচোরেরাই জানিয়ে দিয়েছে, এই পুকুরে জাল ফেলে তারা আর বোকামি করবে না। আধ বিঘার ছোট্ট পার্কটিতে দুটি দোলনা ও দুটি সি-শ্য ছাড়া আছে মুখোমুখি দুটি কংক্রিটের বেঞ্চ। পার্কের চারদিক ঘিরে কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়াগাছ এবং রাস্তা। পার্কটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে দোপাটি, গাঁদা, কামিনী, জবা প্রভৃতি ফুলগাছ দিয়ে সাজানো হয়েছিল। পল্লীর অ্যাসোসিয়েশন থেকে একজন মালিও রাখা হয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যে অধিকাংশ গাছ উধাও হওয়ায় সুশোভনকে শোভনীয় করার চেষ্টা থেকে অ্যাসোসিয়েশন ক্ষান্তি দেয়। পার্কের চারধারে যে বাড়িগুলি তার কয়েকটি চারতলা, কয়েকটি দোতলা এবং বাকি সব একতলা। পল্লীর পেছনদিকে, যারা দেরিতে প্লট কিনেছিলেন, তাঁদের বাড়িগুলির অধিকাংশই একতলা। কয়েকটা প্লটে প্লাস্টার ছাড়াই অসমাপ্ত বাড়িতে লোক বসবাস করছে। এই বাড়িগুলির পেছনে, অর্থাৎ সুশোভন পল্লীর এলাকার বাইরেই বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানার মাঠ।

স্থানীয় লোকেরা এটাকে বলে ইলেকট্রিকের মাঠ। এখানে সকাল-বিকেল ফুটবল খেলা হয়, একটা ফাইভ-এ-সাইড, হাইটের টুর্নামেন্টও পাঁচ বছর আগে শুরু হয়েছে। বিন্দুবাসিনী চ্যালেঞ্জ শিল্ড বিজয়ীর জন্য, আর পাঁচকড়ি দে কাপ বিজিতের জন্য। কারখানা মালিকরা চার বছর আগে জমিটা বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল এক বিল্ডিং প্রোমোটারের কাছে। কিন্তু কীভাবে যেন সেটা জানতে পেরে নেতাজিনগর আর শহিদ কলোনির ছেলেরা বিক্রি বন্ধের দাবিতে লাঠি, বোমা এবং আরও কীসব জিনিস নিয়ে এমন রইরই কাণ্ড বাধিয়ে দেয় যে, মালিকরা আজও কারখানামুখো হতে সাহস পাচ্ছে না।

এপ্রিলের মাঝামাঝি চৈত্রের শেষাশেষি এমন একটা দিনের ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সুশোভন পল্লীর চারজন রাস্তা দিয়ে স্বাভাবিক গতির থেকে একটু জোরে হাঁটছেন। বেড়ানোও নয় জগিংও নয়, সমীরণ নাম দিয়েছে বেগিং। এইভাবে যাঁরা ভোরে রাস্তায় হনহনিয়ে হাঁটেন তাঁদের সে বলে 'বেগার'। বাংলা করে বলে, 'স্বাস্থ্য ভিক্ষুক'। ওর বোন শ্যামলা (শ্যামলী নয়) আর ভাই হিমাদ্রি ছাড়া এই নামকরণের ব্যাপারটা আর কেউ জানে না।

আর কেউ বলতে অবশ্য একজনকেই বোঝায়, তাদের পিসিমা রেখা গুপ্ত। মধ্য কলকাতায় মৌলালির কাছে মেয়েদের একটা স্কুলে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টরের কাজ করেন আর কখনও কোনও শিক্ষিকা অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ক্লাস ঠাণ্ডা রাখতে। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, সত্তর কেজি ওজনের, ছেচল্লিশের কাছাকাছি বয়সী রেখা গুপ্ত এখন ক্লাসে ঢুকেই সারা ঘরে প্রথমে চোখ বুলিয়ে শুধু একবার 'হুম' বলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জোড়া চোখ ডেস্কের ওপর দৃষ্টি নামিয়ে আনে। "তোমরা কি চাও এখন আমি তোমাদের পড়াই ?" ক্লাস নিরুত্তর থাকে। "গুড। তোমরা কি চাও এখন আমি গল্প করি ?" মুহূর্তে একটা 'হ্যাঁ-আ-আ' শব্দ সিলিংয়ের দিকে উঠতে-উঠতে রেখা-আন্টির আর-একটা হুম-এর ধাক্কায় ডেস্কের ওপর গোঁত খেয়ে নেমে আসে। কিন্তু দশাসই ধড়ের ওপর বসানো মিষ্টি মুখটিতে ঝকঝকে আয়ত চোখজোড়া যখন প্রশ্রয়মাখা দুষ্টুমিতে পিটপিট করে ওঠে, তখনই 'আন্টি, গ অল্—পোও' এই শব্দটা এবার প্রজাপতির মতো উড়তে-উড়তে সিলিং ছুঁয়ে ঘরে ছড়িয়ে যায়। ঘণ্টা বাজলে আন্টি যখন বেরিয়ে আসেন, তখন সারা ঘর হাসিতে লুটোপুটি কিংবা ছলছল চোখে গম্ভীর। টিচার্স-রুমে রেখা গুপ্তকে বলতে শোনা যায়, "মেয়েগুলো গল্পের কাঙাল ; এদের বাবা-মায়েরা কেমন লোক ! রোজ গল্প শোনায় না কেন ? কল্পনাপ্রবণ না করে তুললে মনের বিকাশ ঘটবে কী করে ? আমি তো রোজ রাতে গল্প শোনাতাম।"

তিনি গল্প শোনাতেন নাককানমলা-দের। ডাকনাম অনুসারে নাক হল নাকু অর্থাৎ সমীরণ, কান হল কানু বা হিমাদ্রি আর মলা বলাবাহুল্য শ্যামলা। রেখা গুপ্ত বাসকেটবল খেলায় ইউনিভার্সিটি আর স্টেটের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন কুড়ি বছর আগে পর্যন্ত। যখন তাঁর বউদি তিনটি শিশুকে রেখে মারা গেলেন এবং দাদা সুনীলবরণ আধা-সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন শুরু করলেন, তখন ছাব্বিশ বছরের পিসি চার ও দুই বছরের নাকু কানু আর তিন মাসের মলাকে বুকে তুলে নিয়ে একই সঙ্গে ওদের বাবা-মা হয়ে যান। রেখা গুপ্ত বিয়ে করেননি।

সমীরণ যাদের বেগার বলে, তাদের মধ্যমণিটি হলেন তারই পিসি। সুতরাং বেগার শব্দটি যাতে কোনওক্রমেই ওই একজনের কানে না পৌঁছয় সেই ব্যাপারে তিন ভাইবোন হুঁশিয়ার। পৌঁছলে কী হতে পারে সে-বিষয়ে সমীরণের মোটামুটি একটা ধারণা আছে।

পাঁচ বছর আগে তিনটি শোবার ঘর, রান্নাঘর, কলঘর এবং খাবার দালানের মোট দশটি ছোট ও বড় জানলার কুড়িটি কাচের পাল্লা সাবান-জল ও ন্যাতা দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়েছিল এবং এমনভাবে, যেন ন্যাতা বোলানোর দাগ না থাকে। ছিল বলে তিনটি জানলার রিপিট পরিষ্কার করতে হয়। যখন সে প্রথম ফার্স্ট ডিভিশন লিগে দর্জিপাড়া একতা-য় খেলতে শুরু করেছে তখন যুগের যাত্রীকে সে গোল দিতেই রেফারি অফসাইড জানিয়ে গোলটি বাতিল করে। অবশ্যই অনসাইড থেকে করা গোল, তা ছাড়া সমীরণের মতো আনকোরা ফুটবলারদের কাছে যাত্রীর মতো গত বছরের চ্যাম্পিয়ান দলকে ঘেরা মাঠে প্রথম খেলতে নেমেই গোল দেওয়া তো চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো ব্যাপার। রাগে জ্বলে উঠে সে মনের ভারসাম্য নষ্ট করে রেফারিকে বলেছিল, 'যাত্রীর চাকর' এবং আরও কিছু কথা। সঙ্গে-সঙ্গে লাল কার্ড তাকে দেখতে হয়েছিল। পরদিন কাগজে তাকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার খবরটা পড়ে বেগারদের একজন, রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কম্যান্ডান্ট জি. সি. দত্ত, এই 'আনস্পোর্টিং, ইনডিসিপ্লিন্ড বিহেভিয়ার'-এর দুঃসংবাদটি পিসির কানে তুলে দেন। 'লজ্জায় মাথাকাটা যাওয়া' রেখা গুপ্ত অতঃপর অপরাধী ভাইপোর আত্মপক্ষ সমর্থন শোনা ও রায় দেওয়ার জন্য কতক্ষণ সময় নিয়েছিলেন ?

"রেফারিকে তুই চাকর বলেছিস ! এই পরিবারের ছেলে এমন অভব্য, অসভ্য, জন্তু, এমন আনকালচার্ড হবে ভাবতেও পারি না !"

"পিসি, এর থেকেও খারাপ নোংরা কথা ছেলেরা রেফারিকে বলে। আমি তো সেই তুলনায়—"

"চুউপ।"

"পিসি, রেফারি ইচ্ছে করেই আমার গোলটা—"

"আবার কথা !"

"রেফারি যাত্রীর টাকা—" সমীরণের চুল ততক্ষণে পিসির হাতের মুঠোয় বন্দি।

"চাকর বলেছিলিস ? ঠিক আছে, চাকরের কাজই করবি। বাড়ির সব জানলার কাচ...।"

সমীরণ হিসাব করে দেখেছে। বিচার ও শাস্তিদানপর্ব দু' মিনিটেই সারা হয়েছিল। এখন যদি পিসি শোনে তার বন্ধুদের সে আড়ালে বেগার বলে, তা হলে নিশ্চিত তাকে বেগিংয়ে নামিয়ে দেবে। হয়তো বলবে, "যাও, শ্যামবাজার কি মৌলালি মোড়ে এই বাটিটা হাতে নিয়ে ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করো। ভিক্ষের পয়সা থেকে আট আনা খাবার জন্য খরচ করে বাকিটা আমায় রাত্রে দেবে। বেগারদের জিলিপি কিনে খাওয়াব।" পিসিমার বেগার মানে সত্যিকারেরই ভিখারি, যারা রাস্তায় ভিক্ষা করে।

মাঝে-মাঝেই বাজার করে ফেরার সময় হিমাদ্রি গরম জিলিপি কিনে রাস্তা দিয়ে খেতে-খেতে আসত। বলাবাহুল্য, বাড়ি পৌঁছনোর আগেই জিলিপিগুলো শেষ করে ফেলত। হপ্তার ছ'টা দিন তাকে বাজার যেতে হয়। রবিবারে শ্যামলাকে সঙ্গে নিয়ে যান পিসি নিজেই। হিমাদ্রির জিলিপি খাওয়াটা একদিন দেখে ফেলে বেগারদের একজন, স্বাস্থ্য দফতরের রিটায়ার্ড ডেপুটি সেক্রেটারি অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য। যথারীতি পিসির কাছে "নোংরা হাতে, ধুলোবালি বীজাণু ওড়া রাস্তা দিয়ে, আন-হাইজিনিক পরিবেশে তৈরি চিনির রসে ডোবানো জিলিপি, যা খেলে ডায়বিটিস হতে পারে", এমন জিনিস খাওয়ার সাঙ্ঘাতিক খবরটা পৌঁছে গেল।

সুশোভন পল্লীতে ঢোকার মুখে ভি আই পি রোডের ওপরই 'জয় মা তারা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। হিমাদ্রি যথারীতি সেদিন বাজার থেকে বাঁচানো পয়সায় আটটা জিলিপি কিনে, ঠোঙাটার মুখ খুলে দু' আঙুলে ধরে, একটাকে টেনে সবেমাত্র বের করেছে আর ঠিক তখনই পেছন থেকে, "ঠোঙাটা আমায় দে তো কানু।" আঙুল থেকে জিলিপিটা প্রথমেই জমিতে খসে পড়েছিল। তারা মা-র সামনে বসে থাকা কুকুর জগা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে একটা গোটা জিলিপি, সম্ভবত জীবনে প্রথম, পাওয়ার জন্য যার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেজ নেড়েছিল, সে তখন ফ্যাকাসে মুখে পিসির দিকে তাকিয়ে।

"তোর হাতটা দেখি।"

হিমাদ্রি ডান হাতের তালু মেলে ধরল। রেখা গুপ্ত তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে-করতে নাক কোঁচকালেন। "এই তো আলুর মাটি, মাছের গন্ধ লেগে রয়েছে...এই হাতে...।"

ছেঁড়া গেঞ্জি আর লুঙ্গিপরা এক বৃদ্ধ সঙ্গে বাচ্চা একটা ছেলেকে নিয়ে দোকানের একধারে হাত পেতে চুপ করে দাঁড়িয়ে। পিসি হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে ডেকে জিলিপির ঠোঙা তার হাতে দিয়ে বলল, "খেয়ে নে।"

হিমাদ্রি তখন ক্ষীণস্বরে বলেছিল, "পিসি ওর হাতেও ময়লা আছে।"

"থাকুক, ও আমার ভাইপো নয়।"

এহেন পিসি প্রতিদিন ভোরে শ্যামলা আর সাত-আটটি বাচ্চা ছেলেমেয়েকে নিয়ে, ট্র্যাকস্যুট পরে সুশোভন পল্লীতে চক্কর দিয়ে ছোটেন। খুব জোরে নয় আবার বেগারদের মতো অত ধীরেও নয়। ট্র্যাকস্যুটটা সমীরণের। গত বছর ইন্ডিয়া টিমের ক্যাম্পে নতুন একটা পাওয়ায় সে পিসিকে বলেছিল, "শাড়ি পরে কি জগ করা যায়! কোনওদিন হোঁচট খেয়ে পড়বে, হাত-পা ভাঙবে, বরং আমার একস্ট্রা একটা রয়েছে,তুমি এটা পরেই ছোটো।"

পিসি-ভাইপোর উচ্চতা এবং ওজন সমান-সমান। বাড়িতে ট্র্যাকস্যুট পরে নাককানমলাদের সামনে ট্রায়াল দিতে পিসি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় আটবার ছুটে ওঠানামা করে বলেছিলেন, "জিনিসটা ভালই মনে হচ্ছে। অনেক ফ্রি লাগছিল। ওদেরও বলব ট্র্যাকস্যুট পরে দৌড়তে।"

ওরা অর্থাৎ বেগাররা একদিন আলোচনায় বসেছিলেন রেখা গুপ্তর প্রস্তাবটা বিবেচনা করতে। বসাক দম্পতি অর্থাৎ বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর সরোজ ও তাঁর স্ত্রী মালবিকা তাঁদের প্রধান অসুবিধার কথা জানিয়েছিলেন এই বলে—ট্র্যাকস্যুট পরলে তাঁদের যা হাইট তাতে আরও বেঁটে মনে হবে। স্বামী পাঁচ-এক, স্ত্রী চার-দশ। উচ্চতার ঘাটতি দু'জনেই পুষিয়ে নিয়েছেন প্রস্থে। ঢোলা জিনিসটার মধ্যে ঢুকে দৌড়লে তাঁদের যে চলমান পিপের মতো দেখাবেই, তাতে কোনওরকম সন্দেহ তাঁরা পোষণ করছেন না।

এহেন অকপট স্বীকারোক্তির পর ট্র্যাকস্যুট পরিধানের জন্য তাঁদের ওপর আর চাপাচাপি কেউ করলেন না। জি. সি. দত্ত অবশ্য বলামাত্র রাজি, তবে একটা শর্তে, "আমাদের স্পিড বাড়াতে হবে।" যে-স্পিডে তিনি সাব-ইন্সপেক্টর থাকাকালীন একবার খোকাগুণ্ডার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধরেছিলেন তিন মাইল দৌড়িয়ে (প্রতি দশদিন অন্তর গল্পটা বলে থাকেন), তিনি সেই স্পিডে ফেরার বাসনাটাই জানিয়ে দিলেন। প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানালেন প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারি।

"আমরা চোরগুণ্ডা ধরার জন্যই কি তা হলে রোজ সকালে দৌড় প্র্যাকটিস করব? ব্লাড সুগার, অম্বল, ডিসপেপসিয়া, এই তিনটেকেই আমি কন্ট্রোলে রাখার জন্য ঘড়ি ধরে মেপে হিসাব করে পা ফেলি, এর একটা ছন্দ আছে, তাল আছে। হুট করে স্পিড বাড়ানোটা উচিত হবে কি না সেটা ভেবে দেখা দরকার।"

এর পর ট্র্যাকস্যুট পরার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ফললাভ হবে না বুঝে আর কথা বাড়ান হয়নি। রেখা গুপ্ত একাই পরেন। আজও তিনি দৌড়চ্ছিলেন। প্রথমে রেল এঞ্জিনের মতো, তারপর সাত-আটটি ক্ষুদ্র বগি, শেষে গার্ডের মতো শ্যামলা। চারজন বেগার উলটো দিক দিয়ে 'বেগিং' করেন। আজও তারা মুখোমুখি হতেই শ্যামলা বলল, "আট"। অর্থাৎ, তাদের আট চক্কর দৌড় সম্পূর্ণ হল।

"ছয়।" গম্ভীর স্বরে জি. সি. দত্ত নিজেদের সংখ্যাটি জানিয়ে দিলেন।

"ছয় নয়, তিন।" ভটচায ভর্ৎসনা করলেন, "মিছে কথা বলে লাভ কি?"

"আজ শনিবার, কার বাড়িতে চা খাওয়া সেটা কি ভুলে গেছেন?" দত্ত খিঁচিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন।

সপ্তাহের পাঁচদিন সকালের চা এবং কিঞ্চিৎ 'টা' পাঁচজনের বাড়িতে পর্যায়ক্রমে ওঁরা খান। শনিবারের পালা রেখা গুপ্তর,
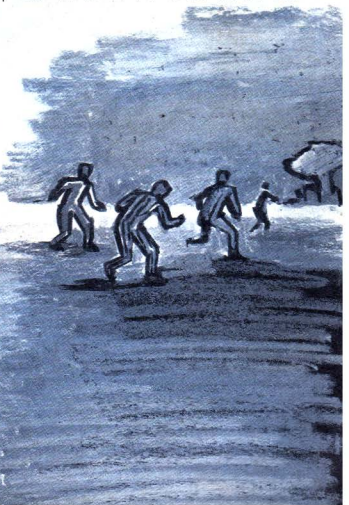
এইদিন ওঁর স্কুলের ছুটি থাকে। সাধারণত তিনি চায়ের সঙ্গে লুচি দেন, সহযোগে আলুছেঁচকি। অথবা লুচির বদলে হালুয়া। দেওয়ার পরিমাণটা নির্দিষ্ট হয়, ক' চক্কর দেওয়া হল তার ওপর। ছয় চক্কর মানে ছ'টি লুচি অথবা বৃহৎ ছ' চামচ হালুয়া।

চার চক্করের পরই চার বেগার পার্কের বেঞ্চে বসে পড়লেন। রেখা গুপ্ত পার্কের মধ্যে তখন বাচ্চাদের ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করাচ্ছেন। সাইকেলে দুটি খবর কাগজওলা তীরবেগে সুশোভনে ঢুকল। একজন অন্যদিকে চলে গেল, অন্যজন ওদের কাছে এসে ঝটপট তিনটি কাগজ হাতে ধরিয়েই সাইকেলে লাফিয়ে উঠল। রেখা গুপ্তর কাগজ বাড়িতে দেওয়া হয়। তার দাদা প্রথমে পড়ার পর অন্যরা হাতে পায়।

তিনজন তিনটি কাগজ খুলে চোখের সামনে ধরলেন। মালবিকা খবরটবরের ধার ধারেন না। তিনি বাচ্চাদের ব্যায়াম করার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"কপিলদেব কলকাতায় এসে কী বলেছে সেটা পড়ে দেখুন।" দত্তমশাই গুরুগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন।

"কী বলেছে ?" ভটচায অবাক চোখে তাকালেন ওর মুখের দিকে।

"আপনার হাতেও তো একটা কাগজ রয়েছে।" দত্ত প্রাক্তন পুলিশি স্বর বের করলেন। ভটচায তাড়াতাড়ি হাতের কাগজটা তন্নতন্ন দেখে বললেন, "নাহ্, আমার কাগজে নেই।"

"আমার কাগজেও নেই।" বসাক যোগ করলেন।

"তা হলে শুনুন—ট্যালেন্ট থাকলেই হয় না, বড় ক্রিকেটার হতে গেলে চাই নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছে আর অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাওয়ার ইচ্ছে।...কেউ যদি সত্যি যোগ্য হয় তা হলে তাকে আটকে রাখা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না। সে ঠিক ফুঁড়ে বেরোবেই।...যে-কোনও খেলাকে ঘিরেই কলকাতার লোকের এত উৎসাহ যে, আমার দারুণ লাগে। একই সঙ্গে এটা ভেবেও খারাপ লাগে যে, কেন এই শহর একটাও টেস্ট ক্রিকেটার তৈরি করতে পারছে না।" দত্ত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, "ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ? কপিলদেব কী বলতে চায় সেটা হৃদয়ঙ্গম হল ?"

"একটু-একটু।" বসাক আমতা-আমতা করে বললেন।

"আমি পুরোটাই হৃদয়ঙ্গম করেছি।" ভটচাযের মুখে হাসি ছড়ানো।

"তা হলে বলুন।" দত্ত দাবি জানালেন।

"বাংলায় কিস্‌সু ক্রিকেট খেলা হয় না। এখানে সবাই হুজুগে। ট্যালেন্ট হয়তো আছে, কিন্তু সবাই ফুলবাবু, একটুও পরিশ্রম করে না, কারণ ইচ্ছেটাই নেই। শুধু খবরের কাগজে ছবি বেরোলেই এখানে লোকে ভাবে সে বোধ হয় খুব বড় প্লেয়ার।" ভটচায কথাগুলো বলে উদ্বিগ্ন চোখে দত্তর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দত্ত চোখ বন্ধ করে মাথাটা ঈষৎ কাত করে অনুমোদন দিলেন।

"আমাদের নাকু কিন্তু খুব খাটে। ইলেকট্রিক মাঠে সকাল নেই, দুপুর নেই, বিকেল নেই, শুধু বল নিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি।" বসাক ফাঁক পেয়ে তাঁর কথাটা ঢুকিয়ে দিলেন।

"কথা হচ্ছে ক্রিকেট নিয়ে, ফুটবল নিয়ে নয়।" ভটচায ছোট্ট একটা দাবড়ানি দিলেন।

"কথাটা আসলে সব খেলা নিয়েই, শুধু ক্রিকেট নিয়ে নয়। বসাকবাবু ঠিকই বলেছেন, এই শুনুন কপিলদেবের আর-একটা কথা। ওকে জিজ্ঞেস করা হয় পরিশ্রম করার ইচ্ছা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন কী করে ? তাইতে বলছে,—'এখানেই আমার মনে হয় পেশাদারদের সঙ্গে সাধারণ মানসিকতাসম্পন্ন লোকেদের তফাত। পেশাদারকে সবসময় সামনের দিকে চোখ রাখতে

হয়। আরও, আরও, আরও, আরও। আমি এই নীতিতে বরাবর বিশ্বাসী। হাতির খিদে আমার'।"

"ওরে বাপ্স, হাতির!" চমকে উঠলেন ভটচায, "আমার তো দুটো লুচি খেলেই অম্বল। আচ্ছা, হাতিরা ক'টা লুচি খেতে পারে?"

"দুটো।" দত্ত খবরের কাগজে চোখ রেখে বিড়বিড় করে বললেন।

"আচ্ছা দত্তবাবু, আমরা কি সাধারণ মানসিকতাসম্পন্ন লোকেদের দলে পড়ি?" বসাক কাঁচুমাচু মুখ করে জানতে চাইলেন।

"সাধারণ মানসিকতা..." দত্ত চিন্তায় ডুবে গেলেন এবং আধ মিনিট পর ভেসে উঠে জানালেন, "পরিস্থিতি-বিশেষে সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। আমি যখন খোকাকে তাড়া করি কোনও ওয়েপন আমার কাছে ছিল না, কিন্তু ওর কাছে পিস্তল ছিল।" এর পর তোমরা বুঝে নাও গোছের একটা হাসি দত্তর ঠোঁট মুচড়ে দিল।

রেখা গুপ্ত বাচ্চাদের বাড়ি পাঠিয়ে তখন হাজির হলেন ওঁদের সামনে। "চলুন, চলুন। রাতে লেচি করে রেখে দিয়েছি, বেলব আর ভাজব। তবে আজ কিন্তু শুধু আলুভাজা, আমি এগোলাম, বাঙ্গালোর ক্যাম্প থেকে নাকুর আজই ফেরার কথা।"

দ্রুত পায়ে শ্যামলাকে সঙ্গে নিয়ে রেখা গুপ্ত বাড়ির দিকে এগোলেন। ওঁদের বাড়িটা সুশোভনের পেছন দিকে ইলেকট্রিক মাঠের লাগোয়া। মাঠে কয়েকটি ছেলে ফুটবল নিয়ে ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত। বরেন মুখোটির একটা লন্ড্রির দোকান আছে নামে মাত্রই, আসলে গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ফুটবলার তৈরি করার কাজেই বেশি সময় দিয়েছেন। এখন পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও, কি শীত কি বর্ষা প্রতিদিন সকালে মুখোটি একটা হুইস্‌ল গলায় ঝুলিয়ে মাঠে আসেন।

পাঁচ বছর আগে তাঁরই হাতে গড়া সমীরণকে তিনি দর্জিপাড়া একতার সেক্রেটারির কাছে নিয়ে যান। "ছেলেটা ভাল খেলবে, ফুটবল সেন্সটা আছে, খাটিয়েও। সবচেয়ে বড় কথা স্বভাবচরিত্র ভাল। একে কয়েকটা ম্যাচ খেলিয়ে দেখুন।" মুখোটির এই ক'টি কথাই যথেষ্ট ছিল। অবশ্য সমীরণ তার প্রথম ম্যাচেই রেড কার্ড দেখে। সেক্রেটারি তখন বলেছিল, "নিমাই আর দুলালকে এক ঝটকায় টলিয়ে ভেতরে ঢুকে কী শটটা নিল দেখলি? ওকে সব ম্যাচ খেলাব।"

সমীরণ সে-বছর তেরোটা গোল দেয়। ষাট হাজার টাকায়, পরের বছর যুগের যাত্রী তাকে সই করায়। সই করাবার জন্য কথাবার্তা বলেছিল ঘুনু মিত্তির। তার পোশাকি নামটা যে কী, কেউ আর তা জানে না। পঁয়ত্রিশ বছর আগে খেলার দিন ক্লাবের সদস্য-গেটে দাঁড়িয়ে সে কার্ড দেখে লোকেদের ভেতরে যেতে দিত। এর পর সেক্রেটারি নারায়ণ সেন-এর গাড়ির দরজা খুলে দেওয়ার অধিকার অর্জন করে। যাত্রীর কোনও ফুটবলার চোট পেলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন লোক পাওয়া যায় না তখন ঘুনু মিত্তিরই এগিয়ে যেত। এইভাবেই ধাপে ধাপে উন্নতি বা কুরে-কুরে সেঁধিয়ে এখন সে কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং নতুন সেক্রেটারি পতিতপাবন ওরফে পতু ঘোষের প্রায় ডান হাত।

ঘুনু প্রথমেই সমীরণকে জানিয়ে দিয়েছিল, "তোর গোলটা ঠিকই হয়েছিল। তবে বড় ক্লাবের এগেনস্টে ছোট ক্লাব গোল করে সিজনের শুরুতেই দুটো পয়েন্ট নিয়ে নেবে আর বিশ লাখ টাকা দামের টিমের সাপোর্টাররা সেটা দাঁত বের করে দেখবে, তা তো হতে পারে না। সেটা ময়দানের নিয়ম নয়। সারথিকে গোল

দিলেও রেফারি অফসাইড করে দিত। নইলে টেন্ট জ্বলে যাবে। কিছুদিন ময়দানের ঘাস চেন, তখন নিজেই সব বুঝতে পারবি। যাক্ গে, তোকে আমি যাত্রীতে নিয়ে যাব। বড় ক্লাবে খেলার সুযোগ এক বছর ছোট ক্লাবে খেলেই পাওয়াটা যে কত ভাগ্যের ব্যাপার সেটা কি তুই বুঝিস ?" আকাশবাণী ভবনের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের কথা হচ্ছিল। সমীরণ আবেগে আপ্লুত হয়ে শুধু মাথা কাত করে জানিয়েছিল, সে বোঝে।

"কিন্তু একটা কথা।" ঘুনু গলা নামিয়ে চাপা স্বরে বলেছিল, "যা কনট্রাক্ট হবে তার টেন পার্সেন্ট আমার। অ্যাডভান্স পাবি সিক্সটি পার্সেন্ট, ক্যাশ।"

সমীরণ এবারও মাথা কাত করে ঢোক গিলে বলেছিল, "বেশ, তাই হবে। কিন্তু কত দেবে আমায় ?"

"চেষ্টা করব যাতে বেশি পাস, তুই বেশি পেলে তো আমিও বেশি পাব।"

ষাট হাজার টাকার টেন পার্সেন্ট ছ' হাজার ঘুনু কেটে নিয়েছিল ছত্রিশ হাজার টাকার অ্যাডভান্স থেকে। একশো টাকার ২৪০ খানা নোট যখন সে পিসিমার সামনে খাওয়ার টেবলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে প্রণাম করেছিল তখন তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছু করতে বা বলতে পারেননি। শ্যামলা আঁতকে উঠে বলেছিল, "দাদা পুলিশটুলিস আসবে কি ? ব্যাঙ্ক ডাকাতি করিসনি তো ?" হিমাদ্রি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে-করতে মন্তব্য করেছিল, "কমই দিয়েছে। দাদার যা খেলা তাতে এক লাখ ষাট হাজার পাওয়া উচিত।"

নোটগুলো গুছিয়ে দু' হাতে তুলে রেখা গুপ্ত ছুটে গিয়েছিলেন কোণের ছোট ঘরটায়, তাঁর দাদার কাছে। একটু পরে চোখের জল মুছতে-মুছতে ফিরে এসে বলেছিলেন, "খুব অবাক হয়ে গেল, বলল, ফুটবল খেলে এত টাকা পাওয়া যায় জানতাম না তো ! বললাম আরও চৌত্রিশ হাজার পাবে। তুই গিয়ে প্রণাম করে আয়।"

সমীরণ গোঁজ হয়ে বসে থেকেছিল। বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের কোনওরকম সম্পর্ক নেই বললেই চলে। অফিস থেকে এসে ঘরে ঢোকেন, শুধু স্নান আর খাওয়ার সময়ই তাঁকে ঘরের বাইরে দেখা যায়, কারও সঙ্গে কথা বলেন না।

"যা না, খুব খুশিই হবে।"

সমীরণ ঘরে ঢুকে সুনীলবরণকে প্রণাম করতেই হাতের বইটা নামিয়ে তিনি ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসেন। বড় ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, "এত টাকা যখন নিচ্ছ, সেইমতন খেলাটাও দিয়ো নিজেকে অপমান কোরো না।"

বাবার কথাগুলো সমীরণের মাথায় কীভাবে যেন গেঁথে গেছল। খাওয়ার টেবিলের কাছে এসে দেখল, পিসি কিছু নোট আলাদা করে গুনে রাখছেন।

"এগুলো কী জন্য ?" সমীরণ রীতিমত অবাক হয়ে বলে।

"প্রণামীর টাকা। যে-গুরুর কাছে প্রথম শিক্ষা নিয়েছিস, যিনি তোকে হাতে ধরে এগিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ঋণ কোনওদিনই তো শোধ করতে পারবি না। তবু প্রণামী বলে এই ছ' হাজার কাল সকালেই দিয়ে আসবি। খুব কষ্টে আছেন ভাইপোদের সংসারে। দোকানটারও যা হাল হয়েছে।"

"দাদার আরও টেন পার্সেন্ট গেল।" হিমাদ্রি হালকা স্বরে বলতেই হাত তুলে সমীরণ তাকে চুপ করিয়ে দেয়।

"কানু, এটাকে গেল বলিসনি। পিসি কেন গ্রেট লেডি জানিস ? যে-কাজটা সবার আগে করা উচিত সেটাই মনে করিয়ে দিয়ে অপরাধের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। বরেনদার কাছে কাল ভোরেই যাব। কিন্তু পিসি, আমাকে দিয়ে আবার যদি জানলার কাচ পরিষ্কার করাও তা হলে আমার মান-ইজ্জত আর থাকবে না।"

কথাটা গ্রাহ্যে না এনে পিসি ভ্রূ কুঁচকে সমীরণকে একপলক দেখে নিয়ে বলেন, "মান-ইজ্জত বলতে কী বুঝিস ? নিজের বাড়ির জানলা নিজের হাতে পরিষ্কার করলে ইজ্জত খোয়া যায় ? কতবার তোদের বিদ্যাসাগর মশায়ের গল্প শুনিয়েছি না ? আসলে তোর মান-ইজ্জত নির্ভর করবে তো তোর খেলার ওপর। টিম যেদিন হারবে, গোল যেদিন দিতে পারবি না সেদিন তোর ইজ্জত থাকবে কি ?"

সিরিয়াস কথাবার্তায় পরিবেশ ভারী হওয়ার দিকে গড়াচ্ছে দেখে শ্যামলা হালকা করার জন্য বলেছিল, "ওসব মাছচোরেরাই কথা রাখো তো এখন, বলো এতগুলো টাকা নিয়ে তুমি কী করবে ? তবে আমায় জিজ্ঞেস করলে বলব, একটা কালার টিভি আর—"

"আর দাদার জন্য একটা স্কুটার।" হিমাদ্রি থামিয়ে দিয়েছিল বোনকে। থতমত হয়ে শ্যামলা বলে, "তা তো দাদা কিনবেই, তবে একতলা বাড়িতে থাকাটা এত বড় প্লেয়ারের পক্ষে একদমই মানায় না। ছাদে একটা অন্তত ঘর না তুললে দোতলা বাড়ি বলা যাবে না।"

সবাই কথাটা শুনে চুপ হয়ে গেছল। অবশেষে পিসিই বলেন, "ঘরে কে থাকবে ?"

"তুমি।" সমীরণ বলেছিল।

"না। ওপরে আমায় তুলে দিয়ে নীচে তোমরা ভূতের নাচ নাচবে, এসব মতলব ছাড়ো। যদি ঘর হয় তো থাকবে দাদা, সঙ্গে বাথরুমও থাকবে।"

হাঁফ ছাড়ার নীরবতাটা কাটিয়ে উঠে সমীরণ বলেছিল, "কারেক্ট ডিসিশন। আমার প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করছি। কিন্তু পিসি, তোমার কি কিছু দরকার নেই ?"

"আমার দরকার !" পিসি হতচকিত হলেন এবং তিনজনের পীড়াপীড়িতে অবশেষে বলেন, "একদিন আমার সকালের বন্ধুদের পেটভরে রেঁধে খাওয়াব।"

"তোমার সকালের বন্ধুদের ?" হিমাদ্রি চোখ কপালে তুলে বলেছিল, "তার মানে বেগা-আ-আ-আ— কথাটা সে শেষ করতে পারেনি যেহেতু শ্যামলার এক প্রচণ্ড রামচিমটি তখন অতি তৎপরতায় তার বগলের নীচে কামড় বসিয়েছিল। হিমাদ্রি অবশ্য খুব স্মার্টলি 'আ-আ-আ'-টাকে দম আটকানো কাশিতে রূপান্তরিত করে কাশতে-কাশতে চেয়ার থেকে উঠে বেসিনের দিকে ছুটে গেছল।

"কী হল তোর ? বেগা বলে বিষম খেলি কেন ?" পিসি উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন।

"কানু হয়তো বলতে চেয়েছিল, রান্নাবান্নার মতো কাজে কেন ব্যাগার খাটবে তার থেকে চিনে দোকানের খাবার এনে—তাই তো রে ?" সমীরণ ভাইয়ের দিকে তাকায়। মুখে জল দিতে-দিতে হিমাদ্রি শুধু বলে, "হুঁউ।"

"রান্না করে খাওয়ানোটাকে ব্যাগার খাটা বলছিস ! কী আনন্দ হয় জানিস লোককে খাওয়াতে ? টাকা থাকলে আমি রোজ ধরে এনে লোক খাওয়াতাম।"

রেখা গুপ্ত তাঁর সকালের বন্ধুদের অবশ্যই ভূরিভোজন করিয়েছিলেন। কালার টিভি এবং স্কুটারও কেনা হয়েছিল। দোতলায় সে-বছর আর ঘর তোলা যায়নি। পরের মরসুমেই সারথি সঙ্ঘ একলাখ দশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমীরণকে সই করায়। যুগের যাত্রীর কাছে তখন তার পাওনা ছিল দশ হাজার টাকা। সেটা আর সে পায়নি।

ময়দানের ঘাস এর পর থেকেই সে চিনতে শুরু করে।

॥ ২ ॥

"না, না, আর না, আমার চারখানা খাওয়া হয়ে গেছে।" ভটচায

তাঁর প্লেটের ওপর দুই তালু ছড়িয়ে রেখা গুপ্তর লুচি নামাবার পথ বন্ধ করলেন। "হাতিরা নাকি দুটো খায়, এই দত্তবাবুই বললেন।"

"হ্যাঁ দুটোই খায়...মিস গুপ্ত আমায় আর-একটা, আজ সাত চক্কর টোটাল—"

খুক-খুক করে মালবিকা কেশে উঠলেন। দত্ত কটমটিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিসেস বসাকের গণনায় কি সাত চক্কর হয়নি?"

"সাত মানে! আট হয়ে নয় হচ্ছিল তখনই তো ভটচাযদা বসতে বললেন।" মালবিকা গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলেন।

"তা হলে বোধ হয় গুনতে ভুল করেছি, ইয়ে, আমায় তা হলে আর-একখানা।" দত্তবাবু বলা শেষ করেই জুড়ে দিলেন, "আর মিসেস বসাককেও।"

"নাকুও ঠিক গুণে আটখানা খায়।" রেখা গুপ্ত তাঁর কাজ শেষ করে বসলেন সরোজ বসাকের পাশের চেয়ারে। "বসাকদা আপনি তো ভটচাযদার মতোই চারটের বেশি নিলেন না!"

"আমরা এক পালকের পাখি তো, ওঁর অম্বল আমার মেদ, চারটের বেশি হলেই প্রব্‌লেম দেখা দেবে।"

ভটচায জোরে-জোরে মাথা নাড়ালেন দক্ষিণ ভারতীয় ঢঙে। আর সেই সময়ই বাইরে ফটকের কাছ থেকে কে বলল, "এটা কি সমীরণ গুপ্তর বাড়ি?"

"মলা, দ্যাখ তো কে একজন নাকুকে খুঁজছে।" রেখা গুপ্ত চেয়ার থেকে নিজেকে সামান্য তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। "দলবদলের সময় এসে পড়ল আর সেইসঙ্গে সমীরণ, সমীরণ, নাকু, নাকুদা, ভিখিরিদের মতো ফটকের কাছে ডাকাডাকিও শুরু হয়ে গেল। এর পর চলবে হাত-পা ধরে টানাটানি। কী অদ্ভুত যে এই দলবদলের নিয়মকানুন!"

"বাড়িতে কেউ আছেন?"

ফটকের কাছ থেকে উঁচু গলায় ডাক এল।

"ওরে মলা, দ্যাখ না।"

"রেখা, যত ডাকাডাকি আর টানাটানি, ততই তো দরবৃদ্ধি।" মালবিকা চোখ পিটপিট করলেন আড়চোখে তাকিয়ে।

"মিস গুপ্ত, যদি হাত-পা ধরে টানাটানি করে তা হলে টেলিফোনটা তুলে আমাকে শুধু একটা খবর দেবেন, তারপর দেখব কার হাত কোথায় আর কার পা কোথায় থাকে।" দত্তবাবু দুই মুঠো পাকিয়ে সেই দুটি টেবিলে ঠুকলেন। "অনেকদিন অ্যাকশনে নামিনি'তো, শরীরটা কেমন যেন মাখন-মাখন হয়ে যাচ্ছে।"

শ্যামলা বাইরে থেকে ঘুরে এসে বলল, "দাদাকে খুঁজতে এসেছে যুগের যাত্রী থেকে। বললাম, দাদার তো আজ সকালে হাওড়ায় নামার কথা। বললেন, তিনি জানেন, বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজ, সেখানে মাদ্রাজ মেলে উঠে আজ সকাল সাতটায় হাওড়া স্টেশনে নামবে। ট্রেন অবশ্যই লেট হবে। সেই সময়টা ধরেই স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে বাড়ি পৌঁছতে-পৌঁছতে কম করে দশটা বেজে যাবেই।"

"এখন তো আটটাও বাজেনি।" ভটচায বললেন, "তা হলে উনি এত হিসাব কষেও এখন কেন হাজির হয়েছেন?"

"আমিও তাই বললাম। পিসির সঙ্গে দেখা করতে চায় বলল।"

"যুগের যাত্রীর লোক রেখার সঙ্গে দেখা করতে চায়!" মালবিকা চোখ ছানাবড়া-প্রায় করে রেখা গুপ্তর দিকে তাকালেন, "তুমি আবার কবে থেকে ফুটবল খেলতে শুরু করলে?"

"আরে, ফুটবলারের পিসিমাসিরাও দলবদলের আগে ভি আই পি হয়ে যায়।" সরোজ বসাক স্ত্রীকে বোঝাবার জন্য জুড়ে দিলেন, "আমাদের দেশের ফুটবলাররা খুবই পরিবার-অন্ত প্রাণ তো, তারা

কথা মনের শোনো, শুধু আসল চেনো

দিদি-বউদি, মা-মাসি, ভাই-বোন, এদের মত না নিয়ে দল বদলায় না, সেজন্য প্লেয়ারদের আগে এদেরই ধরাধরি করা হয়।"

সরোজের কথাটা শেষ হওয়ামাত্রই দরজার কাছ থেকে মিহিস্বরে ভেসে এল, "আমি কি ভেতরে আসতে পারি ?" বলার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটি ভেতরে ঢুকে এলেন।

নাতিউচ্চ মাঝারি গড়ন, ঈষৎ কটা চোখ, গায়ের রং এককালে গৌরবর্ণ ছিল, এখন তামাটে, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির মধ্যে, পাতাকাটা কাঁচাপাকা চুল, বিস্কুট রঙের ট্রাউজার্স ও একরঙা নীল বুশ শার্ট, পাম্পশুটা অন্তত চারশো টাকা দামের। "না বলেই প্রায় ঢুকলাম।" হাতজোড় করে সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "আমার নাম ঘুনু মিত্তির, বিখ্যাত লোক নই যে, নামটা শোনা থাকবে। যুগের যাত্রীকে ভালবাসি, ওদের কমিটিতেও আছি, আর প্লেয়ারদের সঙ্গে দুঃখেসুখে একাকার হয়ে গেছি। ওরা মুশকিলে পড়লে আমি সাহায্য করি, আমি অসুবিধায় পড়লে ওরা আমায় দেখে। এইমাত্র শুনলাম, কে যেন বলছিলেন ছেলেরা দলবদলের আগে মা-মাসি, দিদি-বউদিদের মত নেয় ! কথাটা ওয়ান-ফোর্থ সত্যি। বাকিটা খবরের কাগজের বানানো। ওরা কি দুগ্ধপোষ্য শিশু যে, এখনও মা-মাসির কথামতো চলবে ? কেউ-কেউ চলে, কারণ তাদের মা কি বউ টাকাকড়ির ব্যাপারটা তাদের থেকেও ভাল বোঝে। আমি কি বসতে পারি ?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, বসুন।" রেখা গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। ডাইনিং টেবিলে খালি চেয়ার আর নেই। তাই দেখে বেগারদের অন্য চারজনও চেয়ার থেকে উঠে পড়ল।

"আরে আপনারা বসুন বসুন। মা, একটা টুল কি মোড়া থাকলে এনে দাও তো।" ঘুনু মিত্তির বললেন শ্যামলাকে।

প্রায় ছুটে গিয়ে শ্যামলা পিসির ঘর থেকে মোড়া আনল।

"নাকুর বাড়ি তো আমারও বাড়ি। এখানে আমি মেঝেতেও বসতে পারি।" এই বলে ঘুনু অবশ্য মোড়াটাতেই বসলেন। "মনে হচ্ছে কারুরই চা বোধ হয় এখনও খাওয়া হয়নি।"

"না, এইবার চা হবে। আপনাকেও—" রেখা গুপ্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

"চিনি ছাড়া, আমার ব্লাড শুগার একটু বেশির দিকেই।"

"কত এখন ?" ভটচায দমবন্ধ অবস্থায় জানতে চাইলেন।

"দুশো একানব্বই।" ঘুনু খুব সহজ স্বরে বললেন। "ওষুধপত্তর খাই না। ডাক্তার বলেছে স্ট্রেস আর টেনশন থেকে শুধু দূরে থাকবেন, আমি তাই থাকারই চেষ্টা করি।"

রেখা গুপ্ত ইশারায় শ্যামলাকে ডেকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। সমীরণের কাছে তিনি ঘুনু মিত্তির সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন। তাই মনে-মনে হুঁশিয়ার হয়েও কিঞ্চিৎ সিঁটিয়ে রইলেন।

"যুগের যাত্রীতে কেউ কি টেনশন ছাড়া থাকতে পারে ? শুনেছি ক্লাবের কুকুরগুলো পর্যন্ত নাকি ক্লাবের খেলা থাকলে টেনশন সইতে না পেরে বাবুঘাটে চলে যায় !" ভটচায কিন্তু-কিন্তু করে বলে ফেললেন।

"কার কাছে শুনেছেন ?"

"আমার শ্যালকের ছেলে যাত্রীর মেম্বার, সে বলেছে।"

"বাজে কথা, একদমই বাজে কথা। টেনশন একটু হয় ছোট ক্লাবের সঙ্গে খেলা থাকলে। তা সেজন্য তো আমি আছি। ওদের গোলকিপার আর একটা স্টপার কি একটা ব্যাককে ম্যানেজ করে ফেলি, সেটা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়।"

"নাকুকে কিন্তু পারেননি। লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সে তিন বছর যাত্রীর এগেনস্টে খেলেছে, রোভার্স, ডুরান্ড, ফেডারেশন লিগ, শিল্ড সব মিলিয়ে সাতটা গোল দিয়েছে, তিনটে ডিসঅ্যালাউড হয়েছে। গত দশ বছরে কে পেরেছে···সোজা কথা, দশবার যাত্রীর জালে বল !" ভটচায উত্তেজনা দমন করতে-করতে মুখ লাল করে ফেললেন।

"কিন্তু আমাদের নাকুকে ম্যানেজ করতে পারেননি।"

"জীবনে আমার এই একটাই ফেলিওর। দশ হাজার টাকা ক্লাব ওকে দেয়নি, সেই রাগটা দ্বিগুণ বিক্রমে ওকে খেলিয়ে দেয় যাত্রীর এগেনস্টে। তবে এবার তো একেবারেই নতুন কমিটি, নাকুকে টাকা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ওর দশ হাজার পাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দেব।"

পাঁচ কাপ চা-এর ট্রে নিয়ে শ্যামলা প্রথমেই ঘুনুর সামনে ধরে বলল, "ডান দিকে কর্নার ফ্ল্যাগের কাছেরটা চিনি ছাড়া।"

ঘুনু হাসিমুখে কাপটা তুলে নিয়ে বললেন, "ফুটবলারের বাড়ি তো, কথাবার্তাও সেরকম ! আপনার বাড়িতে আজই প্রথম এলাম। বেশ বাড়িটা করেছেন।" রেখা গুপ্তর উদ্দেশে শেষের কথাগুলো বলে, ঘুনু ঘরটায় চোখ বুলিয়ে চুমুক দিলেন।

"বাড়ি আমার নয়, দাদার।"

"ওই হল। জায়গাটা ভাল, বেশ নিরিবিলি, খোলামেলা। দোতলায় ক'খানা ঘর ?"

"একখানা।"

"কেন ! আরও দু'খানা করতে পারেন, জায়গা তো রয়েছে ! ক'তলার ভিত, তিনতলার নিশ্চয়।"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আরও দুটো ঘর তুলে ফেলুন।"

"সেজন্য টাকা লাগে।" রেখা গুপ্ত সন্তর্পণে কথাটা বলে ভাবতে শুরু করলেন, লোকটা শেষপর্যন্ত কোথায় আলোচনাটাকে নিয়ে যাবে।

"টাকার জন্য আপনার ভাবনা ! ওসব নিয়ে কিছু ভাববেন না, আমি করে দেব।"

"আপনি করে দেবেন মানে !" রেখা গুপ্তর আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা হল। "আপনি কেন করে দেবেন ?"

"কত লাগবে দুটো ঘর করতে ? হাজার তিরিশ ? সে-ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যাত্রীতে নতুন যে-কমিটি এবার এসেছে, টাকার ব্যাপারে কোনওরকম কেপ্পনি তারা করবে না। দু' লাখ দেব বললে দু' লাখই দেবে, দেড় লাখ অ্যাডভান্স। চাইলে গুঁড়োও দেবে।"

"গুঁড়ো কী জিনিস ?" জি·সি·দত্ত কৌতূহলী হলেন।

"সব টাকা তো আর কাগজেকলমে থাকে না, পঁচিশ-তিরিশ হাজার এধারসেধার করে দেওয়া হয়। ওটা হিসাব ছাড়াই, লিখিত চুক্তির বাইরে। ওটাকেই গুঁড়ো বলি।"

"ধরুন, একটা প্লেয়ার অ্যাডভান্স নিল, গুঁড়োও নিল, তারপর অন্য ক্লাবে সই করে বসল—।"

সরোজ বসাকের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুনু কথাটা ছোঁ মেরে তুলে নিল। "ঠিক এই ব্যাপারই তো গত বছর দুলাল চক্রবর্তী করল। সওয়া লাখ অ্যাডভান্স আর কুড়ি হাজার গুঁড়ো নিয়ে বলল যাত্রী ছাড়া আর কোনও ক্লাবে মরে গেলেও খেলবে না। ব্লেড দিয়ে হাতে আঁচড় কেটে রক্ত বের করে বলল, "দেখুন, এর প্রত্যেক কণিকায় যুগের যাত্রীর নাম লেখা রয়েছে।"

"অ্যাঁ ! রক্তে নাম লেখা ?" মালবিকা চমৎকৃত হয়ে বললেন, "তাও কখনও হয় নাকি !"

"হয়। কলকাতার ফুটবলাররা ক্লাবের প্রতি এতই অনুগত, ক্লাবের ভালমন্দ মানমর্যাদা নিয়ে এতই ভাবিত যে, ওদের রক্তে ক্লাব মিশে যায়, ওদের নিশ্বাসেও ক্লাবের নাম বেরিয়ে আসে।"

"কী জানি বাবা, আমি তো সায়েন্স পড়েছি, বায়োলজিতে বি·এসসি, এমন কথা তো কখনও চোখে পড়েনি।" মালবিকা মিনমিন করে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললেন।

"আপনার চোখ নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু আমাদের ফুটবলারদের শরীরে বিশেষ এক ধরনের রক্ত বয়, সেটা ভাল চোখে দেখা যায় না।" ঘুনু মিত্তির এমনভাবে হাসলেন যার সাত-আটরকম অর্থ

হয়। "এই বছর যে প্লেয়ারের রক্তে যুগের যাত্রীর নাম, পরের বছর তারই রক্তে পাবেন সারথি সঙ্ঘের নাম, তার পরের বছর হয়তো লেখা থাকবে জুপিটারের নাম।"

"খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার তো!" জি·সি·দত্তর ঘাবড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হল। "এদের আসল রক্ত, মানে বাপ-মা'র কাছ থেকে পাওয়া রক্তটা তো দেখছি আর নেইই। এদের রক্ত যদি ক্লাব-রক্ত হয় তা হলে মানুষের শরীরে দিলে তারা তো মারা যাবে!"

"যেতে পারে। ফুটবলার জানলে ব্লাড ব্যাঙ্ক হয়তো ভবিষ্যতে এদের রক্ত নেবে না। অবশ্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এরা কখনও ব্লাড ডোনেট করে না।" ঘুনু মিত্তির সহজ স্বরে কথাটা বলেই পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরলেন। "হ্যাঁ, শুঁড়োর কথা হচ্ছিল। দুলাল অ্যাডভান্স আর শুঁড়ো নিয়ে সই করার দু'দিন আগে সারথি-র·বটা বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে ফোন করে আমায় বলল, বটার ছেলেরা ওকে রাস্তা থেকে ধরে, পিস্তল দেখিয়েই অবশ্য, গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে।"

"আপনারা পুলিশের হেল্প নিলেন তো?" ভটচায বলতে বলতে আড়চোখে জি·সি·দত্তর দিকে তাকালেন।

"মাথা খারাপ! পুলিশের কাছে গিয়ে কী হবে? দুলাল তো নিজেই ট্যাক্সি করে বটার ডেরায় গিয়ে উঠেছে। খবর আমি দশ মিনিটের মধ্যেই পেয়ে গেছলাম। আমাদের থেকে পঁচিশ হাজার বেশি দেবে বলাতেই দুলাল টোপ খেয়ে নিল।"

"কিন্তু রক্তে যে যাত্রীর নাম লেখা!" মালবিকা আঁতকে উঠে বললেন। ঘুনু তাতে কান না দিয়ে বলে চললেন, "আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, ওরা কত বেশি দেবে বলেছে? বলল, পঁচিশ হাজার। আমি বললাম, আরও তিরিশ হাজার দেব, চলে আয়। বলল, যাব কী করে, দরজার বাইরে, রাস্তায় ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে। তখন ফোন রেখে আমি দৌড়লাম দুলালের বাড়ি। ওর বউ মধুছন্দাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার স্বামী তিরিশ হাজার টাকা হারাবে যদি সারথিতে সই করে। তুমি ওকে সারথির ডেরা থেকে এখুনিই উদ্ধার করে আনো।"

"তারপর মধুছন্দা উদ্ধার করে আনল?" ভটচায চেয়ারের কিনারে টানটান হয়ে বসলেন। ঘরের সবাই উদগ্রীব।

"মধুছন্দা তখন আট মাসের ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আমায় বলল, চলুন তো, কোথায় ও রয়েছে সেখানে আমায় নিয়ে চলুন। তিরিশ হাজার টাকা ফ্যালনা নাকি! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দেওয়া! পা দিয়ে ফুটবল খেলে বলে কি লক্ষ্মীকেও খেলবে?" ঘুনু অবিকল মধুছন্দার কণ্ঠস্বরে কথাগুলো বললেন।

"আপনি ওকে নিয়ে গেলেন তো?" উৎকণ্ঠিত মালবিকা জানতে চাইলেন।

"অবশ্যই। নিয়ে যাওয়ার জন্যই তো গেছি। ট্যাক্সি করে বটা বিশ্বাসের বেহালার ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে ছেলে-কোলে মধুছন্দাকে নামিয়ে দিয়ে বললাম, তিনতলায় ডান দিকে, আমি ট্যাক্সি নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছি, দুলালকে একেবারে সঙ্গে করে আনা চাই। মনে রেখো, তা না হলে তিরিশ হাজার হারাবে।" ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়েও থমকে গেল মধুছন্দা, বলল, "হারাব আমি? তিরিশটা পঁয়ত্রিশ করুন।"

"কী মেয়ে ভাবুন তো! দরাদরি শুরু করল কিনা এই সময়ে, ট্যাক্সি থেকে এক পা রাস্তায় রেখে।"

"আপনি কী বললেন, পঁয়ত্রিশই দেবেন?" জি· সি· দত্ত যে মনে-মনে হিমশিম হয়ে পড়েছেন সেটা তাঁর ঢোক-গেলা থেকে বোঝা গেল।

"তা ছাড়া তখন আর উপায় কী। বললাম, পঁয়ত্রিশই দেব যদি দুলালকে এখনিই বের করে আনতে পারো।"

"কিন্তু বাইরে যে ছেলেরা পাহারা দিচ্ছে?" সরোজ মনে করিয়ে দিলেন।

"কোথায় ছেলেরা!" ঘুনু মিত্তির পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করলেন। "ছেলেফেলে পাহারা দিচ্ছে, ওসব দুলালের বাজে কথা। যাই হোক, আমি তো ট্যাক্সিতে বসে রইলাম। দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা কেটে গেল। বাড়ি থেকে ওরা কেউ আর বেরোয় না! ভাবলাম হলটা কী! মধুছন্দাকেও আটকে রাখল নাকি?" ডিবে থেকে একটিপ নস্যি বের করে ঘুনু নাকের কাছে এনে থমকে গেলেন। "তারপর দেখি ছেলেকে কাঁখে নিয়ে মধুছন্দা বেরিয়ে আসছে, একমুখ হাসি, সঙ্গে দুলালও।" নস্যিটা ঘুনু নাকে গুঁজে হাত বাড়ালেন।

"সাকসেসফুল! অ্যাঁ, মধুছন্দা তা হলে পারল!" ভটচায প্রায় হাততালি দিয়ে ফেলেছিলেন যদি না তখন মালবিকা 'হ্যাঁচ্চো' করে উঠতেন।

"ওহ্‌, আই অ্যাম সরি।" ঘুনু কাঁচুমাচু হলেন।

"নস্যি একটা খুব বাজে নেশা।" এতক্ষণে রেখা গুপ্ত মুখ খুললেন। ঘুনু মিত্তিরকে এই প্রথম কোণঠাসার মতো দেখাল। শুধু নস্যির গুঁড়ো ছড়িয়ে একজন মহিলাকে হাঁচিয়ে দেওয়ার জন্যই নয়, রেখা গুপ্তর বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হওয়াটাই তাকে কিছুটা ঘাবড়ে দিল। আসলে তিনি এসেছেন তো নাকুর পিসিকে তুষ্ট করতে। ঘুনু খবর নিয়ে জেনেছেন, সমীরণ গুপ্তকে তুলতে হলে জালটা ফেলতে হবে তার পিসির ওপর। পিসি হ্যাঁ বললে ভাইপো কখনও না বলবে না।

"নস্যি আমি এখনিই ছেড়ে দেব। ঠিকই বলেছেন, খুব বাজে নেশা।" ঘুনু ডিবেটা বাড়িয়ে দিল শ্যামলার দিকে, "মা, তুমি এটা এখুনি বাইরে ফেলে দাও তো।"

সারা ঘরে থতমত অবস্থা। চারজন বেগার সমস্বরে "না না না" বলে উঠলেন। শ্যামলা নিজের হাত টেনে নিল। রেখা গুপ্ত রীতিমত অপ্রস্তুত।

"না কেন? আমি এখনই···ওঁর সম্মান, ওঁর কথা, ওঁর নির্দেশ আমি এখনই রক্ষা করব।" ঘুনু উত্তেজিত হয়ে মোড়া থেকে উঠে জানলার কাছে গেলেন। ডিবেটা কপালে ঠেকিয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে বলে উঠলেন, "হতভাগা নস্যি, দূর হ। জীবনে আর তোকে নাকে ঢোকাব না।"

"আমি তো আর ফেলে দিতে বলিনি।" রেখা গুপ্তর গলায় অনুশোচনার মতো ক্ষীণ সুর। ঘুনুর কানে সেটা ধরা পড়ল। একটা নস্যির ডিবে, ক'টাই বা টাকা! কিন্তু চার ভাগের তিন ভাগ কাজ তো এগিয়ে রইল।

"হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম?" ঘুনু যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠলেন এমনভাবে তাকালেন।

"মধুছন্দা বেরিয়ে আসছে বটা বিশ্বাসের ফ্ল্যাট থেকে, সঙ্গে দুলাল আর কোলে বাচ্চা।" ভটচায সঙ্গে-সঙ্গে সূত্র ধরিয়ে দিলেন।

"হ্যাঁ, ওরা বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠল। ট্যাক্সি ওদের বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। মধুছন্দা তখন খুশিতে ডগমগ হয়ে কি বলল জানেন?" ঘুনু চোখ বিস্ফারিত করে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"বটা বিশ্বাসের কবজা থেকে দুলালকে বের করে এনেছি।" সরোজ বললেন।

"সারথির টাকার ফাঁস খুলে দুলালকে বাঁচিয়ে দিলাম।" জি·সি·দত্তর অনুমান।

"পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বেশি দেবেন বলেছেন, মনে থাকে যেন।" মালবিকা নিশ্চিত স্বরে আন্দাজ করলেন।

ভটচায মাথা নেড়ে জানালেন, তিনি কিছু বলতে চান না।

"মধুছন্দার গলায় একটা সোনার হার ঝুলছে যেটা আগে দেখিনি। সেইটা হাতে করে তুলে আমায় বলল, 'বটাদা এত ভাল,

এত সুন্দর মানুষ, দেখুন হারটা, প্রায় দু' ভরি তো হবেই। জানেন, বউদিকে উনি বললেন, তোমার বোন আজ প্রথমবার এসেছে, ওকে একটা উপহার তো দেবে। তারপর নিজেই বউদির গলা থেকে হারটা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, সুন্দর মেয়ের গলাতেই এই হার মানায়। উহ, বটাদা যে কী ভাল! না না, দুলাল সারথিতেই থাকবে, বাড়তি পঁয়ত্রিশ হাজারে আমাদের দরকার নেই। বুঝলেন এবার?" ঘনু সবার মুখের দিকে না তাকিয়ে এবার জানলার বাইরে দৃষ্টি পাঠাল।

খুক-খুক করে প্রথমে হেসে উঠল শ্যামলা। তারপর ঘনু বাদে অন্যরা।

"কিন্তু দুলাল যে অ্যাডভান্স আর গুঁড়ো নিয়েছিল, তার কী হল?" জি. সি. দত্ত মনে করিয়ে দিলেন।

"ট্যাক্সি থেকে নেমে মধুছন্দা বাচ্চা কোলে বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার পর দুলাল আমার হাত ধরে বলল, ঘনুদা পারিবারিক অশান্তির মধ্যে আর যাব না। অ্যাডভান্সের টাকা আমি ফিরিয়ে দেব, তবে গুঁড়োটা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু ভেবো না যে, মেরে দেব। সামনের বছর যাত্রীতেই আবার ফিরে আসব, তখন অ্যাডজাস্ট করে নিয়ো।"

"অ্যাঁ, সারথিতে সইসাবুদ করার আগেই বলে দিল পরের বছর দল পালটাবে! এ কী রে বাবা!" সরোজকে হতভম্ব দেখাচ্ছে।

"কলকাতায় হাতে গোনা যে ক'জন ফুটবল খেলতে পারে, দুলাল তাদের একজন। গত এগারো বছরে সাতবার সারথি আর যাত্রী করেছে। বয়স হয়ে গেছে, সত্তর মিনিটের ম্যাচ আগের মতো আর খেলতে পারে না। না পারলেও এক্সপিরিয়েন্সের তো দাম আছে। সেটাও অনেকখানি কাজ দেয়। বহুবার ইন্ডিয়া টিমে খেলেছে, নাম আছে, সাপোর্টাররাও নামী প্লেয়ার চায়।" ঘনু মিত্তির এর বেশি আর কিছু বললেন না।

"তা হলে এ-বছর দুলাল চক্রবর্তী যাত্রীতে আসছে।" মালবিকা জানতে চাইলেন না, ঘোষণা করলেন। ঘনু স্মিত হেসে মাথা কাত করলেন।

"তা আপনি এই সাত সকালে নাকুর খোঁজে এখানে এসেছেন, কী ব্যাপার?" রেখা গুপ্ত গম্ভীর গলায় সোজা প্রশ্ন রাখলেন।

"বুঝতেই তো পারছেন। যাত্রীতে নাকু এই বছর খেলবে এই প্রার্থনা নিয়েই আপনার কাছে আসা।" ঘনু প্রার্থনা বোঝাতে হাতজোড় করলেন।

"ইয়ে," জি সি দত্ত হাতঘড়ি দেখে খবরের কাগজ হাতে উঠে দাঁড়ালেন। "নাতিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসার টাইম হল।"

বাকি তিনজনও উঠলেন। টাকাকড়ি, দলবদল সংক্রান্ত আলোচনায় বাইরের লোকেদের থাকা উচিত নয়। অবশ্য ওঁরা জানেন, যা কিছু কথাবার্তা হবে সবই কাল সকালে জেনে যাবেন।

ভেতরের ঘরে ফোন বেজে উঠল। শ্যামলা ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল।

"কে, মলা?"

"দাদা! কোত্থেকে ফোন করছিস?"

"হাওড়া স্টেশন থেকে, ট্রেন বেশি লেট করেনি। পিসি কি করছে?"

"ঘনু মিত্তির নামে একটা লোক এসেছে তোমায় খুঁজতে, ডাইনিংয়ে বসে আছে।...."

"কী সব্বোনাশ, বাড়িতে এসে গেছে! বাঙ্গালোরেও এসেছিল যাত্রীর ক'জন, মহাদেব সামুই....কার সঙ্গে কথা বলছে?"

"পিসির সঙ্গে এবার কথা শুরু করবে। বেগাররা এতক্ষণ ছিল তাই..."

"শিগ্গিরি পিসিকে ডাক আমি কথা বলব, কায়দা করে ডাকিস ঘনুদা যেন বুঝতে না পারে।"

শ্যামলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "পিসি ফোন, তোমার এক ছাত্রীর মা কথা বলবেন।"

রেখা গুপ্ত তাড়াতাড়ি এসে ফোন ধরলেন, "হ্যালো, আপনি..."

"পিসি আমি নাকু, লোকটা কেন এসেছে?"

"বোধ হয় তোকে ওদের ক্লাবে খেলতে বলবে।"

"তুমি কিচ্ছু কমিট করবে না, বলবে যা বলার নাকুকেই বলুন।"

"তাই বলব। তোর ভাত তা হলে রাখব তো?"

"না, রাখার দরকার নেই। এখন আমি বাড়িমুখোই হব না। দুপুরে কোথাও খেয়ে নেব, রাতে ফিরব। এখন একবার দুলালদার মানে দুলাল চক্রবর্তীর অফিসে যাব। ঘনুদা আশপাশে কোথাও নির্ঘাত ঘাপটি মেরে থাকবে। সন্ধে পর্যন্ত আমি বাড়ির দিক মাড়াব না।"

"তা হলে ওকে এখন কী বলব?"

"বললাম তো, নাকুর সঙ্গে কথা বলবেন, নাকুর ফুটবলের ব্যাপারে আমি নাক গলাই না, ব্যস। এখন রাখলাম।"

রেখা গুপ্ত চিন্তিত মুখে রিসিভার রাখলেন। সেই মুখ নিয়েই এসে বসলেন ঘনু মিত্তিরের সামনে।

"কোনও দুঃসংবাদ?"

"হ্যাঁ। আমার এক ছাত্রীকে কারা যেন কিডন্যাপ করার চেষ্টা করছে; ওর মা ভয় পেয়ে মেয়েকে আমার কাছে কিছুদিন রাখতে চাইছে।" রেখা গুপ্ত খুবই অস্বস্তিভরে বললেন। মিথ্যা কথা অম্লানবদনে তিনি বলতে পারেন না।

"কী ভয়ঙ্কর কথা! পুলিশে খবর দিয়েছে? ছাত্রীর বয়স কত? নিশ্চয় খুব বড়লোক।" উত্তেজিত ঘনু মোড়া থেকে নিজেকে বিঘতখানেক তুলে আবার নামিয়ে রাখলেন।

"দিয়েছে। কিন্তু পুলিশ কী করতে পারে? তারা বলেছে মেয়েকে এখন বাড়ি থেকে বের করবেন না। আট বছর বয়স, সারাদিন বাড়িতে বন্দি থেকে বেচারার কী কষ্ট হচ্ছে ভাবুন তো? ওকে বরং আমার এখানেই নিয়ে আসি।"

"কিন্তু এখান থেকেও তো কিডন্যাপ হতে পারে।" ঘনু বিপদ সম্পর্কে হুঁশ করিয়ে দিলেন।

"আমার এখান থেকে!" রেখা গুপ্ত যেন স্তম্ভিত হলেন ঘনু মিত্তিরের অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে। "আমি রয়েছি, মলা রয়েছে, এই ওঁরা এতক্ষণ যাঁরা এখানে ছিলেন, পেছনের নেতাজিনগর আর শহিদ কলোনির লোকেরা—কিডন্যাপওলাদের সাহস হবে? বরং ওদের ধরে আমিই কিডন্যাপ করে রেখে দেব।"

"কিন্তু তাদের পাবেন কী করে? তারা তো মোটরে করে আসবে, মেয়েটার মুখ বেঁধে গাড়িতে তুলেই বোঁওও করে... দেখেন না টিভি সিরিয়ালে কীভাবে বাচ্চাদের ধরে?"

"দেখেছি। ওইভাবে ধরতে আসুক না। তা হলে আমিও এইভাবে..." রেখা গুপ্ত হঠাৎ ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ঘনু মিত্তিরের বুশ শার্টের কলার ধরে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঘনুও উঠলেন। "কিডন্যাপ করতে আসা?..... অ্যাঁ কিডন্যাপ? দেখাচ্ছি মজা।" কলার ধরে পাকা জাম পাড়ার মতো ঘনুকে ঝাঁকি দিয়ে আবার বললেন, "কিডন্যাপ করে টাকা কামাবে ভেবেছ?"

"আ-আমি কিডন্যাপার নই, উঁহুহু লাগছে, ছাড়ুন-ছাড়ুন।" ঘনুর মুখে রক্ত জমে লাল, চোখ দুটি গর্ত থেকে প্রায় এক মিলিমিটার বেরিয়ে এসেছে।

রেখা গুপ্ত লজ্জিত হয়ে কলার ছেড়ে দিলেন। "একসাইটেড হয়ে....ছি ছি, আমায় মাফ করবেন।" হাত জোড় করলেন তিনি।

"উফ্‌ফ কী গায়ের জোর!" বিড়বিড় করলেন ঘনু মিত্তির। শ্যামলা চুপচাপ ব্যাপারটা দেখছিল। নম্রস্বরে বলল, "বরফ আনব? গলায় ঘষলে ব্যথা আর থাকবে না।"

"না না, বরফটরফ দরকার নেই, আমার কিছু হয়নি।"

"পিসি একটু রাগি, নইলে মানুষটা খুবই নরম।" শ্যামলা ঢোক গিলল কটমট তাকিয়ে থাকা পিসির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে।

"সত্যিই আমার মনটা খারাপ লাগছে। আমার এখন মুন্নির কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে, মলা যাবি আমার সঙ্গে ?" বলেই রেখা গুপ্ত ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। "হ্যাঁ, বলছিলেন কী যেন দরকার আছে আমার সঙ্গে ? তাড়াতাড়ি বলুন।"

ঘুনু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন পিসির এলোমেলো কথা আর আচরণে। নিজেকে ধাতস্থ করতে-করতে বললেন, "নাকু এ-বছর যাত্রীতে আসুক..... ওর পুরনো যা পাওনা সবই পেয়ে যাবে আর সারথিতে যা পাচ্ছে তার থেকে.....আপনি জানেন তো নাকুকে আমিই দর্জিপাড়া থেকে যাত্রীতে এনেছিলাম ষাট হাজার টাকায় ? আজ আবার আমি এসেছি এক লাখ ষাট হাজার দর নিয়ে।"

"তা আমার কাছে কেন ? নাকুর আর ফুটবলের ব্যাপার এটা, আমি এর মধ্যে নাক গলাতে চাই না।" রেখা গুপ্ত মৃদু শান্ত স্বরে বললেন।

"আপনি যে নাকুর কতখানি তা কি আমি জানি না ? রোজগারের এটাই বয়স। টপ ফর্মে থাকার সময়ই যা কিছু কামিয়ে নেওয়া। এবার আমরা খুব ভাল টিম করব, ওর মতো একটা স্ট্রাইকারের যা দাম তা আমরা নিশ্চয়ই দেব। সারথিতে পাচ্ছে তো এক-তিরিশ, আমরা এক-ষাট দেব।" ঘুনু ধীরে মেপে- মেপে কথাগুলো বলার সময় রেখা গুপ্তর মুখভাব লক্ষ করছিলেন। কিন্তু কোনও ভাবান্তর দেখতে না পেয়ে অস্বস্তিতে পড়লেন।

"আপনি এসব কথা নাকুকেই বলবেন। আমি চাকরি করি, দাদা চাকরি করেন, নাকু তো করেই, আমাদের এতেই মোটামুটি চলে যায়।" রেখা গুপ্ত আরও মৃদু স্বরে বললেন।

"না, না, টাকার লোভ আপনাদের দেখাব, এত ধৃষ্টতা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নাকু এখন বড় প্লেয়ার। ইন্ডিয়া ক্যাম্পে রয়েছে, ক্যাপ্টেন হবে বলেই শুনেছি। দেশের ক্যাপ্টেন হওয়া তো বিরাট মর্যাদা। আমাদের ক্লাবও সেই মর্যাদার কিছুটা পাবে যদি নাকু যাত্রীতে আসে।" ঘুনুর অস্বস্তি আরও বাড়ল কারণ রেখা গুপ্তর মুখভাব এখনও ধ্যানী বুদ্ধের মতোই রয়ে গেছে।

শারদীয়ার আন্তরিক অভিনন্দন
গ্রহণ করুন
এই সেই চেনা নাম বলরাম
বলরাম
হোসিয়ারী
কলিকাতা-৬

"পিসি, মুন্নিদের বাড়ি যাবে না ?" শ্যামলা মনে করিয়ে দিল।

"ওহ হ্যাঁ, স্নানটা করেই..." রেখা গুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে আলোচনায় ইতি টেনে দিয়ে বললেন, "যা বলার নাকুকেই বলবেন। আমায় বলে কোনও লাভ নেই।"

ঘুনু মিত্তির চলে যাওয়ার পরই পিসি আর ভাইঝির খুকখুক হাসি হোহো-তে রূপান্তরিত হল।

॥ ৩ ॥

দুলাল চক্রবর্তী চাকরি করে ব্যাঙ্ক অব বেনারসের চৌরঙ্গি শাখায়। হাওড়া স্টেশন থেকে সমীরণ ট্যাক্সিতে যখন ব্যাঙ্কের সামনে নামল তখন বেলা প্রায় এগারোটা। সঙ্গে একটা সুটকেস। কয়েকবার সে এই ব্যাঙ্কে দুলালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, অনেকের সঙ্গেই তার চেনা। এখানে সারথি এবং যাত্রী দুই ক্লাবেরই কিছু সমর্থক কাজ করে। কাউন্টারের বাইরে সমীরণকে দেখেই অল্পবয়সী একজন টেবিলের কাজ ফেলে উঠে এল।

"সমীরণদা, বাঙ্গালোর থেকে কবে ফিরলেন ?"

"এইমাত্র। হাওড়ায় নেমেই সোজা এখানে।" সমীরণ সুটকেসটা দেখাল। "অরুণ, দুলালদা কোথায় ?"

"এই তো মিনিট কুড়ি আগে সারথির নির্মাল্য রায় এসে ওঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সামনেই তো ক্লাবের ইলেকশন, হয়তো ভোট ক্যানভাসিংয়ের জন্য গেছে। আপনাকেও যদি পায় তো কাজে নামিয়ে দেবে।" অরুণ গলা নামিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল।

"পাবে না। এসব কাজ যে আমি করি না সেটা সবাই জানে।"

"কারা জিতবে মনে হয় ? বটা বিশ্বাসরা তো খুব তোড়জোড় করেই নেমেছে।"

"বটাই জিতুক কি নির্মাল্যই জিতুক, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার কাজ যেটা, আমি শুধু সেটাই করি।" সমীরণ হাসল। তার কাজটা যে কী, সেটা আর বলার দরকার হল না।

"দুলালদার কাছে শুনেছি কেরল থেকে বিনু জন-কে আনার জন্য লোক গেছিল। গোয়ার আলবুকার্কের সঙ্গেও নাকি কথাবার্তা চলছে। দু'জনেই তো স্ট্রাইকার। ওরা এলে তো আপনার..." অরুণের মুখে বিপন্নতার মতো একটা ভাব ফুটে উঠল। যেন সমীরণ নয়, সে নিজেই মুশকিলে পড়বে, এই দু'জন সারথিতে এলে।

সমীরণের কপালে একটা ভাঁজ উঠেই মিলিয়ে গেল। কথাটা সে দিনদশেক আগে বাঙ্গালোরেই শুনেছে কেরলের নুর মহম্মদের কাছে। বিনু জনের বাবার কাছে সারথি থেকে একজন গেছল। সে নাকি বলেছে সমীরণের সঙ্গে ক্লাব অফিসিয়ালদের সম্পর্ক ভাল নয়, তাই সারথি ওকে ছেড়ে দেবে যদি বিনু খেলতে রাজি হয়। সেদিন শুনে সমীরণ মনে-মনে হেসে কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল।

তার সঙ্গে অফিসিয়ালদের সম্পর্ক খারাপ, এমন একটা কথা ক্লাবে বছর দুই ধরে চাউর হয়েছে। ক্লাবের দুটো গোষ্ঠীর কোনওটির সঙ্গেই তার মাখামাখি নেই, সে কোনও কর্তার অনুগ্রহে খেলছে না, নিজস্ব কোনও চক্র সে তৈরি করেনি। এই তিনটিই তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। সবার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে যে চলবে কলকাতার তারকা ফুটবল সমাজে সে সন্দেহজনক লোক বলে চিহ্নিত হবে। সমীরণেরও তাই হয়েছে। শত্রু নেই এ কেমন লোক ! সুতরাং এ বিপজ্জনক, একে ভাগাও।

সমীরণকে ভাগাবার চেষ্টা গত বছরই হয়েছিল পঞ্জাব থেকে কার্নাইল সিং আর আলিগড় থেকে ইরানি ছাত্র রফসঞ্জানিকে এনে। দু'জনে মোট চারটে ম্যাচ খেলে কলকাতা থেকে বিদায় নিয়ে আর আসেনি। রটনা হয়েছিল, সমীরণ এবং আর কয়েকজন

প্লেয়ার 'ক্লিক' করে ওই দু'জনকে খেলার সময় বল না দিয়ে বা ধরা যায় না এমন পাস দিয়ে হাজার-হাজার সমর্থকের সামনে অপদস্থ করেছে। আরও কি, বন্ধু খবরের কাগজের রিপোর্টারদের দিয়ে নাকি ওদের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো মন্তব্যও লিখিয়েছিল। এই সবই নাকি সমীরণের মস্তিষ্কপ্রসূত!

সমীরণ জানে, সব রটনাই বটা বিশ্বাসের 'কোটারি' থেকে বেরিয়েছে। রটনাকে সে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। মাথার মধ্যে গেঁথে থাকা একটা কথাকেই শুধু সে সার সত্য বলে মেনে রেখেছে: এত টাকা যখন নিচ্ছ, সেইমতন খেলাটাও দিয়ো। সারথির সাপোর্টাররা স্বচক্ষেই মাঠে দেখেছে সমীরণের খেলায় আন্তরিকতা। সে জানে ওরাই তার রক্ষাকবচ।

কিন্তু এই জানাটাই তো এখনকার কলকাতার ফুটবলে শেষ কথা নয়। বড় ক্লাবে ক্ষমতা দখল আর প্রতিপত্তি বিস্তারের লড়াই অবিরাম চলেছে। কর্তাদের এক-একজনের তাঁবে থাকে দু-চারজন অনভিজ্ঞ, চলনসই, নবাগত ফুটবলার আর ফর্ম ঝরে যাওয়া, বয়স্ক, নামী ফুটবলার। উভয়েই কর্তাদের দলাদলিতে দাবার বোড়ে হয়ে তাঁদের নির্দেশমতো মাঠে খেলে, পয়েন্ট খুইয়ে কোনও কর্তাকে বিপদে ফেলে দেয়, কোনও প্লেয়ারকে খেলার মধ্যেই অপ্রতিভ করিয়ে তাকে বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে, চোট আঘাতের অজুহাতে শক্ত ম্যাচগুলোয় না খেলে ক্লাবকে জব্দ করে। বিনিময়ে পায় অনুগ্রহ, আরও এক বছর ক্লাবে থাকার ছাড়পত্র অর্থাৎ টাকা বাড়িয়ে নতুন চুক্তি। সমীরণ এইসব নীচতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। সে শুধু নিজের খেলাকে আরও ওপরে তোলার চেষ্টা করে গেছে। সব কর্তারাই জানে সমীরণকে দরকার, কিন্তু একটা গোষ্ঠী তলায়-তলায় চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে, বাইরে থেকেও সমমানের কাউকে আনিয়ে সমীরণকে সারথি ছাড়তে বাধ্য করার জন্য।

"দুলালদার কথা থেকে মনে হয়েছে," অরুণ দু'পাশে আড় চোখে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "আপনি সারথিতে থাকুন এটা উনি চান না।"

"কেন?" সমীরণের কপালে আবার ভাঁজ পড়ল।

"মনে হয়, উনি নিজেও বোধ হয় থাকবেন না, আবার যাত্রীতেই ফিরে যাবেন।"

"যদি থাকবেই না আবার তা হলে ভোট ক্যানভাসিংয়ে নেমেছে কেন!"

"যদি বটা বিশ্বাসের গ্রুপকে হারানো যায়, মানে একটা চান্স নিচ্ছে।"

"বটাদাই তো ওকে যাত্রী থেকে এনেছে, এখন তাকে হারানোর জন্য দুলালদা চেষ্টা করবে কেন? আমি এই ক্লাব পলিটিক্সের মাথামুণ্ডু এখনও বুঝতে পারলাম না। কে যে কখন কার দিকে হয়! কখন যে কার স্বার্থে ঘা লাগে। যাক গে, এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, এখন আমি চলি।" সমীরণ সুটকেসটা তুলে নিল।

"শুনছি মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুর ট্যুরে আপনিই ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন হবেন।" সমীরণের হাত থেকে সুটকেসটা প্রায় কেড়ে নিয়েই দরজার দিকে যেতে-যেতে অরুণ বলল।

"এইরকম একটা কথা নোভাচেকের কাছে আমিও শুনেছি। তবে এসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

"নোভাচেক কেমন কোচ?"

"সেটা এখন কী করে বলি! সবে তো কয়েক মাস হল এসেছে। তবে খাটাচ্ছে। স্পিড আর স্ট্যামিনার ওপরই জোরটা বেশি দিচ্ছে, মডার্ন ফুটবলের মূল জিনিস এই দুটো তো একদমই আমাদের নেই। থাক, তোমায় আর যেতে হবে না, আমি ট্যাক্সি ধরে নিচ্ছি।" সমীরণ সুটকেসটা অরুণের হাত থেকে নিয়ে হাত তুলে থামাল একটা খালি ট্যাক্সিকে।

এর পর সে মুশকিলে পড়ল ট্যাক্সিতে বসে, কোথায় যেতে বলবে ট্যাক্সিওলাকে ? ঘনুদা এতক্ষণ বাড়িতে বসে নেই নিশ্চয়, কিন্তু যদি কাছাকাছি কোনও লোক রেখে থাকে ? তাকে বাড়ি ফিরতে দেখলেই ওর কাছে খবর পৌঁছে যাবে ! কিছু বিশ্বাস নেই এই লোকটিকে। ২৫ পারে।

"কোথায় যাবেন ?" ট্যাক্সিওলা গন্তব্য জানতে চাইল।

"নাগেরবাজার।"

কেন যে নামটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল সমীরণ বুঝতে পারল না। দমদম এলাকার মধ্যে জায়গাটা বাড়িরও কাছাকাছি, এটা একটা কারণ, তা ছাড়া নাগেরবাজারে একটা গলিতে থাকে তার স্কুলের বন্ধু বাসব। অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি। বাসবের একটা নাটকের দল আছে। একাধারে সে নাট্যকার, নির্দেশক আর অভিনেতা। এমন একটা লোককে হঠাৎই এখন মনে পড়ে যাওয়া কেন ? বছর চারেক আগে যখন সে প্রথম যুগের যাত্রীতে খেলছে তখন কিছুদিনের জন্য তার অভিনয় করার ইচ্ছা জেগেছিল। তিন-চারবার মহলা দিয়েই ইচ্ছাটা লোপ পায়। স্টেজে নামা আর মাঠে নামার মধ্যেকার তফাতটা সে দ্রুত বুঝেছিল।

সমীরণ হেসে ফেলল। একটু আগেই অরুণ নোভাচেকের নাম করেছিল। বাসবের চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে চেকোস্লোভাকিয়ার এই লোকটির। দু'জনেই তামাটে-ফরসা, পাতলা, লম্বা, ওপরের দুটি দাঁত একটু বেরিয়ে থাকে। মাথার গড়নটা একই রকম। তবে কারেলের গলা মিহি, বাসবের জলদগম্ভীর। তবে ওদের যতটুকু চেহারায় মিল তাইতেই হয়তো বাসবকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে।

কারেল নোভাচেক ডিসিপ্লিন মানেন কঠোরভাবে। বাঙ্গালোর থেকে আসার সময় সমীরণকে বারবার বলেছিলেন, বাইশ তারিখের মধ্যে না ফিরলে এই ক্যাম্প থেকে তোমাকে ছাঁটাই করব। ছ'জনকে তিনি পত্রপাঠ বিদায় করেছেন মাত্র একদিন দেরিতে পৌঁছনোর জন্য। এ, আই, এফ, এফ সেক্রেটারি অনুরোধ করেছিলেন, ছ'জনকে মাফ করে ক্যাম্পে যোগ দিতে দেওয়া হোক। কারেল জানিয়ে দেন, তা হলে পদত্যাগপত্র আপনার দফতরে পৌঁছে দেব।

সমীরণের মাথার মধ্যে 'বাইশ' শব্দটা কানামাছির মতো বোঁ-বোঁ করে উড়ে চলেছে আর ঠোক্কর খাচ্ছে। বাইশ থেকেই হয়তো বাসবকে মনে পড়ল। চব্বিশে তারা কোঝিকোড় যাবে নাগজি টুর্নামেন্টে খেলতে। টিম কেমন সেট করেছে কারেল তা পরখ করে নেবেন বলেই নাগজিতে তাদের নামাচ্ছেন। ওঁর কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমীরণের কাছেও। এ, আই, এফ, এফ দলের ক্যাপ্টেন সে হচ্ছেই, এটা কারেলই তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। বারো বছর আগে যেদিন সে ফাইভ বুলেটস-এর ক্যাপ্টেন হয়ে, পাতিপুকুর থেকে শিল্ড জিতে বাড়ি ফিরেছিল পাড়ার ছেলেদের কাঁধে চড়ে, সেদিন পিসিকে সে বলেছিল, "আমি ইণ্ডিয়ার হয়ে খেলব, তুমি দেখে নিয়ো।" তারপর বলেছিল, "আমি ইণ্ডিয়ার ক্যাপ্টেনও হব।" প্রথম স্বপ্নটা সম্ভব হয়েছে, দ্বিতীয়টা বাকি রয়ে গেছে। বাইশে তাকে কোঝিকোড় পৌঁছতেই হবে। কারেল বড় কড়া মানুষ।

নাগেরবাজার থেকে দমদম স্টেশনের দিকে যেতে ডান দিকে মতিঝিল কমার্স কলেজের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে ভেতরদিকে চলে গেছে। ট্যাক্সিটা ঢুকতে গিয়েই বাধা পেল। একটা লরি ধাক্কা দিয়েছে আরোহী সমেত সাইকেল রিকশাকে। দুই মহিলা আরোহীর রাস্তায় ছিটকে পড়া ছাড়া বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি, তুমুল কাণ্ড ঘটাবার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। বিতণ্ডা চলছে, লরিটাকে পুড়িয়ে ফেলা হবে কি না। আশপাশের বাড়ির বাসিন্দা ও দোকানদাররা চাইছে, বড় রাস্তায় নিয়ে গিয়ে পোড়াও, নইলে আগুনে তাদেরও সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিছু লোক চাইছে, ঘটনা যেখানে, পোড়ানো সেখানে।

ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে সমীরণ সুটকেস হাতে, ভিড় ঠেলে কয়েক মিনিট হেঁটে পৌঁছল বাসবের বাড়ি। একতলায় বড় একটা ঘরে বাসব একাই থাকে, পরিবারের সবাই দোতলায়। এই ঘরেই অভিনয়ের মহলা হয়। চাকরি করে না, একমাত্র ছেলে, যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি আছে তাই বাসব সামান্য মাত্রায় অলস। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার অভ্যাস তৈরি করে ফেলেছে। সমীরণ তাকে এখন বাড়িতে পাবে আশা করেই ডোর-বেলের বোতাম টিপল, বেল বাজার শব্দ হল না। তা হলে বোধ হয় পাওয়ার কাট।

সমীরণ দরজা খটখটাল, একবার, দু'বার।

"কে-এ-এ-এ !" ঘুমজড়ানো গলায় ভেতর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, আর ঠিক সেই সময়…

"সমীরণদা, আমাদের খুব বিপদ।"

কিছু বুঝে ওঠার আগেই সমীরণ দেখল তিনটি যুবক, কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স, গলির মধ্যে ছুটে এল। একজন গোলকিপারের মতো ডাইভ দিয়ে তার পায়ের দুটো গোছ আঁকড়ে ধরল। আর-একজন নিলডাউন হয়ে করজোড়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তৃতীয়জন ফাঁকা জায়গা না পেয়ে ছুটে তার পেছনে এসে জড়িয়ে ধরল।

"একী, একী ! হচ্ছে কী ?" সমীরণ সুটকেস আঁকড়ে ধরে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ছিনতাই করার নানান পদ্ধতির এটাও একটা বলে তার মনে হচ্ছে।

"আমরা ডুবে যাব, বিশ্বাস করুন আমরা গাড্ডায় পড়ে যাব, পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না আর।" নিলডাউন যুবক সকাতরে বলল।

পায়ের গোছ-ধরা যুবক প্রায় ডুকরে উঠে বলল, "আপনি, শুধু আপনিই আজ আমাদের বাঁচাতে পারেন।"

জাপটে-ধরা তৃতীয়জন তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল, "পিন্টু কাঁদিস না, ভগবান আমাদের সহায় তাই সমীরণদাকে ঠিক সময়েই পাঠায়ে দিয়েছেন।"

"হচ্ছে কী ? অ্যাঁ, ছাড়ো, ছাড়ো বলছি।" সমীরণ কনুই দিয়ে কোঁতকা দিল জাপটে-ধরাকে। টান মেরে ডান পা, বাঁ পা তুলে গোছ ছাড়িয়ে নিল।

"রাগ করবেন না সমীরণদা। আজ আমাদের ফুটবল ফাইনাল, আটদিন আগে তুষার মৈত্র রাজি হয় প্রধান অতিথি হতে। বলেছিল তিনটের সময় বাড়িতে গাড়ি নিয়ে যেতে। আমরা সকাল থেকে রিকশায় মাইক নিয়ে অ্যানাউন্স করে ঘুরেছি, হাতে লিখে পোস্টারও মেরেছি অন্তত গোটা কুড়ি। আজ সকাল দশটায় তুষার ফোন করে বলল আসতে পারবে না, তাকে নাকি দুপুরে বর্ধমানে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। সেখানে ওর শ্যালকদের ক্লাবের ফুটবল ফাইনাল, ওকে চিফ গেস্ট হতে হবে তাই আমাদের এখানে আসতে পারবে না।"

তুষার মৈত্র শুধু যাত্রীরই সেরা নয়, ভারতেও একসময় ওর মতো স্টপার দু-তিনজন মাত্র ছিল। ভীষণ জনপ্রিয়। এগারো বছর ধরে ক্লাব বদলায়নি। ওর সঙ্গে সমীরণের বহুবার কলকাতার এবং বাইরের মাঠে লড়াই হয়েছে। ফলাফল প্রায় সমান-সমান। তবে গত দু' বছর ধরে সমীরণ লক্ষ করেছে পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বয়সী তুষার আগের মতো আর ঝটিতি ঘুরতে পারছে না, দ্রুতগতির ফরওয়ার্ডরা ওকে পেছনে ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছে, স্পট জাম্পে ততটা আর শরীর উঠছে না। বহু জুনিয়ার ছেলের কাছে শুনেছে, এখন জার্সি টেনে ধরে বা পেটে ঘুসি মেরে তাদের আটকায়, রেফারিরা ওর বিরুদ্ধে ফাউল দিতে ভয় পায়। যাত্রীর এক কর্তা সুবোধ ধাড়ার গ্রুপের প্লেয়ার বলেই সবাই তুষারকে জানে। সেক্রেটারি পতিতপাবন ওরফে পতু ঘোষের বিরোধী গোষ্ঠী হল ধাড়া গোষ্ঠী।

"তুষারদা আসতে পারবে না তো আমি কী করব ? বর্ধমান থেকে তাকে ধরে আনব ?" সমীরণ ঝাঁঝালো চোখে তিনজনকে তার বিরক্তি জানিয়ে দিল।

"আপনি রাগ করবেন না সমীরণদা, আজ আমাদের উদ্ধার করে দিন।" বলতে-বলতে আবার নিলডাউন।

"আমরা আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।" বলার সঙ্গে ডাইভও। কিন্তু সমীরণ সাইড স্টেপ করে পায়ের গোছ সরিয়ে নিতে পেরেছে।

তৃতীয়জন আর জাপটে না ধরে, বিগ্রহের সামনে ভক্ত যেভাবে জোড় হাতে দাঁড়ায় তেমনভাবে শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ির দরজা খুলে এই সময় বাসব বেরোল, পাজামার দড়ি বাঁধতে-বাঁধতে জড়ানো স্বরে বলল, "কী রে নাকু, ব্যাপার কী ? এই অসময়ে ? আয়।"

বাসব আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে, তখন নিলডাউন লাফিয়ে উঠে "বাসুদা, বাসুদা", বলে তার পিছু নিল।

"মরে যাব আমরা। আপনি বলুন সমীরণদাকে। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য। দুটো টিমের সঙ্গে ইনট্রোডিউস আর প্রাইজ দেওয়া।"

"এ তো আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম রে ! দুটো রাত ট্রেনে কাটিয়েছি বাঙ্গালোর থেকে হাওড়া পর্যন্ত। এখনও বাড়ি যাইনি, খাওয়া হয়নি, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে, ঘুম পাচ্ছে"—সমীরণ হতাশভাবে শুকনো স্বরে তার শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে করুণ চোখে তাকাল বাসবের দিকে।

"দাদা, শুধু পাঁচটা মিনিট।"

"খেলার আগে ইন্ট্রোডাকশন, খেলার পর প্রাইজ দেওয়া—পাঁচ মিনিটে হয় ? চালাকি করার আর লোক পাওনি ?" সমীরণ তেরিয়া গলায় বলল।

"তুই এখনও খাসনি !" বাসব ব্যস্ত হয়ে পড়ল, "এই শোন, এখন তোরা ওকে ছেড়ে দে। আগে চান-খাওয়া করে নিক, তারপর কথা বলিস।"

"বাসুদা আপনি ওকে···"

"আরে বাবা বলব, বলব। যাবে, যাবে। এখন তোরা ভাগ তো।" বাসব নিশ্চিন্ত স্বরে তিনজনকে আশ্বাস দিল।

সমীরণ দাঁতে দাঁত ঘষে বাল্যবন্ধুর দিকে তাকানো ছাড়া আর কী করবে ভেবে পেল না।

"অ্যাই চল, বাসুদা যখন ভার নিয়েছে আর কিছু ভাবতে হবে না। সমীরণদা, আপনি এখন রেস্ট নিন। একটু ঘুমিয়েও নিন। আমরা ঠিক সময়ে এসে তুলে নিয়ে যাব। এই রানা, তুই এখানে থাক।" নিলডাউনের হাবভাব।

গলার স্বর মুহূর্তে বদলে কড়া, রুক্ষ হয়ে উঠল। এই 'থাক'-এর অর্থ বুঝতে সমীরণের অসুবিধা হল না। পাহারায় থাক, যেন না পালায়।

"যাত্রীর প্লেয়ার পেলাম না তো কী হয়েছে, সারথির এত নামী একজনকে তো পেয়েছি ! সমীরণদা আমাদের এলাকায় দু'দলের সাপোর্টারই আছে।" জাপটে ধরার ভাবভঙ্গিতে স্বস্তি এবং সাফল্য দুটোই টানটান।

"পিন্টু, মাইক নিয়ে বেরো।"

ওরা চলে যেতেই সমীরণ বলল, "বাসু, এটা কী হল ?"

"কী আবার হবে ! পাড়ার ছেলে, জলে বাস করে কুমিরদের সঙ্গে······আগে চান কর, মা'কে বলছি, ভাতটাত করে দিতে।"

কথামতোই ওরা এসে সমীরণকে ঘুম থেকে তুলল। হাঁটলে মাঠটা মিনিট পাঁচেক দূরে, ওরা সাইকেল রিকশায় জোর করেই তুলল।

"এত বড় প্লেয়ার হেঁটে যাবে ? তাই কখনও হয়। আমাদের নিন্দে হবে না ?" সেই নিলডাউন একদম নতুন ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বলল এবং উঠে সমীরণের পাশে বসল।

"আমি তো চিফ গেস্ট, আজকের সভাপতি কে ?"

"নীলমণি গড়গড়ি, আপনি চেনেন ? খুব বড় প্লেয়ার ছিলেন একসময়ে।"

"আলাপ হয়নি, নাম শুনেছি, উনি যখন খেলতেন তখন আমি জন্মাইনি।"

দূর থেকে লাউডস্পিকারে ভেসে আসছে "নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় সেভেন-এ-সাইড ফুটবল প্রতিযোগিতা, শহিদ বিপুল কুণ্ডু চ্যালেঞ্জ কাপ ও তিনকড়ি চ্যালেঞ্জ শিল্ডের ফাইনাল খেলা এখনই শুরু হতে যাচ্ছে। আজকের খেলায় সভাপতি অতীত দিনের প্রখ্যাত খেলোয়াড় এবং কোচ নিলু গড়গড়ি····নীলমণি গড়গড়ি, আর প্রধান অতিথি···", একটু থেমে, "সমীরণ গুপ্ত, যার কোনও পরিচয় দেওয়ার দরকার হবে বলে মনে করি না।"

"শুনলেন ?"

"হুঁউ।"

আবার ভেসে এল, "নির্দিষ্ট প্রধান অতিথি তুষার মৈত্রর শাশুড়ি মারা যাওয়ায় তিনি আজ সকালে বর্ধমান চলে গেছেন, এজন্য আমরা দুঃখিত।"

সমীরণ চোখ বড় করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিলডাউনের দিকে তাকাল।

"এসব না বললে পাবলিক ম্যানেজ করা যায় না। ফুটবলারদের চরিত্র যে কী, দাদা আপনি কিছু মনে করবেন না, লোকে একদমই জানে না। আমরা ছোটখাটো ক্লাব করি, এইসব টুর্নামেন্ট থেকেই তো ফুটবলার বেরিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দিকে বড়-বড় ক্লাব, বড়-বড় ফুটবলার কোনও নজর দেয় না। পাড়ার লোক, দোকানদার, এদের কাছে থেকে চাঁদা তুলে টুর্নামেন্ট চালাই। দেনাও হয়। আস্তে-আস্তে শোধ করি। আমাদের দোষ-ত্রুটি অপরাধ আপনি মাফ করে দেবেন সমীরণদা।"

শুনতে-শুনতে সমীরণের মাথা নীচের দিকে নেমে গেল। ফুটবলটা আসলে কারা বাঁচিয়ে রেখেছে তা সে বোঝে। এইরকম ছোট-ছোট ক্লাব বাংলার সর্বত্র রয়েছে। তাদের পাড়াতে এমন একটা ক্লাব থেকেই তো সে খেলা শুরু করেছিল। যদি ক্লাবটা না থাকত, যদি বরেন মুখোটি তাকে ফুটবলের গোড়ার জিনিসগুলো না শেখাতেন, তা হলে আজ সে এত খ্যাতি, এত টাকার মুখ কি দেখত ?

রিকশা মাঠের ধারে পৌঁছে গেছে। তক্তপোশের ওপর মঞ্চটা সাদা কাপড় ঢাকা। একটা টেবিলে একটি কাপ ও একটি শিল্ড আর ছোট দুটি কাপ। পিতলের ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গোছা। জমিতে রাখা একটা টেবিলে পুরস্কার সামগ্রী—শস্তার কিটব্যাগ ও তোয়ালে।

"সমীরণ গুপ্ত এসে গেছেন। খেলা এখনই আরম্ভ হবে। প্রতিযোগী দল দুটিকে অনুরোধ করা হচ্ছে প্রধান অতিথি সমীরণ গুপ্তর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তারা যেন এবার সেন্টার লাইনের কাছে সার দিয়ে দাঁড়ায়। রেফারি, লাইন্সম্যান, আপনারাও দাঁড়াবেন।"

সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে মালা দেওয়া হল। সমীরণের মনে হচ্ছে সে যেন ইলেকট্রিক মাঠে রয়েছে। চারদিকে বাড়ি, অসমান ঘাসহীন জমি, মাঠ ঘিরে বালক, মাঝবয়সী, এমনকী বৃদ্ধরাও ঠেলাঠেলি করছে সাইড লাইনের ধারে। ছাদে, বারান্দায়, গাছেও মানুষ। এদের বেশিরভাগই কলকাতার ময়দানে কখনও খেলা দেখেনি, যদিও এখান থেকে বাসে ময়দান যাওয়া যায়। ছোট মাঠে, আজীবন এই ফুটবল দেখেই খুশি থাকবে কত লোক ! তার নাম শুনেছে, কাগজে ছবি দেখেছে, হয়তো টিভি-তেও খেলা দেখেছে, কিন্তু তাকে সামনাসামনি এই প্রথম দেখছে। এরা কী

ভাবছে তার সম্পর্কে ?

টিম দুটোর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য মাঠের মাঝে যেতে যেতে সমীরণ মাথা ঘুরিয়ে দর্শকদের দিকে তাকাল। হাততালি পড়ছে।

তার জন্যই কি ? সে খেলতে নামছে না, তবু এই উচ্ছ্বসিত হওয়া কেন ? এখানে তো শুধুই সারথির সাপোর্টার নেই, যাত্রীরও আছে। তারাও তো তাকে হাততালি দিল !

এইভাবে আমিও দাঁড়াতাম। সার দিয়ে দাঁড়ানো প্লেয়ারদের সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে সরে যাওয়ার সময় সমীরণের মনে হল, এদের মধ্যে কেউ একজন সে নিজেও। কোনজন সে ? সবাইকেই তার একাকার লাগছে। ওরা এক পা বেরিয়ে এসে সামান্য ঝুঁকে নিজের নাম বলে যাচ্ছে—হোসেনুর আলম, অরূপ মুখার্জি, রামকুমার সাউ, প্রশান্ত বর্মন····সমীরণ গুপ্ত, সমীরণ গুপ্ত, সমীরণ গুপ্ত········।

পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর গ্রুপ ফোটো তোলা হল। মঞ্চে ফিরে আসার সময় সমীরণ দর্শকদের উদ্দেশে নমস্কার জানাতেই আবার হাততালি পড়ল।

নিলু গড়গড়ি মঞ্চেই থেকে গেছেন। দুটো টিমের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য মাঠের মধ্যে যেতে অস্বীকার করে বলেছিলেন, "আমি কে ? ওরা কি আমায় চেনে, না জানে ? আমার নামও বোধ হয় শোনেনি। আমি যখন খেলেছি তখন ওদের বাবারা খেলা দেখতে যেত। এখন এই বাচ্চাদের হিরো তো সমীরণরা। ওরা আমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে মোটেই ধন্য বোধ করবে না। সমীরণ, তুমিই যাও।"

সমীরণ বুঝে গেছল, নিলু গড়গড়ির শরীর যেমন শুকনো কাঠের মতো, কথাগুলোও ঠিক তেমনই হওয়ার একমাত্র কারণ, আশাভঙ্গ। পুরনো যুগের এইরকম ফুটবলার সে কিছু দেখেছে। এখনকার ফুটবলারদের এঁরা সহ্য করতে পারেন না, বিশেষত এত পাবলিসিটি, এত টাকা পাওয়াটাকে, ওঁরা খেলার জন্যই খেলেছেন, সেজন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন, অনেক কিছু হারিয়েছেন, পেয়েছেন শুধু প্রশংসা। এখন আর কি তা মনে রেখেছে ?

সমীরণের অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য কয়েকটি ছেলে মঞ্চের পাশে ভিড় করে এল। সে একে-একে সই করে দিল। তার পাশে বসা নীলমণি গড়গড়ির দিকে ওরা ফিরেও তাকাল না। তার বলতে ইচ্ছা করছিল, ওঁর সইটাও তোমরা নাও। কেন জানি বলতে পারল না।

সমীরণ আর গড়গড়ি পাশাপাশি বসে খেলা দেখল, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। খেলা শেষ হতেই মঞ্চের সামনে ভিড় জমে গেল। পুরস্কার দেওয়া দেখতে তো বটেই, কাছের থেকে সমীরণকে দেখা আর তার ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা লক্ষ করা এবং শোনার জন্যও এই ভিড়।

বারাসাতের তরুণ মিলন সঙ্ঘ দু' গোলে পাইকপাড়ার ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নকে হারিয়েছে। ঘেমে যাওয়া, শ্রান্ত দুটো টিম মঞ্চের সামনে মাটিতে বসে। সভাপতি বক্তৃতা দেওয়ার পর প্রধান অতিথি পুরস্কার হাতে তুলে দেবে আর তারপর দু-চার কথা বলবে। সমীরণ ইতিমধ্যেই নিলডাউনকে বলে দিয়েছে, বক্তৃতা দেওয়ার প্রতিভা তার নেই, সুতরাং দিতে পারবে না।

"আপনারা একটু পিছিয়ে দাঁড়ান। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এখনই শুরু হবে। তার আগে আজকের এই ফাইনালের সভাপতি শ্রীনীলমণি গড়গড়ি, ভাষণ দেবেন।"

গড়গড়ি মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। চশমার কাচ মুছলেন পাঞ্জাবির খোঁটায়। গলা খাঁকারি দিয়ে, মাথাটা নামিয়ে কয়েক সেকেণ্ড ভেবে শুরু করলেন, "উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, পুত্রবৎ সমীরণ গুপ্ত, আজকের দুই দলের খেলোয়াড়রা। এই ফুটবল ফাইনাল অনুষ্ঠানে আমাকে সভাপতিত্ব করার জন্য যখন আমন্ত্রণ করা হয় তখন আমি, যাঁরা আমার কাছে গেছলেন আমন্ত্রণ জানাতে, তাঁদের বলেছিলাম, আমাকে কেন ? আমি তো পুরনো দিনের একটা ফসিল। এখনকার ফুটবল, তার পরিবেশ, হালচাল সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমার চিন্তাভাবনা অন্যরকম, কোনও যোগাযোগই নেই ময়দানের ফুটবলের সঙ্গে। আমি আপনাদের অনুষ্ঠানে গিয়ে যদি কিছু কথা বলি সেটা অন্যরকম শোনাবে। শুনে লোকে হাসবে। ওঁরা বললেন, আপনি যা বলবেন লোকে তা শুনবে, কেউ হাসবে না।

"না, হাসির কথা বলে আপনাদের হাসাবার জন্য আমি এখানে মাইকের সামনে দাঁড়াইনি। আমাদের ফুটবল যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে হাসির বদলে এখন কান্নার সময় এসে গেছে। তার কারণ আমাদের ফুটবল এখন মারা গেছে। তবে আমরা মৃতদেহটাকে না পুড়িয়ে বা কবর না দিয়ে নিজেদের স্বার্থে সেটা মমি করে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু ঠিকমত নিয়ম না জানায় মমিটাও ঠিকমত করা হয়ে উঠছে না, ফলে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

"দুর্গন্ধ কি ? আপনারা জানেন দু' বছর আগে ময়দানেএকটা খেলা গড়াপেটা করে হচ্ছে বুঝতে পেরে দর্শকরা-সাপোর্টাররা হাঙ্গামা বাঁধায়, টেন্টে আগুন ধরাতে যায়, প্লেয়ারদের মারে, ক্লাবকর্তাদের মারে। এটাই হল দুর্গন্ধ। গত বছর কাগজে পড়ি একজন বড় প্লেয়ার দলবদলের আগে ক্লাবে থেকে যাবে বলে অ্যাডভান্স নিয়েছে, নেওয়ার সময় বলেছে এই ক্লাবের তাঁবু তার কাছে মন্দিরের মতো। পড়ে কী ভাল যে লাগল ! এই অবিশ্বাস, দুর্নীতি আর অবক্ষয়ের যুগে, ম্যানেজ আর গড়াপেটার যুগে একজনও অন্তত ফুটবলকে ঈশ্বর উপাসনার মতো ব্যাপার মনে করে। টাকাকড়িটা, তার কাছে বড় কথা নয়। কিন্তু তিনদিন পর কাগজেই দেখলাম সেই ফুটবলার আর-এক বড় ক্লাবের এক কর্তার ফ্ল্যাটে গিয়ে টাকাপয়সা নিয়ে দরাদরি করছে। এটাও হল দুর্গন্ধ।

"ফুটবলকে মেরে ফেলল কারা ? প্রাণবন্ত ছিল আমাদের সময়ের ময়দান, এখন তা শ্মশান। শ্মশানে ঘুরেবেড়াচ্ছে শেয়াল কুকুর, যাদের বলা হয় ক্লাব কর্মকর্তা। এখন বিখ্যাত হওয়ার শর্টকাট রাস্তা হল বড় ক্লাবের অফিসিয়াল হওয়া। ট্যাঁকের জোর থাকলে ভাল, না থাকলেও ক্ষতি নেই। এক পয়সাও ইনভেস্ট না করে লাখ টাকার পাবলিসিটি পাওয়া যায়, অফিসিয়াল হতে পারলে তখন যা বলবেন কাগজে বড়-বড় করে ছাপা হয়ে যাবে, লোকের কাছে পরিচিতি পেয়ে যাবেন। ক্লাব ভাঙিয়ে, কানেকশান বাড়ানো যাবে, তাই দিয়ে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে অনেক কর্তার দু' নম্বরি কারবার চলছে বলেও কাগজে পড়েছি। এইসব প্রচারলোভী, ময়দানে না এলে লোকে যাদের কোনওদিনই চিনত না, এইসব ক্ষমতালোভী, যারা ফুটবলকে ভালবাসে না, সততা, নিষ্ঠা, পরিশ্রমের কোনও দাম যাদের কাছে নেই, তারা মনে করে যেহেতু তাদের টাকা আছে তাই ময়দানটাকে ইচ্ছে করলেই কিনে নিতে পারে, ফুটবলারদের যারা কুকুর-বেড়ালের মতো মনে করে তাদের মুখের সামনে টাকার থলি ধরে তু-তু করে টেন্টে নিয়ে আসে। এই টাকার লোভই আমাদের ফুটবলের সর্বনাশ করেছে।"

নিলু গড়গড়ি হঠাৎ থামলেন। অনর্গল বাক্যস্রোতে শ্রোতারা ভেসে যাচ্ছিল। তাদের পাড়ে ভিড়িয়ে দিতেই বোধ হয় তিনি বক্তৃতা বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে সমীরণের দিকে তাকালেন। শ্রোতারাও তাকাল। সমীরণ বিব্রত বোধ করল।

"সমীরণ আমার ছেলের বয়সী। এখনকার ফুটবলারদের সম্পর্কে কিছু বললে সেটা নিশ্চয় ওর গায়ে লাগবে তাই আগেই মার্জনা চেয়ে রাখছি। কুকুর-বেড়াল পর্যায়ে আজকের ফুটবলারদের নেমে আসার জন্য কিন্তু তারা নিজেরাই দায়ী। এরা বলে ক্লাব গুরুত্ব দিচ্ছে, মর্যাদা দিচ্ছে তাই রয়ে গেলাম বা গুরুত্ব-মর্যাদা দিচ্ছে না বলে ক্লাব ছাড়লাম, কিন্তু লক্ষ-লক্ষ

ফুটবলপ্রেমী মানুষ কাগজে যা এদের সম্পর্কে পড়ছে তাতে তো মনে হয় এক মিলিগ্রাম মর্যাদাবোধও এদের নেই। দলবদলের সময় তো এসে গেছে, আর চার-পাঁচদিন পরই সই করা শুরু হবে। কাগজেই আপনারা পড়ছেন কত নাটক হচ্ছে, ফুটবলাররা ডায়লগ ঝাড়ছে। কিন্তু সইটা করার আগে কতরকম ডিগবাজি যে খাবে, শুধু সেটাই এখন লক্ষ করার।"

ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল সমীরণের কান। মাথাটা একটু নিচু হয়ে গেল, নিলু গড়গড়ির কথার মধ্যে এখনও সে অন্যায্য কোনও বস্তু পায়নি। কিন্তু তার সামনে এসব কথা তোলা কেন? সে নিজে তো কখনও মর্যাদা হারাবার মতো কোনও কাজ করেনি! শুধু পাঁচ বছর আগে যখন সে প্রথম ময়দানে খেলতে নেমেছিল, যখন অনভিজ্ঞ কাঁচা ছিল তখন লাল কার্ড দেখেছিল রেফারিকে অপমান করে। পরের বছর ছোট ক্লাব থেকে বড় ক্লাবে, যা সব তরুণ ফুটবলারই চেষ্টা করে। তার পরের বছর অন্য ক্লাবে গেছে বেশি টাকার অফার পেয়ে। এতে অন্যায়টা কী? এ তো তার উন্নতিরই স্বীকৃতি।

কিন্তু তারপর তো সে আর ক্লাব বদলায়নি, টাকাকড়ি নিয়ে দরাদরি, প্যাঁচ কষে দর বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য কাগজে আজেবাজে কথা বলা, গ্রুপবাজি করা, এসব তো সে কখনও করেনি। ইণ্ডিয়া ক্যাম্প থেকে বাংলার অনেকে ছাঁটাই হয়েছে নোভাচেকের কঠিন মাপকাঠিতে অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়। সে কিন্তু রয়ে গেছে। তাই নয়, দেশের ক্যাপ্টেনও হতে চলেছে। তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর কাজ করা সম্ভবই নয়।

"এরাই সব মর্যাদাবান ব্যক্তি," এই বলে নিলু গড়গড়ি শ্লেষ মাখানো কণ্ঠে একের পর এক উদাহরণ দিয়ে গেলেন, কোন ফুটবলার মাঠের মধ্যে রেফারির গায়ে থুতু দিয়েছে, রেফারির কান ধরেছে, রেফারিকে লাথি, কিল, চড় মেরেছে। কোন ফুটবলার এটাই আমার আমার শেষ বছর, তারপর, রিটায়ার করব বলেও পরের বছর বলল ক্লাবের জনতা চাইছে তাই অবসর নেব না। কোন ফুটবলার খেলার কয়েক ঘন্টা আগে বলেছে বাকি টাকা হাতে না পেলে পায়ে বল ছোঁবে না। গড়গড়ি বলে যাচ্ছেন আর সমীরণ আড়চোখে লক্ষ করল নানান বয়সী শ্রোতা, হাঁড়ি থেকে রসগোল্লা টপাটপ মুখে ফেলে চিবোবার মতো বক্তৃতাটা পরমানন্দে চিবোচ্ছে, চোখেমুখে গড়াচ্ছে মজা পাওয়ার রস।

বক্তৃতা শেষ হল প্রচুর হাততালি পেয়ে, চেয়ারে বসে গড়গড়ি পাশে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, "তুমি হয়তো অন্যদের মতো নও, কিন্তু পাপের ভাগ তোমাকে তো নিতেই হবে।"

জবাবে সমীরণ শুকনো হাসি ছাড়া আর কিছু দিতে পারল না, নিলু গড়গড়ি তা লক্ষ করলেন।

"এমন একটা সময় শিগগিরই আসবে যখন গাল দিতে গাধা-গোরু বলা হবে না, বলা হবে ফুটবলার। এক সময় ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল খেলেছি, এ-কথা ভাবলে এখন আমি কষ্ট পাই। হয়তো তুমিও পাবে।" গড়গড়ি আলতোভাবে সমীরণের বাহু স্পর্শ করলেন, যেন আগাম সমবেদনা জানিয়ে।

সমীরণ কাপ, শিল্ড এবং অন্য প্রাইজগুলো হাতে-হাতে তুলে দিল। দেওয়ার সময় সবার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে হাসলও, কিন্তু কিছুই তার মনে ছাপ রাখছে না। সে কিছুই দেখছে না, কিছুই শুনছে না। তার ভেতরে কোথায় যেন একটা শর্ট সার্কিট ঘটে গিয়ে ইন্দ্রিয় নামক ডায়নামোটাকে বিগড়ে দিয়েছে।

"সমীরণদা, আপনি কিছু বলুন, অন্তত দুটো কথা। ছোট-ছোট ছেলেরা আপনার মুখ থেকে দুটো কথা শোনার জন্য খুব আশা করে আছে।"

ক্লান্ত দৃষ্টিতে সমীরণ সামনের ভিড়ের দিকে তাকাল। যা বলব এরা কি বিশ্বাস করবে? নিলু গড়গড়ির কথাগুলো কানে নেওয়ার পর এদের শোনাবার মতো কোনও কথাই সে খুঁজে পাচ্ছে না।

"সমীরণদা..."

সে মাইকের সামনে উঠে এল। কোনও ভণিতা না করেই শুরু করল, "গড়গড়িদা আমার পিতৃতুল্য, তাঁর বক্তব্য আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। আমাদের দু'জনের খেলার সময়ের মধ্যে অন্তত চল্লিশ বছরের ফারাক, এর মধ্যে ময়দানে প্রচুর পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেটা ভালর না মন্দের দিকে গেছে তা ভবিষ্যৎকালই বিচার করবে। যদি মন্দের দিকে গিয়ে থাকে তা হলে আমাদের জ্যেষ্ঠরা তা যেতে দিলেন কেন? দূরে দাঁড়িয়ে না থেকে তাঁরা বাধা দিতে পারতেন।

"খারাপ লোকেরা এখন ক্লাব চালাতে আসছেন, কিন্তু তাঁরা ক্লাবের কর্তা হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন কী করে? আমাদের ফুটবল সেট-আপটা কারা গড়েছেন? নিশ্চয় এখনকার ফুটবলাররা নয়। আমরা পেশাদারের মতো টাকা নিই, কিন্তু ফাঁকি মারি এই সেট-আপের গলদের সুযোগ নিয়ে। ফুটবলকে মেরে ফেলা ফুটবলারদের একার ক্ষমতায় সম্ভব নয়, কলকাতার ফুটবলে মৃত্যুর বীজাণু বহুকাল আগেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেটা করেছেন আমাদের পূর্বসূরিরা। হ্যাঁ, ফুটবলকে মমি করে রাখতে চাওয়া হচ্ছে কিন্তু সেই কাজটা তো বয়স্ক লোকেরাই করছেন।" সমীরণ লক্ষ করল ভিড়ের নজর মাঝে-মাঝেই নিলু গড়গড়ির দিকে সরে যাচ্ছে। সেই নজরে মজার ঝিলিক নেই।

"টাকার প্রতি লোভ নেই, টাকার প্রয়োজন নেই এমন কেউ যদি এখানে থাকেন, অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসবেন কি?"

সমীরণ কথা বন্ধ করল। ভিড় থেকে একটা গুঞ্জন উঠেই নীরবতা নেমে এল। সে ধীরে মাথাটাকে দু' বার ঘুরিয়ে দু' পাশে তাকাল। অর্থবহ একটা নৈঃশব্দ্য তৈরি হল।

"এখনকার ফুটবলাররা আপনাদের মতো ঘরেরই ছেলে। তাদেরও টাকার প্রয়োজন আছে। আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমার নিবেদন শেষ করলাম।"

সমীরণ চেয়ারে ফিরে না গিয়ে মঞ্চের সিঁড়ির দিকে এগোল। ছোট-ছোট ছেলেদের জন্য কোনও কথাই বলা হল না। এজন্য মনটা ভার লাগছে বটে, আবার কিছুটা হালকাও বোধ করল নিলু গড়গড়ির থমথমে মুখটা দেখে।

"তুই পরশুই আমার রিহার্সালে হাজির হবি।" উচ্ছ্বসিত বাসব ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। "দাঁড়িয়ে শুনছিলাম তোর বক্তৃতা। কী গলা, কী ডেলিভারি, কী ড্রামাটিক পজ, কী পিচ কন্ট্রোল, কী...."

বাসবের দমবন্ধ হয়ে এল।

"তাড়াতাড়ি চল, সুটকেসটা নিয়েই বাড়ি রওনা হব, অনেক কাজ আছে।" সমীরণ জোরে পা চালাল।

"সমীরণদা একটু বসবেন না, একটু মিষ্টি..."

"না, না, মিষ্টি আমি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

"সমীরণদা, আপনার জন্য রিকশা..."

"দরকার নেই, হেঁটেই..."

"সমীরণদা, মালাটা অন্তত নিয়ে যান।"

"ওটা গড়গড়িদাকে দিয়ো।"

॥ ৪ ॥

রাত্রের খাওয়া শেষ করে টেবিলেই ওরা গল্প শুরু করেছিল। প্রায় রাতেই ওরা চারজন কিছুক্ষণ বসে সারাদিনের ভালমন্দ অভিজ্ঞতার বা ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে থাকে। আজ ঘুনু মিত্তির এবং নিলু গড়গড়ির প্রসঙ্গ ওঠে।

"ফুটবলারদের গাধা-গোরু বলল! তার মানে, নাকু তুই..." রেখা গুপ্তর অসহ্য বিস্ময় আর প্রচণ্ড রাগ মিশে গিয়ে তাকে বাক্য শেষ করার সুযোগ দিল না।

সুযোগটা নিল শ্যামলা। "একটা গাধা-গোরু। সমীরণ গুপ্ত, নামের পাশে টাইটেল গা.গ.।" তারপর সমীরণের কানে-কানে
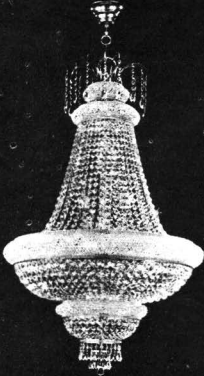
বলল, "যেমন তুই বেগার শব্দটা তৈরি করেছিস।"

"ঠাট্টা নয় মলা, ঠাট্টা নয়।" হিমাদ্রির মুখ সিরিয়াস হয়ে উঠল। "দাদা তো আর বাংলা কাগজগুলো বাঙ্গালোরে পড়ার সুযোগ পায়নি, পেলে বুঝতে পারত স্টার ফুটবলাররা এক-একটা সত্যিই গা.গ.। এই তো সারথির রণেন পাল আর দেবী মাইতিকে যাত্রীর পতু ঘোষ দু' লাখ আশি হাজার দর দিয়েছিল। ওরা বলে বটা বিশ্বাসের সঙ্গে কথা না বলে কিছু করবে না। ওরা এসে বটাকে বলল যাত্রী এই টাকা দেবে, আপনি দর না বাড়ালে যাত্রীতে চলে যাব। বটা তখন দু'জনকে দু' লাখ ষাট করে দেবে বলল। আর দু'জনের গতবারের বকেয়া ছিল পঁচিশ হাজার করে, সেটাও মিটিয়ে দেবে বলল। ওরা মেনে নিয়ে অ্যাডভান্স নিল। তারপর কী করল জানো? দু'জনেই পতু ঘোষের কাছে গিয়ে বলল, আমাদের যদি তিন লাখ করে দেন তা হলে সারথির অ্যাডভান্স ফিরিয়ে দেব।"

"এইসব কথা কাগজে বেরিয়েছে, না কি তুই বানিয়ে-বানিয়ে বলছিস কানু!" রেখা গুপ্ত অবাক হয়ে বললেন।

"পিসি, কাগজগুলো এখনও ঘরে রয়েছে তোমাকে সব দেখাতে পারি, লাইন-বাই-লাইন সত্যি। কিন্তু তোমাকে দেখাব না।"

"কেন?"

"তা হলে তুমি দাদাকে আর ফুটবল খেলতে দেবে না।"

"কেন দেব না? পরিশ্রম করে খেলা শিখেছে, বছরে এত গাদা-গাদা ম্যাচ খেলছে রক্ত জল করে, সেজন্য টাকাকড়ি নেবে না? নিশ্চয় নেবে। মজুরি বাড়াও, মাইনে বাড়াও করে স্লোগান দেবে, মিছিল করবে কুলিমজুর, কেরানিরা, তার বেলা দোষ হয় না আর ফুটবলাররা দুটো টাকা বাড়াতে চাইলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! নাকু এবার যারা বেশি টাকা দেবে তুই সেখানেই খেলবি।"

সমীরণ হাসল। মাথা নামিয়ে কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে মন্থর ভারী গলায় বলল, "নিলু গড়গড়ির কথাগুলোর মধ্যে অনেক সত্যি জিনিস আছে পিসি। ফুটবলাররা নিজেদের মর্যাদা নিজেরাই খুইয়েছে নানানভাবে। দর বাড়াবার জন্য এই যে একবার পতু একবার বটা আবার পতু, এতে কয়েক হাজার টাকা হয়তো বাড়ানো যাবে কিন্তু ক্লাবের সমর্থকরা কি এদের মানুষ হিসাবে উঁচুতে স্থান দেবে না কি ওরা নিজেরাই নিজেদের স্বৎ মানুষ ভাববে? ভেবে দ্যাখো পিসি, দেশে এখন অন্যান্য খেলার সঙ্গে তুলনায় ফুটবলের স্থান কোথায়? শুধু বাংলাতেই ফুটবল নিয়ে নাচানাচি হয়। এখানে রাস্তায় হাঁটলে বহু মানুষই তাকায়, ছেলেরা অটোগ্রাফ চায়। কাজকর্ম, দরকার নিয়ে কোথাও গেলে আগে সেটা করে দেয়। কিন্তু বাংলার বাইরে ফুটবলারদের এখন আর কোনও খাতির নেই কেননা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমাদের কোনও পারফরমেন্সই নেই। আছে ক্রিকেটের, ওরা বিশ্বকাপও জিতেছে। তাই ক্রিকেটারদের পেছনে সবাই ছোটে। আমি নিজে বড়-বড় শহরে, কেরল বাদে সব জায়গায়, এটা লক্ষ করেছি। কেন এমন হবে?" সমীরণ তার মর্মবেদনা কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করল।

"কিন্তু সেজন্য ফুটবলাররা দায়ী হবে কেন?" হিমাদ্রি তর্ক চালাবার একটা রাস্তা পেয়ে যুক্তির সাইকেলে উঠে পড়ল। "ভারত ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে খেলতেই যায় না, না গেলে ফুটবলাররা তৈরি হবে কী করে? ক্রিকেটে যেসব লোক বোর্ডে যায় তারা বেটার ক্লাস অব পিপল, আর ফুটবলে পতু, বটা, ঘুনু এই তো সব নাম! নামেই বোঝা যায় কী ক্লাসের লোক!" হিমাদ্রি ঠোঁট বাঁকাল।

"কানু, তুই ভুলে যাচ্ছিস, বিরাশির এশিয়ান গেম্‌স দিল্লিতে হয়েছিল। তাইতে আমাদের ফুটবল টিম তৈরি করার জন্য বহুবার বাইরে খেলতে দল পাঠানো হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টে।

তখনই আমাদের দেশে নেহরু কাপও শুরু হয়। ভারত এই কাপে এখন পর্যন্ত চৌত্রিশটা ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র একটা ! ইডেনে যুগোস্লাভিয়াকে হারিয়েছিল সেই বিরাশিতে। গোল দিয়েছে মোট সতেরোটা, খেয়েছে চৌষট্টিটা। নিজের দেশের মাটিতে এত বছর ধরে ইন্টারন্যাশনাল খেলছি, দেশের লোকের সামনে। এতে আলাদা বাড়তি একটা প্রেরণাও প্লেয়ারদের পাওয়ার কথা। দেশের সম্মান, দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য, বাড়াবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই তখন একমাত্র কাজ হয়ে ওঠে।"

সমীরণ কথা থামিয়ে তিনজনের মুখের দিকে তাকাল। পিসি ও মলা গম্ভীর হয়ে গেছে। কানুর সাইকেলের চাকা থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে।

"প্রত্যেকবারই ভারত সবার শেষে। ক্যাম্পে নোভাচেক একদিন বলল, স্যাম, আমাকে সমীরণ বলে না, তোমাদের দেশে কি ফুটবল খেলা হয় ? কেমন ফুটবল খেলা হয় ? হেল্‌থ নেই, স্পিড, স্ট্রেংথ, স্ট্যামিনা নেই। কিন্তু বেসিক স্কিলগুলো ? এখনও পাস ধরতে পারে না, শুটিং পাওয়ার জিরো, কারেক্ট বল দিতে জানে না, এয়ারে ভেরি পুওর, কখন কোথায় থাকতে হবে সেই জ্ঞানটাও নেই। তোমাদের স্কুল লেভেলে কিছুই শেখাবার ব্যবস্থা নেই। অজ্ঞ, আনস্কিল্‌ড, খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে বেশি বয়সে ক্লাব ফুটবলে আসে। সেখানেও কিছু উন্নতির সুযোগ পায় না। খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে সারা বছরই অবিরাম খেলে-খেলে এত ক্লান্ত হয়ে থাকে যে, স্কিল বাড়াবার জন্য খাটার ইচ্ছে আর থাকে না। তারপর ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ওরা যখন আসে, আর তখন কী ফুটবল যে খেলে, সেটা তো খেলার ফলই বলে দিচ্ছে।

"শুনতে-শুনতে লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে। তারপর রাগও হয়।" সমীরণ হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রাগী দাঁতচাপা স্বরে বলল, "ইচ্ছে করে লণ্ডভণ্ড করে দিই কলকাতার ফুটবলকে। শুধু ট্রোফি জেতা, লিগ জেতা ছাড়া আর কিছু এরা ভাবে না। সারা পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, এমনকী পাশের এই বাংলাদেশও আমাদের ফেলে এগিয়ে গেছে আর আমরা এখানে ট্যাকটিক্‌স আর স্ট্র্যাটেজি ভেঁজে বড়-বড় বুলি কপচাচ্ছি। বাইরে থেকে প্লেয়ার ধরতে লাখ-লাখ টাকা খরচ করছে এই দুটো ক্লাব। ভাবতে পারো বিনু জন, আলবুকার্ক, কানাইল এরা কিনা প্লেয়ারের জাত ? অথচ এরাই এখন ময়দানের আরাধ্য দেবতা। এদের আনার চেষ্টা হচ্ছে আমাকে কোণঠাসা করার জন্য।"

"সে কী রে !" পিসি আঁতকে উঠলেন। "কোণঠাসা তো ওরাই হবে তোর কাছে।"

"তোকে কি সারথির আর দরকার নেই ?" হিমাদ্রি ভ্রূ তুলে জানতে চাইল। "তোকে যাত্রীতে যাওয়ার সুযোগ দিলে ইলেকশনে বটার কী অবস্থা হবে ?"

"কথাটা দরকার বা অদরকারের নয়, টাকা দিয়ে আমায় অবশ্যই ধরে রাখবে। বটু বিশ্বাস যতই আমায় অপছন্দ করুক, সে জানে আমি যা সার্ভিস ক্লাবকে দেব, আর কেউ সারা বছর ধরে তা দিতে পারবে না। এটা সারথি, জনতাও জানে। কিন্তু বটা বিশ্বাস ওর নিজের তাঁবের কয়েকটা প্লেয়ার দিয়ে মাঠে আমায় সারা বছর খাস্তা করার চেষ্টা করবেই। ম্যাচ গড়বড় হলেই ওর পোষা ছেলেরা টেন্টে ইট ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে ঝামেলা পাকাবে আর দোষটা আমার ঘাড়ে ফেলবে। অবশ্য ওর গোষ্ঠীতে যদি ভিড়ি তা হলে কিছুই হবে না।"

"তুই তো বাঙ্গালোর চলে যাবি, তোকে তো তা হলে আর খেলতে হচ্ছে না।" শ্যামলা বলল, ঝামেলা এড়াবার একটা রাস্তা বাতলে।

"আরে, চলে যাওয়াটা কি চিরকালের জন্য ? ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেবে, তখন এসে খেলব। আবার ডাকবে, চলে যাব। আমাকে বাইশ তারিখের মধ্যে কোঝিকোড় পৌঁছতেই হবে। নাগজির খেলা শেষ হলে নোভাচেক যদি মনে করেন তা হলে ধরে রাখতে পারেন একসঙ্গে ট্রেনিংয়ের জন্য। আবার লিগে খেলার জন্য ছেড়েও দিতে পারেন। সবই ওঁর ইচ্ছের ওপর।"

"তোকে তো সারথি কন্ট্র্যাক্ট করতে বলবে।" হিমাদ্রি জানতে চাইল না, একটা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা যেন বিবৃত করল। "যাত্রীও তোকে চাইছে, বেশি টাকা দেবে বলছে। দু' পক্ষের দরটা আগে শুনে নে।"

"দরটর শুনে কাজ নেই। নাকু, তুই আগে ভাল করে খেলাটা তৈরি কর। ওই চেক সাহেবের কাছ থেকে যত্ন করে সব শিখে নে। সম্মান বাড়া দেশের, দেখবি তাতে তোরও সম্মান বাড়বে।" পিসির কথাগুলো দৃঢ়স্বরে বলা এবং তাইতে বাকি তিনজন অস্বস্তিতে পড়ল।

"পিসি, দাদা তো দেশের সম্মান নিয়ে ভাবছেই, কিন্তু টাকাটাই বা ছাড়বে কেন ?" শ্যামলা বাস্তবের কাছাকাছি পিসিকে ধরে রাখার চেষ্টা করল। "এই তো একটু আগে বললে, রক্ত জল করে খেলে সেজন্য টাকাকড়ি নিশ্চয় নেবে, যারাই বেশি টাকা দেবে···"

"মলা তুই ভুল করছিস।" হিমাদ্রি থামিয়ে দিল। "পিসি বলতে চায় টাকা তো নেবেই কিন্তু দেশের মর্যাদাও বাড়াতে হবে, তাই তো ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ,তাই-ই," পিসি সমাধানটা পেয়ে গিয়ে হাঁফ ছাড়লেন। আর ঠিক তখনই বাড়ির সামনে মোটরগাড়ির দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো শব্দ ভেসে এল।

"এখন আবার কে !" সমীরণ দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "এই সাড়ে দশটায় !"

হিমাদ্রি জানলার কাছে উঠে গেল। শ্যামলা ফটকের আলোটা জ্বেলে দিল।

সবুজ মারুতির দরজা খুলে নামছে ঘুনু মিত্তির। রাস্তায় পা রেখেই বাড়ির জানলার দিকে ইশারা করে আলো নিভিয়ে দিতে বলল।

"ঘুনটা আবার এসেছে, মলা আলো নিভিয়ে দে।" হিমাদ্রি রিলে করল জানলা থেকে। দরজা খুলতে-খুলতে সে বলল, "এত রাতে যে, কী ব্যাপার ?"

"এত রাত আর কোথায়, মাত্র তো সাড়ে দশ। কলকাতায় এখনও ট্রাম-বাস চলছে, খাবারের দোকান খোলা রয়েছে। তোমাদের অবশ্য একটু বেশি রাতই। যারা ফুটবলার ক্যাচ করে বেড়ায় তাদের কাছে দুপুর একটা আর রাত একটা সমানই ব্যাপার।" ঘুনু সমীরণকে দেখে খুবই হৃষ্টমনে ডাইনিংয়ের চেয়ারে বসে পড়ল। "হুঁ হুঁ বাবা, একটু রাত না করলে কি বাড়িতে পাওয়া যায় ?"

"আর একটু দেরি করলে দাদাকে আর পেতেন না।" হিমাদ্রি গম্ভীর গলায় বলল।

ঘুনু চমকে উঠলেন, "কেন, কেন ?"

"সারথির লোক দু'বার এসে খোঁজ করে গেছে। হয়তো রাতেও আসবে। তাই দাদা রাতে বাড়িতে থাকবে না।" হিমাদ্রির থেকেও শ্যামলা আর একটু গম্ভীর গলায় বলল।

"সারথির লোক !" ঘুনু বিরক্তি, ভয়, উদ্বেগ মিশিয়ে তাকালেন। "বঙ্কু ? নির্মল ? নাম বলেছে ?"

"বলেনি। এইভাবে যখন-তখন ঘনঘন ডিস্টার্বেন্স হলে...আমার পার্ট ওয়ান পরীক্ষার আর দু' মাসও বাকি নেই—" শ্যামলা ঈষৎ অনুযোগ কণ্ঠে এবং চাহনিতে ফুটিয়ে তুলল।

"ঠিক-ঠিক ডিস্টার্বড মাইণ্ডে পড়াশোনা, পরীক্ষার প্রিপারেশন হয় না, ফুটবল তো খেলাই যায় না। নাকু, গুছিয়ে নে। দুটো শার্ট, একটা প্যান্ট, একটা পাজামা হলেই হবে।"

"দুটো শার্ট, দুটো প্যান্ট গুছিয়ে নে, তার মানে ?"

সমীরণের আকাশ থেকে পড়ার মতো অবস্থা। এমনটি তার আজই হয়েছিল যখন বাসবের গলিতে ওরা তিনজন আচমকা ছুটে এসে তাকে ধরেছিল।

"মানে হল, পতুর বাড়িতে এখনই তোকে নিয়ে যাব।"

"নিয়ে যাবে মানে ?"

"ওখানে থাকবি, ওখান থেকেই সই করতে যাবি, সই করেই সোজা দমদমে গিয়ে প্লেনে উঠবি। কোথাকার টিকিট কাটব বল ? মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর না হায়দরাবাদের ? মাদ্রাজেরই কেটে রাখি, ওখান থেকে সাউথের সব ফ্লাইটগুলোই পাবি।"

"থামুন থামুন।" সমীরণ দু' হাত তুলল। "পতুদার বাড়িতে আমি যাব কেন ?"

কথাটা শুনে ঘুনু অবাক হয়ে পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "কেন কী রে ? দু'বার যে ঘুরে গেছে। এর পর কি তোকে আর ছেড়ে রাখা যায় !"

"নাকুকে ধরে রাখবেন ?" পিসির নির্বিকারত্ব এতক্ষণে ঘুচল। কথার মধ্যে প্রবেশ করলেন সন্দেহ-কুটিল চোখ নিয়ে।

"নিশ্চয়।"

"আমি বেঁচে থাকতে !" চাপা গর্জন আর পিসির উঠে দাঁড়ানো দেখে ঘুনু চেয়ারে তার অবস্থান পালটে ইঞ্চিখানেক পিছোলেন। বাঁ হাতটা আপনা থেকেই বুশ শার্টের কলারের কাছে উঠে গেল।

"কেন ? কী করেছে ও ? যেখানে খুশি ও খেলবে, যার সঙ্গে খুশি ও যাবে। ও কি গাধা-গোরু যে, দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবেন ?"

"আহাহা আপনি এত চটছেন কেন, নাকুর তো দুটোই পা, ও কেন গাধা-গোরু হতে যাবে ? আমরা ওই পা দুটোই চাইছি। অন্য কেউ এসে ওর পা ধরে যাতে টান না মারে সেজন্যই ওকে পতুর বাড়িতে সরাতে চাচ্ছি। আপনি অল্পেই রণচণ্ডী মূর্তি ধরেন। আজ সকালে আমার..." ঘুনু গলায় হাত বোলাতে শুরু করলেন। রেখা গুপ্ত অপ্রতিভ হয়ে আড়চোখে তিনজনের মুখ লক্ষ করে বুঝলেন সকালের কাজটা নিয়ে এরা বহুদিন তার পেছনে লাগবে।

"ঘুনুদা, আপনি কি আমায় বাচ্চা ছেলে ভেবেছেন ? কেউ ধরে নিয়ে যাবে বললেই কি অমনই ধরা দিয়ে দেব। তা ছাড়া, আমি যাত্রীতে খেলব এ-ধারণাটাই বা আপনাদের হল কী করে ?" সমীরণ বিরক্তি লুকোবার চেষ্টা করল না।

"তোর জায়গায় তিনটে প্লেয়ার আনছে, সেটা তো জানিস ? আমাদের বুকুকেও টোপ দিয়েছে। সারথি এখন ডেসপ্যারেট, একটা-দুটো স্ট্রাইকার পাওয়ার জন্য। নইলে গত তিন বছর একটাও বড় ম্যাচে গোল করতে না পারা বুকুকে কিনা দু' লাখ অফার দেয় ?" ঘুনু তাজ্জব বনেছেন বোঝাতে চোখ পিটপিট করলেন।

"তা হলে বুকু চলে যাক সারথিতে।" সমীরণ আলস্য ভাঙার জন্য দু' হাত তুলে দেহে মোচড় দিল। "দু' লাখ পেলে যাওয়া উচিত।"

"পাগল হয়েছিস। সারথিতে গিয়েই যাত্রীকে গোল দেবে। ওকে যেতে দেওয়া চলবে না, দুই পঁচিশে ও রাজি হয়েছে। আজকেই ওকে পতুর বাড়িতে জিম্মে করে দিয়ে এলাম। তুইও এবার চল।"

"বুকু অর্থাৎ কিশলয় দত্তকে দুই-পঁচিশ, যে গত তিন বছর ধরে বড় ম্যাচে গোল করতে পারেনি। আর সমীরণ গুপ্তকে এক লাখ ষাট হাজার ! বাহ্।" হিমাদ্রি দাদার হয়ে দরাদরির প্রথম ধাপে পা রাখল। "আর দুলাল চক্রবর্তীর মতো বানপ্রস্থের সময় হওয়াকে কত অফার দিয়েছেন ?"

ঘুনু মেজাজ হারালেন না। খোঁচাটাকে সরল হাসি দিয়ে ভোঁতা করে বললেন, "মানছি দুলালের বানপ্রস্থের সময় হয়ে গেছে, এখন ও পঁয়ত্রিশ মিনিটের প্লেয়ার। কিন্তু বড় ম্যাচে এখনও ওর জায়গায় খেলবার মতো লোক এ-দেশে নেই। এজন্যই ওকে নিতে হবে। বলেছি তো, ছেঁকে তুলে নেব এবার, টাকাপয়সা নিয়ে কোনও কার্পণ্য যাত্রী করবে না। তা হলে নাকু ?" ঘুনু চেয়ার থেকে ওঠার মতো ভাব দেখালেন।

"তা হলে কী ?" পা দুটো ছড়িয়ে চেয়ারে শরীর এলিয়ে জানিয়ে দিল, সে ব্যস্ত নয়।

"মামণির পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে, সামনেই পার্ট ওয়ান। পতুর গাড়ি নিয়েই এসেছি। ব্যাগে শার্ট-প্যান্টটা ভরে এবার বেরিয়ে পড়, পাজামা নিতে ভুলিসনি।" অত্যন্ত নিশ্চিন্তে কথাটা বলে, কী যেন ভাবতে-ভাবতে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘুনু, নস্যির নতুন ডিবেটা বের করে ঢাকনায় কয়েকটা চাঁটি দিলেন। রেখা গুপ্তর চোখ নিবদ্ধ হল ডিবেটায়। শ্যামলা হাত দিয়ে মুখ চাপল। হিমাদ্রি হঠাৎ বিষম খেয়ে বেসিনের দিকে ছুটে গেল।

সমীরণ এসব লক্ষ করেনি। কারণ চোখ বন্ধ করে সে তখন ভাবছিল। "ঘুনুদা, আমি যাত্রীতে যাব না।"

নীল আকাশ থেকে ঘুনুর মাথায় বাজ পড়লেও এত অবাক তাকে দেখাত না। "যাবি না ! আমি যে পতুকে দিব্যি গেলে বলে এসেছি, তোকে নিয়ে যাবই যাব ! আমার মাথাকাটা যাবে, লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না...."

"থাক ঘুনুদা, এসব কথা বলে লাভ নেই। আমার সঙ্গে কথা না বলেই দিব্যি গেলে ফেলেছেন ?" সমীরণ কঠিন গলায় ইঙ্গিত দিল বাজে কথা সে শুনতে চায় না।

"দাদাকে কি গা-গ ভেবেছেন ?" শ্যামলা ফুট কাটল।

"গা-গ !" ঘুনু ঘাবড়ে গেলেন, "তার মানে ?"

"ও কিছু নয়।" সমীরণ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করল। "মলার মাথায় পোকা আছে, সেগুলো মাঝে-মাঝে নড়ে ওঠে।"

"আহ্হ ।" নিশ্চিন্তি বোধ করে ঘুনু নস্যির ডিবের ঢাকনাটা খুলে আঙুল ঢোকালেন। তাই দেখে রেখা গুপ্ত কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, শ্যামলা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ থাকতে ইশারা করল।

"দ্যাখ নাকু এক-ষাটটা হল চুক্তি, আর গুঁড়ো পঞ্চাশ হাজার। তা হলে দু' লাখ দশ হাজার। গত দু' বছর ধরে তোর পেছনে লেগে রয়েছি, এবার আর...." টেবিলে হুমড়ি খেয়ে ঘুনু আঙুলের টিপে নস্যি সহ সমীরণের দিকে দু' হাত বাড়ালেন। "সীতেশের গ্রুপের ছেলে বুকু। ওকে প্রোটেক্ট করার জন্য সীতেশই দু' বছর ধরে তোকে যাত্রীতে আনার ব্যাগড়া দিয়ে গেছে। এ-বছর পতু এসে ওকে কোণঠাসা করে দিয়েছে, তবে বুকুকেও পতু রাখতে চায়। তুই প্রথম দুটো ম্যাচে গোল কর, বুকু-ফুকু ফুটে যাবে, সীতেশরাও ভেসে যাবে।"

"যাকে ফোটাতে চান, তার থেকে দাদা পনেরো হাজার কম নেবে কেন ?" হিমাদ্রি জেরা করার ভঙ্গিতে বলল।

"সাতটা গোল তিন বছরে, এক-একটার দাম কত হবে বলে মনে হয় ?"

ঘুনু তাকালেন সমীরণের দিকে। ভাইয়ের প্রশ্নটা দাদার চোখেও। হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে ঘুনু নস্যিটা নাকে ঢুকিয়ে হাত ঝাড়তে গিয়েই মুখ ফ্যাকাসে করে ফেললেন। পর্যায়ক্রমে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হেসে বললেন, "দ্যাখো, কী ভুলো মন যে আমার। আবার আমি নস্যি নিতে শুরু করেছি। এটা যে আজই ত্যাগ করেছি সেটা আর মনেই নেই !"

"এই ডিবেটাও কি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন ?" খুব সাধারণ স্বরে শ্যামলা জানতে চাইল।

"নাহ।" ঘুনু মাথা নাড়াল। "ফেলব না। থাক। বেইজ্জত হতে আর বাকি রইল না। তোমরা সবাই আমাকে ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড,

অ্যাক্টর বলে নিশ্চয় ধরে নিয়েছে। বোধ হয় আমি তাই। ক্লাব করে-করে সোজাভাবে চলটাই ভুলে গেছি।"

করুণ হয়ে উঠেছে ঘুনুর মুখ, কিন্তু ঝট করে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে সরল হাসি ছড়িয়ে বলে উঠলেন, "যাকগে এসব, বরং তুই পতুর সঙ্গে একবার নিজেই মুখোমুখি কথা বল। এক-একটা গোলের দাম কত সেটা ওই ধার্য করবে'খন। মনে হচ্ছে আজ আর তোকে নিয়ে যেতে পারব না, তা হলে কালকে চল।"

"আপনি আমাকে পতুদর ফোন নাম্বারটা দিন, কবে যাব সেটা ফোন করে জানিয়ে দেব।" সমীরণ আন্তরিকভাবে বলল।

ঘুনুদাকে এগিয়ে দিতে ওরা সবাই বাইরের বারান্দায় এল। হঠাৎ তিনি রেখা গুপ্তর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "মুন্নার বাড়িতে গেছলেন কি ?"

"অ্যাঁ, মুন্—না! কে— ?" রেখা গুপ্ত থতমত হয়ে আমতা-আমতা করছেন, ততক্ষণে ঘুনু মিত্তির মারুতির দরজায় হাত রেখেছেন।

"আহ, পিসি, তুমি মাটি করলে। মুন্না কে তা ভুলে গেলে এর মধ্যে ?" চাপা ঝাঁঝ শ্যামলার গলায় এবং সেটা অপ্রতিভতার লজ্জা সহ।

"লাস্ট সেকেন্ডে পেছন থেকে এসে গোল করে দিয়ে গেল। নিশ্চয় সারাদিন ওত পেতে ধারেকাছে ছিল।" হিমাদ্রি ঠোঁট কামড়াল।

"নাকু, ভদ্দরলোকের কাছে যে আমি মিথ্যেবাদী হয়ে রইলাম।" রেখা গুপ্ত কাঁদো-কাঁদো হয়ে সমীরণের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী ভাবছেন উনি আমার সম্পর্কে, মলার সম্পর্কে !"

"কিচ্ছু ভাবছে না, এসব ধড়িবাজ লোককে আমি চিনি। এরা সত্যিমিথ্যের ধার ধারে না।" সমীরণ আশ্বস্ত করার জন্য বলল।

"কিন্তু আমি তো ধরি। আমিও তো ধড়িবাজ হলাম। উহুহু, এবার নরক যন্ত্রণা শুরু হবে। নাকু তুই আমায় উদ্ধার কর, ... তুই বরং ওর ক্লাবেই এবার যা, তা হলে আমি খানিকটা শান্তি পাব।" বলেই রেখা গুপ্ত দ্রুত নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ঘরের আলো নিভিয়ে খাটে বসে কান ধরে বিড়বিড় শুরু করলেন, "মিথ্যা বলা মহাপাপ, নরকে গমন ....মিথ্যা বলা মহাপাপ..... ।"

ডাইনিংয়ে তখন হিমাদ্রি বলছে, "গ্রেট লেডির অর্ডার, অমান্য করলে কিন্তু ভি আই পি রোডে নিশ্চিত নিলডাউন !"

॥ ৫ ॥

"কে, সমীরণ নাকি, আমি ধাড়াদা, সুবোধ ধাড়া বলছি।"

টেলিফোন বাজার শব্দে সমীরণের ঘুম ভেঙে গেছল। খাবার দালান থেকে রেখা গুপ্তর ঘরে যাওয়ার সরু গলিটার মধ্যে দেওয়ালে আঁটা র‍্যাকে টেলিফোন। সে ভেবেছিল মলা বা কানু ফোন ধরবে। ক্রমাগত বেজে যাওয়ায় বিছানা থেকে তাকে উঠতেই হল। আজ রবিবার বেগিং বন্ধ। পিসি আর মলা তা হলে বাজারে গেছে। কানুও বাড়িতে নেই।

"বলুন।" সমীরণ এক চোখ বুজে ঘড়ি দেখল। সওয়া ছ'টা।

"ঘুম ভাঙালাম নাকি ?"

"সারারাত লোডশেডিং, এই সকালের দিকে ঘুমটা এসেছিল।" হাই তোলার শব্দটা সে ফোন মারফত পাঠিয়ে দিল।

"এহেহেহে, তা হলে তো অন্যায় হয়ে গেল। তুই তা হলে এখন ঘুমো, আমি বরং পরে ফোন করব।"

"ঘুম আর আসবে না, বলুন, কী বলবেন।" বিরক্তি চেপে অমায়িক গলায় সে বলল।

"বলব আর কী, ক্লাবে যা চলছে। এরা, মানে ঘুনুরা, আর কোচ খুঁজে পেল না, শেষে কিনা অজয় তালুকদারকে ! কী যোগ্যতা আছে ওর ? কোনওদিন কোনও বড় টিমকে কোচ করল না, দুটো ছোট টিমকে কোচ করে 'বি' গ্রুপে তাদের নামিয়ে দেওয়া ছাড়া যার আর কোনও সাকসেস নেই, কোচিংয়ের ডিগ্রি ডিপ্লোমা নেই, ফুটবল-সেন্স নেই, ঝালচচ্চড়ি অম্বল রাঁধার বাইরে আর কিছু যে রাঁধতে জানে না তাকে কিনা ফাইভ স্টার হোটেলের চিফ শেফ করে দিল ! ....হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস ?"

"পাচ্ছি। আপনি বলে যান। কিন্তু এই সকালবেলায় এসব কথা আমায় শোনাচ্ছেন কেন ? আমি তো যাত্রীর প্লেয়ার নই।"

"ঘুনু তোর বাড়িতে কাল গেছল তোকে তুলে আনতে। পারেনি। আমি জানতুম পারবে না। তোর মতো প্লেয়ারের মানমর্যাদা, ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন হতে যাচ্ছিস, এখন যারা কমিটিতে এসেছে তারা কী দিতে পারবে ? ভেবেছে টাকা ছড়ালেই সমীরণ গুপ্ত ছুটে আসবে, তা কি কখনও হয় ! হায়রে ছেলেদের মতো টাকার জন্য আজ এ-ক্লাব কাল সে-ক্লাব, এসব তো তোর পক্ষে সম্ভব নয়। কী ফ্যামিলির ছেলে তুই, আমি তো তা জানি। ....হ্যালো, ক'দিন ধরে লাইনটা খারাপ, হ্যালো..."

"আমি ঠিকই শুনতে পাচ্ছি, বলুন।"

"ঘুনু কেমন লোক তা তো তুই ভালই জানিস। ক্লাস এইট পর্যন্ত তো বিদ্যে, আগে নারান সেনের গাড়ির দরজা খুলে দিত, এখন পতুর গাড়িতে চেপে প্লেয়ার ক্যাচ করে বেড়াচ্ছে। নারানদার আমলে সেক্রেটারির ঘরে না ডাকলে ঘুনু ঢুকতে পারত না। আর এখন ও পতুর চেয়ারেও মাঝে-মাঝে বসে। ক্লাবের ডিগনিটি বোধটাই নষ্ট হয়ে গেল এদের জন্য। তোর দশ হাজার টাকা তো আজও পেলি না !"

সমীরণ শুনতে-শুনতেই বুঝে গেল সুবোধ ধাড়া তাকে ভাংচি দিতে এইসব বলছে। তার মাথায় দুষ্টুমি খেলল। এইসব লোককে নিয়ে মজা করার সুযোগ চট করে তো পাওয়া যায় না।

"ধাড়াদা, কে যেন বলল, টাকাটা নাকি আপনিই..."

"কী বললি, কী বললি, আমি তোর টাকা মেরেছি ? জীবনে আজ পর্যন্ত একটা পাই-পয়সাও কাউকে ঠকাইনি। নিশ্চয় ঘুনু বলেছে। আসলে তোর টাকাটা ঘুনুই সই করে তুলে নিয়েছিল। আমি নিজে ভাউচারে ওর সই দেখেছি।"

"তখন আমায় সেটা, এইরকম একটা ফোন করে জানাননি কেন ? না ধাড়াদা, আমাকে এত ভালবাসেন অথচ এই খবরটা আমায় দেননি। যদি দিতেন তা হলে আমি হ্যাঁ বলতাম না।"

"হ্যাঁ মানে ! হ্যাঁ ব্যাপারটা কী ? ঘুনুকে হ্যাঁ বলেছিস নাকি ?"

"বলব না ? পৌনে তিন লাখ টাকার অফার পেলে কী না বলব ?"

"পউউনে তিন !"

সমীরণ দশ সেকেন্ড কোনও শব্দ পেল না ওধার থেকে। হাসল সে। ওষুধ ধরেছে।

"ধাড়াদা হ্যালো, লাইন ঠিকই আছে, হ্যালো, ঘুনুদা বললেন, গত বছর বুকু যা কাণ্ড করেছে তাতে নাকি আমাকেই এখন সবাই চাইছে। মেম্বাররা নাকি বলছে হিরো থেকে হিরোইন হয়ে গেছে বুকু দত্ত। এখন যাত্রায় নামুক। পতুদা নাকি বলেছেন ব্ল্যাঙ্ক চেকে সই করে দিচ্ছি, সমীরণকে এনে দাও। আচ্ছা দেখুন তো কী মুশকিলে পড়লাম। আমি যাত্রীতে গেলে এদিকে বটাদা বলেছেন আমাদের বাড়ির সামনে অনশন শুরু করবেন—আমরণ। কী করি বলুন তো ?"

"ঘুনুকে হ্যাঁ বলেছিস, মানে ফাইনাল কথা, না কি ল্যাজে খেলাচ্ছিস ?"

"ওহো ধাড়াদা, এখন কি ফাইনাল কথা বলে কোনও কথা আছে ? সই করার আধঘণ্টা আগেও তো ডিগবাজি খেয়েছে কত তারকা !"

"এখন কিন্তু ওসব খাওয়ার পথ বন্ধ। অলরেডি বটা আর পতু তাদের খোঁয়াড়ে জিনিস ভরে ফেলেছে। বুকুও ঢুকে গেছে পতুর বাড়িতে। বাকি যারা রয়েছে তাদের একজন তুই, আশ্চর্য হচ্ছি, বটা এখনও কী বলে তোকে ছেড়ে রেখেছে! তোকে কি সারথির দরকার নেই? বিনু জন তো কাল এসে গেছে, কানাইল আজ আসছে, তা হলে কি তোকে আর সারথি রাখবে না?"

সমীরণ কয়েক সেকেন্ডের জন্য কাঠ হয়ে রইল বিনু আর কানাইলের খবরটা পেয়ে। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করল, "বিনু যতদূর জানি আসবে না আর কানাইলকে পঞ্জাব পুলিশ ছাড়বে না। তবে ইলেকশনে জেতার জন্য বটাদা রটাবে ওদের আনিয়ে ফেলেছে।"

একটা হালকা খিক্‌খিক হাসি সমীরণের কানে ধাক্কা দিয়ে জানিয়ে দিল তার কথা নস্যাৎ হয়ে গেছে।

"তুই বড় ছেলেমানুষ সমীরণ। বিনুকে কাল আমিই আমার বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলে রেখেছি চন্দননগরে। বটাকে ইলেকশনটা জেতাতে হবে যাত্রীর স্বার্থেই তো। আলবুকার্ক সারথিতে আসছে-আসছে এমন একটা রব তুলতে হবে। আরে খবরের কাগজ আমার মুঠোয়, রব তুলিয়ে দেব। কানাইলের জন্য বটার হয়ে আমি অনেক হেল্‌প ওকে করেছি।"

"কেন করেছেন? পতুদাকে ডোবাবার জন্য?"

"হ্যাঁ।" দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ ফোনের মধ্য দিয়ে সমীরণের কানে সুড়সুড়ি দিল। সুবোধ ধাড়া হঠাৎ যেন খেপে উঠল বলে তার মনে হচ্ছে। "আর শুনে রাখ, যাত্রীতে তুই যদি আসিস তা হলে তোকেও ডুবতে হবে।"

সমীরণের ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল কথাটা শুনেই। সতর্ক হয়ে সে বলল, "পতুদাকে ডোবাতে আপনি কিন্তু যাত্রীরই ক্ষতি করবেন।"

"করব, ক্লাবের জন্য করব। একটা প্ল্যান নেই, পরিকল্পনা নেই, দু' হাতে টাকা ছড়িয়ে শুধু প্লেয়ার ধরছে। এসব ঘুনুর মাথা থেকেই বেরিয়েছে। যত টাকা খরচ হবে ততই ওর হিস্যের টাকাও বাড়বে। এত প্লেয়ার নিয়ে শেষে বিপদে পড়তে হবে। ভাব তুই, লেফট ব্যাকই চারজন, মিডফিল্ডে ন'জন। এইভাবেই রিক্রুট হচ্ছে, অ্যাডভান্স দেওয়া হচ্ছে। পাগল না হলে এমন কাজ কেউ করে? অজয় বলেছে সমীরণকে আনো। ওর ফার্স্ট চয়েস তুই। যদি তুই ফেল করিস তা হলেই বুকু টিমে জায়গা পাবে। এইভাবে কি টিম তৈরি হয়? তুই ফেল করলে তবেই বুকু টিমে আসবে! যাত্রী কি অজয়ের পৈতৃক সম্পত্তি?"

"ধাড়াদা আপনি তো ক্লাবের শুভাকাঙ্ক্ষী, বুকুরও গডফাদার। শুনেছি ক্লাব লিগ না পেলে একমাস হবিষ্যি করেন, জুতো পরেন না। তা হলে গত বছর সারথির সঙ্গে লিগ ম্যাচের মাঝখানে বুকুর মায়ের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে টেলিফোন করে হঠাৎ ওকে মাঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কেন? বুকু তখন তো বেশ ভালই খেলছিল। হয়তো বহুদিন পর গোলও পেয়ে যেত। নিজের ওপর কনফিডেন্সটা ফিরে পাওয়ার জন্য গোল পাওয়া ওর খুবই দরকার ছিল। সেদিন আপনি একই সঙ্গে বুকুর আর ক্লাবেরও ক্ষতি করেছেন।"

সমীরণ ধীর স্বরে, মেপে-মেপে কথাগুলো বলল মাথা নামিয়ে চোখ বন্ধ করে। একজন ভাল ফুটবলারের সর্বনাশ হওয়া দেখতে তার কষ্ট হয়। ফুটবলার হিসাবে বুকুকে সে সমীহ করত। কিন্তু এখন আর করে না। ক্লাবের রাজনীতিতে ধাড়া গ্রুপের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বুকু নিজের ক্ষতি নিজেই করেছে। এইসব দেখে আর শুনে সারথিতে গোষ্ঠী-ঝগড়া থেকে সমীরণ শত হাত দূরে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে।

"সমীরণ তুই বুদ্ধিমান, শিক্ষিত। নোংরামিতে থাকিস না বলে ময়দানে তোর সুনাম আছে। একটা গরিব ঘরের ছেলে, তিন পুরুষ যা পেত না তাই পেয়ে গেছে সাত-আট বছরে। কম করে লাখ দশেক যাত্রী থেকে আর হাজার তিনেক মাসে-মাসে ব্যাঙ্কের চাকরি থেকে। দু' বছর আগেই লক্ষ করেছি বুকুর ভেতর থেকে খেলার ইচ্ছেটা ফুরিয়ে গেছে। ও আর কোনওদিনই খেলায় ফিরতে পারবে না এটা আমি জেনে গেছি বলেই মাঠ থেকে বের করে নেওয়ার জন্য মায়ের হার্ট অ্যাটাকের টেলিফোনটা করিয়েছিলুম। ওর এজন্য কোনও ক্ষতিই হয়নি। কিন্তু আমি যা ঘটাতে চেয়েছিলুম সেটা হয়েছিল। ম্যাচ হেরে গ্যালারিতে আগুন জ্বলেছিল। হয়তো সেদিন বুকু একটা গোল করে ফেলত কিন্তু সেলফ কনফিডেন্স ও ফিরে পেত না। তা পেতে হলে খেলাকেই ধ্যানজ্ঞান করতে হয়। বুকু আর তা পরবে না বলেই ওকে আমি নিজের কাজে লাগাচ্ছি। আর ও এট জানে, এখন ওভারটাইম খেটে উপরি আয় করার কাজ যতদিন পারে ওকে করে যেতে হবে। কিন্তু তুই অ্যামবিশাস, ফুটবলে বড় হতে চাস, তুই ডেঞ্জারাস।"

"এটা প্রশংসা, না নিন্দে?"

কথাটায় কান দিল না ধাড়া। শুধু বলল, "যেজন্য ফোন করা, তুই সারথিতেই থেকে যা, তোর দর আমি বাড়িয়ে দেব। যাত্রীতে আড়াই লাখ টাকার অফার পেয়েছিস বলে খবরের কাগজে রটিয়ে দেব। সারথি দু' লাখ অফার দিয়েছে শুনে তো বুকুকে তুলে নিয়ে গেছে পতু। তোকেও বটা তুলবে।"

সমীরণ আবার খিক্‌খিক হাসি শুনল। সে দ্বিধাভরে বলল, "দু' লাখ, আড়াই লাখ, এসব কি লোকে বিশ্বাস করবে?"

"করবে কেন, করেছে। আবার বলছি, যাত্রীতে এলে ঝামেলায় পড়বি, খেলতে পারবি না....খেলতে দেব না।"

ওধারে টেলিফোন রাখার আর ডোর-বেল বাজার শব্দ প্রায় একই সঙ্গে হল। বাজার নিয়ে রেখা গুপ্ত আর শ্যামলা ফিরল।

"দাদা তোর কি অসম্ভব লাক, কতদিন পর আজই কিনা বাজারে শুঁড় থেকে টেইল প্রায় দু' ইঞ্চি লম্বা বাগদা উঠেছে! 'এ' ব্লকের সেই মেমসাহেব, হাউসকোট পরে যিনি বাজার করেন, তিনি মাছওলার সামনে ঝুঁকে আঙুল দিয়ে বাগদার নাড়ি টিপে-টিপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছিলেন। আর পিসি চল্লিশ হাত দূর থেকে ভিড়ের মধ্য দিয়ে....এককালে যে বাস্কেট খেলত সেটা এবার বিশ্বাস হল।"

"মলা।" রান্নাঘর থেকে গম্ভীর স্বরে ডাক পড়ল।

"না পিসি, সবটা আমি বলব না।" শ্যামলা চেঁচিয়ে আশ্বাস দিয়েই সমীরণের দিকে বড়-বড় চোখ করে বলল, "অসম্ভব একটা ড্রিব্‌ল করে ছুটল। তিন-চারজন ভদ্রলোক ধাক্কা খেয়ে কোনওক্রমে টাল সামলালেন বটে, কিন্তু মেমসাহেবকে নির্ঘাত রেড কার্ড দেখানোর মতো ফাউল পিসি করেছে। সোজা গিয়ে একটা সাইডপুশ, মেমসাহেব দড়াম, এক কথায় চিংড়িগুলো ধরে পাল্লায় চাপিয়ে দিয়েই পিসি বলল, "ওজন করো, সবগুলো নেব।" এক অ্যাকশনে সব ঘটে গেল। মাছওলা পিসিকে জানে। সে বিনা বাক্যব্যয়ে বাটখারা চাপিয়ে ডিক্লেয়ার করল "এক কিলো পঞ্চাশ গ্রাম, আশি টাকা আর চার টাকা, চুরাশি টাকা....দু' টাকা কম দেবেন, সমীরণদা কাল ফিরেছেন জানি। মেমসাহেব যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন মাছগুলো আমার থলিতে এসে গেছে।"

"মলা।" আবার রান্নাঘর থেকে।

"এই যাই, আর একটু বাকি আছে পিসি। তারপরই বুঝলি দাদা, মেমসাহেব তো চিৎকার শুরু করলেন। মাছওলা তখন প্রায় ধমকেই তাকে বলল, "পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বল পেয়ে কী করতে হয় সমীরণ গুপ্তর পিসিমা সেটা জানেন, আপনি অত লেট করলেন কেন? টাটকা বাগদা আর আপনি কিনা টেপাটেপি করছেন! ফাস্টটাইম শট নেবেন তো!" মেমসাহেব তো মাছওলার

কথা কিছুই বুঝলেন না। আর পিসি তো হাতজোড় করে প্রচুর মাফটাপ চেয়ে প্রতিশ্রুতি দিল জীবনে আর কখনও মেমসাহেবকে ধাক্কা মারবে না, এমনকী জীবনে আর কখনও চিংড়িমাছও কিনবে না বলতে যাচ্ছিল....."

"মলা, মিথ্যে কথা বোলো না।" রান্নাঘর থেকে প্রায় করুণ স্বর ভেসে এল।

"আহা, আমি তো বলেছি বলতে প্রায় যাচ্ছিলে, সত্যিই কি আর বলেছ ? আমি যদি তখন 'পিসি ওই দ্যাখো এঁচোড়' না বলতাম তা হলে তো তুমি নির্ঘাত বলেই ফেলতে।"

এই সময় রান্নাঘরের দরজায় এসে রেখা গুপ্ত একটা চিংড়ি তুলে গদগদ স্বরে বললেন, "কীরকম টাটকা বল, আর কত শস্তা, আশি টাকা মাত্র !"

"সর্ষে বাটা আর কষে ঝাল দিয়ে..." সমীরণ টাকরায় জিভ লাগিয়ে একটা শব্দ করল। "বহু... বহুদিন বাগদা খাইনি।"

"না পিসি, নারকোল আর কিসমিস দিয়ে টক-মিষ্টি মালাইকারি।" শ্যামলা নাকিসুরে আবদার জানাল।

" দাঁড়া, দাঁড়া, এঁচোড় দিয়ে একখানা যা ডালনা..." রেখা গুপ্ত রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

""মলা শিগগিরি গিয়ে ধরে পড়, এঁচোড়-ফেচোড় বন্ধ কর।"

"তুই গিয়ে বল।"

ভাইবোনের মধ্যে কথা নিয়ে যখন ঠেলাঠেলি চলছে তখন স্কুটার ফটফটিয়ে হিমাদ্রি বাড়ির সামনে থামল। জিলিপির ঠোঙাটা টেবিলে রেখে, "তিরিশটা আছে, সবার ছ'টা-ছ'টা, ইনক্লুডিং বাবা।" তারপরেই একটু উত্তেজিত স্বরে বলল, "ট্যাক্সি থামিয়ে দুটো লোক, তার মা'র সামনে আমায় জিজ্ঞেস করল, সমীরণ গুপ্তর বাড়িটা কোথায় ? দেখে মনে হল যাত্রী কি সারথির দলবদলের পার্টি, বললাম জানি না, ভেতরে গিয়ে খোঁজ করুন। ওরা সুশোভনেই ঢুকল, এক্ষুনি এসে পড়বে। বাইরে গিয়ে কথা বলবি।"

হিমাদ্রির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গেই ডোর-বেল বাজল। সমীরণ বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল।

দু'জনেই সারথির। বটা বিশ্বাসের বিশ্বস্ত দিলীপ আর বাপি। প্রথমজন তার ব্যক্তিগত কাজগুলো করে, অন্যজন তার দেহরক্ষীর মতো সঙ্গে-সঙ্গে ঘোরে। সমীরণের সঙ্গে মৌখিক আলাপ ছাড়া ঘনিষ্ঠতা নেই।

"কী ব্যাপার, আপনারা ?"

"বটাদা তোমায় একবার ডেকেছে।" দিলীপ জরুরি ভাব দেখিয়ে বলল, "ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

"কিন্তু আমি তো এখন যেতে পারব না। পিসিমা বাগদা চিংড়ি এনেছেন।" সমীরণের সহজ হালকা গলা।

"মানে !" দিলীপ বুঝতে পারল না।

"পিসিমা বাজার থেকে আমার জন্য বাগদা কিনে এনেছেন। এখন তার খোলা ছাড়াচ্ছেন, তারপর রাঁধবেন। সেটা না খাওয়া পর্যন্ত আমি তো বাড়ি ছাড়তে পারব না।" সমীরণ হাসিমুখে বলল কিন্তু অন্য দু'জনের মুখে হাসি ফুটল না।

"বটাদা অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।" দিলীপের গলায় ব্যস্ততা একটু বেশিই ফুটে উঠল।

"মাছফাছ এসে খাবে'খন, আগে বটাদার সঙ্গে কথা সেরে আসবে চলো।" বাপি কেউকেটা ভাব দেখিয়ে দু'পা এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

সমীরণের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে দিলীপের দিকে তাকিয়ে থেকে কাটাকাটা স্বরে বলল, "পিসিমার রান্না না খেয়ে, কোথাও আমি যাব না। এটা আমার কাছে আপাতত সবথেকে জরুরি ব্যাপার। বিকেলের দিকে বটাদার সঙ্গে দেখা করব, উনি তখন কোথায় থাকবেন ?"

ওরা দু'জন একটু অবাক ও কিছুটা বিভ্রান্তি নিয়ে সমীরণের কথা শুনল। বটাদা ডাকছে শুনে আঁকপাক করে দেখা করার জন্য ছুটল না, এমন অদ্ভুত ব্যাপার তারা দেখেনি। কিন্তু সমীরণকে ওরা চেনে। কঠিন গলা ও চাহনি থেকে ওরা বুঝে গেছে এখন একে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

"যাত্রী থেকে কেউ এসেছিল ?" দিলীপ নরম স্বরে জানতে চাইল।

"হ্যাঁ। ঘুনু মিত্তির।" সমীরণ জানে সব খবরই এরা পায়।

"অফার দিয়েছে ?" দিলীপের নিচু গলা।

"হ্যাঁ, তবে আমি কোনও কথা দিইনি।"

দু'জনেই যেন আশ্বস্ত হল। ওরা জানে সমীরণ ছলচাতুরি করে কথা বলে না।

"বিকেলে বটাদা শোভাবাজারে অভয় কুণ্ডুর বাড়িতে থাকবে, তুমি বাড়িটা চেনো ?"

অভয় কুণ্ডু একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিন বছর আগে অনেকের সঙ্গে সে অভয় কুণ্ডুর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গেছল। বাড়িটা যে ঠিক কোথায়, তার মনে নেই। তবে মাঝারি একটা রাস্তা থেকে গলির মধ্যে, খুব পুরনো বাড়ি, মোটা দেওয়াল, উঁচু সিলিং, শ্বেত পাথরের মেঝের হলঘর, সদর দরজার পাল্লা দুটো খুব ভারী, এইটুকুই মনে আছে।

"জায়গাটা জানি, বাড়িটা মনে নেই।"

"তা হলে ঠিক ছ'টায় শোভাবাজার মোড়ে বাপি অপেক্ষা করবে। তুমি ট্যাক্সি ওখানে থামাবে; ও নিয়ে যাবে অভয়দার বাড়িতে। ঠিক ছ'টায়, পাক্কা ?"

"হ্যাঁ যাব।" সমীরণ মাথা হেলাল।

॥ ৬ ॥

সমীরণ পৌঁছেছিল দশ মিনিট দেরিতে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম মানলেও, সর্ষে-কাঁচালঙ্কা মাখানো বাগদাকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়ার জন্য এবং মালাইকারিকে অবজ্ঞা করে রুচিহীনতার কবলে না পড়তে চাওয়ায় সে তার খাওয়ার বিধিনিষেধকে আজ সিকেয় তুলে দেয়। অবশ্য শুধু আজকের জন্যই। মনে-মনে শুধু বলেছিল, 'হাজার হোক আমি তো বাঙালিই রে বাবা !' মাছের সঙ্গে ভাতও আনুপাতিক হারে বেশি খেয়ে ফেলায় সমীরণকে একটি ভাতঘুমের সাহায্যও নিতে হয় হাঁসফাঁসানিকে সুস্থির করতে। অতঃপর দশ মিনিট বিলম্বকে সে দেরি মানতে চাইল না। অবশ্য ট্যাক্সিতে উঠে বাপি শুধু একবারই বলেছিল, "আমি সেই সাড়ে পাঁচটা থেকে দাঁড়িয়ে।"

ট্যাক্সিটা শোভাবাজার মোড় থেকে পশ্চিমে গঙ্গার দিকের রাস্তা ধরে এগোল। সমীরণ হাটখোলা পোস্ট অফিসটা দেখে মনে করতে পারল এই পথেই সে গিয়েছিল নেমন্তন্ন খেতে। আর-একটু এগিয়ে বাপির নির্দেশমতো ট্যাক্সি ডান দিকে একটা রাস্তায় ঢুকল। তারপর বাঁ দিকে একটা কানাগলির মুখে দাঁড়াল।

সামনেই চায়ের দোকান। সাত-আটটি যুবক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর বোর্ড রেখে ক্যারম খেলছিল। ট্যাক্সি থামতেই তিনজন এগিয়ে এল। বিগলিত সম্ভ্রম মুখে মাখানো।

"সমীরণদা এসে গেছে রে........আসুন সমীরণদা।" একজন দরজা খুলে ধরল।

একজন ঝুঁকে হাত বাড়াল নামায় সাহায্য করতে। সমীরণ নামার সময় একমুখ হাসল কিন্তু হাতটা ধরল না।

"সমীরণদা, লিগটাই হল আসল জিনিস, এবার কিন্তু ওটা চাই। শিল্ড, কাপফাপ হোক বা না হোক আপনাকে কিন্তু...."

"আরে একা কি কেউ লিগ জেতাতে পারে ! এগারোজনের খেলা, এতদিন ধরে এতগুলো ম্যাচ, টিম কি সবদিন সমানভাবে খেলতে পারে ?" বিব্রতভাবে কিন্তু হাসিমুখে সমীরণ বলল। এই

ধরনের কথার সামনে বহুবার তাকে পড়তে হয়েছে। বেশি কথাবার্তায় যেতে নেই। মুখে হাসি মাখিয়ে, "অবশ্যই চেষ্টা করব," এবং "এবার নিশ্চয় লিগ জিতব।" ধরনের কথা বলে সে পাগল-সমর্থকদের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে।

"না, সমীরণদা এ-কথা বললে হবে না, টিম আমাদের এবার খুব ভাল, বিনু জন তো..." আচমকা বাপির ধমক খেয়ে ছেলেটি থতমত হয়ে কথা শেষ করতে পারল না।

"কোথায় কী তার ঠিক নেই, বিনু জন নিয়ে হেদিয়ে মরছে। সমীরণ গুপ্ত থাকতে আর কাকে দরকার?" বাপি উত্তেজিত চোখে কটমটিয়ে তাকাতেই ছেলেটি গুটিয়ে গেল। সমীরণের পিঠে মৃদু ঠেলা দিয়ে বাপি বলল, "চলো চলো, এইসব কিসসু যারা বোঝে না জানে না, এদের সঙ্গে..."

সেই পুরনো বড় বাড়িটাই। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে বিরাট একটা অ্যালসেশিয়ান দেওয়ালের কড়ার সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা। উপুড় হয়ে শুয়ে, চোখ বোজানো। পায়ের শব্দে একটা চোখ খুলে শুধু তাকাল। ওঠার সময় সমীরণের মনে পড়ল সুবোধ ধাড়ার কথাটা, "বিনুকে কাল আমিই আমার বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলে রেখেছি চন্দননগরে।" আর এই ছেলেটা সবে যখন বলছিল, "বিনু জন তো," ঠিক তখনই বাপি খিঁচিয়ে উঠে ওর মুখ বন্ধ করে দিল।

বিনুকে আনিয়ে বটা বিশ্বাস তার ওপর চাপ তৈরি করে রাখতে চায়। তারপর আলবুকার্ক, তারপর কানাইলও আসবে। একটা বিষাক্ত আবহাওয়া তৈরি করে বটা বিশ্বাস তার দমবন্ধ করে দেবে। পারস্পরিক দোষারোপ শুরু হবে, খবরের কাগজে বেরোবে কে কার বিরুদ্ধে কী বলল আর তার জবাবে আর-একজন কী বলল। মেজাজ নষ্ট হবে, খেলায় স্ফূর্তি আসবে না। সাপোর্টাররা অকথ্য ভাষায় গাল দেবে।

হলঘরে দুটো সোফায় চারজন লোক বসে। সমীরণ চারজনকেই চেনে। ক্লাবটা এখন এরাই চালায়। বটা বিশ্বাস হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে একটা টাইপ করা কাগজ পড়ছিলেন। বয়স দেখে মনে হয় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, আসলে পঞ্চান্ন। গোলাকার মুখ, পাঞ্জাবির নীচে পেটের কাছে ফুলে রয়েছে চর্বি, গায়ের রং খুবই ফরসা, ডান হাতের আঙুলে পলা ও পোখরাজ বসানো দুটি আংটি। লোকটি সৌম্যদর্শন, কথা বলেন ধীরে। হাতের কাগজটা রেখে চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে সমীরণের দিকে তাকালেন। ধীরে-ধীরে মুখ ভরে গেল অনাবিল হাসিতে।

"কাল এসেছিস অথচ খবর দিসনি। ফোনেও তো জানাতে পারতিস।" সস্নেহ অনুযোগ করলেন বটা বিশ্বাস। নিজের পাশে বসানোর জন্য সোফায় চাপড় দিতে-দিতে বললেন, "বোস, বোস।"

"কাল বাড়ি ফিরলামই তো রাত্রে। খুব টায়ার্ড ছিলাম।" সমীরণ বসার আগেই সতর্কভাবে বলল। বটা বিশ্বাস সব খবরই রাখে সুতরাং আড়াল দিয়ে কথা না বলাই ভাল।

"টায়ার্ড তো হওয়ারই কথা। স্টেশন থেকে দুলালের ব্যাঙ্ক, তারপর দমদমে প্রধান অতিথি, ধকল তো কম নয়।" বটা বিশ্বাস মিটিমিটি হাসছেন।

লোকটার কাছে এইসব খবরও পৌঁছে গেছে! আশ্চর্য বোধ করছে, এটা কোনওভাবেই যাতে মুখে ফুটে না ওঠে সমীরণ সেই চেষ্টায় সফল হল। মুখটা ব্যাজার করে বলল, "তার ওপর রাতে আবার ঘুনুদার ঘ্যানঘ্যানানি শুরু হল।"

বটা বিশ্বাস বিস্ময় প্রকাশ করলেন না ঘুনু নামটা শুনে। ঘুনু প্রসঙ্গ না তুলে খুবই স্বাভাবিক গলায় বললেন, "এ-বছর সারথিতেই তো থাকবি?"

প্রশ্ন বা উৎকণ্ঠা নয়, বটা বিশ্বাসের বলার ভঙ্গিটা যেন একটা বিবৃতি শুরু করার মতো। "প্রচুর দেনা রয়ে গেছে গত বছরের। এই দ্যাখ, ব্যাঙ্ক তাগিদ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। কীভাবে যে এবার টিম করব ভেবে পাচ্ছি না।"

"সুদে-আসলে এগারো লাখ ব্যাঙ্ক এখন পাবে।" শুকনো গলায় বটা বিশ্বাসের পাশে বসা সহসচিব অপূর্ব মজুমদার বললেন।

সমীরণ এই ধরনের কথা গত বছরও দলবদলের আগে শুনেছে। তখন ধারের অঙ্কটা ছিল আট লাখ। এখন যে কাগজটা দেখাল সেটা সত্যিই ব্যাঙ্কের চিঠি কি না তাতে সন্দেহ হলেও সে চুপ করে রইল।

"তুই তো ঘরের ছেলে, যা দেব তাই নিবি সোনামুখ করে। কিন্তু সবাই তো তা নয়।"

"সবাই তো সমীরণ গুপ্ত নয়।" অন্য সোফায় বসা অভয় কুণ্ডু নিজেকে তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলেন বটা বিশ্বাসের সঙ্গে।

"তুই ছিলিস না, কী অসুবিধেয় যে পড়েছিলাম। কাকে-কাকে নেব, কাকে-কাকে ছেড়ে দেব, এই নিয়ে কথা বলার লোকই পাচ্ছিলাম না। নির্মলকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বিপ্লব বোস, গৌতম চ্যাটার্জিকে যাত্রী থেকে নিতে বলল। বোঝ, ও দুটো কি প্লেয়ার! একটার তো ডান পা বলে কিছু নেই, শুধু পারে লম্বা লম্বা দৌড়। আর অন্যটা ফুলবাবু, সাজিয়েগুজিয়ে পায়ে বল পৌঁছে দিলে তবেই তিনি নড়বেন। মডার্ন ফুটবল এইসব প্লেয়ার দিয়ে কি খেলা যায়?"

বটা বিশ্বাসের মুখে 'মডার্ন ফুটবল' কথাটা শুনে সমীরণ হাসি চাপল।

"মডার্ন ফুটবলে সারাক্ষণই তো দৌড়োদৌড়ি করতে হবে," অভয়ের সংযোজন।

সোফায় বসা চতুর্থজনের দিকে মাথা হেলিয়ে বটা বিশ্বাস বললেন, "পুলকেশবাবু ছোট টিমের চারটে ছেলের নাম

দিয়েছেন। ওদের অ্যাডভান্স করা হয়ে গেছে।"

"বাইরে থেকে কাকে পাচ্ছেন, কানাইলের ট্রান্সফার নিয়ে নাকি প্রব্লেম হচ্ছে ?" সমীরণ জানতে চাইল। দল গড়ার ব্যাপারে গত তিন বছরে কখনও তার মতামত বা পরামর্শ কেউ চায়নি। এইবার তাকে খাতির দেখাবার এই ভানটায় তার ভেতরটা কাঠ হয়ে উঠল।

"কানাইলের কেসটা একটু কমপ্লিকেটেড। এ. আই. এফ. এফ জানিয়েছে, কানাইল ওর অফিস থেকে লোন নিয়েছে, টাকা শোধ না করা অবধি রিলিজ অর্ডার অফিস দেবে না। সরকারি অফিস তো, তাই ফ্যাচাং আছে। আলবুকার্কের এগেনস্টে রয়েছে সন্তোষ ট্রোফির খেলায় রেফারির ম্যাচ রিপোর্ট, আর বিনু জন ইন্টার স্টেট ট্রান্সফার চেয়েছে বাংলা আর মহারাষ্ট্রে। এটা তো হয় না। দুটো স্টেটে খেলতে চাইলে পারমিশন দেবে কী করে ?" বটা বিশ্বাস অসহায়ভাবে সবার মুখের দিকে একবার করে তাকালেন। সবাই মাথা নেড়ে তাদের অসহায়তাও বুঝিয়ে দিল।

সমীরণ খটকায় পড়ে গেল। সুবোধ ধাড়া যে বললেন বিনু এসে গেছে ? কিন্তু উনি তো বাজে কথা বলার লোক নন। ঠিক এই সময়ই বছর-বারোর একটি ছেলে ভেতর থেকে হলঘরের দরজায় এসে বলল, "বাবা, চন্দননগর থেকে একজন ফোন করেছে।"

অভয় কুণ্ডু প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। হাত তুলে তাকে নিরস্ত করে বটা বিশ্বাস সোফা থেকে উঠলেন। "ব্যস্ত হতে হবে না, আমিই ধরছি।"

বটা বিশ্বাস ফোন ধরতে গেলেন। ঘরে সবাই চুপ করে বসে রইলেন। নীরবতাটা অস্বস্তিকর লাগায় সমীরণ অভয় কুণ্ডুকে বলল, "সুখেনদা থাকছেন তো ?"

সুখেন কর সারথির কোচ। বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, দরদি। কথা কম বলেন এবং ডিসিপ্লিন সম্পর্কে নোভাচেকের মতোই কঠোর। গত বছর মাঠে এসেও, শরীর ভাল নেই বলে ট্রেনিংয়ে না নামায় দুলাল চক্রবর্তীকে সাতদিন ট্রেনিং করতে দেননি সুখেন কর। তাই নিয়ে জোট বেঁধে দুলালের নেতৃত্বে কয়েকজন বয়স্ক ফুটবলার ছোটখাটো একটা বিদ্রোহ করে ফেলেছিল। বটা বিশ্বাসের মধ্যস্থতায় বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

"নিশ্চয়। সুখেন কর ছাড়া আর কারও কথা আমরা ভাবছিই না। তবে নির্মাল্যরা চাইছে হেমন্ত গাঙ্গুলিকে। আরে, যার কোনও কোচিং ডিগ্রি-ডিপ্লোমা নেই সে কিনা সারথির মতো ক্লাবে কোচ হবে !" অভয় কুণ্ডু আকাশ থেকে পড়তে শুরু করলেন।

সমীরণের মনে পড়ল, সুবোধ ধাড়াও ঠিক একই ভাবে অজয় তালুকদারকে যাত্রীর কোচ করার বিপক্ষে এই যুক্তিটাই দিয়েছিলেন। একই মানসিকতা দুটো ক্লাবে। ডিগ্রি-ডিপ্লোমার প্রতি এত ভক্তি, মডার্ন ফুটবলের জন্য এত ব্যাকুলতা অথচ ক্লাব চালাতে লক্ষ-লক্ষ টাকা দেনা না করে এরা থাকতে পারে না।

"অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে কি হায়ার সেকেণ্ডারি ফেল-মারা কোনও ছাত্রের পড়ার সুযোগ পাওয়া উচিত ? যদি পায় বুঝে নিতে হবে, সে সুযোগ পাচ্ছে খুঁটির জোরে, নিয়মবহির্ভূতভাবে। হেমন্ত সম্পর্কে আমার কোনও অ্যালার্জি নেই। কিন্তু আমাদের তো সারথির স্বার্থের কথাটাই ভাবতে হবে। ও যখন যাত্রীতে খেলত তুই তখন গড়ের মাঠ চোখে দেখিসনি। তখন সারথিকে একটা ম্যাচে দু' গোল দিয়েছিল। আমাদের মেম্বার গ্যালারির দিকে কি অশ্লীল অসভ্য অঙ্গভঙ্গি যে হেমন্ত সেদিন করেছিল তা আজ পনেরো-ষোলো বছর পরও চোখে ভাসছে। ওর পরিচয় তো যাত্রীর ছেলে হিসাবেই। সারথির মেম্বাররা ওকে মোটেই মেনে নেবে না।"

"মেম্বাররা চায় ট্রোফি। ট্রোফি পাইয়ে দিলে কোচ কার ছেলে
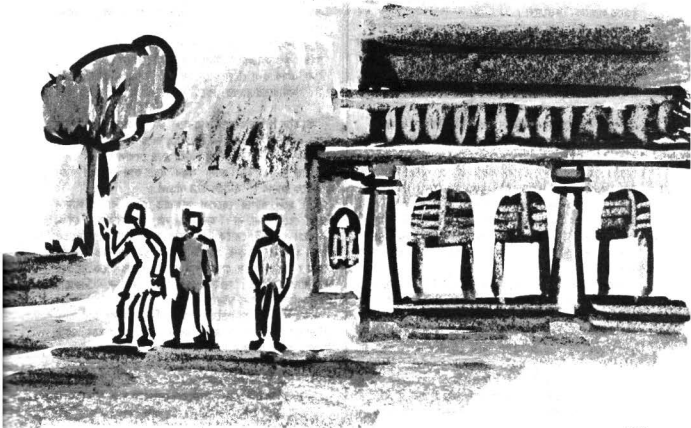
কার নাতি এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।" সমীরণ বিরক্তি চেপে বলল।

এবার পুলকেশবাবু আসরে নামলেন। চাপা গলায়, খুবই গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "বাংলার কোচ হয়ে হেমন্ত সন্তোষ ট্রোফি নিয়ে এল মাদ্রাজ থেকে, সে তো স্রেফ চুরি করেই, বাঁকা পথে। এখন এ. আই. এফ. এফ সেক্রেটারি পদ্মনাভন তো মাদ্রাজেরই লোক। সে তো বলেইছে, বাংলাকে এর মাশুল গুনতে হবে। সেই হেমন্তকে সারথির কোচ করলে, তুমি কি ভেবেছ পদ্মনাভন খুব গদগদ হয়ে আমাদের সুনজরে দেখবে?"

"কানহিল, আলবু, বিনুর ক্লিয়ারেন্সে নো অবজেকশন লিখে দেবে?" অভয় কুণ্ডুর সংযোজন।

ঘরে ফিরে এলেন বটা বিশ্বাস। ওরা দু'জন জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। সমীরণকে একপলক দেখে নিয়ে বটা বিশ্বাস বললেন, "না, তেমন কিছু নয়। ওখানে থাকতে একটু অসুবিধে হচ্ছে......কলকাতায় আসতে চায়। হ্যাঁ, ভাল কথা সমীরণ, ঘুনু তোকে যে অফার দিয়েছে, জানি, আমি জানি কত টাকা বলেছে, কিন্তু অত টাকা সারথি তোকে দিতে পারবে না।" বটা বিশ্বাস ব্যাঙ্কের চিঠিটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে হাতে রেখে বললেন, "গতবারের থেকে বিশ হাজার বেশি দেব।"

"তার মানে পুরো দেড় লাখ।" অভয় কুণ্ডুর সংযোজন।

সমীরণ তখন মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। তার মাথায় ঘুরছে চন্দননগরের ফোন। বিনু জনই করেছে। ধাড়াদা বাজে কথার লোক নন। ওখানে বন্ধুর বাড়িতে তিনিই বিনুকে তুলে রেখেছেন।

"তোকে কবে ক্যাম্পে ফিরতে হবে?" বটা বিশ্বাস জানতে চাইল।

"বাইশের মধ্যে কোঝিকোড় ফিরতে হবে।"

"তা হলে তো আর মাত্র ক'টা দিন।" পুলকেশবাবু ক্যালেণ্ডার খুঁজতে লাগলেন দেওয়ালে।

"বটাদা, যাত্রী কিন্তু আমায় অনেক বেশি অফার দিয়েছে।"

"দিক না, দেবী আর রণেনকেও তো দু' লাখ আশি হাজার করে অফার দিয়েছে, ওরা তিন লাখ করে চেয়েছে। পতু ঘোষ ভাববার জন্য সময় নিয়েছে। আমি সময়টময় নিইনি। দু' জনকেই বলেছি দু' লাখ দশ হাজার, অ্যাডভান্স চল্লিশ হাজারের চেক এখুনি দেব। ওরা চেক নিয়ে গেছে।"

"চেক নিয়ে গেছে?" সমীরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।"

"শুধুই কি নিয়ে গেছে, খবরের কাগজে স্টেটমেন্ট দিয়ে দেবী বলেছে, শত প্রলোভনেও দল ছাড়ছি না, ক্লাব এখন রক্তে মিশে গেছে। হ্যাঁ, ক্লাব যদি অবহেলা করত তা হলে একটা কথা ছিল কিন্তু যেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছি তাতে আমাদের ক্ষোভ থাকার কথা নয়। আমাদের অনুরোধেই সুখেনদাকে কোচ করা হয়, প্রতি ম্যাচে দল গড়ার সময় আমাদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে, এবারেও ক্লাব নির্বাচনের ডামাডোলে কর্তারা ব্যস্ত কিন্তু আমাদের অনুরোধ মেনে চল্লিশ হাজার করে ধার চাইতেই বটাদা ধার দিয়ে দিলেন,........"

মৃদুমন্থর কণ্ঠ পুলকেশবাবুর কথা কেড়ে নিয়ে অভয় কুণ্ডু উচ্চগ্রামে বেগসঞ্চার করে যোগ করলেন, "এত গুরুত্ব, এত ভালবাসা আর কোথায় পাব, টাকাটাই তো জীবনের সব নয়, লক্ষ লক্ষ সারথি সমর্থকের ভালবাসার দাম কি টাকায় হয়?" অভয় কুণ্ডু নিজেকেই প্রায় হাততালি দিয়ে ফেলছিলেন। সেটা না করে, বটা বিশ্বাসের দিকে আপ্লুত চোখে শুধু তাকালেন।

শুনতে-শুনতে নিলু গড়গড়ির বক্তৃতা সমীরণের মনে পড়ছিল। কলকাতার ফুটবল মরে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। গড়গড়ি বলেছিলেন, গত বছর কাগজে পড়ি একজন বড় প্লেয়ার ক্লাবে থেকে যাবে বলে অ্যাডভান্স নিয়ে বলেছিল এই ক্লাবের তাঁবু তার কাছে মন্দিরের মতো কিন্তু তিনদিন পরই সেই ফুটবলার আর-এক বড় ক্লাবের এক কর্তার ফ্ল্যাটে গিয়ে টাকাপয়সা নিয়ে দরাদরি করছে। এটাই হল দুর্গন্ধ।

সমীরণের গা গুলিয়ে উঠল। গত বছরের ওই ফুটবলারটি আর কেউ নয়, দেবী। তার মনে হল, পুরনো এই বাড়ির হলঘরটা যেন একটা মর্গ, শবাগার। এই লোকগুলো এক-একটা ডোম। এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে সে বমি করে ফেলবে।

"যাত্রীতে গিয়ে কিন্তু তুই খেলতে পারবি না। বিরাট ঝগড়া, গোলমাল, কামড়াকামড়ি চলছে, সারা বছরই চলবে। তোর খেলা ও-ক্লাবে গেলে শেষ হয়ে যাবে। টাকা কম দেবে সারথি, তোর দামের থেকে অনেক কম। এখানে কিন্তু নিজের খেলাটা খেলতে পারবি।" বটা বিশ্বাস তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। সমীরণ মাথা নিচু করে দ্রুত ভেবে চলেছে। বটা বিশ্বাস ধরে নিলেন, এই নীরবতার অর্থ, সম্মতি।

"ওপরের তিনটে ঘরে এখন রয়েছে প্রফুল্ল, মানিক, অরবিন্দ আর সতু। তুই প্রফুল্লর ঘরে চলে যা। প্রথম দিন এখান থেকেই সই করতে যাবি। তোকেও অ্যাডভান্স দিচ্ছি চল্লিশ হাজার।"

সমীরণ শুনতে-শুনতে থ' হয়ে গেল। এখানে বন্দি হয়ে থাকতে হবে! ব্যাপারটাই তো লজ্জার, অপমানেরও। সে কি গাধা না গোরু? তাকে বিশ্বাস করে এরা ছেড়ে রাখতে চায় না।

"এখানে বাপির ছেলেরা রয়েছে। যাত্রী কোনওরকম হাঙ্গামা হুজ্জুত করতে আসবে না, তা হলেই চেম্বার বেরোবে এটা ওরা জানে। তোফা খাবিদাবি, ঘুমোবি, ভিডিও-র সিনেমা দেখবি, পঞ্চাশটা হিন্দি-ইংরেজি মারপিটের ফিল্মের ক্যাসেট রয়েছে, কত দেখবি দেখ না! একদমই বোর লাগবে না।" গৃহকর্তা অভয় কুণ্ডু দরাজ স্বরে আতিথ্য গ্রহণের আহ্বান জানালেন।

"বটাদা, পিসিমার সঙ্গে কথা না বলে এখন আমি কথা দিতে পারব না।"

বটা বিশ্বাসের ভ্রূ কুঁচকে উঠেই স্বাভাবিক হয়ে গেল। "এজন্য তোকে পিসিমার সঙ্গে কথা বলতে হবে?"

পুলকেশবাবু বলে উঠলেন, "তা কী করে হয়।"

অভয় কুণ্ডু বললেন, "টেলিফোনে কথা বলে নে।"

"না, এসব কথা টেলিফোনে হয় না। আমাকে বাড়ি যেতেই হবে।" সমীরণের দৃঢ়স্বর বুঝিয়ে দিল তার সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না।

"তা হলে পিসিমার সঙ্গে কথা বলে আয়। অভয়বাবু, বাপিকে ডাকুন একবার, সমীরণকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার সঙ্গে করেই নিয়ে আসুক।" বটা বিশ্বাসকে হঠাৎই ক্লান্ত দেখাল।

"আজ রাতে আর আসা সম্ভব নয়, কাল সকালে এসে আপনাকে জানাব।" সমীরণ উঠে দাঁড়াল।

"তা হলে বাপির ছেলেরা সারারাত তোর বাড়ির সামনে পাহারা দেবে। না, না। অন্য কিছু নয়, ওরা সারথিকে যেমন ভালবাসে তেমনই তোকেও। তোর জন্য ওরা প্রাণ দিতেও পিছপা হবে না, তেমনই প্রাণ নিতেও। তুই সারারাত নিশ্চিন্তে থাকবি।" বটা বিশ্বাস সোজা সমীরণের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল শীতল দৃষ্টিতে। সমীরণ চোখ সরিয়ে নিল না। নিরুচ্চার একটা চ্যালেঞ্জ বিনিময় ঘটল।

অভয় কুণ্ডুর অ্যাম্বাসাডরের পেছনের সিটে সমীরণ আর বাপি, ড্রাইভারের পাশে নারান নামে একটি ছেলে। পেছনে একটা ট্যাক্সিতে আরও তিনজন।

সিগারেট বের করার ছলে বাপি বুশশার্ট তুলে প্যান্টে গোঁজা পিস্তলটা বের করে সিটে রাখল।

"ওটা দেখাবার দরকার নেই, যথাস্থানে রেখে দাও।"

"না না, তোমাকে দেখাচ্ছি না।" বাপি অপ্রতিভ হয়ে ওটা

তুলে নেয়। "তোমার জন্য তো নয়, নিজেদের সেফটির জন্য এটা রাখতে হয়।"

এর পর সারা পথটাই সমীরণ সীটে হেলান দিয়ে বাঁ হাত কপালের ওপর রেখে চোখ বুজে রইল।

বাপি আর নারান মাঝে-মাঝে নিজেদের মধ্যে কথা বলেছিল কিন্তু সমীরণের কানে তার একটা শব্দও ঢোকেনি।

॥ ৭ ॥

মোটর থেকে নেমেই সমীরণ ফটক খুলে ভেতরে এসে ডোর-বেলের বোতাম টিপল। সব জানলায় পরদা টানা, খাবার দালানে শুধু আলো। পেছনে তাকিয়ে দেখল ফটকের সামনে পাঁচজন দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। সময় দেখার জন্য বারান্দার কিনারে এসে রাস্তার আলোয় বাঁ হাতটা তুলল। আটটা বেজে দুই।

রাস্তা নির্জন। এখন টিভি-তে সিনেমা দেখানো হচ্ছে তাই একেবারেই শুনশান। তাদের দু' পাশের বাড়িগুলোর জানলা বন্ধ মশাদের ঢোকা আটকাতে।

আবার সে বেল বাজাল। বাড়িতে কি কেউ নেই ? দরজার পাল্লায় কান লাগিয়ে সাড়াশব্দ পাওয়ার চেষ্টা করল। পিসির ঘরে বসে সবাই টিভি দেখতে থাকলে, অন্তত হিন্দি সিনেমার নাচগান কি মারপিটের আওয়াজ তো ভেসে আসবে। তাও আসছে না। টিভি বন্ধ।

হঠাৎ দরজার পাল্লা খুলে গেল। সুনীলবরণ। বাবাকে দেখে সমীরণ হতভম্ব।

"কী ব্যাপার, আপনি ? ওরা সব গেল কোথায় ?" একবার পেছনে তাকিয়ে, ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সমীরণ বলল। সব ঘর অন্ধকার, শুধু আলো জ্বলছে খাবার দালানে।

"কানু, মলা আর রেখা গেছে অনিরুদ্ধ ভটচাজমশায়ের বাড়িতে। ভদ্রলোক সাইকেলের ধাক্কায় পা ভেঙেছেন বিকেলে। ওরা দেখতে গেছে।" সুনীলবরণ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন।

সমীরণ দ্রুত ভাবতে শুরু করল। এখন কী করা যায়। কার্যত সে এখন গৃহবন্দি। বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই ওরা তাকে জোর করে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে। সকালে ওদের পাহারাতেই বটা বিশ্বাসের খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকতে হবে।

অসম্ভব।

যদি বলি সারথিতে খেলব না, তা হলে জোর করে আটকে রাখতেও পারে। কিন্তু বাইশের মধ্যেই তাকে কোঝিকোড় পৌঁছতে হবে, যেভাবেই হোক। ইণ্ডিয়া টিমের জন্য ক্যাম্প তো টানা সারা বছর ধরে চলবে না, প্লেয়ারদের ছেড়ে দেবে। তখন কলকাতায় এসে খেলতেই হবে। সমীরণ দোটানায় পড়ল। খেললে হয় সারথিতে, নয় যাত্রীতে। দুটো ক্লাবের যেটাতেই সে খেলুক, আই এফ এ-তে নাম রেজিস্টার্ড করতেই হবে। সে শুনেছে ক্যাম্পের প্লেয়ারদের জন্য নিয়ম হয়েছে নির্দিষ্ট দিনের পরেও এটা করা যাবে।

সে ঘরে গিয়ে সন্তর্পণে জানলার পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল। একজনকে দেখতে পেল, রাস্তার ওধারে রঙের ব্যবসায়ী অমিয় চাটুজ্যের ফটকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। বাকি চারজনকে সে দেখতে পেল না। বোধ হয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একসঙ্গে সবাই জটলা করলে লোকে সন্দেহ করতে পারে ডাকাত বলে। তবে সমীরণ নিশ্চিত, এখানকার সব লোকই শিক্ষিত, অতএব ডাকাত ধরার চেষ্টা করবে না। সেজন্য একটু সাহস দরকার।

কিন্তু এভাবে কোনও ক্লাবে খেলার কথা এখন সে ভাবতে পারছে না। যদি সকালে ওদের সঙ্গে যেতে সে অস্বীকার করে ? সমীরণ বুঝে উঠতে পারছে না, তা হলে কী ঘটনা তখন ঘটতে পারে। শুনেছে বছর ছ'য়েক আগে নাকি হেদায়েত আলিকে নিয়ে এইরকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল। যাত্রীতে যেতে চেয়েছিল হেদায়েত, জুপিটার তাকে সুবোধ ধাড়ার পটলডাঙার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছল বোমা ফাটিয়ে। রাস্তার একটা লোক তাইতে মারাও যায়। ধাড়ার একতলাটা তছনছ করে দিয়েছিল।

যদি এরাও তাই করে ! সমীরণের মাথার মধ্যে অসাড় হয়ে আসছে। অন্ধকার ঘরে খাটে বসে সে দু' হাতে মাথা চেপে ধরল। কেউ তাকে চাপা স্বরে এখন পরামর্শ দিল, "পালিয়ে যা, এখান থেকে যেভাবেই হোক, পালিয়ে যা। আজ রাতেই।" বটা বিশ্বাসের কথাটা এখন ভীষণভাবে তার মনে পড়ল। "তোর জন্য ওরা প্রাণ দিতেও পিছপা হবে না। তেমনই প্রাণ নিতেও।" কথাগুলোর মানে খুবই স্পষ্ট।

বাবা, পিসিমা, কানু, মলা, এদের আহত রক্তাক্ত দেহ পলকের জন্য তার চোখে ভেসে উঠেই অদৃশ্য হল। সে ফিসফিসিয়ে নিজেকেই বলল, 'আমার জন্য এরা কেন বিপদে পড়বে ? হতে পারে না, তা হয় না। এদের বাদ দিয়ে আমি কেউ নই, আমার কোনও অস্তিত্বই থাকবে না।'

সমীরণ খাট থেকে উঠে আবার পরদা সরিয়ে দেখল। একজনও নেই। ব্যাপার কী ! ওরা কি চলে গেল ? দোতলার ছাদে গিয়ে কি একবার দেখবে ? এইসব যখন সে ভাবছে, তখন ধীর গতিতে কথা বলতে-বলতে দু'জন বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। একজনকে সে চিনল, নারান।

ওরা তা হলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারারাতই কি ওরা ঘুরবে ? সমীরণ ভেবে কূলকিনারা পেল না। সে পায়চারি শুরু করল।

হঠাৎ ডোর-বেল বেজে উঠল। সমীরণ লাফ দিয়ে পরদা সরিয়ে তাকাল। রাস্তা ফাঁকা। টিভি-তে হিন্দি খবর পড়ার শব্দ আসছে। বারান্দার একটা কোণ দেখা যায় কোনওক্রমে। তার মনে হল পিসিরা বোধ হয় ফিরল।

দ্বিতীয়বার বেল বাজার সঙ্গেই দরজা খুলল সমীরণ। পিসি, মলা আর কানু দাঁড়িয়ে। প্রথমেই সে তিনজনের পেছনে ফটকের দিকে তাকাল। মনে হল রাস্তায় কেউ একজন সরে গেল।

"আর বলিসনি, ভটচাযদার যা কাণ্ড ! পায়ের ওপর দিয়ে সাইকেল রিকশার চাকা চলে গেছে !" রেখা গুপ্ত হাসি চাপতে-চাপতে বললেন।

"এমন চেঁচাচ্ছেন যেন পা'টা দু' খণ্ড হয়ে গেছে।" শ্যামলা বলল।

"দাদা, তোর কথাবার্তার কতদূর ? কত অফার দিল ?" হিমাদ্রি জানতে চাইল।

"বোসো সবাই। বিপদ হয়েছে। রাস্তায় কি কাউকে ঘুরে বেড়াতে দেখলে ? সমীরণের চাপা স্বর আর উৎকণ্ঠিত মুখ দেখে তিনজনের মুখের ভাবও বদলে গেল।

"কেন, কী বিপদ হয়েছে ?" রেখা গুপ্তর গলা অজানা ভয়ে কেঁপে গেল।

"রাস্তায় দুটো লোক দেখলাম আমাদের পেছন-পেছন আসছিল। আর ওই মোড়ে কুকুরওলা বাড়ির কাছে একটা লোক ছিল। তা ছাড়া তো আর কাউকে দেখলাম না !" শ্যামলা মনে করার চেষ্টা করতে-করতে বলল।

"ওই লোকগুলো গুণ্ডা, পাঁচজন রয়েছে, বটা বিশ্বাসের লোক ওরা, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।"

"অ্যাঁ, কেন ?"

"আস্তে কথা বলো, পিসি।" শ্যামলা চাপা ধমক দিল।

"ওরা সারারাত আমার ওপর নজরদারি করবে। কাল সকালে আমাকে সঙ্গে করে আবার বটা বিশ্বাসের কাছে নিয়ে যাবে।"

"কেন ?" হিমাদ্রি জানতে চাইল।

"আমাকে সারথিতেই খেলতে হবে। ওরা ছাড়বে না। পিসির সঙ্গে কথা বলে কাল সকালে জানাব এই কড়ারে বাড়ি এসেছি। ওরা সঙ্গে এসেছে। পাছে আমি পালিয়ে যাত্রীর ঘরে গিয়ে উঠি, তাই সেটা আটকাবার জন্য ওরা রয়েছে। একজনের কাছে পিস্তল আছে দেখেছি।" সমীরণ ধীর নিচু গলায় কথাগুলো বলল। কেউ কোনও কথা বলল না। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং চমকে কথা বলার অবস্থা কারও নেই।

"এটা কি মগের মুল্লুক ?" হিমাদ্রি গজরে উঠল। "আমার ইচ্ছেমতো কি কোথাও খেলতে পারব না ? ঘাড় ধরে খেলাবে আর আমায় খেলতে হবে ?"

সমীরণ ভাইয়ের মুখের দিকে শুধু নীরবে তাকিয়ে রইল। রেখা গুপ্ত ব্যাকুলভাবে বললেন, "পুলিশে খবর দিলে হয় না ?"

"পুলিশ কী করবে ?" সমীরণ বলল।

"ওদের অ্যারেস্ট করবে।"

"কোন অপরাধে ?"

"তোকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে বলে।"

"প্রমাণ কই যে, ধরে নিয়ে যেতে এসেছে ? পুলিশ শুধু তো অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে অ্যারেস্ট করতে পারে না।" সমীরণকে হতাশ দেখাল। "তা ছাড়া ওরা তোমাদের ওপরও হামলা করতে পারে। আমি যদি এখন পালিয়ে যেতে পারতাম—।"

"আচ্ছা পিসি, তোমাদের জি. সি. দত্ত তো পুলিশ অফিসার ছিলেন, ওঁকে বলে দেখলে হয় না ?" শ্যামলা বলল।

"তিনি কী করবেন ?" হিমাদ্রি কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যভরে জানতে চাইল।

"উনি তো বলেন খোকাগুণ্ডা না কাকে যেন পিস্তল সমেত ধরে ফেলেছিলেন। তা এখানেও তো পিস্তল নিয়ে একজন রয়েছে তাকে এসে ধরুন না, আর দাদাও বাড়ি থেকে সেই ফাঁকে বেরিয়ে যাবে।" শ্যামলা খুব সহজ একটা সমাধান পেশ করে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগল।

"এই রাতে বেরিয়ে কোথায় যাবে ?" হিমাদ্রি বিশদ হতে চাইল।

"কোথাও একটা... ...এখানেই কারও বাড়িতে।" আমতা-আমতা করে শ্যামলা বলল।

"তারপর ?" সমীরণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"মলা ঠিকই বলেছে, দত্তবাবু ধরুন বা না-ধরুন, ওদের ভয় তো দেখাতে পারবেন।" বলার সঙ্গে-সঙ্গেই রেখা গুপ্ত ফোনের কাছে উঠে গেলেন।

"পিসি তুমি এদের চেনে না।" সমীরণ উঠে এল। "এদের ভয় দেখানো দত্তবাবুর কর্ম নয়।"

রেখা গুপ্ত ততক্ষণে ডায়ালে পঞ্চম সংখ্যাটি ঘুরিয়ে ফেলেছেন। সমীরণ হালছাড়া ভাবে ঘরে এসে পরদা সরিয়ে বাইরে তাকাল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওদের কাউকে দেখতে পেল না। তার বদলে স্বামী-স্ত্রী আর একটা বাচ্চা ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখল। ছাদে গিয়ে পাঁচিলের আড়াল থেকে কাউকে দেখা যায় যদি, এই ভেবে সে সিঁড়ির দিকে এগোল। পিসির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে শুনল—"তা হলে আর বলছি কী, দারুণ গুণ্ডা, আপনি যেমনটি পছন্দ করেন ঠিক সেইরকম।"

"পিসি বলো পিস্তলও আছে।" শ্যামলার ব্যগ্র স্বর।

"না, ওসব বললে দত্তবাবু খেপে যেতে পারেন।" রিসিভারে হাতচাপা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে পিসিকে বলতে শুনল সমীরণ, সিঁড়িতে ঘোরার সময়।

সুনীলবরণের ঘরের দরজায় পরদা ঝুলছে। সামান্য ফাঁক, তার মধ্যে দিয়ে একনজরে সমীরণ দেখতে পেল টেবিলে ঝুঁকে বাবা কিছু লিখছেন। মোটা দু'খানা বই খোলা রয়েছে। সন্তর্পণে দরজা পার হয়ে গুঁড়ি মেরে সে চোখ দুটি শুধু পাঁচিলের কিনারে রাখল।

বাঁ দিক থেকে তিনজন বেড়াবার মতো শ্লথভঙ্গিতে আসছে। দূর থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এল, "অ্যাই, অ্যাই।"

ওরা তিনজন ঘুরে দাঁড়াল। সমীরণ মুখটা একটু তুলে দেখতে পেল, লুঙ্গি আর গেঞ্জিপরা জি. সি. দত্তর দশাসই চেহারাটি বেগিং-এর গতিতে এগিয়ে আসছে।

"কে তোমরা, এখানে এত রাতে কী করছ ?" দত্তর উচ্চ স্বরে দুটো বাড়ির বারান্দায় লোক টেনে আনল, একতলার জানলা খুলিয়ে দিল।

তিনজন কী জবাব দিল সমীরণ তা শুনতে পেল না। দত্ত যে জবাবে একদমই সন্তুষ্ট হননি, সেটা তাঁর আচরণে প্রকাশিত হল। খপ করে তিনি পুলিশি কায়দায় দু'জনের জামার কলার ধরলেন।

"আমাকে ধোঁকা দেবে ? তোমাদের উদ্দেশ্য আমি বুঝিনি ভেবেছ ? এত বছর পুলিশে—" কথা অসমাপ্ত রেখে জি. সি. দত্ত হঠাৎই কণ্ঠস্বর বদলে "অ্যাই, আই কী হচ্ছে !" বলতে-বলতে দু' হাতে লুঙ্গি চেপে ধরলেন। তারপরই 'য়্যা-আ-আ' ধরনের একটা শব্দ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে দুই হাত মাথার ওপর ওঠালেন। লুঙ্গিটি তখন তাঁর পায়ের গোছে নেমে এল।

জি. সি. দত্ত কাতরকণ্ঠে কী যেন বললেন। বাপির গলা শোনা গেল, "তুলে বেঁধে দে।"

একজন লুঙ্গিটা তুলে দত্তর কোমরে গ্রন্থিবদ্ধ করে দিল। সমীরণ এইবার দেখতে পেল বাপির হাতের পিস্তলটা। বাপি কিছু একটা বলল। দত্ত দু' হাত তোলা অবস্থাতেই ঘুরলেন। এই সময় দোতলার বারান্দাগুলো নিমিষে নির্জন হয়ে গেল, জানলার পাল্লাগুলো ফট-ফট শব্দে বন্ধ হল। বাপি ঝুঁকে দত্তর কানে কিছু একটা বলেই পিস্তলের নলটা দিয়ে খোঁচা দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে জি. সি. দত্ত দু' হাত তুলে বাড়িমুখো রওনা হলেন। একটা ব্যাপার সমীরণ বুঝতে পারছে, জি. সি. দত্ত পরোপকারী, আন্তরিক, দরাজ মানুষ; না হলে এইভাবে, ফোন পাওয়ামাত্রই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছুটে আসতেন না। কিন্তু পরিবর্তিত বাস্তবের সঙ্গে ওঁর তেমন কোনও যোগ নেই। উনি এখনও খোকাগুণ্ডার আমলেই রয়ে গেছেন, বাপিগুণ্ডাদের সম্মুখীন কখনও হননি।

ডান দিক থেকে দু'জন আসছে। সমীরণ মুখটা নামিয়ে নিল। তাদের বাড়ির সামনেই পাঁচজন দাঁড়াল। হাসাহাসি করল। একজন বলল, "আরে, এখানে শিক্ষিত লোকেরা থাকে। কেউ ঝামেলা করবে না।"

আর-একজন বলল, "বাপিদা খিদে পেয়েছে।"

"বাইরে বড় রাস্তায় দেখেছি তারামা না ফারামা নামে একটা দোকান রয়েছে, তোরা খেয়ে আয়। আচ্ছা, চল, আমিও যাচ্ছি, গোরা তুই তা হলে এখানে থাক। আবার কেউ হুজ্জত করতে এলে কিছু বলবি না, কাটিয়ে বেরিয়ে চলে আসবি।" বাপি গলা নামিয়ে কথা বলার দরকার আর বোধ করছে না। প্রতিটি কথা সমীরণ শুনতে পেল।

চারজন মন্থর গতিতে ভি আই পি রোডে মিষ্টির দোকানে খাওয়ার জন্য সুশোভন পল্লীর প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেল। সমীরণ ছাদ থেকে নীচে নামার সময় শুনতে পেল টেলিফোনে পিসি কথা বলছে।

"বলছেন কী দত্তবাবু ?...আপনি দু'জনের ঘাড় ধরে...তা হলে ওদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই ?...তা তো হবেই, আপনাকে আর চিনবে না !...হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেন কী খেলনা পিস্তল !...তাই বলুন, আচ্ছা আচ্ছা।"

টেলিফোন রেখে উদ্ভাসিত মুখে রেখা গুপ্ত কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, সমীরণ তাঁকে থামিয়ে বলল, "পিসি, ঘুনু মিত্তির যে

টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে গেল সেটা কোথায় ? মলা, তুই টুকে রেখেছিস।"

"কেন, ঘুনু মিত্তির কী করবে ?" রেখা গুপ্ত বিভ্রান্ত।

"এখন ওর বুদ্ধিটাই দরকার। বাপিদের মোকাবিলা ওকে ছাড়া সম্ভব নয়।" সমীরণ টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল।

শ্যামলা ফোন নাম্বার লেখা কাগজটা দিতেই সমীরণ ডায়াল করল।

"হ্যালো, এটা কি পতিতপাবন ঘোষের বাড়ি ?"

"হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন ?" সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন এল।

"আমার নাম সমীরণ গুপ্ত, আমি ঘুনুদার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

ওধারে কিছুক্ষণ কথা বন্ধ। ফিসফিস করে কাকে তখন বলা হচ্ছে "সমীরণ, সমীরণ গুপ্ত !"

"হ্যালো....।"

"ঘুনুদা তো এখানে নেই, বাড়িতে চলে গেছেন। আপনার কী দরকার বলুন।"

"ওঁর বাড়ির ফোন নাম্বারটা দিন, দরকারটা ওঁকেই বলব।"

নাম্বার লিখে নিয়ে ঘুনু মিত্তিরের বাড়িতে সমীরণ ফোন করল। "হ্যালো" শুনেই সে বুঝতে পারল ঘুনুদা রিসিভার তুলেছেন।

"আমি নাকু বলছি।"

"বল। বটার ছেলেরা তো তোর বাড়িতে গেছে।" নিশ্চিন্তে চিবিয়ে-চিবিয়ে ঘুনু বললেন।

"আমি সারথিতে থাকব না ঠিক করেছি। এখনই আমাকে বের করে নিয়ে যান।" কথাক'টি বলতে গিয়ে সমীরণের হাঁফ ধরল। টানটান হল হাতের পেশি। বুকের কাছে চিনচিন করে উঠল। তিন বছরের সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলতে কষ্ট তো হবেই। কিন্তু এখন দুঃখে মুহ্যমান হওয়ার সময় নেই।

ঘুনু কয়েক সেকেণ্ড সময় নিলেন কথাগুলো মগজের ভেতর দেশে চালানোর জন্য। চমকে উঠলেন না, উল্লসিত হলেন না, ধীর শান্ত গলায় বললেন, "এখন তোর পজিশনটা কী ?"

"বাড়িতে বন্দি। রাস্তায় পাঁচজন ঘোরাফেরা করছে। একজনের কাছে চেম্বার আছে।"

"অ। গোলমালের মধ্যে গিয়ে কোনও লাভ নেই। তুই যে-কোনওভাবেই হোক, আজ রাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবি ?" আমি গাড়ি নিয়ে থাকব কোথাও। এসব কাজে দেরি করতে নেই।"

"বেরনো ?" সমীরণ সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, "ছাদ থেকে বাড়ির পেছন দিকে নেমে একটা মাঠ, ইলেকট্রিকের মাঠ।"

"আলোটালো নেই তো ? অন্ধকার তো ?"

"একদম ঘুটঘুটে।"

"এখন আর বেশি কথা নয়। আমি ওই মাঠের ধারে, রাস্তায় গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব, ঠিক দুটোয়।"

"আপনি চিনে আসতে পারবেন মাঠে ?"

"আরে, আমি ঘুনু মিত্তির। তারামা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গা দিয়ে শহিদ কলোনির দিকে যাওয়ার রাস্তা, মাঠটা তো তার ওপরই ! বরেন মুখোটি ওই মাঠেই ট্রেনিং করায় না ?"

"হ্যাঁ।"

"হুঁ হুঁ বাবা, এ হল ঘুনু মিত্তিরের মেমারি। শোন, ঠিক দুটোয় নেমে আসবি। ছেলেগুলো তখন কোথায় কী অবস্থায় রয়েছে আগে সেটা দেখে নিবি। ছাড়ছি। ঠিক দুটোয়।"

তিনজন হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে। সমীরণ ব্যস্ত হয়ে বলল, "ব্যাগটা কোথায় ? শার্ট, প্যান্ট, টুথব্রাশ, চিরুনি, তোয়ালে, শেভিংকিট...পিসি হাজার তিনেক টাকা কাল কানুকে দিয়ে আমার জন্য প্লেনের টিকিট কেটে রাখবে। কানু একুশ তারিখের কোঝিকোড়ের টিকিট, ভায়া বোম্বে, একদিনেই তা হলে পৌঁছতে পারব। না পেলে বাঙ্গালোরের, ওখান থেকে ঘণ্টা দশেকের বাস-জার্নি। ঘুনুদা ঠিক দুটোয় ইলেকট্রিক মাঠের ধারে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবেন। আমি ছাদ থেকে নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠব।"

"উঠে কোথায় যাবি ?" উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন রেখা গুপ্তর।

"জানি না।"

সমীরণ ঘরে ঢুকে গেল। আলো জ্বালবে কি জ্বালবে না ভাবতে-ভাবতে জ্বেলেই ফেলল। জানলার পরদা সরিয়ে দিয়ে কাঁধে ঝোলানোর পলিথিন ট্রাভেলিং ব্যাগটা আলনা থেকে নামাল। রাস্তা থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। স্লিপিং সুট ব্যাগ থেকে বের করে নাড়াচাড়া করল। সে যে এখন ঘুমোতে যাচ্ছে, এটা যেন ওরা বুঝে যায়। আলো নিভিয়ে ডোরাকাটা পাজামা আর ঢিলে জামাটা পরে নিয়ে আবার আলো জ্বালাল। এইসব করার সময় সে একবারও বাইরের দিকে তাকাল না।

শ্যামলাকে ডেকে এক গ্লাস জল চাইল। জল খেয়ে গ্লাসটা ওর হাতে দেওয়ার সময় সে বলল, "তোরা খেতে বোস টেবিলে, আমারটা এখানে দিয়ে যা, ওদের দেখিয়ে-দেখিয়ে খাব, শোব, তুই মশারিটা ফেলে গুঁজে দিবি, আলো নেভাবি। সব যেন নর্মালি ভাবে হয়। আর শোন, ছাদ থেকে নামার জন্য একটা শাড়ি কি বেডকভার ঠিক করে রাখ। ঠিক দেড়টায়, সারা বাড়ি যেন অন্ধকার থাকে।"

॥ ৮ ॥

বাড়ি অন্ধকারই ছিল। জানলার পরদা অল্প সরিয়ে হিমাদ্রি এধার-ওধার তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, "কাউকে তো দেখছি না।"

"সর, আমি দেখছি।" শ্যামলাও রাস্তার দু'ধারে তাকিয়ে মাথা নাড়াল। কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। জানলার ধার ঘেঁষে মাথাটা চেপে, এক চোখ দিয়ে বাঁ দিকটা দেখতে-দেখতে সে এবার অস্ফুট শব্দ করে ছিটকে সরে এল।

"কী কাণ্ড ! ওরা আমাদের বাইরের বারান্দায় শুয়ে রয়েছে।"

"ভালই হয়েছে। পাঁচজনই আছে কি ?" হিমাদ্রির গলায় খুশি ফুটে উঠল।

"সবটা তো দেখা যায় না, তা ছাড়া রাস্তার আলোও তো কম।" শ্যামলার চাপা স্বর।

"দরজা জুড়ে শুয়েছে পালানোর পথ বন্ধ করার জন্য। এভাবেই যেন শুয়ে থাকে। দাদা, চটপট এবার রেডি হয়ে নে।"

"রেডিই আছি। এই স্লিপিং সুট পরেই চলে যাব। একটা বেডকভারেই তো হয়ে যাবে, আর-একটা জোড়ার দরকার কী ?"

"দরকার আছে। কানু ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেখেছে জমির অনেক ওপর পর্যন্ত থেকে যাচ্ছে। লাফিয়ে পড়লে শব্দ হবে।" রেখা গুপ্ত বেডকভারটা আঁকড়ে বললেন, "আমি আর-একটা বেঁধে নিয়েছি। ছাদে চল। আর শোন, যেখানেই যা, পৌঁছেই ফোন করে জানাবি কিন্তু।"

সুনীলবরণের ঘরের দরজা বন্ধ। চারজন নিঃসাড়ে ঘরটা পেরিয়ে পাঁচিলের ধারে এল। নীচেই বাড়ির পেছনে সরু গলি। তারপর পাঁচ ফুট উঁচু সীমানা-পাঁচিল। ওটাও সমীরণকে টপকাতে হবে এবং বহুবারই সে এটা করেছে মাঠে যাওয়ার জন্য শর্টকাট করতে গিয়ে।

বেডকভার ঝুলিয়ে হিমাদ্রি আর শ্যামলা ধরে রইল। কাঁধে ব্যাগটা নিয়ে সমীরণ কার্নিসে নেমে বেডকভার আঁকড়ে সন্তর্পণে একটা পা প্রথমে ঝোলাল। পা রাখার মতো জায়গা নেই।

"দুর্গা, দুর্গা।" পাঁচিলে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে রেখা গুপ্ত

ভাইপোর মাথা স্পর্শ করলেন।

হিমাদ্রি ও শ্যামলা প্রাণপণে টেনে রয়েছে। প্রায় সত্তর কেজি ওজনের টান সামলাতে দু'জনেরই দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।

"আহ্হ" সমীরণ কাতরে উঠল।

"কী হল নাকু ?" রেখা গুপ্ত ঝুঁকে পড়লেন।

"একটু টেনে তোল, একটা শিক, তাড়াতাড়ি, লাগছে।

রেখা গুপ্ত প্রায় লাফিয়েই এসে বেডকভার ধরলেন। তার ধাক্কায় হিমাদ্রির মুঠো আলগা হয়ে গেল। অবশ্য পিসির মুঠো ততক্ষণে শক্ত করে ধরে ফেলেছে। একটা টানেই তিনি সমীরণকে প্রায় দু' হাত তুলে নিলেন।

"কানু জিজ্ঞেস কর, আর তুলব ?

হিমাদ্রি পাঁচিলে ঝুঁকে ফিসফিস করে ফিরে এল। "এইভাবে ধরে থাকতে বলল।"

রেখা গুপ্ত বেডকভার ধরে শরীরটা প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি পেছনে হেলিয়ে দিলেন। টানটান বেডকভার হঠাৎই ঢিলে হয়ে গেল, আর রেখা গুপ্ত ছাদের ওপর চিত হয়ে পড়লেন, শ্যামলাকে বুকের ওপর নিয়ে।

"নাকু তা হলে এখন মাটিতে !" রেখা গুপ্তর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় আশ্বস্তের ভাগটাই বেশি। ধড়মড়িয়ে উঠে তিনি পাঁচিলের কাছে যাওয়ার আগেই, বেড়ালের মতো লাফিয়ে পাঁচিল টপকে সমীরণ ইলেকট্রিক মাঠে নেমে পড়েছে।

তিনজন তীক্ষ্ণ নজরে অন্ধকার চিরে-চিরে সমীরণকে খুঁজে পেল না। একটু পরে মোটর স্টার্ট দেওয়ার ক্ষীণ শব্দ পেয়ে শ্যামলা তালি দিয়ে উঠল। হিমাদ্রি বলল, "সেফলি পৌঁছে গেছে।" রেখা গুপ্ত জোড়হাত কপালে ঠেকালেন।

কিবা অন্ধকার কিবা আলো, ইলেকট্রিক মাঠটাকে সমীরণ চেনে তার হাতের রেখাগুলোর মতো। তার একটাই শুধু ভয় ছিল, কাছাকাছি কুকুরগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না। রাস্তার দিকে এগোতে-এগোতে সে খুঁজল মোটরগাড়ি। যে-মারুতিটায় ঘুনুদা এসেছিলেন নিশ্চয় সেটাতেই আসবেন। কুকুরের ডাক উঠল না, তবে ছোট্ট করে একবার হর্ন বেজে উঠল। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে থাকা মোটরের ছায়া দেখে সে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

"ঢুকে পড়।" দরজা খুলে ঘুনু মিষ্টিস্বরে ডাক দিলেন। গাড়ির এঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। সমীরণ পেছনের সিটে বসে দরজা বন্ধ করার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

"কোনও ঝামেলা হয়নি ?" ঘুনু শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন। ভি আই পি রোডে পড়ে ডান দিকে সবেগে বাঁক নিয়েই নির্জন রাস্তায় মারুতি প্রায় উড়ে চলল।

"ছেলেগুলো আমাদের বাইরের বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। কাল সকালে যখন জানতে পারবে, কী যে তখন করবে কে জানে।"

"কিছু করতে পারবে না। তোর পিসিকে যতটুকু বুঝেছি তাতে এটুকু বলতে পারি, হাড়গোড় আস্ত রেখে সবক'টা যদি ফিরে যেতে পারে তা হলে সেটা হবে ওদের বাপের ভাগ্যি।"

"ঘুনুদা, এখন কোথায় যাচ্ছি ?"

"যেখানে তুই সবথেকে নিরাপদ থাকবি, পতুর বাড়ি।"

"এতক্ষণে সমীরণের খেয়াল হল, পেছনের সিটে আর-একজন বসে রয়েছে। অন্ধকারে তাকে চিনতে পারল না।

"আমি দুলালদা।"

সমীরণ 'অ্যাঁ' বলে চমকে উঠতে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে বলল, "তুমিও সারথি ছাড়লে ?"

"হ্যাঁ। নির্মাল্যদার জেতার কোনও আশা নেই।" দুলাল মৃদুস্বরে কথাটা বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

উল্টোডাঙা মোড়, ফুলবাগান, বেলেঘাটা রোড, কনভেন্ট রোড হয়ে সি. আই. টি রোড এবং পতু ঘোষের বিরাট পাঁচতলা বাড়ির গেট দিয়ে মারুতি যখন ঢুকল তখন রাত আড়াইটে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে পর-পর দুটো দরজা। বাঁ দিকেরটির ডোর-বেল বাজিয়ে ডান দিকের দরজাটি দেখিয়ে ঘুনু বললেন, "পতুর প্রাইভেট ড্রইংরুম। অবশ্য ভেতর দিয়েও ওদিকে যাওয়ার দরজা আছে।"

ঘুম-চোখে দরজা খুলল অল্পবয়সী একটি ছেলে। ভেতরে ঢুকে সমীরণ ঘরটা দেখল। দেওয়াল থেকে দেওয়াল কার্পেট, তাতে পা ডুবে যায়, এত পুরু আর নরম। নিচু টেবিল, কৌচ, সোফা, টিভি, টেবিল ল্যাম্প, এয়ার কুলার, আলমারিতে বই, দেওয়ালে কয়েকটা পেইন্টিং, রেফ্রিজারেটর, ইনভার্টার, জানলায় মেঝে-ছোঁয়া ভারী পরদা। তার দেওয়ালে বিচিত্র লাইট শেড। এটা বসার ঘর। এর একদিকের দেওয়ালে পাশাপাশি দুটি ঘরের দরজা।

ঘুনু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "দেবু, খাবারদাবার কী আছে ?"

"বিরিয়ানি আর কড়াপাকের সন্দেশ আছে।"

"নাকু ?"

"না, না, ঘুনুদা, আমি খেয়ে এসেছি।"

"লজ্জা করিস না। এখানে অঢেল ব্যবস্থা। যা খেতে ইচ্ছে করবে দেবুকে বলবি। তুষার তো কাল থেকে শুধু ফিশফ্রাই আর চিনে খাবারই খেয়ে যাচ্ছে।"

"তুষারদা এখানে ?"

"বুকুও তো রয়েছে। কড়াপাক বোধ হয় ওর জন্যই আনা ?" ঘুনু তাকালেন দেবুর দিকে।

"আজ পঁচিশটা এনেছি, বুকুদা পনেরোটা খেয়ে নিয়েছে।"

"ভাল। গরিবের ছেলে তো, একটু খাই-খাই ভাব রয়ে গেছে। নাকু তুই দুলালের সঙ্গেই এক ঘরে থাক।" পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করলেন ঘুনু।

"আগে একটা টেলিফোন করব পিসিকে।"

"টেলিফোন ? কিন্তু ওটা তো ওদিককার ড্রইংরুমে। দরজায় চাবি দেওয়া।" ঘুনু আমতা-আমতা করলেন। "কাল সকালে করিস।"

দেবু একবার ঘুনুর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ সিলিংয়ে তুলল। দুলাল বলল, "ঘুম পাচ্ছে, আয়।"

"আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি, কথাটথা কাল হবে। অবশ্য বলার মতো কথা আর কীই-বা আছে। নিজেই এলি, এতে আমার কী আনন্দই যে হচ্ছে ! তোর কোনও ব্যাপারে কোনও অসুবিধা হবে না। ক্লাব পলিটিক্স কলকাতায় কীরকম হয় তা তো জানিসই ! সুবোধ কি সীতেশ চেষ্টা করবে তোকে ধচাবার, কিন্তু পারবে না। যা এখন শুয়ে পড়।"

ঘুনু চলে গেলেন। দুলালের সঙ্গে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই সমীরণের মনে হল কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের ঘরে যেন সে ঢুকল।

"পতুদার গেস্টরা এসে এখানে থাকে, সেইভাবেই সাজানো। কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার, কয়লা আর স্টিল...কোটি-কোটি টাকা।" দুলাল সসম্ভ্রমে বলল পাজামা পরতে-পরতে। "কিন্তু মানুষটাকে দেখে তোর মনেই হবে না, এত টাকার মালিক। ব্যবসার কাজে এখন কানপুর গেছে...তুই কতয় এলি ?"

"দুই-দশ অফার দিয়েছেন ঘুনুদা।"

"রাজি হয়ে ভালই করেছিস। সারথিতে থাকলে পুরো টাকা কখনওই পেতিস না। আমি এখনও পনেরো হাজার পাব, কিন্তু বটা বিশ্বাস আটকে রেখেছে। যাত্রী দেবে পৌনে দুই, ওখানের থেকে পঁচিশ বেশি।"

"দুলালদা, এখন এসব টাকাপয়সার কথা থাক। তিনটে বাজতে চলল, এবার শোব।" সমীরণ বালিশটা কার্পেটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বিছানা থেকে বেডকভারটা তুলে নিল।

"তুই মেঝেয় শুবি ?"

"নিশ্চয়ই। ওই ফোম রবারের ওপর শুলে আরাম পাওয়া যায়, কিন্তু শরীরটার তেরোটা বাজবে। এই এয়ার কুলারের ঠাণ্ডাটা খুবই আরামের, তবে আমার পছন্দ পাখার হাওয়া।"

"এয়ার কুলার কিন্তু আমি বন্ধ করব না।" দুলাল বেশ কড়া গলায় সমীরণকে জানিয়ে দিল।

"আলো নেভাব ?"

"হ্যাঁ।"

"আলো নিভিয়ে, স্লিপিং সুট পরা সমীরণ বেডকভারটা গায়ের ওপর টেনে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর দুলাল বলল, "সমীরণ, একটা কথা বলব ?"

"হুঁ, বলো।"

"তুই কেন জানি একটু অন্যরকম। সেজন্যই তোকে আমার ভাল লাগে। লেখাপড়া করা প্লেয়ার বা আমার মতো 'ক-অক্ষর গোমাংস' প্লেয়ার কম তো দেখলাম না, কেউ কিন্তু গভীর শ্রদ্ধা ফুটবলকে দেয় না। দিলে সে সবার আগে শরীরের যত্ন নিত, ক্ষমতা বাড়াত, স্কিল বাড়াত, ডিসিপ্লিন লাইফ্ লিড করত। কিন্তু শ্রদ্ধা যে আনব বা দেব তারও তো একটা সঙ্গত কারণ থাকা চাই। বেশিরভাগই আমার মতো গরিব ঘর থেকে এসেছে, অশিক্ষিত। সবার আগে নিরাপত্তা, টাকা, এটাই আমাদের মাথায় থাকে। এটা কি অন্যায় ?"

"অন্যায় তো নয়ই, প্রফেশনালিজ্‌মের এটাই আসল ভিত।"

"বলছিস ?"

"হুঁ। টাকার জন্যই মারাদোনা, গাওস্কর, লেন্ডল, কার্ল লুইসরা ফর্ম ধরে রাখতে প্রাণপণ করে গেছেন আর সাকসেসও পেয়েছেন। তুমি-আমি তো কোন ছার। টাকাকে অশ্রদ্ধা কোনওমতেই করা উচিত নয়। আসলে আমাদের পরিবেশটাই এত খারাপ যে, এক লাখ কি দু' লাখ পাচ্ছি শুনলেই লোকে চমকে ওঠে। এরা একবারও ভেবে দেখে না টিভিতে যাদের খেলা দেখে আহা-আহা করে তারা বছরে কোটি টাকা পায়। তাদের একটা নিরাপত্তা আছে। এখানে আমার কী আছে ?"

"কিচ্ছু নেই। আর সেজন্যই আমাকে উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়।"

"তা হলে এবার তুমি ঘুমোও।"

সমীরণ বেডকভার টেনে নিজেকে ঢেকে দিল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে এসে দেবুর দেখা পেল।

"চা দেব ?"

"হ্যাঁ, তার আগে ফোন করব।"

"যান না ও-ঘরে, ঘরের দরজা তো শুধু বন্ধ করা।"

"চাবি দেওয়া নয় ?"

কালকের মতো সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে দেবু বলল,

"ঘুনুবাবুর কথার ওপর কথা বলা বারণ।"

সমীরণ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "চিরটাকাল একই রকম থেকে গেল।"

তিক্ততায় ভরে উঠল সমীরণ। এত টাকা খরচ করছে যাত্রী ভাল একটা দল গড়ার জন্য, অথচ এইসব ক্ষুদ্রতা নীচতার উর্ধ্বে উঠতে পারল না।

পতু ঘোষের ব্যক্তিগত ড্রইংরুম তার গেস্টরুম থেকে একটু বেশি সমৃদ্ধ। পরদার এবং সোফার কাপড় আরও দামি, কার্পেটের নকশা আলাদা, দেওয়ালে পেইন্টিং তো আছেই, তা ছাড়া করাত দিয়ে কাটা বাকলসহ বিশাল একটা গাছের গুঁড়ির টুকরো রাখা হয়েছে ঘরের একধারে। ফোনের রিসিভারেই ডায়াল বাটন।

"হ্যালো, কে মলা ?"

"দাদা ?"

"খবর কী, ওই ছেলেগুলো—"

"আর বলিসনি। পিসি তো আজ বেগিংয়ে বেরোয়নি। কাল ছাদে পড়ে গিয়ে কোমরে লেগেছে। এখন বিছানায়। আমি মাদার ডেয়ারির বুথ থেকে দুধ আনতে যাব বলে দরজা খুলে বেরিয়েই দেখি পাঁচ মূর্তি বসে রয়েছে বারান্দায়। বললাম, 'এ কী আপনারা বাড়ির মধ্যে কেন ?' একজন বলল, 'পিসির সঙ্গে সমীরণদার কথা বলা কি শেষ হয়েছে ? তাড়াতাড়ি আসতে বলুন।' বললাম, 'কাকে আসতে বলব ?' বলল, 'সমীরণদাকে। বটাদা বলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে।' তখন বললাম, 'দাদা তো অনেকক্ষণ আগেই বেরিয়ে চলে গেছে।' তাই শুনেই তো ওদের চক্ষু চড়কগাছ। ভেতরে ঢুকে সব ঘর, ছাদ তন্নতন্ন করে দেখে প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়! বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'কোথায় গেছে সমীরণদা, বলুন কোথায় গেছে ?' কানু বলল, 'কলকাতার ফুটবলের হাল দেখে বোধ হয় সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয় চলে গেছে।' আমি বললাম, 'দাদা তো সন্ন্যাসী হওয়ার লোক নয়, দেখুন গিয়ে তারামা'য় বসে হয়তো জিলিপি খাচ্ছে।' শোনামাত্র পড়িমরি দৌড়ল তারামা'র দিকে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল চলে যাওয়ার সময় ওদের মুখ দেখে।"

"মলা শোন, আমি এখন পতু ঘোষের বাড়িতে। ফোন নাম্বারটা রেখে দিস, দরকার হলেই ফোন করবি।"

"জায়গাটা কেমন ?"

"ফুটবলারদের ধ্বংস করার জন্য যা দরকার সেটা এখানে ভালমতোই আছে, প্রচুর টাকা, প্রচুর আরাম। ভাল কথা, কানু যেন প্লেনের টিকিটটা কেটে রাখে।"

"ওখানেও কি জেলখানা ?"

"বুঝতে পারছি না, কয়েক ঘণ্টা তো এসেছি। আজকের দিনটা দেখে বুঝতে পারব।"

"পিসিকে কিছু বলতে হবে ?"

"না, না, কিছু বলার দরকার নেই। শুয়ে থাকতে দে। মনে হয় না বটা বিশ্বাস বাড়িতে এসে গোলমাল করবে, দরকার হলে ফোন করব। এখন রাখছি।"

গেস্টরুমগুলোর লাগোয়া, ঘরের মাপের একটা ডাইনিং স্পেস। ছ'জনের জন্য একটা টেবিল। পরদা টেনে দিলেই এই খাবার জায়গাটা বসার জায়গা থেকে আলাদা হয়ে যায়। টেবিলে দেবু থরে-থরে খাদ্য সাজিয়ে রেখেছে। বিশাল এক বৌলে স্যালাড। আপেল, কলা, আঙুর স্তূপ করা। বাটিভরা মাখন আর জেলি। প্লেটে দুধে ডোবানো কর্নফ্লেক্স। থরে-থরে সাজানো সেঁকাপাউরুটি। কড়াপাকের সন্দেশ।

দুলাল ছুরি দিয়ে মাখন লাগাচ্ছে রুটিতে, এক-একটা স্লাইসে প্রায় একশো গ্রাম। তুষার বিরক্ত চোখে মাখনের বাটিটা পাওয়ার জন্য তাকিয়ে রয়েছে দুলালের দিকে। বুকু অবাক হয়ে গেল সমীরণকে দেখে।

"তুই ! এখানে ?"

"কাল রাত্তিরে এসেছে," তুষার একদৃষ্টে মাখনের বাটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কিরে দুলে, রুটির ওপর মাখনের ড্রিবলিং অনেকক্ষণ তো চালাচ্ছিস, এবার পাসটা বাড়া।"

"তুই জেলি মাখানো শুরু কর না। ওভারল্যাপটা কখনওই ঠিক সময়ে তোর দ্বারা আর হয়ে ওঠে না। আচ্ছা এই নে।"

দুলালের ঠেলে দেওয়া মাখনের বাটিটার দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে তুষার বলল, "এটা নিয়ে করব কী ! কিছুই তো আর রাখিসনি। চিরকালই তোর ফাইনাল পাসটা এমন জায়গায় হয় যে, গোল আর করা যায় না। সন্দেশের প্লেটে কিন্তু হাত দিবি না বলে রাখলুম।"

"ওটা বুকুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নে।" গোলমরিচের গুঁড়ো রুটিতে ছিটিয়ে কামড় বসাবার আগে দুলাল বলল।

"নাকু, তুই তো সারথিতেই থেকে যাবি শুনেছিলাম !" বুকুর বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি।

"মত বদলালাম।"

"কেন ? দরে পোষাল না ?"

সমীরণ উত্তর দিতে গিয়েও দিল না। শুধু মাথা নাড়ল। বুকু চোখ সরু করে তেরছা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করল। সমীরণ প্লেটে স্যালাড তুলতে-তুলতে সেটা লক্ষ করে হাসল।

"নাকু, তুই হাসলি যে ?" দুলাল বলল।

"সারথির পাঁচটা ছেলে বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছিল কাল রাতে। এখন বটাদা তাদের কী বলছে সেটা মনে করেই হাসি পেল। আচ্ছা দুলালদা, পৃথিবীতে আর কোনও দেশে কি এইভাবে দলবদলের আগে ফুটবলারদের গাধা-গোরুর মতো খোঁয়াড়ে পোরা হয় ?"

"একটা দারুণ কথা নাকু তুই বললি।" তুষার মুখভরা রুটির মধ্যে একটা ফাঁক তৈরি করে বাক্যটি বের করে আনল। "মানুষকে গাধা-গোরু কখনওই বানানো যায় না যদি-না সে নিজেই তা হতে চায়। আমরা হতে চেয়েছি, তাই ওরা বানিয়েছে। না চাইলে বানাতে পারত না। এখানে লাস্ট চারটে ওয়ার্ল্ড কাপের সাত-আটটা ম্যাচের ক্যাসেট আছে। তুই তার যে-কোনও একটা ম্যাচ দ্যাখ। তোর মনে হবে গাধা-গোরুরা নয়, বাঘ-সিংহের লড়াই হচ্ছে। ওদের খোঁয়াড়ে ভরার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাববে না। ...দুলে কড়াপাকের দিকে আর তাকাসনি বাবা। আগের সিজনে বুকু যে-ক'টা সিটার মিস করেছে ঠিক সেইক'টাই এখন রয়েছে। ওর থেকে যদি খাস—।" তুষারের কথা থেমে গেল। রাগ করে বুকু উঠে পড়েছে।

"সব সময় পেছনে লাগার স্বভাবটা তোমার আর গেল না। আমি ক'টা মিস করেছি তার ফর্দ তুমি রেখেছ, আর তুমি ক'টা গলিয়েছ তার হিসাবটাও কি রাখো ?"

"রাখি।" নির্বিকার মুখে তুষার বলল। যত্নভরে কলার খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে সে আড়চোখে একবার সমীরণের দিকে তাকাল। "কলকাতার মাঠে লাস্ট সিজনে চারবার বিট হয়েছি শুধু নাকুর কাছে। কিন্তু ও গোল দিতে পারেনি। হ্যাঁ মানছি, চারবারই সারথির পেনাল্টি পাওয়া উচিত ছিল। এবার আর নাকুকে মেরে থামাতে হবে না ভেবে পুণ্য অর্জনের সম্ভাবনায় ঠিক করেছি স্যাক্রিফাইস করব।"

তিনজোড়া চোখ তুষারের ওপর গেঁথে গেল।

"সন্দেশগুলো, বুকু তুই একাই খেয়ে নে।"

"আমার মুশকিলটা কী জানো তুষারদা, তোমার এগেনস্টে খেলার সুযোগ একবারও পেলাম না। পেলে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম...।" বুকু অর্থপূর্ণ হাসি তিনজনকে উপহার দিল।

তুষার ভ্রূ তুলে বলল, "কী বুঝিয়ে দিতিস ?"

"বুঝিয়ে দিতাম তোমার রিটায়ার করার সময় এসে গেছে।" বুকু কথাটা বলেই টেবিল থেকে উঠে বসার জায়গায় গিয়ে টিভি সেটের সুইচ টিপল। ধীরে-ধীরে তুষারের মুখ থমথমে হয়ে উঠল।

"খবরের কাগজ কখন আসে ?" সমীরণ বলল প্রসঙ্গটা সহজ করার জন্য, দুলালকে লক্ষ্য করে। এইসব আকচাআকচি, হিংসা, মনোমালিন্য তার মনটাকে ঘুলিয়ে দেয়। সে শুনেছে ক্লাবে আধিপত্য বিস্তারের জন্য এই দু'জনের মধ্যে লড়াই চলছে। দু'জনে দুই কর্তার প্লেয়ার।

"আসে না।"

"মানে ? তোমরা কাগজ পড়ো না ?"

"পড়ি।"

"তা হলে ?"

"তা হলে আবার কী ?" দুলাল বিরক্তিভরে বলল, "আমাদের খবরের কাগজ পড়া বারণ, তাই আসে না।"

স্তম্ভিত হয়ে গেল সমীরণ। সে বুঝে উঠতে পারছে না কাগজ পড়ার মতো একটা সাধারণ ব্যাপারে আপত্তি কেন ?

দুলাল ওর মনের কথাটা আন্দাজ করেই বলল, "ক্লাব অফিসিয়ালদের বিবৃতি, ইন্টারভিউ, প্লেয়ারদের হাম্বা-হাম্বা, কে কাকে ধরতে গিয়ে ফসকে গেল, কে বলছে অমুক ক্লাবে খেলব তমুক ক্লাবে যাব না, কাকে কত টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া হল আর কে অ্যাডভান্স নিয়েও বিরোধী ক্যাম্পে গিয়ে উঠল, অফিসিয়ালদের কে নিজের ক্লাবের বিরুদ্ধেই কথা বলল—এইসব যাতে আমরা জেনে না যাই সেজন্যই খবরের কাগজ দেওয়া হয় না।" দুলাল ফিক-ফিক হেসে চামচে কর্নফ্লেক্স তুলে মুখে দিল।

"এটা অত্যন্ত অন্যায়, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ।" সমীরণ রেগে উঠল।

দুলাল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল দেবু এসে তাকে বলল, "বউদির ফোন।"

দুলাল ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল। তুষারও উঠল। সমীরণ টেবিলে একা বসে রুটি চিবোতে-চিবোতে দেবুকে বলল, "চা দাও।"

"চা নয়, হরলিক্স খেতে হবে।"

শুনেই সমীরণ চোখ সরু করল। "খেতে হবে ! থাক, দরকার নেই।"

পাংশুমুখে ফিরে এল দুলাল। সমীরণের সামনের চেয়ারে বসে নার্ভাস স্বরে বলল, "মুশকিলে ফেলল দেখছি। বটা বিশ্বাসের ষাট-সত্তরটা ছেলে বাড়ির সামনে চিৎকার করছে, গালাগাল দিচ্ছে আমার নামে। কী করা যায় বল তো।" অস্থিরভাবে দুলাল সোফায়-বসা তুষারের কাছে চলে গেল।

"তুষার, এখন কী করি বল তো ?"

"কী আবার করবি। বউকে বল দরজা-জানলা বন্ধ করে, কানে তুলো দিয়ে বসে থাকতে। কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করে ওরা আপনা থেকেই চলে যাবে।"

"তাইই বলেছি। কিন্তু বটাদা টেলিফোন করে বউকে বলেছে দেখা করতে আসবে। এটাই তো ভয়ের কথা। ছন্দা তো বটাদা বলতে অজ্ঞান।"

"হোক না অজ্ঞান ! তোর জ্ঞানটা ঠিক থাকলেই হল।"

"ছন্দাকে তো চিনিস না, ও অজ্ঞান হলে আমাকেও যে অজ্ঞান হতে হবে এটা বটাদা জানে। গত বছর ওকে দিয়ে বটাদা এমন প্রেশার দেওয়াল যে, যাত্রীর অ্যাডভান্স নিয়েও সারথিতে যেতে হল।"

সমীরণ এসে দু'জনের সঙ্গে বসল। বুকু সঙ্গে-সঙ্গে টিভি বন্ধ করে ঘরের মধ্যে চলে গেল। ডোর-বেল বেজে উঠল। দেবু দরজা খুলে দিতেই সুবোধ ধাড়া, সীতেশ রায় এবং সাত-আটজন যুবক ও মাঝবয়সী লোক ভেতরে ঢুকল।

সমীরণকে দেখেই সুবোধ ধাড়া একগাল হাসল।

"বটাকে ম্যাজিক দেখালি ? ভাল, ভাল, এবার মাঠে নেমে পায়ের জাদুটাও দেখাস।"

সমীরণ চুপ করে রইল। দুলাল ইশারায় সুবোধ ও সীতেশকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। ওদের সঙ্গে আর যারা ঢুকেছে তারা সোফায় বসে নিজেদের মধ্যে জোর গলায় কথা বলা শুরু করল—কোন প্লেয়ারকে আনা দরকার, কার কত দর হওয়া উচিত, আর পঁচিশ হাজার বাড়ালেই কাকে পাওয়া যাবে, কাকে একদমই বিশ্বাস করা যায় না, কে ল্যাজে খেলাচ্ছে, এইসব কথার থেকে সরে যাওয়ার জন্য সমীরণ বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়াল।

মরক্কো চামড়া-বাঁধানো ইংরেজি এবং বাংলা নানাবিধ বই থেকে সে অনুমান করল পতু ঘোষ লোকটা উটকো এবং সাজানো বনেদি নয়। শিক্ষা, রুচির একটা ভিত পরিবারে আছে। আলমারির পাল্লা টানতেই খুলে গেল। সে বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর একটা খণ্ড বের করে পাতা ওলটাল। কয়েকটা উপন্যাস রয়েছে এই খণ্ডে। বইটা নিয়ে সে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে পরদা টেনে দিল। জানলার পরদা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল একটা অফিস-বাড়ি। দোতলায় ব্যাঙ্ক। রাস্তার কিছুটা চোখে পড়ে। বাস, মোটর ইত্যাদি চলছে। আকাশ কষ্টেসৃষ্টে দেখা যায়। সে একটা চেয়ারে বসে আর-একটায় দুটো পা তুলে দিল। মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই সে 'কপালকুণ্ডলা'য় ডুবে গেল।

উপন্যাসটা যখন প্রায় শেষ করে এনেছে, হঠাৎ একটা মেয়েগলার চিৎকারে সমীরণ বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল।

"কোথায় দুলাল চক্রবর্তী ? তাকে কোথায় রেখেছেন, বের করে দিন।"

"কে আপনি ?"

"আমি ওর বউ মধুছন্দা।"

"এখানে দুলাল চক্রবর্তী নেই।"

"নেই মানে, আজ সকালেই ফোনে কথা বলেছি। আমায় বলল, এখানে ওকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। আমি সব ঘর সার্চ করব।"

"বলছি তো এখানে নেই। আপনি যেতে পারেন।"

সমীরণ পরদার ওপারের সংলাপ শুনে বুঝল সুবোধ ধাড়াদের সঙ্গে আসা সেই লোকগুলি ছাড়া ওখানে আর কেউ নেই। নিশ্চয় আগাম জেনেছে মধুছন্দা আসছে তাই কেটে পড়েছে।

"আমায় আটকাবেন না বলছি। নীচে একশো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা আমার স্বামীকে অবৈধভাবে এখানে ধরে রেখেছেন।"

"আপনি যদি ঘর দেখতে চান, দেখতে পারেন, কিন্তু অন্য কাউকে ঢুকতে দেব না, সেটাও তা হলে অবৈধ ব্যাপার হবে।"

"ঠিক আছে, এই তোমরা এখানে দরজার বাইরেই থাকো।"

"না বউদি, আমরাও আপনার সঙ্গে থাকব।"

"আপনাকেও যদি আটকে রেখে দেয় ?"

"অ্যা অ্যা অ্যা, আটকাবে আমাকে ? জ্বালিয়ে দেব না সারা বাড়ি। আমি একাই দেখছি, তোমাদের ঢুকতে হবে না।"

বটা বিশ্বাস তা হলে এর মধ্যেই অর্গানাইজ করে ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। সমীরণ পাতার সংখ্যাটা দেখে বই বন্ধ করল। কিন্তু যদি তাকে এখন দেখে ফেলে ? যদি জবরদস্তি চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায় ? তারপরই মনে হল, প্লেয়ার তোলা এভাবে হয় না। যাকে তোলে সে স্বেচ্ছায়ই হাজির হয়।

ঘরের দরজা খোলা আর বন্ধের শব্দের সঙ্গে মধুছন্দার গলা ভেসে এল। "কোথায় ওকে সরিয়েছেন আপনারা বলুন, নয়তো

কুরুক্ষেত্র বাধাব বলছি।"

"বললাম তো আপনাকে, দুলাল চক্রবর্তী আধঘণ্টা আগে ওর জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ, নিজের থেকেই। যাওয়ার সময় শুধু বলল, এখানে থাকব না, বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। যদি বউ খোঁজ করতে আসে—," কথাটা শেষ হওয়ার আগেই সমীরণ শুনল তুষারের গলা, "তা হলে বলে দেবে, বটাদা এবার কত ভরির হার দেবে সেটা জেনে নিয়ে যেন বাড়িতে বিকেলে ফোনের পাশে বসে থাকে। পাঁচ ভরির কম হলে সারথিতে থাকব না।"

"তুষারদা, আপনি তো একজন বড় প্লেয়ার, আপনিই বলুন, ফুটবলারদের কি বিশ্বাস করা যায় ? ওদের কথার কি কোনও দাম আছে ?"

"ছন্দা, আমিও কিন্তু একজন ফুটবলার।"

"না, না, আপনাকে বলছি না, আপনি বাদে আর সবাই। আমাকে বলল একটা হিরের নাকছাবি করিয়ে দেবে সারথির টাকাটা পেলেই। এক বছর হয়ে গেল, কোথায় নাকছাবি ? এবার বলল যাত্রীর অ্যাডভান্স পেলেই—না, না, আমি আর বিশ্বাস করছি না। বলুন না তুষারদা ও কোথায় ? বটাদা বলেছেন মামনকে লরেটোয় ভর্তি করিয়ে দেবেন। উনি এককথার মানুষ, যা বলেন তাই করেন।"

"লরেটোয় তো পতুদাও ভর্তি করিয়ে দিতে পারেন।"

"পারেন ? তুমি একটু বলবে তুষারদা ?"

"তুমি নিজেই বলো না।"

"ঠিক আছে আমিই বলব। জানো, আমার বড়দির মেয়ে কী ফটাফট ইংরিজি বলে ! মেমসাহেবদের মতো উচ্চারণ ! শুনলুম পতুদা এখানে নাকি নেই ?"

"কাল-পরশুই এসে যাবে, তুমি বরং পরশুই এসো।"

সমীরণ ভেবে পাচ্ছে না হাসবে, না রাগবে। একটা ফুটবলারকে জীবনে কতজনের কতরকমের স্বার্থ, লোভ দেখে চলতে হয়। দুলালদা প্রায়ই বলে, 'গুছিয়ে নে নাকু, গুছিয়ে নে। এই খেলা চিরকাল তো থাকবে না, যা পারিস বাগিয়ে নে।' দুলালদা বাগিয়ে নেওয়ার জন্য যাত্রী আর সারথির মধ্যে লাথি খাওয়া বলের মতো যাতায়াত করছে।

বইটা খুলে আবার সে পড়তে শুরু করল। কয়েক মিনিট পর দেবু পরদা সরিয়ে মুখ বাড়াল।

"দুপুরে কী খাবেন ?"

"যা হোক।"

"তুষারদা ইলিশ খাবে বলেছে, বুকুদা চিকেন। যে যা খেতে চাইবে তাই দেওয়া হবে। বুকুদা তো কাল এগারোটা ক্যাডবেরি চকোলেট খেল।"

"আমি খাব ভাত, ডাল, তরকারি আর যে-কোনও একটা মাছের ঝোল।"

"আর ?"

"আবার কী ?" সমীরণ তাকাল দেবুর বিড়ম্বিত মুখের দিকে। "রোজ যা খাই তাই খাব, তবে ইলিশভাজা পেলে ছাড়ি না আর দই পেলে তো খুবই ভাল হয়।"

দেবুর স্বস্তি-পাওয়া মুখ দেখে সে বলল, "বউদিটি চলে গেছেন, না দলবল নিয়ে নীচে বসে আছেন ?"

"বসেটসে নেই, একদমই চলে গেছেন। এদিকে এরাও সব তুষারদাকে নিয়ে বড়বাবুর ড্রইংরুমে গিয়ে বসেছে। মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরের দরজাও লক করে দিয়েছি। বড়বাবুর কড়া অর্ডার প্লেয়ার ছাড়া এদিকে কেউ থাকবে না। ঝামেলাটামেলা হলে ওদিককার ঘরেই হোক। কাল গৌরবন্ধু বেরা-র বাবা এসে যা চেঁচামেচি করলেন !"

"গৌরবন্ধু, মানে সারথির তিন নম্বর গোলকিপার ?"

"হ্যাঁ। ওকে সত্তর হাজার দেওয়ার কথা হয়েছে। লোকটা এসে বলে একলাখ পঁচিশ চাই। ভাবুন একবার, জুনিয়ার বেঙ্গলে একটা ম্যাচ শুধু খেলেছে, সিনিয়ার বেঙ্গল টিমের রিজার্ভে ছিল, সারথিতে গত বছর চারটে এগজিবিশন ম্যাচে নেমেছে, আপনি তো আমার থেকেও ভাল জানবেন, এই প্লেয়ার কি না চাইছে সোয়া লাখ ! দু' ঘণ্টা ধরে বাবা চেঁচালেন, রাগ দেখালেন, তারপর কান্নাকাটি, হাতজোড়, মানে শান্তিগোপাল, স্বপনকুমারও হার মেনে যাবে !"

"চাইবে না কেন ? সারা ময়দানে রটে গেছে টাকার বস্তা নিয়ে পতু ঘোষ প্লেয়ার কেনার দোকান খুলেছে। কানা, খোঁড়া, নুলো, খোকা, বুড়ো যাকে পারছে অ্যাডভান্স ধরাচ্ছে। গৌরবন্ধুর কতয় রফা হল ?"

"আশি হাজার।"

"অ্যাঁ ! ওর দাম তো আশি টাকাও নয়, আর কি না পাবে আশি হাজার !"

"আপনি অ্যাডভান্স নিয়েছেন ?" দেবুর স্বরে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা।

"না।" সমীরণ হুঁশিয়ার হল। এইসব বিষয় নিয়ে এই পর্যায়ের লোকের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়।

"চাইলে অ্যাডভান্স কেন, পুরো টাকাটাই আপনাকে দিয়ে দেবে। আপনি যাত্রীর বড় ক্যাচ, আপনাকে যে পাব এটা তো আমরা আশাই করিনি।"

এই সময় চেঁচিয়ে একজন বলে গেল, "সমীরণ, তোমার ফোন এসেছে।"

নিশ্চয় বাড়ি থেকে। আর তো কেউ জানে না সে এখানে ! সমীরণ প্রায় ছুটেই ড্রইংরুমে গেল।

"কে, দাদা ? আমি কানু।"

"পিসি স্কুলে গেছে ?"

"যায়নি। হটওয়াটার ব্যাগ নিয়ে সেঁক দিচ্ছে। শোন, এইমাত্র বাঙ্গালোর থেকে তোর ফোন এসেছিল।"

মাথার মধ্যে ঝনাৎ শব্দ করে সমীরণের শরীর শক্ত হয়ে গেল। "কে করেছে ?"

"পদ্মনাভন, এ. আই. এফ. এফ সেক্রেটারি। এক্ষুনি তোকে রওনা হতে বলল।"

"এক্ষুনি রও—" সে থেমে গেল। সারা ঘর কান পেতে, সব চোখ এখন তার দিকে। খোলাখুলি কথা বলা নয়।

"কেন বলল ?"

"নাগজি টুর্নামেন্টে তোরা খেলছিস না, কারণ চেকোস্লোভাকিয়া ট্যুর গভর্নমেন্ট স্যাংশন করেছে। দশদিনের মধ্যেই টিম রওনা হবে। তোর জন্য নোভাচেক অপেক্ষা করছে। মিনিটখানেক কথা হল।"

সমীরণের হাতের ফোন থরথর কাঁপছে। তার জীবনের স্বপ্ন বাস্তব হয়ে ফোনের মধ্য দিয়ে সারা শরীরকে সুখে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেই একটা সন্দেহ কাঁটার মতো তার মগজে বিঁধল। ফোনটা বাঙ্গালোর থেকে, না কি শোভাবাজারের অভয় কুণ্ডুর বাড়ি থেকে ? এটা আগে যাচাই করে নেওয়া দরকার। কলকাতার ফুটবলে নোংরামির তো অন্ত নেই !

"কানু, তুই একবার পদাকে ফোন কর, এক্ষুনি ?" নম্বরটা লেখা আছে ফোন-গাইডে।"

"পদা কে ?"

"আহা, একটু আগেই তো বললি তোকে ফোন করেছিল পদা।" সমীরণ আড়চোখে ঘরের লোকেদের দিকে তাকাল। "আমার সুটকেসের একটা নোট বইয়ে নোভুদার ফোন নাম্বার আছে। ওখানে করলেও হবে।"

"পদ্মনাভন না কি নোভাচেক, আগে কাকে করব ?"

"যাকেই হোক, জিজ্ঞেস করে আগে কনফার্মড হয়ে নে। অন্য

কেউ ধাপ্পা দেওয়ার জন্য এভাবে বলছে কি না সেটা ভজিয়ে নেওয়া দরকার। যদি সত্যি হয় তা হলে যা কিনতে বলেছি সেটা কিনে ফেল।"

"কিনতে মানে প্লেনের টিকিট কাটতে বলেছিলিস।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। তবে বো নয় বা।"

"আরে বাঙ্গালোরেরই কাটব। আমার বন্ধুর দাদা, সারথির পাগল সাপোর্টার, এখনও জানে না তুই যাত্রীতে উঠেছিস, তিনি এয়ারলাইন্সের অ্যাকাউন্টসে আছেন। তাঁকে ফোন করে কালকের বোম্বাইয়ের টিকিট চেয়েছিলাম, বললেন হয়ে যাবে। এখন আবার বাঙ্গালোরের চাইতে হবে। অবশ্য প্রথমে পদার কাছ থেকে জেনে নিয়ে।"

"জেনেই আমাকে জানাবি, এক সেকেন্ডও দেরি করবি না। ভীষণ ক্রুশিয়াল এটা আমার কাছে।"

সমীরণ রিসিভার রাখতেই প্রশ্ন হল, "নাকু, কোনও খারাপ খবর ?"

"অ্যাকসিডেন্ট নাকি সমীরণ ?"

"তোমার পিসিমার ?"

দুর্ভাবনাপীড়িতের মতো দেখাচ্ছে সমীরণকে। এখন তাকে এই ভাবটা দেখাতেই হবে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ কর্ম নয়। তাকে আটকে দেবেই। যাত্রীর সে বড় ক্যাচ।

"হ্যাঁ তুষারদা, একজন ফোন করে ভাইকে বলেছে স্কুলের সামনে বাস থেকে পিসিমা পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়ায় চোট পেয়েছে। কথাটা সত্যি কি না কনফার্ম করার জন্য ভাইকে বললাম, পদাদা, আমার এক মামাতো দাদা, পিসিমার স্কুলের পাশেই থাকেন, তাঁকে ফোন করে জেনে নিয়ে আমাকে জানাতে। কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না, বাড়িতেও কেউ নেই যে—।" সমীরণ ক্লিষ্ট মুখে ধীরে-ধীরে তুষারের পাশে বসে পড়ল।

অভিনয়! এখন সে স্টেজের ওপর! ঘাগু দর্শকদের সামনে তাকে অভিনয় করতে হচ্ছে। একটু এধার-ওধার হলেই এরা ধরে ফেলবে। বাসব কী যেন বলেছিল ? "কী গলা, কী ডেলিভারি, কী পিচ কন্ট্রোল!" এসে একবার দেখে যাক সমীরণ গুপ্তর অভিনয়।

"পিসিমার তো দারুণ স্বাস্থ্য, প্রচণ্ড ফিট। শুনেছি এককালে রেগুলার বাস্কেট খেলতেন।" তুষার সমীহভরে বলল।

জবাব না দিয়ে সমীরণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টেলিফোনটার দিকে। তার মাথায় এখন অন্য চিন্তা। কানু কি সুটকেস থেকে নোটবইটা পেয়েছে ? ...ট্রাঙ্ককলে লাইন পেতে কত সময় লাগবে ? ...নোভাচেক কি পদ্মনাভন এখন যদি কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকে ? অন্য কেউ ফোন ধরলে সে নিশ্চয় বলতে পারবে ইন্ডিয়া টিম ট্যুরে যাচ্ছে কি না। যদি যায় তা হলে অবশ্যই তাকে জলদি যেতে বলবে। যেতে হলে প্রথমে এখান থেকে তাকে বেরোতে হবে।

"পিসিমার যদি কিছু হয়ে থাকে তা হলে আমাকে তো যেতেই হবে।" সমীরণ ব্যাকুল হয়ে বলল।

"যাওয়া তো দরকারই।" তুষার সমর্থন করল।

রুগণ, লম্বা, মাঝবয়সী লোকটি, সমীরণ যাকে আগে কখনও দেখেনি, বলল, "ঘুনুদা না বললে তো যাওয়া সম্ভব নয়।"

আর-একজন বলল, "তোমার ভাই কনফার্মড হয়ে আগে তো তোমাকে জানাক, তারপর দেখা যাবে।"

দপদপ করে উঠল সমীরণের কানের দু'পাশ। কিন্তু সে জানে রাগারাগি করে কোনও লাভ নেই। সবার আগে তাকে কাজটা হাসিল করতে হবে।

"আমি ঘরে যাচ্ছি, ফোন এলেই খবর দেবেন।" এই বলে সে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এসে খাবার টেবিলে রাখা বঙ্কিম গ্রন্থাবলীটা তুলে নিয়ে, নিজের ঘরে এসেই অবাক হল। বুকু শুয়ে রয়েছে দুলালের শূন্য বিছানায়। বুকের ওপর টেপরেকর্ডারে নিচু স্বরে বাজছে হিন্দি গান।

"কী ব্যাপার, এখানে ?" সমীরণ বলল।

"তুষারদার সঙ্গে থাকব না, অত্যন্ত বাজে লোক।"

সমীরণ আর কথা না বলে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। কপালকুণ্ডলা শেষ করার বাসনা এখন আর তার নেই। তার মাথায় এখন চেকোস্লোভাকিয়া ট্যুর, বাঙ্গালোর, কানুর ট্রাঙ্ক কল, প্লেনের টিকিট, পতু ঘোষের বাড়ি থেকে বেরনো, ঘুনু মিত্তিরের অনুমতি এবং নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ পর-পর খেলে চলেছে।

"তোদের ক্যাম্পে ছিল নাগাল্যান্ডের খাংমা, ঘুনুদা তাকে আনতে কোহিমা যাচ্ছে।" টেপরেকর্ডার বন্ধ করে বুকু বলল।

সমীরণ নিজের ভাবনার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তার মধ্যেই বুকুর কথাটা তার মগজে আঘাত করল। অবাক হয়ে বলল, "খাংমা মানে সেই স্টপারটা ? নোভাচেক তো ওকে তিনদিন দেখেই ক্যাম্প থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়!"

"হ্যাঁ, ওকেই আনতে যাচ্ছে। অজয় তালুকদার ওকে চেয়েছে। ওর মধ্যে নাকি ভারতের সেরা স্টপারটা লুকিয়ে আছে, অজয়দা তাকে বের করে আনবে। অতএব ব্রিফকেস নিয়ে ঘুনু মিত্তির এবার প্লেনে উঠবে।"

"একটা হাতির ঘুরতে যে সময় লাগে খাংমার লাগে তার আটগুণ সময়। বিনু কি আলবু তো তাস খেলতে-খেলতে ওকে বিট করবে!"

"তাতে কী হয়েছে, ছ' ফুটের ওপর লম্বা, পঁচাশি কেজি ওজন, এটাই তো যথেষ্ট দেড় লাখ টাকার পক্ষে। গৌরবন্ধু, খাংমা, এইসব নিয়ে গোল খাবে আর সেই গোল শোধ করতে হবে আমাকে, এবার থেকে তোকেও। আর না পারলে কী অবস্থাটা আমাদের হবে...পাবলিক জানে অলরেডি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা যাত্রী খরচ করে বসে আছে।" বুকু টেপরেকর্ডারটা আবার চালিয়েই কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্বরগ্রাম কমিয়ে বলল, "তুই আসায় আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই।"

সমীরণ বিছানা থেকে উঠে ঘরের বাইরে এল। ঘরের কোণে টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটা টুংটাং শব্দ করল। এগারোটা। সমীরণ অস্থির মনে পায়চারি করতে-করতে একসময় ড্রইংরুমে ঢুকল। লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে। তাদের মধ্যে তিন-চারজনকে মস্তানগোছের বলে তার মনে হল। যাত্রীর দু'জন ফুটবলারও রয়েছে এর মধ্যে, বোধ হয় দরাদরি করার জন্য এসেছে। ট্রেজারার মহাদেব সামুই একটা বালিশ বগলে রেখে সোফায় কাত হয়ে আধাশোয়া।

ফুটবলারদের একজন সামুইকে তখন বলছিল, "সারথির নির্মাল্য রায় কাল এসেছিল।"

"চুঁচড়োয় ? তোর বাড়িতে ?"

"হ্যাঁ, বললেন ফুড কর্পোরেশনে, নয়তো কোল ইন্ডিয়ায় চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"ভাল কথা, তা হলে সারথিতেই চলে যা।"

ফোন বেজে উঠল। সামুইয়ের হাতের কাছে ফোন, তিনি তুললেন, শুনলেন এবং উদগ্রীব সমীরণের দিকে সেটি বাড়িয়ে ধরলেন।

"কে, কানু ?"

"কারেক্ট খবর। নোভাচেককেই ফোন করেছিলাম, বলল ট্যুরটা হঠাৎই ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গেছে। সম্ভব হলে স্যাম আজই ফ্লাই করুক, নয়তো পজিটিভলি যেন কাল করে। একদিন দেরি হলে ওকে বাদ দেব। হাতে একদমই সময় নেই। দাদা, আমি এখন টাকা নিয়ে এয়ারলাইন্স দৌড়চ্ছি।"

"কিন্তু আমি যাব কী করে কানু, এখানে আমায় নজরবন্দি করে রেখেছে, ধরে রেখেছে। আই অ্যাম ইন এ জেইল।" সমীরণ

চিৎকার করে উঠল। ঠকঠক কাঁপছে তার দেহ। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘাম ফুটেছে কপালে। "যেভাবে পারিস উদ্ধার করে নিয়ে যা। আমি ভারতের ক্যাপ্টেন হয়ে খেলতে চাই, সবার আগে আমি একটা মানুষ হতে চাই।"

সমীরণ আর কিছু বলার সুযোগ পেল না। ছোঁ মেরে তার হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়েছে মহাদেব সামুই।

"কী আজেবাজে কথা বলছিস সমীরণ! এটা কি জেলখানা? যাত্রীর সেক্রেটারির বাড়িকে তুই জেলখানা বলছিস? তুই আছিস যাত্রীর গেস্ট হয়ে, পতুর গেস্ট হয়ে, আর বলছিস কি না... এমন বদনাম...ছি ছি ছি, কেউ দেবে না।"

"তা হলে আমাকে যেতে দিন।" সমীরণ দরজার দিকে পা বাড়াল। তিন-চারজন যুবক ছুটে গিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল। সমীরণ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে মুখটা নামাল। কাঁধ দুটো হতাশায় ঝুলে সে কুঁজো হয়ে গেছে। পায়ে-পায়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। টেপরেকর্ডারে তখনও হিন্দি গান হয়ে চলেছে।

॥ ৯ ॥

"কী বলল?" খাটের ওপর ধীরে-ধীরে উঠে বসলেন রেখা গুপ্ত। "যেভাবে পারিস উদ্ধার করে নিয়ে যা! ...আমায় ধরে রেখেছে! আমার নাকুকে ওরা ধরে রেখেছে? আমি যাব।"

খাট থেকে নামলেন রেখা গুপ্ত। পিসির চোখমুখ দেখে শ্যামলা জড়িয়ে ধরে টেনে এনে তাকে খাটে বসাল।

"কোথায় যাবে তুমি?"

"যেখানে নাকুকে ধরে রেখেছে। কত ক্ষমতা আছে ওই ঘুনু মিত্তিরদের, আমি দেখব।"

"ওখানে গিয়ে কোনও লাভ হবে না পিসি। দাদাকে যদি বের করে আনতে হয় তা হলে অন্য উপায় ভাবতে হবে।" শ্যামলা ঠাণ্ডা গলায় বলল।

"কী উপায়?" রেখা গুপ্তর চোখের আগুন অল্প স্তিমিত হল।

"ভাবতে হবে।"

"তা হলে তাড়াতাড়ি ভাব।"

"এসব কি একা ভাবা যায়? তুমিও ভাবো।"

"আমি কী ভাবব, আমার মাথার কিছু ঠিক নেই এখন। এখন ইচ্ছে করছে জেল ভেঙে, ওদের হাত-পা গুঁড়িয়ে, মাথা ফাটিয়ে নাকুকে বের করে আনতে। এ ছাড়া আর কিছু মাথায় আসছে না। ভটচাযদার মতো ঠাণ্ডা মাথা তো আমার নয়।"

"হয়েছে।" শ্যামলার চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল চিচিংফাঁক হওয়া গুহাটা। "ওকেই বলে দেখি। তুমি চুপ করে এখন শুয়ে থাকো। কানুর এয়ারলাইন্স অফিস থেকে ফিরতে দেড়-দু' ঘণ্টা তো লাগবেই, ততক্ষণে আমি ভটচায-জেঠুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।"

"দত্তবাবুকেও ব্যাপারটা বলিস। পুলিশে ছিলেন তো, বদমাইশ লোকেদের শায়েস্তা করার ব্যাপারটা জানেন।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে ডাইনিং টেবিল ঘিরে বসে গেল বেগারদের শলাপরামর্শের অধিবেশন। সরোজ বসাক কাজে বেরিয়েছেন তাই অনুপস্থিত। সমস্যাটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়ে শ্যামলা বলল, "তা হলে কী উপায়?"

"শঠে শাঠ্যং ছাড়া কোনও উপায় তো দেখছি না।" ভটচায চিন্তিত চোখে ব্যান্ডেজ জড়ানো পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মালবিকা ইতস্তত করে বললেন, "মলা তুমি বলছ বিনু না পিনু জন, তাকে পাওয়ার জন্য এই ঘুনু মিত্তির দু'-দু'বার এর্নাকুলাম পর্যন্ত ছুটেছিল ?"

"কাল রাত্তিরে মশারি গুঁজে দেওয়ার সময় দাদা বলল, 'টুলে বসে একটু কথা বল যাতে বাইরে থেকে ওরা বুঝতে পারে আমি রিল্যাক্সড আছি।' তখনই তো দাদা বলল, বিনু জনকে পাওয়ার জন্য ঘুনুদার এত ছোটাছুটি, পয়সা খরচ হল, অথচ সে এখন কি না চন্দননগরে সারথির কবজায়।"

"নাকুর সঙ্গে বিনুর আলাপ কেমন ?" ভটচায জানতে চাইলেন।

"খুব আলাপ। দাদা বলল, ও তো আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসতেও চেয়েছিল।"

"হুম্‌ম।" ভটচাযের আঙুলগুলো টেবিলের কাঠে ঢাকের বোল তুলল। সবাই তার দিকে তাকিয়ে।

"বিনু জনকে দিয়ে এখন কী হবে !" জি. সি. দত্ত অধৈর্য হয়ে পড়লেন। "এখন দরকার কুইক অ্যাকশন। বহুদিন হাত-পা গুটিয়ে রেখে শরীরটা আমার মাখন-মাখন হয়ে পড়েছে। আমি বরং রেইড করতে যাই পতু ঘোষের বাড়িতে। যা হওয়ার হবে।"

"কাল রাতে তিনটে গুণ্ডাকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন বলে কি ভেবেছেন, সবাই আপনাকে ভয় পাবে ?" মালবিকা প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসল।

হাত তুলে, চেয়ার থেকে ওঠা দত্তর চ্যালেঞ্জ গ্রহণটাকে বসিয়ে দিয়ে ভটচায বললেন, "আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। যাত্রীর কাউকে আমরা যদি হোস্টেজ রাখতে পারি তা হলে বন্দি বিনিময়ের মতো—"

"কাশ্মিরে যা হচ্ছে ?" মালবিকা বললেন।

"আসামেও তো হচ্ছে।" দত্ত জানিয়ে দিলেন তিনিও ওয়াকিবহাল।

"মলা তুমি একটু পাশের ঘরে এসো, কথা আছে।"

পাশের ঘরে ওরা দু'জন মিনিটসাতেক ফিসফিস করে বেরিয়ে এল।

"এটা কিন্তু ঠিক হল না মিস্টার ভটচায।" জি. সি. দত্ত দেরিতে হলেও তাঁর ক্ষোভটা জানালেন। "আমাদের সামনে কি কথা বলা যেত না ?"

"যেত, তবে কি না আমি অত্যন্ত গুরুতর একটা ব্যাপার নিয়ে, মানে একটি তরুণের বড় হওয়ার চেষ্টাকে সাহায্য করার একটা কাজ নিয়ে ফেলেছি। তাই বুদ্ধিটাকে থিতিয়ে নিয়ে, মানে অবাস্তব কথাবার্তা থেকে সরে গিয়ে এখন কাজে নামা দরকার।" ভটচায এত আন্তরিক ও গম্ভীর হয়ে কথাগুলো বললেন যে, দত্ত পর্যন্ত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে ফেললেন, "তা তো বটেই।"

"মলা, তা হলে ফোন কর।" ভটচায নির্দেশ দিয়ে চেয়ারে টান হয়ে বসলেন।

শ্যামলা ডায়াল করে ঘরের সকলের দিকে নার্ভাস চোখে একবার তাকাল।

"হ্যালো, এটা কি ঘুনু মিত্তিরের বাড়ি ?... তিনি কি আছেন ?
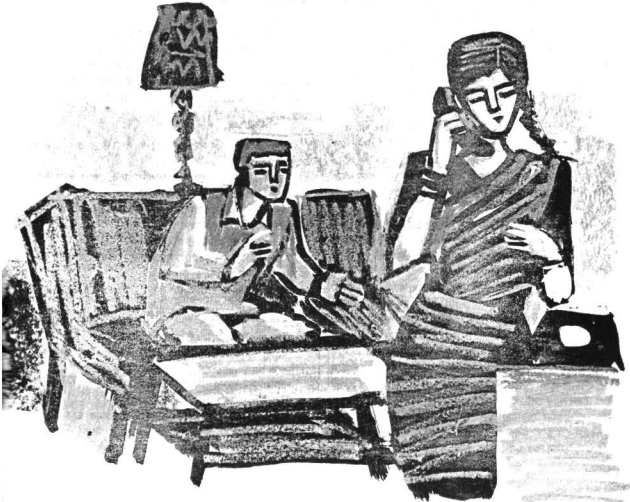
...আমি ? আমি সমীরণ গুপ্তর বাড়ি থেকে বলছি, ওর বোন। ...ঘুমোচ্ছেন ? খুব জরুরি একটা দরকার, যাত্রীর জন্য একটা ইনফরমেশন দেব যেটা ওঁর খুব কাজে লাগবে ... আচ্ছা ধরছি।"

শ্যামলা ঘরের ওপর চোখ বুলিয়ে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল। প্রত্যেকের চোখমুখ, এমনকী বসার ভঙ্গিতে সিঁটিনো ভাব। যেন তার ওপরই নির্ভর করছে সমীরণের মুক্তি।

"হ্যালো কাকাবাবু, আমি নাকুর বোন মলা। আমাদের বাড়িতে ঘণ্টাখানেক আগে.", শ্যামলা ঝপ করে গলার স্বর নামিয়ে বলল, "বিনু জন এসেছে। ...বিনু জন, বিনু জন কেরলের। বাঙ্গালোর ক্যাম্পে দাদার সঙ্গে তো ওর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। অনেকবার বলেছে তোমাদের বাড়িতে যাব, কয়েকদিন থেকে কলকাতাটা দেখব। তা সারথির লোকেরা তোঁ তিন-চারবার ওর কাছে গেছল। শেষে ওর বাবার হাতে অ্যাডভান্স ধরিয়ে দিয়েছে ... দাদার কাছেই কথা কাল রাতে শুনেছি। তা সেই বিনু জন সই করার জন্য চ... এসেছে। কিন্তু এয়ারপোর্টে সারথির কেউ ছিল না। বোধ হয় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমাদের ঠিকানাটা ওর কাছে ছিল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আমাদের বাড়ি চলে এসেছে। ... কাকাবাবু, আমার মেজো ভাই কানু, ও বলল, তুই লুকিয়ে চট করে ঘুনুদাকে ফোন করে ব্যাপারটা বল। সারথির হাতে পড়ার আগেই বিনু জনকে যেন যাত্রীর ক্যাম্পে উঠিয়ে নিয়ে যায় ... য়্যা, ফোনটা বিনু জনকে দিতে বলছেন ?" শ্যামলা ঢোক গিলল। ভটচায ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে, নিজের বাড়ির দিকে আঙুলটা তুলে, কানে অদৃশ্য ফোনের রিসিভার ধরলেন।

"কাকাবাবু, আমি এখানকার ভটচাযবাড়ি থেকে ফোন করছি। ... কী বললেন ? বিনু সম্পর্কে আর ইন্টারেস্টেড নন ? অ, আচ্ছা ... না না আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই, ভাবলাম যাত্রীর যদি এতে লাভ হয়, অন্তত ওকে আটকে রেখেও সারথিকে বঞ্চিত করে ... হ্যাঁ, নমস্কার।"

শ্যামলা হতাশ চোখে সবার দিকে তাকিয়ে রিসিভার রাখল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন রেখা গুপ্ত। ভটচায মাথা চুলকোচ্ছেন, মালবিকা কপালে ঠুকলেন হাতের মুঠি। জি. সি. দত্ত 'ঘোঁত' ধরনের একটা শব্দ মুখ থেকে বের করে কী একটা বলতে যাচ্ছেন তখনই ফোন বেজে উঠল।

শ্যামলা রিসিভার তুলতে যাচ্ছে, ভটচায চিৎকার করে উঠলেন, "না, না, তুমি নও। হয়তো ঘুনু মিত্তিরই ফোন করে তোমার কথাটা যাচাই করতে চায়। মিস গুপ্ত, আপনি ধরুন, বলবেন বিনু জন এখন বাড়ি নেই, রান্না-করা কিছু নেই, কানু ওকে খাওয়াবার জন্য 'তারামা'য় নিয়ে গেছে। মহা ঘাঘু লোক, এটা মনে রাখবেন।"

"মিথ্যে কথা বলব ?" রেখা গুপ্ত অসহায়ভাবে তাকালেন।

"হ্যাঁ মিথ্যে বলবেন, নাকুর জন্যই বলবেন।" জি. সি. দত্ত-র দারোগাগর্জনে তিনটি হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠলেও চতুর্থজন সটান হয়ে ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

"হ্যালো ... ওহ নমস্কার, আমি নাকুর পিসিমা বলছি। ... ফোন ধরার তো কেউ নেই, আমি শয্যাশায়ী, কাল ছাদ থেকে নামাবার সময় আমি নিজেই পড়ে গিয়ে... এখন একটু ভাল আছি। সকালে উঠতে পারিনি, রান্নাবান্নাও কিছু হয়নি, এদিকে নাকুর এক বন্ধু, কী যেন নাম বলল পিনু না বিনু, সে এসে হাজির। ঘরে খাবারদাবার নেই, তাই কানুকে বললাম তারামা থেকে কিছু এনে দে, বেচারা কখন প্লেনে উঠেছে, উপোস করে আছে ... ছেলেটি তো এখন বাড়ি নেই, কানুর সঙ্গে বেরিয়েছে। বাঙালির মিষ্টি কত রকমের, কেমন চেহারার হয় দেখার খুব ইচ্ছে, তাই ওর সঙ্গে দোকানে গেছে। মলাটাও যে শুট করে কোথায় বেরোল ! তা কী জন্য ফোন করছেন ? নাকু ভাল আছে তো ? ... অ, আচ্ছা আচ্ছা, কানুকেই বলব পিনু জনকে যা হোক করে বসিয়ে রাখতে, আপনি এসে ওকে নিয়ে যাবেন ... নমস্কার।"

রেখা গুপ্ত কাঁপা হাতে রিসিভারটা রাখার সঙ্গে-সঙ্গে শ্যামলা "পিসি ... গো ও ও ও ল।" বলে দু' হাত তুলে ভাংড়া নাচের মতন শরীরটা ঝাঁকাল।

মালবিকা জড়িয়ে ধরলেন রেখা গুপ্তর দুটি হাত। "আমি এতক্ষণ ভগবানকে ডাকছিলাম, হে ভগবান, রেখা যেন গুছিয়েগাছিয়ে মিথ্যে কথাটা বলতে পারে।"

"মনে হচ্ছে খুব আন্তরিকভাবেই ডেকেছেন। আমারও ভয় হচ্ছিল এই বুঝি গুবলেট করলেন। তবে এজন্য দত্তবাবুই ক্রেডিট পাবেন। নাকুর নামটা না করলে উনি এত শক্ত হতে পারতেন না।" ভটচায সপ্রশংস নজরে দত্তর বুকের ছাতি ও বাইসেপস ফুলিয়ে দিলেন।

"আর দেরি নয়, দেরি নয়, আমাদের জেলখানা কোনটে হবে ?" মালবিকা তাড়া দিলেন ?

সবাই তাকাল দত্তর দিকে। এ-ব্যাপারে পুলিশের অভিজ্ঞতার কাছে তাদের হাত পাততেই হবে। জি. সি. দত্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঘরগুলো আগে দেখব।"

শ্যামলাকে নিয়ে তিনি তিনটি শোবার ঘর, তাদের গ্রিল, জানলা, দরজা, মায় দেওয়াল পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে পরখ করলেন। রান্নাঘরে, এমনকী বাথরুমেও ঢুকলেন। দোতলায় উঠে সুনীলবরণের ঘর দেখলেন।

"ছাদের ঘরটাই মনে—"

"না। দাদার ঘরে ওইসব পাজি লোক ঢোকাব না।" রেখা গুপ্তর কঠিন গলা দত্তকে দ্বিতীয় নির্বাচনে ঠেলে দিল।

"তা হলে কোণের ওই ছোট ঘরটা।" দত্ত অনুমোদনের জন্য রেখা গুপ্তর দিকে তাকালেন।

"কানুর ঘর, হ্যাঁ হতে পারে।"

এর পর দত্তর নির্দেশে দালানের জানলা বাদ দিয়ে সব ঘরের জানলা বন্ধ করা হল। চাপা গলায় তিনি বলতে লাগলেন, "ফটক খোলা থাক। বেল বাজলে মলা দরজা খুলে ওকে সোজা নিয়ে যাবে কানুর ঘরে। এই সময়টা খুবই ক্রুশিয়াল, একটু সন্দেহ হলেই কিন্তু পালিয়ে যেতে পারে। বিছানায় শুয়ে থাকবেন মিস গুপ্ত, চাদর মুড়ি দিয়ে। লোকটা ঘরে ঢুকলেই আমি ছুটে এসে দরজা বন্ধ করে দেব।"

"তারপর আমি কী করব ?" রেখা গুপ্ত ভয়ে-ভয়ে জানতে চাইলেন।

"দরজা বন্ধের শব্দ পেলেই আপনি চাদর ফেলে লাফ দিয়ে উঠবেন। তারপর আপনি জাপটে ধরবেন লোকটাকে।"

"এ আপনি কী বলছেন, রেখা জাপটে ধরবে ?" মালবিকা প্রতিবাদ এবং ভর্ৎসনা করলেন।

"খোকাকে তো আমি জাপটেই—"

"দত্তবাবু,এ খোকা নয়, খোকার জ্যাঠা ! অন্যভাবে ধরার প্ল্যান করুন।" ভটচাযকে বিরক্ত দেখাল।

"তা হলে একটা ডাণ্ডা হাতে রাখুন। লাফ দিয়ে উঠেই সেটা মাথায়—।"

"তারপর সত্যিকারের থানা, পুলিশ, জেল হোক রেখার।" মালবিকা হাত তুলে মনে হল ডাণ্ডাটা ধরলেন।

"আচ্ছা আমরা তো তখন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে ঘুনু মিত্তিরকে ঘিরে ধরতে পারি, গায়ে হাতটাত না দিয়েই।"

শ্যামলা সমাধানের পথ বাতলাল।

"হ্যাঁ, তাও হতে পারে।" দত্ত হাঁফ ছাড়লেন।

অতঃপর রেখা গুপ্ত একটা চাদর নিয়ে কানুর ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অন্যরা দরজা ভেজিয়ে নাকুর ঘরে বসে রইলেন। দালানে পায়চারি করতে লাগল শ্যামলা।

অবশেষে পতু ঘোষের সবুজ মারুতি ফটকের সামনে থামল। শ্যামলা পরদা ফাঁক করে জানলায় উঁকি দিয়ে দেখল ঘুনু মিত্তির ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নামলেন এবং পেছনের সিটে বসা দুটি লোককে কী যেন বললেন। তারপর পকেট থেকে ডিবে বের করে নস্যি নাকে দিয়ে কিছুটা ইতস্তত করে ডিবেটা ড্রাইভারের হাতে জমা দিলেন।

সঙ্গে দুটো লোক! শ্যামলা রীতিমত ঘাবড়ে গেল। এটা তো হিসাবের মধ্যে রাখা হয়নি! লোক দুটো যদি অপেক্ষা করে-করে ঘুনু মিত্তিরকে বেরিয়ে আসতে না দেখে তখন তো খোঁজ করতে বাড়ির মধ্যে আসবে। সঙ্গে নিশ্চয় চেম্বার আছে। প্লেয়ার তুলতে এসব তো সঙ্গে রাখতেই হয়। তা হলে উপায়?

শ্যামলা দৌড়ে কানুর ঘরে এসে দেখল চাদর ঢেকে শুয়ে থাকার বদলে পিসিমা খাটের ওপর কাঠ হয়ে বসে, হাতে চাদর।

"সব্বোনাশ হয়েছে পিসি, লোকটার সঙ্গে আরও দুটো লোক। তারা অবশ্য গাড়িতেই বসে।"

ডোর-বেল বাজল।

"মলা, আমি কী করব?" করুণ মুখে রেখা গুপ্ত বললেন।

"যা বলা হয়েছে তাই করো, চাদর-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো।" শ্যামলা ঠেলা দিয়ে রেখা গুপ্তকে বিছানার ওপর ফেলে চাদর দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দিল।

দ্বিতীয়বার বেল বাজার সঙ্গেই দরজা খুলল শ্যামলা। "ওহ আপনি এসে গেছেন।" গলা নামিয়ে এর পর বলল, "খুব টায়ার্ড, ও ঘরে ঘুমোচ্ছে। আপনি এখন এখানেই বসুন।"

"সব বন্ধ কেন, অন্ধকার-অন্ধকার লাগছে।" ঘুনু মিত্তির চেয়ারে বসলেন হাসি-হাসি মুখে। "তুমি মা খুব বুদ্ধিমতী। ছেলে হলে তোমাকে ট্রেনিং দিয়ে যাত্রীর রিক্রুটিং অফিসার করে নিতাম। এমন সব বোকাহাবাদের নিয়ে কাজ করতে হয়! বিনু জন যে কলকাতায়, এটা তুমি না জানালে আমি জানতেই পারতাম না।"

"ওকে এখন কোথায় নিয়ে যাবেন?"

"দেখি কোথায় রাখা যায়।"

"কিন্তু ও তো সারথিতে খেলবে বলে এসেছে, আপনার সঙ্গে যাবে কেন?"

"আহা, আমি তো সারথিরই লোক।" ঘুনু মিত্তির ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ টিপলেন। "ও কি আর চেনে কে যাত্রীর আর কে সারথির! সইসাবুদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও আমাদের কাছে থাকবে।"

"যেমন দাদাকে আপনারা রেখে দিয়েছেন। কিন্তু কাকাবাবু, দাদাকে এই মুহূর্তেই যে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। বাঙ্গালোর থেকে আজ ট্রাঙ্ককল এসেছে, ইন্ডিয়া টিম চেকোস্লোভাকিয়া ট্যুরে যাচ্ছে। দাদাকে এক্ষুনি বাঙ্গালোর ফিরে যেতে হবে। সুতরাং সমীরণ গুপ্তকে এখনই বাড়িতে পাঠিয়ে দিন, কাল ভোরের ফ্লাইটে সে বাঙ্গালোর যাবে।"

"ইম্পসিব্‌ল। নাকুকে আমি ছাড়ব না। ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন হয়ে, ইন্ডিয়ার হয়ে খেলে ওর কি ল্যাজ গজাবে? কী পাবে ও? তোমরা অত দেশ-দেশ করে চ্যাঁচাও কেন? চেকোস্লোভাকিয়ায় গিয়ে দশটা ম্যাচ খেলে তো চল্লিশটা গোল খেয়ে আসবে। কটা টাকা পাবে দেশের হয়ে খেলে? এসব চিন্তা ও ছাড়ুক। তার থেকে ক্লাবে খেলুক, টাকা কামাক, অর্জুন-ফর্জুন হোক, তারপর কোচিংয়ে নামুক। তাতেও ভাল পয়সা, অফিসেও উন্নতি করুক। অফিসার হোক, ব্যস বাঙালির ছেলের জীবনে আর কী চাই?"

"হ্যাঁ, আরও চাই। মনের গভীরে একটা সুখ, যেটা লাখ-লাখ টাকা আয় করেও মেলে না। এটা আমার নয়, দাদার কথা। আপনি আমার দাদাকে এনে দিন।"

"নাকু আমার অনেকদিনের টার্গেট, ওর আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। ভগবান যখন পাইয়ে দিয়েছেন তখন আর হাতছাড়া করব না।"

"সেক্ষেত্রে, আপনিও আর এ-বাড়ির বাইরে যেতে পারবেন না।" শ্যামলা দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এবার চেয়ারে বসল।

"তার মানে?"

"যেভাবে দাদাকে আটকে রেখেছেন, সেইভাবে আপনিও এই বাড়িতে আটকা থাকবেন। সে ছাড়া পেলে আপনিও পাবেন।"

"তা হলে বিনু জনের ব্যাপারটা ধাপ্পা?"

"পুরোপুরি।"

"তা হলে জেনে রাখো, নাকুকে আমি ছাড়ব না। তোমরা যা করতে পার করো।"

"তা হলে যেটা পারি তা হল, একটা-একটা করে আপনার হাত, পা আমি ভাঙব, চোখ দুটো উপড়ে নেব!"

ঘুনু মিত্তির আর শ্যামলা চমকে চেয়ার থেকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। রেখা গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর দু' চোখে ঠাণ্ডা চাহনি। অত্যন্ত ঠাণ্ডা চাহনি। ঘুনু মিত্তিরের দু' হাতে কাঁটা উঠল। ঘাড়টা সিরসির করছে।

"নাকুর জীবন যাত্রীর নয়, সারথির নয়, আপনার নয়, আমারও নয়, নাকুর জীবন নাকুরই। সেই জীবন যা চায় তাইই করবে। আপনি তা করতে দেবেন না। তা হলে আমিও—"। রেখা গুপ্ত দু' হাতে ঘুনু মিত্তিরের কলার ধরলেন, "আমিও আপনার স্বাধীনতা কেড়ে নেব।"

একটা হ্যাঁচকা টানে ঘুনু মিত্তির টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়লেন। তাঁর দুটি হাত পিছমোড়া করে ধরে একটু ঝুঁকে ঘুনুর কানের কাছে মুখ এনে, রেখা গুপ্ত বরফের মতো গলায় বললেন, "প্রথমে দুটো হাত, তারপর দুটো পা। সারাজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে।" বলেই তিনি হাতে মোচড় দিলেন।

ঘুনু মিত্তির যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন। শ্যামলা চোখ বন্ধ করে ফেলল। পিসির এই মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি। নাকুর ঘরের দরজার পাল্লা ঈষৎ ফাঁক হল এবং বন্ধ হয়ে গেল।

"আমার দুটো ছেলেকে মোটরে রেখে এসেছি, আমি কিন্তু এবার চ্যাঁচাব।"

"তা হলে ঘাড় মটকে দিয়ে চেঁচানি বন্ধ করে দেব।" রেখা গুপ্ত কথার সঙ্গে-সঙ্গে হাতে আবার মোচড় দিলেন। আবার আর্তনাদ।

"ফুটবল-টুটবল আমি বুঝি না। এই তিনটে ছেলেমেয়েকে অনেক কষ্টে বড় করেছি। এরা আমার বুকের তিনটে পাঁজর। এর একটা ভেঙে দিলে আমি মরে যাব। আর জেনে রাখুন, মরতে যদি হয় তো মেরে মরব, ফাঁসিতে যেতে হয় তো যাব।"

তাঁর গলার দু'পাশের পেশি ফুলে উঠেছে। রক্ত জমে মুখ লাল। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে রয়েছে দাঁতে দাঁত চাপার জন্য। রেখা গুপ্ত শেষবারের মতো একটা মোচড় দিয়ে ঘুনু মিত্তিরকে ছেড়ে দিলেন। ঘুনু নিথর হয়ে টেবিলের ওপর থুবড়ে পড়ে রইলেন। দুটো হাত ঝুলছে।

"এখুনি টেলিফোন করে বলে দিন, নাকুকে যেন পৌঁছে দিয়ে যায়, নইলে—" এবার দুটো তালু সাঁড়াশির মতো ঘুনুর ঘাড়ে এঁটে বসল। "আমার শরীরে অল্পস্বল্প জোর আছে। এই ঘাড়টা ইচ্ছে করলেই—"। দশটা আঙুলের ব্যূহ ছোট হয়ে এল ঘুনুর শীর্ণ গলাটি ঘিরে।

এবার আর আর্তনাদ নয়, চাপা কান্নার মতো আওয়াজ হতেই হুঁশ ফিরে এল শ্যামলার। এগিয়ে এসে রেখা গুপ্তকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ধমকে উঠল, "পিসি, তুমি কি পাগল হলে? এখুনি দমবন্ধ হয়ে মরে যেত।" তারপর ঘুনুকে মিনতির সুরে সে বলল, "কাকাবাবু, পিসিকে থামানো যাবে না। আপনি ওর কথা

শুনুন, ফোন করে দিন।"

ঘুনুর চোখ বন্ধ, মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না। শুধু মাথাটা নাড়লেন।

"ফোন করবেন ?"

"হ্যাঁ। আমার হাতে কোনও জোর নেই, নাড়াতে পারছি না।" হাঁফাচ্ছেন। দুই চোখে ছেয়ে রয়েছে আতঙ্ক।

"আপনি বসুন, আমি ডায়াল করে রিসিভারটা আপনাকে দিচ্ছি।"

শ্যামলা যখন ডায়াল করছে, রেখা গুপ্ত তখন প্রায় ছুটেই কানুর ঘরে চলে গেলেন।

"হ্যালো, এটা কি পতু ঘোষের বাড়ি ?...একটু ধরুন, ঘুনুদা কথা বলবেন...হ্যাঁ, ঘুনু মিত্তির।"

রিসিভারটা ঘুনুর হাতে তুলে দেওয়ার সময় শ্যামলা মুখ ঘুরিয়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল, চাদরে নিজেকে ঢেকে নিয়ে পিসি বিছানায় উপুড় হয়ে। ফুলে-ফুলে উঠছে পিঠ।

"কে, মানু নাকি ?...শোন, নাকু কোথায় ?...আচ্ছা, ওকে এখুনি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যা।" ঘুনু আড়চোখে শ্যামলার মুখটা দেখে নিলেন। শ্যামলা মাথা নাড়ল। "একটা ট্যাক্সি করে নে, ওর যা জিনিস আছে সে-সবও যেন নিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি করিস, নইলে—"। ঘুনু রিসিভারটা তুলে দিলেন শ্যামলার হাতে।

"কাকাবাবু আপনি একটু চা খান, আমি করে আনছি।"

ঘুনু সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন কথা না বলে। তারপর ধীরে-ধীরে মাথাটা নামিয়ে টেবিলে কপাল রাখলেন। শ্যামলা রান্নাঘরে গেল। তখন নাকুর ঘরের দরজার একটা পাল্লা সন্তর্পণে খুলে পা টিপেটিপে তিনজন বেরিয়ে এলেন। ফটক পার হয়েই বেগিংয়ের থেকে দ্রুত গতিতে তাঁরা বাড়ির পথ ধরলেন।

"...আই সি ফ্লাইট নাম্বার সেভেন সেভেন ওয়ান ফর বাঙ্গালোর আর রিকোয়েস্টেড টু প্রসিড..."। সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য ঘোষণা হচ্ছে।

শ্যামলা তাড়া দিল, "দাদা, লাইন পড়ে গেছে।"

"পড়ুক।" সমীরণ ব্যস্ততা না দেখিয়ে বইয়ের দোকানের দিকে এগোল। ওখানে খবরের কাগজও বিক্রি হয়। সাড়ে পাঁচটা এখন। এত ভোরে এয়ারপোর্টে কাগজ পাওয়া যাবে কিনা তাই নিয়ে সে উদ্বিগ্ন থাকায় লক্ষ করেনি লোকটিকে।

"দাদা।"

শ্যামলার দৃষ্টি অনুসরণ করে সমীরণ অবাক হয়ে দেখল, লাউঞ্জের একটা চেয়ারে ঘুনু মিত্তির বসে রয়েছেন। কোলে ব্রিফ কেস। বাঁ হাতের কনুইয়ে মোটা ব্যাণ্ডেজ, হাতটা গলায় বাঁধা ব্যাণ্ডেজে ঝুলিয়ে বুকের কাছে তুলে রাখা। ঘুনু তাদের দিকেই নির্বিকার মুখে তাকিয়ে রয়েছেন। "আপনি এখন এখানে ?" সমীরণ বলল।

"খাংমাকে ধরতে যাচ্ছি। আমার প্লেন আটটা-চল্লিশে, একটু আগেই এসে গেলাম। ...তুই সত্যি-সত্যিই বাঙ্গালোর যাচ্ছিস না ধাপ্পা মেরে বটার ঘরে উঠছিস সেটা তো দেখতে হবে।" ঘুনু মিত্তিরের গলায় কোনওরকম আবেগ নেই। বারো ঘণ্টা আগে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, মনে হচ্ছে না তার কণামাত্রও তিনি মনে করে রেখেছেন।

"ট্যুর থেকে ফিরে এসেও তো দাদা সই করতে পারবে আর করলে পিসি যা বলেছে, সেই ক্লাবেই করবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হাঁসফাঁসানিটা শ্যামলার গলা থেকে বেরিয়ে এল।

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে বলছ ?" ঘুনু মিত্তিরের মুখের নির্বিকারত্ব মুছে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল।

"ভি আই পি রোডের ওপর নিলডাউন হয়ে থাকার চেয়ে আপনার হাতে ধরা দেওয়া অনেক ভাল।" সমীরণের মুখও নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল।

ঘুনু মিত্তির ডান হাতটা সেলামের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "তোর পিসিকে নমস্কার।"

সিকিউরিটি চেকিংয়ের জন্য দ্বিতীয় ডাক শোনা গেল।

"নাকু একটা কথা বলে রাখি, তোর কাছে দেশ যেমন বড়, আমার কাছে তেমনই ক্লাব...আমি ক্লাবের কাজ হাসিল করার জন্য নিজেকে যতটা ঢেলে দিই, আশা করব তুইও দেশের কাজটা সেইভাবে করবি।" তারপরই চোখ টিপে নিচু গলায় বললেন, "কিন্তু পা বাঁচিয়ে।"

মরুভূমির তরুলতা

চঞ্চল পাল

সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত হার মানতে চায় না প্রাণ। বিস্ময়কর তার মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। একফোঁটা জলের জন্য যেখানে মাথা খুঁড়ে মরতে হয়, প্রখর সূর্যের তাপে যেখানে চাঁদি ফেটে যাওয়ার জোগাড়, মাটিতে তপ্ত বালির ছ্যাঁকায় যেখানে পায়ে ফোসকা পড়া আশ্চর্য নয়, সেই ধু-ধু মরুভূমির নির্জলা রুক্ষতাতেও প্রাণের স্পন্দনকে থামিয়ে রাখা যায়নি। মানুষের বুদ্ধি আছে, চিন্তাশক্তি আছে ; তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা হয়ে উঠেছে তার মুশকিল-আসান। কিন্তু অবলা গাছপালার জন্য এই প্রতিকূল পরিবেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতি নিজেই। তাই সহজাতভাবেই এদের দেহের বৈশিষ্ট্য আর জীবনধারণ পদ্ধতি এমনভাবে গড়ে উঠেছে, যাতে মরুভূমিই হয়ে ওঠে তার প্রিয় বাসভূমি।

কে কখন গোড়ায় জল দেবে তার জন্য যেন বসে থাকতে রাজি নয় 'ম্যাসকুইট' গাছ। সে প্রত্যাশা করাও তো বৃথা, কারণ মেক্সিকোর মরুভূমিতে লোকজনও নেই, বৃষ্টিও ছিটেফোঁটা পড়ে কি পড়ে না। কিন্তু প্রকৃতি তাদের জানিয়ে
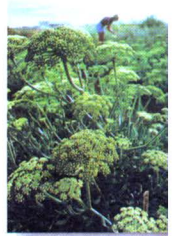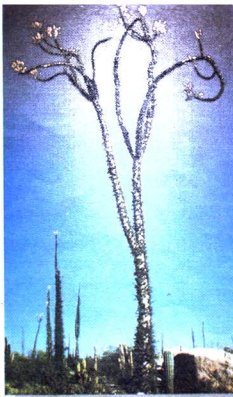
দিয়েছে যে, অনেক দূর মাটি খুঁড়লে জল পাওয়া যেতে পারে। তাই যেখানে বালির আস্তরণ কম, সেখানে এই গাছ শিকড় ছড়াতে শুরু করে। ক্রমশ এই শিকড় মাটির নীচে নামতে-নামতে চলে যায় অবিশ্বাস্য গভীরতায়— ১৭৫ ফুট পর্যন্ত। অবশ্য তার আগে যদি জলের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে আর এত কষ্ট করার দরকার হয় না, ৩০ থেকে ৫০ ফুট গিয়েই শিকড়গুলো থেমে পড়ে। মাটির এত নীচেও তরল জলের ধারা না পাওয়া গেলে ক্ষতি নেই। কারণ এখানকার মাটিতে পৌঁছয় না তাপ, তাই জল উবে না গিয়ে মাটি বেশ ভেজা-ভেজা থাকে। জল শুষে নেওয়ার ব্যাপারেও এদের ক্ষমতা বিস্ময়কর। সাধারণ মাটিতেও এই গাছের পাশে অন্য কোনও গাছ
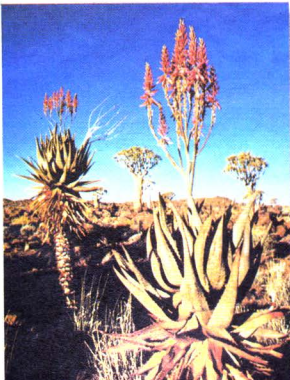
বাঁচতে পারে না। কারণ মাটির সব রস এরা একাই শুষে নেবে। ম্যাসকুইটকে বলা যায় শিকড়সর্বস্ব গাছ। ডালপালা তেমন ঘন হয় না। বীজ থেকে প্রথমে একটা অঙ্কুর বা শিকড় মাটির নীচে কিছুদূর এগিয়ে যায়। এর কাজ হচ্ছে মাটির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা। যদি সে বুঝতে পারে যে, সেই মাটির নীচে জল থাকতে পারে তবেই মাটির ওপরে ডালপালা ছড়াতে শুরু করে।

ক্যাকটাস জাতীয় গাছ দিয়ে অনেকেই ঘর সাজান। নিয়মিত জল দেওয়ার ঝামেলা নেই, গায়ে রোদ লাগানোর দরকারও নেই। এদের ডালপালা কম, পাতাও নেই বললেই চলে, শুধু আছে অসংখ্য ছোট-ছোট কাঁটা। এই কাঁটাগুলোর জন্য বেশিরভাগ জীবজন্তু এড়িয়ে তো চলেই, তা ছাড়া গাছের গায়ে মসৃণ সমতলের পরিমাণও কমে যায়। ফলে, শরীরের ভেতরের জলীয় পদার্থ সহজে উবে যেতে পারে না। সুতরাং ক্যাকটাস যে মরুভূমির রুক্ষতার সঙ্গে যুঝতে পারবে, তা বলাই বাহুল্য। উত্তর আমেরিকার 'সাগুয়ারো' নামে এরকম ক্যাকটাস জন্মায়, যার ভেতর কয়েক গ্যালন জল জমে থাকতে পারে। দেখে মনে হবে, যেন একটা সবুজ রঙের লাঠি মাটিতে পোঁতা আছে। সামান্য দু-একফোঁটা বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই, আবহাওয়ায় আর্দ্রতা সামান্য একটু বাড়লেই হল, সঙ্গে-সঙ্গে এরা জল আহরণ করতে শুরু করবে। এদের শিকড়গুলোও এই কাজের উপযোগী। কারণ শিকড়গুলো মাটির গভীরে না গিয়ে মাটির উপরিতলের কাছাকাছি থেকেই অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বাতাস ও মাটির জলীয় অংশ উবে যাওয়ার আগেই এরা নিজের শরীরে টেনে নিয়ে জমিয়ে রাখে। কিন্তু প্রচণ্ড উত্তাপে এই গাছের গা থেকে জল উবে যায় না কেন? সেটাও প্রকৃতির এক আশ্চর্য কাণ্ড। এদের গায়ে পরানো থাকে বর্ম। মোমের মতো একরকম আঠালো পদার্থ শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে এসে শক্ত হয়ে যায়। মোমের এই আস্তরণটা একেবারেই তাপ-পরিবাহী নয়। ফলে বাইরের তাপ ভেতরে আসতেই পারে না। মোমের এই চাদর গায়ে জড়াতে-জড়াতে এরা সমস্ত শরীরকে একটু-একটু করে সইয়ে নিতে থাকে। তাই এদের বৃদ্ধি এত কম যে, একটা গাছ পুরো লম্বা হতে একশো বছর লেগে যেতে পারে।
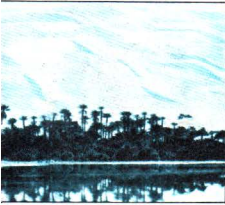
মোমের এই বর্ম পরার কৌশলটা মরুভূমিতে এতই উপযোগী যে, ক্যাকটাস ছাড়া অন্য ধরনের গাছগুলোও তা ক্রমশ শিখে নিচ্ছে। উত্তর আমেরিকার মরুভূমিতে 'ক্যানডেলিয়া' নামে একরকম প্রজাতির গাছ পাওয়া গেছে, যাদের গায়ে

একটুও কাঁটা নেই কিন্তু পাতাবিহীন লম্বা ডালগুলোতে লেপটে থাকে মোমের আস্তরণ। রোদ্দুরে এই আস্তরণটা বেশ চকচক করতে থাকে। ফলে ভেতরের জলীয় অংশ তো বেরোতেই পারে না, তার ওপর চকচকে গায়ে রোদ্দুর প্রতিফলিত হওয়ার জন্য উত্তাপও অনেক কম ঢুকতে পারে। বসন্তের প্রাক্কালে আর গ্রীষ্মের শেষে কমলা-লাল রঙের ফুল ফুটিয়ে এরা যেন 'মরু বিজয়ের কেতন' ওড়ায়।

তা বলে যে পাতাওলা গাছ মরুভূমিতে দেখতেই পাওয়া যায় না, তা নয়। তবে এইসব পাতার কারিকুরি একটু আলাদা। ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকে 'বুজাম' আর 'অকোটিলোস' গাছ। এদের ডালগুলো দেখতে অক্টোপাসের পায়ের মতো। শাখা-প্রশাখা খুব কম, বড় জোর গোটাদশেক। যেই বাতাসে আর্দ্রতা একটু বাড়ে অমনই ডালগুলোর গায়ে ছোট-ছোট গোল পাতা গজিয়ে ওঠে। এই সময় আলোক-সংশ্লেষণের কাজকর্ম পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। তারপর গরমকালের আভাস দেখা দিলেই পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে পড়তে শুরু করে। পাতার বোঁটাগুলো এমনভাবে খসে পড়ে যে, ডালের গায়ে একটুখানি সরু ছুঁচলো অংশ আটকে থাকে, যা ক্রমশ শক্ত কাঁটায় পরিণত হয়। যখন সব পাতা খসে যায়, তখন গাছের স্বাভাবিক কাজকর্ম খবুই কমে যায়। ফলে এই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় জীবনীশক্তি জোগাবার ইন্ধন অনেক কম লাগে। অর্থাৎ, আর্দ্রতার সময় পাতাগুলো যে খাদ্য ও জল আহরণ করে রাখে তা খুব সামান্য পরিমাণে খরচ হতে থাকে। তা ছাড়া, পাতার বোঁটা খসে যাওয়ার জায়গায় যে ছিদ্র তৈরি হয়, তাও বন্ধ করে দেয় মোম জাতীয় রস। তাই অত্যধিক গরমেও গাছের শরীরের জলীয় অংশ আর উবে বা শুকিয়ে যেতে পারে না। গ্রীষ্মকাল শেষ হলেই আবার আরম্ভ হয় যাবতীয় কাজকর্ম এবং শুরু হয় সাদা সাদা ফুল ফোটানোর পালা।

আফ্রিকার মরুভূমিতে 'অ্যালো' গাছের প্রচুর পাতা, আকৃতিও খুব বড়। কিন্তু এরা পাতা খসায় না। কারণ প্রকৃতি এই পাতাগুলোকে এমনভাবে গড়েপিটে নিয়েছে, যাতে রুক্ষতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এগুলো সাধারণ গাছের পাতার মতো হাল্‌কাও নয় আর সহজে ছেঁড়াও যায় না। হাত দিলে মনে হবে যেন রবার বা চামড়ার তৈরি। করাতের মতো পাতার ধার বরাবর এমনই খাঁজ কাটা যে, অসাবধানে হাত দিলে ছড়ে যেতে পারে। খাবার তৈরি করতে আর শরীরের ছিদ্র বন্ধ করতে এরা আশ্চর্য পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। রাত্রে এরা বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে নেয়। সারা রাত সেই অ্যাসিড পাতার কোষে জমা থাকে। দিনেরবেলা সেই অ্যাসিড থেকে আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়। জল ও সূর্যালোকের সাহায্যে এই গ্যাস থেকে তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট—যা আসলে গাছের খাদ্য। খাবার তৈরির উপকরণ হিসাবে জল,

কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও সূর্যালোককে সব ধরনের গাছই কাজে লাগায়। তবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড রাত্রে জমিয়ে রাখার ক্ষমতা অ্যালো গাছ ছাড়া আর কারও

নেই। তার ওপর পাতার গায়ে যেসব সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, যা দিয়ে বাইরের পদার্থ ও শক্তি তারা ভেতরের দিকে টেনে নেয়, সেগুলো ইচ্ছেমতো বন্ধ করার ক্ষমতাও তাদের আছে। বিশেষত দারুণ গ্রীষ্মে ও খরার সময় একনাগাড়ে অনেকদিন তারা ছিদ্র বন্ধ করে বসে থাকতে পারে। কিন্তু সেইসময় তারা কার্বন-ডাই-অক্সাইড আহরণ করবে কী করে ? তার দরকারই নেই, কারণ উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেট বিশ্লিষ্ট করেও তারা কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি করে নিতে পারে। দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও জীবনীশক্তির এত সঞ্চয় শুধু নিজের কাজেই লাগে না। কিছুটা মধুতে রূপান্তরিত হয়ে আশ্রয় নেয় লাল রঙের থোকা-থোকা ফুলে। মরুভূমির পশুপাখিরাও জানে সে-কথা। তাই এই ফুলের মধু সেইসব পশুপাখিরও তৃষ্ণা মেটায়।

আফ্রিকার 'নামিব' মরুভূমির রুক্ষতার সঙ্গে যুগ-যুগ ধরে যুদ্ধ করে চলেছে আর-এক আশ্চর্য প্রজাতির গাছ। এর পারিভাষিক নাম 'ভেল্‌ভিস্‌চিয়া মিরাবিলিস'। সারা জীবন ধরে এর দুটো মাত্র পাতা গজায়। এই গাছের না আছে কাণ্ড, না শাখা-প্রশাখা। দেখে মনে হয়, পাতা দুটোর বোঁটা যেন সরাসরি মাটিতে পোঁতা আছে। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর থেকেই পাতা দুটো একটু একটু করে বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে লম্বা হয়, চওড়াও হয়। বেশ কিছুটা চওড়া হওয়ার পর পাতা দুটো চিরে যায়। তখন মনে হয় যেন চারটে পাতা তৈরি হয়ে গেছে। আবার সেই ছিন্ন পাতাগুলো দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বাড়তে থাকে। যত লম্বা হয় ক্রমশ তত গুটিয়ে যেতে থাকে। এইভাবে বছরের পর বছর ধরে দুটো আদি পাতা ক্রমশ চিরে-চিরে বহুসংখ্যক হয়ে দাঁড়ায়, লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে অনেক দূর পর্যন্ত। এই ঘটনা চলতে থাকে শত-শত বছর ধরে। এই প্রজাতির সবচেয়ে দীর্ঘায়ু গাছটি বেঁচে আছে প্রায় ২,০০০ বছর, আর তার পাতা দুটো চিরে-চিরে ছড়িয়ে পড়েছে ৪০০ গজ জায়গা জুড়ে। নামিব মরুভূমিতে ভোরবেলায় অতলান্তিক মহাসাগর থেকে ধেয়ে আসে এক বিশেষ ধরনের বায়ুপ্রবাহ, যাতে মিশে থাকে সামান্য কিছু জলকণা। এইটুকু আর্দ্রতাই তার জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। দেখে মনে হয় যেন এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানোর জন্যই এর জন্ম। তা না হলে নামিব ছাড়া অন্য মরুভূমিতে এদের দেখা পাওয়া যায় না কেন ?

উত্তর আমেরিকার 'মোজেভ' মরুভূমিতে এক ধরনের গাছকে যে কেউ বিশাল একটা ফুল বলে ভুল করবে। ঠিক পদ্মফুলের মতো দেখতে। পদ্মের পাপড়িগুলোর মতোই তার পাতাগুলো। অত্যধিক গরমে গাছটা হয়ে যায় পদ্মফুলের কুঁড়ির মতো। পাপড়ির মতো পাতাগুলো একটার-পর-একটা গায়ে গায়ে লেপটে বন্ধ হয়ে যায়। আবার আর্দ্রতার সময় ফোটা পদ্মফুলের মতো পাতাগুলো ছড়িয়ে যেন খুলে যায়। বন্ধ অবস্থায় গাছের সামগ্রিক আয়তন অনেক কমে যায়। ফলে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তাপ-সঞ্চালনও অনেক কম হয়। তা ছাড়া, এই পাতাগুলোর ভেতরের দিকটা সবুজ কিন্তু বাইরের দিকটা ধূসর সাদা। তাই বন্ধ অবস্থায় বেশিরভাগ সূর্যের আলোই সাদা অংশে প্রতিফলিত হয়ে
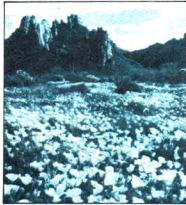
যায়। উত্তাপে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আর-একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেন্দ্রস্থলে আলুর মতো স্টার্চ জাতীয় পদার্থকে ভিজে রাখা। এই অংশটাকেই গাছের প্রাণকেন্দ্র বলা যায়। খুলে থাকা অবস্থায় পাতার সবুজ দিকটা আবহাওয়া থেকে জল আহরণ করে, খাবার তৈরি করে আর স্টার্চ জাতীয় পদার্থকে পরিপুষ্ট করে নেয়। কিন্তু বন্ধ হওয়ার উপায় না থাকলে স্টার্চ জাতীয় পদার্থ কয়েক মিনিটেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। মরুভূমির বহু জায়গাতেই মাটিতে নুনের ভাগ বেশি। স্বাভাবিক গাছপালা জন্মানোর ক্ষেত্রে এই ধরনের মাটি খুবই প্রতিকূল। তাই নোনা মাটির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেড়ে ওঠার জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে এক ধরনের গাছ, যার নাম 'হ্যালোফাইট'। দেখা গেছে, একটু যত্ন নিলেই এই গাছ নোনামাটিতে শুধু জন্মায়ই না, ঘন জঙ্গলেরও সৃষ্টি করতে পারে। সম্প্রতি এই ঘটনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। কারণ, মরুভূমির প্রসার রোধ করতে বা মরুভূমিকে কিছুটা সবুজ করে তুলতে এই গাছের চাষ খুবই সাহায্য করতে পারে। অ্যারিজোনার মরুভূমির একটা বিশেষ জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে এই ধরনের গাছের জঙ্গল সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। সামান্য একটু ছিটেফোঁটা বৃষ্টি মরুভূমির কয়েকটা জায়গায় যে কী আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আজ হয়তো দেখা যাচ্ছে ধু-ধু বালি, জীবনের চিহ্ন কোথাও নেই। তারপর কাল হয়তো একটু বৃষ্টি হল। অমনই দু'দিন বাদে সেখানে গিয়ে দেখা যাবে বালিতে অসংখ্য ছোট-ছোট গাছ আর তার গায়ে সাদা-সাদা ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। কোথায় ছিল এরা ? কচুরিপানার তলায় যেমন থলের মতো
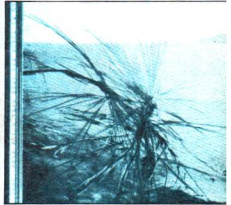
অংশ ঝোলে, এইসব লতার নীচের অংশও অনেকটা সেইরকম। প্রচণ্ড উত্তাপে আর শুকনো অবস্থায় এই অংশটা বালির নীচে লুকিয়ে থাকে। বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এই অংশ থেকে জীবনীশক্তি আহরণ করে লতা বেরোয় মাটি ফুঁড়ে। অর্থাৎ চোখে না দেখা গেলেও এরা কিন্তু উত্তাপেও মরতে চায় না। আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমিতে প্রাণের এই লুকোচুরি খেলা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

তবু, মরুভূমিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এই যেসব কাণ্ডকারখানা, তার কৃতিত্ব কি ওইসব গাছপালার ? না, তা নয়। কেননা, আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। সত্যিকার বুদ্ধি বলতে যা বোঝায় তা তাদের নেই। এটাও কি কম আশ্চর্যের কথা ?

গত চারদিনে তুমুল বৃষ্টি পড়েছে। ঠিক বলা হল না, বৃষ্টিটা তুমুল হচ্ছে রাত্রে, দিনের বেলা টিপটিপিয়ে। আকাশের মুখ হাঁড়িচাচা পাখির চেয়েও কালো। ইতিমধ্যে করলা নদীর পাশের রাস্তাটা ডুবে গিয়েছে। সারা শহর ভিজে।

এই চারদিন বাড়ি থেকে বের হয়নি অর্জুন। স্নান এবং খাওয়া ছাড়া বিছানা থেকে নামেনি । এখন তার বালিশের পাশে পৃথিবীর সব বিখ্যাত গোয়েন্দা গল্পের বই। অবশ্য ইংরেজিতে। সেইসঙ্গে একটা 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকা থেকে বের করা সঙ্কলন। পৃথিবীর রহস্যময় ঘটনাবলী। এই বইটাই সে পড়েছিল সকালবেলায়, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে। গোয়েন্দা গল্পের চেয়ে এই বাস্তব রহস্যকাহিনী অনেক বেশি চনমনে।

এই সময় কেউ একজন কড়া নাড়ল। অর্জুন জানে, মা দরজা খুলবেন। একনাগাড়ে চারদিন ছেলেকে বাড়িতে পেয়ে মা খুব খুশি। একটু বাদেই তিনি ঘরে এলেন, "তোর চিঠি।"

হাত বাড়াল অর্জুন। সাদা খাম। মুখ আঁটা। জিজ্ঞেস করল, "কে দিল?"

"একটা ছেলে এসে দিয়ে গেল।" মা বললেন, "আজ খিচুড়ি খাবি?"

"দারুণ। বৃষ্টিটা যা জমেছে না!"

"কাল কিন্তু বৃষ্টি মাথায় করেও বাজারে যেতে হবে।" মা চলে গেলেন।

খাম খুলল অর্জুন। জগুদার চিঠি।"স্নেহের অর্জুন, আশা করি

সমরেশ মজুমদার

ভাল আছ। গতরাত্রে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি ফিরছিলাম। আজ ভোরে যখন বেরোচ্ছি তখনও বৃষ্টি। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে না পেরে চিঠি লিখে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে। তুমি আজ বেলা একটা নাগাদ শিলিগুড়িতে আমার অফিসে আসতে পারবে? শিলিগুড়ির সেবক রোডে আমাদের ব্যাঙ্ক। শুভেচ্ছা রইল।তোমাদের জগুদা।"

অর্জুন চিঠিটা দু'বার পড়ল। জগুদার মতো মানুষ অকারণে তাকে শিলিগুড়িতে ডেকে নিয়ে যাবেন না। মিনিবাসেই প্রায় পঞ্চাশ মিনিট লাগে। তার ওপর এই বৃষ্টি। ব্যাপারটা কী? সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। এখন গুঁড়ি-গুঁড়ি জল ঝরছে। একটুও ইচ্ছে করছে না বাইরে যেতে। চিঠি খামে পুরে পাশে রেখে সে রহস্যকাহিনীতে মন দেওয়ার চেষ্টা করল। নাঃ, বারেবারে চিঠিটার কথা মনে আসছে। জগুদা খুব সিরিয়াস মানুষ। তাকে বেশ পছন্দ করেন। সে বিছানা থেকে জোরে হাঁক দিল, "মা, তাড়াতাড়ি খিচুড়ি করো, আমি বেরোব।"

ছবি : অনুপ রায়
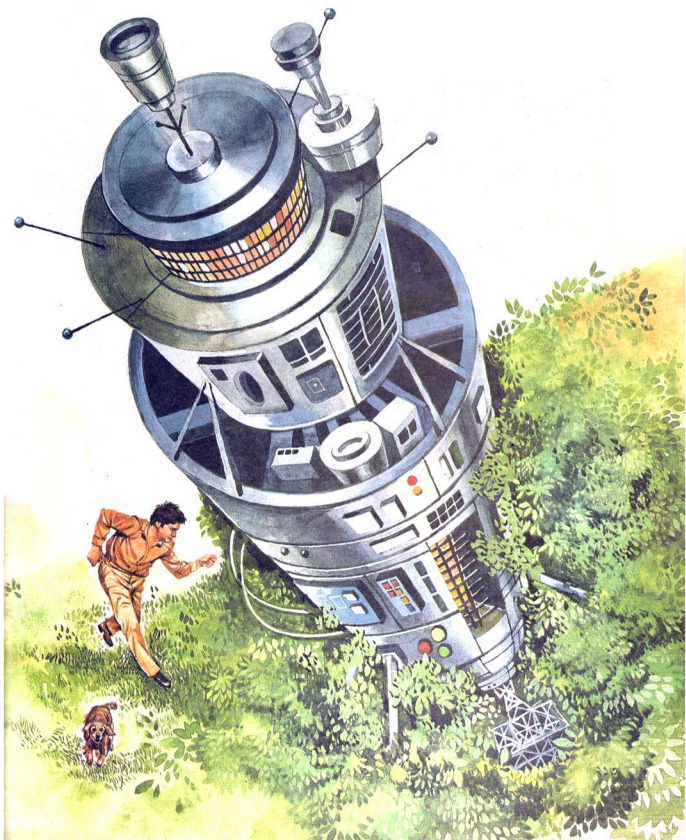
"ওমা, এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবি ?" মায়ের গলা ভেসে এল।
"শিলিগুড়িতে। জগুদা ডেকে পাঠিয়েছেন।"
মায়ের কথাটা নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি। তাই তাঁর গলার স্বর পালটাল। "কখন ফিরবি ?"
"সন্ধের মধ্যেই।" অর্জুন জবাব দিল।

এখন ছাতা হাতে চলা মুশকিল। যা উলটোপালটা হাওয়া বৃষ্টির সঙ্গে বইছে তাতে ছাতি সোজা রাখা যায় না। অর্জুন বর্ষাতি চাপিয়েছিল। মাথায় বারান্দা-দেওয়া টুপি। পায়ে ছোট গামবুট। এই পোশাক পরে দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাস্তায় চললেই নীহাররঞ্জন গুপ্তের গোয়েন্দাকাহিনীর কথা মনে আসে। বিদেশি দু-তিনটে বইতেও এমন চরিত্র সে পড়েছে। গত বছর এখানে অর্জুনের প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন। আলাপ করতে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা, আপনার সন্তু-কাকাবাবুকে ঠিক রহস্যময় গোয়েন্দা মনে হয় না কেন ?" ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন "কীরকম ?"

"এই যেমন ধরুন, একটা বর্ণনা, রাত তখন দুটো, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় কেউ নেই। গ্যাসপোস্টের আলোও ঝাপসা। এই সময় লোকটিকে হেঁটে যেতে দেখা গেল। পরনে ওভারকোট, মাথায় ফেল্টহ্যাট, দু' হাত পকেটে ঢুকিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটায় তার চিবুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। পড়লেই কেমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়. তাই না ?" অর্জুন বোঝাতে চেষ্টা করছিল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, "ওই লোকগুলোকে আজকাল রাস্তাঘাটে তেমন দেখা যায় না। এই যেমন ধরো তুমি, এত নাম করেছ, তোমাকে দেখে মনে হয় কফি-হাউসে আড্ডা মারতে পারো, খেলার মাঠেও চিৎকার করতে পারো। এটাই তো ভাল।"

রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুনের মনে হল তার প্রিয় লেখক এখন তাকে দেখলে কী বলতেন ? সে হেসে ফেলল। কদমতলা পৌঁছে সে আবিষ্কার করল বাস নেই রিকশাও বের হয়নি শহরে। পথেঘাটে মানুষ দেখাই যাচ্ছে না। রূপমায়া সিনেমার পাশে একটা মিষ্টির দোকানের শেড-এর তলায় দাঁড়াতেই শুনল ভেতরে বসা কয়েকজন বলছে ডুয়ার্সের নদীর জল বেশ বেড়ে গিয়েছে। এমনকী কার্নিসের ওপরের দিকে জল ঢুকে পড়েছে। এসব শুনে সে বুঝতে পারছিল না কী করবে এই সময় একটা মিনিবাস এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল। কণ্ডাক্টর চিৎকার করছে "শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি।" অর্জুন মিনিবাসে উঠে দেখল দু'জন যাত্রী বসে আছেন পুরো গাড়িতে। টুপি আর কোট খুলে সে সিটে বসল। জলে জলময় হয়ে যাচ্ছে বাসের ভেতরটা।

জলপাইগুড়ির মোড় ছাড়িয়ে বাসটা যখন শিলিগুড়ির পথে, তখনও অর্ধেক সিট খালি। বৃষ্টির জন্যই খুব দ্রুত যেতে পারছে না গাড়িটা। যাওয়ার পথে যে-ক'টা ছোট নদী পড়ল সেগুলো টইটম্বুর। শিলিগুড়ির থানার সামনে বাস থেমে গেলে নেমে পড়তে হল। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে সকাল থেকেই বৃষ্টি নেই। কিন্তু আকাশের অবস্থা যা, তাতে যে-কোনও মুহূর্তেই

প্রলয় হয়ে যেতে পারে। অর্জুন একটা রিকশা নিল। টাউন স্টেশনের পাশ দিয়ে অনেকটা পথ যেতে হবে এখনও।

ঠিক একটা বাজতে দশে সে জগুদার ব্যাঙ্কে পৌঁছল। জগুদার ভাল নাম অশোক গাঙ্গুলি। জিজ্ঞেস করতেই একজন দেখিয়ে দিল ঘরটা। ঘরে ঢুকতেই জগুদা হাসলেন, "যাক, এসেছ তা হলে। বোসো, বোসো। চা খাবে?"

"খেতে পারি।" অর্জুন তার ওভারকোট আর টুপিটা চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে দিল। বেশ শুকিয়ে এসেছে এর মধ্যে। জগুদা চায়ের হুকুম দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। শিলিগুড়িতে দেখছি বৃষ্টি নেই।"

"ফোরকাস্ট বলছে বিকেলে ভাসাবে। খেয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না কেন জগুদা তাকে ডেকেছেন। এতক্ষণ যেসব কথা হল তাতে জরুরি কোনও প্রয়োজন আছে? সে নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না বলে ঠিক করল। ব্যাঙ্কে জগুদার ওপরে কাজের চাপ আছে। একের পর এক লোক আসছে খাতাপত্র নিয়ে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে সমস্যাগুলো। জগুদা তার মধ্যে বললেন, "আর মিনিট পাঁচেক।"

ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই জগুদা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করলেন, "আসুন, আসুন। কেমন আছেন?"

"আর থাকা। এখনও বেঁচে আছি। বিদেশের হাজারো লোভ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এলাম মন দিয়ে কাজকর্ম করব বলে, তা আর হচ্ছে কই? বসছি!" ভদ্রলোক অর্জুনের পাশের চেয়ারটা নিজেই টেনে নিলেন।

"নিশ্চয়ই।"

তিনজনে বসামাত্র তিনকাপ চা এল। ভদ্রলোক বললেন, "আমি তো চা খাই না। আপনারা খান। আমার চেকগুলোর কোনও খবর আছে?"

"আমি খুব দুঃখিত ডক্টর গুপ্ত। একটু আগেও আমি খোঁজ নিয়েছি। আসলে বিদেশি ব্যাঙ্কের চেক বলেই দেরি হচ্ছে। আমি হেড অফিসে ফোন করেছিলাম। ওরাও চেষ্টা করছে।" জগুদা বললেন।

"ঠিক আছে। আমার যা আছে তাতে দিন পনেরো চলে যাবে।"

এই সময় একজন খাতা নিয়ে জগুদার কাছে আসতেই তিনি 'এক মিনিট' বলে তাতে ঝুঁকে পড়লেন। অর্জুন ডাক্তার গুপ্তকে দেখছিল। আশিভাগ চুলই সাদা, ছোট্ট পাকা আমের মতো শরীর। চোখে পুরু চশমা। ডাক্তার হিসাবে নিশ্চয়ই ইনি খুব ভাল, নইলে জগুদা এত খাতির করতেন না।

কাজ শেষ করে জগুদা মুখ ফেরালেন, "ডক্টর গুপ্ত, আপনি কী স্থির করলেন? পুলিশের কাছে যাবেন না?"

"কোনও লাভ হবে না মিস্টার গাঙ্গুলি। পুলিশকে বললে তারা আমার বাড়ির সামনে পাহারা বসাতে পারে। কিন্তু ক'দিন? তা ছাড়া হাজারটা কৈফিয়ত। এসব আমার ভাল লাগে না। খবরের কাগজ জানতে পারবেই। আপনাকে আমি বলেছি যে, প্রচার চাই না। আর ক'টা দিন যদি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারি তা হলে আমি নিজেই প্রেসকে বলব।" ডক্টর গুপ্তের ডান হাত বারংবার নিজের মাথার চুলে চলে যাচ্ছিল। বোধ হয় কথা বলার সময় চুলে হাত বোলানো তাঁর বদ-অভ্যাস।

এবার জগুদা বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে ওকে জলপাইগুড়ি থেকে আসতে বলেছিলাম। খুব খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও চলে এসেছে।"

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের দিকে তাকালেন, "আচ্ছা! এরই কথা সেদিন বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ। দেখতে অল্পবয়সী হলে কী হবে এর মধ্যে দারুণ-দারুণ সমস্যার সমাধান করে বসে আছে। এমনকী ইংল্যাণ্ড-আমেরিকায় গিয়েও অপরাধী ধরেছে।"

"তাই নাকি? বাঃ। দেখে তো মনেই হয় না। কী নাম ভাই?"

"অর্জুন।"

কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক। তারপর কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, "বাঃ। চমৎকার নাম। কিন্তু মহাভারতটা কি ভাল করে পড়া আছে? অর্জুন চরিত্রটা কি জানা?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, সে জানে।

"বেশ। এবার আমার একটা সমস্যার সমাধান করে দাও তো। মহাভারতের অর্জুন একসময় স্বর্গে গিয়েছিলেন। যেখানে উর্বশীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। বেশ কিছুদিন ছিলেনও সেখানে। তারপর ফিরে এসেছিলেন। তা স্বর্গ মানে আউটার স্পেস। পৃথিবীর বাইরে। সেখানে কারও বয়স বাড়ে না। এমনকী
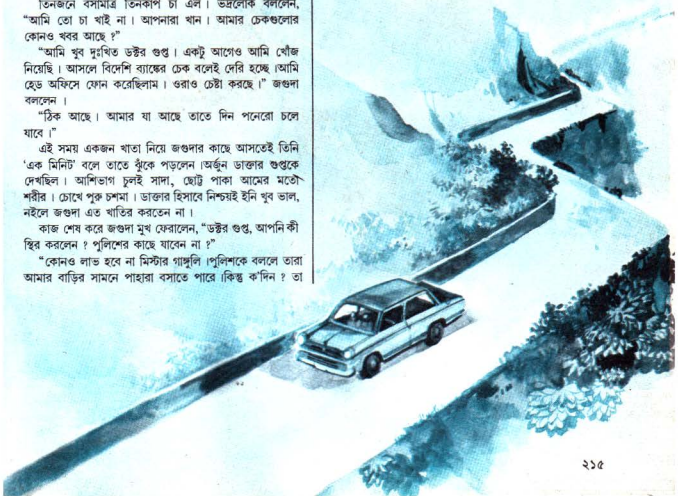
"বাবা তো ভালই চেয়েছিল, কিন্তু...
আমার চুলের ছিরি একবার দেখ। এটা বাবার কীর্তি। সত্যিই আমি কাঁদতাম না কিন্তু যখন ফ্রিস্কি আমায় দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল, আমি আর থাকতে পারলাম না। ইচ্ছা হচ্ছিল মার কাছে ছুটে যাই। বাবার সঙ্গে আড়ি, আড়ি। কিন্তু বাবা এসে যখন আদর করে আমার সবচেয়ে প্রিয় জিভে-জল-আনা কোয়ালিটি চকোবার হাতে ধরিয়ে দিল, বুঝলাম বাবা ভাব করতে চায়। তবে তার আগে আমার চাই বাটার স্কচ, টু-ইন-ওয়ান আর রেনবো।"
Kwality
ICE CREAM
যখন মনের কথায় প্রাণ ভরে

উর্বশীরও বাড়েনি। অতএব অর্জুন যখন সেখানে কিছুদিন ছিলেন তাঁরও তো বয়স বাড়ার কথা নয়। তা তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর দাদা, ভাই, স্ত্রীর বয়স পৃথিবীতে থাকার দরুন বেশ বেড়ে গিয়েছে। অর্জুন তো বয়সে সবার ছোট হয়ে গেলেন, তাই না?"

অর্জুনের বেশ মজা লাগল। মহাভারতে এই ঘটনার কথা সে পড়েছে। কিন্তু এটা যে সমস্যা হতে পারে তা সে ভাবেনি কখনও। কাউকেও বলতেও শোনেনি। ডক্টর গুপ্ত তার উত্তরের অপেক্ষা করে আছেন দেখে সে বলল, "পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করবে অঙ্কের ওপর।"

"অঙ্ক? ইন্টারেস্টিং! কীরকম?"

"প্রথমত, অর্জুন কতদিন স্বর্গে ছিলেন? স্বর্গের একদিন মানে পৃথিবীর কতদিন? এখানে সূর্যের উদয়-অস্তের সঙ্গে দিনের পরিমাপ করা হয়। স্বর্গে নিশ্চয়ই তা হয় না। তা হলে স্বর্গের দিন মাপার পদ্ধতিটা কি? সেটা বের করে স্বর্গের একটা দিনের সমান পৃথিবীর কতদিন হয় বের করে যে-ক'দিন অর্জুন সেখানে ছিলেন সেই ক'টা দিন দিয়ে গুণ করলেই পৃথিবীর সময়টা বেরিয়ে আসবে। যদি তিন-চার মাস হয় তা হলে ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যে থাকবে না।" অর্জুনের বেশ মজা লাগছিল বলতে।

"চমৎকার। কিন্তু স্বর্গের সময়টা কীভাবে মাপবে?"

"সেটা মহাভারতে নেই। পৃথিবী থেকে স্বর্গে হেঁটে যেতে কত সময় লাগে তা মহাপ্রস্থানের সময় হিসাব করে জানা যেতে পারে।"

"তাতে কী লাভ? পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদী যদি রথে চেপে যেতেন তা হলে নন-স্টপ পৌঁছে যেতেন। হুম। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগছে। তুমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর?"

"হ্যাঁ। তাই বলতে পারেন।"

এবার ডক্টর গুপ্ত জগুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি একে কিছু বলেছেন?"

"না। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তা ছাড়া আপনিও আমাকে সব খুলে বলেননি।" জগুদা হাসলেন, "অর্জুন, ডক্টর গুপ্ত অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। প্রায়ই বিদেশের সায়েন্স জার্নালে ওঁর লেখা বের হয়। আমার সঙ্গে আলাপ সেই বাবদ পাওয়া চেক ভাঙানোর সুবাদে। অবশ্য উনি এখন আমাকে বেশ স্নেহ করে ফেলেছেন। উনি একটা সমস্যায় পড়ায় আমার মনে হল তোমাকে ডেকে আলাপ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শুনলেই তো উনি পুলিশের কাছে যাবেন না।" জগুদা বিস্তারিত বললেন।

"সমস্যাটা কী?" অর্জুন জানতে চাইল।

"সেটা বুঝতে গেলে তোমাকে আমার বাড়িতে যেতে হবে।"

"মুখে বলা যায় না?"

"বললেও স্পষ্ট হবে না। অন্তত সত্তরভাগ সমস্যা মানুষ অভিজ্ঞতা ছাড়া হৃদয়ঙ্গম করে না। তিরিশভাগ শুনে বা পড়ে অনুভব করা যায়।" ডক্টর গুপ্ত হাসলেন, "আমার আস্তানা এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে। সঙ্গে একটা পুরনো অস্টিন গাড়ি আছে। পাহাড়ি পথ, তাই যেতে মিনিট চল্লিশেক লাগবে।" কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর গুপ্ত, "চলি মিস্টার গাঙ্গুলি।"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল, "কিন্তু আমি ওঁর সঙ্গে গেলে কি আজ জলপাইগুড়িতে ফিরতে পারব? এমনিতেই বাস খুব কম।"

জগুদা বললেন, "যদি না পারো তা হলে আমি মাসিমাকে নিজে গিয়ে বলে আসব কোনও চিন্তা না করতে। তুমি কিছু ভেবো না।"

অগত্যা অর্জুন ডক্টর গুপ্তকে অনুসরণ করল। মানুষটিকে তার ইতিমধ্যে বেশ পছন্দ হয়েছে। মনের ভেতরে একটা খুঁতখুঁতুনি ছিল মায়ের জন্য। তবে এখন তো সবে পৌনে দুটো। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে ফেরার বাস সন্ধে সাতটাতেও পাওয়া যায়। শুধু এখানে বৃষ্টিটা না নামলে হয়।

ডব্লু. বি-এ-নাম্বার দেওয়া একটা কালো গাড়ি ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে। এ-ধরনের প্রাচীন গাড়ি আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "এ-গাড়ি খুব বিশ্বস্ত। আমাকে কখনও বিপদে ফেলে না। চলার সময় একটু প্রতিবাদ করে, এই যা।"

গাড়িতে উঠে অর্জুন দেখল বাইরে থেকে যতটা মনে হচ্ছিল ভেতরটা কিন্তু ততটা পুরনো নয়। অথচ এই গাড়ির বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ হয়ে গিয়েছে। ডক্টর মল্লিক এঞ্জিন চালু করে চলতে আরম্ভ করতেই রাস্তার লোকজন তাকাতে আরম্ভ করল। এত নামী একজন বৈজ্ঞানিক এমন গাড়ি ব্যবহার করেন কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও অশোভন হবে বলে সে চুপ করে গেল।

গাড়ি এখন সেবক ব্রিজের দিকে এগোচ্ছে। শিলিগুড়ি পার হওয়ার পর দু'দিকে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢোকার সময় অর্জুনের মনে হল যে-কোনও মুহূর্তে আকাশ আর মাটি একাকার হয়ে যাবে। এত কালো আকাশ এমন নীচে সে কখনও দেখেনি। এই রাস্তায় অর্জুন বেশ কয়েকবার গিয়েছে এর আগে। ডান দিকে বাগরাকোটে আর ওদিকে তিস্তাবাজারের কাছে বেশ কিছু বসতি আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথায় থাকেন?"

ডক্টর গুপ্ত বললেন, "কালিঝোরা বাংলোটা পেরিয়ে খানিক ওপরে। এক ইংরেজ ভদ্রলোকের বাংলো ছিল ওটা। আমি নিজের মতো করে নিয়েছি।"

"জগুদা মানে মিস্টার গাঙ্গুলি আপনার সমস্যার কথা বলছিলেন!"

"হ্যাঁ ভাই। বছর-পাঁচেক আছি আমি এখানে। গত বছর আমার এক বন্ধু আমেরিকা থেকে এসেছিল নেহাত গায়ে পড়েই। এখানে আসার পর কাউকে আমি আসতে বলিনি। লোকটার নাম রবার্ট সিনক্লেয়ার। একটা সায়েন্স জার্নালের সম্পাদক। লেখা পাঠাই, ছাপলে চেক পাঠায়, তাই ঠিকানা ওর জানা ছিল। তা বলা-কওয়া নেই চলে এল দুম করে। আমি কী নিয়ে গবেষণা করছি তা জানার জন্য খুব কৌতূহল ওর। তিনদিন ছিল, আমি জানাতে চাইনি। কারণ জানতে পারলেই গবেষণা শেষ হওয়ার আগেই ও ওর জার্নালে ছেপে দেবে। কিন্তু মুশকিল করল তাতান।"

"তাতান কে?" অর্জুন জানতে চাইল।

"আমার কুকুর। ওকে দেখে বব, মানে রবার্টের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।"

"কেন? অদ্ভুত ধরনের কুকুর বুঝি?"

"একটু অদ্ভুত। লম্বায় দুই ইঞ্চি, প্রস্থে ইঞ্চিতিনেক।"

অর্জুনের মনে হল সে নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে। ওটা ইঞ্চি না হয়ে ফুট হবে।

ডক্টর গুপ্ত হাসলেন, "কী, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ববেরও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু যখন বুঝল ওটা ইঁদুর নয়, সত্যিকারের কুকুর, তখন নিয়ে যাওয়ার জন্য কী ঝুলোঝুলি। দশ হাজার ডলার দাম দিয়েছিল সে তাতানের। তার মানে আমাদের দেশের দু' লক্ষ টাকা। আমি দিইনি। এমনকী তাতানের ফোটো তুলতেও অনুমতি দিইনি। ব্যাটা করল কি, দেশে ফিরে গিয়ে এ-সবই তার জার্নালে ছেপে দিল। আর তারপর থেকেই সমস্যা শুরু হয়ে গেল।"

"কীরকম?" অর্জুনের মনে হচ্ছিল সে আষাঢ়ে গল্প শুনছে।

"লোক আসতে লাগল একের পর এক। সবাই তাতানকে দেখতে চায়, কিনতে চায়। প্রথম দিকে বুঝিনি, দেখিয়েছি। দু'-দু'বার চুরির চেষ্টা হল। শেষপর্যন্ত বাড়ির চারধারে ইলেকট্রিক তার লাগালাম। দুটো লোক শক্ খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এদিকে এখন দাম উঠেছে দশ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। একাই সামলে নিচ্ছিলাম। তাতানকে আর বাইরে বের করি না। কিন্তু এখন ঘটনা ঘটছে আরও খারাপ।"

"কী ঘটনা ?"

"সেটা মুখে বললে তুমি বুঝবে না। চলো, গিয়ে দেখবে।"

সেবক ব্রিজের গা ঘেঁষে গাড়ি উঠছিল ধীরে-ধীরে। জায়গাটা এর মধ্যেই অন্ধকার-অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। নীচ থেকে তিস্তার আওয়াজ উঠে আসছে। নিশ্চয়ই জল আরও বেড়েছে। কালিঝোরা বাংলো দেখা গেল। অর্জুন দেখল ডক্টর গুপ্ত প্রশান্তমুখে গাড়ি চালাচ্ছেন। ভদ্রলোকের কুকুরের নাম তাতান। তার উচ্চতা দুই ইঞ্চি। ভাবা যায় ? হঠাৎ ডক্টর গুপ্ত বললেন, "ওই যে শ্রীমানরা এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মহা মুশকিল।"

নির্জন পাহাড়ি রাস্তার একধারে একটা মারুতি জিপসি দাঁড়িয়ে। তার সামনে একজন সাহেব আর দু'জন ভারতীয় হাত তুলে তাদের থামতে বলছে। ডক্টর গুপ্ত বাঁ হাত বাড়িয়ে ড্রয়ার থেকে একটা সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার বের করে ডান হাতে নিয়ে মারুতি গাড়ির টায়ার লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলেন চলন্ত অবস্থায়। লোকগুলো হকচকিয়ে গেল। তার মধ্যেই তিনি পেরিয়ে এলেন জায়গাটা। রিভলভার রেখে দিয়ে বললেন, "এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। থামলে ওরা ঝামেলা করত, না থামলে ওভারটেক করে এসে গাড়ি আটকাত। ওরা চাকা বদলাতে-বদলাতে আমি বাংলোয় ঢুকে যেতে পারব।"

"এরা কী চাইছে ?"

"আমাকে ব্যবহার করতে।" ডক্টর গুপ্ত চুপ করে গেলেন।

শেষপর্যন্ত পিচের রাস্তা ছেড়ে গাড়ি বাঁ দিকের কাঁচা পথ ধরল। একটু চড়াই উঠতে অর্জুন বেদম হয়ে যাচ্ছিল। তবু তাকে তুলে নিয়ে আসতে পারলেন ডক্টর গুপ্ত। লম্বা-লম্বা গাছের পর বাংলোটা দেখা গেল। এককালে সাদা রং ছিল এখনও বোঝা যায়।বাংলোর চারপাশে খালি জমি, তারপর লোহার বিম দিয়ে বেড়া তৈরি করা হয়েছে। পনেরো ফুট উচ্চতার বেড়ার ওপরে অন্তত ফুটচারেক তারের সারি চলে গেছে। অর্জুন বুঝল ওখান দিয়েই বিদ্যুৎ যাচ্ছে। মাঝখানে একটা গেট আছে। ভেতর থেকে জেনারেটরের আওয়াজ ভেসে আসছে, যদিও এই বাংলোয় সরকারি বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। ডক্টর গুপ্ত পকেট থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোলার বের করে কয়েকটা নম্বর টিপতেই গেট খুলে গেল। অর্জুন বুঝতে পারল গেট খোলার জন্য সাঙ্কেতিক নম্বর আছে, যা জানা না থাকলে ওটা খুলবে না। ভেতরে ঢুকে আবার নম্বর টিপে গেট বন্ধ করলেন তিনি। গাড়িটাকে সোজা নিয়ে এলেন বাংলোর গাড়িবারান্দার নীচে। রিভলভারটা পকেটে ফেলে বললেন, "এই আমার আস্তানা। দাঁড়াও দরজা খুলি।"

দরজায় কোনও তালা নেই। কিন্তু রিমোট টিপে ধরতেই সেটা খুলে গেল। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "পেছনের সিটে সারা সপ্তাহের বাজার আছে, তুমি যদি একটু হাত লাগাও তা হলে তাড়াতাড়ি হয়।"

বড়-বড় প্যাকেট-ভর্তি সবজি, মাংস ইত্যাদি জিনিস। অর্জুন সাহায্য করল। আর এই সময় হাওয়া ছাড়তেই শীত-শীত করে উঠল অর্জুনের। টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল। গাড়ি বন্ধ করে মালপত্র নিয়ে ডক্টর গুপ্ত ভেতরে ঢুকে বললেন, "নীচতলাটা বসা আর থাকার ঘর। কিচেন, টয়লেটও এখানে। ওপরটা আমার কাজের জন্য। ওখানে আমি ছাড়া কারও যাওয়া নিষেধ। নীচটাকে নিজের মতো মনে করো।"

॥ ২ ॥

বসার ঘরটি সুন্দর। বাহুল্য কিছু নেই। দুটো বেডরুম আছে। ডক্টর গুপ্ত মালপত্র কিচেনে রেখে গরম জল চাপিয়ে দিলেন স্টোভে। অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। বৃষ্টি নেমেছে। পাহাড়ি গাছের ঝুঁটি ধরে নাড়াচ্ছে খ্যাপা বাতাস। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "সরকারি কারেন্ট যখন আছে তখন জেনারেটরটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। অবশ্য ওটি খুব শক্তিশালী। এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা চলতে পারে।" চোখের আড়ালে চলে গেলেন ভদ্রলোক। তারপরেই শব্দটা থেমে গেল। অর্জুন কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। এরকম অবস্থা যদি বিকেল পর্যন্ত চলে তা হলে আজ ফেরার কথা ভুলে যেতে হবে। এমনিতেই ঘরে আলো জ্বলছে এখন।

সে বাইরের ঘরের সোফায় এসে বসল। ব্যাঙ্কে ডক্টর গুপ্ত টাকার কথা বলছিলেন। কিন্তু এই বাড়ির পেছনে যাঁর এত খরচ হয় তাঁকে কি গরিব বলা যায় ? কখনও নয়। এত খরচ করে নিরাপদে থেকে উনি কী করছেন ? একা থাকতে হাঁফিয়ে ওঠেন না ? এই সময় ডক্টর গুপ্ত একটা জুতোর বাক্স নিয়ে নেমে এলেন ওপর থেকে। বললেন, "এবার কফিটা বানিয়ে ফেলি, তুমি ততক্ষণ তাতানের সঙ্গে ভাব করো।" জুতোর বাক্সটা অর্জুনের সামনের টেবিলে রেখে তিনি চলে গেলেন।

অর্জুন দেখল বাক্সটা একটু অন্যরকমের। গোল-গোল সিকি সাইজের গর্ত আছে ওপরে। একপাশে হুক লাগানো আছে, মানে সেটি দরজা। হুক ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। তারপর অর্জুনের অবাক হওয়া চোখের সামনে এসে দাঁড়াল তাতান। ডক্টর গুপ্ত যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি। তাতানের গায়ের রং খয়েরি। কান ঝোলা। বাইরে বেরিয়ে এসে পেছনের পা মুড়ে বসে সে অর্জুনকে দেখতে লাগল। তার লেজ নড়ছে। পৃথিবীর কোথাও কেউ এত ছোট কুকুরের কথা শুনেছে ? অর্জুন ডাকল, "তাতান ?"

তাতান উঠে দাঁড়াল, তারপর মুখ তুলে ডাকল। খুব মিহি ডাক। অন্যমনস্ক থাকলে এমন ডাক কানেও ঢুকবে না। অর্জুন আঙুল বাড়াতেই চারপায়ে পিছিয়ে যেতে লাগল তাতান। তারপর ঘুরে একদৌড়ে বাক্সের ভেতর।

এই সময় একটা ট্রেতে কফি আর বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর গুপ্ত, "কী, ভাব হল তাতানের সঙ্গে ? কোথায় গেল ?"

ট্রে নামিয়ে কফি দিয়ে তিনি চেয়ার টেনে বসে ডাকলেন, "তা-তান।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে ছুটে এল কুকুরটা। টেবিলের ওপর হাত পেতে দিতেই সে উঠে পড়ল সেখানে। হাত না ভাঁজ করে ডক্টর গুপ্ত তাকে নিয়ে এলেন নিজের মুখের সামনে, "আই অ্যাম সরি তাতান। তোর এই দশা আমার জন্যই হয়েছে। কিন্তু আমি যে এখনও অভিমন্যু। ঢুকতে জানি, বেরোতে জানি না।" বিস্কুটের কুচি ভেঙে তাতানকে খাওয়ালেন তিনি।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ও কি অন্য কুকুরদের মতোই খায় ?"

"হ্যাঁ, সব খায় তাতান। খুব ভাল।" তিনি কুকুরটাকে নামিয়ে দিলেন টেবিলের ওপরে। অর্জুনের মনে হল একটা পুতুল-কুকুর হেঁটে বেড়াচ্ছে। এই পুতুলের দাম এখন দশ লক্ষ টাকা উঠেছে ? সে জিজ্ঞেস করল, "তাতানকে আপনি কী করে পেলেন ?"

"তিস্তাবাজারে এক বুড়ো নেপালি কয়েকটা পাহাড়ি কুকুরের বাচ্চা বিক্রি করছিল। কালিম্পং থেকে ফেরার পথে দেখতে পেয়ে কিনে এনেছিলাম। তখন ওর বয়স হবে মাসদুয়েক। নাম রাখলাম তাতান। বছর দেড়েকের মধ্যে বেশ তাগড়াই হয়ে গেল। পাহাড়ি কুকুর বেশি লম্বা হয় না। তাতান ফুট দেড়েক হয়েছিল। ভারী সুন্দর গায়ের লোম। ওই যে দেওয়ালে ছবি দেখছ, ওই হল তাতান।"

অর্জুন দেওয়ালের ফোটোটা দেখল। স্বাভাবিক চেহারার একটা কুকুরের ছবি। অবিকল এই তাতানের মতো দেখতে, কিন্তু বহুগুণ বড়। সে খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "অতবড় কুকুর এত ছোট হল কী করে ?"

"আমার ভুলে।"

"আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

ডক্টর গুপ্ত কফির কাপে চুমুক দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমার সমস্যাটা তো এখানেই। বব ওর জার্নালে ছাপিয়েছে, আমি এমন কিছু আবিষ্কার করেছি যে, বড় জিনিস ছোট করতে পারি। এবার ধরো, একটা জায়গায় বিরাট বস্তি আছে। জমির মালিক কাউকে উচ্ছেদ করতে পারছে না, কিন্তু সেটাই তার বাসনা। লোকটা আমাকে বলল আমি যদি পুরো বস্তিটাকে দুই ইঞ্চি করে দিই তা হলে সে আমাকে অনেক টাকা দেবে। জমির মালিক বেলচায় তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। এক ইঞ্চি সাইজের মানুষগুলো প্রতিবাদও করতে পারবে না। আমি কাউকে বোঝাতে পারছি না এটা আমার গবেষণার বিষয় নয়। তাতানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দুর্ঘটনাক্রমে হয়ে গিয়েছে।"

"কী করে হল ?"

"সেটাও আমি বুঝতে পারিনি এখনও। তবে অনুমান করতে পারি। তারআগে বলোপৃথিবীতে আমাদের বয়স কীভাবে বাড়ে ?"

"মিনিট ঘণ্টা দিন সপ্তাহ মাস বছর হিসাব করে।"

"গুড। পৃথিবী যে সময়টায় সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে তা মোটামুটি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে। আমরা বলি এক বছর। কিন্তু আমাদের এক বছর আর চাঁদে বাস করলে যে এক বছর হবে তা এক নয়। একই সময়ে সেখানে বয়স বেশি বাড়ে। অর্থাৎ তুমি যদি চাঁদে গিয়ে থাকো তা হলে দশ বছর পরে তোমার সমান বয়সী কোনও ছেলের সঙ্গে একটুও মিল থাকবে না। তেমনই সাতশো দিনে সূর্যকে যে গ্রহ প্রদক্ষিণ করে, সেখানে বাস করলে পৃথিবীর থেকে কম বয়স বাড়ে। এটা অঙ্ক। আমি আবিষ্কার করতে চলেছি এমন একটি গ্রহের, যেখানে বাস করলে বয়স আদৌ বাড়বে না। সেটা করতে গিয়ে তাতানকে আমি এমন একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যেখানে স্থির হয়ে যাওয়ার পরের স্টেজ, অর্থাৎ বয়স কমতে থাকে।"

অর্জুনের মাথার ভেতরে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "বয়স কমলে আকৃতি ছোট হয়ে যাবে কেন ?"

"বয়স বাড়লে একটা সময় পর্যন্ত আকৃতি বাড়ে ?"

"হ্যাঁ, তা বাড়ে।" অর্জুন স্বীকার করল।

"তাতান যতটুকু বেড়েছিল তার থেকে অনেক বেশি বাড়ত স্বাভাবিক অবস্থায়। সেই ততটুকু কমে যেতে ওর এই অবস্থা হয়েছে।" ডক্টর গুপ্ত বললেন।

ঠিক এই সময় ওপরের ঘর থেকে একটা কুঁ- কুঁ শব্দ ভেসে এল। অর্জুন দেখল শব্দটা শোনামাত্র তাতান লাফাতে লাগল। ভয় হচ্ছিল, তাল সামলাতে না পেরে বেচারি টেবিল থেকে হয়তো পড়ে যাবে। ডক্টর গুপ্ত টেবিলের কাছাকাছি মুখ নামিয়ে বললেন, "নো, ঘরে ঢুকে যাও তাতান। অত উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা ! ওই পুঁচকে কুকুর যেন পাগল হয়ে উঠছিল। অনর্গল তার খুদে গলায় ডেকে যাচ্ছিল সে। ডক্টর গুপ্ত এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, "কুকুরটাকে একটু নজরে রেখো, আমি আসছি।"

উনি ওপরে চলে যেতে অর্জুন নিজের কড়ে আঙুলটাকে তাতানের কাছে নিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তাতান ছুটে এল সেটাকে কামড়াতে। আঙুল সরিয়ে নিল অর্জুন চট করে। কুকুর কামড়ালে চোদ্দটা ইঞ্জেকশন নিতে হয়। তা সাধারণ মাপের কুকুর হোক আর এই পুঁচকে কুকুরই হোক। দুটোই তো কুকুর। হঠাৎ কুঁ-কুঁ শব্দটা থেমে গেল। তাতান কান খাড়া করে ওপরের দিকে তাকাল। যেন খুব হতাশ হয়েছে সে। একটু পরে শ্রান্ত হয়ে বসল নিজের ঘরের সামনে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে অর্জুন দেখল ডক্টর গুপ্ত নেমে আসছেন। এসে তাতানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর জন্য আমাকে কাজকর্ম ছাড়তে হবে দেখছি। এ তো বড় জ্বালা হল।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিন্তু এখনও আপনার সমস্যা বলেননি ?"

"উৎপাত। আমাকে কাজ করতে দিচ্ছে না।"

"কী করে সম্ভব সেটা ? আমি যা দেখলাম বিনা অনুমতিতে এই বাংলোয় কোনও মানুষ ঢুকতে পারবে না। উৎপাত করবে কীভাবে ? হ্যাঁ, আপনি যখন বাইরে যাবেন তখন সমস্যায় পড়তে পারেন। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য তো বন্দুক রেখেছেন।"

"তোমার কি মনে হচ্ছে এখানে আমি খুব নিরাপদে আছি ?"

"নিশ্চয়ই। কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে পারবে না, নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবেন।"

হাসলেন ডক্টর গুপ্ত, "তুমি বাইরের দেওয়াল আর তার ওপরের ইলেকট্রিক তার দেখেছ। কিন্তু মাথার ওপরে তো খোলা আকাশ রয়েছে হে। উৎপাত হচ্ছে সেখান দিয়েই। রিভলভার ছুঁড়ব তারও তো কোনও উপায় নেই।"

অর্জুন চিন্তিত হল। মাথার ওপর আকাশ দিয়ে কেউ আসছে নাকি ? আশেপাশের গাছ থেকে লাফিয়ে নামছে ? যদি নামেও, তা হলে ফিরে যাওয়ার তো উপায় নেই। সে উঠে জানলার কাছে গেল। বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। আজ জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হবে না। সে গাছগুলোকে দেখল। না, দেওয়াল থেকে অনেক দূরে রয়েছে তারা। কোনও মানুষের পক্ষে ওই গাছে উঠে এদিকে লাফিয়ে পড়া সম্ভব নয়। তা হলে ? জানলার কাচের এপাশে দাঁড়িয়ে সে ডক্টর গুপ্তের গাড়িটার দিকে তাকাতেই হতভম্ব হয়ে গেল। ডিকিটা খুলে গেল ধীরে-ধীরে। তারপর বাড়তি টায়ার যা ডিকিতে থাকে সেটা বেরিয়ে এল বাইরে। মাটিতে পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না অর্জুন। সে দেখল টায়ারটা বৃষ্টির মধ্যে সামনের লনে পাক খাচ্ছে। ঠিক যেভাবে বাচ্চা ছেলেরা চাকা নিয়ে দৌড়য় সেইভাবে পাক খেয়ে চলেছে। অর্জুনের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে কোনওদিন ভূত দ্যাখেনি, ভূত আছে বলে বিশ্বাসও করে না। কিন্তু এ যদি ভূতের কাণ্ড না হয় তা হলে··· । সে চোখ ফেরাল। ডক্টর গুপ্ত তাতানকে বাক্সবন্দি করছেন। চাপা গলায় অর্জুন ডাকল, "একবার এখানে আসুন।"

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের মুখ দেখে সম্ভবত অনুমান করেছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চলে এলেন জানলার পাশে। টায়ার তখনও ঘুরে চলেছে। জলের ভেজা ঘাসে এলোমেলো দাগ পড়ে যাচ্ছে। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "যা বলছিলাম তা তো নিজের চোখেই দেখছ। এ তো কিছুই নয়। আপনমনে খেলছে। উৎপাত যখন করে তখন মাথা খারাপ হয়ে যায়।"

"কী ব্যাপার বলুন, তো ?" অর্জুন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

"তোমার কী মনে হয় ?"

"এ তো ভুতুড়ে কাণ্ড।"

"যা আমরা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি না তাকে ভুতুড়ে বলি। তবে তোমার দেখছি সাহস আছে ছোকরা। অজ্ঞান হয়ে যাওনি।"

হয়তো ডক্টর গুপ্ত সঙ্গে আছেন, দিনের আলোও নিভে যায়নি বলেই অর্জুন ভয় পায়নি। এখন শোনামাত্র কেমন ছমছম করতে লাগল। সে তো ডক্টর গুপ্তকেও ভাল করে চেনে না। জগুদাও বা কতটা চেনেন ? এটি একটা হন্টেড বাংলো হতে পারে। ডক্টর গুপ্ত নিজে একজন ড্রাকুলা হতে পারেন। এমন কত গল্পই তো শোনা যায়। অর্জুনের গায়ে কাঁটা ফুটল। সে আড়চোখে দেখল ডক্টর গুপ্তের ছায়া পড়েছে দেওয়ালে। যাক ইনি তা হলে ভূত নন। ভূতেদের ছায়া পড়ে না। অর্জুন দেখল টায়ারটা গড়িয়ে সোজা চলে এল গাড়ির পেছনে। যেভাবে নেমেছিল সেইভাবে লাফিয়ে উঠে পড়ল ডিকিতে। কাত হয়ে শুয়ে পড়তেই ডিকি বন্ধ

হয়ে গেল। এসব কাণ্ড ঘটল অথচ কোনও মানুষ গাড়ির ধারেকাছে নেই।

ডক্টর গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি কখন যাবেন কে জানে কিন্তু এবার বুঝলেন উৎপাত কীভাবে এখানে আসে?"

অর্জুনের গলার স্বর কেঁপে উঠল, "কে এটা করল?"

"তাতানের বন্ধু। এখন পর্যন্ত আমার কোনও ক্ষতি সে করেনি কিন্তু ওর উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি বোসো, আমি তাতানকে ওপরে রেখে আসি।" ডক্টর গুপ্ত টেবিল থেকে বাক্সটা তুলে নিলেন।

অর্জুন পাশে এসে দাঁড়াল, "আমি আপনার কথা বুঝতেই পারছি না। তাতান একটা কুকুর। ওর বন্ধু এভাবে অদৃশ্য হয়ে অমন কাণ্ড কীভাবে করতে পারে?"

"বন্ধুটি দেহধারণ করতে পারছে না কোনও কারণে।"

"বিদেহী?"

"বিদেহী মানে আমাদের ধারণায় ভূত। ও তা নয়। তাতানকে আমি যে গ্রহে পাঠিয়েছিলাম, মানে যেখানে গিয়ে তাতানের আকৃতি ছোট হয়ে গেছে, ওর বন্ধু সেখান থেকেই এসেছে। দাঁড়াও, আমি আগে তাতানকে রেখে আসি।" ডক্টর গুপ্ত দ্রুতপায়ে ওপরে চলে গেলেন।

অর্জুন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। এটি ভুতুড়ে কাণ্ড বাবা! অন্য গ্রহের প্রাণী একটা কুকুরের জন্য এখানে ঘুরঘুর করছে? পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহেও প্রাণী আছে বলে সন্দেহ করেন বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু সেটা তো শুধুই সন্দেহ। ডক্টর গুপ্তের কথা যদি সত্যি হয়... । মায়ের কথা মনে পড়ল। তাঁর দেশের বাড়ির অনেক ভুতুড়ে গল্প তিনি শুনিয়েছেন। ঝড় নেই, হাওয়া নেই, হঠাৎ মড়মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। অথবা দরজা-জানলা হুটহাট করে খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। এ তো প্রায় সেইরকম ব্যাপার। অর্জুন অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ দেখল চায়ের কাপ টেবিল থেকে উঠে যাচ্ছে। ঠিক চার ফুট উঁচুতে উঠল কাপটা। ধীরে-ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অর্জুনের গলা শুকিয়ে কাঠ, চোখ ছানাবড়া। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে কাপটা সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল।

একটু-একটু করে সাহসী হল অর্জুন, নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

কেউ উত্তর দিল না। অর্জুন একটু অপেক্ষা করে আবার বলল, "আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন?"

এবারও কোনও জবাব নেই। এই সময় ডক্টর গুপ্ত ওপর থেকে খালি হাতে নেমে আসছিলেন। অর্জুন তাঁকে সতর্ক করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ওঁর পা পড়ল প্লেটের ওপর। ছিটকে গেল সেটা। মেঝেতে পড়ে দু' টুকরো হল। উলটে পড়তে-পড়তে কোনওমতে সামলে নিলেন ডক্টর গুপ্ত। বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কাপ রাখতে গেলে কেন? এটা কি রাখার জায়গা?"

সত্যি, বড় অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারত। অর্জুন বলল, "আমি রাখিনি।"

ডক্টর গুপ্ত চোখ ছোট করলেন, "ও। সরি। এভাবে তোমাকে বলা ঠিক হয়নি।" কাপ তুলে তিনি কিচেনে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, "আমার বেসিনটা প্রায় সাড়ে চার ফুট ওপরে। ও নাগাল পাবে না।"

"কাপ ফুট চারেক ওপরে উঠেছিল।" অর্জুন জানাল।

"ঠিকই। আমার বিশ্বাস ওর হাত মাথার ওপরে তুললে চার ফুটের ওপরে যায় না। মুশকিল হল আমি ওর সঙ্গে কোনওরকম কম্যুনিকেট করতে পারছি না। ও বাংলা হিন্দি ইংরেজি অথবা জার্মান ভাষা বোঝে না।"

"কিন্তু এই ঘরে ঢুকল কী করে?"

"হয়তো শরীরটাকে খুব ছোট করতে পারে। আমার কিচেনের জল যাওয়ার গর্তটা বেশ বড়। তাই দিয়েই আসে।" ডক্টর গুপ্ত চারপাশে তাকিয়ে নিলেন।

"এই সিদ্ধান্তে এলেন কী করে?"

"বললাম তো চার ফুটের ওপরে যেসব জিনিস আছে সেগুলোতে ও কখনওই হাত দেয় না। আমার দোতলায় ওঠার দরজাটায় একচিলতেও ফাঁক নেই। ঘরটাও এয়ারটাইট। সেখানে কখনওই ও যায় না।"

"এয়ারটাইট মানে সাউন্ডপ্রুফ?" অর্জুন কুঁ-কুঁ শব্দটাকে মনে করতে পারল।

"না, সাউন্ডপ্রুফ নয় পুরোপুরি। এই হল আমার সমস্যা। পুলিশের পক্ষে এর সমাধান করা সম্ভব নয়। তোমার কী মনে হয়? পারবে?"

এমন সমস্যা এর আগে কোনও সত্যসন্ধানী সমাধান করেছেন বলে অর্জুনের জানা নেই। স্বয়ং অমল সোম থাকতেও পারতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ব্যাপারটা দারুণ ইন্টারেস্টিং। চট করে না বলতে ইচ্ছে হল না অর্জুনের। সে বলল, "খুব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমি চেষ্টা করতে পারি। তবে ক'দিন এখানে থাকতে হবে।"

"অফকোর্স। স্বচ্ছন্দে থাকো। তোমার দক্ষিণা কত?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "সেটা নিয়ে এখন কথা না বললেই ভাল হয়।"

"নো। তুমি কাজ করবে আর আমি জানতে পারব না কত পারিশ্রমিক নেবে? না না, এভাবে হবে না।"

"বেশ। আপনি যা স্থির করবেন তাই নেব। কিন্তু সফল হলে।"

"কবে থেকে এসে থাকছ তুমি? আমি না হয় শিলিগুড়িতে গিয়ে নিয়ে আসব।"

"আমি কাল থেকেই আসতে চাই। কিন্তু এই প্রলয়ের মধ্যে ফিরব কী করে?"

"হুম্। আমি ভাবিনি এরকম বৃষ্টি পড়বে। ঠিক আছে, চলো, আমি তোমাকে না হয় পৌঁছে দিয়ে আসি।" ডক্টর গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন।

সেই সময় মেঝেতে শব্দ হল। ওরা দু'জনেই দেখল একটা চেন সাপের মতো এগিয়ে আসছে। চেনটা যে তাতানের ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এবার চেনটা মাটি থেকে খানিক ওপরে দুলতে লাগল। ডক্টর গুপ্ত বলে উঠলেন, "অর্জুন, সাবধান, ও বোধ হয় আমাদের মারতে চাইছে।" বলতে-বলতে তিনি ছুটে ঘরের কোণে রাখা লম্বা টুলের ওপর উঠে বসলেন। অর্জুন নড়ল না। ঠিক করল চেনটা তাকে আঘাত করতে এলেই সে ওটাকে ধরবে। দেখা গেল চেনটা টুলের দিকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে থেমে গেল শূন্যে। তারপর ঘরের এক কোণে ছিটকে পড়ল। অর্থাৎ যে ওটাকে এতক্ষণ নাচাচ্ছিল সে বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অর্জুন উঠে চেনটাকে কুড়িয়ে নিতে ডক্টর গুপ্ত নেমে এলেন, "ভয়ঙ্কর, এই প্রথম ও এমন ব্যবহার করল। আক্রমণাত্মক।"

এই সময় বাইরে কড়-কড় করে বাজ পড়ল। এবং সেইসঙ্গে সারা বাড়িতে অ্যালার্ম বাজতে লাগল। অর্জুন চমকে ডক্টর গুপ্তের দিকে তাকাতেই তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, "ঝড়ে বোধ হয় কোনও গাছের ডাল ইলেকট্রিক তারের ওপর ফেলেছে।"

অর্জুন জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেওয়ালটা দেখতে পেল। না, এদিকের তারে কিছু জড়িয়ে নেই। সে বর্ষাতিটা পরে নিয়ে টুপি মাথায় দিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। বৃষ্টিতে চারধার সাদা হয়ে গিয়েছে। বাঁ দিকের দেওয়ালের দিকে এগোতেই সে হতভম্ব হয়ে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যেই একটি

মানুষের শরীর দেওয়ালের ওপরে তারের গায়ে ছটফট করছে। সে দ্রুত ফিরে এসে ডক্টর গুপ্তকে বলল, "তাড়াতাড়ি দেওয়ালের কারেন্ট অফ করে দিন। একটা মানুষ মারা যাবে।"

"মানুষ?" দরজায় দাঁড়ানো ডক্টর গুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, "আবার চেষ্টা করেছে বুঝি? যারা ওখান দিয়ে ভেতরে ঢুকতে চায় তাদের মরাই উচিত।"

"প্লিজ, এখন ওসব বলবেন না। অফ করুন তাড়াতাড়ি।" অর্জুন ধমকে উঠল।

ডক্টর গুপ্ত ভেতরে চলে গেলেন এবং তার খানিক বাদেই অর্জুন দেখল শরীরটা তার থেকে খসে ওপাশে পড়ে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক রকমের আহত হয়েছে। নিশ্চয়ই ভোল্টেজ বেশি নয় তাই এতক্ষণ ছটফট করছিল। অর্জুন দেখল ডক্টর গুপ্ত আবার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সে বলল, "মেইন গেট খুলে দিন। লোকটাকে দেখা দরকার।"

কিন্তু ঠিক তখনই কানে একটা গাড়ির শব্দ ভেসে এল। দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এর মানে লোকটা একা ছিল না। যারা ওকে পাঠিয়েছিল তারাই চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। অর্জুনের মনে হল ডক্টর গুপ্তের ঘরে-বাইরে বিপদ। এই সময়টুকু বৃষ্টিতে দাঁড়ালেই অর্জুনের মনে হল জলপাইগুড়িতে যাওয়া যাবে না। অন্তত আজ তো নয়ই।

ঘরে ঢোকার আগে ওভারকোট আর টুপি খুলতেই অনেকটা জল ঝরল। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "কী হে, চেষ্টা করবে নাকি?"

"আপনার এখানে ফোন নেই?"

"আছে। কিন্তু অর্ধেক দিন সাড়া দেয় না। ঝড়বৃষ্টি হলে কথাই নেই।"

"তবু দেখুন তো। মিস্টার গাঙ্গুলিকে এখনও ব্যাঙ্কে পাওয়া যাবে।"

"ওপাশে আর-একটি ঘর রয়েছে। সম্ভবত গেস্ট রুম। ফোনটা সেখানে। এখানে ডায়াল করে লাইন পাওয়া যায় না। অপারেটরের সাহায্য নিতে হয়। দেখা গেল টেলিফোনে কোনও সাড়া নেই।

অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অর্জুন এখানে আজকের রাতটা থাকবে। কাল সকালে শিলিগুড়িতে গিয়ে কাজের ব্যাপারটা মাকে জানানোর জন্য জগুদাকে বলে আসবে। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "এই ঘরটি তোমার। আমি ঠিক তোমার মাথার ওপরে শোব। প্রয়োজন পড়লে বিছানার পাশে এই যে বোতাম আছে চাপ দিও, আমার ওখানে অ্যালার্ম বাজবে। যাই, আবার বিদ্যুৎ চালু করি।"

॥ ৩ ॥

ভদ্রলোক চলে গেলে অর্জুন চেয়ারে বসল। থাকার কথা তো ঠিক হল কিন্তু সঙ্গে যে একটা পাজামাও নেই। রাত্রে শোবে কী পরে? হঠাৎ তার খেয়াল হল তাতানের বন্ধুর কথা। অনেকক্ষণ তার কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সে চারপাশে তাকাল। অন্য গ্রহের সেই ছোট্ট প্রাণী হয়তো এই ঘরেই দাঁড়িয়ে আছে এখন। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এখানে আছ?"

কেউ সাড়া দিল না।

"তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো। আমি লোক খারাপ নই। মানে, আমরা বন্ধু হতে পারি। বুঝতে পারছ? আচ্ছা, এবার বলো, তুমি কীভাবে এখানে এসেছ? তোমার কি কোনও মহাকাশযান আছে?"

কোনও জবাব নেই। হাল ছেড়ে দিল অর্জুন। এইভাবে একা শূন্যঘরে কাউকে কথা বলতে দেখলে সে তাকে পাগল ভাবত। প্রাণীটা কত ছোট? ডক্টর গুপ্ত বললেন হাত তুললে চার ফুটের বেশি হবে না। ধরে নেওয়া যেতে পারে মাথায় সে আড়াই থেকে তিন ফুট। ওঃ, এর চেয়ে ছোট প্রাণী পৃথিবীতে ছিল। গালিভার যাদের লিলিপুট বলেছেন। হাজার-হাজার ছিল তারা। হয়তো অন্য গ্রহ থেকে এসেছিল। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাণীদের আকৃতি ছোট হয়। একসময় এই পৃথিবীতেই বিশাল-বিশাল প্রাণী দাপটে ঘুরে বেড়াত। ডাইনোসরাস এখন কোথায়? এমনকী এখনও যে হাতি দেখে অবাক হতে হয় সেকালে এর আকৃতি ছিল প্রায় দ্বিগুণ। আদিম মানুষের যে পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে তার পাশে আমাদের পায়ের ছাপ লিলিপুট। হয়তো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানেই প্রাণীদের আকৃতি ছোট হচ্ছে। আজ থেকে তিন হাজার বছর পরে একটা হাতি যদি গোরুর উচ্চতায় নেমে যায় তা হলে মানুষ তিন ফুটের বেশি লম্বা থাকবে না। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীর বিবর্তনকালের অনেক আগে বিবর্তন শুরু হওয়া অন্য কোনও গ্রহের প্রাণীই আজ ডক্টর গুপ্তের বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে ধরে নিলে একটা সহজ সমাধান তৈরি হয়।

কিন্তু সেই প্রাণী কোথা থেকে আসছে এবং কেমন ভাবে, তা বোঝা যাচ্ছে না। ডক্টর গুপ্ত কি জানেন? লোকটা বেশ রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে অর্জুনের। অথচ কুকুরের চেনটাকে শূন্যে ভাসতে দেখে কীরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় আগন্তুকের সঙ্গে ডক্টর গুপ্তের সম্পর্ক ভাল নয়। ভেবেচিন্তে কোনও সুরাহা করতে পারছিল না অর্জুন। আজ জলপাইগুড়িতে যেতে পারলে অমল সোমের সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলা যেত।

বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে। সেইসঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাছেরা মাথা দোলাচ্ছে পাগলের মতো। অর্জুন চুপচাপ বসে দেখল দিন ফুরিয়ে আসছে। অথচ ঘড়িতে এখন মাত্র তিনটে বাজে। এদিকে ডক্টর গুপ্ত সেই যে ওপরে গিয়েছেন আর নামেননি। ভদ্রলোক তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন অন্য কেউ ওপরে যাক তা তিনি পছন্দ করেন না। অর্জুন উঠল।

অন্যগ্রহের মানুষটি এখন এ-বাড়িতে আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কারণ দীর্ঘ সময় সে তার অস্তিত্ব জানাচ্ছে না। কিছুদিন আগে অর্জুন রূপশ্রী সিনেমায় একটা খুব পুরনো ছবি দেখেছিল। ইনভিজিব্‌ল ম্যান। ব্যাপারটা কি সেইরকম? সে নীচের তলার ঘরগুলো দেখতে লাগল। এ-বাড়িতে কাজের লোক পর্যন্ত নেই। সব কিছুই ডক্টর গুপ্তকে করতে হয়। ফলে একটু অগোছালো ভাব চারধারে।

ঠিক চারটের সময় দপ করে আলো নিভে গেল। ঘরের ভেতর এখন পাতলা অন্ধকার। ওপর থেকে ডক্টর গুপ্তের গলা ভেসে এল, "এক মিনিট, জেনারেটার চালিয়ে দিচ্ছি।"

জেনারেটর চালু হওয়ামাত্র আলোকিত হল বাংলো। ডক্টর গুপ্ত নেমে এলেন ওপর থেকে। সোফায় বসে বললেন, "মনে হচ্ছে আজকের রাতটায় আর উপদ্রব হবে না।"

অর্জুন বলল, "কেন মনে হচ্ছে?"

"খুব সোজা ব্যাপার। পৃথিবীর আকাশে এখন মেঘে-মেঘে ঘষা লেগে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। এই স্তর ভেদ করে আসাটা খুব ঝুঁকির কাজ। কেউ বোকামি করবে না।"

"আপনি নিশ্চিত, যে আসছে সে অন্য গ্রহের বাসিন্দা?"

"অবশ্যই।"

"কোন গ্রহ?"

"আমরা এর অস্তিত্বই জানতাম না যে নামকরণ করব। সূর্যের চারপাশে যেমন পৃথিবী সমেত অন্য গ্রহগুলো ঘুরছে, তেমনই সূর্যের মতো আরও অনেক নক্ষত্র তাদের পরিবার নিয়ে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেইরকম একটি পরিবার থেকে এই উপগ্রহটি এখানে পৌঁছেছে।"

"পৃথিবীতে আসতে ওর কত সময় লাগছে?"

"এইটেই আমাকে ভাবাচ্ছে। আমি তাতানকে পাঠিয়েছিলাম আলোর গতিতে। আলো এক ঘণ্টায় মহাকাশে যেতে পারে আটষট্টি হাজার চারশো সাতানব্বই মাইল। ঘণ্টাদশেক যাওয়ার

খাদিম জানে পায়ের আরাম
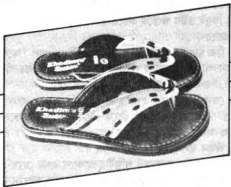
বুটেক্স ও
হাওয়াই চপ্পল

পর আমি ওর গতি থামিয়ে দিলাম। অর্থাৎ ছ'লক্ষ চুরাশি হাজার নশো সত্তর মাইল দূরে কোনও জায়গায় ও পৌঁছেছিল।"

"তুমি নিশ্চয়ই আলোর গতি জানো?" ডক্টর গুপ্ত প্রশ্ন করলেন।

ব্যাপারটা জানা ছিল অর্জুনের, "এক বছরে, মানে আমাদের এক বছরে আলো মহাকাশে যায় ছয় মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল।"

"গুড।" খুশি হলেন ডক্টর গুপ্ত।

"আপনি কীভাবে তাতানকে পাঠিয়েছিলেন? মহাকাশে যেতে তো মহাকাশযান লাগে। ছবিতে দেখেছি রকেটে সেই মহাকাশযানকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে পাঠানো হয়। এখানে কি সেরকম ব্যবস্থা আছে? আর তার জন্য প্রচুর টাকা লাগে।" অর্জুন অকপটে তার মনের কথা বলে ফেলল।

ডক্টর গুপ্ত মাথা নাড়লেন, "তুমি ঠিক বলেছ। আমার মতো সাধারণ মানুষ অত টাকা পাবে কোথায়? তা ছাড়া একজন সাধারণ নাগরিককে সরকার রকেট ছোঁড়ার অনুমতি দেবেন কেন?"

"তা হলে?" অর্জুন বেশ বিস্মিত হচ্ছিল।

এক মুহূর্ত ভাবলেন ডক্টর গুপ্ত। সম্ভবত অর্জুনকে নিজের কথা বলবেন কি না তাই চিন্তা করলেন। এবার তাঁকে হাসতে দেখা গেল, "অর্জুন, এককালে লোকে গোরুর গাড়ি ও ঘোড়ায় চেপে যাতায়াত করত। কলকাতা থেকে দিল্লিতে একদিনে যাওয়ার কথাই ভাবতে পারত না।তারপরে যখন ট্রেন চলল তখন দু' ঘণ্টায় যাওয়ার কথাও কেউ বিশ্বাস করেনি। এখন তো সেটাই জলভাত। এমন দিনও তো আসতে পারে, ছ' মিনিটে আমরা কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছে যেতে পারি। তাই না?"

"হয়তো!" অর্জুন আর কী বলতে পারে!

"রকেট চালিয়ে মহাকাশে যান পাঠানো এখনকার রীতি। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার যে দুটো আবিষ্কার তা এই রীতি থেকে অবশ্য এগিয়ে। কিন্তু সেটা জানার আগে বলো যে জন্য তোমায় নিয়ে এলাম তার কী করলে?"

অর্জুন তাকাল। তারপর বলল, "এত অল্প সময়ে কিছু করা সম্ভব? আপনি বলছেন অন্য গ্রহ থেকে জীব এখানে আসছে। কীভাবে আসছে?"

"ঠিক প্রশ্ন করেছ তুমি। না, সে রকেটের সাহায্যে মহাকাশযানে চেপে আসছে না। এই ব্যাপারটা অন্য অনেক গ্রহে খুব পুরনো বলে বাতিল হয়ে গিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, যেভাবে তাতানকে পাঠিয়েছিলাম সেভাবে এই উপগ্রহটি যাওয়া-আসা করছে। তাতানকে মহাকাযানে পাঠালে ওর সঙ্গে দেখাই হত না। সম-স্তর বলেই যোগাযোগ হয়েছিল। ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে ওপরে চলো।"

"ওপরে?" অর্জুন প্রশ্ন না করে পারল না।

"হ্যাঁ। আমি কাউকে ওপরে নিয়ে যাই না। কিন্তু তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

আচমকা অর্জুন প্রশ্ন করল, "আপনি তো আজই আমাকে প্রথম দেখলেন, ভাল করে চেনেনও না। আপনার গোপন গবেষণার ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হচ্ছে?"

ডক্টর গুপ্ত মাথা ঘোরালেন। তাঁকে খুব হতভম্ব দেখাল প্রথমটায়। তারপর অকস্মাৎই অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন, "গুড। গুড। আমার মন আরও পরিষ্কার হয়ে গেল।"

"কীরকম?"

"খুব সাধারণ ব্যাপার। তোমার মনে অন্য কিছু থাকলে এই প্রশ্ন করতে না। তা ছাড়া তোমাকে নিয়ে আমার কোনও ভয় নেই। যে কোনও দিন মোটরগাড়ি দেখেনি তাকে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে দিলেও সে গাড়ি নিয়ে পালাতে পারবে না। চলো।"

ডক্টর গুপ্তর পেছন-পেছন অর্জুন ওপরে উঠল। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে তিনি বললেন, "একটু সাবধানে আসতে হবে। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। যদিও মনে হচ্ছে উপদ্রবটি তার গ্রহে ফিরে গেছে তবু কে জানে এখানেই ঘাপটি মেরে পড়ে আছে কি না। তুমি যখন ভেতরে ঢুকবে তখন তোমার শরীর একটি বিদ্যুৎপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে যাবে। সামান্য চিনচিন করবে। অশরীরী অস্তিত্বের কাছে সেটা খুবই মারাত্মক অবশ্য। এসো।"

দরজা খুলে ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন। অর্জুন পা বাড়াতেই মনে হল সমস্ত শরীরে ঝিঝি ধরে গিয়েছে। অর্থাৎ সে বিদ্যুৎপ্রবাহের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে। কোনওমতে শরীরটা সামনে ঠেলে নিয়ে আসার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ডক্টর গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও অসুবিধে হয়নি তো? একটু চিনচিন? প্রত্যহ এক-দু'বার নিলে জীবনে বাত হবে না তোমার। আমি তো অনেকবার নিই, দ্যাখো, কী ফিট বডি আমার।"

এসব কথায় মন ছিল না অর্জুনের। তার চোখ এখন ঘরের চারপাশে। বেশ লম্বা হলঘর এটি। চারপাশে নানা যন্ত্রপাতি ছড়ানো। এক কোণে জানলার পাশে ফ্রেমের মতো কিছু, যার মুখে আয়না জাতীয় বস্তু লাগানো। তার পাশেই অদ্ভুত টেবিল-চেয়ার। প্রতিবন্ধীদের জন্য যে-ধরনের হুইল চেয়ার তৈরি করা হয় তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি ছোট্ট টেবিলও। ডক্টর গুপ্ত জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাচের জানলার ওপাশে বিদ্যুৎ চমকে বারংবার পৃথিবী আলোকিত হচ্ছে। ভদ্রলোক দু' হাত মাথার ওপরে তুললেন, "আমাদের পৃথিবী আর মহাকাশের মধ্যে যোগাযোগ এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রুকাউয়াট কে লিয়ে খেদ নেহি হ্যায়।"

অর্জুনের মজা লাগল। তা হলে এই ভদ্রলোক টিভিও দেখেন!

ডক্টর গুপ্ত ঘুরে দাঁড়ালেন, "এই হল আমার জায়গা। আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস। সারাজীবন ধরে তিল-তিল পরিশ্রম করে এটিকে আমি তৈরি করেছি। এখানে দাঁড়িয়ে আমি মহাকাশের অনেকটাই ঘুরে আসতে পারি। ববকে, মানে রকটি সিনক্লেয়ারকে এই ঘরে ঢুকতে দিইনি আমি। সে এই লাইনের লোক। আমার এই ভাঙাচোরা যন্ত্র নিয়ে কোনওমতে যে কাজ করছি আমি, তা দেখতে পেলে সে দেশে ফিরেই বেশ সফিসটিকেটেড মেশিন তৈরি করে ফেলতে পারত। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার সেই ভয় নেই। বোসো, বোসো।" হাত বাড়িয়ে সেই চেয়ারটিকে দেখিয়ে দিলেন তিনি। চেয়ারের তলায় চাকা আছে। সাবধানে না বসলে পিছলে যেতে পারে। অর্জুন অস্বস্তি নিয়ে সেখানে বসল। ডক্টর গুপ্ত তখন সেই বাক্স থেকে তাতানকে বের করে একটা গামলার মধ্যে রেখেছেন। ঝুঁকে পড়ে চুক-চুক শব্দ করে তাকে ডাকছেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "ব্যাটার খুব মন খারাপ দেখছি। একবার গিয়ে এমন মন খারাপ হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে উপদ্রবটি এখানে এসেছিল।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিছু মনে করবেন না, একটা প্রশ্ন করব?"

"নিশ্চয়ই।"

"এসব তো সায়েন্স ফিকশনে হয়ে থাকে। স্পিল্‌বার্গ নামের একজন চিত্রপরিচালকও এমন বিষয় নিয়ে ছবি করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে শুনিনি।"

মাথা নাড়েন ডক্টর গুপ্ত, "কারেক্ট। পৃথিবী ছাড়া সূর্যের চারপাশে যারা ঘুরছে তাদের আবহাওয়ায় প্রাণের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। মঙ্গলে তবু একটু সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সেখানে জলের অভাবই বোধ হয় এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"তা হলে?"

ডক্টর গুপ্ত বললেন, "দ্যাখো বাবা, বিরাট মহাকাশে সূর্য এবং তার পরিবার এটুসখানি জায়গা নিয়ে থাকে। ওরকম কত সূর্য আর তাদের ঘিরে কত গ্রহ ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। সেই রকম

অনেক গ্রহেই দেখা যাবে আমাদের পৃথিবীর মতো আবহাওয়া। সূর্য থেকে যতটা দূরত্বে থাকায় পৃথিবীতে এমন আবহাওয়া তৈরি হয়েছে সেই গ্রহগুলো তাদের সূর্য থেকে ঠিক একই দূরত্বে থাকলে সমান আবহাওয়া পাবে এবং পাচ্ছে। ফলে প্রাণের অস্তিত্ব একশো ভাগ সম্ভব।"

"এর কোনও প্রমাণ আছে ?"

"নিশ্চয়ই। সূর্য থেকে ছিটকে আসা গ্রহগুলো স্থিতাবস্থায় আসার পর যখন পৃথিবীতে অ্যামিবার জন্ম হল, সেই সময় থেকে মানুষের জন্ম পর্যন্ত বিবর্তনের ইতিহাস আমরা জানি। মহাকাশের অন্য সূর্যগুলো থেকে একই প্রক্রিয়ায় এমন অনেক গ্রহের উৎপত্তি হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই পৃথিবী থেকে কয়েক কোটি বছর বয়স্ক। ফলে সেখানে প্রাণ এসেছে আমাদের অনেক আগে। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষজাতীয় প্রাণী জন্ম নিয়েছে বহু-বহু আগে। তাই তাদের বোধবুদ্ধি এবং কার্যক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। এটাই তো স্বাভাবিক। তারা ইচ্ছে করলে তাদের বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত মহাকাশে ঘুরে বেড়াতে পারে। আমরা শুধু চাঁদে মানুষ নামাতে পারি, মঙ্গলে গ্রহ পাঠাতে পারি। হ্যাঁ, বলতে পারো আমি তার থেকে এক ধাপ এগিয়েছি। আমি সূর্যের সংসার ছাড়িয়ে তাতানকে আরও মহাশূন্যে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে কোনও গ্রহের অস্তিত্ব আর নাম আমি জানি না। তাতান যদি কথা বলতে পারত তা হলে সেটা জানা যেত।"

অর্জুন একমনে শুনছিল। ডক্টর গুপ্তের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু সঠিক প্রমাণ বলতে যা বোঝায় তা তিনি দিতে পারেননি। সে জিজ্ঞেস করল, "মহাকাশে যে মানুষজাতীয় বুদ্ধিমান প্রাণীর কথা আপনি বলছেন তারা কি আমাদের মতো দেখতে ?"

"অসম্ভব। হতে পারে না। দাঁড়াও, তোমাকে ছবিগুলো দেখাই।" ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন দেওয়ালের দিকে। সেখানে দেওয়াল-আলমারি জুড়ে প্রচুর বই রয়েছে। তার একটি বের করে পাতা খুলতে-খুলতে এগিয়ে এলেন, "এটা কিসের ছবি ?"

অর্জুন দেখল বিশাল চেহারার হাতি, সারা শরীরে লোম। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "এটি হল ম্যামথ। আদ্যিকালের হাতি। এখনকার হাতির চেয়ে দেড়গুণ বড় শরীর। এর পাশে চিড়িয়াখানার হাতিদের শিশু বলে মনে হবে। কয়েক হাজার বছরেই চেহারার এমন পরিবর্তন ঘটে গেছে। যত দিন যাচ্ছে তত আকার ছোট হচ্ছে। তুমি যদি কয়েকশো বছর পিছিয়ে যাও তা হলে দেখবে তখনকার মানুষ যেসব পোশাক ব্যবহার করত তাতে তোমার মতো দু'জন ঢুকে যাবে। আমাদের মুঘল সম্রাট যেসব অস্ত্র স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতেন তা আমাদের পক্ষে তুলে ধরাই বেশ কষ্টকর। তার মানে ওঁদের শরীর আমাদের চেয়ে বড় ছিল। আবার যদি কয়েকশো বছর এগিয়ে যাও তা হলে দেখবে সব কিছু কেমন ছোট-ছোট অথচ তোমার থেকে বেশি বুদ্ধিদীপ্ত। এটাই নিয়ম। পৃথিবীর বাইরে যে প্রাণ, তার জন্ম হয়েছে আমাদের অনেক, অনেক আগে। ফলে সেখানকার প্রাণীর আকার, বিবর্তন মেনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেছে। হয়তো মস্তিষ্ক, উদর, হাত-পা ছাড়া আর কিছুই নেই তাদের।"

সত্যি, অতবড় হাতি ছবিতেও দেখেনি অর্জুন। শুধু শুঁড় এবং চারটি পা ও লেজ ছাড়া এখনকার হাতির সঙ্গে তেমন মিল নেই। বিশাল লোম, একটা বিকট আকৃতির জন্য ম্যামথকে বেশ বীভৎস বলে মনে হচ্ছিল। বই রেখে দিয়ে ডক্টর গুপ্ত বললেন, "অর্জুন, তোমার নামের সেই বিখ্যাত পাণ্ডবটি স্বর্গে গিয়েছিলেন এ-কথা মহাভারতে আছে। স্বর্গে সময় স্থির হয়ে আছে। স্বর্গটি কোথায় ? কাউকে জিজ্ঞেস করো, সে যত নিরক্ষরই হোক স্বর্গ বললে মাথার ওপরে হাত তুলে দেখাবে। অর্থাৎ স্বর্গ ওই মহাশূন্যে, মাটির নীচে বা পাশাপাশি কোথাও নেই।' মানুষকে কিন্তু কেউ বলেনি স্বর্গ মাথার ওপরে আছে। জন্মজন্মান্তর থেকে একটা ধারণা তার রক্তে সে বয়ে নিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই এর কারণ আছে। সে পড়েছে দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে আসেন। নেমে আসা মানে আমাদের ওপরে তাঁরা থাকেন। আর ওপর বলতে তো আকাশ, মহাকাশ। অর্থাৎ, মহাকাশেই কোথাও স্বর্গ আছে যেখানে সময় স্থির হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই সূর্যের সংসারের কোনও গ্রহে স্বর্গ নেই। সেখানে তো প্রাণের অস্তিত্বই অসম্ভব। তা হলে অন্য কোথাও, অন্য সূর্যের সংসারে স্বর্গ বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে। সেখান থেকে মাঝে-মাঝে দেবতারা এই পৃথিবীতে নেমে আসেন।"

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, "আসতেন।"

"আসতেন ? নো। আসতেন কেন ? এখনও আসেন। ওই যে উৎপাতটা তাতানের খোঁজে আসছে, ওকে নিশ্চয়ই আমাদের গ্রামবৃদ্ধরা উপদেবতা বলতেন।"

অর্জুনের খেয়াল হল সে কিছুদিন আগে দানিকেন সাহেবের লেখা কয়েকটা বই পড়েছে এবং ডক্টর গুপ্তের মতো এতবড় বিজ্ঞানী সেইরকম কথাই বলছেন। দানিকেন সাহেবের কথা তুলতেই ডক্টর গুপ্ত হাত নাড়লেন, "যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না তাই অন্য গ্রহের মানুষের কাজ বলে চাপাতে আমি রাজি নই। অর্জুন, আমার গবেষণা দুটো বিষয় নিয়ে। এক, মহাকাশের অন্য গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ করা। অংশত আমি সফল। তাতানকে আমি পাঠিয়েছিলাম, ওর পেছন-পেছন যে নেমে এসেছে সেই প্রমাণ দিচ্ছে মহাশূন্য প্রাণীহীন নয়।"

"আপনি কীভাবে তাতানকে পাঠিয়েছিলেন ?"

"সেটা তোমাকে বলব না। যতক্ষণ না গবেষণা সফল হচ্ছে ততক্ষণ বলা ঠিক হবে না। আমি পৃথিবীকে একবারেই চমকে দিতে চাই।"

"কিছু মনে করবেন না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?"

ডক্টর গুপ্ত যেন রেগে গেলেন। তারপর বললেন, "তুমি মহাশূন্যে যেতে চাও ?"

অর্জুন তাতানের দিকে তাকাল। মহাশূন্যে গেলে যদি তার অবস্থা ওই তাতানের মতো হয়ে যায় ? লম্বায় চার ইঞ্চি। অসম্ভব। সে মাথা নাড়ল।

ডক্টর গুপ্ত এবার হাসলেন, "ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে ! আরে মহাশূন্যে যাওয়া মানে তাতান হয়ে যাওয়া এমন ভাবছ কেন ? তাতান এমন একটা গ্রহে গিয়ে পড়েছিল যেখানে গেলে ওই অবস্থা হয়। তুমি এই সূর্যের সংসারগুলো দেখে এলে পারতে। অবশ্য চাঁদের বাইরে কিছুটা বাদে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা তেমন কোনও প্রতিক্রিয়ার খবর এখনও পাননি।"

ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন সেই ক্রেনের মতো দেখতে মেশিনটার কাছে। মেশিনটার গায়ে হাত রেখে বললেন, "এইটে আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমি মানুষকে তার ভবিষ্যৎ জানাতে চাই। আজ তুমি যে সময়টায় দাঁড়িয়ে আছ সেই সময়টাকে স্থির রেখে আমি, ধরো, দুশো বছর এগিয়ে নিয়ে গেলাম। অর্থাৎ দুশো বছর বাদে কী ঘটবে তা দেখতে চাইলাম এখনকার মানসিকতা নিয়ে। এটা করতে পারলে ভবিষ্যতে যাঁরা হাত দেখে কুষ্ঠি বিচার করে বলেন, তাঁদের জব্দ করা যাবে। আবার মানুষ তার ভবিষ্যতের কাজকর্ম দেখে বর্তমানের ভুল শুধরে নিতে পারবে।"

"এই গবেষণায় কতটুকু এগিয়েছেন ?"

"তেমন কিছু না। এক-দু' পা মাত্র। এদিকে এসো, এই যে সুইচটা দেখছ, এটা টিপলে যন্ত্র চালু হবে এবং তোমার চারপাশের সময়টা চাপ বেঁধে স্থির হয়ে যাবে। এবার দ্বিতীয় বোতামটা টিপলে তোমার ওই সময় সচল হবে। এখানে দ্যাখো, মিটার আছে। বর্ষমিটার। তুমি পাঁচ থেকে পাঁচশো পর্যন্ত মিটার ঘোরাতে পারো। অর্থাৎ, ইচ্ছে করলে পাঁচ থেকে পাঁচশো বছর ভবিষ্যতে চলে যেতে পারো। কিন্তু এ-জায়গায় আমি সবসময় সাফল্য পাচ্ছি

না। একবার হয়েছিল। নাইন্টি ফোরে আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। ইতালিকে দু' গোল দিয়েছিল জার্মানি। ফিরে এলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর মেশিনটা কাজ করছে না। প্রথমবারে যা-যা করেছিলাম তা করেও নয়। এটাই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্জুন হতভম্ব। নাইন্টি ফোর আসতে এখনও তিন বছর বাকি আছে। হ্যাঁ, সেই সময় আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড কাপ হওয়ার কথা। কিন্তু ডক্টর গুপ্ত গোল দিয়েছিল বললেন? সে-কথাটা তুলতেই ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "আসলে খেলা শেষ হওয়া অবধি আমি লস অ্যাঞ্জেলিসের স্টেডিয়ামে ছিলাম। গোল দেওয়া হয়ে গেলে, গিয়েছিল তো বলবই।"

"তার মানে আপনি বলছেন ওই টুর্নামেণ্টে জার্মানি দু' গোলে ইতালিকে হারাবেই? এটা এখন থেকে আপনি জানতে পারছেন?" অর্জুন উত্তেজিত।

মাথা নাড়লেন ডক্টর গুপ্ত, "হ্যাঁ, জানতে পারছি কিন্তু কাউকে জানাতে চাইছি না। পৃথিবীর কিছু মানুষ সেটা জেনে গেলে ফাটকা খেলবে। লক্ষ-লক্ষ মানুষকে ভুয়ো জুয়ায় হারাবে। জুয়াড়িরা যদি জেনে যায় জার্মানি জিতে যাবেই, তা হলে ইতালির সমর্থকদের কোটি-কোটি টাকা তারা বেমালুম হজম করে ফেলবে।" হাসলেন তিনি, "এ তো গেল খুব সামান্য দিক। এর বড় দিকটাই আসল চিন্তার ব্যাপার।"

ঠিক এই সময় ঘরের এক কোণে লাল আলো জ্বলে উঠে বিপ-বিপ শব্দ শুরু হল। অর্জুনের গায়ে কাঁটা ফুটল। তার মনে হল মহাকাশ থেকে নিশ্চয়ই কেউ কোনও সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। কিন্তু ডক্টর গুপ্তকে বেশ হতাশ দেখাল, "একটু একা থাকতে দেবে না। এই ঝড়বাদলে অন্ধকারে আবার কে এল?"

"আপনি বললেন মেঘের আস্তরণ, বিদ্যুতের ঝলকানি থাকায়...।"

"এসেছে নীচের গেটে। অবশ্যই গাড়িতে। এখানে হেঁটে কে আর আসবে। চলো, নীচে যাই। দেখি গিয়ে।" ডক্টর গুপ্ত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ এই পরিবেশে বেশ ভাল লাগছিল অর্জুনের। বিজ্ঞানের মাধ্যমে কতরকম কাণ্ড ঘটছে পৃথিবীতে। জলপাইগুড়িতে বসে সেসব কথা জানাই যেত না। জলপাইগুড়ির অনেক মানুষ এখনও বলতে পারবে না কীভাবে টিভি-র পরদায় ছবি ফোটে, রেডিওতে গান বাজে অথবা টেলিফোনে কথা শোনা যায়! সে ক্রেনের মতো দেখতে যন্ত্রটার দিকে তাকাল। যন্ত্রটা গোলমাল করছে। নইলে সে ডক্টর গুপ্তকে বলত কাছাকাছি সময় থেকে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে।

সদর দরজা খুলে বাইরের আলো জ্বালাতেই বৃষ্টিভেজা বাগানটার সামান্য অংশ দেখা গেল। ডক্টর গুপ্তের গাড়ির গায়ে অঝোরে জল পড়ছে। কারণ গাড়িটা এখন গাড়ি-বারান্দার বাইরে দাঁড়িয়ে। ওটা আগে ওখানে ছিল না।

গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ডক্টর গুপ্ত চিৎকার করলেন, "হু ইজ দেয়ার? কে এসেছেন? আগে নিজের পরিচিতি জানান।"

পনেরো ফুট দেওয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া, মজবুত গেট, তার ওপর বৃষ্টির শব্দ, ডক্টর গুপ্তের গলা আগন্তুক শুনতে পেল কি না সন্দেহ। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "লাউড স্পিকারের কথা কখনও ভাবিনি, এখন মনে হচ্ছে সেরকম একটা কিছু থাকলে ভাল হত।"

কেউ যে এসেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টি ভেদ করে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়ছে ওপাশের গাছের ওপর। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্রে আপনার কাছে এর আগে কেউ এসেছেন?"

ডক্টর গুপ্ত মাথা নাড়লেন, "সচরাচর নয়। তবে শিলিগুড়ির এক পুলিশ অফিসার এ-পথ দিয়ে যাওয়ার সময় মাঝে-মাঝেই

খোঁজখবর নিয়ে যান।"

এই সময় বৃষ্টিটা একটু ধরল। ঝোড়ো বাতাস শব্দ বাড়াচ্ছে গাছের পাতায় আঘাত করে। ডক্টর গুপ্ত চেঁচালেন আবার, "হু ইজ দেয়ার?"

"প্লিজ, ওপেন দ্য গেট। দিস ইন বিল।"

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের দিকে তাকালেন, "বিল? মানে? উইলিয়াম? উইলিয়াম জোন্স?" বলেই তিনি ছুটে গেলেন বৃষ্টির মধ্যে আচমকা।

অর্জুন কোনও বাধা দিতে পারল না। উইলিয়াম জোন্স নিশ্চয়ই ওঁর খুবই ঘনিষ্ঠ কেউ, নইলে ছুটবেন কেন? কিন্তু একটা ছাতি সঙ্গে নিয়ে গেলে পারতেন। গেট খুলে যাচ্ছে। হয়তো রিমোট ডক্টর গুপ্তের পকেটেই ছিল। গাড়ির হেডলাইটের সামনে এখন ডক্টর গুপ্তের শরীর শিলুট হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ অর্জুন ভদ্রলোককে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল। তিনি চিৎকার করে কিছু বললেন। গাড়ি সটান এগিয়ে আসছে তাঁকে চাপা দেওয়ার জন্য। ডক্টর গুপ্ত একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গাড়িটা এবার তার দিকে এগিয়ে আসছে। অর্জুন দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসল। সঙ্গে-সঙ্গে গুলির আওয়াজ এবং ঝন-ঝন শব্দ শুরু হয়ে গেল। অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না। ডক্টর গুপ্ত নিশ্চয়ই আহত হয়ে বৃষ্টির ভেতর পড়ে আছেন। তাঁকে সাহায্য করতে গেলে বন্দুকবাজদের সামনে পড়তে হবে।

দরজায় আঘাত শুরু হল। ওরা সেটাকে ভাঙতে চাইছে। গাড়িতে ঠিক ক'জন মানুষ ছিল, অন্ধকার এবং বৃষ্টির কারণে বোঝা যায়নি। অর্জুনের মনে হল, আপাতত ডক্টর গুপ্তকে দেখার বদলে তাঁর গবেষণার জিনিসগুলো বাঁচানো বেশি জরুরি। সে দ্রুত দোতলায় উঠে এল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সেটাকে প্রথমে বন্ধ করতেই শরীরে চিনচিনে অনুভূতি হল। অর্থাৎ কারেন্ট পাশ হচ্ছে এখান থেকে। সে ঘরের ভেতর ঢুকে ভাল করে তাকাল।

নীচে তখনও সমানে গুলির আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে। ডান দিকের দেওয়ালের গায়ে রেগুলেটরের মতো একটা নব। ওটার গায়ে লেখা আছে এক দুই তিন চার। রেগুলেটরের মার্কিংটা এক নম্বরে রয়েছে। যদি ওটাকে দুই বা তিনে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে কি এখানকার কারেন্ট আরও তীব্রতর হবে ? সেক্ষেত্রে কেউই এ-ঘরে ঢুকতে পারবে না। অর্জুন নবটাকে ঘোরাল। দরজার সামনে গিয়ে নিজের শরীর নিয়ে পরীক্ষা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা সে করল না। এক নম্বরেই যদি অমন চিনচিনানি হয় তা হলে··· !

এই সময় নীচের দরজা খোলার আওয়াজ কানে এল। হয়ে গেল। ওরা এবার একতলায় ঢুকে পড়বে। ডক্টর গুপ্ত এত সাবধানতা অবলম্বন করে এখানে ছিলেন কিন্তু কী লাভ হল তাতে ? সামান্য একটা ভুলে সব নষ্ট হতে চলেছে। অর্জুন চুপচাপ দরজা ছেড়ে জানলার কাচের পাশে চলে এল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বাইরের।

এবার দোতলার সিঁড়ির গায়ে ধাক্কা। এবং সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার। কেউ যেন ছিটকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল নীচে। মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার ধাক্কা হওয়ামাত্র আবার চিৎকার। অর্জুন একটু নিশ্চিন্ত হল। নব ঘুরিয়ে কারেন্ট বাড়ালে নিশ্চয়ই সমস্ত দরজাটাই ইলেক্‌ট্রিফাইড হয়ে গিয়েছে।

একটু চুপচাপ। হঠাৎ গুলির আওয়াজ হল। দরজা ভেদ করে একটা গুলি এসে লাগল ঘরের ছাদে। খানিকটা কাঠের টুকরো পড়ল মেঝেতে। দ্বিতীয় গুলিটা দরজা ফুটো করে ছুটে এল অনেকটা নীচ দিয়ে। প্রায় অর্জুনের কান ঘেঁষে সেটা লাগল ক্রেনের মতো দেখতে যন্ত্রটায়। অর্জুন চমকে গেল এমন যে, মাটিতে না বসে পারল না। তৃতীয় গুলিটা ছুটে গেল ছাদে। কিন্তু ততক্ষণে অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুরু হয়েছে ঘরের ভেতর। অর্জুন মুখ তুলে শুনল। আওয়াজটা আসছে ওই ক্রেন জাতীয় যন্ত্রটার শরীর থেকে। গুলিটা লাগার পরই ওর পিস্টন চালু হয়ে গিয়েছে। সে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে এঞ্জিনটাকে দেখতে লাগল। ক্রেনের ভেতরে একটা বসার জায়গা আছে। তার সামনে মোটরগাড়ির হুইল। ড্যাশবোর্ডের মতো জায়গায় নানারকম আলো জ্বলছে। ডক্টর গুপ্ত এঞ্জিনটাকে চালু করতে পারছিলেন না, কিন্তু একটা বন্দুকের গুলি আচমকা সঠিক জায়গায় আঘাত করায় ওটা চালু হয়ে গেল। কী তাজ্জব ব্যাপার !

যিনি বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছেন তিনি সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। এবার তাঁর গুলি লাগল দরজার ভেতরে তালার গায়ে। ভাল শব্দ হল। অর্জুন জানে লোকটার উদ্দেশ্য এই ঘরে ঢুকে যন্ত্রপাতির দখল নেওয়া। যদি বুদ্ধি করে ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিয়ে দরজা ভেঙে ঢোকে তা হলে বন্দুকের সাহায্যে সেই উদ্দেশ্য সফল করতে একটুও বেগ পেতে হবে না ওদের। এ-অবস্থায় সে কী করতে পারে ?

ইতস্তত ভাবতে-ভাবতে অর্জুন মেশিনটার দিকে তাকাতেই দ্বিতীয় মতলব মাথায় এল। সে চুপচাপ মেশিনের মাঝখানের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। এটিকে কী করে চালু করতে হয় তা সে জানে না। মেশিন থেকে যেরকম শব্দ বের হচ্ছে তাতে মনেই হয় ওটা ইতিমধ্যেই সচল হয়েছে। কিন্তু এখন কী করা যাবে ? অর্জুন সামান্য ঝুঁকে ড্যাশবোর্ডের আলোগুলো দেখল। দশ-বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ-একশো-হাজার- দশ হাজার লেখা রয়েছে যেখানে, তার নীচেই একটা বোতাম। অর্জুন বোতামটাকে টিপতেই বিপ্‌-বিপ্‌ শব্দ বাজতে লাগল এবং নম্বরগুলোর একপাশে একটা কাঁটাকে ভেসে উঠতে দেখা গেল। অর্জুন সেটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করতেই কাঁটাটাকে এক লাফে কুড়ি এবং ত্রিশের মাঝখানে চলে আসতে দেখা গেল। অর্জুনের সমস্ত শরীর থর-থর করে কাঁপছিল। মেশিনটা যেন পাগলের মতো আচরণ করছে এখন। এবার তার নজরে এল পাশাপাশি দুটো সুইচ রয়েছে। তার একটাতে চাপ দিল সে উদভ্রান্তের মতো।

॥ ৪ ॥

প্রবল একটা ঝাঁকুনি, মনে হল হাড়গোড় সব ভেঙে যাচ্ছে, অর্জুন বন্ধ চোখে অন্ধকার দেখল। এবং তারপরেই শরীরে ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগল। বাইরে বৃষ্টি হলেও এই ঘরে তো হাওয়া ঢোকার উপায় নেই। সে চোখ খুলতেই হতভম্ব হয়ে গেল। ওগুলো নিশ্চয়ই তারা। একফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। তার মানে বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু ঘরের ছাদটা কোথায় গেল ! সে তারা দেখছে কীভাবে ? মাথা ঘোরাতেই সেটা ভোঁ-ভোঁ করে উঠল। ঘর কোথায় ? তার চারপাশে তো গাছগাছালি। মাথার ওপরে আকাশ। সামনে সেই ড্যাশবোর্ড, যেখানে এখনও আলো জ্বলছে। শব্দ বাজছে। সে কোথায় চলে এল ? চটপট মেশিন থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াল অর্জুন। একটা রাতের পাখি বেশ ভয় পেয়েই ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল দিগন্তে। দু-তিন পা জঙ্গল ভেঙে এগিয়েও কোনও দিশা পেল না সে। শুধু যন্ত্রটা থেকে আসা আওয়াজ রাতের নিস্তব্ধতাকে চূর্ণ করছে। অর্জুন আবার ফিরে এল ওটার কাছে। কীভাবে আওয়াজটাকে বন্ধ করা যায়। তার মনে পড়ল শেষবার সে যে সুইচটাকে টিপেছিল তার কথা। পাশাপাশি আর-একটি সুইচ আছে। সেটিকে টিপতেই সব শব্দ আচমকা থেমে গেল। সুইচটির গায়ে দ্বিতীয়বার চাপ দিতেই আবার শব্দ চালু হল। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সে তৃতীয়বার চাপ দিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করল।

কিছুক্ষণ সে সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে। যন্ত্রটায় সে বসে ছিল। সে ছিল ঘরের মধ্যে। এখন জঙ্গলে। তার মানে সে খুবই বিস্ময়কর এক জায়গায় চলে এসেছে মেশিনের কল্যাণে। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার একমাত্র বাহন হল ওই মেশিনটি। অতএব একে হারালে চলবে না। অর্জুন ডালপালা ভেঙে পাতার আড়ালে মেশিনটাকে এমনভাবে ঢেকে রাখল যাতে চট করে কারও নজরে না পড়ে। অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়ার পর সে মেশিনটাকে পেছনে রেখে সোজা হাঁটতে লাগল। জায়গাটায় এত বুনো ঝোপ যে, বোঝাই যায় অনেককাল কেউ এদিকে আসেনি। হাঁটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। মিনিটচারেক হাঁটার পর চোখের সামনে একটা বিশাল রাস্তা দেখতে পেল। তার মনে পড়ল এতবড় রাস্তা সে যখন আমেরিকায় গিয়েছিল তখন দেখেছিল। রাস্তার দু'দিক দিয়ে একসঙ্গে আটখানা গাড়ি স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। মাঝখানে তিরিশ গজ অন্তর তীব্র আলো জ্বলছে।

সে নিজের কব্‌জির দিকে তাকাল। এখন সন্ধে সাতটা, সেপ্টেম্বর মাসের বারো তারিখ, উনিশশো একানব্বই। এই সন্ধেবেলায় আকাশ নির্মেঘ। অথচ সেখানে আকাশ দেখা যাচ্ছিল না। কাছাকাছি জনবসতি আছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় নেমে বাঁ না ডান, কোনদিকে হেঁটে যাবে ঠাওর করতে পারছিল না অর্জুন।

হঠাৎ মাথার ওপরে এয়ারবাসের এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যেতে সে চোখ ওপরে তুলল। কী আশ্চর্য, ওটা কী ? নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে এমন একটা আকাশযানে যার আকার গোল টুপির মতো, ওই শব্দ করতে-করতে উড়ে গেল পশ্চিমে। খানিক বাদে পশ্চিম থেকে ওই একই ধরনের যান ওপরে উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেল। এগুলো কি প্লেন ? তা হলে তার ডানা কিংবা লেজ কোথায় ?

অর্জুনের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। ডক্টর গুপ্তের মেশিনটা যদি সঠিক কাজ করে তা হলে সে আর তিস্তাপারের ওই বাংলোয় নেই। কিন্তু কোথায় আছে ? এতবড় চওড়া রাস্তায় এই সন্ধেবেলায় গাড়ি ছুটছে না কেন ? সে ঠিক করল রাস্তায় নামবে

না। পাশের জঙ্গল দিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল। শুধু জায়গাটা ছাড়ার আগে ভাল করে দেখে রাখল যাতে পরে চিনতে অসুবিধে না হয়। তিন-তিনটে সিড়িঙ্গে গাছ অদ্ভুতভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গা ঘেঁষে সোজা গেলেই ডক্টর গুপ্তর মেশিনটা পাওয়া যাবে।

অর্জুনের ঘড়িতে যখন ন'টা, মানে রাত্তির ন'টা, তখন পুবের আকাশে সূর্যদেব দেখা দিলেন। খুব স্বাভাবিক ভোর, নরম রোদে গাছগাছালি ঝলমল। অর্থাৎ সে সময়ের দিক থেকে অন্তত আট ঘণ্টা পিছিয়ে আছে, একটি দিনের পরিমাপে।

দিন শুরু হতেই অদ্ভুত চেহারার গাড়িতে রাস্তাটা ভরে গেল। ষাট কিলোমিটার স্পিডে গাড়িগুলো ছুটছে, একটার সঙ্গে পরেরটার ব্যবধান দশ-বারো ফুটের। পাশাপাশি দু'মুখো রাস্তার সবক'টা লেন এখন একটু-একটু করে ভরে উঠেছে। এই গাড়িগুলোকে যেন কেউ এতক্ষণ আটকে রেখেছিল, ছাড়া পেয়ে সবাই হুড়মুড়িয়ে চলছে। জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্জুনের মনে হল হুড়মুড়িয়ে শব্দটায় একটা বিশৃঙ্খল মানে বোঝায় কিন্তু গাড়িগুলো যাচ্ছে খুবই শিষ্ট হয়ে। সবচেয়ে বড় কথা, এত গাড়ি রাস্তায় ছুটছে, কিন্তু একটিও হর্নের আওয়াজ নেই, গাড়ির বিকট শব্দ অথবা ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। মাঝে একটি টু-হুইলার বেরিয়ে গেল। জলপাইগুড়িতে অর্জুনের লাল বাইক হলে এতক্ষণে কান ফাটাত। এই রাস্তায় কোনও ফুটপাত নেই। আমেরিকার হাইওয়েগুলোকে যেমন সে দেখেছিল তার সঙ্গে হুবহু মিল। অর্জুনের মনে হল সে নির্ঘাত আমেরিকায় এসে পৌঁছেছে। ওখানকার হাইওয়েতে কেউ হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাতে যায় না। চাইলেও গাড়ি থামবে না। অতএব এখানে অর্জুনও সেই চেষ্টা করল না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল।

ঘড়িতে যখন রাত এগারোটা, এখানে তখন চনমনে রোদ্দুর। হঠাৎ জঙ্গলটা শেষ হয়ে গেল। একটু ঢালু মাঠের পরে কিছু রঙিন ঘরবাড়ি, তাদের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। দূর থেকে বোঝা যায় মানুষজন আছে। অনেকটা কৌতূহল নিয়ে অর্জুন এগিয়ে যেতে বিপ-বিপ শব্দ কানে এল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল দুটো বাচ্চা মেয়ে দ্রুতগতিতে সাইকেল চালিয়ে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সাইকেল দুটো সম্ভবত ফাইবার গ্লাসের। চলে যাওয়ার সময় দুটো মেয়েই তার দিকে খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে গেল।

অর্জুন বাড়িঘরগুলোর কাছাকাছি আসতেই ভেতর থেকে কেউ একজন বেরিয়ে এল। লোকটি ঈষৎ খাটো, পরনে শার্টপ্যান্ট কিন্তু তার সেলাই অন্যরকম। চোখাচোখি হতে লোকটিকেও অবাক হতে দেখল সে। কী ভাষায় কথা শুরু করবে বুঝতে না পেরে অর্জুন হাসল। তারপর ইংরেজির আশ্রয় নিল, 'গুড মর্নিং'।

লোকটি ঠোঁট কামড়াল। তারপর ঘুরে ভেতরে চলে গেল। অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। নিশ্চয়ই ও ইংরেজি জানে না। ইংরেজি না-জানা সভ্য দেশ ইউরোপে অনেক আছে। কিন্তু এই লোকটিকে দেখে মোটেই ইউরোপিয়ান বলে মনে হচ্ছে না। চিন বা জাপানের সাধারণ মানুষও ইংরেজিতে কথা বলা দরকার বলে মনে করে না। সাধারণত যেসব দেশ এককালে ব্রিটিশদের অধীনে ছিল তারাই ইংরেজি শিখেছে বাধ্য হয়ে।

অর্জুন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকবে কি না ভাবছিল এমন সময় সেই লোকটি আবার বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে। বৃদ্ধের পাকা দাড়ি, লম্বা চুল আবার জিনসের প্যান্ট এবং কায়দা-করা শার্ট, সব মিলিয়ে অন্যরকম দেখাচ্ছে। অর্জুন খুব বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করল।

বৃদ্ধ হাসলেন এবং নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন। তারপর হাত নেড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। অর্জুন ওঁদের পেছন-পেছন ভেতরে ঢুকল। সুন্দর সাজানো একটি ঘর। এবং দেওয়ালের একটি ছবির দিকে তাকাতেই সে খুব অবাক হয়ে গেল। ছবিটা কাচে বাঁধানো নয়, পুরো দেওয়াল জুড়ে আঁকা।

সে প্রশ্ন না করে পারল না, "রবীন্দ্রনাথ টেগোর?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "টেগোর? না। ঠাকুর। আমাদের পরমপিতা।"

"আ-আপনি বাঙালি?"

"বাঙালি? হ্যাঁ, আমরা বঙ্গভাষাভাষী। প্রায় দুশো বছর আগে পরমপিতা পৃথিবীতে এসেছিলেন। আমাদের যা কিছু গৌরব তা ওঁরই দান।" বৃদ্ধ হাসলেন, "আপনি বঙ্গভাষা জানেন জেনে খুশি হলাম। আপনার নিবাস?"

"আমার বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরে।"

বৃদ্ধ যেন খুব অবাক হলেন। তিনি সঙ্গীর দিকে তাকালেন। সঙ্গীর চোখ ছোট হল। বৃদ্ধ ইঙ্গিতে অর্জুনকে বসতে বললেন, "মনে হচ্ছে আপনি আপাতত অনেকদূর পথ ভ্রমণ করেছেন। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?"

অর্জুন একটি সুদৃশ্য চেয়ারে বসল। তারপর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বৃদ্ধ তাঁর সঙ্গীকে ইশারা করতে সে ভেতরের দরজা দিয়ে চলে গেল। বৃদ্ধ এবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পোশাক দেখছি প্রায় নতুন। আমাদের বালক বয়সে ওইরকম কাপড়ের পোশাক দেখেছি। আপনি কোত্থেকে এগুলো সংগ্রহ করলেন?"

এই বৃদ্ধ তাঁর ছেলেবেলায় এমন জামাপ্যান্ট দেখেছে? লোকটার মাথা ঠিক আছে তো? সে হেসে বলল, "আমি দোকান থেকেই কিনেছি।"

এই সময় সেই যুবক বেরিয়ে এসে বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কিছু বলল। বৃদ্ধ ব্যস্ত হলেন, "আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগল। আপাতত এই ঘরে বিশ্রাম নিন। বাইরের রোদ হয়তো আপনার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। আমাকে এখনই একটু বিশেষ কাজে বেরোতে হবে। আমার পুত্র আপনাকে দেখাশোনা করবে।" বৃদ্ধ তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অর্জুনকে অবাক হতে দেখে যুবক বলল, "বাবার একটা জরুরি কাজ আছে মিনিট দশেকের মধ্যে। উনি সেটা খেয়াল করেননি।"

এই সময় ঘরে মিষ্টি বাজনা বাজতে লাগল। যুবক উঠে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা সুইচ টিপতেই সেখানে সিনেমার পরদার মত আলো ফুটে উঠল। বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। চৌকো আলোর মধ্যে একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ ভেসে উঠল, "বাবা বেরিয়ে গেছে দাদা?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র। আমি মনে করিয়ে দিলাম।" যুবকের দেওয়ালের দিকে মুখ।

"আজকাল বাবার যে কী হচ্ছে! তুমি কী করছ?"

"একজন অতিথি এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলছি।"

"অতিথি? কে? আমি চিনি?"

"না। মানে, সম্ভবত না। তিনি বলছেন, জলপাইগুড়ি থেকে আসছেন।" কথাটা বলেই যুবক হাসল। সুন্দরী বেশ অবাক, "কী যা-তা বলছ?"

"আমি ঠিকই বলছি।"

অর্জুন শুনতে পেল সুন্দরী চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "মাথা ঠিক আছে?"

"এখনও বুঝতে পারছি না। কখন ছুটি হচ্ছে?"

"আধঘণ্টার মধ্যেই। ঠিক আছে!"

"ঠিক আছে।" দেওয়ালের আলো মিলিয়ে গেল। যুবক সুইচ অফ করে ফিরে এসে হাসল, "আমার বোন। ওর রাতের চাকরি।"

অর্জুন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তার মুখ থেকে প্রশ্ন ছিটকে বের হল, "উনি আপনার সঙ্গে কীভাবে কথা বললেন?"

"কেন? এই পদ্ধতি আপনি আগে দেখেননি?"

"না। আমরা টেলিফোনে কথা বলি। সেখানে শোনা যায়, দেখা যায় না।"

"আমরা শ্রবণ এবং দর্শন একই সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি। আচ্ছা, আপনি মনে করার চেষ্টা করুন তো, এখানে আসার ঠিক আগে কোথায় ছিলেন?"

"কোথায় ছিলেন মানে?"

"কোনও চিকিৎসালয়ের কথা আপনার কি মনে পড়ে?"

হঠাৎ অর্জুনের খেয়াল হল। এদের কাছে তার কথা, পোশাক, আচরণ নিশ্চয়ই অন্যরকম লাগছে। স্বভাবতই এরা ভাবতে পারে সে কোনও মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে। এই ভাবনাটা ওদের বেশি বিচলিত না হতে সাহায্য করছে। অতএব এদের ভুল না ভাঙানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সে অভিনয় করল, "আমার মাথায় যন্ত্রণা হত খুব। তবে আজ সকাল থেকে সেই যন্ত্রণা আর নেই।"

"আপনার বাবা-মা-স্ত্রী অথবা বাড়ির ঠিকানা মনে আছে?"

"না। কিছুই মনে করতে পারছি না। তবে শরীর খুব ভাল লাগছে।"

"এই পোশাকগুলো আপনি পেলেন কী করে? কোনও চিকিৎসালয়ে তো এমন পোশাক ব্যবহার করতে দেবে না। সেখানে কি মজাদার পোশাক পরার কোনও অনুষ্ঠান হয়েছিল। মনে করে দেখুন!"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সেরকম একটা কিছু...।"

যুবক এবার গম্ভীর হল, "দেখুন, একজন নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য এখনই জনস্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাকে ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু আপনি আমার বাবার অতিথি। তা ছাড়া বলছেন আপনার শরীর ভাল আছে। অনেক সময় অবশ্য বাইরের আলো হাওয়া খুব কাজে দেয়। দাঁড়ান, আপনার খাবার নিয়ে আসি।" যুবক ভেতরে চলে গেল।

অর্জুন কিছুক্ষণ একা-একা আকাশপাতাল ভাবল। তার নিজেকে উন্মাদ ভাবতে কিছুতেই ভাল লাগছিল না। যুবক ফিরল একটা সুন্দর ট্রেতে খাবার নিয়ে। অর্জুনের সামনের টেবিলে ট্রেটা বসিয়ে দিয়ে বলল, "মোটামুটি এই বাড়িতে ছিল।"

অর্জুন দেখল একবাটি সুপ, অনেকখানি সবজি সেদ্ধ আর গোল ফুলকো রুটি দু'খানা প্লেটে রয়েছে। সে চুপচাপ খেয়ে গেল। খিদে যে মারাত্মক পেয়েছিল তা খাবার মুখে দিতে মালুম হল। এমন স্বাদহীন খাবার শেষ করতে বেশি সময় লাগল না। খাবার শেষ করা মাত্র দরজায় শব্দ হল। এবং দেওয়ালে যার ছবি দেখেছিল সেই সুন্দরীকে ভেতরে ঢুকতে দেখল সে। সুন্দরী ঘরে ঢুকেই তাকে দেখতে পেয়েছিল। যুবক বলল, "আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার বোন বলাকা। আপনার নামটা জানা হয়নি।"

"অর্জুন।" সে দুই হাত যুক্ত করল নমস্কার জানাতে। বলাকা স্বচ্ছন্দে এগিয়ে এসে ডান হাত বাড়িয়ে অর্জুনের আঙুল স্পর্শ করল, "আপনার বাড়ির লোক নিশ্চয়ই চিত্রাঙ্গদার খুব ভক্ত।"

"চিত্রাঙ্গদা?" অর্জুন হতভম্ব।

"নইলে অর্জুন নামটি তারা রাখতেন না, তাই না?"

এবার বুঝল অর্জুন। বলাকা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের কথা বলছে।

বলাকা এবার তার দাদার দিকে তাকাল, "আমি দুটো প্রবেশপত্র পেয়েছি। আর ঠিক এক ঘন্টা বাদে লন্ডনে খেলা শুরু হবে।"

যুবক বলল, "ক্রিকেট আমার ভাল লাগে না। ফুটবল হলে যেতাম।" সে এবার অর্জুনের দিকে তাকাল, "আপনি ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাবেন?"

"কোথায় হচ্ছে?" অর্জুন ভয়ে-ভয়ে জানতে চাইল।

"লন্ডনে। ভারত বনাম ইংল্যান্ড।" বলাকা বলল, "এ-খবর আপনি জানেন না?"

যুবক নিচু গলায় বলল, "ওর জানার কথা নয়।"

"আমার কাছে একটি অতিরিক্ত প্রবেশপত্র আছে। যেতে চাইলে সঙ্গে আসুন।"

এই ঘর থেকে বেরনো যাবে, প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না, অর্জুন তাই উঠে দাঁড়াল। যুবক জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কখন ফিরছ?"

বলাকা জবাব দিল, "দু' ঘন্টার তো খেলা, শেষ হলেই ফিরব।"

বলাকাকে অনুসরণ করে অর্জুন হাঁটতে-হাঁটতে ভেবে পাচ্ছিল না ক্রিকেট কী করে দু' ঘন্টার খেলা হবে? পাঁচদিনের টেস্ট, তিনদিনের ম্যাচ থেকে এখন ওয়ান ডে-তে এসেছে। অথচ বলাকা বলছে দু' ঘন্টার খেলা।

পার্কিং লটে একটা লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে সেটায় উঠে বসে পাশের দরজা বোতাম টিপে খুলে দিল বলাকা। অর্জুন দেখল গাড়িতে গিয়ার নেই, ক্ল্যাচ নেই। সুইচ অন করে একটা বোতাম টিপতে গাড়ি ভুস করে ছুটে চলল। কয়েক সেকেন্ডেই হাইওয়ে। হঠাৎ মাথার ওপরে একটা বিরাট হোর্ডিং নজরে এল, 'জলপাইগুড়ি শহরে সুস্বাগতম।'

জলপাইগুড়ি শহর? অর্জুন সোজা হয়ে বসল, এটা জলপাইগুড়ি শহর নাকি? যে-শহরে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে, তার কিছুই চেনা মনে হচ্ছে না? এতবড় হাইওয়ে কবে জলপাইগুড়িতে ছিল? শহরের মধ্যে সরু ঘিঞ্জি কিছু রাস্তায় যাতায়াত করত সবাই।

সে জিজ্ঞেস করল, "তিস্তা নদীটা কোন দিকে?"

বলাকা হাসল, "শুনলাম আপনি বলেছেন যে, জলপাইগুড়িতে আপনার বাড়ি, তিস্তা নদীর কী অবস্থা তা জানেন না।"

অর্জুন বুঝল। কেন বৃদ্ধ এবং যুবক তার কথা শুনে অমন অবাক হয়েছিল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলাকা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমাকে সত্যি কথা বলুন তো? আপনার পরিচয় কী?"

অর্জুন হাসল। সত্যি কথা বলে কোনও লাভ নেই। কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। সে মাথা নাড়ল, "আমার কোনও কথাই মনে পড়ছে না।"

"কোনও কষ্ট হচ্ছে?"

"বিন্দুমাত্র নয়।"

পিলপিল করে গাড়ি ছুটে চলেছে। নানা ধরনের গাড়ি, কিন্তু কোনও শব্দ নেই। দিনটা ভালই। বলাকা বলল, "আমরা স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছি। আপনি তিস্তার কথা বলছিলেন, ওই দেখুন।"

বলাকার আঙুল অনুসরণ করে অর্জুন দেখল একটা বড় নোটিস বোর্ডে লেখা আছে, 'আপনারা তিস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছেন।'

মানে? বলাকা যা বলল তা হল, এককালে তিস্তা নাকি সারা বছর শুকিয়ে থাকত। অনেকখানি জায়গা শহরের পাশে বালির চর হয়ে পড়ে নষ্ট হত। মাঝে-মাঝে বর্ষায় বন্যা হত এই যা। বেশ কিছু বছর আগে পাহাড় থেকে যেখানে তিস্তা নীচে নামছে সেখান থেকেই মাটির তলায় বিশাল টানেল করে নদীর জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ না থাকায় সারাবছর সেখানে জল থাকে। স্রোতও। ফলে ভাল বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। আর ওপরের বালি জমিকে নানান কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। শহরের পাশে সেই বিরাট চরেই গড়ে উঠেছে খেলাধুলোর নানান ঘেরা মাঠ।

পেটের ভেতর চিনচিন করতে লাগল অর্জুনের। সেই বিখ্যাত চর উধাও? তিস্তা-ব্রিজের দরকার নেই। এখানে স্টেডিয়াম

হয়েছে। জলপাইগুড়িতে স্টেডিয়াম বলতে ছিল কয়েকটা গ্যালারি নিয়ে হাকিমপাড়ার টাউন ক্লাব। আর বলাকা যেখানে গাড়ি পার্ক করল, লম্বা ট্রলি জাতীয় গাড়ি তাদের তুলে নিয়ে যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে আকাশের অর্ধেকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল স্টেডিয়াম। কবে হল এসব? এত লোক আজ খেলা দেখতে এসেছে তবু ঝামেলা হচ্ছে না এতটুকু! প্রবেশপত্র দেখিয়ে মাঠে ঢোকার পর চোখ জুড়িয়ে গেল অর্জুনের। এমন সবুজ মাঠ, ঝকঝকে স্টেডিয়াম সে কখনও দেখেনি। মাঠের দু'দিকে স্কোরবোর্ড রয়েছে। আর একপাশে বিশাল একটা ক্যামেরাজাতীয় যন্ত্র মাঠের দিকে মুখ করে রাখা হয়েছে। গ্যালারি ইতিমধ্যেই ভরে উঠেছে।

এই সময় আকাশবাণী শোনা গেল, "প্রিয় বন্ধুগণ, আর কিছুক্ষণ বাদেই ইংল্যান্ডের লর্ডস্ মাঠে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের ক্রিকেট খেলা শুরু হবে। দুই দলে যাঁরা খেলছেন তাঁদের নাম নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। তবু আর-একবার জানানো হচ্ছে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক স্বপনলাল। দলে আছেন····।"

অর্জুন কান পেতে শুনল। একটি নামও তার চেনা বলে মনে হল না। পাশে বসা বলাকাকে সে না জিজ্ঞেস করে পারল না, "শচীন খেলছে না?"

"কে শচীন?"

"শচীন তেন্ডুলকর। বিস্ময়-বালক।"

"বিস্ময়-বালক মানে? এরকম নাম তো কখনও শুনিনি।" বলাকা অবাক।

অর্জুনের ডান দিকে বসা এক বৃদ্ধ বললেন, "শচীন তেন্ডুলকর? নামটা কিন্তু কোথায় পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।"

তাঁর ওপাশে বসা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, "অনেকদিন আগে ওইরকম নামের এক ভদ্রলোক নাটক লিখতেন। মরাঠি ভাষায়।"

"কতদিন আগে?" প্রথম বৃদ্ধ জানতে চাইলেন।

"সময়টা ঠিক মনে নেই। নাটকের ওপর একসময় পড়াশোনা করেছিলাম। তখন পড়েছিলাম। তবে প্রথম নামটা নিশ্চয়ই শচীন নয়।" দ্বিতীয় বৃদ্ধ জবাব দিলেন।

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল। আকাশবাণী হল, "খেলা শুরু হচ্ছে। এখন আমরা আপনাদের সামনে লর্ড্স মাঠকে উপস্থিত করছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে মাঠের একপাশে দাঁড় করানো ক্যামেরাজাতীয় যন্ত্রটা চালু হল। অর্জুন অবাক হয়ে দেখল স্টেডিয়ামের মাঝখানে মাঠটা মুহূর্তেই বদলে গিয়ে লর্ডস মাঠে পরিণত হল। আম্পায়ার দুই অধিনায়ককে দিয়ে টস করাচ্ছেন। ইংল্যান্ড টসে জিতে প্রথম ঘন্টার ব্যাটিং নিল। এই মুহূর্তে লর্ডসে বসে থাকলে সে যেমনটি দেখত, জলপাইগুড়িতে বসে ঠিক তেমনই দেখছে। মাঠ, খেলোয়াড়। এক, শুধু দর্শকরা পালটে গেছে। সে বলাকাকে না জিজ্ঞেস করে পারল না, "অত হাজার মাইল দূরে যে খেলা হচ্ছে তা এই মাঠে কী করে দেখানো সম্ভব?"

বলাকা হাসল, "আপনি সত্যি সব ভুলে গেছেন! আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা ঘরে বসে লর্ডসের খেলা দূরদর্শন যন্ত্রে দেখতেন। সেটা কী করে সম্ভব হয়েছিল? শুধু চারচৌকো বাক্সের পরদায় ছবিটাকে না রেখে এই বড় মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে মেজাজটা ভাল পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্তত তিনশোটা মাঠে একই সঙ্গে মানুষ খেলাটা দেখতে পাচ্ছে।"

খেলা চলাকালীন এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিল অর্জুন যে, অন্যদিকে মন ছিল না। প্রথম ঘন্টায় ইংল্যান্ড আশি রান করল তিন উইকেট হারিয়ে। ভারত বল করেছে কুড়ি ওভার। দ্বিতীয় ঘন্টার জন্য ভারত নেমেই একটা উইকেট খোয়াল। সমস্ত স্টেডিয়াম জুড়ে হাহাকার। ইংল্যান্ড উনিশ ওভার বল করলে ভারত রান তুলল

তিন উইকেটে ছিয়াত্তর। খেলা শেষ। কিন্তু যেহেতু ইংল্যান্ড এক ওভার কম বল করেছে তাই ভারত চার রান বোনাস পেল। ফলে দুই দলের স্কোর হয়ে গেল সমান-সমান, আশি। ম্যাচ ড্র। বলাকা বলল, "আজকাল প্রায়ই দেখছি ম্যাচ ড্র হচ্ছে। চলুন।"

অর্জুন নিজের ঘড়ির দিকে তাকাতে পুরনো সময় দেখতে পেল। বলাকার চোখ পড়েছিল তার ঘড়ির ওপর। সে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, "ও মা, এ কীরকম ঘড়ি আপনার ? দেখি, দেখি।"

বাধ্য হয়ে নিজের কব্জিটাকে তুলে ধরল অর্জুন। বলাকা সেটাকে দেখতে-দেখতে বলল, "খুব দাম হবে ঘড়িটার। পুরনো জিনিস সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনার ঘড়ি যে উলটোপালটা সময় দিচ্ছে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ঠিক করা হয়নি।"

"কিন্তু তারিখটা ? কী লেখা আছে ?"

অর্জুন ইংরেজিতে তারিখটা দেখল। এবং তখনই খেয়াল হল এখানে আসার পর থেকে সে একটিও ইংরেজি শব্দ শুনতে পায়নি। বলাকাদের পরিবারের কেউই কথার মধ্যে ইংরেজি বলেনি। হয়তো এখানে কেউ ইংরেজি শেখে না। এই কারণেই বলাকা পড়তে পারছেনা তারিখটা, সে দেখল,অদ্ভুত দৃষ্টিতে বলাকা তাকে দেখছে। একটা কিছু জবাব দিতেই হয়। কিন্তু তার আগেই বলাকা বলল, "নিশ্চয়ই এটাও আপনার মনে পড়ছে না। চলুন।"

বলাকার পেছন-পেছন হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুনের মনে হল মেয়েটা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এবার বেজায় সন্দেহ করছে, সে কী করে এদের বোঝাবে উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে শিলিগুড়ির কাছে একটা বাংলোয় ছিল ! আর এখন ঠিক কোন সাল তাই তো বোঝা যাচ্ছে না।

গাড়িগুলো ফিরছিল। হাইওয়ের গায়ে মাঝে-মাঝে লেখা, ডান দিকের সরু পথ দিয়ে জলযোগকেন্দ্র, বিশ্রামালয়। তিন নম্বর বাহিরপথ বিমানবন্দরের জন্য। বিমানবন্দর ? জলপাইগুড়ি শহরে এয়ারপোর্ট আছে নাকি ?

হঠাৎ বলাকা বলল, "আপনি এতক্ষণ আমাদের সঠিক কথা বলেননি। হতে পারে আপনার মস্তিষ্ক স্থির নেই, কিন্তু আপনার পোশাক, ঘড়ি, কথাবার্তায় এখনকার কিছুই ধরা পড়ছে না। আপনাকে সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু তার আগে আপনাকে আমি জলপাইগুড়ি শহরটা ঘুরিয়ে দেখাব। কথা বলতে-বলতেই বলাকা হাইওয়ে থেকে শহরে যাওয়ার পথ ধরে ডান দিকে বাঁক নিল। অর্জুনের মনে পড়ল আমেরিকার হাইওয়েতে এইরকম পথগুলোকে 'এগজিট' বলে। গঠনটা ঠিক একই ধাঁচের, বাঁ দিকের কার পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলাকা গাড়ির বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে চার-ইঞ্চিটাক টিভি স্ক্রিন বেরিয়ে এল ড্যাশ বোর্ডের একধারে। বাজনা বাজছে কোথাও। এবারেই সেই স্ক্রিনে বলাকার দাদাকে দেখা গেল, "কী ব্যাপার ?"

"বাবা ফিরেছেন ?"

"হ্যাঁ। একটু আগে। তোমরা কোথায় ?

"ছয় নম্বর বাহির পথে। আমরা একটু শহরে যাচ্ছি।"

"কেন ?"

"অর্জুনকে শহর দেখাব।"

"একটু সতর্ক থেকো। বাবা ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়েছেন। ঠিক এক ঘন্টা বাদে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে সবাই এখানে আসছেন। এর ভেতরেই চলে এসো।" আলো নিভে গেল। বলাকা সুইচ টিপে স্ক্রিনটাকে আবার ভেতরে চালান করে দিয়ে বলল, "শুনলেন তো ? এবার সত্যি কথা না বলে আপনার কোনও উপায় নেই। এই শহরের কোথাও আপনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারেন।"

অর্জুনের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। বলাকা যে একটুও মিথ্যে বলছে না তা সে বুঝতে পারছিল, কিন্তু কী করে সঠিক ব্যাপারটা সে বোঝাবে। বলাকা আবার গাড়ি চালু করে গুনগুন করে সুর ধরল,'আজ আমি যে কিছু চাহি নে...' হঠাৎই সে থেমে গিয়ে প্রশ্ন করল, "পরের লাইনটা কী বলুন তো ?"

অর্জুনের মনে পড়ল দেবব্রত বিশ্বাসের গলায় রবীন্দ্রনাথের এই গানটি সে শুনেছে। মনে করেই সে জবাব দিল, "জননী বলে শুধু ডাকিব।"

"বাঃ। খুব ভাল। এবার বলুন।"

গাড়ি এখন শহরের মধ্যে ঢুকছে, সব পালটে গেছে, সব। যদি অতবড় তিস্তা নদীকে ছোট করে পাতালনদী করে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে তা হলে শহরটার ভোল পালটাবেই। সে জিজ্ঞেস করল, "করলা নদী কোথায় "

"করলা ? সেটা আবার কী ?

অর্জুন এবার মরিয়া হল। যা হওয়ার হোক, বলাকাকে ব্যাপারটা বলা দরকার। সে বলল, "অনুগ্রহ করে কোথাও গাড়ি দাঁড় করাবেন,যেখানে আমরা কথা বলতে পারি ?"

বলাকা ওর দিকে তাকাল, তারপর মাথা নাড়ল। দু'পাশে বড়-বড় ঝকঝকে বাড়ি। মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত যানবাহন চলছে। সব আধুনিক গাড়ি। একটা সিঁড়ি দিয়ে কিছু লোক নীচে নেমে গেল, তার মানে এখানে পাতালরেলও রয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের একটি বাড়ি বা দোকানকে সে এখন কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

এখন পার্কিং প্লেস পাওয়া খুবই মুশকিল, বলাকা আধ ঘন্টার জন্য একটা জায়গায় গাড়ি রেখে পাশের রেস্টুরেন্টে তাকে নিয়ে ঢুকল। রেস্টুরেন্টে একজনই কর্মচারী। থরে-থরে খাবার সাজানো আছে। মানুষজন সেগুলো প্লেটে তুলে কর্মচারীটিকে দাম দিয়ে টেবিলে গিয়ে বসছে। এমন ঝকঝকে রেস্টুরেন্ট জলপাইগুড়িতে কখনও ছিল না।

দু' কাপ কফি নিল বলাকা। নিল মানে গরম কফির লিকার কাপে ঢেলে চিনি মিশিয়ে নিল, দুধ ঢালল না। তারপর ট্রে হাতে এগিয়ে গেল দাম দেওয়ার জন্য। অর্জুনের মনে হল বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এরা এর মধ্যে প্রচুর উপকার করেছে তার। অতএব কফির দাম তারই দেওয়া উচিত।

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বলাকা কিছু বলার আগেই সে কর্মচারীটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "দুটো কফির দাম কত ?"

"দু' হাজার।" কর্মচারী জবাব দিল।

হকচকিয়ে গেল অর্জুন। দু' হাজার টাকা দু' কাপ কফির দাম ? তার কাছে তো অত টাকা নেই। পেছন থেকে বলাকা বলল, "আপনি সরে দাঁড়ান, আমি দিচ্ছি।" ট্রে-টাকে পাশের টেবিলে রেখে সে নিজের ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করে কর্মচারীটিকে দিতেই ভদ্রলোক মেশিনে সেটা পাঞ্চ করে ফিরিয়ে দিল।

রেস্টুরেন্টের এক কোণে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে বলাকা জিজ্ঞেস করল, "আপনার হাতে ওটা কী ?"

দশ টাকার নোট তখনও হাতেই ছিল, সেটা নিঃশব্দে এগিয়ে দিল অর্জুন। বলাকা সবিস্ময়ে সেটাকে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এটা কোথায় পেলেন ?"

"আমার কাছেই ছিল। আমাদের সময় এই দশ টাকায় পাঁচ কাপ কফি পাওয়া যেত।"

"আপনাদের সময় মানে ?"

"উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ। আপনাকে আমি সব কথা খুলে বলছি। তার আগে বলুন, এটা কোন সাল, মাস, খ্রিস্টাব্দ ?"

"আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আজ চব্বিশে বৈশাখ, পনেরোশো আটষট্টি সাল।" বলাকা জবাব দিল।

"তার মানে, কাল পঁচিশে বৈশাখ ? রবীন্দ্রনাথের তিনশো বছর পূর্ণ হবে ?"

"হ্যাঁ। কাল আমাদের বিরাট উৎসব।"

অর্জুন মনে-মনে হিসাব করল, বলাকার কথা যদি ঠিক হয় তা হলে সে একশো সত্তর বছর পরের জলপাইগুড়ি শহরে বসে আছে। তার মানে ডক্টর গুপ্তের মেশিন তাকে একশো সত্তর বছর ভবিষ্যতে নিয়ে এসেছে। সে ধীরে-ধীরে সব কথা বলাকাকে খুলে বলল।

শুনতে-শুনতে বলাকা খুব উত্তেজিত, "আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন ?"

"নিশ্চয়ই। এই পোশাক উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমরা পরি। এই ঘড়ি তখন স্বাভাবিক ছিল। এই যে নোট দেখছেন, এটা দশ টাকার, তখন সারা ভারতবর্ষে এটাই চালু ছিল।" অর্জুন বোঝাতে চাইল।

বলাকা কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার এখন বয়স কত ?"

"অর্জুন জবাব দিল, "তেরোশো আটানব্বই সালে বাইশ বছর ছিল।"

"তা হলে তো এখন একশো বিরানব্বই হয়েছে ?"

"হয়নি, কারণ আমি এক মুহূর্তে এখানে এসেছি। আপনি মহাভারত পড়েছেন ? মহাভারতে অর্জুন নামে একজন বীর ছিলেন। তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন আচমকাই, জীবিত অবস্থায়। সেখানে থাকার সময় তাঁর বয়স বাড়েনি।"

"মহাভারত ? নাম শুনেছি। আসলে রবীন্দ্রনাথের নাম ছাড়া আর কিছু পড়ার সময় আমাদের নেই। ওঁর গানই আমাদের পুজোর মন্ত্র। কী অদ্ভুত লাগছে আপনাকে দেখে, সবাইকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছে।"

"প্লিজ সেটা করবেন না, আমার বিপদ হবে।"

"প্রথম শব্দটা কী বললেন ?"

"প্লিজ, মানে অনুগ্রহ করে। এটি ইংরেজি শব্দ।"

"ও, ব্রিটিশদের ভাষা। আমরা বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বলি না।"

"কিন্তু ভারতবর্ষ তো বিরাট দেশ, তার ভাষাও অনেক···।"

"নিশ্চয়ই। শুনেছি এই কারণে এক সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দাঙ্গা হত। কেউ-কেউ বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত ঠিক হল প্রত্যেক প্রদেশকে একমাত্র বৈদেশিক ব্যাপার ছাড়া অন্য বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধিকার দেওয়া হবে। এর পরে আর কোনও সমস্যা নেই। দেশের মধ্যে আমরা সাধারণত নিজেদের নিয়ম মেনে চলি। কিন্তু আপনার কথা যদি সত্যি হয় তা হলে আপনি আমার পূর্বপুরুষ ?" অদ্ভুত চোখে তাকাল বলাকা।

অর্জুনের লজ্জা হল। বলাকা তার সমবয়সী বলা যায়।

"আপনি সত্যি এই শহরে ছিলেন ?"

"হ্যাঁ। শহরটা তখন এরকম ছিল না।"

"কীরকম ছিল ?"

"মফস্বল শহর যেমন হয়। হাইওয়ে ছিল না। একটা বাইপাস ছিল। নদী ছিল বিশাল এবং প্রায়ই জল থাকত না। উনিশশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দের বন্যার পর শহরটা প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তিন-চারতলা বাড়ি হাতে গোনা যেত। মানুষজন ছিল ভাল, কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিল। তখন লন্ডনে খেলা হলে আমরা টিভিতে দেখতে পেতাম।"

বলাকা বলল, "আমি আপনার এসব কথা অনুমানও করতে পারছি না। ঠিক আছে, আপনি আমার সঙ্গে ইতিহাস-ঘরে চলুন।"

"ইতিহাস-ঘর ?"

"হ্যাঁ। আমাদের শহরের যাবতীয় অতীতের তথ্য সেখানে রাখা আছে। যদিও আমার হাতে বেশি সময় নেই, তবু আপনার কথা জানার পর যেতে ইচ্ছে করছে।"

কফির কাপ এবং ট্রে একটি বিশেষ বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে বলাকা অর্জুনকে নিয়ে বের হল। গাড়ি মিনিট-তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল একটা দশতলা বাড়ির সামনে। নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলাকা সেখানকার ছুটন্ত সিঁড়িতে চেপে অর্জুনকে নিয়ে সাততলায় পৌঁছে গেল। দরজার ওপর লেখা আছে, অতীত দু'শো বছর। নিস্তব্ধ বিশাল হলঘর। শীর্ণদেহ কিন্তু খুব স্মার্ট এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, "কোনও সাহায্যে আসতে পারি ?"

"হ্যাঁ। আমরা এই শহরটার অতীত সম্পর্কে জানতে চাই।"

"কী জানতে চান আপনারা ?"

"শহরটা তৈরি হয়েছিল কবে ?"

"জলপাইগুড়ির মূল শহর তৈরি হয় কয়েকশো বছর আগে, পুনর্গঠিত হয় আশি বছর।" বৃদ্ধ ওদের নিয়ে একটা বড় ডেস্কের সামনে চলে এলেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "উনিশশো একানব্বই মানে তেরোশো আটানব্বই সালের জলপাইগুড়ি সম্পর্কে কিছু বলুন !"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। তারপর নানারকম বোতাম টিপতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে বোর্ডের ওপর একটা ম্যাপ ফুটে উঠল। অর্জুন উত্তেজিতভাবে তাকাল। হ্যাঁ, শহরের ম্যাপ। বাড়ি, রাস্তা। বৃদ্ধ বললেন, "অনেকটাই অনুমান-নির্ভর ম্যাপ। কিছু ছবি আর বইপত্র ঘেঁটে তৈরি। তখন তিস্তা শহরের পাশে ছিল অনেকটা জায়গা নিয়ে। এই যে।"

বৃদ্ধের স্টিক অনুসরণ করে অর্জুন তাকাতে নদীর চিহ্ন দেখতে পেল। তিস্তা যদি ওটা হয়,তা হলে পাশেই সেনপাড়া এবং হাকিমপাড়া। সে জিজ্ঞেস করল, "তিস্তা সেতুটা কোথায়, যার ওপর দিয়ে ডুয়ার্সে যাওয়া যেত ?"

"সেতু ? শহরের ছবিতে তিস্তার ওপরে কোনও সেতু নেই। রাস্তাগুলো ছিল খুব সরু। কিছু ব্যক্তি চা-ব্যবসার কল্যাণে ধনী ছিলেন, কিন্তু অনেকেই দরিদ্র।"

হঠাৎ অর্জুন চিৎকার করে উঠল, "ওই তো করলা নদী !"

বৃদ্ধ ফিরে তাকালেন, "হ্যাঁ, তখন ওই নামে একটা খাল ছিল কিন্তু এ-তথ্য আপনি জানলেন কী করে ?"

অর্জুন হকচকিয়ে গেল। উত্তেজিত হওয়াটা ঠিক হয়নি। বলাকা বলল, "উনি ওই সময় সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন।"

"তাই নাকি ? আমাদের এই ইতিহাস-ঘরের বাইরে তথ্য আছে ? বেশ, তখন অঞ্চলগুলোকে কীভাবে ভাগ করা হত বলুন তো ?"

"পাড়া হিসাবে। আলাদা নাম ছিল পাড়ার। এই যে তিস্তার পাশে আর করলার মধ্যে জায়গাটা, এর নাম ছিল হাকিমপাড়া। এইটে স্টেডিয়াম। আমরা টাউন ক্লাব স্টেডিয়াম হিসাবে জানি।" অর্জুন উজ্জ্বল মুখে বলল।

"আপনি ঠিক বলছেন। এত বিশদ আমিও জানি না।"

"এই ইতিহাস-ঘর ওই ম্যাপের কোনখানে হবে ?"

বৃদ্ধ তাঁর স্টিকটি যেখানে রাখলেন সেদিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, "আরে, এটা তো জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি। পাশে একটা মন্দির ছিল, মন্দিরের পাশে বিরাট বিল। দাঁড়ান, এই সোজা চলে এলাম, দিনবাজারের পুল পেরিয়ে সোজা কদমতলার রাস্তায়, হ্যাঁ, এই জায়গাটাকে এখন কী বলে ?"

"পাতালরেল দফতর।"

অর্জুন হতভম্ব। তাদের বাড়ি যেখানে, সেখানে একশো সত্তর বছর বাদে পাতাল রেলের দফতর হবে ? রাজবাড়ির চিহ্ন থাকবে না ? সে জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলটাকে খুঁজল। শ্যামাপ্রসাদবাবু এখন হেডমাস্টারমশাই। খুব ভাল লোক। সে জায়গাটা দেখিয়ে বলল, "এইটে একটা বড় স্কুল।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "ওটিকে মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু মহাশয়, আপনি এত তথ্য জানতে পারলেন কী করে ?"

অর্জুন হাসল, "জেনেছি। আচ্ছা, মোটে তো একশো সত্তর বছর। এমন কোনও প্রবীণ মানুষের কথা কি জানেন, যিনি তাঁর পিতা বা পিতামহের কাছে অতীত দিনের কথা শুনে মনে রেখেছেন ?"

বৃদ্ধ হাসলেন, "আমিই শুনেছি। আমার পূর্বপুরুষের চা-বাগান ছিল। আপনি যে সময়ের কথা বলছেন তার একটু আগে একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন যাঁকে নাকি 'জলপাইগুড়ি শহরের পিতা' বলা হত।"

অর্জুন আচমকা জিজ্ঞেস করল, "তাঁর নাম কি এস·পি·রায় ?"

"এস·পি·? হ্যাঁ তিনি রায় ছিলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়।"

আপনি সত্যেন্দ্রপ্রসাদের বংশধর ?" অর্জুন হতভম্ব।

"আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন তাঁকে চেনেন ?" বৃদ্ধ এবার বেশ অবাক হলেন। এই সময় বলাকার হাতের ঘড়িতে বিপ্ বিপ্ শব্দ শুরু হল। সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার দূরভাষ আমি ব্যবহার করতে পারি ?"

"অবশ্যই।" বৃদ্ধ দূরের একটি ডেস্ক দেখিয়ে দিলেন।

বলাকা সেদিকে এগিয়ে গেল। ডেস্কের উলটোদিকে দূরদর্শনের পরদার মতো একটা পরদায় আলো জ্বলে উঠল বলাকা বোতাম টিপতেই। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, সেই সময় যে-সমস্ত মানুষ বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের নাম জানা যাবে ?"

বৃদ্ধ বললেন, "নিশ্চয়ই। কলকাতার বিখ্যাত মানুষদের সংখ্যা অনেক। সেসব তথ্য পেতে কষ্ট হয়নি। বিভিন্ন জেলার মানুষদেরও আমরা যতটা সম্ভব এই সংগ্রহে রেখেছি।" ভদ্রলোক বোতাম টিপতেই ম্যাপ মুছে গেল। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী ধরনের মানুষের কথা জানতে চান ?"

"ভাল খেলোয়াড় ?"

বোতাম টেপা হল। অর্জুন দেখল দুটো নাম ফুটে উঠেছে। তেরোশো পঞ্চাশের পর দু'জন বিখ্যাত খেলোয়াড় হলেন, রুণু গুহঠাকুরতা এবং মণিলাল ঘটক। এঁরা ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

"শিল্পী ?"

বোতাম টেপা হল। না। সেই সময় জলপাইগুড়িতে ভারতবিখ্যাত শিল্পী ছিলেন না।

হঠাৎ অর্জুনের মাথায় ডক্টর গুপ্তের কথা ভেসে উঠল। ডক্টর গুপ্ত নিশ্চয়ই বিখ্যাত মানুষ। যদিও অনেকেই তখন তাঁর নাম জানত না। কিন্তু শিলিগুড়ির কাছে যেখানে ওঁর গবেষণাগার সেটা জলপাইগুড়ি জেলায় পড়ে না। সে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "দার্জিলিং জেলার বিবরণ আছে ?"

বৃদ্ধ তাকে পাশের টেবিলে নিয়ে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তেরোশো আটানব্বই সালে ডক্টর গুপ্ত নামে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন···।"

বৃদ্ধ বোতাম টিপলেন। পরদায় ফুটে উঠল দার্জিলিং জেলার দুশো বছরের বিখ্যাত বিজ্ঞানী—ডক্টর এস· বি· গুপ্ত এবং তাঁর পরে অনেক নাম।

অর্জুনের মনে পড়ল না, ডক্টর গুপ্তের প্রথম নাম এস·বি·কি না। তবে এই মানুষটি যে তিনিই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে বলল, "ওই ডক্টর এস·বি·গুপ্ত সম্পর্কে বেশি কিছু জানলে ভাল লাগবে।"

ডক্টর গুপ্তের নামের পাশের একটা নীল আলো দপদপ করতে লাগল। তারপর পরদায় লেখাগুলো ফুটে উঠল, ডক্টর সুরব্রত গুপ্ত। মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে চোদ্দশো সাত সালে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তেরোশো আটানব্বইতে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মস্তিষ্কে আঘাত লাগে এবং কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকেন। সুস্থ হওয়ার পর দেখা যায় তিনি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন হয়েছেন। চোদ্দশো দশ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর গবেষণার জন্যই এখন সূর্যের সংসারের বাইরে অন্য একটি গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। গ্রহটির নামকরণ তাঁর সম্মানে করা হয়েছে 'সুরব্রত'।

অর্জুনের কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তার মানে ডক্টর গুপ্ত মারা যাননি। আরও নয় বছর গবেষণা করার পরে উনি নোবেল পাবেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ খবর তিনি নিজেও জানেন না।

কতক্ষণ এইসব নিয়ে সে মগ্ন ছিল জানে না। চৈতন্য হল যখন সে দেখল, বলাকার সঙ্গে আরও চারজন প্রৌঢ় তার দিকে এগিয়ে আসছে। একজন তাকে বলল, "আপনি অর্জুন ? বেশ। আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।"

"কোথায় ?"

"প্রধান তদন্তকেন্দ্রে।"

"কেন ?"

"আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব। তারপরে যদি প্রয়োজন হয় আপনি আইনের সাহায্য নিতে পারেন। আসুন।"

অর্জুন অসহায় হয়ে বলাকার দিকে তাকাল। বলাকা মাথা নিচু করল। অগত্যা প্রৌঢ়দের অনুসরণ না করে উপায় রইল না অর্জুনের।

যেভাবে হাতকড়া না পরিয়ে বন্দিদের গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় সেইভাবেই ওরা অর্জুনকে নিয়ে চলল শহরের প্রান্তে। রাস্তাঘাট চিনতে পারল না সে। মূল প্রবেশদ্বারে কোনও রক্ষী নেই। ড্রাইভার মাইক্রোফোনে সাঙ্কেতিক শব্দ বলতেই গেট খুলে গেল। গাড়ি চলল সরু পথ দিয়ে। আরও দুটো গেট পার হওয়ার পর সবাই গাড়ি থেকে নামল। বিশেষ একটি ঘরে ওদের সঙ্গে ঢুকে অর্জুন দেখল আরও দু'জন মানুষ যেন সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

একজন প্রশ্ন করল, "ইনিই সেই অবাঞ্ছিত অতিথি ? কী নাম ?"

দাঁড়িয়ে থেকেই অর্জুনকে জবাব দিতে হল, "অর্জুন।"

"আপনি বলেছেন, জলপাইগুড়িতে আপনার বাড়ি। কোথায় ?"

"এখন সেই বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপনাদের পাতাল রেলের যেখানে দফতর সেখানেই আমাদের বাড়ি দিল," অর্জুন নির্বিকার মুখে জবাব দিল।

জবাবটা শোনামাত্র সবাই নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করল। একজন বলল, "আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন, পাতাল রেলের দফতর প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তত একশো বছর আগে।"

"আমি আপনাদের সময়ের একশো সত্তর বছর আগে ওখানে থাকতাম।"

"আপনি যা বলছেন তা আপনার ধারণায় সত্যি ?"

"অবশ্যই।"

"তার মানে আপনি অতীতের মানুষ, এই বর্তমানে কীভাবে এলেন ?"

"ডক্টর গুপ্তর বাংলোয় তাঁর তৈরি মেশিনে চড়ে।"

"ডক্টর গুপ্ত কে ?"

"তিনি একশো সত্তর বছর আগে সময়, মহাকাশ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করতেন।"

অর্জুন দেখেনি, ইতিহাসঘরের সেই বৃদ্ধকেও নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। ইঙ্গিতমাত্র তিনি এগিয়ে এসে নিচু গলায় কিছু জানালেন। সম্ভবত একটু আগে ডক্টর গুপ্ত সম্পর্কে জানা কিছু তথ্য। এবার যেন সত্যি অর্জুনের অস্তিত্ব বিশ্বাস করল এরা।

সঙ্গে-সঙ্গে হইচই পড়ে গেল। একজন প্রশ্ন করল, "আপনি তরুণ। ওই সময়ে জলপাইগুড়িতে আপনি কী করতেন?"

"প্রচলিত অর্থে তেমন কিছু নয়।"

"ডক্টর গুপ্ত একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হল কী করে?"

"তাঁকে আমি সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। তিনি গবেষণার কাজে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমি সেটা সক্ষম হইনি তাঁরই আচরণের জন্য।"

"আপনার সাহায্য তিনি কেন চেয়েছিলেন?"

"আমি একজন সত্যসন্ধানী।"

"এজন্য আপনি শিক্ষা নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। আমার গুরু অমল সোমের সহকারী হিসাবে আমি অনেকটা শিখেছি।"

"তিনি কি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন?"

"যে-কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁকে চিনতেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে ইতিহাসঘরের বৃদ্ধকে নির্দেশ দেওয়া হল, অমল সোম সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য। তিনি টেলিফোন-ডেস্কের সামনে গিয়ে বোতাম টিপে সংযোগ করতেই ইতিহাসঘরের সহকারীকে পরদায় দেখা গেল। সেই ভদ্রলোক নির্দেশ শুনে সেটা পালন করতেই টেলিফোনের উলটো দিকের পরদায় ফুটে উঠল, "অমল সোম—বিস্তারিত বিবরণ শূন্য।"

প্রশ্নকারীর একজন হাসল, "কীরকম বিখ্যাত সেটা বুঝতেই পারছি। গুরুর যখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন একবার শিষ্যের খোঁজ করুন।"

ইতিহাসঘরের বৃদ্ধ অর্জুনের নাম জানাতেই তাঁর সহকারী পরদায় ফুটিয়ে তুলল, "অর্জুন, সত্যসন্ধানী, নানান রহস্য উদ্ধার করেছেন। বর্তমান থেকে অতীতে তিনি পরিক্রমা করে এসেছেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে দুর্ঘটনায় মারা যান।"

এবার এই ঘরে কোনও কথা নেই। বৃদ্ধ টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মুখ্য প্রশ্নকর্তা অর্জুনের দিকে এগিয়ে এলেন, "আমি জানি না আপনি খুব বড় প্রতারক কি না। হয়তো এসব তথ্য জেনেই আপনি আমাদের বিভ্রান্ত করতে এখানে এসেছেন। আবার এও হতে পারে, আপনি যা বলছেন তা সত্যি। সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের পূর্বপুরুষদের একজন। আপনার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে একটু সময় লাগবে। সেই সময় পর্যন্ত আপনাকে আমাদের অতিথি হিসাবে থাকতে হবে।" ভদ্রলোক ইঙ্গিত করতে দু'জন রক্ষী অর্জুনকে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

যে-ঘরটিতে তাকে নিয়ে আসা হল তার একটিমাত্র জানলা। কিন্তু তার কাচ বন্ধ। ঘরটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। রক্ষীরা চলে গেলে অর্জুন বুঝল তাকে ওরা বন্দি করে রেখে দিল। হয়তো আরও খোঁজখবর করবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেসব জানার পর রায় দেবেন। সেই রায় যদি তার বিপক্ষে যায় তা হলে? এরা কি তাকে মেরে ফেলবে? এখানে এখন শাস্তির পরিমাপ কী? সে তো কোনও অন্যায় করেনি।

সে ঘরটিকে খুঁটিয়ে দেখল। একটি সুন্দর বিছানা, বিছানার পাশেই টেলিফোন-ডেস্ক। দেওয়ালে কিছু বই। সে এগিয়ে গেল। প্রথম বইটি গীতবিতান। অন্য বইগুলো গীতবিতানের গান নিয়ে লেখা প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান যাদের কাছে বেদ অথবা মহাভারতের মতো, তারা কি তার সম্পর্কে ভয়ঙ্কর হতে পারে?

অন্যমনস্ক অর্জুন পকেটে হাত ঢোকাতে সিগারেটের প্যাকেটের স্পর্শ পেল। সিগারেট সে খুবই কম খায়। গত আট-দশ ঘণ্টায় তো খায়নি। সে সিগারেট ধরাল। নার্ভে যে অবস্থা তাতে সিগারেট সাহায্য করবে হয়তো। অর্জুন ধোঁয়া ছাড়তেই অদ্ভুত কাণ্ড হল। ঘরের ভেতর দপ করে আলো জ্বলে উঠে শোঁ-শোঁ শব্দ শুরু হল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলে গেল এবং বেশ কিছু উত্তেজিত মুখকে উঁকি মারতে দেখা গেল। অর্জুন হতভম্ব। লোকগুলো তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে। দরজা খোলা থাকায় কানে আসছে সাইরেন জাতীয় কিছু একটা তীব্রস্বরে বাজছে। এই সময় একজন কর্তাব্যক্তি ছুটে এলেন, "আপনি ওটা কী করছেন?"

"আমি? সিগারেট খাচ্ছিলাম।"

"সিগারেট? ওর ভেতর কী আছে?"

"তামাক। সাধারণ তামাক।"

"নিভিয়ে ফেলুন। চটপট। তামাক পোড়ার ধোঁয়া মানুষের স্বাস্থ্যের শত্রু। আপনি নিজে মরবেন, আমাদেরও মারবেন।"

"এখানে কেউ তামাক খায় না? সিগারেট বিক্রি হয় না?"

"ওসব এখানে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ ওসব খাচ্ছে জানলে তাকে কড়া শাস্তি দেওয়া হয়। নিভিয়ে ফেলুন বলছি।"

অর্জুন সিগারেট নেভাল। ওরা এবার একটা যন্ত্র নিয়ে এসে ঘরে যেটুকু ধোঁয়া ছিল সব টেনে নিল। তারপর একটা পাত্রের ভেতর সিগারেট, দেশলাই ফেলে দিতে বলল অর্জুনকে। হুকুম পালন না করে কোনও উপায় ছিল না। ওরা দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার আগে বলে গেল একজন চিকিৎসক আসবেন ওর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। অর্জুন খাটের পাশে রাখা একটা চেয়ারে গিয়ে চুপচাপ বসল।

সিগারেট খাওয়া নিয়ে এমন কাণ্ড হবে কে জানত! উনিশশো একানব্বইতে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে সতর্কীকরণ লিখে ছেড়ে দেওয়া হত। দেশের ভেতর প্লেনে চাপলে সিগারেট খাওয়া যেত না, হাসপাতালে নয়, ট্রাম-বাস অথবা সিনেমা হলে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এমন আতঙ্ক তখন সৃষ্টি হয়নি। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, সেই সময় যদি এটা না হত তা হলে মানুষের উপকারে লাগত।

কী আশ্চর্য! এর মধ্যেই সে সেই সময় বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাও করা যায় না। এখন যদি সে এখানে থেকে যায় তা হলে তার বয়স একশো সত্তর বছর বেশি হয়ে যাবে? অসম্ভব। অর্জুন নিজের গালে হাত বোলাল। গতকাল সকালে সে দাড়ি কেটেছে। কোথাও যাওয়ার না থাকলে সে একদিন অন্তর দাড়ি কাটে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা বাদে যতটুকু দাড়ি সাধারণত বাড়ে তার অর্ধেকও বাড়েনি। কেন এমন হল? তার কি এখানে থাকার সময় বয়স বাড়ছে না? সে যদি দশ বছর এখানে থাকে তা হলেও বয়স বাড়বে না?

এই সময় দরজায় শব্দ হল। সেটা খুলে যেতে দু'জন মানুষ কয়েকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাদের আপাদমস্তক মহাকাশচারীদের মতো পোশাকে ঢাকা। একজন বললেন, "আমরা চিকিৎসক। আপনার শরীর পরীক্ষা করব। দয়া করে উঠে আসুন।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "এমন অদ্ভুত পোশাক আপনারা পরেছেন কেন?"

"সংক্রামিত হতে পারে এমন রোগ থেকে সতর্ক থাকতে চাই।"

"কিন্তু আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ।"

"আপনি ধূমপান করেন। এটা জানার পর এই সতর্কতার প্রয়োজন হয়েছে।"

অর্জুনের সমস্ত শরীর রশ্মিযন্ত্র দিয়ে পরদায় ফুটিয়ে তুলে বিশ্লেষণ করা হল। তার রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র, রক্তের ঘনত্ব ইত্যাদি পরীক্ষা করার পর চিকিৎসক বললেন, "এখনও আপনার ফুসফুস নিকোটিনের কবলে পড়েনি। কিন্তু আপনি যদি আর কিছুদিন ধূমপান করেন তা হলে সেই আশঙ্কা থাকছে।"

ওরা আবার দরজা বন্ধ করে চলে গেল। এবার চেয়ারে বসে

অর্জুনের মনে হল, অনেক হয়েছে, এবার ফেরার কথা ভাবা দরকার। সে চিরকাল এখানে পড়ে থাকতে পারে না। বাড়িতে মা আছেন। তা ছাড়া, এদের রেকর্ড যদি ঠিক কথা বলে তা হলে সে পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচবে। তাকে মরতে হবে একটা দুর্ঘটনায় পড়ে। অর্জুনের এখনই শিরশির করল শরীর, যদিও পঞ্চাশে পৌঁছতে তার ঢের দেরি আছে। কিন্তু তাকে ফিরে যেতে হলে সেই হাইওয়ের পাশের জঙ্গলে যেতে হবে। এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যেতে এরা নিশ্চয়ই দেবে না। অর্জুনের মনে হল, এখানকার মানুষজন একটু আলাদা ধরনের। আবেগ কম, কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব।

তবে হ্যাঁ, এখানে এসে তার কয়েকটা লাভ হয়েছে। প্রথমত, ডক্টর গুপ্ত তাঁর গবেষণা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন এই তথ্য জানা গেল। ভদ্রলোক নোবেল পুরস্কার পাবেন। দ্বিতীয়ত, সে নিজে পঞ্চাশ বছরের আগে মারা যাবে না। তৃতীয়ত, একশো সত্তর বছর পরে জলপাইগুড়ির কী অবস্থা হবে সেটাও নিজের চোখে দেখা গেল।

চুপচাপ যতক্ষণ কেটে গিয়েছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মিষ্টি বাজনার আওয়াজ কানে আসতেই সে সোজা হল। ঘরের এককোণে টেলিফোন-ডেস্কে আলো ফুটে উঠেছে। অর্জুন পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল। যেভাবে এর আগে কথা বলার সময় অন্যদের বোতাম টিপতে দেখেছে সেইভাবে সে একমাত্র বোতামটি টিপতেই পরদায় একটি পুরুষের ছবি ভেসে উঠল। ভদ্রলোক বললেন, "শুভসন্ধ্যা। তথ্য ও জনকল্যাণ দফতর থেকে বলছি। আজ দুপুরে আমাদের আপনার কথা জানানো হয়েছে। দেশবাসী আপনার সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"করুন। কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

"আচ্ছা। এখনই সেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি···।"

"দাঁড়ান। এখানে আসার পর আমি সুপ আর সবজিসেদ্ধ খেয়েছি। আসলে ওতে আমার মন ভরে না, খিদেও মেটে না।"

"আপনি কী ধরনের খাবার খেতে চাইছেন?"

"একদম দিশি। ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ কিংবা মাংসের ঝোল। অবশ্য এখন যদি সন্ধেবেলা হয়, আপনি শুভসন্ধ্যা বললেন বলেই বলছি, পরোটা আর কাবাব পেলেও চলবে। সঙ্গে এক কাপ ভাল চা।"

"এক মিনিট দাঁড়ান।" ভদ্রলোক সময় চেয়ে নিয়ে কাউকে ইঙ্গিত করলেন দেখা গেল। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ, আপনি অর্জুন। একশো সত্তর বছর আগে এই শহরে বসে সত্যসন্ধান করতেন। হঠাৎ ভবিষ্যতে এসে আপনার কেমন লাগছে? কী-কী পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন?"

"সব কিছুই পরিবর্তিত। এসব আমরা ভাবতে পারতাম না।"

"তখনকার জীবন আর এখনকার জীবনের মধ্যে কোনটা ভাল?"

"জীবনযাপনের সুবিধেগুলো এখানে বেশি।"

"আমাদের পূর্বপুরুষ ডক্টর গুপ্তর মহাকাশ এবং সময়সম্পর্কিত অবিষ্কার এখনকার বৈজ্ঞানিকদের খুব সাহায্য করছে। আমরা এখন স্বচ্ছন্দে সময়কে নিয়ন্ত্রণে রেখে সুরব্রত গ্রহে চলে যেতে পারি। ডক্টর গুপ্তকে আপনি দেখেছেন। একজন মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন?"

"আমি তাঁকে মাত্র একটি সন্ধে দেখেছি। সেই সময় তিনি আতঙ্কিত ছিলেন, কারণ, তাঁর ভয় ছিল, কেউ তাঁর গবেষণা নষ্ট করে দিতে পারে।"

"কারা?"

"আমি জানি না।"

"ওহো, এইমাত্র আমাদের খাদ্য দফতর জানিয়েছে, আপনি যেসব খাবার খেতে চেয়েছেন তা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। ভাত-ডাল-তরকারি বা মাছের ঝোলে শুধু উদর ভর্তি হয় কিন্তু কর্মক্ষমতা বাড়ে না। আর পরোটা, কাবাব সুপাচ্য নয়, আপনার পেটের পক্ষে ক্ষতিকর। আসলে এই অনাবশ্যক খাবারগুলো অনেকদিন হল বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের সেইসব খাবার খাওয়া উচিত যা তার শরীরকে পরিপূর্ণ করবে। আপনি মুরগির মাংস সেঁকা অবস্থায় খেতে পারেন এবং তাই আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে ভাল দুধ।" ভদ্রলোক হাসলেন।

অর্জুন বিমর্ষ হল, "এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।"

"আপনি কি কিছু বলছেন?" ভদ্রলোক যেন ঠিক বুঝতে পারেননি।"

"আমি যা বলছি তা আপনি বুঝতে পারবেন না।"

"কেন?"

"যে পায়েস, মালপোয়া বা গোকুল পিঠে খায়নি সে শীতকালের খাবার কত ভাল হতে পারে জানবে কী করে?"

ভদ্রলোক গম্ভীর হলেন, "হ্যাঁ, এবার আপনার সঙ্গে একটি পরিবারের পরিচয় করিয়ে দেব। সারা দুপুর সন্ধানকাজ চালিয়ে এঁদের আমরা আবিষ্কার করেছি। চেয়ে দেখুন, একেবারে বাঁ দিকে যিনি বসে আছেন তাঁর নাম মধুসূদন। মধুসূদনের পাশে তাঁর স্ত্রী লাবণ্য। লাবণ্যের পাশে ওঁদের ছেলে ক্ষেমঙ্কর এবং পুত্রবধূ মালিনী।"

অর্জুন দেখল পরিবারের চারজনই অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল, এবার নমস্কার করল। তথ্য দফতরের ভদ্রলোক বললেন, "এই পরিবার আপনার উত্তরপুরুষ। আপনার রক্ত এঁদের দু'জনের শরীরে বর্তমান।"

অর্জুন হতভম্ব। বৃদ্ধ, যাঁর নাম মধুসূদন বেশ উত্তেজিত এখন, "আপনি, আপনি আমার প্রপিতামহের প্রপিতামহ? এভাবে আপনার দর্শন পাব আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।"

"আপনি, আপনি আমার উত্তরপুরুষ?" কথা খুঁজে পাচ্ছিল না অর্জুন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দয়া করে আমাকে আপনি বলবেন না। আমি কত ছোট।"

"কিন্তু কী করে নিশ্চিত হলেন?"

"মানে? আমার প্রপিতামহের ডায়েরি আমার কাছে আছে। তাতে তিনি তাঁর আটজন পূর্বপুরুষের নাম লিখে গিয়েছেন। তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের সম্পর্কে বিশদ লেখা আছে। আপনি সত্যসন্ধানী ছিলেন। দেশে-বিদেশে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আপনার দুই পুত্র-সন্তান। একজন সন্ন্যাসী হয়ে যান। দ্বিতীয়জনের বংশধর আমরা। আপনার যখন পঞ্চাশ বছর বয়স তখন পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। এসব আমি জানি। গল্প পড়ার কৌতূহলে পড়েছি। কিন্তু আপনাকে চোখে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হবে আমার তা ভাবিনি। এই হল আমার পুত্র ক্ষেমঙ্কর। ওকে আশীর্বাদ করুন।" বৃদ্ধ মধুসূদন হাত বাড়িয়ে নিজের ছেলেকে দেখিয়ে দিতে সে আশীর্বাদ নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। অর্জুনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। যে-বংশধরদের মানুষ কখনওই দ্যাখে না তাদের সামনে অনেক কমবয়স্ক শরীর নিয়ে সে বসে আছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম মধুসূদন, কিন্তু ওঁর ক্ষেমঙ্কর, কেন?"

"আসলে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রাবলী থেকে নামকরণ করা এখন নিয়ম।"

"কিন্তু ক্ষেমঙ্করের স্ত্রী তো মালিনী ছিলেন না?"

এবার সুন্দরী মহিলা, যাঁর নাম মালিনী, জবাব দিলেন, "না,

ছিলেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন, মালিনী ক্ষেমঙ্করকেই ভালবাসত।"

নাটকটি দেখেছে অর্জুন। কিন্তু এমন কিছু ছিল কিনা মনে পড়ল না। তাকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে মালিনী বললেন, "একেবারে শেষে মালিনী বলেছেন, মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমঙ্করে। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,'পতন এবং মূর্ছা'। ওটা হয়েছিল ভালবাসার কারণেই।"

এবার লাবণ্য জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমাদের বাড়িতে আসবেন ?"

"আমি কোথায় যেতে পারি তা জানি না। এঁরা আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করছেন।"

তথ্য দফতরের ভদ্রলোক বললেন, "আপনার মঙ্গলের জন্যই তা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যদি জানে আপনি বিংশ শতাব্দীর মানুষ তা হলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। সেটা আমরা চাই না।"

"বিপদে কেন পড়ব ?"

"ইতিহাস বলে, বিংশ শতাব্দীর মানুষেরা অত্যন্ত সন্দেহপরায়ণ ছিল। তারা অকারণে বিশ্বজুড়ে দু'-দু'বার মারাত্মক যুদ্ধ করেছে। সেই যুদ্ধে নৃশংসভাবে তারা শত্রুপক্ষের মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি।"

"সেটা জার্মানি, ব্রিটেন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কেরা করেছিলেন। সাধারণ মানুষ কখনওই সেটাকে মেনে নিতে পারেনি।"

"দেখুন, আপনাদের ইতিহাসে সবসময় রাষ্ট্রনায়কদের কথাই লেখা থাকত, সাধারণ মানুষকে অবহেলা করা হত। যা হোক, আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে হল। এবার আপনি বিশ্রাম করুন।"

চট করে আলো নিভে গেল। অর্জুন সুইচ অফ করতেই ঘরের দরজা খুলে গেল। দু'জন মানুষ একটা ট্রলিতে করে খাবারের ডিশ, গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। কোনও কথা না বলে তারা আবার বেরিয়ে গেল। অর্জুন দেখল এক প্লেট রোস্টেড মুরগি আর একগ্লাস দুধ রয়েছে ট্রলির ওপরে। মুরগির মাংসের পরিমাণ প্রচুর। একটুও সময় নষ্ট না করে সে খাবারে মন দিল। নরম মাংস, কিন্তু লবণের পরিমাণ খুব কম। এরা নুনও কম খায় বোধ হয়। পেট ভরে না যাওয়া পর্যন্ত খেয়ে গেল সে। তারপর বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। যেখানে যাই হোক, এখন তার শরীর একটু ঘুম চাইছে।

অথচ ঘুম এল না। ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। লোকে নাতি কিংবা পুতির মুখ দেখে, ও দেখল কয়েক প্রজন্মের পরের মানুষগুলোকে। দেখে অবাক হয়েছিল কিন্তু কোনওরকম টান, যা স্নেহ-ভালবাসা থেকে তৈরি হয়, তা মনে আসেনি। ওদের কেমন বানানো-সাজানো মানুষ বলে মনে হচ্ছে এখন।

এরা তাকে নিয়ে ঠিক কী করতে চায় ভেবে পাচ্ছিল না অর্জুন। কিন্তু আর নয়, এবার তার ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা দরকার। সে এখন ঠিক কোথায় আছে তা জানা নেই। হাইওয়ের পাশে জঙ্গলের মধ্যে ডক্টর গুপ্তের মেশিনটাকে সে লুকিয়ে রেখে এসেছে। ওই মেশিনটার সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে ফেরা অসম্ভব। যেমন করেই হোক, মেশিনটার কাছে সবার অলক্ষ্যে তাকে পৌঁছতেই হবে।

অর্জুন উঠে বসল। তাকে একই সঙ্গে উত্তেজিত এবং চিন্তিত
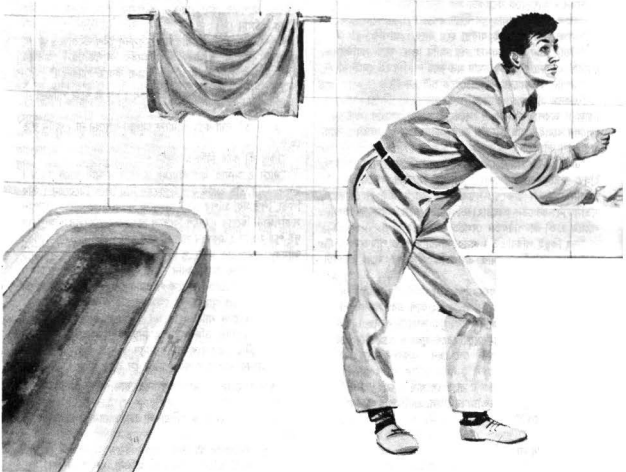
দেখাচ্ছিল। কী করে সেই জায়গাটায় যাওয়া যায়? বলাকা যখন তাকে গাড়িতে নিয়ে হাইওয়ে ধরে যাচ্ছিল তখন তো কোনও জঙ্গল চোখে পড়েনি। অথচ সেই জঙ্গল থেকে হাঁটা শুরু করেই সে বলাকাদের বাড়িতে পৌঁছেছিল। অতএব, সেই নির্দিষ্ট হাইওয়েতে যেতে হলে বলাকাদের বাড়ির দিকে যেতে হবে। অর্জুনের মনে পড়ল, দুপুরের পর থেকে বলাকার দেখা সে পাচ্ছে না।

কিন্তু কী করে সেই জায়গায় যাওয়া সম্ভব হবে? প্রথম কথা, তাকে একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই বাড়ির অন্য দরজাগুলোয় নিশ্চয়ই ভাল পাহারা আছে। এখানে কোনও ট্রাম-বাস চোখে পড়েনি। হয়তো পাতাল রেল সেই জায়গাটার কাছাকাছি যায়। কিন্তু কীভাবে যেতে হয় তা সে জানে না। খুবই অসহায় হয়ে পড়ল অর্জুন।

ঘুমিয়ে পড়েছিল অর্জুন। সেটা কতক্ষণ তা বোঝার উপায় নেই। কারণ, সে আবিষ্কার করল ঘড়ির কাঁটা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে আছে। কী করে একটা অটোমেটিক ঘড়ি হাতে পরে থেকেও বন্ধ হয়ে যায় কে জানে!

অর্জুনের বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছিল। ঘরের ওপাশে একটা দরজা আছে, ঢোকার পরেই চোখে পড়েছিল। সে বিছানা ছেড়ে সেই দরজায় চাপ দিতে একটা মাঝারি ঘর দেখতে পেল। হাল্কা আলো জ্বলছে। ঝকঝকে তকতকে আধুনিক টয়লেট। লোকগুলোর তা হলে রুচি আছে।

শরীর হাল্কা হওয়ার পর সে জানলাটার দিকে তাকাল। কাচের জানলা। ভেতর থেকেই বন্ধ। সে একটু চেষ্টা করতেই জানলাটা খুলে গেল। চোখের সামনে নীল আকাশ। অনেক তারার ভিড় সেখানে। তার মানে এখন রাত অনেক। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সে রয়েছে বেশ কয়েকতলা ওপরে। এই জনলা দিয়ে নীচের দিকটা আদৌ দেখা যাচ্ছে না। জানলার গরাদে ভেঙে পালাবার চেষ্টা করেও কোনও লাভ নেই। অত ওপর থেকে পড়লে আর দেখতে হবে না।

ফিরে আসছিল অর্জুন। হঠাৎ খেয়াল হল, তার মৃত্যু হবে পঞ্চাশ বছর বয়সে। পঞ্চাশ হতে তো বহুত-বহুত দেরি। অতএব ওই জানলা দিয়ে বেরোতে গিয়ে পড়ে গেলেও তার বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু মরবে না এ-কথা বলা হয়েছে, হাত-পা ভেঙে জবুথবু হয়ে বেঁচে থাকবে না এমন কথা তো ওরা বলেনি।

তবু মারা যাবে না যখন, তখন একবার চেষ্টা করা উচিত। অর্জুন টয়লেটে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে জনলার গরাদে হাত দিল। অসম্ভব। সমস্ত জানলাটাই ইস্পাতের মোটা জালে মোড়া। তার একার চেষ্টায় সামান্য নড়ানোও সম্ভব নয়।

অর্জুন ফিরে এসে ঘরে একটা পাক খেল। তারপর সদর দরজায় ধাক্কা মারল। তৃতীয়বারের পর সেই দরজাটা খুলল।
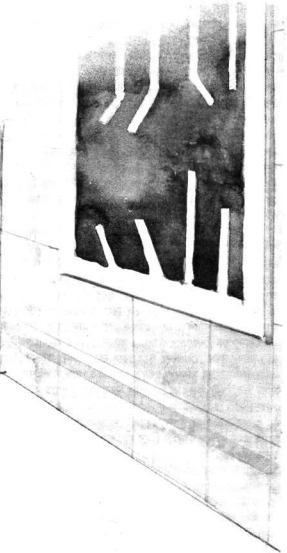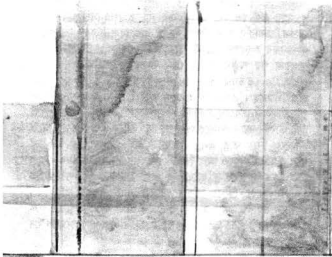
যে-লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে রক্ষী ছাড়া কেউ নয়। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে এখানে কতক্ষণ বন্দি থাকতে হবে?"

রক্ষী গম্ভীর গলায় জবাব দিল, "ওসব বিষয় আমার জানার কথা নয়। আপনি আগামীকাল সকাল সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"এখন ক'টা বাজে?"

"রাতের তৃতীয় প্রহর সবে শেষ হল।" কথাটা বলেই রক্ষী দরজা বন্ধ করে দিল। ঠোঁট কামড়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে মনে-মনে প্রহরের হিসাব করছিল অর্জুন। তুলসীদাসের গান আছে। 'প্রথম প্রহরে সবাই জাগে, দ্বিতীয় প্রহরে ভোগী, তৃতীয় প্রহরে তস্কর জাগে, চতুর্থ প্রহরে যোগী।' তার মানে তিন ঘণ্টায় এক প্রহর হলে তৃতীয় প্রহর শেষ হচ্ছে নয় ঘণ্টায়। সন্ধে ছ'টা থেকে নয় ঘণ্টা মানে এখন সবে তিনটে বেজেছে। সে ঘড়ির কাঁটা তিনটেতে নিয়ে গেলেও সেটা চালু হল না। হঠাৎ খেয়াল হতে সে দিন এবং বছরের কাঁটা ঘুরিয়ে একশো সত্তর বছর এগিয়ে নিয়ে আসা মাত্র আশ্চর্যজনকভাবে ঘড়ি চালু হল। অর্থাৎ, ঘড়িও ঠিক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায়?

হঠাৎ কানে একটা শব্দ হল। কোনও কিছু যেন ঘষটে গেল। অর্জুন চারপাশে তাকাল। সবই তো স্বাভাবিক। সে বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল গরাদের ইস্পাত অদ্ভুতভাবে বেঁকে গিয়েছে। একটু আগেও ওরকম ছিল না। এখন অন্তত এক ফুট ফাঁক হয়ে গিয়েছে। কীভাবে হল? অর্জুন এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করল। এখনই কেউ এমন কর্ম করেছে। কে করল! এই সময় তার কানে মৃদু স্বরে একটা ডাক পৌঁছল। খুব মৃদু। কিন্তু ডাকটা যে কুকুরের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখানে আসার পর সে কোনও জীবজন্তু দেখতে পেয়েছে কি না খেয়াল করতে পারল না। এত ওপরে কুকুরের ডাক? ওরা কি তার ওপর নজর রাখার জন্য কুকুর রেখেছে? অর্জুন অন্যমনস্কভাবে ঘরে ফিরে বিছানায় বসতে যেতে খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পেল। ভাল করে তাকাতেই চক্ষুস্থির। এ তো তাতান! ডক্টর গুপ্তের সেই ছোট হয়ে যাওয়া কুকুর, যার সন্ধানে অন্য গ্রহ থেকে উপদ্রব আসত!

সেই ছোট্ট কুকুর সমানে ডেকে যাচ্ছে। অর্জুন অনেকটা ঝুঁকে আদুরে গলায় ডাকল, "তাতান। তা-তান।" সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরটা ডাক থামিয়ে কুঁই-কুঁই শব্দ করতে লাগল লেজ নাচিয়ে। অর্জুন ওকে হাতে তুলে নিল, "তাতান, তুই এখনও বেঁচে আছিস? অদ্ভুত ব্যাপার। তুই এখানে এলি কী করে?"

তাতান পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে সামনের পা দুটো তুলে লাফাবার চেষ্টা করল। মনে হচ্ছিল অনেককাল পরে সে একটা চেনা মানুষকে দেখতে পেয়েছে। অর্জুন কোনও ব্যাখ্যা পাচ্ছিল না। সে যখন মেশিনে উঠে বসেছিল তখন তাতান ছিল বাক্সে। সময়যন্ত্রের মাধ্যমে এতদূর আসা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ওই ছোট্ট কুকুর এত ওপরে উঠে এসে ইস্পাত বাঁকাতেও পারবে না।

অর্জুন তাতানের গলায় আঙুল বুলিয়ে আদর করল, "তাতান, আমি এখন বন্দি। কীভাবে ফিরে যাব জানি না। তোকে দেখে খুব ভাল লাগছে।"

হঠাৎই খাটের খানিকটা দূরে রাখা চেয়ারটা ঘষটে একটু এগিয়ে এসে দুলতে লাগল। অর্জুন হতভম্ব। এরকম ভৌতিক ব্যাপার দেখে অন্য সময় কী করত সে জানে না কিন্তু তাতান সঙ্গে থাকায় সে শক্ত হয়ে তাকাল। তার মনে পড়ল ডক্টর গুপ্তের গাড়িটার কথা। ডক্টর গুপ্ত যাকে উপদ্রব বলতেন সেই ভিন্ন গ্রহের প্রাণীটি এসে গাড়ির ডিকি খুলে কত না ভৌতিক কাণ্ড করেছিল সেই বিকেলে।

এখানেও তেমনই কিছু ঘটছে? অর্জুন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। চেয়ারটা চুপচাপ এখন। তাতান তার মুখের দিকে তাকিয়ে। অর্জুনের মনে হল সেই উপদ্রবটি নিশ্চয়ই তাতানকে নিয়ে এসেছে, নইলে এর এখানে আসার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু তাতান একশো সত্তর বছর পরেও বেঁচে আছে?

অর্জুন চেয়ারটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কে জানি না, তবে মনে হচ্ছে আপনি তাতানের বন্ধু। আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?"

কোনও জবাব এল না। শুধু চেয়ারটা সামান্য সরে গেল। অর্জুন আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আমার ভাষা বুঝতে পারছেন না?"

কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

এবার তাতানকে দেখা গেল উত্তেজিত হয়ে বিছানার ধারে চেয়ারের দিকে ছুটে যেতে। একেবারে কিনারে পৌঁছে চেয়ারের দিকে মুখ করে সে সমানে চিৎকার করতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ারটা সরে এল বিছানার পাশে। তাতানের গলা থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বের হচ্ছিল এবার। রাগী কুকুরকে আদর করলে এমন শব্দ বের করে তারা। অর্থাৎ ওই আদরে তাতান খুশি হচ্ছে না।

ঘরের ভেতর এখন তিনটি প্রাণী, যার একজন অদৃশ্য। অর্জুন ঝুঁকে তাতানের গায়ে হাত রাখতেই মনে হল কিছু যেন চট করে সরে গেল হাতের তলা থেকে। অদ্ভুত অস্বস্তিকর অনুভূতি হল সেই মুহূর্তে। অর্জুন তাতানকে কোলে তুলে নিল, "তাতান, তোমার বন্ধুকে বলো. আমি খুব বিপদে পড়েছি, আমি সাহায্য চাই।"

কুকুরের কাছে প্রশ্নের জবাব চায়নি অর্জুন, যার কাছে চেয়েছিল সে রইল চুপচাপ। অর্জুন মরিয়া হল, "যদি আমাকে সাহায্য করতে ইচ্ছে থাকে তা হলে ওই চেয়ারটাকে খাটের নীচের দিকে সরিয়ে দেওয়া হোক।"

প্রায় দশ সেকেন্ড কিছুই হল না, তারপর সবিস্ময়ে অর্জুন দেখল চেয়ারটা সরে গেল খাটের একপাশে। আর তারপরেই বাথরুমের জানলায় মটমট করে শব্দ হতে লাগল। শব্দ থেমে যাওয়ার পর অর্জুন এগিয়ে গেল তাতানকে খাটের ওপর রেখে বাথরুমের ভেতর। গিয়ে সে দেখল জানলার অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। এখন সে স্বচ্ছন্দে জানলা দিয়ে বাইরে বেরোতে পারে। অর্জুন ঘরের দরজায় ফিরে অবাক, তাতান নেই। কিন্তু তার ডাকটা কানে আসছে জানলার দিক থেকে। অর্থাৎ তাতানকে আড়ালে নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে উপদ্রবটি। অর্জুনের মনে হল এই মুহূর্তে আর ভিন্ন গ্রহের অধিবাসীকে উপদ্রব বলাটা ঠিক হবে না। সে দু' হাতে ভর রেখে জানলায় উঠে শরীরটাকে গরাদের বাইরে নিয়ে এল। অনেক নীচে রাত্রের রাজপথ। সেখানে কোনও মানুষ অথবা যানবাহন দেখা যাচ্ছে না। সেদিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম হল। এত ওপর থেকে সে নীচে নামবে কী করে?

অর্জুন পাশের দেওয়ালগুলো দেখল। না, জলের পাইপ বা ওই জাতীয় কোনও বস্তু নেই যা বেয়ে নীচে নামা যায়, কার্নিসে দাঁড়িয়ে সাতপাঁচ ভাবছে যখন, তখনই একটা বড় ধাক্কা খেল সে। ধাক্কা এমন আচমকা ছিল যে, তার পদস্খলন হল এবং প্রায় ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে হু-হু করে নামতে লাগল। অর্জুন বাঁচার জন্য মরিয়া হল। কোনওরকমে মাথাটাকে ওপরে নিয়ে যেতে পারল সে। কিন্তু যে গতিতে সে নামছে তাতে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যেতে বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না। মাটির কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছে তখন দুই কাঁধ এবং কোমরে মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত একটা টান অনুভব করল সে। শরীরে প্রবল ঝাঁকুনি লাগল, কিন্তু নিজের শরীরটাকে ধীরে-ধীরে ফুটপাথে নেমে আসতে দেখল সে। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার কোমর, কাঁধ টনটন করছে। অত ওপর থেকে পড়ার পরেও বেঁচে থাকার বিস্ময়টা সেইসঙ্গে প্রবল। সে এখন বুঝে গিয়েছে ডক্টর গুপ্তের সেই

উপদ্রবটি এবার তাকে বাঁচাল। কিন্তু তারা ধারেকাছে নেই বা থাকলেও সে দেখতে পাচ্ছে না।

অর্জুন ভেবেছিল পা বাড়ালেই পড়ে যাবে, কিন্তু পড়ল না। এক পা এক পা করে সে ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়াল। পেছনের ঘরবাড়িগুলো এখন অন্ধকার, দরজা বন্ধ। এখান থেকে কীভাবে হাইওয়ের ধারের জঙ্গলে পৌঁছনো যায়? সে হাঁটা শুরু করল। কোথায় যাচ্ছে, রাস্তাঘাট কী, তা সে জানে না। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা চিহ্ন, তার নীচে লেখা, 'পাতাল রেল'। পাশ দিয়ে নীচে নামার সিঁড়ি।

সেখানে পা দিয়ে ও জলপাইগুড়ির ম্যাপ দেখতে পেল। একটু খুঁটিয়ে দেখে সে স্টেডিয়ামটাকে চিনতে পারল, ওইখানে বলাকা তাকে নিয়ে গিয়েছিল। বলাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেডিয়ামে যাওয়ার সময় 'সুস্বাগতম' লেখা দেখতে পেয়েছিল। তার মানে বলাকার বাড়ি শহরের বাইরে, স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকে। অনেকক্ষণ দেখার পর আন্দাজে মনে হল জায়গাটাকে সে চিনতে পারছে। বলাকাদের বাড়ি ছাড়িয়ে যে হাইওয়ে চলে গিয়েছে, সেইখানে তাকে যেতে হবে। মূল শহরের ম্যাপের পাশে পাতাল রেলের ম্যাপ। অর্জুন দেখল সেদিকটায় পাতাল রেলের একটা লাইন শেষ হয়েছে। লাইনের নাম, 'মুক্তধারা'। এদের পাতাল রেলের বিভিন্ন লাইনের নামকরণ হয়েছে কবিগুরুর নাটক থেকে।

কিন্তু পাতাল রেলে চড়তে গেলে টিকিট লাগবে। অভিজ্ঞতা আছে তার। টিকিট যন্ত্রের ভেতর না ঢোকালে দরজা খোলে না। টিকিট কেনার পয়সা তার নেই। একশো সত্তর বছর আগেকার নোট যে এখন বাতিল হয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে কারও সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। মুহূর্তেই কর্তৃপক্ষ তার অস্তিত্ব জেনে যাবে। এখন কি পাতাল রেল চলছে? অর্জুন ইতস্তত করছিল, এমন সময় একটা লোককে অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে আসতে দেখল। লোকটার রকমসকম খুব চেনা। হিন্দি সিনেমায় যে গুন্ডাদের দেখা যায় এর ভাবভঙ্গি তাদের মতন।

লোকটা ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়াল, "বাঁচতে চাও তো পকেটে যা আছে দাও।"

অর্জুন এমন অবাক যে, না বলে পারল না, "এখানে এখনও গুন্ডামি হয়?"

"আবার বাজে কথা! দাও?" রীতিমত ধমকে উঠল লোকটি।

অর্জুন বিনা বাক্যব্যয়ে পকেটের সব টাকা লোকটার হাতে দিয়ে দিল। আধা-অন্ধকারে লোকটা বলল, "এসব কী হাবিজাবি দিচ্ছ? তোমার ক্রয়পত্র নেই?"

"না।" অর্জুনের মনে পড়ল বলাকা একটা কার্ড নিয়ে ঘোরে।

"এগুলো কী?"

"টাকা।"

"দুস।" লোকটা খুব বিরক্ত হয়ে টাকাগুলো ফেরত দিয়ে বলল, "কপালটাই খারাপ। তা ক্রয়পত্র সঙ্গে না নিয়ে বেরিয়েছ, পাতাল রেলে চড়বে কী করে বুদ্ধুরাম?"

"সে-কথাই ভাবছি।"

"বুঝেছি, তুমি আমারই মতন শিকার খুঁজছ। নাম কী?"

"অর্জুন।"

"আমি রঘুপতি, তোমার দলে কেউ আছে?"

"না, আমি একা।"

"আমিও। এখনও ধরা পড়িনি। তুমি পড়েছ?"

"না।"

"বেশ ভাল হল। কোথায় যাবে?"

"মুক্তধারার শেষ প্রান্তে।"

"আরে, ওখানেই তো আমার বাড়ি। তোমাকে আগে দেখিনি কেন? চলো, আজ রাত্রে আর কিছু হবে না। তবে ক্রয়পত্র সঙ্গে না নিয়ে এলে কী করে?" লোকটা হাঁটতে-হাঁটতে প্রশ্ন করল।

"এসে গেলাম।" অর্জুন সমানে তাল দিচ্ছিল।

"উচিত হয়নি। পাতাল রেলকে ঠকানো উচিত নয়। এবার আমি তোমার প্রবেশপত্র কিনে নিচ্ছি।" লোকটা এগিয়ে গেল একটা মেশিনের দিকে। ওরা তখন পাতাল রেলের মূল দ্বারে পৌঁছে গিয়েছে। অর্জুন দেখল, মেশিনে কার্ড পাঞ্চ করে লোকটা দুটো টিকিট বের করে নিল। সেই টিকিট গেটের গর্তে ঢুকিয়ে ওরা প্ল্যাটফর্মে চলে এল। এখন প্রায় ভোর পাঁচটা। মাটির নীচে পাশাপাশি আটটি প্ল্যাটফর্ম। এই ভোরে দু-তিনজন যাত্রী দাঁড়িয়ে। রঘুপতি বলল, "এখানে কিছু করবে না। চারধারে জাল পাতা আছে।"

ঠিক পাঁচটা দশে ওরা ট্রেনে উঠল। ট্রেনের ভেতরটা রবীন্দ্রনাথের নানা লাইন ছবির মতো লেখা। কিছু চরিত্রের ছবিও আছে।

অর্জুন ছুটন্ত ট্রেনে বসে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করো?"

"মাংস বিক্রি করতাম। পাঁচ মাস আগে ওরা আমার লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে।"

"কেন?"

"মাংসটা ভাল ছিল না।"

"এখন চলে কী করে?"

"বেকার ভাতা দেয়। তাতে চলে নাকি? তাই সপ্তাহে একদিন বেরিয়ে এসে এই কাণ্ড করি। ক্রয়পত্র হাতিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তাই দিয়ে জিনিসপত্র কিনে সেটাকে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। তুমি কী করো?"

"সত্যসন্ধান।"

"সেটা কী জিনিস?"

"তুমি বুঝবে না। ধরা পড়লে কী হবে তোমার?"

"কুড়ি বছর। তোমার?"

"আজীবন।" অর্জুন হাসল।

"তা হলে তো তুমি আমার চেয়েও বড় কিছু করো?"

এক-একটা স্টেশনে পাতাল রেল দাঁড়াচ্ছিল আর যাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। তারা উঠে অর্জুনের দিকে তাকাচ্ছিল বারেবারে। কিন্তু সে একজন সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছে দেখে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল।

রঘুপতি হাসল, "এই পোশাক কোথায় পেলে?"

"পেয়ে গেলাম।"

"খুব মজাদার পোশাক।"

মুক্তধারার শেষ প্রান্তে ওরা ট্রেন থেকে নামল। গেট থেকে বাইরে পা দিতেই আকাশবাণী হল, "জলপাইগুড়ি শহরের অধিবাসীদের জানানো হচ্ছে, গতকাল অতীত-থেকে-আসা একটি মানুষকে গ্রেফতারের পর যখন পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছিল তখন সে বিভ্রম তৈরি করে পালিয়ে গিয়েছে। তার পোশাক মজাদার কিন্তু সে অতীব বুদ্ধিমান। ইস্পাতের গরাদে ভেঙে বহুতল বাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েও সে জীবিত অবস্থায় এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক ওই ব্যক্তিকে দেখামাত্র কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে পুরস্কৃত করা হবে।"

রঘুপতি দাঁড়িয়ে পড়েছিল ঘোষণাটা শুনতে। স্টেশনের মাইকে ঘোষণাটা শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ রঘুপতি শাঁ করে অর্জুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই কেউ তাকে নির্দেশ দিল, আঘাত করো। অর্জুনের হাত এবং পা একই সঙ্গে রঘুপতির শরীরে আঘাত করতেই সে ছিটকে পড়ল মাটিতে। কে দেখছে না দেখছে লক্ষ না করে অর্জুন দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

এদিকের রাস্তাঘাট পরিষ্কার এবং বাড়িঘরের সংখ্যা কম। এখন ভোর বলেই সম্ভবত রাস্তায় মানুষ নেই। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর সে দেখল একজন বৃদ্ধা তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। গাড়িতে কোনও ড্রাইভার

নেই। সম্ভবত বৃদ্ধাই চালাবেন। অর্জুন একেবারে বৃদ্ধার সামনে পৌঁছে গেলে তিনি মুখ ফেরালেন। ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড স্থূলকায়। কিন্তু হাসিখুশি।

তিনি অর্জুনকে বললেন, "সুপ্রভাত।"

"সুপ্রভাত।" অর্জুন চটপট জবাব দিল।

বৃদ্ধা এবার ঝুঁকে গাড়ির দরজা খুলতে গেলেন। চাবি নয়, দরজার গায়ের চাকতির নম্বর ঠিক জায়গায় নিয়ে এলে দরজা খুলে যাবে। বৃদ্ধা সেটা মন দিয়ে করার চেষ্টা করতেই তাঁর হাত থেকে ব্যাগ পড়ে গেল। অর্জুন সেটা কুড়িয়ে ফেরত দিতে বৃদ্ধা খুব খুশি হলেন, "অনেক ধন্যবাদ। আজ-কাল করে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া হচ্ছে না। আপনি খুব ভাল মানুষ। বাতের ব্যথার জন্য ঝুঁকে কিছু কুড়োতে আমার কষ্ট হয়।"

অর্জুন বলল, "আমাকে আপনি বলবেন না, আমি অনেক ছোট।"

"বাঃ। এরকম কথা তো এখনকার যুবকদের মুখে শুনি না।" বৃদ্ধা গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং-এ বসলেন, "তুমি এদিকে থাকো?"

"না। হাইওয়ের ওপাশে থাকি।"

"হাইওয়ের ওপাশে? সে তো অনেকদূর। এলে কী করে?"

"আমার এক বন্ধুর গাড়িতে। এখন ফিরব কী করে তাই ভাবছি।"

"আহা। এসো, এসো, আমার যদিও অতদূরে যাওয়ার কথা ছিল না, তবু চলো তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছি। কী নাম তোমার?"

তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসে সে জবাব দিল, "অর্জুন।"

"চমৎকার নাম। আমার মেয়ের নাম চিত্রাঙ্গদা।" বৃদ্ধা গাড়ি চালাতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন লক্ষ করল, এই গাড়িটা বলাকার গাড়ির মতনই, তবে ড্যাশবোর্ডে সেই টিভির পরদাটা নেই। শান্ত সকালে গাড়ি ধীরে-ধীরে শহর থেকে বেরিয়ে আসছিল। অর্জুনের চোখে পড়ল রাস্তার মোড়ে-মোড়ে সাদা ইউনিফর্ম-পরা পুলিশেরা দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধাও সেটা দেখলেন। নিজের মনেই বললেন, "হঠাৎ এত রক্ষী কেন? আমার বাপু ওদের ভাল লাগে না।"

অর্জুন সিঁটিয়ে ছিল। তার মনে হচ্ছিল, এত পুলিশ রাস্তায় শুধু তাকেই খুঁজে বের করার জন্য। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন বৃদ্ধা। বাড়িটার মাথার ওপর লেখা রয়েছে, "উপাসনা মন্দির।" বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কিছুক্ষণ মন্দিরে থাকব। তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও?"

'হ্যাঁ' বললে বৃদ্ধা খুশি হতেন। কিন্তু আশপাশে গাড়ির সংখ্যা দেখে অর্জুন বুঝল, মন্দিরে ভাল ভিড় হবে। ইতিমধ্যে ঘোষণা শুনে ফেলা কোনও লোক তাকে দেখে সন্দেহ করলেও দফা রফা হয়ে গেল। সে হাসল, "আমি না হয় অপেক্ষা করি।"

"বেশ।" বৃদ্ধা নেমে গেলেন। থপথপ করে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, হাতে ব্যাগ নিয়ে। অর্থাৎ ব্যাগটির ব্যাপারে তিনি বেশ সতর্ক।

অর্জুন গাড়িতে বসে ছিল চুপচাপ। তারপর কী মনে হতে গাড়ির ড্যাশবোর্ড খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এইটে এঞ্জিন চালু বা বন্ধ করার সুইচ। বৃদ্ধা এইটে নীচে নামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করেছিলেন। এইটে কী? পাশে কিছু লেখা নেই। গোটা-আটেক নানা ধরনের সুইচ সে টিপতে লাগল এঞ্জিন চালু করার সুইচটিকে বাদ রেখে। হঠাৎ রেডিও বেজে উঠল। গান হচ্ছে, 'ও আমার সোনার বাংলা'। বাঃ, চমৎকার। অর্জুনের মনে হল, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে যাঁরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন কপিরাইট আইনের সময় শেষ হওয়ায় তাঁর গান নিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে, তাঁদের এখানে এসে শোনানো উচিত। মৃত্যুর একশো সত্তর যোগ পঞ্চাশ বছর পরেও কী সততার সঙ্গে গাওয়া হচ্ছে।

গান শেষ হতেই ঘোষক বললেন, "সতর্কীকরণ! আজ ভোরবেলায় জাতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এক ব্যক্তি আমাদের সুরক্ষা দফতরের জানলা ভেঙে পালিয়ে গিয়েছে। লোকটির পোশাক বিংশ শতাব্দীর মানুষের মতো, ধূমপান করে এবং নিজের নাম অর্জুন বলে পরিচয় দেয়। লোকটি একা কি না তা জানা নেই। তবে যেভাবে সে নিখোঁজ হয়েছে তাতে বোঝা যায়, তার সঙ্গী থাকতে বাধ্য। যে-কেউ এই লোকটির সন্ধান পাবেন তাঁকেই কালবিলম্ব না করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।"

অর্জুনের শিরদাঁড়া কনকন করে উঠল। ওরা এখন তাকে খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে উঠেছে। উপাসনা মন্দিরে যদি ওই ঘোষণা শোনা যায় তা হলে বৃদ্ধা এতক্ষণে··· ! সে রেডিওর সুইচ অফ করল। তারপর জায়গা পরিবর্তন করে স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসল। স্টিয়ারিং বলতে একটা গোল চাকতি। ক্ল্যাচ নেই, গিয়ার নেই শুধু অ্যাক্সিলেটার আর ব্রেক। সে এঞ্জিন চালু করে অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। প্রথমে হাত কাঁপছিল। কিন্তু মোটরবাইক চালানোর অভ্যাস থাকায় গাড়ির চলাকে আয়ত্ত করতে অসুবিধে হল না। এমন মজার ড্রাইভিং যদি বিংশ শতাব্দীতে জলপাইগুড়ির মানুষ করতে পারত! প্রথম মোড় এগিয়ে এল। দু'জন পুলিশ তার দিকে অলস চোখে তাকিয়ে আছে। দমবন্ধ করে অর্জুন মোড়টা পার হতেই 'বাহির পথ' লেখা বোর্ড দেখতে পেল। সে দ্রুত গাড়ি সেই পথে নিয়ে যেতে-যেতে গতি সামলাল। সামনে এখন প্রচুর গাড়ি। এভাবে চালিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে কোনও লাভ নেই। এ-জীবনের জন্য এখানেই থেকে যেতে হবে।

ধীরে-ধীরে সে অন্য গাড়িগুলো অনুসরণ করে হাইওয়েতে উঠে এল। ওঠার পরেই মনে হল সে জানে না কোন দিকে যেতে হবে। ডান না বাঁ। বাঁ দিকে যেতে হলে ফ্লাইওভারে উঠে ওপাশে গিয়ে গাড়ির স্রোতে মিশতে হবে। অর্জুন অনুমান করল তাকে ডান দিকেই যেতে হবে, কারণ সে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

হাইওয়েতে যে-গতিতে গাড়ি যাচ্ছে, আনাড়ি হাতে তার সঙ্গে তাল রাখা মুশকিল। দু'-দু'বার দুটো গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতে-লাগতে বেঁচে গেছে। লেন ঠিক রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছে। তবু স্পিড বাড়াতে দ্বিধা করছে না অর্জুন। হঠাৎ চোখে পড়ল মাথার ওপর সাইনবোর্ড, 'বিদায় অতিথি, জলপাইগুড়ির স্মৃতি সুখকর হোক।' সাইনবোর্ডটার তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে সে দেখল এপাশে সুস্বাগতম লেখা। আঃ। সে ঠিক পথেই যাচ্ছে। বলাকা তাকে এই পথেই নিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ পেছন থেকে বিপ-বিপ শব্দ ভেসে এল। গাড়ির আয়নায় অর্জুন দেখল একটা লাল আলো জ্বালানো গাড়ি তার পেছন-পেছন আসছে ওই শব্দ করতে-করতে। এটা নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি। পুলিশ তার খবর পেল কী করে? বৃদ্ধা কি তাঁর গাড়ি হারানোর ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছেন? অর্জুন আরও গতি বাড়াল। তার গাড়িই একমাত্র হর্ন দিচ্ছে। ফলে অন্য গাড়ি সামনে থেকে সরে গিয়ে পথ করে দিতে লাগল। এঁকেবেঁকে অর্জুনের গাড়ি ছুটতে লাগল সামনে। পেছনের পুলিশের গাড়িটা একটু হকচকিয়ে গিয়ে গতি বাড়াল। খানিকটা যাওয়ার পর অর্জুন বুঝতে পারল পুলিশের গাড়িটা অনেক শক্তিশালী। প্রায় তার গায়ের কাছে চলে এসে পুলিশ অফিসার হাত-মাইককে আদেশ করলেন, "গাড়ি থামাও, নইলে গুলি করব।"

অর্জুন কান দিল না। এদিকটায় রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা জমি। হঠাৎ ডান দিকে জঙ্গল দেখতে পেল। পুলিশের গাড়ি এবার তার ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। রিভলভারটাকে প্রায় নাকের ডগায় দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেল অর্জুন। তার হাত কেঁপে উঠল। ব্রেকে পা দেওয়ার বদলে চাপ বাড়াল অ্যাক্সিলেটারে। দড়াম্ করে একটা আওয়াজ হল। অর্জুনের গাড়ির ধাক্কায় পুলিশের গাড়ি

ছিটকে গেল রাস্তার একপাশে। অর্জুনের গাড়ি পাক খেতে-খেতে শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে ছুটল আরও জোরে। পেছনে কাত হয়ে থাকা পুলিশের গাড়ির দিকে তার নজর দেওয়ার সময় নেই।

মিনিটখানেকের মধ্যেই বিপ্‌-বিপ্‌ আওয়াজে কান ঝালাপালা হওয়ার অবস্থা। অর্জুন বুঝল আরও পুলিশের গাড়ি ছুটে আসছে তার দিকে। এরা সম্ভবত হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ওরা গুলি করবেই। অর্জুন পাশের জঙ্গলের দিকে তাকাল। এই জঙ্গলটাই তো? তিনটে সিড়িঙ্গে গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। সেগুলো কোথায়? বুলডগের মতো গাড়িগুলো ছুটে আসছে পেছনে। অর্জুন দেখতে পেল হাইওয়ে থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে। সে চকিতে স্টিয়ারিং ঘোরাল। ব্রেক কষেও শেষরক্ষা করতে পারল না, গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল রাস্তার পাশের রেলিঙে। মেরে স্থির হয়ে গেল।

দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে অর্জুন জঙ্গলের দিকে দৌড়তে লাগল। পুলিশের গাড়িগুলো ব্রেক কষে থামতে-থামতে সে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। এবং তখনই তার কানে খুব নিচু পরদায় ঘেউ-ঘেউ ডাক ভেসে এল। অর্জুন চিৎকার করে উঠল, "তাতান।"

কিন্তু চিৎকারটা এবার পেছন থেকে। অর্জুন দেখল একগাদা পুলিশ চেনবাঁধা কুকুর হাতে নিয়ে ছুটে আসছে। কুকুরগুলো হিংস্র, ডাকছে তারাই। অর্জুন ছুটল। একটা সময় কুকুরের ডাক মিলিয়ে গেল, কিন্তু খুব কাছ থেকে নিচু গলার ডাক ভেসে এল। অর্জুনের মনে হল তাতানকে নিয়ে সেই অন্য গুহবাসী তার সামনে এগিয়ে চলেছে। এর মানে ওরা সারাক্ষণ তার সঙ্গে ছিল।

মাথার ওপর এখন বিমানের আওয়াজ। অদ্ভুত চেহারার বিমানগুলো এখন জঙ্গল খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎই তাদের একটা অর্জুনকে দেখতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে জোরালো আগুনের একটা রশ্মি নেমে এল ওপর থেকে। অর্জুন দৌড়ে সময়মতো সরে গিয়ে দেখল সেই জায়গার গাছপালা পুড়ে কালো হয়ে গেল।

স্তিমিত হয়ে আসা কুকুরের ডাক অনুসরণ করে কিছুটা যেতেই সে তিনটে সিড়িঙ্গে গাছ দেখতে পেল। অর্জুন এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, খেয়াল করেনি একজন পুলিশ অফিসার তার দিকে এগিয়ে আসছে। যখন দেখতে পেল তখন মেশিনটার উদ্দেশ্যে না দৌড়ে কোনও উপায় নেই।

মাথার পাশ দিয়ে দু'-দু'বার গুলি ছুটে গেল। মেশিনটার কাছে পৌঁছে দরজা খুলে সে পেছনে তাকিয়ে হিংস্র পুলিশটিকে দেখতে পেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে বন্দুক তাক করেছে। হঠাৎই লোকটা হতভম্ব হয়ে পাশে ঘুরে দাঁড়াল। অদৃশ্য কিছু তাকে ধাক্কা মেরেছে বলে মনে হল। অর্জুন আর অপেক্ষা না করে মেশিনে উঠে বসে এঞ্জিন চালু করার সুইচে হাত দিয়ে নব ঘোরাতে লাগল। একশো সত্তর বছর পিছিয়ে যেতে হবে তাকে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনিতে শরীরের হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা। অর্জুন চোখ মেলে দেখল চারপাশ কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। সে কোথায়, প্রথমে ঠাওর করতে পারল না। শরীর একটু স্থির হতে সে মেশিন থেকে নামার চেষ্টা করল। কয়েক সেকেন্ড বাদে সে বুঝতে পারল এটা ডক্টর গুপ্তের গবেষণাগার। কোনও পুলিশ অফিসার সামনে নেই বন্দুক উঁচিয়ে।

অর্জুন ধীরে-ধীরে দরজার কাছে এগোল। না। বিদ্যুতের ছোঁয়া নেই ওখানে। দরজা ঠেলল সে। ধীরে-ধীরে খুলে গেল সেটা। সেই সিঁড়ি এখন অন্ধকারে ঢাকা। নীচের ঘরে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। কিছু লোক কথাবার্তা বলছে। অর্জুন হ্যাজাকের আলো লক্ষ্য করে নীচে নেমে আসতেই একজন চিৎকার করে উঠল,

"কে ? কে ওখানে ?" অর্জুন দেখল, খাঁকি পোশাক পরা পুলিশ অফিসার।

ভদ্রলোক একা নন, সঙ্গে আরও তিনজন সেপাই আছেন। চারজনেই উঠে এসেছেন অর্জুনের সামনে। প্রত্যেকেরচোখেমুখে বিস্ময়।

অর্জুন বলল, "আমি অর্জুন। ডক্টর গুপ্ত আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন।"

অফিসারটির চোখ ছোট হল, "কখন নিয়ে এসেছিলেন ?"

"সন্ধেবেলায়। ঠিক সন্ধে হয়নি তখনও।"

"আপনি ওপরে ছিলেন সেই থেকে ?"

"হ্যাঁ।"

"মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাননি ? আমরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি এই বাড়ি। ওপরের ঘরে কেউ ছিল না। এই, একে অ্যারেস্ট করো।" অফিসার হুকুম করলেন।

এর কিছুক্ষণ বাদে, গভীর রাত্রে অর্জুন শিলিগুড়ির থানায় বসে ছিল। দারোগাবাবু বাইরে গিয়েছেন কাজে। তিনি না ফেরা পর্যন্ত কেউ তার কথা শুনবে না।

অর্জুন হতাশ হয়ে পড়ছিল। একশো সত্তর বছর আগে গিয়ে তাকে পুলিশের হাতে পড়তে হয়েছিল। প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেও সেই একই অবস্থা ?

দারোগাবাবু এলেন রাত দুটোর সময়। রিপোর্ট নিশ্চয়ই আগেই পেয়েছিলেন, ঘরে ঢুকে বললেন, "কে হে তুমি ? ওই বাংলোয় কোন মতলবে ঢুকেছিলে ?"

অর্জুন বলল, "আপনারা খুব ভুল করছেন। আমি একজন সত্যসন্ধানী। আমার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়ি শহরে থাকি। ডক্টর গুপ্তই আমাকে ওখানে নিয়ে যান।"

হঠাৎ দারোগাবাবুর মুখচোখ বদলে গেল, "আরে, তাই তো ! আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ? ডক্টর গুপ্তকে যখন হস্‌পিটালাইজ্‌ড করা হয় তখনও তিনি আপনার নাম বলছিলেন !"

"উনি কেমন আছেন ?"

"খুব খারাপ। বাঁচার কোনও চান্স নেই। হেড ইন্‌জুরি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।"

"বেঁচে যাবেন।" অর্জুন বলল।

"মানে ?"

"কিছু না। আর কী হয়েছে ?"

"যারা এসেছিল ডাকাতি করতে তারা নীচের তলাই তছনছ করেছে, ওপরের ঘরে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু একটা খবর আমরা ডক্টর গুপ্তকে দিতে পারিনি। ওঁর যা কন্ডিশন !"

"কী খবর ?"

"কারেন্ট অফ করে ওপরের ঘরে ঢুকে আমরা কোনও কুকুরের দেখা পাইনি। আপনিও ছিলেন না। ডক্টর গুপ্ত কেবলই তাতান-তাতান করছিলেন !" দারোগার আবার মনে পড়ল, "আপনি কোথায় ছিলেন ?"

"ওপরের ঘরে অনেক যন্ত্র ছিল, তার একটাতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অঘোরে ঘুমিয়েছি।" অর্জুন হাসল।

"আচ্ছা। হ্যাঁ, যন্ত্রগুলো দেখেছি কিন্তু কী থেকে কী হয়ে যাবে ভেবে আর খুলে দেখিনি। তা হলে কুকুরটাও তার একটাতে থাকতে পারে !" দারোগা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"না, নেই। তাতান এখানে নেই।" মাথা নাড়ল অর্জুন।

দারোগাবাবুই রাত্রে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঘুম ভাঙার পর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাজ্জব অর্জুন। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। ঘড়ির তারিখ একশো সত্তর বছর এগিয়ে। সে কাঁটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সময়টাকে সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনতেই ঘড়ি আবার চালু হল। প্রায় ঘণ্টা-চব্বিশ সে এই সময়ে ছিল না। কিন্তু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে রওনা হয়েছে এক সকালে, পৌঁছল রাতের বেলায়। যাওয়ার সময় তো এমন কাণ্ড হয়নি। পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পুবে এলে সময় বেড়ে যায়, সেইরকম কিছু ?

সকালবেলায় দারোগাবাবুর সৌজন্যে লুচি-তরকারি আর চা খেতে যে কী আরাম লাগল তা কাউকে বোঝাতে পারবে না অর্জুন। আহা, একশো সত্তর বছর পরের মানুষগুলো এসবের স্বাদ জানবে না।

ঠিক ন'টা নাগাদ শিলিগুড়ির হাসপাতালে গিয়ে শুনল কলকাতা থেকে বড়-বড় চিকিৎসকরা এসেছেন। ডক্টর গুপ্তের মাথায় অপারেশন হবে। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার সময় সে এক মুহূর্তের জন্য ডক্টরের দেখা পেল। অজ্ঞান হয়ে আছেন। অর্জুন বিড়বিড় করল। পাশে দাঁড়ানো দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলছেন ?"

অর্জুন বলল, "আর কয়েক বছর বাদে উনি নোবেল পুরস্কার পাবেন।"

"তার মানে ? উনি ভাল হয়ে যাবেন ?" দারোগা অবাক।

"অবশ্যই। মাথার এই আঘাতটা ওঁকে সাহায্য করবে।"

অর্জুন আর দাঁড়াল না। হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠল। জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলায় রূপমায়া সিনেমার সামনে বাস থেকে নেমে কিন্তু ওর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কী ঘিঞ্জি রাস্তা, রিকশা, গাড়ি মানুষের ভিড়ে হাঁটা মুশকিল। একশো সত্তর বছরের পরে এই জায়গাটাকে চেনা যাবে না। এখনকার ভাল আর তখনকার ভালগুলোকে যদি এক করা যেত !

হঠাৎ তার তাতানের কথা মনে পড়ে গেল। তাতানকে সেই রাতেই তার ভিন্নগ্রহের বন্ধু নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই সেই গ্রহে বয়স বাড়ে না। তাই তাতান একশো সত্তর বছর পরেও একই রকম আছে। ইচ্ছেমতন মাঝে-মাঝে বন্ধুর সঙ্গে পৃথিবীতে ঘুরে যায়। ডক্টর গুপ্ত ব্যাপারটা জানতে পারলে খুশি হবেন।

অর্জুন নিজের গালে হাত বোলাল। যাঃ, এর মধ্যেই খরখরে দাড়ি বেরিয়ে গেছে। ভালভাবে শেভ করে স্নান করা দরকার। সে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

নিল ও'ব্রায়েন

আকাশপথে একা অতলান্তিক পাড়ি দিয়েছিলেন চার্লস লিন্ড্‌বার্গ

চার্লস লিন্ড্‌বার্গই সর্বপ্রথম বিমানপথে অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দেননি। ১৯২৭ সালের ২০ মে-র সকালে লিন্ডাবার্গ নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস-অভিমুখে আকাশপথে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর আগে আরও ৭৮ জন এই অভিযানে সফল হয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ একা আকাশ পথে অতলান্তিক অতিক্রম করেন তিনিই প্রথম। সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। ঔপনাসিক এফ স্কট ফিট্‌জেরাল্ডের ভাষায় ১৯২৭ সালের বসন্তের আকাশ জুড়ে অচেনা, উজ্জ্বল একটি জিনিস ঝল্‌সে উঠেছিল। নিজের প্রজন্মকে ঘিরে কিছুই যাঁর করণীয় ছিল না, মিনেসোটার সেই তরুণ বীরত্ব দেখিয়ে দিলেন।

লিন্ড্‌বার্গের ঠাকুরদা ছিলেন একজন সংস্কারবাদী রাজনীতিক। তিনি সুইডেনে পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিলেন। সেখানে 'মানসন'—এই পুরনো পারিবারিক নামটিই ব্যবহার করতেন তিনি। আমেরিকায় লিন্ডির বাবাও রাজনীতিতে এসেছিলেন, সমাজবাদী হিসাবে প্রজাতন্ত্রী দলের মনোনয়নে কংগ্রেস সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে লড়েছিলেন। প্রায় দশ বছর তিনি ওয়াশিংটনে ছিলেন। ছেলেবেলায় লিন্ড্‌বার্গ যখন ওয়াশিংটনে থাকতেন, প্রেসিডেন্ট টেডি রুজভেল্টের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো করেই তাঁর সময় কেটে যেত।

লিন্ডির বাবা ছিলেন অত্যন্ত জেদি মানুষ। অতিরিক্ত ধনসম্পদের বিরোধিতা করতেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে 'জার্মানি ঘেঁষা' বলে তাঁর নামে অভিযোগ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে লিন্ডির নামেও একই অভিযোগ উঠেছিল। সেন্ট লুই-এর ব্যবসায়ীদের অর্থানুকুল্যে নিউ ইয়র্ক থেকে প্যারিসের পথে তাঁর আকাশযাত্রা সফল হওয়ার পর লিন্ডি অবশ্য কখনওই তাঁর বাবার মতো ধন-সম্পদের বিরোধিতা করেননি। বস্তুত প্যারিস অভিযানের পর তিনি নানা ধরনের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। বিভিন্ন পরিচালক সমিতির পরামর্শদাতা বা সদস্যের ভূমিকায় ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি।

রেমন্ড অর্টেগ নামের জনৈক ব্যক্তি ঘোষণা করেছিলেন যে, বিমানে নিউইয়র্ক-প্যারিস একটানা উড়তে পারলে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। এরই ফলে লিন্ড্‌বার্গ তাঁর বিখ্যাত আকাশযাত্রায় আগ্রহী হয়েছিলেন। অত্যন্ত রোমহর্ষক এই

চার্লস লিন্ডবার্গ ও তাঁর বিমান

আকাশযাত্রা শেষ হতে সময় লেগেছিল সাড়ে ৩৩ ঘণ্টা। যাত্রারম্ভের আগেও পুরো একটি দিন ঘুমোতে পারেননি লিন্ড্‌বার্গ। বিমান ছাড়বার আগে প্রয়োজনীয় খাবারদাবারও সঙ্গে নিয়েছিলেন—শুকনো মাংস, শক্ত বিস্কুট, ডিমের সাদা অংশ, চকোলেট, এক বোতল জল আর কিছু স্যান্ডউইচ। পরবর্তীকালে লিন্ড্‌বার্গ লিখেছিলেন, "মোটরসাইকেলে পুলিশ,

সাংবাদিক, বৈমানিক, আর কিছু দর্শকের চোখের সামনে ধীর, অচঞ্চল যাত্রা শুরু হল। প্যারিসের পথে বিমানযাত্রার বদলে এ যেন অনেকটা শবযাত্রার মতো।" এক ডানার যে বিশেষ বিমানে তিনি আকাশে উড়েছিলেন, তার নাম দেওয়া হয়েছিল, 'স্পিরিট অব সেন্ট লুই'। তৈরি করেছিলেন সান দিয়েগোর রায়ান কোম্পানি। বিমানবন্দর ছেড়ে ওড়বার সময় জ্বালানির ভারে বিমানটি অনেকবারই নিচু হয়ে মাটিতে ধাক্কা খেয়েছিল। আগে থেকে করে রাখা হিসাবের ভিত্তিতে বিমান চালিয়েছিলেন তিনি, তবু উপকূল থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে পৌঁছেই ইউরোপের মাটি প্রথম নজরে পড়েছিল লিন্ডবার্গের। ৩৬১০ মাইল ওড়বার পর তিনি প্যারিস বিমানবন্দরে পৌঁছন। বেশ কয়েকবার আকাশে চক্কর দেওয়ার পর তিনি ঠিক করেন, কীভাবে নামবেন। লিন্ডবার্গের বিমান যখন লা বুর্জে বিমানবন্দরের মাটি ছোঁয় তখন সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন হাজার ২০ ভক্ত। লিন্ডবার্গের কথায়, এই অভিনন্দন-পর্বই তাঁর বিমানযাত্রার সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশ বলে মনে হয়েছিল।

বিজয়ীর মতো আমেরিকায় ফিরে এলেন লিন্ডবার্গ। এর পর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় তাঁর আর-এক বিমানযাত্রা নিয়েও খুব শোরগোল উঠেছিল। সেবার তিনি মেক্সিকোয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডোয়াইট ডব্লিউ মোরো-র সহযাত্রী ছিলেন। ১৯২৯ সালে মোরোর কন্যা অ্যাজ মোরোর সঙ্গে লিন্ডির বিয়ে হয়। তাঁদের প্রথম সন্তান চার্লস অপহৃত হয় ১৯৩২ সালের ১ মার্চ। পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। ১৯৩৫ সালে ব্রুনো হাউপ্টমান এ-ঘটনায় দোষী প্রমাণিত হয়। অপরাধীর ফাঁসির আগেই লিন্ডবার্গ-দম্পতি দেশত্যাগ করেন।

মোটামুটি এই সময়ে লিন্ডবার্গ চূড়ান্ত রক্ষণশীল হয়ে পড়েন। নাৎসি বিমানবাহিনী লুফ্‌ৎভাফে-র প্রধান হেরমান গোরিং-এর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়। জার্মানির ক্ষমতা লিন্ডবার্গকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ভাবতেন, ভবিষ্যতে কোনও যুদ্ধেই জার্মানিকে হারানো যাবে না, তাই ঘনিয়ে-আসা সংঘাত থেকে আমেরিকাকে দূরে রাখার জন্য নিজের প্রভাব খাটিয়েছিলেন। লিন্ডবার্গ মনে করতেন, যুদ্ধের পিছনে ইহুদিদের আর্থিক মদত আছে। তিনি একথাও বলেছিলেন, পৃথিবী জুড়ে বর্ণবৈষম্য সমস্যায় আমেরিকার জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট প্রকাশ্যেই তাঁর মতামতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানানোর ফলে লিন্ডবার্গ বিমানবাহিনীর পদে ইস্তফা দেন। পরে অবশ্য ১৯৫৪ সালে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার লিন্ডবার্গের সম্মান ফিরিয়ে দেন এবং তাঁকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত করেন।

সাধারণ মানুষের কাছে লিন্ডবার্গের পরিচয় ছিল 'লিন্ডি', 'ভাগ্যবান লিন্ডি' বা 'নিঃসঙ্গ ঈগল' নামে। তবে এসব ডাকনাম নিয়ে লিন্ডবার্গ বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। অল্প বয়সে যখন তিনি বিভিন্ন জায়গায় চমকপ্রদ বিমানচালনার কৌশল আর প্যারাশুট-ঝাঁপ দেখিয়ে বেড়াতেন কিংবা ডাক-বিমান চালাতেন, তখন 'ছিপছিপে' বলে ডাকলে ঠিকই সাড়া দিতেন লিন্ডবার্গ। কেউ কেউ বলেন, প্যারিস বিমানযাত্রার আগেই তাঁকে 'ভাগ্যবান' বলা হত। সে-যুগে বিমান এবং বিমান নামানোর পদ্ধতি দুই-ই ছিল পুরনো ধরনের। জ্বালানি ফুরিয়ে আসা এবং খারাপ আবহাওয়ার জন্য বিমানঘাঁটি দেখতে না পাওয়ার জন্য বারদুয়েক লিন্ডবার্গকে প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ দিতে হয়েছে। শোনা যায়, তিনি নাকি ভাগ্যের জোরেই বেঁচে গিয়েছিলেন।

লিন্ডবার্গ যথেষ্ট সতর্ক এবং সাবধানী ছিলেন। আকাশে ওড়ার আগে সব সময়ই তিনি যতদূর সম্ভব খুঁটিনাটি দেখেশুনে পরিকল্পনা করতেন। ঝুঁকি নিতেন, ভেবেচিন্তে। উদ্দামতা তাঁর চরিত্রে ছিল না। প্যারিস-যাত্রায় তিনি প্যারাশুট নেননি, কিন্তু রবারের নৌকো সঙ্গে রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে লিন্ডবার্গের সুনামে ভাটা পড়ে তাঁর চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী বিবৃতিগুলির জন্য। তবে পরে সেই সুনাম তিনি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন। বিমানচালনার ইতিহাসে তাঁর কৃতিত্বের কথা মনে রেখেছেন আমেরিকার মানুষ, ভুলে গিয়েছেন গোরিং এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন 'আমেরিকা ফার্স্ট'-এর সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের কথা।

প্রশ্ন

(১) 'কৌটিল্য' বা 'চাণক্য'-এর আসল নাম কী ছিল ?

(২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোন স্থলযুদ্ধে জাপানের সবচেয়ে বড় পরাজয় ঘটে ?

(৩) এখন হংকং-এর রাজনৈতিক মর্যাদা কী ?

(৪) সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কোন ভারতীয় সম্রাটের মৃত্যু হয়েছিল ?

(৫) কোন খেলায় জয়ীরা পিছু হটে, আর পরাজিতরা এগিয়ে যায় ?

(৬) কোন কৌশলের আবিষ্কার মহিলাদের গাড়ি চালাতে সাহায্য করেছে ?

(৭) 'অ্যাসট্রোটার্ফ'-এর এমন নাম কেন হয়েছে ?

(৮) দার্শনিক প্লেটোর আসল নাম অ্যারিস্টোক্লিস। তাঁকে 'প্লেটো' বলা হত কেন ?

(৯) 'সবুজ আসন' থেকে 'লাল আসন'-এ স্থানান্তরের প্রকৃত তাৎপর্যটি কী ?

(১০) চার্লস ডিকেন্স-এর কোন উপন্যাসটি অসমাপ্ত ?

(১১) 'ডেনিস দ্য মিনেস'-এর স্রষ্টা কে ?

(১২) টেনিস খেলায় 'লাভ' মানে শূন্য কেন ?

(১৩) একটি সাপের দেহের কোনখানে তার কান থাকে ?

(১৪) আধুনিককালের ওলিম্পিক খেলায় (১৮৯৬) প্রথম স্বর্ণপদক কে পেয়েছিলেন ?

(১৫) আমাদের জাতীয় পতাকার চক্রে কতগুলি 'দণ্ড' (স্পোক) আছে ?

(১৬) 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' কে ছিলেন ?

(১৭) চেরিফুলের জন্য কোন দেশ বিখ্যাত ?

(১৮) কোনও জাহাজের পতাকার ওপরের অংশ নামানো থাকলে কী বোঝায় ?

(১৯) কোন দেশকে 'ইউরোপের ক্রীড়াভূমি' বলা হয় ?

(২০) রাষ্ট্রপতি ভবনের সর্বপ্রথম সরকারি বাসিন্দা কে ?

(২১) 'কোর্টিস' কাকে বলে ?
(২২) ভারতীয় সেনাবিভাগে 'জেনারেল'-এর ঠিক নীচের পদটি কি ?
(২৩) রেড ইন্ডিয়ান শিশুকে কোন নামে ডাকা হয় ?
(২৪) জনপ্রিয় জাপানি রব 'বানজাই'-এর অর্থ কী ?
(২৫) রেনে লেনেক কী আবিষ্কার করেছিলেন, যা চিকিৎসকেরা এখনও ব্যবহার করেন ?
(২৬) বিশ্বের বিচ্ছিন্নতম দ্বীপটির নাম কী ?
(২৭) কলকাতার কোন প্রেক্ষাগৃহের নাম 'কর্নওয়ালিস থিয়েটার' ছিল ?
(২৮) একগুচ্ছ তাসের মধ্যে কোন সাহেবটির কেবল একটিমাত্র চোখ ?
(২৯) হোভারক্রাফটের আবিষ্কারক কে ?
(৩০) 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থের রচয়িতার নাম কী ?
(৩১) শ্রীমতী ডেরেল ওয়াটার্স কোন ছদ্মনামের আড়ালে লিখতেন ?
(৩২) রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রথম বাংলা ছবির নাম কী ?
(৩৩) লিখিত ইংরেজিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত শব্দ কোনটি ?
(৩৪) 'সেল্‌ভা' কী ?
(৩৫) টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে কে প্রথম শতরান করেন ?
(৩৬) কোন দেশ ইংল্যান্ডকে বোম্বাই দিয়েছিল ?
(৩৭) প্রশান্ত মহাসাগরের আবিষ্কর্তা কে ?
(৩৮) 'অশ্রুর প্রবেশদ্বার' কাকে বলা হয় ?
(৩৯) স্পেনের জাতীয় প্রতীক কোনটি ?
(৪০) 'লৌহ-জাদুকর' নামে কে পরিচিত ?
(৪১) ভগিনী নিবেদিতাকে 'লোকমাতা' উপাধি কে দিয়েছিলেন ?
(৪২) বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোনটি ?
(৪৩) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আল ওয়ের্টার (AL Oerter) কেন বিখ্যাত ?
(৪৪) সাম্প্রতিকতম তুষারযুগ কোন ভূতাত্ত্বিক কালপর্যায়ের অন্তর্গত ?
(৪৫) 'মিড্‌লইস্ট এয়ারওয়েজ' কোন দেশের ?
(৪৬) কোন শহরকে 'আধুনিক যুগের ব্যাবিলন' আখ্যা দেওয়া হয় ?
(৪৭) ফুটবলের 'কালো মুক্তো'টি কে ?
(৪৮) কর্ণকে রাজমর্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুর্যোধন তাঁকে কোন রাজ্যের রাজা করেছিলেন ?
(৪৯) 'ভারতের নেপোলিয়ন' কাকে বলা হয় ?
(৫০) চেঙ্গিজ খানের প্রকৃত নাম কী ছিল ?
(৫১) জুডো খেলার প্রবর্তক কে ?
(৫২) ফাউন্টেন পেনের আবিষ্কারক কে ?
(৫৩) প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কবে এবং কোথায় হয়েছিল ?
(৫৪) ভারতীয় ছত্রি-বাহিনীর প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত ?
(৫৫) ১৯৫৪ সালের ৬ জুন ক্রীড়াজগতের কোন বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটেছিল ?
(৫৬) কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী কে করেছিলেন ?
(৫৭) যিশু খ্রিস্টের জীবনের একমাত্র কোন অলৌকিক ঘটনার কথা চারটি সুসমাচারেই (গস্‌পেল) উল্লেখ করা হয়েছে ?
(৫৮) স্টিভি ওয়ান্ডারের 'হ্যাপি বার্থডে' গানটি কার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য ?
(৫৯) নোবেল পুরস্কারবিজয়ী প্রথম ব্রিটিশ নাগরিক কে ?
(৬০) 'নার্গিস দত্ত পুরস্কার' কী জন্য দেওয়া হয় ?
(৬১) আধুনিক পরমাণুতত্ত্বের প্রবক্তা কে ?
(৬২) পশ্চিমি ধ্রুপদী কনসার্ট সম্বন্ধে কে মন্তব্য করেছিলেন, "প্রথমে সুন্দর সঙ্গীত, শেষে সুন্দর সঙ্গীত, মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল।"
(৬৩) 'কাগজ তে কানওয়াস' কার লেখা ?
(৬৪) ফরাসি ভাষায় অবিবাহিতাদের 'মাদমোয়াজেল' বলে ডাকা হয়। অবিবাহিতদের কী বলা হয় ?
(৬৫) সোভিয়েত ইউনিয়নে অভিজাতদের গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র বাসভবনকে কী বলা হয় ?
(৬৬) সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার কৃতিত্ব কার ?
(৬৭) বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দর কোনটি ?
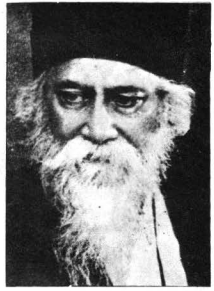
(৬৮) অ্যামবাসাডর এবং 'হাইকমিশনার'-এর মধ্যে প্রভেদ কী ?
(৬৯) 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' কে তৈরি করেছিলেন ?
(৭০) মার্টিন লুথার কার সম্পর্কে বলেছিলেন, "বোকাটা জ্যোতির্বিদ্যার জগৎকে ওলটপালট করে দেবে ।"
(৭১) আচার্য বিনোবা ভাবের পুরো নাম কী ?
(৭২) কোন রাষ্ট্র প্রথম নিজেদের 'নিরীশ্বরবাদী' বলে ঘোষণা করেছিল ?
(৭৩) আধুনিক যুগে কোন দেশে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রেসিডেন্ট পদ পেয়েছেন ?
(৭৪) 'শান্ত সাগর' কোথায় অবস্থিত ?
(৭৫) কোয়াসিমোদো কে ?
(৭৬) ২২১-বি বেকার স্ট্রিট কার ঠিকানা ?
(৭৭) সবচেয়ে বেশি সোনা পাওয়া যায় কোন দেশে ?
(৭৮) ভারত মহাসাগরে গভীরতম খাত কোনটি ?
(৭৯) আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ কবে শুরু এবং কবে শেষ হয়েছিল ?
(৮০) 'গর্জনশীল চল্লিশা' বলতে কী বোঝায় ?
(৮১) ত্রিবান্দ্রমের কাছে রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্রটির নাম কী ?
(৮২) কে প্রথম রবারের টায়ার তৈরি করেছিলেন ?
(৮৩) কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রভর্তি সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ?
(৮৪) 'ডালিয়া' ফুলের নামটির উৎস কোথায় ?
(৮৫) কোন ভারতীয় মহেঞ্জোদরো আবিষ্কার করেন ?
(৮৬) কোন অঞ্চলে প্রতি বছর একঝাঁক পাখি আত্মহত্যা করে ?
(৮৭) 'পার্কিনসনের অসুখ' কাকে বলে ?
(৮৮) রামচন্দ্রের বোন কে ছিলেন ?
(৮৯) প্রতি বছর কোন দিনটিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় ?
(৯০) কোন রাজা স্বল্পতম সময় রাজত্ব করেছিলেন ?
(৯১) 'হাম্পটি ডাম্পটি'র সম্ভাব্য পরিচয় কী হতে পারে ?
(৯২) কোন গ্রহের 'গ্যানিমিড' নামক একটি উপগ্রহ আছে ?
(৯৩) 'ওয়াইল্ড ক্যাট স্ট্রাইক' বলতে কী বোঝায় ?
(৯৪) কোন মহিলা সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন ?
(৯৫) সর্বপ্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গজয়ী এডমন্ড হিলারি কোন দেশের মানুষ ছিলেন ?
(৯৬) 'বিবলিওম্যানিয়া' বলতে কী বোঝায় ?
(৯৭) রামকৃষ্ণ মিশন কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?
(৯৮) বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ডাকটিকিট কোনটি ?
(৯৯) সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার কে পান ?
(১০০) ভ্রূকুঞ্চনের জন্য কতগুলি পেশির সঙ্কোচন প্রয়োজন হয় ?

উত্তর

(১) বিষ্ণুগুপ্ত ।
(২) ইম্ফল ।
(৩) ব্রিটিশ-রাজের উপনিবেশ ।
(৪) হুমায়ুন ।
(৫) দড়ি-টানাটানি খেলা (টাগ অব ওয়ার) ।
(৬) সেলফ স্টার্টার ।
(৭) টেক্সাসের অন্তর্গত হাউসটনের ইন্ডোর বেসবল পার্কের নাম 'অ্যাসট্রোডোম' থেকে । এখানেই সর্বপ্রথম এ ধরনের ভূমিতে খেলা হয়ছিল ।
(৮) 'প্লেটো' শব্দের অর্থ 'চওড়া কাঁধযুক্ত মানুষ' । তিনি সম্ভবত তাই ছিলেন ।
(৯) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমনস থেকে খেতাবধারী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা গঠিত উর্ধ্বতন সভায় (হাউস অব লর্ডস) স্থানান্তর ।
(১০) দ্য মিস্ট্রি অব এডুইন ড্রুড ।
(১১) হ্যাংক কেচাম ।
(১২) 'লাভ' হল ফরাসি 'L' oeuf'-এর ইংরেজি ভাষান্তর, যার অর্থ 'ডিম' । ব্যাপারটা তাই পরিষ্কার ।
(১৩) সাপের কোনও কান নেই ।
(১৪) জেমস. বি. কনোলি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ।
(১৫) ২৪টি ।
(১৬) কোনও অতিকায় দানব নয়, যিনি এটি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরই নাম ।
(১৭) জাপান ।
(১৮) শোক ।
(১৯) সুইজারল্যান্ড ।
(২০) লর্ড আরউইন ।
(২১) স্পেনের আইনসভা ।
(২২) লেফটেনান্ট-জেনারেল ।
(২৩) পাপুজ ।
(২৪) ১০,০০০ বছর ('জীবন হোক তোমার') ।
(২৫) স্টেথোস্কোপ ।
(২৬) দক্ষিণ অতলান্তিকের ট্রিস্টান ডা কুন্‌হা ।
(২৭) শ্রী ।

(২৮) রুহিতনের সাহেব।
(২৯) ক্রিস্টোফার ককেরেল।
(৩০) সুভাষচন্দ্র বসু।
(৩১) এনিড ব্লাইটন।
(৩২) সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'।
(৩৩) 'দ্য'।
(৩৪) আমাজন অববাহিকার বৃষ্টিচ্ছায়া অরণ্য।
(৩৫) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ব্যানারমান।
(৩৬) ক্যাথরিন অব ব্রাগাঞ্জার সঙ্গে দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহের যৌতুকস্বরূপ পর্তুগাল এটি দিয়েছিল।
(৩৭) ভাস্কো নুনেজ দ্য বালবোয়া।
(৩৮) আরবরা লোহিতসাগরের প্রবেশপথের (বাব-এল-মানদেব) এই নামকরণ করেছিলেন, কারণ ওই অঞ্চলে প্রচুর জাহাজডুবি হত।
(৩৯) ঈগল পাখি।
(৪০) আলেকজান্ডার-গুস্তাভ আইফেল (তাঁর নির্মিত টাওয়ার তাঁরই নাম বহন করছে)।
(৪১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৪২) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র।
(৪৩) তিনি পর পর চারটি ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় (১৯৫৬, '৬০, '৬৪, '৬৮) ডিসকাস ছোঁড়ার জন্য স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। একই বিভাগে পর পর চারবার আর কোনও ক্রীড়াবিদ এই সাফল্য পাননি।
(৪৪) প্লেস্টোসিন।
(৪৫) লেবানন।
(৪৬) লণ্ডন।
(৪৭) পেলে।
(৪৮) অঙ্গ।
(৪৯) সমুদ্রগুপ্ত।
(৫০) তেমুচিন বা তেমুজিন।
(৫১) ডঃ জিগোরো কানো, জাপান।
(৫২) (লুই) ওয়াটারম্যান।
(৫৩) ভেনিসে, ১৯৩২ সালে।
(৫৪) আগ্রায়।
(৫৫) সেই প্রথম চার মিনিটের কম সময়ে এক মাইল দৌড়নো সম্ভব হয়েছিল।
(৫৬) আর্থার সি ক্লার্ক।
(৫৭) গণ-অন্নদানের ঘটনা।
(৫৮) মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার)।
(৫৯) সার রোনাল্ড রস (১৯০২, মেডিসিনে)।
(৬০) জাতীয় সংহতি বিষয়ক শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য।
(৬১) জন ডালটন।
(৬২) মস্কোয় একটি কনসার্ট শোনার পর ডঃ রাধাকৃষ্ণন এই মন্তব্য করেন।
(৬৩) অমৃতা প্রীতম।
(৬৪) মঁসিয়ে (বিবাহিত পুরুষদেরও)।
(৬৫) ডাশা।
(৬৬) ম্যাথু ওয়েব।
(৬৭) কিং আব্দুল আজিজ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, জেদ্দা, সৌদি আরব।
(৬৮) বিদেশে কোনও দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্থায়ী কূটনীতিককে অ্যাম্বাসাডর বলে। আর হাইকমিশনার হলেন কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির একটিতে অন্য কোনওটির দূতাবাসের প্রধান।
(৬৯) ফ্রেডরিক অগস্ট বারথল্ডি।
(৭০) নিকোলাস কোপার্নিকাস।
(৭১) বিনায়ক নরহরি ভাবে।
(৭২) আলবানিয়া।
(৭৩) আর্জেন্টিনা (জুয়ান পেরোন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর ইসাবেল পেরোন)।
(৭৪) চাঁদে।
(৭৫) 'দ্য হাঞ্চব্যাক অব নোত্‌রদাম' উপন্যাসের নাম-চরিত্র।
(৭৬) শার্লক হোম্‌স।
(৭৭) দক্ষিণ আফ্রিকা।
(৭৮) জাভা (সুন্দা) খাত।
(৭৯) ১৭৭৫ সালে লেক্সিংটনের যুদ্ধে সূচনা ; শেষ ১৭৮১ সালে ইয়র্কটাউনে, ব্রিটেনের আত্মসমর্পণে।
(৮০) 40° থেকে 50° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী উত্তাল সমুদ্রের ভৌগোলিক নাম।
(৮১) বিক্রম সারাভাই মহাকাশ-কেন্দ্র'।
(৮২) ব্রিটেনের টমাস হ্যানকক নিরেট টায়ার তৈরি করেন ; ব্রিটেনের জন ডানলপ বায়ুপূর্ণ টায়ার তৈরি করেন।
(৮৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
(৮৪) ডাল নামক সুইডেনের সেই উদ্ভিদবিদের নামানুসারে, যিনি মেক্সিকো থেকে ফুলটি প্রথম ইউরোপে এনেছিলেন।
(৮৫) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৮৬) অসমের জাটিংগা গ্রামে।
(৮৭) একটি স্নায়ুরোগ। খুব তাড়াতাড়ি এতে কাঁপুনি, পেশির আড়ষ্টতা এবং কৃশতা দেখা দেয়।
(৮৮) শান্তা।
(৮৯) ১০ ডিসেম্বর (নোবেল-এর মৃত্যুবার্ষিকী)।
(৯০) ১১৯৬ সালে শ্রীলঙ্কার রাজা দ্বিতীয় বিক্রমবাহু তাঁর রাজ্যাভিষেকের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই নিহত হয়েছিলেন।
(৯১) একটি ডিম।
(৯২) বৃহস্পতি।
(৯৩) আকস্মিক ও অঘোষিত ধর্মঘট।
(৯৪) গার্টুড এডের্ল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।
(৯৫) নিউজিল্যান্ড।
(৯৬) বইপত্র সংগ্রহের বাতিক।
(৯৭) স্বামী বিবেকানন্দ।
(৯৮) এক সেন্টের 'ব্রিটিশ গায়না ব্ল্যাক'।
(৯৯) সুলি প্রুধোম, ফরাসি কবি।
(১০০) ৪৩টি ; কিন্তু মৃদু হাসির জন্য মাত্র ১৭টি! তাই হাসতে থাকাই ভাল।

ইত্যাদি—সব ভেজিটেরিয়ানদের জন্য ।

এগ্ নুড্‌ল এবং এগ্ চাউচাউ
—নন্ ভেজিটেরিয়ানদের জন্য
সুজি ময়দার আনুপাতিক সংমিশ্রণে প্রোটিন
সমন্বিত ইটালিও পদ্ধতিতে তৈরী সুস্বাদু খাদ্য ।
(নন্- ফ্রায়েড ও কেমিক্যাল বর্জিত)

লিসিয়া ম্যাকারনী
৩৬, পেমেন্টাল স্ট্রীট কলিকাতা-১৬
ফোন : ২৪-৪৮৩৫
রেসিঃ ৩৭-৭২৪০

সেই অপূর্ব
আরামের অনুভূতি...

Bapi REGD

আপনাকে দেয় সেই কোমল
সুখের আবেশ । উপভোগ করুন ।
নিজেকে হারিয়ে ফেলুন এর মধ্যে ।
সবসময় । একবার পরলে অন্য কিছুই
আর আপনার মনে ধরবে না ।

HINDUSTHAN TEXTILE CALCUTTA
হিন্দুস্থান টেক্সটাইল কলকাতা-৭০০০০৫

Bapi সবার সেরা, সবসময়

PRASA HT 9C
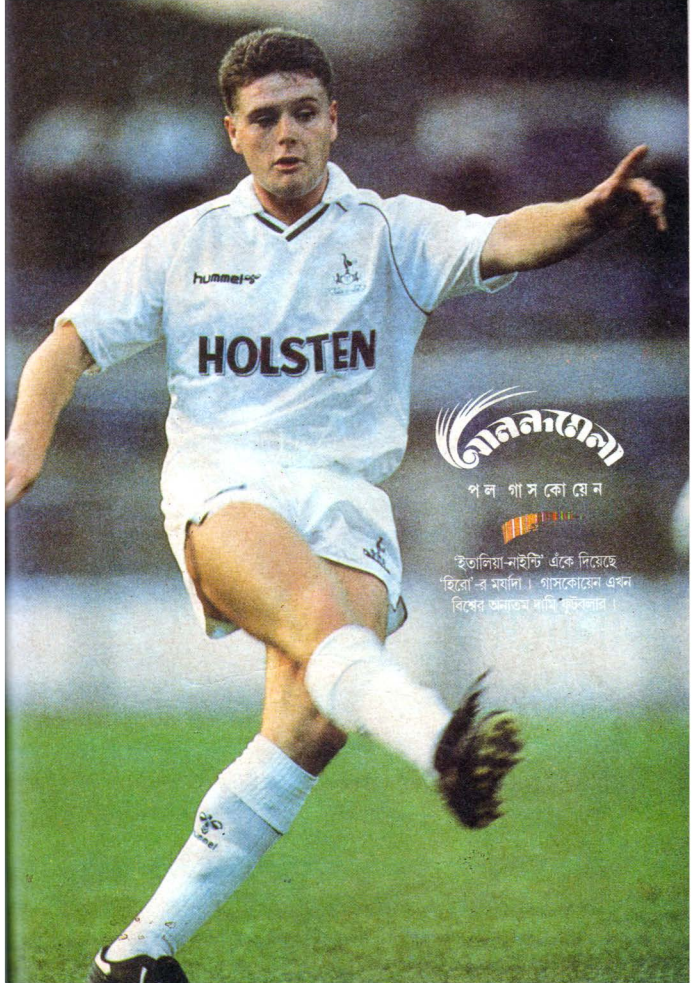
পল গাসকোয়েন

'ইতালিয়া-নাইন্টি' এঁকে দিয়েছে 'হিরো'-র মর্যাদা। গাসকোয়েন এখন বিশ্বের অন্যতম দামি ফুটবলার।

বিশ্বনাথন আনন্দ আমাদের গর্ব

মানস চক্রবর্তী

ভারতের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় কে ? বছরদুয়েক আগেও এ-নিয়ে তর্কের শেষ ছিল না। উঁকি দিত বহু নাম। ধ্যানচাঁদ, মিলখা সিংহ, রমানাথন কৃষ্ণন কিংবা সুনীল গাওস্কর-এর মতো না হলেও বিজয় অমৃতরাজ, প্রকাশ পাড়ুকোনের নাম এসে যেত ভাবনাচিন্তায়। কেউ-কেউ কুস্তিগির কে. ডি. যাদবের কথাও বলতেন। কারণ, ওলিম্পিকে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত পদক শুধু যাদবের দখলেই রয়েছে। এখন আর অবশ্য এ নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই। সুনীল গাওস্কর নিশ্চয় সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকবেন। বাকি সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছেন মাদ্রাজের বেসান্তনগরের একটি ছেলে, বিশ্বনাথন আনন্দ। মাত্র ২২ বছর বয়সে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন আনন্দ সারাজীবন চেষ্টা করেও কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় তার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেননি। দাবা-দুনিয়ায় আনন্দের স্থান এখন নবম। ব্রাসেল্‌স-এ ক্যান্ডিডেট্‌স দাবায় আনাতোলি কারপভের সঙ্গে ম্যাচটির পর তাঁর ফিডে রেটিং আরও বেড়েছে। ব্রাসেল্‌স-এ আনন্দ যখন যান, তখন তাঁর আগে ছিলেন মাত্র আটজন দাবাড়ু। প্রথমজন অবশ্যই কাসপারভ (২৭৭০)। দু' নম্বরে ইভানচুক (২৭৩৫), তিন-এ কারপভ (২৭৩০)। এর পর বারিভ, সালভ, গেলফাঁ, শর্ট ও বালিয়াভস্কি। ন' নম্বরে ছিলেন আনন্দ (২৬৫০)। ব্রাসেল্‌সেই অবশ্য কারপভের সঙ্গে আনন্দের প্রথম দেখা হয়নি। এর আগে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান করপভের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয় দু'বার। আনন্দকে কিন্তু হারানো যায়নি। ১৯৮৭-তে স্পেনের সেভিল-এ 'কুইক চেস' প্রতিযোগিতায় অংশ নেন কারপভ। আনন্দের সঙ্গে তাঁর পাঁচ মিনিটের লড়াই ড্র হয়ে যায়। আর মাসকয়েক আগে লিনারেস আন্তর্জাতিক দাবায় আনন্দ হারিয়েছেন কারপভকে। কীভাবে সম্ভব হল সেটা ? আনন্দ বলেছেন, "ওই ম্যাচে আমি ইচ্ছে করেই কোনও থিয়োরিটিক্যাল লড়াইয়ে যেতে চাইনি। তা রেখে দিই অগস্টের ক্যান্ডিডেট্‌স দাবার জন্য। শুধু চেষ্টা করেছিলাম, ওপেনিংয়ে নতুনত্ব এনে চাল দেওয়ার। ম্যাচের দু' দিন আগেই জানতে পেরেছিলাম ক্যান্ডিডেট্‌স ম্যাচের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হব আমরা। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দু'জনের ওপরেই চাপ ছিল। মিড্‌ল গেমে আমি অল্প কিছু সমস্যায় পড়েছিলাম। অবশ্য এন্ড গেমে সুযোগ পাব বলেই আমার দৃঢ় ধারণা ছিল এবং সেই সুযোগ পেয়েওছিলাম। জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি।"

ব্রাসেলসের ম্যাচের আগে আনন্দ যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তা এককথায় অসাধারণ। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর তাঁর নজর ছিল। খেলাটা যেহেতু ব্রাসেল্‌স-এ হবে তাই সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য মাসতিনেক তিনি থেকে গেলেন ব্রাসেল্‌স-এ। অগস্টে ওখানে বেশ শীত। কিন্তু তার আগের মাসতিনেক ওই শহরে কাটাবার জন্য আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কোনও অসুবিধা হয়নি। প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ানের প্রতিটি খেলার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আনন্দ ডেভিড লেভির 'কালেকটেড কারপভ গেমস'-এর পৃষ্ঠাগুলি তন্নতন্ন করে পড়েছেন। বইটি অবশ্য ১৯৭৮ সালে লেখা। তারপর কারপভ বছরে কমপক্ষে একশোটি করে, ১২-১৩ বছরে আরও বারোশোর ওপর ম্যাচ খেলেছেন। সেগুলি কী হবে ? কোনও চিন্তা নেই। আনন্দের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কারপভ-কাসপারভের অন্তত সাত-আটশো ম্যাচ ছিল। অতএব কারপভ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়েই আনন্দ যে বোর্ডের সামনে বসেছিলেন, এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। এখানেই থেমে থাকেননি আনন্দ। সেকেন্ড হিসাবে এমন একজনকে নিয়েছিলেন যাঁকে শুধু কাসপারভই নন, ভয় পান কারপভও। হ্যাঁ, মিখাইল গুরেভিচকে সবাই শ্রদ্ধাও করেন। গত বছর বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপের সময় কাসপারভের সেকেন্ড ছিলেন ওই গুরেভিচও। দাবার সমস্ত তত্ত্বই নাকি গুরেভিচের করায়ত্ত। আনন্দের চেয়ে বয়সে বেশ খানিকটা বড়ই গুরেভিচ। তাতে অবশ্য কিছু যায়-আসে না। মানসিকতাই হল আসল। আনন্দের পরিণত মনের সঙ্গে গুরেভিচের তাত্ত্বিক জ্ঞান—এই দুইয়ে মিলে তৈরি হয়েছে নতুন আনন্দের। প্রতিদিন প্রায় আট ঘণ্টা সময় দু'জনে কাটিয়েছেন দাবার বোর্ডে। গুরেভিচের ইংরেজি জ্ঞান খুব সামান্যই। আনন্দ আবার রুশ ভাল বোঝেন না। কিন্তু দাবার ভাষা তো আন্তর্জাতিক, চিরন্তন। অতএব প্রাথমিক কিছু অসুবিধা থাকলেও দু'জনেই তা মানিয়ে নিয়েছিলেন।

ব্রাসেল্‌সের ফল যাই হোক, আনন্দ কিছু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, অনুন্নত এশিয়া থেকেও বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হওয়ার দাবিদার হওয়া যায়। প্রসঙ্গত জেনে রাখা

গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া। বাংলায় দাবা খেলার প্রচারে দিব্যেন্দু বড় ভূমিকা নিয়েছেন।

দীপাঞ্জন দাস। ব্রিটেনে সম্প্রতি এক প্রতিযোগিতায় দীপাঞ্জনের সাফল্য তাকে ভবিষ্যতের বড় দাবাড়ু হিসেবে চিনিয়ে দিয়েছে।

সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। সারা বিশ্বে দশ বছরের কম বয়সী দাবাড়ুদের মধ্যে সূর্যশেখরের স্থান তৃতীয়।

দরকার, আনন্দের আগে কোনও এশিয়ান ক্যান্ডিডেট্‌স দাবার মূল পর্বে যেতে পারেননি। অথচ এশিয়াতে দাবার চল নাকি বহুদিনের। আর দাবার জন্ম নাকি এ-দেশেই। আনন্দ প্রমাণ করেছেন, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা আর একাগ্রতা থাকলে এই ভারত থেকেই বিশ্বসেরা হওয়া যায়। জুলাই-এ পোল্যান্ডের ওয়ারশ-তে বসেছিল বিশ্বদাবার আসর, অনূর্ধ্ব ১০ ও ১২ বয়সীদের জন্য। সেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল সূর্যশেখর গাঙ্গুলি ও দীপাঞ্জন দাস। দীপাঞ্জনের কোচ শ্যামল দত্ত ওখানে বিশ্বের কয়েকজন নামী দাবা-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মেনে নিয়েছেন, আনন্দের বিশ্বসেরা হওয়ার যোগ্যতা আছে। এই বিশেষজ্ঞের ধারণা, কাসপারভের পর চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সবচেয়ে বড় দাবিদার ভ্যাসেলি ইভানচুক। এর পরেই আছেন আনন্দ। এই জায়গাটায় পৌঁছবার জন্য আনন্দের প্রয়োজন হয়নি কোনও সরকারি সাহায্যের। দরকার হয়নি বিদেশে গিয়ে ট্রেনিং নেওয়ার। বিদেশে ট্রেনিং নিতে গিয়ে বুলা, খাজান, ব্রোমিও বা সোমা দত্তরা কীরকম উন্নতি করেছেন তা আমাদের দেখা আছে। আনন্দ ওখানে যাননি। সত্যি কথা বলতে কি, ক্যান্ডিডেট্‌স দাবায় খেলার আগে আনন্দের কোনও সেকেন্ডও ছিলেন না। আলেকজান্দার ড্রিভ-এর বিরুদ্ধে খেলার আগে তিনি হেলার্সকে তাঁর সেকেন্ড করেন। সেই প্রথম। তারপর কারপভের বিরুদ্ধে লড়ার আগে গুরেভিচকে। আনন্দ অহেতুক চাকরির পেছনেও ছোটেননি। চাকরিই তাঁর পেছনে ছুটেছে। কিন্তু কিছু করতে পারেনি। দাবাকেই জীবনের ধ্রুবতারা করে ফেলেছেন আনন্দ। পেশাদার না হয়েও তিনি তাই পেশাদার। অবশ্য এর জন্য আনন্দের পারিবারিক কাঠামো অনেকখানি দায়ী। শৈশব-কৈশোরে বেড়ে ওঠার সময় যতটুকু পারিবারিক সাহায্য পাওয়া দরকার, আনন্দ তা পেয়েছেন। কিন্তু সেরকম সাহায্য তো ভারতের লক্ষ-লক্ষ ছেলেমেয়ে পায়। সবাই কি আনন্দ হতে পেরেছে ? হয়নি। আসলে, আনন্দ একজনই। আনন্দ শুধু ভারতের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নন, সত্যিকারের মাস্টার। মাস্টার অব স্পোর্টস। আনন্দের কাছে এখন আর কারপভ-কাসপারভ দূরের মানুষ নন। আনন্দ এখন সারা দেশের গর্ব।

বল নিয়ে ভেলকি দেখাত যে ছেলেটি

রূপক সাহা

পৃথিবীতে কারও স্থান কখনও শূন্য থাকে না। ভরাট হয়েই যায়। কেউ-না-কেউ হঠাৎ উঠে এসে অভাবটা পূরণ করে দেন। এই ডিয়েগো মারাদোনার কথাই ধরুন। সেই আটাত্তর সাল থেকে তাঁকে নিয়ে আর্জেন্তিনায় হইচই। ছিয়াশিতে মারাদোনা বিশ্বের সেরা ফুটবলার, আর্জেন্তিনার গৌরব। একানব্বইয়ে তিনি আর কেউ নন। তাই বলে মারাদোনার স্থান শূন্য পড়ে থাকবে, সেটা তো আর হতে পারে না। এক বছর আগেও যাঁর নাম আর্জেন্তিনার বাইরে কেউ শোনেননি, কোপা আমেরিকা ফুটবলে তিনি-ই মারাদোনার অভাবটা পূরণ করে দিলেন। আর-এক ডিয়েগো। ডিয়েগো লাতোরে। বুয়েনস আইরেসের বোকা জুনিয়ারস ক্লাবে মারাদোনার জন্য এখন আর কেউ হা-হুতাশ করছেন না। নতুন নায়ক লাতোরে। আর্জেন্তিনায় এখন অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, সাসপেনশন উঠে যাওয়ার পর মারাদোনা আবার যখন খেলায় ফিরে আসবেন, তখন নতুনদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠবেন না। লাতোরে, ডারিও ফ্রাঙ্কো-রা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেবেন আশির দশকের ফুটবল-বাদশা-কে।

এই ভাবনাটা এসেছে, বেন জনসনের অবস্থা দেখে। মারাদোনার মতো একই অপরাধে জনসনকে দীর্ঘদিন সরে থাকতে হয়েছিল অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক থেকে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ফিরে এলেও লি'রয় বুরেল, মাইকেল জনসনদের জন্য, বেন আর এখন এক নম্বর জায়গা ফিরে পাচ্ছেন না। মাঝের দু' বছরে তাঁর শূন্য স্থানটি দখল হয়ে গিয়েছে। নব্বই দশক নতুন নায়কদের দশক। সত্তর বা আশির দশকের শ্রেষ্ঠ পারফরমার-রা হাড়ে- হাড়ে টের পাচ্ছেন, তাঁদের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। সাঁতারে মার্ক স্পিট্জ, টেনিসে বিয়র্ন বর্গ, বক্সিংয়ে জর্জ ফোরম্যান চেষ্টা করেছিলেন ফিরে আসার। পারেননি। মারাদোনাও কি পারবেন, পনেরো মাস একই সঙ্গে বনবাস আর অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে আবার ফুটবল-বিশ্বকে আনন্দ দিতে ? মনে হয়, না। এই দেড় বছরে কিন্তু বিশ্ব ফুটবলে অনেক ওলটপালট হয়ে যাবে।

ফিরে আসতে পারুন বা না পারুন, আর্জেন্তিনাবাসীদের মন থেকে তাঁদের প্রিয় ডিয়েগো অবশ্য কোনওদিনই মুছে যাবেন না। এই সেদিন কথা হচ্ছিল

ছেলেবেলা থেকেই বল ওঁর কথা শোনে

বলের সঙ্গে বন্ধুত্ব চিরদিনের

সার্জিও-র সঙ্গে। সার্জিও বুয়েনস আইরেসের একটা সংবাদপত্রের নামকরা ফুটবল-লেখক। ইতালির বিশ্বকাপের সময় এই সার্জিও-ই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন মারাদোনার কাছে। তাঁর ধারণা, মারাদোনা মোটেই দোষী নন। তাঁর বিরুদ্ধে কোকেন সেবনের যেসব অভিযোগ উঠেছে, তা নিছকই ষড়যন্ত্র। ইতালির লোক ও পুলিশ ডিয়েগোকে শেষ করে দেওয়ার জন্য এসব অভিযোগ তুলেছে। এটা শুধু সার্জিও-র কথাই নয়, বেশিরভাগ আর্জেন্তিনাবাসী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, বেচারি ডিয়েগোর দোষ তিনি অন্য সবাইয়ের চেয়ে অনেক ভাল খেলেন। আর কিছু নয়। ইতালির লোক নচ্ছার। তাঁদের জন্যই ডিয়েগোকে বুটজোড়া তুলে রাখতে হয়েছে। ডিয়েগো সম্পর্কে এই অন্ধ বিশ্বাস অবশ্য

হিরো একজনই : মারাদোনা
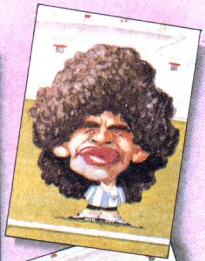
কার্টুন : মারাদোনা যা ছিলেন, যা হয়েছেন

একদিনে তৈরি হয়নি। আর্জেন্তিনাবাসীরা তো আর তাঁকে এক-আধদিন ধরে দেখছেন না। দেখছেন সেই ছেলেবেলা থেকে। শনিবারের সন্ধ্যায় যখন তাঁরা টিভি খুলে বসতেন লিগ ম্যাচ দেখার জন্য, তখন শীর্ণকায় ছোট্ট একটা ছেলেকে নিয়মিত তাঁরা দেখতে পেতেন। টিভি-র পরদা জুড়ে তাকে দেখানো হত। ছেলেটা বল নিয়ে অপূর্ব খেলা দেখাত। তার বল কন্ট্রোল দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। ম্যাচ আরম্ভ হওয়ার আগে, অথবা বিরতিতে দর্শকদের

বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকাতে। আমাদের দেশে শুধু মাইক বাজিয়ে গান শোনানো হয়। ব্যাঙ্ককে দেখেছি, মাঠের ধারে বিরাট অর্কেস্ট্রা পার্টি বসানো হয়। লাতিন আমেরিকায় বল নিয়ে নানারকম খেলা দেখানোর ব্যবস্থা থাকে। গাব্রিয়েলা সাবাতিনিকেও আটাত্তরে বিশ্বকাপের সময় টিভি-র পরদায় এই ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। তা, ছোট্ট মারাদোনাকে সেই সময় খুঁজে বের করেন টিভি কোম্পানির এক প্রযোজক। বুয়েনস আইরেসের বাইরে একক বস্তিতে। মারাদোনাকে তাঁর এত ভাল লেগে যায় যে, মাঝে-মাঝেই তিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেন তাকে। ভাল কোনও প্রোগ্রাম না থাকলেই তিনি সেই টেপ চালিয়ে দিতেন।

সেই ছেলেবেলা থেকেই মারাদোনা পরিচিত হয়ে যান সারা দেশের কাছে। খুবই দরিদ্র পরিবারের ছেলে। বাবা (আসলে তাঁর নামই ডিয়েগো মারাদোনা) হাফ-বেকার। কাকা ছোট একটা ফুটবল ক্লাব চালাতেন। সংসার চলত ঠাকুমা আর মায়ের রোজগারে। ঠাকুমার ছিল তামাক সেবনের অভ্যাস। গোপনে ধূমপানের অভিজ্ঞতাও হয়ে গিয়েছিল মারাদোনার, খুব অল্প বয়সে। সেই সময় বাড়িতে পড়াশোনার চল নেই। সারাদিন ধরে রাস্তায়-রাস্তায় বিয়ারের খালি ক্যান নিয়ে শুধুই খেলে বেড়ানো। মারাদোনার এই বয়সটা খুব সুন্দর কেটেছে। কাকা-র ক্লাবে খেলার ফাঁকেই একদিন হাজির হলেন ক্রিস্টার্সপিলার। এই ভদ্রলোক মারাদোনার সঙ্গে ছিলেন চুরাশি সাল পর্যন্ত। বার্সেলোনা ক্লাবে খেলতে গিয়ে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার পর মারাদোনা আর মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। ক্রিস্টার্সপিলারকে তাড়িয়ে দেন। ক্রিস্টার্সপিলার যতদিন সঙ্গে ছিলেন, মারাদোনা ঠিক ছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর থেকেই অধঃপতন শুরু।

বার্সেলোনা ক্লাবে খেলার সময় মারাদোনা প্রায়ই একটা রেস্তরাঁয় যেতেন। সময় কাটানোর জন্যই। সিউডাড কোণ্ডাল অঞ্চলে ওই রেস্তরাঁটি তখন খুবই ছোট্ট। মাঝের একটা টেবিল সব সময় রেখে দেওয়া হত মারাদোনার জন্য। ধীরে-ধীরে মারাদোনার সঙ্গীদের ভিড় বাড়তে আরম্ভ করল। এক-এক সময় পনেরো থেকে কুড়িজন। হঠাৎই সেই

"যদি অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা কোরো"

রেস্তরাঁর কপাল খুলে গেল। ছোট্ট রেস্তরাঁ রাতারাতি বিরাট হোটেল হয়ে উঠল। সেখানে এক মহিলাকে রোজই দেখা যেত। নাম মারিয়া মিগুয়েলা, যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ইতালির নাপোলি শহরের কয়েকজন কুখ্যাত মাফিয়ার। নাপোলি ক্লাবের সঙ্গে মারাদোনার যোগসূত্র এই মহিলার মাধ্যমেই। রাত দু'টো-আড়াইটা পর্যন্ত রোজ আড্ডা চলত। প্র্যাকটিসে ঘাটতি পড়ত। এ নিয়ে মারাদোনার সঙ্গে খিটিমিটি লাগল বার্সেলোনা ক্লাবের। যে আশা নিয়ে ক্লাবকর্তারা মারাদোনাকে নিয়ে এসেছিলেন, সেটা পূরণ হচ্ছিল না। স্পেনে অনেক 'রাফ' ফুটবল খেলা হয়। বুল-ফাইটের দেশে, ফুটবল মাঠেও কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। বিলবাও-এর এক ডিফেণ্ডার মেরে মারাদোনাকে কয়েক মাসের জন্য জখম করে দিলেন। এর জন্য তিনি কোনও লজ্জাবোধ করলেন না। বাড়ির ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে রাখলেন সেই বুট, যেটা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন মারাদোনাকে। স্পেনে আর থাকবেন না ঠিক করলেন মারাদোনা। স্ফূর্তি করতে গিয়ে সব টাকাই তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কপর্দকশূন্য হয়ে হঠাৎ যেন বাস্তবের জগতে নেমে এলেন। এরপর নাপোলি ক্লাবের সেই বিরাট 'অফার'। মারাদোনা দক্ষিণ ইতালির, মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য নাপোলিতে খেলতে এলেন এবং এক বছরের মধ্যেই রাজা হয়ে গেলেন। পরের ঘটনাবলী সবারই জানা। ইতালির বিশ্বকাপ পর্যন্ত মারাদোনা সেখানে অতি আদরের 'ডিয়েগোইতো'। তাঁর কোনও কুকর্মই লোকের চোখে তখন পড়ে না। মারাদোনা কানে দুল পরেন। ইতালির বহু তরুণ কানে দুল পরতে শুরু করল।

মারাদোনার একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য সে কী ব্যাকুলতা! বিশ্বকাপের সময়ই কিন্তু সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। অন্ধ ভালবাসা হয়ে গেল প্রচণ্ড ঘৃণা। বিশ্বকাপের সময় মারাদোনাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। প্রথম দেখায় তাঁকে অস্থিরচিত্ত এক নাবালক মনে হয়েছে। মনে আছে, ত্রিগোরিয়ায় আর্জেন্তিনার প্র্যাকটিস-মাঠে মারাদোনা ঢুকলেন অন্য সবার শেষে। মাঠে নেমেই দুমদাম গোলে শট নিতে শুরু করলেন। কখনও ঠাট্টা করছেন, কখনও শিস দিচ্ছেন,

বিশ্বের অন্যতম সেরা 'বলপ্লেয়ার'

কখনও গান গাইছেন চিৎকার করে। একেবারে ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু তিনি যে মোটেই ছেলেমানুষ নন, টের পেলাম কিছুক্ষণ পর। দেশ-বিদেশের বহু সাংবাদিক অপেক্ষা করছিলেন তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। প্র্যাকটিস থেকে ফিরে এসেই মারাদোনা সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের মধ্যে যাঁরা আর্জেন্তিনা থেকে এসেছেন, আজ আমি শুধু তাঁদের সঙ্গেই কথা বলব। বাকিরা সবাই চলে যান।" এই কথা বলে মারাদোনা একটা হলঘরে ঢুকে গেলেন। আমার সঙ্গে ছিল আর্জেন্তিনার সার্জিও। তাঁর পেছনে পেছনে হলঘরে ঢুকে পড়লাম। আরগোমিটারে বসেই মারাদোনা জবাব দিচ্ছেন। হঠাৎ ধরে ফেললেন ইতালির এক সাংবাদিক ভিড়ের মধ্যে রয়েছেন। মারাদোনা চেঁচিয়ে উঠলেন, "আপনি বেরিয়ে না গেলে আমি কোনও প্রশ্নের উত্তর দেব না। আপনাদের জ্বালায় কি আমি আমার দেশের লোকেদের সঙ্গে মন খুলে দুটো কথাও বলতে পারব না?" ইতালির সেই সাংবাদিকটিকে, মনে হল, মারাদোনা ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। তিনি মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন। সার্জিও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ভাবখানা এই, দেখলে, মারাদোনা আমাদের কত আপনার লোক। প্রায় আধ ঘণ্টা মারাদোনার ইন্টারভিউ চলল। তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথা বলছেন দেখে হলঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি ইতালির সেই সাংবাদিক দাঁড়িয়ে আছেন। মিনিটপাঁচেক পর হঠাৎ দেখি একজন এসে তাঁকে ডাকছেন। ফিসফিস করে বলছেন, "আপনি চলে যাবেন না। ডিয়েগো নিজের ঘরে আপনাকে যেতে বলছেন।"

ইতালিতে আর-একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সেই সময় দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা চলছে। ইতালির সঙ্গে আর্জেন্তিনার দেখা হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে ইতালি-শিবিরে হাজির হলেন মারাদোনা। সঙ্গে সাত-আটটা দশ নম্বর জার্সি। গভীর রাতে ইতালির খেলোয়াড়দের ঘুম থেকে ডেকে তুললেন তিনি। জামিয়ে আড্ডা শুরু করলেন। ইতালীয়রা তো দারুণ খুশি। ডিয়েগো স্বয়ং তাঁদের শিবিরে। ডিয়েগো কিন্তু এবার আসল কাজ শুরু করলেন। পছন্দমতো খেলোয়াড়কে তাঁর দশ নম্বর

ইতালির বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের খেলোয়াড়রা রুখে দিয়েছিলেন মারাদোনাকে

জার্সি বিলোতে লাগলেন। কেউ খুশি, কেউ মনঃক্ষুণ্ণ। এর পর ফিরে আসার আগে কয়েকজনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে এলেন মারাদোনা, "বাঃ, বেশ খেলছ।"

পুরো ব্যাপারটাই ভবিষ্যতের দিকে ভেবে করা। মারাদোনা আন্দাজ করেই রেখেছিলেন, সেমিফাইনালে ইতালির সঙ্গে দেখা হতে পারে। তাই ইতালি শিবিরে একটু গোলমাল পাকিয়ে দিয়ে গেলেন।

সেই মারপিটের ঘটনাটা অবশ্য সবারই জানা। বিশ্বকাপের সময়ই ঘটনাটি ঘটে। মারাদোনার সঙ্গে সর্বত্রই তাঁর আত্মীয়স্বজনরাও থাকেন। তাঁর এক শ্যালক নাপোলি থেকে ফিরছিলেন, মারাদোনারই গাড়ি চালিয়ে। ইতালির পুলিশ মারাদোনার গাড়ি চেনেন। অন্য একজনকে তা চালাতে দেখে তাঁরা গাড়ি থামিয়ে লাইসেন্স চ্যালেঞ্জ করেন। শ্যালকের তো লাইসেন্স নেই। ফলে তাঁকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে বলেন। পুলিশের কথায় পাত্তা না দিয়ে মারাদোনার শ্যালক জোরে গাড়ি চালিয়ে হাজির হন আর্জেন্তিনা-শিবিরে। সেই সময় মারাদোনার স্ত্রী ক্লাউদিও ভিয়াফিনে গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। ভাইকে পুলিশ তাড়া করেছে দেখে ভিয়াফিনে ডেকে নিয়ে আসেন মারাদোনাকে। কোনও কিছু না শুনেই মারাদোনা পুলিশের সঙ্গে মারপিট শুরু করে দেন। যেখানে আর্জেন্তিনার শিবির বসেছিল, সেই জায়গাটা রোমা ক্লাবের। ভাঙচুরও হয়। এ নিয়ে বিরাট হইচই। শেষে রোমা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ঘটনাস্থলে গিয়ে সব কিছু সামাল দেন।

এই ঘটনাটা শুনে আমরা সবাই খুব অবাক হয়েছিলাম। বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্ট খেলতে এসে কোনও খেলোয়াড় যে এইরকম ছেলেমানুষি করতে পারেন, ভাবা যায় না। পরে বুঝেছিলাম, হঠাৎ এই ধরনের উগ্র মেজাজ মাদক সেবনেরই লক্ষণ। আসলে মারাদোনা অভ্যাসটি করেন বার্সেলোনা-তে। নাপোলিতে গিয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। এই সময় তাঁকে ভাল পথে ফিরিয়ে আনতে পারতেন তাঁর কাছের লোকেরা। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। ফলে মারাদোনার ফুটবল-জীবনে হঠাৎ ছেদ পড়ে গেছে। মারাদোনার ফুটবল-প্রতিভা নিয়ে কেউ কোনওদিনই কোনও প্রশ্ন তুলবেন না। এই শতাব্দীর সেরা ফুটবলারদের নিয়ে কোনও টিম গড়া হলে মারাদোনা অবশ্যই তাতে থাকবেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। একজন বিরল-প্রতিভা এত দ্রুত মাঠ থেকে সরে গেলেন, এটা ভাবতেই খারাপ লাগছে।

মারাদোনার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার : বিশ্বকাপ

ছেলেবেলা থেকেই সবার নজর কেড়ে নিয়েছিলেন দিয়েগো

যে কোনওভাবেই ওঁকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেন বিপক্ষ দল

ফোটো : রাসবিহারী দাস

বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় হতে চাই

লিয়েন্ডার পেজ
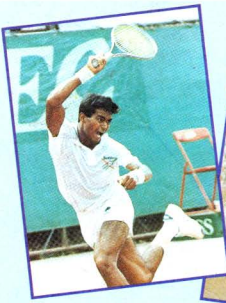
গত দেড় বছরে অল্প যে কয়েক সপ্তাহ কলকাতায় কাটিয়েছি, তার মধ্যে একটা মন্তব্য মাঝেমধ্যেই আমার কানে এসেছে : "ওই যে, ওই দ্যাখ, লিয়েন্ডার পেজ...ওই যে আইসক্রিম খাচ্ছে, গাড়িতে উঠছে...।" বেশ কয়েকবারই শুনেছি এরকম মন্তব্য। রাস্তায় বেরোলে বা পার্টিতে ঢুকলে সবাই যদি আপনার দিকে ঘুরে তাকায়, একনজরে চিনতে পারে, তা হলে কার না ভাল লাগে ! আমারও যে খারাপ লাগে বলব না, বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে এই যে সামান্য পরিচিতিটা হয়েছে, তাকে মাথার মধ্যে ঢোকাতে আমি একেবারেই রাজি নই। আসল হচ্ছে আমার খেলা। আমার সাফল্য। চূড়োয় পৌঁছনো। সেদিন এক সাংবাদিক বন্ধু বলছিলেন, "জুনিয়ার উইম্বলডন জেতাটা তোমার উল্লেখযোগ্য সাফল্য।" ওকে জবাব দিলাম, "খুব বড় সাফল্য মোটেও নয়। আমি যে-লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আছি, সেখানে পৌঁছবার এটা একটা সোপান মাত্র। আপনি যখন তাকিয়ে আছেন মন্দিরের চুড়োর দিকে, তখন ছোট একটা ধাপ পেরনোকে কি খুব গুরুত্ব দেবেন ?"

আমার লক্ষ্যটা যে ঠিক কী, সেটা বুঝিয়ে বলা উচিত। আমার লক্ষ্য হচ্ছে নিজের যে সম্ভাবনা আছে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো। যদি তা পারি, আশা করি, বিশ্বের একনম্বর হতে পারব।

১৯৮৯-এ যেবার প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টগুলোতে খেললাম, ফল হয়েছিল যাচ্ছেতাই। সিঙ্গল্‌সে সবক'টাতে হারি প্রথম রাউন্ডে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে

ডাবলসে অবশ্য আমি আর গৌরব নাটেকর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। ফরাসি ওপেনে আমি আর রোহিত রাজপাল হারলাম কোয়ার্টার ফাইনালে। উইম্বলডনেও নিউজিল্যান্ডের ট্রয় টিপনেকে জুড়ি নিয়ে শেষ আটজনে গিয়েছিলাম।

পরেরবার যখন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলতে যাওয়ার তোড়জোড় করছি, ব্যাট-এ আমার কোচ ডেভ এমেরো আমায় ডাকলেন। বললেন, "আমরা দু'জনেই এবার যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি। এবার তোমার ভাল না খেলার কোনও কারণ নেই। একজন, বিশ্বের এমন একজন জুনিয়ারের নাম করো যাকে তুমি হারাতে পারবে না বলে মনে হয়।" আমি কারও নাম করতে পারিনি।

মেলবোর্নে ঠিকঠাক শুরু করলাম। ফাইনালে যাওয়ার পথে হারাই শীর্ষ বাছাই ইয়ান কোদেসকে। টুর্নামেন্টটা জিততে পারলাম না, কিন্তু এই বিশ্বাস নিজের মধ্যে চলে এল যে, আমি ঠিক রাস্তাতেই এগোচ্ছি। ফরাসি ওপেনের প্রথম রাউন্ডে ইয়ান কোদেসকে প্রথম

আমার সামনে অনেক কঠিন পরীক্ষা আসছে। এখন থেকে তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। কোথায়-কোথায় আরও উন্নতি করতে হবে ? আমার তো মনে হয় সব জায়গায়। সামনে প্রচুর পরিশ্রম এবং পরিশ্রমের চেয়েও যেটা বড় কথা, বিরাট চ্যালেঞ্জ।

সেটে হারানোর পর দ্বিতীয়টি হেরে গেলাম ০-৬-এ। শেষসেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল, হারলাম। প্যারিসের পরাজয়ে কিন্তু মুষড়ে পড়িনি। কারণ ক্লে কোর্টের জন্য আমার আলাদা কোনও প্রস্তুতিই ছিল না। উইম্বলডনের পাঁচ সপ্তাহ আগে থেকে খেলছিলাম শুধু ঘাসে। ডেভ-সার টুর্নামেন্ট শুরুর আগে আমায় বললেন, "এবার কিন্তু ফাইনালে ওঠাও তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তোমায় চ্যাম্পিয়ান হতে হবে। আর কোনও রাস্তা নেই।" প্যারিসের পরাজয়ের কথা মন থেকে মুছে ফেলে জোর প্র্যাকটিস শুরু করে দিলাম বেলজিয়ামে। কৃত্রিম ঘাসের কোর্টে। ইংল্যান্ডে পৌঁছনোর পর হঠাৎ কাঁধে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আমি পাত্তাই দিইনি। আমি তখন নিজের মনকে 'ফোকাস' করে ফেলেছি। কোনও কিছু—কোনও কিছুই আমার খেতাব-জেতা আটকাতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত পারেওনি।

উইম্বলডনের ওই ট্রোফিটা নিশ্চয়ই গৌরবের। কিন্তু আমার কাছে তখনকার মতো তার চেয়েও যেটা বেশি আনন্দের ছিল, তা হচ্ছে ওই উপলব্ধি। প্রচণ্ড খাটলে, মনের একাগ্রতা রাখলে ওই উপলব্ধি হয় মানুষের। কোনও বাধাই তখন আর বাধা নয়। এর পর থেকে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার কাজটা সহজতর হয়ে গেছে। এখন নিজেকে বলতে পারি, "লিয়েন্ডার, পরিশ্রম করো, ফল পাবেই। একবার তো তুমি পেয়েছ।"

আমার ধারণা, যদি প্রাণপাত পরিশ্রম করে যাই, নিজেকে বেঁধে রাখি কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে, তা হলে বিশ্বের একনম্বর টেনিস খেলোয়াড় হতে পারব। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্যের কথা এখন ভাবার চেয়েও যেটা বুদ্ধিমানের কাজ তা হল, হার্ডলগুলো একে-একে টপকানো। একশো মিটার দৌড়ের শেষে কীভাবে বুক দিয়ে ফিতে ছোঁব সে-চিন্তা আমি করছি না। বরং প্রতি পঁচিশ মিটার নিয়ে আমি আলাদা করে ভাবতে চাই। এখনও আমার অনেক উন্নতি করার
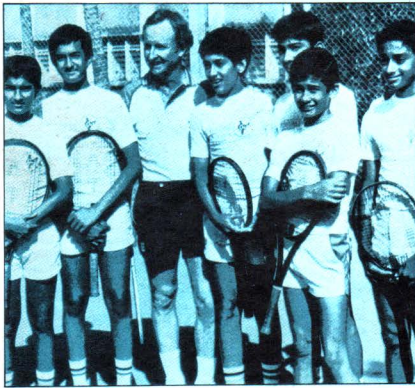
কোচ ডেভ এমেরার সঙ্গে ব্যাট-এর ছাত্ররা

আছে। ডেভিস কাপে টুকটাক দু-একটা ম্যাচ জিতেছি, বাইরের টুর্নামেন্টগুলো খারাপ খেলছি না। তবে এই রেকর্ড যথেষ্ট নয়। আমার সামনে অনেক কঠিন পরীক্ষা আসছে। এখন থেকে তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। কোথায়-কোথায় আরও উন্নতি করতে হবে ? আমার তো মনে হয় সব জায়গায়। শারীরিক দিক দিয়ে আরও শক্তসমর্থ হওয়া দরকার, মজবুত করা দরকার খেলার ভিতটা। নতুন শট তৈরি করতে হবে, ছকে রাখতে হবে নানা ধরনের ট্যাকটিক্স। সামনে প্রচুর পরিশ্রম এবং পরিশ্রমের চেয়েও যেটা বড় কথা,বিরাট চ্যালেঞ্জ।
চ্যালেঞ্জ ব্যাপারটা আমার কাছে খুব চিত্তাকর্ষক। আমি ভালমতো জানি, যে লক্ষ্যের দিকে ছুটতে শুরু করেছি, তা কত কঠিন। আর এটাও জানি, সাফল্য আসুক না আসুক, প্রচুর ত্যাগ, প্রচুর কষ্টস্বীকার করতে হবে এর জন্য। আমার বয়সী ছেলেমেয়েরা যেমন হই-হুল্লোড় করে মোটামুটি আরামে এই সময়টা কাটিয়ে দেয়, আমি তা পারব না। কিন্তু তাতে কোনও দুঃখ নেই, এ নিয়ে কোনওরকম গাঁইগুইও করি না। আমি যখন সবদিক দেখেশুনে এই খেলাটা বেছে নিয়েছি, তখন নিশ্চয় এর যন্ত্রণা সম্পর্কেও আগে থেকে ওয়াকিবহাল আছি। কাল আমি যদি সফল হতে পারি, তা হলে তো আজকের ত্যাগের বিরাট মূল্যও পেয়ে যাব। এটা তো আমাকে সাহায্য করবেই, উপকৃতও হবে আমার পরিবার। আমি বুঝে গিয়েছি,আমার অস্বাভাবিক জীবনযাত্রাটাকেই ভালবাসতে হবে। এর মধ্যে থেকেই জীবনকে যথাসম্ভব উপভোগ করতে হবে। এবং তাই আমি করছি।
আমার এক শুভানুধ্যায়ী সেদিন বলছিলেন, "লিয়েন্ডার,এত খাটছ তুমি। মনে করো পাঁচ-ছ' বছর খাটার পর আবিষ্কার করলে তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে ব্যর্থ। তখন কী করবে ?" আমি বললাম, "ব্যর্থতা শব্দটাই আমার অভিধানে নেই। ওটা নেতিমূলক প্রতিক্রিয়া। যদি লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারি, তা হলে ধরে নেব যে, আমি সফল হতে পারিনি। তার মানে ব্যর্থ হওয়া নয়।" আমার ধারণা, আরও পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যেই এটা বোঝার মতো অবস্থায় পৌঁছে যাব যে, আমাকে দিয়ে কতটা হবে। যদি টেনিস ছাড়তেও হয়, জীবনের অন্য যে-কোনও শাখায় প্রবেশের যথেষ্ট সুযোগ থাকছে। কত বয়স হবে তখন আমার ? ২৩। বড়জোর ২৪। একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এ-মুহূর্তে অবশ্য অন্য শাখা নিয়ে আমি ভাবতে রাজি নই। টেনিস আমার ধ্যানধারণা। 'চান্স ফ্যাক্টর'গুলোকে আমি যথাসম্ভব কমিয়ে রাখছি। অনুশীলন, আরও অনুশীলন, শুধুই অনুশীলন, আপাতত এই আমার মন্ত্র। পারব কি পারব না, সেটা ভবিষ্যতের কথা। তবে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখব না। পরে যেন কোনওদিন এমন ভাবনা আমার মনে না আসে যে, আরও পরিশ্রম করা উচিত ছিল। তা হলে হত।
টেনিসতারকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও মানুষ হিসাবে বদলে যাব বলে আমি মনে করি না। একনম্বর টেনিস খেলোয়াড় হয়ে ওঠাটা যেমন পেশাদার জীবনে আমার লক্ষ্য, ব্যক্তিগত জীবনেও সেরকম আমার একটা লক্ষ্য আছে। সেরা মানুষ হয়ে ওঠা, সেরা বন্ধু হওয়া। যতটা সাফল্যই পাই না কেন, আমার এই চিন্তার কোনও নড়চড় হবে না। আমি বরাবরই বহির্মুখী। নতুন-নতুন বন্ধু পেতে ভালবাসি। সাফল্য আজ আছে, কাল নেই। খ্যাতি আজ থাকবে, কাল কেউ চিনবে না, কিন্তু বন্ধুত্বটা তো চিরন্তন। তার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি।
লেখাটা যখন আপনারা পড়ছেন তার মধ্যে আর কলকাতা ফিরতে পারব কি না জানি না। জুলাই থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘাঁটি গেড়ে এদিক-ওদিক খেলে বেড়ানোর কথা আমার। কোর্টে সময় কাটাবার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের ডাক্তারের চেম্বারেও নিয়মিত যেতে হবে আমাকে। ক্রীড়াবিজ্ঞানের জগতে যে অস্বাভাবিক উন্নতি হয়েছে, তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে আধুনিক টেনিস খেলোয়াড়রা। আমিই বা ব্যতিক্রম হব কেন ? আমার নাড়ির গতিটা আরও কমিয়ে আনতে হবে। যথাসম্ভব কমাতে হবে। কারণ ফিট্‌নেসের সঙ্গে নাড়ির গতির খুব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। যার নাড়ির গতি যত কম, সে তত বেশি 'ফিজিক্যালি ফিট'। সবদিক দিয়ে এখন আমার চেষ্টা চলবে। শারীরিক, মানসিক, টেকনিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল। বিশ্বসেরা হতেই হবে। বড় বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হচ্ছে আমাকে ? উপায় নেই। সেই একটা কথা আছে না, তারাদের ধরতে গেলেন আপনি। গিয়ে নামলেন মেঘে। মেঘেও যদি নামতে পারি !

অনুলিখন : গৌতম ভট্টাচার্য

সঞ্জয় মঞ্জরেকর
ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাটস্ম্যান
সঞ্জয় মঞ্জরেকর। বিশ্বের সেরা
বোলাররাও সঞ্জয়কে সমীহ করেন।
POWER
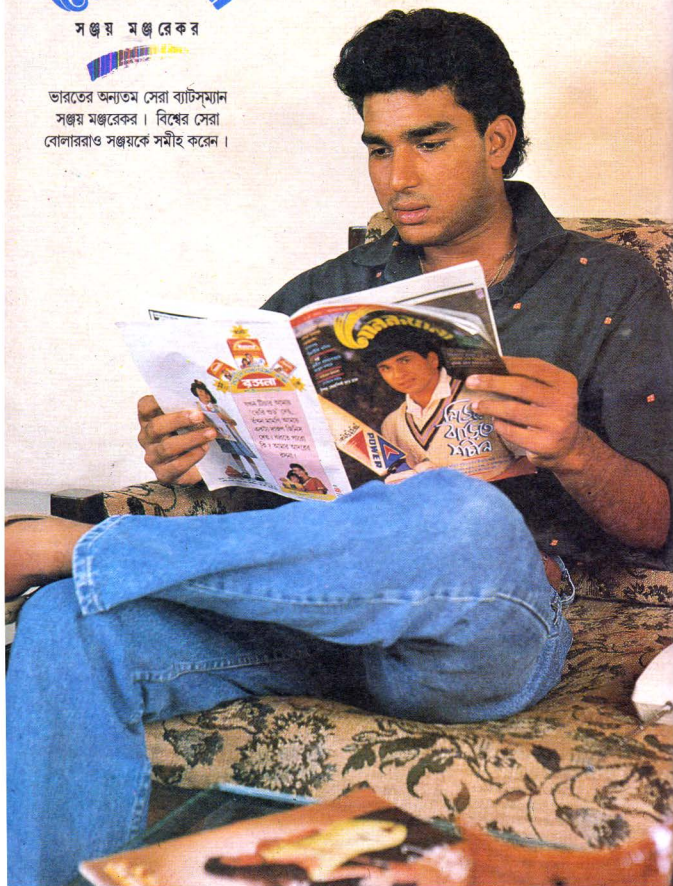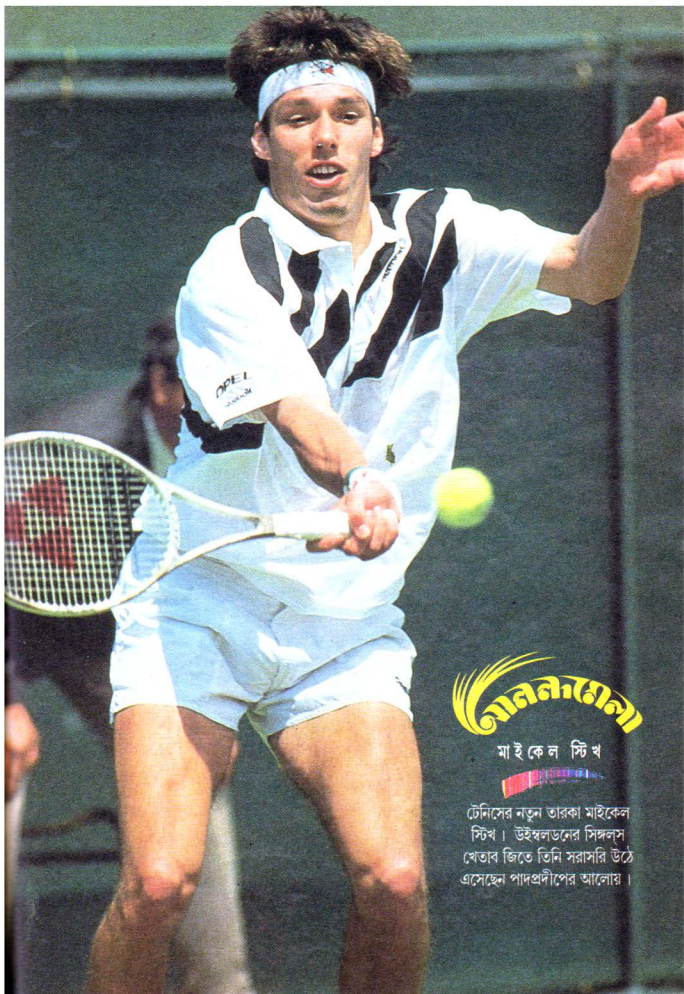
খেলার মেলা
মাইকেল স্টিখ
টেনিসের নতুন তারকা মাইকেল স্টিখ। উইম্বলডনের সিঙ্গল্‌স খেতাব জিতে তিনি সরাসরি উঠে এসেছেন পাদপ্রদীপের আলোয়।
OPEL

রবি শাস্ত্রীই আমার আদর্শ ক্রিকেটার

সৌরভ গাঙ্গুলি
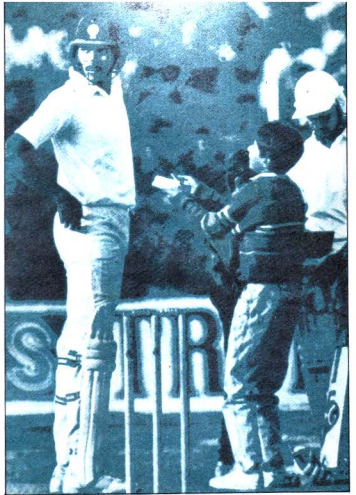
নতুন প্রজন্মের কাছে রবি শাস্ত্রী বরাবরই জনপ্রিয়

প্রথম সেই অ-টো-গ্রা-ফ-টা ? কথা নেই, বার্তা নেই, মাঝে-মাঝে হঠাৎই চোখের সামনে এসে যায় সেদিনের সেই ছবি । বাড়িতে বসে একদিন হয়তো ডেভিড গাওয়ারের কোনও ইনিংসের ক্যাসেট দেখছি, তখনই । সেই সময়ের অনুভূতি যে আসলে কেমন, বলে বোঝানো যাবে না । আমি বোঝাতে পারব না । ময়মনসিংহের ওই ছোট স্টেডিয়ামে, এশিয়া যুব কাপ ক্রিকেট খেলতে গিয়ে জীবনে প্রথম অটোগ্রাফ দিতে হয়েছিল আমায় । ইচ্ছে হয়, সেই ছবিটা···· । থাক বরং । ইচ্ছে তো অনেক কিছুই হয়, যা আর কোনওদিনও বাস্তব হবে না !

হয়তো কোথাও যাচ্ছি ; গাড়ি থেকে চোখে পড়ল, রাস্তার পাশের মাঠে কোনও ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে । ইচ্ছে হয়, দারুণ ইচ্ছে হয় , নেমে পড়ি । ফুটবলই প্রথম শুরু করেছিলাম । দুর্বলতা তো একটু থাকবেই । স্কুলে পড়ার সময় পাওয়া বেস্ট ফুটবলারের বেশ কিছু প্রাইজও আছে আমাদের বাড়িতে । ক্রিকেট শুরু করলাম তো এই সেদিন । ইচ্ছে অনেক কিছুই হয় । কিন্তু আবার কোনও ফুটবল ম্যাচে নামার ইচ্ছে বোধ হয় শুধু ইচ্ছেই থেকে যাবে । ফুটবল খেললে চোটের আশঙ্কা ! আমার কেরিয়ারের এই জায়গায় এরকম ঝুঁকি কি নেওয়া উচিত ?

শেষ কবে যে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রাস্তায় আড্ডা মেরেছি, মনে পড়ছে না । বাড়িতে আসলে এ-ব্যাপারে কড়াকড়ি প্রথম থেকে । যে জন্য পাড়ায় তেমন বন্ধুবান্ধবও নেই আমার । ছোট থেকে তো বাইরে বেরোইনি । এখনও অফিস

আমি সৌরভ

আর প্র্যাকটিসের সময়টুকু বাদ দিলে, বাড়িতেই । ইচ্ছে হয়, মাঝে-মাঝেই ইচ্ছে হয়, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি । আড্ডা মারতে, সিনেমা-থিয়েটার দেখতে । হয়ে ওঠে না । রাস্তায় বেরোলেই লোকে এমনভাবে তাকায় ! "ওই যে সৌরভ, ওই দ্যাখ, নীলরঙের জামা পরে আছে"— এ-কথা শুনে অস্বস্তি হয় প্রচণ্ড । ইচ্ছে থাকলেই বা কী করা যাবে ? ইচ্ছে তো অনেক কিছুই হয় । আমায় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, পৃথিবীতে কোন মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে তুমি সমস্ত কিছু বাজি রাখতে প্রস্তুত, আমি বলব, অমিতাভ বচ্চন । কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়া কি কখনও সম্ভব ?

দেবাং গান্ধী, সঞ্জয় দাস—আমার ক্রিকেটার বন্ধুদের প্রায়ই বলি, ক্রিকেট খেললে রবি শাস্ত্রীর মতোই খেলা উচিত ! কী নিজের ডাঁটে খেলে ! বেশি কথা নয়, কাউকে পরোয়াও নয় । শুধু নিজের কাজ—খেলা ! শুরু করেছিল বোলার হিসাবে, অথচ কীভাবে নিজেকে 'ইম্‌প্রোভাইজ' করে ভারতের এক নম্বর 'ওপেনার' হয়ে গিয়েছে শাস্ত্রী ! আদর্শ যদি কাউকে করতে হয়, তা হলে করা

উচিত ওকেই। ইচ্ছে তো হয়, ওর মতো·····।
ইন্টারভিউ নিতে এসে, ক'দিন আগে কোনও সাংবাদিকই বোধ হয় আমায় জিজ্ঞেস করছিলেন, এসবের জন্য আমার কোনও আক্ষেপ হয় কি না। আমার পরিষ্কার উত্তর ছিল, না। একেবারে ছোট থেকে বাড়িতে আমরা এভাবেই, একটু আলাদাভাবে বড় হয়েছি। এতে হয়েছে কি, নিজের ওপর আস্থা বেড়েছে। 'নিজের', 'আমার' কথাগুলো বারবার চলে আসছে হয়তো। তবু বলি, এই আস্থাটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার। অনেকের দেখবেন আছে, অন্যের ব্যাপারে বড্ড মাথা ঘামায়। আমার একদম ভাল লাগে না এটা। বাবা-মা'কে বাদ দিলে কেউ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে, সেটাও। আর ভাল লাগে না, বেশি কথা বলার লোক। বকাঝকা করার লোক তো আরও নয়। এই ধরনের লোক এবং 'আমায় দ্যাখ' ভাবটা একদম অপছন্দ করি। রবি শাস্ত্রীকে আমার ভাল লাগে, তারও কারণ ওই। ওর সবকিছুতে একটা নিজস্বতা আছে। কপিলদেবকে ভাল লাগার কারণটা আবার অন্য। এ-বছর রঞ্জি সেমিফাইনালে ওকে আরও কাছ থেকে দেখে, একেবারে মন থেকে বলছি, আমি মুগ্ধ। পরিশ্রম করার ইচ্ছেটা তা হলে একজনকে কতদূরে নিয়ে যায়। বেহালা চৌরাস্তায়,বাড়ির কাছে বড় রাস্তায় আড্ডা মারতে পারছি না, এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে ইচ্ছেমতো ঘুরতে পারছি না—এইসব আক্ষেপ-টাক্ষেপ গৌণ হয়ে পড়ে এঁদের পরিশ্রম আর মানসিকতা দেখলে। ধরে নিয়েছি; ওপরে, আরও ওপরে উঠতে হলে অনেক কিছু ছাড়তে হবেই। এটা নিয়ম।
কিন্তু প্রশ্ন হল, সৌরভ গাঙ্গুলি হওয়ার অসুবিধাগুলোই বা শুধু লিখতে যাচ্ছি কেন ? সুবিধা কি কিছুই নেই ? এই তো এক বছর আগে, ক্লাস ইলেভেন থেকে টুয়েলভে ওঠার পরীক্ষা দেব ! অ্যাটেনডেন্স পার্সেন্টেজ যতটা হলে পরীক্ষায় বসা যায়, আমার তার অর্ধেক। ক্লাসে যাব কি, তা হলে আর ম্যাচ খেলা যায় না। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সবাই সেটা জানেন। তো, এই জায়গাটায় আমি ছাড় পেয়ে গেলাম। তারপর এই ক্লাসে পড়া ধরার ব্যাপারটা। মাস্টারমশাইরা জানেন, পড়া ধরলে আমি পারব না। আমার লেখাপড়া মানে, পরীক্ষার আগের একমাস ষোলো-সতেরো ঘন্টা প্রতিদিন। পড়া তাঁরা ধরেনই না কোনওদিন। এবং আমার আর একটা সুবিধা, কলেজের অধিকাংশ বন্ধুই স্কুলের। ওরাও জানে ব্যাপারটা। সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক যেটা, সেই অদ্ভুতভাবে তাকানোর ব্যাপারও এখানে নেই। এবার যেমন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে হল। সিট পড়েছিল আশুতোষ কলেজে। প্রথম দিন পরীক্ষা শুরুর সওয়া ঘন্টা আগে গিয়ে, বাইরে গাড়িতে বসে আছি, শেষ মুহূর্তে বইটা দেখে নিচ্ছি। ওইখানেই দেখি, ভিড় হয়ে গিয়েছে। ওই টেনশন, তার সঙ্গেই অটোগ্রাফের জন্য ধাক্কাধাক্কি। পরের দিন থেকে আর কোনও ঝুঁকিটুঁকি নয়, কলেজে পৌঁছতাম ওই স্টেশন, তার মধ্যেই অটোগ্রাফের জন্য ধাক্কাধাক্কি। পরের দিন থেকে আর কোনও ঝুঁকি-টুকি নয়, কলেজে পৌঁছতাম ঠিক দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে। আর গিয়েই একেবারে গাড়ি থেকে নেমে সোজা হলের ভেতরে।
১৯৮৭ সালে আমি যখন বড়িশার হয়ে ময়দানে প্রথম ক্রিকেট শুরু করলাম, তার সঙ্গে এখনকার পরিবেশে অনেক তফাত। তফাতটা ভালর দিকে। স্থানীয় ক্রিকেটারদের পরিচিতি এখন অনেক বেশি। মনে পড়ে না, চার বছর আগে স্থানীয় ক্রিকেটে খবরের কাগজে এখনকার মতো এত লেখালেখি হত কি না !

সঞ্জয় দাস

এখনকার দেবাং গান্ধী, সঞ্জয় দাসও আমাদের বয়সী যে-কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে পাল্লা দেবে। হার্ডহিটার দেবাং, সঞ্জয় আবার ভাল স্ট্রোকপ্লেয়ার। 'লড়াই' শব্দটা এর মধ্যেই ঢুকে গিয়েছে আমাদের প্রজন্মের সকলের মধ্যে।

সম্ভবত না। ক্রিকেটের ছাত্র হিসাবে বলতে পারি, অনেক বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে এখন। ঘরোয়া ক্রিকেটেই হোক আর বাইরের টুর্নামেন্টই হোক। প্র্যাকটিস করার সুযোগ-সুবিধাও এখন বেশি। এখানে একটা কথা খুব চালু, ভাল ক্রিকেট খেলেও নাকি কোনও লাভ নেই। বাংলার ক্রিকেটাররা যতই ভাল খেলুক, তাদের টেস্টে সুযোগ দেওয়া হবে না ! অরুণলালের অবস্থা দেখার পর এরকম কথা উঠতেই পারে। কিন্তু এই কথাটার পাশে আর একটা কথাও খুব সত্যি। একঝাঁক ভাল ক্রিকেটার কিন্তু একসঙ্গে চলে এসেছে কলকাতায়। আমার ধারণা, শচীন তেন্ডুলকরের পর আমাদের প্রজন্মে সবচেয়ে ভাল ব্যাটসম্যান রাহুল দ্রাভিদ। কিন্তু এখনকার দেবাং গান্ধী, সঞ্জয় দাসও আমাদের বয়সী যে-কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে পাল্লা দেবে। হার্ডহিটার দেবাং, সঞ্জয় আবার ভাল স্ট্রোকপ্লেয়ার। ধরা যাক, এমন একটা টিম হল, যেখানে এই দু'জন ছাড়া আছে অভিজিৎ চ্যাটার্জি, আমি, সৈকত মুখার্জি, জয়ন্ত ঘোষদস্তিদার, দীপ্তেশ পাকড়াশি, সুপ্রিম গাঙ্গুলি, আবদুল মোনায়েম, শান্তনু ঘোষ আর মহম্মদ শফিক। এখনকার বাংলা দলের সঙ্গে এই টিমটার খেলা হলে কী হবে ? আমরা হয়তো হারব। তবে রীতিমত লড়াই করে। দু-তিনজনকে বাদ দিলে বাংলার বর্তমান রঞ্জি দল সম্ভবত আরও পাঁচ বছর অপরিবর্তিত থেকে যাবে ! কিন্তু 'লড়াই' শব্দটা এর মধ্যেই ঢুকে গিয়েছে আমাদের প্রজন্মের সকলের মধ্যে।
চার বছর আগে, ইন্দোরে বাসু পরাঞ্জপের কোচিং ক্যাম্পে গিয়ে আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ শচীনের। তখন যেমন দেখেছিলাম, এখনও সে ওইরকমই আছে। চুপচাপ, কোনও হইচইয়ের মধ্যে থাকে না। সারাক্ষণ কানে 'ওয়াকম্যান' লাগিয়ে বসে আছে। কিন্তু জেদ আর লড়াই করার ইচ্ছেটা যেন ওই অবস্থাতেই বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখে দিচ্ছে। অন্য ইচ্ছে-টিচ্ছে সব মূল্যহীন। এই ইচ্ছেটাই আসল। আকাশ-ছোঁয়া একটা পথের কথা আমি মাঝেমধ্যে ভাবি। কোথায় ? না, সেই পথের একেবারে শুরুতে আমি দাঁড়িয়ে। এই আসল ইচ্ছে, লড়াই করার ইচ্ছেটা সঙ্গে নিয়ে আমায় একেবারে ওই পথের শেষে যেতে হবে।

অনুলিখন : রূপায়ণ ভট্টাচার্য
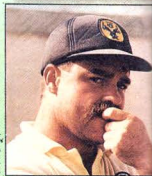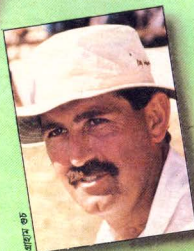
ব্যাটেও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে হবে কপিলকে

আতসবাজির আলোয় সন্ধের কলকাতা তখন সকালের মতো ঝলমলে। সকাল সাতটা, না সন্ধে সাতটা বোঝা মুশকিল। ঠিক যেন দুর্গাপুজোর অষ্টমীর সন্ধে। রাস্তায় নেমে পড়েছেন অনেকে। সবার মুখেই হাসি। একই দৃশ্য সারা ভারত জুড়ে। তবে এখানে একটু বেশি। কী এমন ঘটল, যার জন্য আনন্দের এই বন্যা? ১৯৮৩-র ২৫ জুনের রাতটা আবার যেন ফিরে এসেছে। সেবার ভারত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। আর এবার ১৯৯২-র ২৫ মার্চ প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ভারত আবার ছিনিয়ে আনল সেই অনন্য সম্মান—দ্বিতীয়বারের জন্য। বিজয়ীর ট্রোফিটা আকাশের দিকে তুলে ধরেছেন অধিনায়ক আজহারউদ্দিন, ছুঁয়ে আছেন কপিলদেব,

অরবিন্দ ডি' সিলভা

সঞ্জয় মঞ্জরেকর, শচীন তেণ্ডুলকর ও আরও কয়েকজন ক্রিকেটার। আর টানটান উত্তেজনায় আমাদের মনও উড়ে যেতে চাইছে হাজার হাজার মাইল দূরে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে। একবার ট্রোফিটা ছুঁয়ে দেখতে। শুধু একবার। এটা কি স্বপ্নদৃশ্য, নাকি বাস্তব? কে জানে! সঠিক উত্তর তো আমাদের কারও জানা নেই। তবে বাস্তবে সত্যি এটা ঘটলে সবাই যে খুব খুশি হব, তাতে সন্দেহ নেই।

আগামী বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে মোট আটটি দল— ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবোয়ে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকাকেও খেলতে দেখা যাবে। এবারেরটি পঞ্চম বিশ্বকাপ। প্রতি চার বছর অন্তর বিশ্বকাপ হয়ে আসছে—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়টি হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে যথাক্রমে ১৯৭৫, ১৯৭৯ এবং ১৯৮৩ সালে। চতুর্থবারের আসর বসে ১৯৮৭-তে ভারত ও পাকিস্তানে। নিয়মানুযায়ী ১৯৯১-এ, অর্থাৎ বর্তমান বছরে বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় বিশ্বকাপের আসর বসছে ১৯৯২-এর প্রথমার্ধে। শুরু ২২ ফেব্রুয়ারি। গতবারের মতো এবারও দু'টি দেশে হচ্ছে— অস্ট্রেলিয়ায় ও নিউজিল্যাণ্ডে। ফাইনাল হবে অবশ্য অস্ট্রেলিয়াতে খুব সম্ভবত মেলবোর্ণে, ২৫ মার্চ।

একদিনের ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার মাঠ ভারতের কাছে দারুণ পয়া। ভারত অস্ট্রেলিয়াতেই জিতেছে বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপ। ১৯৮৭ সালে। বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপকে বলা হয়েছিল 'মিনি বিশ্বকাপ'। সেবার ভারতের দলনায়ক ছিলেন 'লিট্‌ল মাস্টার' সুনীল গাওস্কর। এবার দলে আছেন আর এক 'মাস্টার'। শচীন তেণ্ডুলকর। শচীনের এটি প্রথম বিশ্বকাপ। একদিনের ক্রিকেটে শচীনের অভিজ্ঞতা কম নয়। প্রথম সিরিজেই খেলেছেন পাকিস্তানের সেরা বোলারদের বিপক্ষে। আব্দুল কাদিরের মতো বিশ্বের সেরা লেগস্পিনারের বলে ছক্কার পর ছক্কা
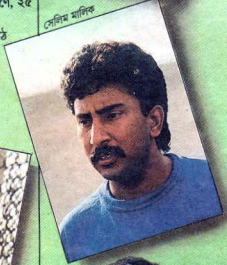
মহম্মদ আজহারউদ্দিন

সেলিম মালিক

মার্টিন ক্রো

শচীন তেণ্ডুলকর

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য, তপন দাশ, উৎপল সরকার

মেরে শচীন তো ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন একটি ম্যাচে। দ্রুত রান তোলায় তাঁর ওপর অনেকখানি নির্ভর করে থাকবে ভারতীয় দল। প্রয়োজনে শচীন বলও করেন। 'স্টক' বোলার হিসাবে তিনি হয়তো কাজে আসবেন। ফিল্ডিংও বেশ ভাল শচীনের। তবে ফিল্ডিং ও বোলিংয়ের চেয়ে শচীনের ব্যাটই বেশি ঝলসে উঠুক, এটাই আমরা চাইছি। অধিনায়ক আজহারউদ্দিন কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমরা নিজেদের তৈরি করছি বিশ্বকাপের দিকে লক্ষ্য রেখে।" কাউন্টি ক্রিকেটে দারুণ খেলে আজহারউদ্দিন নিজে অনেকখানি তৈরি। অভিজ্ঞ আজহার ভারতকে বহু ম্যাচে উতরে দিয়েছেন ব্যক্তিগত দক্ষতায়। ফিল্ডার হিসাবে তিনি বর্তমানে বিশ্বের প্রথম পাঁচজনের মধ্যে আসেন। বিশ্বকাপে তাঁর অভিজ্ঞতাও ভারতকে বিরাটভাবে সাহায্য করবে। রবি শাস্ত্রী গত বিশ্বকাপে তেমন ভাল খেলতে পারেননি। তবে রবি এখন অনেক পরিণত। রবি এখন বলের চেয়ে বেশি জোর দিচ্ছেন ব্যাটে। তিনি হয়তো ভারতের ইনিংস শুরু করবেন। একদিক ধরে রাখার ক্ষেত্রে রবির ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। বিপক্ষ ব্যাটসম্যানকে 'বেঁধে' রাখার ক্ষেত্রেও তাঁর বোলিং কার্যকর ভূমিকা নেবে। বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস কাপে সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছিলেন রবি। ঘটনাটি তাঁর ভোলার কথা নয়। ভারতের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক সঞ্জয় মঞ্জরেকরের ব্যাটের ওপরও আমরা আস্থা রাখছি। উইকেটরক্ষক হিসাবে দলে আসবেন বিশ্বস্ত কিরণ মোরে।

অ্যালান বর্ডার

তবে ফর্মের বিচারে আসা উচিত ১৯৮৩-র বিজয়ী দলের সৈয়দ কিরমানির।

ভারতের সবচেয়ে দুর্বল হচ্ছে বোলিং। আমাদের ভরসা শুধু ওই কপিলদেব। গত এক দশকের ওপর তিনি একাই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ভারতকে। এখনও তাঁর ওপর ভরসা রাখা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমাদের আরও 'স্ট্রাইক' বোলার দরকার।

এখনকার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সম্বন্ধে একই কথা বলা যায়। পরিসংখ্যানের বিচারে, একদিনের ক্রিকেটে বর্তমানে মোটেই ভাল জায়গায় নেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। তারা একের পর এক একদিনের সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যাণ্ডের কাছে। অস্ট্রেলিয়া তো আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতেই তাদের হারিয়ে এসেছে ৪—১ ম্যাচে। বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বড় ধাক্কা খাবে যদি গর্ডন গ্রিনিজের মতো ব্যাটসম্যান খেলতে না পারেন। রিচার্ডস্ নিশ্চয় তাঁর শেষ বিশ্বকাপে খেলবেন। সেক্ষেত্রে পাঁচ-পাঁচটি বিশ্বকাপেই খেলার সৌভাগ্য হবে তাঁর। আর অধিনায়ক হিসাবে প্রথম বিশ্বকাপ জেতার শেষ চেষ্টা কি তিনি করবেন না? ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আছেন হেন্‌স, রিচার্ডসন, হুপার, লোগি, দুঁজোর মতো ব্যাটসম্যান, আছেন মার্শাল, ওয়ালশ, অ্যামব্রোস, প্যাটারসনের মতো বোলার। ব্রায়ান লারা-র মতো প্রতিভাবান তরুণও অপেক্ষায় আছেন।

কিন্তু বড় সমস্যা হল, এই দলের নেই পেশাদারি মনোভাব। খেলার আনন্দে খেলে গেলে বিশ্বকাপ জেতা যায় না। এটা এতদিনে, পরপর দু'টি বিশ্বকাপে হেরে, নানা সিরিজ হেরে রিচার্ডসের বোঝার কথা।

আগামী বিশ্বকাপে 'হট ফেভারিট' বলা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে তাদের মনোবল এখন তুঙ্গে। এছাড়া বাড়তি কিছু সুযোগও পাবে অস্ট্রেলিয়া। প্রথমত, তারা খেলবে নিজের দেশে। দ্বিতীয়ত, তারা গতবারের চ্যাম্পিয়ান। অ্যালান বর্ডার এখন বোধহয় বিশ্বের সেরা অধিনায়ক। দল পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং, তিনটি ক্ষেত্রেই অস্ট্রেলিয়া শক্তিশালী। বুন-মার্শের ওপেনিং জুড়ি একদিনের ক্রিকেটে সেরা। এছাড়া মার্ক টেলর, স্টিভ ও, ডিন জোন্‌স রানের মধ্যে আছেন। জোন্‌স তো দুর্দান্ত খেলছেন। বলে অল্ডারম্যান, মার্ভ হিউজ, রিড, ম্যাকডারমট এবং হুইটনি ভাল ফর্মে আছেন। আর সর্বোপরি আছেন স্বয়ং অ্যালান বর্ডার।

ইংল্যাণ্ডকে হিসাবের বাইরে রেখে অনেকেই বোকা বনেছিলেন গত বিশ্বকাপে। কিছুদিন আগে ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একদিনের সিরিজেও অনেকে একই ভুল করেন। ৩—০ ম্যাচে জিতে গুচ্ আবার প্রমাণ করেন, খেলাটা মাঠেই হয়। আর সেখানে গুচের দলবল একেবারে উপেক্ষণীয় নন। আর্থারটন, ফেয়ারব্রাদার, ল্যাম্ব, হিক ও গুচ্ স্বয়ং ব্যাটে যে-কোনও দলকে বিপদে ফেলতে পারেন। ডেফ্রিটাস, লরেন্স, লিউইস, প্রিঙ্গল এবং স্মল বোলিংয়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন। ইয়ান বথাম যদি দলে আসেন ইংল্যাণ্ড আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে অভিযোগ, এই উপ-মহাদেশের বাইরে তারা তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারে না। শারজার জয়েই তারা সন্তুষ্ট। অভিযোগটা ভুল নয়। এখন পর্যন্ত পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আসরে প্রমাণ করতে পারেনি চ্যাম্পিয়ানশিপের দাবিদার তারাও। এখন পর্যন্ত একটি বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠতে পারেনি পাকিস্তান। এবারে পাকিস্তান দল যথেষ্ট শক্তিশালী। রামিজ রাজা, সেলিম মালিক, শোয়েব মহম্মদ, জাভেদ মিয়াঁদাদ, ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার ইউনুস এবং আবদুল কাদির অবশ্যই নতুন ইতিহাস রচনা করতে চাইবেন। ইমরান খান নেতৃত্বে থাকলে লড়াই জমে যাবে।

নিউজিল্যাণ্ডকে চ্যাম্পিয়ান হিসাবে কেউ ধরে নিচ্ছেন না, যদিও এবার বেশ কয়েকটি ম্যাচ সে দেশেই হবে। সম্ভবত মার্টিন ক্রোও চ্যাম্পিয়ান হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন না। নিউজিল্যাণ্ডের ভরসা মূলত ক্রো-ই। একা তাঁর ব্যাটে ভরসা রেখে বড়জোর একটা দুটো ম্যাচ জেতা যেতে পারে। এর বেশি নয়। অবশ্য ক্রো, মার্ক গ্রেটব্যাচ, অ্যান্ড্রু জোন্‌স ও কেন রাদারফোর্ডের দল বড় ম্যাচে অঘটন ঘটাতে পারেন।

একই কথা বলা যায় শ্রীলঙ্কা ও জিম্বাবোয়ে সম্পর্কে। দুটি দলই এখন আর হেলাফেলার নয়। বড় দলকেও কষ্ট করে জিততে হয়েছে গত বিশ্বকাপে। ফিল্ডিংয়ে এই দুটি দলই চমৎকার। সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাতে এরাও কার্পণ্য করবে না।

শেষ পর্যন্ত কে জিতবে বিশ্বকাপ? প্রশ্নটা কোটি টাকার। যুক্তি বলছে, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অথবা পাকিস্তান। মন চাইবে, ভারত। অবশ্যই ভারত। ভরসা একটাই, জীবনের মতো ক্রিকেটও সবসময় যুক্তি মেনে চলে না।

ছবির অ্যালবাম

রত্নাকর

মনে করো, তোমাদের পাড়ার সেই ছেলেটি, যে বুদ্ধিতে দারুণ পাকা। লেখাপড়ায় ফার্স্ট হবেই, অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো তার বাঁধা। সে মাঝে-মাঝেই এক-একটা উদ্ভট আর মজার জিনিস নিয়ে হাজির হয় তোমাদের সামনে। আর সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। তবে তোমাদের মধ্যে যারা আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা, দারুণ বুদ্ধি ধরো মাথায়, তারা কিন্তু চটপট ধাঁধার জট ছাড়িয়ে সমাধান করে বোকা বানিয়ে দাও তাকে। ধরো, সেই ছেলেটির নাম পলাশ। সেই পলাশ এবার তোমাদের সামনে হাজির। পলাশ এবারে যে দারুণ খেলাটা নিয়ে এসেছে, আমি জানি এবারেও তোমরা কেউ-কেউ সমাধান বলে দিতে পারবে। তবে একটু হয়তো সময় লাগবে!
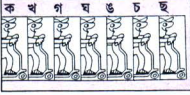
যাক, খেলাটার কথা বলি। ছবিতে দ্যাখো, পলাশ বাঁ হাতে ধরে আছে একটি আধখানা ছবি। আর ডান দিকে রয়েছে সাতটি আধখানা ছবি। এই সাতটি ছবির মধ্যে লুকিয়ে আছে পলাশের ধরে থাকা ছবির বাকি আধখানা। এখন বলো তো কোন ছবিটি?

ছবি আঁকতে সবাই পারো! কেননা, তোমাদের স্কুলে সব্বাইকে ছবি আঁকতে হয়। শুধু তাই নয়, ছবি আঁকার পরীক্ষাও হয় স্কুলে। এ ছাড়া 'হাতের কাজ'-এরও পরীক্ষা হয়। এইসব ব্যাপারে তোমরা সবাই বেশ পটু। তাই তোমাদের জন্য দেওয়া হল মোট ১৬টি ছবির টুকরো। এবার কী করতে হবে বলি। প্রথমে ছবিগুলোকে

একটা পাতলা কার্ডবোর্ডের ওপর ভালভাবে আঠা দিয়ে সেঁটে নাও। তারপর খুব সাবধানে ১৬টি টুকরোকে আলাদা-আলাদা ভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে ফ্যালো। ব্যস, এবার শুধু ঠিকমতো সাজিয়ে নিতে পারলেই দেখবে একটা দারুণ জীবজন্তুর ছবি তৈরি হয়ে গেছে। ছবিটা দেখলে তখন তোমার মনে হবে, বুঝি প্রায় গোটা চিড়িয়াখানাটাই উঠে এসেছে তোমার সামনে। তারপর তোমার ছোট ভাই বা বোনকে প্রশ্ন করো না, কোন জন্তুটার কী নাম? সে ঠিক-ঠিক পারছে কি না দ্যাখো। না পারলে তাকে জন্তুগুলোর নাম শিখিয়ে দাও।

তোমাদের গোয়েন্দাগিরির কোনও তুলনা নেই, আমি জানি। পুজোর সময় তিলের নাড়ু বানিয়ে মা যে কোথায় রেখে দেন, তা তোমরা ঠিকই জেনে যাও। কিন্তু এখন তোমাদের জন্য যে গোয়েন্দা-ধাঁধা দিচ্ছি, তার সমাধান করতে গিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে হবে না। সমাধানের সূত্রও দিয়ে দিচ্ছি। দেখি, তোমরা কেমন খুদে গোয়েন্দা হয়েছ; চটপট সমাধান করে দাও তো। হ্যাঁ, আগে বলি, কী করতে হবে। মনে করো, রামবাবু তোমাদের পাড়ায় থাকেন। তিনি একদিন বাজার থেকে কিছু একটা কিনে বাড়ি ফিরছেন। তোমরা দ্যাখো নীচের ছবিটি। হ্যাঁ, নিজেই রামবাবু
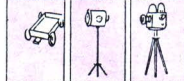
জিনিসটি কাঁধে করে নিয়ে ফিরছেন। এখন তোমাদের বলতে হবে, রামবাবু কী কিনে এনেছেন বাজার থেকে। নীচে যে তিনটি জিনিসের ছবি দিলাম, এরই কোনও একটি কিনেছেন রামবাবু। বলো তো কোন জিনিসটি কিনেছেন তিনি?

(সমাধান ৫১৬ পাতায়)

বড়গল্প

কঙ্কগড়ের

ছবি : সুনীল শীল
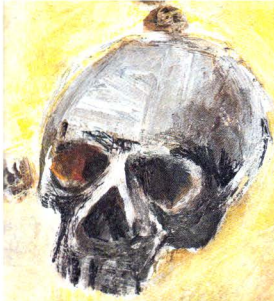
কঙ্কাল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার খুব মন দিয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন। ছেঁড়াখোঁড়া মলাট। পোকায় কাটা হলদে পাতা। নিশ্চয় কোনও পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই। কিন্তু শেষ মার্চের এই সুন্দর সকালবেলাটা গম্ভীর মুখে বই পড়ে নষ্ট করার মানে হয়? দাঁতে কামড়ানো চুরুট কখন নিভে গেছে এবং সাদা দাড়িতে ছাইয়ের টুকরো আটকে আছে। একটু কেসে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। ধ্যান ভাঙল না। আমার উলটো দিকে সোফায় বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই উসখুস করছিলেন। একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে আনমনে বললেন, "যাই গিয়া!"

এতক্ষণে কর্নেল বই বন্ধ করে বলে উঠলেন, "হালদারমশাই কি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন?"

হালদারমশাইয়ের দুই চোখ গুলি-গুলি হয়ে উঠল। জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "নাহ্। ক্যান?"

কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। "জয়ন্ত তুমি?"

"নাহ্।"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি জ্বেলে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "সমস্যা হল, আমাকেও কেউ এই প্রশ্ন করলে আমিও

সোজা নাহ্ বলে দিতাম। কিন্তু অসংখ্য মানুষ প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। তাদের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশি। কাজেই তারা এই বিশ্বাসের বশে এমন সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক সব কাণ্ড করে বসে কহতব্য নয়।"

হালদারমশাই উত্তেজিত ভাবে বললেন, "কেডা কী করল ?"

কর্নেল হাসলেন। "করল নয়, করেছিল। ভেবে দেখুন হালদারমশাই! ১০৮টা নরবলি।"

"কন কী! পুলিশ তারে ধরে নাই ?"

"পুলিশ এ-রহস্য ভেদ করতে পারেনি। যিনি পেরেছিলেন, তিনিই এই বইটা লিখে গেছেন।" কর্নেল বইটার পাতা খুলে দেখালেন। "তান্ত্রিক আদিনাথের জীবন এবং সাধনা। নামটা আমার পছন্দ। লেখকের নাম হরনাথ শাস্ত্রী। প্রায় নব্বই বছর আগে লেখা এবং ছাপা বই। আদিনাথ ছিলেন হরনাথের জ্যাঠামশাই।"

বললাম, "ওই তান্ত্রিক ভদ্রলোক ১০৮টা নরবলি দিয়েছিলেন ?"

"তা-ই তো লিখেছেন হরনাথ। তান্ত্রিক ভদ্রলোকের বিশ্বাস ছিল, ওই ১০৮টি প্রেতাত্মা তাঁর চেলা হবে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। একদিন ভোরবেলা স্বয়ং তান্ত্রিককেই মন্দিরের হাড়িকাঠের কাছে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। মুণ্ডহীন ধড়। রক্তে-রক্তে ছয়লাপ! নিজেই বলি হয়ে গেলেন।"

হালদারমশাইয়ের গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপছিল। বললেন, "মুণ্ড গেল কই ?"

কর্নেল হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললেন, "মুণ্ডু পাওয়া যায়নি। অগত্যা ধড়টা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হরনাথ লিখেছেন, দেড় মন ঘি আর আট মন কাঠের আগুনেও তান্ত্রিকের ধড় একটুও পোড়েনি। শেষে লোকজানাজানি এবং পুলিশের ভয়ে মুণ্ডুকাটা ধড়ে পাথর বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অদ্ভুত ব্যাপার, পরদিন ধড়টা জলে ভেসে ওঠে। নদীতে স্রোত ছিল। অথচ ধড়টা দিব্যি স্থির ভাসছে।"

বললাম, "হরনাথবাবু দেখেছিলেন এসব ঘটনা ?"

"তখন ওঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর। কাজেই স্মৃতি থেকে লেখা। কিন্তু তারপর উনি যা লিখেছেন, তা আরও অদ্ভুত। বছর কুড়ি পরে হরনাথবাবু নাকি স্বপ্নে তান্ত্রিক জ্যাঠামশাইকে দেখতে পান। তান্ত্রিক ভদ্রলোক ভাইপোকে বলেন, 'কেউ যদি আমার মুণ্ডুটা ধড়ের সঙ্গে জোড়া দেয়, আমি আবার সশরীরে ফিরে আসব।'"

"ততদিনে দুটোই তো কঙ্কাল। নিছক হাড় আর খুলি।"

হালদারমশাই সায় দিয়ে বললেন, "হঃ! স্কেলিটন অ্যান্ড স্কাল।"

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। "কিন্তু খুলি কোথায় পোঁতা আছে, হরনাথ জানতেন না। কেউই জানত না। উনি কবন্ধ মড়াটা এনে সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলেন। তারপর খুলির খোঁজে হন্যে হচ্ছিলেন। হঠাৎ আবার একদিন আদিনাথ স্বপ্নে দেখা দিয়ে একটা মজার ধাঁধা বললেন। ওতেই নাকি খুলির সূত্র লুকনো আছে। ধাঁধাটা হল :

> *"আটঘাট বাঁধা*
> *বার পনেরো চাঁদা*
> *বুড়ো শিবের শূলে*
> *আমার মাথা ছুঁলে*
> *ওঁ হ্রীং ক্লীং ফট্*
> *কে ছাড়াবে জট ॥"*

অবাক হয়ে বললাম, "আপনার মুখস্থ হয়ে গেছে দেখছি!"

কর্নেল হাসলেন। "সহজে মুখস্থ হবে বলেই তো আগের দিনের লোকেরা ছড়া বাঁধত। মাস্টারমশাইরা অনেক ফরমুলা ছড়ার আকারে ছাত্রদের শেখাতেন।"

হালদারমশাই উৎসাহে মাথা নেড়ে বললেন, "হঃ। একখান শিখছিলাম :

> *"ইফ যদি ইজ হয়*
> *বাট কিন্তু নট নয়..."*

গোয়েন্দা ভদ্রলোক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ওঁকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললাম, "তা এই উদ্ভট বই নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ কী কর্নেল ?"

কর্নেল গম্ভীর হয়ে দাড়ির ছাই ঝাড়লেন। তারপর অভ্যাসমতো চওড়া টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "হরনাথ এই ধাঁধার জট ছাড়াতে পারেননি। ওঁর বংশধররাও পারেননি। কিন্তু সম্প্রতি যা সব ঘটছে বা ঘটেছে, তা থেকে এলাকার লোকেদের বিশ্বাস জন্মেছে, তান্ত্রিক আদিনাথের সশরীরে পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। প্রথমত, সিন্দুকের কঙ্কালটি কে বা কারা চুরি করেছে। দ্বিতীয়ত, দেবী চণ্ডিকার পোড়ো মন্দিরের সামনে পর-পর দুটো নরবলি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, রামু রজক সন্ধ্যার মুখে ঝিল থেকে কাপড়ের বোঁচকা গাধার পিঠে চাপিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সবে চাঁদের আলো ফুটেছে, একটা কঙ্কাল ওর সামনে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলেন, 'আমি সেই আদিনাথ।' রামু গোঁ-গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।"

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "তারপর ? তারপর ?"

"রামু এখন পাগল হয়ে গেছে। কীসব অদ্ভুত কথাবার্তা বলছে। অবশ্য মাঝে-মাঝে ওর আচরণ কিছুক্ষণ সুস্থ মানুষের মতো।" কর্নেল বইটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বললেন, "গাধাটাও পাগল হয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধরা দেয় না।"

হালদারমশাই বললেন, "বাট হোয়্যার ইজ দ্যাট প্লেস কর্নেলসার ?"

"কঙ্কগড়। আপনি কি যেতে চান সেখানে ?"

"নাহ্। এমনি জিগাই।" গোয়েন্দা ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে হাসলেন। "কিন্তু কঙ্কগড় নামটা চেনা-চেনা লাগছে। কঙ্কগড়...কঙ্কগড়..."

কর্নেল বললেন, "কঙ্কগড় বর্ধমান-বিহার সীমান্তে। দুর্গাপুর থেকেও যাওয়া যায়।"

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে একটিপ নস্যি নিলেন। "ছড়াটা কী কইলেন য্যান কর্নেলসার ?"

কর্নেল আমার দিকে একবার তাকিয়ে একটুকরো কাগজে ছড়াটা লিখে ওঁকে দিলেন। মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি। হালদারমশাই ছড়াটা মুখস্থ করার চেষ্টায় ছিলেন। আমাদের চোখে-চোখে কৌতুক লক্ষ করলেন না।

ষষ্ঠীচরণ আর-এক প্রস্থ কফি আনল। কফির পেয়ালা তুলে বললাম, "হালদারমশাই! বোঝা যাচ্ছে এই রহস্যের কেস কর্নেল নিজের হাতে নিয়েছেন। আপনি বরং ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারেন।"

হালদারমশাই বাড়তি দুধমেশানো ওঁর স্পেশ্যাল কফিতে চুমুক দিয়ে খি-খি করে হেসে উঠলেন। ওঁর এই হাসিটি একেবারে শিশুসুলভ। কে বলবে উনি একসময় দুঁদে পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং ওঁর দাপটে যত দাগি অপরাধী তটস্থ হয়ে থাকত ? চাকরি থেকে অবসর নিয়ে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। মাঝে-মাঝে কর্নেলের কাছে আড্ডা দিতে, আবার কখনও কোনও কেস পেলে ওঁর ভাষায় 'কর্নেলসারের লগে কনসাল্ট' করতেও আসেন।

বললাম, "হাসছেন কেন হালদারমশাই ?"

হালদারমশাই আরও হেসে বললেন, "কর্নেলসার কইলেন গাধাটা পাগল হইয়া গেছে। গাধা...খি খি খি...গাধা ইজ গাধা। অ্যাস! দুইখান এস্।"

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "সম্ভবত দুইখান এস এলেন। নাহ্। অ্যাস নয়। শশিনাথ শাস্ত্রী।"

বললাম, "নাম শুনে মনে হচ্ছে যজমেনে বামুন। পাণ্ডাপুরুতঠাকুর সম্ভবত। নাকি সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই?"

কিন্তু ষষ্ঠীচরণ যাকে নিয়ে এল, তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার বয়সী একজন যুবক। স্মার্ট, ঝকঝকে চেহারা। পরনে জিন্স, ব্যাগি শার্ট, কাঁধে ঝোলানো কিটব্যাগ। কর্নেলকেও একটু অবাক দেখাচ্ছিল। বললেন, "এসো দিপু! তোমার বাবা এলেন না যে?"

যুবকটি বসে কব্জি তুলে ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, "মর্নিংয়ে হঠাৎ ট্রাঙ্ককল এল। একটা মিসহ্যাপ হয়েছে বাড়িতে। বাবা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলে চলে গেলেন। ন'টা পাঁচে একটা ট্রেন আছে।"

"কী মিসহ্যাপ?"

"আবার কী? একটা ডেডবডি। ভজুয়া নামে আমাদের একজন কাজের লোক ছিল। মন্দিরের সামনে তার বডি পাওয়া গেছে আজ ভোরে। একই অবস্থায়।"

হালদারমশাই নড়ে বসেছিলেন। ফ্যাঁসফেসে গলায় বললেন, "নরবলি?"

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, "তোমার সঙ্গে এঁদের আলাপ করিয়ে দিই দিপু। হালদারমশাই! এর নাম দীপক ভট্টাচার্য। হরনাথবাবুর কথা আপনাদের বলেছি। তাঁর পৌত্র। দিপু, ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। আর—জয়ন্ত চৌধুরী। 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকার রিপোর্টার।

দীপক আমাদের নমস্কার করল। তারপর হালদারমশাইকে বলল, "আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

হালদারমশাই খুশিমুখে বললেন, "ইয়েস!"

কর্নেল বললেন, "দিপু! বরং এক কাজ করো। তুমি হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি যথাসময়ে পৌঁছব।"

দীপক বলল, "দুপুরে সাড়ে বারোটায় একটা ট্রেন আছে। বাবা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

"চিন্তার কিছু নেই। আমি যাব'খন। আর শোনো, আমার থাকার ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে না।"

"সে কী! বাবা আমাকে—"

"নাহ্। আমি সরাসরি তোমাদের ওখানে উঠলে আমার কাজের অসুবিধে হবে। তুমি বরং হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তবে উনি যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ, এটা যেন কাউকে বোলো না।"

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন, "আমারে মামা কইবেন।"

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "দিপুরা রাঢ়ের ঘটি। ওর মামা পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বললে লোকের সন্দেহ হবে। আপনি তো দিব্যি স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় কথা বলতে পারেন।"

"তা পারি।" বলে হালদারমশাই আর-একটিপ নস্যি নিলেন।

বললাম, "আসলে উত্তেজনার সময় হালদারমশাইয়ের মাতৃভাষা এসে যায়।"

কর্নেল বললেন, "তা যা-ই বলো জয়ন্ত, পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ওজন আছে। উত্তেজনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা একেবারে অচল। তাই দ্যাখো না, উত্তেজনার সময় যাঁরা পূর্ববঙ্গীয় ভাষা জানেন না, তাঁরা হিন্দি বা ইংরেজি বলেন।"

হালদারমশাই সটান উঠে দাঁড়ালেন। "ইউ আর হানড্রেড পার্সেন্টি কারেক্ট কর্নেলসার!" বলে পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে দীপককে দিলেন। "আমি হাওড়া স্টেশনে এনকোয়ারির সামনে ওয়েট করব। চিন্তা করবেন না।"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক পা বাড়িয়েছেন, কর্নেল বললেন, "একটা কথা হালদারমশাই! আপনার একটা ছদ্মনাম দরকার।"

"হঃ!" বলে হালদারমশাই সবেগে বেরিয়ে গেলেন।
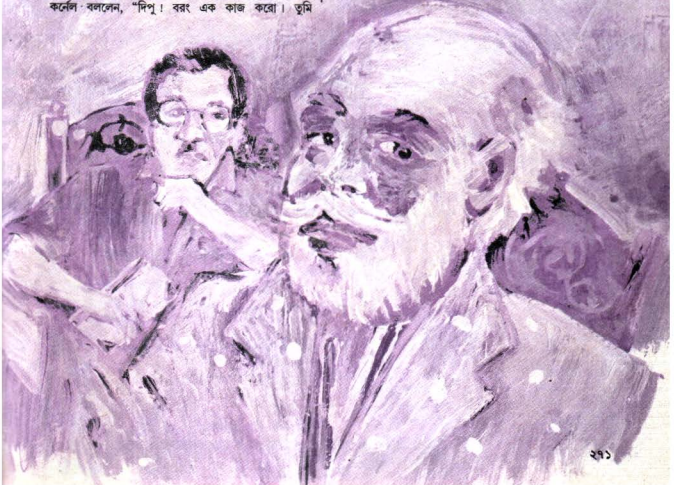
ভিভা পাওয়ার
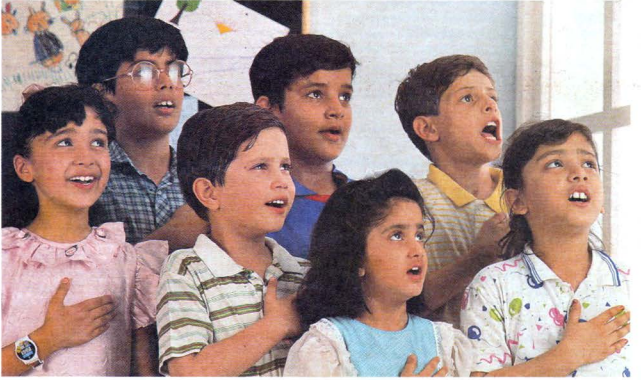
এ হ'লো ক্রীমে ভরা দুধ, ৮ টি জরুরী ভিটামিন, মল্ট ও প্রোটীনের অনন্য পুষ্টি পাওয়ার।

ক্রীমে ভরা দুধের পাওয়ার

দুধের যাবতীয় পুষ্টি গুণ... আপনি পাচ্ছেন ভিভা থেকে। দুধ দিয়ে তৈরী ভিভা, ক্যালসিয়াম এবং দুধের প্রোটীনে ভরপুর যা আপনার বাচ্চার শক্ত দাঁত, হাড় তথা সর্বাত্মক পুষ্টিবিধানে অতুলনীয়।

৮ টি জরুরী ভিটামিনের পাওয়ার

ভিভা ৮টি অত্যাবশ্যক ভিটামিনে সমৃদ্ধ। যেমন, ভিটামিন এ, বি১, বি২, বি১২, সি, ডি, ফোলিক অ্যাসিড, নিয়াসিন। কাজেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনার বাচ্চার শরীরে রোগ ও ক্লান্তির মোকাবিলা করার শক্তির অভাব হবেনা। স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা ওকে ঘিরে থাকবে সর্বক্ষণ।

মল্ট ও প্রোটীন পাওয়ার

ভিভা স্বাস্থ্যকর বার্লি ও গমের মল্ট ও প্রোটীনের পুষ্টিগুণে ভরপুর। আজকে বাচ্চাদের পক্ষে যার অর্থ একটি সুস্বা স্বাস্থ্য-পানীয়তেই আরো বেশি স্ট্যামিনা। আরো বেশি সুস্বাস্থ্য। আপনার বাচ্চাকে দিন ভবিষ্যতের শক্তি। ওকে দিন ভিভা আজ থেকেই।

নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন পাওয়ার

ষষ্ঠীচরণ দীপকের জন্য কফি আর স্ন্যাক্স দিয়ে গেল। কর্নেল বললেন, "ভজুয়ার বয়স কত? কতদিন তোমাদের বাড়িতে ছিল সে?"

দীপক বলল, "বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। ওরা পুরুষানুক্রমে আমাদের ফ্যামিলিতে ছিল। জমিদার ফ্যামিলিতে যেমন হয়। একগাদা লোকজন থাকে। অবশ্য এখন আর নেই। ভজুয়া কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী লোক ছিল। ভূতপ্রেতের গল্প বলত বটে, বিশ্বাস করত বলে মনে হয় না। আমার ছেলেবেলায় ওর বউ মারা যায়। কিন্তু ও আর বিয়ে করেনি। আমার অবাক লাগছে, ওর মতো সাহসী আর বলবান লোককে কী করে বলি দিতে পারল?"

"তুমি কি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করো?"

"নাহ্। ওসব স্রেফ গুলতাপ্পি। ঠাকুরদা কী সব বোগাস গপ্প ফেঁদে গেছেন, আমি একটুও বিশ্বাস করি না। বাবাও বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু হঠাৎ দু-দুটো নরবলির ঘটনা। তারপর পাতালঘর থেকে সিন্দুকের তালা ভেঙে কে কঙ্কাল সরাল। তাই বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কর্নেল! পাতালঘরের কথা আমি ঠাকমার কাছে শুনেছিলাম। কিন্তু সিন্দুকে যে কঙ্কাল আছে, তা জানতাম না। নরবলির ঘটনার পর এক রাত্রে বাবা আমাকে আর ভজুয়াকে ডেকে চুপিচুপি পাতালঘরে ঢুকলেন। পাতালঘরের দরজার তালা কিন্তু ভাঙা ছিল না। গতকাল সন্ধ্যায় বাবা আপনার কাছে সব কথা খুলে বলেননি।"

"হয়তো কঙ্কগড়ে গেলে বলবেন ভেবেছিলেন।"

দীপক চাপা গলায় বলল, "সিন্দুকের ভেতর কঙ্কাল সত্যিই ছিল কি? আমার বিশ্বাস হয় না। অতকালের পুরনো কঙ্কাল। আস্ত থাকার কথা নয়। অথচ সিন্দুকে একটুকরো হাড়ও পড়ে নেই।"

"ভজুয়াকে কেউ ওভাবে খুন করবে কেন? তোমার কী ধারণা?"

দীপক একটু চুপ করে থাকার পর বলল, "সম্ভবত ভজুয়া কিছু জানত। তার মানে, শচীনদা আর জগাইকে কে বা কারা ওভাবে খুন করেছে, সে জানতে পেরেছিল। কারণ জগাই খুন হওয়ার পর ভজুয়া আমাকে বলেছিল, খামোকা একজন সাধুসন্ন্যাসী মানুষের বদনাম রটাচ্ছে লোকে। তাঁর আত্মা স্বর্গে বাস করছেন ভগবানের কাছে। ভজুয়া বলেছিল, শিগগির সে এর বিহিত করবে।"

"ভজুয়া বলেছিল?"

"হ্যাঁ। দাদুর জ্যাঠামশাই সম্পর্কে ভজুয়ার খুব শ্রদ্ধা ছিল। তার ঠাকুরদার বাবা নাকি ওঁর সেবা করত।" দীপক হঠাৎ একটু নড়ে বসল। "মনে পড়ে গেল! গত মাসে দোতলা থেকে অনেক রাতে আমি ঝিলের ধারে জঙ্গলের ভেতর আলো দেখেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে আমি তো আসানসোলে পড়াশোনা করেছি। কঙ্কগড়ে সবসময় থাকিনি। তো সকালে মাকে কথাটা বললাম। মা বললেন, ওই জঙ্গলে আলো নতুন কিছু নয়। মা-ও নাকি অনেকবার দেখেছেন। আমি কিন্তু এতকাল পরে ওই একবার।"

বললাম, "কিসের আলো? মানে— টর্চ না হারিকেন?"

"না। মশালের আলো বলে মনে হয়েছিল।"

কর্নেল চোখে হেসে বললেন, "প্রেতাত্মারা টর্চ বা হারিকেন জ্বালে না জয়ন্ত!"

দীপক বলল, "আপনি কি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন?"

"প্রকৃতিতে রহস্যের শেষ নেই দিপু!"

দীপক যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমি চলি তা হলে।"

"আচ্ছা, এসো।"

দীপক বেরিয়ে গেলে বললাম, "কঙ্কগড়ের সাঙ্ঘাতিক ভূতটা আপনাকে পেয়ে বসেছে মনে হচ্ছে। ভূত বা প্রেতাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির কী সম্পর্ক?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "আছে। প্রকৃতি চির-আদিম। ভূতপ্রেতও আদিম শক্তি, ডার্লিং!"

॥ ২ ॥

কঙ্কগড়ে আমরা উঠেছিলাম সরকারি ডাকবাংলোয়। বাংলোটি পুরনো ব্রিটিশ আমলে তৈরি। গড়নে বিলিতি ধাঁচ। কিন্তু অযত্নের ছাপ আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। লনের ফুলবাগান আর চারপাশের দেশি-বিদেশি গাছপালা একেবারে জঙ্গুলে হয়ে গেছে। চৌকিদার রঘুলাল দুঃখ করে বলছিল, নতুন সার্কিট হাউস হওয়ার পর সরকারি কর্তারা এলে সেখানেই ওঠেন। সেখানে জায়গা না পেলে তবেই কদাচিৎ কেউ এখানে এসে জোটেন। আসলে বসতি থেকে বেশ খানিকটা দূরে বলেই এই দুরবস্থা।

তবে নীচেই সেই বিশাল ঝিল এবং পাশেই জঙ্গলের শুরু। তার ওধারে একটা নদী আছে। তার মানে, একসময় ঝিলটি নদীর অববাহিকায় একটা স্বাভাবিক জলা ছিল। ইদানীং অনেকে একে 'লেক' বলতে শুরু করেছে। খনি অঞ্চলের শিল্পনগরী থেকে দল বেঁধে অনেকে পিকনিক করতেও আসে। রঘুলাল বলছিল, নরবলির পর পিকনিক বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অনেক আগে এদিকটা জনহীন হয়ে পড়ে। রঘুলালও সূর্যাস্তের আগে বাড়ি চলে যায়। তবে 'কর্নেলসার' যখন এসেছেন, তখন রাত্তিরটা এখানে কাটাতে তার ভয় নেই। এই সায়েবকে সে ভালই চেনে। এর আগে কতবার উনি এখানে এসেছেন।

আমরা পৌঁছেছিলাম বিকেল চারটে নাগাদ। আমাকে বিশ্রাম করতে বলে কর্নেল একা বেরিয়েছিলেন। বাংলোর বারান্দা থেকে লক্ষ করছিলাম, উনি বাইনোকুলারে পাখি-টাখি দেখতে-দেখতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেলেন। রঘুলাল একটা থামে হেলান দিয়ে বসে কঙ্কগড়ের গল্প করছিল। তান্ত্রিক আদিনাথের অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথাও বলছিল। আদিনাথের কঙ্কালের ধড় ও মুণ্ডের কাহিনীও তার জানা। ধড় ও মুণ্ড জোড়া লাগলে তান্ত্রিক আদিনাথ যে সশরীরে আবার আবির্ভূত হবেন, এটা সে বিশ্বাসও করে এবং তার ধারণা, এই কাজটা কেউ করতে পেরেছে এতদিনে। তাই তান্ত্রিকবাবা নিজের কাজে নেমে পড়েছেন।

বললাম, "কিন্তু তান্ত্রিকবাবা তো শুনেছি ১০৮টা নরবলি দিয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আবার কেন উনি নরবলি দিচ্ছেন?"

রঘুলাল বাংলা বলতে পারে বাঙালির মতোই। মাথা নেড়ে বলল, "না সার! ১০৮টা নরবলির আগে উনি নিজেই বলি হয়েছিলেন। শুনেছি, তিনটে নরবলি বাকি ছিল। এতদিনে হয়ে গেল।"

"এই লোক তিনটিকে তুমি চিনতে?"

"চিনব না কেন সার? প্রথমে বলি হলেন শচীনবাবু। উনি ম্যাজিক দেখাতেন।"

"ম্যাজিশিয়ান ছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতেন। তো তারপর গেল জগাই। জগাই শ্মশানে মড়া পোড়াত। শেষে গেল ভজুয়া। জমিদারবাড়ির কাজের লোক। জমিদারি আমাদের ছোটবেলায় উঠে গেছে। তা হলেও জমিদারবাড়ি নামটা টিকে আছে। খুব বড় বাড়ি সার! অনেক ভেঙেচুরে খণ্ডহর হয়ে পড়ে আছে। তবে দেখলে বোঝা যায় কী অবস্থা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝুন, তান্ত্রিকবাবা ছিলেন ওই জমিদারবাড়ির লোক। শুনেছি, বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে তপজপ নিয়েই পড়ে থাকতেন।"

এর পর রঘুলাল রামু রজক আর তার গাধার গল্পে চলে এল। একঘেয়ে উদ্ভট গল্প শোনার চেয়ে ঝিলের ধারে কিছুক্ষণ বেড়ানো ভাল। লনে নামলে রঘুলাল চাপা গলায় সাবধান করে দিল,

"আঁধার হওয়ার আগেই চলে আসবেন সার ! কর্নেলসারের কথা আলাদা। উনি মিলিটারির লোক।"

গেট পেরিয়ে ধাপবন্দি পাথরের সিঁড়ি। ফাটলে ঝোপ আর আগাছা গজিয়ে আছে। নীচের রাস্তা এবড়োখেবড়ো। রাস্তাটা এসেছে বাঁ দিক থেকে এবং এখানেই তার শেষ। ডান দিকে ছোট-বড় নানা গড়নের পাথর এবং ঝোপঝাড়, গাছপালা। সামনে একফালি পায়েচলা পথ নেমে গেছে ঝিলের ধারে। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা ভাঙাচোরা পাথুরে ঘাট। ঝিলের জলটা স্বচ্ছ। সূর্য পেছনে গাছপালার আড়ালে নেমে গেছে। তাই ঝিলে ছায়া পড়েছে। সামনে-দূরে ধূসর কুয়াশা। একটা পানকৌড়ি আপনমনে ডুবসাঁতার খেলছে। একটু দূরে দামের আড়ালে কোথাও জলপিপির ডাক শোনা গেল পি-পি-পি।

ঘাটের মাথায় বসে ছিলাম। কর্নেলের সংসর্গে মাথার ভেতর হয়তো প্রকৃতিপ্রেম ঢুকে গেছে। দিনশেষের এই ধূসর সময়টা সত্যি অনুভব করার মতো। জলমাকড়সার অবিশ্বাস্য গতিতে ছোটাছুটি, জলজ ফুলের ওপর টুকটুকে প্রজাপতি ও গাঙফড়িংয়ের ওড়াউড়ি, পাখপাখালির ডাক। সব মিলিয়ে জীবজগতের একটা আশ্চর্য স্পন্দন।

হঠাৎ পাশেই খুট করে একটা শব্দ। চমকে উঠে দেখি, এক টুকরো ঢিল সদ্য গড়িয়ে পড়ছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তন্নতন্ন খুঁজলাম। কাউকেও দেখতে পেলাম না। ঢিলটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। গাডার দিয়ে ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ বাঁধা আছে। কাঁপা-কাঁপা হাতে কুড়িয়ে নিলাম। কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখি ডটপেনের লাল কালিতে লেখা আছে :

ওঁ

ওহে টিকটিকির চেলা ! কাল সকালেই কঙ্কগড় ছেড়ে না গেলে মা চণ্ডিকার পায়ে বলি হয়ে যাবে। বুড়ো টিকটিকিকে জানিয়ে দিয়ো। আজ রাতে প্রেতাত্মা পাঠিয়ে আগাম সঙ্কেত দেব। সাবধান !

হাতের লেখা আঁকাবাঁকা, খুদে হরফ। খুব ব্যস্তভাবে লেখা। চিরকুটটা পকেটে ভরে আবার কিছুক্ষণ চারপাশে খুঁটিয়ে দেখলাম। কেউ কোথাও নেই। ঝিলের পশ্চিম পাড় এটা। উত্তর-পূর্ব কোণে কঙ্কগড় বসতি এলাকা শুরু। প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে এদিকে-ওদিকে নজর রেখে বাংলোর নীচে পৌঁছলাম। গা ছমছম করছিল অজানা ত্রাসে। লোকটা কি আড়াল থেকে নজর রেখেছে ? আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর রিভলভার পকেটে ঢুকিয়ে দ্রুত বাংলোয় উঠে গেলাম। রঘুলাল আমাকে দেখে সুইচ টিপে বাতিগুলো জ্বেলে দিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "আপনি কি কিছু দেখে ভয় পেয়েছেন সার ?"

রুক্ষ মেজাজে বললাম, "নাহ্। কেন ?"

রঘুলাল বিনীতভাবে বলল, "আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে।"

"কিছুই দেখাচ্ছে না। তুমি শিগগির এক কাপ চা করো।"

কর্নেল ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। সহাস্যে বললেন, "রামুর গাধাটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ডার্লিং ! গাধাটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। ওকে বুঝিয়ে বললাম, দ্যাখো বাপু, এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। গাধাবলির বিধান শাস্ত্রে আছে বলে শুনিনি। তবে বলা যায় না।"

আস্তে বললাম, "ব্যাপারটা রসিকতা করার মতো নয়। রীতিমত বিপজ্জনক। এই দেখুন।"

কর্নেল চিঠিটা পড়ে নিয়ে বললেন, "কোথায় পেলে ?"

ঘটনাটা বললাম। শোনার পর কর্নেল একটু ব্যাজার মুখে বললেন, "লোকটা আমাকে টিকটিকি বলেছে, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট অপমানজনক। তুমি তো জানো জয়ন্ত, টিকটিকি কথাটা এসেছে ডিটেকটিভ থেকে। আমি লোকেদের কিছুতেই বোঝাতে পারি না, আমি ডিটেকটিভ নই এবং কথাটা আদতে গালাগাল।"

"আজ রাতে ভূত পাঠাবে বলে শাসিয়েছেও।"

"তা একটা কেন, একশোটা পাঠাক। কিন্তু টিকটিকি…ছিঃ !" বলে কর্নেল হাঁকলেন, "রঘুলাল !"

রঘুলাল কিচেন থেকে ট্রেতে কফির পট, পেয়ালা সাজিয়ে এনে টেবিলে রাখল। সেলাম দিয়ে বলল, "কর্নেলসাবকে আসতে দেখেই আমি কফি বানাতে গিয়েছিলাম।"

কর্নেল চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বললেন, "খবর পেয়েছি, আজ রাতে এ-বাংলোয় ভূত এসে হানা দেবে। তৈরি থেকো রঘুলাল।"

রঘুলাল কাঁচুমাচু হাসল। "কর্নেলসাব থাকতে ভূতপেরেত ডাকবাংলোর কাছ ঘেঁষতে সাহস পাবে না। কিন্তু সার, একটু আগে আমার মেয়ে দুলারি এসেছিল। বলল, ওর মায়ের খুব জ্বর। আমি ওকে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে বললাম। তো…"

কর্নেল হাত তুলে বললেন, "না, না ! তুমি বাড়ি চলে যেয়ো। রাতের খাবারটা বরং এখনই তৈরি করে রাখো। আমরা খেয়ে নেব'খন।"

রঘুলাল হন্তদন্ত কিচেনের দিকে চলে গেল। বললাম, "রঘুলাল আসলে কেটে পড়তে চাইছে। ওর মেয়ের এসে মায়ের জ্বরের খবর দেওয়াটা স্রেফ মিথ্যা।"

"কেন বলো তো ?"

"ওর মেয়ে এলে টের পেতাম।"

"তুমি কিছুই টের পাও না, জয়ন্ত !" কর্নেল হাসলেন। তারপর টেবিলে রাখা বাইনোকুলারটি দেখিয়ে বললেন, "এই যন্ত্রচোখ দিয়ে ফ্রকপরা একটি বাচ্চা মেয়েকে বাংলোর লনে আমি দেখেছি। অবশ্য তোমাকে দেখতে পাইনি। কারণ বাংলোটা উঁচুতে। তুমি নীচে ঝিলের ধারে ছিলে। ওখানে যথেষ্ট ঝোপঝাড়। তবে তোমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তান্ত্রিক হরনাথের প্রেতাত্মা ধারালো খাঁড়া হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

কর্নেল কফি শেষ করে ঘরে ঢুকলেন। সত্যি বলতে কি, একা বারান্দায় বসে থাকতে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি, কর্নেল টেবিলবাতির আলোয় একগোছা অর্কিড খুঁটিয়ে দেখছেন। বোঝা গেল, জঙ্গলে কোথাও সংগ্রহ করেছেন। আমাকে সেই অর্কিডটার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে শুরু করলে বললাম, "ওসব পরে শুনব। রঘুলালের কাছে কিছু তথ্য জোগাড় করেছি। অর্কিডের চেয়ে সেগুলো দামি।"

"কী তথ্য ?"

"শচীনবাবু ছিলেন ম্যাজিশিয়ান। আর জগাই ছিল শ্মশানের…।"

"হুঁ, ম্যাজিশিয়ানদের বলা হয় জাদুকর। জাদুর সঙ্গে নাকি তন্ত্রমন্ত্রের সম্পর্ক আছে। আবার তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে তান্ত্রিক এবং তান্ত্রিকের সঙ্গে শ্মশানের সম্পর্ক আছে। কাজেই তোমার তথ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শাস্ত্রীমশাই, মানে দিপুর বাবার কাছে সে-খবর আমি কলকাতায় বসেই পেয়ে গেছি।"

চাপা গলায় বললাম, "যা-ই বলুন, এই রঘুলাল লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছে না। খুব ধূর্ত। আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া ঝিলের ঘাট থেকে বাংলোয় ফেরার সময় কী করে ও টের পেল আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি ? বলল, আপনি কি ভয় পেয়েছেন ? আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে…!"

"তোমাকে এখনও কেমন যেন দেখাচ্ছে, ডার্লিং !" কর্নেল মুচকি হেসে বললেন। "ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না যারা, ভূতপ্রেতের ভয় তাদেরই বেশি। বিশেষ করে ভূতের চিঠি ভূতের চেয়ে সাঙ্ঘাতিক।"

চটে গিয়ে বললাম, "ভূতপ্রেত হুমকি দিয়ে চিঠিটা লেখেনি।

লিখেছে কোনও মানুষ।"

"হুঁ, মানুষ। সেই মানুষকে সম্ভবত তান্ত্রিক আদিনাথের ভূত ভর করেছে।"

রসিকতা শোনার মেজাজ ছিল না। তবে বরাবর এটা লক্ষ করেছি, রহস্য যত জটিল এবং সাঙ্ঘাতিক হয়, আমার বৃদ্ধ বন্ধুটিকে রসিকতা তত বেশি ভূতের মতো ভর করে। বিছানায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিলাম। ট্রেন আর বাসজার্নির ধকল এতক্ষণে পেয়ে বসেছিল। একটু পরে লক্ষ করলাম, কর্নেল পকেট থেকে একটুকরো ভাঙা চাকতির মতো কী একটা ছোট্ট জিনিস বের করলেন। তারপর কিট্‌ব্যাগ থেকে খুদে একটা ব্রাশ আর লোশনের শিশিও বেরোতে দেখলাম। চাকতিটার আধখানা চাঁদের মতো গড়ন। লোশনে ব্রাশ চুবিয়ে ঘষতে থাকলেন কর্নেল। জিজ্ঞেস করলাম, "জঙ্গলে মোহর কুড়িয়ে পেয়েছেন বুঝি ?"

কর্নেল আনমনে বললেন, "মোহরের ভাঙা টুকরো বলতেও পারো। তবে সোনার নয়। সেকেলে মুদ্রাও নয়। কী সব খোদাইকরা সিলের টুকরো। কাদা ধুয়ে ফেলেও কিছু বুঝতে পারিনি। দেখা যাক।"

কিছুক্ষণ পরে রঘুলালের সাড়া পাওয়া গেল। ওর হাতে টর্চ আর লাঠি দেখলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, "সব রেডি রইল সার ! কিচেনঘরের চাবিটা দিয়ে যাচ্ছি। আমি ভোর ছ'টায় এসে যাব।"

কর্নেলের ইশারায় ওর হাত থেকে কিচেনের চাবি নিয়ে এলাম। ও চলে গেল। কর্নেল ভাঙা সিলটা আতশ কাচে দেখতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "গুপ্তযুগের সিল নাকি ?"

"কী ? গুপ্তযুগ ?" কর্নেল নিঝুম সন্ধ্যারাতের পুরনো ডাকবাংলোর স্তব্ধতা ভাঙচুর করে অট্টহাসি হাসলেন। "হুঁ, ওই এক পুরাতাত্ত্বিক বাতিক জয়ন্ত ! মাটির তলায় কিছু পাওয়া গেলেই সটান গুপ্তযুগ। তার আগে বা পরে নয়। তবে এটাই আশ্চর্য ! এটা পুরো একটা সিলের আধখানা মাত্র। সিলটা আধখানা কেন, এটাই প্রশ্ন।"

এই সময় আচমকা বাংলোর আলো নিভে গেল। কর্নেল তখনই টর্চ জ্বেলে বললেন, "ফায়ারপ্লেসের ওপর থেকে হারিকেনটা এনে জ্বেলে দাও, জয়ন্ত ! লোডশেডিং প্রেতাত্মাকে বাংলোয় আসার সুযোগ দিতে পারে। কুইক !" তাঁর কণ্ঠস্বরে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক। কিন্তু আমার গা ছমছম করতে লাগল।

ইংরেজ আমলের বাংলো। কাজেই ফায়ারপ্লেস আছে। ঝটপট হারিকেন জ্বেলে এনে টেবিলে রাখলাম। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম। কর্নেল বললেন, "চলো ! বরং বারান্দায় বসে জ্যোৎস্নায় প্রকৃতিদর্শন করা যাক।"

বেরিয়ে গিয়ে দেখি সুন্দর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। ঝিলের জল ঝিলমিল করছে। গাছপালা তোলপাড় করে বাতাস বইছে। সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি আবার ফিরে এল। ভয়ের চোখে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছিলাম। হাতে টর্চ এবং পকেটে রিভলভার তৈরি। আস্তে বললাম, "সত্যি লোডশেডিং, নাকি কেউ মেইন সুইচ অফ করেছে দেখে আসা উচিত। কারণ ওই তো দূরে আলো দেখা যাচ্ছে।"

কর্নেল বললেন, "ছেড়ে দাও ! জ্যোৎস্নায় পুরনো পৃথিবীকে ফিরে পাওয়া যায়। তা ছাড়া জ্যোৎস্নার একটা নিজস্ব সৌন্দর্যও আছে। কোন কবি যেন লিখেছিলেন, 'এমন চাঁদের আলো/ মরি যদি সে-ও ভাল/ সে-মরণ স্বরগ-সমান'।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "মৃত্যুটা প্রেতাত্মার হাতে হওয়া বড্ড অপমানজনক। আমরা মানুষ।"

"ডার্লিং! তা হলে দেখছি এই আদিম পরিবেশ তোমাকে প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী করতে পেরেছে।"

"বোগাস! আমি আসলে বলতে চাইছি..."

"বলার আগে দেখে নাও। ওই দ্যাখো, ডান দিকে ঝোপের আড়ালে প্রেতাত্মা উঁকি দিচ্ছে!"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে সেইদিকে টর্চের আলো ফেললাম। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বোধবুদ্ধি হারিয়ে গেল। দক্ষিণ-পশ্চিমের ঢালের মাথায় উঁচু ঝোপজঙ্গল। একখানে ঝোপ থেকে মুখ বের করে আছে সত্যিই একটা কঙ্কাল। খুলি থেকে কাঁধ অবধি দেখা যাচ্ছে।

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চ টেবিলে রেখে রিভলভার বের করে ছুঁড়লাম। কর্নেল আমার কাঁধ ধরে নাড়া দিলেন। "জয়ন্ত! জয়ন্ত! করছ কী?"

এবার টর্চ জ্বেলে দেখি কঙ্কাল অদৃশ্য। উত্তেজিতভাবে বললাম, "অবিশ্বাস্য! অসম্ভব!"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, "সব ভেস্তে দিলে তুমি! আমাদের কাছে ফায়ারআর্মস আছে জেনে গেল প্রেতাত্মাটা। এবার ও খুব সাবধান হয়ে যাবে।"

বলে কর্নেল টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ চারদিকে আলো ফেলে তন্নতন্ন খুঁজে ফিরে এলেন। একটু হেসে বললেন, "যা ভেবেছি, তা-ই। একটা কথা বলি, ডার্লিং! এখানে কোথাও যা কিছু ঘটুক, কখনও মাথা খারাপ করে ফেলবে না। বিশেষ করে গুলি ছোঁড়াটা চলবে না।"

চটে গিয়ে বললাম, "বলি দিলেও চুপচাপ থাকব?"

"তোমাকে বলি দিয়ে ওর লাভ হবে না।"

"আপনাকে যদি চোখের সামনে বলি দেয়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখব?"

কর্নেল বারান্দায় বসে চুরুট জ্বেলে বললেন, "আমাকে বলি দেওয়ার সাহস ওর হবে না। কারণ আমার মনে হচ্ছে, ও আমাকে ভালই চেনে। কঙ্কগড়ে আমি তো এই প্রথম আসছি না।"

হেঁয়ালি করা কর্নেলের এক বিরক্তিকর অভ্যাস। তাই চুপ করে গেলাম। একটু পরে নীচের দিকে মোটরসাইকেলের শব্দ শোনা গেল। আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছিল। গেটের নীচের রাস্তায় এসে মোটরসাইকেলটা থামল। তারপর টর্চের আলোয় দীপককে আসতে দেখলাম।

তার হাতেও টর্চ ছিল। বারান্দায় এসে বলল, "আলো নেই কেন কর্নেল? সার্কিট হাউসে আলো দেখে এলাম। ওখানে আলো থাকলে এখানেও থাকার কথা।"

"সম্ভবত প্রেতাত্মা মেইন সুইচ অফ করে দিয়ে গেছে।" কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন। "দিক না। জ্যোৎস্না আজকাল দুর্লভ হয়ে উঠেছে। যাই হোক, আমরা এখানে উঠেছি কী করে জানলে?"

দীপক হাসল। "কিছুক্ষণ আগে রামু পাগলা— মানে সেই রামু বাবার কাছে গিয়েছিল। বিকেলে ঝিলের জঙ্গলে ওর গাধার খোঁজে গিয়ে নাকি আড়াল থেকে দেখেছে, এক দাড়িওয়ালা সায়েব ভূত ওর গাধার সঙ্গে কথা বলছেন। দেখেই সে পালিয়ে এসেছে। আপনি তো শুনেছেন, বাবার কোবরেজি বাতিক আছে। রামুকে রোজ সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক কী সব পাচন গেলাচ্ছেন। রামু লক্ষ্মীছেলের মতো রোজ তিনবেলা বাবার কাছে পাচন গিলতে যায়। তো বাবা আমাকে খোঁজ নিতে বললেন, আপনি এই ডাকবাংলোয় উঠেছেন কি না। কারণ এই বাংলোটা ঝিল আর জঙ্গলের কাছেই।"

"আমাদের হালদারমশাইয়ের খবর কী?"

"ওঁকে নিয়ে প্রবলেম। সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি। গতকালও তা-ই। রাতদুপুরে ফিরেছিলেন। আজ কখন ফেরেন কে জানে!"

"কতদূর এগোলেন, কিছু বলেছেন তোমাকে?"

"ঠাকুরদার জ্যাঠামশাইয়ের খুলি কোথায় পোঁতা ছিল, সেই জায়গাটা নাকি খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আপাতত আমাকে জায়গাটা দেখাতে চান না। যথাসময়ে দেখাবেন। দ্যাটস্ মাচ্।" দীপক উঠে দাঁড়াল। "মেইন সুইচটা দেখে আসি। এভাবে বসে থাকার মানে হয় না।"

"থাক দিপু! পরে আলো জ্বালা হবে। তুমি গিয়ে দ্যাখো, হালদারমশাই ফিরলেন কিনা। ওঁর জন্য একটু চিন্তা হচ্ছে। গোয়েন্দা হিসাবে পাকা। পুলিশের প্রাক্তন দারোগা। দুর্দান্ত সাহসী। তবে বড্ড হঠকারী মানুষ। আর শোনো, আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে যোগাযোগ কোরো না। দরকার হলে আমিই করব। বাবাকে বোলো, আমরা খাসা আছি। প্রেতাত্মা-দর্শনেরও সৌভাগ্য হয়েছে।"

দীপক চমকে উঠল, "মাই গুডনেস! প্রেতাত্মা মানে?"

"ভূত। দিপু, তুমি এখনই কেটে পড়ো।"

দীপক হেসে ফেলল। তারপর, "ঠিক আছে, চলি।" বলে চলে গেল।...

॥ ৩ ॥

কিচেনের পাশে মেইন সুইচ সত্যি নামানো ছিল। আমার সন্দেহ রঘুলালই কাজটা করেছে। কিন্তু কর্নেল তা মানতে রাজি নন। রঘুলাল তাঁর চেনা লোক। অমন বিশ্বাসী লোক নাকি তিনি জীবনে দেখেননি। দুর্লভ প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি, অর্কিডের খোঁজে বহুবার কঙ্কগড়ে এসেছেন। রঘুলাল তাঁর সেবাযত্নের ত্রুটি করেনি। তাঁর সঙ্গী হয়েও ঘুরেছে।

তবে লোকটি পাকা রাঁধুনি, স্বীকার না করে পারলাম না। খাওয়ার পর বারান্দায় কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে যখন শুয়ে পড়লাম, তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। আমার ঘুম আসছিল না। কর্নেল কিন্তু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। জানলার দিকে তাকাতে আমার ভয় করছে। এই বুঝি তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল এসে উঁকি দেবে!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কর্নেলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চাপা স্বরে বললেন, "উঠে পড়ো ডার্লিং! শিগগির!"

ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম, "সকাল হয়ে গেল নাকি?"

"নাহ্। রাত দেড়টা বাজে। এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার। ওঠো, ওঠো!"

"কোথায়?"

"বাইরে গিয়ে দ্যাখো। তা হলেই বুঝতে পারবে।"

দরজা কর্নেলই খুলে রেখেছেন। বাংলোর লনে আলো পড়ে আছে। তার ওধারে আদিম প্রকৃতি। ঝিলের দক্ষিণে জঙ্গলের ভেতর একটা আলো চোখে পড়ল। আলোটা নড়াচড়া করছে। বললাম, "দীপক এই আলোর কথাই বলেছিল তা হলে!"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। এই সেই আলো। ঝটপট রেডি হয়ে নাও। টর্চ, ফায়ারআর্মস সঙ্গে নেবে। কিন্তু সাবধান! আলো জ্বালবে না বা মাথা খারাপ করে গুলি ছুঁড়বে না।"

কর্নেল তৈরি হয়েই ছিলেন। আমি তৈরি হয়ে বেরোলে দরজায় তালা এঁটে দিলেন। তারপর দু'জনে গেট পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচের রাস্তায় নামলাম। এবার কর্নেল আগে, আমি পেছনে। বনবাদাড় ভেঙে কর্নেল হাঁটছেন। আমি ওঁকে অনুসরণ করে চলেছি। জ্যোৎস্নার জন্য জঙ্গলের ভেতরটা মোটামুটি স্পষ্ট। কোথাও চকরাবকরা, কোথাও ঘন ছায়া। শনশন করে বাতাস বইছে। কর্নেল যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, বুঝতে পারলাম, এই জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি ওঁর পরিচিত। সেই আলোটা কখনও-কখনও আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। আলোটা জ্বলছে ঝিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে একটা ধ্বংসস্তূপ। কর্নেল গুড়ি মেরে দুটো জঙ্গলে-ঢাকা স্তূপের মাঝখান দিয়ে এগোলেন। ফিসফিস করে বললেন, "চুপচাপ এসো। টুঁ শব্দটি নয়।"

খানিকটা এগিয়ে একটা উঁচু প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় গেলাম দু'জনে। প্রকাণ্ড সব ঝুরি নেমেছে বটগাছটার। একটা ঝুরির আড়ালে কর্নেল বসে পড়লেন। আমিও বসলাম। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানেই একটা মশাল মাটিতে পোঁতা আছে। দাউদাউ জ্বলছে।

আর মশালের পাশে দঁড়িয়ে বিকট অঙ্গভঙ্গি করছে সেই নরকঙ্কালটা। মশালের পেছনে একটা ভাঙা পাথুরে দেওয়াল। দেওয়ালে কঙ্কালটার ছায়াও নড়ছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন, এ এমন একটা দৃশ্য।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কঙ্কালের দু' হাতের মুঠোয় একটা চকচকে খাঁড়া। একটু তফাতে একটা হাড়িকাঠ পোঁতা আছে। তার পাশে একটা লোক আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। কঙ্কালটা খাঁড়া নাচিয়ে খ্যানখেনে গলায় বলে উঠল, "এখনও বলছি ওটা কোথায় আছে বল। না বললেই বলি হয়ে যাবি।"

বন্দি লোকটা গোঁ-গোঁ করে কী বলার চেষ্টা করল। পারল না।

কঙ্কালটা হুঙ্কার দিল। "ন্যাকামি হচ্ছে? তুই আমার খুলির সমাধি খুঁড়ছিলি। তুই, তুই ওটা পেয়েছিস। দে বলছি!"

বন্দি লোকটা আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল। তখন কঙ্কালটা এক পা বাড়িয়ে খাঁড়া তুলে তেমনই খ্যানখেনে বিকট গলায় বলে উঠল, "তবে মর!"

এর পর আমার মাথার ঠিক রইল না। কর্নেলের নিষেধ ভুলে গেলাম। চোখের সামনে নরবলি হবে! আস্ত একটা ভূত মানুষের গলায় কোপ বসাবে! এ সহ্য করা যায়? এক লাফে বেরিয়ে গিয়ে রিভলভার তুলে গর্জে উঠলাম, "নিকুচি করেছে ব্যাটাচ্ছেলে ভূতের!"

অমনই কঙ্কালটা শূন্যে ভেসে পেছনের পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাড়া করতে যাচ্ছি, কর্নেল ডাকলেন, "জয়ন্ত! জয়ন্ত! কী পাগলামি করছ?"

খাপ্পা হয়ে বললাম, "পাগলামি আমি করছি, না আপনি? চোখের সামনে একটা মানুষকে একটা ভূত ব্যাটাচ্ছেলে বলি দেবে..."

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "প্রেতাত্মার পেছনে তাড়া করে লাভ নেই, ডার্লিং! বরং এসো, আমরা হালদারমশাইয়ের বাঁধন খুলে দিই।"

আকাশ থেকে পড়ে বললাম, "উনি হালদারমশাই? কী সর্বনাশ!"

কর্নেল মশালটা উপড়ে এনে বন্দি হালদারমশাইয়ের কাছে পুঁতলেন। মশালটা তৈরি করা হয়েছে একটা ত্রিশূলে। টর্চের আলোয় গোয়েন্দা ভদ্রলোকের দুর্দশা দেখে কষ্ট হল। দড়ির বাঁধন খুলে দেওয়ার পর উনি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। খি-খি করে একচোট হেসে বললেন, "বলি দিত না। ভয় দ্যাখাইতাছিল।"

কর্নেল টর্চের আলো জ্বেলে সেই ভাঙা দেওয়ালের কাছে কিছু তদন্ত করতে গেলেন। আমি বললাম, "হালদারমশাই! কঙ্কালটার হাতে খাঁড়া ছিল। সে সত্যি আপনার গলায় কোপ বসাতে যাচ্ছিল।"

"ক্কী? কঙ্কাল?" হালদারমশাই পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন। "কই কঙ্কাল? কোথায় দেখলেন কঙ্কাল?"

খাপ্পা হয়ে বললাম, "আপনার চোখের সামনেই তো..."

গোয়েন্দাভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, "নাহ্। একজন সাধুবাবা। কাপালিক কইতে পারেন। তারে ফলো করে আসছিলাম। হঠাৎ সে গাছের উপর থেকে জাম্প দিল। ওঃ! কী সাঙ্ঘাতিক জোর তার গায়ে মশাই!"

"কিন্তু আমরা দেখলাম একটা কঙ্কাল খাঁড়া হাতে আপনাকে শাসাচ্ছে।"

"ভুল দ্যাখছেন!" বলে হালদারমশাই প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালেন। আবার একচোট হেসে বললেন, "আমার ফায়ারআর্মস আছে টের পায় নাই।"

"তা হলে কোনও কঙ্কাল আপনি দেখেননি?"

"নাহ্।"

"কিন্তু সে আপনার সঙ্গে কথা বলছিল। শাসাচ্ছিল।"

"কাপালিক! কাপালিক!"

কর্নেল এসে বললেন, "কঙ্কালটাকে হালদারমশাই দেখতে পাননি। কারণ ওঁকে ওপাশে কাত করে ফেলে রেখেছিল। উনি ভাবছিলেন, যে-কাপালিক ওঁকে ধরেছে, সে-ই কথা বলছে।"

হালদারমশাই নস্যির কৌটো বের করে নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, "কর্নেল সার! জয়ন্তবাবু কঙ্কালের কথা বলছেন। কিছু বুঝতে পারতাছি না। আপনি বুঝাইয়া দেন, এখানে স্কেলিটন আইল ক্যামনে?"

"পরে বুঝিয়ে দেব। এদিকটায় ঝিলের একটা ঘাট আছে। চলুন ঝিলের জলে, ঘাড়ে আর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেবেন। ব্রেন ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

কর্নেল মশালটা মাটিতে ঘষটে নেভালেন। তারপর ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। এখানেও একটা ভাঙাচোরা পাথুরে ঘাট। হালদারমশাই রগড়ে হাত-মুখ ধুলেন। কাঁধে জলের ঝাপটা দিলেন। তারপর বললেন, "ওই যাঃ! জুতা! হোয়্যার আর মাই শুজ? অ্যান্ড মাই টর্চ?"

কর্নেল হাসলেন। "দেখলেন তো? জল আপনার ব্রেন কেমন চাঙ্গা করে দিয়েছে।"

হালদারমশাইয়ের জুতো দুটো ওপাশে একটি ভাঙা মন্দিরের তলায় অনেক খোঁজার পর পাওয়া গেল। কিন্তু টর্চটা পাওয়া গেল না। এদিকটায় একসময় দালানকোঠা ছিল বোঝা যাচ্ছে। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলে বললেন, "হ্যাঁ। এখানেই কঙ্কগড়ের রাজবাড়ি ছিল। এখন জঙ্গল। মুঘল আমলের একটা গড়ও ছিল। সেটা এই জঙ্গলের দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখন একটা ঢিবিমাত্র। যাই হোক, আর এখানে নয়। বাংলোয় ফেরা যাক।"

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, "টর্চটা গেল। কাপালিকেরই কাজ।"

কর্নেল বললেন, "কাপালিক আপনার টর্চ কুড়নোর সময় পায়নি। কাল সকালে এসে বরং ভাল করে খুঁজবেন।"

আমরা কয়েক পা এগিয়েছি, হঠাৎ পেছন থেকে একঝলক টর্চের আলো এসে পড়ল। তারপর দীপকের সাড়া পেলাম। "কর্নেল! আমি দিপু।"

হালদারমশাই ঘুরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললেন, "এসো ভাগনে! এসো, মামা-ভাগ্নে একসঙ্গে বাড়ি ফিরব।"

দীপক প্রায় দৌড়ে এল। উত্তেজিতভাবে বলল, "জঙ্গলে আলো দেখতে পেয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে। তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। জঙ্গলে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা বিকট হাসি শুনলাম। টর্চ জ্বেলে দেখি..."

কর্নেল বলে উঠলেন, "কঙ্কাল?"

"হ্যাঁ। আস্ত কঙ্কাল।" দীপকের হাতে একটা বল্লম দেখা গেল। সেটা তুলে সে বলল, "বল্লমটা তাক করতেই কঙ্কাল ভ্যানিশ! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না, কর্নেল! তবে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। কী করা উচিত ভাবছি, সেই সময় ঝিলের ঘাটে টর্চের আলো চোখে পড়ল। আপনাদের কথাবার্তা

শুনতেও পেলাম। আলোটা দেখেই কি আপনারাও এখানে এসেছিলেন ?"

"হ্যাঁ।" কর্নেল বললেন। "এবং আমরাও কঙ্কালটাকে দেখেছি।"

হালদারমশাই জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "আমি দেখি নাই। আমি একজন কাপালিক দেখছি। তারে ফলো করছিলাম।"

দীপক বলল, "কাপালিক ! বলেন কী মামাবাবু ?"

"হঃ ! কাল রাত্রেও তারে ফলো করছিলাম। চণ্ডীর মন্দিরের ওখানে ত্রিশূল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। আমার সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল। আবার আজও বহুক্ষণ ওত পেতে থেকে তারে দেখলাম। আজ আর মাটি খুঁড়ছিল না। তার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা ছিল।" বলে হালদারমশাই কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। "বোঁচকাটা গেল কই ? বোঁচকা লইয়া দৌড়নো সহজ নয়। বোঁচকায় কী থাকতে পারে বলুন তো কর্নেলসার ?"

কর্নেল বললেন, "কঙ্কাল থাকতেও পারে।"

দীপক বলল, "তা হলে ওটা কি ঠাকুরদার জ্যাঠামশাইয়ের সেই কঙ্কাল ?"

কর্নেল বললেন, "কিছু বলা যায় না। তবে আর এখানে নয়। বাংলোয় ফেরা যাক। দিপু, তুমিও এসো। মামাবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরবে।"

দীপক পা বাড়িয়ে নার্ভাস হেসে বলল,"ঠাকুরদার লেখা বইটার কথা তা হলে সত্যি ? কিন্তু কে ওই কাপালিক ?"

আমি বললাম, "সে যে-ই হোক, আপনাদের পাতালঘর থেকে সে কঙ্কাল চুরি করেছে। এবং কোথায় খুলি পোঁতা ছিল তাও অবিষ্কার করেছে। তারপর ধড়ের সঙ্গে মুণ্ডু জুড়েছে। প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করি বা না করি, এই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে।"

হালদারমশাই আনমনে বললেন, "আমি কঙ্কাল দেখলাম না ক্যান ?"

বললাম, "চোখে দেখেননি। তার বিদঘুটে কথাবার্তা কানে তো শুনেছেন।"

"হঃ।" বলে গুম হয়ে গেলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক।

ডাকবাংলোয় আবার আলো নেই। তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, আমাদের ঘরের দরজার তালা ভাঙা। কিচেনের দিকে গিয়ে দেখি, মেইন সুইচ আগের মতো অফ করা আছে। অন করে দিলাম। আলো জ্বলে উঠল। ঘরে ফিরে এসে দেখলাম, লণ্ডভণ্ড অবস্থা। কর্নেল তাঁর কিট্‌ব্যাগ গোছাচ্ছেন। হালদারমশাই বিড়বিড় করছেন, "চোর ! চোর ! কাপালিক না, চোর !"

দীপক আর আমি ওলটপালট বিছানা দুটো ঠিকঠাক করে ফেললম।আমার ব্যাগের জিনিসপত্র মেঝেয় ছত্রখান হয়ে পড়ে ছিল। গুছিয়ে নিলাম। কর্নেল একটু হেসে বললেন, "চোর বড্ড বোকা। তার এটুকু বোঝা উচিত ছিল, যা সে খুঁজতে এসেছে, তা বাংলোয় রেখে যাওয়ার পাত্র আমি নই। আসলে প্রথমে সে ধরেই নিয়েছিল জিনিসটা হালদারমশাইয়ের কাছে আছে। তাই ওঁকে বলিদানের ভয় দেখাচ্ছিল। আমরা গিয়ে পড়ার পর সে পালিয়ে গেল। কিন্তু তার মাথায় তখন খটকা বেধেছে। বলিদানের হুমকিতেও যখন জিনিসটা পাওয়া গেল না,তখন ওটা নিশ্চয় হালদারমশাইয়ের কাছে নেই। সম্ভবত আমার কাছেই আছে। অতএব আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে সে বাংলোয় এসে হানা দিয়েছিল।"

কর্নেল মেঝের দিকে তাকালেন। বললেন, "খালি পায়ে এসেছিল চোর। লাল সুরকির স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। হুঁ,একটুখানি জলকাদা ভেঙেই—মানে শর্টকাটে এসেছিল সে। যাই হোক, রাত তিনটে বাজে প্রায়। জয়ন্ত, তুমি কিচেনে গিয়ে কেরোসিনকুকার জ্বেলে,প্লিজ,একপট কফি করে ফেলো। কফি ! কফি এখন খুবই দরকার !"

দীপক বলল, "চলুন জয়ন্তদা ! আমি আপনাকে হেল্প করছি।"

রঘুলাল কাজের লোক। কিচেনে সব কিছু ঠিকঠাক রেখে গিয়েছিল। কফি তৈরির কাজটা আমিই করলাম। দীপক প্রহরীর মতো বল্লম আর টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে রইল। তার ভাবভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল, সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। পাওয়ারই কথা। ভয় কি আমিও পাইনি ? এই চর্মচক্ষে জ্যান্ত কঙ্কাল দর্শন আর তার বিকট খ্যানখেনে গলায় কথাবার্তা শোনা জীবনে একটা সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতা। কর্নেল ঠিকই বলেন, 'প্রকৃতির রহস্যের শেষ নেই। সভ্যতার আলোর তলায় আদিম রহস্যে ভরা অন্ধকার থেকে গেছে।'

কফি করতে-করতে হালদারমশাইয়ের দুর্দশার বিবরণ দিলাম দীপককে। দীপক হাসবার চেষ্টা করে বলল, "ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে।"

বললাম, "কর্নেলের মাথাতেও কম ছিট নেই।"

ট্রেতে কফির পট আর পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে এলাম। দীপক কিচেনে তালা এঁটে দিল। ঘরে ঢুকে দেখি, হালদারমশাই চাপা গলায় কর্নেলকে তাঁর তদন্ত রিপোর্ট দিচ্ছেন।

কফি খেতে-খেতে ক্রমশ চাঙ্গা হচ্ছিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। প্যান্ট-শার্টে লালচে দাগড়া-দাগড়া ছোপ। খি-খি করে হেসে বললেন, "কর্নেলসার কইলেন, যে দড়ি দিয়া আমারে বাঁধছিল, তা নাকি রামু রজকের গাধা বাঁধার দড়ি। ঠিক, ঠিক। তাই তো ভাবছিলাম, কাপালিক দড়ি পাইল কই ?"

রামু এবং তার গাধাকে নিয়ে কর্নেল হালদারমশাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ রসিকতার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "নাহ্‌ দিপু, এবার শুয়ে পড়া উচিত। তোমার মামাবাবুর ওপর বড্ড ধকল গেছে। ওঁর বিশ্রাম দরকার।"

"হঃ।" বলে হালদারমশাই উঠে দাঁড়ালেন।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। কর্নেল বললেন, "তা হলে ডার্লিং, তোমাকে যা বলেছিলাম..."

ওঁর কথার ওপর বললাম, "হ্যাঁ। রহস্য ঘনীভূত। কিন্তু কঙ্কাল যে জিনিসটা চাইছিল, সেটা কি ওই চাকতি ?"

"হ্যাঁ। ব্রোঞ্জের সিল।"

"কী আছে ওতে ?"

কর্নেল সেই ছড়াটা আওড়ালেন ঘুমঘুম কণ্ঠস্বরে :

আটঘাট বাঁধা
বার পনেরো চাঁদা
বুড়ো শিবের শূলে
আমার মাথা ছুঁলে
ওঁ হ্রীং ক্লীং ফট
কে ছাড়াবে জট ॥

তারপর ওঁর নাক-ডাকা শুরু হল। কয়েকবার ডেকে আর সাড়া পাওয়া গেল না ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এমন সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতার পর ঘুমনো যায় না। বারবার সেই দৃশ্যটা চোখে ভাসছিল। মশালের আলোয় ভাঙা দেওয়ালের ধারে একটা নরকঙ্কাল। দু'হাতে চকচকে খাঁড়া। তার ওই খ্যানখেনে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর।

কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল। তড়াক করে উঠে বসলাম। কর্নেলকে দেখতে পেলাম। মাথার টুপিতে শুকনো পাতা, মাকড়সার জাল, খড়কুটো আটকে আছে। হাতে প্রজাপতি ধরা নেট-স্টিক। গলায় ক্যামেরা এবং বাইনোকুলার ঝুলছে। বললেন, "দশটা বাজে প্রায়। ব্রেকফাস্ট রেডি। রঘুলালকে বলে গিয়েছিলাম, তোমাকে যেন যথেচ্ছ ঘুমোতে দেয়।"

উনি পোশাক বদলাতে ব্যস্ত হলেন। বুঝলাম, যথারীতি

ভোরবেলা প্রকৃতিজগতে চলে গিয়েছিলেন। তবে অনেক দেরি করেই ফিরেছেন আজ।

কিছুক্ষণ পরে ব্রেকফাস্টে বসে বললাম, "কঙ্কালের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যিই কি ওটা তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল ?" কর্নেল দাড়ি থেকে একটা পোকা বের করে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, "কাল রাতেই একটা বোঝাপড়া হয়ে যেত। কিন্তু তোমার হঠকারিতার জন্যই সব ভেস্তে গেল। তুমি যদি আমার কথা মেনে চুপচাপ থাকতে, আমাকে আর বেশি পরিশ্রম করতে হত না।"

"কী মুশকিল ! ব্যাটাচ্ছেলে হালদারমশাইয়ের গলায় খাঁড়ার কোপ চালাতে যাচ্ছিল যে।" কর্নেল আনমনে বললেন, "যা হওয়ার হয়ে গেছে। খেয়ে নিয়ে বেরনো যাক।"

"ওই ভুতুড়ে জঙ্গলে ?"

"নাহ। শ্মশানে।"

॥ ৪ ॥

কঙ্কাল দর্শনের পর শ্মশানযাত্রা ! যদিও দিনদুপুর, ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর। কর্নেলের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে বনবাদাড় ভেঙে যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে একটা নদী। নামেই নদী। বালি আর পাথরে ঠাসা অগভীর একটা সোঁতা। এঁকেবেঁকে ঝিরঝিরে একফালি কালো জল অবশ্য বয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা বটগাছের তলায় জীর্ণ কুঁড়েঘর। নদীর বালিতে গর্ত খুঁড়ে তিনটে কাচ্চাবাচ্চা হুল্লোড় করে কী খেলা খেলছে।

কর্নেল কুঁড়েঘরের কাছে গেলেন। এতক্ষণে ওপাশে একটা বাঁশের মাচা দেখতে পেলাম। মাচায় বসে আছে একটা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে। কষ্টিপাথরে খোদাই করা চেহারা যেন। পরনে হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া লাল গেঞ্জি। আমাদের দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কর্নেল মিঠে গলায় বললেন, "কী মশাই ? আমাকে চিনতে পারছ না ? গত বছর তুমি আমাকে জঙ্গলের গাছ থেকে কত অর্কিড পেড়ে দিয়েছিলে, মনে পড়ছে।"

মনাই নামে ছেলেটির মুখে একটু হাসি ফুটল। মাচা থেকে নেমে সেলাম দিয়ে বলল, "নদীর ওপারে একটা গাছে দেখেছি সার ! লাল-লাল পাতা।"

"তোমার বাবার খবর শুনে মন খারাপ হয়ে গেছে মনাই !"

মনাইয়ের মুখের খুশি চলে গেল। চোখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। বুঝলাম, মনাই সেই জগাইয়ের ছেলে। তার চোখ ছলছল করছিল।

কর্নেল বললেন, "তোমার মা কোথায় ?"

মনাই আস্তে বলল, "ঘাটোয়ারিবাবুর অফিসে গেছে। বাবার মাইনের টাকা বাকি আছে। বাবু রোজ ঘোরাচ্ছে মাকে।"

কর্নেল বাঁশের মাচায় সাবধানে বসলেন। পুরনো মাচা ওঁর ভার সইতে পারবে না মনে হচ্ছিল। উনি ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। ভয়ে-ভয়ে একপাশে বসলাম। কর্নেল বললেন, "জগাইয়ের এটা আড্ডা দেওয়ার আখড়া ছিল জয়ন্ত ! সন্ধেবেলা ওর কাছে কত লোক আড্ডা দিতে আসত। তাই না মনাই ?"

মনাই মাথা নাড়ল।

"মাঝে-মাঝে সাধুসন্ন্যাসীরাও এসে এখানে ধুনি জ্বালিয়ে বসতেন শুনেছি। জগাই বলছিল। তো তোমার বাবা খুন হওয়ার আগেও নিশ্চয় কোনও সাধুসন্ন্যাসী এসেছিলেন। ওই যে ! ধুনির ছাই দেখছি।"

মনাই একটু ইতস্তত করে বলল, "ম্যাজিকবাবুর সঙ্গে এক সাধু আসত সার ! চেহারা দেখলে ভয় করে। মাথায় জটা। লাল চোখ। মা বলছিল, ওই সাধুই প্রথমে ম্যাজিকবাবুকে চণ্ডীর থানে বলি দিয়েছে। তারপর বাবাকে।"

"ম্যাজিকবাবু মানে শচীন হাজরা ?"

মনাই মাথা দোলাল। বলল, "মা বলছিল, ওই সাধুই অজ্ঞান করে বাবাকে বলি দিয়েছে। বাবাকে যে-রাত্তিরে বলি দেয়, খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি জেগেই ছিলাম। মা বারবার ঘরের দোর ফাঁক করে বাবাকে ডাকছিল। বাবা এল না। শেষে জলঝড় থামলে মা লণ্ঠন হাতে এখানে এল। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে এল। বলল, দু'জনে ঠ্যাং ধরে টানতে-টানতে ঘরে ঢোকাব।"

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন, "বলো কী ! তারপর ?"

"এসে দেখি বাবা নেই। সাধু বসে আছে। মা সাধুবাবাকে ডাকাডাকি করল। সাধুবাবা চোখ বুজে মন্তর পড়ছিল। তাকালই না। তখন মা সাধুবাবাকে বকাঝকা করল। অনেকক্ষণ পরে সাধুবাবা চোখ কটমট করে বলল, 'জগাইকে একটা কাজে পাঠিয়েছি। তোরা ঘুমোগে যা' !"

"তোমরা ঘুমোতে গেলে ?"

মনাই ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে বলল, "হুঁ। তারপর আর বাবার পাত্তা নেই। সকালে একটা মড়া এল। ঘাটোয়ারিবাবুর লোক এক পাঁজা কাঠ মাথায় করে এল। বাবা নেই দেখে সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করল। সেই সময় রামু হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে খবর দিল চণ্ডীর থানে---"

মনাই ঢোক গিলে থেমে গেল। কর্নেল বললেন, "পুলিশ আসেনি তারপর ?"

"এসেছিল সার ! মা সব বলেছে পুলিশকে।"

"আচ্ছা মনাই, সেই সাধুবাবাকে আগে কখনও দেখেছ ? ভাল করে ভেবে বলো।"

"দেখিনি। তবে চেনা-চেনা মনে হয়েছিল।"

"ভজুয়াকে নিশ্চয় চিনতে তুমি ? সে-ও তো বলি হয়ে গেছে শুনেছি।"

"হ্যাঁ সার ! মা বলছিল এ-ও সাধুবাবার কাজ। সাধুবাবা নাকি মানুষ না। মানুষের রূপ ধরে এসেছিল।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথা দোলালেন। "ঠিক বলেছ মনাই ! শুনেছি সাধুবাবা আসলে একটা নরকঙ্কাল।"

মনাই চমকে উঠল। ভয়-পাওয়া মুখে বলল, "সার ! মা বলছিল, সাধুবাবার কাছে যেন একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়ে ছিল। আমি দেখতে পাইনি। মা নাকি দেখেছিল।"

"সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে ?"

মনাই জোরে মাথা দোলাল। কর্নেল ওর হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন। সে টাকাটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল। বলল, "চলুন সার ! সেই গাছ থেকে লালপাতার ঝুরি পেড়ে দেব।"

"ওবেলা আসব'খন। তো, ভজুয়া তোমার বাবার কাছে আড্ডা দিতে আসত না ?"

"আসত। আসত সার !"

"সাধুবাবা থাকার সময় ভজুয়া এসেছিল ?"

"হুঁউ।"

কর্নেল উঠলেন। বললেন, "ওবেলা আসব। তখন তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব। চলি !"

শ্মশানতলা থেকে একফালি পায়ে-চলা পথে পৌঁছে বললাম, "ছেলেটা বেশ স্মার্ট। এবং অত্যন্ত সরল।"

"প্রকৃতির মধ্যে যারা থাকে, তারা স্বভাবত সরল হয়। আর ওকে স্মার্ট বললে। সে-ও ঠিক। কারণ এখনই ওকে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই দিতে হবে। সম্ভবত এই বয়সেই ঘাটোয়ারিবাবু ওকে কাজে বহাল করবেন। তবে মড়াপোড়ানো কাজটা ওর পক্ষে কঠিন হবে না। বাবার সঙ্গে এই কাজটা ওকে করতে হয়েছে। আমি দেখেছি।"

"এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি ?"

"ম্যাজিকবাবুর বাড়ি।"

কঙ্কগড়ের এদিকটা চেহারায় একেবারে পাড়াগাঁ। গা-ঘেঁষাঘেঁষি মাটির বাড়ি, টালি বা খড়ের চাল। কিন্তু কয়েকটা বাড়ির মাথায় টিভি-র অ্যান্টেনা দেখে অবাক হলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা পিচের রাস্তায় উঠলাম। এর পর মফস্বল শহরের চেহারা। নতুন-পুরনো একতলা বা দোতলা বাড়ি। পিচ রাস্তায় ট্রাক, টেম্পো, জিপ, প্রাইভেট কার এবং সাইকেল রিকশার বিরক্তিকর আনাগোনা। মোড়ে একটা খালি সাইকেল রিকশার কাছে গেলেন কর্নেল। বললেন, "ওহে রিকশাওলা, এখানে ম্যাজিকবাবুর বাড়িটা কোথায় জানো?"

রিকশাওলা চমকে-ওঠা ভঙ্গিতে বলল, "ম্যাজিকবাবু? সে তো মা চণ্ডীর থানে নরবলি হয়ে গেছে সার!"

"বলো কী!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সে এক সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। কথায় বলে, বেদের মরণ সাপের হাতে। যে ভূতটাকে নিয়ে খেলা দেখাত, সেই ভূতটাই নাকি বলি দিয়েছে।"

"ভূত নিয়ে খেলা দেখাত ম্যাজিকবাবু? কেমন ভূত? তুমি দেখেছিলে ভূতের খেলা?"

রিকশাওলা দুঃখিত মুখে একটু হাসল। "দেখেছিলাম সার! নরকঙ্কাল ইস্টেজে এসে নাচত। ম্যাজিকবাবু বলত, ওঠ। উঠে দাঁড়াত। বোস, বললে বসত। নাচ, বললে নাচত। সে কী নাচ সার!"

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন, "ওর বাড়িটা কোথায়? নিয়ে চলো আমাদের।"

রিকশাওলা বলল, "ম্যাজিকবাবুর নিজের বাড়ি তো ছিল না সার! বাউণ্ডুলে লোক। মাঝে-মাঝে এসে থাকত। আবার চলে যেত কোথায়।"

"কিন্তু কার বাড়িতে এসে থাকত?"

"মোহনবাবুর বাড়িতে। ইস্কুলের মাস্টার উনি।"

"চলো। মোহনবাবুর কাছে যাওয়া যাক।" বলে কর্নেল রিকশায় উঠে বসলেন। ওঁর ইশারায় আমিও উঠে বসলাম।

রিকশাওলা বলল, "কিন্তু মাস্টারমশাই তো এখন ইস্কুলে আছেন।"

"ওঁর বাড়ি গিয়ে খবর দেব'খন। তুমি ওঁর বাড়িতেই নিয়ে চলো।"

"বাড়ি অবধি রিকশা যাবে না।"

"যতদূর যায়, নিয়ে চলো।"

রিকশাওলা অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে প্যাডেলে চাপ দিল। যেতে-যেতে বলল, "মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে কাউকে পাবেন না। মিছিমিছি হয়রান হবেন সার!"

কর্নেল বললেন, "কেন? বাড়িতে লোক নেই?"

"নাহ্। মাস্টারমশাই একা থাকেন। বিয়ে-টিয়ে করেননি। বিধবা দিদিকে এনে রেখেছিলেন। তিনিও স্বগ্‌গে গেছেন।"

"ম্যাজিকবাবুর সঙ্গে নিশ্চয় কোনও সম্পর্ক ছিল মাস্টারমশাইয়ের?"

"শুনেছি, পিসতুতো না মাসতুতো ভাই ওঁরা।"

পিচরাস্তা ছেড়ে খোয়াঢাকা এবড়ো-খেবড়ো ঘিঞ্জি গলি-রাস্তায় এগোচ্ছিল রিকশা। একসময় নিরিবিলি একটা জায়গায় পৌঁছলাম। কাছাকাছি বাড়ি নেই। শুধু জরাজীর্ণ ছোট-ছোট মন্দির আর পোড়ো ভিটে। জঙ্গল গজিয়ে আছে চারদিকে। সঙ্কীর্ণ রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে। একখানে রিকশা দাঁড় করিয়ে রিকশাওলা বলল, "আর যাওয়া যাবে না সার! এই যে পায়েচলা রাস্তা দেখছেন, সিধে গিয়ে বাঁ দিকে তাকাবেন। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি দেখতে পাবেন।"

আমরা নামলে সে রিকশা ঘুরিয়ে একটু হেসে বলল,

"মাস্টারমশাইকে খবর দেওয়ার লোক পাবেন কি দেখুন। বরঞ্চ আমাকে দুটো টাকা বাড়তি দিলে ইস্কুলে খবর দেব। আপনাদের ফেরত নিয়েও যাব।"

কর্নেল ওকে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, "দরকার নেই। আমি লোক খুঁজে নেব।"

রিকশাওলা এতক্ষণে সন্দিগ্ধমুখে আমাদের দিকে তাকাতে-তাকাতে রিকশার সিটে উঠল। তারপর কে জানে কেন, খুব জোরে রিকশা চালিয়ে চলে গেল। কর্নেল অভ্যাসমতো বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিয়ে বললেন, "এসো জয়ন্ত! কুইক! আমার ধারণা, রিকশাওলা মোহনবাবুকে যেচেপড়েই খবর দেবে, দু'জন উটকো লোক ওঁর বাড়িতে গেছে।"

পায়েচলা-পথে শুকনো পাতা পড়ে আছে। দু'ধারে পোড়ো ভিটে আর ভাঙাচোরা শিবমন্দির।ঘন ঝোপঝাড় আর উঁচু গাছপালা। পাখিদের তুমুল চ্যাঁচামেচি চলেছে।এলোমেলো জোরালো হাওয়া দিচ্ছে। বাঁ দিকে প্রায় হানাবাড়ির মতো দেখতে একটা একতলা বাড়ি দেখা গেল। সদর দরজায় তালা আঁটা। কর্নেল বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে গেলেন। ওঁকে অনুসরণ করলাম। ওদিকটায় একটা হাজামজা পুকুর দেখা গেল। কর্নেল আবার চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "তুমি এই ঝোপের আড়াল থেকে ওই রাস্তার দিকে লক্ষ রাখো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলে তিনবার শিস দেবে। বোকামি কোরো না কিন্তু! সাবধান!"

বাড়িটার পেছনের পাঁচিল জায়গায়-জায়গায় ধসে গেছে কবে।সেখানে ডালপালার বেড়া দেওয়া হয়েছে। একখানে বেড়া ঠেলে সরিয়ে কর্নেল ঢুকে গেলেন। বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে বাগিয়ে ধরলাম এবং গুঁড়ি মেরে বসলাম। রাস্তাটার দিকে নজর রাখলাম।

তারপর কর্নেলের আর পাত্তা নেই। বসে আছি তো আছিই। অস্বস্তি যত, বিরক্তিও তত। কতক্ষণ পরে পেছনে কোথাও শুকনো পাতার মচমচ শব্দ এল। দ্রুত পিছু ফিরে দেখি, পুকুরের দিকে নেমে যাচ্ছে একটা গাধা। তার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা। রামুর গাধাটা নয় তো?

গাধাটা অদৃশ্য হলে আবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে দেখি, কর্নেল যা বলেছিলেন, ঠিক তা-ই। সেই রিকশাটা এসে থামল। রিকশা থেকে রোগা চেহারার ধুতিপাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত নামলেন। অমনই তিনবার শিস দিলাম।

এতক্ষণে কর্নেল বেড়া গলে বেরিয়ে এলেন। চাপা স্বরে বললেন, "কেটে পড়া যাক। চলে এসো।"

আমরা গুঁড়ি মেরে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেলাম। পুকুরের চারপাড়ে ঘন জঙ্গল। তলায় দামে ঢাকা খানিকটা জল। গাধাটা পিঠে বোঁচকা নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে জলজ ঘাস খাচ্ছে। কর্নেল গাধাটার দিকে প্রায় দৌড়ে গেলেন।ওঁর এই পাগলামি দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

উনি কাছাকাছি যেতেই গাধাটা এক লাফে পুকুরের ধারে-ধারে নড়বড় করে দৌড়তে থাকল। কর্নেল তাড়া করলেন। গাধাটা পাড়ের জঙ্গল ফুঁড়ে উধাও হয়ে গেল।

এবং কর্নেলও।

অগত্যা আমাকে দৌড়তে হল।পাড়ের জঙ্গলে ঢুকেছি, পেছন থেকে চেরা গলায় হাঁকডাক ভেসে এল, "চোর! চোর! ধর্! ধর্!"

একবার ঘুরে দেখে নিলাম, সেই রিকশাওলা আর সম্ভবত মোহন মাস্টারমশাই দৌড়ে আসছেন।কেলেঙ্কারিতে পড়া গেল দেখছি! জঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে দেখলাম কর্নেল বা গাধা নেই। হলুদ ফুলে ঢাকা সরষে আর সবুজ ধানখেত এদিকটায়। ডান দিকে পোড়ো ভিটে আর ভাঙাচোরা মন্দির।লুকিয়ে পড়ার জন্য সেদিকটায় দৌড়ে গেলাম। পেছনের চ্যাঁচামেচি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।

হাঁফাতে-হাঁফাতে একটা ভাঙা শিবমন্দিরের আড়ালে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলাম। তারপরে দেখতে পেলাম কর্নেলকে। চোখে বাইনোকুলার রেখে একটা উঁচু গাছের ডগায় কিছু দেখছেন। কাছে গিয়ে বললাম, "কী অদ্ভুত কাণ্ড আপনার!"

"ডার্লিং! আমার চেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করল রামুর গাধাটা। রামু পাগল হয়েছে। গাধাটার তো পাগল হওয়ার কথা নয়!"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "আর-একটু হলেই কেলেঙ্কারি হত। সেই রিকশাওলা আর মোহনবাবু আমার পেছনে চোর-চোর, ধর-ধর বলে তাড়া করেছিলেন।"

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "তোমাকে দেখে ফেলেছিলেন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা তোমারই বোকামি। আমার পেছন-পেছন তোমারও দৌড়নো উচিত ছিল।" বলে কর্নেল চারপাশটা দেখে নিয়ে পা বাড়ালেন। "কুইক জয়ন্ত! আর এখানে নয়। গাধাটা এতক্ষণে ঝিলের জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছেছে।"

হাঁটতে-হাঁটতে বললাম, "আমি কিন্তু গাধার পেছনে দৌড়চ্ছি না।"

"নাহ্। আপাতত গাধার পেছনে ছোটা নিরর্থক।"

সোজা এগিয়ে সেই পিচের রাস্তায় পৌঁছলাম দু'জনে। তারপর একটা খালি সাইকেল রিকশা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন,"জমিদারবাড়ি। তাড়াতাড়ি চলো ভাই!"

আকার-প্রকারে মনে হচ্ছিল, এসব বাড়িকেই হয়তো একসময় বলা হত সাতমহলা পুরী। কিন্তু এখন হতশ্রী অবস্থা। দেউড়ি আছে এবং মাথায় দুটো সিংহও আছে। কিন্তু সিংহের পেট ফুঁড়ে অশ্বত্থচারা গজিয়েছে।দরোয়ান থাকার কথা নয়।দু'ধারে পামগাছ এবং এবড়ো-খেবড়ো একফালি রাস্তা। পোর্টিকোর তলায় গিয়ে রিকশা থেকে দু'জনে নামলাম। তারপর হলঘরের দরজায় দীপককে দেখলাম।বলল, "আসুন, আসুন। ওপর থেকে আপনাদের দেখতে পেলাম। আবার কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো?"

কর্নেল বললেন, "নাহ্।তোমার বাবা আছেন?"

"বাবা স্কুলে গেলেন একটু আগে।ম্যানেজিং কমিটির মিটিং আছে। উনি তো কমিটির সেক্রেটারি। ভেতরে আসুন।"

হলঘরে ঢুকে কর্নেল বললেন, "হালদারমশাইয়ের খবর কী?"

দীপক হাসল, "ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন। অদ্ভুত মানুষ!"

"আচ্ছা দিপু, তোমাদের পাতালঘরের চাবি কার কাছে থাকে?"

দীপক একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ভজুয়ার কাছে নীচের কিছু ঘরের চাবি থাকত।কারণ সে-ই এসব ঘর দেখাশোনা করত। আসলে ভজুয়া যে-ঘরে থাকত, তার পাশের একটা ঘরে পুরনো ভাঙাচোরা আসবাবপত্র ঠাসা আছে। ওই ঘরের কোনাতেই পাতালঘরে নামার গোপন সিঁড়ি আছে।"

"ঘরটা একটু দেখতে চাই।মানে, সেই সিন্দুকটা।"

"এক মিনিট। মায়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে আসছি।"

একটু পরে সে চাবির গোছা নিয়ে ফিরে এল। গোলকধাঁধার মতো কয়েকটা ঘরের ভেতর দিয়ে সেই ঘরটাতে নিয়ে গেল সে। দরজা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বালল।আবর্জনার মতো পুরনো চেয়ার-টেবিল-খাট ইত্যাদির স্তূপে ঘরটা ভর্তি।এককোণে কাঠের আলমারি দাঁড় করানো আছে। দীপক সেটা ঠেলে সরাতেই একটা ছোট্ট দরজা দেখা গেল। সে দরজা খুলে গোপন সুইচ টিপে আলো জ্বালল।বলল, "আসুন।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছোট্ট একটা ঘরে পৌঁছলাম। কেমন ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। দেওয়ালে সিঁদুরের ছোপে একটা স্বস্তিকা আঁকা। তার নীচেই কালো কাঠের সিন্দুকটা খুলল দীপক। কর্নেলের পকেটে সব সময় টর্চ থাকে দেখেছি। টর্চের আলোয় ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। ততক্ষণে দুর্গন্ধে আমি অস্থির। কর্নেল হঠাৎ ঝুঁকে একটা কালচে ছোট্ট জিনিস সিন্দুকের ভেতর থেকে তুলে নিলেন। উজ্জ্বল মুখে বললেন, "হুঁ! পাওয়া গেল তা হলে।"

দীপক বলল, "কী পাওয়া গেল কর্নেল?"

কর্নেল বললেন, "যা পাওয়া উচিত ছিল। চলো, বেরনো যাক এখান থেকে।"

॥ ৫ ॥

হলঘরে ফিরে কর্নেল বললেন, "এই জিনিসটার খোঁজে ম্যাজিকবাবুর ডেরায় হানা দিয়েছিলাম। তার ম্যাজিকের বাক্স-প্যাঁটরা তন্নতন্ন খুঁজে যখন পেলাম না, তখন বুঝলাম এটা হয়তো সিন্দুকের ভেতর থেকে গেছে। কাপালিকবেশী লোকটি যে-ই হোক, তাকে ম্যাজিকবাবু এটা দিলে প্রাণে মারা পড়ত না। ম্যাজিকবাবু ভজুয়ার সাহায্যে সিন্দুক থেকে তান্ত্রিক আদিনাথের কবন্ধ লাশের হাড়গোড় নিয়ে গিয়েছিল...."

দীপক চমকে উঠে বলল, "ভজুয়ার সাহায্যে? অসম্ভব।"

"সম্ভব ডার্লিং!" কর্নেল সোফায় বসে চুরুট ধরালেন। "যখের ধনের লোভ সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক লোভ। চিন্তা করে দ্যাখো। ওই পাতালঘর থেকে ভজুয়ার সাহায্য ছাড়া কারও পক্ষে কাজটা সম্ভব ছিল না। তোমার ঠাকুরদার বইয়ে লেখা আছে, কবন্ধ লাশ দুমড়ে-মুচড়ে কাপড়ে বেঁধে সিন্দুকে ঢোকানো হয়েছিল। এতকাল পরে কাপড় আস্ত থাকার কথা নয়। কাজেই হাড়গোড়গুলো আবার একটা কাপড়ে বা চটের থলেয় ভরে নিয়ে গিয়েছিল দু'জনে। এদিকে মাংস গলে পচে কাপড় গুঁড়ো হয়ে এই জিনিসটা সিন্দুকের তলায় খসে পড়েছে এবং সেঁটে গেছে।"

জিনিসটা কর্নেল দেখালেন। বাংলোয় দেখা আধখানা চাঁদের গড়ন সেই সিলের বাকি টুকরো বলে মনে হল। বললাম, "একটা গোটা সিল দু' টুকরো করার কারণ কী?"

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "বইয়ে তান্ত্রিক আদিনাথের ছবি আছে। শিবের জটায় চন্দ্রকলার ছবি দেখেছ তো? ওঁর জটাতেও তেমনই আধখানা খুদে চাঁদের মতো জিনিস আছে। প্রথমে গ্রাহ্য করিনি। পরে দেখলাম ওঁর ডান বাহুতে তাগার মতো অবিকল একই জিনিস বাঁধা আছে। আতশ কাচে দুটোই পরীক্ষা করে বুঝলাম একটা খুদে সিলের দুটো টুকরো। কী সব খোদাই করাও আছে ওতে। তখনই বুঝলাম তান্ত্রিক আদিনাথ যত বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁর ভাইপো হরনাথ—মানে, দিপুর ঠাকুরদাও তত বুদ্ধিমান ছিলেন। হরনাথ লিখেছেন, দেবী চণ্ডিকার ধনে লোভ করা উচিত নয়। বইয়ে 'ধ' হরফ এবং 'লো' হরফ পোকায় কেটেছে। তাই দিপুর বাবা ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেননি। দু-দুটো নরবলির পর ওঁর সন্দেহ হয়। তাই আমার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন।"

দিপু বলল, "বাপ্‌স্! মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। সেকালের লোকেরা কী অদ্ভুত ছিল!"

"হ্যাঁ। এখন তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু হরনাথ ধর্মপ্রাণ মানুষ। দেবী চণ্ডিকার ধনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বংশধরদের হাতে দিতে চেয়েছিলেন। ওই ছড়াটা উনি তাই নিজেই রচনা করে লিখে গেছেন। ওর মধ্যে একটা সূত্র লুকনো আছে। সিলের আধখানা তো সিন্দুকে নিরাপদে রইল। বাকি আধখানা খুঁজে বের করার জন্য ওই ছড়া! কিন্তু ছড়াটা কাজে লাগেনি। জগাই জানত, মুণ্ডু কোথায় পোঁতা আছে।"

বললাম, "কিন্তু তান্ত্রিক আদিনাথকে বলি দিল কে?" কর্নেল হাসলেন। "ওটা গপ্প। আমার থিওরি হল, আসলে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর দেবী চণ্ডিকার লুকিয়ে রাখা ধন যাতে সহজে কেউ খুঁজে না পায় তাই হরনাথ একটা সাঙ্ঘাতিক কাজ করেছিলেন। মৃতদেহের মুণ্ডু কেটে কোথাও পুঁতে রাখার জন্য..."

বাধা দিয়ে বললাম, "বোগাস! আপনার থিওরির মাথামুণ্ডু নেই। সিলের টুকরো দুটো লুকিয়ে রেখে গেলেই পারতেন! কোনও বদ্ধ পাগল ছাড়া মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে পারে না।"

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সাড়ে বারোটা বাজে। চলি দিপু! ওবেলা এসে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।"

দীপক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাইরে গিয়ে বললাম, "জগাই কী করে জানল কোথায় মুণ্ডু পোঁতা আছে?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "তুমি তো কথাটা শেষ করতেই দিলে না। আমি কি বলেছি হরনাথ নিজের হাতে তান্ত্রিক জ্যাঠার লাশের মুণ্ডু কেটেছিলেন? মড়া কাটার জন্য ওঁর একজন লোকের দরকার ছিল। জগাইরা পুরুষানুক্রমে এই কাজ করে। হরনাথের বইয়ে একজনের উল্লেখ আছে। তার নাম গদাই। নিশ্চয় জগাইয়ের ঠাকুরদা বা তার বাবা। নামে নামে মিল। এদিকে তো পূর্বপুরুষের কোনও গোপন কথা বংশানুক্রমে পরিবারে চালু থাকে। এই পরিবারেও ছিল। আমার থিওরি নিখুঁত, ডার্লিং!"

"কী করে অত নিশ্চিত হচ্ছেন?"

"জগাই একইভাবে খুন হয়েছে বলে।" কর্নেল গেট পেরিয়ে একটা সাইকেল-রিকশা ডাকলেন। তারপর বললেন, "বাংলোয় ফিরে বুঝিয়ে দেব।"

বাংলোয় পৌঁছে দেখি, হালদারমশাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বললেন, কাপালিকের ডেরা ডিস্কভার করেছি কর্নেল! গড়খাইয়ের ওপারে একটা গুহার মতো গম্বুজঘরে সে থাকে। কম্বলের তলায় ভাঁজকরা এই চিঠি ছিল।"

কর্নেল ওঁর হাত থেকে ইনল্যাণ্ড লেটারটা নিয়ে বললেন, "দিপু আপনার জন্য ভেবে সারা। শিগগির গিয়ে ওকে দেখা দিন। আর শুনুন! একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। রামুর গাধার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা আছে। গাধাটা নয়, বোঁচকাটা খুব দরকার।"

হালদারমশাই লাফিয়ে উঠলেন। "কই? কই সে?"

"খেয়েদেয়ে খুঁজতে বেরোবেন। ঝিলের জঙ্গলেই দেখা পেতে পারেন। কিছুক্ষণ আগে ওকে তাড়া করে ওদিকেই পাঠিয়ে দিয়েছি।"

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সবেগে উধাও হয়ে গেলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেল ইনল্যাণ্ড লেটারটা পড়ে আমাকে দিলেন। চিঠিতে লেখা আছে :

শঙ্করদা,

পত্রপাঠ চলে আসুন। জগাই রাজি হয়েছে। ভজুয়াও রাজি। গতবারের মতো সাধু সেজে আসবেন। শ্মশানতলায় থাকবেন। মা চণ্ডীর কৃপায় এবার আর ব্যর্থ হব না। প্রণাম রইল। ইতি

শচীন

নাম-ঠিকানা ইংরেজিতে লেখা। 'শ্রী এস· এন. ভট্টাচার্য। কেয়ার অব জয়চণ্ডী অপেরা। ৩৩।১ ঠাকুরপাড়া লেন, কলকাতা-৫।'

বললাম, "যাত্রাদলের লোক?"

কর্নেল হাসলেন। "তাই তো মনে হচ্ছে। তার পক্ষে কাপালিক সাজা সহজ। এবার এই চিরকুটটা দ্যাখো। ম্যাজিকবাবু শচীন হাজরার বাক্সে পেয়েছি।"

চিরকুটটা দেখেই বললাম, "আমাকে যে চিরকুটটা ছুঁড়ে কাল বিকেলে ভয় দেখিয়েছিল, তারই লেখা। ম্যাজিকবাবুকে

শ্মশানতলায় ডেকেছিল দেখছি। তলায় ইংরেজিতে 'এস' লেখা সেই শঙ্করদা।"

"হ্যাঁ। জগাইকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল, 'এসে গেছি।' যাই হোক, এবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই।" বলে কর্নেল তাঁর কিট্ব্যাগ থেকে প্যাড্ বের করে আঁকজোক শুরু করলেন। তারপর বললেন, "এটা একটা ওলটানো ত্রিভুজ।
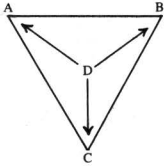
...'এ' বিন্দু ভজুয়া, 'বি' বিন্দু জগাই এবং 'সি' বিন্দু ম্যাজিকবাবু শচীন হাজরা, মাঝখানে 'ডি' বিন্দু হল শঙ্কর নামে একটা লোক। যে-কোনও কারণেই হোক, শঙ্কর প্রকাশ্যে কঙ্কগড়ে আসতে পারে না। অথচ সে দেবী চণ্ডিকার গুপ্তধন-রহস্য জানে। সে তিনজনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। এতদিন পরে সে ম্যাজিকবাবুর সাহায্যে প্রথমে তান্ত্রিক আদিনাথের ধড় হাতাল। কিন্তু সিলের অর্ধাংশ পেল না। তখন ম্যাজিকবাবু ওটা হাতিয়েছে সন্দেহ করে তাকে খতম করল। তারপর জগাই মুণ্ডু উদ্ধার করে দিল। কিন্তু মুণ্ডুতেও সিলের বাকি আধখানা নেই। থাকবে কী করে? মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সন্দেহক্রমে খাপ্পা হয়ে সে জগাইকে খতম করল। কারণ সে ধরেই নিয়েছিল, গুপ্তধনের লোভে তাকে ওরা ফাঁকি দিচ্ছে। বাকি রইল ভজুয়া। আমার ধারণা, ভজুয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিল শঙ্কর। নিশ্চয় ওকে লোভ দেখিয়ে বাগে এনেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও সন্দেহক্রমে খতম করেছে। গুপ্তধনের লোভ পেয়ে বসলে মানুষ হিংস্র হয়ে ওঠে। তিন-তিনজনকে সে অবশ করে দেবী চণ্ডিকার থানে এনে বলি দিয়েছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। কিন্তু এখনও সে আশা ছাড়েনি। দিপুর বাবা গোয়েন্দা এনেছেন কলকাতা থেকে, সে জেনে গিয়েছে। তাই ভেবেছে, গোয়েন্দার ওপর বাটপাড়ি করবে। আসলে আমাদের হালদারমশাই অতি-উৎসাহে—ঠিক তোমার মতোই..."

বাধা দিয়ে বললাম, "জ্যান্ত কঙ্কাল চোখের সামনে নাচতে দেখলে মাথার ঠিক থাকে না।"

কর্নেল সেই কালো আধখানা সিলটা লোশন দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকলেন। বললেন, "আজ পূর্ণিমা। আজ রাতে আবার কঙ্কালের নাচ দেখাব তোমাকে। শিওর!"

দুপুরে আমার ভাতঘুমের অভ্যাস আছে। কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল। কর্নেল সিলের টুকরো দুটো জোড়া দিয়েছেন। বললেন, "একপিঠে দেবী চণ্ডিকার রণমূর্তি। অন্যপিঠে শুধু স্বস্তিকাচিহ্ন। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। গুপ্তধনের সূত্র কোথায়? দেবী চণ্ডিকা আর স্বস্তিকা।" কর্নেল টাকে হাত বোলাতে থাকলেন। চোখ বুজে গেল।

একটু পরে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। বললাম, "গুপ্তধনটা গুলতাপ্পি নয় তো?"

"কিছু বলা যায় না। যাক্গে, চলো। বেরনো যাক।"

"গুপ্তধনের খোঁজে?"

"নাহ্। থানায়।"

"থানায় যেতে আমার ভাল লাগে না। আপনি যান।"

কর্নেল উঠে দরজার কাছে গিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। বরং তুমি রামুর গাধাটা ধরতে হালদারমশাইকে সাহায্য করতে পারো। ওই দ্যাখো, ঝিলের দক্ষিণের ঘাটে হালদারমশাই ওত পেতে বসে আছেন।"

বারান্দায় গিয়ে দেখি, সত্যি তা-ই। হালদারমশাই ঘাটের পাশে একটা ঝোপের ধারে বসে আছেন। গাধাটা দেখতে পেলাম না। কর্নেল চলে যাওয়ার পর রঘুলালকে ঘরের দিকে লক্ষ রাখতে বলে বেরিয়ে পড়লাম। নীচের রাস্তায় নেমেছি, হালদারমশাইয়ের চিৎকার শোনা গেল।

"জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু! গাধা! গাধা!"

পিঠে বোঁচকাবাঁধা গাধাটা জঙ্গল ফুঁড়ে ছুটে আসছিল। আমি দু'হাত তুলে এগিয়ে যেতেই ঝিলের ঢালে নেমে গেল। তারপর দিব্যি জলজ ঘাসের দিকে মুখ বাড়াল। আমি রঘুলালকে ডাকলাম। সে দৌড়ে এল। বললাম, "গাধাটা ধরতে হবে। বকশিশ পাবে রঘুলাল।"

হালদারমশাই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "গাধা কয় আর কারে!"

রঘুলাল একটা মজার কাজ পেয়ে গেল যেন। সে বলল, "চেঁচামেচি না করে তিনজনে তিনদিক থেকে ঘিরে ধরতে হবে সার। রামুর গাধাটা খুব বদমাশ! লাথি ছুঁড়তে পারে।"

হালদারমশাই বললেন, "দড়ি লও রঘুলাল! আমার কাছে দড়ি আছে।"

রঘুলাল দড়ি নিয়ে পা টিপে-টিপে এগোল। বললাম, "দড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলে নাকি?"

হালদারমশাই হাসলেন। "নাহ্। কাইল রাত্রে কাপালিক আমারে এই দড়ি দিয়া বাঁধছিল না?"

রঘুলাল চাপা গলায় বলল, "আপনারা দু'দিকে রেডি থাকুন সার!"

সে কাছাকাছি যেতেই গাধাটা ঘুরল। অমনই রঘুলাল তার গলায় দড়ির ফাঁস আটকে দিল। হালদারমশাই এবং আমি গিয়ে দড়ি ধরে ফেললাম। টাগ অব ওয়রে শেষপর্যন্ত গাধাটা পরাস্ত হয়ে ঘাসে পড়ে গেল। হালদারমশাই তার পিঠ থেকে বোঁচকাটা খুলে নিয়ে বললেন, "খুব জব্দ এবার। রঘুলাল! ওকে ছেড়ে দাও! কিন্তু ইস্স্! বোঁচকাটায় কী বিটকেল গন্ধ!"

গাধা বেচারা গলায় দড়ির ফাঁস নিয়ে নড়বড় করে দৌড়ে রাস্তায় উঠল। বুঝলাম, বুদ্ধিমান গাধা। জঙ্গলে ঢুকলে দড়িটা কোথাও আটকে গিয়ে বিপদে পড়ত।

হালদারমশাই বাংলোয় এলেন আমার সঙ্গে। কর্নেল নেই শুনে নিরাশ হলেন। বোঁচকা থেকে সত্যি বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। সেটা এনে ফেলে রেখে বারান্দায় বসলাম আমরা। রঘুলাল কফি করতে গেল। হালদারমশাই সন্দিগ্ধভাবে বললেন, "বোঁচকায় কী আছে যে, এমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে? গাধার পিঠে এটা বাঁধলই বা কে?"

হাসতে-হাসতে বললাম, "খুলে দেখুন না! গুপ্তধন থাকতেও পারে।"

হালদারমশাইয়ের ধৈর্য রইল না আর। উঠে গিয়ে নোংরা কাপড়ের বোঁচকাটা খুলে ফেললেন। তারপর লাফিয়ে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! মড়ার খুলি আর হাড়গোড়ে ভর্তি।"

চমকে উঠেছিলাম। বুক ধড়াস করে উঠেছিল। বললাম, "এই সেই তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল।"

বোঁচকা ঝটপট বেঁধে হালদারমশাই বললেন, "আপনি কাইল রাত্তিরে দেখছিলেন, একটা কঙ্কাল আমারে বলি দিতে চাইছিল। হেই ব্যাটাই? কিন্তু খড়্গ গেল কই?"

বললাম, "কাপালিকের কাছে।"

"হঃ। ঠিক কইছেন।" বলে হালদারমশাই বারান্দায় এলেন। ধপাস করে বসে জোরে শ্বাস ছাড়লেন। বোঝা গেল, এতক্ষণে উনি বেজায় উত্তেজিত।

একটু করে কফি খেতে-খেতে আমরা গুপ্তধন-রহস্য নিয়ে আলোচনা করছি, রঘুলাল ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং লনে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে ঝিলের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ বলল, "কর্নেলসাব আসছেন।ওই দেখুন।"

ঝিলের ধারে জঙ্গলের ভেতর কর্নেলকে হন্তদন্ত আসতে দেখলাম।হালদারমশাই হন্তদন্ত গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গেটের নীচে কর্নেলের টুপি দেখা গেল। হালদারমশাই জয়ের উল্লাসে বলে উঠলেন, "বোঁচকার ভেতর স্কেলিটন অ্যাণ্ড স্কাল!"

সাড়ম্বরে ঘটনার বিবরণ দিতে-দিতে হালদারমশাই কর্নেলের সঙ্গে বাংলোর বারান্দায় ফিরে এলেন। রঘুলাল আবার কফি করতে গেল। বললাম, "গেলেন তো থানায়। ফিরলেন জঙ্গল থেকে।নিশ্চয় অর্কিড খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন না জঙ্গলে?"

কর্নেল হাসলেন। মুখে ক্লান্তির ছাপ। বললেন, "ফাঁদ পাততে গিয়েছিলাম।"

"কিসের ফাঁদ?"

"কাপালিক ধরার। হালদারমশাই ওর ডেরার খোঁজ দিয়েছেন। সেই ডেরায় ঢুকে গুপ্তধনের সূত্র অর্থাৎ সিলটা রেখে এলাম। সঙ্গে একটা চিঠি। সন্ধ্যা সাতটায় ঝিলের পুবের ঘাটে বুড়ো শিবের মন্দিরের সামনে দেখা করতে লিখেছি। শর্ত দিয়েছি, গুপ্তধনের আধাআধি বখরা চাই।দেখা যাক টোপ গেলে কি না। গুপ্তধনের লোভ অবশ্য সাঙ্ঘাতিক।"

অবাক হয়ে বললাম, "সিলটা রেখে এসেছেন! করেছেন কী!"

কর্নেল চাপা স্বরে সকৌতুকে বললেন, "বলেছি ডার্লিং, আজ রাতে কঙ্কালের নাচ দেখাব। আর হালদারমশাই স্বচক্ষে দেখবেন তাঁকে কে বলি দেবে বলে শাসাচ্ছিল।"

হালদারমশাই বললেন, "সে-ব্যাটা তো ওই বোঁচকার ভেতর বাঁধা আছে।"

"হালদারমশাই! প্রেতাত্মা তার কঙ্কালসুদ্ধ বোঁচকা থেকে বেরিয়ে পড়বে। যাই হোক, রঘুলালকে দিয়ে ওটা আপাতত বাথরুমে রাখতে হবে। এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। পৌনে সাতটায় আমরা বুড়ো শিবমন্দিরের ওখানে পৌঁছব।"

একটা চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে পৌঁছতে গেলে যা হয়। সময় যেন কাটতে চায় না। সাড়ে ছ'টায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নীচের রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঝিলের উত্তর পাড় ধরে কর্নেল এগোলেন। স্তূপ, খানাখন্দ, ঝোপঝাড় পেরিয়ে মোটামুটি একটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সবে চাঁদ পুবের গাছপালার মাথা আলো করে উঁকি দিচ্ছে। হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, "আরে! এখানেই তো কাপালিক মাটি খুঁড়ছিল।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। খুলি পোঁতা ছিল এখানেই। ওই দেখুন, বুড়ো শিবের মন্দির। চুড়োয় একটা ত্রিশূল পোঁতা আছে।"

এই সময় কাছাকাছি কেউ বলে উঠল, "এসে গেছি কর্নেল!"

"চলে এসো দিপু!"

দীপক একটা স্তূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।হাতে সেই বল্লম আর টর্চ। কর্নেল আমাদের নিয়ে ফাঁকা জমিটায় গেলেন।তারপর বললেন, "সবাই মন্দিরের আড়ালে যাও। কুইক! দিপু, এদের নিয়ে যাও। সাবধান! টুঁ শব্দটি করবে না।"

কতকালের পুরনো মন্দির। তার একপাশে ঘন ছায়ায় আমরা তিনজনে বসে রইলাম। কর্নেল ফাঁকা জমিটায় পায়চারি করছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, একটু পরে ওঁকে সেই ছড়াটা আওড়াতে শুনলাম। ছড়াটা বার-দুই আওড়েছেন, কেউ খ্যানখেনে গলায় বলে উঠল, "ওঁ, হ্রীং ক্লীং ফট্!" তারপর দপ করে একটা মশাল জ্বলে উঠল। পেছনে ঘন ঝোপ। ঝোপের মাথায় মশালটা আটকানো মনে হল।

হঠাৎ ঝোপ ডিঙিয়ে একটা আস্ত নরকঙ্কাল লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াল। তার দু'হাতে ধরা একটা চকচকে খাঁড়া নেড়ে তেমনই ভুতুড়ে গলায় বলল, "এসেছিস? আয়, আয়! কাছে আয়।"

কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "দেবী চণ্ডিকার গুপ্তধন কি উদ্ধার হয়নি?"

"কাছে আয়। কথা হবে।"

"আর কিসের কথা মশাই? সিল তো পেয়ে গেছেন।"

কঙ্কাল খাঁড়া নাচিয়ে বলল, "চালাকি? আমি কে জানিস? আমি তান্ত্রিক আদিনাথ। আমার দেবীর ধন। আমার সঙ্গে ফক্কুড়ি? তবে রে ব্যাটা বুড়ো টিকটিকি!"

এবার যেন কর্নেলেরই আমার মতো মাথা-খারাপ হয়ে গেল। টিকটিকি বলার জন্যই কি খেপে গেলেন? রিভলভার বের করে দৌড়ে গেলেন। কঙ্কালটা তড়াক করে ঝোপ ডিঙিয়ে পালাতে যাচ্ছিল। ঝোপে আটকে গেল। তারপর হঠাৎ ঝোপের ওপাশে অনেক টর্চের আলো জ্বলে উঠল। ধুপধাপ, দুদ্দাড়, ছুটোছুটি শব্দ। আমরা দৌড়ে কর্নেলের কাছে গেলাম। কর্নেল সেই কঙ্কালটা ঝোপের ডগা থেকে নামিয়ে এনে বললেন, "ম্যাজিকবাবুর ম্যাজিক কঙ্কাল! ম্যাজিকের স্টেজে পুতুলনাচের কৌশলে পেছন থেকে প্লাস্টিকে তৈরি কঙ্কালটাকে দড়ির সাহায্যে কন্ট্রোল করা হত। হুঁ, খাঁড়াটা দেখছি পিস্‌বোর্ডে মোড়া রাংতার।" বলে হাঁফ ছাড়লেন, "কই মিঃ ধাড়া! আপনার আসামি কোথায়?"

ঝোপের পেছন থেকে সাড়া এল, "বড্ড বেয়াড়া আসামি! এক মিনিট কর্নেল!"

তারপর সদলবলে বেরিয়ে এলেন সত্যিকার খাঁড়া হাতে এক দারোগাবাবু। তাঁর পেছনে কনস্টেবলরা লাল কাপড়পরা এক কাপালিককে বেঁধে নিয়ে এল। দারোগাবাবু বললেন, "খাঁড়াটা দেখেছেন? হাতে এটা ছিল বলেই অ্যারেস্ট করতে একটু দেরি হল।"

কর্নেল কাপালিকের জটাজুট এবং গোঁফদাড়ি হ্যাঁচকা টানে খুলে দিয়ে টর্চ জ্বেলে বললেন, "দ্যাখো তো দিপু, লোকটাকে চিনতে পারো কি না?"

দিপু অবাক হয়ে বলল, "এ কী! শঙ্করকাকা না?"

"হ্যাঁ। তোমার বাবার জ্ঞাতিভাই শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য তোমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়েছিল। তুমি তখন আসানসোলে কলেজ-স্টুডেন্ট। তোমার বাবার কাছে জেনে নিয়ো কী সাঙ্ঘাতিক আর জঘন্য চরিত্রের লোক এই শঙ্করনাথ। মিঃ ধাড়া! আসামি নিয়ে থানায় চলুন। আমি পরে দেখা করব।"

দারোগাবাবু এবং কনস্টেবলরা আসামি নিয়ে চলে গেলেন। হালদারমশাই কঙ্কালটা পরীক্ষা করছিলেন। খি-খি করে হেসে বললেন, "কী কাণ্ড! আমি ভাবছিলাম বোঁচকা থেকে বেরিয়ে—খি-খি-খি!"

বললাম, "কিন্তু ওই অদ্ভুত ছড়াটার কী মানে?"

কর্নেল বললেন, "ওই দ্যাখো, 'বার-পনেরো চাঁদা' উঠেছে। বুড়ো শিবের ত্রিশূলের ছায়া কোথায় পড়েছে লক্ষ করো! ওখানে খুলিটা পোঁতা ছিল। হুঁ, গোড়া থেকে বুঝিয়ে দিই। 'আঁটঘাট বাঁধা' নয়, কথাটা হল আটঘাট বাঁধা। এই ঝিলের চারদিকে বাঁধানো ঘাট আছে। বুড়ো শিবের মন্দির তো দেখতেই পাচ্ছ। 'বার পনেরো চাঁদা' মানে বারো নম্বর মাস অর্থাৎ চৈত্র মাস। 'পনেরো' হচ্ছে চাঁদের পঞ্চদশী তিথি। তার মানে চৈত্র মাসের পূর্ণিমার চাঁদ যখন বুড়ো শিবের ত্রিশূলের মাথায় দেখা যাবে, ত্রিশূলের ছায়া যেখানে পড়বে, সেখানেই খুলি পোঁতা আছে। তাই ছড়ায় আছে: 'বুড়ো শিবের শূলে। আমার মাথা ছুঁলে।' কিন্তু চূড়ার জট ছাড়ানোর আগেই জগাই খুলির খোঁজ দিয়েছিল শঙ্করনাথকে।"

"গুপ্তধনের কী হল?"

"তুমি ভুলে গেছ জয়ন্ত, পাতালঘরের দেওয়ালে আমরা সিঁদুরে আঁকা স্বস্তিকাচিহ্ন দেখেছি। সিলের একপিঠে স্বস্তিকা আছে। অন্যপিঠে দেবী চণ্ডিকার মূর্তি। ওই মূর্তিটাই গুপ্তধন। প্রায় এক কেজি ওজনের সোনার দেবীমূর্তি। থানায় খবর দিয়ে দিপুদের বাড়ি গিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করেছি। স্বস্তিকা আঁকা ছিল যেখানে, সেখানে খুঁড়তেই সোনার মূর্তি পাওয়া গেল। কাজেই সিলটা শঙ্করনাথের ডেরায় রেখে এসেছিলাম। ওটাই ফাঁদ। বুঝলে তো?

হালদারমশাই উদাস চোখে চাঁদ দেখছিলেন। বললেন, "চলেন কর্নেলসার। বাংলোয় গিয়া বোঁচকাটা দেখা দরকার।"

কর্নেল কঙ্কালটা দিব্যি ভাঁজ করে গুটিয়ে বললেন, "বোঁচকা আছে। শঙ্করনাথ-তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল আর খুলিতে সিল না পেয়ে খাপ্পা হয়ে ওটা রামুর গাধার পিঠে বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু গাধাটাকে এই কাজে লাগাতে হলে রামুকে ভয় দেখিয়ে ঘাট থেকে তাড়ানোর দরকার ছিল। তাই ম্যাজিকবাবু কঙ্কাল দেখিয়ে বেচারাকে ভাগিয়ে দেয়। আস্ত কঙ্কালের নাচ দেখে রামুর পাগল হওয়া স্বাভাবিক। তবে এবার ওকে সুস্থ করা যাবে।"

আমরা বাংলোয় ফিরে চললাম।

বাসন্তী রঙের শালুকের জন্যে অষ্টক

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

লিলিপুলের শোভা শালুক করছে ফুটি-ফুটি,
সকাল সন্ধে সেই সুবাদে বাগান দেখতে ছুটি।
বাগানে ছার মুসাণ্ডা ফুল, বাগানে ছার জুঁই,
শত পাতার ফাঁকে শালুক পলকমাত্র ছুঁই।
কী বাহারি বাসন্তী রং, সচরাচর নয়—
আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষে খোলে তার হৃদয়।
সেই হৃদয়ে মধুগ্রাহক ভ্রমর চলে আসে,
রোদবৃষ্টির ফুল্ল খেলা বসায় মাঠের ঘাসে।

সবাই ভাল

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আধখানা চাঁদ দিল ফাঁদখানা পেতে,
খোকাখুকু থাকে তাই নাচগানে মেতে।
বান্টু না মান্টু খড়খড়ি তুলে
তাকাতেই দেখল যে সাদা তুলতুলে
ভুলুবাবু লেজ তুলে ছুটে আসে কাছে।
চাঁদ শুধু আটকিয়ে গেল ঝাউগাছে।
"ভুলু, ওরে ভুলু" —খুকু জিগ্যেস করে
"কোন্‌দিকে তুই ছিলি এই শহরে ?
আমরা তো নাচলাম, নাচলাম কত—
দেখেশুনে বুড়োদাদা হল থতমত;"
ভুলু কুঁইকুঁই করে, চাঁদ ফেলে আলো,
তুমি ভাল, আমি ভাল, সব্বাই ভাল।
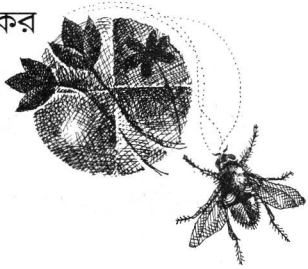
পৃথিবীর শেষ কয়েকটি পেঙ্গুইনের সঙ্গে

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অ্যান্টার্কটিকে তুষারের মাঝখানে
পেঙ্গুইনের ডেলিগেশনের সাথে
দেখা হয়ে গেল, আমাকে বলল ওরা :
"আর কোনোদিন দেখা হবে কে বা জানে !

"পৃথিবীর তাপমাত্রা শূন্য-পাঁচ
গ্রেড বেড়ে আজ অনেক সেলসিয়াস,
কাঠ-পেট্রল-কয়লা পুড়িয়ে যারা
CO_2 ছড়ায় বাতাসে, প্রকাশ্যত
যদিও বলে না 'পেঙ্গুইনকে মারো'

"প্রাণীর বিনাশ তাদেরই আবিষ্কার—
এবং তুমিও ওদের দলের দায়ী
যারা নাকি শুধু নিজেদের চামড়াই
বাঁচিয়ে রাখার গরজে অনবরত
আমাদের মেরু করে দেয় ছারখার...
তোরা মৃত্যুর কূটতর্কের ব্যাস।"

নালিশটা শুনে আমার কলমদানি
ভরে গেল খুব অন্যায় অভিমানে ;
অথচ সেদিন পেঙ্গুইনের বিয়ে,
বর কিছু বুড়ো, কিছুটা কিশোরী কনে,
একফোঁটা ত্রুটি ছিল না আপ্যায়নে,
যে-মাংস ওরা আমায় খাওয়াল সেটা
পরে শুনলাম ওদেরই হৃদয়খানি !

ছবি : অনুপ রায়

"ওরেব্বাস! ক্যালকাটাস্ লুমিনাস!"
"প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক! চারিদিকে কি আলো দ্যাখ!"
"থাণ্ডারিং টাইফুন! উৎসব কি দারুণ!"
"ভৌ, ভৌ, ভৌ, এমন মজা দেখেছে কেউ!"

CLARION C-CESC—41

একবার চেয়ে দেখ, তোমাদের প্রিয় এই শহরটা কেমন পুজোর সাজে সেজে উঠতে চলেছে। তোমাদের এই বন্ধুরাও সেই সাজ দেখতে বহুদূর থেকে ছুটে এসেছে এখানে। এসো, উৎসব-মুখর কলকাতাকে আমরা নতুন করে দেখি।

CESC LIMITED

রাতদিন প্রতিদিন ১৮৯৭থেকে অবিরাম কর্মরত

"জেন্টুদের সবচেয়ে জমকালো উৎসব হল দুর্গাপূজা। এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য সাহেবদেরও আমন্ত্রণ করা হয়। উৎসবের হোতারা উৎসবের দিনগুলোর প্রতি সন্ধ্যায় তাঁদের ফলমূল দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। সঙ্গে থাকে নাচ গানের ব্যবস্থাও।"

হলওয়েল : ইন্টারেস্টিং হিস্টোরিকাল
ইভেন্টস্, ১৭৬৬

সেকালের সাহেবদের কাছে দুর্গাপূজা যেমনই হোক না কেন, আসলে এ উৎসব বঙ্গবাসীর হার্দিক ও সামাজিক মিলনের এক পীঠস্থান। সারা বছর ধরে অনাবিল আনন্দময় শারদীয়া উৎসবের এই কয়েকটা দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকা। আর এই উৎসব থেকে বঙ্গবাসী আহরণ করে আনন্দের সঞ্চয়। যে সঞ্চয় জীবনকে করে তোলে বর্ণময়, মধুময় ও সমৃদ্ধ।

পিয়ারলেস-এর সান্নিধ্যে জগজ্জননীর আবির্ভাব ও মহাপূজার এই দিনগুলি আরও উজ্জ্বল ও শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠুক

Estd 1932

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

পিয়ারলেস ভবন, ৩ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯

ভারতের বৃহত্তম নন-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান

রহস্য-রোমাঞ্চের ভ্রমণ

কল্যাণ চক্রবর্তী

দিপুর মনটা বেজায় খারাপ। এবার বোধ হয় পুজোর ছুটিতে ওর কোথাও যাওয়া হল না। রবিকাকা গুয়াহাটি থেকে চিঠি দিয়েছেন যে, এবার আর তাঁর কলকাতা যাওয়া হবে না। এবারের দুর্গাপুজোর দায়িত্ব রবিকাকার ওপর। প্রতি বছর রবিকাকার সঙ্গেই দিপু পুজোর ছুটিতে কোথাও-না-কোথাও বেরিয়ে পড়ে। গতবার গিয়েছিল পুরী, তার আগের বছর দেওঘর। পুজোর ছুটির দিন যতই এগিয়ে আসছে দিপুর মন এতই খারাপ লাগছে এই ভেবে যে, ওর আর এ-বছর বেড়াতে যাওয়া হল না। দিপু খুব বেড়াতে ভালবাসে। বন, বনের জন্তুরা দিপুর খুব প্রিয়। ও কলকাতার চিড়িয়াখানা দেখেছে। বন্ধুদের সঙ্গে একবার উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়াতেও গিয়েছিল। সেই থেকে বন ওর কাছে খুব প্রিয়। হঠাৎ রবিকাকা টেলিগ্রাম করে জানালেন যে, দিপু যেন গুয়াহাটি চলে আসে। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য কলকাতার এক ভদ্রলোককে উনি বলে দিয়েছেন।

পুজোর ভেতরে দিপু তো পৌঁছে গেল রবিকাকার গুয়াহাটির বাংলোতে। জারুল ও দেবদারুগাছের সারির মধ্যে ছোট্ট সুন্দর ছিমছাম বাংলো। গোলাপ, রজনীগন্ধার সুন্দর বাগানও রয়েছে। মিলিটারি সার্ভিস থেকে অবসরের পর রবিকাকা গুয়াহাটিতেই থাকেন। একসময় শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। এখন অবশ্য ওঁর শখ বন্যজন্তুদের ও বনের ছবি তোলা। পুজোয় ক'টা দিন গুয়াহাটিতে ঘুরে-ঘুরে দিব্যি কেটে গেল। রবিকাকা বললেন, এবার যাওয়া হবে নামধাপার বন দেখতে। বনে যাওয়ার কথা শুনে দিপু তো নাচতে লাগল। রবিকাকা নামধাপা কোথায় ও কীভাবে যেতে হয় সেটা ম্যাপ দেখিয়ে দিপুকে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন,"নামধাপা দেশের একটি খুব নামকরা ব্যাঘ্র প্রকল্প। ১৯৭৩ সালের ১ এপ্রিল ব্যাঘ্র প্রকল্পের শুরু, আটটি বন নিয়ে। নামধাপা এই প্রকল্পের আওতায় আসে ১৯৮৩ সাল নাগাদ। নামধাপা উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে দূরের রাজ্য অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত, যে-রাজ্যটির আগের নাম ছিল নেফা। ১৯৮৫ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল ঘিরে গড়ে উঠেছে নামধাপা ব্যাঘ্র প্রকল্প। প্রকৃতির সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য ব্যাঘ্র প্রকল্পের লাগোয়া বনাঞ্চলকেও অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে সরকারিভাবে।"

নামধাপা যাওয়ার জন্য গুয়াহাটি থেকে জিপে করে রাস্তার দু'পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, কৃত্রিম বনাঞ্চল, ধানখেত, চা-বাগান প্রভৃতি দেখতে-দেখতে মিয়াও বলে একটি ছোট, সুন্দর মহকুমা-শহরে এসে পৌঁছলেন রবিকাকা ও দিপু। ডিব্রুগড় থেকে নামধাপা যাওয়ার পথে ভারী সুন্দর কয়েকটা জায়গা নজরে পড়ল দিপুর। তিনসুকিয়া, মাকুম, মার্গারেটা, ডিগবয় এবং খারসান। তিনসুকিয়াতে নেমে কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হল। রাস্তার পাশ দিয়ে অনেক দূর অবধি রেললাইন চলে গেছে। বাঁ-ডান দিকে মাঝে-মাঝেই ছবির মতো সব চা-বাগান। চা-বাগানের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গাছগাছালি। ডিব্রুগড় থেকে মিয়াও যেতে দুটি নদীও দিপুর নজরে এল—তিরাপ ও নামচিক। নামচিক নদীর ওপার থেকেই অরুণাচল রাজ্যের শুরু, তার আগে অসম রাজ্য। মিয়াও পৌঁছতে গভীর রাত হয়ে গেল। তার ওপরে সেখানে বৈদ্যুতিক আলো না

অরুণাচলের পথে। ইনসেট, চিতা-বিড়াল

থাকায় মিয়াও শহরটির চেহারাটা ভালভাবে বোঝা গেল না।
পরদিন সকালে কোনও একটা অচেনা পাখির ডাকে দিপুর ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল। কিন্তু দরজা খুলে কোনও পাখি দেখতে পেল না দিপু। দূর থেকে টিউটিউ ডাক কিন্তু অনবরত শোনা যাচ্ছিল। একটু পরে ৫০-৬০টির মতো পাখি উড়ে যেতে দেখা গেল। রবিকাকা পাখিগুলোর নাম বললেন, 'হিল ময়না'। কিছুক্ষণ পর রবিকাকা মিয়াওতে নামধাপা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন নামধাপার বন-বাংলো বুক করার জন্য। অধিকর্তাকে জিজ্ঞেস করে জানলেন যে, মিয়াওতে একটি 'হোয়াইট উইং উড ডাক' বলে এক বিপন্ন পাখির কৃত্রিম প্রজনন-কেন্দ্রে ২০টির মতো বিপন্ন পাখি আছে। আর আছে একটি ব্যাঘ্র প্রকল্পের মিউজিয়াম। মিউজিয়ামটি দেখে দিপু ভীষণ খুশি। ভারী সুন্দর গাছগাছালি আর বন্যপ্রাণীর সংগ্রহ আছে এখানে। আছে বিভিন্ন পাখি, কীটপতঙ্গ, সাপ ইত্যাদি। নামধাপা না গিয়েও এখানকার বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায় এই মিউজিয়ামটি দেখে।
দুপুর একটা নাগাদ নামধাপার গিবন পয়েন্টে পৌঁছে গেল প্রায় ১০ কিলোমিটার কাঁচা ও পাকা রাস্তা পেরিয়ে। বাঁ দিকে বয়ে চলেছে নোয়াডিহিং নদী। গিবন পয়েন্টে ঢোকার ঠিক আগে চাকমা উপজাতিদের একটি বড় কলোনি। ফরেস্ট গার্ডকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, গিবন পয়েন্ট নামটি হুলক-গিবন থেকে এসেছে। ওই জায়গাটিতে প্রায় প্রতিদিন সকালবেলা হুলক-গিবন পরিবার এসে দেখা দেয়। জায়গাটা খুব ভাল লেগে গেল দিপুর। দিপু জিপ থেকে নেমে একটু এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দেখে ফরেস্ট গার্ড বললেন, "এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়, কারণ এখানে বাঘ, ভালুক, লেপার্ড, ক্লাউডেড লেপার্ড, সবরকম হিংস্র জানোয়ার আছে।" এর পর দু' কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে ডান দিকে বনের ভেতরে আরও প্রায় ছ' কিলোমিটারের মতো চড়াই-উতরাই ভেঙে মতিঝিল নামে একটা জায়গায় দিপুরা চলে এল। ফরেস্ট গার্ড জানালেন, এখানে বন্যপ্রাণীদের জন্য নুন রাখার ব্যবস্থা আছে, যাকে 'সল্ট লিক' বলে। বন্যপশুরা নুন চাটতে খুব ভালবাসে, তাই এই ব্যবস্থা। বনের চোখজুড়নো সৌন্দর্য দেখে দিপু বিস্ময়ে হতবাক। রবিকাকাও স্বীকার করলেন যে, ট্রি ফার্ন, বাঁশ ও অন্যান্য লতাপাতা, আগাছার এত ঘন বৈচিত্র্য এর আগে উনি কোথাও দেখেননি।
বনের মধ্যে-মধ্যে বিভিন্ন মাপের পায়ের দাগ দেখে দিপু জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কী?" ফরেস্ট গার্ড জানালেন, "এগুলো নানারকমের বিড়াল-জাতীয় প্রাণীর পায়ের দাগ।"
ওখান থেকে ফিরে জিপে চড়ে ডেবানের পথে ওরা রওনা হল। ফরেস্ট গার্ডও তাদের সঙ্গে চললেন জিপে। খানিকটা যাওয়ার পর জমির ওপরে একটা বিরাট ফাটল দেখে ভয় পেয়ে গেল দিপু। সঙ্গী ফরেস্ট গার্ড জানালেন, ওটা হচ্ছে মাটির ক্ষয়ের নমুনা। দেখা গেল, আগের তৈরি করা রাস্তা পাহাড়ের একটা বড় অংশ নিয়ে মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে ভূমিক্ষয়ের জন্য। তা হলে বর্ষাকালে এখানে মানুষেরা যাতায়াত করেন কীভাবে? উত্তরে ফরেস্ট গার্ড বললেন, "বর্ষাকালে নামধাপার সঙ্গে বাইরের জগতের প্রায় সমস্ত সম্পর্কই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেবলমাত্র রেডিও-টেলিফোনই ভরসা।" ডেবান বাংলোতে পৌঁছনোর আগে হলং গাছের মগডালে একটি কালো সুন্দর পাখি দেখে হঠাৎ কিচিরমিচির কানে এল দিপুর। ওগুলো বানরের আওয়াজ।
গিবন পয়েন্ট থেকে ন' কিলোমিটার যাওয়ার পরে রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে গেছে। একটা চলে গেছে ডাইনে গান্ধী গ্রামের দিকে, যেটি বর্মার ভারতীয় সীমান্তে, ও অন্যটি চলে গেছে ডেবান বনবিভাগের বাংলোর দিকে। বাংলোর অবস্থান, কাঠের রংবাহারি দোতলা গোলাকৃতি বাড়ি, সামনে দুটো নদী মিলেমিশে সবই কেমন যেন ছবির মতো। বাংলোতে চারটি ঘর, সুন্দর বন্দোবস্ত। নোয়াডিহিং প্রধান নদী হলেও বাঁ দিকে আরও একটি নদী

রডোডেনড্রন গুচ্ছ

পুরুষের শরীরে আনে ছন্দের তরঙ্গ

Nawab
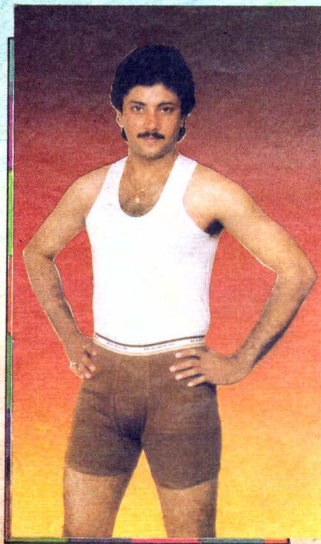
আধুনিক পুরুষের অন্তর্বাসের সুরুচি পূর্ণ বিলাসিতার কথা মনে রেখেই নবাব এনেছে গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়ার বিপুল সম্ভার, যা আরাম ও সাচ্ছন্দের অনন্য প্রতীক

চলে গেছে, যার নাম 'ডেবান'। নদীর নামেই জায়গাটিরও নাম রাখা হয়েছে ডেবান । এখানকার ফরেস্ট রেঞ্জারের সঙ্গে পরের দিনের ভ্রমণসূচি তৈরি করে ফেললেন রবিকাকা ।

তিনিও রবিকাকাদের সঙ্গী হলেন । যথারীতি সকালে বাংলো থেকে বেরিয়ে ডেবান ও নোয়াডিহিং দুটো নদী নৌকো নিয়ে পার হলেন রবিকাকা, কিন্তু রাস্তায় নানারকম অসংখ্য নুড়ি আর চাঁই পাথর এমনভাবে ছড়ানো যে, যাতায়াত করাই দুষ্কর । খুব সন্তর্পণে প্রায় চার কিলোমিটার হেঁটে আবার জঙ্গলের মেঠো পথ । বিড়াল জাতীয় প্রাণীর বেশকিছু পায়ের দাগ নজরে পড়ল । বুনো কুকুর, সম্বর, বার্কিং ডিয়ার—এদেরও পায়ের দাগ দেখা গেল রাস্তায় । ডান দিকে পাহাড়-ঘেঁষা জঙ্গলে অসংখ্য অজানা পাখির কিচিমিচি শোনা গেল । নানা চেহারার, নানা রঙের এইসব পাখির নামও বিচিত্র । ড্রোঙ্গো, ট্রি পাই, সানবার্ড, স্রাইক, প্যারাকিটের বিভিন্ন প্রজাতি, নাথাচ, রেডস্টার্ট, মিনিভেট, গ্রিন পিজিয়ন, ইম্পিরিয়াল পিজিয়ন, রেড মুনিয়া, স্পটেট মুনিয়া, বিভিন্ন রবিন ময়না, ওয়াগটেইল ইত্যাদি । এদের কিছু-কিছু ফোটো তোলার চেষ্টা করলেন রবিকাকা । হঠাৎ সঙ্গী ফরেস্ট গার্ড ডান দিকে সঙ্কেত করে দেখালেন, ছ'টি হুলক গিবন মেকাই গাছের এক শাখা থেকে আর-এক শাখায় লাফিয়ে চলে যাচ্ছে । রবিকাকা এর ছবি নিতে ভুললেন না । এবার গন্তব্যস্থল বুলবুলিয়া । পাশে একটি ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্যাম্প, ডেবান বনবাংলো থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে । কোনও গাড়িই সে-রাস্তায় চলতে পারে না । তাই পায়ে হেঁটেই যেতে হবে । রাস্তার দু'দিকে নিসর্গ দৃশ্যের কোনও তুলনা নেই । দেখে মনটা আনন্দে ভরে গেল দিপুর । দিপু ও ফরেস্ট গার্ড আগে-আগে, পেছনে চলেছেন রেঞ্জারবাবু ও রবিকাকা । ফরেস্ট গার্ডের হাতে বন্দুক, রেঞ্জারবাবু নিয়েছেন রাইফেল । রাইফেল-বন্দুক ছাড়া বনে ঢোকা যায় না । কখন কী ঘটে যাবে কেউ বলতে পারে না । নামধাপার মতো ঘন বনে । দিপু এক-একটা গাছ দেখছে আর ফরেস্ট গার্ডকে নাম জিজ্ঞেস করছে । ফরেস্ট গার্ডও জানিয়ে দিচ্ছেন এক-এক করে কোনওটার নাম—কারও নাম খোকন, হলক, 'মেকাই, গর্জন, শাল । বিশাল-বিশাল গাছ । সূর্যের আলোও মাটিতে পড়তে পারে না গাছের ছায়ার জন্য । যাওয়ার পথে হলদিবাড়ি ক্যাম্পে সাময়িক যাত্রাবিরতি হল । এখানেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারতে হবে । হলদিবাড়ির কাছে এসে বিভিন্ন বাঁশগাছ দেখে রবিকাকা ভীষণ খুশি । রেঞ্জারবাবু নামধাপা বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে রবিকাকা ও দিপুকে আরও বিশদভাবে জানালেন । নামধাপাতে ৬১টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ১০৫টি প্রজাতির পাখি ও প্রায় ২০টি প্রজাতির সাপ এবং নাম-না-জানা বেশ কিছু সরীসৃপ প্রজাতির প্রাণী রয়েছে । নামধাপা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনাঞ্চলের উচ্চতা দুশো মিটার থেকে প্রায় চার হাজার পাঁচশো মিটার । এই উচ্চতার বৈপরীত্য বনে এনেছে নানা বৈচিত্র্য । বনের বৈচিত্র্য এনেছে বন্যপ্রাণীও । চারটি বিরল প্রজাতির বড় বেড়াল এই নামধাপার বনে আছে । বাঘ, লেপার্ড, স্নো লেপার্ড, ক্লাউডেড লেপার্ড । এ ছাড়াও আছে বহু বিরল প্রাণী, যেমন, রেড পাণ্ডা, বিন্টুরং, বুনো মোষ, বাইসন, মিশমি টাকিন, কস্তুরী মৃগ ইত্যাদি । হলদিবাড়ি থেকে যাওয়া হল হর্নবিল পয়েন্ট-এ । বিভিন্ন বিপন্ন হর্নবিল প্রজাতির পাখি রেঞ্জারবাবু দেখাতে লাগলেন রবিকাকা ও দিপুকে । হর্নবিল পয়েন্ট থেকে সবাই যখন বুলবুলিয়ায় পৌঁছল, তখন সূর্য প্রায় ডুব-ডুবু । সে-রাতে বুলবুলিয়াতেই থাকার কথা । ওই

নামধাপায় বুনোহাতি
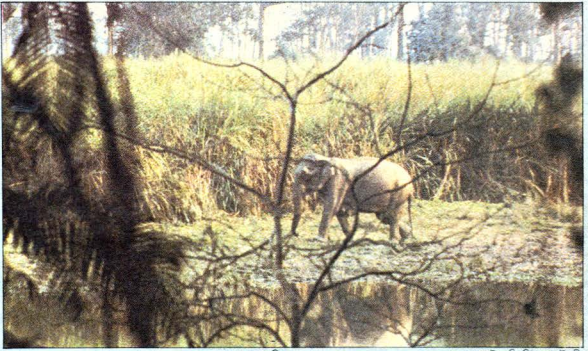
ফোটো : বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী

ক্যাম্পের নীচে রয়েছে বনবিভাগের তৈরি সল্ট-লিক, যেখানে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী নুন খেতে আসে। বুলবুলিয়া সত্যিই একটি অসাধারণ জায়গা। ক্যাম্প থেকে সরাসরি নীচে তাকালে নানা বন্য প্রাণী দেখা যায়। সম্বর, বার্কিং ডিয়ার তো আছেই, তার সঙ্গে আছে প্রায় একশোটির মতো বুনো হাতি। সার্চলাইটে বহুক্ষণ ধরে এদের দেখা গেল।

বুলবুলিয়া থেকে ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়েছে সকলে। দৃশ্য দেখতে-দেখতে সবাই চলেছে। বাঁশবন, বুনো কলাগাছ, বুনো আমগাছ, বেতের নিবিড় ঘন ঝোপ, আগাছার বন। ক্রমে পথটার দু'ধারের বন পথটাকেই যেন দু'দিক দিয়ে চেপে ধরেছে। বড়-বড় গাছের ডালপালা রাস্তার ওপর চাঁদোয়ার মতো নিচু হয়ে নেমে এসেছে। কালো গাছের গুঁড়ির তলায় নানা জাতীয় নাম-না-জানা ফার্ন। রবিকাকা সামনে তাকিয়ে দেখলেন পথটা ওপরের দিকে ঠেলে উঠছে। বন আরও কালো, ডান দিকে একটা উঁচু পাহাড়ের চুড়ো। রেঞ্জারবাবু হঠাৎ দূরে দেখিয়ে বললেন, "দুটো বুনো কুকুর এদিকে আসছে। সাবধান, এরা খুবই বিপজ্জনক জন্তু।" বাঁ দিকে বনবিভাগের একটি মিনার দেখিয়ে রবিকাকাকে বললেন, "আমরা এর ওপরে উঠে পড়ি চলুন, কারণ বুনো কুকুরকে বিশ্বাস নেই।" কিন্তু ফরেস্ট গার্ড ও দিপু কোথায়? ওরা যে বেশ পেছনে পড়ে গেছে। ওরা কি কুকুরদের দেখতে পায়নি! বলতে-বলতে ওঁরা দু'জনেই নজর মিনারের ওপরে উঠে

সানবার্ড

বসলেন ও ওপর থেকে তারস্বরে দিপুদের বলতে লাগলেন, "সাবধান, সামনে কুকুর।" ফরেস্ট গার্ড কুকুরের কথা শুনে ভয় পেয়ে একটা মেকাইগাছে উঠে বসলেন। দিপু পাশের একটা ছোট বাদামগাছে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেল। হঠাৎ তার কানে বন ভাঙার একটা শনশন আওয়াজ এল। ওদিকে প্রায় ছ-সাতটা কুকুর দিপুর কাছ থেকে ২০ গজের মধ্যে! এখনই না একটা বিপত্তি ঘটে যায়! দরদর করে ঘামতে লাগল দিপু। সেখান থেকে দেখতে-দেখতে বন ভেঙে যে বেরিয়ে এল, সে হচ্ছে নামধাপার ভয়ঙ্কর সুন্দর—মূর্তিমান বাঘ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না দিপু। বাঘটিকে দেখেই বুনো কুকুরের দলটি উলটো দিকে চোঁ-চা দৌড়। বাঘও তাদের তাড়াতে সেদিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল। বনে জলজ্যান্ত বাঘ ও বুনো কুকুর স্বচক্ষে দেখে দিপু শিহরিত। প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। তবে এ-যাত্রা সে বাঘের জন্য বুনো কুকুরের হাত থেকে বেঁচে গেল। তা না হলে কী যে হত সে-কথা ঈশ্বরই জানেন।

হলদিবাড়ি থেকে এবার ডেবান বাংলোতে ফেরার পালা। মিনিট-পনেরো চলার পর সঙ্গী ফরেস্ট গার্ড একটা খোকন গাছ দেখিয়ে চিৎকার করে বললেন, "অজগর, অজগর।" খোকন গাছের একেবারে মগডাল থেকে ঝুলছে এক বিরাট অজগর সাপ। গাছের ছালের রঙের সঙ্গে এতটাই মিলেমিশে ছিল যে, দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন একটা লতা ঝুলছে ওপর থেকে। মাটির দিকে চোখ রেখে সকলে চলেছে বন ভেদ করে। বাঘিনীর টাটকা পায়ের ছাপও চোখে পড়ল। রেঞ্জারবাবু বললেন, এখানে একটি বাঘিনী ও তার বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই খুব সাবধানে যাওয়া দরকার। যাতে কোনও ঝামেলায় না পড়ে যায়। হঠাৎ কিছু হর্নবিল পাখির ডাকতে ডাকতে উড়ে যাওয়া, অন্যদিকে কমন লাঙুরের এ-ডাল থেকে ও-ডালে যাওয়া দেখে রেঞ্জারবাবু মন্তব্য করলেন, "বাঘিনী আমাদের খুবই কাছে আছে, হয়তো আমাদের অনুসরণও করছে।" রেঞ্জারবাবু সামনে রাইফেল ও ফরেস্ট গার্ড পেছনে বন্দুক নিয়ে দিপু ও রবিকাকাকে মাঝখানে রেখে সাবধানে ডেবান বাংলোতে ফিরে এলেন। কিন্তু বাংলোতে ফিরে এসে পা দুটোর দিকে তাকিয়ে দিপু দেখল, তার দুটি পা-ই রক্তাক্ত। কারণ অসংখ্য জোঁক দু' পায়ের রক্ত খেয়েছে। এতক্ষণ নামধাপার বনে-বনে ঘুরতে-ঘুরতে দিপুর সেসব খেয়ালই ছিল না।

ছুটির অ্যালবাম

রত্নাকর

আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্রের মধ্যে তফাতটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। এই খেলাটি কিন্তু বর্গক্ষেত্রের খেলা। যে ক্ষেত্রের চারটি বাহু পরস্পর সমান, হ্যাঁ, সেটাই বর্গক্ষেত্র। এখন দ্যাখো, এই বর্গক্ষেত্রটির প্রত্যেক বাহুতে দুটি করে বিন্দু দেওয়া আছে। এক বাহুর একটি বিন্দু থেকে, যেমন ১ নং বিন্দু থেকে, বিপরীত বাহুর ঠিক বিপরীত বিন্দু, যেমন ৬ নং বিন্দু পর্যন্ত সরলরেখা টানলে। এইভাবে চারটি সরলরেখা টানলে দেখবে বর্গক্ষেত্রটির মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে আরও ন'টি বর্গক্ষেত্র। কিন্তু আসল খেলার কথায় আসি। এই বর্গক্ষেত্রটিকে মোট ছ'টি ভাগে ভাগ করতে হবে মোট চারটি
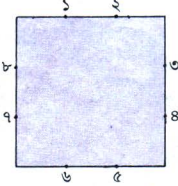
সরলরেখা টেনে। কী মনে হচ্ছে খুব কঠিন? কঠিন মনে হলেও, আসলে কিন্তু বেশ সোজা। তোমার বোঝার সুবিধের জন্য একটি সূত্র চুপিচুপি ধরিয়ে দিচ্ছি। চারটি সরলরেখা টেনে তুমি যে ছ'টি ভাগ পাবে, তার মধ্যে পাঁচটি ভাগ হবে কিন্তু একই মাপের। চেষ্টা করে দ্যাখো, তুমি পারলে তারপর বন্ধুদের করে দেখাতে বলো।

এখন ত্রিভুজের খেলা। তোমাদের জন্য একটি বড় ত্রিভুজের মধ্যে অনেক ত্রিভুজ এঁকে দেওয়া হল। খেলাটা এই যে, ঠিকমতো গুনে বলতে হবে মোট ক'টি ত্রিভুজ আছে ছবিটিতে। তুমি হয়তো ভাবছ, 'এ আর এমন কী কঠিন খেলা? অঙ্কে তো ভাল নম্বরই পাই।' কিন্তু গুনে দ্যাখো, দেখবে খেলাটি বেশ কঠিন।
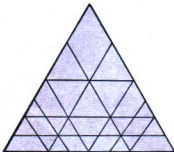
তোমাদের কাউকে ডেকে যদি বলি "তোমার বুদ্ধি ভীষণ কম," বা "তুমি খুব বোকা"— তখন নিশ্চয়ই খুব অভিমান হবে। জোর গলায় বলবে, "না, আমি একদম বোকা নই।" আমিও জানি তোমরা ভীষণ বুদ্ধিমান, কি পড়াশোনায়, কি বুদ্ধির খেলায়। কিন্তু তার আগে এই বুদ্ধির খেলায় জিততে হবে তো! তবেই তো প্রমাণ হবে যে, তুমি বুদ্ধিমান। তোমার সামনে মোট ছ'টি

ছবি রয়েছে। এই ছ'টি ছবির কোন ছবিটি নীচের চৌকো ফাঁকা ঘরটির মধ্যে বসবে বুদ্ধি খাটিয়ে বলতে হবে। খেলাটি আসলে সহজ! তোমাকে দেখতে হবে খুব মনোযোগ দিয়ে যে, নীচের ছবিগুলো কীরকম ক্রমপর্যায়ে সাজানো হয়েছে। তা হলেই তোমার উত্তর পেয়ে যাবে। নিজে পারলে তারপর বন্ধুদের সমাধান করতে দিয়ে বোকা বানিয়ে দাও।

(সমাধান ৫১৬ পাতায়)

ইলেকট্রনিক গেম্‌সের আশ্চর্য দুনিয়া

অনীশ দেব

অন্ধকার রাতে খোলা মাঠের ওপরে বিশাল একটা বাড়ি ভুতুড়ে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দুটো জানলায় আলো জ্বলছে। হঠাৎই একটা জানলায় দেখা গেল একটা ছায়ামূর্তি। তার লাল দুটো চোখ জ্বলছে-নিভছে। এই অবস্থায় শুরু হল লুকোচুরি খেলা। যে-করে হোক ধরে ফেলতে হবে ওই রহস্যময় ছায়ামূর্তিকে। এই ধরে ফেলার কাজে সাহায্য করবে কম্পিউটারের কি-বোর্ড। কারণ অলৌকিক জগতের ওই ভুতুড়ে বাড়ি কিংবা ছায়ামূর্তি, সবটাই কম্পিউটারের টিভি পরদায় ফুটে ওঠা রঙিন ছবি। আর এই ইলেকট্রনিক গেমটির নাম 'হন্টেড হাউস'। কি-বোর্ডের কয়েকটি নির্দিষ্ট বোতাম টিপে কোনও খেলোয়াড় তাড়া করে বেড়াতে পারে ছবির ছায়ামূর্তিকে। তখন গেম-এর প্রোগ্রাম অনুযায়ী ছায়ামূর্তিও পালিয়ে বেড়াবে রহস্যময় বাড়ির এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। তবে সে পেছনে ফেলে যাবে তার গতিবিধির নানা সূত্র। সেই সূত্র ধরেই শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলা যাবে তাকে। আর খেলোয়াড় যতগুলো সূত্রের অর্থ বুঝে ক্রমশ চূড়ান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে ততই বেড়ে যাবে তার পয়েন্ট। খেলতে-খেলতে একসময় সত্যিই মনে হবে বাস্তবে যেন কোনও চোর-পুলিশ খেলা চলছে। এমনই রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চকর এই লুকোচুরি খেলা।

সত্তরের দশকে যখন ইলেকট্রনিক গেম্‌স শুরু হয়েছিল তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল, এই খেলাগুলো নেহাতই ছেলেমানুষদের মাতিয়ে রাখার খেলা। ভিডিও গেম্‌স নামে শুরু হওয়া এই খেলাগুলো সাধারণত খেলা যেত কোনও রেস্তরাঁ কিংবা ভিডিও গেম্‌স পারলারে। এই যন্ত্রগুলোর নির্দিষ্ট গর্তে নির্দিষ্ট মূল্যের 'কয়েন' ফেলে দিলেই খেলোয়াড় খেলা শুরু করতে পারে। মোটর গাড়ির দৌড় থেকে শুরু করে নকল যুদ্ধ ইত্যাদি নানারকম খেলার ব্যবস্থা রয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রে। প্রথম দিকে এই খেলা আকর্ষণ করেছিল কিশোর-কিশোরীদের। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল বয়সের সীমারেখা দিয়ে খেলোয়াড়দের আর বাঁধা যাচ্ছে না। রোজই কয়েনে বোঝাই হয়ে উঠছে যন্ত্রগুলো।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রেস্তরাঁ বা পারলার থেকে ঘরে ঢুকে পড়ল ভিডিও গেম্‌স। এর প্রমাণ পাওয়া গেল 'অ্যাটারি'

কোম্পানির তৈরি ভিডিও গেম্‌স কার্ট্রিজ, কনসোল দুরন্তভাবে সফল হওয়ায়। রঙিন টিভির সঙ্গে এই কনসোল জুড়ে দিয়ে খেলা যায় অভিনব সব খেলা। বলতে গেলে প্রায় রাতারাতি লক্ষ-লক্ষ কনসোল ঢুকে পড়ল সাধারণ মানুষের ঘরে-ঘরে।
প্রায় এই সময়েই বাড়তে শুরু করে পার্সোনাল কম্পিউটারের জনপ্রিয়তা। কমোডোর-সিক্সটিফোর, অ্যাপল-টু, আই বি এম পিসি ইত্যাদির ব্যবহার পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে। তখন গেম ডিজাইনরা লক্ষ করলেন, পার্সোনাল কম্পিউটারকে মাধ্যম করে গড়ে তোলা যায় নতুন ধরনের ইলেকট্রনিক গেম্‌স। আশির দশকে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কম্পিউটার গেম্‌স। তবে পাশাপাশি নিচু লয়ে চলতে থাকে ভিডিও গেম্‌স কনসোল। ১৯৮৭ থেকে অ্যাটারির জায়গায় আসে 'নিন্‌টেন্‌ডো' কোম্পানি। এদের রোমাঞ্চকর তাক-লাগানো নানারকমের ভিডিও গেম্‌স অ্যাটারির দশগুণ ঝড় তুলল ভিডিও গেম্‌স খেলোয়াড়দের মধ্যে। নিন্‌টেন্‌ডোর কার্ট্রিজ হয়ে উঠল সবচেয়ে জনপ্রিয়। তবে নিন্‌টেন্‌ডোর পর অবশ্য অন্যেরা থেমে থাকেনি। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বাজারে এসেছে 'এন ই সি', 'সিগা', 'কম্পুসার্ভ', 'লুকাসফিল্ম গেম্‌স' ইত্যাদি কোম্পানির তৈরি ভিডিও গেম্‌স।
যতই দিন যেতে লাগল ততই আকর্ষক হয়ে উঠতে লাগল রঙিন গ্রাফিক্স ও তার অনুষঙ্গী শব্দলহরী—দশ বছর আগের কোনও অ্যাটারি গেম খেলোয়াড় যা কল্পনাও করতে পারে না। এর মূল কারণ, নতুন-নতুন জটিল সফ্‌টওয়্যার ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ। গেমসের জটিল প্রোগ্রাম ও তথ্য সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহার করা হতে লাগল নতুন সঞ্চয়-মাধ্যম সিডি-রম। এই ধরনের গেম্‌স সাঙ্ঘাতিক রকমের ইনটারঅ্যাকটিভ। অর্থাৎ, কম্পিউটার জীবন্ত বুদ্ধিমান কোনও মানুষের মতোই খেলা চালিয়ে যায় ভিডিও গেম্‌স খেলোয়াড়ের সঙ্গে। হয়তো আর কয়েক বছরের মধ্যেই এমন ইলেকট্রনিক গেম্‌স চালু হবে যা খেলোয়াড়ের কথার সরাসরি জবাব দেবে। সুতরাং ইলেকট্রনিক গেম্‌সের রঙিন দুনিয়ার সত্যি যেন কোনও শেষ নেই।

ইলেকট্রনিক গেম্‌স কতরকম

ইলেকট্রনিক গেম্‌স যে সত্যি কতরকম তার সঠিক কোনও হিসাব দেওয়া অসম্ভব। বিশেষ করে পার্সোনাল কম্পিউটার ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ার পর গেমসের রংচঙ আর কারিকুরি যেন লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়ছে। আর তার সঙ্গে রয়েছে মানানসই শব্দের আবহ। যেমন, 'ক্যাট' খেলাটার কথাই ধরা যাক। কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে বা ফ্লপি ডিস্কে

যদি খেলাটা স্টোর করা থাকে তা হলে স্রেফ সি এ টি—ক্যাট—শব্দটা কি-বোর্ডে টাইপ করে এনটার বোতাম টিপে দিলেই হবে। সঙ্গে-সঙ্গে কম্পিউটারের টিভির পরদায় ফুটে উঠবে একটা গলি। গলিতে সার বেঁধে সাজানো কয়েকটা উঁচু-নিচু জঞ্জালের ড্রাম। ঢাকনা আঁটা ড্রামগুলোর পেছনেই খাড়া কাঠের দেওয়াল। দেওয়ালের পরেই একটা ছ'-সাত তলা বাড়ি। বাড়ির সামনে কয়েকটা দড়ি টাঙানো আছে।

বলা বাহুল্য, গোটা ছবিটাই রঙিন। গোলাপি রঙের গলিতে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে একটা কুচকুচে কালো মেনি বেড়াল। টুকটুকে লাল কাচের গুলির মতো তার চোখ। কি-বোর্ডের কারসর কন্ট্রোল বোতামগুলো টিপে বেড়ালটাকে ডান দিক বা বাঁ দিকে ছোটানো যায়, খাড়াভাবে বা কোনাকুনি লাফও দেওয়ানো যায়। এইসব লাফালাফির খুবই প্রয়োজন, কারণ এক লাফে ড্রামের ওপরে না উঠে পড়লে যেতে হবে কুকুরের পেটে। একটা সাদা কুকুর থেকে-থেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে আসছে গলি দিয়ে। তখন যদি বেড়ালটা তার পথে পড়ে তো সঙ্গে-সঙ্গে তার দফারফা। আবার ড্রামের ওপরে উঠলেই যে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে তা নয়। কারণ সেখানে ঢাকনা খুলে মাঝে-মাঝেই উঁকি মারছে বড়সড় এক-একটা হুলো বেড়াল। অতএব মেনি বেড়ালের সামনে একটাই পথ খোলা : সেটা হল, ড্রামের ওপর থেকে এক লাফে কাঠের দেওয়ালের ওপরে, সেখান থেকে এক লাফে দড়িতে। তবে দড়িতে গিয়েও রক্ষা নেই। কারণ বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে বাসিন্দারা হঠাৎ-হঠাৎ কিসব ছুড়ে মারছে। তার কোনও একটি বস্তু ছটফটে মেনির গায়ে লাগলেই বেচারি অক্কা এবং খেলা শেষ। আর এইসব উড়ন্ত গোলার হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে এ-দড়ি থেকে ও-দড়িতে লাফালাফি করলে পাওয়া যাবে অনেক নেংটি ইঁদুর। যতগুলো নেংটি ইঁদুর শিকার করা যাবে, সেই হিসাবে নম্বরও পাওয়া যাবে।

এইরকম লাফালাফি করতে-করতে বেড়ালটা যদি বাড়ির কোনও খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে তা হলে সঙ্গে-সঙ্গেই বদলে যাবে দৃশ্যপট। দেখা যাবে একটা ঘরের ছবি। ঘরে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে একটা বড় কাচের জার—জলে ভর্তি। আর তার মধ্যে রয়েছে রঙিন মাছ।

ঘরে আরও একটা আশ্চর্য জিনিস চোখে পড়বে : সেটা হল, একটি ঝাড়ু। কোনও অদৃশ্য ঝাড়ুদার দ্রুত হাতে সেটা ব্যবহার করে চলেছে সারা ঘরে। বেড়ালের কাজ হল ঝাড়ুটিকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়ানো। সে লাফিয়ে উঠতে পারে আসবাবপত্রের ওপরে, কিংবা ছুটে বেড়াতে পারে ঘরের যেখানে-সেখানে। তবে ঝাড়ুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হলেই সর্বনাশ! ব্যাটের বাড়ি খাওয়া বলের মতো পাক খেতে-খেতে বেড়ালটা ছিটকে যেতে পারে যে-কোনও দিকে। সে বেরিয়ে যেতে পারে খোলা জানলার বাইরে অন্ধকারে—সেখানেই খেল খতম। অথবা সে গিয়ে পড়তে পারে জলভর্তি কাচের জারের মধ্যে।

তৎক্ষণাৎ আবার বদলে যাবে কম্পিউটারের মনিটারের ছবি। গোটা পরদা জুড়ে দেখা যাবে নীল জল, আর তাতে খেলা করছে নানারকমের রঙিন মাছ। তারই মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে সাঁতরে বেড়াচ্ছে বেড়াল। একবার এদিক, আর-একবার ওদিক। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্জারশাবকের অপঘাতে মৃত্যু। সেইসঙ্গে খেলাও শেষ। টিভির পরদায় ফুটে উঠবে খেলোয়াড়ের পাওয়া পয়েন্ট। এই খেলাটিতে বেড়ালের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে পয়েন্ট বাড়িয়ে নেওয়াটাই হচ্ছে গেম্‌স খেলোয়াড়ের কাজ। খেলার রঙিন গ্রাফিক্স যেমন আকর্ষক, তেমনই মজার এর আবহসঙ্গীত। মনে হয় বারবার খেলি।

এইরকমই আর-একটি খেলার নাম 'প্যারাট্রুপার'। এই খেলা শুরু হওয়া মাত্রই পরদার নীচের দিকে ঠিক মাঝখানে দেখা যায় একটা ঊর্ধ্বমুখী কামানের ছবি। কি-বোর্ডেরবোতাম টিপে কামানকে খুশিমতো ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরানো যায় এবং তা থেকে গুলিও ছোড়া যায়। পরদার ওপরের অংশে থেকে-থেকেই উড়ে যাচ্ছে শত্রুপক্ষের হেলিকপ্টার আর

বোমারু বিমান। কখনও তা থেকে নেমে আসছে ছত্রিসেনা বা প্যারাট্রুপার, আবার কখনও-বা ছোড়া হচ্ছে বোমা। কামানের গুলিতে প্লেন, হেলিকপ্টার, সৈন্য বা বোমা ধ্বংস করতে পারলে উপযুক্ত পয়েন্ট পাওয়া যাবে। আর প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলির জন্য এক পয়েন্ট করে কাটা যাবে। শত্রুপক্ষ খেলোয়াড়ের কামানটি ধ্বংস করে ফেলামাত্রই খেলা শেষ। পরদার একপাশে তখন লেখা থাকবে খেলোয়াড়ের পাওয়া পয়েন্ট। এর পর অন্য কোনও খেলোয়াড় প্রথম থেকে খেলা শুরু করতে পারে। পর পর অনেক খেলোয়াড় খেলার পালা শেষ করার পর সর্বোচ্চ পয়েন্ট পরদায় দেখা যাবে। অর্থাৎ, খেলা চলার সময় কম্পিউটার সবসময়েই বিভিন্ন খেলোয়াড়ের পাওয়া পয়েন্ট তুলনা করে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ফুটিয়ে রাখে পরদায়।

আবার 'ডিগার' কম্পিউটার গেম-এ সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে শুরু করে ক্রমানুসারে পর পর দশজন খেলোয়াড়ের নামের আদ্যক্ষর ও পয়েন্ট ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা আছে। এই খেলায় মাটিতে সুড়ঙ্গ কেটে ঘুরে বেড়ায় একটি পোকা। আর সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধায় তাকে তাড়া করে ঘুরে বেড়ায় দুটি কীট। এরই মাঝে রয়েছে নানা পুরস্কার—যেমন, টাকার থলি, মণিমুক্তো, লোভনীয় দুর্লভ ফল ইত্যাদি। পোকাটিকে যতক্ষণ অনুসরণকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে ততক্ষণই বাড়তে থাকবে পয়েন্ট। এ ছাড়া অনুসরণকারীদের নিকেশ করতে পারলেও পয়েন্ট এক লাফে অনেকটা বেড়ে যাবে। তার জন্য পোকাটির বিশেষ বন্দুকও রয়েছে।

ক্যাট, প্যারাট্রুপার, ডিগার ইত্যাদির মতো আরও যে কত রোমাঞ্চকর খেলা রয়েছে তার কোনও হিসাব নেই। আর খেলাগুলো এমনই যে, হাজার বর্ণনা দিয়েও তার আকর্ষণ বা অভিনবত্ব বোঝানো সম্ভব নয়। তবে আধুনিক কম্পিউটার গেম্‌স এসব খেলার চেয়ে অনেক বেশি দড়। সেখানে শুধুই কি-বোর্ডে চটপট আঙুল চালানোর পরীক্ষা নয়, বরং একই সঙ্গে থাকে বুদ্ধিরও পরীক্ষা।

যেমন 'টি এস আর ইনকরপোরেটেড'-এর কম্পিউটার গেম 'বাক রজার্স'। আগামী পঁচিশ শতকের পটভূমিতে এক-একটি খেলা এক-একটি রোমাঞ্চকর অভিযান। সেখানে রয়েছে আশ্চর্য রকমের উন্নত সব সভ্যতা, জেনেটিক প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি নতুন বুদ্ধিমান প্রজাতি, আর আগামী দিনের অত্যাশ্চর্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এই খেলায় খেলোয়াড়ের কাজ হল বুধ ও শুক্র গ্রহের শত্রুর হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা। খেলোয়াড়ের জন্য সূত্র ছড়ানো রয়েছে সৌরজগতের নানা জায়গায়, মহাকাশের নানা কক্ষপথ ধরে সে যেন ছুটে চলেছে মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে, সূত্রের সন্ধানে। কখনও-বা অনুসন্ধান চলছে বুধের উপগ্রহে। পৃথিবী তথা মানবজাতির ভবিষ্যৎ যেন নির্ভর করছে খেলোয়াড়টির ওপরে। খেলোয়াড় যদি দক্ষ ও বুদ্ধিমান হয়, তা.হলেই সে সফল হবে তার রোমাঞ্চকর অভিযানে। অন্যথায় পৃথিবী হয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন।

"কম্পুসার্ভ" বের করেছে নতুন গেম 'দ্য আইল্যান্ড অব কেস্‌মাই'। একশোজন পর্যন্ত একসঙ্গে এই খেলা খেলতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে দুস্তর মরুপ্রান্তর, পাহাড়ের চূড়োয় অবস্থিত সব আজব নগরী, স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার সমাধি-কুঠরি, আর কম্পিউটার গ্রাফিক্সে তৈরি তিন হাজার দুশো পঞ্চাশটি গা-শিরশির-করা ভয়ঙ্কর প্রাণী। এ-ধরনের খেলাকে বলা হয় মালটি-প্লেয়ার গেম্‌স। এই খেলার জন্য দরকার একটি পার্সোনাল কম্পিউটার, একটি মোডেম—অর্থাৎ, মডিউলেটর ডিমডিউলেটর—এবং কম্পুসার্ভ-এর সদস্য পদ।

'বাক রজার্স' বা 'দ্য আইল্যান্ড অব কেস্‌মাই' যে-ধরনের খেলা, তাদের বলা হয় রোল প্লেয়িং গেম। প্রথম রোল প্লেয়িং গেম তৈরি করেছিলেন গ্যারি গাইগ্যাক্স নামের শিকাগোবাসী একজন ইনসিওরেন্স ব্রোকার। ১৯৭৪ সালে 'ডানজন্‌স অ্যান্ড ড্র্যাগন্‌স' নামে তাঁর তৈরি খেলাটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পায়। এখন সারা পৃথিবী জুড়ে রোল প্লেয়িং গেম-এর ফ্যানটাসি অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে মেতে আছে এক কোটিরও বেশি খেলোয়াড়। এইসব গেম্‌স তৈরির জন্য মূল কাহিনী হিসাবে বিভিন্ন লেখকের রোমাঞ্চকর উপন্যাস ব্যবহার করা হয়। যেমন, স্টিফেন কুন্ট্‌স-এর উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি রোল প্লেয়িং গেম 'ফ্লাইট অব দ্য ইনট্রুডার'।

অজানাকে জানার জন্য ইলেকট্রনিক গেম্‌স

কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীতে প্রথম কম্পিউটার-শিক্ষকের আবির্ভাব। কোন বিষয়ে পড়াশোনা করতে চাই তা রোবট-শিক্ষক বা কম্পিউটার-শিক্ষককে জানিয়ে দিলেই হল। অবশ্য জানিয়ে দেওয়ার এই কাজটা করতে হবে কি-বোর্ড জাতীয় কোনও ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে। তখন পড়াশোনার কাজ শুরু হয়ে যাবে। টিভি পরদায় ফুটে উঠবে সেই বিষয়ের নানা প্রশ্ন ও উত্তর। কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীর লেখকদের দূরদৃষ্টি অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ এখন নানা রূপে নানা নামে ঘরে-ঘরে ঢুকে পড়ছে ইলেকট্রনিক যন্ত্র-শিক্ষকেরা। আর খেলার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখার মতো মজার জিনিস আর হয় না। এভাবে পড়াশোনা করলে মনেও থাকে বেশিদিন। কারণ যে-বিষয়ে পড়াশোনা করছি তার সবটাই রঙিন ছবির মাধ্যমে ঘটে যাচ্ছে চোখের সামনে।

সন্দেহ নেই, শিক্ষার জগতে কম্পিউটার বড় আশীর্বাদ। কিন্তু একসময়ে যে-কম্পিউটার ছিল শুধুই শিক্ষাবিদদের আওতায়, এখন তা নয়। ছবি পালটে গেছে। ছোটদের জন্য নিত্যনতুন তৈরি হচ্ছে এডুকেশনাল সফ্‌টওয়্যার। নানা আমোদপ্রমোদের মোড়কে তৈরি করা এই সফ্‌টওয়্যার যেন ভিন্ন জাতের কম্পিউটার গেম্‌স। স্কুলপাঠ্য বিষয়ের সিলেবাসভিত্তিক আলোচনা নিয়েই এইসব সফ্‌টওয়্যার তৈরি করছেন নানা প্রকাশক। যেমন, ব্রিটানিকা সফ্‌টওয়্যার, ডেভিডসন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, দ্য লার্নিং কোম্পানি, বরডারবান্ড ইত্যাদি। এঁদের প্রকাশিত বিষয় হল অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, আরও কত কী!

কম্পিউটার-শিক্ষকের সবচেয়ে বড় গুণ হল, সে কখনও ক্লান্ত হয় না। ফলে একটি শিক্ষামূলক সফ্‌টওয়্যার একটানা অক্লান্তভাবে কোনও ছাত্রকে সাহায্য করতে পারে। আর এইসব সফ্‌টওয়্যার যেসব বিশেষজ্ঞ ডিজাইন করেন তাঁদের মূল লক্ষ্য থাকে কী করে এর প্রতিটি ধাপ শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষক করে তোলা যায়।

প্রথমে ধরা যাক, ব্রিটানিকা সফ্‌টওয়্যারের কথা। এঁদের প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি সফ্‌টওয়্যার হল 'কম্পটন্‌স মালটিমিডিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া'। এই বিশ্বকোষের ছাব্বিশটি খণ্ড সঞ্চয় করা আছে একটি সিডি-রম ডিস্কে। এই ডিস্ক সহজেই চালানো যায় পার্সোনাল কম্পিউটারে।

বিশ্বকোষটির ছাব্বিশটি খণ্ডে রয়েছে বত্রিশ হাজার বিষয় । সঙ্গে হাজার-হাজার রঙিন ছবি, বহু বিষয়ের রঙিন চলচ্চিত্র রূপ আর সারা পৃথিবীর রঙিন মানচিত্র । এ ছাড়া আছে বিখ্যাত মানুষের বক্তৃতার নির্বাচিত অংশ, গান ও সঙ্গীত, প্রায় একঘণ্টা ধরে । রয়েছে সম্পূর্ণ অভিধান । আর-একটি বিজ্ঞান শব্দকোষ—যা উচ্চারণ করে ব্যবহারকারীকে শব্দটা শুনিয়ে দেয় । একটি সিডি-রম ডিস্কের মধ্যে এতসব আশ্চর্য তথ্য—শুনলে নেহাতই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে ।
এরকম আর-একটি উদাহরণ হল 'প্রডিজি সার্ভিসেস কোম্পানি'-র বিভিন্ন সফটওয়্যার প্যাকেজ । মাসিক চাঁদা দিয়ে প্রডিজি সার্ভিসের সফটওয়্যার ব্যবহারের সুবিধা নেওয়া যায়—এ যেন অনেকটা সাম্প্রতিককালে কলকাতায় চালু হওয়া কেবল টিভি-র মতো । অর্থাৎ, যিনি প্রডিজির মাসিক সদস্য হবেন, তাঁর আই বি এম কমপ্যাটিব্‌ল পার্সোনাল কম্পিউটারটি জুড়ে দেওয়া হবে প্রডিজির হোস্ট কম্পিউটারের সঙ্গে । এর জন্য সদস্যের কম্পিউটারে দুশো ছাপ্পান্ন কিলোবাইট তথ্য সঞ্চয় করার মতো র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমোরি বা 'র‍্যাম' থাকলেই হল । এ ছাড়া দরকার উপযুক্ত গ্রাফিক্স প্রদর্শনের ক্ষমতা ।
কী-কী বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে এই কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে ? প্রথমেই যে-বিষয়টির নাম করতে হয় সেটা হল : 'গ্রলিয়ার'-এর একুশ খণ্ডের বিশ্বকোষ ব্যবহার করা যাবে কি-বোর্ডের বোতাম টেপামাত্রই । অর্থাৎ, প্রায় তেত্রিশ হাজার বিষয় সম্পর্কে যখন খুশি জেনে নেওয়া যায় । আর নানা বিষয়ের লেখাগুলো যাতে সবসময়েই সাম্প্রতিক তথ্যে সমৃদ্ধ থাকে সেইজন্য প্রডিজি সার্ভিসেস প্রতি তিনমাস অন্তর বিষয়গুলোর সংস্করণ করেন । সোজা কথায় প্রডিজির সদস্য হিসাবে নখদর্পণে থাকবে একটি অন-লাইন এনসাইক্লোপিডিয়া ।

শুধু তাই নয়, আগ্রহী সদস্যরা পেতে পারেন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলার টাটকা খবর । কিংবা শেয়ার বাজারের ওঠানামার খবর জেনে কম্পিউটার টার্মিনালে বসেই খুশিমতো শেয়ার কেনাবেচা করা যেতে পারে । অথবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত উপদেশ পাওয়া যেতে পারে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে । এ ছাড়া, কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রডিজি সার্ভিসেস-এর প্রায় পাঁচ লক্ষ সদস্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো যেতে পারে ।
এতসব সুবিধার জন্য মাসিক চাঁদা দিতে হবে মাত্র তেরো ডলার । যাঁরা সদস্য হতে চান তাঁদের সুবিধার জন্য প্রডিজি সার্ভিসেস কোম্পানি বিনামূল্যে বিতরণ করে প্রিভিউ ফ্লপি ডিস্ক । এতে তাঁদের নানা সফটওয়্যারের বিভিন্ন গুণপনার অংশবিশেষ দেওয়া থাকে । এটা ব্যবহার করে দেখলে প্রডিজির সদস্য হতে যে মন চাইবে তাতে সন্দেহ নেই ।

কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীর রূপায়ণে ইলেকট্রনিক গেম্‌স

কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীর ঘনঘটা যেন বিজ্ঞান-সুবাসিত আরব্য রজনীর এক আশ্চর্য জগৎ । ইলেকট্রনিক গেমসের গ্রাফিক্স যেন কল্পবিজ্ঞানের কথা ভেবেই তৈরি । এককথায় রাজযোটক ।
এমনিতেই ইলেকট্রনিক গেমসের মধ্যে কোথায় যেন কল্পবিজ্ঞানের সুর লুকিয়ে রয়েছে । কারণ খেলোয়াড় নির্দিষ্ট বোতাম টেপা মাত্রই টিভি মনিটরে ফুটে ওঠে কল্পনার জগতের রঙিন ছবি । আর জগতের প্রায় সবরকম নিয়ন্ত্রণের মালিক গেম্‌স খেলোয়াড় নিজে ।
শুরুর দিকে কল্পবিজ্ঞানের ঢঙে যেসব কার্ট্রিজ গেম্‌স চালু হয়েছিল তার মধ্যে বিখ্যাত হল 'স্পেসওয়ার' এবং 'অ্যাস্টারয়েড্‌স' । 'স্পেসওয়ার' যেন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র 'স্টার ওয়ার্স'-এরই নামান্তর । কারণ সেখানে রয়েছে লড়াকু সব মহাকাশযান, আর মহাকাশে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে উজ্জ্বল নক্ষত্র, কৃষ্ণ গহ্বর আর মাধ্যাকর্ষণ কূপ । তবে 'অ্যাস্টারয়েড' খেলাটিতে খেলোয়াড়ের জন্য বরাদ্দ করা আছে একটি মহাকাশযান আর উপযুক্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র । খেলোয়াড় তার খুশিমতো মহাকাশে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে এই যানটি, আর প্রাণভরে চালাতে পারে আধুনিক সব মারণাস্ত্র ।
কল্পবিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর জগতের হাতছানিতে প্রাথমিকভাবে সাড়া দেওয়ার পর আশির দশকের মাঝামাঝি এল 'ইলেকট্রনিক আর্টস'-এর নতুন সায়েন্স ফিকশন বা এস এফ গেম 'এম· ইউ· এল· ই' । এই খেলায় খেলোয়াড়দের দায়িত্ব অনেক বেশি । মহাকাশের বিপদসঙ্কুল নানা গ্রহে রোবট পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে শিল্প বা কলকারখানা গড়ে তোলার চেষ্টাই হচ্ছে খেলোয়াড়ের প্রধান কাজ ।

এর চেয়েও উন্নত এস এফ গেম্‌স 'ফায়ারবার্ড'-এর 'এলিট' বা 'স্টারফ্লিট' বা 'ব্রিচ' সিরিজ । এ ছাড়াও আছে 'লুকাসফিল্ম গেম্‌স'-এর 'দ্য সিক্রেট অব মাঙ্কি আইল্যান্ড' । ডিজাইনার রন গিলবার্টের তৈরি এ এক কল্পবিজ্ঞান অ্যাডভেঞ্চার । এ ছাড়া একই কোম্পানির তৈরি অ্যাডভেঞ্চার কম্পিউটার গেম্‌স 'লুম' এবং 'ইন্ডিয়ানা জোন্‌স অ্যান্ড দ্য লাস্ট ক্রুসেড' অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা পেয়েছে । অনেকটা একই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার গেম 'ম্যাজিশিয়ান লর্ড' চালু করেছে 'নিওজিও' কোম্পানি ।
গত দু-এক বছরে কল্পবিজ্ঞান লেখকদের গল্প-উপন্যাসকেও রূপান্তরিত করা হয়েছে কম্পিউটার-চলচ্চিত্রে.। উইলিয়াম গিবসনের 'নিউরোম্যান্সার' উপন্যাসটিকে কম্পিউটার গেমসের রূপ দিয়েছে 'ইন্টারপ্লে' কোম্পানি । জর্জ আলেক এফিঙ্গার-এর 'এ ফায়ার ইন দ্য সান' কম্পিউটারের পরদায় হয়েছে 'সার্কিট্‌স এজ' । এই নতুন গেম্‌স-এর নামই হয়ে গেছে 'সায়েন্স ফিকশন গেম্‌স' । এই তালিকায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে 'ব্যাক টু দ্য ফিউচার, পার্ট টু' ।
হয়তো খুব শিগগিরই আইজ্যাক অ্যাসিমভ, রে ব্র্যাডবেরি, আর্থার সি ক্লার্ক, রবার্ট হাইনলাইন অথবা ফ্র্যাঙ্ক হার্বার্ট-এর গল্প-উপন্যাস নিয়ে তৈরি হবে কল্পলোকের ইলেকট্রনিক গেম্‌স ।

প্রায় পঁচানব্বই বছর আগে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রন কণার আবিষ্কার দিয়ে বিজ্ঞানে যে-নতুন শাখা ইলেকট্রনিক্‌স-এর সূচনা, আজ নানা আবিষ্কারের পথ পাড়ি দিয়ে সে পৌঁছে গেছে ইলেকট্রনিক গেম্‌সের রঙিন কল্পলোকের জগতে ।

সম্পূর্ণ উপন্যাস

মা এক নির্ভীক সৈনিক

শৈলেন ঘোষ

ছবি : বিমল দাস

সে কতদিন আগের কথা। হবে হয়তো চার হাজার বছর। এক যে ছিল রাজা। সে রাজা ভয়ঙ্কর। তার নাম বুমবুজাং। তার হিংসুটে চোখ দুটো যেন দপদপ করছে, অন্ধকার গুহার ভেতর। মাথায় একঝাঁক চুল। লম্বা, নোংরা, রুক্ষ। গালভর্তি দাড়ি। রোদে ঝলসানো খসখসে চামড়া। ময়লা। রাজা চান করে কালেভদ্রে। যেমন রাজা, তেমনই তার প্রজারাও। তেমনই সৈন্য-সামন্ত, আর সক্কলে।

এ-রাজার না ছিল রাজপ্রাসাদ, না কোনও দুর্গ। ছিল না রাজসিংহাসনও। তার সিংহাসন ছিল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার পিঠে বসেই রাজা রাজকাজ চালাত। দেশশাসন করত। তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত। আসলে বুমবুজাং ছিল এক ঘোড়সওয়ার যাযাবর রাজা। এ-রাজার টাকা ছিল না। সোনা ছিল। এ-রাজার রাজ্যে লেখাপড়ার বালাই ছিল না। সবাই মুখ্যু। এমনকী, রাজাও। রাজার পাত্র-মিত্র তারাও। হবেই তো। কেননা, সে-রাজ্যে লেখাপড়ার অক্ষরই ছিল না। তাই কারও অক্ষর-জ্ঞানও ছিল না।

রাজা যেমন যাযাবর ঘোড়সওয়ার, তেমনই তার প্রজারাও। তারাও রাজার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত ঘোড়ায় চড়ে। সবার ছিল নিজের-নিজের ঘোড়া। হাজার-হাজার প্রজার হাজার-হাজার ঘোড়া। হাজার-হাজার ঘোড়া যখন মাটি কাঁপিয়ে ছুটত, মনে হত ভূমিকম্প হচ্ছে। এই বুঝি মাটি ফেটে পাতাল বেরিয়ে পড়ে।

রাজার যে রানি, তার কিন্তু ঘোড়ায় চড়া বারণ। তার ছিল ছ' চাকার গাড়ি। সে-গাড়ি হয় বলদে টানে, না-হয় চামরি। গাড়ির ওপর তিনখানা ঘর। শোবার ঘর। বসার ঘর। খাবার ঘর। রাজার ঘোড়া ছুটত, টগবগ-টগবগ, আর, রানির গাড়ি টানত, বলদ, ঝমঝম-ঝমঝম। রানি গাড়িতে সেজেগুজে বসত। বসে-বসে ইতিউতি চাইত। আর থেকে-থেকে হাই তুলত।

তা, রানির সাজ দেখলেও মরে যাই। কাঠবিড়ালির লোম। সেই লোমের তৈরি লম্বা জামা। জামার নীচে টাট্টুঘোড়ার চামড়া দিয়ে ঝালর-সেলাই। ধারে-ধারে উদ্‌বেড়ালের লোম। জামার হাতায় নকশা-আঁকা। রং-বেরং। পায়ে তার পশমি-মোজা। লাল জুতুয়া।

শুধু যে রানিই গাড়িতে থাকত তাই নয়। এ-রাজার বলদ-জোতা গাড়ি ছিল সব মেয়ে-প্রজারই। অবিশ্যি তাদের গাড়ি কি আর রানির মতো! সে-গাড়ি অতবড়ও না। শৌখিনও নয়। সে-গাড়ি চার চাকার। গাড়ির ওপর একটি কি দুটি ঘর। সেই ঘরে তাদের থাকত ঘরকন্নার সাতসতেরো জিনিসপত্তর। খুঁটিনাটি এটা-ওটা।

এমনই এক গাড়ির ঘরে সংসার ছিল কোহেনের মার। তার নাম ছিল, আনাতুরি। কোহেনের বাবা ছুটত গাড়ির আগে-আগে, ঘোড়ার পিঠে। সে ছিল স্তান। স্তান রাজার কাছের মানুষ। রাজার বিশ্বাসী সহচর। সে যেমন যুদ্ধ করতে পারত, তেমনই রোগ-জ্বালায় দাওয়াই দিত। যেমন সে রাজার ভবিষ্যৎ বলতে পারত, তেমনই পারত ধুমধাড়াক্কা বাজনা বাজিয়ে পিশাচের সঙ্গে নাচতেও। হ্যাঁ, স্তান জানত কুহক-বিদ্যে। এই কুহক-বিদ্যের জোরেই সে করত অসাধ্য সাধন। তাই রাজা তাকে কী খাতিরই না করত! কিন্তু যেদিন স্তানকে হত্যা করা হল! সেদিনই শুরু হল গল্প। এক মায়ের গল্প। কোহেনের মা, আনাতুরির গল্প।

যে-মায়ের বুকভর্তি ছিল মমতা। ছিল ভালবাসা। না, থাক এখন সে-কথা।

একটা মস্ত মুল্লুকের রাজা ছিল এই বুমবুজাং। কে তাকে এই মুল্লুক দিয়েছিল, কেউ জানে না। কেউ দিয়েছিল, না নিজেই জবরদস্তি দখল করেছিল, তাও কারও জানা নেই। মুল্লুক বলতে সে তো ওই ধু-ধু করছে জমি। জমির পর জমি। ওপরে খোলা আকাশ। তারও যেমন সীমা নেই। নীচে তেমনই এই জমি। তারও তেমন শেষ নেই। দেখতে-দেখতে চোখের নাগাল থই হারায়। এর নাম স্তেপ। শুকনো ঘাসের জমি। ঘাসের পাতায় বাতাস ছোটে হিসহিস করে। রাতের বেলা ঠাণ্ডা কাঁপে হিহি করে। কোথাও পাহাড়, ককেশাস। তার চুড়োয় তুষার গলে। এধারে নদী, ওধারে নদী। ডন আর দানিয়ুব। বয়ে যায়। কৃষ্ণসাগরে ঢেউ ওঠে ফুলে-ফুলে বুক কাঁপিয়ে। আরও দূরে, অনেক দূরে, গাছের পর গাছ। ওক-পাইনের বন। গা-ছমছম। যুদ্ধের সময় এই বনই রাজার দুর্গ। এই দুর্গ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ো শত্রুর ওপর, আচমকা। তীরের পর তীর ছুড়ে মারো শত্রুকে। শেষ করে ফেলো। শত্রুর মুণ্ডুগুলো ছিঁড়ে নিয়ে লুফে-লুফে খেলা করো। তারপর তাদের রক্ত পান করো। গায়ে মাখো। নয়তো মুণ্ডুগুলো সাফ করে তৈরি করো পানপাত্র। শত্রুর গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তৈরি করো নরম গদি। কিংবা চামড়া দিয়ে বানিয়ে নাও, গায়ের জামা। আলখাল্লা। আর, তা যদি না চাও, ধরে আনো শত্রুকে যুদ্ধ-দেবতার সামনে। বলি দাও। সে কী বীভৎস দৃশ্য!

রাজা বুমবুজাং নোংরা যেমন, তার বাবুয়ানাও তেমনই। পোশাকের বহর দেখে থমকে যাবে। গায়ের জামা, সে তো তৈরি মরুর দেশের পশুর চামড়ায়। নরম যেন মখমল। কতরকম নকশা-বোনা সেই জামাতে। চামড়ার কাজ করা জামার গায়ে। কী সুন্দর। জামার বুকে ছুটন্ত হরিণের ছবি। তার চোখে সোনার পুঁতি। তা, আজ যদি রাজা এইটা পরে, তো কাল পরবে আর-একটা। কালকেরটা নেউলের লোমের তৈরি। সেটা কাফটান। তাতে অগুনতি সোনায়-মোড়া কাঠের লকেট সাজানো। ঝুলছে আর দুলছে। রাজার মাথায় টুপি, কান চাপা। ঢেউখেলানো। সে-টুপি কপাল থেকে পিছিয়ে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত। বাতাস না ঢোকে। উফ! সে বাতাসের কী তেজ! যেন হাড়ের ভেতর খামচি দিচ্ছে বরফের। রাজার পা-পর্যন্ত-লম্বা পাতলুন, সেও তৈরি চামড়ার। সেই পাতলুন জুতোর ভেতর অবধি ঢুকে গেছে। আর সে-জুতোও কেমন নরম! কেমন তুলতুলে!

রাজা বুমবুজাংয়ের বাবাও ছিল এক দুর্ধর্ষ রাজা। সে-ও যে কত মানুষ মেরেছে। কত যুদ্ধ যে জয় করেছে! তা আর কে গুনে রেখেছে। কিন্তু রাজা বুমবুজাংয়ের বাবা যেদিন মারা গেল, সেদিন কী রক্তারক্তি কাণ্ড। মানুষ মানুষকে মারছে। রক্ত মেখে আর্তনাদ করছে। আকাশ কাঁপাচ্ছে। কবর তৈরি করছে। কবরকে ওরা বলে কুরগাঁ। সে-কুরগাঁ মস্ত বড়। তার ভেতরে অনেক ঘর। বানানো হল। একটি ঘরে রাজা থাকবে। অন্য ঘরে থাকবে তার আপনজন। রাজা মারা গেলে তাদেরও মরতে হল। তাদের হত্যা করা হল গলা টিপে। তাদের মৃতদেহ থাকবে রাজার পাশে-পাশে। অন্য ঘরে। রাজার জন্য তৈরি হল শবাধার। কাঠের। অপরূপ কাজ-করা। মৃত রাজাকে সাজানো হল। সব সেরা পোশাকগুলি তার গায়ে পরানো হল। শবাধারে তার মৃতদেহটি শোয়ানো হল। তারপর রাখা হল কুরগাঁয়ে, তার ঘরে। রংচঙে গালিচা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে সেই ঘর। সে-গালিচা পশমের তৈরি। ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কতরকমের পরদা। কত কারুকাজ তাতে। কাঠের তৈরি হরেক আসবাব। আর সোনার তৈরি অমূল্য সব গয়নাগাটি। ঝলমলিয়ে উঠছে সেই কুরগাঁ।

রঙে-রঙে রং ছড়িয়ে উপচে উঠছে।

সোনা। সোনা তাদের দেবতা। সোনা তাদের জীবন। এই সোনার দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য কত মানুষের জীবন গেছে। কত রক্ত ঝরেছে। শীতের রাত। অন্ধকার। আগুন জ্বলছে ধিকি-ধিকি। সেই আগুন ঘিরে তারা গল্প করে। সোনার গল্প : এক যে ছিল দেশ। সে এক অনেক দূরের দেশ। সেই অনেক দূরের দেশে ছিল সোনার ভাণ্ডার। সে কত সোনা। মেপেজুখে শেষ হয় না। দেখে-দেখে শেষ হয় না। অজস্র সোনা। এই সোনার ভাণ্ডারের পাহারাদার ছিল গ্রিফিন। কী ভয়ঙ্কর দেখতে সেই গ্রিফিনকে! দেখতে খানিকটা সিংহের মতো। খানিকটা যেন ছোঁ-মারা ঈগল। পাছে কেউ এই সোনার ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে যায়, তাই সে দিনরাত জাগত। জেগে-জেগে নজরদারি করত। একবার কী হল, আরমাসপিয়ানরা এই সোনার খবর কেমন করে যেন জানতে পারল। এই আরমাসপিয়ানরা ছিল একচোখো মানুষ। তারা থাকত উত্তরে। সেই ঠাণ্ডার দেশ, সাইবেরিয়ায়। একদিন তারা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল দেশ থেকে। অনেকখানি পথ এল তারা চিনতে-চিনতে। একচোখে। তারপর একদিন তারা খুঁজে পেল সেই সোনার ভাণ্ডার। ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা পাহারাদার গ্রিফিনের ওপর। তুমুল লড়াই হল গ্রিফিনের সঙ্গে। গ্রিফিন সেই একচোখো মানুষদের কখনও সিংহের থাবায় শেষ করে ফেলে। আবার কখনও ঈগলের মতো ছোঁ মারে। অনেক আরমাসপিয়ানকে তারা মেরে ফেলল। কিন্তু সবাইকে পারল না। শেষে আরমাসপিয়ানদের হাতেই গ্রিফিন মারা পড়ল। শেষমেশ এই একচোখো মানুষের দলই হল সোনার মালিক।

তা, এ-গল্প রূপকথার মতো শোনালেও, সত্যি। সত্যি বলেই বিশ্বাস করত স্তেপের এই ঘোড়সওয়ার মানুষেরা।

॥ ২ ॥

রাজা বুমবুজাং রাজা হল যেদিন থেকে, স্তানের কপালও খুলল সেদিন থেকে। রাজা যেতে চায় উত্তর দিকে। ডাক পড়ল স্তানের। এই নাও একমুঠো সোনা। বলো, উত্তরে যাওয়া ঠিক হবে কি রাজার, এখনই? কোনও বিপদ কি আছে উত্তরে?

স্তান অমনই শুরু করে দিল ভোজবাজি। ঘুরঘুট্টি রাত। অন্ধকার। সুনসান চারদিক। বাতাস বইছে হু-হু। স্তেপের বুক কাঁপছে হা-হা। যেন নিশ্বাস ফেলছে পিশাচ। সেই নিশ্বাসের তালে-তালে ডুগডুগি বাজে। স্তান বাজায়। স্তান নাচে। যেন একটা ক্ষিপ্ত নেকড়ে। নাচতে-নাচতে চেঁচায় সে। নাচতে-নাচতে নিজেরই মাথার চুল খামচে ধরে। খেঁকিয়ে ওঠে :

তুফান ছোটে শন-শন-শন
বনবাদাড়ে ঝড়,
পা-টনটন পিশাচ রে তুই
হুমড়ি খেয়ে মর!
যাচ্ছে রাজা উত্তরে বল
তার কি বিপদ আছে?
সে-পথে কি নাক-খিঁচিয়ে
ভূত-ভূতুনি হাঁচে?

কিন্তু পিশাচ যে কী উত্তর দিত, কেউ জানত না। জানত শুধু স্তান। রাজার কানের কাছে মুখ। স্তানের মুখ। মুখে ফিসফিস শব্দ। রাজার কানের ভেতর ফিসফিসিয়ে স্তান শুনিয়ে দিত সেই কথা। তারপর রাজা ঠিক করত, যাবে কোন দিকে। উত্তরে, না, দক্ষিণে। না কি যাওয়াই নয় কোনও দিকেই। তবে কি যেদিকেই যাও, বিপদ সেই দিকেই।

একবার হল কি, বুমবুজাং-এর ছেলে, তার নাম তিত্তাচিনি, তার হল ভীষণ অসুখ। প্রাণ নিয়ে টানাটানি। ছেলে বুঝি বাঁচে না। ডাক, ডাক, স্তানকে ডাক। স্তান এল। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু করল স্তান তন্ত্র-মন্ত্র, ভোজবাজি। জ্বালা হল আগুন। দাউ-দাউ। আনা হল তিত্তাচিনিকে সেই আগুনের ধারে। স্তানের চোখ কটমট, দাঁত কড়মড়। মন্ত্র পড়ে। বুক ধড়ফড়। তারপর ধাঁই-ধপাধপ নৃত্য শুরু। নাচতে-নাচতে হুঙ্কার ছাড়ে। হা-হা করে অট্টহাসে। হাসতে-হাসতে গড়াগড়ি। আগুন নিয়ে ছোড়াছুড়ি। তখন কী মূর্তি স্তানের। দেখলে গায়ের রক্ত হিম। মানুষজন হিমশিম।

যাক, সে-যাত্রায় তিত্তাচিনি জানে বাঁচল। স্তানেরও আদর বাড়ল। বাড়ল যেমন রাজার কাছে, তেমনই বাড়ল রানির কাছে। রানি বলল, "স্তান, এখন থেকে আমার ছেলের দেখভাল তোমার হাতে। তাকে তুমি ছেলের মতো দেখবে। তাকে তুমি কেমন করে যুদ্ধ করতে হয়, শেখাবে। শেখাবে, শত্রুকে ঘায়েল করতে আর তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আনতে।"

ঠিক তখন থেকেই রাজার ছেলে তিত্তাচিনি স্তানের কাছে বেড়ে ওঠে। তিত্তাচিনি বড় হয় একটু-একটু। একটু-একটু শেখে ঘোড়া ছোটাতে। শেখে, ঘোড়ার পিঠে ছুটতে-ছুটতে তীর ছুড়তে। যুদ্ধ করতে। মানুষ মারতে।

এমনই করে মারতে-মারতে তিত্তাচিনিও হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। ওর বাবার মতো ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর রাজা বুমবুজাংয়ের ভয়ঙ্কর ছেলে তিত্তাচিনি। একজন যুদ্ধবাজ রাজপুত্র। বন থেকে আচমকা সে বেরিয়ে আসে। ঘোড়া ছোটায় তীরবেগে। ঘোড়ার খুরে শব্দ ওঠে। ধুলো ওড়ে। ধুলোর ঝাঁকে লুকিয়ে-লুকিয়ে শত্রুর এলাকায় ঢুকে পড়ে। তীর ছোড়ে শত্রুকে তাক করে। তারপর আবার লুকিয়ে পড়ে। বনের ভেতর। আবার কখনও আকাশ শেষে ওই যে দূর, ওই দূরে হারিয়ে যায় ফুসমন্তরে। কেমন করে, কেউ বুঝতেই পারে না।

এখন তিত্তাচিনি বড় হয়েছে। তাই সে জানে তাদের বলে কোলোৎস। এই স্তেপে যারা থাকে তারা সবাই কোলোৎস। অন্য দেশের মানুষ তাদের বলে সাইথিয়ান। সাইথিয়ান মানে জানে না তিত্তাচিনি। কিন্তু সে জানে, সাইথিয়ানদের মধ্যে অনেক জাত। অনেক দল। এক-এক দলের এক-এক নাম। এক-এক রাজা। যেমন তাদের দলের নাম আসগুজাই। আসগুজাই-এর রাজা বুমবুজাং। তার বাবা। তিত্তাচিনি জানে, একদিন সে-ও রাজা হবে। তাই সে অন্যের ধন লুঠ করতে শিখছে এখন থেকেই। শিখছে, শত্রুর রক্তে তীরের ফলা চুবিয়ে নিতে। শিখছে, সেই রক্ত পান করতে। পান করে আনন্দ-উল্লাস করতে। সে জেনেছে যার ভাঁড়ারে যত সোনা, সে-ই তত বড় রাজা। যে যত বেশি শত্রুর মাথা কেটে আনতে পারে, সে-ই তত বড় বীর। তিত্তাচিনি জানে, তাদের সঙ্গে সৌরামাতির শত্রুতা সবচেয়ে বেশি। তারা থাকে পুব দিকে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝটিতি তাদের ওপর। যখন-তখন। মারধর করে। তাদের ঘোড়া-ভেড়া লুঠ করে। গাই-বলদ ছিনিয়ে নেয়। তারপর পালিয়ে যায়। তিত্তাচিনির ঠাকুরদাদা পারেনি সৌরামাতি-শত্রুদের টিট করতে। তার বাবা পারেনি তাদের সঙ্গে যুঝে উঠতে। এমনকি, তার ঠাকুরদাদার বাবাও হেরে গেছে তাদের কাছে। এখন তাই তিত্তাচিনি ভাবে, সে-ও কি হেরে যাবে! অথচ সৌরামাতি-রাজার আছে অঢেল সোনা। অনেক ঘোড়া। অনেক ধন-দৌলত। তিত্তাচিনির লোভ হল। সে থাকতে পারল না। বাবার কাছে গেল। বাবা বুমবুজাংকে বলল, "বাবা, বাবা, আমি এখন যুদ্ধ শিখেছি।"

বাবা ছেলের মুখের দিকে তাকাল। ফস করে একফালি হাসি তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল। তারপর ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, "যুদ্ধ তো শিখেছিস, ক'টা শত্রু মেরেছিস?"

রাজার ছেলে তিত্তাচিনি ঘোড়ার দিকে চোখ ঘোরাল। তার নিজের ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো মাথার খুলি, মানুষের। খুলি দেখিয়ে বলল, "আমার ঘোড়ার পিঠে আছে এত। আর

চুল নিয়ে সমস্যা ?

চুল পড়া ? অকালপক্কতা ? খুস্কি ?

ডাঃ সরকার বলেন–

চুলের কোনও রোগই নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। তাই শুধু মাথায় ওষুধ লাগালেই হবে না সঙ্গে ওষুধ খেতেও হবে।
খুস্কি বিহীন, ঘন, কালো, মসৃণ চুল যদি চান,
আর্ণিকাপ্লাস লাগান আর ট্রায়োফার খান।
এ দুটি চুল পড়া বন্ধকরে, চুলের পুষ্টি জোগায়,
অকালপক্কতা রোধ করে, মাথার খুস্কি তাড়ায়।
মাথা ঠাণ্ডা রাখে, পেটের গোলমাল সারায়,
চুলের উপাদান বাড়ায়, তাই নতুন চুল গজায়।
রূপ হয় অপরূপ হোমিওপ্যাথির ছোঁয়ায়,
আর সুফল ছাড়া, কোনও কুফল না হয়।

বিশ্বে সর্বপ্রথম

কেশ সমস্যা সমাধানে

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার (সি,সি, আই-পুরস্কৃত) ট্রায়োফার খাওয়ার সঙ্গে আর্ণিকাপ্লাস লাগানোর ওষুধ।

ব্যবহার বিধি ঃ
আর্ণিকাপ্লাস-হেয়ার ভাইট্যালাইজার স্নানের পরে ও রাতে শোয়ার আগে চুলের গোড়ায় লাগান, সঙ্গে ট্রায়োফার-হেয়ার টনিকটিও-সেবন করুন সকালে ও রাত্রে, যত দিন না চুল নিয়ে সমস্যা দূর হয়।

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপ্‌ল অ্যাক্‌শন হেয়ার ভাইট্যালাইজার
কেশ সমস্যা সমাধানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত
হোমিও ওষুধ

প্রস্তুতকারক ঃ ফোন ৩৫-২৯৬১
এ্যালেন ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ
এ্যালেন হাউস ঃ ২২৪/এইচ্, মানিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪

বিপণন সংস্থা ঃ ফোন-৫৯-৪০৫১
অ্যালেন্স ইণ্ডিয়া মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ
অ্যালেন ভবন, কৃষ্ণপুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৯

Allopathic, Ayurvedic & Homoeopathic Medicine Manufacturers

Bringing Science To Life

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।

Dr. SARKAR Group

নদীর জলে ভাসছে অনেক।"

বাবা তারিফ করল, "শাবাশ!"

ছেলে বলল, "আমি এবার যুদ্ধে যাব।"

বাবা জিজ্ঞেস করল, "কার সঙ্গে যুদ্ধ করবি?"

ছেলে চটপট উত্তর দিল, "সৌরামাতির রাজার সঙ্গে।"

রাজা বুমবুজাং চমকে উঠল, ছেলের কথা শুনে। কোটর থেকে লাল টকটকে চোখ তার ঠিকরে বেরোল। চোখ টেরিয়ে ছেলেকে দেখল। হয়তো খুশি হল ছেলের বুকের পাটা দেখে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "পারবি?"

ছেলে ভয় পেল না। বুক ফোলাল। উত্তর দিল, "তোমার ছেলে আমি, স্তানের আমি শাগরেদ। না পারার কারণ নেই।"

বাবা বলল, "সৌরামাতির রাজা কালো ঘোড়ার সওয়ার।"

ছেলে উত্তর দিল, "তোমার ছেলে নীল ঘোড়ার সওয়ারি। সে যদি হয় অন্ধকারের রাজা, তবে, আমি নীল আলোর বজ্রপাত।" বলতে-বলতে তিত্তাচিনি হা-হা করে হেসে উঠল। সে-হাসি তাচ্ছিল্যের।

রাজা বোধ হয় খুশি হল খুব, ছেলের কথা শুনে। ছেলের ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে তার সাহসের বাহবা দিল। তারপর চেঁচাল, "ডাক স্তানকে।"

ছুটে এল স্তান।

"স্তান, এই নাও!" বলে রাজা বুমবুজাং একটা হরিণের শিং ছুড়ে দিল তার দিকে। সেই শিং সোনায় মোড়া।

স্তান সেই শিং লুফে নিয়ে অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, "এটা কী আজ্ঞে?"

"তোমার ইনাম।"

"কিসের ইনাম?"

"আমার খুশির ইনাম।"

স্তানের তখনও ঘোর কাটেনি। সে কী বলবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। কী না বলবে, তাও খুঁজে পাচ্ছে না। হতভম্ব।

স্তানের সেই অবস্থা দেখে রাজা হেসে ওঠে হো-হো করে। হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করল, "কেন খুশি হয়েছি, জানতে চাইলে না?"

তাই তো! স্তান থতমত খেয়ে গেছে। তখনই তার মুখ ফসকে গেল। বলে ফেলল, "আমি বুঝতে পেরেছি।"

"কী বুঝতে পেরেছ?" রাজা হাসে। জিজ্ঞেস করে।

স্তান উত্তর দিল, "আপনি খবরটা পেয়ে গেছেন।"

রাজার হাসি থামে। অবাক হয়। জিজ্ঞেস করে, "কীসের খবর?"

স্তান লজ্জায় আধখানা হয়ে উত্তর দিল, "কেন, আমার ছেলের খবর।"

"তোমার ছেলে!" রাজা বুমবুজাং যেন আকাশ থেকে পড়ল।

স্তান আরও লজ্জা পেল। তার মাথাটা আরও নুয়ে পড়ল। তারপর সে আমতা-আমতা করে বলল, "হুজুর যখন সবই জানেন, তখন, আমায় আর জিজ্ঞেস করে লজ্জা দিচ্ছেন কেন!"

রাজা আরও অবাক হয়ে গেল, "সবই জানি মানে? আমি তো কিছুই জানি না!"

"তবে আমায় ডাকলেন কেন?" এখনও লজ্জা গেল না স্তানের, "তবে কেন আমায় সোনায় মোড়া এই হরিণের শিং ইনাম দিলেন?"

"সে তো আমার নিজের খুশির খবর।" রাজা উত্তর দিল।

"সেই খুশির খবরটা কি আমি জানতে পারি না?" জিজ্ঞেস করল স্তান।

রাজা বলল, "আমার খবরটা তুমি জানার আগে, তোমার খবরটা কি রাজার আগে জানা উচিত বলে তুমি মনে করো না?"

এবার স্তানের খুবই লজ্জা হল। লজ্জায় ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফিক করে হাসি বেরিয়ে এল। মুখখানা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যায়। আর বোধ হয় না-বলে নিস্তার নেই। তাই স্তান বলেই ফেলল, "হুজুর, কাল আমার একটি—" বলতে-বলতে থমকে গেল স্তান।

"আরে, থামলে কেন, বলো, বলো!"

স্তান বলেই ফেলল, "আমার একটি পুত্র হয়েছে।"

"বলো কী!" রাজা বুমবুজাং চিৎকার করে উঠল আনন্দে। স্তানকে জাপটে ধরল। হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর স্তানকে ছেড়ে নিজের ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল। ছুটল স্তানের গাড়ি-ঘরের দিকে। স্তান হতবাক।

গাড়ি-ঘরে পৌঁছে গেল রাজা, দেখতে-দেখতে। ডাক দিল স্তানের বউ আনাতুরিকে। আনাতুরি সাড়া দিল। দেখা দিল। আনন্দে দিশেহারা রাজা বুমবুজাং। চেঁচিয়ে উঠল, "আনাতুরি দেখাও, দেখাও, তোমার ছেলের মুখ দেখাও!"

আনাতুরি গাড়ি-ঘরের পরদা তুলল। রাজার চোখের ওপর তুলে দেখাল ছেলের মুখখানি। রাজা হাসল প্রাণ খুলে। হাসতে-হাসতে ছেলের গলায় পরিয়ে দিল নিজের গলার সোনার হার। পরিয়ে দিয়ে বলল, "আমি তোমার ছেলের নাম রাখলুম, কোহেন।"

আবার রাজার ঘোড়া ছুটল। এবার রাজা নিজেই খবরটা ছড়িয়ে দিল চারদিকে। হুকুম হল, "আনন্দ করো। খানাপিনা তৈয়ার করো। ভোজ লাগাও।"

অমনই শুরু হয়ে গেল গানা-নাচার। খানাপিনার। সে এক মোচ্ছব। শুরু হল, ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বর্শার খেলা। হরিণ শিকার। ঘোড়ার পিঠে রাজার সেনা। ঘোড়া ছুটছে। হরিণ পালাচ্ছে। ভয়ে কাঁপছে। একটা নয়, অসংখ্য হরিণ। সেনার হাতের বর্শা, কারও গায়ে লাগছে। কেউ পালাচ্ছে। যার হাতে যত মরছে হরিণ, সে তত পাচ্ছে ইনাম। একটি মানুষ জন্মাল। অসংখ্য হরিণ মরল। অসংখ্য হরিণের রক্তে লাল হয়ে গেল স্তেপের মাটি। নাচ হচ্ছে সেই রক্তের ওপর। যুদ্ধবাজ মানুষের নাচ। সে-নাচ কী বীভৎস। আনন্দের সে কী ভয়ানক হুল্লোড়। বাধা মানে না।

অনেকক্ষণ পর শান্ত হল সেই হুল্লোড়। শান্ত হলে বুমবুজাং চিৎকার করে উঠল, "শোনো আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমার বিশ্বাসী সহচর স্তানের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করায়, আমি যারপরনাই খুশি। এই খুশির দিনে আমি আরও একটি খুশির খবর দেব। আমার ছেলে তিত্তাচিনি এখন বড় হয়েছে। তার ইচ্ছে সে এবার যুদ্ধে যাবে। স্তানেরই কাছে সে যুদ্ধ শিখেছে। স্তান আমার ছেলের কপালে দেখেছে সৌভাগ্যের চিহ্ন। স্তান জানে কুহক-বিদ্যা। পিশাচের সঙ্গে কথা বলে স্তান জেনেছে, আমার ছেলে তিত্তাচিনি হবে এক বীরযোদ্ধা। কোনও যুদ্ধেই তার হার হবে না। তাই আমিও মনস্থির করেছি। স্থির করেছি আমার ছেলে যাবে সৌরামাতির রাজ্যে। সৌরামাতির রাজা আমাদের চিরশত্রু। এই শত্রুকে যতক্ষণ না আমরা নিকেশ করতে পারছি, ততক্ষণ আমাদের স্বস্তি নেই। তা ছাড়া আমি জানি, সৌরামাতি রাজার অঢেল সোনা আছে। রাজা মরলে সেই সোনাও আমাদের দখলে আসবে। সেই কারণেই আমি আমার সৈন্যদের আদেশ করছি, তোমরা তৈরি হও। আমার ছেলে তিত্তাচিনির সঙ্গে চলো যুদ্ধে। শুনলে তোমাদের নিশ্চয়ই সাহস বাড়বে, স্তানও যাবে যুদ্ধে। সে হবে তোমাদের সেনাপতি। সে একদিকে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, আর-একদিকে কুহক-বিদ্যার সাহায্যে তোমাদের রক্ষা করবে। স্তান থাকলে তোমাদের নিশ্চিত জয়।"

বেজে উঠল কাড়া-দুন্দুভি। সাজ-সাজ রব উঠল। শ'য়ে-শ'য়ে

রাজার সেনা সাজল। শ'য়ে-শ'য়ে ঘোড়ার পিঠে উঠল। যুদ্ধে চলল। তাদের কাঁধে তীর-ধনুক। কোমরে গোঁজা ধারালো অস্ত্র। কিন্তু স্তানের যেন মন কাঁদে। কেমন করে যেন তার মন। বারবার নিজের ছেলের মুখটা তার ভেসে ওঠে চোখের ওপর। সে ছুটে গেল বউ-এর কাছে। বউকে বলে, "আনাতুরি, সাবধানে থেকো!"

আনাতুরি বলে, "আমার ভয় করছে।"

চমকে ওঠে স্তান, "কেন?"

"জানি না।"

বিদায় নিল স্তান। বলে গেল, "আনাতুরি, এই আমার শেষ যুদ্ধ।" তারপর ছেলের কপালে একটা চুমো দিল।

আনাতুরির চোখে জল। চোখের জল মুছতে-মুছতে সে স্তানের পেছু ডাকল, "স্তান!"

স্তানের ঘোড়া থামল। ফিরে তাকাল।

"জানো স্তান", ছেলেকে বুকে নিয়ে এগিয়ে গেল আনাতুরি। এগিয়ে গেল স্তানের ঘোড়ার সামনে।

"কী বলছ আনাতুরি?"

"জানো স্তান, যেদিন আমাদের ছেলে এল এই পৃথিবীতে, সেদিন থেকে রক্ত দেখলে আমার বুক কাঁপে। মানুষকে হত্যা করতে দেখলে আমি থাকতে পারি না। আমি ভয় পাই। আচ্ছা, স্তান, আমার ছেলেও যদি রক্ত নিয়ে খেলা করে! সে-ও যদি ঘাতক হয়!" বলতে-বলতে সে আর্ত স্বরে চিৎকার করে ওঠে, "না স্তান, না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। তাকে আমি হত্যা করতে দেব না কিছুতেই। স্তান, সে মানুষকে হত্যা করবে না। সে ভালবাসবে।"

স্তান আনাতুরির কথা শুনল। ছেলের মাথায় হাত রাখল। তারপর বলল, "কেঁদো না আনাতুরি। তোমারও যা ইচ্ছে, আমারও তাই। আমি ছেলেকে ঘাতক করব না। মানুষ করব।

॥ ৩ ॥

যুদ্ধে গেল স্তান। সে এখন সেনাপতি। সেনাপতি রাজপুত্র তিত্তাচিনির। স্তানের ঘোড়া ছোটে। টগবগ, টগবগ। ঘোড়া ছোটায় তিত্তাচিনি পাশে-পাশে। সেনার ঘোড়া অগুনতি। ঘোড়া ডাকে চিঁহি-চিঁহি। ধুলো ওড়ে খুরে-খুরে। মাটির ডেলা গুঁড়িয়ে যায়। আগুন ছোটে পাথরে-পাথরে, ঘোড়ার খুরে।

ঘোড়সওয়ারি সেনার দল হাঁকার দিল, "শত্রু কোথায়, এগিয়ে আয়!"

ছুটছে ঘোড়া। হাঁকছে সেনা। কোথাও ঘাস। কোথাও গাছ। কোথাও নদী। কোথাও হ্রদ। কোথাও দিন। কোথাও রাত।

ছুটতে-ছুটতে তারা পৌঁছে গেল। পৌঁছে গেল সৌরামাতির ডেরার কাছে। নদীর পাড়ে। নদীর পাড়ে গাছগাছালি ঝুপসি। সেখানে তারা তাঁবু ফেলল। ওত পাতল। ওত পেতে বসে রইল। শত্রু এলেই আড়াল থেকে সাঁই-ই-ই। তীর ছুড়বে। শত্রুকে শেষ করবে আচমকা।

অন্ধকার রাত। নিঝুম। নদীর জলে ছলাতকার। ঠাণ্ডা বাতাস কনকন করে। ঝুপঝাপ শব্দ। ঘোড়ার গলায় ঘড়ঘড়ানি। গাছের ডালে ঝটপটানি। সেই অন্ধকার রাতে তিত্তাচিনির সেনারা বসে রইল, অনেকক্ষণ। তবু শত্রুর সাড়া নেই। যুদ্ধের কোনও তাড়াও নেই। তখন তিত্তাচিনি হাঁপ ছাড়ল। স্তানকে বলল, "সেনাপতি, আজ তবে ঝুটমুট জেগে কী লাভ! অনেক্টা পথ আসতে হয়েছে। এসো সবাই বিশ্রাম নিই। আজ রাতটা বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে নদী পেরোব।"

কিন্তু স্তানের মুখ গম্ভীর। মুখে কথা নেই। চোখ তার সতর্ক। কী দেখছে সে অমন করে!

রাজপুত্র তিত্তাচিনি অমন করে স্তানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "কী দেখছ সেনাপতি?"

স্তান এবার কথা বলল। তার গলায় উদ্বেগ। সে বলল, "শোনো রাজপুত্র, আজ রাতটা আমাদের জেগেই থাকতে হবে। শত্রুর কোনও সাড়া নেই, এ ঠিক কথা। কিন্তু তাই বলে শত্রু যে কাছেপিঠে লুকিয়ে নেই, এ-কথা ঠিক নয়। আমি একটু আগে, রাতের আকাশ দিয়ে একঝাঁক কালো ডানার পাখি উড়ে যেতে দেখেছি। এ খুব অশুভ লক্ষণ। কালো পাখির কালো ডানার বাতাস যদি গায়ে লাগে, তবে নির্ঘাত বিপদ। আমাদের মাথার ওপর দিয়েই পাখি উড়ে গেছে। তার মানে, তাদের ডানার বাতাসও লেগেছে আমাদের গায়ে।"

তিত্তাচিনি যেন স্তানের কথা শুনে ভয় পেল। ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "তার মানে কি বিপদ এগিয়ে আসছে?"

স্তান উত্তর দিল, "তা ছাড়া আর কী ভাবতে পারি?"

"তুমি তা হলে মন্ত্র পড়ো! বিপদ কাটাও!" বলল তিত্তাচিনি।

স্তান জবাব দিল, "তুমি বললে আর আমি মন্ত্র পড়লুম, অমনই বিপদ কেটে গেল, তাই কখনও হয়! এ-বিপদ কাটানো অত সহজ নয়।"

"তবে?"

"এ-বিপদ কাটাতে হলে রক্ত চাই। ওই উড়ন্ত পাখির রক্ত।"

"পাখি তো পালাল অন্ধকার আকাশের আড়ালে।"

"আবার আসবে। আমাদের জেগে থাকতে হবে। এলেই আকাশে তীর ছুড়ে পাখি মারতে হবে।"

কাজেই জেগে রইল সেনাপতি। জাগল সৈন্যরা। সেইসঙ্গে জেগে থাকল তিত্তাচিনি। সবাই জাগবে, আর, রাজার ছেলে ঘুমিয়ে থাকবে এ কখনও হয়! তিত্তাচিনি লাগাম ধরে বসে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। বসল সেনাপতি স্তান। বসল সৈন্যরাও, যে-যার ঘোড়ায়। কারও নজর নদীর জলে। কেউ তাকিয়ে আকাশপারে। আকাশে রং-ঝিলমিল তারা। নদীতে ঢেউ-টলমল জল। তবে, অন্ধকারে নদীর ঢেউ দেখাই যায় না ভাল। দেখা যায় আকাশটা। অসংখ্য তারার আকাশ।

চমকে উঠল স্তান। হঠাৎ। আকাশে দৃষ্টি তার স্থির। সে যেন দেখতে পেয়েছে, আবার, সেই কালো ডানার কালো পাখি! এবার শুধু একা স্তান নয়। দেখল তিত্তাচিনিও। এমনকী, দেখতে পেল, রাজপুত্রের সেনারাও।

ঘোড়া ছোটাল তিত্তাচিনি। ঘোড়ার পিঠে বসে ধনুকে তীর জুড়ল। আকাশের ওই পাখির দিকে তাক করল। তিত্তাচিনিকে দেখে, ঘোড়া ছোটাল সেনারাও। ধনুকে তীর জুড়ল তারাও। আগে কে মারবে পাখি? রাজার ছেলে? না রাজসেনারা?

ঘোড়ার খুরে শব্দ উঠল।

পাখিরাও ডানায়-ডানায় ঝাপটা দিয়ে আরও জোরে শব্দ তুলল। উড়ে চলল ঘোড়ার আগে।

"মার, মার, মার।" চেঁচাল রাজসেনারা।

"মার, মার, মার।" চেঁচিয়ে উঠে তীর ছুড়ল তিত্তাচিনি। আকাশে, অন্ধকারে, পাখির দিকে।

পাখি পালাল। তীর ফসকাল। ঠিক সেই ফাঁকে শত্রুও ধেয়ে এল। ঘোড়ার পিঠে। তিত্তাচিনির সেনারা থতমত খেয়ে গেছে। তারা বুঝতেই পারেনি, এ শত্রুর কারসাজি। বুঝতেই পারেনি আকাশে পাখি উড়িয়ে শত্রুই তাদের ফাঁদে ফেলেছে। এ-পাখি রাতের পাখি। রাতের আকাশে উড়তে জানে। শত্রুকে বে-পথের গোলকধাঁধায় নাকাল করে হিমশিম খাওয়ায়।

আর ঠিক তাই। তিত্তাচিনি ফাঁদে পড়ল। তার সেনারা পথ হারাল। শত্রুর ব্যূহে আটকে পড়ে এদিক ছোটে, ওদিক ছোটে। হাঁকপাঁকিয়ে পথ খোঁজে। হায় রে, আর পথ নেই! পথ নেই

বেরিয়ে যাওয়ার ! পালিয়ে যাওয়ার ! এবার মরো !

মরতেই যখন হবে, তখন, তিত্তাচিনি মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "সৈনিক, মারো তীর !"

তিত্তাচিনির সৈনিকের দল গর্জে উঠল, "সাবধান ! সাবধান !" অন্ধকার কেঁপে উঠল।

সেই কাঁপা-কাঁপা অন্ধকারে সৌরামাতির ঘোড়া ছোটে। শব্দ ওঠে। ঘোড়ার পিঠে সেনা হাঁকে, "শয়তানদের শেষ করো।"

তীর ছুটল এপাশ থেকে ওপাশে। যুদ্ধ লাগল একদলের সঙ্গে আর-এক দলের। ঘোড়া ডাকে চিঁহি, চিঁহি। লম্ফঝম্ফ এদিক-ওদিক। সে কী ভীষণ যুদ্ধ।

পারল না তিত্তাচিনি, হারল। তার সেনারা ছত্রভঙ্গ। পালাচ্ছে। তিত্তাচিনির তূণের তীর শেষ। সে বোধ হয় মরবে এবার। মরবার আগে বাঁচার জন্য কে না চেষ্টা করে ! অস্ত্র নেই। এবার পালিয়ে বাঁচো। তিত্তাচিনির ঘোড়া ছুটল ঝড়ের বেগে। লাফ মারল আকাশ জুড়ে। ডাক ছাড়ল দিক কাঁপিয়ে। সে তার প্রভুকে বাঁচাবে। সামনের কোনও বাধাই সে মানবে না। কেউ তাকে রুখতে পারবে না। যে ঘোড়ার সামনে পড়ে, দূরে পালায়। যে তার পায়ের সামনে এগিয়ে আসে, পিষে মরে। যে তাকে বাধা দেয়, তার মূর্তি দেখে ভিরমি খায় ! সে তার প্রভুকে বাঁচাবেই। এই দারুণ শীতেও ঘোড়ার দেহে ঝরঝরিয়ে ঘাম ঝরে। ক্লান্তিতে হাঁপ ধরে। তবু সে লাফ মারবে। শত্রু-ব্যূহ টপকে যাবে। পালাবে।

কিন্তু ঘোড়া একটা ব্যূহ টপকাল তো, সামনে আর-একটা। আর-একটা টপকাল তো আবার একটা। যেন একের পর এক ঢেউ। আছড়ে পড়ছে তার ওপর।

কিন্তু কতক্ষণই বা একা যুঝবে একটা ঘোড়া। তিত্তাচিনির সেনার দল পগারপার। যতজন পালিয়েছে তার চেয়ে বেশিজন মরেছে। স্তানও কি মরে গেল ! কে জানে !

এখন তিত্তাচিনি একা। তার অস্ত্রও নেই। সৈন্যও নেই। শুধু আছে তার এই একমাত্র ঘোড়া। এ ছাড়া এখন কেউ আর তাকে রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু ঘোড়াই বা আর কতক্ষণ ! তীরের পর তীর গেঁথে গেছে তার শরীরে। রক্ত ঝরছে অঝোরে। সময় তার ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং এবার বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে হবে তিত্তাচিনিকে। তিত্তাচিনি ঘোড়ার কেশর খামচে ধরল। ঘোড়ার ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "জোরসে মারো লাফ।"

ঘোড়া লাফাল যেন আকাশ ছুঁয়ে।

তিত্তাচিনি আবার চেঁচাল, "হট যাও, দুশমন !"

কিন্তু তার মুখ থেকে মুখের কথা পড়তে পারল না। একটা তীর ছুটে এল তার বুকে। শত্রুর তীর। এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেল তার বুক। "আঃ !" আর্তনাদ করে উঠল তিত্তাচিনি। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা তীর, উড়ে এল। এবার লক্ষ্য মাথা। "আঃ !" তিত্তাচিনির গলায় যন্ত্রণার আর্ত রব। রক্ত ছুটল তিত্তাচিনির দেহ থেকে। সে অসহায়ের মতো খামচে ধরল ঘোড়ার গলা। আর কোনও বাধা মানল না ঘোড়া। লাফ মারল। সব বাধা ডিঙিয়ে সে ছুট দিল। ছুট দিল তার আহত প্রভুকে পিঠে নিয়ে। ফিরে চলল সে তিত্তাচিনির বাবার কাছে। এখন নীল ঘোড়া যেন একটা উড়ন্ত ঈগল। উড়ছে সে, না, ছুটছে ! সে ঝড়, না, দুরন্ত ঢেউ ! না কি বন্যা ! সবকিছু ভাসিয়ে দিয়ে ধেয়ে আসছে ! দুরন্ত বেগে !

॥ ৪ ॥

দুরন্ত বেগেই ঘোড়া পৌঁছে গেল রাজা বুমবুজাংয়ের শিবিরে। তার প্রভু যেমন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছে, সে-ও তেমনই। তার প্রভু যেমন তীরের আঘাতে আহত, সে-ও তাই। সে এখনও বেঁচে আছে। সে এখনও নিশ্বাস ফেলছে। কিন্তু তার পিঠের ওপর যে-মানুষটা এখনও তার গলা জড়িয়ে আছে, সে আর নিশ্বাস ফেলছে না। তার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে। তিত্তাচিনির মৃতদেহ থেকে
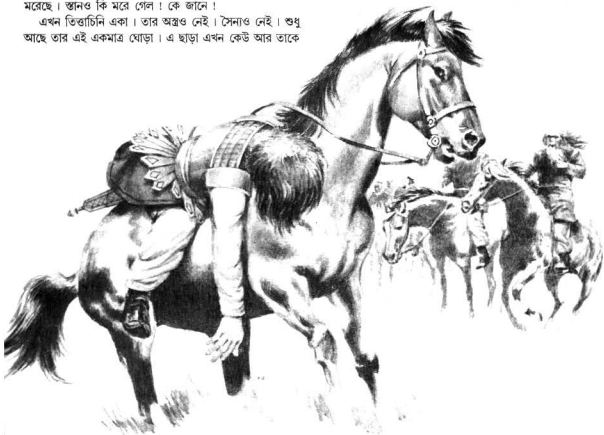
এখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। গড়িয়ে পড়ছে ঘোড়ার গা বেয়ে। ঘোড়ার বুক দিয়েও এখন রক্ত ঝরছে। আহত ঘোড়ার।

ঘোড়া দাঁড়াল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামানো হল তিত্তাচিনির মৃতদেহটা। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠল ঘোড়া। বিকট চিৎকার। তারপর সে ছিটকে পড়ল। মাটির ওপর। তার কাজ শেষ। তার নিশ্বাসও শেষ।

ফিরে এল তিত্তাচিনির পরাজিত সেনারাও। সে তো মাত্র কয়েকজন। সেই কয়েকজনই বেঁচে ছিল। কিন্তু স্তান ?

রাজা বুমবুজাং ছুটে এল। ছুটে এল রানি, তিত্তাচিনির মা আকুল হয়ে বুক চাপড়াতে লাগল রানি। ছেলের শোকে। রাজা বুমবুজাং ছেলের মৃতদেহ দেখে দাপাদাপি শুরু করে দিলে। তার সে কী ভীষণ রাগ। শোকে পাগল হয়ে গেল রাজা। যাকে সামনে পায় তারই গলা টিপে ধরে। হাহা করে হাসে। কাউকে মেরে ফেলে। কাউকে ছেড়ে দেয়। কারও রক্ত দ্যাখে। কারও রক্ত গায়ে মাখে। রাজা যেন একটা বুনো জন্তু। কী হিংস্র তার সেই মূর্তি। এখন কেউ তার সামনে যেতে পারবে না। কেউ তাকে সান্ত্বনা দিতে সাহস পায় না। যে পারে, সে স্তান। তবে সে কি সত্যিই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে !

"স্তান-ন-ন-ন !" বিকট চিৎকার করে হাঁক ছাড়ল রাজা বুমবুজাং।

স্তানের সাড়া পাওয়া গেল না।

"স্তান-ন-ন-ন-ন।" এবার আরও জোরে চিৎকার করে উঠল, রাজা বুমবুজাং।

এখনও স্তানের সাড়া নেই।

রাজা বুমবুজাংয়ের চোখ কটমট করে উঠল। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল তার হাত। পা। তার মাথার চুল যেন খাড়া হয়ে উঠল। সে কী ভয়ঙ্কর মূর্তি। সে-মূর্তি যে দ্যাখে সেই পালায়। যে পারে না পালাতে, রাজা তাকে ধরে ফেলে। চেঁচিয়ে ওঠে, "পালাবি কোথায় ? আমার ছেলে মরেছে। তোদেরও মরতে হবে। কেউ বেঁচে থাকবে না।"

নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল সামনের খোলা জায়গাটা। মরার জন্য কে আর দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু দাঁড়িয়ে রইল রাজা। পড়ে রইল রাজার ছেলে তিত্তাচিনির দেহটা। আর, তাকে দেখে বুক চাপড়ে কাঁদতে থাকল ছেলের মা রাজরানি। ছেলের সামনে বসে-বসে। একা। কিন্তু যারা মরল, এইমাত্র, রাজার হাতে, তারাও পড়ে রইল। তাদের জন্য কেউ কাঁদতে এল না।

ও কে ? একটু দূরে দাঁড়িয়ে, একা ? ঘোড়ার পিঠে, নিঃসঙ্গ মানুষটি ?

স্তান।

স্তানকে দেখে কী হল রাজার ! কোথায় গেল তার তর্জন-গর্জন ! অমন নির্বাক কেন রাজা ! অমন স্থির কেন তার চোখের দৃষ্টি ! অমন ধীর পায়ে কেন এগিয়ে যায় স্তানের দিকে। ওই মৃতদেহগুলি মাড়িয়ে। এইমাত্র, এই মানুষগুলিকে তো রাজা নিজেরই হাতে হত্যা করেছে।

স্তান পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল।

স্তানের সামনে এসে দাঁড়াল রাজা বুমবুজাং। তার চোখে যেন আগুন, ঠিকরে বেরোচ্ছে ! গায়ে কাঁটা দেয় সে-চোখ দেখলে। কিন্তু স্তান শান্ত। বসে রইল ঘোড়ার পিঠে।

দু'জনের চোখে চোখ।

নির্বাক।

নিস্তব্ধ চারদিক। ছেলের শোকে এতক্ষণ কেঁদে আকুল হচ্ছিল রানি। তার কান্নাও থেমে গেছে, স্তানকে দেখে। শুধু ভেসে আসে বাতাসের শব্দ। তীক্ষ্ণ। সি-ই-ই-ই, সি-ই-ই-ই !

আচমকা চিৎকার করে উঠল রাজা বুমবুজাং। আচমকা স্তানের ঘোড়ার লাগামটা হাত দিয়ে চেপে ধরল। তারপর কেঁদে উঠল।

ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে রাজা স্তানের হাতটা ধরল। কাঁদতে-কাঁদতে। বলল, "স্তান, আমার ছেলেটা মরে গেল। স্তান, তোমার হাতে তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম। তুমি তাকে রক্ষা করতে পারলে না।"

স্তান রাজার চোখে জল দেখে অবাক হল। কিন্তু অস্থির হল না।

রাজা স্তানের অমন অবিচল মূর্তি দেখে অস্থির হল। তার নিশ্বাসের হিংস্র শব্দ ছিটকে পড়ে। রাজা বলে, "তুমি চুপ করে আছ কেন? তবে কি আমি মনে করব, তুমিই অপরাধী! তবে কি আমি মনে করব, তুমি তাকে রক্ষা করার কোনও চেষ্টাই করোনি!"

স্তান চমকে ওঠে, রাজার কথা শুনে।

রাজা আবার চেঁচায়, "তিত্তাচিনি আমার ছেলে না হয়ে যদি তোমার ছেলে হত? তুমি কি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে না? তাকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিতে ভয় পেতে?" তীব্র রোষে রাজার গলার স্বর ফেটে পড়ে।

স্তানের মন আনচান করে ওঠে হঠাৎই। তার মনে পড়ে গেছে নিজের ছেলের কথা। হঠাৎই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, যুদ্ধে যাওয়ার আগেই তার একটি ছেলে জন্ম নিয়েছে। ছেলের কথা মনে পড়তেই সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ছেলের মুখখানি ভেসে উঠল তার চোখে। রাজার কথা আর তার কানে গেল না। রাজার কথার সে উত্তর দিতে পারল না। এখন, এই মুহূর্তে, সে আর-কিছু চায় না। সে তার ছেলের মুখখানি দেখতে চায়। সে কি তবে রাজার কথার উত্তর না দিয়ে ঘোড়া ছোটাবে!

না, তাকে উত্তর দিতে হল না। রাজাই কথা বলল। আচমকা বুককাঁপানো সে-কথা। তবে কি রাজা স্তানের মনের কথা জানতে পেরেছিল! নইলে রাজা বুমবুজাং কেন বলল, "ভেবো না স্তান, আমার ছেলে মরে গেছে বলে তোমার ছেলে বেঁচে থাকবে।"

স্তান শিউরে উঠল। কী ভয়ঙ্কর কথা। স্তানের বুকটা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কে যেন তার বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে তার। সে যেন আর বসে থাকতে পারছে না, ঘোড়ার পিঠে। টলছে স্তান। বুঝি এখনই সে পড়বে মুখ থুবড়ে। জড়িয়ে ধরল ঘোড়ার গলা। হাঁকপাঁক করে। তারপর আর্তনাদ করে উঠল, "আমার ছেলেকে মারবেন না রাজা।"

স্তানের জামাটা খামচে ধরল রাজা। তারপর চিৎকার করে উঠল, "তোমার ছেলে সর্বনেশে। অলক্ষুনে। সে জন্মাল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার ছেলে নিহত হল, শত্রুর হাতে। এ আপদকে মরতেই হবে।"

"না-আ-আ-আ।" স্তান গর্জন করে উঠল রাজার মুখের ওপর। তার জামায় খামচে ধরা রাজার হাতটা ছাড়িয়ে নিল টান মেরে।

রাজা হকচকিয়ে গেছে। এমন দুঃসাহস কেমন করে হল স্তানের! সে টান মারে রাজার হাত ধরে। রাগে অন্ধকার দেখল রাজা। নিজেকে সামলাতে-না-সামলাতে রাজার চোখের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল স্তান। ছুটল গাড়ি-ঘরে। সেখানে তার ছেলে আছে। ছেলের মা আছে।

স্তানের ঘোড়া ছুটতেই রাজার হুঁশ হয়েছে। রাজা নিজের ঘোড়ার পিঠে লাফ দেয়, নিমেষে। ধাওয়া করে স্তানকে। ছুটতে-ছুটতে হুঙ্কার ছাড়ে, "শয়তান, দাঁড়া। পালিয়ে পার পাবি না। তুই মরবি। তোর ছেলে মরবে। বউ মরবে। আমার হাতে তোরা কেউ নিস্তার পাবি না।"

স্তান শুনলই না রাজার কথা। তার ঘোড়া ছুটছে। দুর্দান্ত তার বেগ। তার তেজ। ঘাড় ফেরাল স্তান ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে। তারপর বিদ্রোহী সেনার মতো শাসিয়ে উঠল, "শোন রে দুশমন রাজা, যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে, ততক্ষণ কেউ আমার ছেলের প্রাণ নিতে পারবে না। তোর ছেলে গোঁয়ার। সে মরেছে নিজের গোয়ার্তুমিতে। তাতে আমার ছেলের কী দোষ! মিথ্যে অপবাদ দিয়ে যে আমার ছেলেকে আপদ বলে, সে নিজে আপদ। যে আমার ছেলেকে হত্যা করতে চায়, তার মৃত্যুর চাবিকাঠি আমার হাতে।" বলতে-বলতে স্তান ছুটছে ঘোড়ার পিঠে। ছুটতে-ছুটতে নিজের হাতের মুঠি শক্ত করল। রাজার দিকে ছুড়ে দেখাল।

॥ ৫ ॥

স্তান পৌঁছে গেল ছেলের আস্তানায়। আনাতুরির কাছে। পেছনে-পেছনে পৌঁছে গেল রাজাও।

স্তান চোখের পলকে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল। ছুটে গেল আনাতুরির ঘরের সামনে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে স্তান। হাঁপাতে-হাঁপাতে ডাক দিল, "আনাতুরি-ই-ই-ই!"

"কে?" আনাতুরি চমকে ওঠে। এ যে স্তানের গলা! হন্তদন্ত হয়ে সে ঘরের ভেতর থেকে মুখ বাড়াল। দেখল, বেদম হয়ে স্তান হাঁপাচ্ছে। দেখল, তার পেছনে রাজা। রাজার মূর্তি দেখে শিউরে উঠল আনাতুরি। যেন এক ভয়ঙ্কর ঘাতকের মতো তার চোখ জ্বলছে।

"আমার ছেলে কই?" উত্তেজনায় অস্থির হয়ে স্তান জিজ্ঞেস করল আনাতুরিকে।

"কেন, কী হয়েছে?" ভয়ে জড়োসড় হয়ে জিজ্ঞেস করল আনাতুরি। স্তানের মুখে যেন বিপদের ছায়া!

আনাতুরির কথার উত্তর দিতে হল না স্তানকে। তার আগেই গাঁক করে উঠল রাজা, "আমি তাকে হত্যা করব।"

স্তান নেমে পড়ল ঘোড়া থেকে। উঠে পড়ল তার গাড়ি-ঘরে। ঠেলে সরিয়ে দিল আনাতুরিকে। নিজের ছেলেকে সে জড়িয়ে নিল বুকে। তারপর গর্জে উঠল, "দেখি, কে আমার ছেলেকে হত্যা করে!"

রাজার ঘোড়া এগিয়ে এল। ঘোড়ার পিঠে যেন একটা জল্লাদ বসে। তার হাত দুটো নিশপিশ করছে। এখনই বুঝি গলা টিপে ধরবে ওই কচি ছেলেটার।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল আনাতুরি। রাজার ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, "দেখি কে আমার সামনে আসে!"

রাজা বুমবুজাং লাফিয়ে নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে। একঝটকায় ফেলে দিল আনাতুরিকে। ধেয়ে গেল স্তানের দিকে। এবার বুঝি কেড়ে নেয় তার ছেলেকে!

আনাতুরি ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে। রাজার পোশাকটা টেনে ধরে সে। না, সে তার ছেলেকে স্তানের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে দেবে না। সে চিৎকার করে উঠল, "আমার ছেলেকে মারতে দেব না। কিছুতেই না।"

আনাতুরির গলায় ধাক্কা দিল রাজা। এবার আরও জোরে। আরও জোরে ছিটকে পড়ল আনাতুরি। মাটির ওপর। মুখ থুবড়ে। তবু সে পরাজয় মানল না। আবার সে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল রাজার সামনে। রাজার বুকটা খামচে ধরে বাধা দিল। তারস্বরে বলে উঠল, "স্তান, তুমি ছেলেকে নিয়ে পালাও।"

স্তান চেঁচিয়ে ওঠে, "ও তোমায় মেরে ফেলবে আনাতুরি!"

"মারুক। আমি মরলে আমার ছেলে যদি বাঁচে, তাতে আমার দুঃখ নেই। আমার বুকে যদি স্নেহ থাকে, তবে রাজার সাধ্যি নেই আমার ছেলেকে মারে! তুমি আমার ছেলেকে রক্ষা করো স্তান! তুমি ঘোড়ায় উঠে পড়ো। আমি এই নির্দয় ঘাতককে এখান থেকে এক পাও নড়তে দেব না।" বলে আনাতুরি রাজার পথ আটকাল।

রাজা এগোতে পারে না। রাজা ধাক্কা মারে।

আনাতুরি ধস্তাধস্তি লাগিয়ে দেয়।

রাজা আনাতুরির চুলের মুঠি ধরে টান মারে।

আনাতুরি তবু হারে না।

রাজা আনাতুরির মুখের ওপর ঘুসি ছুড়ল।

আনাতুরিকে কাবু করতে পারল না।

রাজা আনাতুরির দুটো হাত একসঙ্গে মোচড় দিল।

আনাতুরি মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ল। আবার পথ আটকাল।

স্তান তার ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়েছে।

রাজা বুমবুজাং দেখতে পেল।

স্তানের ঘোড়া ছুট দিয়েছে।

রাজা এবার বেপরোয়া। পা ছুড়ল রাজা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। লাগল আনাতুরির। মুখ থুবড়ে পড়ল সে মাটির ওপর। প্রচণ্ড লাগল। তবু সে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার আগেই রাজা নিজের ঘোড়ায় উঠে পড়েছে। স্তানের পিছু নিয়েছে।

ছুটল আনাতুরিও। রাজার ঘোড়ার পেছনে। কিন্তু ঘোড়ার সঙ্গে কেমন করে টক্কর দেবে আনাতুরি!

স্তানের ঘোড়া ছুটতে-ছুটতে বনে ঢুকল।

রাজার ঘোড়া তাকে দেখে বনেই ঢুকল।

স্তানের ঘোড়ার দম ফুরোয়।

রাজার ঘোড়া এগিয়ে আসে।

স্তানের ঘোড়ার হাঁপ ধরে।

রাজার ঘোড়া তার নাগাল পায়।

স্তান ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল। ছেলে তার বুকে।

রাজা স্তানকে ধরে ফেলল।

স্তান চেঁচিয়ে উঠল, "শোন রে রাজা, আমি কুহকী। শোন রে রাজা, একদিন তোর ছেলে মরতে বসেছিল ব্যামোতে। আমি তার প্রাণ বাঁচিয়েছি। আমার ছেলের গায়ে যদি হাত দিস, তবে শুনে রাখ শয়তান, আমার পিশাচ-মন্ত্রে তোর মরণ কেউ রুখতে পারবে না। তুই মরবি। তোর সব ধ্বংস হয়ে যাবে।"

রাজা বুমবুজাং শুনল না তার কথা। ঝাঁপিয়ে পড়ল স্তানের ওপর। সে কেড়ে নিতে গেল স্তানের ছেলেকে। স্তান ছেলেকে আগলে রাখে। রাজা টানামানি করে। ছেলে ককিয়ে ওঠে। মারামারি লেগে যায়। ছেলে ছিটকে গেল স্তানের হাত থেকে। পড়ল। ধাক্কা লাগল। চিলচেঁচিয়ে কেঁদে উঠল ছেলে। আর বুঝি পারল না স্তান ছেলেকে রক্ষা করতে। তবু শেষ চেষ্টা করতে চায় স্তান। রাজাকে সে ফেলে দিল মাটির ওপর। বুকের ওপর চেপে বসল। বুঝি সে এবার মরণ কামড় দেবে। কিন্তু পারল না। রাজা চকিতে তার গলাটা খামচে ধরল। দম আটকে আসে স্তানের। নিস্তেজ হয়ে পড়ে স্তান। এবার রাজা তার বুকের ওপর চেপে বসে। চেপে ধরে গলাটা। নিস্তব্ধ হয়ে আসে স্তানের বুকের শব্দ। ধীরে-ধীরে। নিথর হয়ে গেল মানুষটা। চিরদিনের জন্য।

কিন্তু স্তানের ছেলে? সে তখনও কাঁদছে। এবার খুনি রাজা ছুটে গেল তার দিকে। এবার তার গলাটা টিপে ধরবে রাজা।

"না-আ-আ-আ "

চমকে ওঠে রাজা বুমবুজাং। কে অমন করে চেঁচিয়ে ওঠে এই বনে, আচমকা। ঝটপট পেছনে তাকায় রাজা। চেয়ে দ্যাখে, এ যে স্তানের বউ! আনাতুরি! তার হাতে একটা পাথরের চাঁই। মস্ত। তার চোখে প্রতিহিংসার ভয়ঙ্কর চাউনি। ছুটতে-ছুটতে এসেছে সে। হাঁপাচ্ছে। গজরাচ্ছে। ঘাম ঝরছে। আক্রোশে কাঁপছে।

তাকে দেখে থমকে গেল রাজা বুমবুজাং। একটা হিংস্র জানোয়ারের মতো লাফ মারল রাজা। ছেলেটাকে ছোঁ মারতে গেল। চোখের পলকে আনাতুরির হাতের পাথর ছিটকে পড়ল। রাজার ঘাড়ে। রাজা চেঁচিয়ে উঠল, "আ-আ-আ!" মাটিতে পড়ল মুখ ঘসটে। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। রক্তের ফোয়ারা ছুটল। আবার মারল আনাতুরি ওই পাথর দিয়ে, তার হাতের ওপর। ওই হাত দিয়েই সে তার স্তানকে মেরেছে। আর যেন কাউকে মারতে না পারে।

ছুটে গেল আনাতুরি ছেলেটার কাছে। তার কান্না থামেনি। সে ছেলেকে তুলে নিল বুকে। তারপর ছুটে গেল স্তানের কাছে। স্তান পড়ে আছে। সে মৃত। আনাতুরি লুটিয়ে পড়ল। লুটিয়ে পড়ল স্তানের মৃতদেহের ওপর। সে আকুল হয়ে কেঁদে উঠল। বন নির্জন। সেই নির্জন বনে এক মায়ের কান্না যেন অনেক কান্না হয়ে হাওয়ায় ভেসে যায়। ভেসে যায় একটি প্রতিজ্ঞা। আনাতুরির প্রতিজ্ঞা, "শোনো স্তান, আমি তোমার ছেলেকে খুনি হতে দেব না কোনওদিন। সে কোনওদিন আসগুজাই মানুষের মতো মানুষের রক্ত গায়ে মেখে আনন্দে গান করবে না। তাকে আমি শেখাব ভালবাসতে। মানুষকে ভালবাসতে। শেখাব, সাহসে বুক ফুলিয়ে খুনির মুখোমুখি দাঁড়াতে। তাকে মরতে শেখাব বীরের মতো। অন্যায়ের কাছে হারতে শেখাব না। তুমি জেনে রাখো স্তান, এই নিষ্ঠুর, হত্যাকারী রাজার বিরুদ্ধে এইভাবে আমি নেব প্রতিশোধ। আমি হাজার-হাজার মানুষকে বলে বেড়াব, রাজা হত্যাকারী। যে হত্যা করে, সে মানুষ নয়, পশু। স্তান, তোমার এই মৃতদেহের ওপর আমার চোখের জল ছড়িয়ে রইল। এর বেশি আর-কিছু নেই আমার। কিন্তু তুমি দিয়ে গেলে তোমার ছেলেকে। এর জন্যই আমায় বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকব তোমার আশীর্বাদ নিয়ে।"

টগবগ, টগবগ। ঘোড়া ছুটে আসছে।

বুঝতে পেরেছে আনাতুরি। রাজার সেনারা আসছে। এদিকেই। এবার তার বিপদ। রাজা মরেনি। সে জ্ঞান হারিয়েছে। আহত! রাজাকে আহত দেখলে, রাজার সেনার হাতে নিস্তার নেই আনাতুরির। সেও মরবে। তার ছেলেটাও মরবে। তাকে এখনই পালাতে হবে। আর সময় নষ্ট করার সময় নেই। ছেলেকে বুকে নিয়ে সে ঘোড়ার পিঠেই চড়ে বসল। এ ঘোড়া স্তানের। আশ্চর্য, সে তো এর আগে আর কোনওদিন ঘোড়ায় চড়েনি! ঘোড়া ছোটায়নি! আজ সে ঘোড়া ছোটাল কেমন করে!

না, আনাতুরি ঘোড়া ছোটাল না। স্তানের ঘোড়া নিজেই ছুটল। ছুটল তীরবেগে বনের গভীরে। লুকিয়ে পড়ল। এখানে কে তাদের খুঁজে পাবে। তাই রাজা বুমবুজাংয়ের সেনারা জানতেও পারল না আনাতুরির কথা। জানতে পারল না, আনাতুরির আঘাতেই রাজা ধরাশায়ী।

॥ ৬ ॥

কিন্তু এখন আনাতুরি কী করবে! এই বনে সে কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। কাঁদতে-কাঁদতে। গাড়ি-ঘরে তার সর্বস্ব পড়ে আছে। আনাতুরি কেমন করে যাবে, আবার, ঘরে! স্তানের জন্য মনটা বারবার কেঁদে উঠছে। তবু চোখের জল তার চোখেই শুকিয়ে যাচ্ছে। বারেবারেই সে তার ছেলের মুখখানি দেখছে। যতবার দেখছে, ততবারই কেমন যেন একটা দুরন্ত সাহসে সে কাঁদতে ভুলে যাচ্ছে।

না, আনাতুরি আর কাঁদল না।

কিন্তু হঠাৎ ছেলেটা কেঁদে উঠল। তার ঘুম ভেঙে গেছে। সেই নিশ্চুপ বনে ছেলেটার গলার স্বর ককিয়ে উঠছে। হারিয়ে যাচ্ছে। আনাতুরি ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে। আর ভাবছে, কেউ যদি শুনতে পায় এ-কান্না। তাই সে আদরে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে ভোলাচ্ছে।

এদেশে বোধ হয় এই প্রথম একজন মা হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। বোধ হয় প্রথম চোখের জল ফেলল। বোধ হয় প্রথম বলল, সে তার ছেলেকে খুনি হতে দেবে না। সে ছেলেকে ভালবাসতে শেখাবে। প্রায় চার হাজার বছর আগে মানুষকে মেরেই আনন্দ করেছে স্তেপের এই আদিম মানুষগুলো। তারা বোধ হয় ভালবাসেনি কাউকে কোনওদিন। হয়তো বা জানেও না ভালবাসা কাকে বলে। এ-শব্দ, এই স্তেপে আনাতুরিই একা জানত বুঝি। আর কাউকে সে কোনওদিন বলেনি। আজই বলল। বাতাসে এই শব্দটি আজই প্রথম ভেসে গেল। কিন্তু

স্তানের মৃতদেহ ছাড়া এ-শব্দ আর কারও কানে পৌঁছে দিতে পারল না আনাতুরি। বলতে পারল না, আমরা পশু নই, আমরা মানুষ। মানুষের রক্তপান করে নয়, মানুষকে ভালবেসে আমরা জীবন সুন্দর করতে পারি। কিন্তু কে শুনবে তার কথা।

কেউ শুনবে না। কিন্তু এটাই সত্যি। ছেলেটাকে বুকে নিয়ে এই সত্যিটাই বারবার তার মনে সাহস জোগাচ্ছে। তাই, লুকিয়ে থাকতে মন আর সায় দিচ্ছে না তার। না, সে আর লুকিয়ে থাকবে না। যারা লুকিয়ে থাকে, তারা ভিতু। কাপুরুষ। সে ঘোড়ার মুখ ফেরাল। সে বন থেকে বেরিয়ে আসবে। স্তানের ঘোড়া ছুটল আনাতুরির গাড়ি-ঘরের দিকে।

কিন্তু পারল না আনাতুরি। পারল না তার ঘরে ফিরতে। বনের অন্ধকার থেকে ফিরে এল সে আলোয়। আগুনের আলোয়। যে-আলো ঝলসে উঠছে দাউ-দাউ করে। পুড়ে যাচ্ছে মানুষ। পুড়ে যাচ্ছে শিবির। জ্বলে উঠছে চারদিক। এধার-ওধার ঘোড়া ছুটছে দুড়দাড়িয়ে। ভয়ে। ঘোড়ার পিঠে রাজার সেনারা চিৎকার করছে আকাশ কাঁপিয়ে। তীর উড়ে যায় এলোপাথাড়ি। ধোঁয়া উড়ছে। কালো অন্ধকার ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার অন্ধকার থেকে মানুষের আর্তনাদ ভেসে আসছে। যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। ছত্রাখান।

বেশিক্ষণ সময় লাগল না আনাতুরির। সে বুঝতে পারল, সৌরামাতির সেনারা রাজা বুমবুজাংয়ের সৈন্যদের আক্রমণ করেছে। যুদ্ধ লেগে গেছে আসগুজাইদের সঙ্গে সৌরামাতির। সৌরামাতি প্রতিশোধ নেবে এবার। আসগুজাই রাজার ছেলে তিত্তাচিনি তাদের আঘাত করে পালিয়ে এসেছে। এবার সৌরামাতির সেনারাই ঢুকে পড়েছে আসগুজাইয়ের আস্তানায়। মারো! মারো! যাকে সামনে পাও, তাকেই মারো। রক্তবন্যায় ভেসে গেল চারদিক। বুমবুজাং-এর সেনারা মরছে শ'য়ে-শ'য়ে। এখন কে তাদের হাল ধরবে! রাজাও নেই। রাজার ছেলেও নেই। ছেলে তো মরেই গেছে। রাজা আহত হয়ে পড়ে আছে বনে। এখন কে আটকাবে সৌরামাতির এই আক্রমণ। দুরন্ত গতিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আগুন লাগাচ্ছে। লুটে নিচ্ছে, সোনাদানা। ঘোড়া-গোরু যা পাচ্ছে।

কিন্তু এখন আনাতুরি কী করবে? তার হাতে কোনও অস্ত্র নেই। কোলে ছেলেটা। সৌরামাতির দুর্ধর্ষ সেনার হাত থেকে সে ছেলেটাকে কেমন করে বাঁচাবে! বিপদের যেন শেষ নেই। স্তান শেষ হয়ে গেছে। এখন আনাতুরিরও কি সময় ঘনিয়ে এল! আনাতুরি যদি শেষ হয়ে যায়, তবে ছেলেটাও তো শেষ হয়ে যাবে! ভাবতে-ভাবতে শিউরে ওঠে আনাতুরি। না, ছেলেটাকে সে মরতে দেবে না। সে নিজেও মরতে চায় না। তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। বেঁচে থাকতে হবে, তার ছেলের জন্য। কোহেন যার নাম।

এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না এমন করে বিপদের মুখোমুখি। মনে সাহস আনল আনাতুরি। ঘোড়া ফেরাল। ঘোড়া আবার ছুটল বনের ভেতরে। লুকিয়ে পড়ল ঘোড়া। লুকিয়ে পড়ল আনাতুরি ছেলেকে নিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে।

হয়তো অনেকক্ষণ তাদের থাকতে হয়েছিল এইভাবে লুকিয়ে। বোঝা যাচ্ছিল রাত নামছে। কেননা, স্তেপের বাতাসে এখন হিমানীর ছোঁয়া ভেসে আসছে। একটা ভয়-জাগানো নির্জনতা ছেয়ে ফেলছে বনের চারদিক। অন্ধকার হয়ে উঠছে আরও ভয়ঙ্কর। আনাতুরির মনটাও যেন ছমছম করছে। একটা অজানা অস্বস্তিতে সে ছটফট করছে। আর থাকতে ইচ্ছে করছে না তার এই বনে। এই অন্ধকারে। সে আবার ঘোড়ার লাগাম ধরে টান দিল। এবার ধীরে হাঁটল ঘোড়া। দুলকি চালে। আনাতুরি ছেলেকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে দুলছে আর ভাবছে। ভাবছে,

এতক্ষণে হয়তো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

আচমকা থমকে দাঁড়াল কেন আনাতুরি ! বুকটা তার কেঁপে উঠল কেন ?

একটা শব্দ। খুবই অস্পষ্ট। আনাতুরির দৃষ্টি সতর্ক। এদিক-ওদিক তাকায়। অন্ধকার। কোথা থেকে আসছে এ-শব্দ ! কেউ যেন এদিকেই আসছে। তার পা পড়ছে, শব্দ স্পষ্ট হচ্ছে !

ঘোড়াকে দাঁড় করাল আনাতুরি। সন্ধানী চোখ তার একজন পাকা সৈনিকের মতো। নিজেও সাবধানী। উড়ন্ত ঈগলের মতো। বেশিক্ষণ নয়, মাত্র কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ যেন চোখ তার ধাঁধিয়ে গেল ! এ যে রাজা বুমবুজাং ! তাকে তো দেখার কথা নয় আনাতুরির। তার তো অনেক আগেই মরে যাওয়ার কথা। সে যে হাঁটতে-হাঁটতে এদিকেই আসছে। শয়তানটা আবার উঠে দাঁড়িয়েছে ! পাথরের আঘাতে সে মরেনি ! তবে কি আনাতুরি আর-একটা পাথর দিয়ে ওর মাথাটা খানখান করে দেবে !

মনে হয়, তার আর দরকার নেই। কেননা, রাজা যতই হাঁটছে, ততই টাল খাচ্ছে। বোধ হয় সময় তার ঘনিয়ে এসেছে। হয়তো বনের অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে-খেতেই সে মরবে।

সে মরবে কি না, সে পরের কথা। কিন্তু আনাতুরি এখন কী করবে ! সামনে দুশমন। কোলে তার ছেলে। দুশমনের হাত থেকে ছেলেকে রক্ষা করাই এখন তার একমাত্র ভাবনা। বুমবুজাং যদি দেখতে পায় ! যদি সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ! না, আনাতুরি ভীরুর মতো লুকিয়ে থাকবে না আর। সে ঘোড়া ছোটাল। অন্ধকারে। বনের ভেতরে।

থতমত খেয়ে গেছে রাজা বুমবুজাং। সে কিছুই দেখতে পেল না। কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু কানে এল তার ঘোড়ার টগবগানি। আর শুকনো পাতার খড়মড়ানি। রাজা বুমবুজাং কিছু ভেবে ওঠার আগেই আনাতুরি পগার পার। আর ঠিক তখনই রাজা আর্তনাদ করে উঠল, "আমাকে বাঁচাও ! আমি রাজা বুমবুজাং !"

এখন, এখানে আর কেউ নেই। কেউ তাকে বাঁচাবে না। তার আর্তনাদ অন্ধকার বনে প্রতিধ্বনি তুলল। মিলিয়ে গেল। কেউ সাড়া দিল না।

সাড়া দিল আনাতুরির ঘোড়া। অনেকখানি বন ডিঙিয়ে খোলা আকাশের দেখা পেয়েই ঘোড়া চেঁচিয়ে উঠল, চিঁ-হিঁ-হিঁ !

এখন বনের বাইরে এসেছে আনাতুরি। এখন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চারদিক। কেমন যেন নিঝুম সব। শুধু আগুন জ্বলছে যুদ্ধের। ধিকি-ধিকি। এখানে-ওখানে মৃত মানুষের দেহ। মুণ্ডু নেই। যুদ্ধ জয় করে যে-সৈনিক শত্রুর যত বেশি মুণ্ডু রাজাকে উপহার দেবে সে-ই তত বড় বীর। এধারে-ওধারে রক্ত। ছড়িয়ে আছে। মানুষের মুণ্ডুহীন দেহের রক্ত।

আনাতুরি সেখানে আর দাঁড়াল না। আনাতুরি ঘোড়া ছোটাল নিজের গাড়ি-ঘরের দিকে। কে জানে, তার ঘরেও আগুন লেগেছে কি না !

কিন্তু তাকে ঘর অবধি যেতে হল না। সে জানতে পারেনি সৌরামাতির সেনারা ওত পেতে বসে আছে। কাছেপিঠে। আনাতুরির ঘোড়া দেখেই তারা তেড়ে এল। চিৎকার করে উঠল। আনাতুরি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। তার বুকটা ধক করে চমকে উঠেছে। এবার সে ধরা পড়ে গেছে। আর বুঝি সে পারল না। পারল না ছেলেটাকে বাঁচাতে ! নিজে মরবে। মরবে ছেলেটাও। সুতরাং আর চেষ্টা করে লাভ নেই।

আশ্চর্য, আনাতুরিকে কিছুই করতে হল না ! করল তার ঘোড়া। শত্রুকে তেড়ে আসতে দেখে, ঘোড়া নিজেই ছুট মারল। আর ঠিক তখনই আনাতুরির ছেলেটাও কেঁদে উঠল। বিপদে পড়ে গেল আনাতুরি। ঘোড়া যেখানে ছোটে, কান্নাও সেদিকে যায় ! শত্রুর ঘোড়াও সেইদিকে ধাওয়া করে।

আর মিথ্যে বাঁচার চেষ্টা। এমন করে কতক্ষণই বা বাঁচা যায় ! পারল না আনাতুরি। সে বুঝতে পারল, শত্রু তাদের ঘিরে ফেলেছে। যেদিকে চায় সে, সেইদিকেই শত্রুসৈন্য সৌরামাতির। ঘোড়ার পিঠে। তাদের হাতে তীর-ধনুক। লক্ষ্য আনাতুরি। অথবা তার ছেলেটা। তাকে দেখে চিৎকার করে হেসে উঠল সৌরামাতির সেনারা, হা-হা-হা ! আর কিছু করার নেই। যে-কোনও মুহূর্তে তীর ছুটে আসবে। এক মৃত্যুর হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এবার আর-এক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে আনাতুরি।

এগিয়ে আসছে সৌরামাতির সেনা। ঘোড়ার পিঠে।

ছেলেটা কাঁদছে আনাতুরির কোলে।

সৌরামাতির সেনারা হাসছে বিকট স্বরে।

আনাতুরির ঘোড়া ভেতরে-ভেতরে ফুঁসছে।

আরও এগিয়ে এল শত্রুরা।

আনাতুরি ছেলেকে আড়াল করছে।

শত্রু লাফ দিল।

আনাতুরির ঘোড়া তার আগেই শত্রুর মাথা টপকে মারল ছুট।

শত্রু হকচকিয়ে গেছে। নিজেদের হাতের তীর হাতেই রয়ে গেল। ছোড়া হল না।

আবার শুরু ছোটাছুটি।

আবার শুরু চেঁচামেচি।

আবার শুরু ঘোড়ার খুরে টগবগানি।

একটা ঘোড়া একা। একশোটা ঘোড়া তাকে তাক করেছে। একশোটা ঘোড়ার পিঠে একশোজন সেনা। একশোজন সেনার হাতে একশোটা তীর-ধনুক। পারবে কেন ! আনাতুরির ঘোড়া ছুটতে-ছুটতে দম খোয়াল। সে হোঁচট খেল। ধুঁকতে-ধুঁকতে হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ল। ছিটকে পড়ল আনাতুরিও, ছেলেটাকে কোলে নিয়ে। ছেলেটাকে সে রক্ষা করল। কিন্তু আঘাত পেল নিজে। প্রচণ্ড। অন্য কেউ হলে হয়তো যন্ত্রণায় বেহুঁশ হয়ে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু না, আনাতুরি যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাল না। সে তার ছেলেকে বুকের আড়ালে আগলে নিয়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল। তার আর পালাবার পথ নেই।

সৌরামাতির ঘোড়সওয়ার সেনার হাতে ধরা পড়ল আনাতুরি। তার সঙ্গে তার কোলের ছেলেটাও। শুরু হয়ে গেল হম্বিতম্বি, আনাতুরির ওপর। ভয় দেখানো হল, এখনই তার গলা কেটে ফেলা হবে। তার ছেলেটাকে আকাশে ছুড়ে লোফালুফি খেলা হবে। তারপর মেরে ফেলা হবে।

রুখে দাঁড়াল আনাতুরি। তার ছেলেকে বুকে নিয়ে, একটা হিংস্র সিংহীর মতো। চোখ তার রাঙানো।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। তার এই দুঃসাহস তছনছ করে দিল সৌরামাতির সেনারা। মুহূর্তের মধ্যে। তারা ছেলেটাকে কেড়ে নিল আনাতুরির বুকের আড়াল থেকে। তারপর আনাতুরির চুলের মুঠি ধরে ঘোড়া ছোটাল। ঘোড়া ছোটে। চুলে টান মেরে চিৎকার করে সৌরামাতির সেনারা। আনাতুরি হুমড়ি খেতে-খেতে ঘষটে যায়। হোঁচট খায়। পা কাটে। রক্ত ছোটে।

"থামো !" হঠাৎ কেউ ক্ষিপ্ত স্বরে চিৎকার করে উঠল।

ঘোড়সওয়ার সৌরামাতির সেনারা থামল। আনাতুরির চুলের মুঠি ছেড়ে দিল। আনাতুরি লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। জ্ঞান হারাল। আর বোধ হয় তাকে কেটে ফেলার দরকার হবে না। একটু পরেই হয়তো আনাতুরির দম ফুরিয়ে যাবে। মরবে তার ছেলেটাও।

"কেন তোমরা এই মেয়েটাকে এমন করে মারছ ?" সে আবার ধমক দিল।

একজন সেনা নিচুস্বরে উত্তর দিল, "মহারাজ, মেয়েটা শত্রুপক্ষের লোক।"

"কী করেছে মেয়েটা ?"

"মহারাজ, মেয়েটা তার ছেলেটাকে নিয়ে পালাচ্ছিল ।"

"কই ছেলে ?"

"আজ্ঞে, এই যে । ঘুমিয়ে পড়েছে ।"

"দু'জনকেই শিবিরে নিয়ে চলো ।" বলতে-বলতে মহারাজ ঘোড়া ছোটাল । হয়তো শিবিরের দিকেই ঘোড়া ছুটল ।

আনাতুরি কিছুই জানতে পারল না । কেননা, তখনও তার জ্ঞান ফেরেনি ।

॥ ৭ ॥

জ্ঞান ফিরেছিল আনাতুরির, অনেকক্ষণ পর । অনেকক্ষণ পর সে বুঝতে পেরেছিল, এখনও সে বেঁচে আছে। কিন্তু তার ছেলেটা ! ছেলের কথা মনে পড়তেই আঁতকে ওঠে আনাতুরি । সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে । পারে না । অনেকগুলো অচেনা মানুষের মুখ । তার দিকে চেয়ে আছে ড্যাবড্যাব করে । আনাতুরি ভয় পায় । ঘোর অন্ধকার আবার যেন নেমে আসে তার চোখের পাতায় । সে চিৎকার করে ওঠে । ভয়ে । কেঁদে ফেলে । আর ঠিক তখনই কেঁদে ওঠে আনাতুরির ছেলে । কোহেন । ককিয়ে-ককিয়ে ।

থমকে থামে আনাতুরির কান্না । সে ছেলের কান্না শুনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে । তবে কি তার ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে ! তবে কি তার চোখের সামনেই কোহেনকে হত্যা করা হবে !

আনাতুরি আর পারল না শুয়ে থাকতে । তার মনে হল এবার সে উঠতে পারবে । উঠে বসতে পারবে । হ্যাঁ, সে উঠে বসল । কষ্ট হল । পা দুটো তার ছিড়ে ছড়ে গেছে । ব্যথা । যন্ত্রণা । ছেলের কান্না শুনে সে-যন্ত্রণা সে ভুলে গেল । কই তার ছেলে ? আঁতিপাতি করে তার চোখ খুঁজতে লাগল তার ছেলেকে ।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তার চোখ । সে দেখতে পেয়েছে । এই তো তার ছেলে । কিন্তু ও কে ! কার কোলে তার ছেলে শুয়ে আছে ! কাঁদছে !

ওই তো সৌরামাতির রাজা ।

জানে না আনাতুরি । চেনে না তাকে । অবাক চোখে দেখছে শুধু ।

সৌরামাতির রাজা হাসল । আনাতুরিকে দেখে । তারপর বলল, "আমি তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। আমি সৌরামাতির রাজা ।"

শিউরে উঠল আনাতুরি । ডুকরে উঠল, "আমার ছেলেকে মেরো না ! ওকে ফিরিয়ে দাও আমার কাছে !"

আশ্চর্য, রাজার চোখ তো প্রতিহিংসায় ঝলসে উঠল না ! রাজা তো জল্লাদের মতো হেসে উঠল না ! বরং ধীরে পায়ে এগিয়ে এল রাজা । আনাতুরির কাছে । ছেলেকে নিয়ে । আনাতুরির কোলে তুলে দিল রাজা তার ছেলেকে । রাজার চোখের পলক পড়ে না । সে দেখছে, মা আর ছেলেকে । অবাক হয়ে ।

আনাতুরি বিশ্বাস করতে পারে না । সে ভাবে, তার ছেলেকে হয়তো এখনই হত্যা করা হবে । তাই দয়া করেছে রাজা । দয়া করে তাকে দেখতে দিয়েছে । এ বুঝি ছেলেকে তার শেষ দেখা । আনাতুরি ছেলের মুখের দিকে তাকাল । তারপর হাউহাউ করে কেঁদে উঠল । কেঁদে উঠল, ছেলেকে বুকে চেপে ধরে । কাঁদতে-কাঁদতে আবার বলল, "মেরো না রাজা । আমার ছেলেকে দয়া করো ! আমায় দয়া করো !"

এবার রাজা হাসল । হো-হো করে হেসে উঠল । হাসতে-হাসতে বলল, "শত্রুকে আমরা বাঁচতে দিই না !"

আনাতুরি কাঁদতে-কাঁদতেই বলে উঠল, "আমার ছেলে দুধের শিশু । শত্রু কাকে বলে ও জানে না রাজা । ওকে বাঁচতে দাও ! আমি ওকে কারও শত্রু হতে দেব না । আমার ছেলে হবে সকলের বন্ধু । তোমাদেরও ।"

রাজা উত্তর দিল, "তুই নিজেই তো আমাদের শত্রু । শত্রুকে আমরা ধরে আনি তার রক্ত দেখার জন্য । শত্রুকে যে বাঁচতে দেয় তার মতো আহম্মক আর কে আছে ! কে না জানে, শত্রুকে বাঁচতে দেওয়া মানে নিজেরই বিপদ ডেকে আনা !"

সৌরামাতিরাজার কথা শুনতে-শুনতে আনাতুরির চোখের জল যেন শুকিয়ে গেল । তার মুখখানা যেন নিমেষে ঝলসে উঠল রাগের আগুনে । কঠিন হল তার গলার স্বর । নির্ভয়ে সে বলল, "তবে শোনো সৌরামাতিরাজ, আমার এই ছেলের বাবার নাম স্তান । স্তান ছিল রাজা বুমবুজাংয়ের বিশ্বাসী সহচর । বুমবুজাংয়ের ছেলে তিত্তাচিনি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দিল । কিন্তু দোষ হল আমার এই দুধের ছেলেটার । রাজা বুমবুজাং অপবাদ দিল আমার ছেলে জন্মেছে বলেই তার ছেলে মরেছে । আমার ছেলে অলক্ষুনে ! রাজা, তুমি একবার ভাল করে চেয়ে দ্যাখো তো আমার ছেলেটার দিকে ! বলো তুমি, কোথায় দেখতে পাচ্ছ অলক্ষণ ! তুমি দ্যাখো, আরও ভাল করে দ্যাখো ! বলো তুমি, আমার ছেলে কি সুন্দর নয় ! বলো ! বলো ! আমার এই সুন্দর ছেলেকেই রাজা হত্যা করতে চেয়েছিল । স্তান বাধা দিল । রাজা বুমবুজাং স্তানকে মেরে ফেলল । তারপর আমার এই ছেলের গায়ে যখন হাত তুলল, আমি রাজাকে পাথর ছুড়ে আঘাত করলুম । আমি ছেলেকে বাঁচালুম । ভাবলুম, আমার পাথরের আঘাতে রাজা বুঝি মরেই গেছে । না, সে মরেনি । আমি দেখেছি, সে বনের অন্ধকারে বাঁচার জন্য আর্তনাদ করে বেড়াচ্ছে । এতদিন আমি বুমবুজাংকে আমার রাজা বলে মান্য করে এসেছি । কিন্তু আর নয় । সে ঘাতক । এখন আমার রাজা তুমি । আমার কেউ নেই । আমার এই ছেলেটিকে তুমি যদি মেরে ফেলো, আমার যে কিছুই থাকবে না । রাজা, আমাকে তুমি আশ্রয় দাও । তোমার আশ্রয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আমায় বাঁচতে দাও ! রাজা, মনে করো আমি তোমার মেয়ে । বিশ্বাসী মেয়ে । আমি কারও ক্ষতি করব না কোনওদিন । আমি শুধু ঘাতকের হাত থেকে ছেলেটাকে বাঁচাব । তাকে ভালবাসতে শেখাব আমি । সে ভালবাসবে তোমাকে ।

তোমার দেশকে। দেশের মানুষকে।"

সৌরামাতির রাজা নির্বাক হয়ে শুনল আনাতুরির প্রতিটি কথা। শুনতে-শুনতে একবারও সে উত্তেজিত হল না। একবারও সে রাগে চিৎকার করে উঠল না। গম্ভীর হয়ে গেল সে। তারপর গম্ভীর স্বরেই রাজা কথা বলল। বলল, "আমি কখনও শত্রুপক্ষের কোনও লোককে আশ্রয় দিই না। শত্রু ধরা পড়লে তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কোনও শাস্তি আমাদের জানা নেই। যুদ্ধদেবতার উদ্দেশে শত্রুর রক্ত উৎসর্গ করাই আমাদের ধর্ম। কিন্তু তোর কথা শুনে তোকে আমার শত্রু ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। আমার কাছে কেউ কোনওদিন এমন করে আশ্রয় চায়নি। কেউ কোনওদিন কারও জন্য এমন করে প্রাণভিক্ষা করেনি। মেয়ে বলে কেউ কোনওদিন আমার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়নি। কেউ বলেনি এমন করে ভালবাসার কথা। তোর কথা আমি বিশ্বাস করেছি। তাই আমি ঠিক করেছি, তোর প্রাণ আমি নেব না। আমার মেয়ের মতোই তুই বেঁচে থাকবি। বেঁচে থাকবে তোর ছেলেও। কিন্তু কোনওদিন যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারি, তুই যা বলেছিস সব মিথ্যে, যদি বুঝতে পারি, তুই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস, তবে জানবি, সেইদিনই তোর শেষ দিন। শেষ দিন তোর ছেলেরও।"

সৌরামাতিরাজার কথা শুনে উছলে উঠল আনাতুরি। খুশিতে। রাজার পায়ের কাছে মাথা নোয়াল। আবেগে সে আর চোখের জল সামলাতে পারল না। কান্না-ভেজা গলায় বলল, "হে রাজা, তুমি মহৎ। তুমি দয়াবান। আমি যতদিন বাঁচব, তোমার এই দয়ার কথা আমি কোনওদিন ভুলব না। আমার ছেলেকেও আমি তোমার মতো দয়াবান করে তুলব। ভালবাসতে শেখাব।"

সৌরামাতির রাজা কথা বলল না। হাসল। তারপর আনাতুরি আর তার ছেলের জন্য একটি ছ'চাকার গাড়ি-ঘরের ব্যবস্থা করে দিল। সেইদিনই। সেইদিন থেকেই গাড়ি-ঘরের চাকা ঘুরতে শুরু করল। সেই গাড়ি-ঘরে এখন একা থাকে আনাতুরি, ছেলেকে নিয়ে। একাই ছেলেকে আদর করে। যেদিন এখান থেকে পাড়ি দেয় রাজা আর তার প্রজারা আর-এক জায়গায়, ঘোড়া ছোটে, সেদিন আনাতুরির গাড়িও ছোটে তাদের পিছু-পিছু। এখন আর স্তান নেই। এখন আর স্তান ছুটতে-ছুটতে ঘোড়া থামায় না। আনাতুরির গাড়ির কাছে দাঁড়ায় না। আনাতুরির কাছে একটু জলও চায় না ক্লান্ত স্তান। এখন থামে রাজা। মাঝে-মাঝে। জিজ্ঞেস করে, "ও মেয়ে, ছেলে কী করছে?"

ছেলে কখনও ঘুমোয়। কখনও কাঁদে। কখনও হাসে। কখনও মায়ের কোলে বসে হাত বাড়ায়। ওই অসংখ্য ঘোড়ার দিকে। কখনও আঁকপাঁকিয়ে লাফ দেয়। মায়ের কোল থেকে ওই ঘোড়ার দিকে।

মা ছেলেকে আদরে জড়িয়ে হেসে ওঠে। হাসতে-হাসতে বলে, "ছেলের সাহস দ্যাখো! এখনই ঘোড়ায় চড়ার জন্য ছটফটানি! দেরি আছে। আগে বড় হ'। তারপর।" বলতে-বলতে ছেলের চিবুক ছুঁয়ে ধরে। ছেলে হেসে ওঠে।

॥ ৮ ॥

ছেলে বড় হচ্ছে। ধীরে-ধীরে। এখন সে হাঁটতে পারে গাড়ির সঙ্গে। এখন সে ছুটতে পারে ঘোড়ার পিছু। একটু-একটু।

আরও বড় হচ্ছে ছেলে।

এখন সে চিনতে পারে। চিনতে পারে, ঘোড়ার পিঠে এই যে মাথাগুলো ঝুলছে, ওগুলো মানুষের মাথার খুলি। আর ওই যে সেনারা মাথার খুলিতে চুমুক দিয়ে যা খাচ্ছে, তা মানুষের রক্ত।

মা সাবধান হচ্ছে। মা ছেলেকে খুন করতে দেবে না। ভালবাসতে শেখাবে। তাই খুনের কথা যখনই ওঠে কোথাও, মা ছেলেকে সরিয়ে নেয়। ভুলিয়ে-ভালিয়ে গল্প বলে। গল্প বলে: এক যে আছে আকাশ-কন্যা। তার নাম জোছনা। সে আলো ছড়িয়ে দেয় আকাশে। আকাশ থেকে এই স্তেপের ঘাসের ওপর। নদীর ওপর। পাহাড়ে তুষারের ওপর। এইটাই তো পৃথিবী। পৃথিবীকে সুন্দর করে সে আলো ছড়িয়ে দেয়। এই সুন্দর পৃথিবীতে কত গাছ। কত পাখি। কত ঝরনা। কত গান। কত কলতান। কত ভালবাসা।

"মা।" আচমকা ছেলে ডাকল গল্প শুনতে-শুনতে।

গল্প বলতে-বলতে থমকে থামে আনাতুরি, ছেলের ডাক শুনে।

ছেলে বলে, "আমার একটা তীর-ধনুক চাই।"

আঁতকে ওঠে আনাতুরি। ভাবে, ছেলে কি তবে গল্প শুনছে না! জোছনার গল্প! মা ব্যস্ত গলায় জিজ্ঞেস করে, "তীর-ধনুক কী করবি?"

ছেলে উত্তর দিল, "পাখি মারব।"

মায়ের বুক দুরু-দুরু করে ওঠে। ছেলেকে কোলে টানে। বলে, "পাখি মারতে নেই।"

"কেন মারতে নেই! সবাই তো মারে। আগে পাখি মেরে টিপ শিখতে হয়।"

মা উদ্বেগে অস্থির হয়। জিজ্ঞেস করে, "কে বলল তোকে?"

ছেলে বলল, "এ-কথা আর কে না জানে!"

মা তাড়াতাড়ি আবার গল্প শুরু করল। যেখানে থমকে গেছল জোছনার গল্প, সেখান থেকে। সে-গল্পে পাখি মারার কথা নেই। আছে, আকাশের আলোর গান।

ছেলে কিন্তু শোনে না। সে আনমনা। ভাবে, অন্য কথা। ভাবতে-ভাবতে বলে, "আমি এখন শুধু পাখি মারব। তারপর আমি হরিণ মারব। তারপর আরও বড় হলে, আমাদের শত্রুকে মেরে রক্ত নিয়ে খেলা করব।"

"না-আ-আ-আ।" মা চিৎকার করে ধমক দেয়।

"হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা।" ছেলে ঠিক তত জোরেই উত্তর দেয়।

মায়ের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে ছেলেকে আদর করে। একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তার গলায়। বলে, "তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই।"

ছেলে চমকে চায় মায়ের মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, "কেন নেই?"

মা বলে, "সে-কথা তোর শোনার মতো নয়। সময় হয়নি এখনও।"

"কেন হয়নি?" ছেলে জিজ্ঞেস করে।

"তুই এখন ছোট। তোর এখন খেলার সময়।" মা উত্তর দেয়।

ছেলে জানতে চায়, "আমি কতদিন ছোট থাকব?"

"যতদিন না ঘোড়া চড়তে শিখছিস।"

"আমি এখনই ঘোড়ায় চড়তে পারি।" উত্তর দিল ছেলে।

মা আবার থমকে গেল। আবার তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকাল। তারপর একটা ভীষণ ভয়জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুই ঘোড়ায় চড়েছিস?"

"হ্যাঁ।"

"কার ঘোড়া?"

"রাজার।"

হঠাৎই যেন অন্ধকার নামল আনাতুরির চোখের তারায়। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। সে বুঝি পড়ে যায়! না, সামলে গেল। ছেলে কিছু বোঝার আগেই জানতে চাইল, "কবে চড়েছিস?"

"ক'দিন আগে।"

"কখন?"

"তখন দুপুর। তুমি ঘুমোচ্ছিলে।"

"রাজা?"

"আমাদের এই গাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।"

"তুই কোথা ছিলি ?"

"আমি বলদের পিঠে বসে খেলা করছিলুম। রাজা আমাকে দেখল। দাঁড়াল। হেসে বলল, এই তো কোহেন বলদের পিঠে বসতে শিখে গেছে।"

"তুই কী উত্তর দিলি ?"

"আমি বললুম, আমি তোমার মতো ঘোড়াও ছোটাতে পারি।"

"রাজা বলল, 'তুই ছোট। পড়ে যাবি।' বলতে-বলতে হাসল। আমি বললুম, 'একবার দিয়েই দ্যাখো না।' সঙ্গে-সঙ্গে রাজা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। আমাকে বসিয়ে দিল ঘোড়ার পিঠে। অমনই আমি ঘোড়া ছোটালুম। সত্যি বলতে কী, প্রথমটা আমি একটু ঘাবড়ে গেছলুম। এমনকী, আমার ঘোড়ার ছুট দেখে রাজাও ভড়কে গেছল। ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল রাজাও। কিন্তু তারপর আমার আর একটুও ভয় করেনি। আমার ঘোড়া ছুটল কদম পায়ে। আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলুম। ও, সে কী মজা! মনে-মনে ভাবলুম, এখন আমি নিজেই রাজা।" বলতে-বলতে আনাতুরির ছেলে হেসে উঠল।

নির্বাক হয়ে গেল আনাতুরি।

আনাতুরির ছেলে কোহেনও মায়ের মুখে আর কোনও কথা না শুনে অবাক চোখে তাকাল। মাকে দেখে বলল, "তুমি বুঝি ভাবছ আমি মিথ্যে বলছি ?"

আনাতুরি তবুও নিশ্চুপ।

ছেলে বলল, "আমাকে বিশ্বাস যদি না হয়, তুমি রাজাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো।"

এবার আনাতুরি কথা বলল। ভারী বিমর্ষ তার গলার স্বর। ছেলের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোহেন, তোর জোছনার গল্প শুনতে ভাল লাগে না ?"

ছেলে তার ঠোঁট উলটিয়ে উত্তর দিল, "জোছনার গল্প বিচ্ছিরি। তার চেয়ে যুদ্ধের গল্প অনেক ভাল।"

আনাতুরি ভয়ে কুঁকড়ে যায়। মনে-মনে ভাবে, তারও ছেলে কি তবে মানুষের রক্ত নিয়েই খেলা করবে! মানুষকে ভালবাসবে না! বুঝি তার স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যায়। হায় রে, ছেলেটা তার কেন বড় হল! কেন থাকল না ছোট্টটি! যেমন ছিল সে এই ক'দিন আগেও!

কিন্তু দিন তো আর দাঁড়িয়ে থাকে না। সময় বয়ে যায়। কোহেনও বড় হয়। আরও বড়। আর গাড়ি-ঘরের বন্ধ আড়ালে বসে থাকতে ভাল লাগে না তার। মায়ের সঙ্গে। এখন তার আরও পাঁচজনের মতো খেলা করতে ইচ্ছে করে। খোলা আকাশে ঘোড়া ছুটিয়ে। আর, নয়তো কোনও বিদেশি মানুষের সর্বস্ব লুঠ করে আনন্দ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কিছুই পারে না সে। কেমন করে পারবে! তার তো ঘোড়া নেই। লুঠ করে পালাবে কেমন করে!

"মা," একদিন কোহেন মাকে ডেকে বলল, "দ্যাখো, এখন আমি বড় হয়েছি। তোমার সঙ্গে এই গাড়ি-ঘরের অন্দরে বসে থাকা আমার এখন সাজে না। এখন তুমিই থাকবে গাড়ির ভেতর। আমি থাকব ঘোড়ার পিঠে। আর তো আমি তোমার কোলের ছেলেটি নই।"

আনাতুরি হতাশ চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, "কোহেন, তুই যতদিন আমার কাছে-কাছে থাকবি, ততদিনই তুই আমার ছোট্ট কোহেন হয়েই থাকবি। ওরে কোহেন, মায়ের কাছে ছেলে চিরদিনই তার ছোট্ট ছেলে। সে কোনওদিনই বড় হয় না। তাই তুই আমার কাছে, সেই ছোট্ট কোহেন হয়েই আছিস।"

কোহেন মায়ের কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল।

মা অবাক হয়ে তাকাল কোহেনের মুখের দিকে। তবে কি মায়ের কথা পছন্দ হল না কোহেনের। তা না হলে অমন তাচ্ছিল্যের সুরে সে হাসে কেন!

অমন তাচ্ছিল্যের সুরে হাসতে-হাসতেই কোহেন বলল, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমি কোনওদিনই বড় হব না। আমি কোনওদিনই ঘোড়ায় চড়ে স্তেপের ঘাস ডিঙিয়ে যুদ্ধ করতে শিখব না! কোনওদিনই আমি বীর হব না! শত্রুকে তীর ছুড়ে ঘায়েল করতে পারব না! চিরদিনই গাড়ির ঘরে বসে থাকব, তোমার কোল ঘেঁষে, জুজুর ভয়ে!" বলতে-বলতে থামল। তারপরেই মুখখানা তার ঝলসে উঠল। রুক্ষ স্বরে সে ফুঁসিয়ে উঠল, "মা, তুমি কি চিরদিন আমায় ঠুঁটো হয়ে থাকতে বলো ? তুমি কি চাও না, ছেলেটা রক্ত চিনতে শিখুক ? ছেলেটা মানুষ হোক ?"

মা চমকাল। মাকে তো কোহেন কোনওদিন এমন কর্কশ স্বরে কথা বলেনি। এমন উদ্ধত ব্যবহারও করেনি। ভয় পায় আনাতুরি। স্বামীর মৃতদেহের ওপর চোখের জল ফেলে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, মিথ্যে হয়ে যায় বুঝি সেই প্রতিজ্ঞা! হায় রে, সে কোহেনকে শেখাতে পারল না ভালবাসতে। প্রতিদিন রক্ত দেখে-দেখে সেও বুঝি হয়ে উঠেছে রক্তপিশাচ। একটা যুদ্ধবাজ হিংস্র জানোয়ার!

"আমার একটা ঘোড়া চাই।" হঠাৎ বেশ চড়া গলায় মার কাছে দাবি করল কোহেন।

আনাতুরি তাকাল কোহেনের দিকে। মমতায় ভরে আছে সে দুটি চোখ।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল না কোহেনের। সে চড়া গলায় বলল, "আর ঘরে বসে থাকা আমার সাজে না।"

আনাতুরি এবারও শান্ত। মনের ব্যথাটা অনেক কষ্ট করে মনের মধ্যেই লুকিয়ে রাখল। তারপর বলল, "কোহেন, আমি তোকে ঘোড়া কোত্থেকে দেব বাবা ? ঘোড়া দেওয়ার সামর্থ্য যে আমার নেই।"

তেমনই ক্ষিপ্ত স্বরেই কোহেন উত্তর দিল, "ঠিক আছে। তোমার সামর্থ্য নেই যখন, তখন, আমাকেই দেখতে হবে।"

শিউরে উঠল আনাতুরি। জিজ্ঞেস করল, "তুই কোথায় দেখবি ?"

কোহেন উত্তর দিল, "দেখার অনেক জায়গা আছে। আমাকে তো আর মায়ের আদরে অন্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। যা হোক কিছু করতেই হবে।"

মা অস্থির হল, "কী করবি তুই ? ঘোড়া পাবি কোথায় ?"

"আমি রাজার কাছে চাইব। তার অনেক আছে।" উত্তর দিল কোহেন।

চুপ করে গেল আনাতুরি। সে যে মনে-মনে কী ভাবল, সে আনাতুরি ছাড়া আর কেউ জানল না। তারপর রাত্তিরবেলা কোহেন যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন সে ছুটল। সে ছুটছে প্রাণের ভয়ে। একটা হিংস্র বাঘ যেন তাড়া করেছে তাকে। এই বুঝি তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বাঘটা!

॥ ৯ ॥

ছুটতে-ছুটতে আনাতুরি পৌঁছে গেল রাজার আস্তানায়। রাজার শিবির। এইখানেই। সামনে একটা স্বচ্ছ জলের সরোবর। থই-থই জলের ছবিতে আকাশ-ভর্তি তারার ছায়া। দুলছে। দু-একটা গাছ। ওক অথবা পাইন। ঘাস এখানে সবুজ হয়ে আছে। হাওয়া বইছে। কেউ বাধা দেওয়ার নেই। যে বাধা দেয় সে তো হাওয়ার বন্ধু। ওই গাছ, ওই সবুজ ঘাস। হাওয়া যেন ওদের খেলার সঙ্গী। হাওয়া বাজনা বাজায় গাছের পাতায়। দোল খায় গাছ। গান গায়। না হয়, নাচে।

রাজার শিবিরের পাশে আরও অনেক শিবির। যাযাবর এই ঘোড়সওয়ার মানুষের শিবির। এই রাতে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকে জেগে আছে। কোথাও-কোথাও মানুষের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। কোথাও হাসি। কোথাও হুল্লোড়। দূরে দামামা বাজছে।

ট্যুরিস্ট স্টাইল
অফিস স্টাইল
স্পোর্টস স্টাইল
ফ্লাইট স্টাইল
ট্রেকিং স্টাইল
পথ চলার সফ্‌ট্ লাগেজ,
আপনি যেখানেই যান।
স্টাইলিশ, কিন্তু ধকল সইতে পারে। ট্র্যাভেলস্টাইল আপনি যেমন করেই ব্যবহার করুন না কেন চরম ধকলের পরেও দেখায় ঝকঝকে অভিজাত। একে টেঁকসই করাই হয়েছে সেভাবে। এতে আছে অনন্য নাইলন কাপড় আর মেটাল ফিটিংস।
হ্যাঁ ট্র্যাভেলস্টাইল। চলে আসুন যে কোন ডাকব্যাক শো রুমে। চোখের দেখা দেখুন। তারপর ছুঁয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন তফাতটা কোথায়। আর দামের কথা ভাবছেন! সেটা আপনাকে চমকে দেবার মতই আনন্দদায়ক।
Duckback®
Travelstyle
মাইলের পর মাইল, বছরের পর বছর—শুধু আপনারই
শো-রুম ঃ
● ১২,জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৩
● ৮৬,কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০১২
● ১৬৭বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৯
● ১১০, বিধান সরণী, কলকাতা—৭০০ ০০৪
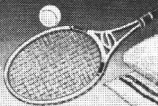
ভেসে আসছে। শোনা যাচ্ছে গান।

রাজার শিবিরের সামনে এসে দাঁড়াল আনাতুরি। হাঁপাচ্ছে সে।

রাজার শিবিরের দু'পাশে দু'জন সান্ত্রি।

"কী চাই ?" সান্ত্রি জানতে চায়।

"মহারাজ কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ?" হাঁপাতে-হাঁপাতে জিজ্ঞেস করে আনাতুরি।

"কেন ?" সান্ত্রি প্রশ্ন করে।

"আমি তাঁর সঙ্গে দ্যাখা করতে চাই।" জবাব দিল আনাতুরি।

"কে তুমি ?"

"আমার নাম আনাতুরি।"

"কাল সকালে এসো !"

"আমার আজই দরকার।"

"তোমার দরকার থাকলেও আমাদের হুকুম নেই।" চড়াগলায় উত্তর দিল সান্ত্রি।

"তোমরা শুধু একবার খবর দাও, আনাতুরি এসেছে।" মিনতি করল আনাতুরি।

সান্ত্রি হুঙ্কার দিয়ে বলল, "বলছি তো, না। বিরক্ত কোরো না। যাও !"

রাজা সান্ত্রির চিৎকার শুনতে পেয়েছে। রাজা শিবিরের ভেতর থেকে হাঁক দিল, "কে ? কেন চেঁচাচ্ছ ?"

রাজার গলা শুনে আনাতুরি নিজেই আগ বাড়িয়ে সাড়া দিল, "আমি, আনাতুরি।"

"কে ! আনাতুরি !" রাজার গলায় বিস্ময়। নিজেই শিবিরের পরদা সরিয়ে এগিয়ে এল। "এত রাত্রে আনাতুরি, তুমি !"

"হে সৌরামাতিরাজ, আমার বড় বিপদ। আমি তোমায় দুটো কথা বলতে এসেছি। যদি তুমি দয়া করে শোনো !" অধীর হয়ে বলল আনাতুরি।

রাজা জিজ্ঞেস করল, "কী এমন বিপদ তোমার যে, এই রাতদুপুরেই আসতে হল আমার কাছে ? এসো, এসো, তুমি ভেতরে এসো !"

রাজার পেছনে-পেছনে আনাতুরি শিবিরের ভেতরে ঢুকল।

সান্ত্রি দু'জন হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। হয়তো মনে-মনে ভাবল, কে এই আনাতুরি !

"বোসো !" শিবিরে ঢুকে রাজা আনাতুরিকে বসতে বলল।

আনাতুরি বসল।

"কী হয়েছে তোমার ?" অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করল রাজা।

আনাতুরি আকুল হয়ে কেঁদে পড়ল, "তুমি আমাকে বাঁচাও !"

"কে তোমায় বিপদে ফেলেছে ?" রাজার গলায় আরও বিস্ময়। "সে কি আমার কোনও প্রজা ?"

"না। হে সৌরামাতিরাজ, সে আমার ছেলে।" আনাতুরির গলা কেঁপে উঠল।

"তোমার ছেলে ? কোহেন ?"

"হ্যাঁ, প্রভু।"

"কী করেছে সে ?"

আনাতুরি আকুল হয়ে বলল, "হে রাজা, আমার স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে গেল। আমার ছেলে মানুষকে ভালবাসতে শিখল না। আমি হেরে গেছি।"

"কেন এ-কথা বলছ ?" খুবই অবাক হল রাজা।

"মহারাজ, কোহেন আমাকে চোখ রাঙাল। সে আমার মুখের ওপর বলল, আমার কাছে সে আর থাকবে না। তার ঘোড়া চাই। সে যুদ্ধ করবে। সে হত্যা করবে।" বলতে-বলতে আনাতুরির মুখখানা লাল হয়ে গেল। তার ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে। সে হাঁপাচ্ছে। কাঁপছে।

রাজার উৎকণ্ঠা এবার কমল। রাজা বলল, "আনাতুরি, এতে তোমার এত উতলা হওয়ার কী আছে ! তুমি শান্ত হও !"

"আমি শান্ত হতে পারছি না রাজা।" আনাতুরি কেঁদে ফেলল। বলল, "আমি যে কোহেনের বাবার মৃতদেহের ওপর চোখের জল ফেলে বলে এসেছি, আমি কোহেনকে ভালবাসতে শেখাব। আমি বলেছি, হত্যা নয়, ভালবাসা দিয়ে সে তার বাবা স্তানের হত্যার প্রতিশোধ নেবে।"

রাজা হাসল। অনেকদিন আগে আর-একবার হেসেছিল রাজা এমন করে। আনাতুরির মুখে ভালবাসার কথা শুনে।

"হাসছ কেন হে সৌরামাতিরাজ ? অনেকদিন আগেও তুমি একবার হেসেছিলে। এমন করে। আমার মুখে ভালবাসার কথা শুনে।" বলল আনাতুরি।

"আনাতুরি", রাজার হাসি থামল, "তোমার স্বপ্ন মিথ্যে। আমি জানতুম, তোমার ছেলে কোনওদিনই ভালবাসতে শিখবে না। আমাদের দেশে কেউ শেখে না। আমাদের এই দেশে ভালবাসা নেই। থাকতে পারে না। কারণ, আমাদের চারদিকে শত্রু। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে আমাদের বাঁচতে হয়। আমাদের অস্ত্র হল হিংসা। আনাতুরি, আমাদের ঘর নেই, দোর নেই। তুমি তো জানোই, এই স্তেপের পথে-পথে আমাদের ঘর। আমরা যাযাবর। আমাদের লড়াই করতে হয় আকাশের সঙ্গে। এখানে বাতাসে শীতের প্রচণ্ড শিহরন। এখানে ঝড়ের শক্তি ভয়ঙ্কর। সে-ঝড় বয়ে আনে কালো মেঘ। কালো মেঘের আড়াল থেকে নেমে আসে বজ্রের আঘাত। নেমে আসে বৃষ্টি। সব আমাদের সহ্য করতে হয়। ওই আকাশকে তুষ্ট করার জন্য আমরা ছড়িয়ে দিই রক্ত। মানুষের রক্ত। সেই মানুষের রক্তে চান করে আমরা ভয়কে জয় করি। আমাদের মৃত্যু হলে মানুষকে হত্যা করে আমরা দুঃখ জানাই। আনাতুরি, তুমি তো এও জানো, তিনশো পঁয়ষট্টি দিনেও যে-পুরুষ একজন শত্রুকেও হত্যা করতে পারে না, তাকে আমরা মানুষ বলি না। আমাদের সংসারে ভীরু পুরুষের জায়গা নেই। তাকে মেরে ফেলা হয়। সুতরাং তুমি কেমন করে ভাবলে, তোমার ছেলে ভীরু হবে ! কেমন করে ভাবলে, তোমার ছেলে বীরের মতো যুদ্ধ না করে, তোমার হাত ধরে ঘুরে বেড়াবে ভিতুর মতো ! সে ভালবাসবে সবাইকে ! আনাতুরি এই নিষ্ঠুর স্তেপে ভালবাসা নেই। থাকতে পারে না।"

আনাতুরি সৌরামাতির রাজার কথা শুনতে-শুনতে এবার হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতে জিজ্ঞেস করল, "ওগো রাজা, তবে কেন আমার মন এমন করে আদরে উছলে ওঠে ছেলেটার জন্য ? বলো তো রাজা, স্তানের হত্যা দেখে আমার মন অমন করে কেন কেঁদে উঠেছিল সেদিন ? আমি কেন পাষাণ হতে পারিনি ? রাজা, রক্ত দেখে আমিও কেন উল্লাস করতে পারি না ? বলো রাজা, বলো। কেন ? কেন ? কেন ?"

"মন শক্ত করো আনাতুরি !" রাজার গলা বড় শান্ত, "আনাতুরি, এই স্তেপে কোনও দয়া নেই। কোনও মায়া নেই। এই স্তেপ আমাদের নৃশংস হতে শিখিয়েছে। তোমার ছেলেও তাই শিখবে। তুমি একা কেমন করে পারবে স্তেপের নিয়ম ভাঙতে। এই নিয়মই আমাদের বাঁচার নিয়ম।"

"এই নিয়ম আমি মানি না !" হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠল আনাতুরি।

রাজা এতটুকুও রাগ করল না।

আশ্চর্য, যে-রাজার সামনে এমন করে গলা চড়িয়ে কথা বললে, তার মরণ ছাড়া অন্য শাস্তি নেই, সেই রাজা কিন্তু শান্ত স্বরেই আনাতুরিকে বলল, "আনাতুরি, তোমার ছেলে আমার সৈনিক হবে।"

আনাতুরি আঁতকে উঠল। আর যেন তার গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। স্থির চোখে চেয়ে থাকে রাজার মুখের দিকে। অসহ্য যন্ত্রণায় সে যেন জেরবার হয়ে যায়। সে যন্ত্রণা বুঝি-বা তার সারা শরীর ঠুকরে খাচ্ছে।

"কোহেনকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।" ভারী শান্ত স্বরে রাজা আনাতুরিকে আদেশ করল।

"না-আ-আ-আ!" আনাতুরির মাথায় যেন কেউ আঘাত করল শেলের বাড়ি। সে চিৎকার করে উঠল। তারপর সে যেমন করে এসেছিল তেমনই করেই ছুট দিল। রাজার শিবির থেকে নিজের আস্তানায়। এখন যেন আর কেউ নেই তার। একা। নিঃসহায়। এই অন্ধকার রাতে, এই শেষ না-জানা আকাশটার নীচ দিয়ে সে একাই ছুটে চলেছে। ওই আকাশের অনেক বন্ধু। অসংখ্য তারা। আছে চাঁদ। আছে সূর্য। আছে রাত আর দিন। আনাতুরির কেউ নেই। কিচ্ছু নেই। আজ আর কেউ তাকে গান শোনাবে না। কেউ তার সামনে এসে গলাটি জড়িয়ে ধরবে না, হাসতে-হাসতে। কেউ খুশিতে দু' হাত তুলে খেলা করবে না। তার সামনে। সবাই তাকে দেখে বলবে, ভিতু। গঞ্জনা দেবে। ছিঃ ছিঃ করবে। হায় রে, সে তবে বাঁচবে কেমন করে!"

পৌঁছে গেল আনাতুরি নিজের গাড়ি-ঘরে। থমকে গেল আনাতুরি। দেখল, কোহেনের ঘুম ভেঙে গেছে। সে বসে আছে। চেয়ে আছে মায়ের পথের দিকে।

"কোথা গেছলে?" খুবই রুষ্ট স্বরে সে জিজ্ঞেস করল।

আনাতুরি কী বলবে? কোন কথাটা বললে যে ছেলের মন পাবে, সে বুঝতে পারল না। কিন্তু ছেলের মন পাওয়ার জন্য মিথ্যে বলতেও তার মন সায় দিল না। ছিঃ! সে না মা! ছেলেকে মিথ্যে কেন বলবে সে! সে তো কিছু অন্যায় করেনি। তাই নিজের সমস্ত উৎকণ্ঠা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সে বলল, "রাজার কাছে।"

রাজার নাম শুনে হঠাৎ কী হল কোহেনের! তার সেই রুষ্ট স্বর কোথায় গেল! আনন্দে উচ্ছল হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "রাজা কী বলল?"

"কিসের কী বলবে?" জিজ্ঞেস করল আনাতুরি।

"আমার ঘোড়ার কথা!"

"জিজ্ঞেস করিনি।"

সঙ্গে-সঙ্গে চুপসে গেল কোহেন। জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

মা'র গলার স্বর দৃঢ় হল। বলল, "আমি চাই না, তুই ঘোড়সওয়ার হোস।"

"রাজাও কি চায় না?" মায়ের মতোই দৃঢ় গলায় কোহেন জিজ্ঞেস করল।

"রাজা কী চায়, না চায়, আমি জানি না। শুধু শুনে রাখ, আমি তোর মা। আমি চাই না।"

কোহেন মায়ের মুখের দিকে কটমট করে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি তবে আমাকে ঘোড়া দেওয়ার কথা বারণ করতে গেছলে রাজার কাছে?"

"হ্যাঁ।" স্পষ্ট গলায় মায়ের উত্তর।

এবার চিৎকার করে উঠল কোহেন, "কেন?"

"আমার ইচ্ছে।" মা উত্তর দিল।

মায়ের এই উত্তর শুনে অবাধ্য ছেলের মতো হাত-পা ছুড়ে কোহেন জবাব দিল, "তোমার ইচ্ছে আমি মানি না। আমি নিজে রাজার কাছে যাব। আমি নিজে রাজাকে ঘোড়ার কথা বলব।"

আনাতুরি আর থাকতে পারল না। ছেলেকে ধমক দিল, "না, তুই যাবি না!"

মায়ের মুখের ওপর মুখ তুলে কোহেন উত্তর দিল, "তোমার কথায়!"

"হ্যাঁ, আমার কথায়!" উত্তেজনায় কেঁপে উঠল আনাতুরি।

"আমি তোমার কথা যদি না মানি?"

আনাতুরি থাকতে পারল না। সহ্য করতে পারল না ছেলের বেয়াদপি। আচমকা সে কোহেনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল ঠাস করে। রাগে চিৎকার করে উঠল, "ভুলে যাস না, আমি তোর মা। আমার মুখের ওপর কথা বলার স্পর্ধা দেখাস তুই কোন সাহসে! আমি যা বলব, তোকে তাই-ই শুনতে হবে।"

আশ্চর্য, মায়ের হাতে মার খেল, অথচ, কোহেনের মুখে আর একটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত বেরোল না। ঠিক যেন বিদ্যুৎ। চমকেই মিলিয়ে গেল। মুখে যেমন কথা নেই, চোখে তেমনই রাগ নেই। নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না। বালিশে মুখ গুঁজে সে গোঁজ হয়ে পড়ে রইল বিছানায়।

শিউরে উঠল আনাতুরি। ইস! এ কী করল সে! এমন দপ করে সে রাগে কেন জ্বলে উঠল! কেন অমন করে আঘাত করল সে কোহেনকে! অস্থির হয়ে উঠল আনাতুরি। যে-হাত দিয়ে সে কোহেনের গালে আঘাত করেছে, সে-হাত তার কাঁপছে। যে-মনে তার ছেলে আঘাত করে আনাতুরিকে ক্ষিপ্ত করেছিল, মুহূর্ত আগে, সে-মন এখন অনুতাপে ছটফট করছে। আহা রে, সে কেন এমন নির্দয় হল! আর-একটু সহ্য করলে কী ক্ষতি হত! নিজের ছেলে হলেও এখন তো সে বড় হয়েছে। কিছু যদি করে বসে ছেলেটা! তখন!

না, পারল না, আনাতুরি। মমতায় উছলে গেল তার মন। দু' হাত বাড়িয়ে সে ছেলেকে আদরে জড়িয়ে ধরল। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "ওরে, আমি এ কী করলুম! আমার কেন এমন রাগ হল! আমি কেন তোকে মারলুম! তুই ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই!"

কোহেন সাড়া দিল না। ঠেলে দিল মাকে। মায়ের দুটি হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিল।

কোহেনের যে-গালটির ওপর মা'র হাত আঘাত করেছিল, আনাতুরি সেই গালের ওপর নিজের হাত রাখল। বোলাতে-বোলাতে আক্ষেপ করতে লাগল, "ওরে কোহেন, যাক, এ-হাত আমার পুড়ে যাক। নয়তো ভেঙে তুই খানখান করে দে! ধিক, ধিক! আমি কেন আমার ছেলের গায়ে হাত তুললুম! আমি মা নই, আমি ডাইনি।"

"মা!" কোহেন শান্ত গলায় ডাক দিল। তারপর বলল, "তুমি মেরেছ, ভালই করেছ। এমনই করে মার খেতে-খেতে আমিও একদিন অন্যকে মারতে শিখব। তুমি আমায় এতদিন কেন মারোনি! কেন তুমি আমায় মারতে-মারতে পাহাড়ের পাথরের মতো শক্ত করোনি। আমার বাবাও কি তোমার মতো এইরকম দুর্বল ছিল?"

আনাতুরি ছেলের মুখে এই কথা শোনার জন্য তৈরি ছিল না। সে আর্ত স্বরে চিৎকার করে উঠল। আকাশের দিকে মুখ তুলে সে ডাক দিল কোহেনের মৃত বাবাকে, "স্তান-ন-ন-ন, আমায় তুমি শক্তি দাও।"

আকাশের ওপার থেকে তখন কি আর সাড়া পাওয়া যায় স্তানের!

॥ ১০ ॥

মনে হয়, আনাতুরির সেদিন সকাল হয়েছিল একটু তাড়াতাড়িই। স্তেপের সেই রাতের শিরশিরে ঠাণ্ডা যেন তার গা ছুঁতে পারছিল না। একটুও। একটা অসহ্য যন্ত্রণা। সারা দেহ তোলপাড় করছে। ঘুম আসছে, তবু চোখ বুজছে না। যখনই তন্দ্রা এসেছে, তখনই চমকে উঠেছে। তখনই হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত ছেলেটাকে ছুঁয়ে ধরেছে।

তারপর একবার যে কী হল, ঘুমিয়ে পড়ল আনাতুরি। অঘোরে। কখন যে তার হাত ঘুমের আবেশে ছেলের হাত থেকে ঢলে পড়েছিল, খেয়াল করতে পারেনি আনাতুরি। যখন খেয়াল করল, তখন ভোরের আকাশে আলো নামছে। একটু-একটু। সেই আলোয় বরফের ওড়না গায়ে দিয়ে বাতাস ছুটে বেড়াচ্ছে। ঠাণ্ডার আমেজে নিস্তব্ধ দিশ্বিদিক।

হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠেছে আনাতুরি। ঢলে-পড়া হাতটি

বাড়িয়ে সে ধরতে গেছে কোহেনকে। কিন্তু কাকে ধরবে! কোহেন তো নেই!

নেই! সে কী! ঘুম ছুটে গেল নিমেষে। উঠে পড়ল চমকে! হায়! এ কী হল! ছেলেটা কই! চাপা স্বরে ডাক দিল, "কোহেন!" তার গলায় উত্তেজনা। কিন্তু সাড়া পেল না। ভেড়ার লোমের নরম লেপটা আনাতুরি উলটে ফেলে দিল। না, লেপের মধ্যেও কোহেন নেই। সে এবার চেঁচিয়ে ডাকল, "কোহেন!" কে সাড়া দেবে! আতঙ্কে ছটফট করে উঠল আনাতুরি। কোথা গেল ছেলেটা? আনাতুরি গাড়ি-ঘরের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। গলা ফাটিয়ে ডাক দিল, "কোহেন!"

কুয়াশায় ঢেকে আছে স্তেপ। দু' হাত দূরের মানুষকেও নজর করা যায় না। এমনই জমাট সেই কুয়াশা। সেই কুয়াশা ভেদ করে আনাতুরি ছুটে যায়। কুয়াশার আড়ালে-আড়ালে সে খুঁজে বেড়ায় কোহেনকে। পাগলের মতো। ডাক দেয়, "কোহেন, ওরে কোহেন, বাপ আমার, আমি তোর মা! আয় বাবা, ফিরে আয়!"

কুয়াশা কাটছে। কুয়াশার জাল ছিঁড়ে সূর্য উঠছে। একটু-একটু করে। আকাশটারও মুখের ঢাকা সরে যাচ্ছে। শুকনো আর সবুজ ঘাসের মাথাভর্তি রাশিরাশি শিশিরবিন্দু। ঝিলমিল করছে। সেই শিশিরবিন্দুতে ভিজে যায় আনাতুরির পা। কিন্তু দেখা পায় না সে কোহেনের। সাড়াও নেই তার।

এখন শুধু একা আনাতুরি। খুঁজে বেড়াচ্ছে ছেলেকে। ডাক দিচ্ছে। এখনও কারও ঘুম ভাঙেনি। এখনও হয়তো কারও কানে পৌঁছয়নি আনাতুরির কণ্ঠস্বর। শিবিরের পরদা ঠেলে কেউ উঁকি মেরে দেখেওনি তাকে। তারা জানেও না, আনাতুরি নামে এক মায়ের দেখা সব স্বপ্ন তার ছেলে মিথ্যে করে দিয়েছে। দিয়ে, হারিয়ে গেছে। আনাতুরিই বুঝি সে-ই মা, একা, এই স্তেপে, যে ডাক দিয়ে বলে যায়, "ওরে কোহেন, বাপ আমার, তুই পৃথিবীতে জন্মেছিস, মানুষকে খুন করার জন্য নয়। ভালবাসার জন্য।"

আনাতুরি ডেকে-ডেকে সারা হল। তবু খুঁজে পেল না কোহেনকে। পাবেই বা কেমন করে! কোহেন যে তখন রাজার শিবিরে।

সকাল। কুয়াশা কেটে গেছে। সূর্য উঠেছে। রাজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কোহেন! রাজা জিজ্ঞেস করল, "কী চাস তুই?"

"আমার নাম কোহেন।"

"আমি জানি।"

"আমার মায়ের বিরুদ্ধে আমি নালিশ করতে এসেছি।"

"মায়ের বিরুদ্ধে নালিশ!" অবাক হল রাজা।

"হ্যাঁ", দৃঢ় গলায় উত্তর দিল কোহেন।

"যে-মা'র কোলে তুই জন্মেছিস, যে-মা তোকে কোলেপিঠে করে বড় করেছে, যে-মা হাজারটা ঝড়ঝাপটা সামাল দিয়ে তোকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে তোর নালিশ! এ-কথা বলতে তোর জিভ কাঁপছে না?"

রাজার কথা শুনে থতমত খেয়ে গেল কোহেন। পলকে নিজেকে সামলে নিলে। তারপর আবার বলল, "রাজামশাই, আমাদের দলের যা নিয়ম-রীতি, তার বিরোধী যদি কেউ হয়, তার বিরুদ্ধে যেতে আমি ভয় পাই না! নিজের মা হলেও না।"

"এ-কথা এমন অনায়াসে কী করে বলতে পারছিস তুই?"

"আমি তো কিছু অন্যায় বলছি না। আমি এখন বড় হয়েছি। সবাই যা পারে, এখনও আমি তা পারব না কেন? একজন শত্রুকে এখনও পর্যন্ত আমি খতম করতে পারিনি। এ আমার কম লজ্জা নয়। মা আমায় বাধা দেয়। মা আমায় আগলে রাখে। কেন? কেন?" রাগে মুখখানা ঝলসে উঠল কোহেনের।

"তুই কি জানিস, তোর মা তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রেখেছে ? তুই কি জানিস তোর বাবাকে কেমন করে হত্যা করা হয়েছে ?" রাজা কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল।

"সেটা আমার জানার কথা নয়", উত্তর দিল কোহেন। "সেটা আমি জানতেও চাই না। এখন আর মায়ের হাত ধরে আমায় পা-পা হাঁটতে হয় না। আমি নিজেই চলতে পারি। আমাদের এই দলের সবাই এখন যেমন করে চলে, আমিও এখন তেমনই করে চলতে চাই। আমি বীর হতে চাই। আমি একা-একা ঘোড়া ছোটাব। আমি ঘোড়ার পিঠে বসে তীর ছুড়ব। শত্রুকে মারব। শত্রুর রক্ত গায়ে মেখে আমি উল্লাস করব। মায়ের বারণ আমি মানব না। আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।"

রাজা জিজ্ঞেস করল, "তোর তো কিছুই নেই। দাঁড়াবি কেমন করে ?"

"মা আমায় কিছু না দিলে, আমিই বা পাব কেমন করে ?" উত্তর দিল কোহেন।

"কোনওদিন জেনেছিস, মা কেন দেয় না ?"

"সেটা জানার আমার দরকার কী ! আমি যা চাইব তাই-ই তোমায় দিতে হবে। নইলে তুমি মা কিসের !"

"চুপ কর, অবাধ্য ছেলে !" রাজা আর সহ্য করতে পারল না কোহেনের এই উদ্ধত কথাবার্তা। রাজা ধমক দিল কোহেনকে, "মাকে এত তাচ্ছিল্য তোর ? কে তোকে এ-সাহস জোগাল ?"

রাজার ধমক খেয়ে থমকে গেল কোহেন ! রাজার চোখের দিকে তাকিয়ে সে আর কথা বলতে সাহস করল না।

"শোন তবে তুই", কোহেনের বুকের জামাটা খামচে ধরে রাজা বলল, "তুই আমাদের দলের কেউ না। তোর মাও নয়। তোরা আসগুজাই। আসগুজাইয়ের রাজা বুমবুজাং তোর বাপকে মেরে, তোকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তোকে বাঁচিয়েছিল তোর মা-ই। ঠিক সেই সময় আমরা আক্রমণ করেছিলুম তোদের দলকে। তোর মা বন্দি হয়েছিল আমার সেনার হাতে। সঙ্গে তুইও। হয়তো আমার সেনার হাতে মরতিস তুই। তোর মা-ও। কিন্তু আমি দেখতে পেয়ে তোদের প্রাণরক্ষা করি। সেই থেকে তোরা আমার কাছে আছিস। কোলের শিশু থেকে তুই এখানেই এত বড় হয়েছিস। আসগুজাইয়ের রাজা যেদিন তোর বাবাকে তোর মায়ের সামনেই হত্যা করেছে, সেইদিন থেকেই তোর মা প্রতিজ্ঞা করেছে, তোকে খুনি হতে দেবে না। তোকে মানুষকে ভালবাসতে শেখাবে।"

"তুমি নিজেই তো খুনি।" হঠাৎ রাজার মুখের ওপর জবাব দিল কোহেন।

"আমি রাজা।" রাজার উত্তর।

"তোমার সব প্রজারাও তো খুনি।" যেন রাজাকে অবজ্ঞা করে বলে উঠল কোহেন।

"আমরা যোদ্ধা।" দৃঢ় গলায় অগ্রাহ্য করল রাজা।

"আমিও যদি যোদ্ধা হই, তাতে তোমার আপত্তি কেন ?" কোহেনের গলাও দৃঢ় হল।

রাজা উত্তর দিল, "তুই আমার কাছে আসার আগে পর্যন্ত আমার আপত্তি ছিল না। আমি তোকে যোদ্ধা করতে চাই, এ-ইচ্ছা আমি তোর মাকেও জানিয়েছিলুম। কিন্তু এখন আমি তোকে যোদ্ধা করতে নারাজ।"

"কেন ?"

"যে-ছেলে নিজের মায়ের নামে অন্যের কাছে নালিশ করতে আসে, সে যোদ্ধা হওয়ার যোগ্য নয়। সে শয়তান।" রাজা যেন গর্জে উঠল।

"আর যে-মা ছেলের গায়ে হাত তোলে, তাকে বোধ হয় মা বলতে তোমার আপত্তি নেই।" ঠেস দিয়ে উত্তর দিল কোহেন।

"চুপ কর হতচ্ছাড়া !" ধমকে উঠল সৌরামাতিরাজ। যে-ছেলে মায়ের কথা শোনে না, সে-ছেলেকে মা যদি শাসন না করে তবে, তাকেই আমার মা বলতে আপত্তি।"

এ-কথার আর কোনও উত্তর এল না কোহেনের মুখে। সে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার চোখে হঠাৎ একটা হিংস্র চাউনি ঝলক দিল। সে মুহূর্তের জন্য তাকাল রাজার মুখের দিকে। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল।

"তুই এবার আসতে পারিস।" তীক্ষ্ণস্বরে আদেশ করল রাজা।

"আমার একটা আর্জি আছে।" গম্ভীর গলায় বলল কোহেন।

"কিসের আর্জি ?" রাজা বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করল।

"আমার একটা ঘোড়া চাই।"

"কে দেবে ?" আরও বিরক্ত হল রাজা।

"আমি তোমার কাছেই চাইছি।" সাফ-সাফ উত্তর দিল কোহেন।

"রাজা কাউকে ঘোড়া দান করে না। যারা বীর, তারা শত্রুকে খতম করে ঘোড়া জয় করে।" রাজা কথা শেষ করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কোহেন আর দাঁড়াল না। সে রাজার কথার আর কোনও উত্তরও দিল না। একটা চাপা রাগে ছটফট করতে-করতে সে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল রাজার শিবির থেকে। কিন্তু সে ঘরেও ফিরল না। রাজার একটা কথা তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে তখনই, তার মনে : "যারা বীর, তারা শত্রুকে খতম করে ঘোড়া জয় করে, যারা বীর তারা..."।

হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে গেল কোহেনের। সে থমকে থামে। মনটা তার আনচান করে ওঠে। মনে ভাবে, কে তার শত্রু ! কোথায় তার শত্রু ! কোন শত্রুকে হত্যা করে সে ঘোড়া জয় করবে ! ভাবতে-ভাবতে জেরবার হয়ে যায় কোহেন। তবু ভেবে পায় না কিছু। একা-একা অস্থির পায়ে সে হাঁটে। কোথায় হেঁটে যায় সে, নিজেও জানে না। হাঁটতে-হাঁটতে মায়ের ওপর অভিমানে মুখখানা তার রাঙা হয়ে ওঠে। কখনও নিজের ওপরেই রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেয় ! হয়তো ভাবে, সে নিজেই বুঝি তার নিজের শত্রু। আর, সে যদি তার নিজের শত্রু না হয়, তবে কি শত্রু তার রাজা বুমবুজাং ! সেই বুমবুজাংই তো তার বাবাকে হত্যা করেছে। সেই বুমবুজাংই তো কোহেনকেও হত্যা করতে হাত তুলেছিল ! মা তাকে রক্ষা করেছে। ঠিক-ঠিক। তবে বুমবুজাংকেই সে দেখে নেবে। বুমবুজাংয়ের ঘোড়াটাই সে জয় করবে। সেই জয়ই হবে সাচ্চা বীরের জয়।

না, বুমবুজাংকে শত্রু বলতে মন সায় দিল না কোহেনের। মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন তার সব তালগোল পাকিয়ে গেল। বুমবুজাং তো আসগুজাই দলের রাজা। কোহেনও তো আসগুজাই দলেরই ছেলে। আসগুজাই তো তার নিজের দল। আসগুজাইয়ের রাজাই তো নিজের রাজা। এই দলে তার বাবা জন্মেছে। মা জন্মেছে। কোহেনেরও জন্ম। না, না, রাজা বুমবুজাং কখনওই শত্রু হতে পারে না। শত্রু সে-ই, যে আসগুজাই রাজাকে আক্রমণ করে। আসগুজাই রাজাকে আক্রমণ করা মানে, সে তো কোহেনকেই আক্রমণ করা। তার নিজের দলের রাজাকেই শেষ করে ফেলার চক্রান্ত। এ-চক্রান্ত সে মেনে নিতে পারে না। যে-রাজা বুমবুজাংয়ের শত্রু, সে কোহেনেরও শত্রু। যে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সেই শত্রুর আশ্রয়ে পালিয়ে যায়, সে বিশ্বাসঘাতক।

তবে ? তবে কি কোহেনের মা বিশ্বাসঘাতক ? ভাবতে-ভাবতে শিউরে ওঠে কোহেন। তার মা-ই তো পালিয়ে এসে শত্রুর আশ্রয়ে লুকিয়ে আছে। তবে, কোহেনের মা-ই বুঝি সবচেয়ে বড় শত্রু তার ! তবে কি সে তার মাকে হত্যা করবে ?

॥ ১১ ॥

ভাবনার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে যায় কোহেন। সারাদিন সে

মায়ের কাছে গেল না, একটিবারের জন্যও। সে লুকিয়ে-লুকিয়ে ঘুরে বেড়াল। তার মা যে দিনভর আকুল হয়ে কেঁদেছে, জানতে পারল না সে-কথাও। সে-কথা জানার এখন দরকারই বা কী! ঘোড়া না হোক, এখন তার দরকার একটা তীর-ধনুক। শত্রুকে খতম করতে গেলে এইটাই চাই। খালি হাতে তো আর কাজ হয় না। কী আশ্চর্য, একটা তীর-ধনুক পর্যন্ত তাকে দেয়নি, তার মা! অথচ পাঁচজনের দেখতে-দেখতে কোহেন ভাবে তীর ছোড়া এমন কী আর শক্ত! এক্ষুনি একটা পেলে সে দেখিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কে দেবে? আর চাইবেই বা কার কাছে। অগত্যা সে এইখানে বসে পড়ল। অনেকক্ষণ ঘুরপাক খেয়েছে। এখন একটু জিরিয়ে না নিলে পা আর চলে না।

কিন্তু একটু বসেই মন চাইল তার শুয়ে পড়তে। খোলা আকাশ। এখন বাতাস শান্ত। ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার চোখেও ঘুম ছুঁই-ছুঁই করছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই। ঘুম আসতেই পারে। সারাদিনে পরিশ্রমটা তো কম হয়নি। তবুও সে কিছুতেই চোখের পাতা এক হতে দেবে না। যতবারই ঘুমের আবেশে চোখ বুজে আসতে চায়, ততবারই সে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে।

হঠাৎ যেন একটা ঘোড়দৌড়ের শব্দ তার কানে এল। কে আসে ঘোড়ার পিঠে! এদিকে! তাকাল কোহেন। দেখতে পেল, স্তেপের ঘাস ডিঙিয়ে একজন সেনা আসছে, ঘোড়া ছুটিয়ে। ওই দূরে তাকে দেখা যাচ্ছে। পাশেই শুকনো ঘাসের লম্বা ঝোপ। লুকিয়ে পড়বে কি না, ভাবল কোহেন। না, কেন সে লুকোবে! আসতে দাও সেনাটিকে। কোহেন উঠে দাঁড়াল। সেনাটি কাছে এলে সে বুঝতে পারল, সৌরামাতিরাজেরই সেনা এই লোকটি। সেনাটি সটান কোহেনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কে তুই?"

কোহেনের ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। উত্তর দিল, "আমার নাম কোহেন।"

"এখানে কী করছিস?"

"কিচ্ছু না।"

"মিথ্যে বলছিস?" সেনাটি বেশ কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল।

"যদি মিথ্যেও বলি, তুমি কে এমন যে, তার উত্তর তোমাকে দিতে হবে?" জবাব দিল কোহেন।

সেনাটি এবার চটল। বাজখাঁই গলায় তেড়ে বলে উঠল, "খুব চ্যাটাং-চ্যাটাং করে কথা বলতে শিখেছিস তো। দেখবি, আমি কে?" বলে, নিজের তীর-ধনুকটা তুলে দেখাল।

"তুমি আমায় মারবে নাকি?" ভেতরে-ভেতরে গুমরে উঠল কোহেন।

"বেশি বেগড়বাঁই করলে একদম শেষ করে ফেলব।" সেনাটি শাসাল।

"তাই নাকি!" তাচ্ছিল্যে ঠোঁট ওলটালো কোহেন। তারপর বলল, "হাতে অস্ত্র নিয়ে সবাই অমন জাঁক দেখাতে পারে। অস্ত্র ফেলে এসো! একা-একা লড়ে যাও! দ্যাখা যাক, কে জেতে, কে হারে!"

"ওরে ছেলে, তোর তো ভীষণ জিদ্দি!" বলতে-বলতে ধাঁই করে কোহেনের গলাটা খাবলে ধরল সৈনিক। তারপর গলায় একটা রাম-ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ক্ষমতা থাকে তো দ্যাখ এবার!"

সৈনিকের হাতের টিপুনিতে কোহেনের দম আটকে আসে আর-কি! বাধ্য হয়ে সেনার হাত থেকে নিজে বাঁচার জন্য ঝটপটানি লাগিয়ে দিলে।

কিন্তু সেনা ছাড়ে না। সে আরও জোরে চেপে ধরে। চেঁচায়, "একা লড়বি? খুব দেমাক! অ্যাঁ!"

আর ক্ষমতায় কুলোয় না কোহেনের। এবার সে দম ফেটে মরবেই। কিন্তু মরবার আগে সব মানুষই একবার আঁকপাক করে লাফিয়ে ওঠে। কোহেনও লাফাল। লাফিয়ে বেমক্কা এমন একখানি ধাক্কা মারল সেনাটিকে যে, এক ঘায়েই কাত! কোহেনের গলা ছেড়ে মাটিতে চিতপটাং। যেই না পড়ল, অমনই কোহেনও পা দিয়ে তার গলাটা মাড়িয়ে ধরল। গলাটা পিষতে-পিষতে কোহেন চেঁচাতে লাগল, "দ্যাখ, এবার কে কাকে শেষ করে!"

সত্যি-সত্যি শেষ হয়ে গেল সৈনিকটি। শেষ হল কোহেনের পায়ের চাপে। এই সৈনিকটিকে মারার সঙ্গে-সঙ্গে আনাতুরির ছেলে কোহেন চেঁচিয়ে উঠল উল্লাসে, "হ্যাঁ, আমি পেরেছি। আমি শত্রুকে খতম করেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শত্রুই তো! আমার রাজা বুমবুজাং। আমার শত্রু সৌরামাতির রাজা। আমার জন্ম আসগুজাই রাজার দলে। আমার আসগুজাই দলের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে-ই আমার শত্রু।" বলতে-বলতে কোহেন তার হাতে নিহত সেনার তীর-ধনুকটা হাতিয়ে নিল। মৃত সেনার ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল। তারপর বুক ফুলিয়ে হাসতে-হাসতে বলল, "সৌরামাতির রাজা, তুমি যেমন আমার শত্রু, তেমনই শত্রু তোমার সেনাও। দ্যাখো, তোমার সেনাকে মেরে আমি ঘোড়া জয় করেছি। আমি অস্ত্র কেড়ে নিয়েছি।" বলে, সে ঘোড়ার লাগাম ধরে টান দিল, "হ্যাট ঘোড়া, হ্যাট!" ঘোড়া অমনই ছুটতে শুরু করল।

ঘোড়া ছোটে। ঘোড়ার পিঠে কোহেনও দোলে। বীরের মতো। এখন সে ছুটে যায় মায়ের কাছে। মাকে গিয়ে বলবে, "মা, এতদিন তুমি তোমার ছেলেকে কোলের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলে। তুমি চেয়েছিলে তোমার আদরে আমি যেন গলে যাই। তোমার কোল না ছাড়ি। কিন্তু সে তোমার মিথ্যেই আশ। দ্যাখো, আজ থেকে আমি অন্য কোহেন! আজ থেকে আমি বীর। আমি শত্রুর শমন।"

ঘোড়া তাদের গাড়ি-ঘরের সামনে ছুটে এল। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে কোহেন হাঁক পাড়ল, "মা!"

মা সাড়া দিল না।

"মা, দ্যাখো, আমি কোহেন। দ্যাখো, আমি কী জয় করেছি।"

তবু মা'র সাড়া পেল না।

"মা, ওমা!" কোহেন ডাকতে-ডাকতে গাড়ি-ঘরের পরদা ঠেলল। মা নেই।

আরও ক'বার এমনই করে ডাকল কোহেন। সাড়া না পেয়ে কী ভাবল সে-ই জানে। তারপর আর সেখানে দাঁড়াল না। মুখ ফেরাল ঘোড়ার। আবার সে ছুট দিল। তবে কি সে মাকে খুঁজতে বেরোল!

না। তার ঘোড়া ছুটতে-ছুটতে এল সৌরামাতির রাজ-শিবিরের সামনে। এবারও সান্ত্রি তার পথ আটকাল। জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই?"

"রাজাকে।" পরোয়া না করে সে উত্তর দিল।

"ওকে আসতে দাও!"

সান্ত্রি চমকে উঠল। কেননা, আদেশ করল রাজা নিজে। শিবিরের ভেতর থেকে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে শিবিরের ভেতরে ঢুকে গেল কোহেন।

"আবার কী চাই?" রাজা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

"আর কিছু নয়," উত্তর দিল কোহেন, "আমার যা দরকার ছিল, আমি সব জয় করেছি।"

কোহেনের হাতে তীর-ধনুক। রাজার নজর পড়ল। জিজ্ঞেস করল, "কোত্থেকে পেলি?"

"শত্রুকে খতম করে।" হাসতে-হাসতে উত্তর দিল কোহেন।

"আর ঘোড়া?"

"জয় করেছি শত্রুকে মেরে।" বীরের মতো বুক ফুলিয়ে জবাব দিল কোহেন।

"কোথায় পেলি শত্রুর দেখা ?" একটু অবাক হল রাজা।

"কেন, শত্রু তো আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।" খুব সহজেই উত্তর দিল কোহেন।

"মানে !" স্তম্ভিত হল রাজা।

কোহেনের চোখের দৃষ্টি স্থির। সে-দৃষ্টি রাজার চোখের ওপর। তারপর বলল, "কেন, মানে তো খুবই সহজ। তুমি আমার শত্রু। তোমার সেনাকে হত্যা করে আমি জয় করেছি ঘোড়া আর তীর-ধনুক।"

রাজা যেন কেমন হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি তোর শত্রু ?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিতে দোনোমনো করল না কোহেন।

রাগে রাজার মুখ লাল হয়ে উঠল। গলা কাঁপল তার কথা বলতে। বলল, "ওরে অকৃতজ্ঞ ছেলে, আমাকে শত্রু বলতে তোর মুখে আটকাল না! আমি তোর, আর তোর মা'র জীবন বাঁচিয়েছি। তোদের আশ্রয় দিয়েছি। সেই আশ্রয়ে তুই বড় হয়েছিস।"

"কিন্তু তুমি আমার রাজাকে আক্রমণ করেছিলে।"

"কে তোর রাজা ?" ধমক দিল সৌরামাতিরাজ।

"বুমবুজাং।" ধমক গ্রাহ্য না করে উত্তর দিল কোহেন।

থতমত খেয়ে গেল সৌরামাতিরাজ, কোহেনের উত্তর শুনে। তারপর যেন একটা ভয়ঙ্কর দানবের মতো হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করে উঠল, "বেইমান, যে তোর জীবনরক্ষা করল, সে তোর শত্রু! যে তোর মাকে আশ্রয় দিল, তোদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে যে এগিয়ে এল, সে তোদের শত্রু! ওরে শয়তান, আমি না থাকলে কবেই তোরা শেষ হয়ে যেতিস। কেউ কোনওদিন জানতেও পারত না, কোহেন নামে একটা ছেলে ছিল এই পৃথিবীতে, আনাতুরি নামে একজন মা ছিল তার। তাদের দলের রাজা কবেই তাদের মেরে ফেলত। অথচ সেই রাজাই হল তোদের বন্ধু!"

সৌরামাতিরাজ ঠিক যতখানি চিৎকার করে কোহেনকে ভর্ৎসনা করল, ঠিক ততখানি গলা চড়িয়ে কোহেন উত্তর দিল, "আসগুজাইয়ের রক্ত আমার শরীরে বইছে। সারাজীবন আমার বাবা আসগুজাই রাজার সহচর ছিল। স্তেপের এই যাযাবর মানুষরা একজন আর-একজনকে হত্যা করে বেঁচে থাকে। এটা অন্যায় নয়। যে-অন্যায় করে, তাকে না মারাটাই এখানে অন্যায়। এখানে ছেলে বাপকে মারে। বাপ ছেলেকে। এখানে দাদা ভাইকে মারে। ভাই দাদাকে। সুতরাং আমার মা যদি কিছু অন্যায় করে থাকে, আর, আমার রাজা বুমবুজাং যদি তাকে হত্যা করতে অস্ত্র হাতে নেয়, তবে সেটাও অন্যায় নয়। বরং তাকে যে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসে অন্যায় তার। তুমি সেই অন্যায় কাজ করেছ। কাজেই সেই অন্যায় কাজের জন্য এখন যদি আমিই তোমাকে মারি, তবে সেটাই হবে ন্যায়ের কাজ।"

সৌরামাতির রাজা কোহেনের কথা শুনে রাগে কাঁপতে লাগল থরথর করে। জ্বলে গেল রাজা ভেতরে-ভেতরে। হঠাৎ চিৎকার করে হাঁক দিল, "এই, কে আছিস!"

চোখের পলকে কোহেন তীর-ধনুকটা হাতে নিল। তারপর রাজাকে চোখ রাঙাল, "আস্ফালন দেখিয়ো না রাজা! আজ হয় তুমি থাকবে, না-হয় আমি। শুধু একটা কথা শুনে রাখো, তুমিও আমার কেউ নও, আমিও তোমার বন্ধু নই। আমরা দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি দুই শত্রু। এক শত্রুকে খতম করাই তো অন্য শত্রুর দস্তুর।"

সৌরামাতিরাজ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, "আমার হাতে এখন কোনও অস্ত্র নেই। নিরস্ত্র মানুষকে একা পেয়ে যে বীরত্ব দেখায়, তাকে আমি ঘৃণা করি।"

কোহেনও থোড়াই তোয়াক্কা করল রাজাকে। সে উত্তর দিল,

"যে-রাজা আমাদের মতো শত্রুকে হত্যা না করে তাদের আশ্রয় দেয়, সে-রাজাকেও আমি রাজা বলি না। তাকেও আমি ঘৃণা করি।"

"কোহেন !" হঠাৎ কে ডাকল।

চমকে ওঠে কোহেন। এ যেন তার চেনা স্বর। ধনুকে তীর জুড়ে চকিতে সে ফিরে তাকাল। এ যে তার মা ! শিবিরের পরদা ঠেলে সে ভেতরে আসছে !

কোহেন মাকে দেখে চিৎকার করে উঠল, "তুমি কেন এখানে এসেছ ?"

"আজ সারাদিন কোথায় ছিলি কোহেন ? আজ সারাদিন ধরে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সারাদিন তোকে দেখিনি। এখন খুঁজতে-খুঁজতে এখানে চলে এসেছি।" ভারী বিমর্ষ গলায় উত্তর দিল আনাতুরি।

কোহেন মায়ের কথা শুনল না। মাকে সাবধান করল, "তুমি চলে যাও এখান থেকে। আমার হাতে অস্ত্র।"

এতক্ষণ খেয়াল করেনি আনাতুরি। চকিতে তার নজর গেল কোহেনের হাতের দিকে। চমকে উঠল আনাতুরি। তারপর অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুই আমায় মারবি ?"

"না।" ঝাঁঝিয়ে উঠল কোহেন, "আমি আমার শত্রুকে মারব। যে আমাকে বাধা দেবে, তারও নিস্তার নেই।"

"কে তোর শত্রু ?" হঠাৎ যেন আনাতুরির গলার স্বর অস্থির হয়ে ওঠে।

"ওই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সৌরামাতিরাজ।"

"কোহেন !" গর্জে উঠল আনাতুরি, "যে-লোকটা তোকে প্রাণে বাঁচাল, তাকে শত্রু বলতে তোর মুখে আটকাল না ! ছিঃ ! সৌরামাতিরাজ আমাদের বন্ধু।"

"এ কেমন বন্ধু ? এই সৌরামাতিরাজই না আমাদের দলের রাজা বুমবুজাংকে আক্রমণ করেছিল ?" জিজ্ঞেস করল কোহেন।

"এই সৌরামাতিরাজই হিংস্র বুমবুজাংয়ের হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আমাদের দয়া করেছে।" উত্তর দিল আনাতুরি।

"ছিঃ ! শত্রুর দয়া ভিক্ষা নিয়ে আমরা বেঁচে আছি ! ওগো মা, আমাদের নিজের রাজা বুমবুজাংকে সাহায্য করতে যদি সেদিন আমরা নিজেদের প্রাণ দিতুম, তবে সে-ই হত আমাদের বীরের মৃত্যু।"

"ওরে নির্বোধ ছেলে, প্রাণ দিলেই কি বীরত্ব দেখানো যায় ? না কি প্রাণ নিলে দেখানো যায় ক্ষমতা ? শোন রে কোহেন, তোর হাতের ওই তীর-ধনুকের চেয়ে ভালবাসার ক্ষমতা অনেক, অ-নে-ক বেশি।"

"হা-হা-হা !" মায়ের কথা শুনে তাচ্ছিল্যের সুরে হেসে উঠল কোহেন। তারপর তীরের তেকোনা ফলাটা রাজার দিকে তাক করে বলল, "এবার তুমি দ্যাখো মা, বীর কাকে বলে !"

"কোহেন !" উৎকণ্ঠায় চিৎকার করে উঠল আনাতুরি। তারপর চোখের পলকে দাঁড়িয়ে পড়ল কোহেনের সামনে, রাজাকে আড়াল করে।

কোহেন উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল, "মা, তুমি সরে যাও !"

রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল আনাতুরি। কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "আগে তুই আমাকে মার। তারপর রাজাকে মারবি। আমি বেঁচে থাকতে সৌরামাতিরাজের গায়ে কে হাত দেয় দেখি !"

"সরো !" মায়ের গায়ে ঝাপটা দিল কোহেন।

ছিটকে গেল মা। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে ডাক দিল, "সান্ত্রি-ই-ই-ই !"

সান্ত্রি ছুটে এল।

কিন্তু সান্ত্রি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তীর ছুড়ে দিল কোহেন। একেবারে সান্ত্রির বুকে।

আর-একজন সান্ত্রি ছুটে আসার আগেই কোহেনের তীর ছুটল। এবার সান্ত্রির বুকে নয়। তীর আঘাত করল রাজার বুকে।

আনাতুরি আঁতকে উঠল। সে পারল না রাজাকে রক্ষা করতে। পারল না তার ছেলেকেও বাধা দিতে।

কোহেন চোখের পলক ফেলতে দিল না। একটা দমকা হাওয়ার মতো নিমেষে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল কোহেন। ছুট্টে বেরিয়ে এল রাজার শিবির থেকে। একটা হিংস্র বাঘের মতো সে লাফ দিল। উঠে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। তারপর ঘোড়া ছোটাল। স্তেপের ঘাসের ফাঁকে ঘোড়া ছোটে আর লাফ মারে। এক-একটা লাফ, এক-একটা ঢেউ যেন। উদ্দাম সমুদ্রের বুক থেকে ছিটকে পড়ছে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। খবর ছড়াল, কোহেন রাজার বুকে তীর মেরেছে। পালিয়েছে। রাজার মৃত্যু এখনও হয়নি। রাজা জ্ঞান হারিয়েছে !

রাজার সেনারা ঘোড়া ছোটাল। কোহেনের পিছু নিল। কোহেন ততক্ষণে উধাও ! সেনাদের নিশানার অনেক দূরে। আর তাকে ধরে কার সাধ্যি ! কিন্তু ধরা পড়ল কোহেনের মা। সৌরামাতির ক্ষিপ্ত মানুষ মারতে উঠল কোহেনের মাকে। তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, "এমন ছেলের মা, মানুষ নয়, ডাইনি। ওকে মারো ! মারো !"

কোহেনের মাকে অবশ্য তখনই মারা হল না। রাজাকে তখন বাঁচাতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। রাজবদ্যিরা ছুটে এল। রাজশিবিরের চতুর্দিকে শ'য়ে-শ'য়ে মানুষ জমায়েত হয়ে চিৎকার করছে, "ডাইনি ! ডাইনি ! ওকে বার করে দাও ! ওর চামড়া ছিঁড়ে আমরা গায়ে জড়াব। ওর দেহটা পায়ে দলে মাটিতে পিষে ফেলব !"

অবশ্য আনাতুরিকে রাজসেনারা সেই উন্মত্ত মানুষের হাতে তুলে দিল না। বন্দি করে রাখল সৌরামাতিরাজার শিবিরেই। রাজা যদি ভাল হয়ে ওঠে, তবে রাজাই করবে তার বিচার। আর যতদিন রাজা ভাল না হয়, ততদিন আনাতুরি থাকবে বন্দি।

বন্দি হল আনাতুরি। তার মুখ দেখে কে বলবে, মরণের ভয়ে সে ধুঁকছে ! কে বলবে তাকে ডাইনি ! কে বলবে, সে সৌরামাতিরাজার শত্রু !

॥ ১২ ॥

সৌরামাতিরাজকে আঘাত করে কোহেনের ঘোড়া ছুটেছিল ঝড়ের বেগে। সে জানত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে লুকিয়ে পড়তে হবে। এই স্তেপ টপকে লুকিয়ে পড়ার একটাই জায়গা। ওক-পাইনের গভীর বন। কিন্তু সে-বনও তো এখনও অনেক দূরে। সেই বনে পৌঁছতে তাকে অনেকটা পথ ভাঙতে হবে। পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পেরিয়ে নদীর তীর ধরতে হবে। সে তখনও শুনতে পাচ্ছিল, সৌরামাতি সৈন্যদের ধেয়ে আসার চিৎকার। অস্পষ্ট। শুনতে পাচ্ছিল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। পথঘাট কিছুই জানা নেই কোহেনের। তবু শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য কখনও সে আড়াল পেলে লুকিয়ে পড়ে। নিঃসাড়ে। কখনও দাঁড়িয়ে পড়ে। অবশ্য অনেক দূরে একটা পাহাড়ের চুড়ো সে অনেকক্ষণ থেকেই দেখতে পাচ্ছিল। সেইদিকেই তার লক্ষ্য। ওই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে, হয়তো সে ফাঁকি দিতে পারবে সৌরামাতির সৈন্যদের। হয়তো সে বেঁচে যাবে।

হ্যাঁ, বাঁচাল তাকে ওই পাহাড়টাই। ওই পাহাড়ের অন্ধকারে একটা সুড়ঙ্গপথের সন্ধান পেয়ে গেল কোহেন। ওই সুড়ঙ্গের মধ্যেই সে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু মুশকিলে ফেলল ওই ঘোড়াটা। অসম্ভব ছটফট করছে। নাকে শব্দ করছে। পা ঠুকছে। নিস্তব্ধ সুড়ঙ্গ চমকে-চমকে উঠছে। চমকে উঠছে কোহেনেরও বুকটা। ঘোড়াটাকে সে ব্যস্ত হয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে-চেষ্টা বৃথা। ঘোড়া তো আর মানুষ নয় যে, কথা শুনবে ! অগত্যা মাঝে-মাঝেই উঁকি মারছিল কোহেন। দেখছিল, সুড়ঙ্গের অন্ধকার

থেকে বাইরেটা। অবশ্য ঘোড়ার পিঠে শত্রু ছুটে এলে শব্দ কানে আসবেই। পাহাড়ের পাথরের ওপর দিয়ে তো আর ঘোড়া নিঃশব্দে হাঁটতে পারবে না। চাই কি, তার চোখকেও ফাঁকি দিতে পারবে না। তাই কোহেনের চোখের দৃষ্টি সজাগ। কান খাড়া!

অনেকক্ষণ এমনই সতর্ক হয়েই দাঁড়িয়ে রইল কোহেন, সেই সুড়ঙ্গে। অথচ এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়াও সে পেল না। কারও দেখাও না। সৌরামাতি-সেনার নাগাল থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিল কোহেন। দূরে-দূরেই তার ঘোড়া ছুটছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টি ছিল কোহেনের ওপর স্থির। সুতরাং এতক্ষণে তো কোহেনের ধরা পড়ে যাওয়ার কথা! তবে কি ঘোড়সওয়ার সেনাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পেরেছে কোহেন! তবে কি সেনারা অন্য পথে ঘুরপাক খাচ্ছে! হবে হয়তো!

তবুও চট করে বেরোল না কোহেন সুড়ঙ্গ থেকে। আরও কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে। তারপর সত্যিই যখন কারও সাড়া পাওয়া গেল না, তখন সে সুড়ঙ্গে পথের সন্ধান করতে লাগল। অন্ধকার থেকে সে আলো খুঁজতে লাগল।

হ্যাঁ, সে আলো দেখতে পেল। সুড়ঙ্গের অন্ধকার পার হয়ে সে পথের হদিস পেল। কিন্তু সে বুঝতে পারল না, কোন অজানা জায়গায় সে এসে পড়েছে। এদিকেও পাহাড়ের খাড়া পাথর। এদিকেও নির্জনে শোনা যাচ্ছে বাতাসের শব্দ, গাছের পাতায়। কোথাও-কোথাও মানুষের পায়ে চলার স্পষ্ট চিহ্ন। এইখানেই সে এবার একটু বিশ্রাম নেবে। পাহাড়তলির এদিক-ওদিক সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে। ঘোড়াটার খাওয়া নেই অনেকক্ষণ। এবার তাকে একটু ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। ঘোড়াটা ছাড়া পেয়ে ছুটল ঘাস চিবোতে। ঘোড়া হাঁটছে, আর মুখে ঘাস ছিঁড়ছে। অবশ্য কোহেনেরও পেটে অনেকক্ষণ কিছু পড়েনি। নাই পড়ুক। সে খিদে সহ্য করতে পারবে। কিন্তু খিদে পেলে ঘোড়া শুনবে কেন! সুতরাং ঘোড়া ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঘাস খাক। কোহেন বসে-বসে তাই দেখুক।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া হল কোহেনের। মনে হয়, ঘোড়াটারও পেট ভরে গেছে। এদিকে আকাশের রোদও পড়তির মুখে। না, আর নয়। কোহেন আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ল। আবার চলল। এবার যে কোথায় চলল, কোহেন নিজেও জানে না। এখনও কি তার মা'র কথা মনে পড়ছে না! এখনও কি তার মন বলছে না, মা ছাড়া তার আর কেউ নেই! আর মায়েরও নেই কোহেন ছাড়া আপন কেউ! না, এখন ওসব ভেবে সময় নষ্ট করতে চায় না কোহেন। কোহেনের শত্রু সৌরামাতিরাজা। তাকে সে তীর মেরে পালিয়ে এসেছে। এখন তার ভাবনা, সেই তীর রাজার বুকটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে কি না! মরেছে কি না তার তীরের আঘাতে সেই রাজা! যদি মরে থাকে, তবে আনন্দের শেষ নেই তার। কেননা, সে মেরেছে এমন এক রাজাকে, যে তার শত্রু। রাজাকে মারতে পারে ক'জনে! এ-কথা যদি রাজা বুমবুজাংয়ের কানে পৌঁছয়, তবে কোহেনের জীবন সার্থক। কাজেই এ-খবরটা যত শিগগির সম্ভব রাজা বুমবুজাংয়ের কানে পৌঁছে দিতে হবে। সুতরাং এখন আসগুজাই রাজা বুমবুজাংয়ের ঠিকানাটা কোহেনকে খুঁজে বার করতেই হয়। কিন্তু কেমন করে!

আচ্ছা, রাজা বুমবুজাং কি এখনও বেঁচে আছে? সে তো কবেকার কথা। কোহেন তখন তো নেহাতই দুধের শিশু। তার এই নাম কোহেন সে তো রাজা বুমবুজাংয়েরই রাখা। আবার রাজার ছেলে তিত্তাচিনি যখন যুদ্ধে হেরে গেল, তখন সেই রাজাই তো আবার কোহেনকে অলক্ষুনে বলল। তাকে মারতে গেল! হ্যাঁ, এসব কথা শুনেছে সে সৌরামাতিরাজের মুখে। রাজা যে সত্যি এ-কথা বলেছে, তারই বা কী প্রমাণ! শত্রু কখনও সত্যি বলে! কখনও না! কিন্তু মা?

না। কোহেন জানে না, পৃথিবীতে মা আর বাবার বড় কেউ নেই। তারা আছে বলেই পৃথিবীর বাতাসে আমরা শ্বাস নিতে পেরেছি। তারা আছে বলেই আমরা জানি পৃথিবী এত সুন্দর। একটি গাছ। অনেক রঙিন ফুল। অনেক পাখি। অনেক গান। সবই তো পৃথিবীর। কত সুন্দর! আর সেই সুন্দরকে আমরা সুন্দর বলতে পারি বলেই না, আমরাও এত সুন্দর!

এসব কথা বোঝে না কোহেন। শুধু কোহেন কেন, কোহেনের মতো স্তেপের অসংখ্য ঘোড়সওয়ার মানুষও বোঝে না। তারা জানে শুধু লড়াই করতে। শুধু মারো, কাটো আর বাঁচো! একে কি বাঁচা বলে!

ঘোড়া ছুটেছে কোহেনের। ঘোড়া যে তার কোথা যাচ্ছে, সে জানে না। কোহেনের সতর্ক দৃষ্টি। আঁতিপাঁতি এদিক-ওদিক ঘুরছে। চারদিকে ঘাস। কোথাও সবুজ। কোথাও শুকনো। ঘাসে-ঘাসে স্তেপের গন্ধ। কোনও সাড়া নেই। সাড়া শুধু তার ঘোড়ার খুরে, টগবগ টগবগ। সেই শব্দই ছড়িয়ে পড়ছে। হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে।

সাঁই-ই-ই! কী হল! আচমকা একটা তীর ছুটে এল কোনখান থেকে! কে কোহেনকে লক্ষ করে তীর ছুড়ল! কেউ কি কোহেনকে দেখতে পেয়েছে! কিন্তু কোহেন তো কাউকে দেখতে পাচ্ছে না!

কোহেন থতমত খেয়ে থমকে যায়! মুহূর্ত দাঁড়াল। ঝট করে একবার পেছনটা দেখে নিল। আবার ঘোড়া ছোটাল। যদিও সে কাউকে দেখতে পেল না, তবুও সে বুঝতে পারল বিপদ তার পিছু নিয়েছে। সুতরাং এবার ঘোড়ার গতি বাড়ল দ্বিগুণ।

সাঁই-ই-ই! এবার আবার ছুটে এল আর একটা তীর। এবারও কোন গোপন জায়গা থেকে তীর উড়ে এসে তার ঘোড়ার সামনে পড়ল, বুঝতেই পারল না কোহেন। কিন্তু আঁচ করতে পারল,

তীরের লক্ষ্য কোহেন নিজে। আর ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবার চেষ্টা করল না কোহেন। সে থামল। মনে-মনে ভাবল, শত্রু যদি সত্যিই তাকে নিশান করে থাকে, তবে মিথ্যে তার পালানোর চেষ্টা। সে একা। শত্রু তার একা নাও হতে পারে। যে একা অনেকজনের সঙ্গে লড়াই করতে যায়, সে আহম্মক। কাজেই, কোহেন দাঁড়িয়ে তার ধনুকে হাত পর্যন্ত ঠেকাল না। সে হাত তুলে দিল আকাশে।

মুহূর্তের মধ্যে অজানা সওয়ারির ঘোড়া ছুটে এল। তিন দিক থেকে। দশটা ঘোড়া। দশজন ঘোড়সওয়ার। দশজনই লুঠেরা। স্তেপের এই নির্জনে ওরা ওত পেতে বসে আছে। শিকার এলেই ধরবে। সব কেড়ে নেবে। একা কারও সাধ্যি নেই, ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালায়। কোহেনও পারল না।

দশ ঘোড়ার দশ সওয়ারি ঘিরে ধরল কোহেনকে।

"কী চাই তোমাদের?" খুব ধীর গলায় জিজ্ঞেস করল কোহেন।

"কী আছে তোর কাছে?" দলের সর্দার তেড়েমেড়ে জিজ্ঞেস করল।

"কিচ্ছু নেই।" উত্তর দিল কোহেন নির্ভয়ে।

দশ ঘোড়ার দশ সওয়ারি হো-হো-হো করে হেসে উঠল কোহেনের কথা শুনে। হাসতে-হাসতে সর্দারটা এগিয়ে এল কোহেনের কাছে। তারপর মেজাজ তিরিক্ষি করে বলল, "কিছু না থাকলেও ক্ষতি নেই। তুই তো আছিস। তোর মাথার খুলিটা তো আর ফেলনা নয়। তোর মাথাটা দেখে মনে হচ্ছে, একটা দামি পানপাত্র করা যাবে মাথার খুলিটা দিয়ে।"

কোহেন চুপ করে থাকল।

সর্দার কড়কে উঠল, "চুপ করে থাকলে কেমন করে চলবে! দেখা কী আছে তোর কাছে!"

কোহেন ঘোড়ার পিঠে বসে-বসেই আবার বলল, "তোমরা নিজেই তল্লাশি করে দেখতে পারো।" বলে আবার আকাশে হাত তুলল।

লুঠেরার সর্দার চেঁচাল, "এই, তোরা এর তীর-ধনুকটা কেড়ে নে!"

দশ সওয়ারির এক সওয়ারি কোহেনের কাছে এল। কোহেনের তীর-ধনুকটা কেড়ে নিল। কোহেনের মুখ দিয়ে একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত বেরোল না।

সর্দার আবার হুকুম জারি করল, "দ্যাখ, এর কাছে আর কী আছে!"

এবার দশ সওয়ারির তিন সওয়ারি কোহেনের পোশাক হাঁটকাতে লাগল।

আসলে, কোহেনের কাছ থেকে কিছুই তো পাওয়ার কথা নয়। কী অবস্থায় কোহেন এখানে পালিয়ে এসেছে, সে-কথাই বা কে না জানে! যাও-বা তীর-ধনুক ছিল, তাও গেল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মরা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। কোহেন এখন একা। একা অতজনের সঙ্গে যুঝতে পারা যায়! সে জানে, প্রথমেই ধড় থেকে তার মাথাটা কাটা হবে। তারপর ছিঁড়ে নেওয়া হবে তার দেহ থেকে ছাল-চামড়া। কাজ শেষ হলে তার দেহটা এইখানেই পড়ে থাকবে। লুঠেরার দল ছুটবে আর-একজনকে ধরতে। এমনই করে সারাদিনে কত মানুষ যে তাদের শিকার হবে, কেউ জানে না।

আশ্চর্য, এইসব ভয়ঙ্কর কথা ভাবতে কোহেনের বুক এখন আর একটুও কাঁপে না। খুন দেখে-দেখে এসব ভাবনা কিচ্ছু না তার কাছে। তার শুধু একটাই আপসোস, সৌরামাতির রাজাকে সে তীর ছুড়ে আঘাত করল, কিন্তু রাজাটা মরল কি না, সে দেখে আসতে পারল না। আর তার মারও যে কী হল, তাও জানতে পারল না।

হঠাৎ যেন দূরে একটা শোরগোল উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই
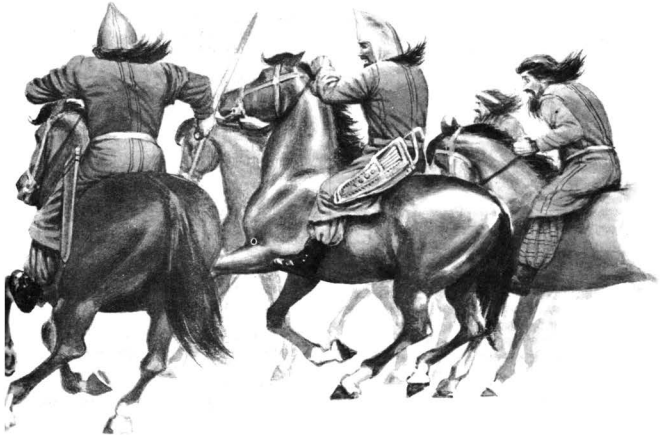
লুঠেরার দল অস্থির হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "সামাল ! সামাল !" চোখের পলকে তারা ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে বসল। বসেই কোহেনের হাতটা জাপটে ধরল দলের সর্দারটা। তারপর হাঁক দিল নিজের দলের লোকদের, "ঘোড়া ছোটাও-ও-ও !"

দশ সওয়ারির ঘোড়া ছুটল। সর্দারের হাতের টানে কোহেনও ছুটল মাটিতে। ঘোড়ার সঙ্গে টালমাটাল করতে-করতে। কিন্তু ঘোড়ার সঙ্গে কোহেন কখনও ছুটতে পারে। মাটিতে ঘষটাচ্ছে। পা কাটছে, ছড়ে যাচ্ছে। হাঁপাচ্ছে। দম বেরিয়ে যাচ্ছে। কোহেনের দফা শেষ হয়ে যায় !

এমন চটজলদি সব ব্যাপারটা ঘটে গেল ! ধাঁধা লেগে যাওয়ার গোত্তর ! কোত্থেকে যে হল্লা উঠল ! আর কেনই বা এই লোকগুলো পালায়, কিছুই বোঝা যায় না। তবে কি এদের পেছনেও আরও দুর্ধর্ষ একঝাঁক দস্যু ধাওয়া করেছে !

না, দস্যু নয়। ছুটে আসছে একদল ঘোড়সওয়ার সৈনিক। মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরেই ওই সৈনিকের দল এদের খোঁজ-তল্লাশি করছিল। নজরে পড়ে গেছে। তাই চিৎকার করে তাড়া লাগিয়েছে।

দু' দলেরই ঘোড়া ছুটছে। আকাশ ছেয়ে ধুলো উড়ছে। শব্দ উঠছে। ঘোড়া চেঁচাচ্ছে। এদিকে প্রাণ যাচ্ছে কোহেনের। সে নিজেকে সর্দারের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করছে ! কিন্তু যতই চেষ্টা করছে, ততই সর্দারের মুঠো শক্ত হচ্ছে। একদিন কোহেনের মা আনাতুরিও ঠিক এমনই বিপদে পড়েছিল। তবে, সেদিন তাকে যারা টেনে-হিঁচড়ে নাকাল করেছিল তারা লুঠেরা ছিল না। তারা ছিল সৌরামাতিরাজার সেনা ! তা হোক। কিন্তু বিপদের ধরন তো একই রকমের।

কিন্তু আর যেন পারছে না কোহেন। এখন সে নিজে ছুটছে না। নিজে ছোটার আর শক্তিই নেই তার। বলা যায়, সর্দার তাকে টানছে। কোহেন ঘষটাতে-ঘষটাতে লাট খাচ্ছে।

এদিকে সেনারা ধরে ফেলে প্রায় সেই দলটাকে। এই ধরা পড়ল বলে দলের সর্দারটা ! না, আর সে টানতে পারছে না কোহেনকে। যতই টানছে, ঘোড়াও তার কোহেনের ভারে ততই যেন দমসম হয়ে পড়ছে। ঘোড়ার ছুটতে কষ্ট হচ্ছে। সর্দার বুঝল ছেলেটাকে আর টানা যাবে না। তার ভারে ঘোড়ার বেগ কমছে। একে ছেড়ে না দিয়ে আর উপায় নেই। কাজেই কোহেনের মায়া ত্যাগ করল লুঠেরা-সর্দার। সর্দারের হাতের মুঠো খুলে গেল। কোহেন ছাড়া পেল। কিন্তু সে নিজে আর পালাতে পারল না। সে-শক্তি তার কোথায় তখন ! যেখানে কোহেন ছাড়া পেল, সেখানেই পড়ে রইল। যেন একটা আধমরা মানুষ। হাঁপাচ্ছে। হয়তো আর একটু পরেই দম ফেটে সে মরে যাবে।

দেখতে-দেখতে তেড়ে-আসা ঘোড়সওয়ার সেনারা হুড়মুড় করে এসে কোহেনকে ঘিরে ফেলল। কোহেন ধরা পড়ে গেল। অবশ্য কোহেনকে ধরতে তেমন কসরত করার দরকারই পড়ল না সেনাদের। যে প্রায় মরেই আছে, তাকে ধরার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলার কথাই ওঠে না।

না, মরল না কোহেন। যাদের হাতে ধরা পড়ল কোহেন, সেই সেনারাও তাকে আর আঘাত করল না। কোহেনের গায়ের জামাটা দেখে তারা থমকে গেল। তারা বুঝতে পারল, ছেলেটা সৌরামাতির লোক। সৌরামাতির লোক মানেই তো শত্রুপক্ষ। সুতরাং নিয়ে চলল তারা কোহেনকে তাদের নিজের দলের রাজার কাছে। রাজার শিবিরে। রাজা ? এ আবার কোন রাজা ?

॥ ১৩ ॥

যে-রাজার সামনে কোহেনকে হাজির করা হল, সে এক বুড়ো থুত্থুড়ে রাজা। রাজার বয়স হয়েছে যেমন, চুলও পেকেছে তেমন। বলিরেখা দেখা যাচ্ছে, চোখেমুখে। বেঁকেছে শিরদাঁড়া। আর ক'দিন পরে হয়তো কোমরটাও ভাঙবে। চোখের দৃষ্টিও কমেছে। কিন্তু তবু মনে হয়, অর দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা সন্দেহের চাউনি। সেই সন্দেহভরা দৃষ্টি মেলেই কুতকুত করে দেখছে কোহেনকে রাজা। দেখতে-দেখতে একটা ভীষণ ক্রূর গলায় রাজা কথা বলল, "কোথা ছিল এই জোয়ান ছেলেটা ?" কথা বলতেই বোঝা গেল রাজার গলা ভেঙেছে। কাঁপছে গলার স্বর।

"একদল ঠগ ছেলেটাকে ফেলে পালাল।" বোধ হয় সেই সৈনিকদলের নায়ক উত্তর দিল।

"ছেলেটাও কি ঠগের দলে ছিল ?" জিজ্ঞেস করল রাজা।

"সেটা বোঝা গেল না।" উত্তর দিল নায়ক।

"এর কাছ থেকে কিছু পাওয়া গেছে ?" আবার জিজ্ঞেস করল রাজা।

"আজ্ঞে না।"

"তবে এর মাথাটা কেটে ফেল !" আদেশ দিল রাজা।

রাজার আদেশ শোনার সঙ্গে-সঙ্গে কথা বলল কোহেন। তার গলার স্বর খুবই ক্ষীণ। সেই ক্ষীণ স্বরে সে বলল, "আমার মরতে ভয় নেই। তবে মরবার আগে আমি একটা কথা বলে যেতে চাই। বলে যেতে চাই, আমি ঠগ নই। আমি আমার এক শত্রুর খপ্পর থেকে পালাতে গিয়ে ওই ঠগের হাতে ধরা পড়ি।"

"কে তোর শত্রু ?" বুড়ো রাজা গলায় বেশ জোর দিয়েই জিজ্ঞেস করল কোহেনকে।

"সৌরামাতির রাজা।" উত্তর দিল কোহেন।

সৌরামাতিরাজার নাম শুনে যেন থতমত খেয়ে গেল এই থুত্থুড়ে রাজা। মুহূর্তের জন্য রাজা কথা হারাল। চমকে তাকাল কোহেনের মুখের দিকে। তারপর কেউ কিছু বুঝে ফেলার আগেই গলাখাঁকারি দিল। হুঁশিয়ার হয়ে গেল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "শত্রুর হাতে তুই ধরা পড়লি কেমন করে ?"

"আমি ধরা পড়িনি। আমার মা ধরা দিয়েছে।"

কোহেনের উত্তর শুনে আনচান করে উঠল রাজা। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর মা ধরা দিয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"তোর মা কোন দলে ছিল ?"

"আমার মা ছিল আসগুজাই দলে।"

ছমছম করে উঠল রাজার বুকের ভেতরটা। অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর মায়ের নাম ?"

"আনাতুরি।"

"তোর বাবার নাম ?"

"স্তান।"

"তাকে তুই দেখেছিস ?"

"দেখেছি। কিন্তু আমি তখন নেহাতই শিশু। মনে নেই।"

"তোর নাম ?"

"কোহেন।"

এক-একটা উত্তর শুনছে বুড়োরাজা। একটু-একটু করে তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছে। ভীষণ উত্তেজনায় ছটফট করতে-করতে রাজা জিজ্ঞেস করল, "তুই কোথায় পালাচ্ছিলি ?"

"আসগুজাইয়ের রাজা বুমবুজাংয়ের কাছে।"

"কেন ?"

"আসগুজাইয়ের রাজাই তো আমার রাজা। আমি তো আসগুজাই দলে জন্মেছি। আমি রাজা বুমবুজাংয়ের কাছে গিয়ে সাহায্য চাইব।"

"কিসের সাহায্য ?"

"আমি তাকে বলব, আমার মাকে আমি উদ্ধার করব। তুমি আমায় ফৌজ দাও !"

"পারবি ?"

"কেন পারব না ! আমি তো সৌরামাতিরাজার বুকে তীর মেরে পালিয়ে এসেছি ।"

"সে মরেছে ?" বুড়ো ভীষণ উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল ।

"তার বুকে তীর গেঁথেছে ।"

"তার রক্ত দেখেছিস ?"

"দাঁড়িয়ে দেখার সময় পাইনি ।"

"সে যদি মরে না থাকে ?"

"আবার মারব ।"

"শাবাশ !" আচমকাই বুড়োরাজা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ।

কোহেন নিজেও কেমন যেন হকচকিয়ে গেল । তারপর বুড়ো রাজা চিৎকার করে সেনাদের আদেশ করল, "না, একে মারতে হবে না । একে ছেড়ে দাও !"

রাজার সেনারা রাজার আদেশ শুনে থ হয়ে গেল ।

রাজার সেনারাও যেমন থ হল, তেমনই কোহেনও কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে নির্বাক হয়ে গেল । সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না রাজা তাকে মুক্তি দিয়েছে ।

রাজার সেনারা কোহেনকে যখন মুক্ত করে দিল, তখন রাজা কোহেনকে বলল, "ভাবিস না, আমি তোকে রেহাই দিলুম বরাবরের জন্য । এখনকার মতো তুই ছাড়া পেলি । এখন থেকে তুই আমার জিম্মায় থাকবি । তোর সাহসের কথা শুনেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি । সৌরামাতিরাজার বুকে যখন তীর মেরেছিস, তখন মনে হয় সে মরেছে । আর যদি মরে না-থাকে, তুই যদি তাকে মারতে পারিস আমি তোকে অনেক ইনাম দেব । আর, তার ওপর তুই যদি সৌরামাতিরাজার খপ্পর থেকে তোর মাকে উদ্ধার করে আনতে পারিস, তবে তোকে আমার সেনাপতি করে দেব । তোর এই কাজে যত সেনা লাগে, তুই পাবি । যত ঘোড়া লাগে, তা-ও তুই পাবি । অস্ত্রশস্ত্র সবই তুই পেয়ে যাবি ।"

এই বুড়োরাজার হঠাৎ এমন কোহেনের ওপর দরদ দেখলে কে না অবাক হবে ! না চাইতেই রাজা কোহেনকে গায়ে পড়ে কেন যে সাহায্য করতে চাইছে, তার হাটহদ্দ কিছুই উদ্ধার করতে পারল না সে । কোহেন আস্ত একটা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ।

রাজা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, ছেলেটা তাকে বিশ্বাস করছে না । তাই কোহেনকে আরও অবাক করে দিয়ে রাজা যখন তাকে বলল, "তোর ওই কোহেন নামটা আমারই দেওয়া," তখন কোহেন আরও ঘাবড়ে গেল । শুধু তাই নয়, রাজা যখন তার ঘাড়ের একটা আঘাত কোহেনকে দেখিয়ে বলল, "এই দ্যাখ, আমার ঘাড়ে এই যে আঘাতের চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছিস, এটা তোর মায়ের হাতের আঘাত, আর, তোর সামনে যে-রাজাকে তুই দেখতে পাচ্ছিস, সে-ই তোর আসগুজাই রাজা বুমবুজাং," তখন সত্যি-সত্যি কোহেন বোবা হয়ে গেল । রাজা আবার বলল, "তোর বাবা স্তান ছিল আমার বিশ্বস্ত সহচর । সে আমার আদেশ শোনেনি । তাই আমি—না, সেসব কথা আর শোনার দরকার নেই । এখন দরকার সৌরামাতি থেকে তোর মাকে উদ্ধার করে আনা । আর সৌরামাতির রাজা যদি না-মরে থাকে, তবে সেই কাজটা শেষ করে ফেলা । তুই সেই কাজ পারবি । আমার দৃঢ় বিশ্বাস । এগিয়ে চল ।"

রাজার কথা শুনে কোহেনের কেমন সব এলোমেলো হয়ে গেল । তবে কি একেই বলে বরাত ! এমন যে আচম্বিতে সে রাজা বুমবুজাংয়ের কাছে পৌঁছে যাবে, এ-কথা সে ভাবতেই পারেনি । সুতরাং আর ভাবনা কী ! এবার কোহেনের বীরত্ব দেখানোর পালা । এ বীরত্ব দেখাবে সে তার মাকে । দেখাবে, ভালবাসা নয়, অস্ত্রই মানুষের বড় শক্তি ।

॥ ১৪ ॥

রাজবদ্যিদের অনেকক্ষণ, অনেক চেষ্টায় সৌরামাতিরাজার জ্ঞান ফিরে এসেছিল । অসংখ্য মানুষের কানে খবরটা পৌঁছে গেল নিমেষের মধ্যে । উৎকণ্ঠায় অস্থির সেই মানুষগুলোর তখন সে কী আনন্দের হুল্লোড় । আকাশ কাঁপিয়ে তারা চিৎকার করে উঠল । কাঁচা বয়সের ছেলেরা উল্লাসে লাফাচ্ছে । ঝাঁপিয়ে পড়ছে আগুনের ভেতর । দাউদাউ করে জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে । কেউ-কেউ নিজেরাই নিজেদের রক্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে । প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে, অসংখ্য মানুষেরই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছে সমর্থ মানুষ । পিষে যাচ্ছে পায়ের চাপে । মরতে-মরতে তারা চেঁচাচ্ছে, "রাজা, তুমি দীর্ঘজীবী হও !"

রাজা দীর্ঘজীবী হবে কি না সে পরের কথা । কিন্তু আপাতত রাজা বেঁচে উঠেছে । কোহেনের ছোড়া তীর সৌরামাতিরাজের হৃৎপিণ্ডে আঘাত করতে পারেনি । রক্ত ঝরেছে । কিন্তু জীবনের তাতে ক্ষতি হয়নি । রক্ষা পেয়েছে রাজা । এখন রাজা কী আদেশ করবে ? রাজা কি এখন কোহেনের মা আনাতুরিকে হত্যা করার হুকুম দেবে ?

রাজা যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হল, ততদিনই আনাতুরি বন্দি হয়ে পড়ে রইল । রাজা যেদিন আনাতুরির বিচারের জন্য সভা ডাকল, সেইদিনই আনাতুরিকে রাজার সামনে হাজির করা হল ।

সৌরামাতিরাজকে দেখে বন্দি আনাতুরি স্থির । তার হাতে-পায়ে শেকল । সেই বন্দি শেকলেরও শব্দ কেউ শুনতে পেল না ।

রাজার দৃষ্টি পলকহীন ।

আনাতুরি আনত ।

রাজা গম্ভীর । জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী বলার আছে আনাতুরি ?"

আনাতুরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল । তারপর ধীর গলায় উত্তর দিল, "আমার আপসোস, আমার হাতের এত কাছে থেকেও পালিয়ে গেল ছেলেটা । আমি তাকে ধরতে পারিনি । এই একটি অপরাধেই আমার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত ।"

সৌরামাতিরাজ মুহূর্তের জন্য অবাক চোখে তাকাল আনাতুরির চোখের দিকে । বোধ হয় রাজা ভাবতে পারেনি, আনাতুরির মুখে এমন কঠিন কথা শুনতে পাবে । পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সে যদি তোমার হাতে ধরা পড়ত, তুমি কী করতে ?"

এবার দৃঢ় গলায় আনাতুরি উত্তর দিল, "রাজা, আমার ছেলের তীরের আঘাতে তোমার বুকের যত রক্ত ঝরেছে, আমার ছেলেকে ধরতে পারলে, আমি তার বুক ফুটো করে তত রক্ত তোমাকে উপহার দিতুম ।"

রাজা বলল, "এখন যদি বলি, তোমার ছেলে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে, এ দেখেও তাকে তুমি ইচ্ছে করে ধরোনি ! যদি বলি, তোমার ছেলে বলে তুমি তাকে বাঁচতে সাহায্য করেছ !"

আনাতুরি উত্তর দিল, "রাজা, এ-কথা তুমি বলতেই পারো । কারণ, আমার মনের কথা, এখন যদি আমি চিৎকার করে গলা ফাটিয়েও বলি, তুমি বিশ্বাস করবে না । বিশ্বাস করা উচিতও না । কেননা, কোন মা এমন নির্দয় হতে পারে । কোন নির্দয় মা ইচ্ছে করে তার ছেলেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় !"

"তবে কি তুমি মৃত্যুদণ্ডই চাইছ ?" জিজ্ঞেস করল রাজা ।

"হ্যাঁ ।" দৃঢ় গলায় উত্তর দিল আনাতুরি । পরক্ষণেই আবার বলল, "শুধু মৃত্যুর আগে ছেলেটাকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে যেতে পারলুম না, এই দুঃখ আমার থেকে গেল ।"

"বেঁচে থাকলে তাকে তুমি কী শাস্তি দিতে ?"

"তোমার বুকে তীর ছুড়ে সে যেমন করে আঘাত করেছিল, তেমনই করে আমিও তার বুকটা ঝাঁঝরা করে দিতুম ।"

"ছেলেকে হত্যা করতে তোমার হাত কাঁপত না ? তুমি তো মা ।"

রাজার এই কথা শুনে আনাতুরি চমকে উঠল। তারপর খুবই অসহায়ের মতো রাজার মুখের দিকে চোখ ফেরাল। তার চোখে জল। যেন মনে হল, একটা আহত মানুষ কথা বলার জন্য আকুলিবিকুলি করছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না। শুধু তার গাল দুটি চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

"কী হল ? তুমি কথা বলছ না যে ?" রাজা জিজ্ঞেস করল।

আনাতুরি তবু কথা বলল না। বলা যায়, বলতে পারল না।

রাজা আনাতুরিকে কথা বলতে না দেখে আবার বলল, "তুমি আমার কথার উত্তর দাও। আমার বিচারের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আনাতুরি এবার তার চোয়াল শক্ত করল। সিধে হয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, "রাজা, একদিন স্তানের মৃতদেহের ওপর আমার চোখের জল ফেলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, হিংসা নয়, আমার ছেলেকে ভালবাসতে শেখাব। হিংসার প্রতিশোধ নেবে সে ভালবেসে। কিন্তু আজ আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, ভালবাসা নয়, আমার ছেলের রক্ত তোমাকে উপহার দেব। এই হবে তোমার প্রতি তার অকৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ।" বলতে-বলতে আনাতুরি আর বুঝি পারল না। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রাজা হাঁক দিল, "সান্ত্রি-ই-ই-ই !"

সান্ত্রি ছুটে এল।

"আনাতুরির বন্দি-শেকল খুলে দাও !"

সেখানে তখন যত ছিল সেনা, যত ছিল সেনাপতি, সবাই থ হয়ে গেল রাজার আদেশ শুনে। রাজা তাকে মুক্ত করে দিচ্ছে, এ-কথা আনাতুরি নিজেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সে হতচকিত। তাই আনাতুরি অস্পষ্ট স্বরে বলে ফেলল, "রাজা !"

"হ্যাঁ।" রাজা ঘাড় নাড়ল। বলল, "আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি। আমি তোমায় অবিশ্বাস করিনি কোনওদিন। আজও করি না। তবে শুনে রাখো আনাতুরি, তোমার ছেলের খবর আমি জানি।"

চমকে চাইল আনাতুরি। জিজ্ঞেস করল ব্যস্ত হয়ে, "কোথায় সে ?"

রাজা উত্তর দিল, "সে পালিয়েছে আসগুজাই রাজা বুমবুজাংয়ের আস্তানায়।"

"তবে কি বুমবুজাং এখনও বেঁচে আছে ?" অবাক হল আনাতুরি।

"হ্যাঁ, বেঁচে আছে।" রাজা বলল, "তোমার ছেলে তার কাছে আমাদের সব খবর পৌঁছে দিয়েছে। তোমার ছেলে রাজা বুমবুজাংয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ফন্দি আঁটছে। তৈরি হচ্ছে আমাকে হত্যা করার জন্য। অবশ্য সে এখনও জানে না, তার তীরের আঘাতে আমি বেঁচে আছি, না মরে গেছি।"

সৌরামাতিরাজার কথা শুনতে-শুনতে আনাতুরিরও চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ক্রোধে দপদপ করে জ্বলে উঠছে। ক্রুদ্ধ গলায় সে বলে উঠল, "তা যদি সত্যি হয়, তবে শুনে রাখো রাজা, তার এই শয়তানি আমি রুখবই।"

"তুমি !" রাজার গলায় বিস্ময়।

"হ্যাঁ, আমি।" আনাতুরির নির্ভয় উত্তর, "শোনো রাজা, তোমার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব।"

"তোমার ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে ?" আনাতুরির মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রাজা।"

"হ্যাঁ রাজা, আমার ছেলের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব। এই যুদ্ধে হয় আমি মরব, না হয় সে। রাজা, তুমি আমাকে একটা ঘোড়া দাও ! আমাকে তুমি অস্ত্র দাও। তোমার বিশ্বস্ত ক'জন ঘোড়সওয়ার সেনা দাও। দ্যাখো আমি পারি কি না।"

রাজা অবাক স্বরে বলল, "তুমি কখনও যুদ্ধ করোনি। তুমি পারবে কেমন করে ?"

আনাতুরি এক কঠিন শপথ করার মতো চিৎকার করে উঠল, "পারব, পারব, পারব। নয়তো মরব। আর, তুমি যদি রাজি না হও, তবে রাজা, আমি একাই আমার রাস্তা খুঁজে নেব।"

রাজা বলল, "ঠিক আছে, আমায় ভাবতে দাও।"

পুরো একটা দিন ভেবেছিল রাজা। পুরো একদিন পরে সৌরামাতিরাজা তলব করেছিল আনাতুরিকে। সকলকে অবাক করে আনাতুরিকে বলেছিল, "আনাতুরি, আমি মনঃস্থির করেছি। আমি তোমার ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। আমি দেখতে চাই, মা আর ছেলের এই যুদ্ধে তুমি জয়ী হও। আমি দেখতে চাই, ভালবাসার জয়। হিংসার নয়। আনাতুরি, আমরা অসভ্য বর্বর মানুষ। মানুষকে হত্যা করা আমাদের পেশা। আমরা ভালবাসি রক্ত। মানুষের রক্ত। আমরা ভালবাসি প্রতিহিংসা। তোমার মতো মা আমরা পাইনি কোনওদিন। আমার বংশের কোনও মা, কোনওদিনই বলেনি, হত্যা নয়, মানুষকে ভালবাসো, তা হলে পৃথিবী সুন্দর হবে। আমরা সবাই সুন্দর হব। হ্যাঁ আনাতুরি, তাই তোমাকে দেখে আমার এত কষ্ট হয়। আমি তোমাকে দেখি, আর ভাবি, তুমি একা একজন মা, ছেলেকে সুন্দর করার জন্যে একাই লড়াই করছ। একাই একজন মা আকুল হয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে ছেলের জন্য। বলছে, ভালবাসো, ভালবাসো, সবাইকে ভালবাসো। কিন্তু মিথ্যে তোমার কান্না। সেই ছেলেই তুলছে মায়ের বুকের ওপর তীর। এ কী ভয়ঙ্কর পাপ। এ পাপের শেষ হয়তো তুমিই করতে পারো। আনাতুরি, ছেলের বিরুদ্ধে তুমি লড়াই করলে, আমি তাই তোমার পক্ষে। তুমি যদি জেতো, আমি আমার সকল মানুষের হাত থেকে অস্ত্র চেয়ে নিয়ে বলব, অস্ত্র নয়, জয় হয়েছে ভালবাসার। আর তুমি যদি পরাজিত হও, তবে জানব, আমরা জঘন্য পশু। চিরদিন এমন পশুই থাকব। যেমন এখন আছি।"

সৌরামাতিরাজার কথা শুনতে-শুনতে আনাতুরির দু' চোখ ভরে অশ্রু উছলে পড়ছিল। কাঁদছিল একজন মা। যে মা ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে। সে-যুদ্ধে কে জিতবে কেউ জানে না। কে বাঁচবে, কে মরবে, কারও জানা নেই। যদি আনাতুরি মরে, তবে তো তার খেদ থাকে না একটুও। কিন্তু আনাতুরির অস্ত্রের আঘাতে ছেলেটাই যদি মরে যায় ! তাই যুদ্ধে যাওয়ার আগে আনাতুরি যখন যুদ্ধের সাজসজ্জায় নিজেকে সাজাচ্ছিল, তখনও সে কেঁদেছে। যুদ্ধ-সাজ গায়ে পরে, ঘোড়ায় চড়ে সে যখন তীর-ধনুক হাতে নিয়েছিল, তখনও তার চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু যখন সে ঘোড়ার লাগাম ধরে টান মারল, ঘোড়া ছুটল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে, তখন আর জল নেই তার চোখে। তখন একজন দুঃসাহসী সেনার মতো তার মুখখানা ঝলসে উঠছে। হাঁক দিয়ে ডাক দিচ্ছে আনাতুরি তার সৈন্যদের, "জোয়ান সৈনিক, তোমাদের অস্ত্র তৈরি রাখো ! ছোটাও ঘোড়া। জয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

॥ ১৫ ॥

আনাতুরির ঘোড়া ছুটেছে। ঘোড়ার পিঠে বসে আনাতুরি ছুটল তার ছেলে কোহেনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে। ঘোড়া ছুটেছে সৌরামাতির সৈন্যদলের। স্তেপের বাতাসে যেন ঝঞ্ঝার মতো শব্দ তুলে ধেয়ে যায় সৈন্যদলের ঘোড়া। স্তেপের নদীর তরঙ্গে বেজে উঠল দুঃসাহসের জয়গান। পাহাড়ের পাথরে-পাথরে শোনা গেল সেই বীরগানের প্রতিধ্বনি।

চার হাজার বছর আগের এ-কথা এখন কারও জানার কথা নয়। চার হাজার বছর আগে আনাতুরি নামে এক মায়ের এই বীরগাথা কেউ লিখেও যায়নি। কে লিখবে ! এই দুর্ধর্ষ একরোখা

যুদ্ধবাজের দল শুধু জানত যুদ্ধই করতে। ঘোড়াই তাদের সঙ্গী। আর সঙ্গী তীর-ধনুক। তবু কেউ যদি হঠাৎ, এখনও, স্তেপের সেই ঘাসের রাজ্যে পৌঁছে যাও, যদি কান পেতে শোনার চেষ্টা করো, তবে হয়তো শুনতে পাবে আনাতুরি আর তার ঘোড়সওয়ার-সেনার এই গল্প ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। চারদিকে। শুনতে পাবে আনাতুরি-মায়ের সেই ডাক, "হে সৈনিকের দল, আমরা শত্রুর সীমানায় ঢুকে পড়েছি। অস্ত্র তৈরি রাখো। শত্রুকে হত্যা করার আগে, নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করো। আমার সৈনিকের একটি প্রাণ, হাজার প্রাণের চেয়েও অনেক গুণ দামি।"

সৌরামাতির সৈন্যরা ধেয়ে আসছে। খবরটা আসগুজাই রাজা বুমবুজাংয়ের কানে পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। সঙ্গে-সঙ্গে বুমবুজাংয়ের সৈন্যরাও তৈরি। রাজা বুমবুজাং যুদ্ধের হাঁক দিয়ে সৈন্যদের আদেশ করল, "যাও, শত্রুকে আঘাত করো! মরতে ভয় পেয়ো না। তোমাদের মাথা যায় তবু ভাল। কিন্তু শত্রুর মাথা জয় করতে ভুল কোরো না। যে যত মাথা জয় করবে, তার জন্য আমার কাছে আছে তত পুরস্কার।"

"রাজন!"

কে ডাকল? চমকে ওঠে রাজা বুমবুজাং, "কে?"

"আমি। কোহেন।" রাজার সামনে হঠাৎ সে দাঁড়াল।

রাজা বুমবুজাং কোহেনকে দেখে চিৎকার করে উঠল, "তৈরি হয়ে নে। শত্রু আমাদের সীমানায় ঢুকে পড়েছে।"

"শত্রু কারা, তুমি কি জানো?" ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল কোহেন।

"সৌরামাতি।" উত্তর দিল বুমবুজাং।

"তবে কি সৌরামাতিরাজ জানতে পেরেছিল, আমরা তাদের আক্রমণ করে আমার মাকে উদ্ধার করে আনব?"

"আমার জানা নেই।" রাজার উত্তর।

বাইরে শুরু হয়ে গেছে সাজ-সাজ রব। চিৎকার-চেঁচামেচি। হঠাৎ এমন সময়ে রাজা বুমবুজাংয়ের একজন সহচর ছুটে এসে চিৎকার করে উঠল, "রাজামশাই, সৌরামাতির এই ফৌজের প্রধান একজন মেয়ে।"

"কে?" থমকে গেল রাজা বুমবুজাং। "আমাদের এই স্তেপে মেয়েদের জায়গা গাড়ি-ঘরে, যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। ফৌজের প্রধান এই মেয়েটি কে?"

"আমি জানি সে কে!" বলে আর অপেক্ষা করল না। ছুট দিল। না, ছুটতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, "আমি এক্ষুনি আসছি। মহারাজ, তুমি এখানেই থাকো। দ্যাখো, আমি তোমার সামনে কাকে ধরে আনি!"

এবার ঘোড়া ছুটল কোহেনের। তার কোমরে বাঁধা ধারালো অস্ত্র। কাঁধে ঝোলানো ধনুক। পিঠে তূণ। তাতে তীর। সে ছুটছে। পেছনে ছুটছে বুমবুজাংয়ের ঘোড়সওয়ার সৈন্যদল।

ওদিক থেকে ধেয়ে আসছে ঘোড়ার পিঠে আনাতুরি। তার হাতে তীর-ধনুক। প্রস্তুত সে। সতর্ক।

আরও কাছে এগিয়ে এল রাজা বুমবুজাংয়ের সেনা। তার আরও কাছে এগিয়ে এল সৌরামাতির ফৌজ। দু' দল আরও কাছাকাছি। একেবারে মুখোমুখি।

চিৎকার করে উঠল কোহেন, "আঘাত করো!"

যুদ্ধের প্রথম তীরটি ছুটে এল সৌরামাতির সৈন্যের গায়ে। তারপর শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের ভয়ঙ্কর মারামারি। এদিক থেকে ছোটে যত তীর, ওদিক থেকে ছুটে আসে তারও দ্বিগুণ। ওদিকের সেনার গলায় আক্রোশের যত আর্তনাদ, এদিকের সৈন্যের গলায় প্রতিহিংসার ততই অট্টরব। অস্ত্রের আঘাত। যন্ত্রণার চিৎকার। রক্তের বন্যা। এখানে এখন কেউ আর মানুষ নয়। এখন তারা এক-একজন যুদ্ধদানব। কেউ কাউকে ছাড়বে না। একজন আর-একজনের গলা টিপে ধরছে। কিন্তু ভাবতে পারছে না, সে

যাকে হত্যা করছে, সেও তারই মতো মানুষ। কান্না শোনা যায়, অসংখ্য শিশুর সঙ্গে অসংখ্য মায়ের। তাদের গাড়ি-ঘর জ্বলছে দাউদাউ করে। তাদের ঘরের ছেলে মরছে আগুনে। আগুনের ধোঁয়া উঠছে আকাশে। ধোঁয়ার সঙ্গে ধুলো উড়ছে স্তেপের বুক থেকে। এ ধোঁয়ায়, এ ধুলোয় চিনতে পারে না কোহেন তার মাকে। মা-ও খুঁজে পায় না তার ছেলে কোহেনকে।

কিন্তু সামনাসামনি যুদ্ধ কে করবে কতক্ষণ! দু' পক্ষের সৈন্যই মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে অস্ত্রের আঘাতে। দু' পক্ষেরই রক্তে ভেসে যাচ্ছে স্তেপের মাটি। এমনই করে যুদ্ধ চললে, শেষ হয়ে যাবে দু' পক্ষেরই সৈন্য, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। সুতরাং আর মুখোমুখি যুদ্ধ নয়। রাজা বুমবুজাংয়ের ঘোড়সওয়ার সেনারা ছুটে পালাল ওক-পাইনের বনে। সঙ্গে-সঙ্গে গর্জে উঠল আনাতুরিও, "সৈনিক ওদের ধাওয়া করো। ওরা পালাচ্ছে।"

বুমবুজাংয়ের সেনার পেছনে ঘোড়া ছুটল সৌরামাতি ফৌজের।

বুমবুজাংয়ের সেনারা ঢুকে পড়ল বনের ভেতর। সঙ্গে কোহেনও।

সৌরামাতির ফৌজও তাদের তাড়া করল বনের আনাচে-কানাচে। সঙ্গে আনাতুরিও।

বুমবুজাংয়ের সেনারা গা-ঢাকা দিল বনের আড়ালে। আবডালে।

সৌরামাতির ফৌজিসেনারা তাদের তল্লাশ করতে লাগল হুঁশিয়ার হয়ে। বনের মধ্যে সে যেন আর-এক নিঃশব্দ যুদ্ধ। যেমন ভয়জাগানো, তেমনই বুককাঁপানো। কখন যে আচমকা কার বুকে তীর বিঁধবে, কারও জানা নেই। কিন্তু সেই ভয়কে তুচ্ছ করে আনাতুরি খুঁজে বেড়াচ্ছে তার ছেলে কোহেনকে। হাতে তার তীর-ধনুক। আর, গাছের আড়ালে লুকিয়ে-লুকিয়ে কোহেনও খুঁজছে তার মাকে। দৃষ্টি তার সতর্ক। কে কাকে আগে খুঁজে পাবে, কেউ জানে না। জানে না, কে জিতবে, কে হারবে।

এমন সময়ে, বনের গাছের পাতায় দমকা হাওয়ার শব্দ।

এমন সময়ে, হঠাৎ অস্ত্রের আঘাতে মানুষের আর্তনাদ।

হঠাৎ-হঠাৎ বুক-দুরদুর রণহুঙ্কার। ঘোড়ার হ্রেষারব, চিঁ হিঁ হিঁ।

সেই হুঙ্কার শুনে ডাক দেয় আনাতুরি, "হুঁশিয়ার!"

কোহেন জিগির তোলে, "মার, মার, মেরে ফেল।"

কিন্তু বনের মধ্যে মাও খুঁজে পায় না ছেলেকে। ছেলেও দেখতে পায় না মাকে। সে কী ভয়ঙ্কর উত্তেজনা। গায়ে কাঁটা দেয়। শিউরে ওঠে সারা শরীর।

কিন্তু ভয় নেই আনাতুরির।

হয়তো ভয় নেই কোহেনেরও।

বনের আড়ালে-আড়ালে তাদের দৃষ্টি আঁতিপাতি ঘোরে-ফেরে। কখনও এদিক। কখনও ওদিক।

এমন সময়ে হঠাৎ কেন আনাতুরি আঁতকে ওঠে! কেন তার ঘোড়া থামে!

হঠাৎ কেন চমকে ওঠে কোহেন! ঘোড়া তার দাঁড়ায় কেন!

কাকে দেখে আনাতুরি এগিয়ে আসে!

কাকে দেখে কোহেন তার তীর খুঁজতে হাত বাড়ায়!

ধক করে ওঠে কোহেনের বুক।

কেন?

তার তূণে তীর নেই। ফুরিয়ে গেছে! সামনে তার মা দাঁড়িয়ে। তার মায়ের হাতে তীর। এই বুঝি তীর ছুটে আসে! এই বুঝি মায়ের তীরে মরল কোহেন!

ভয় পেল কোহেন। তার ঘোড়া ছোটাল আচমকা। বনের গাছগাছালি ডিঙিয়ে ছুটল ঘোড়া। পালাল।

হঠাৎ ছেলেকে ছুটে পালাতে দেখে থতমত খেয়ে গেল আনাতুরি প্রথমটা। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। চেঁচিয়ে ডাক দিল, "কোহেন!"

কোহেন পিছু ফিরে দেখল না। ছুটল।

আনাতুরিও ঘোড়া ছোটাল তার পেছনে। ছুটতে-ছুটতে আনাতুরি আবার চেঁচাল, "কোহেন, দাঁড়া! নইলে আমার হাতে মরবি তুই!"

কোহেন বুঝতে পারল, সে তার মায়ের তীরের নিশানার মধ্যেই রয়েছে। এখনই তার মায়ের হাতের তীর ছুটে এসে আঘাত করবে। তবুও সে দাঁড়াল না। চিৎকার করে উত্তর দিল, "আমায় তুমি মারো, সেও ভাল, তবু, তোমার হাতে ধরা দেব না কখনওই।"

আনাতুরির ঘোড়া কোহেনের আরও কাছে এগিয়ে এল। আনাতুরি আবার চিৎকার করল, "আমি তোর মা।"

কোহেন উত্তর দিল, "এখন তুমি আমার শত্রু।"

শত্রু! মা তার শত্রু। আনাতুরির বুকটা দুঃখে যেন ভেঙে পড়ল। তবু আর-একবার নিজের মনকে সে শক্ত করল। এবার সে ধমক দিল, "ওরে তুই ধরা দিবি না?"

"না!" জোরগলায় উত্তর দিল কোহেন। তারপর আবার বলল, "যে-মা ছেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, ধিক তাকে।"

ছেলে! হ্যাঁ, কোহেন তার ছেলে! সত্যিই তো, সে তার ছেলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। আনাতুরির পরাক্রম যেন গুঁড়িয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। তার শক্তি যেন ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল শরীর থেকে। আনাতুরি আর পারল না। আনাতুরি কেঁদে ফেলল। কাঁদতে-কাঁদতে আর্তস্বরে সে বলল, "আমি যদি অস্ত্র ফেলে দিই, তবে কি তুই ধরা দিবি বাবা?"

না, তবু দাঁড়াল না কোহেন। সে ঘোড়ার পিঠে বন ডিঙোতে-ডিঙোতে বলল, "আগে ফেলো, তারপর ধরা দেওয়ার কথা উঠবে।"

আনাতুরি অবিশ্বাস করল না ছেলেকে। আনাতুরি অস্ত্র ফেলে দিল। চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে কোহেন, এই দ্যাখ, আমি অস্ত্র ফেলে দিয়েছি। এবার দাঁড়া। আয় আমার কাছে!"

কোহেনের ঘোড়া থামল। কোহেন দেখল মায়ের হাতের দিকে। সত্যিই তার মা অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখের চাউনি কঠোর হল। হঠাৎ সে হাঁক দিল, "শোনো রাজা বুমবুজাংয়ের সেনাদল, তোমরা যে-যেখানে আছ বেরিয়ে এসো। আমাদের জয় হয়েছে। সৌরামাতির সেনানায়ক তার অস্ত্র ফেলে দিয়েছে। তাকে বন্দি করো!"

আঁতকে উঠল আনাতুরি। তবে কি ছেলে তার যেমন অকৃতজ্ঞ, তেমনই বিশ্বাসঘাতক!

খবরটা দাবানলের মতো বনের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। সৌরামাতির সৈন্যরা সে-খবর শুনে যে পারল, পালাল। যে পারল না, ধরা দিল। রাজা বুমবুজাংয়ের সেনারা আনাতুরিকে বন্দি করল। আনাতুরির স্নেহমাখা চোখ দুটি বুজে গেল নিমেষে। আবার উপচে গেল অশ্রুফোঁটায়। কান্নাভেজা গলায় সে আকুল হয়ে বলল, "কোহেন, বাপ আমার, আমি সত্যিই হেরে গেছি তোর কাছে। তোর কাছে, আমার শেষ অনুরোধ, আমায় তুই হত্যা কর। আমাকে বন্দি করিস না।"

কিন্তু মায়ের শেষকথাও শুনল না কোহেন। সে মাকে বন্দি করে নিয়ে চলল রাজা বুমবুজাংয়ের কাছে। মাকে পরাজিত করেছে কোহেন। এখন তাকে পায় কে!

॥ ১৬ ॥

মায়ের হাতে বন্দি শেকল পরিয়ে দিয়েছে কোহেন। বন্দি-মাকে সে নিয়ে এসেছে রাজা বুমবুজাংয়ের শিবিরে। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে মায়ের গলার শব্দ। অসহায়ের মতো সে চেয়ে আছে। দেখছে এদিক-ওদিক। দেখছে, তার ছেলেকে। দেখছে, রাজা বুমবুজাংকে।

রাজা বুমবুজাং আনাতুরির মুখের সেই চেহারা দেখে হেসে উঠল হো-হো করে। তারপর হাসতে-হাসতেই বলল, "আশা কুরি, আমাকে চিনতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না ?"

আনাতুরি নির্বাক।

"মনে আছে, একদিন আমাকে তুমি হত্যা করার চেষ্টা করেছিলে ! এই চেয়ে দ্যাখো, তোমার সেই পাথরের আঘাতের চিহ্নটা এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে।" বলতে-বলতে রাজা বুমবুজাং গায়ের জামাটা সরিয়ে আনাতুরিকে নিজের কাঁধটা দেখাল। দেখিয়ে, আবার হেসে উঠল। কী হিংস্র সেই হাসির শব্দ। কী বীভৎস রাজা বুমবুজাংয়ের সেই মূর্তি। সে-হাসি থামে না। সেই মূর্তি ভয় জাগায়।

নিস্তব্ধ আনাতুরি তবুও। অসহায়। ঝাপসা হয়ে আসছে তার চোখের দৃষ্টি। ফিরে তাকায় ছেলের দিকে। এখন যেন একটা অস্পষ্ট ছায়া তার ছেলে, তার চোখে। কী বলবে সে জানে না। কোন কথাটি বললে ছেলে যে তাকে 'মা' বলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরবে, তাও জানে না আনাতুরি। সে এখন শুধু জানে, তার সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই। না, মরতে ভয় পায় না আনাতুরি। ভয় তার এই ছেলেটার জন্য। হায় রে, ছেলেটা কেমন করে এমন নৃশংস হল ! কেমন করে সে পারল, মায়ের হাতে বন্দি-শেকল পরিয়ে দিতে ! বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস করতে মন চায় না আনাতুরির। এই ছেলের জন্যই না তার সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছে আনাতুরি। ওই ছেলের কপালে কত-না স্নেহের চুমো এঁকে দিয়ে আদর করেছে তাকে ! কত খুশির দিন কেটেছে তার ছেলেকে নিয়ে। কেটেছে কত আনন্দে ! তবে কি সব মিথ্যে ! মিথ্যে মা ! মিথ্যে ছেলে ! মিথ্যে স্নেহ ! ভাবতে-ভাবতে

আনাতুরির চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

তীক্ষ্ণস্বরে কড়কে উঠল রাজা, "না-আ-আ ! আমি সে-কথা ভুলিনি। তোমাকে আমি রেহাই দেব না। যে-ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে, আজ সেই ছেলের হাতেই তুমি বন্দি। তুমি বিশ্বাসঘাতক ! তুমি নিজের রাজার আশ্রয় ছেড়ে ছেলেকে বাঁচানোর জন্য অন্যের আশ্রয় নিয়েছিলে। ভেবেছিলে, তাকে তুমি লুকিয়ে রাখবে আমার নজরের আড়ালে। কিন্তু পারোনি। সে নিজেই ছুটে এসেছে আমার কাছে। সে নিজেই আমার কাছে ধরা দিয়েছে। আমি রাখলে সে বাঁচবে। আমি চাইলে সে মরবে। এখন তার জীবন আমার হাতে। যেমন তোমার প্রাণও আমার হাতে। তবে সে-প্রাণ আর-বেশিক্ষণ এই স্তেপের বাতাসে শ্বাস নিতে পারবে না। বেশিক্ষণ এই স্তেপের আলো তোমার চোখে আর ঝলসে উঠবে না। আর-বেশিক্ষণ ছেলের জন্য তোমার মন কাঁদবে না। তোমায় মরতে হবে।"

আনাতুরি একটুও চমকাল না রাজার কথা শুনে। কিন্তু কোহেন যেন কেমন অস্থির হল।

"তবে শোনো আনাতুরি, তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি নিজের হাতে তোমাকে হত্যা করব না। আমি জানি, আমার হত্যার আঘাত ভীষণ কষ্ট দেয় মানুষকে। আমি এখন আর গলা টিপে মানুষকে মারি না। এখন আমি মানুষের গলা মুচড়ে-ছিঁড়ে তাকে মেরে ফেলি। তোমাকে অত কষ্ট দিতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। যতই হোক, তুমি আমার বিশ্বস্ত সহচর স্তানের বউ। স্তানকে আমি গলা টিপেই হত্যা করেছি। তুমি বিশ্বাস করো, তোমার কোহেনকেও আমি সেইদিন গলা টিপেই হত্যা করতাম। ওর তেমন কষ্ট হত না। ও তখন ছিল একেবারেই কচি শিশু। সেদিন যদি কোহেন মরত, তবে আজ তোমায় মরতে হত না। তুমি সুখে থাকতে। তোমাকে পালাতে হত না আমার শত্রু সৌরামাতির আশ্রয়ে।"

আনাতুরি তবুও নিশ্চুপ। কিন্তু কোহেনের মুখের চেহারা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে আসে। যতবারই সে মায়ের চোখের দিকে তাকায়, ততবারই ছমছম করে ওঠে কেন তার মন !

"শত্রুর আশ্রয়ে যে পালিয়ে যায়, তার নিষ্কৃতি নেই। তোমাকে মরতেই হবে। আমি নয়, তোমাকে হত্যা করবে, তোমার ছেলে কোহেন।" বলে ভয়ঙ্কর এক চিৎকার করে হেসে উঠল রাজা বুমবুজাং।

ভয়ে শিউরে উঠল কোহেন। দেখল মায়ের চোখ উপচে জল গড়াচ্ছে।

রাজা গর্জন করে উঠল, "তোমার চোখের জল মুছে ফেলো আনাতুরি। তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও !" তারপর কোহেনকে আদেশ করল, "কোহেন, তুই অস্ত্র নে। ধনুকে তীর জোড় !"

কোহেন হাতে ধনুক নিয়ে, ধনুকে তীর জুড়ল।

রাজা আবার কর্কশ গলায় হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করল, "মরবার আগে তোমার কী ইচ্ছে আনাতুরি ? কী চাও তুমি ? যদি বলো, তোমার সে-ইচ্ছে আমি পূরণ করব।"

রাজার মুখের দিকে এবার তীব্র রোষে তাকাল আনাতুরি। সে তার চোয়াল শক্ত করল। চোখের জল থমকে গেছে। সে-জল চোখের ভেতরই ছলছল করছে। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে।

"সময় চলে যাচ্ছে। তুমি কী চাও তাড়াতাড়ি বলো !" গলা চড়িয়েই জিজ্ঞেস করল বুমবুজাং।

আর থাকতে পারল না আনাতুরি। একটা সাঙ্ঘাতিক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো সে হঠাৎ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল। সে চিৎকার করে বলে উঠল, "আমার হাতে একটা অস্ত্র দাও ! আমি তোমার প্রাণ চাই !"

"আনাতুরি-ই-ই-ই-ই !" ক্ষিপ্ত দানবের মতো আর্তনাদ করে উঠল রাজা বুমবুজাং। দানবের মতো তার চোখ দুটো কটমট করে উঠল। তার ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা লকলক করে বেরিয়ে এল ! এই বুঝি সে আনাতুরির নড়া দুটো ছিঁড়ে নেয় ! কড়মড় করে চিবিয়ে খায় !

না, তা করল না সে। রাজা বুমবুজাং গলা ফাটিয়ে হুকুম করল, "কোহেন, তীর ছুড়ে তোর মায়ের হৃৎপিণ্ডটা এফোঁড়-ওঁফোড় করে দে।"

কোহেন মাকে তাক করল।

মা আকুল হয়ে কোহেনকে ডেকে উঠল, "কোহেন, বাপ আমার, আমি তোর মা। আমাকে মেরে ফেলার আগে, একবারটি আমার কাছে আয় ! আমি শেষবারের মতো তোর কপালে একটা চুমো দিই।"

"না-আ-আ-আ।" রাজা ধমক দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে কোহেনের ধনুকের ছিলা ছিটকে তীর ছুটল, তার মায়ের দিকে। হাত কেঁপে গেছে কোহেনের। এ কী, নিশানা যে তার ফসকে গেল !

চিৎকার করে উঠল রাজা বুমবুজাং, "কোহেন-ন-ন !"

কোহেন সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি তীর ধনুকে জুড়ল। এবার আর ডাকল না মা কোহেনকে। মা অপলক চোখে চেয়ে রইল কোহেনের মুখের দিকে। আহা ! মমতায় উথলে উঠছে আনাতুরির সেই চোখ দুটি। সেই চোখের দিকে মুহূর্ত তাকাল কোহেন। তার কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। আর দেরি নয়। সে ছুড়ে দিল তীর। আশ্চর্য, এবারও তার চোখ নিশানা হারাল। উড়ে গেল তীর আনাতুরিকে না-আঘাত করে।

ক্ষিপ্ত রাজা বুমবুজাং লাফিয়ে উঠল। লাফিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ধেয়ে গেল কোহেনের দিকে। কোহেনের গলাটা সে প্রায় টিপে ধরে। কোহেন ভয় পায় না। একটুও ব্যস্ত হয় না। সে রাজাকে শান্ত গলায় বলে, "হে রাজা, আমাকে ক্ষমা করো। আজ আমি ক্লান্ত। বড্ড ক্লান্ত। তাই আমার নিশানা লক্ষ্য হারাচ্ছে। আমি একটু বিশ্রাম চাই। অন্তত একটা দিন। কাল ভোরে আলো ফুটলেই আমার মাকে আমি হত্যা করব।"

"না-আ-আ-আ ! আজই তোকে হত্যা করতে হবে এখনই।" রাজা চিৎকার করে উঠল।

"একটা দিন এমন কিছু নয়। রাত গড়ালেই ভোর। এর বেশি তোমার কাছে আমি তো আর কিছু চাইছি না।" উত্তর দিল কোহেন।

ক্ষিপ্ত রাজা বুমবুজাং স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল খানিক কোহেনের মুখের দিকে। হয়তো কিছু ভাবল। তারপর বলল, "ঠিক আছে, তোর কথাই সই। একটা দিন সময় তোকে দিতে রাজি। কাল ভোরেই তোকে এ-কাজ করতে হবে। নইলে তোর মা-ও মরবে। মায়ের সঙ্গে তুইও। এই একটা দিন তোর মা বন্দি থাকবে, বন্দিশিবিরে। একা।"

বুমবুজাংয়ের সৈন্যরা আনাতুরিকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। বন্দি আনাতুরি। তার পায়ের শেকলে শব্দ ওঠে, ঝনঝন। সেই পায়ের দিকে চমকে তাকায় কোহেন। তারপর তার ঘোড়া ছুটিয়ে পালায় কোহেন নিজের শিবিরে।

॥ ১৭ ॥

সতিই, আজ বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কোহেন। আজ বনের মধ্যে নির্ঘাত সে-ই মরত তার মায়ের হাতে। মা ইচ্ছে করলেই একটি তীরের আঘাতে তাকে শেষ করে ফেলতে পারত। কিন্তু মা তো তাকে মারল না। মা কোহেনের কথায় বিশ্বাস করল। নিজের অস্ত্র ছুড়ে ফেলে দিল। অস্ত্র ছুড়ে না ফেললে, কোহেন কি তার মাকে বন্দি করতে পারত ! না, মাকে সে রাজা বুমবুজাংয়ের সামনে হাজির করতে পারত ! সত্যি কথা বলতে কী, হেরে গেছে কোহেনই। কিন্তু কোহেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মায়ের সঙ্গে। একদিন যে মা নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে কোহেনের প্রাণ বাঁচিয়েছে

রাজা বুমবুজাংয়ের হাত থেকে, সেই মাকে ধরে আনল কোহেন সেই ঘাতকেরই কাছে ! ছিঃ ! সেই মায়েরই হাতে-পায়ে শেকল পরানো হল, কোহেনেরই জন্য। ধিক ! ধিক ! এখন কোহেনকে কে বোঝাবে, "ওরে কোহেন, পৃথিবীতে মায়ের চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ নেই। ওরে কোহেন, তুই প্রথম যেদিন মায়ের কোলে শুয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিলি, সেদিন মা-ই তোকে আদরে জড়িয়ে ধরে হেসে উঠেছিল। সেই হাসি দেখে তুইও হেসেছিলি। সেইদিনই পৃথিবী সুন্দর হয়ে উছলে উঠেছিল। আর যেদিন তুই সেই মাকে তীরের আঘাতে মারতে চেয়েছিলি, সেদিন পৃথিবীর কান্নার দিন। ওরে কোহেন, শুনে রাখ, তোর মা-ই তোর পৃথিবী। তোর মায়ের চোখের জল, এই পৃথিবীরই কান্নার অশ্রুফোঁটা।"

ভয়ানক নিস্তব্ধ লাগছে কোহেনের আজকের রাতটা। বড্ড নিথর। কিছুতেই আজ আর তার চোখে ঘুম আসছে না। ঘুম আসার কথাও না। কেননা, আজ বারবার তার চোখে ঝলসে উঠছে মায়ের সেই মুখখানি। সেই কান্নাভেজা চোখ দুটি। মায়ের চোখে কান্না দেখেই কি তবে কোহেনের নিশানা ফসকে গেছে ! তীরের লক্ষ্য হারিয়ে গেছে ! ভালই হয়েছে। ওই তীরের আঘাতে কোহেন যদি মাকে হত্যা করত, তবে পৃথিবীতে তার যে আর আপন কেউ থাকত না। কেউ বলত না, "কোহেন, বাপ আমার, আমি তোর মা। আয়, তোর কপালে একটা চুমো দিই।"

কিন্তু কাল ? কাল ভোরে কী হবে ? কাল ভোরে যে মাকে মরতেই হবে কোহেনের হাতে !

উফ ! কী যন্ত্রণা ! জেরবার হয়ে যায় কোহেন ভাবতে-ভাবতে। এই শীতের রাতেও ঘাম ঝরে তার কপাল বেয়ে। ঘামের বিন্দুগুলি যতবার সে মুছে ফেলে, ততবারই আবার ফুটে ওঠে। আর শুয়ে থাকা যায় না। পারল না কোহেন শুয়ে থাকতে। উঠে পড়ল। বেরিয়ে পড়ল বাইরে, শিবিরের পরদা ঠেলে। তারপর স্তেপের অন্ধকারেই হারিয়ে গেল। কোথা গেল সে !

"মা !"

"কে ?" চমকে ওঠে আনাতুরি।

"আমি, কোহেন।" ভারী দুঃখ-জড়ানো সেই গলার স্বর। মায়ের বন্দি-শিবিরের পেছনের পরদা তুলে কোহেন ঢুকল। চোরের মতো। সামনে দিয়ে আসা যায় না। সেখানে সান্ত্রি। সুতরাং সান্ত্রিকে ফাঁকি দিয়েই কোহেন মায়ের সামনে দাঁড়াল।

তবে কি মা'র চোখেও এতক্ষণ ঘুম ছিল না। বোধ হয়। বন্দি-মা হয়তো জানত না, এখন কত রাত। তাই শিবিরের অন্ধকারে কোহেনের মুখখানা খুঁজতে-খুঁজতে জিজ্ঞেস করল, "ভোর হয়ে গেছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ মা !" অনুতাপে কাতর যেন কোহেনের গলার স্বর।

"এবার আমায় যেতে হবে ?" জিজ্ঞেস করল মা।

"হ্যাঁ।"

"আমি যে হাঁটতে পারছি না কোহেন। বন্দি-শিকলের ভার যে আমি বইতে পারছি না।"

"তোমার বন্দি-শেকল আমি খুলে দেব মা। তোমার হাঁটতে আর কষ্ট হবে না।"

"সেই ভাল। আমি পালাব না। আমি পালাতে আসিনি।"

"জানি মা। আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।"

"কোথায় ?"

"যেখানে রক্ত নেই। আছে, মায়ের ভালবাসা।"

"কোহেন !" একটা উত্তেজনার চাপা স্বর আনাতুরির গলায়।

"এসো মা, তোমার বন্দি-শেকল খুলে দিই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"কোহেন, তুই আমায় মারবি না ?"

"না।"

"কোহেন, তুই আমাকে না মারলে, রাজা যে তোকে মেরে ফেলবে !" মায়ের গলায় আতঙ্ক।

"মা, রাজা আর আমাদের খুঁজে পাবে না। আমরা হারিয়ে যাব। এসো, তোমার বন্দি-শেকল খুলে দিই।" কোহেন মায়ের পায়ে হাত দিল। পায়ের শেকল খুলে দিল। খুলে দিল হাতের শেকলও। তারপর বলল, "মাগো, এবার তুমি আমার কপালে চুমো দাও, যত ইচ্ছে ! যেমন করে আদর করতে আমায় ছেলেবেলায়, তেমনই করে আদর করো মন ভরে। বিশ্বাস করো, আজ আমি তোমার কাছে হেরে গেছি। মা, তোমার ভালবাসার কাছে আমি পরাজিত।"

হতভম্ব হয়ে গেল আনাতুরি ছেলের কথা শুনে। দাঁড়িয়ে রইল বোবার মতো, অন্ধকারে। অনেকক্ষণ। কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পায় না। কার চোখে কত জল উপচে যায়, তাও দেখতে পায় না কেউ। শুধু শোনা যায় নিশ্বাস, মা আর ছেলের। সেই নিশ্বাসই নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। সেই নিশ্বাস শুনে মা এগিয়ে যায় ছেলের দিকে। অন্ধকারেই চিনতে পারল মা ছেলের চিবুকটি। ছুঁতে পারল মা'র ঠোঁট দুটি ছেলের কপাল। ছেলের কপালে চুমো দিল মা, তার সমস্ত স্নেহ উজাড় করে। ছেলে তাঁর হাতটি বাড়িয়ে দিল মায়ের হাতের দিকে। ছেলের হাত ধরে মা বেরিয়ে এল বন্দি-শিবির থেকে গোপনে। তারপর স্তেপের সেই অন্ধকার নির্জনে দাঁড়াল ক্ষণেক। আকাশে অসংখ্য তারা। দেখল দু'জনেই। ঘাসে পা ফেলল মা আর ছেলে। ছুটে চলল। ছুটতে-ছুটতে হারিয়ে গেল কোথায়, কেউ জানে না। এখনও না।

পা নিয়ে বিপাক

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
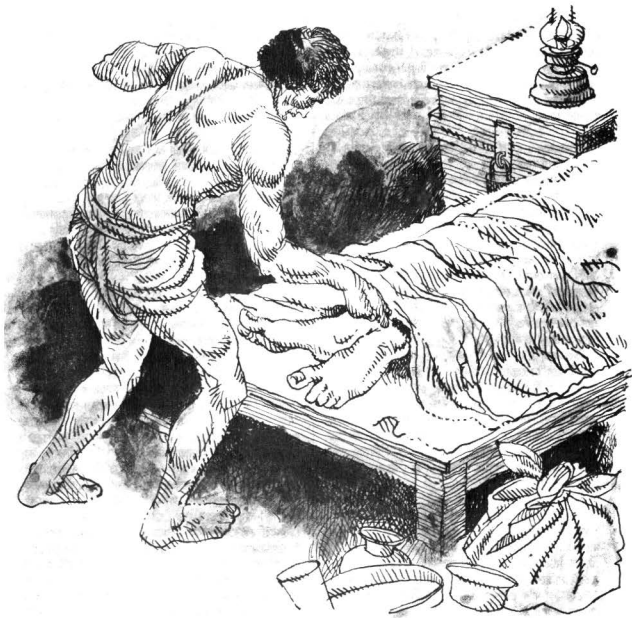
নিজের গাঁয়ে ব্যবসা জমছে না দেখে চরণচন্দ্র ওরফে চুন্নু সিঁধকাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাত তখন বেশ গভীর, তায় অমাবস্যা। চারপাশে গা-ছমছম করা অন্ধকার। তা হোক, এরকম অন্ধকারই ও চায়। ফুটফুটে চাঁদের আলো থাকলে কাজে বড় অসুবিধা হয়। কৃষ্ণপক্ষেই ওর কাজ-কারবার ভাল জমে।

চুন্নুর পরনে একটা নেংটির মতো কাপড়, গায়ে কোনও জামা নেই, পায়ে তো জুতো থাকার প্রশ্নই আসে না। হাঁটতে-হাঁটতে কয়েক ক্রোশ পেরিয়ে এসে একটা ছোটমোট গ্রাম দেখতে পেল ও। মাত্র দশ-বিশ ঘরের গ্রাম। বেশ কিছু গাছগাছালিও দেখা যাচ্ছে, আম, জাম, তেঁতুল আর তাল-সুপুরির। গ্রাম যখন, গাছপালা তো থাকবেই, আর তাতে ওর সুবিধাই হয়। একে অমাবস্যা, তাতে গাছের অন্ধকার, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কারও নজরে পড়ার ভয় থাকে না।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে চুন্নু। সারা গাঁ-টাই যেন ঘুমোচ্ছে। এত রাতে বাপু কেই-বা আর জেগে থাকে। মনের আনন্দে এদিক-সেদিক ঘুরতে থাকে ও। দু-একটা পাকাবাড়িও চোখে পড়ল। কিন্তু পাকাবাড়িতে তো সিঁধ কাটা যায় না, তাই যে-কোনও একটা মাটির বাড়ির দিকেই ওকে নজর রাখতে হচ্ছে। ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ এক সময় কেমন চমকে উঠল, অনেক দূর থেকে শেয়াল ডেকে উঠেছে, "কা হুয়া, কা হুয়া।" শেয়াল ডাকের একটা মজা আছে, একটা শেয়াল চেঁচাতে শুরু করলেই সঙ্গে-সঙ্গে আরও সব শেয়াল চেঁচিয়ে ওঠে, "হুয়া কা, হুয়া কা।"

চুন্নুর মনে হল শেয়ালগুলো যেন ওকে উদ্দেশ্য করেই ডেকে উঠেছে, "কী হয়েছে

চুন্নু, কী হয়েছে ?"

চুন্নুও মনে-মনে উত্তর দিল, "কী আবার হবে, কিচ্ছু হয়নি।" বলেই আবার সুড়ুত-সুড়ুত করে ঘুরতে লাগল।

ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত একটা ডোবা চোখে পড়ে। পানা-কচুরিতে ভরা। আর ডোবার এদিক-ওদিক কিছু ঝোপঝাড়। কিন্তু আর-এক পাশে একটা মাটকোঠা ; প্রায় ডোবার সঙ্গে লেগে আছে। বাড়িটার যে এটা পেছন দিক, বোঝা যায়। ওপরে টালির চাল। টালির চাল যখন নিশ্চয়ই এটা একটু অবস্থাপন্ন লোকেরই বাড়ি হবে। দিন-আনা দিন-খাওয়া লোকের বাড়ি হলে ওপরে খড়ের ছাউনি থাকত। সেসব চুন্নু ভালভাবেই বোঝে। তাই মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, এ-বাড়িতেই ঢুকবে। যেহেতু ডোবার ধারে বাড়ি, মাটিও নরম পাওয়া যাবে, খুঁড়তে অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া সিঁধ কেটে ঢুকবার সময় বা ঘরের মালপত্র হাপিস করার সময় যদি কেউ দেখেও ফেলে, ফুস করে পালিয়ে যেতেও অসুবিধা হবে না।

ডোবার পাড় দিয়ে পা টিপে-টিপে ও এগিয়ে এল বাড়িটার কাছে। তারপর সিঁধকাঠি নিয়ে বসল। কিন্তু মাটি খোঁড়া শুরু করার আগে আর-একটা কাণ্ড করে নিল ও। ট্যাঁক থেকে একটা তেলের শিশি বার করে সারা গায়ে চপচপে করে তেল মেখে নিল। গায়ে তেল মাখা থাকলে, কেউ যদি ওকে ধরেও ফেলে পিছলে পালিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না। ওদের বাপ-চোদ্দ পুরুষের এই ব্যবসা তো, চুন্নু এ-সব ভালই জানে।

যাই হোক, গায়ে তেল মাখা হয়ে গেলে সিঁধ কাটতে শুরু করে চুন্নু। টুকুস-টুকুস করে মাটি কাটে আর গর্ত থেকে খাবলে-খাবলে মাটি সরায়। এরকম ভাবে বেশ খানিকটা গর্ত করার পর ও বুঝল, বাড়িটা মাটির হলে কী হবে, দেওয়ালটা বেশ মোটা। তা হোক, এসব কাজে কখনও দমে গেলে চলে না। আবার খুঁড়তে থাকে চুন্নু। খুঁড়তে-খুঁড়তে এক সময় ঘরের ভেতর পর্যন্ত ফুটো করে ফেলল। একটা যেন সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল।

ব্যস, এবার ঢুকে পড়লেই হয়। কিন্তু পুরোপুরি ঢুকে পড়ার আগে একটু দেখে-শুনে এগোতে হয়। ফলে প্রথমে হাত দুটো আর মাথাটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল চুন্নু। তারপর বুকে হেঁচড়ে-হেঁচড়ে মাথা আর হাত দুটো ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কোমর থেকে পা দুটো রইল বাইরে, ডোবার দিকে।

কিন্তু ঘরের ভেতরে যেন আলকাতরার মতো অন্ধকার। কিছুই দেখার উপায় নেই। ঘরে কেউ আছে কি নেই, বা বাক্স-পেটরা কোথায় কী আছে না-আছে তাও বোঝার উপায় নেই। বাক্স-পেটরা তো পরের কথা, আপাতত ধারে-কাছে কেউ শুয়ে-টুয়ে আছে কি না সেটা দেখা দরকার। তাই হাত দুটো এপাশে-ওপাশে নেড়েচেড়ে দেখে নেয় চুন্নু। না, কারও গায়েই ওর হাত লাগল না। কোমরটাকে আরও একটু টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে আবার হাত নাড়তে থাকে ও। খুব সাবধানে হাত নাড়ে। বলা তো যায় না, কারও-কারও ঘুম আবার খুব পাতলা, অল্প একটু হাতের ছোঁয়া পেলেই ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তা হলে আর দেখতে হবে না, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে পাড়া মাত করে ছাড়বে।

এরকম বিপদে যে কতবার পড়েছে চুন্নু তার হিসাব নেই। মনে পড়ল, বছরখানেক আগেই হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল একবার। তারপর কী মারটাই না খেয়েছিল। শুধু কি মার, শ্রীঘরে গিয়ে তিন-তিনটে মাস কাটাতে হয়েছিল।

সে যাক গে, পুরনো কথা ভেবে আর কী হবে ! চুন্নু হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বুঝতে পারল, ধারেকাছে কেউ নেই। এবার ওর উচিত হবে পুরো শরীরটাকে টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে আনা।

কিন্তু হায় সব্বোনাশ, ভীষণভাবে চমকে উঠল চুন্নু। পায়ের পাতার নীচে কে যেন কুতকুত করে একটু সুড়সুড়ি দিল। গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল ওর। তবে কি কেউ দেখে ফেলল নাকি রে বাবা ! আজ না জানি গর্দানই যায় ওর। পড়িমরি করে পুরো দেহটাকেই ও টেনে ডোবার ধারে বার করে আনল।

বার করে আনল বটে, কিন্তু কেউ নেই তো। শুনশান, ফাঁকা। কীরকম হল ! পায়ের পাতায় যে কেউ সুড়সুড়ি দিয়েছে তাতেও ভুল নেই। তবে কি কেউ সুড়সুড়ি দিয়েই কোনও ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল !

চারপাশে তন্নতন্ন করে দেখল চুন্নু। নাহ্, কেউ নেই। তা ছাড়া কেউ যদি ওকে সিঁধ কেটে ঘরের ভেতর ঢুকতেই দেখবে তো সুড়সুড়ি দেবে কেন ! পা দুটো তো সবার আগে সে জাপটে ধরবে, তারপর দড়ি-ফড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলবে। বেঁধে টানতে-টানতে ওকে বাড়ির বাইরে বার করে ধোলাই দিতে শুরু করবে।

তা হলে কি মনের ভুল ? চারপাশে আবার আঁতিপাতি করে তাকিয়ে নেয় চুন্নু। মানুষজন তো দূরের কথা, শেয়াল-কুকুরও নেই।

মনের ভুলই তা হলে। যাক বাবা, ধরা যে পড়িনি, এই ভাগ্যি ভাল।

তারপর আরও খানিকক্ষণ ওখানেই গুম হয়ে বসে থেকে ভাবল, ধুত ছাই, চুরি করতে এসে অত ভয় পেলে চলে কখনও ! তার চেয়ে বরং একটা কাজ করি, প্রথমে পা দুটো ঢোকাই। পরে ধীরে-ধীরে পেট, বুক, গলা। সবার শেষে মাথা। কোনও লোক যদি এবার সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য এগোয়, তা হলে তো দেখাই যাবে। তখন ঝটপট পালিয়ে যেতেও সময় লাগবে না।

চুন্নু শেষটায় তাই করল। সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এবার প্রথমে পা দুটো ঢুকিয়ে দিল। তারপর হেঁচড়ে-হেঁচড়ে পেটটাও। আর ওদিকে চোখও পেতে রেখেছে ডোবার দিকে, কেউ যদি এগোয়, ঠিক দেখা যাবে।

খুব সতর্কভাবে শরীরটাকে আরও একটু ঠেলে ভেতরে ঢোকায় চুন্নু। বুক অবধি ঢুকে গেল। এবার গলা আর মাথাটা আর একটু ঠেললেই ঘরের ভেতর পুরোপুরি ঢুকে যেতে পারে ও।

কিন্তু ঠিক এই সময়ই আবার সেই অদ্ভুত কাণ্ড। ওর পা এখন ঘরের ভেতর। সেখানেও কুতুকুতু করে সুড়সুড়ি। আবার ওর গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। সব্বোনাশ, এবার বুঝি আর শেষরক্ষা হল না। প্রাণপণে পা দুটো ও টেনে পাঁকাল মাছের মতো শরীরটাকে সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে বাইরে বার করে এনে হাঁপাতে লাগল।

তবে কি ঘরের ভেতর জেগে বসে কেউ ওকে ঢুকতে দেখেছে ! মহা গোলকধাঁধাতেই পড়ে গেল ও। কিন্তু একটা কথা ওর কিছুতেই মাথায় আসছে না, ঘরে চোর ঢুকছে দেখতে পেয়েও ওর পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেবে কেন ! এ আবার কীরকম ব্যাপার ! তবে কি এটা অন্য কিছু ! হতেও পারে, লক্ষণটা ওর মোটেই ভাল লাগছে না।

কিন্তু এত কষ্ট করে ও সিঁধ কাটল ; এখন ঘরের ভেতর একবার না ঢুকে চলে যাওয়াটা কি উচিত হবে ? ওর বউ তো আজ বলবে, "তুমি কেমন লোক গো, সিঁধ কাটলে অথচ ঘরে না ঢুকেই চলে এলে ! এখন তো ঘরে এক কণাও চাল নেই, খাবে কী শুনি ?"

চোরের সংসার মানেই অভাবের সংসার। কত আশা করে যে এ গ্রামে ও চুরি করতে এসেছে, কিন্তু এখন দেখছি বৃথাই আসা, খালি হাতেই না-জানি আজ

ফিরতে হয়। এর চেয়ে তো দেখছি ওর নিজের গাঁ-ই ভাল ছিল। ঘটি-বাটি টুকটাক যা-ই পাক, সংসার তো ওদের চলে যাচ্ছিল। এখানে বেশি লোভ করতে এসে না জানি আজ বেঘোরেই প্রাণ যায়। এর চেয়ে বাড়িতে বসে না খেতে পেয়ে মরাও যেন ভাল।

কিন্তু ওর বউটা কি এসব শুনবে? বাড়িতে ঢুকলেই তো হাত পাতবে, "দেখি, আজ কী পেলে? ও মা, কিছুই আনোনি।"

বউকে ভীষণ ভয় পায় চুন্নু। এক ধরনের ঝগড়াটে মেয়ে আছে না, ওর বউ হচ্ছে তাই। কথায়-কথায় বঁটি নিয়ে তেড়ে এসে ওকে গলা কাটার ভয় দেখায়। আর আজ তো ভয়ফয় দেখানো নয়, কচাত করে গলাটাই কেটে ফেলবে ওর।

ফলে চুন্নু যে পালিয়ে আবার গাঁয়ে ফিরে যাবে তারও উপায় নেই। যা থাকে কপালে, মরতে তো একদিন হবেই, তা বউয়ের হাতেই মরি কি গৃহস্থের হাতেই মরি।

চুন্নু ঠিক করে ফেলল, সিঁধ যখন কাটাই হয়ে গেছে, তখন ও ভেতরে ঢুকে একবার দেখবেই। ট্যাঁক থেকে আবার তেলের শিশিটা বার করে দেখল, শিশির তলায় এখনও একটু তেল রয়েছে। এটুকু তেলই বা রাখি কেন! গায়ে ঢেলে মেখে নিল। তারপর কপালে দু'বার হাত ঠেকিয়ে ঠাকুর নমস্কার করে সুড়ঙ্গের মধ্যে মাথা গলাল। গলিয়ে এবার আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা নয়, সুড়ুত করে পাঁকাল মাছের মতো দেহটাকে পুরোপুরি ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল।

ঢুকে একপাশে কিছুক্ষণ ভূতের মতো বসে রইল। অনেক সময় ঘরে কোনও লোক থাকলে সেটা বোঝা যায় নাক ডাকার শব্দে। কিন্তু এ ঘরে সেসব কোনও শব্দ নেই। ফলে বোঝার উপায় নেই ঘরে কেউ আছে কি না। আর থাকলে সে কোথায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে কে জানে!

একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ঘরের ভেতরটা একবার দেখে নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কোমরে দেশলাই থাকলেও জ্বালাতে সাহস হল না। তার চেয়ে বরং অন্ধকারেই একটু হাতড়ে-হাতড়ে দেখা যাক।

বসে-বসেই পা টেনে-টেনে একটু এগোতে থাকে চুন্নু। ঘরের দেওয়ালের দিকে পিঠ। দেওয়ালটাই যেন ওর নিশানা। কেউ যদি টেরও পেয়ে যায়, এই দেওয়াল ধরেই পিছিয়ে গিয়ে ও সুড়ঙ্গ দিয়ে পালাবে।

আরও একটু এগোয় ও। আর ঠিক তখনই হাতে লেগে একটা ঘটিই বোধ হয় পড়ে গেল। পড়বি তো পড় নীচে এমন কিছু একটার ওপর পড়ল যে ঝনাত করে শব্দ হল।

ব্যস, কাঠ হয়ে বসে রইল চুন্নু। আর সঙ্গে-সঙ্গে ওপাশ থেকে একটা বুড়ির গলা ভেসে এল, "কে রে, শ্রীপদ এলি বাবা? আমি বুড়ি একা-একা এ-ঘর আর কত সামলাব বল দেখি!"

চুন্নু ঘামতে শুরু করে। কিন্তু বুঝতে পারে ঘরের ভেতর একমাত্র এই বুড়িটাই রয়েছে। শ্রীপদ বলে যার কথা বলল, ও বোধ হয় ওর ছেলে। যাক বাবা, একদিক থেকে ভালই হল, ঘরে কোনও লোক নেই যে ওর মাথায় ডাণ্ডা মারবে।

"কী রে শ্রীপদ, কী হয়েছে তোর, কথা বলছিস না যে! তোর প্রাণে কি এতটুকু মায়াদয়াও নেই রে! আমি বুড়ি, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না, কবে এসে দেখবি মরেই পড়ে আছি বিছানায়।"

চুন্নু ততক্ষণে পড়ে যাওয়া ঘটিটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে একপাশে সরিয়ে রেখেছে। আর কিছু না পাওয়া যাক, এটা নিয়েই পালানো যাবে।

ওদিকে বুড়িটা তখনও বকেই চলেছে, "ঘরে আলোটা জ্বেলে নে না বাবা। অন্ধকারে কি খুটুরখাটুর করছিস? আমার ছাই চোখ দুটো একেবারেই গেছে রে শ্রীপদ। এখন কত রাত হয়েছে বল তো? দিনের বেলাই আজকাল চোখে দেখি না, আর এই রাত্রিবেলা আমি তো অন্ধ রে ছেলে।"

কথা শুনে চুন্নুর বেশ সাহস বাড়ল। ভাবল, ঘরে তো এই অন্ধ বুড়ি ছাড়া কেউ নেই, দেশলাইটা একবার জ্বালিয়েই দেখি না।

ট্যাঁক থেকে দেশলাই বার করে ফস করে জ্বালায় চুন্নু। তারপর এক পলকে ঘরের হালচালটা বুঝে ফেলে। ওদিকে ছোট্ট একটা চৌকিতে হোগলার ওপর একটা বিছানা পাতা, তার ওপর আপাদমস্তক কাঁথামুড়ি দিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। নির্ঘাত বুড়িটাই। এমনভাবে শরীরটাকে ঢেকে রেখেছে যে মুখটাও দেখার উপায় নেই। না দেখা যাক, সেটাই ভাল।

হাতের কাঠিটা নিভে যেতেই সেটাকে ফেলে দিল চুন্নু।

"হ্যাঁ রে শ্রীপদ, হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়েছিস তো? হ্যারিকেনে আবার তেল আছে কি না কে জানে! তুই তো আর ঘরের দিকে নজরই রাখিস না। আমি একটা তিনকাল খোয়ানো বুড়ি, বেঁচে রইলাম কি মরে গেলাম, খবরও নিস না। সবাই মাকে কত যত্ন করে, অথচ তুই ..."

চুন্নু ভাবল, হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে ফেললেই হয়। আলো জ্বালিয়ে ঘরের ভেতরটা ভাল করে দেখে বেছে-বেছে জিনিসপত্র নেওয়া যাবে। চুরি করতে এসে এমন সুযোগ ওর জীবনে কোনওদিনই আসেনি। ভগবান আজ এমনভাবে যে ওর দিকে মুখ তুলে তাকাবেন, ও ভাবতেই পারেনি।

"কী রে, আলোটা জ্বালালি বাবা?"

চুন্নু ছোট্ট করে উত্তর করল, "হুঁ।"

বলেই দেশলাই জ্বালিয়ে ও হ্যারিকেন জ্বালাল। তবে কলটাকে ঘুরিয়ে আলোটাকে যতখানি পারল কমিয়ে রাখল। বাইরে থেকে যাতে কেউ টের না পায়।

"তুই আজ সেই কোন সকালে বেরিয়েছিস বল তো! সারাদিন বুঝি কিচ্ছু খাসনি! আমি কি ছাই এই বয়সে অত রাঁধতে পারি। তবু দ্যাখ তো, ঝুড়ি চাপা দিয়ে তোর জন্য ভাত, ডাল আর বেগুন পোড়া রেখেছি। এখন কষ্ট করে তাই খেয়ে নে বাবা। কাল একটু ভাল দেখে মাছ আনিস তো, কতকাল আগে মাছ খেয়েছি, মনেই পড়ে না।"

চুন্নুর সাহস বলিহারি, ফস করে বলে বসল, "আনব।" বলে দেখল, বুড়ির চৌকির কাছে একটা ঝুড়ি উলটো করে চাপা দেওয়া। তা হলে বোধ হয় ওর নীচেই ভাত-টাত রয়েছে। ভালই হল, চুন্নুরও আজ সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। রাতে চুরি করে যা পাবে, তাই বিক্রি করে তবে চাল কিনবে। তারপর ওর খাওয়া।

চুন্নুর মনে পড়ল, ওদের বাড়িতেও অনেকদিন মাছ ঢোকেনি। পয়সা কোথায় যে মাছ কিনবে! চুন্নুর বউটাও বেশ কিছুদিন ধরে ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছিল, "মাছ-মাংসের স্বাদ তো ভুলেই গেলাম গো! কেবল আলু সেদ্ধ আর ভাত খেতে-খেতে পেটে যে চড়া পড়ে গেল।"

"ও শ্রীপদ, ভাতটা খেয়ে নে বাপ।" বুড়ির গলা।

চুন্নু এগিয়ে গিয়ে ঝুড়িটা তুলে ফেলল। দেখল, থালায় সাজানো রয়েছে ভাত, বাটিতে ডাল আর একপাশে তেল, নুন আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাখা বেগুন পোড়া। জিভে জল এসে গেল ওর। বলল, "হুঁ।"

বলেই আর দেরি করা নয়, খেতে বসে গেল। গপাগপ করে তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠতে হবে। বলা তো যায় না, বুড়ির ছেলে শ্রীপদ যদি এ সময় ফিরে আসে তা হলেই বিপদ।

ঘুরে ওপাশের দরজার দিকে একবার তাকায় চুন্নু। দরজায় খিল তোলা রয়েছে। শ্রীপদকে ঘরে ঢুকতে হলে দরজায় ধাক্কা দিতে হবে। আর ততক্ষণে পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সময় পেয়ে যাবে ও। পালাবার সময় অবশ্য এই থালা, বাটি আর ওপাশে যে ঘটিটা রয়েছে সেটাও নিয়ে পালাবে।

গপাগপ করে ভাত খেতে থাকে চুন্নু। খেতে-খেতে হঠাৎ মনে হল, ঘটি, বাটি, থালা ছাড়াও ওই যে ওদিকে টিনের বাক্সটা রয়েছে ওর মধ্যে কিছু টাকা-পয়সা থাকলেও থাকতে পারে। চাই কি, বুড়ির দুটো-একটা গয়না যদি থাকে তো কথাই নেই। এক মাস দু' মাস আর চুরি করতে না বেরোলেও ওর চলবে। এখন এককণা সোনা পাওয়া মানেই ওর পক্ষে যেন লটারি পাওয়া।

"হ্যাঁ বাবা শ্রীপদ, খাচ্ছিস তো ? সেই কোন সকালে রান্না করে রেখেছি, ভাতগুলো নিশ্চয়ই শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে রয়েছে, তাই না ?"

চুন্নু হাত চাটতে-চাটতে বলল, "না।"

বেশি কথা তো ওর পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কেবল দুটো-একটা শব্দ করেই ও কাজ সারছিল।বেশি কথা বললে হয়তো বুড়ি বুঝে যাবে, ও শ্রীপদ নয়। আর তা হলেই বিপদ। এই বুড়িও "চোর চোর" করে চেঁচিয়ে পাড়া জাগিয়ে তুলতে পারে। কে বাবা সাধ করে বিপদ ডাকে !

আপাদমস্তক ঢাকা বুড়িটার দিকে একটু তাকায় চুন্নু। মনে হল, বুড়িটা যেন একটু নড়ে উঠেছে। এই সেরেছে, কাঁথার ভেতর থেকে মুখটা বার করবে নাকি এবার। অন্ধ হোক আর যাই হোক, ব্যাপারটা তা হলে মোটেই ভাল হবে না। চুন্নুর বুকের ভেতরটা কেমন যেন একটু কেঁপে উঠল।

কিন্তু না, বুড়িটা আবার স্থির। যাক বাবা, বাঁচা গেল। ভাতের থালাটা ততক্ষণে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চেটেপুটে সবটুকু খেয়ে থালা আর বাটিটা তুলে এনে ঘটির পাশে রাখল চুন্নু। আর কিছু না জুটুক, এই তিনটে জিনিস নিয়ে পালাতে পারলেই ও সাতদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

"হ্যাঁ রে শ্রীপদ, শুনছিস ?"

চুন্নু উত্তর করল, "হুঁ।"

"তোর বউটা সেই যে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে রইল, কবে ফিরবে বল তো ? ঘরের বউ যদি ঘরে না থাকে, তা হলে ভাল লাগে, তুইই বল ?"

চুন্নু বুঝল, শ্রীপদর বউ এখানে থাকে না। বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে। এটা খুবই অন্যায়। বুড়িটাকে সত্যিই তো কে দেখাশোনা করে !

"কী রে, কথা বলছিস না যে ? বউটাকে এবার নিয়ে আয়।"

চুন্নু বলল, "হুঁ।"

"হুঁ কী ?"

"আনব।"

"হ্যাঁ বাবা, নিয়ে আয়। আমি এই অন্ধ বুড়ি, আর পারি না রে। এখন চোখ বুজলেই আমি বাঁচি। তবে মরার আগে যদি একটু ছেলের বউয়ের আদর পেতাম !"

চুন্নু আর হুঁ-হাঁ করে না। ওপাশের টিনের বাক্সটা খুলে না দেখা পর্যন্ত যেন ওর স্বস্তি নেই। পা টিপে-টিপে ও বাক্সটার কাছে এগিয়ে আসে। এসে দেখে, হায় কপাল, এ যে তালাবন্ধ। তালা ভাঙা কি সোজা কথা নাকি ! তা ছাড়া তালা ভাঙতে হলে যে শব্দ হবে তাতে বুড়ি নির্ঘাত সন্দেহ করবে।

কী যে করবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না চুন্নু। বাক্সের তালায় একটু হাত দেয়। আর এ-সময় আবার বুড়ির গলা, "তা ছাড়া শ্রীপদ, তোর বউয়ের গয়নাগুলো সব এ-ঘরেই বাক্সের মধ্যে রয়েছে, কবে যে চোর এসে ওগুলো নিয়ে পালাবে, ভাবতেই আমার গা কাঁপে রে। চাবিটা দ্যাখ তো, বাক্সের নীচেই রেখেছি কি না ! আমার আবার যা ভুলো মন।"

বাক্সের নীচে চাবি ! কী কপাল, চুন্নু ভাবতেই পারে না আজ কার মুখ দেখে ও চুরি করতে বেরিয়েছে।

বাক্সটা তুলতেই ও চাবিটা পেয়ে গেল।

"কী রে, চাবিটা আছে তো ?"

চুন্নু বলল, "হুঁ।"

"যাক বাবা, বাঁচা গেল। আমি আর ক' দিন।তোদের জিনিস তোরাই তো ভোগ করবি।"

চুন্নু আর দেরি না করে বাক্সটা খুলে ফেলল। খুলে দেখতে পেল একগাদা জামা-কাপড়, শাড়ি-ব্লাউজ। আর তার নীচের দিকে কাপড়ের ছোট্ট একটা পুঁটলিতে কিছু গয়না। কানের দুল, চুড়ি, হার। মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো ব্যাপার।

সঙ্গে-সঙ্গে কাপড়ের পুঁটলিটা তুলে নিয়ে ও তালা বন্ধ করল। ঘটি-বাটিগুলো আর নেওয়ার দরকার হবে না। গয়নাই যখন পাওয়া গেছে তখন আর ওগুলো কে নেয় !

চুন্নু খুশিতে আটখান হয়ে বলে বসল, "মা, অনেক রাত তো হল, এবার তুমি ঘুমোও।"

"তুই শুবি না ?"

"শোব তো।"

"শোবার আগে একটু কাজ করে দিবি বাবা। আমার মাথাটা একটু টিপে দিবি ? সেই থেকে বড্ড মাথা ধরে রয়েছে রে। কিছুতেই ঘুম আসছে না।"

চুন্নুর কেমন মায়া হল। বেচারা বুড়ির অনেক কষ্ট, দিই না একটু মাথা টিপে। ভোর হতে তো এখনও অনেক বাকি। তা ছাড়া শ্রীপদর বউয়ের গয়নাগুলো যখন পাওয়াই গেছে, না হয় একটু কষ্টই করি।

গয়নার পুঁটলিটা বাক্সের ওপর রেখে বুড়ির কাছে এগিয়ে আসে চুন্নু। কাঁথা দিয়ে বুড়ির সারা-শরীর ঢাকা। কোন দিকে যে মাথা আর কোন দিকে পা, কে জানে ! দেখতে হলে গায়ের ওপর থেকে কাঁথাটা একটু সরানো দরকার।

ঠিক আছে, একদিকে এগিয়ে আলতো করে কাঁথাটা একটু ফাঁক করে চুন্নু। ফাঁক করে দেখল, মাথা কোথায়, দুটো পা। শুকনো শরীরের পা, তবে আলতা মাখা।

"আ মর, ওদিকে কী করছিস ? মাথা তো আমার এদিকে রে।"

চুন্নু বুড়ির পা দুটো আবার ঢেকে দিয়ে উলটো দিকে, মানে মাথার দিকে এগিয়ে আসে।

এসে কাঁথাটা ধীরে-ধীরে একটু তুলতেই ভিরমি খাওয়ার মতো ব্যাপার। নিজের চোখকেই ও বিশ্বাস করতে পারছে না, এদিকেও যে একজোড়া পা। বুড়ির পা। শুকনো কাঠি-কাঠি, আলতা মাখা।

চুন্নু চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল। কান ভোঁ-ভোঁ, পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। চুন্নু গোঁ-গোঁ করে ককিয়ে উঠল, "ভূ-ভূ-ভূ ..."

তারপর এক লাফে দরজার খিল খুলে বাইরে বেরিয়েই দে ছুট।

ছুটতে-ছুটতে-ছুটতে গাঁ ছাড়িয়ে যখন মাঠের মধ্যে তখন খেয়াল হল, হায় রাম, সোনার পুঁটলিটা তো বাক্সের ওপরই রেখে এসেছে। থালা, ঘটি, বাটি আনার কথা ওর মাথাতেই ছিল না। ফেলে এসেছে সিঁধ কাটার কাঠি আর তেলের শিশিটাও।

চুলোয় যাক ওসব, প্রাণে যে ও বেঁচে গেছে, এই তো যথেষ্ট।

ছবি : অনুপ রায়

শারদীয় শব্দসন্ধান

বাক্‌পতি

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) ভাষা ও চিন্তার অতীত। (৭) এর কথা অমৃতসমান। (১২) হৃদয়ালেখ্য। (১৫) ধাতুবিশেষ। (১৬) অক্ষর। (১৮) সরস মিষ্টি। (১৯) টাকা। (২০) বড় মন্দিরা। (২২) ভূষণ, তিলক। (২৪) লজ্জা। (২৬) মৃণ্ময় জলপাত্র। (২৮) বন্ধুত্ব। (২৯) পৃথিবীবিখ্যাত তিন মরুভূমি। (৩১) গুড়ের তক্তি। (৩২) বামন। (৩৪) অন্য। (৩৬) রন্ধন। (৩৭) অবিরাম। (৪০) প্রাচীন জাতিবিশেষ। (৪২) এ থেকে চুন খসলেই ত্রুটি। (৪৪) সম্মানিত। (৪৬) তেজস্বী। (৪৭) ডাঙ্গশ। (৪৮) সুসজ্জিত শিবিকা। (৪৯) তামাটে। (৫০) সমন। (৫১) লক্ষ্মী। (৫৩) লজ্জিত। (৫৫) পূর্ণিমা। (৫৬) তন্ত্রসিদ্ধ। (৫৮) বায়ুহীন। (৫৯) পরিমাণ বোঝায়। (৬১) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। (৬২) কথাসাহিত্যিক। (৬৩) গঙ্গার বাহন। (৬৬) ভূমি। (৬৭) মাখন। (৬৮) "ওরে বকুল, পারুল, ওরে—এর বন"। (৭০) তিনের সমষ্টি। (৭১) লাল তাস। (৭৪) স্বনামখ্যাত সাপুড়ে। (৭৬) শব্দ। (৭৭) ফলদায়ক। (৭৮) "আনো মৃদঙ্গ—মুরলী মধুরা"। (৭৯) রানা প্রতাপের ঘোড়া। (৮০) জলমগ্ন স্থান। (৮১) পারদর্শী। (৮৩) নীল বর্ণ। (৮৫) মুহূর্ত। (৮৮) দেবালয়। (৯০) মানসিক। (৯১) কলধ্বনি। (৯২) লাঙল। (৯৩) ঘটনা, দুর্ঘটনা। (৯৪) ইকা-প্রত্যয় যোগে চুল! (৯৫) গঙ্গার অষ্টপুত্র। (৯৭) অন্য দেশ। (৯৯) মুসলমান রাজা। (১০২) অন্ধ অনুকরণ। (১০৪) মক্কা ফেরত। (১০৬) পর্যঙ্ক। (১০৯) সাজা পান। (১১০) জাহাঙ্গিরের বেগম। (১১২) বিত্তবান। (১১৩) মোনালিসা-স্রষ্টা, অনেকে ওকার দিয়েও লেখেন। (১১৬) বিনা। (১১৮) ঝাল কন্দ। (১১৯) উলটোলেই কাত। (১২০) ঘর। (১২২) ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কামান। (১২৪) অসমতল। (১২৫) হাত। (১২৬) প্রদীপ। (১২৭) অগোচর। (১২৮) কৃত্রিম।

সঙ্কেত : উপর-নীচ : (১) অসাধারণ। (২) শোভা। (৩) ভবন। (৪) মানুষ। (৫) সিদ্ধি। (৬) চূড়ান্ত। (৮) পরাজয়। (৯) সংস্কৃত নাট্যকার। (১০) নারায়ণ। (১১) নিম্নদেশ। (১৩) প্রাচীন ভারতের দার্শনিক। (১৪) "পিনাকেতে লাগে—"। (১৭) ইন্দ্র। (২১) মান্যগণ্য ব্যক্তি। (২৩) কমনীয়তা। (২৫) তরল ধাতু। (২৬) নিষ্পাপ। (২৭) তরলের একক। (৩০) পদ্মের মৃণাল। (৩৩) অপরাধ। (৩৫) নোয়ানো যায় না। (৩৮) "হে—,/প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চিনা।" (৩৯) আশীর্বাদ। (৪০) কালিদাসের কালে ছিলেন, সত্যজিতের কলমে আছেন। (৪১) ওষ্ঠপ্রান্ত। (৪২) আঙুলের লড়াই যার জোরে। (৪৩) রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত রূপক-গল্প। (৪৪) ইন্দ্রের সারথি। (৪৫) ইন্দিবর। (৪৮) বিস্ময়কর। (৪৯) মগের মুলুক। (৫১) তারযন্ত্রবিশেষ। (৫২) কিস্তি—। (৫৪) মালপত্তর। (৫৬) রাজা রায়চৌধুরী। (৫৭) কিন্নারা। (৫৯) শত্রুঘ্ন। (৬০) পুত্র। (৬৪) তৃতীয় পাণ্ডব। (৬৫) মনসার গান। (৬৮) পাগড়িবিশেষ। (৬৯) বিখ্যাত ফকির। (৭২) চন্দ্র। (৭৩) মল্লিকাজাতীয় ফুল। (৭৪) এই কল গাছের গায়ে। (৭৫) পঞ্জাবি খানার উপাদান। (৭৯) চেতনা। (৮২) ঘা। (৮৪) সরু ও লম্বা। (৮৬) ঘোড়া। (৮৭) পাহাড়ি জনপদ। (৮৮) শরীর। (৮৯) পশম। (৯০) তাঁতযন্ত্র। (৯৫) খুব। (৯৬) সুরচিত। (৯৭) ব্রাহ্মণ। (৯৮) দেবভৃত্য। (৯৯) ননী। (১০০) পিতা। (১০১) পুস্তক। (১০২) পৌঁছনোর জায়গা। (১০৩) তিন লেখকের এক। (১০৪) বিলাপ। (১০৫) অপদেবতা। (১০৬) ধরিলে তো ধরা দেবে না। (১০৭) কলঙ্ক। (১০৮) তালিকা। (১১১) বুদ্ধদেবের পূর্বজীবনবৃত্তান্ত। (১১৪) ভাত। (১১৫) অবন ঠাকুরের কলমে ঋষিবালক। (১১৭) শর। (১১৮) সখা। (১২০) বিখ্যাত মসজিদ। (১২১) বুদ্ধি। (১২২) পাগড়ি। (১২৩) নিশানা।

১	২		৩	৪	৫		৬		■	৭	৮	৯	১০	১১	■	১২		১৩	১৪
১৫		■	১৬			■		■	১৭	■	১৮					■	■	১৯	
২০		২১		■	২২	২৩		■	২৪	২৫	■	■		■	■	২৬	২৭		
	■		■	২৮			■	২৯				৩০			■	৩১			■
৩২			৩৩	■	■		■	■	■	■	■		■	■	৩৪			■	৩৫
	■	৩৬			■	■	৩৭	৩৮	৩৯			■	৪০	৪১	■	■	■	৪২	
■	৪৩	■		■	৪৪	৪৫	■	৪৬		■	■	৪৭			■	■	৪৮		
৪৯			■	■	৫০				■	৫১	৫২	■	■	■	৫৩	৫৪		■	
৫৫		■	৫৬	৫৭			■	■	৫৮			■	৫৯	৬০	■	৬১			
৬২					■	৬৩	৬৪	৬৫	■		■	৬৬			■		■	■	■
৬৭		■		■	৬৮					■	৬৯	■	৭০		■	৭১	৭২		৭৩
■	■	৭৪		৭৫		■	৭৬		■	৭৭				■	৭৮			■	
৭৯			■	৮০		■		■	■	■		■	৮১	৮২	■	■	৮৩	৮৪	
	■	৮৫	৮৬		■	৮৭	■	৮৮	৮৯		■	৯০			■	■	৯১		
	■	■		■	■		■	৯২		■	৯৩		■	■	■	৯৪			
■	৯৫	৯৬	■	৯৭	৯৮		■	■	■	■	■	■	৯৯	১০০	১০১	■	■		■
১০২			১০৩				■	১০৪	১০৫	■	■	১০৬				১০৭	■	■	১০৮
	■	১০৯		■	১১০		১১১			■	■	১১২		■	■	১১৩	১১৪	১১৫	
১১৬	১১৭		■	১১৮		■	১১৯		■	১২০	১২১		■	১২২	১২৩				■
■		■	১২৪			■	১২৫		■	১২৬		■	১২৭			■	১২৮		

সমাধান ৪৫৮ পৃষ্ঠায়

যে-নামেই ডাকো, ধাঁধা ধাঁধাই

সত্যসন্ধ

খেলা যখন

চারটে পোড়া দেশলাইকাঠি ও একটি সিকি দিয়ে একটা দুর্দান্ত মজার খেলা খেলবে ? বেশ, এসো তা হলে।

পাশের ছবিতে ঠিক যেভাবে কাঠি সাজানো রয়েছে, সেইভাবে চারটে কাঠিকে সাজাও। অনেকটা শরবতের গ্লাসের মতো দেখতে, তাই না ? তো, এই গ্লাসের মধ্যে রাখো সিকিটিকে।

এবার কী করতে হবে শোনো। দুটো কাঠি—হ্যাঁ, মাত্রই দুটো কাঠির অবস্থান বদলে দিয়ে পয়সাটাকে বের করে আনতে হবে গ্লাস থেকে। পারবে ?

গ্লাস যদি কাত হয়ে যায়, কিংবা উলটেই যায়, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। চেহারাটা দেখে যেন গ্লাস বলেই চেনা যায়, সেটুকু শুধু খেয়াল রেখো। তা
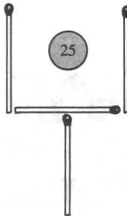
ছাড়া, গ্লাসে যদি পয়সা থাকে সত্যি, হয় কাত নয় উলটো করতে হবে গ্লাসটা। পয়সা কি তা না হলে বেরোবে ? নাও। শুরু করো তা হলে।

চিঁড়েতন হরতন ইস্কাবন

হ্যাঁ, তাসের দেশ থেকেই তিনটে তাস এনে উলটো করে রাখা হয়েছে টেবিলের ওপর। তবে, এগুলো না চিঁড়েতন, না হরতন, না ইস্কাবন। তা হলে ?

তা হলে যে কী এবং কত-কত তা তোমরাই বের করো না বাপু। আমি না হয় কিছু সূত্র দিচ্ছি তোমাদের।

১। ক ও খ এর মোট মূল্য হল ১৫।

২। খ ও গ এর মোট মূল্য হল ১৭।

৩। এমন একটি তাসও নেই যার ফোঁটা হল ৭।

৪। ৯ ফোঁটার বেশি মূল্যের তাসই নেই টেবিলে।

এবার বলো তো, তাসগুলোকে সোজা করে বিছিয়ে দিলে পর-পর কোন তিনটে তাস দেখতে পাব ?
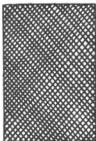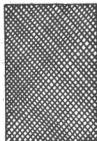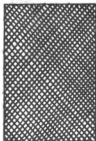
দুর্গরহস্য

শহরতলিতে একটা দুর্গের মতো বাড়ি। সেই বাড়িতে থাকেন এক বিখ্যাত শিল্পসংগ্রাহক, শ্রীযুক্ত আচার্য।

হরেক জিনিস তাঁর সংগ্রহে। পুরনো ছবি, মুদ্রা, মূর্তি, কাঁথা, পুতুল, ঘড়ি—কী নেই। এসব জিনিস থাকে আলাদা পাঁচখানা ঘরে।

অফিসঘরের কাচের আলমারিতেও রয়েছে কিছু টুকিটাকি শিল্পদ্রব্য। এগুলো বিক্রির নয়, তেমন দামিও কিছু নয়।

সেদিন ছিল শনিবার। বহু টাকা দামে দুর্লভ কয়েকটি পিতলের দেবদেবী-মূর্তি কিনে আনলেন আচার্যমশাই। ছোট্ট মূর্তি সব, কিন্তু দুষ্প্রাপ্য ও দামি। তো, সেদিন এই জিনিসগুলোকে তাড়াহুড়োয় কাচের আলমারিটাতেই পেছন দিকে রেখে চলে গেলেন আচার্যমশাই।

রবিবার সন্ধেবেলা অফিসঘরে ঢুকে আচার্যমশাই অবাক। মূর্তিগুলো সম্পূর্ণ উধাও।

আচার্যমশাই তখনই যোগাযোগ করলেন গোয়েন্দা ব্যোমকেশের সঙ্গে।

সোমবার সকালে অফিসঘরে হাজির হলেন ব্যোমকেশবাবু।

যে-তিনজন কর্মচারীর অফিসঘরে ঢোকার সুযোগ রয়েছে, সেই তিনজন কর্মচারীকে ডেকে পাঠানো হল।

ব্যোমকেশকে অবশ্য গোয়েন্দারূপে পরিচয় করিয়ে দেননি আচার্যমশাই। বিশিষ্ট এক শিল্পরসিক বলে আলাপ করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "এই কাচের আলমারিটায় কিছু দুর্লভ শিল্পনির্দশন রেখেছিলাম শনিবার বিকেলে। আজ দেখছি সেগুলো নেই। তোমাদের কাছে তো অফিসঘরে ঢোকার চাবি থাকে। তোমরা কিছু জানো ?"

তিন কর্মচারীর নাম কমল, অমল আর বিমল।

কমল বলল, "এই আলমারিতে কেউ দামি জিনিস রাখে ? এতদিন কাজ করছি। কখনও তো দেখিনি।"

আচার্যমশাই উত্তরে বললেন, "তাড়াহুড়োয় রাখা। ভুল হয়ে গিয়েছে।"

অমল বলল, "ভুল তো অন্যভাবেও হতে পারে। এই বাড়িতে কত পেতলের মূর্তিই তো আছে। ওসবের মধ্যেই কোথাও মিশে গেছে হয়তো আপনার মূর্তিগুলো।"

বিমল বলল, "আমি সার গত সপ্তাহটা

ছুটিতে ছিলাম। আজই কাজে এসেছি। আমাকে এ-ব্যাপারে কেন ডেকেছেন জানি না।"

কর্মচারী তিনজনকে বিদায় দিয়ে ব্যোমকেশবাবু বললেন, "একজনকে সন্দেহ হচ্ছে।"

কাকে সন্দেহ করতে পারেন গোয়েন্দা ব্যোমকেশ? কেনই-বা? বলতে পারলে বুঝব, তুমিও পাকা গোয়েন্দা।

সত্য বই মিথ্যা নয়

মাস দুই আগে একটা বই বেরিয়েছে। খুবই হইচই ফেলেছে বইটি। একই কলেজে পড়ে পাঁচ বন্ধু। এদের মধ্যে একজনই মাত্র বইটি পড়েছে।

কিন্তু মজার কথা হল, তখন এদের এ-নিয়ে প্রশ্ন করা হল, পাঁচজনই জানাল, বইটি পড়েনি।

পাঁচজনের কাছেই তিনটি করে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। কী ধরনের প্রশ্ন, উত্তর থেকেই আঁচ পাবে। এদের উত্তরগুলো অবিকল তুলে দেওয়া হল। একটা জিনিস পরিষ্কার, প্রত্যেকেরই দুটো উত্তর সত্যি, একটা মিথ্যে। কার কোন দুটো উত্তর সত্যি, আর কোন উত্তরটা মিথ্যে, সেটা তোমাদের বের করতে হবে। তা হলেই বুঝবে, এদের মধ্যে কে বইটি পড়েছে।

দ্যাখো তো, আঁচ করতে পারো কি না!

অলোক: (১) আমি বইটি পড়িনি।
(২) গত তিনমাসে কোনও বই পড়া হয়নি আমার।
(৩) দীপঙ্কর বইটি পড়েছে।

বিমল: (১) আমি বইটি পড়িনি।
(২) বইটির একটা সমালোচনা পড়েছি।
(৩) বইয়ের দোকানে আমি নিয়মিত যাই।

সরিৎ: (১) আমি বইটি পড়িনি।
(২) এ-বইয়ের একটা সমালোচনা পড়েছি।
(৩) অলোক বইটি পড়েছে।

দীপঙ্কর: (১) আমি বইটি পড়িনি।
(২) ইন্দ্রজিৎ বইটি পড়েছে।
(৩) অলোক যে বলেছে বইটি আমার পড়া, সেটা ভুল।

ইন্দ্রজিৎ: (১) আমি বইটি পড়িনি।
(২) বিমল বইটি পড়েছে।
(৩) বইয়ের দোকানে আমি নিয়মিত যাই।

সাতটি তারার তিমির
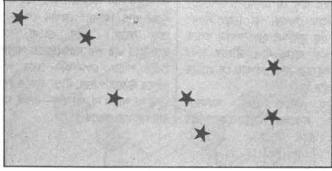
সপ্তর্ষিমণ্ডল যে এক অনন্ত জিজ্ঞাসা-চিহ্ন, সে-কথা ভেবেই সাতটি তারার তিমির বোধ হয় ব্যবহার করেছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশ।

কিন্তু ওপরের ছবিতে যে সাতটি তারা, তা নিয়ে আমরা সেই কখন থেকে যে তিমিরে, সেই তিমিরে।

কেন?

আর বোলো না। তিনটে সরলরেখা এমনভাবে [illegible] হবে যাতে কিনা ওই তারাগুলো প্রত্যেকটা আলাদা-আলাদা খোপে জায়গা পায়। মাত্র তিনটে সরলরেখা।

সহজ কি কঠিন, তোমাদের ওপরেই তা বিচারের ভার রইল। দ্যাখো তো, কী দাঁড়ায়।

অর্জুন, তুমি অর্জুন!

না, এখনই তোমাকে অর্জুন বলছি না। বলব তখনই, যখন নীচের চাঁদমারিটায় তোমার লক্ষ্যভেদ হবে অব্যর্থ।

কীভাবে?

বেশ। হাতে তুলে নাও অদৃশ্য বন্দুক। অনিঃশেষ গুলিভরা বন্দুক।

চাঁদমারিতে দ্যাখো, প্রত্যেক গোলের মধ্যে সংখ্যা বসানো আছে।

সেই সংখ্যা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে যাও। এক ঘরে একবার কেন, যতবার খুশি গুলি ছুঁড়তে পারো। কিন্তু মনে রেখো, সবশেষে যোগফল হওয়া চাই টায়টায় ১০০। কমও নয়, বেশিও নয়। পুরো ১০০।

বলো তো, কতবার গুলি ছুঁড়বে? কোন-কোন ঘরেই-বা ছুঁড়বে?
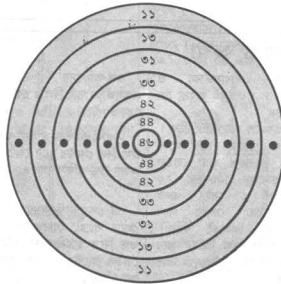
সেরা সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায় যে একালের সবথেকে জনপ্রিয় লেখক, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল হল, কথাটা বলতে গিয়েও বলা যাচ্ছে না। নীচের ছবির অজস্র অক্ষরের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেল কথাটা।

ছবিটায় দ্যাখো তো, সমকালে আমাদের সকলের সবথেকে প্রিয় লেখকের নাম সত্যজিৎ রায়, এই কথাটা খুঁজে পাও কি না। যেখান থেকে খুশি শুরু করো। মনে রেখো, অক্ষর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এর পর ঘরগুলোতে পাশাপশি যেতে পারো, কোনাকুনি যেতে পারো, ওপরে উঠতে পারো, নীচে নামতে পারো, কিন্তু যা পারো না, তা হল—একই ঘর দু' বার ব্যবহার করতে।

স	ম	লে	আ	মা	ক	লে	কে	কা	র	ম	লে	মা
কা	ম	আ	লে	স	র	ৎ	আ	য়	স	না	ৎ	রা
কা	মা	লে	আ	স	ব	ত্য	লে	খ	স	ম	র	আ
আ	লে	প্রি	য়	না	স	ব	সে	রা	কা	লে	রা	য়
ম	না	আ	প্রি	ম	না	ম	রা	সে	ৎ	জি	ত্য	স
লে	আ	দে	মা	দে	র	স	থে	কে	ব	স	কা	লে
ম	র	দে	লে	খ	ক	প্রি	য়	স	ম	কা	র	না
লে	র	সে	রা	ৎ	প্রি	কে	লে	লে	প্রি	কে	য়	না
স	ব	রা	জি	রা	য়	থে	ঘ	ৎ	খ	রা	সে	ম
ব	ক	ত্য	স	ব	ব	না	ক	ম	দে	র	স	লে
থে	স	লে	ত্য	স	লে	কা	ম	স	জি	ত্য	ক	খ
কে	য়	স	র	স	ম	কা	লে	কে	থে	ৎ	ব	ক
য়	প্রি	লে	রা	ক	খ	না	ম	ত্য	স	আ	রা	য়

ছয়ে-ছয়ে ছয়লাপ

ছয়ের নামতা মনে আছে?

আছে! বেশ, তা হলে বলে যাও। আমি লিখে নিচ্ছি। কী বললে? দাঁড়াও, উত্তর লিখি। ৬, ১২, ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৫৪—

না, আর বলার দরকার নেই। ৬ এক্কে ছয় থেকে ৬নং চুয়ান্ন— এই-যে পর-পর সংখ্যাগুলো, ছয়ের নামতায় যা আসছে, তা মনে রেখে সংখ্যাগুলোকে বসিয়ে যাও নীচের জাদুবর্গের ন'টা খোপে। এমনভাবে বসাতে হবে যাতে কিনা লম্বালম্বি, পাশাপাশি, কোনাকুনি যেদিক থেকেই যোগ করা হোক-না, উত্তর সব সময়ই হবে—৯০।

যদি পারো, তুমি পাবে—

না, নব্বই কেন, পুরো একশোয় একশো।

টালি থেকে

নীচের ছবিটি চেনো নিশ্চয়ই। সাধারণ একটা সমকোণী ত্রিভুজ।

এই ত্রিভুজটায় 'ক' বাহুর দ্বিগুণ মাপের বাহু হল 'খ'।

ধরো, এটা একটা টালির মাপ। তো, এইরকম কুড়িটা টালি ইচ্ছেমতো সাজিয়ে একটা নিখুঁত বর্গক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

পারবে?

দেখি, কেমন পারো।

মধু গন্ধে ভরা

দুই ভাই— প্রবাসজীবন ও নিবাসরঞ্জন। দু'জনেরই ব্যবসা হল সেন্ট বা সুগন্ধির।

দুই ভাই একসঙ্গে বাইরে গিয়েছিল। ব্যবসার কাজে। প্রবাসজীবন বিদেশ থেকে নিয়ে ফিরছিল ৬৪ বোতল সেন্ট। নিবাসরঞ্জন কিনেছিল ২০ বোতল সেন্ট। সেই একই কোম্পানির। তো, ফেরার পথে শুল্ক-অফিস দুই ভাইকেই ধরল। বোতল-পিছু প্রদেয় শুল্ক মিটিয়ে তবে দেশে ফিরতে পারবে। দু'জনেরই নগদ টাকা কম ছিল।

শুল্ক-অফিসের হিসাবমতো প্রবাসজীবন তাই দিল ৫ বোতল সেন্ট ও নগদ ৪০ টাকা।

নিবাসরঞ্জন শুল্ক-অফিসে শুল্ক হিসেবে জমা দিল সেন্টের দুটো বোতল। তাকে অবশ্য শুল্ক-অফিস নগদ ৪০ টাকা ফেরত দিল।

এই লেনদেন ভালভাবে খতিয়ে দেখে বলতে পারো, বোতল-পিছু কত টাকা শুল্ক দিতে হয়েছিল দুই ভাইকে? এক বোতল সেন্টের দামই বা টাকার হিসাবে কত দাঁড়াচ্ছে?

কিস্তিমাত

ছকটা দাবার, কিন্তু কিস্তি অন্যভাবে মাত হবে।

এ-খেলায় রয়েছে ষোলোটা গোল ঘুঁটি।

ঘুঁটিগুলোকে এই খোপের মধ্যে এমনভাবে বসিয়ে দিতে হবে যাতে কিনা আড়াআড়ি, লম্বালম্বি বা কোনাকুনি—যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, এক সারিতে দুটোর বেশি ঘুঁটি দেখা যাবে না।

দুটো ঘুঁটি বসানো রইল।

বাকি চোদ্দটি ঘুঁটি হিসাব করে বসিয়ে দাও তো বাপু।
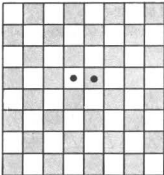
গুণ চাই গোনাতেও

রুইতনের ছবিতে ভর্তি এই-যে ত্রিভুজ, এর মধ্যে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ক'টা রুইতন রয়েছে, চটপট গুনে ফেলো তো। রুইতন কেমন দেখতে মনে আছে তো ! ঠিক এইরকম—
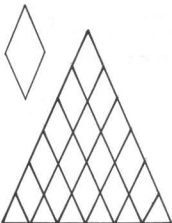
গোল-বাধানো গোল
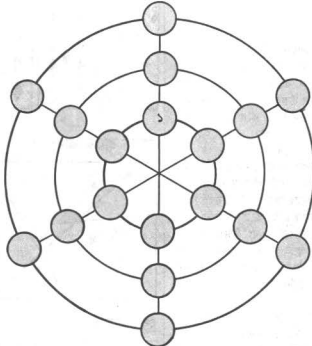
কী গোলই না বাধিয়েছে এই গোলের মধ্যের গোলগুলো।

আঠারোটা ছোট গোলে বসবে ১ থেকে ১৮। ১ অবশ্য বসানো রয়েছে। কিন্তু বাকিগুলো বসাতে হবে। যেমন-ইচ্ছে তেমনভাবে নয়। এমনভাবে, যাতে কিনা প্রতিটি সরলরেখায় অবস্থিত গোলের মধ্যের সংখ্যাগুলোর যোগফল হয় ৫৭। আবার বড় বৃত্ত-তিনটির পরিধির মধ্যে যেসব গোল, তার মধ্যের সংখ্যাগুলো যোগ করলেও প্রতিক্ষেত্রে উত্তর হওয়া চাই সেই ৫৭।

বসাও তো দেখি।

উত্তর

খেলা যখন
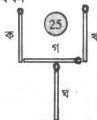
(১) 'গ'-চিহ্নিত কাঠিটাকে ডান দিকে সরিয়ে নাও, 'খ'-এর ঠিক তলায় যেন থাকে কাঠির মধ্যস্থলটা।
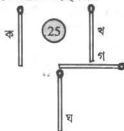
(২) এবার 'ক' চিহ্নিত কাঠিটাকে সরিয়ে এসে বসাও 'গ'-চিহ্নিত কাঠির ডান দিকের শেষ প্রান্তের তলায়, 'ঘ'-এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে। দ্যাখো, পয়সা বেরিয়ে এসেছে। গ্লাস অবশ্য উলটে গেছে, তা যাক। উত্তর তো এখন সোজা। তাই না ?
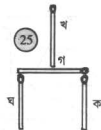
দুর্গরহস্য

আচার্যমশাই কর্মচারীদের সামনে একবারও বলেননি যে, হারিয়ে-যাওয়া শিল্পনিদর্শনগুলো কী ছিল। অথচ অমল

বলল, পিতলের মূর্তির কথা। কী খোয়া গেছে সে জানল কীভাবে ? তাই তাকেই সন্দেহ হয়।

সত্য বই মিথ্যে নয়

ধরা যাক, অলোকের ১ নং উত্তর মিথ্যে। সে বইটি পড়েছে। তা হলে তার ৩ নম্বর উত্তর সত্যি হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকে একটি করে মিথ্যে বলেছে, বলা আছে। তা হলে অলোকের ১ নং উত্তর সত্যি। সে বইটি পড়েনি।

অলোকের ৩ নং উত্তরও যদি সত্যি হয়, দীপঙ্কর বইটি পড়েছে। কিন্তু তা হলে দীপঙ্করের তিন-তিনটি উত্তরই মিথ্যে প্রতিপন্ন হচ্ছে। তা হতে পারে না। তা হলে অলোকের ৩ নং উত্তর সত্যি। মিথ্যে তা হলে দু' নম্বর উত্তর। তিন মাসে সে কোনও বই পড়েনি তা নয়, এ-বইটি পড়েনি কিন্তু অন্য বই পড়েছে নিশ্চয়।

একইভাবে তা হলে দীপঙ্করের ১ ও ৩ উত্তর সত্যি। সুতরাং ২ নং উত্তর, মিথ্যে। বোঝা গেল ইন্দ্রজিৎ বইটি পড়েনি।

ইন্দ্রজিতের প্রথম উত্তরটি সত্যি। ২ ও ৩-এর মধ্যে কোনটি সত্যি আর কোনটি মিথ্যে এখন যাচাই না করলেও চলবে।

সরিৎ-এর ৩ নং উত্তর মিথ্যে। তা হলে ১ ও ২ উত্তর সত্যি। সরিৎ তা হলে বইটি পড়েনি।

অলোক পড়েনি, দীপঙ্কর পড়েনি, ইন্দ্রজিৎ পড়েনি, সরিৎ পড়েনি। তা হলে নিশ্চিত বিমল বইটি পড়েছে। তা হলে বিমলের ১ নং উত্তর মিথ্যে। ২ ও ৩ সত্যি।

ইন্দ্রজিতের ২ নং উত্তর সত্যি। ৩নং মিথ্যে—এখন বোঝা যাচ্ছে।

টালি থেকে

চিড়েতন হরতন ইস্কাবন

সাতটি তারার তিমির

সেরা সত্যজিৎ

স	ম	লে	আ	মা	ক	লে	কে	কা	র	ম	লে	মা
কা	য়	আ	লে	স	র	ৎ	আ	য়	স	না	ৎ	রা
কা	মা	লে	আ	স	ব	ত্য	লে	খ	স	ম	র	আ
আ	লে	প্রি	য়	না	স	ব	সে	রা	কা	লে	রা	য়
ম	না	আ	প্রি	ম	না	ম	রা	সে	ৎ	জি	ত্য	স
লে	আ	নে	মা	লে	র	স	থে	কে	ব	স	কা	লে
ম	র	নে	লে	খ	ক	প্রি	য়	স	ম	কা	র	না
লে	র	সে	রা	ৎ	প্রি	কে	লে	লে	প্রি	কে	য়	না
স	ব	রা	জি	রা	য়	থে	ঘ	ৎ	খ	রা	সে	ম
ব	ক	ত্য	স	ব	র	না	ক	ম	নে	র	স	লে
থে	স	লে	ত্য	স	লে	কা	ম	স	জি	ত্য	ক	খ
কে	য়	স	র	স	ম	কা	লে	কে	থে	ৎ	ব	ক
য়	প্রি	লে	রা	ক	খ	না	ম	ত্য	স	আ	রা	য়

মধু গন্ধে ভরা

৫ বোতল সেন্টের দাম + ৪০ টাকা হল ৬৪ বোতল সেন্টের ওপর শুল্ক। অন্য দিকে ২ বোতল সেন্টের দাম— ৪০ টাকা হল ২০ বোতল সেন্টের ওপর ধার্য শুল্ক। তা হলে ৭ বোতল সেন্টের দাম হল ৮৪ বোতল সেন্টের ওপর শুল্ক। তা হলে ১২ বোতল সেন্টের ওপর যা শুল্ক, তাই হল ১ বোতল সেন্টের দাম।

তা হলে অন্যভাবে বলতে পারি, ৫×১২ বা ৬০ বোতল সেন্টের উপর শুল্ক + ৪০ টাকা হল ৬৪ বোতল সেন্টের ওপর শুল্ক। অর্থাৎ ৪ বোতল সেন্টের ওপর শুল্ক হল ৪০ টাকা। ১ বোতল সেন্টের ওপর শুল্ক তা হলে ১০ টাকা।

অর্থাৎ, ১ বোতল সেন্টের দাম এর বারো গুণ বা ১২০ টাকা।

অর্জুন, তুমি অর্জুন

১৩ লেখা ঘরে ছ'-বার ও ১১ লেখা ঘরে দু'বার। মোট আটবার ছুঁড়লে তবেই শুধু হবে টায়টায় ১০০।

(১৩×৬)+(১১×২)=৭৮+২২=১০০

ছয়ে-ছয়ে ছয়লাপ

৩৬	৪২	১২
৬	৩০	৫৪
৪৮	১৮	২৪

গুণ চাই গোনাতেও

মোট ২০টি রুইতন রয়েছে ছবিটায়। নীচে গুনে-গুনে দেখানো হল।

কিস্তিমাত

গোল-বাধানো গোল
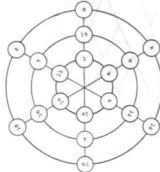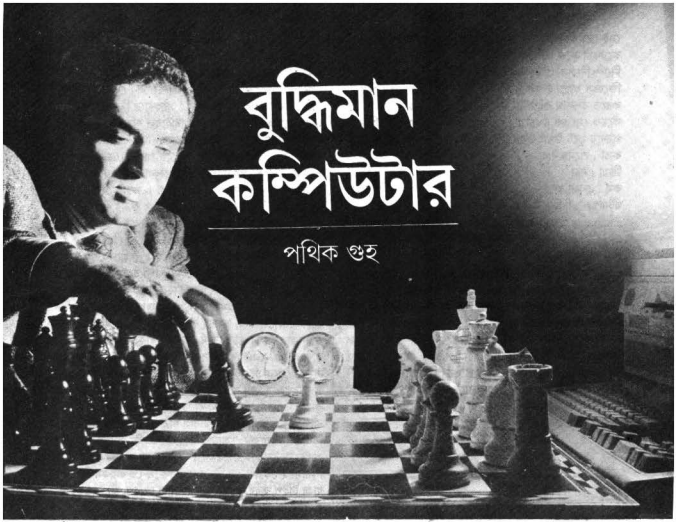
বুদ্ধিমান কম্পিউটার

পথিক গুহ

কম্পিউটারের সঙ্গে দাবা খেলছেন কাসপারভ

বরানগরে বি টি রোডের ধারে পুকুর আর গাছের ছায়ায় ঘেরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে গিয়েছ কি কখনও ? না গেলে, এবার একবার ঘুরে এসো।

ওখানে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন্স বিভাগের ছোট্ট একটা ঘরে প্রবাল সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। দেখবে, ওঁর পারসোনাল কম্পিউটার-এর (পি সি) ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। দিন নেই রাত নেই। বোতাম টিপছেন এটা-সেটা। খুটখাট। একদা শিবপুর বি·ই·কলেজের মাস্টারমশাই প্রবাল সেনগুপ্ত এখন ব্যস্ত একটা কাজে। বলতে পারো ওঁর পি সি-টাকে 'মানুষ' করার প্রতিজ্ঞায়। মানুষ ! অবাক হচ্ছ বুঝি ? ভাবছ সে কেমন গেরো ! যন্তর আবার মানুষ হয় নাকি। কম্পিউটারে যার কাজ কিনা পেল্লায় বড় বড় সব সংখ্যা চিবনো—সে কিনা হবে মানুষ ? কথা কইবে ? গান গাইবে ? সত্যি বটে, ওখানকার কম্পিউটার কবিতা শোনায়, গান গায়। তবে সেটা ওঁর পি সি নয়। ওঁর পাশের ঘরে সতীর্থ গবেষকরা বানিয়েছেন অন্য কম্পিউটার, যার কাজ জীবনানন্দ আবৃত্তি করা কিংবা রবীন্দ্রনাথ গেয়ে শোনানো। সে এক মজার কাণ্ড ! তবে অন্য ব্যাপার। আপাতত ফের প্রবালের গবেষণায় আসি। ওঁর পি সি কথা বলে না, গান গায় না। বরং কথা শোনে। আর, তা বোঝে। মানে বোঝার চেষ্টা করে। সহজ করে বললে, প্রবালের লক্ষ্য যন্ত্রটাকে বুদ্ধিমান করে তোলা। হ্যাঁ, সেই বুদ্ধি, যা জীবের মস্ত বড় হাতিয়ার।

কী বলা যাবে এমন বুদ্ধিকে ? বিজ্ঞানীরা জুতসই একটা নাম বাতলেছেন। আরটিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স। অর্থাৎ, কৃত্রিম বুদ্ধি। সারা পৃথিবী জুড়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানী মহলে এখন ওটাই সবচেয়ে আকর্ষক গবেষণা। এক দৌড়। আরটিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের পেছনে। কম্পিউটার যন্ত্রটাকে মানুষের মতো বুদ্ধিমান করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। আমাদের ঘরের পাশে প্রবালও একজন দৌড়বীর। ছুটছেন ইউরোপ আমেরিকার বিজ্ঞানীদের মতো। ওখানকার বিজ্ঞানীদের মতো ওঁরও স্বপ্ন কম্পিউটারকে বুদ্ধিমান করে তোলা। আমরা জানি, হিসেবকিতেব কম্পিউটারে জলভাত। যেসব অঙ্ক কষতে তোমার-আমার লেগে যাবে এক হপ্তা, কম্পিউটার তা করে ফেলবে এক লহমায়। সেটা যন্ত্রের ব্যুৎপত্তি। কিন্তু অঙ্ক কষা তো আর বুদ্ধির পরিচয় নয়। কোনটা বুদ্ধি আর কোনটা নয় সেটা বুঝতে ফের ঘুরি আমি প্রবালের পি সি রুম থেকে। দেখা যাক।

ইংরেজি কি-বোর্ড টিপে প্রবাল টপাটপ ওঁর পি সি-র ভিডিও টার্মিনালে লিখে ফেললেন এই বাক্যটা—কাল রামের বাবা দিল্লিতে আমাকে একটা বই দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, লেখা অবশ্যই ফুটে উঠল এইভাবে—KAAL RAMER BABA DILLITE AMAKE EKTA BOI DIECHHILEN. সেটা এমন কিছু জটিল ব্যাপার নয়। কি-বোর্ডে বাংলা হরফ

নেই তো কী করা যাবে ! বাক্যটা টাইপ করা শেষ হতেই দ্রুত কয়েকটা নতুন চাবি টিপলেন প্রবাল। বোঝা গেল, নতুন নির্দেশ দিলেন যন্ত্রটাকে। কী যেন জানতে চাইলেন। কী তা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, "বাক্যটার কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম বের করতে বললাম কম্পিউটারকে। দেখুন না পারে কি না !" কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ। তারপর, হঠাৎ একসময় পি সি-র পরদায় ফুটে উঠল উত্তর।

কর্তা : রামের বাবা
ক্রিয়া : দান
কর্ম : একটা বই
ঘটনাস্থল : দিল্লি
... ...
... ...

মনে হল, এ আর এমনকী ব্যাপার ! ছোট্ট একটা বাক্য থেকে বিভিন্ন অংশ বা টুকরো বাছাই। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় সেটা অনুমান করলেন প্রবাল। বললেন, "জানি অবাক হননি। ভাবছেন, সোজা কাজ তো ? ঠিক তাই। ওই একই বাক্য লেখা যাক একটু ঘুরিয়ে। লিখি তা হলে ?" আবার চাবি টেপার টকাটক। এবারের বাক্যটা—দিল্লিতে কাল আমাকে একটা বই দিয়েছিলেন রামের বাবা। লেখা শেষ হতে ফের ঠকঠাক। নির্দেশ। আর প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রের জবাব—কী আশ্চর্য ! একেবারে ঠিক-ঠিক। এবারে আর পারা গেল না বিস্মিত না-হয়ে। কম্পিউটারের পরদায় তখনও ভাসছে—কর্তা : রামের বাবা, ক্রিয়া : দান, কর্ম : একটা বই, ঘটনাস্থল : দিল্লি....। কী করে পারল যন্ত্র ? একই বাক্য, কিন্তু বলা হয়েছে যথেষ্ট ঘুরিয়ে। অথচ তাতে

কলিকাতার বিখ্যাত

বাজারের সেরা ও জনপ্রিয়

শোরুম-১৩১এ, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

পালটায়নি কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম। কিন্তু পালটায়নি যে, সেটা বুঝতে পারা, কিংবা এই ঘুরিয়ে বলা বাক্য থেকে সবকিছুকে ঠিক-ঠিক 'চিনতে' পারা...। আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রবালের মন্তব্য ! "আরে থামুন, থামুন। কী বললেন যেন ? বুঝতে পারা, চিনতে পারা না কী যেন ? একেবারে ঠিক ধরেছেন। ওই বুঝতে পারা আর চিনতে পারাই হল বুদ্ধির লক্ষণ। ওটা একটা বিশেষ ক্ষমতা। আর তা আট-নং – বাহাত্তর কিংবা নয় – উনিশ একশো একাত্তর বলতে পারার চেয়ে আলাদা। ওগুলো হল মুখস্থের ব্যাপার, চিন্তাভাবনা নেই ওর ভেতর। ছোটবেলায় ধারাপাত পড়ে মুখস্থ করা। মনের কোণে সেটা জমিয়ে রাখা। তারপর প্রয়োজনে মনের কুঠরি থেকে বের করা। ওরকম কাজ তো কম্পিউটার দিনরাত করছে। "কীরকম ? একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ট্রেন বা প্লেনের রিজার্ভেশন কাউন্টারে গেছেন নিশ্চয়ই। ওখানে দেখেছেন কম্পিউটারের কাজ। যেমন-যেমন কাটা হচ্ছে টিকিট, সেইভাবেই টুকে রাখছে কম্পিউটার। তারপর যেই একজন এসে খোঁজ নিলেন অমুক তারিখের রাজধানী এক্সপ্রেসের আসন মিলবে কিনা, অমনই কম্পিউটার খুঁজতে থাকে ওদিনকার আসন ভর্তির ফর্দ। ফাঁকা থাকলে 'হ্যাঁ' আর না থাকলে 'না'—এইরকম জবাব আসে তার। ওটা ওই মুখস্থ নামতা থেকে চটপট একটা বলে দেওয়ার মতন। কিন্তু উলটেপালটে বলা বাক্যকে চেনা বা বোঝা বুদ্ধির ব্যাপার। কারণ, তাতে ভাবার বিষয় আছে।"

ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে প্রবাল চলে এলেন ফের পি সি-তে। বললেন, "আমার পরের লক্ষ্য কী জানেন ? যন্ত্রটাকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলা। কীভাবে ? বলছি। খুব শিগগিরই কোনও একদিন আমার পি সি-তে এরকম তিনটে বাক্য টাইপ করব আমি—রামের বাবা দশরথ, স্ত্রী কৈকেয়ীর প্ররোচনায় ছেলেকে বনে যেতে বললেন তিনি। ছেলে মানলেন আদেশ। এর পর পি সি-কে প্রশ্ন করব—রামকে কোথায় পেতে পারি এখন ? বিশ্বাস করবেন কি যে, পি সি-র পরদায় ফুটে উঠবে সঠিক উত্তর—বনে। অথচ কোথাও কিন্তু সরাসরি বলা হয়নি যে, রাম গেছে বনে। বরং বলা হয়েছে অন্যসব কথা। কিন্তু সেইসব কথামালা থেকে কম্পিউটার কীভাবে এগিয়ে যাবে দেখুন। রামের বাবা দশরথ হলে দশরথের ছেলে কে ? না, রাম। অর্থাৎ, কে বাবা হলে কে হবে তার ছেলে। তারপর ছেলেকে দেওয়া হয়েছে আদেশ। ছেলে মেনেছে তা। অর্থাৎ, আদেশ দেওয়া এবং তা মানার অর্থটা কী। কোথায় যাওয়ার আদেশ ? না, বনে। তো, সেই আদেশ মানলে কোথায় থাকতে হয় রামকে ? অবশ্যই বনে। এতগুলো যুক্তি আর তার পুত্র 'চেনা' বা 'বোঝা' চাট্টিখানি কথা নয়। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, একটা শিশুও মন দিয়ে ওই তিনটে বাক্য শুনে বলে দিতে পারে উত্তরটা। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে, উত্তরটা বলতে হলে বুদ্ধি খাটাতে হয়। মানবশিশু হলেও তাকে যুক্তি আর বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয় ব্যাপারটা। তার জন্য দরকার মগজের। মানুষের যেটা আছে। "খবর দেব," বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রবাল, "আশা করছি শিগগিরই আমার পি সি হয়ে উঠবে আরও খানিকটা বুদ্ধিমান। পারবে খানিকটা চিন্তা করতে। তখন আসবেন একদিন।" কথা দিলাম, "যাব।"

এর মধ্যে হাতে এল একটা লেখা। মারভিন মিনস্কি-র। কে ? হ্যাঁ, বলে নিই ওঁর কথা। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এম আই টি)-র অধ্যাপক। কম্পিউটার

কম্পিউটারকে মানুষের মতো বুদ্ধিমান করে তুলতে চান প্রবাল সেনগুপ্ত *ফোটো : তাপসকুমার দে*

সায়েন্সে। এককালে ছাত্রও ছিলেন ওখানেই। এখন জগৎজোড়া নাম। কম্পিউটারকে বুদ্ধিমান করে তোলার কাজে এখন সারা পৃথিবীতে কাজ হচ্ছে যেসব জায়গায়, তার মধ্যে এম.আই.টি অন্যতম। সেই কাজের গুরু হিসাবে মিনস্কি আবার প্রবাদপ্রতিম। আরটিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের প্রবক্তাদের অন্যতম। সারা জীবনের গবেষণা, মানুষের বুদ্ধি যন্ত্রে চালান দেওয়ার কাজে। ওঁর জীবনের একটা ঘটনার কথা লিখেছেন মিনস্কি।

ঘটনাটা এইরকম : সালটা ১৯৫১। আর মিনস্কি এম.আই.টি-র কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র। শখ, তৈরি করবেন বুদ্ধিমান কম্পিউটার। মানুষের মতো যন্ত্র। এখন এই 'মানুষের মতন' ব্যাপারটা কীরকম,তাই নিয়ে তর্ক হয় সতীর্থদের সঙ্গে। অর্থাৎ, বুদ্ধির নিদর্শনটা কী হবে ? জবাবটা উনি পেয়ে গেলেন একদিন। লিখেছেন : বসে ছিলুম একটা ঘরে। পাশে বসে বই পড়ছিল একটা ছোট্ট ছেলে। একটা শব্দ—অবশ্যই নতুন ওর কাছে—পড়তে গিয়ে হোঁচট খেল ছেলেটা। HEDGE। আমায় বলল, হেডগিটা কী জিনিস ? আমি খবরের কাগজ পড়ছিলুম। বললুম, হেডগি ? শুনিনি তো কখনও। বানান করো তো শব্দটা। ও করল H-E-D-G-E। আমি বললুম, 'হেডগি'নয়। ওটা হল 'হেজ', মানে 'বেড়া'। দ্যাখোনি অনেকের বাড়ির সামনে লাইন দিয়ে গাছের ঘেরা আছে এরকম। শুনে ছেলেটা বলল, ওহ্,ওই যেরকম রাস্তার ওপারের বাড়িটায় রয়েছে ? ওহ্, সামান্য একটা শব্দ। কিন্তু বাচ্চাটার মুখে ওই একটা কথা খুলে দিল আমার চোখ। বুঝলুম, ও চিনে নিতে পেরেছে নতুন একটা বস্তুকে। এর পর আর কখনও বিভ্রম হবে না ওর। জিজ্ঞেস করবে না কাউকে হেজ জিনিসটা কী। এই চিনে নেওয়া আর শিখে নেওয়াই হল বুদ্ধি। কাজ শুরু করলাম,যাতে কম্পিউটার চেনা আর শেখার কাজগুলো করতে পারে।

বুদ্ধির কী ও কেন,তাই নিয়ে এমনই আরও অনেক মজার কথা বলেছেন মিনস্কি। বুদ্ধি যে সত্যিই একটা বিষম বস্তু, তা বুঝিয়েছেন এইভাবে : ধরা যাক, একটা ছোট্ট ছেলে। খেলনার ব্লক দিয়ে বানাচ্ছে পিরামিড। সে কখনওই শুরু করবে না পিরামিডের চূড়া থেকে। শুরু করবে ভূমির অংশটা থেকে। কেন ? না, কারণ সে জানে নীচে কিছু না থাকলে চূড়াটা দাঁড়াতে পারবে না। পড়ে যাবে। মাধ্যাকর্ষণের জন্য। শূন্যে যে কোনও জিনিস ভেসে থাকতে পারে না,এইটে সে জানে। জেনেছে অভিজ্ঞতায়। কিন্তু অনেক শেখানো-পড়ানোর পরেও একটা কম্পিউটারকে পিরামিড বানাতে বললে সে শুরু করতে পারে চূড়া থেকে। কারণ সে হয়তো জানেই না মাধ্যাকর্ষণ জিনিসটা। সুতরাং বুদ্ধির একটা বড় উপকরণ হল অভিজ্ঞতা।

দিন বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে কম্পিউটারও। শুধু অঙ্ক কষা কিংবা রিজার্ভেশনের হিসাব রাখাই তার দায়িত্ব নয় আজকাল। ও-দেশে মিনস্কি কিংবা আমাদের এখানে প্রবালের মতো ছেলেরা ভাবছেন কেবল। যাতে কম্পিউটার হয়ে উঠতে পারে বুদ্ধিমান। ওঁদের আশা, একদিন যন্ত্র হয়ে উঠবেই চিন্তাশীল। ভাবুক। কবি কিংবা শিল্পী। বলা বাহুল্য এ-মতের বিরোধীদের অভাব নেই। ওঁদেরই একজন রজার পেনরোজ। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক,গণিত এবং পদার্থবিদ্যার এই বিশেষজ্ঞ

পৃথিবীবিখ্যাত ওঁর দু-একটি তত্ত্বের জন্য। সম্প্রতি বই লিখেছেন একখানা। 'দ্য এমবেররস্ নিউ মাউন্ড'। রীতিমত জটিল অঙ্কে ঠাসা। তবুও রাতারাতি বেস্টসেলার হয়েছে সেখানা। কারণ একটাই। বইটার প্রতিপাদ্য। পেনরোজ প্রমাণ করতে চেয়েছেন (একেবারে প্রমাণ, নিজে বিজ্ঞানী কিনা তাই শুধু মত ব্যক্ত করেই শান্ত থাকেননি) কম্পিউটার কোনওকালে পারবে না মানুষের মতো বুদ্ধিমান হতে। ওঁর মতে, বিশ্লেষণক্ষমতা যা কিনা মানুষের মগজের একটা বিরাট গুণ—তা যন্ত্র কোনওদিনই পারবে না আয়ত্ত করতে। কেন ? উনি বলেছেন, কম্পিউটার যে-কোনও সমস্যা সমাধান করে নিয়ম অনুযায়ী এগিয়ে। ওই নিয়মটা তাকে শেখাতে হয়। অথচ এমন বহু সমস্যা আছে যাদের সমাধানে নিয়ম মেনে এগোলে চলে না। মানুষের মন বেনিয়মেও চলতে পারে এগিয়ে। তাই তার নাগাল যন্ত্র কোনওদিনই পাবে না।
বলা বাহুল্য, পেনরোজের বইটার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন অনেকেই। মিনস্কিও। ওঁর মতে, পেনরোজের প্রমাণে নাকি ফাঁক আছে। মিনস্কির সমর্থক যাঁরা, তাঁরা এ-প্রসঙ্গে টেনে আনছেন আর-একটা কথা। আর সেটাও মজার সন্দেহ নেই। কী ? কেন ? কম্পিউটারের দাবা খেলা। কম্পিউটার যে সত্যিই দাবা খেলে আজকাল। খেলে মানুষের সঙ্গে। 'ডিপ থট' নামে এক কম্পিউটার ১৯৮৯ সালে নিউ ইয়র্কে দাবা খেলেছে গ্যারি কাসপারভের সঙ্গে। আমরা অনেকেই জানি না ওই কম্পিউটারের নির্মাতা চারজন বিজ্ঞানীর একজন এ-দেশেরই মানুষ। নাম, টমাস অনন্তরামন। একদা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র টমাস পরে গবেষণা করতে চলে যান কারনেগি মেলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর ওখানেই সতীর্থ ফেং শিউং সু, মারে কামপবেল আর অ্যানড্রিয়াম নোয়াৎঝিকের সঙ্গে মিলে বানান ডিপ থট। ১৯৮৮-র গোড়ার দিকে এক প্রেস কনফারেন্সে কাসপারভকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। কম্পিউটার কোনও গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারাতে পারবে কি না, ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। "মোটেই না," বলেছিলেন কাসপারভ। ওই প্রেস কনফারেন্সের দশ মাসের মাথায় বেস্ট লারসেন নামে এক গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়ে দেয় ডিপ থট। নিউ ইয়র্কে অবশ্য কাসপারভের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি সে। মাথা হেঁট করে অনন্তরামনেরা তাই বানিয়ে চলেছে আর একটা কম্পিউটার। উদ্দেশ্য, ১৯৯২ সালে কাসপারভকে চ্যালেঞ্জ জানানো। বিশ্বখেতাব লড়াইতে। ওঁদের আশা আগামী বছর হারানো যাবেই বিশ্বসেরা দাবাড়ুকে।
আশান্বিত হওয়ার কারণও আছে যথেষ্ট। দাবা খেলাটা আসলে কী ? চালের পালটা চাল। এখন কারপভ একটা দান দিলে কাসপারভ যখন পালটা দান দেন তখন আসলে উনি কী করেন ? ভাবেন, ওঁর দানের পালটা আঘাত কারপভ দিতে পারেন সম্ভাব্য কতগুলো দিক থেকে। অর্থাৎ, একটা দানের পালটা দান, আবার তার পালটা দান কতরকমের হতে পারে তার হিসাব কষা। কে না জানে যে,হিসাব কষায় ক্রমশই আরও আরও বেশি ক্ষমতাবান হচ্ছে কম্পিউটার। বিদ্যুতের বদলে আলোকে কাজে লাগিয়ে এখন তৈরি হচ্ছে নতুন কম্পিউটার, যা কিনা প্রতি সেকেন্ডে সেরে ফেলতে পারে ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টি (১-এর পরে ১৮টি শূন্য) গণনা। এত দ্রুত গতিতে চিন্তা করতে পারলে সবচেয়ে ভাল চাল বের করা কি কোনও কঠিন ব্যাপার ? এ যেন একটা সাধনা। যন্ত্রের।দেখা যাক,কতদূর যেতে পারে সে।

কৃপা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রতি রবিবার দাদা একজোড়া জুতো খুব পালিশ করে। চামড়ার জুতো। জুতো-জোড়াটা ছিল আমার বাবার। বাবা চলে গেছেন। আজ প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। নরম কাপড় দিয়ে পালিশ করতে-করতে এমন করে ফেলে, আয়নার মতো মুখ দেখা যায়। বাবা যে খাটটায় শুতেন, তার তলায় সুন্দর একটা পিঁড়ের ওপর সাজিয়ে রাখে।

বাবা মারা যাওয়ার পর দাদাকে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। দাদার খুব ইচ্ছে ছিল, অনেক লেখাপড়া করবে। বিলেত যাবে। সে আর হল না। এক মাড়োয়ারি ফার্মে চাকরি করে। দাদার স্বপ্ন হলুম আমি। দাদা বলে, "আমার ইচ্ছে ছিল, হল না। তোকে হতে হবে। রোজ যখনই সময় পাবি, ওই জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকবি। দেখবি একটা শক্তি পাবি।"

মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে গেল। আর ক'দিন মাত্র বাকি। এমন একটা ভয় এল মনে। প্রথমে মনে হল, আমি পাশ করতে পারব না। তারপর মনে হল, যদিও পাশ করি কোনওরকমে করব। ভাল নম্বর পাব না। আর ভাল নম্বর না পেলে পড়াশোনা শেষ। দাদাকে আর সাহায্য করতে পারব না। সারা জীবন বেকার বসে থাকতে হবে দাদার ঘাড়ে। আমার চোখে জল এসে গেল। যতই

পড়ছি, ততই সব ভুলে যাচ্ছি। আমার এই অবস্থার কথা কাউকে বলতে পারছি না। লেখাপড়ায় আমি খুব একটা খারাপ নই। আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।

আমাদের অবস্থা এক সময়ে খুব ভাল ছিল। মানুষের সবদিন তো ভাল যায় না। কর্মচারীরা প্রবল আন্দোলন করে বাবার কারখানাটা উঠিয়ে দিল। বাবা আর নতুন করে কিছু করতে চাইলেন না। বললেন, "অনেককে নিয়ে বড় কিছু করার দেশ এটা নয়। হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ- কারখানা, এ-সবই বন্ধ হয়ে যাবে।" বাবার অনেক বড়-বড় স্বপ্ন ছিল। মানুষ ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে। বাবার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়লেন। যে-ঘুম কোনওদিন ভাঙে না। চলে যাওয়ার সাতদিন আগে কথায়-কথায় বলেছিলেন, "এবার জন্মালে বিলেতে জন্মাব।" সাতদিন পরেই স্ট্রোক। দাদা বাবার ইউনিফর্ম পরে নেমে এল খেলার মাঠে। বললে, "চলছে, চলবে। যা চলছিল সবই ঠিক সেইরকম চলবে।"

ছেলেবেলায়, দাদা যখন ছোট ছিল, ছাতে ঘুড়ি ওড়াত। আমার হাতে লাটাই। আকাশে ঘুড়ি, দাদার হাতে সুতো, সে কী চিৎকার—'দুয়ো। আমার বাজারে কেউ নেই, আমি আছি ভয় নেই।' ছেলেবেলার এই স্লোগানটাকেই একটু অন্যরকম করে নিয়ে, দাদা এখন থেকে-থেকে হুঙ্কার ছাড়ে— "আমার পাশে কেউ নেই, আমি আছি ভয় নেই।"

সকালে দমাদ্দম ডন-বৈঠক মারার পরই এই স্লোগানটা বারেবারে বেরোতে থাকে। আমাকে বোঝায়, "জীবন কেমন জানিস? তোকে বাঘে তাড়া করেছে। তুই ছুটছিস। উঠে গেছিস পাহাড়ে। বাঘ তখনও তোর পেছনে। পাহাড়চূড়া থেকে তুই পড়ে যাচ্ছিস খাদে। পড়ে যেতে-যেতে কোনওরকমে একটা লতা ধরে ঝুলছিস। বাঘটা উঁকি মারছে। এই সময় হঠাৎ বেরিয়ে এল এক পাহাড়ি ইঁদুর, ইয়া এত বড়। ইঁদুরটা ধারালো দাঁত দিয়ে, তুই যে লতাটা ধরে ঝুলছিস, সেইটা কাটতে লাগল। তুই ঝুলছিস। নীচে গভীর খাদ। পড়ে গেলেই মৃত্যু। এমন সময় তুই দেখলি, পাশেই তোর হাতের নাগালের মধ্যে ঝুলছে এক থোলা পাকা আঙুর। বাঁ হাতে লতাটা ধরে ঝুলছিস, ইঁদুর কাটছে, মাথার ওপর বাঘ ঝুঁকে আছে, তুই ডান হাতে একটা করে আঙুর ছিঁড়ছিস আর মুখে দিচ্ছিস, নীচে গভীর খাদ হাঁ করে আছে। তোকে যেভাবেই হোক, ঝুলে থাকতে হবে। মৃত্যুর পরোয়া করি না, জীবনকে উপভোগ করি।"

আমার দাদা, সাঙ্ঘাতিক দাদা। বাবাকে ভীষণ ভালবাসত। বাবাই তার গুরু। বাবার সমস্ত জিনিস, বাবার ঘরে এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে, যেন বাবা বাথরুমে গেছেন। এখনই এসে জামাকাপড় পরবেন, চশমাটা চোখে দেবেন, জুতো পরে হাতে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে যাবেন। দাদা বাবার ঘরে কাউকে শুতে দেয় না। বলে, "বাবার মন্দির।" ঘরের সংখ্যা কম। আমরা দু' ভাই বারান্দায় শুই। দাদা বাবার বিছানায় মশারি ফেলে ভাল করে গুঁজে, মাথার কাছে ছোট টেবিলে এক গেলাস জল চাপা দিয়ে রাখে।

দাদাকে মনে হয়, আমার বাবা। ছোট বাবা। বাবা যেমন রোজ রাতে দাদাকে পড়াতে বসতেন, দাদাও আমাকে নিয়ে সেইরকম বসে। বাবার মতো মুখ, চোখ, কপাল, খাড়া নাক, এমনকী, গলার আওয়াজও। পরীক্ষা যেদিন শুরু হবে, তার আগের দিন রাতে, দাদা আমাকে নিয়ে বসেছে। বলছে, "সব একবার রিভাইস করে নে।"

আমি কেঁদে ফেললুম, "দাদা, আমার কিচ্ছু মনে নেই। সব ভুলে গেছি। আমি বসে-বসে ফেল করব।"

দাদা কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। তারপর হঠাৎ যেন আগুনের মতো জ্বলে উঠল। কোনও বাধা পেলেই দাদা যেমন হয়ে যায়। বাবার নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ। বাবার সামনেও কোনও বাধা এলে, বুক চিতিয়ে বলতেন, 'আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ, সারেন্ডার নট। আত্মসমর্পণ করব না।'

দাদা আমার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি মেরে বললে, "তুই সারেন্ডার নট-এর ছেলে হয়ে এই কথা বলছিস! আয় আমার সঙ্গে।"

দাদাকে অনেকটা মহাদেবের মতো দেখতে। আমাকে টানতে-টানতে বাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বললে, "বোস মেঝেতে, বাবু হয়ে।"

বসলুম। একসঙ্গে চার-পাঁচটা ধূপ জ্বেলে বাবার ছবির সামনে রাখলে। ছবিটা খাটে। ধূপদানিটা সামনের টুলে। মৃদু একটা আলো জ্বেলে দিলে। খাটের তলায় চোখের সামনে বাবার জুতো-জোড়া। ঝকঝক করছে। ছোট্ট একটা আসনের ওপর।

দাদা, আমার পাশে বসল। প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে। বললে, "বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে থাক বেশ কিছুক্ষণ। চোখের পাতা ফেলবি না।"

একভাবে তাকিয়ে আছি। জল আসছে চোখে। বাবার হাসি-হাসি মুখ। বসে আছেন চেয়ারে। গায়ে একটা কাশ্মিরি শাল। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তোলা। সেই ছবিটাই বড় করা হয়েছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মনে হল, ছবিটা জীবন্ত। চোখের পাতা পড়ছে। ঠোঁট নড়ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। কেমন যেন ঘোর লেগে যাচ্ছে। সব ঝাপসা হয়ে আসছে। হঠাৎ খটখট জুতোর শব্দ কানে এল। যে-ঘরে বসে ছিলুম, সেটা যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল। লম্বা, সোজা একটা রাস্তা। দু'পাশে সার সার বিশাল-বিশাল গাছ। বহু দূরে আকাশের গায়ে নীল একটা পাহাড়। জল চিকচিক একটা নদীর রেখা।

আমার সামনে সোজা হয়ে হেঁটে চলেছেন বাবা। আমি তাঁর শক্ত পায়ের গোছ দেখতে পাচ্ছি। গোড়ালিটা ঢুকে গেছে চামড়ার তৈরি ঝকঝকে জুতোর মধ্যে। বাবার হাঁটার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। কখনও পা ভাঙত না হাঁটুর কাছ থেকে। সৈনিকের মতো চর্চা করতেন। চিবুকটা থাকত খাড়া। যেন খাপখোলা একটা তরোয়াল হেঁটে চলেছে। আর হাঁটতেন খুব দ্রুত গতিতে।

আমি, আমার দাদা, দু'জনে প্রায় ছুটছি। তাল রাখতে পারছি না। জুতোর ভয়ঙ্কর শব্দ আমাদের আগে-আগে চলেছে। কাঁকুরে পথ। শেষবেলার রোদ লুটিয়ে আছে, গাছের ফাঁক দিয়ে যেখানে-যেখানে আসতে পেরেছে। 'বাবু' বলতুম আমি বাবাকে। দাদা 'বাবা'ই বলত। বাবার জুতোর গোড়ালির চাপে ছোট-ছোট কাঁকর গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে যাচ্ছে। মশর-মশর শব্দের সঙ্গে জুতোর গোড়ালির শব্দ।

বাবার চওড়া পিঠ। সুন্দর মাথা। শক্ত ঘাড়। ব্যায়াম করা শরীর। আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন না। কেবল এক একবার বলছেন, "ঠিক আসছ তো, ঠিক আসছ তো।"

আমরা প্রায় ছুটছি। আমাদের নজর বাবার পায়ের দিকে। সুন্দর দুটো পা। কালো কুচকুচে জুতো। সমান-সমান দূরত্ব রেখে একটার-পর-একটা পড়ছে। আর বিশাল লম্বা একফালি কাপড়ের

মতো পথটা গুটিয়ে যাচ্ছে। আমার পায়ে ভোঁতা-মুখ ছোট্ট একজোড়া বুট। আমাদের জুতোর ঠোক্করে, ছোট-ছোট সাদা মসৃণ পাথর ঠিকরে চলে যাচ্ছে।

উলটো দিক থেকে বাতাস বইছে জোরে। বাবার মাথার পেছন দিকের বড়-বড় চুল উড়ছে। আমাদের কপালে চুল খেলা করছে। হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটা টাঙ্গা আমাদের অতিক্রম করে সামনে চলে গেল। সাদা ঘোড়ার পায়ের টগবগ শব্দ। নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে চাকার কেটে-কেটে চলে যাওয়ার অদ্ভুত আওয়াজ। পেছন দিকে তিন-চারজন যাত্রী। তাদের মধ্যে একজন সিল্কের রুমাল নাড়ছে। টাঙ্গাটা ক্রমশ দূর থেকে দূরে একটা দেশলাইয়ের খোলের মতো হয়ে গেল। পথটা যেন নাড়া খেল। নির্জন, আরও নির্জন হল। সাদা স্বাস্থ্যবান ঘোড়াটা বাবার হাঁটার শক্তি যেন আরও বাড়িয়ে দিল।

আমি মাথা নিচু করে, হাত মুঠো করে সারা শরীর দুলিয়ে হাঁটছি। আমার চোখ আমার ছোট পায়ের ছোট জুতোর দিকে। পথের সাদা কাঁকরের দিকে। মাঝে-মাঝে চোখ যাচ্ছে বাবার পায়ের দিকে। কী গতি, কী শক্তি। টাঙ্গার বড়-বড় লোহার চাকাও হেরে যায়। আমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে বাবার একটা যেন রেস চলেছে। আকাশের গায়ে নীল পাহাড়টাকে অনেক বড় দেখাচ্ছে। নদীর সুতো এখন চওড়া ফিতে। বাবা পাহাড় ভীষণ ভালবাসতেন। পাহাড়টাকে ধরার জন্য যেন ছুটছেন। আমি ঘেমে গেছি। আমার ছোট-ছোট পা দুটো যেন আর চলছে না। হঠাৎ আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম মুখ থুবড়ে। দাদা বলছে, "রাজা পড়ে গেছে। রাজা পড়ে গেছে।" বাবা অনেকটা দূরে ছিলেন। আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন গটগট করে। আমি দেখতে পাচ্ছি কালো জুতো। পাউডারের মতো ধুলো জমেছে। বাবা সামনে এসে আমাকে তুলতে-তুলতে বলছেন, "পড়ে গেছে তো কী হয়েছে? এই তো আবার উঠে পড়েছে।"

আমার হাঁটু দুটো ছড়ে গেছে। দাদা বলছে, "কেটে গেছে।"

বাবা বলছেন, "ও অমন অনেক কাটবে ছিঁড়বে। সামনেই নদী। পাহাড়ি নদীর জল ওষুধের মতো। ওখানে গিয়ে ধুয়েমুছে দেব।"

আবার আমাদের হাঁটা শুরু হল। বাবার সেই এক গতি। আমার হাঁটুর

কাটা থেকে অল্প-অল্প রক্ত ঝরছে। এক সময় বললুম, "বাবা, আমি যে আর পারছি না।"

বাবা থেমে পড়লেন। আমার দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, "পারছ না মানে! তুমি ওই নীল পাহাড়ে যাবে না?"

"আমার শরীর আর পারছে না।"

"শরীর নয়, তোমার মন। তোমার মন হেলে গেছে। তুমি হেরে যাবে? যারা টাঙ্গা করে গেল তারা এতক্ষণে নদী পেরিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছে। ওই পাহাড়ের চূড়ায় নানা রঙের পাথর পাওয়া যায়। এক-একটার রং প্রজাপতির পাখার মতো। আর পাথরের ফাটলে-ফাটলে আছে তুলো ঘাস। এত কাছে এসে তুমি বলছ, পারবে না। ওদের কাছে তুমি হেরে যাবে!"

দাদা বলছে, "বাবা, আমরাও তো টাঙ্গায় যেতে পারতুম।"

বাবা বলছেন, "ও তো দুর্বলের যাওয়া, সবল যায় পায়ে হেঁটে। হাঁটার একটা আলাদা আনন্দ আছে। সব জিনিসই জয় করে নিতে হয়। কষ্টের পর যে বিশ্রাম, তার আনন্দ অনেক বেশি। হারি আপ, হারি আপ মাই বয়েজ। সূর্য ডোবার আগে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে। কেন পারবে না! বীর কখনও হারে না।"

আবার আমাদের হাঁটা শুরু হল। পথ ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। গাছ সরে যাচ্ছে। নদী এগিয়ে আসছে। পাথর আরও বাড়ছে। এইবার বড়-বড় পাথর। সাদা দুধের মতো, হালকা সবুজ-লালের ছিট। ক্রমশই ঢালু হচ্ছে পথ। একসময় শুধুই পাথর। টাঙ্গাটা একপাশে দাঁড়িয়ে। আর এগোতে পারেনি। চালক ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে, একপাশে বসে আছে উদাস হয়ে।

বাবা বলছেন, "দেখছ, অন্যের কাঁধে চড়ে, কিছুদূর যাওয়া যায়, শেষপর্যন্ত যেতে হলে নিজের শক্তিই ভরসা।"

বাবা এইবার পাথর থেকে পাথরে লাফ মেরে চলেছেন। কী ব্যালান্স। জুতোর শব্দ হচ্ছে খটাস-খটাস। গোড়ালির পেরেকের সঙ্গে পাথরের কোনা লেগে সিগারেট লাইটারের মতো আগুনের ফিনকি ছুটছে।

নানা মাপের অত পাথর, দিগন্তবিস্তৃত অত পাথর দেখে চোখে ঘোর লেগে যাচ্ছে।

বাবা বলছেন, "শরীরটাকে পাখির মতো হালকা করে দাও। মনে করো তোমার ডানা আছে। ভাবলেই হবে। মানুষ সব পারে, মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই।"

আমরা আরও ঢালু বেয়ে একেবারে নদীর বুকে নেমে এলুম। জল বেশি নয়, কিন্তু ভীষণ স্রোত। কাচের মতো জল। একবারে তলা পর্যন্ত দেখা

যাচ্ছে। ছোট-বড় পাথর, বালির দানা কিচকিচ করছে। বাবা পকেট থেকে রুমাল বের করে জলে ভিজিয়ে, আমার হাঁটুর থেঁতলে যাওয়া জায়গা দুটোয় থুবে থুবে, আলতো করে লাগালেন। সব ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। হাতে লেগেছিল। সেই জায়গাগুলোও মেরামত করলেন।

জিজ্ঞেস করছেন, "কী, খুব জ্বালা করছে?"

করছে। তবু আমি বললুম, "না না, ঠিক আছে।"

বাবা, খুশি হয়ে বলছেন, "বাঃ ভেরি গুড! এই তো ট্রেনিং। কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা, আমাদের জীবনের সঙ্গী। একদম পাত্তা দেবে না। তা হলেই সব কাবু হয়ে যাবে। এখানে হাঁটতে এসেছ, হেঁটে যাও। থামবে না, থেমে পড়বে না, ভেঙে পড়বে না। এই হল পথ, তুমি হলে পথিক। আর এই জুতো হল গতি। দ্যাখো না, আমি কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি! আর হ্যাঁ, জুতো হল আত্মবিশ্বাস। এই দ্যাখো, পেছনে তাকাও।"

আমি ফিরে তাকালুম। অবাক কাণ্ড। দেখি একটা ঘর, দালান। চারপাশে আমগাছ, জামগাছ, লিচুগাছ। সকালের রোদ। পাখি ডাকছে। দালানে একটা দোলা। একেবারে এতটুকু একটা শিশু দোলায় শুয়ে হাত-পা নাড়ছে। ছোট্ট লাল-লাল কচি-কচি দুটো পা। বাবার গলা। তিনি বলছেন,, "চিনতে পারছ? তোমার বাবা।"

আমি বাবার দিকে ফিরে তাকালুম। আশ্চর্য! ওইদিকটায় সেই খরস্রোতা নদী। নীল পাহাড় খাড়া হয়ে উঠে গেছে আকাশের দিকে।

বাবা বলছেন, "আবার দ্যাখো।"

একজন কিশোর গ্রামের পথ ধরে স্কুলে যাচ্ছে। বগলে বই।

বাবা বলছেন, "বাড়ি থেকে দেড় মাইল দূরে ছিল তোমার বাবার স্কুল। রোজ হেঁটে যেত, হেঁটে ফিরত। তাই তো আমি এখনও এত হাঁটতে পারি। একদিনও কামাই হত না। টিফিন ছিল ছোলা ভিজে আর আদা। একটু নুন।"

ফুর-ফুর করে বাঁশি বাজল। নিমেষে দৃশ্য বদলে গেল। খেলার মাঠ। লাল জার্সি-পরা একটি ছেলে দুর্দান্ত খেলছে। গোল। হাততালি। খেলা-শেষের বাঁশি। ভারিক্কি চেহারার এক ভদ্রলোক ছেলেটির হাতে একটা বড় কাপ তুলে দিচ্ছেন। লাল জার্সি-পরা ছেলেটি মাথায় কাপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে মাঠ থেকে। হইহই উল্লাস।

বাবা বলছেন, "আমাদের স্কুল ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ান হল। আমাদের সময় পড়া আর খেলা। দুটোই ছিল।"

একটা ঘর। জানলার ধারে একটা টেবিল। টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। এক যুবক বই খুলে গভীর মনোযোগে পড়ছে। টেবিল-ক্লকে রাত দুটো। যুবকের গায়ে গেঞ্জি। ভীষণ ভাল স্বাস্থ্য। টেবিলের ওপর ডান হাত। হাতের গুলি ঠেলে উঠেছে।

বাবা বলছেন, "কলেজ হস্টেল। কাল থেকে শুরু হচ্ছে বি. এসসি পরীক্ষা। ওই ছেলেটি জীবনের কোনও পরীক্ষাকেই ভয় পায়নি কোনওদিন। সারারাত পড়বে। ভোরবেলা..."

ঠিংঠাং শব্দ। জিমনাশিয়াম। যুবক একা বারবেল ভাঁজছে। ভোরের আকাশ। দূরে একটা পার্ক। জল টলটলে দিঘি।

বাবা বলছেন. "দেহচর্চায় শুধু দেহ বড় হয় না, মনও বড় হয়। মনের সব ভয় কেটে যায়।"

দৃশ্য বদল হল। বিশাল একটা বাড়ি। বড়-বড় থাম। অনেক সিঁড়ি। সুন্দর সেই যুবক কালো গাউন পরে ধাপে-ধাপে নেমে আসছে। হাতে গোল করে গোটানো একটা কাগজ।

বাবা বলছেন, "ওই দ্যাখো, সিনেট হল। তোমার বাবা কনভোকেশান থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসছে। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। তোমার বাবার কাঁধে যিনি হাত রাখছেন, তিনি তোমার ঠাকুরদা। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বড় উকিল ছিলেন। তোমার ঠাকুরদার মুখের ভাবটা দ্যাখো, যেন কোহিনুর পেয়েছেন। পিতার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ পুত্রের সাফল্য। ছেলের মধ্যেই বাবা বেঁচে থাকেন। অনন্তকাল ধরে এই হয়ে আসছে। তোমার সাফল্যেই আমার সাফল্য। তুমি আমাকে আনন্দ দিলে তবেই আমি আনন্দ পাব। জানবে মানুষের পা হাঁটে না, হাঁটে মন, পায়ের সাহায্যে। কোনও জিনিস হাত ধরে না, ধরে মন। দেহ বড় হয় না, বড় হয় মন। ইচ্ছে করলে মানুষ আকাশের চেয়েও বড় মন করতে পারে। পৃথিবীর সব কিছু দুর্বল। ইচ্ছাই প্রবল। সব চেয়ে শক্তিশালী হল মানুষের ইচ্ছে।"

হঠাৎ সব অদৃশ্য। কেউ কোথাও নেই। শুধু বড়, ছোট পাথর। পাহাড়ি নদীর বয়ে চলার কুলুকুলু শব্দ। একটা পাথরের ওপর বাবার জুতো-জোড়া। চকচকে কালো জুতো। মিহি পাউডারের মতো ধুলো। নদীর ওপারে সেই নীল পাহাড়। খাড়া উঠে গেছে আকাশের দিকে। কান ছুঁয়ে শাঁ-শাঁ শব্দে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। নদীর তরতরে জল পাথরে-পাথরে গান শুনিয়ে যাচ্ছে, আমরা চলেছি, চলেছি, আমরা থেমে নেই।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। আলো কমে আসছে। নীল পাহাড় ধূসর হয়ে গেছে। পৃথক-পৃথকভাবে আর কোনও কিছুই চেনা যাচ্ছে না, সব একাকার।

চিৎকার করলুম, "বাবা।"

প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই পাহাড়চূড়া থেকে উত্তর এল, "রাজা।"

স্লেট-পাথরের মতো আকাশ, দৈত্যের মতো পাহাড়, দুধের মতো নদী, একেবারে চূড়ায় সাদা হাঁসের মতো এতটুকু একজন মানুষ, "রাজা, আমি এইখানে। তুমি নদীর বাধা পেরিয়ে চলে এসো। এখানে এলে তুমি দূর, দূর, কত দূর দেখতে পাবে। মিছরির মতো মিষ্টি বাতাস। কতরকমের পাথর ছড়িয়ে আছে এখানে। কোনও-কোনও পাথরে, সোনার আঁচড়।"

"ভীষণ অন্ধকার।"

"মনের মশাল জ্বেলে নাও।"

"নদীতে ভীষণ স্রোত।"

"মনের ভেলা ভাসাও।"

"পাহাড় ভীষণ উঁচু।"

"মনের মই তার চেয়ে উঁচু।"

"আমার পা চলছে না।"

"আমার পৃথিবী-ঘোরা জুতোটা পরে নাও।"

"আমার দাদা কোথায়?"

ঠিক আমার পাশ থেকে উত্তর এল, "তোর পাশে।"

ঘোর কেটে গেল। বিছানায় বাবার ছবি। সামনেই কালো চকচকে জুতো। দাদা রোজ অফিসে বেরোবার আগে প্রণাম করে। আমি কোনওদিন করি না। জুতোয় মাথা ঠেকালুম। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, শুধু জুতো নয়, জীবন্ত দুটো পা এসে গেছে। জুতোটা গরম।

দাদা বলছে, "আর কোনও ভয় আছে রাজা?"

"না,. দাদা, আমি পেয়ে গেছি।" অনেকদিন পরে কাঁদছি আমি।

দাদা বলছে, "রাজা, জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া হল কৃপা।"

ছবি : দেবাশিস দেব

চোখের সামনে

আনন্দ বাগচী

ঠিক মাধ্যমিক পরীক্ষার পরেই পুরোপুরি স্বাধীন হওয়ার এমন একটা মওকা এসে যাবে, জয় ভাবতেই পারেনি। দেশের বাড়িতে জেঠতুতো দিদির বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হতে চলেছে। সেই উপলক্ষে দিন দশেকের জন্য সবাইকে নিয়ে বাবা গাঁয়ের বাড়িতে চলে গেলেন। বাড়ি পাহারা দেওয়ার ছুতো করে জয় থেকে গেল কলকাতায়। টাকা-পয়সা দিয়েও আজকাল দরকারের সময়ে থাকার লোক পাওয়া যায় না। আর যদিই বা পাওয়া যায়, বাইরের লোকের ওপর ভরসা করা যায় না। বিশ্বাসও না। যা দিনকাল পড়েছে, সেই লোকই যে ঘরসন্ধানী বিভীষণ হয়ে উঠবে না তা কে বলতে পারে!

বাবাকে সরাসরি বলতে সাহস পায়নি। মাকেই বলেছিল, সবাইকে শুনিয়ে, "তোমরা যাও, আমি বাড়ির দায়িত্ব নিলাম। তা ছাড়া শিবুও থাকবে আমার সঙ্গে।"

শিবুকে বাড়ির সবাই চেনে, জয়ের ছেলেবেলার বন্ধু, ইস্কুলের সহপাঠী, একসঙ্গেই এবার ওরা মাধ্যমিক দিল। পরীক্ষার আগে বেশ কয়েকদিন সে জয়ের সঙ্গে রাত জেগে পড়াশোনা করেছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে। শিবুরা যে ফ্ল্যাটে থাকে, সেখানে জায়গা কম, লোক বেশি। রাত জেগে পড়াশোনা করলে অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। জয়দের দোতলা বাড়িতে ঠিক তার উলটো। লোকের তুলনায় অনেক ঘর।

ছোড়দি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ছে বলে নিজেকে খুব তালেবর ভাবে, জয়কে তো মানুষ বলে গণ্যই করে না। জয়ের প্রস্তাব শুনে গায়ে জ্বালা-ধরানো হাসি হেসে বলেছিল, "শিবু থাকবে তোর বডিগার্ড হিসাবে, তাই বল। নইলে তোর মতো নাবালক বাড়ি পাহারা দিচ্ছে জানতে পারলে চোরচোট্টাও হাসত। এই রোগাপটকা পাঁচ ফুটের হোমগার্ড, গোঁফের রেখাটাও যার ভাল করে ওঠেনি, তার থাকা না-থাকা সমান।"

কথাটা ঠিক হয়নি। জয় ছিপছিপে, স্লিম। সে রোগাও নয়, পটকাও নয়, তাকে খুব সহজে পটকানো শক্ত। নিয়মিত যোগ-ব্যায়াম করে, মাথায় খাটো হলেও বুদ্ধিতে অনেকের চেয়েই ঢ্যাঙা। বই পড়ে-পড়ে সে অনেক শিখেছে, নাবালক না, তাকে ঝট করে ঘোল খাওয়ানো কঠিন, খুবই কঠিন। আর তার দিদি, বয়সে নিঃসন্দেহে অনেক বড়, তবে ওর পাঁচ-দুই হাইটের মধ্যে কারচুপি আছে। হাই হিলের আর চুলের ফাঁকি তার না-জানা নয়। সামান্য একটা আরশোলা দেখলে যে ভয়ে আধমরা হয়ে যায় তার মুখে এসব সাহসের খোঁটা মানায় না। রাগে অপমানে মুখচোখ লাল হয়ে গিয়েছিল জয়ের। মুখে প্রায় এসে গিয়েছিল, আমি তো কারও মতো ডিঙি মেরে বড় হতে চাইনি। তবে লম্বা হওয়ার বয়েস আমার এখনও চলে যায়নি।

কিন্তু বলেনি। বাবা শুনতে পেয়ে যাবেন বলেই বলেনি। বাবা ওসব

মেয়েলি কথায় কান না দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "খুব ভাল কথা। তবে এই টাকাগুলো রাখো, পাড়ার হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়ো, ওরা দু'বেলা তোমাদের খাবার টিফিন-ক্যারিয়ারে করে পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

মানি-ব্যাগ থেকে একগোছা নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "একটু বেশি করেই রাখ, কখন কী দরকার পড়ে তার ঠিক কী! আর-একটা কথা, চারদিকে চুরি-ডাকাতির হিড়িক চলছে, সজাগ সাবধান থাকবে। দিনের বেলায়ও বাড়ি ফেলে বেশিদূরে কোথাও যাবে না।"

মা ব্যাকুল গলায় বলেছিলেন, "আহা, ও যে এককাপ চা বানিয়েও খেতে শেখেনি।"

বাবা হেসে বলেছিলেন, "মাধ্যমিক পরীক্ষাও তো আগে কখনও দেয়নি। পুরুষমানুষকে কত কিছুই তো নিজে হাতে ঠেকে শিখতে হয়। শিখে নেবে, নয়তো দোকানে খাবে। চা বানানোর চেয়ে অনেক বড় দায়িত্বই তো ওর ওপর দিয়ে গেলাম।"

সবাই চলে যাওয়ার পর দুটো দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল ওরা কেউ টেরই পেল না। ও আর শিবু। সর্বক্ষণ একসঙ্গে, হাসিতে গল্পে মেতে আছে। হোটেলের কথা এক কথায় নাকচ করে দিয়ে শিবু বলেছিল, "দুর বোকা, একগাদা টাকা খরচ করে ওই বারোয়ারি রান্নার ছাইভস্ম কেন গিলব। তার চেয়ে নিজেরা হাত পুড়িয়ে যা রাঁধব দেখবি অমৃত মনে হবে। তুই আমার ওপর ছেড়ে দে।"

শিবু যে খুব প্র্যাকটিক্যাল, সাংসারিক জ্ঞানগম্যি তার অনেক বেশি। জয়দের রান্নাঘরের অ্যারেঞ্জমেন্ট এক নজরে খতিয়ে দেখে সে মহাখুশি। বলেছিল, "বহুত আচ্ছা! এ যা দেখছি, দু'বেলা ইনডোর পিকনিক চালিয়ে যাওয়া যাবে।"

শিবু ছেলেটা যেমন সরল তেমনই মজার। গায়ে অসুরের মতো শক্তি, প্রাণবন্ত, ছটফটে। সব সময় হাসছে, মজায় মেতে আছে। এই সতেরোয় পা দিয়েই মাথায় ছ' ফুটের চৌকাঠ ছুঁয়ে ফেলেছে। কিন্তু শিবু কবে কী করে এমন রান্না শিখল কে জানে! হাত পুড়িয়ে রাঁধবে বলেছিল, সে বোধ হয় কথার কথা। মাছ, মাংস দুটোতেই তার হাত বেশ মকশো করা।

নিচু ভল্যুমে টিভি চালিয়ে ওরা ছবির দিকে তাকিয়ে গল্প করছিল। শিবু হঠাৎ-হঠাৎ উঠে যাচ্ছিল রান্নাঘরে। মাংসের একটা খুশবু এসে খিদেটাকে চাঙ্গা করে দিচ্ছে থেকে-থেকে। জয় কী একটা কথা বলতে গিয়ে দেখল শিবু পাশে নেই। একটু পরেই নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকল সে, দু' হাতে দুটো প্লেট।

বলল, "একটু টেস্ট করে দ্যাখ তো, মুখে দেওয়া যায় কি না। মাথা খাটিয়ে একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করেছি।"

একটা ডোর-বেল বাজল কোথাও। থেমে-থেমে বার দুই। শিবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই জয় বলল, "আমাদের না। পাশের একতলা বাড়ির।"

জয়ের মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই পাড়া কাঁপিয়ে একটা জড়ানো আর্তনাদ শোনা গেল। আর তার গা ছুঁয়েই একটা গুলির শব্দ। বেশ জোরালো, বন্ধ জায়গায় পটকা ফাটালে যেমন হয়। একটা গরম মাংসের টুকরো সবে মুখে পুরেছিল জয়। ডিশ থেকে ঝোল চলকে পড়ল গায়ের ওপর ক' ফোঁটা। কোনওরকমে সেন্টার টেবিলের ওপর ডিশটা নামিয়েই সে ছুটে গেল পাশের ব্যালকনির দিকে।

পাশের একতলা বাড়ির গাড়ি বারান্দার তলা থেকে পিছু হটে বেরিয়ে এসেছে একটি লোক। মনে হল ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। দোতলার ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে জয় চেঁচাল, "কে আপনি? কী হয়েছে! কী ব্যাপার?"

লোকটা জয়কে আগে দেখতে পায়নি, চমকে তাকাল কথা শুনে। কী বলতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না প্রথমটায়। দু' হাত নেড়ে তাকে নীচে ডাকল। তারপর কাঁপা গলা শোনা গেল, "শিগগির আসুন আপনারা।"

শিবু ততক্ষণে নীচে নেমে গেছে তিন লাফে। জয় একতলায় পৌঁছনোর আগেই সে দরজা খুলে বাইরে। হাতে হকি স্টিক তুলে নিয়ে গেছে অভ্যেসবশে। পাড়াটা নিরিবিলি। এই আটটা রাত্তিরেই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল যেন। এবার মানুষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে আশপাশ থেকে। দরজা-জানলা খোলার একের পর এক আওয়াজ। লোকটা ফিরে গিয়ে আবার ডোর-বেল টিপে ধরেছে—অ্যালার্ম বাজার মতো লাগাতার বেজে যাচ্ছে সেটা বাড়ির ভেতর। শিবু স্টিক হাতে ঠিক পেছনে, তৈরি।

কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া নেই। কেউ যে দরজা খুলবে সে লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। জয় বলল, "পেছন দিকে একটা দরজা আছে, আমি সেদিকে যাচ্ছি।"

"চলো, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি, তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে না।"

জয় গলা শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল ডাক্তার দাশগুপ্ত। এ পাড়ায় নতুন এসেছেন। বয়সে তরুণ। বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স। পাজামা আর গেঞ্জি পরেই ছুটে বেরিয়ে এসেছেন। মুখে একটা হাসির ভাব ফুটিয়ে জয় বলল, "ডাক্তারবাবু আপনি! চলুন তা হলে।"

দ্রুত পায়ে জয় বাড়ির পেছন দিকে চলল। দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "ঘটনাটা কী? তুমি তো পাশের বাড়িতেই থাকো।"

"বুঝতে পারছি না। একটা চিৎকার আর গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে এসেছি।"

"আমিও।"

"ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়। নইলে সবাই এত চুপচাপ কেন!"

"মিঃ ব্যানার্জির বাড়ি তো এটা? আমার সঙ্গে অবশ্য আলাপ হয়নি এখনও।" দাশগুপ্ত বললেন, "একা থাকেন নাকি বাড়িতে?"

"স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একরকম একাই। দুই ছেলেই কলকাতার বাইরে। একজন নাসিকে না কোথায়। অন্যজন খড়্গপুরে। একহপ্তা বাদে-বাদে আসেন। এক আর্টিস্ট ভাগনে অবশ্য সঙ্গেই থাকেন। রান্নার লোক, কাজের লোকও আছে। এ কী!"

"হুঁ, এটাও তো ভেতর থেকেই বন্ধ দেখছি। আর কোনও রাস্তা নেই? জমাদারের জন্য খিড়কি দরজা?"

কিন্তু খিড়কিও বন্ধ। সামনে-পেছনে প্রধান দরজা দুটোতেই বিদেশি কোম্পানির গা-তালা বসানো। বাইরে থেকে টেনে দিলেও বন্ধ হয়ে যায়। তাই আক্রমণকারী কেউ যদি পালিয়ে যাওয়ার সময় দরজা টেনে দিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তা বোঝার কোনও উপায় নেই। আর এটাই স্বাভাবিক, দুষ্কর্ম করার পরে সেই শয়তান কখনও বোকার মতো ভেতরে বসে নেই, সে পালিয়েই গেছে। তবে তার ভেতরে থাকার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না, কারণ যদি সে টাকাকড়ি গয়নাগাটি বা অন্য মূল্যবান কোনও কিছুর সন্ধানেই এসে থাকে তা হলে এত অল্প সময়ের মধ্যে সেসব খুঁজেপেতে হাতিয়ে নিতে পেরেছে এমন নাও হতে পারে।

সেক্ষেত্রে মানুষটি রীতিমত

বিপজ্জনক। তার হাতে রিভলভার বা পিস্তল জাতীয় কোনও আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আর তা থেকে এখনও পর্যন্ত মাত্র একটি গুলিই সে ছুঁড়েছে।

বাড়ির সামনে একে-একে বেশ কিছু প্রতিবেশী জড়ো হয়ে গিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই। প্রথমে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেউ-কেউ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা দিক ভেবে স্থির হল কাজটা ঠিক হবে না। আগে পুলিশ আসুক। ইতিমধ্যেই ফোনে থানায় খবর পাঠানো হয়ে গেছে। যতক্ষণ থানা থেকে তারা এসে না পৌঁছচ্ছে, ততক্ষণ সবাই মিলে বাড়িটা ঘিরে রাখা যাক। লাঠিসোঁটা ডাণ্ডা হকি স্টিক এবং গোটা দুই শটগান জোগাড় হয়ে গিয়েছিল। ছোটদের হাতে এয়ার রাইফেলও ছিল তিন-চারটে। মোট কথা এখন রীতিমত একটা সশস্ত্র বাহিনী। আততায়ী যদি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, খুব সহজে পার পাবে না নিশ্চয়।

হঠাৎ চমকে উঠে শিবু বলল, "এই জয়, মাংসের কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম রে। চল চল, দেখি ওদিকে আবার কী হল।"

শুধু মাংস নয়, বাড়ির দরজা খুলে রেখেই চলে এসেছে, সে-কথাও মনে পড়ল সঙ্গে-সঙ্গে।

একটু বাদেই সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি এসে পড়ল।

ব্যালকনি থেকে ঘুরে এসে জয় বলল, "যাক, পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছে। আসল ব্যাপারটা এবার জানা যাবে। চল, যাবি নাকি?"

রান্নাঘর থেকে শিবু জবাব দিল, "দাঁড়া, এত তাড়া কিসের! আর কিছুক্ষণ পরে গেলেই চলবে। আগে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকুক। তা ছাড়া পুলিশ প্রথমে কাউকেই হয়তো ভেতরে যেতে দেবে না।"

তা ঠিক।" জয় মাথা নেড়ে বলল, "পুলিশের কী সব তদন্ত-টদন্তর কাজ থাকে। খুন-টুন হলে অনেক কাজ। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব দেখবে, ছাপছোপ নেবে, ফোটো তুলবে। তারপর জবানবন্দি।"

কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে শিবু বলল, "তুই তা হলে ধরেই নিয়েছিস ও বাড়িতে খুন হয়েছে?"

"নিশ্চয়ই। আর্তনাদ, গুলির শব্দ, তারপর সব চুপচাপ। এর মানে তো একটাই, মার্ডার।"

শিবু হাসল।

"হাসছিস যে!"

"ভুলেই গিয়েছিলাম তুই ডিটেকটিভ বইয়ের পোকা। অনেক জ্ঞান।"

"জ্ঞান কিছু না।" লজ্জিত গলায় জয় বলল, "আসলে ছকটা জানা। বই পড়া বিদ্যে। সেকেণ্ড হ্যান্ড নলেজ বলতে পারিস।"

"তাই বা ক'জনের থাকে! থার্ড হ্যান্ড ফোর্থ হ্যান্ড নলেজও না। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলে আমারও খুব উত্তেজনা হয়। এটা তো বলতে গেলে কুড়িয়ে পাওয়া অ্যাডভেঞ্চারই। লোমহর্ষক রহস্য। একেবারে গায়ের কাছে পাশের বাড়িতে।"

জয় নিজেও ভেতরে-ভেতরে উত্তেজিত হয়ে আছে। তার ছেলেবেলা থেকেই শখ, বড় হয়ে শখের গোয়েন্দা হবে। একটার পর একটা দুর্ভেদ্য রহস্যের সমাধান করবে। শার্লক হোমসের মতো, এরক্যুল পোয়ারোর মতো, কিরীটি রায় কিংবা ব্যোমকেশ বক্সি হতেই বা বাধা কোথায়। একদিন ছোড়দি ওর উৎসাহের মাথায় জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। বলেছিল, শখের গোয়েন্দা বলে আদতে কোনও বস্তু নেই। আমাদের দেশে শখের গোয়েন্দা বলে কোনও জিনিস নেই। ওসব গল্পের বইয়ের ধাপ্পা। তোদের মতো খোকা-ভোলানো রূপকথার

অশ্বডিম্ব।

মনে-মনে দমে গেলেও জয় বিশ্বাস করেনি। প্রাইভেট ডিটেকটিভ থাকতে বাধা কোথায়। ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানী আইনজ্ঞ সবাই যদি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন, গোয়েন্দা কেন পারবে না?

জয় বলল, "তোর ওদিকের কদ্দুর?"

"সেরে ফেলেছি। আমি এখন রেডি। এবার গেলেই হয়।" শিবু একটু থেমে বলে, "আচ্ছা তুই কাউকে আশঙ্কা করছিস?"

"মানে?"

"যদি খুন হয়েই থাকেন তবে কে তিনি?"

একটু ভেবে জয় বলল, "ব্যানার্জিমশাই, কর্তাবাবু, হেড অব দ্য ফ্যামিলি অবশ্যই।"

"কোনও শত্রু ছিল ভদ্রলোকের?"

হেসে ফেলে জয় বলল, "এরকমই জিজ্ঞেস করতে হয়, তাই না? তবে এর উত্তর গড নোজ, আমার জানা নেই।"

খিড়কির দরজা ভেঙেই পুলিশ শেষ পর্যন্ত ভেতরে ঢুকল। ঢুকে থ। যেমন অনুমান করা গিয়েছিল তা নয়, গুলি ছুঁড়েছেন গৃহকর্তা স্বয়ং। ডাইনিং স্পেসের সামনে তিনি কাত হয়ে পড়ে আছেন, হাতের প্রায় শিথিল মুঠোয় রিভলভারটা তখনও ধরা। সাদা-কালো মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে থিকথিকে একটা রক্তের ধারা। না, সুইসাইড নয়। একটা হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা ছোরা আমূল ঢুকে আছে তাঁর বুকের বাঁ দিকে। বোঝাই যায় ইস্পাতের ফলাটা নির্ভুলভাবে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে গেছে। আর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটেছে তাঁর।

গুলিটা তা হলে তিনি কাকে করেছিলেন? নিশ্চয়ই আততায়ীকে লক্ষ্য করেই। কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও আততায়ীর সন্ধান পাওয়া গেল না।সে যেন কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। পেছনের দরজার কাছে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখে বোঝা গেল অক্ষত অবস্থায় সে পালাতে পারেনি। অল্প হোক বিস্তর হোক, জখম সে হয়েছেই। এবং ওই দরজা দিয়েই সে পালিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় দরজার কপাট টেনে দিয়ে যেতে ভোলেনি। অনেকদূর পর্যন্ত তল্লাশ করেও কিন্তু আহত লোকটার রক্তের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। হয়তো বাইরে বহু লোকের আনাগোনায় সে চিহ্ন মুছে গিয়ে থাকবে।

ব্যাপারটা তা হলে এইরকম দাঁড়াচ্ছে যে, মিঃ ব্যানার্জির বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে লোকটা পালিয়ে যাচ্ছিল। সে যখন পেছনের দরজার কাছ বরাবর পৌঁছেছিল তখন মিঃ ব্যানার্জি মাটিতে পড়ে যেতে-যেতেও কোনওরকমে গুলিটা ছোঁড়েন। মৃত্যুর আসন্ন মুহূর্তে হাতের নিশানা ঠিক ছিল না, তবু গুলিটা ফসকায় না, হত্যাকারীর গায়ে বিঁধে যায়। কাকতালীয় ঘটনা এই, বাড়ির ভেতরে যখন এই নাটকীয় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে ঠিক তখনই সদর দরজায় এক ভদ্রলোক এসে হাজির। কিছু না জেনেই তিনি বেল টিপেছেন। ডোর-বেলের আওয়াজ শুনে মিঃ ব্যানার্জি হয়তো দরজা খোলার জন্য করিডোরে বেরিয়ে আসছিলেন, আর তখনই খুনি তাঁকে আক্রমণ করে। তিনি চিৎকার করে ওঠেন কিন্তু রেহাই পান না। নিমেষে ছোরাটা তাঁর বুকে ঢুকে যায় আর সেই মুহূর্তেই তিনিও গুলি ছোঁড়েন। একে জখম, তার ওপর বাইরে লোকজন এসে পড়েছে বুঝতে পেরে খুনি পালিয়ে যায়। হত্যা করা ছাড়াও অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে সে যদি এসেও থাকে, সে কাজ হাসিল করা বোধ হয় সম্ভব হয়নি। এ বাড়ি থেকে সে কিছু হাতিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে কি না সেটা অবশ্য এখনই বলতে পারা যাচ্ছে না। তার জন্য বাড়ির লোকের কাছ থেকে খবরাখবর সংগ্রহ করতে হবে।

লালবাজারে খবর চলে গিয়েছিল সঙ্গে-সঙ্গে। গোয়েন্দা অফিসার এসে গেছেন এরই মধ্যে। সেইসঙ্গে ফরেনসিক বিভাগের লোকজন, ফোটোগ্রাফার, সরকারী ডাক্তার। ছকমাফিক অনুসন্ধানের কাজ চলেছে। ছোরার বাঁটে কোনও হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি, শোবার ঘরের লকার, টেলিফোন বা অন্য সব কিছুতেই মিঃ ব্যানার্জির আঙুলের ছাপ, বাইরের অন্য কারও ছোঁয়া লাগেনি।

রিভলভারটা লাইসেন্স-বহির্ভূত, অন্তত ওঁর নামে কোনও লাইসেন্স নেই। তবে ওর বাঁটে তাঁর হাতের ছাপ স্পষ্ট। রিভলভার থেকে একটিই গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। চেম্বারের মধ্যে বাকি পাঁচটি বুলেট এখনও মজুত। ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানালেন, মৃত্যুর সময় আনুমানিক সন্ধে সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় হৃৎপিণ্ডে ছুরিকাঘাতেই মৃত্যুর, তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কারণ।

মিঃ ব্যানার্জির পরনে আলিগড়ি পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে ঘড়ি। ভদ্রলোক কি কোথাও বেরোতে যাচ্ছিলেন? গ্যারাজে ওঁর অ্যাম্বাসাডার। গাড়ি নিয়ে হয়তো কাছে কোথাও বেরোতে যাচ্ছিলেন। কিছুই অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কারণ বাড়িতে এই মুহূর্তে কেউ নেই। সর্বক্ষণের তদারকি আর ফাইফরমাশ খাটে যে-লোকটা, সেই জলধর কোথাও বেরিয়েছে। রান্নার ঠাকুর খাবার-দাবার গুছিয়ে রেখে বুঝি আগেই চলে গেছে। ঘর পরিষ্কার করার ঠিকে লোক কাছেই বস্তিতে থাকে। তার পাত্তা করা গিয়েছে। সে অবশ্য কিছুই জানে না। ব্যানার্জিমশাইয়ের ছেলে দুটো কাছে নেই। ভাগনের বাড়ি ফেরার সময় হয়নি। সে টিভিতে নাটক করে, রাতদিন ওই নিয়ে মেতে আছে। কে একজন বললেন, সে না কি হালে একটা কোম্পানি খুলেছে বন্ধুবান্ধব মিলে। একটা নতুন সিরিয়াল শিগগিরই রিলিজ করবে।

অনেকক্ষণ পরে পুলিশের কাছ থেকে তলব পেয়ে জয় আর শিবু যখন ব্যানার্জি ভিলার ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকল গোটা বাড়ির দৃশ্যপট ততক্ষণে ভোজবাজির মতো বদলে গেছে। কম্পাউন্ড আলোয় আলোয় দিন বরাবর। ছাদের চার কোনা থেকে চারটে ফ্লাড লাইটের মতো জোরালো আলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বোগেনভেলিয়ার ঝুপসি ছায়ার তলায় যে গ্যারাজ ঘরটা তখন প্রায় চোখে পড়েনি, এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। টানা কোলাপসিবল গেটের ফাঁক দিয়ে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডারের ঘুমন্ত চেহারা নজর এড়ায় না। আলোছায়ায় ঝাপসা গাড়িবারান্দা এখন ঝলমলে। সিলিং থেকে একটা সুদৃশ্য উজ্জ্বল কাচের গ্লোব ঝুলছে। বাড়িটার সব দরজা-জানলাই খোলা, ভেতরে টিউবলাইটের রুপোলি জ্যোৎস্না। যেন আলাদা একটা আলোর মাত্রা।

প্রতিবেশীরা সকলেই পুলিশের খাতায় নিজের-নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। পরে দরকার হলে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। এখন চাই এই অকুস্থলের প্রথম সাক্ষীদের জবানবন্দি। যারা চিৎকার আর গুলির শব্দ শুনে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে গিয়েছিল বাড়ির সদরে। বন্ধ দরজার ওপিঠে কী ঘটেছিল না জানলেও ভেতরে ঢোকার ব্যর্থ চেষ্টা তারা করেছে। তা ছাড়া আরও একটি মানুষ যিনি বাড়ির সদরে প্রথম

আগন্তুক, ফার্স্ট ভিজিটার, ডোর-বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করছিলেন দরজা খোলার, তাঁকে শনাক্তকরণ করার জন্যও বটে। নিরীহ জিজ্ঞাসাবাদের ভেতর থেকেও অভাবিত সূত্র-প্রমাণ বেরিয়ে আসে অনেক সময়। ডিটেকটিভ বইয়ের পোকা জয় তো জানেই, শিবুও না জানে তা নয়। তাই তাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন গোয়েন্দা অফিসার।

গাড়িবারান্দার থামের গায়ে হেলান দিয়ে এক বিহারি কনস্টেবল তরিবত করে খৈনি ডলছিল। আঙুলের ইশারায় সদর দেখিয়ে বলল, "সিধা ভিতরে, সাব্‌লোক বসিয়ে আসেন।"

দু'ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠেই চতুষ্কোণ চত্বরটা যেন সদর আগলাচ্ছে। দুটো বড় পেতলের টবে রবার গাছের বাহারি মূর্তি। তার পাশেই জয়ের এই প্রথম চোখে পড়ল, একটা গোল্লামতন কী পড়ে আছে। এরকম ছিমছাম জায়গায় বেমানান। নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল টক করে। কাগজ, হালকা বাদামি রঙের কাগজের ড্যালা। কেউ অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নিশ্চয়ই। শিবু চাপা গলায় হাসল, "না বলিয়া পরের দ্রব্য···"

"দ্রব্য না, কাগজ! ছোটবেলায় কাগজের বল খেলিসনি?" কাগজের দলাটা পকেটে চালান করে দিতে-দিতে বলল, "কতকাল পরে দেখেই হাত সুড়সুড় করে উঠল।"

"তোর খুব হাতটান হয়েছে রে!"

"তা না, আসলে ফেলা জিনিস মানেই ফেলনা নয়।"

"আর বলতে হবে না, বুঝেছি। যেখানে দেখিবে ছাই···" শিবু আচমকা থেমে গেল। প্যাসেজে ঢুকতেই বাঁ-হাতি ঘরখানার দরজা হাট করে খোলা, পরদা সরানো। সেখানে নিঃশব্দে বসে আছে জনাকয়েক লোক। দরজার দিকে মুখ করে যিনি টেবিলে মধ্যমণির মতো বসে, তাঁর সঙ্গে প্রথম চোখাচোখি হল ওদের। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ, খাড়া নাক, চওড়া চিবুক। যেন ওদের অপেক্ষায়ই বসে ছিলেন। মনে হল শেষ কথাটা ঠিকই শুনেছেন কিন্তু মুখে ভাবান্তর নেই। সাদা ট্রাউজার্সের ওপর গোল গলার আকাশি-নীল গেঞ্জি। বললেন, "এসো।"

গলার স্বর গভীর, গমগমে। পেটাই শরীর আর চুলের ছাঁট দেখে বোঝা যায়, প্লেন ড্রেসের পুলিশ। বোধ হয় সেই গোয়েন্দা অফিসারই হবেন।

ঘরের ভেতরে ঢুকে, নমস্কার করে দাঁড়াতেই বললেন, "বোসো। পাশের খালি দোতলায় শুধু তোমরা দু'জনেই আছ? তোমাদের তো দু' ভাই মনে হয় না। বন্ধু?"

শিবু মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। জয় মানে জয়ন্তর বাড়ির সবাই দেশের বাড়িতে গেছেন। আমরা দু'জনে পাহারায় আছি।"

"বেশ।" একনজরেই দু'জনের মুখ দেখে নিলেন পলকখানেকের জন্য। শেষে বললেন, "আমার নাম অশনিরঞ্জন গুপ্ত, আমি এই দুর্ঘটনার ইনভেস্টিগেশনে এসেছি। মানে···"

"জানি।" জয় আগ বাড়িয়ে বলল, "তদন্ত করতে।"

"ভেরি গুড। গল্পের বইটই খুব পড়ো বোধ হয়।" সামনের দুটো খালি চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "দাঁড়িয়ে কেন, বসে পড়ো।"

ওরা বসতেই অশনি গুপ্ত বললেন, "যতদূর জানি, তোমরাই বোধ হয় প্রথম চিৎকার আর গুলির শব্দ শুনে এখানে ছুটে এসেছিলে?"

"তা কেন?" জয় বলল, "আমরা প্রথম না, আমাদেরও আগে থেকেই, একজন লোক এখানে ছিলেন।"

"কে তিনি? এখানে কী করছিলেন?"

জয় বলল, "জানি না। আগে কখনও দেখিনি।"

শিবুও মাথা নেড়ে সমর্থন করল, "দরজার বেল বাজিয়ে কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন।"

"কার সঙ্গে?"

"জানি না। মানে জিজ্ঞেস করা হয়নি।" শিবু বলল।

"তোমরা নিশ্চয়ই মনোরঞ্জন ভৌমিকের কথা বলছ?"

মনোরঞ্জন ভৌমিক! সে কে? দু'জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

অশনি গুপ্ত ডাকলেন, "ভৌমিকবাবু, চিনতে পারছেন? এরাই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এরাই। লম্বা ছেলেটাই প্রথম হকি স্টিক নিয়ে ছুটে এসেছিল।"

দু' বন্ধুই চমকে তাকাল। আরে সেই লোকটা তো এখনও যাননি। একেবারে শিবুর পাশের চেয়ারেই বসে আছেন। ভিড়ের মধ্যে খেয়াল করেনি দু'জনের কেউই। একদম পাশে বলেই মুখ ঘুরিয়ে তাকানো হয়নি। আসলে অশনিবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার পর থেকে ওদের মনোযোগের বারো আনাই কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি। বাকি চার আনা, টেবিলের ওপর বসিয়ে রাখা একটি যন্ত্র। দু'জনেই চিনতে পেরেছিল ওটা টেপ রেকর্ডার। তবে চালু করা আছে কি না বুঝতে পারেনি।

অশনি গুপ্ত এবার অন্য গলায় কথা বললেন, "নাও বয়েজ, তোমাদের মুখ থেকে সব ঘটনা আমি শুনতে চাই। একেবারে গোড়া থেকে। যে-কোনও একজন বলো, অন্যজন কিছু বাদ পড়লে বা ভুল হলে কিংবা নতুন কিছু মনে পড়লে সেটা ধরিয়ে দেবে। খুঁটিনাটি কিচ্ছু বাদ দেবে না, ভেবেচিন্তে সব বলবে। আচ্ছা তুমিই শুরু করো।" বলেই খচ করে রেকর্ডারের বোতাম টিপলেন, "কী নাম যেন তোমার?"

"জয়, জয়ন্ত দত্ত। আর ওর নাম শিবনাথ হালদার। শিবু বলে ডাকি।" একটু থমকে গিয়ে জয় বলল, "কিন্তু কী বলব বুঝতে পারছি না। কোত্থেকে কেমন করে শুরু করব?"

"রাত তখন ক'টা?"

"এই ধরুন আটটা।"

"বেশ, এবার বলে যাও তোমরা তখন কী করছিলে।"

"টিভি দেখছিলাম, গল্প করছিলাম, ও মাংস রাঁধছিল।"

"ওভাবে বললে হবে না। তোমাদের খুঁটিনাটি কথাবার্তা সব রিপিট করে যাও।"

লজ্জিত ভঙ্গিতে জয় বলল, "আপনি হাসবেন!"

"না, হাসব কেন? তোমাদের তো ছেলেমানুষি থাকবেই। তার ওপর দুই বন্ধু, একসঙ্গে?"

সন্ধেবেলার ঘটনা, সবই একের পর এক মনে পড়ে যাচ্ছিল জয়ন্তর। প্রথমটা একটু বাধো-বাধো ঠেকলেও পরে একটানা ঝোঁকের মাথায় বলে চলেছিল সে। শিবু এক-আধটা কথার খেই ধরিয়ে দিচ্ছিল থেকে-থেকে। আর অশনি গুপ্ত হঠাৎ-হঠাৎ এক-আধটা প্রশ্ন করছিলেন ওকে থামিয়ে। যেমন, ডোর-বেল শুনেই বুঝতে পারল কী করে যে বেলটা ব্যানার্জি ভিলায় বাজছে? চিৎকারটা তো বেশ স্পষ্টই শোনা গিয়েছিল কিন্তু কার গলা সেটা চিনতে পেরেছিল কি? না, চিনতে পারেনি। অস্বাভাবিক জড়ানো গলার আর্তনাদ। কোনও কথা না, শুধুই ভয়-পাওয়া গলায় একটা চিৎকার।

তার বলা শেষ করে জয়ন্ত থামতেই অশনি গুপ্ত প্রশ্ন করলেন, "ব্যানার্জি ভিলায় গিয়ে এমন কিছু চোখে পড়েনি যা তোমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল?"

"বাড়িটা অস্বাভাবিক নির্জন ঠেকেছিল। মনে হচ্ছিল কেউ কোত্থাও নেই। অন্যদিন গমগমিয়ে টিভি চলে কিংবা ভি সি আর। ব্যানার্জি-জেঠুর হাঁকডাক শোনা যায়। পুরনো কাজের লোক জলধরদাকে এটা-ওটা ফরমাশ করেন।"

"কিন্তু আলো জ্বলছিল।"

"হ্যাঁ, বাড়ির ভেতর আলো জ্বলছিল। গাড়িবারান্দায় একটা ডিম লাইট। না না, রাস্তার লাইট পোস্টের আলো এসে পড়েছিল সামনের জমিতে আর গাড়িবারান্দার গায়ে। আমাদের দোতলার ঘর থেকেও আলোর আভা গিয়ে পড়ে।"

"বাড়ির ভেতর আলো জ্বলছিল। অথচ তোমার মনে হয়েছিল বাড়িতে বোধ হয় কেউ নেই। কেন বলো তো ?"

জয় সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল না, কিছু যেন মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল। এক সময় হঠাৎ উত্তেজিত গলায় সে বলে উঠল, "ইস, এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটাই আমি খেয়াল করিনি, আমি কী বোকা ! আমার মাথায়ই আসেনি।"

অশনি গুপ্ত উৎসাহ দিলেন, "বলো, বলে ফেলো।" তাঁর ঠোঁটে যেন প্রশ্রয়ের হাসি।

জয় বলল, "ব্যানার্জি ভিলার সব জানলাগুলোই বন্ধ ছিল। ঘষা কাচের পাল্লার ভেতর দিয়ে আলোর আভা চোখে পড়ছিল, কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অথচ এমন কেন হবে ? এই এপ্রিল মাসের গরমে কেউ সব বন্ধ-ছন্দ করে এয়ার টাইট হয়ে বাস করে না। বিশেষ করে সন্ধে-রাত্তিরে ! অন্যান্য দিন তো খোলাই থাকে। আমি যতদূর জানি, মহিন-জেঠুর আলো-হাওয়ার বাতিক ছিল। ইস, কেন যে ব্যাপারটা আমার খেয়ালে আসেনি !"

"দ্যাট্স রাইট। আলো অনেক কিছুই আড়াল করে রাখে। রবি ঠাকুরের কবিতায় পড়োনি ? রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। আচ্ছা জলধর···"

থানার ও সি-র দশাসই চেহারার আড়াল থেকে কেমন কান্না-জড়ানো আড়ষ্ট অস্ফুট একটা সাড়া এল। জয় ঝুঁকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একটা টুলের ওপর বৃদ্ধ জলধর জবুথবু হয়ে বসে আছেন। ধুতির খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে তাকালেন। চোখ লাল।

"ঠাকুর, রান্নার পাট সেরে চলে যাওয়ার পর সওয়া সাতটা নাগাদ তুমি মহাভারত শুনতে চলে গিয়েছিলে বলেছ। তা যাওয়ার আগে তুমি কি ঘরের জানলাগুলো নিজে হাতে বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলে ?"

"আমি ? কই, না। জানলা তো খোলাই ছিল। কত্তামশাইয়ের ঘরের জানলা তো শীতকালেও খোলা থাকে !"

"ঠিক আছে, তুমি এবার যেতে পারো। আর হ্যাঁ, পৌনে দশটা বেজে গেল, তোমার কর্তাবাবুর ভাগনে, কী যেন নাম, ও, তুহিন চৌধুরী, কই তিনি তো এখনও ফিরলেন না !"

জলধর উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, "আজ্ঞে, ওঁর ফেরাফিরির ঠিক নেই। আটটাও হতি পারে আবার বারোটা-একটাও হতি পারে। আর্টিস মানুষ তো, কেলাবে গেলে আর হুঁশ থাকে না। এই তো পরশু দিন, কত্তাবাবুর সঙ্গে খুব একচোট ফাটাফাটি হল।"

গুপ্ত চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন, "ঝগড়া হয়েছিল, বলছ ? কেন ? কী নিয়ে ?"

"আজ্ঞে, তা তো ঠিক জানিনে বাবু। কত্তাবাবুর চিৎকার শুনে ছুটে আসছিলাম, দেখলাম তুহিন দাদাবাবু মাথা হেঁট করে বেরিয়ে যাচ্ছেন ঘর থেকে। মুখ-চোখের অবস্থা ভাল না। কত্তাবাবু তখন ঘরের ভেতর থেকে চেঁচাচ্ছেন। বলছেন, এ-বাড়িতে থেকে এসব চলবে না। আমি পষ্ট বলে দিচ্ছি, নিজের রাস্তা এবার নিজে দেখে নাও !"

"ব্যস, এইটুকুই শুধু তুমি শুনেছ ? আর কিছু ?"

"না বাবু। তবে এত রেগে যেতে কত্তাবাবুকে কখনও দেখিনি।"

"হুঁ।" অশনি বললেন, "কিন্তু কী নিয়ে এই ঝগড়া বেধেছিল কিছু আন্দাজ করতে পারো ?"

"আজ্ঞে না বাবু। এমনিতে তো দাদাবাবুকে উনি ভালই বাসতেন। তবে এই রাত করে ফেরা উনি তেমন পছন্দ করতেন না। একদিন···"

কথা শেষ হল না জলধরের। বাইরে কার জুতোর শব্দ শোনা গেল, কেউ যেন ছুটতে-ছুটতে প্যাসেজের দিকেই আসছে। একটা অচেনা উদভ্রান্ত গলাও শোনা গেল সেইসঙ্গে, "বাড়িতে পুলিশ কেন ? কী হয়েছে এ-বাড়িতে, অ্যাঁ ! কাউকে দেখছি না কেন ? জলধর··· ও জলধর," বলতে-বলতে এক সুদর্শন যুবক ঝড়ের মতো ঘরের সামনে এসে একদম থমকে যেন বোবা হয়ে গেল।

"তুহিন দাদাবাবু।" জলধর অশনির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল।

কোনওরকমে খাওয়াটা সেরে নিয়ে ওরা যখন দোতলার বসার ঘরে এসে বসল তখন বেশ রাত হয়েছে। শিবনাথ উত্তেজনায় টগবগ করছিল। এমনিতে সে কম কথা বলে, কিন্তু আজ তার মুখে যেন খই ফুটতে চাইছিল। বাড়ি ফিরেই সে বারকয়েক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কী সব বলতে গিয়েছিল, কিন্তু জয়ের গুম মেরে যাওয়া ঠাণ্ডা ভাব দেখে আর ও-প্রসঙ্গ তোলেনি। জয়ের ভেতরেও একটা তোলপাড় হচ্ছিল নিশ্চয়ই কিন্তু মুখে তার প্রকাশ ছিল না। অন্য সময় যার মুখের কামাই থাকে না, সে একদম সাইলেন্ট হয়ে গেলে, মুখে কুলুপ এঁটে বসলে ভারী আশ্চর্য লাগে। শিবুর উৎসাহের মাথায় জল ঢেলে দিয়ে একবার শুধু বলেছিল, "পরে হবে। এখন খুব খিদে পেয়েছে।"

এবারেও শিবুই প্রথম কথা বলল, "জানিস জয়, আমি জীবনে কখনও গোয়েন্দা দেখিনি। এই প্রথম একজন সত্যিকারের গোয়েন্দার সঙ্গে···"

"হ্যাঁ।" জয় বলল, "তবে সরকারি গোয়েন্দা, পুলিশের কর্মচারী।"

"তা হলেও, সত্যিকারের কাজের লোক, খুব ইন্টেলিজেন্ট আর অমায়িক। তোকে ওঁর খুব পছন্দ হয়েছে মনে হল, নইলে ওঁর বাড়ির ফোন নম্বর তোকে দিতেন না। তোর মহিন-জেঠুর ডেডবডি আমাদের দেখতে দেবেন, আমি ভাবতেও পারিনি।"

"আমিও।" বলেই জয় বোধ হয় সেই দৃশ্যই আবার চোখের সামনে দেখতে পেয়ে কেমন শিউরে উঠল, "উঃ, কী সাঙ্ঘাতিক !" রক্ত দেখে আমার গা-টা কেমন ঘুলিয়ে উঠেছিল। আমি কখনও মড়া দেখিনি, শ্মশানে যাইনি, এমনকী রাস্তার অ্যাকসিডেন্টও না। সহ্য করতে পারব না ভেবে রাস্তার ভিড়ে উঁকি মারতে যাইনি পর্যন্ত ! সেই আমি, তুই ভাব, একটা চেনা মানুষকে প্রায় চোখের সামনে খুন হয়ে যেতে দেখলাম !"

"কয়েক মিনিট আগেও লোকটা বেঁচে ছিলেন রে ! সত্যি, কোথা দিয়ে কী যে ঘটে গেল ! সো স্যাড। মরবার পর মানুষের চেহারা কেমন অন্যরকম হয়ে যায়, তাই না জয় ? আমিও তো ভদ্রলোককে কয়েকবার দেখেছি, চিনতে পারছিলাম না যেন। কী বীভৎসভাবে পড়ে ছিলেন মেঝের ওপর, পাঞ্জাবির বুক পকেটের কাছটা রক্তের চাকা, ছুরির বাঁট, হাতের মুঠোয় রিভলভার, ওঃ !"

"আর বলিস না।" জয় বলল, "আমার তখনই বমি উঠে আসছিল, কোনওরকমে সামলেছি।"

"আমি তো ওঁর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। অত বড়-বড় চোখ, কেমন প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল, কী জানি আমাকেই দেখছেন, হয়তো বেঁচে আছেন··· আমার মাথার ভেতরে কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। মনে হল সব ভুল দেখছি। মরা মানুষের হাতে জ্যান্ত হাতঘড়ি, সেকেণ্ডের লাল কাঁটাটা ঘুরছে, ঘুরেই চলেছে··· স্ট্যান্ড করা যায় না। ধোঁকা লাগে, অপটিক ইলিউশন, মানে দৃষ্টিবিভ্রম··· স্পষ্ট দেখলাম ঘড়িতে চারটে বাজে, অথচ আমার হাতঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা···"

"আরে, আমিও তাই···" বলেই জয় শিবুর হাতঘড়ির দিকে কী খেয়ালে তাকাল, দেখল সাড়ে এগারোটা, তার মানে ঠিক এক ঘণ্টা আগে··· কিন্তু··· জয় এবার ভুল দেখার কারণটা যেন ধরতে পারল। বলল, "আসলে কী জানিস, আজকাল আধুনিক স্টাইলের ঘড়ির ডায়াল খুব সাদামাটা, সেখানে সংখ্যার বদলে একই ধরনের একটা করে মোটা দাগ দেওয়া থাকে, ছয় আর বারোর ঘরে ডবল দাঁড়ি, সবটাই বুঝে নিতে হয়। তোর মতো ওয়ান টু থ্রি ফোর লেখা ডায়াল হলে বোধ হয় এই ভুলটা···" জয় হঠাৎই থেমে গেল।

"ঠিক বলেছিস।" শিবু সজোরে সমর্থন জানাল, আমরা দু'জনেই তা হলে একসঙ্গে একই ভুল করতাম না!"

হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎ-চমক খেলে গেল জয়ের চোখের সামনে। সে তখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল শিবুর কবজির ঘড়িটার দিকে। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল, "দাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়া— আমরা দু'জনেই কখনও একসঙ্গে ভুল দেখতে পারি না, একটা ছোট্ট গোলমাল আছে এর মধ্যে!"

অবাক শিবু হাঁ করে তাকিয়ে থাকল জয়ের দিকে। জয় এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল, "ঘড়িটা খোল তো, শিবু।"

শিবুর হাত থেকে ঘড়িটা নিয়ে আবার ওর হাতে পরিয়ে দিচ্ছিল জয়। শিবু বাধা দিয়ে বলল, "উঁহু উঁহু, উলটো হচ্ছে, দে, আমার হাতে দে।"

জয় মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল, "এই তো! বুঝতে পারলি না, গোলমালটা এইখানেই ছিল। ঘড়ির চাবিটা আঙুলের দিকে থাকবার কথা, কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ, মহিন-জেঠুর হাতে ঘড়িটা উলটো করে পরানো হয়েছিল।"

"পরানো হয়েছিল!" শিবুর ভুরুজোড়া কপালের ওপরে উঠে গেল।

"হ্যাঁ, ঘড়িটা কেউ পরিয়ে দিয়েছিল। তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি।"

"কিন্তু কেন? ঘড়ি অন্য কেউ পরাতে গেল কেন?"

"সেইটাই তো ভাববার কথা!" জয় বলল, "চল, তার আগে অশনি গুপ্তকে একটা টেলিফোন করে আসি। ভদ্রলোক বলেছিলেন, কিছু হঠাৎ মনে পড়লে আমাকে জানিয়ো। উনি নিশ্চয়ই এখনও শুয়ে পড়েননি।"

"কিন্তু বডি তো মর্গে চলে গেছে।" শিবু মাথা নেড়ে বলল, "ঘড়িটড়ি তো খুলে নেওয়া হয়ে গেছে কখন। আমাদের কথা তো প্রমাণ করা যাবে না।"

"তা হোক। আমি শুধু ভাবছি অমন একজন ঝানু গোয়েন্দার আর থানার ও সি-র চোখ এড়িয়ে গেল কী করে! আসলে শিবু, ভুল করাই মানুষের স্বভাব। অনেক সাবধানী অপরাধীও যেমন একটা-না-একটা ক্লু ফেলে যায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি গোয়েন্দাও তেমনই চোখের সামনের সহজ সূত্রটি দেখতে পান না কখনও-কখনও।"

একজন শখের গোয়েন্দার থেকে পুলিশের ক্ষমতা অনেক বেশি। যেমন বিশাল তাদের নেট ওয়ার্ক, তেমনই তাদের সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। যে-কোনও খবর খুঁজেপেতে বের করে আনতে সামান্য সময়ের মামলা। টেলিফোন টেলেক্স আর অয়্যারলেসের মাধ্যমে টেবিলে বসেই যে-কোনও দিকে লম্বা হাত বাড়ানো যায়।

অশনি গুপ্তর সৌজন্যে অনেক কিছুই এখন ওদের জানা হয়ে গেছে। কাল গোটা রাত্তিরটাই ওদের নির্ঘুম কেটেছে। আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে দু'জনে নানা জল্পনা করেছে। গোয়েন্দাগিরির শখের দায়িত্ব যেন ওদের ওপরেও বর্তেছে। একটা গোলমেলে অঙ্ক কিছুতেই মেলাতে পারছে না লাগাতার মাথা ঘামিয়েও। সব যুক্তি সমাধানের কাছাকাছি এসেও আবার তর্কে ফেঁসে যাচ্ছে, ধোপে টিকছে না।

মহীন্দ্রনারায়ণ ব্যানার্জি ছিলেন ঘুণ ব্যবসায়ী। এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসায় হালে বিস্তর পয়সা করেছিলেন। কিন্তু মানুষটার আচার-আচরণ কেমন যেন অসামাজিক গোছের ছিল। ভীষণ একগুঁয়ে আর বদমেজাজি বলতে যা বোঝায়, তাই। স্ত্রীর মনে এই কারণেই খুব সুখ ছিল না। স্বামীর অনেক ব্যাপারই তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। ছেলেরাও মায়ের ধারা পেয়েছিল। তারা বাবার ব্যবসার মধ্যে মাথা গলায়নি। পৈতৃক সম্পত্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের-নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। একজন এঞ্জিনিয়ার, অন্যজন ডাক্তার, দু'জনেরই পসার-পয়সা যথেষ্ট। বড় ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ক্ষীণ হয়ে এসেছে, বছরে এক-দু'বার কোনও উপলক্ষে সপরিবারে বেড়াতে আসে। ছোটজন ডাক্তার, কাছেই আছে, খড়্গপুরে। প্রতি সপ্তাহে হয় না, এক সপ্তাহ অন্তর বাবার সঙ্গে দেখা করতে ঠিক চলে আসে। মহিনবাবু অবশ্য এতে মচকাননি। মা-বাপ মরা একমাত্র ভাগনে তুহিনকে তিনি নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, প্রায় ছেলের মতো মানুষ করেছেন। নিঃসঙ্গতার অনেকখানিই ভরিয়ে রেখেছিল তুহিন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর আশা পূরণ করেনি। তার মনও ব্যবসার দিকে ঝোঁকেনি। মহিনবাবুর অবর্তমানে বিজনেস লাটে উঠবে।

এবার আসে উইলের প্রসঙ্গ। সমস্ত সম্পত্তি এই তিনজনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন মহিনবাবু। এটা প্রায় কারওই অজানা ছিল না। কিন্তু দিন তিনেক আগে সে উইল বাতিল করে আর-একটা নতুন উইল তৈরি হয়েছে। সে-খবর ছেলেরা কেউ জানে না। একমাত্র তুহিন বোধ হয় আভাসে জেনেছে। এবারে সমস্ত সম্পত্তি ছোট ছেলের ওপর বর্তেছে। বড় ছেলে আর তুহিন বাদ। জলধর পাবে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা।

খুনের মোটিভ হিসাবে উইলের একটা ভূমিকা থাকে। প্রত্যক্ষে হোক, পরোক্ষে হোক। সেদিক থেকে তুহিন সন্দেহজনক চরিত্রের কোঠায় পড়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। মনোরঞ্জন ভৌমিককে অবশ্য এ-বাড়ির কেউই কখনও দেখেনি। তুহিনও না। ভদ্রলোক আর্ট ডিলার। বিশেষ করে কিউরিও সামগ্রী কেনাবেচা করেন। মাত্রই কয়েক সপ্তাহ আগে মহিনবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়, আজ রাত আটটার সময় মহিনবাবুর সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

অজানা অচেনা আগন্তুক হিসাবে মনোরঞ্জনবাবু সম্ভবত পুলিশের নজর এড়িয়ে যেতে পারেন না। সন্দেহজনক চরিত্র হিসাবে তিনি দু' নম্বর ব্যক্তি। কিন্তু দু' নম্বরি নন, জেনুইন। তাঁর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছে। কোথাও বিন্দুমাত্র ধোঁয়া নেই। সল্ট লেকে বাড়ি করেছেন বছর চারেক। অনেক শিল্পী এবং বিখ্যাত পরিবারই তাঁকে চাক্ষুষ চেনে। বছর দশেক এই লাইনে আছেন। সাদা বাংলায় সংস্কৃতিজগতের দালাল। মহিনবাবুর মৃত্যুর সময়ে তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর অ্যালিবাই খুব মজবুত। ভাগ্যিস জয় আর শিবু সে-সময় বাড়িতে ছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সাক্ষী দিয়েছে, নইলে ফেঁসে যেতে পারতেন। এই অবস্থায় সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছে তুহিন। কারণ, অ্যালিবাই দাঁড়াচ্ছে না। সে জবানবন্দিতে বলেছিল নাটকের মহলায় ব্যস্ত ছিল। চৌরঙ্গি অঞ্চলের এক বাড়িতে তাদের ক্লাব। তাদের বিজ্ঞাপন কোম্পানির অফিসও বটে। দুপুর থেকে সাতটা পর্যন্ত সেখানে রিহার্সাল হয়েছিল সেদিন। তারপর সবাই চলে যাওয়ার পর সে নাকি অফিসেই ছিল সাড়ে আটটা পর্যন্ত। নাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসে ছিল। বাড়ির দরোয়ানের কাছে সে চাবি জমা দিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু লোকটা সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারেনি। দেশোয়ালিরা মিলে তখন আড্ডার আসর জমিয়ে বসেছিল। সুতরাং উইল বদল হয়ে যাচ্ছে এই আশঙ্কায় কিংবা বদলানো হয়ে গেছে জানার পর আক্রোশে তার পক্ষে কিছু একটা করে বসা হয়তো অসম্ভব ছিল না।

শিবু বলল, "তোর কী মনে হয় তুহিন চৌধুরীর পক্ষে তার মামাকে খুন করা সম্ভব ?"

জয় এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "আমার বিশ্বাস হয় না। তুহিনদাকে তো বেশ কিছুকাল ধরেই দেখছি। খুবই ভদ্র, নরম মনের মানুষ। নাটক নিয়েই মেতে আছেন দিনরাত। অর্থের লালসা থাকলে, মামার বিজনেসে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারতেন। তবে মুশকিল হচ্ছে কী জানিস, রাত সাড়ে আটটা অবধি উনি যে চৌরঙ্গির ওই বাড়িতে ছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই। ওঁর পক্ষে কোনও অ্যালিবাই নেই।"

"কেন নেই !" শিবু বলল, "মহিনবাবুর খুনি গুলিতে জখম হয়েছিল। কিন্তু তুহিনবাবু যখন ঘরে ঢুকলেন, তাঁর শরীরে কোথাও ইনজুরির চিহ্ন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।"

এই পয়েন্টটা জয়ের খেয়ালই হয়নি। বলল, "রাইট ! এইটেই তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এঃ, একদম মাথায় আসেনি।"

"কিন্তু একটা প্রশ্ন তা হলে স্বভাবতই উঠবে। মহিনবাবুর কি তেমন কোনও শত্রু ছিল ? যদি থেকে থাকে তো তার মোটিভ কী ?"

"থাকা তো বিচিত্র নয়, হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে-ওঠা ব্যবসায়ীর শত্রু ব্যবসায়ীরাই হয়। হয়তো কতজনের পাকা ধানে তিনি মই দিয়েছেন। আর যেরকম একরোখা আর বদমেজাজি ছিলেন মহিন-জেঠু, তাতে করে কোনও বিপজ্জনক লোকের লেজ মাড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়।"

"আর সেরকম লোকের পক্ষে ভাড়াটে খুনি লাগিয়ে দেওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।" শিবু কথাটা বলে একটু মাথা চুলকোল, "কিন্তু সমস্ত জানলা-দরজা বন্ধ করার কারণটা সেক্ষেত্রে ঠিক ধরা যাচ্ছে না। অকারণ মনে হচ্ছে।"

"আর হাতঘড়ির ব্যাপারটাও, ভেবে দ্যাখ।"

"তবে ক্রিমিনাল অথবা ক্রিমিনালরা সময়টা বেছে নিয়েছিল মোক্ষম। জানত, তখন কেউ থাকবে না। হয়তো মনোরঞ্জন ভৌমিকের অ্যাপয়েন্টমেন্টের

কথাও জানত। তারা কি কাউকে ফাঁসাতেও চাইছিল, ভৌমিক অথবা চৌধুরীকে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার জন্য ?"

"এনি হাউ, আমাদের এই আবিষ্কারের কথা অশনি গুপ্তকে এক্ষুনি জানানো দরকার।"

"কিন্তু এত বেলায় কি আর ওঁকে বাড়িতে পাবি ?"

"না পেলে, লালবাজারে ফোন করে দেখব।" বলেই জয় গলা লম্বা করে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "যা ভেবেছি তাই, একটা বাচ্চা ছেলের গলা পাচ্ছিলাম তখন থেকে। ছোট ছেলে এসে গেছেন ফ্যামিলি নিয়ে। বড়জন কখন আসবেন কে জানে।"

শিবু বলল, "যা তা হলে, দেরি করিস না, চায়ের জল কিন্তু ফুটে এসেছে।"

"আবার চা !"

"প্লিজ, আর-এক রাউন্ড ! নইলে রাত জাগার ক্লান্তিটা কাটতে চাইছে না।"

একটু পরে থমথমে মুখে জয় যখন ফিরে এল তখন ডিশ চাপা দেওয়া দু'কাপ চা সামনে রেখে শিবু ঘড়ি দেখছে। ওদিকে স্টোভে ভাতেভাত চাপিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। বলল, "পেলি মিস্টার গুপ্তকে। ভাবছিলাম তোকে ডাকতে যাব কি না। লেবু-চা করেছি, খা।"

নিজের কাপটা ডিশের ওপর বসিয়ে নিতে-নিতে জয় বলল, "পেলাম, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে।" তারপর বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, "নাঃ, তুহিনদাকে বোধ হয় বাঁচানো গেল না।"

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে সামান্য বিষম খেল শিবনাথ। কাসতে-কাসতে ধরা গলায় বলল, "কেন ?"

"কেননা খুনি, কেবল খুনিই বা কেন, কোনও দ্বিতীয় কেউ ও বাড়িতে আহত হয়নি। কারণ পেছনের দরজার কাছে ছড়িয়ে থাকা রক্তের ফোঁটা পরীক্ষা করে জানা গেছে, সে রক্তও মহিন-জেঠুর। অর্থাৎ স্রেফ সাজানো ব্যাপার, চোখের ধুলো। লোডেড রিভলভারটি থেকে একটি গুলি ছোঁড়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে-গুলি অন্য কেউ ছুঁড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং ওই চিৎকার আর গুলির শব্দের সঙ্গে মৃতের কোনও সম্পর্ক নেই। অনুমান করা হচ্ছে মহিন-জেঠু মারা গিয়েছিলেন গুলি ছোঁড়ার কয়েক মিনিট আগেই। এতই আচমকা তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর হৃৎপিণ্ড যেভাবে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল যে, এটা নিশ্চিত, তাঁর মৃত্যু একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই ঘটে গেছে।"

শিবু যেন ঘটনাটা মেনে নিতে পারছিল না। প্রায় আপত্তি জানানোর গলায় সে জিজ্ঞেস করল, "গুলিটা তা হলে কে ছুঁড়ল, কেন ছুঁড়ল, কাকে লক্ষ্য করেই বা ছুঁড়ল ? কেউ যদি আহত হয়নি তা হলে সেই বুলেটটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি কেন ?"

"সেটাই এখনও পর্যন্ত ধাঁধা।" জয় বলল, "ডিটেকটিভ গুপ্ত বললেন, এমনও হতে পারে পেছনের দরজা তখনও খোলাই ছিল, গুলিটা কম্পাউন্ড ডিঙিয়ে চলে গেছে।"

শিবু বলল, "ঘড়ির কথাটা বলেছিলি ? বিশ্বাস করলেন ?"

"হ্যাঁ। আমি বলার পর মৃতদেহের এনলার্জ করা ছবি দেখে চমকে গেলেন। অনেক প্রশংসা করলেন আমাদের। আর হ্যাঁ, আজই বিকেলে মর্গ থেকে ডেডবডি ছেড়ে দেবে। তবে ছেলেরা নাকি ওখান থেকেই শ্মশানে নিয়ে যাবে দাহ করতে, বাড়িতে আর নিয়ে আসবে না।"

"ছেলেরা মানে ?"

"বড় ছেলেও দুপুরের ফ্লাইটে রওনা হয়েছেন, এনি টাইম এসে পড়বেন। একাই আসছেন শুনলাম। মিঃ গুপ্ত কাল সকাল ন'টায় ব্যানার্জি ভিলায় আসবেন কিছু জরুরি জিজ্ঞাসাবাদ করতে। আমাদের দু'জনকেই বিশেষ করে যেতে বলেছেন।"

সন্ধেবেলায় ব্যানার্জি ভিলায় কোনও সাড়াশব্দ ছিল না। বাড়ি তালাবন্ধ করে সবাই বেরিয়ে গেছেন। কম্পাউন্ডে আগের দিনের মতো জোরালো আলো জ্বলছে। দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ গাড়ি বারান্দার সামনে বেঞ্চ পেতে বসে আছে। সেদিকে তাকিয়ে জয়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা পুরনো কথা। চমকে উঠে বলল, "এই রে ! সেই কাগজটার কথা তো ভুলেই মেরে দিয়েছি রে !"

হ্যাঙ্গারে ঝোলানো প্যান্টের পকেট হাতড়ে বাদামি কাগজের দলাটা বের করে দু'জনে পড়ার টেবিলে চলে এল। উজ্জ্বল আলোয় কাগজের গোল্লাটাকে সাবধানে টানটান করে মেলে ধরল। ভেবেছিল কি না জানি রহস্য খুঁজে পাবে কাগজটার মধ্যে, নিদেন দু-এক ছত্র লেখা, কোনও আপাত-তুচ্ছ সূত্রটুত্র। কিন্তু কোথায় কী ! উৎসাহ মিইয়ে যেতে দেরি হল না, যখন দেখল অতবড় কাগজের গোল্লাটা হয়ে গেল স্রেফ একটা এক কেজি মাপের ঠোঙা। ব্রাউন রঙের শক্তপোক্ত ব্র্যান্ড নিউ ঠোঙা। তার গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত নেই।

শিবু হতাশ গলায় বলল, "যাঃ, বাবা ! ছিল বেড়াল, হয়ে গেল রুমাল ! তাও ফাটা রুমাল। কিছু আমরা আস্ত পেলাম না।"

জয় তেতো গলায় বলল, "সুকুমার রায় ? কোটেশানটাও যদি ঠিকমতো লাগাতে পারিস !"

শিবু বলল, "যেমনটি দেখলাম তেমনটি বললাম। ঠোঙার পেটের কাছটা কেমন ফেঁসে ফুটুমডুম হয়ে গেছে দ্যাখ। ছেলেবেলায় আমরা কত ঠোঙা ফাটিয়েছি ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে, মনে নেই !"

ফাটা ঠোঙার মতো চুপসে গেল জয়। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোল না। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়ে থাকল শিবুর মুখের দিকে। কিন্তু চোখে কোনও দৃষ্টি নেই, শুধু থেকে-থেকে মাথা নাড়ছে দু'পাশে, অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো।

বোমা ফাটল, না গুলির শব্দ হল, কে জানে। ঘরসুদ্ধ মানুষ থ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু দু'জন মানুষ এ-ব্যাপারে অভ্যস্ত। অশনি গুপ্ত আর ও সি পিস্তল হাতে ছুটে বেরিয়ে এলেন প্যাসেজে। দেখলেন দুই মূর্তিমান কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে। একজনের হাতের তালুতে একটা চ্যাপটা হয়ে যাওয়া ঠোঙা। ও সি ধমকে উঠলেন বাঘের গলায়, "কী, ইয়ার্কি হচ্ছে ? এটা কি ছেলেখেলা করার জায়গা !"

গুপ্ত সামলে নিলেন নিজেকে, নিচু গলায় বললেন, "জয় ছিঃ ভাই, এভাবে কি চমকে দিতে আছে মানুষকে ?"

মাথা চুলকে জয় বলল, "আপনারা রেগে যাবেন জানতাম, কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। তাই এক্সপেরিমেন্ট করে দেখালাম।"

এক পলক তাকিয়ে থেকে অশনি বললেন, "তোমাদের কিছু বলার আছে বুঝতে পেরেছি, এসো আমার সঙ্গে।"

পরদিন বিকেলে আচমকাই ফোন করলেন অশনি গুপ্ত, "শোন জয়, তোমরা দু'জনেই এক্ষুনি একবার লালবাজারে চলে এসো। তোমাদের জন্যে একটা বিগ সারপ্রাইস রয়েছে।"

জয় হেসে বলল, "মনোরঞ্জন ভৌমিক তো ? আমরা সেইরকমই সন্দেহ করেছিলাম।"

ছবি : দেবাশিস দেব

ময়না ও টিপু সুলতান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

ময়না বলল, "দাঁড়া, জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিই। তুই ততক্ষণ একটু ওয়েট কর।"

ইলেকট্রিক মিটারগুলোকে ঢাকা দেওয়া যে জালি-জালি গ্রিল তার গায়ে ঠেস দিয়ে ধুলোমাখা শরীরে টিপু অপেক্ষা করতে লাগল, কতক্ষণে ময়নার ফিতেয় গিঁট বাঁধা শেষ হয়। অন্য অনেক কিছুতেই ময়না খুব ওস্তাদ হলে কী হবে, কয়েকটা ব্যাপারে সে এখনও, মানে এই বারো বছর বয়সেও, বেশ আনাড়ি। তার একটা হল, পরীক্ষায় বেশি মার্কস পাওয়া, যতই চেষ্টা করুক তার মার্কস কখনও পঞ্চাশের ঘর ছাড়ায় না। অন্যটা হল, জুতোর ফিতেয় ঠিকঠাক ফাঁস লাগানো, যাতে একটা দিক ঝুলে পড়ে মাটিতে লটপট না করে।

টিপুর সামনে ঘ্যাঁস করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেলেন জিতুকাকু। ওঁর স্কুটার থাকে সিঁড়ির তলায়। টিপু একবার ভাবল, সামনের চাকাটা একটু সরিয়ে নেবে, যাতে জিতুকাকুর রাস্তা খালি হয়। কিন্তু জিতুকাকু একদিন স্কুটার বের করার সময় ওর গায়ে বেশ জোরে ধাক্কা দিয়েছিলেন, ময়না সে-কথা জানেও না। টিপু কিন্তু ভোলেনি। টিপু কিছুই ভোলে না। বোঝেও অনেক কিছু। তাই জিতুকাকুর ঘ্যাঁস করে ব্রেক দেওয়া, মিষ্টি-মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করা, "এই যে মিস ময়না, সাইকেল রেস কেমন চলছে" আর সেইসঙ্গে আড়চোখে রাস্তা আটকে থাকা টিপুর দিকে বিরক্ত-বিরক্ত ভাবে তাকানো, সব মিলিয়ে ওঁর মনের কথাটা হল : আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল যা-হোক।

ময়না বেচারি অতশত বোঝে না। মাথা নিচু করেছে বলে চুলগুলো সামনে এসে পড়েছে, সে দেখতেই পাচ্ছে না সামনে কি হচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো পেছনে পাঠিয়ে সে বলল, "ও জিতুকাকু। এই যে এক্ষুনি হয়ে যাবে।"

জিতুকাকুর ভুরুটা কুঁচকে গেল। কী হয়ে যাবে ? ও, জুতোর ফিতে বাঁধা। এতক্ষণে তাঁর মুখের ভাব একটু নরম হল। এবারে তিনি টিপুর দিকে ফিরলেন। আসলে উনি কী খুঁজছেন, সেটা বুঝতে টিপুর এক সেকেন্ডও লাগল না, সেই দিনের ধাক্কায় কোথায় তুবড়েছে,

কিংবা তুবড়েছে কি না। টিপু চট করে প্যাডল ঘুরিয়ে দিল। চোখ গোল হয়ে গেল জিতুকাকুর। "তোমার সাইকেলকে কি মন্তর পড়িয়েছ নাকি ময়না? নিজে থেকে চলছে।"

ময়না মুচকে হাসল। সোজা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা না করে বলল, "ওঃ হো, মা বলেছিলেন"—বলেই চুপ করে গেল।

"কী বলেছিলেন", জিতুকাকুর চোখ সরু হল। টিপুর ততক্ষণে বাঁই-বাঁই করে প্যাডল ঘুরছে। উহু, ময়না এদিকে তাকায় না কেন?

পরীক্ষায় ভাল না করলে কী হবে, ময়না এদিকে খুব চালাক। একটা বেফাঁস কথা আর-একটু হলেই বলে ফেলছিল আর কি। মা কি বলছিলেন, সে-কথা তো জিতুকাকুকে বলা যাবে না। তাই সামলে নিয়ে বলল, "কী যেন একটা আনার কথা বলছিলেন। আচ্ছা দাঁড়ান, জিজ্ঞেস করে আসি", বলেই সিঁড়ির তিনটে ধাপ টপকে বাঁ দিকে বেঁকেই হাওয়া।

"ময়না, ময়না, আগে তোমার সাইকেলটা সরিয়ে নাও", নীচে থেকে হাঁক পাড়লেন জিতুকাকু, "শোনো, শোনো। মাকে পরে জিজ্ঞেস করলেও হবে।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ময়না ততক্ষণে তিনতলায় পৌঁছে গিয়েছে, কিন্তু দরজার ঘন্টি না টিপে আবার অ্যাবাউট টার্ন হয়ে দৌড় লাগাল নীচে। সেখানে জিতুকাকুর স্কুটার আর ময়নার টিপু সুলতান মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—কীরকম একটা যুদ্ধং দেহি অবস্থা।

"মা বলছিলেন, ইস্ত্রিটার কাজ যদি হয়ে গিয়ে থাকে…"

"ও এই কথা। চলো আমার সঙ্গে।" জিতুকাকু স্কুটার নিয়ে সিঁড়ির নীচে ঢোকাচ্ছিলেন। ময়না টিপুর সিটে একটা হাত হ্যান্ডেলে একটা হাত দিয়ে দাঁড়াতেই টিপু একদম আদুরে বেড়ালছানার মতো ঠাণ্ডা। ওকে ময়না এখন ঝাড়বে, মুছবে—যদিও সাইকেল পেট্রোল, জল কিংবা মোবিল কিছুই খায় না, তবু ময়না ওকে ওইসব জিনিসের নাম করে লোভ দেখাবে, বলবে, "কী রে, খাবি নাকি? অন্তত একটু চকোলেট খা।" তারপর ভাল করে পালিশ করে, চাকার কাদা ধুয়ে তবে তো সে ওপরে যাবে।

"জিতুকাকু আপনি যান। আমি আসছি।" ঝাড়াঝুড়ি সেরে, টিপুর নাকে একটা আদরের থাপ্পড় মেরে ময়না যখন ওপরে উঠল তখন সাতটা বেজে পনেরো। বাড়ি ফিরে পড়তে বসার কথা সাতটার মধ্যে। এই নিয়ে একটু বকাবকি হবে। তা হবে। কী আর করা যাবে। এরকম তাকে প্রায়ই শুনতে হয়। বকেন বেশি মা। বাবা ততটা নয়। তবে তার সবচেয়ে বড় সাপোর্ট ঠাম আর দাদু। ঠাম তো মনে করেন, এইটুকু মেয়ে এতগুলো বই পড়ছে—তাই যথেষ্ট। প্রত্যেকটা বই আবার কি পেল্লায় ভারী। বেশি পড়লে স্বাস্থ্য নষ্ট হবে। "দেখো বউমা মেয়েটা এই বয়সেই চশমা নিয়ে অষ্টপ্রহর বই মুখে করে বসে থাকবে—তাই কি তুমি চাও?"

মা রেগে যান, কিন্তু ঠাকুমার মুখের ওপর কথা বলার সাহস নেই। তাই গজগজ করেন। "কেন? পড়লেই বুঝি চশমা নিতে হয়।" বলে মা যার উদাহরণ দেন শুনেই ময়নার হাসি পেয়ে যায়। মিত্তিরকাকুর ছেলে দুলাল। চশমা নেই ঠিকই। কিন্তু ওকে কোনদিক দিয়ে আদর্শ বলা যায়। আর-একটু যখন ছোট ছিল ওর কাজ ছিল, প্রত্যেক ফ্ল্যাটের দরজার ঘন্টি বাজিয়ে দিয়ে পালানো। একদিন টিপুকে বলে ওর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কার সঙ্গে কী করতে হয় এসব টিপু ঠিক জানে। ময়না মনে-মনে যা ভাবে, ও সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে যায়। মা যদি বারবার ওই দুলালের উদাহরণ দেন, তা হলে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করা দরকার।

দাদু একটু কাশবার মতো শব্দ করে বললেন, "তবে যেন শুনেছিলাম দুলাল এবার সিক্স থেকে সেভেনে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে।"

"কী জানি।" মা আরও রেগে গেলেন, "কিন্তু সাড়ে ছ'টা বাজতেই বল বগলে বাড়ি আসে সেটা তো দেখেছি। আর আপনার এই নাতনিকে দেখুন। হাত-পায়ের ছিরি কী।"

"ও তো ধুলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।" ময়না ইঙ্গিত বুঝেই এক দৌড়ে বাথরুমে। ততক্ষণে তার অন্য একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে। দাদুর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দাদু কত বই পড়েন। অন্য কেউ বই পড়তে ভালবাসে শুনলে দাদু খুব খুশি হন। এই ছেলেটা, আজ তার সঙ্গে যার আলাপ হল, ও তো শুধু বই-ই পড়ে। কী করবে বেচারা!

বিকেলবেলা নিয়মমাফিক পাড়ার রাস্তায়-রাস্তায় চক্কর মারছিল ময়না। আধুনিকার পাশের গলিতে একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেখানে মিস্তিরিরা কেমন কাজ করছে দেখবার জন্য সে সাইকেল থেকে নামল। মোড় থেকে তিনটে বাড়ি ছেড়ে যে তিনতলা লাল গ্রিল দেওয়া বারান্দা, তার একতলায় আজ একজন বসে আছে। কিন্তু সে বুড়ো নয়। ছোট ছেলে, কিন্তু চেয়ারে চুপ করে বসে-বসে রাস্তা দেখছে। আরও অবাক কাণ্ড, সে ময়নাকে দেখে হাসল।

তখন ময়নাকেও হাসতে হল। সে এগিয়ে গিয়ে দেখে ফরসামতো কোঁকড়া চুল হাসি-হাসি মুখ একটি ছেলে কীরকম অদ্ভুত একটা চেয়ারে বসে। মনে হল, ওর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

ছেলেটি বলল, "তুমি খুব ভাল সাইকেল চালাও।"

এর জবাবে কী বলা যায়। ময়না লজ্জা-লজ্জা মুখ করে চুপ করে রইল। টিপু একটু ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠতে ওকে এক থাপ্পড় মেরে চুপ করাতে হল।

"কী হল? সাইকেলের ওপর রাগ কেন?"

"সাইকেল? ও তো টিপু।"

"তার মানে?"

"ভাল নাম টিপু সুলতান। আমার ভাল নাম শর্মিষ্ঠা। তোমার নাম কী?"

"সাইকেলের নাম টিপু সুলতান? এরকম অদ্ভুত নাম কেন?"

এবারে ময়নার মুখ গম্ভীর হল। "কেন, টিপু সুলতান বুঝি অদ্ভুত নাম?"

"না, না, আমি তা বলিনি। বলছিলাম যে, এত নাম থাকতে টিপু সুলতান?"

"টিপু রকেট চালাত। রকেট দিয়ে ইংরেজদের সৈন্যবাহিনীকে ছারখার করে দিয়েছিল।"

"বাঃ", ছেলেটির মুখ খুশিতে চকচক করে উঠল। "উইলি লো-র বইতেও সে-কথা বলা আছে। কিন্তু স্পেস সায়েন্সের বিকাশে টিপুর অবদানকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিদেশিরা বড় রেসিস্ট হয়।"

ময়না অবাক হয়ে দেখছিল ছেলেটাকে। ওইটুকু তো ছেলে, কী সব পাকা-পাকা কথা। ও বলল, "ওসব জানি না। দাদু বলেছেন, তাই। দাদু বলেছেন, টিপু আমাদের হিরো। কিন্তু তোমার কোনও নাম নেই বুঝি?"

ছেলেটি বলল, "সবুজ।"

"কী?" এবারে ময়নার বোকা বনার পালা। সবুজ তো রং—এরকম কারও নাম হয় নাকি? কিন্তু ভদ্রতা করে সে বলল, "বাঃ সবুজ—কী সুন্দর নাম। এরকম নাম অবশ্য আমি আগে শুনিনি।"

টিপু অস্থির হয়ে উঠছিল। অন্যমনস্কভাবে ময়নার হাতের চাপ পড়েছে কী পড়েনি টিং-টিং, টিং-টিং করে তারস্বরে ঘণ্টি বাজতে শুরু করেছে। ওর ভাল লাগছে না চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে।

"আমি আজ যাই", ময়না বলল। "কাল আসব। তুমিও চড়তে পারো—টিপু অবশ্য..."

টিপু অবশ্য পছন্দ করে না আর কেউ চড়ুক। কিন্তু সে-কথা এই নতুন ছেলেটাকে বলা ঠিক হবে না ভেবে মাঝপথে থেমে গেল সে।

ছেলেটি কেমন যেন নিভে গেল। "আমি? আমি তো সাইকেল চালাতে পারি না।

শিখে যাবে, কতক্ষণ লাগবে। অবশ্য আছাড় খাবে কয়েকবার।" দৃশ্যটা কল্পনা করেই হাসি পেয়ে গেল ময়নার।

ছেলেটি বলল, "আমার অসুখ। তাই আমি বাড়ি থেকে বেরোই না।"

"বেরোও না? একদম না?"

"নাঃ।"

"কী করো তা হলে?"

"বই পড়ি।"

"সারাদিন শুধু বই পড়ো?"

"হ্যাঁ, আমার খুব ভাল লাগে।"

ময়না ভাবল তা হলে তো বাবা তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এইখানেই খতম। সে যাক গে। যার যা ভাল লাগে। কারও বই পড়তে, কারও সাইকেল চালাতে। তা ছাড়া, ছেলেটাকে ভালই মনে হচ্ছে। চশমা যদিও নেই কিন্তু দুলালের মতো নয়।

ময়না ভরসা দিয়ে বলল, "তোমার অসুখ সেরে গেলে আমি তোমাকে সাইকেল চালাতে শিখিয়ে দেব।" টিপু এত অস্থির হয়ে উঠছিল যে, এর পরে ময়নার সেখানে থাকা অসম্ভব—সে হাত নেড়ে দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল।

ছেলেটির কথা দাদুকে বলতেই বাবা কান খাড়া করলেন। "কোন বাড়িটা বল তো?"

ময়না বুঝিয়ে দিল। বলল, "ওই তো আধুনিকার মোড়ে যে বাড়ি তৈরি হচ্ছে তার সামনের তিনতলা লাল গ্রিল।"

বাবা বললেন, "বুঝেছি। সান্যাল আমাকে বলছিল বটে। ভেরি আনফরচুনেট।" তারপর বাকিটা দাদুকে বললেন ইংরেজিতে। দাদুও সহানুভূতিসূচক দু-একটা কথা বললেন। ময়না এইটুকু বুঝল যে, ওঁরা সবুজের বিষয়ে এমন কিছু বলছেন যার বাংলায় মানে দাঁড়ায় দুর্ভাগ্যজনক। এই কথাবার্তা থেকে ইচ্ছে করে ময়নাকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে বলে খুব রাগ হয়ে গেল তার। ওঁরা তো সবুজকে কেউই চেনেন না, দেখেনওনি। ময়না বলল, তাই জানলেন। এখন ইংরেজিতে গম্ভীর মুখে কী সব বলা হচ্ছে।

"ও কিন্তু খুব বই পড়ে, জানো দাদু।" আলোচনার মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করল সে।

বাবা ওর দিকে একবার তাকালেন। দাদু বললেন, "সে তো ভাল কথা।"

ময়না তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি কিন্তু ওকে সাইকেল শেখাব বলেছি।"

বাবা বললেন, "সে কী, টিপু সুলতানকে অন্যের হাতে সমর্পণ ময়নার প্রাণ থাকতে!"

মা এতক্ষণ এঁদের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। এবারে ময়নার দিকে ফিরে ধমকের সুরে বললেন, "সাইকেল শেখাবে। ওকে! বোকামির একটা লিমিট আছে।"

ময়নার চোখে জল আসার উপক্রম দেখে দাদু তাড়াতাড়ি ওকে কাছে টেনে বললেন, "না, না। আমাদের ময়নামতীকে বোকা কে বলে! আসলে কথাটা হল এই, সবুজের পায়ের যে অসুবিধেকে ও অসুখ বলছে, সেটা থাকার জন্যই ওর পক্ষে সাইকেল চালানো..." কথাটা দাদু শেষ করলেন না। কিন্তু ময়না এর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জের গন্ধ পেল।

"কিন্তু দাদু, সাইকেল চালালে পায়ের মাস্‌ল শক্ত হয়।"

"শাবাশ। এই তো আমার ময়নামতী।" দাদু আলতো করে একটা থাপ্পড় দিলেন নাতনির পিঠে। "কখনও

হাল ছাড়তে নেই। বলা যায় না, সবুজ একদিন হয়তো হার্ডল রেসে ফার্স্ট হবে।"

ঠাম বললেন, "আহা, তাই যেন হয়।"

বাবা বললেন, "সান্যালের কাছে যা শুনেছি—হলে ইট উইল বি এ মিরাক্‌ল।"

টিভিতে ততক্ষণে খবর শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এ-বিষয়ে কথা আর এগোল না।

পরের দিন বিকেলে ময়না যথারীতি বাঁই-বাঁই করে চক্কর কাটছে। আজ ও খুব চিন্তিত। প্রথমেই ও গেল সবুজদের বাড়ির রাস্তায়। সবুজ বারান্দায় নেই। এখনই আসবে হয়তো। কীরকম করে ও আসবে জানতে কৌতূহল হল তার। হেঁটে? কারও হাত ধরে? কোলে চড়ে? এতবড় ছেলে কোলে চড়ে—তাও কি হয়? তা হলে? ভাবতে-ভাবতেই ওদের দরজার পরদাটা সরে গেল—একজন মহিলা, নিশ্চয়ই বাড়ির কেউ, ওটা তুলে ধরলেন আর বেরিয়ে এল সবুজ। আরে এ তো ভারী মজার খেলনা। সবুজের সামনে একটা চাকা লাগানো জিনিস, সেটা ঠেলতে-ঠেলতে ও আসছে। দুটো লাঠিকে যদি আর একটা লম্বালম্বি ডাণ্ডা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায় তা হলে যেরকম হয়, অনেকটা সেইরকম। সবুজ চেয়ারে বসে পড়তেই মহিলা চাকা লাগানো জিনিসটা নিয়ে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হলেন। ময়না সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করছিল। এবারে একটু স্পিড কমাল। কিন্তু নামল না।

"এই যে ময়নামতী সাইকিলোতি।"

থেমে গেল ময়না।

"তুমি কী করে জানলে দাদু আমাকে ময়নামতী বলে ডাকেন?"

সবুজ হাসল। ময়না মোড় অবধি ঘুরে আবার ফিরে এল।

"আর কী বললে ওটা?"

"সাইকিলোতি।"

"তার মানে?"

"তার মানে সাইকেল চড়ে।"

"এটা আবার কোন ভাষা?"

"কেন, সংস্কৃত? ধাতুরূপ জানো না? তি তস অন্তি, সি থস থ···"

"থামো থামো। ওহ্‌, কী মজার ভাষা। তিস তিস তিন্তি···"

"তি তস অন্তি—করতি করতঃ করন্তি, চলতি চলতঃ চলন্তি···"

"দৌড়নোর সংস্কৃত কী?"

"বলব কেন?"

ময়নার মুখ গম্ভীর হচ্ছে দেখে সবুজ

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সংস্কৃত শেখা কি অতই সহজ ভেবেছ? ইংরেজির মতো? প্রথমে দেখতে হবে কে দৌড়চ্ছে—আমি? আমরা দু'জন? আমরা সবাই? না তুমি, না তোমরা? না সে কিংবা তারা। ধাতুরূপ জানতে হবে। মুখস্থ করতে হবে।"

"ধাতুরূপ কাকে বলে?"

"ক্রিয়াপদের সব রূপ, যেমন আমি যাই, আমরা যাই, তুমি যাও, তোমরা যাও, সে যায়, তারা যায়।"

"এর মধ্যে আবার জানার কী আছে। এ তো সবাই জানে।"

"সবাই মানে কি সত্যি সবাই? যারা গুজরাতি বলে তারা কি জানে?"

ময়না ভুরু কুঁচকে ভাবার চেষ্টা করল। মনে পড়ে গেল গায়ত্রী দিভাতিয়ার কথা। সে বলে, আপনি যাচ্ছে। কিন্তু এইসব পড়াশোনা আর মুখস্থ করার কথা বলে মিছিমিছি সময়টা বাজে খরচা করা কেন। সে তো এই উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। উদ্দেশ্যটা বলে ফেলার জন্য তার আর তর সইছিল না।

"সবুজ, ওসব ছাড়ো। কাল তোমাকে কী বলছিলাম, মনে আছে?"

সবুজ ভাববার চেষ্টা করল।

"কী বলেছিলে? তোমার সাইকেলের নাম টিপু সুলতান কেননা, টিপু আমাদের হিরো। তোমার দাদু বলেছেন।"

প্রশংসার চোখে তার দিকে তাকাল ময়না।

"একদম ঠিক। তবে আর-একটা কথা বলেছিলাম মনে পড়ছে?"

"বলেছিলে কাল আবার আসব।"

"তা ছাড়া?"

"আর তো কিছু মনে পড়ছে না। তুমি কোথায় থাকো, কোন স্কুলে পড়ো, কোন ক্লাসে—এসব তো কিছুই বলোনি।"

মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল ময়না। আলাপ হলেই কেন যে লোকে জিজ্ঞেস করে, কোন স্কুলে পড়ো, কোন ক্লাসে উঠলে। শুনলেই ওর রাগ হয়ে যায়। মনে হয় উত্তর দেয়, আমি পড়াশোনা করি না। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। কী হবে পড়াশোনা করে? তার চেয়ে বাঁই করে রেললাইন পেরিয়ে লেকের রাস্তায় চক্কর কাটতে কী মজা। একদিন ওদিকে গিয়েছিল, তখন লেকের জলে বাইচ চলছে—কত লোকের ভিড়, কী হুল্লোড়। কথাটা অবশ্য বাড়ির কেউ শুনলে সর্বনাশ। পাড়ার বাইরে যাওয়া বারণ। এই শর্তে ওকে সাইকেল কিনে দিয়েছেন দাদু।

"তোমাকে সাইকেল চালাতে শেখাব বলেছিলাম, ভুলে গেলে এরই মধ্যে?"

সবুজের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে দেখে ময়না তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "জানি, জানি। আর বলতে হবে না। দেখি তো তোমার কেমন পায়ের অসুখ। দরজাটা খুলবে একটু?"

"তুমি বেলটা বাজাও। পিসি এসে গেট খুলে দেবে।"

এই সামান্য কাজটার জন্যও একে আর কাউকে ডাকতে হয়। বেচারার খুব মুশকিল তো! ময়না টিপুকে রেলিঙে হেল'ন দিয়ে রেখে সিঁড়ির দিকে এগোল। ও পেছন ফিরতেই টিপু গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হল, তারপর গুঁড়ি-গুঁড়ি এমনভাবে এগিয়ে এল, যেখান থেকে বারান্দার ভেতরটা দেখা যায়। আসলে সবুজের কী হয়েছে জানার কৌতূহল তারও কম হচ্ছিল না।

ময়নার ঘণ্টি শুনে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি কিন্তু আর একজন। সবুজকে যিনি পরদা সরিয়ে বারান্দায় নিয়ে এসেছিলেন, তিনি নন। ময়নাকে দেখে তিনি একটু অবাক হলেন। কারণ, একে তিনি চেনেন না। তাঁর যদি সবুজের মতো বারান্দায় বসে থাকা অভ্যাস থাকত তা হলে চিনতে কোনও অসুবিধে হত না।

"তুমি বেল বাজিয়েছ?"

"হ্যাঁ, একটু ভেতরে আসব।"

সবুজ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "পিসি, ও ময়না। ভাল নাম শর্মিষ্ঠা। আর ওই যে ওর সাইকেল—টিপু সুলতান।"

পিসি গেট খুলে ময়নাকে ভেতরে ডাকলেন। বাইরে টিপু ভারী খুশি হয়ে ছোট্ট করে হ্যান্ডেল নাড়িয়ে নমস্কার জানাল। ময়না পিসির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই পিসি ওর চিবুক ছুঁয়ে বললেন, "থাক, থাক।" কেউ তাকে আদর করছে না দেখে টিপু অভিমানভরে মাথা ঝাঁকাতেই টলমল করে উঠল তার দেহ। আর হবি তো হ সেই মুহূর্তেই আর-একটা ঘটনা ঘটল। যার ফলে টিপু আর ব্যালান্স রাখতে না পেরে দড়াম করে পড়ল কার যেন ঘাড়ে।

আসলে হয়েছিল কী, ঠিক এখনই কালুর পেছন-পেছন ঢিল নিয়ে ছুটছিল দুলাল। কালুর গায়ে কালো ছোপ-ছোপ, তাই পাড়ার ছেলেরা ওর নাম দিয়েছে কালু। ওকে সবাই আদর করে খেতে দেয়, ওকে নিয়ে খেলা করে। কালু তাই নেড়ি-কুত্তা হয়েও অনেকটা পোষা কুকুরের মতো। দুলালের মাঝে-মাঝে কুকুরদের ঢিল মেরে মজা করার ইচ্ছে হয়—আজ সে পড়েছিল কালুকে নিয়ে। কিন্তু কালুর সঙ্গে দৌড়ে কে পারবে! সে তো দুলালের হাতে ইটের টুকরো দেখেই চক্ষের নিমেষে পগার পার। তার পেছন-পেছন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছিল দুলাল। সবুজদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সোজা গিয়ে পড়েছে টিপুর ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে দু'জনেই চিতপটাং।

উঠে দাঁড়িয়ে বেদম রাগে সাইকেলের চাকায় একটা লাথি কষাল দুলাল। আর তারপরেই আর্তনাদ। তার চিৎকার শুনে সবুজ, সবুজের পিসি, ময়না সবাই ওদিকে ফিরে এই দৃশ্য দেখে তো থ। ময়না এক দৌড়ে নেমে এসেছে। দুলাল ততক্ষণে উঠেছে। তার চোখে যেন আগুন ঝলসাচ্ছে।

"তুই আমার টিপুকে লাথি মারলি কেন?" ময়না নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে শুধু মুখেই প্রশ্নটা করল।

"টিপুকে লাথি মারলি কেন?" মুখ ভেঙিয়ে উঠল দুলাল। "যেখানে-সেখানে সাইকেল দাঁড় করিয়ে রাখ কেন? ভারী তো সাইকেল তার আবার নাম। টিপু—হুঁঃ।"

টিপুর যে-স্পোকটা দুলালের পায়ে বিঁধে গিয়েছিল সেটা আর-একবার ঘুরে এসে ওর অন্য পায়ে আঁচড়ে দিয়ে গেল। ময়না দেখে টিপু ভালমানুষের মতো মাটিতে শুয়ে—কেবল একটা চাকা বন-বন করে ঘুরছে—তার একটা স্পোক আলগা।

আ-আ করে আবার এক গগনভেদী চিৎকার ছাড়ল দুলাল। "মা, মা, দেখে যাও ময়না আমার গায়ে ওর সাইকেল ফেলে দিয়েছে।" তার চেঁচানি শুনে এবারে সবুজের পিসি নীচে না নেমে পারলেন না।

"দেখি তো খোকা কোথায় লাগল—একটু ডেটল লাগিয়ে দিই।"

এক ঝটকায় তাঁর হাত ছাড়িয়ে বাড়ির দিকে ছুট লাগাল দুলাল। "মা, মা, দেখে যাও, ময়নার সাইকেল..."

ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল ওর গলা। পিসি ও ময়না পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করলেন। ময়না টিপুকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। এঁদের সামনে ওকে বকাবকি করাটা ঠিক হবে না। তা ছাড়া এইসব ঘটনার পর ওর প্ল্যানটা পুরো ভেস্তে গেল। এখন কি আর পিসি ওর হাতে সবুজকে ছাড়বেন? সত্যি, টিপুটাও বেয়াক্কেলের চূড়ান্ত। যত কেরামতি কি সবুজের পিসির সামনে না করলেই চলছিল না! মাথা নিচু করে বারান্দায় উঠে এল ময়না। সবুজ সমস্ত ব্যাপারটা চুপ করে লক্ষ করছিল। এবারে সে বলে উঠল, "ছেলেটা ভারী দুষ্টু তো। নিজেই ধাক্কা দিয়ে সাইকেলটা, মানে টিপুকে ফেলল..."

ময়না গম্ভীর মুখে বলল, "ও দুলাল।" যেন তাতেই সব বলা হয়ে গেল।

পিসি খানিকক্ষণ কোনও কথা বললেন না। নতুন পাড়া, বিশেষ কাউকে চেনেন না। তবে ময়নাকে দেখে তাঁর বেশ ভাল লেগেছে। উনি বললেন, "দ্যাখো তো, কী কাণ্ড। যাকগে, তোমার সাইকেলের, মানে টিপু সুলতানের লাগেনি তো?"

"একটা স্পোক খুলে গেছে।"

"ওহো, তা হলে কী হবে?"

"কিছু হবে না। ইউসুফকাকার কাছে নিয়ে গেলেই হবে।"

"তোমার তো খুব সাহস। আচ্ছা, একটু বোসো। মিষ্টি নিয়ে আসি।"

ময়না আর-একটা খালি চেয়ার টেনে বসল। দুলালটা যে কী। দিল সমস্ত বিকেলটা মাটি করে। এখন তো আসল কথাটা বলাই যাবে না।

প্লেটে করে মিহিদানা আর সীতাভোগ নিয়ে এলেন পিসি।

"খাও। একেবারে খাস বর্ধমানের।"

সবুজ বলল, "মা এনেছে। মা রোজ বর্ধমানে যায়।"

"কেন?"

"পড়াতে।"

"ও।" ময়না এর পরে কী বলবে ভেবে পেল না। কিন্তু পিসি বেশ গপ্পে-মানুষ। উনি বললেন, "তা তোমার সাইকেলের নাম যখন টিপু সুলতান, তোমার নাম হওয়া উচিত রাজিয়া সুলতানা।"

ময়না কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই সবুজ বলে উঠল, "তা কী করে হবে পিসি। রাজিয়া সুলতানা হল ইলতুতমিসের মেয়ে। রাজত্বকাল ১২৩৬ থেকে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ। আর টিপু সুলতান হায়দার আলির ছেলে। জন্ম ১৭৫০-এ। একজন ছিল দিল্লিতে, অন্যজন মহিশূরে— সময়ের ব্যবধান পাঁচ শতাব্দীর।"

"নাঃ, তোর কাছে কোনও কথা বলে পার পাওয়ার জো নেই।" বলে পিসি উঠলেন।

পিসি চলে গেলেন ভেতরে। অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল ময়না। সামনে একটা বাড়ি ভাঙা হচ্ছে— অনেক লোক মাথায় করে ইট নিয়ে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। আওয়াজ আসছে ঠং ঠং। মাটিতে পাতা লোহার ছড়ের ওপর ডাণ্ডা মারছে দু'জন লোক।

"কী হল? মিহিদানা খাও।" সবুজ বুঝতে পারছিল না সামনে খাবার ফেলে ময়না এত কী চিন্তায় পড়ে গেছে।

"হ্যাঁ খাচ্ছি। তুমি খাবে না?"

সবুজ একটু মুখটা বেঁকাল। "মিহিদানার চেয়ে আমার চকোলেট বেশি

ভাল লাগে।"

ময়না অবাক হল। তার মানে এদের বাড়ি প্রায়ই মিহিদানা আসে। হয়তো রোজই ওর মা পড়িয়ে ফেরার পথে আনেন।

"বর্ধমানে কাকে পড়াতে যান তোমার মা?"

"কাকে? তার মানে?"

"তুমি যে বললে পড়াতে যান।"

"ও!" হো-হো করে হেসে উঠল সবুজ। "সে তো ইউনিভার্সিটি। খুব সুন্দর জায়গা, মা'র কাছে শুনেছি।"

"তুমি যাওনি কখনও?" মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েই ময়না মনে-মনে জিভ কাটল। চট করে কথা ঘুরিয়ে বলল, "চকোলেট ভালবাসো তো মাকে বললেই পারো।" সে ভাবল যিনি রোজ মিহিদানা আনেন তিনি নিশ্চয়ই অসাধারণ ভাল লোক।

"মা বলে চকোলেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। বিশেষ করে আমার পক্ষে। আমার তো কোনও একসারসাইজ হয় না।"

এই সুযোগ। ময়না চট করে একবার দরজার দিকে দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "সবুজ, সাইকেল চালানো খুব ভাল একসারসাইজ, জানো তো।"

"জানি। কিন্তু তাতে আমার কী।"

"সাইকেল চালালে পায়ের মাস্‌ল শক্ত হয়।"

এবারে সবুজ চুপ করে রইল।

"পিসি এখন কী করছেন?"

"টিভি দেখছে।"

"বাইরে আসবে না তো?"

"মনে হয়, না।"

"তা হলে এবারে দেখো আমি কী করি।"

এক দৌড়ে ময়না রাস্তা পার হয়ে যেখানে নতুন বাড়ি হচ্ছে, সেখান থেকে টানতে-টানতে একটা লম্বা সরু কাঠের তক্তা নিয়ে সবুজদের সিঁড়ির ওপর ফেলল। একজন মিস্ত্রি হাঁ-হাঁ করে উঠতেই ও বলল, "এক মিনিট। এক্ষুনি আবার ফেরত দিয়ে যাব।" ব্যাপার দেখে টিপু উৎসাহিত হয়ে নড়েচড়ে উঠল। ময়না তার হ্যাণ্ডেলে এক হাত আর সিটে এক হাত রেখে ফিসফিস করে কী সব বলল। টিপু গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনল। "কী রে পারবি তো? ফেলে দিবি না তো ওকে?" টিপু এমন একটা শব্দ করল যার মানে হয়, পাগল। একবার কাজটা আমাকে দিয়েই দ্যাখো না। এবারে টিপুকে নিয়ে তক্তার ওপর দিয়ে

তরতরিয়ে বারান্দায় উঠে এল ময়না।

"এসো সবুজ। প্যাডলে একটা পা রাখো।"

সবুজ ইতস্তত করতে লাগল।

"আমার হাত ধরে ওঠো। ওঠো বলছি।"

"পারব না।"

"পারব না আবার কী। নিশ্চয়ই পারবে। তুমি শুধু একটু প্যাডলে পা-টা রাখো।"

সবুজকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দিল ময়না। তার পরের ব্যাপারটা যেন চক্ষের নিমেষে ঘটে গেল। সবুজ কিছু বোঝার আগেই দেখে সে সাইকেলের সিটে বসে একটু-একটু করে প্যাডল ঘোরাচ্ছে।

"শাবাশ টিপু।" হাততালি দিয়ে উঠল ময়না। সবুজের দৃষ্টি কিন্তু দরজার দিকে— তার মুখে একই সঙ্গে ভয় আর উত্তেজনা। ময়না মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, "ছি ছি। আর চ্যাঁচাব না। কিন্তু তুমি প্যাডল করতে পারছ তো সবুজ?"

সবুজের মনে হচ্ছিল প্যাডল দুটোই ধাক্কা মেরে তার পায়ের পাতা একবার নীচে একবার ওপরে করে দিচ্ছে। খুবই আশ্চর্য লাগছিল তার। এ কি সে নিজে না অন্য কারও পা ধার করেছে।

উত্তেজনার চোটে ময়না একবার এ-পায়ে একবার ও-পায়ে ভর দিয়ে তিড়িং-তিড়িং করছে। সেদিকে তাকিয়ে টিপু ভাবল বাঃ আমাকে স্টেডি থাকতে বলে নিজে তো খুব নাচা হচ্ছে। কিন্তু না, তাকে যে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেদিক থেকে অন্য দিকে মন ফেরানো যাবে না। যদি সবুজ পড়ে যায়!

"ময়না, ময়না— আমি নিজে প্যাডল করতে পারছি।"

"আমি জানতাম। কিন্তু একদিনের পক্ষে বেশি একসারসাইজ হয়ে যাচ্ছে। টিপু..."

বাধ্য ছেলের মতো টিপু সবুজের চেয়ারের সামনে এসে একটু কাত হতেই সবুজ স্লাইড করে ঠিক নিজের জায়গায় খাপে-খাপে ঢুকে গেল। টিপুকে নিয়ে ময়না মুহূর্তের মধ্যে নীচে নেমে গেছে। চেয়ারে বসে দম নিতে-নিতে সবুজ দেখল ময়না কাঠের তক্তাটা টানতে টানতে সামনের বাড়িতে ফেরত দিতে যাচ্ছে। মিস্ত্রিটার সঙ্গে কী কথাবার্তা হচ্ছে। সে এদিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে কী যেন বলল। ময়না আবার এক দৌড়ে এদিকে এসে চেঁচিয়ে জানতে চাইল ক'টা বেজেছে।

"সাতটা দশ" বলল সবুজ। তার হাতের রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে।

"এই সেরেছে।" ময়না রেলিঙের কাছে ঘেঁষে এল। "কাল আবার, বুঝেছ? কাউকে বোলো না। খবর্দার।"

মাসখানেক পরে ময়না একদিন ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরে হোম ওয়ার্কে মন বসাবার চেষ্টা করছে এমন সময় দরজায়

ঘন্টি। মা বললেন, "একটু দ্যাখ তো।"

জিতুকাকু ভেতরে ঢুকে বললেন, "বউদি আবার একটু ইস্ত্রিটা নিতে এলাম। ছেলের স্কুলের ইউনিফর্ম প্রত্যেকদিন ছুরির মতো শার্প না হলে নাকি বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে রাখে। যত সব— আমাদের সময়ে·····" —হঠাৎ ময়নার দিকে চোখ পড়তে তাঁর কথার স্রোত থেমে গেল মাঝপথে। দু' চোখে প্রশ্নচিহ্ন ফুটিয়ে তিনি চার্জ করলেন···

"এই যে মিস ময়না? তোমার সাইকেলে সেদিন কাকে চড়াচ্ছিলে? মনে হল একটি নতুন ছেলে— আগে তো কোনওদিন পাড়ায় দেখিনি।"

ময়না এমন ভান করল যেন কথাটা কানেই যায়নি। কথাটা সকলেই শুনতে পেলেন। তবে জিতুকাকুকে কেউ তেমন আমল দিতে চায় না, তাই ঠাকুমা যেমন বুনছিলেন বুনতে লাগলেন— দাদু ম্যাগাজিন মন দিয়ে পড়তে লাগলেন— বাবা টিভির ছবিটা টিউন করার জন্য পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। ভাগ্যিস মা তাড়াতাড়ি এসে ইস্ত্রিটা দিয়ে বুদ্ধি করে বললেন, "সকালে কিন্তু আমার লাগবে···" সুতরাং জিতুকাকু আর এক মিনিটও দাঁড়ালেন না।

জিনিসপত্র চাইতে আসা নিয়ে মা ও বাবার মধ্যে দুটো মত আছে। বাবা বলেন, ইস্ত্রিওয়ালা তো রোজই আসে। তাকে কাপড় দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। মা বলেন প্রতিবেশী কিছু চাইতে এলে না বলাটা অসভ্যতা। বাবা বলেন, কিন্তু যে ফেরত দিতে ভুলে যায় তার সঙ্গে একটু অভদ্রতা করতে দোষ নেই। একবার না বলে দিলে সে জীবনে আর চাইতে আসবে না। এই নিয়ে অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে। যাই হোক আজ কিন্তু জিতুকাকু দুম করে দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার পর সমস্ত ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নিল।

মা ময়নার দিকে সোজা তাকালেন। "কাকে চড়াচ্ছিলি তোর সাইকেলে?"

ঠাম তাড়াতাড়ি ময়নার পক্ষ সমর্থন করার জন্য বলে উঠলেন, "হবে কেউ। দুলালটুলাল হয়তো। ছেলেরা চাইলে ও কী করে না বলে!"

মা কঠিন দৃষ্টিতে বললেন, "দুলাল কে?"

দাদু এই সময় অস্বাভাবিক জোরে বললেন, "দেখেছ, দেখেছ অ্যামেরিকানদের প্রোপাগাণ্ডা?"

বাবা টিভি ছেড়ে সোজা হলেন।

ঠাম বোনা থামিয়ে বললেন, "আবার কী হল?"

বাবা বললেন, "আজকালকার যুদ্ধ তো চালাচ্ছে প্রচার-মাধ্যমগুলো। নতুন কী বলছে ওরা?"

দাদু লম্বা গল্প ফাঁদলেন— একটা আমেরিকান টেলিভিশন কোম্পানি কুয়েত সম্পর্কে অনেক কথা যে বানিয়ে-বানিয়ে বলা হচ্ছিল সেসব ফাঁস করে দিয়েছে। সাদ্দাম নাকি ছোট্ট বাচ্চাদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। এখন জানা যাচ্ছে সব বাজে কথা।

ময়নার কপাল ভাল। মা এই আলোচনার মধ্যে ঢুকে গেলেন। বাড়িতে সাদ্দামের পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটো দল। কাজেই অনেকক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলবে। ময়নাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তবে সবুজকে সাইকেল চালাতে যে অনেকেই দেখে ফেলবে এটা তো জানাই.কথা। বাবার রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে সান্যালকাকুর কাছ থেকে সবরকম লেটেস্ট রিপোর্ট নিয়মিত আসছে। এখন সবুজের পিসিও জানেন। এখন চেয়ার থেকে সবুজ নিজেই ওঠে, লাঠি না ধরে নিজে-নিজেই হাঁটতে পারে। তবে সাইকেল চালাবার সময় কিন্তু একদম অন্য মানুষ। কে বলবে ওর পা কমজোর। পিসি বলেছেন ডাক্তারবাবু খুব অবাক হয়েছেন। আবার একবার সবুজকে থরো চেক-আপ করা হবে।

ঠাম হঠাৎ বললেন, "ভাল কথা বউমা। সবুজের পিসি ফোন করেছিলেন। উনি আসতে চান। দ্যাখো তো ভুলেই গেছি। একটু দেরি করে আসবেন।— সবুজের মা বাড়ি ফেরার পর। চা-টা খাইয়ো।"

দাদু বললেন, "বেশি রাত করে আসবেন বললে। তখন আবার চা কী?"

বাবা বললেন, "একেবারে ডিনার খাইয়ে দিলেই হয়।" এটা মাকে রাগাবার জন্য বলা। "যতই বলো প্রতিবেশী। বাড়িতে প্রথম আসছেন।"

মা বললেন, "তা হলে তুমিই যাও— কিছু নিয়ে এসো। কোজি নুক থেকে।"

ময়না তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, "মা, আমি যাই? কী-কী আনব বলে দাও।"

বকুনি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল সে। কিন্তু কী আশ্চর্য, বাবা বললেন, "এই নে টাকা নিয়ে যা— আনবি বারোটা চিকেন বল, ষোলোটা ফিশ পকোড়া···"

ঠাম বললেন, "চিলি চিকেন কী দোষ করল? ওটাও আসুক এক বাক্স।"

দাদু বললেন, "কিছু শিক কাবাব হলে মন্দ হয় না।"

বাইরে যাওয়ার চটিতে পা গলাতে-গলাতে ময়না জিজ্ঞেস করল, "আর নেতাজি সুইটস থেকে কিছু মিষ্টি আনব না?"

বাবা বললেন, "তা হলে আর-একটু টাকা নে।"

একসঙ্গে তিনটে করে সিঁড়ি টপকাতে-টপকাতে ময়না নীচে নামল। জিতুকাকুকেও কি ঠিক এই সময় নামতে হবে? "কী ব্যাপার মিস ময়না— বাঘে তাড়া করেছে নাকি?"

ময়না বলল, "কোজি নুক বন্ধ হয়ে যাবে।"

জিতুকাকুর মুখটা হাঁ হয়ে থেকে গেল। ময়না ততক্ষণে টিপুর পাশে। "দেখলি তো কেমন একখানা দিলাম।"

টিপু বলল, "টিং টিং।"

ময়না বলল, "চল।"

টিপু বলল, "টিং টিং টিং টিং।"

কী হল আবার? ও! সামনে তিনজনকে আসতে দেখে ময়না দাঁড়িয়ে গেল। সবুজের পিসি, তার সঙ্গে একজন, নিশ্চয়ই তিনি সবুজের মা, আর সকলের শেষে জিনস্ আর নর্থ স্টার পরা সবুজ। গটমট করে হাঁটছে। লাঠি নেই।

পিসি বললেন, "বউদি এই হল ময়না। আর···"

সবুজ লাফিয়ে এসে টিপুর হ্যাণ্ডল পাকড়ে বলল, "মা, এ হচ্ছে টিপু সুলতান।"

সবুজের মায়ের হাতে বিরাট বড় মিষ্টির বাক্স। বাক্সটা সবুজকে ধরতে বলে তিনি ময়নাকে জড়িয়ে ধরলেন। ময়না বুঝতে পারল তিনি কাঁদছেন। কান্নার কী হল? ঘাবড়ে গেল সে।

চোখ বুজে ধরা-ধরা গলায় সবুজের মা বললেন, "ময়না এই নাও তোমার প্রাইজ।"

"তোমরা কিন্তু আসল হিরোর কথা ভুলেই যাচ্ছ। মিষ্টিটা ওরই প্রাপ্য।" মনে করিয়ে দিলেন পিসি।

মহা খুশি হয়ে মাথা নাড়িয়ে দিল টিপু। শব্দ হল টুং টাং টুং টাং।

সিঁড়ির ওপর থেকে জিতুকাকু সমস্ত দৃশ্যটা দেখছিলেন। তাঁর হাঁ-করা মুখটা আরও একটু গোল হয়ে গেল।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

অলৌকিক রহস্য

সর্বনাশা উত্তরাধিকার

আচ্ছা ! আপনারা ঠিক কী শুনবেন আশা করছেন ? ডঃ ওয়াটসনের সামনে খোলাখুলি কথা বলতে পারেন !
আমার স্বর্গত বাবার সঙ্গে কথা হবে আশা করছি । একটা লুকনো উইল খুঁজছি !
তা হলে আপনার বাবা উইল না করে মারা গেছেন ?
ঠিক উলটো ! দু' বছর আগে বাবা উইল করে আমাকে বঞ্চিত করে আমার ছোটভাই ডেনিসকে সর্বস্ব দিয়ে যান !
কয়েক বছর আগে অবসর নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে আসার আগে আমার বাবা ছিলেন দূর-প্রাচ্যে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী । আমার পেশার জন্যই তিনি আমাকে একটি পয়সাও দিতে রাজি হননি !
দেখতে পাচ্ছি পেশাটা অভিনয় !
অ্যাঁ···হ্যাঁ ! কিন্তু আপনি কী করে····
থিয়েটার শেষ হলে এখানে আসার তাড়ায় ভালভাবে মুখ পরিষ্কার করতে পারেননি ! আপনার গালের একদিক অন্য দিকের চেয়ে কালো ! কেন ? মেক-আপ ! কে মেক-আপ নেয় আর দেরিতে দেখা করতে আসে···অভিনেতা !
বাবা মারা গেছেন দু' মাস আগে, আর তাঁর উইল অনুযায়ী প্রাসাদ, জমি, সবকিছুই পেয়েছে ডেনিস । তারপরে দূর-প্রাচ্যের এক পারিবারিক বন্ধু আমাকে বলেন যে, আমি প্রবঞ্চিত হয়েছি !
সেইজন্যই লুকনো উইলের খোঁজ পড়েছে !
হ্যাঁ , মিঃ ল্যান্ডার্স বলেছেন যে, তিনি আর অন্য এক ভদ্রলোক মাস-পাঁচেক আগে এক নতুন উইলে সাক্ষী হয়েছিলেন ! যে-উকিল উইল তৈরি করেছিলেন তিনি মারা গেছেন ! ল্যান্ডার্স নিশ্চিত যে, বাবার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছিল ! উইলটি নিখোঁজ ! হয় ডেনিস সেটা নষ্ট করেছে····নয় লুকনো আছে !
আর তাই যাযাবরের আবির্ভাব ?

ঠিক তাই, মিঃ হোম্‌স ! মরিয়া লোকের আশা । আপনি সিয়াঁসে উপস্থিত থাকবেন, মিঃ হোম্‌স ?
কর্মজীবনে আমাকে অনেক নিখোঁজ জিনিস খুঁজে দিতে হয়েছে ! পরলোকের সাহায্যে খোঁজ পেলে ভবিষ্যতে কাজটা সহজ হবে !

চমৎকার ! যাওয়ার পথে মিঃ ল্যান্ডার্সকে তুলে নিলেই দল পূর্ণ হবে !
বাকি রইল শুধু পারলৌকিক কণ্ঠ !

কিছুক্ষণ পরেই....
গাড়োয়ান, তুমি লন্ডনে ফিরে যেতে পারো । রাতটা আমরা নরফোক প্রাসাদেই কাটাব !

কী বিষণ্ণ জায়গা, হোম্‌স !
হ্যাঁ, ওয়াটসন....তবে সিয়াঁসের পক্ষে আদর্শ জায়গা !

ভৌ !
গররর !

থাম, লক্ষ্মী !
থাম !
গরররর
আমার সঙ্গে থাকুন, ওরা কিছু বলবে না।
মিঃ ল্যাণ্ডার্স, দেখতে পাচ্ছি আপনি আগেও এখানে এসেছেন !
হ্যাঁ, অবশ্যই ! কিন্তু আপনি কী করে....
কুকুররা আপনাকে দেখে গর্‌গর্ করেনি !
আর্নল্ড, তুমি ফিরে যেতে পারো !
ডেনিস, জানি প্রাসাদটা বাবা তোমাকে দিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি আর আমার বন্ধুরা শুধু আজকের রাতটা থাকতে চাই, যাতে আমরা...
আমাকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে পারো !

ডেনিস, এটা অন্যায় ! আমি তোমাদের পারিবারিক বন্ধু, কাজেই আমাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলতে পারবে না ! আমি বলছি, আর-একটা উইল ছিল !
তা হলে সেটা গেল কোথায় ?
সেই কথাটা জানতেই আমরা এখানে এসেছি ! এখন বৃষ্টি বড় অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে, মিঃ নরফোক !
তা হলে গাড়িতেই ফিরে যান !
তাতে ব্যাপারটা শুধু পিছিয়ে যাবে ! আপনার কথা যদি সত্যি হয় এবং অন্য উইল না থাকে, তা হলে নিশ্চয় সেটা খোঁজার চেষ্টায় আপনার ভয়ের কিছু নেই !
ভেতরে আসুন ! কিন্তু আর্নল্ড, আজ রাত্তিরের পরে আর আমাকে বিরক্ত করবে না !
আমার যাযাবর বন্ধু যোগাযোগ করতে পারলে ব্যাপারটা আজই চুকে যাবে !
খানিক বাদে····
হোমস, বৃদ্ধ নরফোকের সংগ্রহটা দ্যাখো ! আমার গা হিম হয়ে যাচ্ছে !
ওটা সিয়াঁসের জন্যে তুলে রাখো···· যদি ঘরটা উপযুক্ত মনে হয় !

সবাই যখন হাত ধরে টেবিল ঘিরে বসল, যাযাবর এক অদ্ভুত বিদেশি গান ধরল, তারপরে হঠাৎ স্পষ্ট ইংরেজি কথা শোনা গেল·····

আলফ্রেড নরফোক এখানে এসে থাকলে সঙ্কেত করুন !

আশ্চর্য, টেবিলটা নড়ছে !

আলফ্রেড নরফোক, আপনি কি কথা বলতে পারেন ? এখানে কেউ-কেউ আপনার কথা শুনতে চান ! কথা বলুন !

আমি এসেছি ! আ···মি উত্তর দেব !
আমার বাবার গলা···· সামান্য তোতলামি-টুকুও আছে !

মৃত্যুর কিছুদিন আগে আপনি একটা উইল করে থাকলে সেটা কোথায় ?
সেটা প্রাসাদে নেই, আছে বাইরে····· সময় যেখানে রাত্তিরে থেমে যায় !

সেই জায়গাটা কোথায় ?

ঢের হয়েছে !
ফেলে দিন !
খুনের অভিযোগ আমি পছন্দ করি না !
তা হলে ভাইকে খুনের চেষ্টা করবেন না ! আমি বলছি উইলটি পেলে আমরা আসল খুনিকে খুঁজে পাব !
কিন্তু উইল কোথায় ?
বাইরে ! কিন্তু ঝড় চলছে, এটা উইল খোঁজার সময় নয় ! সৎকারের লোক ডাকতে হবে ! তারপরে রাত্তিরের মতো বিশ্রাম !
আমার বিশ্বাস, সকালে উইল কোথায় পাওয়া যাবে আমি তা জানি !

আলফ্রেড নরফোক, সেই জায়গাটা কোথায় বলে দিন !
আ-আ-আ-আ !

আলো ! বাতিটা কেউ জ্বালিয়ে দিন !

হোম্‌স, সর্বনাশ ! দ্যাখো ।
ওয়াটসন, জলদি ! দ্যাখো, বেচারাকে সাহায্য করতে পারো কি না !

না, হোম্‌স ! এই মালয়ি ছোরার আঘাত মারাত্মক হয়েছে ! আঘাত এসেছে ওর ডান দিক থেকে । আর এক ইঞ্চি ওপরে লাগলে ডান কাঁধের হাড়ে বাধা পেত·····কিন্তু এখানে লাগায় মৃত্যু হয়েছে সঙ্গে-সঙ্গে !

ওকে কে খুন করতে পারে ? আমরা সবাই হাত ধরে ছিলুম ! হোম্‌স, তুমি ছিলে ল্যান্ডার্সের বাঁয়ে····
ব্যাপারটা হয়তো সুযোগের নয়, স্বার্থের !

ডেনিসের স্বার্থ ছিল ! ল্যান্ডার্স আমাকে বাবার শেষ উইলে ঢোকায়····
আমাকে অভিযুক্ত করছ, তাই না ?

খানিক বাদে····
বাহ্ ! একটা গার্নিয়েরি ! আপনার বাবার বেহালাটির তুলনা নেই ! ঘরে নিয়ে গিয়ে এটা একটু বাজিয়ে দেখতে পারি ?
নিশ্চয় !
একটা গ্রামোফোনও রয়েছে দেখছি ! সঙ্গীত শোনার সর্বাধুনিক উপায় !
হ্যাঁ, এই আবিষ্কারটি বাবাকে খুব উত্তেজিত করেছিল ! মৃত্যুর কয়েক দিন আগে উনি এটি কিনেছিলেন !
তক্ষুনি····
হোম্‌স, জানি আমাদের ঘর পাশাপাশি, তবু একটা খুনি যথেচ্ছ ঘুরে না বেড়ালে অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করতুম !
যথাসময়েই সে ধরা পড়বে !
দেরি করছ কেন ? ডেনিসকে এক্ষুনি পুলিশের হাতে তুলে দাও ! ও ল্যান্ডার্সের ডান দিকে বসে ছিল ! এটা স্পষ্ট যে, বেচারা ল্যান্ডার্সকে ও-ই খুন করেছে !
ব্যাপারটা বেশি স্পষ্ট বলেই আশঙ্কা, ওয়াটসন !
কিন্তু ডেনিস খুনি না হলে কে····
'সময় যেখানে রাত্তিরে থেমে যায়' সেখানে উইলটি পেলে খুনিকেও পাব !
হ্যাঁ, কিন্তু প্রেতাত্মা যেখানে বলেছিল সেখানে উইল পেলে আমাকে পরলোকে বিশ্বাস করতে হবে । সেটা আমার বৈজ্ঞানিক স্বভাবের বিরোধী !

কয়েক মিনিট বাদে অন্ধকার লাইব্রেরির দেওয়ালে দুটি হাত কাঠের প্যানেল খুঁজছে....
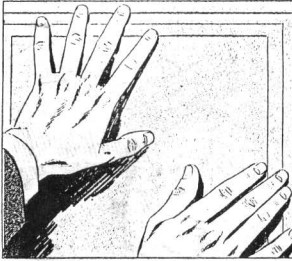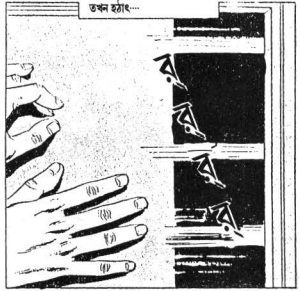
তখন হঠাৎ....

এদিকে....
হোম্‌স ? বেহালায় যা শব্দ করছ তা ছাপিয়ে কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?

এইজন্যই কোনও জবাব পাইনি !

মিঃ হোম্‌স কোথায় ? ওঁর বাজনা শুনলাম !
তা হলে আপনিও বোকা বনেছেন, মিঃ নরফোক !

ওই গ্রামোফোন শুনে ভেবেছিলুম হোম্‌স এখানে বাজাচ্ছে । কিন্তু হোম্‌স এমন করল কেন ?
এর কোনও তাৎপর্য নেই, নিছক ঠাট্টা ! আচ্ছা, চলি !

খানিক বাদে....
আমার অনুমান ঠিক হলে তোমাকে গুপ্ত দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে পারি !
শুনুন... কুকুর !

আমরা এখানে, কেউ তা জানে ! আমার পেছনে এসো ! আর আশা করা যাক, কুকুরের মুখে পড়ার আগে বাইরে যেতে পারব !
গরররর

ওরা মরিয়া হয়ে খাড়া সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ছুটে চলল। হঠাৎ সামনে এক দরজা পড়লে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে প্রাসাদের প্রাচীরে উঠে গেল····

জলদি ! দরজাটা বন্ধ করতে সাহায্য করো !
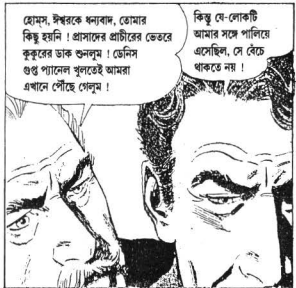
ভৌ !

ভৌ !

আমাকে দিয়ে হবে না ! ওই হিংস্র রাক্ষসদের কাছে আমি যাব না !

খানিক বাদে····

কিন্তু আমি ভেবেছিলুম যারা টেবিলে বসে ছিল তাদের কেউ···

না, ওয়াটসন ! ছুরির ক্ষত ডান কাঁধের হাড় এড়িয়ে গেছে এবং ক্ষত দেখে বোঝা যাচ্ছে আঘাত এসেছিল ডান দিক থেকে ! ডান-হাতি লোকই এমন আঘাত করতে পারে ! তুমি ডেনিসের ডান হাত ধরে ছিলে, কাজেই ডেনিস খুনি নয় !

পরদিন সকালে····

আর্নল্ড নরফোক তাড়াতাড়ি উইলটা খুলে পড়ল····

পরে, বিচারকের কামরায়....

কিন্তু তিন দিন পরে....

ওটা নামাও !
উফ্ !
দুম্ !

হোম্‌স, ও যে আর্নল্ড তা কী করে জানলে ?
শেষ সাক্ষীর অভিনেতার মতো বড় গোঁফ দেখে স্বাভাবিক কারণেই আমার সন্দেহ হয়েছিল ! ভূমিকাটি নিঃসন্দেহে লোভনীয় !

নিশ্চয় তার আগেই ওকে সন্দেহ করেছিলে !
ল্যান্ডার্সের খুন হওয়ার সময় থেকেই ! আমি নিশ্চিত ছিলুম যে, আর্নল্ডের উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুত বখরা থেকে বঞ্চিত করতেই ল্যান্ডার্সকে খুন করা হয়েছে ! তার মানে, ল্যান্ডার্সও ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল !

সিয়াঁসের সময় আত্মার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলুম যে, মাথার ওপরে একটা পথ আছে ! স্পষ্টতই লোকটিকে ওখানে যে রেখেছিল প্রাসাদের অলিগলি তার ভালভাবে চেনা····ভাইদেরই একজন, উইল থেকে যে লাভবান হবে, সে !

আর্নল্ড যখন খুনিকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিতে···· অথবা খুন করতে গেল····ও জানতে পারল আমি ঘরে নেই ! ও আমাদের দু'জনকেই খুন করতে চেষ্টা করল ! সন্দেহ ছিল আর্নল্ড তার গোপন কথা আরও একজনকে বলেছে ! তাই জেম্‌স নোল্‌স-এর আবির্ভাব আশা করেছিলুম !
মিঃ হোম্‌স, কী ভাবে ধন্যবাদ দেব, জানি না ।

আসল উইল অনুযায়ী ডেনিস এখন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে !
হ্যাঁ ওয়াটসন, এবং 'আরওএকটা উইল আছে' প্রেতকণ্ঠে আর এ-কথা শোনা যাবে কিনা সন্দেহ !

(সমাপ্ত)

আলোই পৃথিবীর সমগ্র জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আলো না থাকলে পৃথিবীতে মানুষ, পাখি, অন্যান্য জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, এমনকী গাছপালাও বেঁচে থাকতে পারত না। সূর্যের আলোয় রং দেখতে সাদা হলেও ওর মধ্যে আছে রামধনুর সাতটি রং। গোলাপি, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। সব রং মিলেমিশে রয়েছে। আকাশে যখন রামধনু ওঠে কিংবা যখন প্রিজমের মধ্যে দিয়ে সূর্যের সাদা আলো আলাদা-আলাদা রঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে তখন সাতটি রং বোঝা যায়।

মহাকাশ থেকে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো পৃথিবীর বুকে এসে আছড়ে পড়ল, আমরা বুঝলাম আকাশে চাঁদ উঠেছে। সুদূর নক্ষত্র থেকেও মৃদু আলো পৃথিবীতে এসে পড়ে, সেই নক্ষত্রের সঙ্গে পৃথিবীর আলোক-বন্ধনের কথা ঘোষণা করে। কাজেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে আলোকরশ্মি

আশ্চর্য অপটিক্যাল ফাইবার

পার্থসারথি চক্রবর্তী

ওপরে, যোগাযোগের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে অপটিক্যাল ফাইবার ; মাঝে, টেলিভিশন ও টেলি-যোগাযোগে কাজে লাগে এই প্রযুক্তি ; বাঁদিকে, অপটিকাল ফাইবার গুচ্ছ ; নীচে, অ্যান্টেনা

খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায়। ধাতব তারের মধ্যে দিয়ে যেমন খুব সহজেই বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে, তেমনই স্বচ্ছ কোনও বস্তুর মধ্যে দিয়ে আলোও চলাফেরা করতে পারে খুব স্বচ্ছন্দে। আলোর এই গতি এক-এক ধরনের স্বচ্ছ বস্তুর ক্ষেত্রে এক-একরকম। তবে কৌশলে আলোর এই গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। কেমন করে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবার তোমাদের তা-ই বলছি। যে বিশেষ মাধ্যমের সাহায্যে এই নিয়ন্ত্রণ ঘটানো যায়, তার নাম 'অপটিক্যাল ফাইবার'। বাংলায় এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'আলোকতন্তু'। এই

আলোক তন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। দু' হাজার সালের মধ্যে এই আলোকতন্তু দিয়ে এমন অনেক অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হবে যার সঙ্গে একমাত্র আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপেরই তুলনা করা যেতে পারে।

আমরা জানি আলোকরশ্মি একটা ফাঁপা নলের মধ্যে দিয়েও বেরিয়ে আসতে পারে। নলটা যদি বাঁকা হয়, তা হলেও অসুবিধা নেই, আলোকরশ্মি ঠিকই বেরিয়ে আসবে। ব্যাপারটা ঘটে এইরকমভাবে : বাঁকা পাইপের এক মুখ দিয়ে আলো ঢুকে তারপর ক্রমাগত প্রতিফলিত হতে-হতে অবশেষে অন্য মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। ঝকঝকে একটা রুপো অথবা অ্যালুমিনিয়ামের নলের মধ্যে দিয়ে আলো এইভাবে ধাক্কা খেতে-খেতে খুব সহজেই এগিয়ে আসবে। এই ঘটনার অবশ্য ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই, কেননা এটা মোটেই কার্যকর নয়। প্রত্যেকবার নলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিফলিত হওয়ার সময় বেশ কিছুটা আলো হারিয়ে যায়। যে নলের মুখের ব্যাসের চেয়ে তার দৈর্ঘ্য অনেক বেশি, সেসব ক্ষেত্রে প্রচুর আলো হারিয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা এমন একটা উপায় আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে আলোকরশ্মি বহুবার প্রতিফলিত হওয়া সত্ত্বেও এতটুকু নষ্ট হবে না, আর তার হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও অনেক কমে যাবে। কাচ এবং বাতাসের সীমারেখায় সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (total internal reflection) ঘটিয়ে এটা সহজেই করা যায়। মনে করো, আলোকরশ্মি কাচের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করার সময় প্রতিসরিত হয়ে কিছুটা বেঁকে গেল। তখনও কিন্তু ওই আলো কাচের মাধ্যমকে পরিত্যাগ করবে না মোটেই। তখন আলো কাচ ও বাতাসের সীমানা বরাবর বারেবারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হতে থাকবে। আর আশ্চর্যের কথা, তুমি তখন অবাক হয়ে দেখবে যে, আলোকরশ্মি এখানে হারিয়েছেও খুব কম। এত কম যে তা হিসাবের মধ্যেই পড়ে না।

তোমরা হয়তো ভাবছ যে, এইভাবে আলো প্রতিফলিত হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই ফাঁপা নল চাই। এই নলের একদিক দিয়ে আলোকরশ্মি সোজা ঢুকে পড়বে, আর অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। আসলে এটা একটা রড। আজ আমরা এই ধরনের যে সমস্ত আলোক-নল (light pipe) ব্যবহার করি তার অধিকাংশই ফাঁপা নয়। এই নলগুলো কাচ অথবা খুব স্বচ্ছ অ্যাক্রাইলিক প্লাস্টিকের তৈরি। অবশ্য কাচের পাইপই প্লাস্টিকের চেয়ে আজকাল বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধুমাত্র একটা নিরেট কাচ আলোকশক্তি (ফোটন) পরিবহণের সুন্দর পথ করে দেয় বটে, কিন্তু তা কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব সঞ্চারিত করতে পারে না। কেন পারে না সে-কথাই বলছি।

যখন আমরা কোনও বস্তু অথবা কোনও দৃশ্য বা ছোট্ট একটা আঁকা ছবির দিকে তাকাই—তখন সেই বস্তু, দৃশ্য অথবা ছবিটি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, আমরা তখন তা দেখতে পাই। মনে করা যাক, আমরা একটা অতি ক্ষুদ্র দৃশ্য, যেটা একটা স্ট্যাম্পের ওপর আঁকা আছে,

প্লাস্টিকের আলোক তন্তু

তা দেখছি। তখন ওই স্ট্যাম্পের ছবির ওপর আলোকরশ্মি পড়ে প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে পড়বে, আর ওই ছবিটা তখন আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। ছবির বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিফলিত আলোর তীব্রতা কোথাও কম আবার কোথাও-বা বেশি। কাজেই গাঢ় জায়গা থেকে কম আলো চোখে পড়বে, হালকা জায়গা থেকে পড়বে বেশি। এই প্রতিফলিত আলোকরশ্মির তীব্রতার কম-বেশির হার অনুসারে একটা বিশেষ ধরনের প্যাটার্ন তৈরি হবে। যদি আলোকতরঙ্গ ছবির কোনও অঞ্চল থেকে একটিমাত্র আলোক-নলে (যার ব্যাস এক সেন্টিমিটার মাত্র) ঢোকে, তখন সেই আলোক তরঙ্গকে অনেক পথ অতিক্রম করে আসতে হবে, এ-কথা তো আগেই বলেছি। এবার এই আলোক তরঙ্গ এবং ছবির অন্যান্য অঞ্চলের আলোকতরঙ্গ বেরিয়ে আসবে নলের অন্য মুখ দিয়ে। তখন ওই ছবির প্রতিবিম্ব এমনভাবে জড়িয়ে যাবে যে তাকে আর চেনাই যাবে না।

কাজেই কোনও প্রতিবিম্ব এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাতে হলে একসঙ্গে অনেক আলোক-নল ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবিম্বকে অনেক ছোট-ছোট অঞ্চলে ভাগ করে নিতে হয়। প্রতিবিম্বের প্রতিটি ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে আলোকতরঙ্গ বহন করে আনবে আলাদা-আলাদা আলোক-নল, তারপর তাকে অনায়াসেই গুচ্ছ নলের একেবারে শেষ প্রান্তে এনে পৌঁছে দেয়। এই ধরনের কাচ অথবা প্লাস্টিকের প্রতিটি অতি সূক্ষ্ম অথচ নিরেট রডের ব্যাস এত কম যে, তা আমাদের একেবারে কল্পনার বাইরে। তাই এদের রড না বলে 'তন্তু' বা 'ফাইবার' বলাই ভাল। এইভাবে অনেক তন্তু ব্যবহার করে কোনও প্রতিবিম্ব যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো যায় যে যন্ত্রের সাহায্যে, তার নাম 'ফাইবারস্কোপ'। টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, স্টেথিসস্কোপ-এর মতো ফাইবারস্কোপ কথাটিরও এখন খুব চল হয়েছে। আর আনন্দের কথা—এই ফাইবারস্কোপই হল ফাইবার অপটিক্স-এর আসল উপাদান, এর কাজ করবার ক্ষমতাও অবাক করার মতো।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, নমনীয় ফাইবারস্কোপ দিয়ে খুব সহজেই প্রতিবিম্ব এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। যাঁরা পদার্থবিদ্যার ছাত্র, তাঁদের প্রায়ই আলো এবং ছায়া নিয়ে কাজ করতে হয়। একশো বছর ধরে এই পদার্থবিদ্যার ছাত্র-অধ্যাপক সবাই মিলে চেষ্টা করে আসছিলেন কীভাবে কৌশলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার প্রতিবিম্ব পাঠানো যায়। এ-কাজে যে অসুবিধা ছিল না এমন নয়। যেমন, সাধারণ কাচের তন্তু যদি একে অন্যের সংস্পর্শে থাকে, তা হলে আলো একটা তন্তু থেকে অন্য তন্তুতে যাওয়ার সময় বেরিয়ে যায়। ফলে ওই প্রতিবিম্বের চেহারাটাও ঝাপসা দেখায়। কখনও-কখনও প্রতিবিম্বটি চেনা যায় না একেবারেই। এ ছাড়া আরও একটা অসুবিধা হতে পারে। তন্তুগুলো একটার সঙ্গে অন্যটার
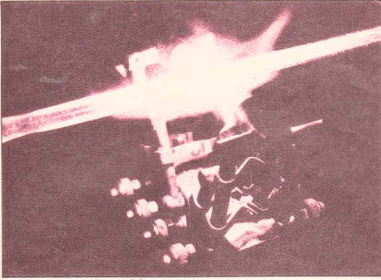
অপটিক্যাল ফাইবার তৈরির জন্য সিলিকার নলকে উচ্চতাপ দেওয়া হচ্ছে

ঘষা লেগে ওপরের তলে দাগ পড়ে। ফলে বেশ কিছুটা আলো নষ্ট হয়েও যেতে পারে।
অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশ্য এই অসুবিধাগুলো দূর করা সম্ভব হয়েছে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বিজ্ঞানীরা এমন একটা চমৎকার তন্তু আবিষ্কার করলেন, যার দুটো অংশ। একটা অন্তর্নিহিত 'কেন্দ্র' বা 'কোর' এবং আর-একটা বাইরের 'কোটিং' বা 'জ্যাকেট'। ভেতরের কোর-এর প্রতিসরণ অঙ্ক বেশ উঁচু, আর যে কোটিং দিয়ে এটা ঘেরা থাকে তার প্রতিসরণ অঙ্ক বেশ কম। এই উঁচু এবং নিচু প্রতিসরণ অঙ্কের বস্তুর সংযোগস্থলে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে। এখানে আলো বেরিয়ে যেতেও পারে না। এখন যে সমস্ত আলোকতন্তু পাওয়া যায় সেগুলোতে এই সুবিধা থাকে।
আসলে একটা জিনিস এখানে মনে রাখা খুবই দরকার, তা হল—ফাইবারস্কোপে বিভিন্ন তন্তুর আপেক্ষিক অবস্থান একদিকের প্রান্তে যেমন থাকবে অন্য দিকেও ঠিক তেমনটি থাকা প্রয়োজন। এই আলোকতন্তুগুলি বেশ ঢিলেঢালা এবং নমনীয় অবস্থায় রাখতে হবে। অনেক ঝাঁটার কাঠি বেঁধে যেমন একটা মোটা ঝাঁটা তৈরি হয়, তেমনই আলোকতন্তুর গুচ্ছ দিয়ে একটা মোটা আলোকতন্তু তৈরি করা হয়—খুব পরিষ্কার প্রতিবিম্ব পাওয়ার জন্য। একটা সাধারণ ফাইবারস্কোপের মধ্যে প্রায় ৭৫০,০০০ আলোকতন্তু থাকে, এদের প্রত্যেকটি আলোক তন্তুর ব্যাস হল ০·০০১ সেন্টিমিটার অথবা ১০ মাইক্রন। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য এক-একটা আলোকতন্তুর ব্যাস ৫ মাইক্রনও হতে পারে।
অনেক সময় আলোকতন্তুগুচ্ছের মধ্যে দিয়ে প্রতিবিম্ব পাঠানোর প্রয়োজন হয় না। তখন অবশ্য তাকে আর ফাইবারস্কোপ বলা যাবে না। তখন তাকে বলা হয় নমনীয় আলোক নির্দেশ প্রেরণ করবার একটা উপায়মাত্র। এই রকম একটা গুচ্ছে আলোকতন্তুদের যেমন খুশি তেমনভাবে সাজানো যায়। এই গুচ্ছ দু'রকমের হতে পারে—সুসঙ্গত (coherent) এবং অসঙ্গত (incoherent); এই সুসঙ্গত আলোকতন্তুর গুচ্ছ সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রতিবিম্ব পাঠিয়ে দিতে পারে। অসঙ্গত গুচ্ছের আলোকতন্তু তৈরি করা কিন্তু বেশ সহজ। সুসঙ্গত গুচ্ছের চেয়ে এটা তৈরি করতে খরচও পড়ে বেশ কম।
এখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই আলোকতন্তু তো তৈরি করা গেল, কিন্তু এটা আমাদের কী ধরনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ?
সে-কথায় এবার আসছি। আলোকতন্তু দিয়ে তৈরি বস্তুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে। চিকিৎসকরা খুব সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের সময় দেহের বিশেষ অংশ আলোকিত করবার কাজে এই আলোক তন্তু ব্যবহার করেন। এ ছাড়া আজকাল বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মধ্যে আলোক তন্তু বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার ভেতরের প্রয়োজনীয় অংশ আলোকিত করবার জন্য। কোথাও আগুন লাগলে এই আলোকতন্তু ব্যবহার করে কোন জায়গায় আগুন লেগেছে, তার সঠিক অবস্থান জেনে নেওয়া যায়।
চিকিৎসকদের কাছে এই ফাইবারস্কোপের কদর খুব বেশি। আলোকতন্তু বসানো গ্যাসট্রোস্কোপ নামে এক ধরনের যন্ত্র বেরিয়েছে, যার সাহায্যে পাকস্থলীর ভেতরের সমস্ত কিছু দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রায় একই ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে দেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশ যেমন—মূত্রাশয়, কোলোন পরিষ্কারভাবে চিকিৎসকরা দেখতে পান। আজকাল উন্নত ধরনের নানা আলোকতন্তু বসানো যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে অস্ত্রোপচার আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে। খুব সরু সুচের মতো আলোকতন্তু ব্যবহার করে চামড়ার টিসু, মাংসপেশির তন্তু, এমনকী, রক্তকণিকাও পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী, এই আলোকতন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে।
শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানেই নয়—শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আলোকতন্তু যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের সময় কারখানার যে সমস্ত দুর্গম অঞ্চলে শ্রমিকদের তাড়াতাড়ি যাওয়া সম্ভব হয় না, সেখানকার অবস্থা কেমন, তা আলোকতন্তু দিয়ে জানা যায়।
ফাইবারস্কোপ দিয়ে টারবাইন ব্লেড, বয়লার টিউব, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরের বিভিন্ন যন্ত্রাংশে কোনও ত্রুটি থাকলে তা সহজেই ধরা পড়ে। উড়োজাহাজের ডানার যন্ত্রাংশ শ্রমিকরা ঠিকমতো মেরামত করেছেন কি না, যদি অসাবধানতাবশত সেখানে কোনও যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে, এ-সবও আজকাল ফাইবারস্কোপের সাহায্যে জেনে নেওয়া যাচ্ছে। গ্যাসোলিন ট্যাঙ্কে জ্বালানির পরিমাণ কমে এলে ফাইবারস্কোপ সেটাও সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়ে দেবে।
অনেক ফাইবারস্কোপের গুচ্ছ একত্র করে অনেক সময় 'সলিড প্লেট' তৈরি করা হয়। এর নাম 'ফেসপ্লেট'। এই ফেসপ্লেট টেলিভিশন পিকচার টিউব এবং বন্যান্য ক্যাথোড-রে সংবলিত যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। এই ফেসপ্লেটের কাজ হল টিভির ভেতরের ফসফর অঞ্চলে তৈরি হওয়া প্রতিবিম্ব কৌশলে পরদায় চালান করে দেওয়া।
আরও আশ্চর্যের কথা হল—সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, এই আলোকতন্তুর সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে হাজার-হাজার টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ঘটানো সম্ভব।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী
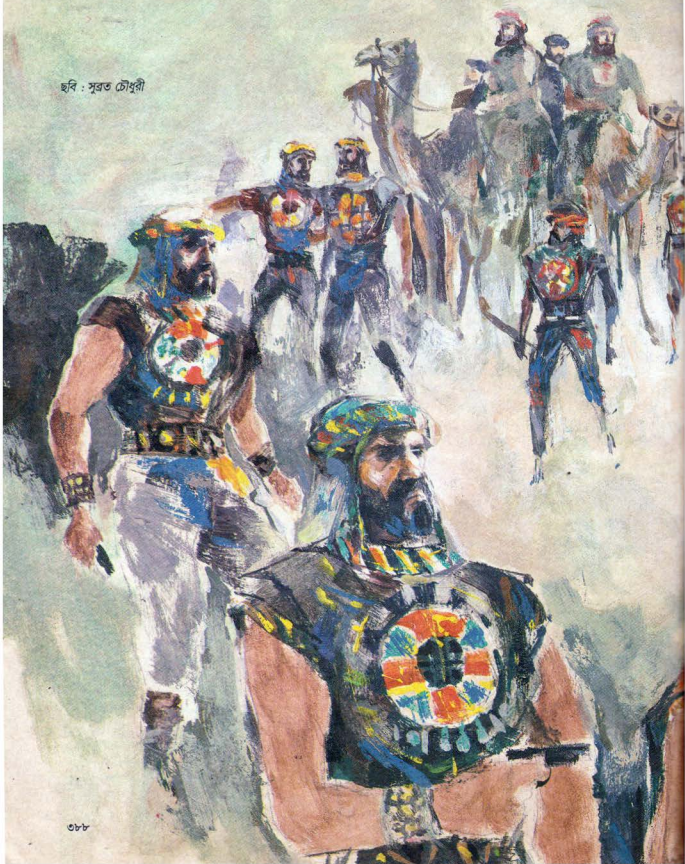
পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সাম স্যান্ডডিউন্‌স ।এই একটি নামই বাবলুর মনের মধ্যে বারবার ঘুরপাক খেতে লাগল। কোথায় যে শুনেছে নামটা, তা কিছুতেই মনে করতে পারল না। অথচ শুনেছে। তাই ও অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। আর পঞ্চুর ওই এক রোগ। বাবলুকে চিন্তান্বিত দেখলেই ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে ওঠে। ও দিব্যি লেজ নেড়ে-নেড়ে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবলু যতবার যাওয়া-আসা করে ততবারই ওর সঙ্গে যাওয়া-আসা করতে থাকে।

পঞ্চুর রকম দেখে হাসি পায় বাবলুর। বলে, "কী রে ! তোর আবার কী হল ?"

পঞ্চু দু' পায়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠল, "আঁ-আঁ-আঁউ।" তার মানে, কী আবার হবে। তোমাকে চিন্তিত দেখছি, তাই এইরকম করছি।

বাবলু বলল, "সাম স্যান্ডডিউন্‌স জানিস ?"

পঞ্চু ওর পায়ে লুটোপুটি খেয়ে মুখ দিয়ে 'গোঁ-ও-ঔ' করে একটা আওয়াজ করল। অর্থাৎ কিনা এটা কি আমার জানার কথা ?

বাবলু আদর করে ওর পিঠে একটু হাত বুলিয়ে বলল, "চল, কিছুতেই যখন মনে করতে পারছি না তখন শুধু-শুধু সময় নষ্ট না

করে মিত্তিরদের বাগান থেকেই একটু ঘুরে আসি চল।"

এমন সময় মা এলেন। বললেন, "এত বেলায় কোথায় চললি ?"

বাবলু বলল, "বেলা কোথায় মা ? সবে তো দশটা।"

"একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস বাপু। আমি আজ একবার ও-বাড়ির বড় বউদির সঙ্গে বরানগরের পাটবাড়ি যাব।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা মা, সাম স্যান্ডডিউন্স জানো ?"

"না বাবা, ওসব জানি-টানি না। তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস। উনি হয়তো বলতে পারবেন।"

"নামটা কোথায় যেন শুনেছি-শুনেছি মনে হচ্ছে।"

"তা শুনবে না ? যত উদ্ভট নাম তুমি ছাড়া কে শুনবে ?"

"কিন্তু এরকম কেন হচ্ছে বলো তো ? মনে আসছে-আসছে, অথচ আসছে না।"

"ও এরকম হয়। পরে এক সময় মনেও পড়ে।"

মা চলে গেলেন।

বাবলুর মনের ছটফটানিটা তবুও গেল না। সে আরও অস্থির হয়ে হঠাৎ টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল বাচ্চু, বিচ্ছুদের বাড়ি। ওদিক থেকে বাচ্চুর গলা ভেসে আসতেই বাবলু বলল, "এই, সাম স্যান্ডডিউন্স জানিস ?"

"না। কেন বাবলুদা ?"

"আঃ, জানিস কি না বল ?"

"জানি না।"

"বিচ্ছুকে ডাক।"

বিচ্ছু কাছেই ছিল। বাচ্চু ওর হাতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "বাবলুদা।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, বিচ্ছু বলছি।"

"সাম স্যান্ডডিউন্স জানিস ?"

"সাম-স্যান্ড-ডিউন্স ? নামটা খুবই শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। তবে 'স্যান্ডডিউন্স' মানে বালিয়াড়ি। বাবা সেদিন কাকে যেন বলছিলেন। আর 'সাম' নিশ্চয়ই কোনও জায়গার নাম। তা কী ব্যাপার বলো তো ?"

"বেস্ট অব লাক। এইবার মনে পড়েছে। ওটা রাজস্থানে থর মরুভূমিতে। কয়েকদিন আগেই একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলুম। আমি মিত্তিরদের বাগানে আছি। বিলু আর ভোম্বলকে একটা ডাক দিয়েই তোরা এক্ষুনি চলে আয়। বিশেষ দরকার।" বলে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে খবরের কাগজের বাণ্ডিল থেকে বিশেষ একটি রঙিন ক্রোড়পত্র বার করে পঞ্চুকে নিয়ে মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল বাবলু।

মাঘ মাসের সোনাঝরা রোদ্দুর এই বেলা দশটায় যেন চনচন করছে। আকাশ কী পরিষ্কার। সাদা-সাদা মেঘখণ্ডগুলো যেন তুলোর পাহাড়ের মতো ভেসে চলেছে দূর-দূরান্তে। বাবলুর মনে পড়ে, খুব ছেলেবেলায় এই মেঘগুলোকে দেখলে ওর দারুণ ভয় করত। কেবলই মনে হত এই মেঘগুলো যদি ভাসতে-ভাসতে হুড়মুড়িয়ে ওর ঘাড়ে পড়ে তা হলে কী কাণ্ডটাই না হবে! এইগুলো চাপা পড়েই তো মরে যাবে ও। এই ভয়ে ওইরকম ভাসা মেঘ দেখলে ঘর থেকেই বেরোত না। এখন সেই ছেলেমানুষির কথা মনে পড়লেও হাসি পায়।

মিত্তিরদের বাগানে এখন ফুলের মেলা। বেশিরভাগই গাঁদা ফুল। বাচ্চু, বিচ্ছুর লাগানো। কয়েকটি শিমুলগাছও লালে লাল। বাবলু পায়ে-পায়ে এসে ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালটায় বসল। তারপর একমনে কাগজের পাতাটায় চোখ রেখে হারিয়ে গেল কল্পনার দেশে। যেখানে শুধু বালি আর উট।

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির হল। ভোম্বলের হাতে কী যেন ছিল একটা ঠোঙার মধ্যে।

বাবলু বলল, "ওতে কী এনেছিস ? কোনও খাবার জিনিস নিশ্চয়ই ?"

ভোম্বল বলল, "এতে করে যা আমি নিয়ে এসেছি তা তোরা কখনও খাসনি, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।"

বাবলু বলল, "কী তবু শুনি ?"

"দিল্লি-কা-লাড্ডু। যো খায়া ও ভি পস্তায়া যো নেহি খায়া ও ভি পস্তায়া।"

বাবলু বলল, "দিল্লি-কা-লাড্ডু ! কোথায় পেলি ?"

"আমার ছোটমামা এনেছেন। আজই সকালে এসেছেন ওঁরা। মামা, মামি, মামাতো বোন সবাই এসেছে।"

"বলিস কী রে ! তা তোর মামাতো বোনকে নিয়ে এলি না কেন ?"

"আনবার নয়। ছ' মাস বয়স।"

সবাই হাসল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে যে যার সুবিধামতো জায়গায় বসে দুটো করে লাড্ডু নিয়ে মুখে দিল। পঞ্চুও বাদ গেল না। এই সময় একটু জল পেলে হত। কিন্তু কী আর করা যাবে। খাওয়া হলে বিলু বলল, "আমরা তো আসতামই। কিন্তু হঠাৎ এমন জরুরি তলব কেন ?"

বাবলু রহস্যের হাসি হেসে বলল, "সাম স্যান্ডডিউন্স।"

"তার মানে ?"

"সাম স্যান্ডডিউন্স জানিস ?"

বিলু ভোম্বল দু'জনেই ঘাড় নাড়ল, "ননা।"

"রাজস্থানে থর মরুভূমির বুকের ওপর আদিগন্তবিস্তৃত ঢেউখেলানো বালির স্তর, বালির ঢিপি আর উটের মিছিল যেখানে, এই দ্যাখ।" বলেই ক্রোড়পত্রের পাতাটা ওদের দিকে মেলে ধরল বাবলু।

সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল ছবিটা। রাজস্থান সরকারের বিজ্ঞাপন এটি। বেশ কয়েকদিন আগেই কাগজে বেরিয়েছে। আসন্ন

মরুমেলায় উৎসাহী ভ্রমণার্থীদের যাওয়ার জন্য রাজস্থান সরকার এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বিলু বলল, "তুই কি এই মরুমেলায় যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা করছিস ?"

বাবলু বলল, "সেইজন্যই তো এমন জরুরি তলব। আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি, বিজ্ঞাপনটা যেদিন বেরিয়েছিল সেদিন অতটা মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। মা ক্রোড়পত্রটা পড়ছিলেন। আমি পড়ছিলুম কাগজের খবর। তারপর ভুলেই গেছি। হঠাৎ চার-পাঁচদিন আগে পুরনো কাগজ বিক্রি করতে গিয়ে বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে। তখন তাড়াহুড়োয় এটাকে নতুন কাগজের বাণ্ডিলের মধ্যে গুঁজে রাখি। আজ হঠাৎ সকাল থেকেই মনে হতে লাগল 'সাম স্যান্ডডিউনস' নামটা কোথায় যেন শুনেছি অথবা পড়েছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। সে কী অস্বস্তিকর অবস্থা রে ভাই! মাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলতে পারলেন না। বাচ্চুকে ফোন করলাম। ও-ও পারল না। অবশেষে বিচ্ছুই মনে পড়িয়ে দিল। এখন আমার মনে হয় এই দারুণ শীতে কোনও রহস্যের সন্ধানে নয়, জমিয়ে একটা মরু-অভিযান করলে কেমন হয় ? এই সময় গেলে মরুভূমি একেবারে মরু-সাজে মেতে উঠবে। কত দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসবে। সাহেব মেম আসবে। গাঁও-দেহাত থেকে বিচিত্র সব পোশাক পরে রাজস্থানি লোকজন আসবে। সে এক দারুণ মজার ব্যাপার হবে। যেন রঙের বৈচিত্র্য লেগে যাবে চারদিকে। এখন তোরা যদি রাজি থাকিস…।"

বাবলুর কথাটা শেষ হওয়ার আগেই লাফিয়ে উঠল সকলে।

ভোম্বল বলল, "রাজি থাকিস মানে ? আমরা এককথায় রাজি। রাজস্থান হল আমাদের স্বপ্নের দেশ। জয়পুর, আজমির, উদয়পুর, চিতোর দেখবার শখ যে কতদিনের, তা তো জানিস।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, তবে একটা কথা। আমরা কিন্তু ভবঘুরে ট্যুরিস্টদের মতো ট্রেনে-বাসে গিয়ে এক-একটা জায়গায় বুড়ি-ছোঁয়া করে ক্যামেরায় ক্লিক-ক্লিক ছবি তুলেই পালিয়ে আসব না। আমরা যেখানে যাব, সেখানে গিয়ে জায়গাটা ভাল করে চষে বেড়িয়ে তবেই আসব। এবং এই যাত্রায় আমরা জয়পুর, আজমির নয়, চিতোরের কেল্লাও নয়, আমরা শুধু ডেজার্ট এরিয়াটাই ঘুরে নেব। অর্থাৎ, মরুভূমি হবে আমাদের লক্ষ্য।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "সেকী বাবলুদা! আমরা জয়পুর চিতোর দেখব না ?"

"না। কেননা অধিক ভোজন কোনও যুক্তিতেই ভাল নয়। আমরা তো রাজস্থান ভ্রমণে যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি মরুভূমি দেখতে।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। যা হয় সেই ভাল। এখন কবে যাবি সেই কথাটাই বল।"

"কবে আবার ? আজকালের মধ্যেই দিনটা ঠিক করে নেব। কেননা গেলে দু-একদিনের মধ্যেই বেরোতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য তো শুধু মরুভূমি দেখা নয়, মরু-মেলা।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "ঠিক। শুধু মরুভূমি দেখতে গেলে বছরের যে-কোনও সময়েই যাওয়া যেতে পারে। আমরা যাব থর মরুভূমির বুকে মরু-উৎসব দেখতে।"

বাবলু বলল, "তার আগে আমরা গাইড-বুক দেখে টাইম টেবল দেখে যাওয়ার ব্যাপার-স্যাপারগুলো বুঝে নিই। তারপর দিন ঠিক করেই কেটে নেব টিকিটগুলো। হয়তো কাল সকালেই হাওড়া স্টেশনে চলে যাব টিকিট কাটতে।"

ভোম্বল বলল, "একেই বলে ভাগ্য।"

"কেন ?"

"প্রত্যেক শুভ কাজেই একটা করে শুভ লক্ষণ দেখা দেয়। আমরাও সেইরকম সঙ্কেত পেয়েছি। অতএব যাওয়া আমাদের আটকায় কে ?"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "আমাদের শুভ লক্ষণটা কীরকম ?"

"যে-মুহূর্তে আমাদের রাজস্থান যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে সেই মুহূর্তেই ছোটমামা এসে হাজির হয়েছেন। এর চেয়ে আশাপ্রদ আর কিছু হতে পারে কি ?"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "তাই তো রে। এটা তো ভেবে দেখিনি। তোর ছোটমামা যখন দিল্লির বাসিন্দা তখন উনিই তো আমাদের সঠিক পথনির্দেশ দিতে পারবেন। ওঁর চেয়ে ভাল গাইড আমরা কোথায় পাব ?"

"তবে! খেয়েদেয়েই তোরা দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে চলে আয়। আমার মামা দিল্লি থেকে প্রায়ই জয়পুর, বিকানির যান শুনেছি। কাজেই থর মরুভূমির বালিতে আমরা কীভাবে পা রাখব, সেটা উনিই ভাল বলতে পারবেন।"

বাবলু বলল, "আমরা খেয়েদেয়েই তোদের বাড়িতে চলে আসছি। আজই আমরা সবকিছু জেনেশুনে যাওয়ার দিন ঠিক করব। তারপর কাল সকালেই থ্রি-টিয়ারের টিকিট কাটব হাওড়া স্টেশনে গিয়ে।"

বাচ্চু, বিচ্ছু তো আনন্দে নেচে উঠল। পঞ্চুও একটা ডিগবাজি খেয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ, ভৌ-ভৌ।"

ভোম্বলের ছোটমামা মুকুল রায় দিল্লির নরোজি নগরে থাকেন। দীর্ঘ উন্নত সুন্দর চেহারা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। কথায়-কথায় গুনগুন করেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ঘরের মধ্যে জাঁকিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ভোম্বলের মা রাজধানীর কথাবার্তা জানতে চাইছিলেন আর ছোটমামা উত্তর দিচ্ছিলেন এক-এক করে।

এমন সময় বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু এসে হাজির। এরা সবাই

ছোটমামার পরিচিত। ওদের দেখেই ছোটমামা সহাস্যে বলে উঠলেন, "এই তো পঞ্চপাণ্ডবের দল, সবাই হাজির দেখছি। তা এবার কি হস্তিনাপুর যাত্রা ?"

বাচ্চু, বিচ্ছু অবাক বিস্ময়ে বলল, "হস্তিনাপুর !"

বাবলু বলল, "দিল্লির প্রাচীন নাম।"

বিলু বলল, "মামাবাবু, আপনি এসে পড়ায় আমাদের যে কী উপকার হয়েছে তা কী বলব। সবে আমরা ঠিক করছি থর মরুভূমি দেখতে যাব, এমন সময় আপনার আবির্ভাব। কীভাবে যাব না-যাব, কোথায় থাকব একটু যদি বলে দেন তো খুব ভাল হয়। আমরা মরুভূমি কখনও দেখিনি। গোবি-সাহারায় তো যেতে পারব না। তাই আমরা থর মরুভূমিই দেখব বলে ঠিক করেছি। উটের পিঠে চাপব। বালির সমুদ্র দেখব। কত কী করব। তার ওপর সামনেই মাঘী পূর্ণিমায় মরু-মেলা। দারুণ উৎসব সেখানে। মরুভূমিতে এখন সাজ-সাজ রব। কাজেই এই মওকা আমরা ছাড়ছি না।"

ছোটমামা বললেন, "তা হলে তো আর সময় নেই। এই সময় ওখানে একটা মেলা হয় শুনেছি। আমার অবশ্য যাওয়া হয়নি কখনও। থরে গেছি। ভারী চমৎকার জায়গা। ওখানে গেলে মনে হবে, ভারতে নয়, যেন আরব্য রজনীর দেশে পৌঁছে গেছি। তবে এখন কিন্তু ওখানে খুব শীত।"

বাবলু বলল, "তা হোক। মেলাটা কতদিন থাকে ?"

"তা তো বলতে পারব না। ওখানকার মেলা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই। সপ্তাখানেক নিশ্চয়ই থাকবে।"

বাবলু বলল, "আমরা বড়জোর তিন-চারদিন থাকব। এখন বলুন কীভাবে যাব আমরা ?"

"শোনো তবে। থর মরুভূমি যেতে গেলে যে-কোনও রুট দিয়েই হোক জয়শলমির যেতেই হবে তোমাদের। আর জয়শলমির যেতে গেলে যোধপুর অথবা বিকানির ছাড়া পথ নেই। কেউ-কেউ অবশ্য আগ্রা থেকে জয়পুর আজমির মাড়োয়ার হয়ে বারমের দিয়েও যায়, তবে সেটা খুব একটা সহজ পথ নয়।"

"আমরা তা হলে কীভাবে যাব ?"

"তোমরা দিল্লি থেকে যোধপুর মেলে যোধপুর কিংবা বিকানির মেলে বিকানির হয়ে জয়শলমির যাও। যদি যোধপুর দিয়ে যাও তা হলে ওখানে দু-একটা দিন বিশ্রাম করে ওখানকার বিখ্যাত মেহেরনগর ফোর্ট, যশোবন্ত থারা, উমেদ ভবন, বালসমন্দ হ্রদ, মাণ্ডোর গার্ডেন দেখে দিনের অথবা রাতের গাড়িতে জয়শলমির চলে যাও। আর বিকানির দিয়ে যদি যাও তা হলে দিল্লি থেকে বিকানির মেলে বিকানির গিয়ে সেখানেও যা-কিছু দেখবার দেখে বাসে করে থর মরুভূমির ওপর দিয়ে চলে যাও জয়শলমির। জয়শলমির গেলে কেল্লা, হাবেলি আর মরুভূমি দেখে মন ভরে যাবে। আসলে যোধপুর, বিকানির, জয়শলমির সবই ওই থর মরুভূমির ওপর। ট্রেনেই যাও আর বাসেই যাও, মরুভূমির ওপর দিয়েই যেতে হবে। তবে তোমরা মরুভূমির যে রূপ দেখতে চাইছ তা দেখতে গেলে যেতে হবে সাম-এ। সাম স্যান্ডডিউন্স।"

ভোম্বল সোল্লাসে গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বার করে বলল, "ইয়াহা। আমরা তো ওই দেখতেই যাচ্ছি।"

"যাও, দেখে এসো। মন ভরে যাবে।"

"আমরা তা হলে কীভাবে এবং কোন দিক দিয়ে যাব বলুন ?"

"ওই তো বললাম, যেদিক দিয়ে ইচ্ছে যেতে পারো। হয় বিকানির, নয় যোধপুর। তবে আমি বলি কি, তোমরা দিল্লি হয়ে প্রথমেই বিকানির যাও। ওখান থেকে বাসে করে চলে যাও জয়শলমির। সেখানে দু-চারদিন থেকে মেলা দেখে রাতের অথবা দিনের গাড়িতে চলে এসো যোধপুর। তারপর আবার দিল্লি হয়ে বাড়ি।"

ভোম্বলের মা বললেন, "যদি দিল্লি দিয়েই যেতে হয় তোমাদের, তা হলে কিন্তু তোমরা কালকা মেলে যেয়ো। দিল্লি-কালকা কখন পৌঁছচ্ছে দিল্লিতে ?"

ছোটমামা বললেন, "রাত্রি আটটা নাগাদ।"

"ওখান থেকে বিকানিরের ট্রেন কখন ?"

"রাত ন'টায়।"

"ওরে বাবা, কালকা যদি লেট করে তা হলেই তো গেল।"

"সারারাত স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে।"

"এর পরে আর কোনও গাড়ি নেই ?"

"না। একেবারে সেই সকালে।"

"তার চেয়ে বাপু দিনের বেলায় পৌঁছনো যায় এমন কোনও গাড়িতেই যাক ওরা।"

ছোটমামা বললেন, "ওদের জন্য এ. সি. এক্সপ্রেসটাই ঠিক। এখান থেকে বেলা দশটা নাগাদ ছেড়ে পরদিন ওই একই সময়ে নিউ দিল্লি পৌঁছবে। সেখানে সারাটা দিন অফুরন্ত সময়। ইচ্ছে করলে ওখানকার বিড়লা মন্দির, কালীবাড়ি দেখে যে-কোনও লোক্যাল ধরে দিল্লি চলে আসুক। তারপর স্টেশনেই স্নান-খাওয়া করে পারলে পায়ে হেঁটে লালকেল্লাটাও দেখে নিক। তারপর রাতের গাড়িতে চলে যাক বিকানিরে।"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। আমরা ওই গাড়িতেই যাব। কেননা রেলের অবস্থা আমাদের খুব ভালভাবেই জানা হয়ে গেছে। কাজেই অযথা দিল্লি-কালকায় যেতে গিয়ে রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। কালই টিকিট কাটছি আমি।"

আনন্দের বন্যা বয়ে গেল যেন সকলের মনে। যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হতেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। এখন শুধু টিকিট পাওয়ার অপেক্ষা।

॥ ২ ॥

মরু-অভিযানের আনন্দে এমনই মেতে উঠল ওরা যে, সে-রাতে ঘুমই হল না কারও। সবাই ভাবল কতক্ষণে সকাল হয়।

সকাল অবশ্য একসময় হল। সকাল ঠিক নয়, ভোর।

বাবলুও প্রতিদিনের মতো বেরোল পঞ্চুকে নিয়ে মর্নিং ওয়াক করতে। মিত্তিরদের বাগানে এসেই দেখে অদ্ভুত ব্যাপার। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই বসে আছে।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "ব্যাপার কী রে ! তোরা এমন সময় ?"

বিলু বলল, "যাওয়ার আনন্দে ঘরে একদম মন বসছে না। তাই সবাই ছুটে এসেছি ভোর না হতেই। এবার থেকে ভাবছি আমরাও রোজ তোর মতো মর্নিং ওয়াক করব।"

ভোম্বল বলে, "আমারও খুব ইচ্ছে করে তোর মতো ভোর-ভোর উঠতে। কিন্তু পারি না। বেলা আটটার আগে আমার ঘুমই ভাঙতে চায় না।"

বাবলু বলল, "কেন, একটা এলার্ম দেওয়া ঘড়ি রাখলেই তো পারিস ?"

"ঘড়ি তো আছে। চেষ্টাও করেছি। কিন্তু ঠ্যালা সামলেছি পরে। বেলা দশটার পর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েও ঘোড়ার মতো ঘুমিয়েছি।"

ভোম্বলের কথায় সবাই হেসে উঠল হো-হো করে।

ওরা কথা বলতে-বলতে যখন ওদের সেই ভাঙা বাড়িটার কাছে এসে পৌঁছল তখন দেখল কোত্থেকে এক সাধুবাবা এসে ত্রিশূল পুঁতে ধুনি জ্বালিয়ে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন সেখানে। যেমন বিচ্ছিরি দেখতে, তেমনই কিটকিটে কালো গায়ের রং। পরনে লাল চেলি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মাথায় দীর্ঘ জটা। বেঁটেখাটো খেঁকুরে চেহারা। খাঁটি ফক্কড় যাকে বলে ঠিক তাই।

এই না দেখেই পঞ্চু তো ভৌ-ভৌ করে তেড়ে গেল।

বাবাজির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। পঞ্চু যতই ভৌ-ভৌ করে উনিও

ততই 'ঔ-ঔ' করে ভ্যাংচান। আর মাঝে-মাঝে এক চোখ টিপে খি-খি করে সকলের দিকে তাকিয়ে হাসেন।

বাবাজির রকম দেখে বাবলুরা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে। পঞ্চু আরও রেগে যায়। কিন্তু যেহেতু বাবলুরা কিছু বলছে না তাই নিজে থেকে কিছু করতেও পারছে না ও। ওর হাঁকডাকে সবাই যেখানে ভয় পায় সেখানে এই বিটলে বাবাজি কিনা ওকেই ভ্যাংচাচ্ছে? পঞ্চু রেগে গিয়ে আবার ডাক ছাড়ে, "ভৌ-উ-উ-উ-উ।"

বাবাজিও মুখের দু'পাশে হাত রেখে ভেংচে ওঠেন, "ঔ-উ-উ-উ-উ।"

বোঝো কারবার।

ভোম্বল একেবারে বাবাজির মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি?"

সাধুবাবা নাকমুখ সিঁটকে বললেন, "রক্ষেকালীর বাচ্চা।"

বাচ্চু, বিচ্ছু তো হেসেই গড়িয়ে পড়ল তখন। হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে গেল ওদের। কী ফাজিল সাধু রে বাবা। গায়ের রং কালো হতে পারে। তাই বলে নিজেকে কেউ বলে ওই কথা? ভারী মজার লোক বটে। কী কথার ছিরি। বলে কিনা—।

বিলুও এবার অতিকষ্টে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল, "তা, বাবাজির আসা হচ্ছে কোত্থেকে?"

বাবাজি ডাঁটের মাথায় বললেন, "কৈলাস থেকে।"

বাবলু বলল, "ওরেব্বাবা। যেখানে যত বাবাজিকে দেখি সবার মুখেই শুনি ওই এক কথা। তা কৈলাসটা কোন দিকে বাবাজি?"

বাবাজি খি-খি করে হেসে বললেন, "অতই যদি জানব তো মাথার ওপর এই আধমনি বোঝাটাকে কেন বয়ে বেড়াব বাবা?"

ভোম্বল বলল, "আপনি এখানে এলেন কী করে?"

"কেন, পায়ে হেঁটে।"

"হ্যাঁ, পায়ে হেঁটে তো আসতেই হবে। না হলে মারুতি আর কে দেবে আপনাকে? বলি, এখানে যে এইরকম একটা ডেরা আছে সেটা জানলেন কী করে?"

"এই দ্যাখো, এটা কি জানতে হয়? মায়ের ইচ্ছেয় ঘুরতে-ঘুরতে চলে এলুম। এখন থাকি না সুখে দিনকতক।"

ভোম্বল কঠিন গলায় বলল, "শুনুন, ওসব মায়ের ইচ্ছেয়-টিচ্ছেয় বুঝি না। এখান থেকে মানে-মানে কেটে পড়ুন দেখি।"

"অত শস্তা নয় চাঁদু। আমার গায়ে গরম জল না ঢাললে আর পুলিশের পেটানি না খেলে আমি সহজে নড়ি না কোথাও থেকে।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "গররর- ঘৌ।"

বাবাজি তো এক লাফে লম্বা। দু' চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, "পঞ্চু! ওর নাম পঞ্চু! মানে পঞ্চানন্দ। জয় বাবা বটুক ভৈরব।" বলেই একেবারে পঞ্চুর সামনে লাফিয়ে পড়ে দু' হাতে জাপটে ধরলেন পঞ্চুকে।

বাবলুরা তো হাঁ-হাঁ করে উঠল। সর্বনাশ। এক্ষুনি দিল বুঝি কামড়ে। কিন্তু হতচকিত পঞ্চু তা করল না। এদিকে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বাবাজির সে কী আদর করবার ধুম। আদর করতে-করতেই নিজের গলার রুদ্রাক্ষের মালাটি পঞ্চুর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "দ্যাখ দেখি, কেমন মানিয়েছে। ওরে শোন, বাবা পঞ্চানন্দর যেমন ষাঁড়, তেমনই বটুক ভৈরবের কালো কুকুর। তোদের এ কুকুর যা-তা কুকুর নয়। একে রোজ পুজো করবি। বুঝলি? এখন ছাড় দেখি কার কাছে কী মালকড়ি আছে। বাবার একটু ভোগ লাগাই। জয় বাবা।" বলেই হাত পাতলেন বাবাজি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো অভিভূত। পঞ্চুকে এইরকম ভগবানের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সকলেরই মন নরম হয়ে গেল খুব। বাবলু ওর পকেট হাতড়ে সাতটি টাকা বার করে দিতেই সে কী আনন্দ বাবাজির। টাকাটা হাতে নিয়েই একবার তুড়ুক করে লাফিয়ে উঠলেন বাবাজি। তারপর বললেন, "টাকা! টাকা কী হবে রে বোকা? রামকৃষ্ণদেব কী বলেছেন জানিস না? টাকা মাটি, মাটি টাকা। টাকার কথা ভাবলে কি পেট ভরবে? যা, রসগোল্লা নিয়ে আয়। আজ মনের আনন্দে বটুক ভৈরবের ভোগ লাগাই।" বলেই পঞ্চুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আর-একবার লাফিয়ে উঠলেন বাবাজি, "জয় বাবা বটুক ভৈরব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখে আর কথাটি নেই। ওরা সত্যিই বিগলিত হল বাবাজির ব্যবহারে। পঞ্চুর পায়ের ধুলো যিনি মাথায় নিতে পারেন তিনি তো মহাপুরুষ।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমি এক্ষুনি রসগোল্লা নিয়ে আসছি।" বলে চলে গেল বাবলু।

বাবাজি পরম সমাদরে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। পঞ্চু বেচারি কী আর করবে, সেও রাগ ভুলে জিভ লকলকিয়ে বাবাজির আদর খেতে লাগল।

একটু পরেই এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে ফিরে এল বাবলু। অবশ্য ও একা নয়। সঙ্গে ওর মা-ও আছেন।

মা গলবস্ত্র হয়ে বাবাজিকে প্রণাম করতে যেতেই বাবাজি আর-একবার লাফিয়ে উঠলেন, "থাক মা, থাক। তুই হলি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আর আমি হলুম গিয়ে তোর একটা কু-সন্তান। আমিই পেন্নাম করব তোকে।" বলেই ঢিপ করে একটা পেন্নাম।

যত যাই হোক সংস্কার একটা আছে। কোনও জটাজুটধারী সন্ন্যাসী কোনও গৃহবধূকে প্রণাম করলে তিনিই বা তা নেবেন কেন? বাবলুর মা বললেন, "এ কী করলেন বাবা! আপনি সাধুসন্ত লোক। আপনি আমাকে প্রণাম করলেন কেন?"

বাবাজি বললেন, "কেন করব না? তুই যে আমার মা। সবার মা তুই।" বলেই বাবলুকে বললেন, "কই দেখি? দেখি কী এনেছিস।"

বাবলু রসগোল্লার হাঁড়িটা বাবাজিকে দিতেই বাবাজি বললেন, "ওরে বাবা। এ যে অনেক! অনেক রসগোল্লা রে! এ তো অনেক টাকার। পেট পুরে খাব।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। মা কিনে দিয়েছেন।"

বাবাজি রসগোল্লার হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে নেচে উঠলেন একবার। তারপর কয়েকটা রসগোল্লা নিজে হাতে পঞ্চুকে খাইয়ে টপাটপ নিজেও গালে ফেললেন কয়েকটা।

বাবলুর মা বললেন, "তা বাবা, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি। আপনার দর্শন যখন পেয়েছি তখন একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আজ আপনাকে আমার বাড়িতে একটু সেবা করতে যেতেই হবে। আমার বহুদিনের ইচ্ছে সাধুসেবা করাবার। আপনি নিজে থেকেই যখন এখানে এসে হাজির হয়েছেন তখন এমন সুযোগ আমি ছাড়ছি না।"

বাবাজি লাফিয়ে উঠলেন, "জয় মা, জয় মা। নিশ্চয়ই যাব। আমাকে সাধু হিসাবে নয়। তোর একটা পাগল ছেলে ভেবেই পেট ভরে দুটো খাইয়ে দে দিকিনি। ওঃ, কতদিন যে তৃপ্তি করে খাইনি।" বলেই বিচ্ছুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "খাওয়ানো তো দূরের কথা। আমার এই উত্তমকুমারের মতো চেহারা দেখলেই লোকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়।"

বিচ্ছু আবার কুলকুলিয়ে হেসে উঠল। এমন মজার লোক ওরা কখনও দেখেনি।

মা চলে গেলে বাবাজি বললেন, "তোরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রসগোল্লাগুলো খেয়ে নে।"

বাবলুরা দেরি করল না। সবাই মিলে আনন্দ করে খেতে লাগল রসগোল্লাগুলো। পড়ে রইল গোটা দুই।

বাবাজি বললেন, "যাক। আমার মা-জননীর কৃপায় অনেকদিন

পরে আজ একটু ভালমন্দ খেতে পাব।" বলেই ফিক-ফিক করে হেসে বললেন, "ওরে, মাকে কখনও ঠকাতে নেই। তোদের আমি চুপিচুপি বলি শোন, আসলে সাধু-টাধু আমি কিছুই নই। সেইজন্যেই মাকে আমার পায়ে হাত দিতে দিলুম না। আমি একটা ঠগবাজ। ভেকধারী, ভণ্ড।"

ভোম্বল বলল, "সে কী ! আপনার এমন জটা··· !"

বাবাজি হেসে বললেন, "জটা থাকলে বুঝি সাধু হয় ? তা হলে তো যার মাথায় টাক আছে সেও হয়ে যাবে নেতাজি।"

"না, না, তা বলছি না। এই জটাটা কি তা হলে ফল্‌স ?"

বাবাজি বললেন, "এঃ, টেনে দ্যাখো না হে ছোকরা, কেমন ছেঁড়ে। সবই আসল। শুধু মানুষটাই আমি মেকি। ছিলুম বড়বাজারের গাঁটকাটা, হয়ে গেলুম চোট্টাবাবা।"

বাবলু বলল, "সে কী !"

"হ্যাঁ, দিনে একটা অন্তত চুরি না করলে রাত্রে আমার ঘুমই হবে না।"

বিলু বলল, "আপনি চুরি করবেন ?"

"করবই তো। চুরি আমাকে করতেই হয়। এতদিনের স্বভাব আমি ছাড়ব কেন ?"

"শেষ চুরি কোথায় করেছেন ?"

"ক্যাওড়াতলার ঘাটে। বাবা গঞ্জিকানন্দর কলকেটা চুরি করে পালিয়ে এসেছি কাল।"

বিচ্ছু আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বাচ্চু বলল, "তা এত জিনিস থাকতে আপনি কলকে চুরি করতে গেলেন কেন ?"

"করব না ? এক ছিলিম খেতে চেয়েছিলুম। যেমন দেয়নি তেমনই বেশ করেছি।" বলেই খি-খি করে হাসতে লাগলেন।

বাবলু বলল, "আপনি অদ্ভুত লোক তো ?"

"আসলে লোকটাই যে আমি খ্যাপা রে। ভগবানের পকেট কেটে সাত মাস জেল খেটেছি আমি।"

বিচ্ছু তো এবার হাসির দমকে পেট চেপে বসে পড়ল সেখানে। সবাই হাসল।

বাবলু বলল, "ভগবানের পকেট কেটে ? কীরকম ?"

"আরে, নামকরা ব্যবসায়ী ভগবানদাস ঝাবড়মল। নাম শুনিসনি ? দিলুম একদিন তারই পকেটটা কেটে। তা চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গেলে যা হয় তাই হল। পড়লুম ধরা। মারও খেলুম। জেলও খাটলুম। জেল হল সাত মাসের। সেই হাতেখড়ি। তারপর থেকে এমন হাত পাকিয়ে ফেললুম যে, রেলের চেকার, থানার দারোগা, কারও পকেটই কাটতে আর বাকি রাখিনি।"

"তারপর ?"

"তারপর জেল-ঘুঘু হতে-হতে একদিন 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'র সেই চোরের মতো ছাই-ভস্ম মেখে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে আমিও সাধু হয়ে গেলুম। তবে সত্যিকারের সাধু তো নই। ভেকধারী, ভণ্ড।" বলেই হাসতে-হাসতে বললেন, "আসলে এটা আমার পেট চালাবার ফিকির।"

এতক্ষণে বাবলু বেশ বিজ্ঞের মতো বলল, "দেখুন বাবাজি, আপনি নিজেকে যাই বলুন না কেন, আপনিই কিন্তু সাচ্চা লোক। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। আসুন, বাড়িতে আসুন।"

পঞ্চুর গলা থেকে রুদ্রাক্ষর মালাটা পড়ে গিয়েছিল তখন। বিলু সেটা কুড়িয়ে দিয়ে দিল বাবাজিকে।

বাবাজি বললেন, "তোরা কি সত্যি-সত্যিই আমাকে তোদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাস ? আমি একটা দাগি চোর রে বাবা। তোরা বড়লোক। তোদের ঘরে কত কী দামি জিনিসপত্তর আছে। দেখলে আমার লোভ হবে। তাই বলি কি, মায়ের পেসাদ তোরা বাড়ি থেকেই নিয়ে আয় না। তৃপ্তি করে খাই।"

বাবলু বলল, "বেশ। আপনি তা হলে এখানেই বিশ্রাম করুন। আমরা যথাসময়ে আসব।" এই বলে চলে এল ওরা।

বাড়ি আসতেই মা বললেন, "কী রে, কী হল ? বাবাজি কোথায় ?"

বাবলু বলল, "আর বাবাজি, ও পাগলার কথা বোলো না। পুরো গোলমেলে লোক। কী রেঁধেছ ওর জন্য দাও গিয়ে দিয়ে আসি।"

"তোরা কী রে ! নিয়ে আসবি তো বাড়িতে। আমার [illegible] কতদিনের ইচ্ছে সাধুসেবা করাবার।"

"কিন্তু না এলে ?"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া আপনি যা ভাবছেন উনি তা নন মাসিমা। লোকটা আসলে ভণ্ড। চেহারা দেখলেন না ? বিটকেল লোক একটা।"

"চেহারা যেমনই হোক না বাবা। চেহারায় কী যায়-আসে ? চেহারার জন্য কাউকে অশ্রদ্ধা করতে নেই। ভাল হোক, মন্দ হোক, ভণ্ড হোক না হোক, মাথায় জটা তো রয়েছে ? গলায় রুদ্রাক্ষ তো আছে ? আমি তাকেই সম্মান জানিয়ে ওঁকে নিমন্ত্রণ করেছি।"

ভোম্বল বলল, "জটা মালা তো থিয়েটারেও পরে মাসিমা।"

"তা পরে। কিন্তু এটা যখন থিয়েটারের স্টেজ নয় আর উনি যখন খ্যাপার মতো নিজেই এসে হাজির হয়েছেন তখন ও-কথা বলি কী করে ? যাও, আমার আদেশ। ডেকে নিয়ে এসো তাঁকে।"

অগত্যা বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে ডাকতে গেল বাবাজিকে। কিন্তু গিয়ে [illegible]ল সব ভোঁ-ভাঁ। কোথায় বাবাজি, কোথায় কে ? কেউ কোথাও নেই। সব ফাঁকা। অবশেষে এদিক-সেদিক একটু ঘুরে দেখে ব্যর্থ হয়েই ফিরে এল বাবলু।

মা বললেন, "কী হল, এলেন না উনি ?"

"না মা। উনি কোথায় যেন চলে গেছেন।"

মা আর কিছু বললেন না। ঠাকুরঘরে গিয়ে রামকৃষ্ণ ও চৈতন্যের ছবির সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করে বাবলুকে খেতে দিলেন। তবে নিজে তিনি কোনও কিছুই মুখে দিলেন না।

॥ ৩ ॥

ব্যাপারটা যে এমন হবে তা ভাবতেও পারেনি বাবলু। বাবাজি গেলেন কোথায় ? হঠাৎ এইভাবে উনি উধাও-ই বা হলেন কেন ? সাধুর ছদ্মবেশে উনি যে কোনও শয়তান তা বলেও মনে হয় না। ওঁর সরলতাভরা দুটি চোখ, এলোমেলো কথাবার্তা ও অকপট স্বীকারোক্তি মানুষটি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না। তবে ?

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের টিকিট কাটতে যাওয়া মাথায় উঠল। বিকেলবেলা আবার তাই এসে হাজির হল ওরা মিত্তিরদের বাগানে। কারও মুখে কথা নেই। এইরকম একটি ঘটনায় ওদের মন এমনই উদ্বিগ্ন যে, কিছুই ভাল লাগল না।

বাবলু বলল, "আমি কিন্তু রীতিমত রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।"

বিলু বলল, "আমিও।"

ভোম্বল বলল, "আমি কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। আসলে লোকটা খ্যাপাটে। তাই যেমন ধাঁই করে এসেছিল তেমনই বাঁই করে চলে গেছে।"

"সেটা অবশ্য অসম্ভব কিছু নয়। তবে খাওয়ার ব্যাপারে ওঁর যেরকম আগ্রহ দেখলাম তাতে না খেয়ে চলে যাওয়ার লোক উনি নন।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "ওঁর জন্য মাসিমারও আজ খাওয়া হল না।"

বাবলু বলল, "মা এইসব ব্যাপারে খুব সেন্টিমেন্টাল।"

বিলু বলল, "আচ্ছা, এমনও হতে পারে ওঁর চলে যাওয়ার মতলব ছিল বলেই বাড়িতে উনি খেতে গেলেন না।"

"হতে পারে। কিন্তু চলেই যদি যাবেন তো দুটো খেয়ে গেলেই বা ক্ষতি কী ছিল ? ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আমার মনে হয়, আমরা চলে যাওয়ার পর মুহূর্তেই এখানে এমন একটা কিছু ঘটে গেছে যাতে পালাতে উনি পথ পাননি।"

"বলছিস ?"

"নির্ঘাত।"

"তা হলে নিশ্চয়ই উনি কারও কিছু চুরি করে পালিয়ে এসেছেন, আর তারা জানতে পেরে তাড়া লাগিয়েছে এখানে।"

ভোম্বল বলল, "এইটাই ঠিক।"

বাবলু বলল, "দ্যাখ, উনি রইলেন কি গেলেন তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। তবে ওঁর অন্তর্ধানটা রহস্যময়। আর চুরির কথা বলছিস ? যে-লোক তুচ্ছ একটা কলকে চুরি করে, সে কারও দামি জিনিস কখনও চুরি করবে না। তা ছাড়া ভাল জিনিস দেখলে পাছে লোভ হয় সেই অজুহাতে উনি আমাদের বাড়িও গেলেন না। এ লোক আদৌ চোরই নয়। যাই হোক, গড়বড় কিছু-না-কিছু একটা হয়েইছে। এখন আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। আর বাগানের দিকে নজর রাখতে হবে এখানে কোনও গুপ্তচক্রের ঘাঁটি কিছু গড়ে উঠছে কি না।"

"আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা তা হলে পিছিয়ে যাবে ?"

"না, কালই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে টিকিটটা কেটে আনব আমি।"

"টিকিট কাটতে আমরা সবাই যাব।"

"বেশ তো যাবি।"

ওরা এতক্ষণ নিজেদের কথায় এমনই মেতে ছিল যে, পঞ্চুর কথা মনেও হয়নি কারও। সন্ধে হয়ে আসছে দেখে ওরা যখন উঠতে যাচ্ছিল তখনই হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল ওরা। বাগানের একেবারে ভেতর থেকে পঞ্চুর ভৌ-ভৌ ডাক একটানা ভেসে আসছে। সেই ডাক শুনে হই-হই করে ছুটে গেল ওরা। গিয়ে দেখল বাগানের এক প্রান্তে বহু বছরের পুরনো একটি জলহীন কুয়োর ভেতর থেকে একটি চাপা কান্নার মৃদু শব্দ ভেসে আসছে। ওরা ঝুঁকে পড়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখল ওদেরই বয়সী একটি মেয়ে সেই কুয়োর ভেতরে বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বাবলু বলল, "কে ! কে তুমি ? উঠে এসো।"

মেয়েটি ভয়ে-ভয়ে বলল, "তুম কৌন হো ?"

বাবলু বলল, "ভয় নেই। ওপরে উঠে এসো তুমি।"

মেয়েটি তবুও ওঠে না। ভয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকে।

এবার বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "ডরো মাত। আমরা তোমার বন্ধু। তোমাকে নিতে এসেছি।"

"দোস্ত ?" মেয়েটি কান্না থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওপরে ওঠার চেষ্টা করল না।

অগত্যা কুয়োর বেড়-এ পা দিয়ে বাচ্চুই নেমে গেল ভেতরে। ছোট্ট গর্ত। বহুদিনের পুরনো মজে যাওয়া। তাই নামা-ওঠা কোনওটাই বিপজ্জনক নয়। বাচ্চু গিয়ে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতেই মেয়েটি বাচ্চুকে বুকে জড়িয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। তারপর দু'জনেই উঠে এল এক-এক করে।

গেঞ্জি আর প্যান্ট পরা স্মার্ট অবাঙালি মেয়ে। কেঁদে-কেঁদে চোখ দুটি ফুলে উঠেছে। বুকের কাছের গেঞ্জিতে চাপ-চাপ রক্তের দাগ।

মেয়েটি ওপরে উঠতেই বাবলু জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি ?"

মেয়েটি বাবলুর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "তুমি বাংলা বোঝো না ?"

"থোড়া-থোড়া।"

"তোমার নাম কী ? নাম ক্যা তুমহারা ?"

"রাধা। পিতাজিকা নাম ডি.এন. শর্মা।"

"বাড়ি কোথায় ? মকান ?"

"আগ্রা।"

"আগ্রা ! মানে তাজমহল যেখানে ? তা, সেখান থেকে তুমি এখানে এলে কী করে ?"

"আমার নসিব আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে ভাইয়া।"

"তোমার প্যান্টে, গেঞ্জিতে এত রক্ত ! ব্যাপারটা কী ?"

"এ মাত পুছো। ম্যায় কাতিল হুঁ। লেকিন নির্দোষ। পোলিসবালেকো মাত বুলানা।"

বাবলু বলল, "তোমার কোনও ভয় নেই। আমরা কাউকে কিচ্ছু বলব না। তুমি আমাদের বাড়িতে এসো। সন্ধে হয়ে গেছে। আর এখন অন্ধকারে এখানে থাকা ঠিক নয়।"

রাধা তখন এমনই অবসন্ন যে, অতিকষ্টে বাচ্চু বিচ্ছুর কাঁধে ভর করে বাবলুদের বাড়ি এল। এইটুকু পথ আসতেই যে কতবার ওর পা দুটো টলে গিয়েছিল তার ঠিক নেই।

বাবলুর মা রাধাকে দেখে বিস্ময়ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও কে ! কাদের মেয়ে রে ?"

বাবলু বলল, "কিছুই জানি না মা। আমাদের বাগানে কুয়োর ভেতরে ভয়ে লুকিয়ে ছিল।"

"ও মা ! সে কী !"

রাধা একবার ওর ম্লান মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটিয়ে ঘরে ঢুকে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে দু' চোখ বুজে রইল। তারপর বহু কষ্টে বলল, "দিনভর খানা নেহি হুয়া। ভুখ লাগ গয়ি। বহোত তিয়াস লাগি।"

মা সঙ্গে-সঙ্গে গোটাচারেক সন্দেশ আর এক গেলাস জল এনে দিল রাধাকে।

রাধা সেগুলো খেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

মা ওর হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভাল করে সাবান-টাবান মেখে স্নান করে স্নিগ্ধ হল রাধা। বাচ্চু ছুটে গিয়ে ওদের বাড়ি থেকে ওরই পরনের স্কার্ট ইত্যাদি রাধার জন্য নিয়ে এল। রাধা বাচ্চুর পোশাক পরে আবার যখন ওদের পাশে এসে বসল তখন স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, পরিচ্ছন্নতায় মেয়েটি যেন ঝলমল করছে। লুচি, আলুভাজা, গরম-গরম হালুয়া সহযোগে আর-এক প্রস্থ জলযোগের পর এক কাপ করে কফি খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিল রাধা। বাবলুরাও খেল।

রাধা এবার ওর ভ্রমর-কালো চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করল, "ম্যায় কাঁহা হুঁ ?"

বাবলু বলল, "তুমি হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে আছ।"

মা বললেন, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ? কোনও ভয় নেই তোমার।"

"জি !"

"বলছি, তুমি ভয় পাতা হ্যায় কাহে ? আমরা তোমার কোনও ক্ষতি হতে নেহি দেগা। তোমাকে তোমার বাবা-মায়ের কাছে পাঠায়গা।"

মায়ের হিন্দি শুনে বাবলু বলল, "ও তোমার কথা কিছু বুঝবে না মা। এখন ওকেই বরং ওর ভাষায় ওর কথা বলতে বলো।" বলে রাধাকে বলল, "তুম কুছ বতানা চাহো তো বতাও। হাম লোক তুমকো মুলুকমে ভেজেগা। তুম্হারা মাতা-পিতা কা পাশ।"

মা বললেন, "তুই বেশ ভালই হিন্দি বলিস তো ?"

বাবলু বলল, "ভাল না ছাই। অশুদ্ধ হিন্দি। যেটুকু বলছি সেটুকু অবশ্য টিভির দৌলতে শিখেছি। একেবারে নির্ভুল না হলেও মনের কথাটা এর দ্বারা বুঝিয়ে দিতে পারি।"

বাবলুর কথা শুনে রাধা কী যেন ভাবল। তারপর ওর ভাষায় ভাঙা বাংলা ভাঙা হিন্দিতে যা বলল তা হল এই :

আগ্রার মেয়ে ও। আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের কাছে ওদের বাড়ি।

সেখানে ওর বাবা-মা এবং ওর আর-এক বোন থাকে। ওর নাম রাধা। বোনের নাম রেখা। যমজ বোন। দু'জনকেই একই রকম দেখতে। তা ওদের মহল্লার একটি মেয়ের শাদি উপলক্ষে হাওড়ার ঘুসুড়িতে পড়শিদের সঙ্গে এসেছিল ওরা। বাবা-মা আসেননি। ওরা দু' বোনেই এসেছিল। তবে এখন মনে হচ্ছে না এলেই বুঝি ভাল হত।

ওর বান্ধবী হেমার বাবা আগ্রার বাসিন্দা হলেও শালকিয়ার হরগঞ্জবাজারের একজন নামকরা ব্যাপারি। ঘুসুড়িতে একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। তা শাদি উপলক্ষে এখানকার বিনানি ধর্মশালা ভাড়া নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেখানে যতসব আত্মীয়-কুটুম্ব মিলে দল বেঁধেছিল ওরা। কাল সন্ধেবেলা হঠাৎ বিয়েবাড়িতে লোডশেডিং হয়ে গেলে ওরা শুনতে পেল চারদিকে একটা হুটোপুটির শব্দ। আর সেইসঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি। ব্যাপারটা যে কী হল কিছু ভেবে দেখার আগেই রাধা বুঝতে পারল সেই অন্ধকারে কে যেন ওর গলার হারটা ছিনিয়ে নিয়েছে। তারপরই হেমার আর্তনাদ। সেই অন্ধকারে বিয়েবাড়ির ক্ষীণ প্রদীপের আলোটুকুই ছিল ভরসা। তাতেই দেখা গেল হেমার কান থেকেও ওর ঝুমকো দুটো ছিঁড়ে নিয়েছে কেউ। দু' হাতে কান চেপে কাঁদছে হেমা। আর তার চেয়েও খারাপ অবস্থা ওর দিদির। দু'জন যুবক গায়ের জোরে ওর দিদির গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নিচ্ছে পটাপট। হেমার দিদি প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে। আর-এক যুবক রিভলভার তাগ করে আছে বাড়ির অন্যান্য লোকেদের দিকে। পুরুষরা দূরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আর দূর থেকেই উপদেশ দিচ্ছে, "ও লোগ যো কুছ মাংতা সব দে দো। নেহি তো মার ডালে গা।"

রাধা কিন্তু এই অমানুষিক দৃশ্য দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। হঠাৎ নীচে থেকে জেনারেটরের ভট-ভট শব্দ ভেসে আসতেই ও প্রদীপ উলটে ভারী পিলসুজটা নিয়ে যে-লোকটা রিভলভার তাগ করেছিল তার মাথার ওপর বসিয়ে দিল এক ঘা। লোকটি ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। পড়ে ছটফট করতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে আলোও জ্বলে উঠল। রাধারও বুকে-মুখে রক্তের ছিটে। সামনের আয়নায় সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল সে। যে লোক দুটো হেমার দিদির গয়না কেড়ে নিচ্ছিল তারা এবার সহসা লাফিয়ে পড়ল রাধার ওপর। তারপর গায়ের জোরে ওকে টানতে-টানতে নীচে নামিয়ে একটা অ্যাম্বাসাডারে উঠিয়ে দিল ওরা। একজন ওর নাকে একটা রুমাল চেপে ধরতেই দম যেন বন্ধ হয়ে এল ওর। একটু-একটু করে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল ওর চোখের সামনে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করতে লাগল এক অজানা ভয়ে অথবা রুমালে মাখা কোনও ওষুধের প্রভাবে। তারপর আর কিছুই ওর মনে নেই।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন একটি ঘরের মধ্যে ও একা শুয়ে আছে। সেই ঘরে একটি সবুজ রঙের ডিম লাইট জ্বলছিল। ঘরের ভেতর গদি বিছানা আলমারি সবই ছিল। কোনও লজ অথবা ফ্ল্যাটবাড়ি হবে হয়তো। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল অনেক নিচুতে রাস্তা। সেখানে কোনও লোকজন নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। রাত কত তা কে জানে ? কিন্তু ফ্ল্যাটটা এত উঁচুতে যে, সেটা চারতলায় কি পাঁচতলায় তাও সে মনে করতে পারল না। এই জানলায় লোহার ফ্রেমের সঙ্গে রঙিন কাচ লাগানো। টেনে খোলা যায়। জানলায় কোনও গ্রিল বা রড নেই। কিন্তু এত উঁচু থেকে তো লাফানো যায় না। অথচ পালাবারও পথ নেই। এখন হয় এদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে নয়তো বরণ করে নিতে হবে মৃত্যুকে। অথচ ঘরের একটিমাত্র দরজা, আর সে দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ। রাধা তখন হঠাৎই বুদ্ধি করে ঘরের ডিম লাইটটাও নিভিয়ে দিয়ে দরজার কাছে এসে টোকা দিতে লাগল, "কই হ্যায় ? দরোয়াজা খোলো।" বাইরে পাহারা ছিল নির্ঘাত। তাই বেঁটেখাটো হাফপ্যান্ট পরা একটা দরোয়ান গোছের লোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই লোকটার পায়ে পা দিয়ে এমন একটা হ্যাঁচকা টান দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। আর রাধাও সেই ফাঁকে ছুটে বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল তুলে দিল। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে। কয়েক ধাপ নামার পরই দেখল দুড়দাড় করে আরও দু-একজন নামছে ওকে ধরবার জন্য। ও তখন দোতলায় নেমেছে। সিঁড়ির একপাশে একটি অপরিচ্ছন্ন ল্যাট্রিন দেখে বুদ্ধি করে তার ভেতরেই ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর সেই ল্যাট্রিনের জানলা গলে লাফিয়ে পড়ল পাশের একটি টিনের চালে। সেখান থেকে রাস্তায়। নেমেই ছোটা শুরু করল। একটু পরেই পায়ের শব্দ শুনে বুঝল দু'জন লোকও তাড়া করে আসছে ওকে। হঠাৎ একটা গলির ভেতর থেকে কতকগুলো রাস্তার কুকুর ঘেউ-ঘেউ শব্দ করে এমন তাড়া লাগাল ওদের যে, পালাতে পথ পেল না বাছাধনরা। রাধা তখন সেই গলিরই ভেতর দিয়ে এ-গলি ও-গলি পার হয়ে ঢুকে পড়ল একটি পোড়ো বাগানে। সেই বাগান, যেখান থেকে ওরা উদ্ধার করেছে ওকে।

এই পর্যন্ত বলে রাধা একটু থামল।

বাবলু বলল, "তারপর ?"

রাধা আবার শুরু করল —

বাগানে ঢুকে সে যে কোথায় কোন দিকে লুকোবে কিছু ঠিক করতে পারল না। হঠাৎ দেখল একটা ভাঙা বাড়ির ভেতর এক সাধুবাবা ধুনি জ্বালিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলছেন বসে-বসে। ও ছুটে গিয়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরল সাধুবাবার। তারপর বলল, "বাবাজি, মুঝে বঁচাইয়ে। ও লোক মেরা পিছু পড় গিয়া। ম্যায় বেকসুর হুঁ।" বাবাজি বললেন, "কে তুই ?" রাধা তখন অতি কষ্টে হাঁফাতে-হাঁফাতে সব কথা খুলে বলল বাবাজিকে। বাবাজি বললেন, "ঠিক আছে। তোর কোনও ভয় নেই। আমি আছি। ঘুরতে-ঘুরতে ভাগ্যিস এসে পড়েছিলাম এখানে। তবে দু-একটা দিন এই জঙ্গলেই তুই লুকিয়ে থাক। তারপর আমি সুবিধেমতো তোকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে আসব। চাই কি,আমি নিজেই চলে যাব তোর সঙ্গে। তবে এই অবস্থায় তুই কিন্তু একদম বাইরে বেরোবি না। বেরোলেই ধরা পড়বি। আর ধরা পড়লেই কেলেঙ্কারি। খুন যখন করেছিস তখন হয় তোকে পুলিশে ধরবে, নয়তো গুণ্ডায় মারবে। ওদের দলের লোককে তুই মেরেছিস, ওরা কি তার প্রতিশোধ নেবে না ভেবেছিস ?" রাধা বলল, "আপনি যাতে আমার ভাল হয় তাই করুন।" তখন বাবাজি অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজেপেতে ওই কুয়োর মধ্যে ওকে ঢুকিয়ে দিলেন। কুয়োর ভেতরে ঢুকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল রাধা। দেখতে-দেখতে সকাল হল। অনেক বেলায় বাবাজি এসে দুটো রসগোল্লা খাইয়ে গেলেন ওকে। আর একটু রস। কিন্তু তাতে কি পেট ভরে ? উলটে তেষ্টায় প্রাণটা ছটফট করতে লাগল। বাবাজিকে সে-কথা বলতেই বাবাজি বললেন, "ব্যবস্থা করছি জলের।" আর এও বললেন, দুপুরে দুটো ভাতের ব্যবস্থাও নাকি হয়ে গেছে।

"তারপর ?"

রাধা বলতে লাগল, "তারপর বরাত মন্দ।"

যেন ছায়াছবির দৃশ্যের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল ঘটনাগুলো।

বাবাজি কুয়োর কাছ থেকে সবে কয়েক পা এগিয়েছেন, এমন সময় কারা যেন এসে হাজির হল সেখানে। বাবাজিকে বলল, "একটা মেয়ে একজনকে খুন করে পালিয়ে এসেছে। খুব সম্ভবত এই বাগানেই কোথাও লুকিয়েছে সে। মেয়েটা কোথায় ?" বাবাজি বললেন, "কোথায় তা আমি কী করে জানব ? ওসব মেয়েটেয়ে এখানে নেই। এখন ভালয়-ভালয় কেটে পড়ো দিকিনি।" ওরা বলাবলি করল, 'আমাদের মনে হচ্ছে এই ভণ্ড ব্যাটা সব জানে।

চেপে যাচ্ছে। না হলে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে আসছে কেন? নিশ্চয়ই মেয়েটাকে খাওয়াতে গিয়েছিল। এখন এতে করে জল আনতে যাচ্ছে।

বাবাজির গলা শোনা গেল এবার, "আমার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি ছাড়া আর একটা কী আছে দেখছ তো? ত্রিশূল। এর বাড়ি এমন খুঁচিয়ে দেব যে, দিনের বেলায় চাঁদ দেখবে।" ওদের একজন বলল, "আমাদের সঙ্গে ওইভাবে কথা বোলো না বাবাজি। ফল খুব খারাপ হবে।" বাবাজিও রেগে বললেন, "আমার সঙ্গেও চালাকি করতে এসো না। আমিও ছেড়ে কথা বলব না। আমি যে-সে সাধু নই। ধুনির সামনে দু' চোখ বুজে আমি ভগবানের ধ্যান করি না। কার কি হাতাব তাই ভাবি। দরকার হলে মার্ডারও করতে পারি আমি। যাও।" ওরা তখন দু' দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবাজির ওপর। রাধা অনুমানে বুঝল, ওরা খুব মারধোর করছে বাবাজিকে। একজন বলল, "এখন আর নয়। মজা দেখাব পরে। এক্ষুনি সেই শয়তান ছেলেমেয়েগুলো হয়তো কুকুর-টুকুর নিয়ে এসে হাজির হবে। তার চেয়ে রাত্রিবেলা আসব। এসে মোচড় দিয়ে কথা বার করব। হয় মেয়েটাকে নিয়ে যাব, নয়তো এই জটায় পেট্রল ঢেলে ধরিয়ে দেব দেশলাই কাঠি। বুঝবে তখন ঠ্যালাটা।"

বাবলু বলল, "মাই গড। বাবাজি তা হলে কোথায়?"

রাধা বলল, "আমি জানি না। ওরা বাবাজিকে নিশ্চয়ই এই বাগানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আমি সারাদিন ওই বাবাজির কথা ভাবছিলাম। লেকিন এখানে তো আমার কোনও জান পয়ছান নেই। তাই ভাবছিলাম সন্ধের পর ছুপকে-ছুপকে বাবাজিকে একটু খুঁজে দেখব। না পেলে পালাব এখান থেকে।"

বাবলু বলল, "পালিয়ে তুমি কোথায় যেতে?"

"তা তো জানি না। সেইজন্যই তো ভেবে-ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছিলাম।"

রাধার কথা শুনে অবাক সকলে।

বাবলু বলল, "বাবাজি কত মহৎ লোক দেখেছিস? পাছে আমাদের কাছে ওর কথা বললে আমরা চারদিকে রাষ্ট্র করে দিই, তাই পুরো ব্যাপারটা চেপে গেছেন। হাসি-ঠাট্টা-ফাজলামি করে আমাদের এমন ভুলিয়ে রেখেছিলেন যে, আমরা অকারণে বাগানের আরও ভেতরে যেন না যাই। মা ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিলেন, কিন্তু ওই অভুক্ত মেয়েটির কথা চিন্তা করে বাবাজি ওঁর খাবার বাগানেই দিয়ে আসতে বলেছিলেন। পরে অবশ্য নিয়তি তাঁকে দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দিয়েছে। আমাদের খুব উচিত ছিল বাবাজিকে ছিটেল ভেবে অবহেলা না করে তখনই ভালভাবে তাঁর খোঁজ করা। আসলে ব্যাপারটা যে এত খারাপ দিকে চলে গেছে তা কেউ ভাবেইনি। ভাগ্যে পঞ্চু রাধাকে খুঁজে পেল।"

বিলু বলল, "এখন তা হলে আমাদের করণীয়?"

"এক্ষুনি বাবাজিকে উদ্ধার করতে হবে। বাবাজি ওই বাগানের ভেতরেই আছেন। এখনও হয়তো সময় আছে।" বলেই উঠে দাঁড়াল বাবলু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও যাওয়ার জন্য তৈরি হল। আর পঞ্চু? সে এই নৈশ অভিযানের গন্ধ পেয়ে ঘন-ঘন লেজ নাড়তে লাগল আনন্দে।

রাধা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কাঁহা যা রহে হো তুম?"

বাবলু বলল, "তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি মায়ের কাছে থাকো। আমরা বাবাজির খোঁজ নিতে যাচ্ছি।"

রাধা ভয়ে-ভয়ে বলল, "লেকিন হামারা বাত কিসিকো মাত বোলনা।"

"না, না। কাউকেই বলব না।" বলে চটপট তৈরি হয়ে পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে সকলকে ইশারা করে চলে গেল বাবলু।

মা বললেন, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন মা? তুমি তো খুনের জন্য খুন করোনি। তোমার কোনও ভয় নেই। পুলিশ তোমাকে কিচ্ছু বলবে না।"

"মা জি! মুঝে বহোত ডর লাগতা।"

"ভয় কী? তা ছাড়া লোকটাকে তুমিই যে খুন করেছ তারই বা প্রমাণ কী? ওকে অন্য কেউও তো খুন করতে পারে?"

"নেহি মাজি! ও খুন ম্যায়নে কিয়া।"

"পাগল মেয়ে। আমাদের যা বলেছ তা সবাইকে বলবে কেন? তুমি বলবে, গুণ্ডারা তোমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আর ওই খুনের ব্যাপারে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, তুমি ওদের বাধা দিতে গিয়েছিলে বলে ওরা তোমাকে মারতে গিয়েছিল। সেই সময় ওই লোকটা এসে পড়ায় অন্ধকারে ওরই মাথায় লেগে গেছে। তা হলেই তো হল।"

এইভাবে যে একটা খুনের ঘটনাকে বুদ্ধির চালে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তা বোধ হয় মনে হয়নি রাধার। তাই আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর ম্লান মুখখানি। সে গভীর আবেগে বাবলুর মাকে জড়িয়ে ধরেই মুখ লুকলো তাঁর কোলের ভেতর।

॥ ৪ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যখন মিত্তিরদের বাগানে এল তখন সেখানে শ্মশানের নীরবতা। জ্যোৎস্নার আলো চারদিকের গাছপালায় চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ছে। তাই টর্চের প্রয়োজন হল না। ওরা খুব সন্তর্পণে চুপিচুপি ছায়ান্ধকারে সেই ভাঙা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাবলু পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে ওকে একটু ঠেলে দিতেই পঞ্চু বুঝে নিল এখন তাকে কী করতে হবে। সে ঝড়ের গতিতে চলে গেল জঙ্গলের গভীরে।

বাবলুরা চারদিকে নজর রাখতে-রাখতে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল জঙ্গলের দিকে।

বিলু বলল, "মনে হয় ওরা এখনও আসেনি। এলে কিন্তু ওদের হাঁকডাক আমরা শুনতে পেতাম।"

বাবলু বলল, "বাবাজিকে উদ্ধার করেও আমরা অপেক্ষা করব ওদের জন্য। এমন শিক্ষা দেব যে, বাছাধনরা হাড়ে-হাড়ে টের পাবে।"

ভোম্বল বলল, "রাধাকে পৌঁছে দেওয়ার কী করবি?"

বাবলু বলল, "কাল সকালে ঘুসুড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নেব। তারপর রাধাকে পৌঁছে দেব ওর আত্মীয়স্বজনদের হাতে। সেখানে ওর বোনও তো আছে। খুব কান্নাকাটি করছে নিশ্চয়ই।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা, এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু কই কোনও কাগজেই তো দিল না খবরটা?"

"আসলে এইরকম ঘটনা তো আজকাল আকছার ঘটছে। তাই হয়তো দেয়নি। নয়তো দেরিতে খবর পৌঁছনোর জন্য কাগজওয়ালারা খবরটা ঠিক সময় ছেপে উঠতে পারেনি। কালকের কাগজে নিশ্চয়ই থাকবে।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তখনই হঠাৎ কে যেন পিছন দিক থেকে অতর্কিতে চেপে ধরল বাবলুর মুখটাকে। তারপর ওকে আস্তে-আস্তে পাশের একটি ঝোপের দিকে টেনে নিল। ব্যাপারটা এমনই সুকৌশলে এবং আচমকা ঘটে গেল যে, কেউ টেরও পেল না। বাবলুও বাধা দিতে পারল না।

বাবলুকে যারা টেনে নিল তারা প্রথমেই কেড়ে নিল ওর পিস্তলটা। ওরা দু'জন ছিল। একজন ওর পেটে ছুরি ঠেকিয়ে বলল, "এই জঙ্গলে রাতদুপুরে কী করতে এসেছিস?"

বাবলু বলল, "তোমরাই-বা এখানে কী করতে এসেছ?"

"আমরা নিশাচর। রাত্রি হলেই বেরিয়ে পড়ি আমরা।"

বাবলু বলল, "এই বাগানে এক সাধু এসেছিলেন। উনি হঠাৎ

করে উবে যান। তাই কী ব্যাপার দেখবার জন্য আমরা এখানে এসেছি।"

"আর কিছু?"

"আর কী?"

"সেই মেয়েটা কোথায়?"

"কোন মেয়েটা?"

"একটু আগেই যার কথা বলছিলি?"

"জানি না।"

এমন সময় বিলুর হঠাৎ খেয়াল হল বাবলু নেই। বিলু বলল, "তাই তো রে, বাবলু কোথায় গেল? বাবলু? এই তো কথা বলছিল?"

ভোম্বল বলল, "সত্যিই তো! কোথায় গেল সে?" বলেই ডাকল, "বাবলু, এই বাবলু, কোথায় গেলি?"

বাবলু ওর ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু লোক দুটো ওর মুখ চেপে ওর পেটের ওপর ছুরিটা এমনভাবে ধরে রইল যে, ভয়ে চেঁচাতে পারল না ও।"

বিলু তখন হাঁক দিয়েছে, "পঞ্চু, পঞ্চু, পঞ্চু শিগগির আয়।"

বিলুর ডাক শোনামাত্রই ছুটে এল পঞ্চু।

সবাই বলল, "বাবলু নেই।"

পঞ্চু লাফিয়ে উঠল, "আঁ-আঁ-আঁউ।" অর্থাৎ সে কী!

হঠাৎ দূরে একটা ঝোপ নড়ে উঠতেই পঞ্চু তীর-বেগে ছুটে গেল সেদিকে। একেবারে ঠিক জায়গাতেই গিয়ে পড়েছে। যে লোকটা বাবলুর পেটে ছুরি ধরেছিল, পঞ্চু গিয়ে লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর। যেই না পড়া অমনই দেখা গেল আর-একজন ছুটে এল সেখানে। লোকটার হাতে একটা কাঁটাওয়ালা চাবুক ছিল। সেই চাবুকের বাড়ি এক ঘা পঞ্চুর পিঠে বসিয়ে দিতেই বিকট চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল পঞ্চু। তারপর কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। কী ছিল সেই চাবুকে তা কে জানে? গায়ে পড়ামাত্র সারা শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। ওই চাবুকের ঘা খেয়ে পঞ্চুর এমন হল যে, আর-একবার আক্রমণ করতে সাহস করল না। তাই সে ক্রুদ্ধ চোখে লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে গরর-গরর করতে লাগল।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু সবাই ছুটে এসেছে।

যে-লোকটা বাবলুর পেটে ছুরি ধরেছিল তার এক হাতে ছোরা, অন্য হাতে বাবলুর পিস্তলটা। সে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়াতেই পঞ্চু আরও একবার সুযোগ বুঝে বাবলুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল যেই, অমনই সে যখন অর্ধপথে তখন হঠাৎ সেই চাবুকের আর-এক ঘা পড়ল ওর গায়ে। পঞ্চু "আঁ-আঁ-আঁউ" করে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তারপর গুটি-গুটি পিছু হটে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের ভেতর।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এমন অসহায় অবস্থায় কখনও পড়েনি। একে তো বাবলুর হাতে পিস্তল নেই তার ওপর পঞ্চু বেকায়দায়।

লোক দুটো এবার এগিয়ে এসে ওদের পাঁচজনকে পর পর সারি দিয়ে দাঁড় করাল।

একজন পিস্তল তাগ করে রইল ওদের দিকে।

চাবুক-মারা লোকটা বলল, "এইবার বল মেয়েটা কোথায়?"

বাবলু বলল, "জানি না।"

"ঠিক করে বল। না হলে দেখছিস তো হাতে কী? এটা যে-সে চাবুক নয়। এতে এমন জিনিস ফিট করা আছে যাতে শুধু কুকুর নয়, বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া পর্যন্ত চুপ করে যাবে। সারা শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে যাবে এই চাবুকের, এক ঘা খেলে।"

বাবলু বলল, "মেয়েটা আপাতত আমাদের কাছেই আছে। কিন্তু সেই সাধুবাবা কোথায়?"

লোক দুটো হেসে উঠল, "সাধুবাবা! গায়ে ছাই মাখলেই সাধু হয় বুঝি? সাধুবাবা আমাদের কাছেই আছে।"

"ঠিক আছে। সাধুবাবাকে ছেড়ে দাও। তারপর মেয়েটাকে পাবে।"

"ওসব ছেঁদো কথায় আমরা ভুলছি না। তোদের আমরা ভালরকম চিনি। সেইজন্যই তো ফাঁদ পেতে ধরেছি তোদের। কুকুরটার জন্যও স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করে এনেছি, দেখলি তো দু' ঘা খেতেই কেমন লেজ গুটিয়ে পালাল। এখন যা বলি শোন। যে-কোনও একজন গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে আয়। ও আমাদের বস্‌কে হাফ-মার্ডার করেছে। এখনও হাসপাতালে ধুঁকছে সে। ওকে আমাদের চাই।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমাদের ভেতর থেকে যে-কোনও একজনকে যেতে দাও। সে গিয়ে নিয়ে আসবে মেয়েটাকে।"

"পুলিশ ডেকে আনবি না তো ? খুব সাবধান। তোদের একদম বিশ্বাস নেই। যদি পুলিশ আসে তা হলে পুলিশ দেখলেই আগে তোদের খতম করব। তারপর লড়ে যাব পুলিশের সঙ্গে। হয় জিতব নয় মরব।"

বাবলু বলল, "আমরা চট করে পুলিশের কাছে যাই না। তা যদি যেতাম তা হলে এই রাতদুপুরে বাগানে আমরা আসতাম না, পুলিশই আসত। আমি কথা দিচ্ছি মেয়েটাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। কিন্তু তার আগে যে সাধুবাবাকে আমাদের চাই ব্রাদার ?"

চাবুক হাতে লোকটি ক্রোধান্ধ হয়ে বলল, "তবে রে ! এক ফোঁটা ছেলে, আবার ইংরিজি বলা হচ্ছে ?" বলেই চাবুকের বাড়ি বাবলুর পায়ে।

বাবলু যেন নীল হয়ে উঠল।

কিন্তু পরের বার মারবার জন্য যেই না সে চাবুক উঠিয়েছে, অমনই কোথা থেকে যেন গেরিলা আক্রমণে "ভৌ-উ-উ" শব্দে লোকটির হাত কামড়ে ঝুলে পড়ল পঞ্চু। লোকটি "মাই গড" বলে লাফিয়ে উঠল। তবে পঞ্চুর কামড় থেকে হাত ছাড়ায় এমন শক্তি তার কোথায় ? অগত্যা হাত ছাড়াবার বৃথা চেষ্টায় অযথা ধস্তাধস্তি করতে লাগল পঞ্চুর সঙ্গে।

এদিকে পিস্তলধারী অপরজনও তখন হতচকিত হয়ে পড়েছে। আর সেই সুযোগে বিলু ভোম্বলও একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা ধরে ঝুলে পড়েছে ওর।

ওদিকে বাবলুও তখন চাবুকটা কেড়ে নিয়েছে সেই লোকটির হাত থেকে। তারপর পঞ্চুকে ছাড়তে বলে সেই চাবুক দিয়ে মারের পর মার। ঠিক যেভাবে পঞ্চুকে, বাবলুকে মেরেছিল সেইভাবে—সপাং-সপাং-সপাং।

চাবুকের শক খাওয়া লোকটির তখন আর্তনাদ করবার শক্তিও নেই। মুখ দিয়ে শুধু গোঁ-গোঁ করে একটা শব্দ করল।

বিলু ভোম্বল আগের লোকটির কাছ থেকে ছোরা আর পিস্তল কেড়ে নিয়েছে তখন। পিস্তলটা বাবলুকে দিতেই বাবলু সেটা হাতে নিয়ে বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

লোকটি হাত ওঠাল।

বাবলু চাবুকটা বিলুর হাতে দিয়ে বলল, "বেশটি করে চাবকা।"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনে মিলে পালা করে তখন চাবকাতে লাগল লোকটাকে।

আর লোকটি চাবুকের ঘা খেয়েই শুরু করল মাঙ্কি ডান্স।

অপর লোকটি বলল, "ঠিক আছে, আমরা আর কাউকে চাই না। এবারের মতন তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও।"

বাবলু বলল, "সাধুবাবা কোথায় ?"

"আমাদের বাগানের বাইরে নিয়ে চলো, তারপরে বলছি।"

বাবলু বলল, "তবে রে !" বলেই পিস্তল ওঠাল।

ওদিকে পঞ্চুর তখন সে কী গরগরানি।

ওরা দু'জনে তখন চোখে-চোখে কী যেন ইশারা করল।

একজন বলল, "ঠিক আছে। আমার সঙ্গে কেউ এসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

বিলু, ভোম্বল লোকটার পেছনে ছুরি ধরে বলল, "চলো।"

লোকটি ওদের সেই ভাঙা বাড়ির ভেতর নিয়ে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠেই পেছন দিকে মারল এক লাফ।

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই হতবাক। ওরা জোরে চেঁচাল, "পঞ্চু, পঞ্চু রে !"

ওদের ডাক শোনামাত্রই ছুটে এল পঞ্চু। এবং এত দ্রুত এল যে, পালাবার চেষ্টা করেও পালাতে পারল না লোকটি। উলটে পঞ্চুর হাঁকডাক আর ভীষণ মূর্তি দেখে হার্টফেল করে আর কি। বিলু, ভোম্বলও তখন ছাদ থেকে নেমে এসে ধরেছে লোকটিকে। তারপর আবার পিঠে ছুরি রেখে নিয়ে এল বাবলুর কাছে।

বাবলু বলল, "সোজা আঙুলে এখানে ঘি উঠবে না দেখছি।"

ওরা মাথা হেঁট করল।

বাবলু ওদের বলল, "দু'জনেই হাত ওঠাও। এগিয়ে চলো সামনের দিকে। ছোটবার চেষ্টা করবে না। ছুটলেই গুলি করব।"

ওরা বলল, "কোথায় যাব ?"

"শ্বশুরবাড়ি যাবে। আবার কোথায় ?"

"তোমরা কি আমাদের পুলিশে দেবে ?"

"কথা না বাড়িয়ে চলো বলছি।"

অগত্যা দু' হাত তুলে গৌরাঙ্গ হয়ে এগিয়ে চলল ওরা। আর ওদের পেছনে চলল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। সেইসঙ্গে ক্রুদ্ধ পঞ্চু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও বাবলুকে অনুসরণ করল। ওরা বুঝতে পারল না বাবলু ওদের কোনদিকে নিয়ে যেতে চাইছে। থানায় গেলে তো বাগানের বাইরে যেত। তার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে আরও ভেতরে।

ওরা যেতে-যেতে একসময় সেই জলহীন কুয়োটার কাছে এল।

বাবলু লোক দুটোকে বলল, "ঢোক এর ভেতর।"

"তার মানে ?"

"ঢোক বলছি।"

বিচ্ছু সপাং করে এক ঘা দিয়ে বলল, "যা বলছে তাই কর না। ঢোক এর ভেতর।"

বাবলু বলল, "ভয় নেই। বেশি গভীর নয় এটা। ঢোকো।"

ওরা ঝুপঝাপ নেমে পড়ল।

পঞ্চু কুয়োর পাড়ের ওপর বসে গরর্-গরর্ করতে লাগল ওদের দিকে চেয়ে।

ওরা এমন বেকায়দায় পড়ল যে, আর ওদের ওঠার সাধ্য নেই।

বাবলু বলল, "এবার বলো সাধুবাবা কোথায় ?"

"এই বাগানের পুব দিকে একটা গাবগাছের সঙ্গে বাঁধা আছে।"

বাবলু বিলুকে বলল, "তুই সবাইকে নিয়ে চলে যা। পঞ্চুও যাক। আমি দেখছি এ-দুটোকে।"

"তুই একা দু'জনকে সামলাতে পারবি ?"

"সেইজন্যেই তো বুদ্ধি করে গর্তে ঢোকালাম দুটোকে। তা ছাড়া আমার এক হাতে হান্টার আর-এক হাতে পিস্তল। পারব না মানে ?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তখন পঞ্চুকে নিয়ে সদলবলে ছুটল বাগানের পুব দিকে সাধুর সন্ধানে। পঞ্চুর আনন্দ দেখে কে। যতই হোক মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে তো।

বাগানের পুব দিকে একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে ওরা দেখল, সত্যি-সত্যিই সেই বাবাজিকে একটি গাবগাছের গুঁড়ির সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখও এমনভাবে বাঁধা যাতে চেঁচাতে না পারে।

ওরা ছুটে গিয়ে ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে বাঁধনমুক্ত করল বাবাজিকে। বাবাজির দু'চোখে তখন জলের ধারা। মুক্ত হতেই বাবাজি একবার ধুপ করে বসে পড়লেন মাটিতে। তারপর অবাক

বিস্ময়ে বললেন, "তোমরা ! তোমরা এখানে কী করে এলে ?"

"আপনার খোঁজ করতে-করতেই এসে পড়লাম ।"

বাবাজির পায়ের কাছে বেঁকানো অবস্থায় ত্রিশূলটা পড়ে ছিল। বাবাজি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ভোম্বলকে বললেন, "এটা একটু সোজা করে দে তো বাবা। হাত দুটো মোড়া ছিল বলে টাটিয়ে উঠছে ।"

ভোম্বল ত্রিশূলটা সোজা করে দিতেই বাবাজি বললেন, "আমাকে তো উদ্ধার করলি। এবার আর-একজনকে উদ্ধার কর দেখি। অবশ্য সে যদি এখনও থাকে ।"

বিলু বলল, "কার কথা বলছেন আপনি ?"

"সে একজন। গেলেই দেখতে পাবি ।"

ওরা তো সবই জানে। তাই বাবাজির পিছু-পিছু চলল। বাবাজি ওদের নিয়ে কুয়োর কাছে এসেই বাবলুকে দেখতে পেলেন। বাবাজি বললেন, "ও, তুমি আছ এখানে ?" বলেই বললেন, "এই কুয়োর ভেতরে টর্চের আলো ফেলো তোমরা ।"

বিলু, ভোম্বল তাই করল।

বাবাজি ঝুঁকে পড়ে ভেতরে তাকিয়েই লোক দুটোকে দেখে বললেন, "আরে ! এদের এখানে ঢোকাল কে ?"

বাবলু বলল, "আমরা ।"

বাবাজি ত্রিশূল হাতে লাফিয়ে উঠলেন, "এই শয়তানরাই আমাকে বেঁধে রেখেছিল। এরা আমাকে কী মার মেরেছে আজ। এখন গর্তের ব্যাঙ-কে যেভাবে খোঁচায় ঠিক সেইভাবেই খুঁচিয়ে মারব ওদের ।" বলেই ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরলেন।

বাবলু বলল, "তার আর প্রয়োজন হবে না। আমরা ওদের উচিত শিক্ষা দিয়েছি। এবার পুলিশে খবর দেব। পুলিশ এসে যা করবার করবে ।"

বাবাজি বললেন, "সবই তো হল। কিন্তু একটি অসহায় মেয়েকে আমি এর ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তার খবর কিছু বলতে পারো ?"

বাবলু বলল, "সেই মেয়েটি এখন আমাদের হেফাজতে আছে। আর ওকে উদ্ধার করা হয়েছে পঞ্চুরই কৃতিত্বে ।"

বাবাজি আর-একবার লাফিয়ে উঠলেন, "জয় বাবা বটুক ভৈরব ।"

সবাই বলে উঠল, "জয় হো ।"

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে একজন ইনস্পেক্টর সেখানে এসে হাজির হলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার ! আপনারা ?"

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন, "তোমার মা ফোন করেছিলেন। কাল রাত্রে গোলাবাড়ি থানার কাছে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেছে। শুনলাম সেই চক্রের দু'জনকে ধরবার জন্য তোমরা নাকি ফাঁদ পেতেছ ? এক বাবাজিও শুনলাম ওদের ক্রোধের বলি হয়েছেন ।"

বাবলু বলল, "এই দেখুন আমাদের ফাঁদে কেমন জোড়া ফড়িং ধরা পড়েছে। বাবাজিকে আমরা যে উদ্ধার করেছি তা তো দেখছেনই ।"

পুলিশ কুয়োর ভেতর থেকে লোক দুটোকে তুলে হাতে হাতকড়া পরাল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "মেয়েটাকে যে তোমরা উদ্ধার করেছ এইটাই তোমাদের বড় কৃতিত্ব ।"

বাবলু বলল, "আমরা নয়। আমাদের পঞ্চুর ।"

পঞ্চু এই কথা শোনামাত্রই মুখ দিয়ে "ভু-ভু-ভুক" করে এমন একটা শব্দ করল যে, তার মানে, এসব আবার কী কথা ? কৃতিত্ব শুধু আমার কেন, আমাদের সকলের।

বাবাজি বাবলুদের সঙ্গে ওদের বাড়ি এলেন। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও এল। তারপর মহানন্দে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করল সকলে। বাবাজি বিদায় নিলেন সে-রাতেই। ওরাও চলে গেল যে যার।

বাবলু ঠিক করল কাল সকালে রাধাকে ওর স্বজনদের হাতে তুলে দিয়ে দুপুরবেলাই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বিকানিরের টিকিট কাটবে। ভাবতে-ভাবতে পরম শান্তিতে দু' চোখ বুজল সে। তারপর গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

॥ ৫ ॥

সেই ঘুম ভাঙল পরদিন অনেক বেলায়। যদিও বাবলু ভোর-ভোর ওঠে তবু আগের রাতের ওই দৌড়ঝাঁপের জন্য শরীরটা ক্লান্ত হয়ে ছিল বলেই দেরি হল। ঘুম থেকে উঠেই রাধার মুখ দেখে ও বুঝল মেয়েটি ঘোর সঙ্কট থেকে মুক্ত হয়ে খুব খুশি এখন।

ওরা যখন চা-টেবিলে বসেছে, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও এসে হাজির হল তখন। এসেই মায়ের কাছ থেকে সকালের খবরের কাগজখানা চেয়ে নিয়ে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "এই দ্যাখ, আমাদের পুরো ঘটনাটা আজকের কাগজে বেরিয়েছে ।"

বাবলু খবরের ওপর চোখ দুটো বুলিয়ে নিল একবার, তারপর সৌজন্যের হাসি হাসল।

মা সকলকেই জলখাবার দিলেন।

খাওয়া হলে বাবলু বলল, "চল সবাই মিলে একটা ট্যাক্সি করে রাধাকে পৌঁছে দিয়ে আসি ওদের ওখানে। তারপর দুপুরবেলা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটব ।"

রাধা উল্লসিত হয়ে বলল, "হামারা মুলুক যাওগে তুম ?"

বাবলু বলল, "আসলে আমরা বিকানির যাচ্ছিলাম মরুভূমি দেখতে। এমন সময় তোমার এই বিপদটা হয়ে গেল। যদি তোমাকে তোমাদের লোকজনের হাতে তুলে দিতে পারি তা হলে ভালই। না হলে আমরা তোমাকে নিয়েই আগ্রায় চলে যাব। তারপর ওখান থেকে যোধপুর হয়ে চলে যাব জয়শলমির ।"

রাধার চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে উঠল, "জয়শল যাও গে তুম ?"

"হ্যাঁ। তুমি গেছ ?"

"গিয়া থা। লেকিন তুমি সব এক কাম করো না ভাইয়া, বিকানির মাত যাও। পহলে মেরা সাথ হামারা মুলুক চলো। উসকে বাদ জয়শল যাও। তাজমহল দেখা তুমনে ?"

"না। আমরা ওদিকে যাইনি কখনও ।"

"তো আচ্ছা হুয়া। তুমি সব আমার সঙ্গে চলো। আগ্রা ফোর্ট দেখো, তাজমহল দেখো, ফতেপুর সিক্রি দেখো। বাদ মে রেগিস্তান যাও ।"

বিচ্ছু বলল, "রেগিস্তান মানে ?"

"যাঁহা বালু জায়দা হোতা। মরুভূমি ।"

বাবলুরা চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল দেখে রাধা বলল, "ম্যায় ভি যাউঙ্গা তুমহারা সাথ ।"

সবাই লাফিয়ে উঠল আনন্দে, "সত্যি ! সত্যি যাবে তুমি ?"

"সচ ।"

"তা যদি হয় তা হলে আমরাও দিল্লি হয়ে বিকানির না গিয়ে আগ্রা হয়েই যোধপুর যাব ।"

চায়ের পেয়ালায় যখন আনন্দের তুফান উঠেছে, ঠিক তখনই বাইরে গেটের কাছে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

বাবলু দরজা খুলেই দেখল দু'জন অবাঙালি ভদ্রলোক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবলুকে দেখে বললেন, "তুমহারা নাম বাবলু আছে ?"

বাবলু বলল, "জি হাঁ। রাধা এখানেই আছে ।"

রাধা তখন ছুটে গিয়ে সেই দু'জনের একজনকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তাঁর বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সে কী কান্না।

প্রস্তুতকারক

শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়

২৮, বনমালী সরকার স্ট্রীট • কলিকাতা-৭০০ ০০৫

ভদ্রলোকও সজল চোখে মেয়েকে আদর করে বললেন, "রোও মত বেটি। তুম আচ্ছা হো তো ? তবিয়ত তো ঠিক হ্যায় ?"

রাধা বলল, "হ্যাঁ।" তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "মেরা পিতাজি।"

বাবলুর মা তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করে ঘরে এনে বসালেন।

রাধা বলল, "বাবুজি, আপ ক্যায়সে হিঁয়া চলা আয়া ?"

এর উত্তরে রাধার বাবা শর্মাজি যা বললেন তা হল এই, কালকের ওই ভয়ানক ঘটনার কথা ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে জানতে পেরেই তিনি বিমানযোগে ছুটে এসেছেন এখানে। এর পর থানায় যোগাযোগ করে মেয়ের নিরাপত্তা এবং মুক্তির খবরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঠিকানা পেয়েই চলে এসেছেন। আজই বিকেলের ফ্লাইটে অথবা কাল সকালের ট্রেনে মেয়ে নিয়ে চলে যাবেন তিনি। ওঁর সঙ্গে আর-একজন যিনি এসেছেন তিনি হলেন হেমার বাবা। অর্থাৎ যাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে এত কাণ্ড। তবে কিনা অত বিপর্যয় সত্ত্বেও শুভবিবাহের কাজটা নিরানন্দভাবে হলেও কোনওরকমে সম্পন্ন হয়েছে।

বাবলুর মা চা দিলেন ভদ্রলোকদের।

ওঁরা যে বাবলুদের কীভাবে ধন্যবাদ দেবেন তা ভেবে পেলেন না।

তবে বাবলুরা কিন্তু ওঁদের কৃতিত্বের চেয়েও রাধার সাহসিকতার প্রশংসাই করতে লাগল বারবার। কেননা রাধা ওইভাবে একজনকে ঘায়েল না করলে বা ওইরকম দুঃসাহসী হয়ে পালিয়ে না এলে ওদের কোনও কিছুই করার থাকত না।

যাই হোক, রাধার বাবা এসে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দায়িত্ব অনেক কমে গেল। এখন যেদিক দিয়েই হোক সুদূরে পাড়ি দিতে আর কোনও বাধাই নেই। রাধার মুখে ওদের মরু-উৎসব দেখতে যাওয়ার কথা শুনে শর্মাজিও তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন বাবলুদের। এমনকী,ওদের সঙ্গে মেয়ে পাঠাতেও কোনও আপত্তি নেই তাঁর। শুধু তাই নয়, তিনি এও বললেন, সম্ভব হলে মরুভূমিতে ওদের থাকার ব্যবস্থাও করে দেবেন তিনি। কেননা এই সময় ওখানে ভিড় হয় প্রচণ্ড। তাই আগেভাগে থাকার জায়গা ঠিক না করে হঠাৎ করে গিয়ে পড়লে থাকার জায়গা না পেয়ে ফিরে আসতেও হতে পারে।

সব শুনে নিশ্চিন্ত হল বাবলুরা। ওরা আগ্রা দিয়ে যোধপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করল।

রাধা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পঞ্চুর গালে চুমু খেয়ে চলে গেল ওর বাবার সঙ্গে।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে রেলের কাউন্টারে গেল রিজার্ভেশনের জন্য লাইন দিতে। মুখোমুখি ছ'টি বার্থ ওদের চাই। এখন তো কম্পিউটারের টিকিট। তাই খুব বেশিক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হল না।

ওরা ফিলাপ-করা ফর্ম কাউন্টারে দিতেই মধ্যবয়সী স্টাফ ভদ্রলোক নাকমুখ কুঁচকে একবার তাকালেন ওদের দিকে। তারপর বললেন, "যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?"

"কেন ? আগ্রাতে।"

"আগ্রা লিখলেই হবে ? আগ্রা ফোর্ট কি ক্যান্ট সেটা লিখতে হবে না ?"

"আগ্রা ফোর্ট।"

"কী আছে সেখানে যে, একেবারে দল বেঁধে ছুটতে হচ্ছে ?"

"বাঃ রে; আমরা ফোর্ট দেখব। তাজমহল দেখব। ফতেপুর সিক্রি যাব।"

"তবে তো আহ্লাদের আর সীমা নেই। যেদিন জল্লাদের খপ্পরে পড়বে সেদিন রেলে চাপা বেরিয়ে যাবে। আমি বলে রেলের চাকরি করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, এখনও বেনারস কেমন তা দেখলুম না, আর আমার হাতের টিকিট নিয়ে তোমরা যাচ্ছ কি না তাজমহল দেখতে ?"

বাবলু বলল, "বেশ তো, আপনিও চলুন না পাস লিখিয়ে আমাদের সঙ্গে ?"

"আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তা মরতে এই নরক যন্ত্রণার গাড়িতে চাপার বুদ্ধিটা কে দিলে ?"

"কেন ? হাওড়া থেকে ওই একটা গাড়িই তো আগ্রায় যায়। তুফান এক্সপ্রেস।"

"সবই তো জেনে বসে আছ দেখছি। তা আমি যদি অন্য কোনও গাড়িতে তোমাদের ব্যবস্থা করে দিই তা হলে আপত্তি আছে ?"

লাইনের ভেতর থেকে গুঞ্জন উঠল এবার, "কী ছেলেমানুষি করছেন দাদা ? তাড়াতাড়ি করুন।"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার কম্পিউটার মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে। পাশের কাউন্টারে যান, প্লিজ।" বলেই একটু থেমে আবার বললেন, "এসব কাজে এলে একটু সময় হাতে নিয়ে আসতে হয়, বুঝেছেন ? আমি বেলাইনের যাত্রীর সঙ্গেও কথা বলছি না, আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও বাজে বকছি না। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা এসেছে। তারা যাতে ভাল গাড়িতে ভালভাবে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাই করছি।"

গুঞ্জন থেমে গেল। সবাই চুপ। দু-একজন বলল, "নিন,নিন, কাজ করুন।"

ভদ্রলোক বাবলুকে বললেন, "দেখলে তো তোমাদের জন্যে পাবলিকের কাছে কত বকুনি খেলুম। তা কবে যাবে না যাবে কিছুই তো লেখোনি দেখছি।"

"আগামী দু-চার দিনের ভেতর যে দিনের হোক দিয়ে দিন।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ একমনে কীসব খিটি-খিটি করে খুব শান্ত গলায় বললেন, "শোনো, হাওড়া থেকে আগ্রা যাওয়ার একটি মাত্র গাড়ি আছে। সেটি হচ্ছে তুফান। কিন্তু এতে অনেক সময় লাগে। বেলা দশটায় হাওড়া ছাড়লে পরদিন দুপুর দুটো-আড়াইটে লেগে যায় আগ্রা পৌঁছতে। অথচ আমি তোমাদের যে গাড়িতে চাপিয়ে দিচ্ছি তাতে চাপলে ওই একই সময়ে হাওড়া ছেড়ে পরদিন সকাল ছ'টা নাগাদ টুণ্ডলায় পৌঁছে যাবে। টুণ্ডলা থেকে বাসে হোক অটোয় হোক চলে যাও আগ্রা।"

"কতক্ষণ সময় লাগবে ?"

"ঠিকভাবে গেলে আধ ঘণ্টা।"

"তা হলে তো খুব কাছেই ?"

"সেইজন্যেই তো। এ-বছর নির্বাচনের জন্য গাড়িতে ভিড় হচ্ছে না। না হলে এসব গাড়িতে দু' মাসের আগে রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, তারিখ দেখে তুফানের টাইমেই স্টেশনে এসো। গাড়িটার নাম মনে রেখো, 'টু থ্রি এইট ওয়ান এ· সি· এক্সপ্রেস'।"

বাবলুরা টিকিট হাতে পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে নাচতে-নাচতে বাড়ি এল। রেলের কাউন্টারে যাঁরা বসেন তাঁরা সবাই তা হলে বেরসিক নন। কিছু ভাল লোকও আছেন।

দেখতে-দেখতে দু-চারটে দিন কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। অবশেষে এসে গেল যাত্রার দিনটি। এমন আনন্দের ভ্রমণ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কখনও হয়নি। যতবার গেছে ততবারই একটা না একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে ওরা। এবার একেবারে কুসুম ছড়ানো পথ। যাওয়ার আগে অবশ্য সামান্য একটু গোলমাল যাও বা দেখা দিয়েছিল তাও কেটে গেছে বিনা ঝঞ্ঝাটে। এখন শুধু রেলের থ্রি-টিয়ারে শুয়ে ভাল-মন্দ খেতে-খেতে ঝড়ের গতিতে ছুটে যাওয়া। প্রথমেই আগ্রা। আগ্রা থেকে যোধপুর। তারপর জয়শলমির হয়ে সাম স্যান্ড ডিউন্স।

ওরা নির্দিষ্ট দিনে বেলা দশটা নাগাদ ট্রেনে চাপল। পঞ্চুকে

কায়দা করেই রেখেছিল, তাই কোনও ঝামেলা হয়নি। ট্রেন ছেড়েই ছুটে চলল ঝড়ের বেগে। কী স্পিড গাড়ির। দুলুনির চোটে এক-এক সময় মনে হতে লাগল, ট্রেনটা বুঝি লাইন থেকেই ছিটকে পড়বে। কিন্তু না, সেরকম কোনও অঘটন ঘটল না। রাত ন'টার সময় বারাণসী পার হলে ওরা যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল। তারপর সকালবেলা ঘুম যখন ভাঙল ট্রেন তখন টুণ্ডলায় ঢুকছে।

হাওড়া-দিল্লি লাইনে টুণ্ডলা একটি জংশন স্টেশন। এইখান থেকেই একটি লাইন সোজা চলে গেছে দিল্লির দিকে। আর-একটি লাইন আগ্রা মথুরা হয়ে দিল্লি গেছে ঘুর-পথে। ওরা কনকনে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে ট্রেন থেকে নেমেই দেখল শর্মাজি হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে। বাবলুর সঙ্গে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে তাঁর যোগাযোগ একদিন আগেই হয়েছে। তাই ওদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় সেজন্য এত সকালে তিনি নিজেই চলে এসেছেন এখানে।

বাবলুরা খুশিতে ডগমগ হয়ে স্টেশনের বাইরে এল। শর্মাজি ওদের জন্য একটা অটোর ব্যবস্থা করে নিজে সঙ্গে-আনা স্কুটারে চাপলেন।

প্রশস্ত রাজপথ ধরে অটো এবং স্কুটার একইসঙ্গে ছুটে চলল।

বেশ কিছুটা পথ আসার পর দূর থেকেই তাজমহলের চূড়া ওদের নজরে পড়ল। তাজমহল প্রথম দেখার আনন্দ যে কী তা যে বা যারা দেখেছে তারাই জানে। এ তবু দূর থেকে দেখা। এখন কতক্ষণে যে সেই অনবদ্য স্থাপত্যের মুখোমুখি হবে সেই আনন্দেই ওরা অধীর হয়ে উঠল।

বাবলু বলল, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। ভাগ্যে রাধার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। না হলে আমরা দিল্লি হয়েই চলে যেতাম। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এমন জিনিস আমাদের দেখা হত না।"

বিলু বলল, "শুধু কি তাজমহল ? আরও একটা জিনিস দেখা হত না আমাদের। ওই দ্যাখ, ও জিনিস কখনও দেখেছিস ?"

সবাই উৎসাহিত হয়ে বলল, "কী রে ?"

"হিন্দি ছবির ভিলেনরা কেমন রাজপথে নেমে পড়েছে।"

সত্যিই তো। ওরা দেখল দুটো মোটর বাইকে ভয়ঙ্কর-দর্শন চারজন লোক চেপে আছে। দু'জন চালকের আসনে বসে আছে। আর দু'জন পেছন দিক থেকে ওদের কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের পরনে কালো প্যান্ট। কালো রঙের মোটা জ্যাকেট। মাথায় টুপি। বীভৎস চেহারা। মেইন রোডের ওপর বেপরোয়ার মতো বাইক নিয়ে নানারকমের কসরত দেখাচ্ছে তারা। এঁকেবেঁকে আলপনা কেটে একবার যাচ্ছে, একবার আসছে। ওদের ভয়ে পথচারীরাও শঙ্কিত। রকমসকম দেখে বোঝা গেল ওরা বেপরোয়া। ওদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই। ওদের উদ্দেশ্যই হল পায়ে পা তুলে একটা গোলমাল পাকানো অথবা অ্যাক্সিডেন্ট করা।

বাবলু বলল, "তাই তো রে। হিন্দি ছবির ভিলেনই বটে। নেহাত এটা আমাদের বিদেশ, তাই। না হলে কত গমে কত আটা বুঝিয়ে দিতাম ব্যাটাদের।"

একটা মোটর বাইক হঠাৎ করল কি, ভটভটিয়ে রাস্তায় একটা পাক খেয়ে যেন সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে এমন ভান করে শর্মাজির দিকে এগিয়ে এল। শর্মাজি আগে থেকেই পাশ কাটিয়েছিলেন, তাই রক্ষে, নাহলে নির্ঘাত একটা কেলেঙ্কারি ঘটতই।

এক সবজিওয়ালি চার চাকার একটি ভ্যানগাড়িতে আলু, বেগুন, মুলো, কপি ইত্যাদি বোঝাই করে হাঁকতে-হাঁকতে আসছিল। একজন করল কি, ইচ্ছে করে বাইকটা নিয়ে এমনভাবে ধাক্কা মারল তাতে যে, সব ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। ভ্যানটাও গেল উলটে। চাকাগুলো ফরর করে শূন্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। সবজিওয়ালি চিৎকার করে কেঁদে উঠল তখন। কিন্তু ভিলেনদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা সবজিওয়ালির উদ্দেশে একটা খারাপ কথা বলে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এল বাবলুদের অটোর দিকে।

বাবলু ক্রোধে ফুঁসছিল।

বিলু বলল, "ওরা যা করে করুক। ওদের এখন ঘাঁটাতে যাস না বাবলু। মনে রাখিস, এটা আমাদের বিদেশ।"

বাবলু বলল, "এক-এক সময় মনে হচ্ছে ওদের বাইকের টায়ারগুলো পাংচার করে দিই গুলি করে। কিন্তু রানিং-এ তো সেটা সম্ভব নয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "কিন্তু ওদের এই ঔদ্ধত্যও কি সহ্য করা উচিত ?"

ভোম্বল বলল, "মোটেই না। তবে সব সময় রিস্ক নিতে যাওয়াও ঠিক নয়।"

ওরা যখন এই সমস্ত কথাবার্তা বলছে ঠিক তখনই আর-একটা বাইক পেছন থেকে এসে জোরে ওভারটেক করার অছিলায় এমন ধাক্কা দিল ওদের অটোতে যে, এক ধাক্কায় উলটে গেল অটোটা। ভোম্বলের বাঁ হাতে খুব জোর লাগল। ও "মরে গেলুম, বাবাগো," বলে একটা চিৎকার করে উঠল। আর সেই মুহূর্তে পঞ্চু করল কি, ব্যাঘ্র বিক্রমে প্রচণ্ড হুঙ্কারে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইকের ওপর। পঞ্চুর ওজনও নেহাত কম নয়। তাই এইরকম অভাবিত আক্রমণের জন্য তৈরি না থাকার ফলে চালক তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি জুতোর দোকানের শোকেসের কাচ ভেঙে ঢুকে গেল ভেতরে।

চারদিক থেকে শুধু "গেল, গেল" রব উঠল।

ওদিকে শর্মাজিও তখন একপাশে স্কুটার রেখে ছুটে এলেন ওদের দিকে। ছুটে এল পথচারী অনেকেও। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে আবার অটোটাকে তুলে দাঁড় করাল রাস্তার ওপর। পঞ্চু তখন ফিরে এসেছে। সবাইকে বসিয়ে নিয়ে অটো আবার গরর-গরর করে স্টার্ট নিতে লাগল। ড্রাইভারেরও লেগেছে খুব। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও একেবারে অক্ষত নেই। তবে ভোম্বলের আঘাতটাই সবচেয়ে বেশি। কী ভাগ্যিস, আরও সাঙ্ঘাতিক কিছু হয়নি।

শর্মাজি বললেন, "ইয়ে লোগ অ্যায়সা হি করতা হ্যায় সবকা সাথ। বহোত খতরনাক। লেকিন তুমহারা কুত্তা যো খেল দিখায়া ও আভি সমঝে গা।"

পথচারীরা বলল, "ডাকাইতি কা রাজ আ গিয়া। মস্তানি কা রাজ। জেনানা কো ইজ্জত নেহি দেতা এ লোগ, বাচ্চো কো ভি রক্ষা নেহি করতা। বেদরদি আহাম্মক।"

ড্রাইভার বলল, "ম্যায়নে তো সাইড দে দিয়া ও লোকন কো। লেকিন তব ভি ও হামারা পিছু পড় গিয়া।"

শর্মাজি বললেন, "ছোড় দো ভাই। আগে তো বড়ো। তুরন্ত ভাগো হিঁয়াসে।"

অটো আবার চলা শুরু করল।

আরও অনেকটা পথ যাওয়ার পর একসময় ওরা আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের পেছন দিকে শর্মাজির বাড়িতে এসে পৌঁছল। কী সুন্দর ছোট্ট দোতলা বাড়ি। নীচে দোকান। ওপরে থাকার ঘর।

রাধা-রেখা দু' বোনেই ছুটে এল ওদের সম্ভাষণ জানাতে।

তারপর সকলে মিলে সামান্য যা মালপত্তর ছিল তা ধরাধরি করে নিয়ে গেল ওপরে।

শর্মাজি প্রথমেই নীচের ওষুধের দোকান থেকে ব্যথা কমানোর ওষুধ এনে খাইয়ে দিলেন ভোম্বলকে। তারপর চলে গেলেন দোকান-বাজার করতে।

বাবলুরা দাঁত মেজে মুখ-হাত ধুয়ে গোল হয়ে বসল সব। পঞ্চু ঘন-ঘন লেজ নেড়ে রাধার পা দুটো শুঁকতে লাগল। ওদের মা শোভা দেবী হলেন এক অপূর্ব শোভাময়ী নারী। যেন দেবী দুর্গা। মেয়ের মুখে তিনি সব শুনেছেন। তাই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ যে

কীভাবে করবেন তা ভেবে পেলেন না। বাচ্চু,বিচ্ছুকে জড়িয়ে ধরে কত আদর করলেন। মিষ্টি-মিষ্টি কথা বললেন। এবং বেশ কিছুদিন এখানে থেকে যাওয়ার অনুরোধও জানালেন।

তবে বাবলুরা কিন্তু রাধা ও রেখাকে দেখে দারুণ বিভ্রান্তিতে পড়ল। ওরা রাধাকেই দেখেছে, রেখাকে নয়। অথচ এখন ওদের যমজ বোনের কে যে রাধা কে যে রেখা তা কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। তার ওপর মেয়ে দুটো আবার একই রঙের পোশাক পরেছে। ফলে বিভ্রান্তি চরমে। অমন যে পঞ্চু সেও বুঝি ঠিক করতে পারছে না কিছু। তাই কাকের মতো ঘাড় কাত করে এক চোখে পিটপিটিয়ে দেখছে।

শর্মাজি ফিরে এলে সকলে চায়ের টেবিলে বসল। চা খেতে-খেতে শর্মাজি বললেন, "তুমহারে লিয়ে এক বুরা খবর হ্যায়।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবিস্ময়ে তাকাল শর্মাজির দিকে। বাবলু বলল, "আপনি জয়শলমিরে আমাদের থাকার কোনও ব্যবস্থা করতে পারেননি। এই তো?"

শর্মাজি বললেন, "না। ও বাত নেহি।"

"তা হলে নিশ্চয়ই রাধা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না?"

"ও ভি নেহি।"

"তা হলে?"

"এ সাল মে বিধানসভা কে চুনাও কে লিয়ে মরু-উৎসব থোড়ি দিন পহলেই হো চুকা।"

"সে কী! ঠিক জানেন আপনি?"

রাধা আর রেখা তখন দু'জনেই বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। বলল, ওদেরই এক বান্ধবীর বাবা তাজমহলের পাশে রাজস্থান ট্যুরিজম-এর অফিসে কাজ করেন। ওর বাবা যখন জয়শলমিরে থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর মুখেই শুনে এসেছেন ব্যাপারটা। কাজেই পারফেক্ট নিউজ।

বাবলু বলল, "এরকম হওয়ার মানে? আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম!"

রাধা বলল, "বিজ্ঞাপনটা মেলা চলাকালীন সময়েই বেরিয়েছিল। আসলে এই মরু-উৎসবটা তো এদের কোনও জাতীয় উৎসব নয়। ইদানীং সারা পৃথিবীর লোক প্রমোদ ভ্রমণে এখানে এসে থাকেন, তাই ফরেনারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে সরকারি তত্ত্বাবধানে। ক্যামেল সাফারিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব বিশেষ অসুবিধা দেখা দিলে এই মেলার দিন পরিবর্তনে এখানে বাধা নেই। তবে মার্চে যে হোলি উৎসব হয়, সেটার দিনক্ষণ কখনও পালটাবে না।"

শর্মাজি বললেন, "তুম সব দো-চার দিন হিঁয়া ঠারো। উসকে বাদ জয়পুর চলা যাও।"

বাবলু বলল, "জয়পুর না হয় গেলাম। কিন্তু জয়শল আমরা যাবই। আমাদের উদ্দেশ্যই হল মরুভূমি দেখা।"

"জয়পুরসে যোধপুরকা বাস মিলেগা।"

বাবলু বলল, "তা হলে জয়পুর থেকে যোধপুর বাসে গিয়ে ট্রেনেই চলে যাব জয়শলমির। মরুমেলা না হোক, মরুভূমি তো দেখতে পাব।"

রাধা বলল, "ও বাদ মে হোগা। এখন চলো ফোর্ট দেখিয়ে আনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেরি না করে সবাই মহোৎসাহে চলল আগ্রার ফোর্ট দেখতে। পঞ্চুও বাদ গেল না। ওরা জনবহুল রাস্তা পার হয়ে মিটারগেজ লাইনের কালভার্টের নীচ দিয়ে এক সময় ফোর্টের সামনে এসে পৌঁছল। এই পথেই তাজমহল। দূর থেকে তাজমহল দেখাই যাচ্ছে। দিনের চড়া রোদে চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে। ওরা দু' টাকা করে টিকিট কেটে ফোর্টে ঢুকল। শুক্রবারে জুম্মাবার। সেদিন হলে টিকিট লাগত না। তা
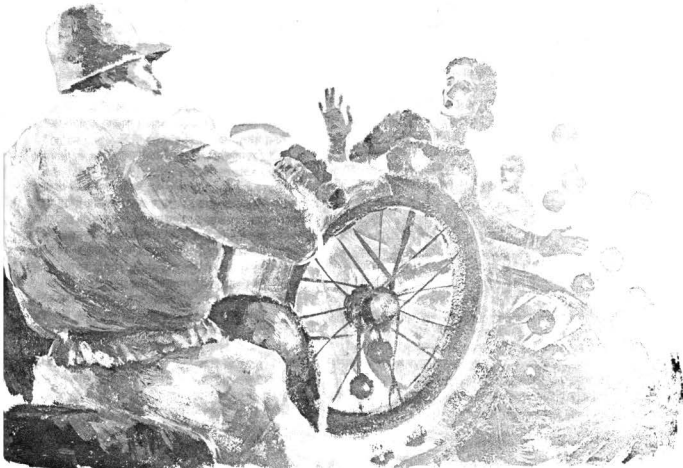
যাই হোক, পঞ্চুর টিকিট কাটল না ওরা। অবশ্য পঞ্চুর দিকে বিশেষ নজরও দিল না কেউ। ভাবল রাস্তার কুকুর হয়তো।

ফোর্টে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরেফিরে দেখল সব। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের হাতে তৈরি এই দুর্গের আকর্ষণ বড় কম নয়। দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, জেসমিন প্রাসাদ। দুর্গের ছাদের ওপর থেকে যমুনা কিনারে তাজমহলের অপরূপ দৃশ্য সব দেখল। তারপর পরিপূর্ণ মন নিয়ে ঘরে ফিরে এসে স্নান-খাওয়া করল। ঠিক হল বিকেলবেলা তাজমহল দেখতে যাবে। মাঘী পূর্ণিমা আগত। এখন তাই জ্যোৎস্নাস্নাত তাজমহলে অনেক রাত পর্যন্ত লোকজন থাকবে। পূর্ণিমার ভরন্ত চাঁদ থেকে জ্যোছনা গলবে চুঁয়ে-চুঁয়ে। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। ওরা দেখবে। তারপর কাল সকালে যাবে ফতেপুর সিক্রি। যাওয়ার পথে দয়ালবাগটাও দেখে নেবে। কত পরিকল্পনা। তারও পরের দিন সন্ধেবেলা আগ্রা ফোর্ট থেকে জয়পুর যাবে সুপার এক্সপ্রেসে। সন্ধে পাঁচটায় ছেড়ে রাত দশটায় নামবে। জয়পুর দু'দিন দেখে চলে যাবে যোধপুর। সেখান থেকে থর। একেবারে সাম সন্দ স্যান্ড ডিউন্‌স। ওঃ, কী মজা।

যাই হোক, ওরা দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে বিকেল হতেই সদলবলে চলল তাজমহল দেখতে। চৌরাস্তা থেকে অটোয় তাজমহল ভাড়া নিল মাথাপিছু এক টাকা করে। দু' মিনিটের মধ্যেই তাজমহলে পৌঁছে গেল ওরা।

পৃথিবীর বিস্ময় এই অনবদ্য স্থাপত্যের সামনে দাঁড়িয়েই হতবাক হয়ে গেল ওরা। এখানেও টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। কিন্তু ঢোকার মুখেই বিপত্তি। প্রতিটি লোককে সার্চ না করিয়ে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে না। মেটাল ডিটেক্টর না কী যেন দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বাবলুর ভয় হল ওর পিস্তলটা না কেড়ে নেয় ওরা। কিন্তু যাই হোক. ভগবান সহায়, গার্ডরা ওদের দিকে খুব বেশি একটা নজর দিল না। ওরা তালেগোলে ঠিকই ঢুকে গেল ভেতরে। আর পঞ্চু তাড়াতাড়ি খেয়েও ওর ব্যবস্থাটা করে নিল এক অপূর্ব কৌশলে।

ওরা দূর থেকে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগল তাজমহলকে।

পঞ্চুও বেশ কিছুটা তফাতে থেকে ওদের দিকে নজর রেখে এগোতে লাগল এক-পা এক-পা করে।

একজন গাইড লাঠি নিয়ে তেড়ে এল পঞ্চুকে।

পঞ্চু জানে এই অবস্থায় কাউকে আক্রমণ করতে নেই। তাই সে বিনা প্রতিবাদে দৌড়ে পালাল সেখান থেকে। তবে দূরে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েও লক্ষ রাখতে লাগল বাবলুদের দিকে।

বাবলুরা সিঁড়ি ভেঙে তাজমহলের ওপরের চাতালে উঠে এল। তারপর ভেতরে ঢুকে মমতাজ ও শাজাহানের বেদিতে রেখে এল একটি করে লাল গোলাপ। ফুল ওখানেই কিনতে পাওয়া যায়।

রাধা বলল, "আমরা আগ্রার মেয়ে। এইখানেই আমাদের জন্ম। এই তাজমহল যে আমরা কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই। তবু পুরনো হয় না। এমনই এর আকর্ষণ।"

রেখা বলল, "তাজমহল কি অমর কহানি তুমনে জরুর শুনা হোগা ?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই। তা ছাড়া হিস্ট্রি আমার প্রিয় সাবজেক্ট।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, তাজমহল কত সালে তৈরি হয়েছিল তোমার মনে আছে ?"

"১৬৩২ থেকে ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।"

ভোম্বল বলল, "কত কোটি টাকা খরচ হয়েছিল বলো তো ?"

বাবলু বলল, "আজকের টাকার অঙ্কে হিসাব তো হবে না। তখনকার দিনে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল।"

বাচ্চু,বিচ্ছু সবিস্ময়ে বলল, "তুমি কী করে জানলে বাবলুদা ?"

বাবলু বলল, "আমার দাদামশাইয়ের স্টকে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই আছে। তিনি মারা গেলেও মামারা তাঁর বইগুলি যত্ন করে রেখেছেন। ওঁর আলমারিতে ১৩২৯ সালের 'প্রভাতী' নামে একটি পত্রিকার সব ক'টি সংখ্যা বাঁধানো আছে। তাইতে ভাদ্র সংখ্যায় যদুনাথ সরকারের 'ভারতের ঐশ্বর্য' নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। সেই প্রবন্ধটা পড়লেই জানা যাবে শাজাহানের আমলে শুধু তাজমহল্‌ কেন, কোনও প্রাসাদ-সৌধ নির্মাণে কত টাকা খরচ হয়েছিল। আমি একটা কাগজে সেটা নোট করে রেখেছি। পারিস তো তোরাও যে যার নোটবুকে এগুলো টুকে রাখ।" বলে পকেট থেকে ভাঁজকরা একটা কাগজ বের করল বাবলু।

সকলে ঝুঁকে পড়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই কাগজের লেখার দিকে। তাতে লেখা আছে :

আগ্রার সৌধমালা-দুর্গাভ্যন্তরস্থ মোতি মসজিদ, প্রাসাদ ও প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান, ৬০ লক্ষ টাকা। তাজমহল, ৫০ লক্ষ টাকা। দিল্লির প্রাসাদসমূহ, ৫০ লক্ষ টাকা। জুম্মা মসজিদ, ১০ লক্ষ টাকা। দিল্লি নগরীর চারিদিকের প্রাচীর, ৪ লক্ষ টাকা। দিল্লির শহরতলির ইদগাহ, ৫০ হাজার টাকা। লাহোরের প্রাসাদ উদ্যান ও খাল, ৫০ লক্ষ টাকা। কাবুলের মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ ও নগর প্রাচীর, ১২ লক্ষ টাকা। কাশ্মিরের প্রাসাদ ও উদ্যান, ৮ লক্ষ টাকা। কান্দাহারের কান্দাহার বিস্ত ও জমিন্দাবারের দুর্গ, ৮ লক্ষ টাকা। আজমির ও আহমদাবাদে, ১২ লক্ষ টাকা। মুখলিশপুরের রাজপ্রাসাদ, ৬ লক্ষ টাকা। দারাশুকোর প্রাসাদ, ২ লক্ষ টাকা। মোট, দুই শত সাড়ে বাহাত্তর লক্ষ টাকা।

শাজাহানের খরচের খতিয়ান দেখে চোখ কপালে উঠে গেল সকলের। একেই বলে রাজকীয় ব্যাপার।

যাই হোক, ওরা যখন তাজমহলের ওপর থেকে যমুনার দৃশ্য দেখছে, সেই সময় দেখতে পেল পঞ্চুও কখন টুক করে উঠে এসেছে ওপরে। ওরা আদর করে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। যমুনায় জল নেই বললেই চলে। কুকুর হেঁটে পার হচ্ছে। কয়েকটি ট্রাক দাঁড় করানো আছে। যমুনার জলে সেগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করছে ক্লিনাররা। যমুনার জলে তাজমহলের প্রতিবিম্ব দেখার সৌভাগ্য তাই হল না। তবু মানুষ আসছে, দেখছে, আসবেও। কেননা তাজমহল তো পুরনো হবে না। একদল ছেলেমেয়ে তাজমহলের গা বেয়ে যমুনার বালুচরেও নেমে পড়েছে। সূর্য তখন অস্তাচলে।

বাচ্চু,বিচ্ছু বলল, "ওখানে যাবে বাবলুদা ?"

বাবলু বলল, "এই তো বেশ আছি। কী হবে ওখানে গিয়ে ?"

রেখা বলল, "চলিয়ে না ?"

ওরা আর দ্বিরুক্তি না করে নীচে নামল।

পঞ্চুও এল ওদের সঙ্গে।

তাজের ওপরে কত কোলাহল। অথচ এখানটা কত শান্ত। মাঠের প্রান্তে নীল আকাশের গায়ে আসন্ন সন্ধ্যার ফিকে চাঁদের গায়ে কেমন রং ধরেছে। এখানে রাধা ও রেখার পরিচিত কয়েকটি মেয়ের সঙ্গেও দেখা হল। একঝাঁক মেয়ে। তাজমহলে ঘুরতে এসেছে। এইরকম স্থানীয় ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতীর দল প্রায়ই আসে এখানে। বেড়ায়। গান গায়। মেয়েরা নাচে। চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখে সময় কাটায়।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে শোনা গেল কতগুলো ভটভট শব্দ। পরক্ষণেই দেখা গেল এক-আধটা নয়, প্রায় চার-পাঁচটা মোটর বাইক সেই বালির ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। ওরা এমনভাবে আসছে যেন ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করে অথবা পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে সব। মোটর বাইকগুলো একসময় হুড়মুড়িয়ে জলের ওপর এসে পড়ল। জল কেটে জলের ফোয়ারা তুলে ওপার থেকে এপারে এল।

রাধা ও রেখার মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে।

অন্য ছেলেমেয়েরা যারা যেখানে ছিল ছুটে পালাল।

রেখা বলল, "চলো, ভাগো। ইধার ঠারনা ঠিক নেহি।"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "সকালের সেই গ্রুপটা নয় তো ?"

বিলু বলল, "হতে পারে। ওদের দু'জন এখন হাসপাতালে থাকলেও বাকি দু'জনকে চেনা মনে হচ্ছে।"

ভোম্বল বলল, "লোকগুলোর চেহারা দেখেছিস ? কী ভয়ঙ্কর।"

রেখা আস্তে করে বলল, "ইয়ে তো হার্মাদ।"

রাধা বলল, "চলে এসো। এরা খুব খারাপ লোক।"

কিন্তু যাবে কোথায় ? ওরা ততক্ষণে সেই বদ লোকগুলোর নজরে পড়ে গেছে। রেখা যাকে হার্মাদ বলল, সে তখন একদৃষ্টে দেখছে বাবলুকে।

বাবলু বলল, "হার্মাদ কে ?"

"আগ্রার আতঙ্ক। কুখ্যাত মরুদস্যু কান্দাহার থেরানির শাগরেদ। ওদের কাজই হল ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, অপহরণ। আজ সকালে তোমরা ওদের খপ্পরেই পড়েছিলে। লোহামাণ্ডিতে ওদের শক্ত ঘাঁটি।"

"কিন্তু ওরা এখানে কেন ?"

"ওরা প্রায়ই এখানে আসে। যমুনার জলে বাইকগুলোকে ধোয়, পরিষ্কার করে। রাত পর্যন্ত থাকে। সুযোগ-সুবিধা পেলে ট্যুরিস্টদেরও বেকায়দায় ফেলে। কখনও ছিনতাই করে, কখনও কিড্‌ন্যাপ করে।"

"সে কী !"

"এই যে দেখছ ট্রাকগুলো, এগুলোর ভেতর কী যে আছে, আর কী যে নেই তা কেউ জানে না। এগুলোও ওদের।"

তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। আর এখানে একটুও থাকা উচিত নয় ভেবে ওরা যাওয়ার উপক্রম করল। কিন্তু যাবে কি করে ? হার্মাদের লোকেরা তখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে ওদের।

হার্মাদের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে। পচর-পচর করে পান চিবোতে-চিবোতে বলল, "কিঁউ হিরো সাব। হিঁয়া তক চলা আয়া তুম ? হাম তো স্বপ্ন মে ভি নেহি শোচা, ফিন মুলাকাত হো যায়েগা তুমহারা সাথ।"

বাবলু গম্ভীর গলায় বলল, "রাস্তা ছোড়ো হার্মাদজি।"

"আরে ! হামারা নাম তুমকো কিনোনে বতায়া ?"

"আগ্রার মাটিতে পা দিয়েই তোমার নাম আমি শুনেছি গুরু। সকালে খুব জোর অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলে। নেহাত ভাগ্যটা ভাল ছিল তাই বেঁচে গেছি।"

"লেকিন আর নেহি বাঁচোগি।"

বাবলু গলায় জোর এনে বলল, "রাস্তা ছাড়ো বলছি।"

আগুন যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। হার্মাদ চোখ পাকিয়ে বলল, "হামকো আঁখ দিখাতা ?" বলেই বাইকের সামনের চাকাটা ওর পেটে ঠেকিয়ে তাজের দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরল ওকে।

বাবলুর আর নড়বার শক্তি রইল না। সে চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠল, "পঞ্চু !"

সবার অলক্ষ্যে পঞ্চু তখন এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছিল। এইবার বাঘের মতো হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল হার্মাদের ঘাড়ে।

প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি ও হুটোপাটিতে চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। তাজমহলের ওপর থেকে হুমড়ি খেয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল কত লোক। কিন্তু আশ্চর্য ! তারা কেউ ছুটে এল না এই বিপদে ওদের সাহায্য করতে।

রাধা আর রেখা জনতার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আপ লোগ ইতনা আদমি কিউ তামাশা দেখ রহে ? আ যাও ইধার। মারো বদমাশকো।"

কিন্তু কে আসবে ? সবাই তো ভয়ে কাঁটা।

অবশ্য আসতেও হল না কাউকে। পঞ্চু একাই একশো। পালা করে এক-একজন আরোহীর ঘাড়ে-পিঠে লাফিয়ে পড়েই ঘ্যাঁক-ঘোঁক করে এমন কামড়াতে লাগল যে, পালাতে পথ পেল না বাছাধনরা। পালাবার মুখে একজন পঞ্চুর দিকে রিভলভার তাক করতেই বাবলুর পিস্তলও গর্জে উঠল।

গুলিটা বোধ হয় পায়ে লাগল লোকটির। তাই বাইক সমেত যমুনার জলে অকারণেই ঘুরপাক খেল দু-একবার। খেয়ে বহু কষ্টে পালাল।

পঞ্চুর বিক্রম তখন দেখে কে ? সেও জল পার হয়ে ভৌ-ভৌ-ভৌ-উ-উ ডাক ছেড়ে তেড়ে গেল বেশ কিছুদূর পর্যন্ত।

তারপর যখন যুদ্ধজয়ের গৌরব নিয়ে পঞ্চু ফিরে এল ওদের কাছে, তখন বাবলুদের সে কী আনন্দ। কিন্তু সেই আনন্দ ম্লান হয়ে গেল যখন দেখল হার্মাদের মালবোঝাই একটি ট্রাক ওদের চাপা দেওয়ার জন্য দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। ওরা যে যেদিকে পারল পালাল। এমন যে পঞ্চু তাকেও পিছু হটতে হল এবার।

হঠাৎ রাধার চিৎকারে ঘুরে তাকিয়েই ওরা দেখল আর-একটি ট্রাক থেকে একজন দুষ্কৃতী প্রায় জোর করেই তুলে নিল রাধাকে। তারপর ঝড়ের বেগে হারিয়ে গেল বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে। অন্য ট্রাকগুলো তখন তাকেই অনুসরণ করল। সবাই নির্বাক। শুধু পঞ্চুর চিৎকারে কেঁপে উঠল যমুনার নিভৃত কিনার। কী থেকে কী হয়ে গেল। কেন যে নীচে নেমেছিল ওরা ! তাজমহল দেখতে এসে ওরা যে এমন বিপদে পড়বে তা কেই বা জানত ? কিন্তু এ কী ! বাবলু কই ? এই তো ছিল সে ওদের পাশেই। আর তো তাকে দেখা যাচ্ছে না।

॥ ৬ ॥

না, বাবলু নেই। রাধা দুষ্কৃতীদের কবলে। আর রেখা ? সে তখন সংজ্ঞাহীন। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তবুও সেই অবস্থায় রেখাকে ধরাধরি করে তাজমহলে নিয়ে এল। তারপর একটা টাঙ্গায় চেপে ওদের বাড়িতে।

শর্মাজি সব শুনে বুক চাপড়াতে লাগলেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন ওদের মা শোভা দেবী।

শর্মাজি বললেন, "রাহু কি অন্তিম দশা মেরা রাধাকো ছিন লিয়া। ও জিন্দা নেহি রহেগা। ও লোক মার ডালেগা রাধা কো। নেহি তো দুসরি দেশ মে ভেজ দেগা। ইয়ে হার্মাদ বহোত ডেঞ্জারাস। কান্দাহার থেরানি ভি।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মাথা হেঁট। এই অবস্থায় ওরা যে কী করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। কথায় আছে, 'যদি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে।' কোথায় ওরা যাচ্ছিল মরু-উৎসব দেখতে, তার জায়গায় ঘটনা ওদের টেনে আনল তাজমহলে। তার মূলে একটি মেয়ে। আবার এখনও মরুযাত্রার পথে সেই মেয়ে নিয়েই যত গণ্ডগোল। সেইসঙ্গে বাবলুর অন্তর্ধান। কী যে হল, কোথায় যে গেল বাবলু, তা কে জানে ? বাবলু কি রাধাকে অনুসরণ করল ? এখন এই কান্নাকাটির বাড়িতে ওরা কী করবে ? কোথায় সারাদিন ঘোরাঘুরির পর খেয়েদেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে একটু শোবে তার জায়গায়, কিন্তু এ কী !

শর্মাজি বললেন, "শুনো, তুমহারা জিন্দগি ভি খতরে মে হ্যায়। হার্মাদ কিসিকো নেহি ছোড়েঙ্গে। আজ রাত হিঁয়া ঠারো। কাল শুভা হোনেসে পহলে চলা যাও। নেহি তো সবকো বরবাদ কর দেগা ও লোগ।"

বিলু বলল, "শর্মাজি, আপনি পুলিশে একটা খবর দিন তো।"

"কুছ নেহি হোগা। হার্মাদ কো পোলিশ ভি ডরতা। ও রাজস্থান শের কান্দাহার কা আদমি।"

ভোম্বল বলল, "হলেই বা। আপনার মেয়ে যে শুধু গেছে তা তো নয়, আমাদেরও একটি ছেলে গেছে। কাজেই পুলিশকে

ব্যাপারটা জানাতে হবে না ? পুলিশের কাজ পুলিশ করুক না করুক, আমাদের কাজ আমরা করি।"

রেখা এতক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে। বলল, "হ্যাঁ বাবুজি, পুলিশওয়ালেকো খবরদেনা হি চাহিয়ে। এ সবকা সাথ আপ থানামে যাইয়ে।"

শর্মাজি কী আর করেন, বিলু ও ভোম্বলকে সঙ্গে নিয়েই চলে গেলেন থানাতে।

এর পর প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শর্মাজি থানা থেকে যখন আশাহত হয়ে ফিরে এলেন, বাড়িতে তখন আর-এক দৃশ্য। দরজায় শিকল দেওয়া। ঘরেও কেউ কোথাও নেই। চারদিক লণ্ডভণ্ড। হঠাৎ নজরে পড়ল রান্নাঘরের দরজার কাছে মাথায় আঘাত নিয়ে সংজ্ঞাহীন পড়ে আছেন শোভা দেবী। বাচ্চু নেই, রেখা নেই, পঞ্চু নেই। কেউ নেই।

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

শর্মাজি ছুটে গিয়ে স্ত্রীকে ধরলেন। তারপর ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে ফোন করলেন ডাক্তারবাবুকে। ডাক্তারবাবু নীচের ওষুধের দোকানেই বসেন। খবর পেয়েই ওপরে এলেন।

এদিকে সকলের উপস্থিতি টের পেয়েই বুঝি বাথরুমের ভেতর থেকে চিৎকার করতে লাগল পঞ্চু,"ভৌ-ভৌ-ভৌ-উ-উ-উ।"

বিলু আর ভোম্বল ছুটে গেল সেদিকে। গিয়েই দেখল একজন গুণ্ডার মতো দেখতে লোক বাথটবের ভেতরে ঢুকে বসে আছে। আর পঞ্চু রুদ্রমূর্তিতে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বিলু লোকটাকে বলল, "কৌন হো তুম ?"

লোকটি কথা বলতে গিয়ে হাবাদের মতো 'উঁ উঁ আঁ আঁ' করে কীরকম যেন একটা আওয়াজ বের করল গলা দিয়ে।

ভোম্বল বলল, "তুম হিঁয়া পর ক্যায়সে আ গিয়া ?"

শর্মাজিও তখন ছুটে এসেছেন সেখানে, "এ ক্যা ! এ আদমি হিঁয়া কিউ ঘুসা ?"

বিলু বলল, "আপনি চেনেন একে ?"

"নেহি। লেকিন এ লোগ জরুর হার্মাদকা আদমি হোগা।"

বিলু বলল, "এখনও বল তুই কে ? আভি বতাও ?"

লোকটি আবার ওইরকম আওয়াজ বের করল গলা দিয়ে। যেই না করা পঞ্চু অমনই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। লোকটি আর্তনাদ করে উঠল, "আ-আ-আ।" তারপর বলল, "হামকো ছোড় দো ভাই। সব কুছ বতায়গা হাম।"

"বতাইয়ে।"

"হাম চোরি করনে হিঁয়া আয়া থা। লেকিন ওহি বখত কুছ আদমি আকে লুট মার লাগা দিয়া। উসি কা ডরসে ইধার ঘুস গিয়া হম।"

বাবলু শর্মাজিকে বলল, "এই চোর প্রথমে হাবা সাজল। পরে পঞ্চুর কামড়ানি খেয়ে বোলও ফুটল তার। এখন যা বলছে তা সত্যি কি মিথ্যে জানতে হলে ওর অন্য ট্রিটমেন্টের দরকার। আপনার কাছে খানিকটা ইলেকট্রিকের তার হবে ?"

"ক্যা করো গে ?"

"ওকে একটু কারেন্ট খাইয়ে দেখব মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বেরোয় কি না ?"

শর্মাজি সঙ্গে-সঙ্গে ফুটদশেক প্লাগ লাগানো তার এনে বিলুর হাতে দিলেন।

বিলু প্লাগ-পিনটা সুইচ-বোর্ডে লাগিয়ে তারের অন্য প্রান্ত বাথ টবে রাখল। তারপর কলের প্যাঁচ ঘুরিয়ে বাথটব জল ভর্তি করেই সুইচে হাত রেখে বলল, "কী, এবার বলবে, না অন করব ?"

বাথটবের জলে আধ-ডোবা লোকটি শুধু পঞ্চুর ভয়েই লাফাতে পারছে না। তবু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "নেহি।"

"তা হলে বলো, তুম হার্মাদ কা আদমি ?"

"হাম কুছ বতানে নেহি সকেঙ্গে।"

বিলু বলল, "ভোম্বল, আমাকে একটা কাঠের চেয়ার এনে দে তো। পঞ্চুকে নিয়ে বাথরুমের বাইরে যা তুই। একটু টাইট না দিলে আর চলছে না দেখছি।"

ভোম্বল সঙ্গে-সঙ্গে একটা চেয়ার এনে বলল, "আমরা বাইরে যাব কেন ?"

"গোটা ঘর জলে জল। এই অবস্থায় ওকে জব্দ করতে গিয়ে হয়তো আমরাই কারেন্ট খেয়ে মরব।"

পঞ্চুকে নিয়ে ভোম্বল বাথরুমের দরজার কাছে যেতেই লোকটি পালাবার জন্য তৎপর হল। কিন্তু যেই না তৎপর হওয়া বিলু অমনই সুইচটা অন করেই অফ করে দিল। কিন্তু ওই সামান্য একটু সময়ের মধ্যেই অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে বেচারির।

ততক্ষণে আরও অনেক লোক ছুটে এসেছে ওপরে। কিছুক্ষণ আগে যে এই বাড়িতে একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেছে তা কেউ জানতেও পারেনি টিভি-তে অনুষ্ঠান দেখার ফলে। এবং রাজপথের কোলাহলে।

বিলু এবার কঠিন গলায় লোকটিকে বলল, "তুম হার্মাদ কা আদমি হো ?"

লোকটি ভয়ে-ভয়ে বলল, "জি হাঁ।"

"তাজমহল কি পিছে সে যো ট্রাক এক লেড়কি কো উঠাকে লে গয়া ও কিধার গয়া ?"

"জয়পুর।"

"ঠিকসে বতাও।"

"অম্বর ফোর্ট কি বগলমে এক পুরানা কিল্লা হ্যায়। হুঁয়া রাখেগা উসকো।"

"আর ইস ঘরকা লেড়কিয়াঁ ?"

"উসকো ভি উধার লে যায় গা। লেকিন ও নেহি যা সকে। ও ইধরিমে হ্যায়।"

"কাঁহা পর ?"

"ছাদ কা উপর।"

ভোম্বল সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্চুকে নিয়ে ছাদে উঠতে গেল। সঙ্গে গেল আরও লোক। কিন্তু ছাদের সিঁড়ির দরজা ওদিক থেকে বন্ধ। তবু ওরা দমাদ্দম করে কিল চড় লাথি ঘুসি দিতে লাগল। এমন সময় বাইরে একটা গুলির শব্দ। সবাই ছুটে নীচে নেমেই দেখল বাথরুমে পঞ্চুর ভয়ে লুকিয়ে থাকা সেই লোকটি সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়েই বিপত্তি ঘটিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ গুলি খেয়ে পড়ে আছে ফুটপাথে। কখন কোন ফাঁকে যে নিয়তি তাকে টেনে নামিয়েছিল তা কে জানে ? ওদের দলের লোকেরাই হয়তো মেরেছে ওকে। দুঃখ করবার কিছু নেই। এইসব লোকের অন্তিম পরিণতি এইরকমই হয়। কিন্তু ছাদে ওঠবার কী হবে ? সবাই দেখল একটি নাইলনের চওড়া ফিতে দোতলার ওপর থেকে রাস্তার দিকে ঝুলছে। অর্থাৎ, গোলমাল বুঝেই দুষ্কৃতীরা পালিয়েছে এইখান দিয়ে। একজন সাহসী লোক তাই ধরেই উঠে পড়ল ওপরে। তারপর ছাদের দরজা খুলে দিতেই সবাই গিয়ে উদ্ধার করল বাচ্চু বিচ্ছু ও রেখাকে। ওরা তিনজনেই হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল ছাদের ওপর। ওদের মুখে সবাই যা শুনল তা হল এই :

শর্মাজির সঙ্গে বিলু আর ভোম্বল চলে যাওয়ার অনেক পরে দরজায় টক-টক শব্দ। রেখা ভাবল, ওর বাবাই বুঝি ফিরে এসেছেন। তাই নির্ভয়ে দরজাটা খুলে দিতেই হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল জনাচারেক লোক। এই অবস্থার মোকাবিলা কী করে করতে হয় পঞ্চু তা জানে। সেও ব্যাঘ্রবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক-একজনের ওপর। পঞ্চুর এই আক্রমণটা বোধ হয় অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই দিশেহারা হয়ে পড়ল সব। এই ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে তখন সে কী ছুটোছুটি। কে যে কোন দিকে

পালাবে তা কেউ ঠিক করতে পারল না। একজন লোক তো পঞ্চুর ভয়ে বাথরুমেই ঢুকে পড়ল। আর দু'জন প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাচ্চু,বিচ্চু আর রেখাকে টানতে-টানতে ছাদেই উঠে গেল। আর-একজন শর্মাজির স্ত্রীকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে দৌড়ল নীচের দিকে। যাওয়ার আগে পঞ্চুর ভয়ে শিকলটাও তুলে দিয়ে গেল। পঞ্চু তখন একবার ছাদের সিঁড়ি আর-একবার বাথরুম এই করতে লাগল। যারা ওদের ছাদে উঠিয়েছিল তারা পঞ্চুর আক্রমণ বাঁচিয়ে এদের অপহরণ করা অসম্ভব বুঝে ওদের হাত-পা-মুখ বেঁধে ছাদের কার্নিসে নাইলনের ফিতে বেঁধে সুড়সুড় করে বানরের মতো নেমে গেল নীচে। তারপরই অবশ্য শর্মাজি ও বিলু ভোম্বলের ফিরে আসাটা অনুমান করা গেল। তারও পরের ঘটনা সবারই জানা।

ভয়ঙ্কর একটি বিপদের হাত থেকে তিন-তিনটি মেয়ে যে রক্ষা পেয়ে গেল এটি কম আনন্দের ব্যাপার নয়। কিন্তু এ বাড়িতে এ নিয়ে আনন্দের প্রকাশ ঘটল না কারও মুখে। কেননা এখনও এই বাড়ির একটি মেয়ে দুষ্ট চক্রের কবলে এবং একটি ছেলে নিখোঁজ। বাবলু যে কখন কীভাবে হারিয়ে গেল টেরও পেল না কেউ। পাশে থাকতে-থাকতেই হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল সে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু ঠিক করল ওই লোকটির কথার সত্যাসত্য এবার যাচাই করবার সময় হয়েছে। কেননা সে একটি কথা সত্যি বলেছে যে, মেয়েগুলোকে নিয়ে পালাতে পারেনি ওরা। ছাদের ওপর আছে। অতএব রাধাকে যদি ওরা জয়পুরেই নিয়ে গিয়ে থাকে সেটাও তা হলে মিথ্যে হবে না। আর এই যদি অবস্থা হয় তা হলে অযথা এই বিপজ্জনক পরিবেশে চুপচাপ বসে থেকেই বা লাভ কী? ওরা যদি বাবলুকেও নিয়ে গিয়ে থাকে তা হলেও তো একই জায়গায় রাখবে। তারপর মারধোর কেনাবেচা যা হওয়ার হবে। অতএব আর দেরি না করে এগিয়ে পড়াই ভাল। আগ্রা পুলিশ সহায়ক না হলেও জয়পুর রাজস্থানের রাজধানী। সেখানে নিশ্চয়ই পুলিশের সাহায্য পাবে ওরা। বাবলুর জন্য ভয় হলেও ওর উপস্থিত বুদ্ধির ওপর ভরসা আছে সকলের। নেহাত দুর্দৈব না হলে সে ঠিক বাঁচিয়ে নেবে নিজেকে। কিন্তু রাধা একটি মেয়ে। তাকে তো রক্ষা করতেই হবে।

অতএব আর একটুও দেরি না করে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু সবাই তৈরি হল যাওয়ার জন্য।

রেখা সবিস্ময়ে বলল, "কাঁহা যাওগে তুম?"

বিলু বলল, "রাধা আর বাবলুর খোঁজে, জয়পুর।"

"না, না। মাত যাও ভাইয়া। রাত বারো বাজ গিয়া হোগা। আভি কুছ নেহি মিলেগা। না ট্রেন, না বাস।"

শর্মাজি বললেন, "আরে বাবা, অ্যায়সা না করো। সুভা তো হোনে দো।"

বিলু বলল, "তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে শর্মাজি।"

রেখা বলল, "লেকিন..."

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু ওর লেকিনের কোনও জবাব না দিয়ে 'গুডবাই' বলে পঞ্চুকে নিয়ে নেমে এল নীচে। তারপর বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল যদি কোথাও কোনও ট্যাক্সি বা কোনও মালবাহী লরি পায় সেই আশায়।

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "এইভাবে আমাদের পথে বের হওয়াটা কি ঠিক হল? ধরো, যদি আমরা চলে যাওয়ার পরেই বাবলুদা ফিরে আসে? অথবা এই আগ্রা বাজারে নিশুতি রাতে যদি আবার আমরা হার্মাদের পাল্লায় পড়ি?"

বিলু বলল, "বাবলু যদি সত্যিই ফিরে আসে তা হলে আমরা ওদের খোঁজে জয়পুর গেছি শুনেই ভোরের ট্রেন অথবা বাসে জয়পুরে চলে যাবে। আর হার্মাদের পাল্লায় আমরা তো পড়েই গেছি। আসলে আমরা আর-এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাই না। তার কারণ মনে রাখিস এখানে কিন্তু আমাদের শত্রু শুধু হার্মাদ নয়, কান্দাহার থেরানিও। হার্মাদের কাজ হল লুঠ, মার, রাহাজানি, ছিনতাই আর কান্দাহারের কাজ হল শান্ত নিথর মরুভূমির ওপর দিয়ে সেইসব জিনিস বিদেশে পাচার করা। রাধা এবং বাবলু এখন তাদের দু'জনেরই সম্পত্তি। কাজেই চক্র এখানে একজনের নয়, দু'জনের।"

ওরা যখন কথা বলতে-বলতে বেশ খানিকটা এগিয়েছে তখন একটা ট্যাক্সির হেড লাইটের জোরালো আলো ওদের মুখের ওপর এসে পড়ল। ড্রাইভার একজন সর্দারজি।

বিলু হাত দেখাতেই থামল ট্যাক্সিটা।

গম্ভীর মুখে সর্দারজি বললেন, "কাঁহা যাওগে তুম?"

বিলু বলল, "সর্দারজি, আমরা খুব বিপদে পড়েছি। আপনি আমাদের জয়পুরে নিয়ে চলুন।"

সর্দারজি চমকে উঠলেন, "জয়পুর! ও তো বহোত দূর। পান্‌শো রুপাইয়া কিরায়া লাগে গা।"

বাচ্চু, বিচ্চু সর্দারজির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, "তাই দেব। সর্দারজি, আমরা আপনার মেয়ের মতন। খুব বিপদে পড়েছি আমরা। একটু দয়া করে নিয়ে চলুন আমাদের।"

"তুমহারা বাত হামকো সমঝমে নেহি আতা। ইত্‌নি রাত মে কাহে কো জয়পুর যানা চাতে হো তুম? কিরায়া ভি জায়দা লাগে গা ঔর ফায়দা ভি নেহি হোগা। সুভে চার বাজে তো বাস-ই মিলেগা তুমকো। ওহি মে চলা যাও। হাম তুমকো বাস স্ট্যান্ড পর ছোড় দেঙ্গে। চলো, উঠো।"

অগত্যা ওরা উঠেই পড়ল। এখনই তো রাত সাড়ে বারোটা। ভোর চারটে কথা বলতে-বলতেই হয়ে যাবে। তবু লোকের বাড়িতে থাকার চেয়ে তো এটা ভাল হল।

ট্যাক্সিতে বসে বিলু ওদের বিপদের কথা সব খুলে বলল সর্দারজিকে। সর্দারজি যেতে-যেতেই হঠাৎ 'ক্যাঁচ' করে একটা ব্রেক কষে ট্যাক্সি থামিয়ে বলল, "হার্মাদ লে গিয়া উয়ো লেড়কি কো?"

"হ্যাঁ। সেইসঙ্গে আমাদের এক বন্ধুকেও।"

"তব তো ও জয়পুরমে নেহি যায়েগা। ও রহেগা বান্দিকুই। হুঁয়াসে মারবাড় হো কর চলা যায়গা যোধপুর।"

"তা হলে?"

সর্দারজি আর কোনও কথা না বলে একটা পেট্রল পাম্পে গিয়ে খানিকটা তেল নিয়ে নিলেন। তারপর বিলুকে বললেন, "ডর নেহি লাগতা তুম্‌হারা?"

বিলু বলল, "ডর লাগলেই বা কী করব সর্দারজি? পুলিশ কিছু করল না বলে আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না।"

"মরদ কা ব্যচ্চা। আগ্রাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক নেহি। লেকিন রাজস্থান পুলিশ তুম্‌হারা আর্জি জরুর শুনে গা।"

"আপনি আমাদের হেল্প করুন।"

ট্যাক্সি আর বাসস্ট্যান্ডে নয়, একেবারে বুলেটের গতিতে ছুটে চলল বান্দিকুই-এর দিকে। বাবলুর তবু মানচিত্র-জ্ঞান আছে, কিন্তু ওদের তা নেই। তাই কোথায় জয়পুর কোথায় বান্দিকুই কিছুই জানে না ওরা। চুপচাপ ট্যাক্সিতে বসে রইল।

বেশ খানিকক্ষণ যাওয়ার পর সর্দারজি বললেন, "আভি হাম রাজস্থানমে আ গিয়া। ইয়ে ভরতপুর হ্যায়।"

বাচ্চু, বিচ্চু, বিলুকে বলল, "এইখানকার পক্ষিনিবাস বিখ্যাত না?"

"হ্যাঁ। বাবলুর মুখে শুনেছি, ভরতপুরই রাজস্থানের প্রবেশ দ্বার। ১৭৩০ সালে মহারাজ সূরযমল এই শহরটি গড়ে তোলেন। এখানে একটি দুর্গও আছে। আর এখানকার বার্ড স্যাংচুয়ারিতে পাখি ছাড়াও আছে ভারতীয় কৃষ্ণসার মৃগ, নীলগাই, চিতল, ভালুক, প্যান্থার ইত্যাদি।"

প্রায় শেষ রাতে ট্যাক্সি এসে বান্দিকুইতে পৌঁছল। সর্দারজি

ওখানেই এক জায়গায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ওদের আসতে বললেন। এ-পথ সে-পথ করে একটি গলির ভেতর বস্তি এলাকার একটা বাড়িতে এসে হাজির হলেন সর্দারজি। তারপর একটা বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন, "শাজাহান, এ শাজাহান ভাইয়া?"

এক বুড়ো বেঁটে বামনাকৃতি লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, "কৌন?" তারপর সর্দারজিকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, "আরে জ্ঞান সিং তুম?"

"হার্মাদিকা নয়া শিকার কুছ আয়া?"

"শুনা তো নেহি।"

"এক মাসুম লেড়কিকো ছিনকে লিয়ায়া ও বদমাশ। জেরা তালাশ তো লাগাও।"

শাজাহান বললেন, "ঠারো।" বলে ঠুক-ঠুক করে এগিয়ে গেলেন একটি দর্মার ঘরের দিকে। দরজায় ঠুক-ঠুক শব্দ করে ডাকলেন, "মাস্টার, এ মাস্টার!"

চাদর-মুড়ি দেওয়া চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি ছেলে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে এসে বলল, "ক্যা চাহিয়ে বাবা।"

"আরে দেখো তো কৌন আয়া। জ্ঞান সিং। মেরা পুরানা দোস্ত। তেরা বস্ ফিন খারাবি কাম কিয়া। আয়া কোই?"

মাস্টার বলল, "উঁহু। তিনো ট্রাক আনেকা বাত থা। লেকিন আভি তক নেহি আয়া।"

শাজাহান জ্ঞান সিং-এর দিকে তাকালেন।

বিলু ছুটে এসে বলল, "লক্ষ্মী ভাই, ওদের যাতে ফেরত পাই এমন একটা ব্যবস্থা করে দাও তুমি।"

শাজাহান বললেন, "ও নেহি সকেগা। হোশিয়ারিসে কাম করনে পড়েগা। বস্ কা মালুম হো যায়েগা তো মার ডালেগা উসকো।"

বিলু বলল, "আচ্ছা, জয়পুরে কি তোমাদের কোনও ঘাঁটি আছে?"

"জয়পুরমে হ্যায়, মারবাড় মে হ্যায়, যোধপুরমে হ্যায়। তুম বঙ্গালি?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও বাঙালি। পাঁচ বছর বয়স থেকে এখানে আছি। এখানে বাস-গুমটির কাছে আমার একটা চায়ের দোকান আছে। আমি এদের স্কোয়াডের ছেলে না হলেও এদের হয়ে কাজ করি। ওই চায়ের দোকানটা থেরানি সাহেবের লোকেরা আমাকে করিয়ে দিয়েছে। অবশ্য হার্মাদেরও অবদান আছে অনেক। তা যাক, এদের অনেক খবরাখবর আমি রাখি। বা গোপন চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করিয়ে দিই।"

সর্দারজি বললেন, "হাম যা রহে। তুমহারা দেশোয়ালি মিল গয়া। তুম সব বাতচিত করো। আউর সুভে জয়পুর চলা যাও। হিঁয়াসে এক-দো ঘণ্টেকা মামলা।"

বিলু বলল, "সর্দারজি, আপনার ভাড়াটা?"

"আরে ছোড়ো না বাবা। রাখ্‌কো তুমহারা পাশ।" বলে মাস্টারকে বললেন, "সবকো মদত করো, উঁ?"

সর্দারজি চলে গেলেন।

শাজাহানও বিদায় নিলেন।

মাস্টার ওদের নিয়ে গেল ওর ছোট্ট ঘরটিতে। নোংরা অপরিচ্ছন্ন ঘরদোর। ওদের ঘরে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে মাস্টার বলল, "এদের দলে আমি একজন ইনফরমার ছাড়া কিছু নই। তা তোমাদের ব্যাপারটা কী বলো তো?"

বিলু ভোম্বল সব কথা খুলে বলল মাস্টারকে।

সব শুনে মাস্টার বলল, "আর বলতে হবে না। আসলে হার্মাদের অত্যাচার যারা নীরবে সহ্য করতে না পারে সঙ্গে-সঙ্গেই খতম লিস্টে তাদের নাম উঠে যায়। কান্দাহারও তাই। কালই তো
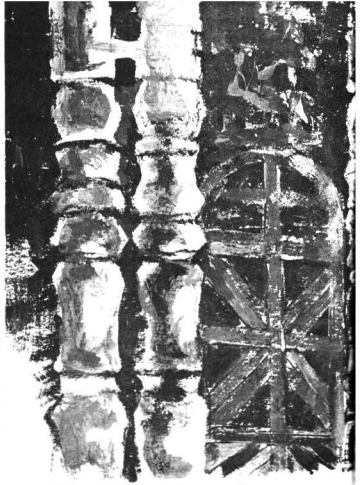
একজনকে দিনের আলোয় দিগের কাছে ট্রাকের তলায় পিষে মেরে ফেলল। তবে তোমরা যখন দুর্ভাগ্যক্রমে ওর কুনজরে পড়ে গেছ তখন আমার মনে হয় তোমাদের বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।"

"কিন্তু আমাদের দু'জন সঙ্গীকে ফেলে রেখে কোন মুখে আমরা ফিরে যাব বলো তো?"

"সে তো বুঝলুম। কিন্তু তোমাদের লাইফও তো ডেঞ্জার হতে পারে। আসলে এরা হল ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার। হার্মাদ ভয়ঙ্কর হলেও মাথামোটা। কিন্তু কান্দাহার থেরানি বাজে লোক। ওর নোটিশে এসে গেলে রাজস্থান থেকেই তোমরা বেরোতে পারবে না।"

"কীরকম দেখতে লোকটাকে?"

"আমি কখনও ওর চেহারাই দেখিনি। শুনেছি, দেখলে মনে হবে একজন রহিস আদমি। ভয়ও লাগবে। ভয়ঙ্কর রাশভারী লোক। থেরানিজি না ইন্ডিয়ান না অ্যারেবিয়ান। সাম সন্দ ওর মূল ঘাঁটি। মরুভূমির বালির ঢিবির নীচে ওর কারবার। হার্মাদ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে আর থেরানির কারবার জ্যান্ত মানুষ কেনাবেচা। মানুষের হাড়গোড় নিয়ে কারবার। তা ছাড়া সোনা চাঁদি আরও অনেক কিছু আমদানি-রফতানির ব্যাপার তো আছেই।"

"তা তো হল। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা কী হবে?"

"দেখো ভাই, মেয়েটাকে যদি আমার জিম্মায় এনে রাখত তা হলে আমি না হয় একটা ফুসমন্তর দিতে পারতাম। যদিও ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তবে এলই না যখন, তখন কী উপায় করি বলো তো? আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। এই বান্দিকুই, জয়পুর, এইসব সিটি কিন্তু আগ্রা সিটির মতো নয়। এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অত্যন্ত কড়া। তবু ওরা ফাঁকি দেয়।"

বিলু বলল, "অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি এত কড়া তা হলে ওরা

দিনের পর দিন এইসব ব্যবসা করে কী করে ?"

"আসলে ব্যাপারটা হল কি, রোজই তো ওরা লোকের ছেলেমেয়েকে তুলে আনছে না, বা রোজই স্মাগলিং গুড্‌স পাচার করছে না। বড়-বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ওদের যোগসাজস আছে। তাদের সামান-ভর্তি মালের সঙ্গে ওদেরও মাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। এইখানে একটা ছোট পুরনো কেল্লা আছে। সেই কেল্লার নীচে ওদের একটা ঘাঁটি আছে। জ্যান্ত মানুষ ধরে এনে লুকিয়ে রাখা হয় সেইখানে। তার গোপন পথের সন্ধান আমি জানি। আমার কাছে চাবি থাকে। আমি ওদের খাবার পৌঁছে দিই। পরে সময়মতো ওরা মাল পাচার করে। এইসব কাজ মাঝরাতে হয়। শেষরাতে নয়। কাজেই তোমাদের কাউকে ওরা ধরে আনলে আমার হেফাজতেই থাকত।"

"আচ্ছা, ওদেরই একজন লোকের মুখ থেকে শুনেছিলাম অম্বরের কাছে একটি পুরনো কেল্লার নীচে নাকি ওদের ঘাঁটি আছে ?"

"হ্যাঁ,আছে। জয়গড়ে। কিন্তু ওখানে গেলেও ওরা এখানে বসে এক কাপ করে চা না খেয়ে যেত না। তা যখন আসেনি তখন ওরা জয়গড়েও নেই। শোনো, আলিগড়, কানপুর, আগ্রা থেকে যাদের ধরে আনা হয়, তাদের জন্য বান্দিকুই। আর ওদিকে উজ্জয়িনী, ভোপাল থেকে যাদের আনা হয় তাদের জন্য জয়পুর। আজমিরের পথ ধরে আসে ওরা।"

"এমন সময় হঠাৎ বাইরে মস মস শব্দ।

মাস্টার সকলকে ইস্‌স করে চুপ করতে বলেই ওর খাটিয়ার তলায় সকলকে লুকিয়ে পড়তে বলল। তারপর বিছানার ময়লা চাদরটা এমনভাবে টেনে দিল, যাতে নীচে কী আছে তা দেখা না যায়। বিল্লু,ভোম্বল,বাচ্চু,বিচ্ছু আর পঞ্চু ওর কথামতো টুঁ শব্দটি না করে লুকিয়ে রইল খাটিয়ার নীচে।

একটু পরেই দরজায় টক-টক শব্দ, "মাস্টার, এ মাস্টার !"

মাস্টার যেন ঘুম ভেঙে এইমাত্র উঠল এমন ভান করে দরজা খুলে দিতেই পাঁচ-সাতজন লোক ঢুকে পড়ল ভেতরে। খাটিয়ার নীচে লুকিয়ে থাকার ফলে বিলুরা ওদের মুখও দেখতে পেল না, চিনতেও পারল না কাউকে।

ওরা ঘরে ঢুকেই যে যা পেল, তাই নিয়ে বসে পড়ল। কেউ বসল টুলে। কেউ খাটিয়ায়। একজন তো এমন বসল যে, ভোম্বলের প্রাণ যায় আর কি। লোকটি বলল, "কেয়া রাখ্খা হ্যায় নীচেমে ?"

"কুছ নেহি। পুরানা বিস্তারা।"

আর-একজন বলল, "খাস খবরি কুছ হ্যায় ?"

"নেহি।"

"তুরন্ত চায় বানা। জলদি, জলদি। আভি ভাগ্‌না হোগা। বহোত দের হো গিয়া।"

মাস্টার চায়ের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে বলল, "ইতনা দের কিউঁ কিয়া ?"

"আরে ও হার্মাদকে লিয়ে সবকা নসিব ফাঁস গিয়া। পাগলা কুত্তা কাটে হুয়ে সবকো। হার্মাদ কা হাল ভি বহোত খারাবি করবায়া।"

"কুত্তা মরে গয়ে কি নেহি ?"

"উসকো মারনে নেহি সকা। আউর মারনে সে ভি ফায়দা ক্যা ? অচানক কাট দিয়া না ?"

যদিও এটা চায়ের দোকান নয়,তবুও রাতের অতিথিদের জন্যে এখানে সবরকম ব্যবস্থা আছে। দরকার হলে স্টোভে রোটি চাপাটিও বানিয়ে দিতে পারে মাস্টার।

চা তৈরি হলে চা খেতে-খেতে একজন বলল, "থোড়া বুখার আ গিয়া। কাল সুভে যোধপুরমে সুই লানে পড়েগা।"

শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ

শ্রী ঘৃত

ভারতী ঘৃত

শ্রীলক্ষ্মী ঘৃত

শ্রী মধু

শ্রী হনফুড

প্রস্তুতকারক

অশোক চন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিমিটেড

২৬ কটন স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০০৭ ফোনঃ ৩৮ ২২৪৭

মাস্টার বলল, "তুমকো ভি কাটা ?"

"সবকো ।"

"আগ্রেমে সুই কিঁউ নেহি লিয়া তুমনে ?"

"আরে ও দাওয়াই উধার মিলতা হি নেহি। ডাক্তারকা পাশ গিয়া তো স্রেফ টিটেনাস দে দিয়া।"

আর-একজন বলল, "সিপ্পি আয়া ?"

"আভি তক নেহি আয়া।"

"ও তো জুট কা ট্রাক লেকে ভাগা হামসে ভি পহলে। উসমে এক লেড়কি ভি থা।"

"নেহি আয়া। তুম ক্যা লেকে আয়ো ?"

"হামারা ট্রাক মে তো চাঁদি, চরস আউর বেপারিকা সামান। আউর কুছ নেহি।"

"তো কাঁহা গয়া সিপ্পি। পাকড়ে গয়ে তো নেহি ?"

"নেহি মাস্টার। সিপ্পি কো কৌন পাকড়েগা ? মালুম হোতা জরুর কুছ গড়বড় হুয়া। ট্রাক বিগড় গয়া রাস্তেমে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। একে তো ট্রাক এল না। তার ওপর ওরা সবাই একজন লেড়কির কথাই বলছে। কিন্তু কোনও লেড়কার কথা বলছে না কেউ। বাবলু তা হলে কোথায় গেল ? ওকে কি অন্য কোথাও সরিয়ে দিল ওরা। না কোনও চোট-টোট পেয়ে যমুনার চড়াতেই সবার অলক্ষ্যে পড়ে রইল ? কিন্তু তা যদি হত তা হলে তো পঞ্চুর নজর এড়াত না।

এমন সময় হঠাৎ দু'জন লোক ছুটতে-ছুটতে হাজির হল সেখানে, "আরে এ উল্লাস, এ ফকিরা, শের আলি জঙ্গ্ !"

"ক্যা সমাচার !"

"ইনস্পেক্টর আনন্দ।"

নামটা শোনামাত্রই ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠল সকলে। প্রত্যেকেরই হাতে তখন একটা করে রিভলভার চলে এসেছে। একজন খাটিয়াটা হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে যেই না দরজা ঢাকতে গেছে অমনই পেটের পিলে চমকে দিয়ে লাফিয়ে উঠেছে পঞ্চু, "ভৌ-উ-উ-উ"। সে কী বিকট চিৎকার। যেন মরণ-ডাক ডাকিয়ে আনল সকলের।

বিল্লু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তখন আচমকা এরকম হয়ে যাওয়ায় ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

সাক্ষাৎ-যম তখন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তরুণ তুর্কি ইনস্পেক্টর আনন্দ।

ঘরের ভেতর তখন প্রচণ্ড দাপাদাপি। পঞ্চুর গেরিলা আক্রমণের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা। অতএব হাতের রিভলভার হাতেই রইল। কে কাকে গুলি করে ? তবু তারই ফাঁকে দুর্বৃত্তদের গুলিতে দু'জন কনস্টেবলকে শুয়ে পড়তে হয়েছে। এরাও শুয়েছে দু'জন। দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইনস্পেক্টরের ওপর। সেই সুযোগে একজন রিভলভার তাগ করতেই পঞ্চু তার টুঁটি কামড়ে ঝুলে পড়ল। আর ভোম্বল সেই মুহূর্তে ছিনিয়ে নিল তার হাত থেকে রিভলভারটিকে। এর পর তো বিলু, বাচ্চু আর বিচ্ছু যে যা হাতের কাছে পেল তাই দিয়ে পেটাতে লাগল দুষ্কৃতীদের। আর পঞ্চু শুরু করল ভয়ঙ্কর কামড়াকামড়ি। অবশেষে দুষ্কৃতীরা দুর্বল হয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। পুলিশের লোকেরা হাতে হাতকড়া লাগাল সকলের।

ইনস্পেক্টর আনন্দ পঞ্চুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমকো ভি এ লোগ চুরাকে লে আয়া ?"

বিলু বলল, "না। আমরা নিজের থেকেই এখানে এসেছি।"

"ক্যায়সে ?"

"আমরা জয়পুর যাচ্ছিলাম। রাস্তায় আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। তাই এখানে একজন বাঙালি থাকে শুনে দেখা করতে এসেছি।"

"তুমহারা কুত্তা মেরা জান বাঁচায়া।"

"এর কাজই এই। কারও জান বাঁচায়, কাউকে আবার খতমও করে।"

ইনস্পেক্টর আনন্দ দুষ্কৃতীগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাহার মে যো ট্রাক খাড়ি হ্যায় ক্যা চিজ হ্যায় উসমে ?"

"বেপারি কা মাল।"

"আগ্রা পোলিশ নে রিপোর্ট কিয়া তুম সব এক লেড়কি কো কিড্ন্যাপ করকে ভাগা।"

"নেহি। ইয়ে বাত ঠিক নেহি।"

"চলো, বাহার চলো। ট্রাক দিখলাও। সার্চিং হোগা।"

বিলু বলল, "একটু আগেই এরা বলাবলি করছিল ওই ট্রাকের ভেতর চাঁদি, চরস এইসব নাকি আছে।"

দুষ্কৃতীরা একবার রক্তচক্ষুতে দেখল বিলুকে। তারপর পুলিশের নির্দেশমতো চলল।

দু'জন কনস্টেবল এক-এক করে তুলে নিয়ে গেল ডেডবডিগুলো। নিহতের সংখ্যা চার। ডেডবডি চলে গেলে ইনস্পেক্টর বললেন, "তুম সব কাঁহা যাওগে ? জয়পুর ?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ।" তারপর বলল, "আগ্রা পুলিশ আপনাকে যে মেয়েটির কথা বলেছে ও আমাদেরই দলের মেয়ে। একটু চেষ্টা করে দেখুন যদি তাকে উদ্ধার করা যায়। ওইসঙ্গে আমাদের এক বন্ধুও নিখোঁজ হয়েছে।" বলে সব কথা খুলে বলল।

"ও, আচ্ছা। লেকিন তুম ইতনি দূর চলে আয়ে কিঁউ ?"

"কী করব। আগ্রা পুলিশ আমাদের কথা ভাল করে শোনেনি। এমনকী, ভাল ব্যবহারও করেনি আমাদের সঙ্গে। তাই আমরা নিজেরাই ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি।"

"তো শুনো, আগ্রা পুলিশ জরুর শুনাহা হোগা তুমহারা বাত। উনহোনে তো সব কুছ বতায়া হামকো।"

"এরকম কেন হল ?"

এতক্ষণে কথা ফুটল মাস্টারের মুখে। বলল, "আসলে ব্যাপারটা কী জানো ? হার্মাদের ইনফরমাররা পুলিশের ভেতরেও আছে। তাই ওখানকার পুলিশ তোমাদের কথা শুনেও ওদের ভয়ে না-শোনার ভান করেছে। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে কাজ করেছে ঠিকই।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "ওই ট্রাকটার তা হলে কী হল ? গেল কোথায় সেটা ?"

মাস্টার বলল, "আমার মনে হয় ওটা ওখানেই ধরা পড়েছে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "ঠিক হ্যায়। তুম সব ইঁয়া বৈঠো। হাম ওয়ারলেসমে বাত করকে বতায়েঙ্গে।"

ইনস্পেক্টর চলে গেলেন।

মাস্টার বলল, "মাঝখান থেকে আমার অবস্থাটা ঢিলে হয়ে গেল। কান্দাহার থেরানির কাছে খবর গেলে উনি আর আমাকে বিশ্বাস করবেন না।"

বিলু বলল, "কিছু হবে না। টের পাবে কী করে ? পুলিশ মার্ডার করে এই লোকগুলো কি সহজে ছাড় পাবে ভেবেছ ?"

"না পেলেই ভাল। তবে পুলিশ খুব কড়া স্টেপ নিয়েছে। কান্দাহার বা হার্মাদের সঙ্গে ইনস্পেক্টর আনন্দের সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। তা ছাড়া আনন্দ খুব জেদি লোক। সবাই ভয় করে ওকে। আর স্টেপ নেবে নাই-বা কেন ? এদের অত্যাচার এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। ওপর থেকেও চাপ আসছে খুব।"

বিলু বলল, "আর তো আমাদের লুকিয়ে থাকার কোনও ব্যাপার নেই। মাস্টারভাই, এবার তুমি আমাদের সকলকে এক কাপ করে চা খাওয়াও।"

"খাওয়াব। আমাকেও খেতে হবে। ভোর হয়ে আসছে।

আমারও দোকান খোলবার সময় হয়েছে এবার।"

মাস্টার বেশ ভাল করে ছ'কাপ চা তৈরি করল। তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চুকে দিয়ে নিজেও খেল তৃপ্তি করে।

ওরা যখন চা খাচ্ছে তখন একজন কনস্টেবল এসে জানিয়ে গেল, আগ্রা পুলিশ জানিয়েছে ওই বিশেষ ট্রাকটির এখনও পর্যন্ত কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।

মাস্টার বলল, "তোমরা তা হলে এক কাজ করো, এখানে থাকার আর দরকার নেই। সোজা জয়পুরেই চলে যাও। ওই ট্রাক আর এখানে আসবে না। যদিও আসে আমি সুযোগ করে দেব ওদের পালিয়ে যাওয়ার।"

বিলু চায়ের দাম দিতে গেলে মাস্টার নিল না। ওরা তখন মাস্টারকে সঙ্গে করে বড় রাস্তায় আসতেই জয়পুরগামী একটি সরকারি বাস পেয়ে গেল। এত ভোরে হাড়কাঁপা শীতে বাস একদম ফাঁকা। ওরা বাসে উঠতেই বাস ছুটে চলল গোঁ-গোঁ করে।

জয়পুর যখন এল তখন সকাল হয়ে গেছে। বাসস্ট্যান্ড শহরের মাঝখানে। বাস থেকে নেমেই এদের প্রথম কাজ হল কোথাও একটু থাকার ব্যবস্থা করে নেওয়া।

ভোম্বল বলল, "কাছাকাছি একটা লজ দেখলে হত না?"

বিলু বলল, "সে তো দেখতেই হবে। তবে বাবলু কিন্তু সব সময় বলে বাইরে গিয়ে কোথাও থাকলে স্টেশনের কাছাকাছিই থাকতে হয়। আমরাও তাই স্টেশনের কাছে কোথাও থাকিগে চল।"

সবাই এককথায় রাজি। বাসস্ট্যান্ড থেকেই একটা অটো নিয়ে ওরা চলে এল স্টেশনে। তারপর শস্তায় থাকার জায়গার খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারল স্টেশন থেকে বেরোবার মুখেই বাঁ দিকে থানার গায়ে একটা গলির ভেতর একটি ধর্মশালা আছে। সেইখানেই বহাল তবিয়তে থাকা যেতে পারে।

ওরা তাই করল। থানার পাশে গলিতে ঢুকেই একটা বাঁক নিয়ে ডান দিকে একটি ধর্মশালা দেখতে পেল ওরা। নীচে দোকানপত্তর। খাবার হোটেল। ওপরে থাকার জায়গা। ওরা দোতলায় উঠে নামধাম লেখাতেই ঘর পেয়ে গেল একটা। নামে ধর্মশালা হলেও লজের মতোই ব্যবস্থা। আবার সিঁড়ি দিয়ে ধর্মশালার পেছনের অংশে নামতেই দেখতে পেল সারি-সারি কয়েকটি ঘর। কোনওটি ডবল বেডের। কোনওটি ফোর বেডের। ওদের জন্য ফোর বেডের রুমই ধার্য হয়েছিল। তাই পেয়ে গেল। শুধু বাথরুমটাই যা কমন। তা মন্দ কী? লজে উঠলে অনেক টাকা চলে যেত। এ তবু পার ডে দশ টাকা হিসাবে চল্লিশ টাকায় হয়ে গেল।

ওরা ঘরে জিনিসপত্তর রেখে পোশাক পালটে আলোচনায় বসল কীভাবে এবং কেমন করে ওরা ওদের অনুসন্ধান শুরু করবে।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "কাল থেকে আমাদের ঘুম নেই। বিশ্রাম নেই। ভোরবেলায় বাসে আসতে-আসতে ঘুমে যেন ঢুলে পড়ছিলাম। অথচ এখন কোনও ঘুমের ভাবই নেই।"

বিলু বলল, "এইরকমই হয়।"

এমন সময় দরজায় নক করে একটি ছেলে ঢুকল, "চায় লাগে গা ভাই সাব?"

"লাগেগা। আউর ক্যা মিলে গা?"

"ওমলেট, পুরি, টোস্ট, গরম জিলাবি।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা খুব জিলিপি খেতে ভালবাসত রে।"

ভোম্বল বলল, "শোনো, তুমি আমাদের জন্যে পাঁচ কাপ চা আর পুরি জিলিপি নিয়ে এসো। জলদি যাও।"

ছেলেটি চলে গেল।

বিলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল অম্বর চলে যাওয়া। অম্বর কতদূর তা জানি না। সেখানে গিয়ে ওই পুরনো কেল্লার নীচে ওদের গোপন ঘাঁটিটা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। যদিও সেখানে কাউকে পাব না। তবু চেষ্টা করতে ছাড়ব কেন? ওরা যখন বলেছে রাধাকে অম্বরে রাখা হবে তখন একবার খুঁজে দেখতে দোষ কী? তবে এতেও কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হবে না। হয়তো সেখানে হানা দিয়ে আমরা রাধাকে মুক্ত করতে পারব। কিন্তু বাবলু? ওর অন্তর্ধানটা তো রহস্যময়ই রয়ে গেল। এমন রহস্যজনকভাবে বাবলু তো কখনও উধাও হয়নি। রাধাকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বাবলুকে হারালে তো আমরা সবাই অকেজো। কোন মুখে বাড়ি ফিরব আমরা? পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার কথা কাগজে-কাগজে ছাপা হবে। এ আমরা কেউ সহ্য করতে পারব না।"

ভোম্বল বলল, "সত্যিই যদি বাবলুর কিছু হয় বা ওকে আমরা ফিরে না পাই তা হলে কিন্তু আমি আর বাড়ি ফিরব না।"

বিলু বলল, "আমিও না।"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "আমরা তো নয়ই।"

পঞ্চু বলল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ, আমিই ফিরব বুঝি?

এমন সময় ছেলেটি আর-একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চা, জলখাবার ইত্যাদি নিয়ে এল। প্লেটগুলো নামিয়ে রেখে বলল, "পেপার লাগেগা?"

ভোম্বল বলল, "হিন্দি না বাংলা?"

"ইধার বাংলা নেহি মিলতা। হিন্দি, ইংলিশ।"

"যাও। নিয়ে এসো।"

ওরা সকলেই সংস্কৃত পড়ার দৌলতে হিন্দি পড়তে বা বুঝতে পারে। যদিও হিন্দিতে যা কথা বলে তা সবই ভুলভাল। তবু মনের কথা ব্যক্ত করতে পারে তাই দিয়ে।

ছেলেটি কাগজ নিয়ে এলে কাগজের প্রথম পাতার খবর পড়েই চমকে উঠল ওরা। খবরে যা ছিল তা হল এই, 'আগ্রার কাছে ভয়াবহ ট্রাক দুর্ঘটনা। অগ্নিদগ্ধ ট্রাক ব্রিজের কংক্রিট ভেঙে রেলপথে। যমুনা নদী থেকে এক কিশোরীকে অপহরণ করে পালাবার সময় গাড়িটি চালকের দোষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটায়। সন্দেহ করা হচ্ছে অপহৃতা কিশোরী সহ সকলেই মৃত।' আর-একটি সংবাদ, 'এই চক্রের অন্যতম নায়ক কুখ্যাত হার্মাদি আগ্রার পুলিশ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। এক দেশি কুকুরের হিংস্র আক্রমণে হার্মাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাজস্থান-পুলিশ তদন্তসূত্রে ওই চক্রের অপরাপর আসামিদের ধরতে গেলে বান্দিকুইয়ের এক বস্তিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে দু'জন দুষ্কৃতীসহ পুলিশের দুই কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে। পরে মাস্টার নামে এক কিশোরকেও ভোরের দিকে একটি চায়ের দোকানের সামনে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।'

কাগজটা পড়তে-পড়তেই দু' চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল সকলের। পঞ্চু, ব্যাপারটা কী যে হল, কিছু বুঝতে না পেরে লেজ নাড়তে লাগল ঘনঘন। ডিশের খাবার ডিশেই পড়ে রইল ওদের। চা জুড়িয়ে জল। এই সংবাদ জানার পর আর কি তদন্তের কোনও প্রয়োজন আছে?

॥ ৭ ॥

ওরা যে কতক্ষণ এইরকম শোকস্তব্ধ হয়ে ছিল তা খেয়াল নেই। সেই ছেলেটি আবার এসে বলল, "এই, বিল্লু কিসিকা নাম?"

বিলু বলল, "আমার নাম। কেন?"

ছেলেটি বলল, "নিসপিকটর আনন্দ তুমকো বুলায়া। তুম সবকো।"

ওরা কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল।

ছেলেটি বলল, "তুম তো কুছ নেহি খায়া। চায় ভি নেহি।"

বিলু বলল, "সব লে যাও। দাম মিল যায়গা তুমকো।"

ছেলেটি এক-এক করে নিয়ে গেল সব। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু বিচ্ছু ও পঞ্চুকে নিয়ে দরজায় তালা দিয়ে উঠে এল ওপরে।

ম্যানেজার বললেন, "ইনস্পেক্টর আনন্দ।"

"কোথায় উনি ?"

"বগলমে, পুলিশ চৌকি পর। চলা যাও।"

ওরা বাইরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। তারপর থানায় যেতেই সে কী খাতির। ইনস্পেক্টর আনন্দ সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওদের। সকলেই বললেন, এই ছেলেমেয়েগুলো এবং এই কুকুরটা না থাকলে ওঁর বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তারপর সকলকে কেক আর চা খাইয়ে বললেন, "শুনো, তুম সব আভি রেলওয়ে স্টেশন পর চলা যাও। উপরমে রিটার্নিং রুম হ্যায়। দো নম্বর ঘর পর চলা যাও। বঁহি পর রহোগে তুম। এ ধরমশালা ছোড় দো।"

বিলু বলল, "কেন, এখানে তো আমরা বেশ আরামেই আছি।"

"স্টেশানমে জি·আর·পি পোস্টিং হ্যায়। আভি তুমহারা জিন্দগি খতরেমে পড় গয়া। আউর কুছ ঘুমনা দেখনা চাহো তো এস·পি সাহেব কা গাড়ি মিলেগা। যাও, আভি রুম দেখকে আও। তুমহারা প্লাটফরম টিকট নেহি লাগেগা। রুমকা কিরায়া ভি নেহি। কোঈ কুছ পুছে তো মেরা নাম বতানা। ইনস্পেক্টর আনন্দ।"

এইরকম একটা সুযোগ কখনও ছাড়তে নেই। তাই ওরা ইনস্পেক্টরের কথামতো স্টেশনে এল রিটার্নিং রুম দেখতে। পরে একসময় গিয়ে বরং ধর্মশালা থেকে মালপত্তরগুলো নিয়ে আসা যাবে।

ওরা যেতেই কয়েকজন জি·আর·পি হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, "তুম সব আ গয়ে ? উপর চলা যাও। রুম নাম্বার টু।"

ওরা একে-একে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। কী চমৎকার স্টেশন এই জয়পুর। সাজানোগোছানো সভ্যভব্য। যেন ঝলমল করছে। তেমনই সুন্দর ঘরগুলো। এখানে থাকতে পেলে যে-কোনও মানুষের মনপ্রাণ ভরে যাবে। ওদেরও আনন্দ হল। কিন্তু বাবলুর অভাবে সে আনন্দ ম্লান। ইনস্পেক্টর আনন্দ ওদের ভালবেসে সরকারি ক্ষমতায় ওদের জন্য হয়তো অনেক কিছুই করতে পারেন। কিন্তু পারেন না শুধু মনের আনন্দকে ফিরিয়ে দিতে।

ওরা দু' নম্বর ঘরে গিয়ে দরজা খুলেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, "এ কী ! বাবলু তুই ?"

বাবলু বলল, "একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম রে। এই উঠছি। তোরা কখন এলি ?"

"স-স-সকালবেলা। রাধার খবর কী ?"

"ও বাথরুমে। তোরা চা-টা খেয়েছিস ?"

ভোম্বল বলল, "ইহকাল পরকাল সব তো খেয়ে বসে আছি। আর চা খাবো না ? এইমাত্র ইনস্পেক্টর আনন্দ আমাদের চা আর কেক খাওয়ালেন। কিন্তু তুই যে এত বড় ম্যাজিশিয়ান তা তো জানতাম না।"

বাবলু বলল, "থাকার ঘরটা কেমন বল দিকিনি ?"

"খুব ভাল। কিন্তু ব্যাপারটা কী !"

পঞ্চু যে তখন কী করবে কিছু ঠিক করতে পারছে না। সে অনবরত কুঁই-কুঁই করে বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

একটু পরেই ঝলমলে মুখ নিয়ে রাধা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

বাবলু বলল, "তোরা ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ চলে এসেছিস তো ?"

"হ্যাঁ।"

"কিট ব্যাগে আমার জামাপ্যান্টগুলো আছে। এগুলো আর পরা যাচ্ছে না।"

ভোম্বল বলল, "নিয়ে আসব ?"

"আরে যাবি'খন। এখন একটু বোস তো। চা-টা খাই।" বলে নিজেই উঠে গিয়ে কয়েক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে এল।

বিলু বলল, "এই অসম্ভবটা সম্ভব হল কী করে ? আমরা তো ভাবলাম তোরা দুটোতে মরেই গেছিস।"

"যেতাম। কিন্তু ভাগ্য-জোরে বেঁচে গেছি। চা-টা আসুক। খেতে-খেতে সব বলছি।"

রাধা বলল, "আমরা এখানে এসেই বাড়িতে ফোন করেছি। রেখাও এসে পড়বে দুপুরের মধ্যে। আমারও পোশাক-আশাক কিছু নেই।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি ততক্ষণ দিদিরটা পরো না ?"

"তাই ভাবছি।"

রেলের বড়-বড় কাপে চা এসে গেল একটু পরেই। চা আসা মাত্রই হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ভোম্বল।

বাবলু বলল, "কোথায় যাচ্ছিস ?"

সে কোনও উত্তর দিল না।

তারপর যখন ফিরে এল তখন দু' হাতে দুটো ঠোঙা। একটাতে বড়-বড় শিঙাড়া। আর একটাতে গরম-গরম জিলিপি। বলল, "স্টেশনের সামনেই ভাজছিল। দেখে এসেছি। দারুণ লোভ হচ্ছিল রে। শুধু তুই নেই বলেই খেতে পারছিলাম না।"

বিলু বলল, "তা ব্যাপারটা কী বল দেখি ?"

বাবলু যা বলল তা এক রোমহর্ষক ঘটনা। ওরা চা খেতে-খেতে পলকহীন চোখে সেই কাহিনী শুনতে লাগল।

গতকাল সন্ধ্যায় যমুনার বালুচরে সেই ট্রাক থেকে দু'জন লোক রাধাকে জোর করে তুলে নেওয়া মাত্রই বাবলু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল সেই ট্রাকে। জীবন বিপন্ন করে। চলন্ত ট্রাকের সাইডের মোটা কাছি ধরে বহু কষ্টে ঝুলে পড়েছিল। ফলে ওইটুকু সময়ের মধ্যে ও কাউকে কিছু চেঁচিয়ে বলবারও অবকাশ পায়নি। এই ট্রাকটি পাট বোঝাই ছিল। পাটের নীচে কী ছিল তা অবশ্য ও জানে না। ট্রাকটা এত জোরে ছুটছিল যে, ধুলো-বালি উড়িয়ে ধোঁয়া ছেড়ে অন্ধকার করে দিয়েছিল চারদিক।

ও বহু কষ্টে ধীরে-ধীরে সেই পাট-বাঁধা কাছি ধরে একটু-একটু করে ওপরে উঠে এসেছিল। তারপর গুছিয়ে বসেছিল ট্রাকের মাথায়। এমনভাবে যে, কেউ টের পায়নি। সেও কোনও সাড়াশব্দ করেনি।

এদিকে ট্রাকের মধ্যে তখন ভয়ঙ্কর ধস্তাধস্তি হচ্ছে রাধাকে নিয়ে। রাধা নেহাত কমজোরি মেয়ে নয়। এবং ওর মনের জোরও অন্য মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি। আর গালাগালিও করতে পারে বটে। তাই ওকে কব্জা করতে খুব বেগ পেতে হচ্ছিল ওদের।

একজন ড্রাইভারের আসনে বসে ছিল। আর-একজন সামলাচ্ছিল রাধাকে।

বাবলু ট্রাকের মাথায় বসে এইরকম অবস্থায় কী করে যে কী করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। পিস্তলে একটা গুলি ভরে নিয়ে একবার ভাবল ড্রাইভারের মাথার খুপরিটা উড়িয়ে দেয় এটা দিয়ে। আবার ভাবল, তা করতে গিয়ে নিজেদের মরণকেই ডেকে আনবে ওরা। একবার যদি কোথাও গাড়িটা থামে তা হলে খেল দেখাবে তখনই। এমন সময় হঠাৎই একটা বদ বুদ্ধি মাথায় এল। দেখল ট্রাক তো পাটে বোঝাই। তাই লোডশেডিং-এ বাতি ধরাবার জন্য যে একটা লাইটার ওর কাছে ছিল, সেটা জ্বেলে টুক করে ধরিয়ে দিল সেই শুকনো পাটে। প্রচণ্ড হাওয়ার বেগে প্রথমে একটু অসুবিধা হয়েছিল। তারপর জ্বলে উঠল একেবারে দাউ-দাউ করে। কাজটা করেও বিপদে পড়ে গেল বাবলু। ভাগ্যিস, হাওয়ার বিপরীতে ছিল। না হলে আগুন ওকেই গ্রাস করত আগে।

আগুন জ্বলে উঠতেই ড্রাইভার টের পেয়ে গাড়ি থামাল।

যে লোকটা রাধাকে কবজা করছিল সে তখন লাফিয়ে নেমে

দেখতে গেল ব্যাপারটা কী হয়েছে। যেই না যাওয়া বাবলু অমনই তাকে লক্ষ করেই গুলি করল একটা। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ফসকে গেল গুলিটা। লোকটাও পালাল।

সেই তালে রাধাও নেমে পড়ল ট্রাক থেকে।

বাবলুও তখন লাফিয়ে নামল।

ওদিকে ড্রাইভার তো দেখতে পায়নি বাবলুকে। তাই গুলির শব্দ শুনেই সে ভাবল নিশ্চয়ই পুলিশে তাড়া করেছে ওদের। তাই ওই অবস্থাতেই জ্বলন্ত ট্রাক নিয়ে প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে ঘটিয়ে বসল বিপত্তি। ট্রাকটা ছিল রেল ব্রিজের ওপর। একেবারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কংক্রিটের রেলিং-এ ধাক্কা মেরে পড়ল নীচে রেল লাইনের পাশে। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণে গাড়িটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। উঃ, সে কী দৃশ্য। সে দৃশ্য দেখা যায় না।

রাধা ছুটে এসে তখন বাবলুর একটা হাত ধরল। বলল, "আর দেখতে হবে না। রাত হয়ে গেছে। এই জায়গাটা আরও খারাপ। জলদি ভাগনা চাহিয়ে।"

বাবলু বলল, "চলো।" বলে যেই আসতে যাবে অমনই দেখল জনা দশ-বারো লোক গলায় রুমাল বেঁধে পাকা শিকারির মতোই এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এরা কারা তা কে জানে? হার্মাদের লোকও হতে পারে অথবা অন্য কেউ। হয়তো ট্রাকের সেই পালিয়ে যাওয়া লোকটিই গিয়ে ডেকে এনেছে ওদের। সেই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া ওদের আর করার কিছুই ছিল না। কেননা আর একটিও গুলি ছিল না বাবলুর পিস্তলে।

হঠাৎ ভগবানের দয়াই বলতে হবে, ধীর শ্লথ গতিতে মিটারগেজ লাইনের একটি মালগাড়ি গুটি-গুটি করে যাচ্ছিল ব্রিজের তলা দিয়ে। ওরা ভগবানকে স্মরণ করেই দু'জনে দু'জনার হাত ধরে লাফিয়ে পড়ল সেই মালগাড়ির মাথায়। ব্রিজটা নিচু ছিল খুব। দু' হাতও লাফাতে হয়নি তাই।

যাই হোক। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওয়াগনের মাথায় বসে খানিকটা তারপর পরই বুঝতে পারল গাড়িটা স্পিড নিচ্ছে। আর খোলা হাওয়া প্রচণ্ড শীত করছে তখন। ওরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে একটু-একটু করে এগিয়ে আসতে লাগল গার্ড-এর কামরার দিকে।

গার্ড তো ওদের দেখেই অবাক।

রাধা তখন ওর ভাষায় ওদের বিপদের কথাটা সব খুলে বলল গার্ডকে।

গার্ডসাহেব দারুণ খুশি হলেন রাধার কথা শুনে। ওদের সাহসের প্রশংসা করে বললেন, এ গাড়ি তো ভরতপুরের আগে থামবে না। তারপর একেবারে জয়পুর। কারণ গাড়িটা মেল হয়ে যাচ্ছে আমেদাবাদ। আবু রোডে হয়তো একবার থামলেও থামতে পারে।

রাধা বলল, "ভরতপুরে গাড়ি থামলেও অবশ্য ওদের লাভ নেই। কেননা সেখানে এই শীতে রাত কাটাবে কোথায়? তবে জয়পুরে ওর অনেক চেনাজানা আছে। কাজেই কোনও অসুবিধা হবে না।"

তা গাড়ি ভরতপুরেও থামল না, কোথাও না। একেবারে থামল জয়পুরে।

রাত তখন একটা। গার্ডসাহেবের বদান্যতায় কেউ ওদের কাছে টিকিট চাইল না। ওরা সেই কনকনে শীতে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসে রইল সারারাত। ইতিমধ্যে ওদের ব্যাপারটা চাউর হয়ে গেছে চারদিকে। তাই ভোরবেলা ইনস্পেক্টর আনন্দের ফোন পেয়ে স্থানীয় থানার কর্তাব্যক্তিরা এসে এই ঘরটির ব্যবস্থা করে দিল ওদের জন্য। সকালবেলা ইনস্পেক্টর আনন্দও এসে দেখা করলেন ওদের সঙ্গে এবং বললেন, "তোমাদের বন্ধুরা জয়পুরেই এসেছে। এমনকী, পঞ্চুর কৃপায় তাঁর যে প্রাণরক্ষা হয়েছে সে-কথাও বললেন। তিনি এও বললেন, প্রত্যেককে ধরে আনার দায়িত্বও নাকি তাঁর। অতএব এই সকালেই তেড়ে একটা ঘুম দিয়ে নিলাম দু'জনে। সবে ঘুম থেকে উঠছি। বিপদের মেঘ কেটে গেছে। আর এখন ভাবনা কী?"

বিলু বলল, "হার্মাদের কথা শুনেছিস তো?"

"না।"

"একেবারে শেষ অবস্থায়। আর বেঁচে উঠতে হচ্ছে না ওকে।"

বিলুর কথা শেষ হতেই ইনস্পেক্টর আনন্দ এলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "গুড মর্নিং। ক্যায়সা সারপ্রাইজ দিয়া ম্যায়নে?"

সবাই আনন্দে করমর্দন করল আনন্দের।

বিলু ভোম্বল তখনই ছুটে গেল ধর্মশালা থেকে ওদের মালপত্তরগুলো নিয়ে আসতে।

আনন্দ বললেন, "তোমরা যদি এখন কোথাও যেতে চাও তো আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। আমরা শুধু হাওয়ামহল আর অম্বরের কেল্লাটা দেখব। ও আমরা অটো কিংবা বাসেই দেখে নিতে পারব। তারপর কাল সকালে চলে যাব যোধপুর।"

"সমঝ গিয়া। জয়শল যা না চাতে হো তুম। লেকিন উধার তুমহারা যানা ঠিক নেহি। ঘরের ছেলে এবার ঘরে ফিরে যাও না বাবা।"

বাবলু বলল, "সে দেখা যাবে।"

ইনস্পেক্টর আনন্দ চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন কোনও অসুবিধা হলে সঙ্গে-সঙ্গে থানায় খবর দিতে। ফোন নম্বরটাও দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিলু ভোম্বল ফিরে এল। আর তারও কিছুক্ষণ পরে ওরা যথারীতি তৈরি হয়ে ঘরে তালা দিয়ে স্টেশনের বাইরে এল। জয়পুর শহরটা একবার ঘুরে দেখতে হবে তো? এখানে রাধাই ওদের গাইড।

প্রথমেই ওরা ঠিক করল অম্বর দেখতে যাবে। তাই স্টেশনের সামনে মির্জা ইসমাইল রোড থেকে প্রাইভেট বাসে এগিয়ে চলল বড়ি চৌপটের দিকে। আসতে-আসতে সুসজ্জিত পথঘাট এবং ঘরবাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল সকলে। এসব কী দেখছে ওরা? এ কি কোনও রূপকথার দেশ?

বাবলু বলল, "জয়পুর হচ্ছে রাজস্থানের রাজধানী। সেকালেও ছিল। একালেও। তারও আগে ছিল অম্বরে। অর্থাৎ, যেখানে আমরা যাচ্ছি। রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ নিজের জয়কে ঘোষণা করবার এবং সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ১৭২৭ সালে এই নতুন রাজধানী গড়ে তুলে এর নাম দেন জয়পুর। শাস্ত্র, জ্যোতিষ, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে তাঁর অনুরাগ এবং অধিকার দেখে ঔরঙ্গজেব তাঁকে একেরও অতিরিক্ত অর্থাৎ সোয়া মনে করতেন। তাই তাঁকে 'সোয়াই' উপাধি দিয়েছিলেন। নবগ্রহের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই শহরটিকে ন'টি আয়তাকার পরিকল্পনায় বিন্যস্ত করেন জয়সিংহ। তাঁর এই পরিকল্পনাকে রূপদান করেছিলেন এক তরুণ বাঙালি, বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। গোলাপি রঙের মার্বেল পাথরে তৈরি এই শহরটিকে বলা হয় পিঙ্ক সিটি।"

কী সুন্দর শহর। এত বাস, অটো, ট্যাক্সি; তা সত্ত্বেও এই শহরের বুকের ওপর দিয়ে চলেছে উটের সারি। বিচিত্র সব সাজপোশাক ও অলঙ্কার-পরা রাজস্থানি মেয়েরা।

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "জয়পুরে না এলে যে কী দারুণ ঠকতাম আমরা।"

রাধা বলল, "আমি তো এর আগেও এসেছি। তাই রীতিমত এই শহরটাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

বাবলু বলল, "১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টও এই পিঙ্ক সিটির সৌন্দর্য দেখে একে ভালবেসে ফেলেছিলেন। ম্যাক্স লেরনার আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আই

হ্যাভ সিন জয়পুর অ্যান্ড নাউ আই ক্যান ডাই।"

বিলু বলল, "তুই এতসব তথ্য পাস কোথা থেকে বল তো ?"

বাবলু বলল, "এখন আসলে-নকলে মিলিয়ে বাজারে অনেক গাইডবুক বেরিয়ে গেছে। তা ছাড়া বিভিন্ন স্টেটের ওপর ছোট-ছোট সরকারি গাইডবুকও আছে অনেক। কাজেই জানার চেষ্টা করলে এগুলো জানা কোনও কঠিন ব্যাপারই নয়। কোথাও যেতে গেলে আগে পাঁচটা বই পড়ে বা শুনে সেই জায়গার ওপর একটা ধারণা করে নিতে হয় বা সবকিছু জেনে নিতে হয়।"

ভোম্বল বলল, "অত ভাই হবে না আমার দ্বারা। তবে তুই হচ্ছিস একটা চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। যখন যা দরকার হবে তোর কাছ থেকেই জেনে নেব আমরা।"

বাস এসে বড়ি চৌপটে যেখানে থামল সেখানে চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে হাওয়া মহল। এর ছবি তো বিভিন্ন বই এবং পত্রপত্রিকায় সকলেই দেখেছে ওরা। তাই চিনতে অসুবিধা হল না। যাই হোক, এইখানেই অম্বর যাওয়ার সরকারি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। একেবারে ফাঁকা বাস। রাধা সেই বাস দেখিয়ে ওদের বলল, "চলো।"

জয়পুর থেকে অম্বর মাত্র ১১ কিলোমিটারের পথ। ভাড়া দেড় টাকা করে। ওরা কিছু সময়ের মধ্যে শহর ছেড়ে পাহাড়ের কোলে আর-এক ছোট্ট জনপদ, অম্বরে এসে হাজির হল। এক বিস্তীর্ণ জলাশয়ের (মাওয়াটা হ্রদ) গায়ে পাহাড়ের মাথায় অম্বরের কেল্লা। দেখামাত্রই মনটা যেন কীরকম হয়ে গেল। এখানে বাস থেকে নামতেই আর-এক প্রস্থ চা-জলখাবার হয়ে গেল ওদের। তারপর শুরু করল পর্বতারোহণ। আগে পঞ্চু।তার পেছনে রাধা সহ পান্ডব গোয়েন্দারা। ওঠার মুখেই ওরা দেখতে পেল সারি-সারি কতকগুলো চিত্রবিচিত্র হাতি রঙিন পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে পিঠে হাওদা নিয়ে অপেক্ষা করছে যাত্রী বহনের আশায়। ওদের দেখেই মাহুতরা এগিয়ে এসে বলল, "বাবু, হাতি !"

পান্ডব গোয়েন্দাদের খুবই ইচ্ছে হল হাতির পিঠে চেপে পাহাড়ে ওঠার। কিন্তু গোল বাধল পঞ্চুকে নিয়ে। অমন সাহসী পঞ্চু অথচ হাতি দেখে তার কী ভয়।সে কিছুতেই উঠবে না হাতির পিঠে। আবার হাতিরও হাবভাব দেখে মনে হল কুকুর বইতে তার ভয়ানক আপত্তি। অবশ্য দোষও নেই। এটা আসলে মর্যাদার ব্যাপার। মানুষের অনেক বুদ্ধি।তারা সেবা করে, যত্ন করে, পালন করে। তারা সবাইকে চরায়। কাজেই তাদের খাতির করে বওয়া যায়। তাই বলে একটা কুকুরকে ? না, না। জানোয়ার বলে কি তার সম্মান নেই ?

যাই হোক। মাহুত অনেক কষ্টে বাবা-বাছা করে হাতির গায়ে পিঠে গালে হাত বুলিয়ে হাতিকে রাজি করাল। তারপর এক এক করে তুলে দিল সবাইকে হাতির পিঠে।

ওরা উঠে বসতেই হাতি দুলকি চালে দুলে-দুলে চলল। আরও যাত্রিবাহী হাতির দল এগিয়ে এল কয়েকটা। এদের মধ্যে একদল বাঙালিও আছেন। আর যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই ফরেনার।হাতির পিঠে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে পঞ্চুকে দেখে সকলের কী হাসি রাস্তার কুকুরগুলো তো চিৎকারে মাত করে দিল। পাহাড়ের গাছের ডালে বসে থাকা বানর ও হনুমানগুলো পঞ্চুকে দাঁত খিঁচোতে লাগল।হাতিটাও মাঝেমধ্যে গরগর করতে লাগল রাগে। অর্থাৎ,আমি তো জানতুম এইরকমটা হবে। এখন এই টিটকিরি কি সহ্য হয় ? কী ঝকমারি রে বাবা !

পঞ্চু অবশ্য ভ্রুক্ষেপও করল না কাউকে। দিব্যি বাবলুর কোল ঘেঁষে বসে হাতির পিঠে চেপে পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে লাগল।

এর পর একটা বাঁক নিয়ে কেল্লার ওপরে উঠে এল ওরা। রাজকীয় ব্যাপারস্যাপারগুলো সেই আমল থেকেই করা ছিল। তাই হাতিকে এখানে লোক তোলবার জন্য নত হতে হয় না। প্রাচীরের মতো একটা চওড়া উচ্চস্থানের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আর লোকজন সেইখান দিয়ে নামা-ওঠা করে।

এই যাত্রায় বাবলু ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়েছিল। তাই চটপট ছবি তুলে নিল কয়েকটা। হাতির পিঠে পঞ্চু। এ-ছবি পাবে কোথায় ? ওরা ছবি তুলে কেল্লার প্রশস্ত চত্বরে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহের হাতে তৈরি এই দুর্গ। চলতি কথায় আমের।প্রথম দিকে কাছাওয়া বংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। আকবর এই কাছাওয়া বংশের রাজকন্যা যোধাবাঈকে বিয়ে করেছিলেন। পরে একসময় দুর্ধর্ষ মিনারা অম্বর অধিকার করে নেয়। তার আগে এরা ধুন্দর রাজ্য শাসন করত। অম্বর অধিকারের পর ধুন্দরের রাজধানীও করল অম্বরকে। এরা এমনই শক্তিশালী ছিল যে, এদের হাতে অস্ত্র থাকলে এরা অজেয়। বছরের একটিমাত্র দিন, অর্থাৎ দোলের দিন এরা অস্ত্র ধরত না। আকবরের সেনাপতি তখন মানসিংহ। তিনি দেখলেন মিনাদের পরাস্ত করার এর চেয়ে ভাল দিন আর নেই। তাই ওইদিন অতর্কিতে প্রচুর মুঘল সৈন্য নিয়ে তিনি আক্রমণ করলেন ধুন্দর রাজ্য। মিনারা অস্ত্র ধরল না। তারা অনুরোধ জানাল শুধু একটা দিন অপেক্ষা করতে। কিন্তু মানসিংহ সে-অনুরোধ রাখলেন না। আর মিনারাও ধর্মের নামে অস্ত্র ধরল না সেদিন।ফলে ধুন্দর মুঘলদের অধিকারে চলে গেল। এই রাজ্যে অম্বিকেশ্বর শিবের মন্দির ছিল। সম্ভবত সেই থেকেই অম্বর নামের উৎপত্তি। অন্য মত, কুশ বংশের রাজা অম্বরীশ এই রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। সে যাই হোক, প্রথম মানসিংহ অম্বরে যে প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন তা শেষ করেন সোয়াই জয়সিংহ, প্রায় একশো বছর পরে। এই সেই অম্বর কেল্লা।

বাবলুরা এদিক-সেদিক ঘুরেফিরে শিশমহলে ঢোকার জন্য কাউন্টারে এল টিকিট কাটতে। তিন টাকা করে টিকিট। পঞ্চুকে অবশ্য ঢুকতে দিল না ভেতরে। ও তাই চুপচাপ বসে-বসে হাতি দেখতে লাগল।

ওরা শিশমহল ঘুরে যশোরেশ্বরী কালী দেখতে এল। কী চমৎকার মন্দিরের কারুকার্য।আর তেমনই অপূর্ব ওই কালীমূর্তি। মন্দিরের দেওয়ালে কলার কাঁদিওয়ালা দুটো কলাগাছ খোদাই করা আছে। মন্দিরের প্রবেশপথের দরজায় আছে একটি রুপোর দশমহাবিদ্যার খোদিত মূর্তি।দেওয়ালের একটি ছবি ওদের দারুণ আকর্ষণ করল। রুদ্রমূর্তি এক কালী। তাঁর দশটি মুখ, দশটি হাত, দশটি পা। সামনেই অমরকুণ্ড। মন্দিরটি সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরের।

এখানকার পূজারিরা সবাই বাঙালি। তাঁদের মুখেই শোনা গেল এর ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দীতে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর থেকে এই কালীকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। প্রবাদ আছে মথুরায় কংস কারাগারে যে শিলাখণ্ডটির ওপর দেবকীর সন্তানদের কংস আছাড় দিয়ে মেরে ফেলত, প্রতাপাদিত্য মথুরা গিয়ে ওই পাথরটি নিয়ে আসেন এবং যশোরেশ্বরীর কালীমূর্তি নির্মাণ করেন।

বাবলুরা মুগ্ধ চোখে সেই কালীকে দর্শন করে ধন্য হল। কত লোকে নারকেল মিষ্টি ফুল ইত্যাদি নিয়ে দেবীর পুজো দিচ্ছে। ওরা সেসব কিছু আনেনি। তাই পয়সার বাক্সে ষোলো আনা ফেলে দিয়ে মন্দিরের বাইরে এল। আসবার সময় কালো কষ্টিপাথরের অষ্টভুজা দেবীর কাছে ওরা প্রার্থনা করল ওরা যেন নির্বিঘ্নে মরুভ্রমণ করে বাড়ি ফিরতে পারে। আর কোথাও কোনও ঝামেলা না হয়।

অম্বরের কেল্লা দেখে ওরা চলল জয়গড় দেখতে। জয়গড় অনেকেই দেখে না। কিন্তু যেহেতু পাণ্ডব গোয়েন্দারা জেনে গেছে এই জয়গড়ে কান্দাহার থেরানির একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে কান্দাহার থেরানির গোপন ঘাঁটি আছে, তাই জয়গড় না দেখে কি ওরা

ফিরতে পারে ? অতএব চলল । জয়গড়ের পথ জঙ্গলাকীর্ণ । তবে লোকজন যায় । পথঘাট ভাল । কিন্তু বড্ড খাড়াই । নীচে থেকে ওপরে ওঠার মুখে যে বাঁকটা আছে তার পাশ দিয়েই রাস্তা । ওরা সকলে মহোৎসাহে হইহই করতে-করতে জয়গড় কেল্লার দিকে এগিয়ে চলল । খাড়াই উঠতে ওদের যত কষ্ট, পঞ্চুর ততই সুবিধা । সে দিব্যি হেলেদুলে সবার আগে তুরতুর করে এগিয়ে চলল তাই ।

একেবারে পাহাড়ের মাথায় উঠেই দেখল দারুণ মজবুত একটি কেল্লা । কেল্লার ভেতরে বেশ বড় ধরনের মিউজিয়ামও আছে একটি । এই কেল্লায় ঢুকতে দর্শনী লাগল ছ' টাকা করে । কেন যে লাগল তা অবশ্য পরে বুঝল । সব কিছু দেখেশুনে ।

কেল্লার ভেতরে মিউজিয়াম ছাড়াও ছিল এক বিশাল পানি ট্যাঙ্কি । আর যা ছিল তা অম্বর গিয়ে যারা না দেখেছে তারা সবাই ঠকেছে । ওই কেল্লার মাথার ওপরে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম কামান জয়বান, যেটি মিলিটারিরা সব সময় পাহারা দিচ্ছে । আসলে এই দুর্গটি এখন সেনাবাহিনীর ঘাঁটি । সে কী বিশাল কামান ! এটি তৈরি হয়েছিল সোয়াই জয়সিংহের আমলে, ১৬৯৯ থেকে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে । এর মুখটা ১১ ডায়ামিটার ১১ ইঞ্চি । ২২ মাইল দূর পর্যন্ত এই কামান দাগা যেত । এবং একটি ফায়ারিং-এর জন্য বারুদ লাগত ১০০ কিলো ।

জয়গড়ে গিয়ে দুর্গের একটি নির্জন অংশে বসে ওরা চারদিকের পর্বতমালা দেখতে লাগল । রাজপুত বীরেরা যখন অশ্বখুরধ্বনিতে এইসব জায়গা ভরিয়ে রাখতেন তখন না জানি এর কী শোভা ছিল !

বিলু বলল, "সেই গোপন সুড়ঙ্গটা কোথায় কাছে, আমাদের একটু খুঁজে দেখলে হয় না ?"

বাবলু বলল, "তাতে লাভ ? তা ছাড়া সুড়ঙ্গ তো পাহাড়ের মাথায় থাকবে না । থাকবে নীচে । কোনও বনবাদাড়ে । ওসব ঘুরতে যাওয়ার সময় কোথায় ? শেষকালে কেঁচো খুঁড়ে সাপ বেরোলে হয়তো এমন অবস্থা হবে যে, তখন আসল জায়গাতেই যেতে পারব না আমরা ।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক । ঝামেলার চরম হয়েছে । এখান থেকে নেমে আগে বাসে উঠি চলো ।"

রাধা বলল, "জগৎশিরোমণির মন্দির দেখবে না তোমরা ? ওটা কিন্তু খুব ভাল, দেখবার আছে ।"

বাবলু বলল, "তা হলে চলো । অম্বরে এসে এটাই বা বাকি থাকে কেন ?"

ওরা পাহাড় থেকে নেমে বাঁ দিকে বাজারের পাশে একটা সরু গলির মধ্যে যখন ঢুকল তখন দেখল নিগ্রোদের মতো কালো লম্বা একজন লোক ওদের অনুসরণ করছে । ওরা দেখল কিন্তু কিছু বলল না । কীই-বা বলবে ? কে এই লোক ? কেনই বা পিছু নিয়েছে ওদের ?

যাই হোক, ওরা জগৎশিরোমণি মন্দিরে ঢুকে দেবদর্শন করল । চিতোরে মীরাবাঈ যে-রাধাকৃষ্ণ মূর্তির আরাধনা করতেন এটি সেই মূর্তি । মানসিংহ নিয়ে এসেছেন এখানে ।

বাবলু বলল, "যদি কখনও সম্ভব হয় তা হলে একবার অন্তত আমার মাকে আমি নিয়ে আসব এখানে ।"

রাধা বলল, "জরুর নিয়ে আসবে । তোমার যখন মন আছে ভাইয়া, মা তখন নিশ্চয়ই আসবেন ।"

জগৎশিরোমণি মন্দির দেখে অভিভূত হয়ে গেল ওরা । মানসিংহ তাঁর ছোট ছেলে জগৎসিংহের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৫ শতকে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দির তৈরি করেছিলেন ।

ওরা মন্দির থেকে যখন বেরিয়ে এল সেই লোকটি তখনও দূর থেকে ওদের অনুসরণ করছে ।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো ?"

বাবলু বলল, "কে জানে ?"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "লোকটাকে কিন্তু জয়গড়েও আমি দেখেছি ।"

বাবলু বলল, "আমার যন্তর রেডি । গোলমাল পাকালেই অক্কা পেয়ে যাবে বাছাধন ।"

লোকটি গোলমাল করল না । ওরা যখন বাস স্ট্যান্ডে এসে বাসে উঠল, সে তখন একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আর-একজন লোকের সঙ্গে ফিসফিস করে কী কথা বলতে লাগল ।

বাস ছাড়ল একটু পরেই । এবং কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল বড়ি চৌপটে । তারপর জয়পুর স্টেশনে যখন এল তখন দেখল ওদের দরজার সামনে একটা বড় চামড়ার সুটকেস নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রেখা ।

রাধা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রেখাকে । হারানিধি ফিরে পেয়েছে তো, তাই দু' বোনের সে কী আনন্দ ।

রাধা জিজ্ঞেস করল, "মা কি তবিয়ত ক্যায়সা ?"

রেখা বলল, "ভালই ।"

ওরা সবাই ঘরে ঢুকে প্রথমে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসল ।তারপর স্নান সেরে রেলের ক্যান্টিনেই খেয়ে নিল মাংস-ভাত ।কী চমৎকার রান্না । খাওয়াদাওয়ার পর তেড়ে একটা ঘুম । সে ঘুম ভাঙল বিকেল চারটেয় ।

আর সময় নষ্ট নয় । তাই আবার সাজ-সাজ রব । ওরা আবার তৈরি হয়ে চা-টা খেয়েই চলল জয়পুরের বিখ্যাত গোবিন্দজির মন্দিরে । স্টেশন থেকে আবার ওরা বড়ি চৌপটে এল । তারপর পায়ে হেঁটেই শিরে দেওরি বাজারে গিয়ে দেখে নিল হাওয়ামহল, যন্তর মন্তর আর গোবিন্দজির মন্দির । ঔরঙ্গজেবের রোষবহ্নির হাত থেকে রক্ষা করতে এই গোবিন্দজিকে বৃন্দাবন থেকে জয়পুরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সোয়াই জয়সিংহ । মন্দিরে বসে অনেকটা সময় কাটাল ওরা ।সন্ধ্যারতি দেখল । তারপর যোধপুর যাওয়ার জন্য বাস স্ট্যান্ডে এসে খোঁজখবর নিতে লাগল ।কাল খুব ভোরে অর্থাৎ পাঁচটার সময় যোধপুরের বাস । ভাড়া একান্ন টাকা ।

ওরা আর দেরি না করে ফিরে এল স্টেশনে । তারপর রিটার্নিং রুমে বসে পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ।

রাধা এর আগে যোধপুর জয়শলমির গেছে ।রেখা যায়নি । পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তো এই প্রথম । ভগবানের কৃপায় ওরা আর কোনও বাধা-বিপত্তিতে পড়েনি । তবে অম্বরের সেই রহস্যময় লোকটির কথা ওদের বারবারই মনে হতে লাগল । লোকটি কে ? কেনই বা ওদের পিছু নিয়েছিল ? ও কি থেরানির লোক ? তা হলে তো বিকেলবেলাও দেখা যেত লোকটিকে । কিন্তু না । লোকটি আর আসেনি ।

॥ ৮ ॥

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ওরা চলল বাস ধরতে । বাস স্ট্যাণ্ড স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে । তাই তিনটে রিকশা করতে হল । একটাতে বাবলু বিলু, ভোম্বল, একটাতে বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু, আর একটাতে রাধা, রেখা দুই বোন । বাস একদম ফাঁকা । যোধপুরের তো কোনও যাত্রীই নেই । যা দু-একজন আছে তারা সবাই আজমিরে নেমে যাবে । তবু সরকারি বাস, যাত্রী থাক বা না-থাক ছাড়তে তো হবেই । ছাড়লও একসময় ।

বেলা প্রায় একটা নাগাদ ওরা যোধপুর পৌঁছল । পাহাড়ের ওপর যোধপুরের বিখ্যাত মেহেরনগড় কেল্লাটা ওরা অনেক দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল । এখন বাস থেকে নামামাত্রই চোখের সামনে কেল্লাটা যেন মূর্ত হয়ে উঠল । এই মরুনগরী যোধপুরও ওদের চোখে যেন এক স্বপ্নের দেশ বলে মনে হল । থরমরুর বুকের ওপর এ এক আশ্চর্য নগরী । উটের সারি প্রশস্ত রাজপথের

ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে। চলেছে রঙিন ঘাগরা পরা সালঙ্কারা রাজপুতানির দল। এ ছাড়াও মোটর-বাস ইত্যাদি তো আছেই। আছে রিকশা। ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

বাস থেকে নেমে একটা রিকশা নিয়ে ওরা স্টেশনে এল। রেলস্টেশনের কাছেই একটি সরাইখানায় গিয়ে উঠল ওরা। নাম যশোবন্ত ধর্মশালা। দেহাতিরাই বেশি ওঠে। অনেকগুলো ঘর আছে এখানে। তাই একটা-না-একটা পাওয়া যায়। চারদিকে ঘর। মাঝখানে উঠোন। ঘরের ভাড়া তিন টাকা করে। ওরা দুটো ঘর ভাড়া নিল। একটাতে মেয়েরা থাকবে। একটাতে থাকবে ছেলেরা। ধর্মশালার কেয়ারটেকার ক্যাম্পখাট ভাড়া দেয়। দু' টাকা করে সেই ক্যাম্পখাট ভাড়া নিয়ে চমৎকার শোবার ব্যবস্থা করে ফেলল ওরা।

এই অঞ্চলের লোকেরা খুব রুক্ষ প্রকৃতির। ম্যানেজার অত্যন্ত খিটখিটে। পঞ্চুকে দেখেই তো প্রথমে খ্যাঁক করে উঠেছিল। পরে অবশ্য থাকতে দিতে রাজি হয়েছিল ওদের।

যাই হোক, ওরা ঘরে মালপত্তর রেখে সরাইখানার পেছন দিকে গিয়ে ইঁদারার জলে স্নান করে সকলে। তারপর বেশ ঝরঝরে হয়ে চলল দুপুরের খাওয়া খেতে। অজস্র হোটেল আছে এখানে। তবে কি না এসব খাবার বাঙালিদের উপযুক্ত নয়। এখানকার হোটেলে খেয়ে ওদের মনে হল এসব দেশে এলে একমাত্র মিষ্টি আর ফল ছাড়া কোনও কিছুই খাওয়া উচিত নয়।

খাওয়াদাওয়ার পর বাবলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল জয়শলমিরের টিকিট কাটা।"

বিলু বলল, "সে কী! যোধপুর দেখবি না?"

"নিশ্চয়ই দেখব। আমরা জয়শলমির যাব কাল রাতের গাড়িতে। আজ বিকেল এবং কাল সারাদিনে আমাদের খুব ভালভাবে যোধপুর দেখা হয়ে যাবে। এখানে যা-যা দেখার আছে তা আমি গাইডবুক দেখে নোট করে এনেছি। এখন রাধার কাজ হল আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

ওরা রেলস্টেশনে এসে শুনল বুকিং অফিসটা ঠিক স্টেশনে নয়। চৌরাস্তার দিকে একটু এগিয়ে ডান দিকে। ওরা মনের আনন্দে সেখানেই গেল। গিয়ে ফর্ম ফিলাপ করে কাউন্টারে দিতেই পেয়ে গেল সাতটা টিকিট।

সেই টিকিট পকেটে নিয়ে ওরা চলল আট কিলোমিটার দূরে মাণ্ডোর গার্ডেনে। শহরের এক প্রান্তে মাণ্ডোর এক রমণীয় উদ্যান। যাওয়ার সময় দু' কিমি দূরে মহামন্দিরে গিয়ে হাজার স্তম্ভ বিশিষ্ট মহামন্দিরটিও দেখে নিল ওরা। তারপর মাণ্ডোর। এই পথেই ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দে বুলকরাও পরিহারের তৈরি ৫৬০০০ ঘনফুট জলের বালসমন্দ হ্রদ। ওরা বালসমন্দ গেল না। গেল না বৃহত্তম কৈলানা হ্রদ দেখতেও। মাণ্ডোরে ঢুকে সেখানকার মন্দিরের শিল্পকলা দেখেই অভিভূত হয়ে গেল। মাণ্ডোর একসময় মাড়োয়ারের রাজধানী ছিল। মিটারগেজ লাইনের একটি স্টেশনও আছে মাণ্ডোরে। এখানে যোধপুরের রাজাদের বেশ কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। এখানকার 'হল অব হিরোজ'ও দেখবার মতো একটিমাত্র পাথরকে কুঁদে ১৬ টি বিশাল মূর্তি এমন এক অভিনব পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে, যা দেখলে বিস্ময় লাগে। তবে বানরের উপদ্রব এখানে খুব বেশি।

সন্ধে পর্যন্ত মাণ্ডোর উদ্যানে দলে-দলে লোক আসে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা নির্ভয়ে বসে রইল তাই। তারপর একসময়ে যখন উঠব-উঠব করছে, তখন দেখল অম্বর কেল্লার সেই দীর্ঘদেহ নিগ্রোর মতো কালো লোকটি দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে-খেতে লক্ষ রাখছে ওদের দিকে।

ভোম্বল বলল, "বাবলু, লুক দ্যাট।"

বাবলু বলল, "দেখছি।"

"কী ব্যাপার বল তো?"

বিলু বলল, "আমাদের ফলো করছে। মনে হচ্ছে এর পিছু নিলেই আমরা কান্দাহার থেরানির দর্শন পেয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "থেরানি যেরকম ডেঞ্জারাস তাতে ওর লোকেরা তো আমাদের ওইভাবে ফলো করবে না। ওরা হয় মেরে ফেলবে অথবা তুলে নিয়ে যাবে।"

"তাই কি?"

"নিশ্চয়ই। আবার এমনও হতে পারে আমরা নিজেরাই ওদের হাঁ-মুখে যাচ্ছি বলে হয়তো কিছু করছে না। এখন আমাদের ভয় শুধু রাধা আর রেখাকে নিয়ে।"

রেখা বলল, "ম্যায়নে তো শোচ লিয়া ও মেরে সামনে আয়ে তো মারে চপ্পল বদমাশ কো। পঞ্চু হামারা সাথ রহে তো ম্যায় কিসিকো নেহি ডরেঙ্গে। ও বারবার মেরা মটকা গরম কর দেতা।"

রাধা বলল, "অ্যায়সা উলখাট লাগায়গা ও সাথ-সাথ সমঝেগা ম্যায় লেড়কি নেহি, ইলেকট্রিক হিটার।"

বাবলু বলল, "শাবাশ। তবে আর এখানে বসে থাকা কেন? চলো, ফেরা যাক।"

রহস্যময় লোকটি কিন্তু ওদের আক্রমণও করল না, অনুসরণও করল না। যেমন ছিল তেমনই বসে রইল। আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল একটু-একটু করে।

ওরা আবার একটা শেয়ারে অটো নিয়ে যোধপুর ফিরল সন্ধের পর। তারপর আলো-ঝলমল মরুনগরীর পথে-পথে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ ধরে।

বাবলু বলল, "যোধপুর কী জন্য বিখ্যাত বল দেখি?"

বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "তুমিই বলো।"

"চপ্পল, উটের চামড়ার ব্যাগ আর চুনরি শাড়ির জন্য।"

ওরা রাজপথের দু'পাশে সাজানো দোকানগুলোয় চপ্পল এবং রং-বেরঙের নকশা-কাটা জুতো, রাজস্থানি সাজপোশাক ইত্যাদি দেখল। দরদামও করল।

এক সময় বিচ্ছু বলল, "এইরকম রংচঙে বাহারি পোশাক একটা কিনব বাবুলদা?"

বাবলু বলল, "শখ থাকলে কিনতে পারিস। তবে মরুভ্রমণের জন্য আমরা যে পোশাক নিয়ে এসেছি তা কিন্তু জয়শলমির গিয়ে পরতে হবে।"

বিচ্ছু বলল, "সে তো পরব। তবে কাল সকাল থেকে এইগুলো পরে যদি এখানকার পথেঘাটে ঘুরে বেড়াই তা হলে মন্দ কী?

"তা হলে কেন।"

বাচ্চু বলল, "বিচ্ছু কিনলে আমিও কিনব।"

অতএব যে যার পছন্দমতো এক সেট করে কিনে নিল।

রেখা তো টাকার গোছা এনেছে। দেখাদেখি ওরাও কিনতে ছাড়ল না। এর পর ওরা বড় একটি দোকানে গিয়ে খাস্তা কচুরি আর মিষ্টি খেল পেট ভরে। খেয়েদেয়ে রাত ন'টার আগেই সরাইখানায়। ঠিক হল কাল সকালে ওরা ঘুমার ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে থেকে যে ট্যুরিস্ট বাস ছাড়ে সেই বাসে চেপে যোধপুর ঘুরবে।

রাধা বলল, "কোনও দরকার নেই। ওরা যা দেখাবে তা আমরা পায়ে হেঁটেই দেখে নিতে পারব। শুধু উমেইদ ভবনটা একটু দূরে। ওইটাই দেখা হবে না। আর মাণ্ডোর তো আমরা দেখেই এসেছি। আমরা কাল সকালে একটা অটো নিয়ে চলে যাব। মেহেরনগড় দুর্গ দেখতে। ওখান থেকে যশোবন্ত থারা।"

ওরা আর গল্প না করে শোয়ার ব্যবস্থা করল। শস্তার ঘর, তাই লাইট নেই। বাইরে উঠোনে চারদিকে অবশ্য আলো আছে। নেই শুধু ঘরগুলোতে। সেইজন্য ওরা মোমবাতির ব্যবস্থা করেছিল। বাতি জ্বেলে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে যে যার ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়ল। আপনা থেকে বাতি যখন নেভে তখন নিভবে।

বেশ গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা।

শেষরাতে একটা প্রচণ্ড হট্টগোলে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। পঞ্চু তো বারবার লাফিয়ে-লাফিয়ে দরজার কাছে যাচ্ছে আর কুঁই-কুঁই করছে। বাবলু টর্চ জ্বেলে পঞ্চুর কাছে গিয়ে ওকে শান্ত করল। রাধা রেখা দু'জনেই ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলতে যাচ্ছিল পাশের ঘরে। বাচ্চু,বিচ্ছু বারণ করল। ওরা তবুও ওদের কথা না শুনে একেবারে বাইরে না বেরিয়ে দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে দেখতে লাগল ব্যাপারটা কী।

বাবলুরাও ঠিক ওইভাবেই দেখল। ওরা দেখল সরাইখানার বিস্তীর্ণ চত্বরে আট-দশজন দুর্ধর্ষ লোক উটের পিঠে চেপে ঘুরছে। আর ওদের ভয়ে কিছু লোক ছুটোছুটি করছে চারদিকে। ওরা ঘুরছে-ফিরছে,এক-একজন লোককে ধরে মারছে,আর টাকা-পয়সা যা পারছে কেড়ে নিচ্ছে।

এই প্রশস্ত জায়গাটায় রাতটুকুর মধ্যে কখন যে এত যাত্রী এসে গদি-বিছানা ভাড়া নিয়ে কম্বল-মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল তা কে জানে? রাত্রে ওরা যখন এসেছিল তখন তো সবই ফাঁকা ছিল।

বিলু চাপা গলায় বলল, "এরা নিশ্চয়ই মরুদস্যু?"

"হ্যাঁ। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কান্দাহার খেরানির দলের লোক ছাড়া এমন সাহস কার হবে? এত শিগগির যে এদের দর্শন পাব তা কিন্তু ভাবিনি।"

ভোম্বল বলল, "এরা কি আমাদের খোঁজেই এখানে এসেছিল?"

"মনে হয়, না। তা হলে ঘরে-ঘরে ঢুকে সার্চ করত।"

বাবলু বলল, "লোকগুলোকে তো একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

বিলু বলল, "তা তো উচিত। কিন্তু কীভাবে কী করবি? এই অবস্থায় ওদের আক্রমণ করতে যাওয়া মানেই নিজেদের বিপন্ন করা। এই যে এত লোক ভয়ে ছুটছে এরাও তো শক্তিশালী কম নয়। সবাই ছুটোছুটি না করে এখনই যদি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে তো পালাতে পথ পায় না বাছাধনরা।"

এমন সময় হঠাৎ এক মর্মান্তিক দৃশ্য। এক রাজস্থানি গ্রাম্য মহিলা তার শিশুপুত্রটিকে বুকে জড়িয়ে একাকাণে বসে ভয়ে জড়সড় হয়ে থরথর করে কাঁপছিল। তার লোকটিকে একটু আগেই মারধোর করেছে দস্যুরা। শিশুটি হয়তো সেই কারণেই পরিত্রাহি চিৎকার করছে। এমন চিৎকার যে, তাকে থামানো যাচ্ছে না।

দস্যুরা এবার বিরক্ত হয়ে সেই মহিলাটির কাছে গিয়ে তার বুক থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিল। যেই না নেওয়া, বাবলু অমনই 'পঞ্চু' বলে লাফিয়ে পড়ল সেইখানে।

দস্যুটা তখন শিশুটির নড়া ধরে ছুঁড়ে দিয়েছে।

বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে ওর মা ওকে ধরতে যাওয়ার আগেই বাবলু লুফে নিল শিশুটিকে। চোখের পলকে যেন ম্যাজিক ঘটে গেল।

উটের পিঠে চাপা লোকটি তখন সজোরে একটা লাথি কষিয়েছে বাবলুকে। বাবলু পড়ে যাওয়ার আগেই শিশুটিকে বিলুর হাতে দিয়ে দস্যুটার পা ধরে এমন একটা হ্যাঁচকা টান দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়ল সে। যেই না পড়া, পঞ্চু অমনই ছুটে গিয়ে তার বুকের ওপর উঠেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

দস্যুটার নড়বারও ক্ষমতা রইল না আর। সেও মুখ দিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল 'গ্যাঁ গ্যাঁ' করে।

উটের পিঠে চাপা আর-একজন দস্যু তখন ছুটে গিয়ে শিশুটির মাকে ধরেছে। ইচ্ছেটা এই যে, নিয়ে পালাবে। ওর মতলব বুঝতে পেরেই বাবলু পিস্তল বের করল। শিশুটির মা তখন দারুণ বাধা দিচ্ছে দস্যুটাকে।

হঠাৎ শব্দ হল 'গুড়ুম'।

উঠের পিঠে বসে-থাকা অসুরটা একটি গুলিতেই কলাগাছের মতো ঢিপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

মহিলাটি ছুটে গিয়ে তার শিশুকে বুকে নিল।

জনতার ভয় তখন ভেঙে গেছে। এবার তারা সাহস পেয়ে হইহই করে ছুটে এল একজোটে। তারপর সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই দস্যুটার ওপর। বিলু তখন এগিয়ে গিয়ে মেইন গেটটা বন্ধ করে দিয়েছে। পালাবার আর রাস্তা নেই। উটের পিঠে চেপে জনতার মার খেয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল দস্যুগুলো। কিন্তু সরাইখানা-ভর্তি লোকের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? তাই অল্প সময়ের মধ্যে ধরা পড়ল সবাই। তারপর সে কী মার!

রাধা,রেখা,বাচ্চু,বিচ্ছু সবাই বেরিয়ে এসেছে তখন ঘর থেকে।

দেখতে-দেখতে ভোর হয়ে এল। থানা থেকে পুলিশ এল দলে-দলে। কীভাবে যে খবর পেল বা কে খবর দিল তা কে জানে? জনতার প্রহারে অর্ধমৃত লোকগুলোকে গাদা করে তুলে নিল একটা গাড়িতে। সেইসঙ্গে গুলিবিদ্ধ মৃত লোকটিকেও।

সরাইখানার উঠোনে একটা চায়ের দোকান আছে। সেই দোকানের গরম চুল্লিতে তখন বড়-বড় কেটলিতে জল ফুটছে টগবগ করে। যে-লোকটি চা করছে সে ভাঁড়ে করে গরম চা এনে খেতে দিল ওদের।

বাবলুরা তৃপ্তি করে খেল।

তারপর সকাল হতেই যখন আকাশ আলো করে সূর্যোদয় হল, ওরা তখন মুখ-হাত ধুয়ে দিব্যি সেজেগুজে ঘরে তালা লাগিয়ে চলল ফোর্ট দেখতে, মেহেরনগড়ে। সরাইখানার ভেতরে-বাইরে তখন ওদের নিয়ে দারুণ হইচই পড়ে গেছে।

সরাইখানা থেকে স্টেশন এক মিনিটের পথ। ওরা স্টেশনের সামনে বড় রাস্তায় এসে প্রথমেই একটু নাস্তা করতে বসে গেল। কেননা কখন ফিরবে তার তো কোনও ঠিক নেই। আবার কোথায় কী পাবে তাও জানা নেই। তাই বড় রাস্তার ধারে একটি দোকানের বেঞ্চে বসে গরম-গরম শিঙাড়া আর জিলিপির অর্ডার দিল। এখানে নাস্তা মানেই এইসব। শিঙাড়া, কচুরি, আলুবড়া, পকৌড়া, অমৃতি আর জিলিপি।

খেয়েদেয়ে মনে জোর এনে ওরা একটা অটো ভাড়া করল। তারপর জনবহুল রাজপথের ওপর দিয়ে পাহাড়ের কোলে একটি সরু গলির মুখে এসে নামল।

রাধা বলল, "কিতনা লাগেগা?"

ড্রাইভার বলল, "যো দেওগি তুম।"

বাবলু একটা দশ টাকার নোট হাতে দিতেই দুটো টাকা ফেরত দিয়ে অটো নিয়ে চলে গেল লোকটি।

রাধাই এবার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওদের।

চারদিকের ঘিঞ্জি ঘরবাড়ির ফাঁক দিয়ে যেতে-যেতে ওরা বুঝতে পারল কেল্লা পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। আরও খানিকটা উঠতেই যোধপুর শহরের যে দৃশ্য ওরা দেখল, তা এক কথায় অনবদ্য। সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ছে। পঞ্চু তো ঘন-ঘন লেজ নাড়ছে আনন্দে। রাধা আর রেখার মুখ দিয়ে হিট ছবির একটি গানই বেরিয়ে এল। বিলু,ভোম্বল,বাচ্চু,বিচ্ছুরও মুখে যেন কথার খই ফুটছে। শুধু বাবলুই যা নীরব।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার বাবলু? এখানে এসে তুই হঠাৎ এমন বেকায়দা মেরে গেলি কেন? তোর আনন্দ কোথায় গেল?"

বাবলু বলল, "উঁ। ন-না। কী আর এমন।"

বিলু বলল, "তুই হচ্ছিস আমাদের হিরো। পাণ্ডব দ্য গ্রেট। যা খেল দেখালি তুই!"

বাবলু বলল, "আমি আর কী খেল দেখালাম বল? খেল তো দেখাল ভূতে।"

"তার মানে ?"

"তার মানে একটা ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটে গেল-বলতে পারিস।"

"যাঃ। ভুতুড়ে ব্যাপার কেন হবে ? ওই মুহূর্তে দস্যুটাকে যেভাবে গুলি করলি তুই, তা অনেক আচ্ছা-আচ্ছা লোকও পারে না। আর ছেলেটাকেও ওইভাবে লুফে নেওয়া কি যার-তার কাজ ?"

"ছেলেটাকে লুফে নেওয়ার কৃতিত্ব অবশ্য আমি রাখি। আমার মাধ্যমে ভগবান ওকে রক্ষা করেছেন। না হলে মরে যেত। তবে গুলিটা কিন্তু আমি করিনি।"

সবাই এমন চমকাল যে, তা বলবার নয়।

"সে কী ! তুই করিসনি ? তোর হাতেই তো পিস্তল ছিল।"

"ছিল। কিন্তু আমি করিনি।"

"তা হলে করল কে ?"

"ওইটাই তো রহস্য। আমি ট্রিগার টেপার আগেই গুলি এসে লেগেছিল দস্যুটার গায়ে।"

বাচ্চু, বিচ্চু বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই ওদের দলের কেউ তোমাকে মারতে গিয়ে ওকে মেরেছে।"

"না। গুলি যেভাবে লেগেছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে ওটা পাকা হাতের টিপ। তা ছাড়া শুধু-শুধু ওরা ওদের দলের লোককে মারবে কেন ?"

ওরা ঘটনার মারপ্যাঁচে নির্বাক হয়ে পথ চলতে লাগল।

একটু সময়ের মধ্যে ওরা কেল্লার সামনে এসে দাঁড়াল। এইখান থেকেই অনতিদূরে পাহাড়ের অন্য অংশে যশোবন্ত থারা দেখা যাচ্ছে। ওরা কেল্লার ভেতরে ঢুকে পাঁচ টাকা করে টিকিট কাটল। সত্যিই দেখবার মতো দুর্গ একটি। রাও যোধা ১৪৫৯ সালে এটি তৈরি করেন। দুর্গে ঢোকার মুখে ফতে পোল ও জয় পোল নামে দুটি বিশাল তোরণ পার হল ওরা। এই তোরণের বুকে কামানের গোলার দাগ এখনও প্রকট হয়ে আছে। দুর্গটি লম্বায় ৪৫৭ মিটার এবং চওড়ায় ২২৮ মিটার। নাটকের দৃশ্যের মতো সাজপোশাক পরা সরকারি গাইডরা এমনভাবে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল ওদের, যা দেখে মনে হল এ-যুগে নয়, ওরা সেই রাজপুত রাজাদের আমলেই চলে এসেছে বুঝি। এমন চমৎকার ব্যবস্থা কোথাও নেই। ওরা পঞ্চুকে গেটের কাছে বসিয়ে রেখে দুর্গের মোতিমহলে ঢুকল রাজকীয় বৈভব দেখতে। এখানকার দুর্গের ভেতর প্রাসাদের জালির কাজ সুরসিংহর তৈরি মোতিমহল, অভয়সিংহর ফুলমহল দেখবার মতো। মোতিমহলের দরবার ৮০ কিলো ওজনের সোনার জল দিয়ে পেন্টিং করা। যদিও সামান্য অংশ অসম্পূর্ণ। তবু তা দেখবার মতো। বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে দেখল সব।

এর পর পঞ্চুকে নিয়ে চলল দুর্গের উপরিভাগে ছাদের ওপর মুঘল যুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের প্রায় শতাধিক কামান দেখতে। কামান দেখে ওরা দুর্গের মাথায় পশ্চিম দিশায় চামুণ্ডা মন্দিরে গেল দেবীদর্শন করতে।

এখানকার পূজারিরা খুব ভাল। যাওয়ামাত্রই ওদের প্রসাদ দিলেন। পরিচয় জিজ্ঞেস করে নানারকম কাহিনী শোনালেন। তারই মধ্যে এমন একটি কাহিনী শোনালেন, যা ইতিহাসে নেই। শুধু লোকশ্রুতিতে কয়েকজনের মুখে-মুখে বেঁচে আছে। কাহিনীটা এই : যোধপুর দুর্গের অধিপতি তখন মাড়োয়ারের রাজা মালদেব। একদিন তিনি দুর্গের মাথায় বসে আছেন, এমন সময় একটি চিঠি তাঁর হাতে এল। কী সাঙ্ঘাতিক চিঠি, চিঠিতে হুমায়ুনের স্বাক্ষর। চিঠিটা বারবার পড়লেন তিনি। একজন বিদ্রোহী সেনাপতির ষড়যন্ত্রে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তাই এই মুহূর্তে তিনি মালদেবের কাছে যোধপুর দুর্গে আশ্রয় চান। খবর গেল রানির কাছে। হুমায়ুনের ব্যাপারে রানির সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে হবে বইকী। কেননা রানি চন্দ্রাবতী মুঘলদের ওপরে মোটেই সন্তুষ্ট নন। বিশেষ করে হুমায়ুনের ওপর। কেননা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারদেব, বাবরের সঙ্গে যখন রানা সঙ্গর ঘোর যুদ্ধ হয় তখন সঙ্গের হয়ে বাবরের সঙ্গে তিনি লড়েছিলেন। বীরের মতো যখন তিনি চাঘাটি মুঘলদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, মুঘলরা তখন যুদ্ধের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাঁকে। তা সেই বাবরের পুত্র হুমায়ুনকে আশ্রয় দেওয়ার কোনও যুক্তিই নেই। তা ছাড়া মুঘলদের বিশ্বাস নেই। আজ বিপদের দিনে তারা এখানে আশ্রয় নিয়ে এখানকার সব কিছু দেখেশুনে গিয়ে পরে যে একদিন অতর্কিতে এসে হানা দেবে না, তাই বা কে বলতে পারে ?

যাই হোক, রানির মনোভাব বুঝে মালদেব হুমায়ুনকে পাত্তা দিলেন না। হুমায়ুন তখন ভীষণ মরুভূমির মধ্যে জয়শলমিরের কাছে অমরকোটের দরবারে ঠাঁই পেলেন। অমরকোটের রাজা আশ্রয় দিলেন তাঁকে।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই শের শাহ্‌র কাছ থেকে দূত এল একদিন। হুমায়ুন ছিলেন শের শাহ্‌র ঘোর শত্রু। তাই সেই শত্রুকে যে আশ্রয় দেননি মালদেব সেই আনন্দে শের শাহ্‌ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠালেন মালদেবের কাছে। সেইসঙ্গে শের শাহ্‌র পুত্র সেলিমের সঙ্গে মালদেব-কন্যা মৃগনয়নার বিবাহ প্রস্তাবও ছিল।

চিঠি পেয়ে সন্ধি তো দূরের কথা, রেগে আগুন হয়ে উঠলেন মালদেব। উনি সঙ্গে-সঙ্গে দূতকে জানিয়ে দিলেন, শের শাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি যে হুমায়ুনকে আশ্রয় দেননি তা তো নয়। আসলে মুঘলদের প্রতি বিরাগই এর কারণ। শের শাহ্‌ রাজপুত রাজাদের চেনেন না বলেই এইরকম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কাজেই রাজকন্যার সঙ্গে সেলিমের বিবাহ তো হবেই না, উপরন্তু তিনি এমনই অপমানিত যে, যুদ্ধের ময়দানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

দূত-মুখে খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন শের শাহ্‌। একজন ক্ষুদ্র রাজার এমনই ঔদ্ধত্য যে, তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করে ? তার ওপরে আবার যুদ্ধ চায় ? যাই হোক, তিনি বহুকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে হেসে বললেন, "আচ্ছা সময়ে এর জবাব দেব।"

এর পর ব্যাপারটা ভুলেই গেল সকলে। শের শাহ্‌ আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

প্রায় মাসতিনেক পরে হঠাৎ একদিন প্রায় হাজারদশেক সৈন্য নিয়ে শের শাহ্‌ মাড়োয়ারের ভীষণ মরুভূমির ওপর উপস্থিত হলেন। আগেভাগে কোনও খবর না দিয়ে আচমকাই এলেন তিনি যাতে মালদেব বিভ্রান্ত হন। যাই হোক, পাঠান সৈন্যরা যখন অনেক কষ্ট সহ্যের পর মরুভূমির নিদারুণ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে যোধপুর সীমান্তে উপস্থিত হল তখন দেখল রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে মালদেব তাঁর সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে তাঁদের আগেভাগেই রণভূমে এসে হাজির হয়েছেন।

আসলে মালদেব জানতেন, শের শাহ্‌ একদিন-না-একদিন অতর্কিতে হানা দেবেনই। তাই তিনি ভেতরে-ভেতরে তৈরি ছিলেন। তাঁর সৈন্য-সংখ্যা কম হলেও রণকৌশলে তারা ছিল পাঠানদের চেয়েও অনেক নিপুণ। তাই যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই যোধপুর কেল্লার ওপর থেকে উড়ে-আসা ঝাঁকে-ঝাঁকে তীরের আঘাতে আর রাজপুত বীরদের হাতে শত-শত পাঠান সৈন্য মরতে লাগল। শের শাহ্‌ প্রমাদ গনলেন। এখন না পারেন পালাতে, না পারেন যুদ্ধ করতে। কেননা এ-যুদ্ধ সেধে তিনিই বরণ করেছেন।

যাই হোক, যুদ্ধ যখন চরমে, তখন হঠাৎ একদিন শেষরাতে মালদেব যখন সেনাবাহিনীর শিবিরের আশেপাশে তাঁর একজন দেহরক্ষীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন হঠাৎই লক্ষ করলেন একজন পাঠান সৈন্য অন্য এক শিবিরের দিকে চুপিচুপি যাচ্ছে। দেখামাত্রই তিনি রক্ষীকে আদেশ দিলেন, "যেভাবেই হোক ওকে ধরে আনা চাই।"

রাজাদেশে রক্ষী ছুটল পাঠানকে ধরতে। পাঠানও ভয়ে পালাল। ততক্ষণে গোলমাল শুনে অন্য সৈন্যও সব এসে হাজির হয়েছে।

একটু পরেই রক্ষী যখন ফিরে এল তখন সে একা।

মালদেব বললেন, "কী হল ? লোকটাকে ধরতে পারলে না ?"

রক্ষী নতমস্তকে বলল, "না, মহারাজ।"

"অপদার্থ।"

মালদেব একজন সেনাপতিকে ডেকে বললেন, "এটাকে এখনিই আমার তাঁবুর পেছনে নিয়ে গিয়ে বধ করো।"

রক্ষী ভাবতেও পারেনি এই অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। সে তখন বন্দি হওয়ার আগে কাঁপা-কাঁপা হাতে কী যেন একটা কাগজ মালদেবকে দিল। সেটা পড়েই স্তব্ধ হয়ে গেলেন মালদেব। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "আমি এর প্রাণদণ্ড মকুব করলাম।" বলে কাউকে কোনও কথা না বলে নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

ব্যাপারটা যে কী হল, কেউ তা বুঝতেও পারল না।

অনেক পরে মালদেব তাঁর প্রধান-প্রধান সেনাপতিদের ডেকে বললেন, "শুনুন, রাজপুত জাতির পতনের দিন এগিয়ে এসেছে। তাই আর বীরের মতো যুদ্ধ না করে কাপুরুষের মতো বশ্যতা স্বীকার করাই ভাল। অতএব এখনই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হোক।"

মালদেবের মুখে এইরকম কথা শুনে সেনাপতিরা স্তব্ধ। তাঁবুর মধ্যে বালির ওপর একট সুচ পড়লেও তখন শব্দ হবে বুঝি।

প্রধান সেনাপতি রানা কুম্ভ বললেন, "এ কী বলছেন আপনি মহারাজ ! শের শাহ্‌ তো হেরেই বসে আছেন। তা ছাড়া আপনার মতো বীরের মুখে এই কথা। আমরা ভুল শুনছি না তো ?"

মালদেব রক্ষীর আনা সেই কাগজখানি কুম্ভর হাতে তুলে দিলেন। রানা কুম্ভ সেটা পড়ে তো কাঁপতে লাগলেন থরথর করে। তারপর কয়েকজন সেনাপতির কাছে গিয়ে থুঃ থুঃ করে থুতু দিলেন তাদের গায়ে।

সেই চিঠিতে যা লেখা ছিল, তার মর্মার্থ হল, মালদেবের সেনাবাহিনীর মধ্যে বেশ কয়েকজন মালদেবের দাম্ভিকতার জন্য ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই তাঁরা শের শাহ্‌কে জানিয়েছিলেন শের শাহ্‌ যদি তাঁদের জীবন এবং ধনসম্পত্তি রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞা করেন, তা হলে তাঁরা যুদ্ধের সময় শের শাহ্‌র হয়ে যুদ্ধ করতে পারেন। সেই প্রস্তাব সমর্থন করে শের শাহ্‌র স্বাক্ষরিত কাগজটি, যা কিনা পাঠান সৈন্যটি রাজপুত সেনাদের দিতে এসেছিল। এবং যে-কাগজটি ধস্তাধস্তি করে কেড়ে নিতে গিয়েই পাঠান সৈন্যকে ধরেও ধরতে পারেনি মালদেবের রক্ষী। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই কাগজটি সে বুদ্ধি করে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

রানা কুম্ভ বললেন, "মহারাজ, যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু এই কলঙ্কের ভাগি আমরা সবাই হব কেন ? এখন মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। আপনি এবারের মতো সকলকে ক্ষমা করুন। শুধু একবার আমাদের সুযোগ দিন, এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়ার।"

মালদেব বললেন, "বেশ দিলাম। এখন যা করলে ভাল হয় তা করুন আপনারা।"

এর পর পাঠানদের সঙ্গে রাজপুতদের যে কী ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল তা ইতিহাসে লেখা না থাকলেও মরুভূমির হলুদ বালি লাল হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বেঁচে শের শাহ্‌ শুধু বলেছিলেন, "বাপ রে, এক মুষ্টি ভুট্টার জন্য (যোধপুরে তখন ভুট্টা ছাড়া অন্য কোনও ফসল উৎপন্ন হত না) আমি আর-একটু হলেই হিন্দুস্থানের আধিপত্য হারিয়েছিলাম।"

গল্প শুনে অভিভূত পাণ্ডব গোয়েন্দারা পূজারিকে প্রণাম করে দুর্গের অনতিদূরে যশোবন্ত থারা দেখতে চলল। মহারাজ যশোবন্ত সিংহর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিধবা পত্নী শ্বেত পাথরের এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করান। যোধপুর রাজাদের বংশপঞ্জিও এখানে উৎকীর্ণ আছে।

ওরা যখন ঘুরে-ঘুরে সব দেখছে, তখন হঠাৎ একজন বিদেশিনী দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের। বিদেশিনীর মুখের দিকে তাকালে যেন চোখ ফেরানো যায় না। যেমন অপূর্ব মুখশ্রী, তেমনই ডিমের কুসুমের মতো গায়ের রং। বয়সও কম। বয়স খুব জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে। সাগরপারের নীলনয়না যাকে বলে ঠিক তাই। বিদেশিনী প্রথমেই বিস্কুট আর কেক খাইয়ে আলাপ জমালেন পঞ্চুর সঙ্গে। তারপর এদের সকলকে একটা করে চকোলেট খাইয়ে ক্যামেরায় ফোটো তুললেন। সবশেষে পঞ্চুকে আদর করে বললেন, "ইজ ইট ইয়োরস ? প্লিজ টু সি ইট, মাচ, ভেরি মাচ। এনিওয়ে, হোয়্যার ফ্রম আর ইউ ?"

বাবলু বলল, "ফ্রম বেঙ্গল। মে উই নো হোয়্যার ফ্রম আর ইউ ?"

"ফ্রম কানাডা।"

"হোয়্যার আর ইয়োর আদার কম্প্যানিয়নস ?

"নান্ এলস্ উইথ মি। অ্যালোন, অল অ্যালোন আ'অ্যাম হিয়ার।"

"ইজ ইট সো ? হাউ স্ট্রেঞ্জ ! অল অ্যালোন ফ্রম সাচ এ ডিস্ট্যান্ট ফরেন কান্ট্রি ?"

"ইয়েস। দ্যাটস সো। হিয়ার অ্যা'অ্যাম টু ট্যুর ইণ্ডিয়া।"

"মে উই নো ইয়োর গুড নেম ?"

"মাইন। মাইন ইজ মিস লর্না। আ'ইল স্টার্ট ফর জয়শলমির বাই টুনাইটস্ ট্রেন। ও'ন্ ইউ লাইক টু বি দেয়ার ?"

"ইয়েস। বাই অল মিন্স।"

লর্না মিষ্টি হেসে বাবলুকে বললেন, "ভেরি গুড। অ্যান্ড সো উই হোপ টু মিট এগেন। ও'ন্ট দ্যাট ? বাই। এ ভেরি হ্যাপি গুড বাই।" বলে চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেকক্ষণ তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে মোটরচলা পথে নীচে নামতে লাগল। ওরা যখন পাহাড়ের নীচে নামল তখন বুঝতে পারল সম্পূর্ণ উলটো দিকে চলে এসেছে ওরা। যাই হোক, নীচে নেমেই একটা অটো করে ফিরে এল সরাইখানায়। এর পর দুপুরের খাওয়া সেরে বিকেলবেলা কাছাকাছি পার্ক-টার্কগুলো ঘুরে সন্ধে হতে-না-হতেই চলে এল স্টেশনে। যদিও ট্রেন সেই রাত নটায়, তবুও সরাইখানার অন্ধকারে বসে থাকার চেয়ে আলো-ঝলমল স্টেশনে থাকা অনেক ভাল।

স্টেশনেই দেখা হয়ে গেল লর্নার সঙ্গে। বাবলু কফি অফার করল। লর্না না করলেন না। বাচ্চু, বিচ্চু রাধা রেখার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কফি খেলেন। যথাসময়ে ট্রেন এল। দৈবের কী অদ্ভুত যোগাযোগ। ওদের পাশাপাশি একই বগিতে বার্থ পড়েছিল লর্নার। ট্রেনে উঠে প্রথমেই তাই যে যার জায়গা পছন্দ করে নিল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল আর বাচ্চু, বিচ্চু, রেখা মুখোমুখি তিন থাকের ছ'টি বার্থ বেছে নিল। আর সাইডের দুটি লোয়ার আপার বার্থ নিল রাধা ও লর্না। লর্না যদিও ওদের চেয়ে বয়সে বড়, তবুও দারুণ আলাপ জমে গেল ওদের সঙ্গে। শুধু লর্না নয়, এই বগিটাই সাহেবসুবোয় ভর্তি। এইভাবে বিদেশি যাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে ট্রেন-ভ্রমণ ওদের জীবনে এই প্রথম। ওদের বারবারই মনে হতে লাগল, ভারতে নয়, ওরা লন্ডন, প্যারিস কিংবা কানাডায় ট্রেন ভ্রমণ করছে বুঝি। সুন্দর। কী আশ্চর্য সুন্দর এই রেলযাত্রা। মিটারগেজ লাইনের সুসজ্জিত ট্রেন ঠিক সময়ে ছেড়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল। ওরা সবাই যে যার বার্থে শুয়ে পড়লে পঞ্চু বাবলুর পায়ের কাছে শুয়ে ওদের মালপত্তর পাহারা দিতে লাগল। বাবলু মনে-মনে চিন্তা করল এখনও পর্যন্ত কোনও বিপত্তি

যখন নতুন করে কিছু ঘটেনি, তখন বিপদের মেঘ নিশ্চয়ই কেটে গেছে।

বাবলুর মনোভাব বুঝতে পেয়ে অলক্ষ্যে বসে ভগবানও বুঝি মৃদু হাসলেন একটু। মনে-মনে বললেন, নিতান্তই ছেলে-মানুষ তোরা। ঠিক আছে, যা। আমি তোদের সঙ্গে আছি।"

॥ ৯ ॥

খুব ভোরে ওরা যখন জয়শলমিরে ট্রেন থেকে নামল তখন দলে-দলে লোক এসে ছেঁকে ধরল ওদের। এরা সব হোটেল ও লজের মালিক বা দালাল। স্টেশনে ওয়াগন, অটো, জিপ, উটের গাড়ি, সবই আছে ওদের সঙ্গে।

মাঙ্কি ক্যাপে কান পর্যন্ত ঢাকা একজন সুদর্শন যুবক এগিয়ে এসে ওদের বলল, "আরে বাঙালি ভাই, তোমাদের থাকার জন্য তো আমার লজ আছে। ভাটিয়া লজ। আমার নাম রাহুল ভাটিয়া। সব বাঙালি থাকে আমার ওখানে। কোনও অসুবিধা হবে না, এসো।"

রাধা বলল, "আমরা আগেরবার ছিলাম হোটেল ডেজার্টে।"

ভাটিয়া রাধার একটি হাত ধরে বলল, "ঠিক আছে। এবার আমার লজে তো একবার ওঠো।"

শুধু বলার অপেক্ষা। রাধার নরম হাতে গরম থাপ্পড় তখন ঠাস করে পড়েছে ভাটিয়ার গালে। বলল, "বদতমিজ, তুমনে মেরে হাত পর হাত কিউ লাগায়া?"

ভাটিয়া গালে হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, "ও। আ'অ্যাম সরি সিস্টার। বুরা মাত সমঝো মুঝে। চলো উঠো।"

"অ্যায়সা গলতি কভি না হোনা চাহিয়ে।"

বাবলু বলল, "যাকগে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন চলুন তো, আপনার লজেই উঠব আমরা।"

ভাটিয়ার জিপ ওদের নিয়ে চলল শহরের দিকে। যেতে-যেতেই ওরা এই অপূর্ব দুর্গ শহরের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। হবে নাই-বা কেন? মন্দির, কেল্লা, প্রাসাদ আর গৌরব-কাহিনী নিয়েই তো জয়শলমির। হলুদ রঙের চুনাপাথরে তৈরি কেল্লা, ঘরবাড়ি আর হলুদ বালির শোভায় জয়শলমির হচ্ছে গোল্ডেন সিটি। ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই ভাটি রাজপুত রাওয়াল জয়শল এই দুর্গের পত্তন করেন। নগরী তখন দুর্গের মধ্যেই ছিল। এখন তো বাইরেও ঘরবাড়ি হয়েছে অনেক। বিশাল থরের বুকে এ এক আশ্চর্য আরব্য রজনীর দেশ। ওরা ধনুকের মতো বাঁকা পথ ধরে ত্রিকূট পাহাড়ের গায়ে সেই বিখ্যাত কেল্লার পাশ দিয়ে জমজমাট বাগদাদ নগরীর মতো বাজারের কাছে ভাটিয়া লজে এল।

জিপ থেকে নামতেই একদল বাঙালি যুবক হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, "কী ভাই, কেল্লা দেখতে এসেছ নাকি? তবে খুব সাবধান, এই লোকটির ফাঁদে যেন পোড়ো না।"

বাবলু বলল, "কেন?"

"এই রাহুল ভাটিয়া হচ্ছে একটি পাক্কা শয়তান। এর কাজই হল ভোর-ভোর উঠে স্টেশন থেকে বাঙালি যাত্রী দেখলেই তাদের বাংলায় মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে ধরে আনা। তারপর নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বধ করা। লোককে জামা-কাপড় ছাড়তে সময় দেয় না। ঘ্যান-ঘ্যান করে জিপের বুকিং করিয়ে ঘোরাতে নিয়ে যায়। পার টিকিট সত্তর টাকা। তারপর যখন ঘুরিয়ে আনে তখন যাত্রীরা বুঝতেও পারে না তারা কী ঠকানটাই না ঠকল বা কী দুর্লভ দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত হল।"

কথাবার্তা যা হচ্ছিল তা ভাটিয়ার সামনেই। ভাটিয়া তো রেগে আগুন হয়ে বলল, "বাঙালিবাবু মুখ সামলে কথা বলবে। তুমি যদি ট্যুরিস্ট না হতে তো তোমার লাশ আমি পৌঁছতে দিতাম না দেশে।"

বাঙালি যুবকরা সোদপুর থেকে এসেছে। বলল, "আমরাও দলে নেহাত কম নই রে। মরবার আগে তোকেও আমরা যমের বাড়ি পাঠাতে জানি। যাওয়ার আগে এখানকার থানায় তোর নামে রিপোর্ট লিখিয়ে তবে যাব। দিনের পর দিন সকলের চোখের সামনে ঘুঘু তুই ট্যুরিস্টদের কী করে ব্ল্যাকমেল করিস সেটা জানিয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "এতে ব্ল্যাকমেলের কী আছে আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

"শোনো তবে, এই যে দেখছ পাহাড়ের ওপর কেল্লাটা, এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত কেল্লা। এর আশপাশে কয়েকটা হাবেলি আর গড়সিসর নামে একটি জলাশয় ছাড়া কিছুই দেখার নেই। বাকি যা দেখার আছে সেটা হল মরুভূমি। সাম সন্দ। এই কেল্লা, বা আর যা কিছু তা ঘন্টাখানেক সময় নিয়ে পায়ে হেঁটেই দেখা যায়। মরুভূমি দেখতে গেলে যেতে হয় সূর্যাস্তের সময়। সবাই তাই যায়। জিপের ভাড়া কুড়ি টাকা। আর এই লোকটা নতুন যাত্রীদের কাছ থেকে সত্তর টাকা করে ভাড়া নিয়ে এই কেল্লার আশপাশে এ-গলি সে-গলি করে বারবার চক্কর দিয়ে এই সামান্য পায়ে হাঁটার পথটুকু এমন ভাবে ঘোরায় যাতে লোকে ভাবে কতই না ঘুরলুম। অর্থাৎ, সাম সন্দ ছাড়া পঞ্চাশ টাকা। সামও নিয়ে যায়। কিন্তু ওই একই সময়ে। অর্থাৎ, বেশি ভাড়া দিয়েও লোকে সূর্যাস্তের দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গে যাত্রীদের এমনভাবে ব্ল্যাকমেল করে যে, তারা কোনও কিছু চিন্তা করার আগেই জবাই হয়ে যায়। পরে সব কিছু ঘুরে দেখে এসে যখন সময় টাবার জন্য নিজেরাই ঘোরাফেরা করে তখন বুঝতে পারে কী ঠকানটাই না ঠকেছে। আমরা দলে দশজন ছিলাম। এর পাল্লায় পড়ে আমাদের ৫০ টাকা করে ৫০০ টাকা চলে গেল ভাই। যারা ট্রেন থেকে নেমেই সব কিছু দেখে আবার রাতের গাড়িতে চলে যায়, তারা কিছুই টের পায় না। এদের খাতায় এদের ভদ্র ব্যবহারের মন্তব্যও লিখে রেখে যায় কেউ-কেউ। দেশে ফিরে অন্য বাঙালি বন্ধুদের বলে এদেরই খপ্পরে পড়তে। কিন্তু সব জেনেশুনে আমাদের কী অবস্থা বলো তো?

বাবলু বলল, "কী মিঃ ভাটিয়া, আপনি এইভাবে ট্যুরিস্টদের চিট করেন?

ভাটিয়া তখন রাগে গরগর করতে লাগল।

বাঙালি যুবকরা বলল, "তোমরা ছেলেমানুষ বলেই তোমাদের সাবধান করে দিলাম। তোমরা এখানে পায়ে হেঁটে সব কিছু ঘুরে দেখে বিকেলে অন্য জিপ ভাড়া করে সাম সন্দে চলে যেয়ো।"

বাবলু জিপের ভাড়া মিটিয়ে রাধার পরিচিত সেই হোটেল ডেজার্টে চলে গেল। মাত্র সত্তর টাকায় বেশ বড়সড় ঘর পেয়ে গেল একটা। ঘরে মালপত্তর রেখে ওরা সবান্ধব চলল কেল্লা দেখতে।

চৌমাথায় আসতেই দেখল চুড়িদার পায়জামা, কুর্তা আচকান পরা রাজস্থানিরা রাস্তায় চলাফেরা করছে দলে-দলে। চারদিকে বালির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহপালিত উট। গ্রামের মানুষরা খাটো ধুতি, দণ্ডিয়া আংরাখা, পটিয়া পাগড়ি, কেউ বা আঠারো গজি পোগা পোগরি পরে দোকানে বসে চা খাচ্ছে, বাজার-হাট করছে। চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিদেশি ট্যুরিস্টের দল। সোনা রোদে কাঁচা সোনার মরুপ্রান্তর যেন ঝলমল করছে। একদল রাজস্থানি মেয়ে রংবাহারি ঘাগরা, কাঁচুলি আর আড়াই গজি ওড়নি উড়িয়ে ওদের গা ঘেঁষে চলে গেল।

ওরা একটা দোকানে ঢুকল জলখাবার খেতে। গরম-গরম আলু-পরোটা আর চা খেতে-খেতে ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, এবার থেকে আমাদের একটা করে পাঁজি রাখতে হবে বাড়িতে। আর কখনও দিনক্ষণ না দেখে বেরোব না আমরা। কোনও তদন্তে এলে আমাদের একটাই ঝামেলা থাকে। কিন্তু বেড়াতে বেরিয়ে

দেখছি হাজারটা ঝামেলা।"

বাচ্চু,বিচ্ছু বলল, "এখন ভালয়-ভালয় স্যাণ্ড ডিউনস্‌টা দেখে আসতে পারলে বাঁচি।"

ওরা নাস্তা সেরে কেল্লায় প্রবেশ করল। প্রথমেই দুর্গের মূল দরোয়াজা সুরজ পোল পার হয়ে মহারাওয়াল প্রাসাদের কাছে এল। তারপর মেঘ দরবার। সূর্যমন্দির, জৈনমন্দির এক-এক করে দেখতে লাগল সব। দুর্গের ভেতরে লোকজনের ঘরবাড়ি দেখল। রাজার প্রাসাদ দেখল। দেখল তাজিয়া মিনার। কিন্তু দুর্গ দেখতে এসে সবচেয়ে মজা হল পঞ্চুকে নিয়ে। ঘাড় কাত করে এক চোখে ও এমনভাবে কেল্লা দেখতে লাগল যে, মনে হল এসব ওর কতদিনের চেনা।

রাধা ওর হাবভাব দেখে বলল, "কী ব্যাপার! তোমাদের পঞ্চু জাতিস্মর হয়ে উঠল নাকি। ও কি পূর্বজন্মে এখানে ছিল? এমন করছে যেন এখানটা ওর কতদিনের চেনা।"

বাবলু হেসে বলল, "তোমার ধারণাটা নেহাত অমূলক নয়। কখনও এখানে না এলেও জায়গাটা ওর কিন্তু সত্যিই চেনা।"

"কীরকম?"

"আসলে কিছুদিন আগেই এই জায়গার ওপর একটা তথ্যচিত্র ও টিভিতে দেখেছে। তাই এখানে এসে ও বুঝতে পারছে না এই জায়গাটা ওর কেন এত চেনা লাগছে! সেইজন্যই অমন করছে ও।"

বাবলুর কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল সকলে। এর পর ওরা কেল্লার বাইরে এসে গদি সাগর বা গড়সিসর দেখতে চলল। এটি হল প্রাচীনকালের তৃষিত মরুর বুকে এক শীতল জলের প্রাণের উৎস। কলসির পর কলসি মাথায় বসিয়ে এই পানিহারি থেকে রাজস্থানি মেয়েরা দূর-দূর থেকে এসে জল নিয়ে যায় ঘরে-ঘরে।

এর পর শহরের প্রধান যে-পথটি চলে গেছে পাকিস্তানের সীমানা অবধি, সেই-পথ ধরে ওরা এগিয়ে চলল হাবেলি দেখতে। ওদের দেখে এক রাজস্থানি ভিখারি দোতারার মতো কী একটা যন্ত্র বাজিয়ে সুর করে গান গাইতে লাগল। ওরা আট আনা চার আনা পয়সা দিতেই চলে গেল ভিখারিটা। এর পর ওরা সেলিম সিংহর হাবেলি, নাথমলজিকা হাবেলি আর পাটোয়ান-কি-হাবেলিতে এল প্রাসাদের শিল্পকর্ম দেখতে। এরকম সোনালি পাথরে অপূর্ব জালির কাজ সারা ভারতে কোথাও নেই।

স্থানীয় একজন ভদ্রলোক ওদের দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, "তোমরা জয়শলমির দেখতে এসেছ, খুব ভাল কথা। তবে শুধু এই কেল্লা আর সাম সন্দ নয়। এখানে আরও অনেক কিছু দেখার আছে। সেগুলোও দেখে নিয়ো।"

"আর কী কী দেখার আছে বলুন?"

"এই যেমন পাঁচ কিমি দূরে লোদুর্বার পথে অমর সাগর, ছ' কিমি দূরে রাজাদের সমাধিক্ষেত্র বড় বাগ। তা ছাড়া ১৭ কিমি দূরে লোদুর্বাতে অবশ্যই যেয়ো।"

"কী আছে সেখানে?"

"বাঃ, লোদুর্বাই তো ছিল রাওয়াল জয়শলের অতীতের রাজধানী। ওখানে জৈন মন্দিরে একটি কল্পতরু গাছ আছে। তার কাছে কেউ কিছু চাইলে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"

ভোম্বল বলল, "আমি তা হলে সেইখানে গিয়ে মরুদস্যু কান্দাহার থেরানিকে যাতে ভাল করে ট্রেনিং দিয়ে আসতে পারি তাই চাইব।"

ভদ্রলোক দারুণ রেগে গেলেন ভোম্বলের কথায়। বললেন, "তুম যো সমঝো ওহি করো। যাও, আগে বাড়ো।"

বাবলু বলল, "কী হল কী ভোম্বল? সবেতেই কেন ফর-ফর করিস তুই? যিনি যা বলেন তা কান পেতে শোন না? এইসব দর্শনীয় জায়গাগুলোর কথা তো গাইড বুক থেকে আমারও নোট করা আছে। শুধু লোদুর্বা কেন? আমার তো পোখরান, বারমেরও যাওয়ার ইচ্ছে আছে। তা ছাড়া কিরাডুতে গিয়ে গুপ্ত যুগের সোমেশ্বর মন্দির, এখান থেকে ৪০ কিমি দূরে ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক, ১১ কিমি দূরে উড ফসিল পার্ক সবই দেখবার ইচ্ছে আছে। তবুও তো আমি শুনছি।"

"উড ফসিল পার্ক!"

"হ্যাঁ। আঠারো কোটি বছর আগেকার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে এই থর মরুভূমির বুকে।"

ওরা আর বেশি না ঘুরে ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে আবার বাজারের কাছে চলে এল। এই পথেই বাস স্ট্যান্ড। এখান থেকে বারমের, পোখরান, যোধপুর, বিকানিরের বাস ছাড়ছে। বাস স্ট্যান্ড থেকে একটু এগিয়ে ভারী মনোরম দুর্গাকৃতি একটা সৌধ দেখতে পেল। তার মাথায় ছাতার মতো ছোট কী যেন। বাবলু একজনকে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী ভাই?"

লোকটি হেসে বলল, "শ্মশান।"

বাচ্চু,বিচ্ছু বলল, "আমাদের ভয় করে। শ্মশান দেখতে আমরা যাব না। অনেক ঘুরেছি। এখন ঘরে চলো।"

ওরা আর দেরি না করে হোটেলে ফিরল।

বিকেলবেলা ওরা মনের আনন্দে চলল স্যান্ড ডিউনস দেখতে। কেল্লার সামনে থেকে একটা জিপ ভাড়া করল ওরা। যাতায়াত দুশো টাকায় রফা হল। কথা হল, সাম সন্দে সূর্যাস্ত দেখে তবেই ওরা ফিরবে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মরুভূমি দেখতে যাবে বলে জিন্‌সের প্যান্ট শার্ট, রোদ আড়াল করা টুপি ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল। তাই পরে চলল সবাই। শুধু রাধা আর রেখাই যা একটু ব্যতিক্রম হল। ওরাও জঙ্গল কালারের জিন্‌স পরেছিল। কিন্তু শার্টের বদলে ছিল গরমের লাল গেঞ্জি। আর মাথায় কোনও টুপি ছিল না। রাধার চোখে ছিল গগল্‌স।

জয়শলমিরের ঘরবাড়ির আড়াল থেকে সরে আসতেই ওরা দিগন্তবিস্তৃত মরুবালুরাশি দেখতে পেল। তবে এইসব বালিতে মাটির ধূসর ভাবও আছে। যাই হোক, জিপ ওদের প্রথমেই নিয়ে গেল অমর সাগরে। সেখানকার পরিত্যক্ত জলাশয় ও জৈনমন্দির দেখার পর ওরা চলল সাম সন্দের দিকে। জয়শলমির থেকে সাম ৪২ কিমির পথ। এখানে বালিতে আর মাটির ভাগ নেই। বালি-বালি, শুধুই বালি। ধু-ধু করছে দিগন্তবিস্তৃত বালির ময়দান। কিছু সময়ের মধ্যেই সাম সন্দে এসে পৌঁছল ওরা।

জিপ থেকে নেমেই দিগন্তজোড়া উঁচু-নিচু বালির স্তর বা স্যান্ড ডিউনস দেখে মোহিত হয়ে গেল। এই জায়গাটা একটা ছোটখাটো মরূদ্যান মতো। খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি ছোট-ছোট ঘর দেখে খুব ভাল লাগল ওদের। এখানে চারদিকে রংবাহারি পোশাক পরা উটের সারি। ওদের দেখেই একদল বেদুইন ছুটে এল, "ওয়েলকাম বেঙ্গলি দাদা। ক্যামেল সাফারি করোগে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, ক্যামেল সাফারি তো করব। তবে তিন-চারদিনের জন্য নয়। মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য।"

ওদেরই বয়সী একটি ছেলে এসে বলল, "দাদাজি, তোমরা আমার উটে চাপো। আমার নাম সলোমন খাঁ। বাবার নাম ঈশা খাঁ। আমার উটে চাপলে ভাল সফর হয়ে যাবে। একদম মনপসন্দ হয়ে যাবে তোমাদের।"

বাবলু বলল, "বেশ। তোমার উটেই চাপব।"

একদল বাঙালি পরিবার সবে সফর শেষ করেছেন। তাঁরা বললেন, "কতক্ষণ ঘুরবে তোমরা ঘড়ি ধরে সেইটা আগে রফা করে নিয়ো। না হলে ভারী বদমাশ এরা। একেবারে ঠগ জোচ্চোর। পনেরোটা করে টাকা নিয়ে উটের পিঠে চাপাচ্ছে আর এক পাক একটুখানি ঘুরিয়ে এনেই নামিয়ে দিচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি ? তা হলে তো ভাল ব্যবসা শুরু করে দিয়েছ ভাই ? কতদূর থেকে কত অর্থব্যয় করে কত আশা নিয়ে ট্যুরিস্টরা আসেন আর তোমরা যদি তাদের এইভাবে ঠকাও সেটা তো ভাল কথা নয় ।"

সলোমন বলল, "না দাদা, ওদের কথা শুনবেন না । ওরা ঝুটা বাত বলছে ।"

"উঁহু । কোনও ট্যুরিস্ট কখনও এইরকম মিথ্যে কথা বলবে না । তারা বরং খুশি হলে তোমাদের প্রশংসাই করবেন । তা যাক । আমাদের মোট সাতটা উট লাগবে । কত করে নেবে ?"

"সাতটা উট কী করবেন ? একটাতেই তো দু'জনের হয়ে যাবে ।"

"জানি । তবু আমরা একটু সেপারেটলি বসতে চাই ।"

সাতটা উটের নাম শুনেই আরও সব উটওয়ালারা এসে ছেঁকে ধরল ওদের । একজন বলল, "আমার একটা উট লিয়ে লিন খোঁকাবাবু । এর নাম পাপ্পু । এ একজন ফিল্মস্টার আছে । রেশমা ঔর শেরা পিক্‌চার দেখা তুমনে ? এ পাপ্পু উসমে থা । একদম পক্ষিরাজ ঘোড়া । থর মরুর উট । আংরেজ লোকেরা বলে শিপ অব ডেজার্ট ।"

বাবলু বলল, "কোন উট যাবে না-যাবে তা আমার জানার দরকার নেই । সেটা তোমরাই ঠিক করবে । এখন বলো কত কী নেবে ?"

ওরা নিজেরা কথা বলে বলল, "টুয়েনটি ফাইভ রুপিজ করকে লাগেগা । এক দাম ।"

বাবলু বলল, "তাই দেব । ভাল করে ঘোরাবে কিন্তু । একদম ছোটাবে না । ধীরে-ধীরে বালির ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে । কেননা আমাদের তো চাপা অভ্যাস নেই । হয়তো বেসামাল হয়ে পড়ে যাব ।"

"ডরনেকা কোঈ বাত নেহি খোঁকাবাবু । তুম সব চুপচাপ বৈঠো ।"

উটগুলো ওদের নেওয়ার জন্য পা মুড়ে শুয়েই ছিল । ওরা এক-এক করে চেপে বসল উটের পিঠে । বাবলু বসতেই পঞ্চুও উঠে বসল ।

সলোমন পঞ্চুর কাছে গিয়ে বলল, "এ মিস্টার ! তুমকো উতারনে হোগা । তুম পয়দল চলো ।"

পঞ্চু বলল, "ভৌ ভৌ ।" অর্থাৎ কেন ? কুকুর বলে কি আমি ফেলনা ইয়ে নাকি ? বেশ করব চাপব ।

বাবলু বলল, "আচ্ছা বসে বসুক ।"

সলোমন হাসতে-হাসতে সরে গেল । উটও উঠে দাঁড়াল ।যেই না উট উঠল পঞ্চু অমনই ভয় পেয়ে লাফিয়ে নামল বালির ওপর । এক বাঙালি পরিবার তো ঢিপ করে পড়েই গেল উটের পিঠ থেকে । আসলে উট যখন ওঠে বা নামে তখন সাবধানে ছড়িদারের নির্দেশ মেনে কখনও সামনে কখনও পেছনে একবার ঝুঁকিয়ে দিলেই টালটা সামাল দেওয়া যায় । তারপর একেবারে উঠে দাঁড়ালে আর কোনও ভয়ের ব্যাপার থাকে না ।

যাই হোক, উটের সারি চলল লাইন দিয়ে মরুভূমির ওপর । কী আনন্দ । শুধু ওদের সাতটি উট নয় । আরও প্রায় দশ-বারোটি উট চলল ওদের সঙ্গে । ট্যুরিস্ট এখানে অনেক । এই দিগন্তজোড়া বালুরাশি দেখে সাহারা আর থর একই মনে হল যেন । তবে এই বিশাল মরুর বুকে দূরের ছোট-ছোট পাহাড়গুলো যেন সৌন্দর্যের হানি ঘটাতে লাগল । তা হোক । তবু ওরই মধ্যে ওরা যা দেখল তাতেই মন ভরে গেল ওদের ।

একটি বিশেষ জায়গা পর্যন্ত গিয়ে উট আর এগোল না । ট্যুরিস্টের দল ফিরে আসতে লাগল । সলোমন ওদের সঙ্গে ছিল । বাবলু বলল, "আমরা কিন্তু এখনই ফিরছি না । আরও একটু এগোব ।"

সলোমন আর গেল না । উটের মুখ ঘুরিয়ে আনার কায়দাটা ওদের একটু দেখিয়ে দিয়ে বলল, "জায়দা দূর মাত যা না । ইয়ে রেগিস্থান আচ্ছি জায়গা নেহি ।"

ওরা বলল, "না না, খুব বেশিদূর যাব না ।"

সলোমন একটা ডিউনসের ওপর বসে রইল । ওরা চলল ধীরে-ধীরে । এক-একজন এক একটি উটের পিঠে চেপে ওই রকম প্যান্ট-শার্ট-টুপি পরে যেন হিরো হয়ে উঠল । পশ্চিম দিগন্ত লাল করে সূর্য তখন একটু-একটু করে ডুবতে বসেছে । ওঃ, সে কী বিচিত্র রঙের খেলা । ধূসর বালির বুকে আগুনরাঙা রং যেন হোলি খেলছে । দেখতে-দেখতে সূর্য ডুবে গেল । সূর্যাস্তের শেষ রংটুকু তখনও মোছেনি আকাশের পট থেকে । উট চলেছে । ওরাও চলেছে । ফেরার কথা ওদের আর খেয়ালই নেই । বাবলু জোরে-জোরে আবৃত্তি করতে লাগল "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন / উত্তরেতে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন..."

ঢিসুম । ঢিসুম । ঢিসুম ।

পর-পর তিনটি গুলির শব্দে হতচকিত উটগুলো থমকে দাঁড়াল । ওরা বুঝি বাতাসে বিপদের গন্ধ পায় । পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিন্তু বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কী হল । এখানে গুলির শব্দ আসে কোত্থেকে ? সীমান্তে কি কোনও গোলমাল হচ্ছে ? কিন্তু সীমান্ত এখান থেকে অনেক দূরে । তা হলে ?

বাবলু বলল, " কী ব্যাপার বল তো ?"

বিলু বলল "কী আবার ? এরই মধ্যে ভুলে গেলি ? কোথায় এসেছি আমরা ?"

"বুঝেছি । আর যাওয়া নয় । ফিরে চল সব ।"

এমন সময় দেখতে পেল সন্ধ্যার আবছায়ায় কয়েকজন সাহেব সেই বালির ওপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছেন ।

ওরা উট নিয়ে তাঁদের দিকে এগোতেই বললেন, "হে ! ডেঞ্জার অ্যাহেড । ডোন্ট গো দ্যাট ওয়ে ।"

বাবলু বলল, "হোয়াই ?"

"রবার্স আর প্লান্ডারিং দ্য ডেজার্ট । উই লস্ট এভরি পেনি টু দেম অ্যান্ড উই অলসো লস্ট আওয়ার ক্যামেল ।"

"হোয়াট ফর ডিড ইউ গো দেয়ার ?"

এর উত্তরে বিদেশি সাহেবরা যা বললেন তা হল, এইখানে থর মরুর বুকে খননকার্য চালিয়ে সম্প্রতি কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে । সেইসঙ্গে পাওয়া গেছে কিছু দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা ।সেইজন্য সাহেবরা আজ সারাদিনের মরু-সফরে এসে ওই মুদ্রাগুলি দেখতে গিয়েছিলেন । হঠাৎ কয়েকজন মরুদস্যু এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের ওপর । শ্রমিকদের প্রচণ্ড মারধোর করে অনেক কিছু কেড়ে নেয় । সাহেবদেরও পাসপোর্ট ভিসা জিনিসপত্তর টাকা-পয়সা সব কিছুই খোয়া গেছে । শুধু তাই নয়, একজন বিদেশিনীকে অপহরণ করে পালিয়ে যায় ওরা । যাওয়ার আগে গুলি করে মারে কয়েকজন শ্রমিককে ।

শোনামাত্রই বাবলুর গা গরম হয়ে উঠল । বিলু ভোম্বলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে সাহেবদের বলল, "কুড ইউ নট রেজিস্ট দেয়ার অ্যাটাকস ?"

"দে আর আর্মড, অ্যান্ড উই আর ফরেনার্স ।"

বাবলু সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "সি ইস মিস লর্না । সে ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না । সে সব সময় একা-একা ঘোরে । ট্রেন থেকে নেমে সে সকালের দিকে নিশ্চয়ই একা-একা গিয়েছিল ক্যামেল সাফারিতে । তাই সকাল থেকে কোথাও তাকে দেখিনি ।"

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু ?"

"কী আবার, লর্নাকে উদ্ধার করতেই হবে । আই মাস্ট গো দেয়ার ।"

"শুধু তুই কেন ? আমরাও যাব ।"

"না । যে-কোনও একজন আমার সঙ্গে আয় । মনে রাখিস আমাদের দলে চারজন মেয়ে আছে । ওদের সঙ্গে নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে সামে ফিরে যা কেউ । গিয়ে সকলকে খবর দে ।"

বাচ্চু বলল, "খবর দেওয়ার জন্য তো সাহেবরাই যথেষ্ট । আমরা তোমাকে ছাড়ব না ।"

বাবলু বলল, "এ ভুল করিস না বাচ্চু । এটা মরুভূমি । এখানে লুকোবার বা গা আড়াল করবার কোনও জায়গা পাবি না ।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, মরুভূমিতে আমরা দিশেহারা হতে পারি । কিন্তু সাথীহারা হতে পারব না ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা উট নিয়ে এগোতেই সাহেবরা বললেন, "দে আর হাইলি ডেঞ্জারাস । সো উই ওয়ার্ন ইউ নট টু গো । এস্‌পেশ্যালি অ্যাজ ইউ হ্যাভ ফোর ইয়াং গার্লস উইথ ইউ ।" বলে চলে গেলেন সাহেবরা ।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা উটের পিঠে চেপে দ্রুত এগিয়ে চলল । সারা আকাশ তখন তারায় ভরে গেছে । মাঘী পূর্ণিমার গোল চাঁদ আকাশ ভরিয়ে জ্যোৎস্না ঢালছে । ওরা খানিক এগোতেই সেই জ্যোৎস্নালোকে মরুদস্যুদের দেখতে পেল । ওরা ক'জন তা কে জানে ? তবে উটের সংখ্যা দশ-বারোটা । পঞ্চুও ওদের সঙ্গে ছুটে-ছুটে আসছিল । ও দূর থেকেই ওদের দেখে সাড়া দিল, "ভৌ-উ-উ-উ ।"

থমকে দাঁড়াল মরুদস্যুরা । ওরা যখন কাছাকাছি এল তখন এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল । দস্যুরা যে লোকগুলোকে গুলি করে মেরেছিল সেই লোকগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে উটের সঙ্গে বালির ওপর দিয়ে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে ।

ওদের সাহস এবং সাজপোশাক দেখে কয়েকজন মরুদস্যু সম্ভবত ওদের পুলিশের লোক ভেবে উট ছুটিয়ে পালাল ।

বাবলু বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল, "হল্ট ।"

কিন্তু বয়ে গেছে তাদের থামতে । তবে পাঁচজন রুখে দাঁড়াল । ওরা এক-এক করে গোল হয়ে ঘিরে ফেলল ওদের । একজন রক্তচক্ষুতে বলল, "কাঁহা যাওগে তুম ? ইধার কিঁউ আয়া ?"

এই দস্যুটির উটের পিঠে একজন শ্বেতাঙ্গিনী হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল । উটের পিঠের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা ছিল সে । কিন্তু মেয়েটি আদৌ লর্না কি না বোঝা যাচ্ছিল না ।

বাবলু বলল, "তোমরা কারা ? ওকে ওইভাবে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন ?"

দস্যুটা দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল একবার । তারপর বাবলুর দিকে বন্দুক তাগ করে যেই না ট্রিগার টিপতে যাবে অমনই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল, "ঢিসুম ।"

বিকট একটা চিৎকার করে উটের পিঠ থেকে পড়ে গেল দস্যুটা । আর উটটা ভয় পেয়ে বন্দিনীকে নিয়ে তীরবেগে ছুটতে লাগল বালির ওপর দিয়ে । অন্যান্য দস্যুর হাতেও তখন বন্দুক উঠে এসেছে । কিন্তু এলে কী হবে ? চতুর বাবলু তখন প্রথম দস্যু পড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বালির ওপর লাফিয়ে পড়ে তার বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে ওদের দিকে তাগ করেছে । সেই সুযোগে পঞ্চুও করেছে কি, আর-একজনের পায়ে এমন কামড় দিয়েছে যে, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে সেও পড়ে গেল উটের পিঠ থেকে । বিলু কাছাকাছি ছিল । মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে তার বন্দুক কেড়ে নিয়ে তারই বুকে ঠেকিয়ে রাখল । বন্দুকটা এমনভাবে ধরল যেন এখনই গুলি করবে সে । ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রাধা, রেখা সবাই লাফিয়ে নেমেছে উটের পিঠ থেকে । একজন মরুদস্যু করল কি, এরই ফাঁকে হঠাৎ একটা গুলি করে বসল । আর গুলিটা লাগল রাধার পায়ে । রাধা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতেই বাবলু খট-খট ট্রিগার টিপে সব ক'টাকে শুইয়ে দিল । ততক্ষণে গুলির শব্দে ছত্রভঙ্গ উটগুলো যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে । বালির এই মহাসমুদ্রে কয়েকটি মৃতদেহ ছাড়া আর কেউ নেই । রাধা তখন বালির ওপর পড়ে কাতরাচ্ছে । রেখা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে রাধাকে । গুলিটা পায়ে লেগেছে ওর । তাই রক্তে ভেসে যাচ্ছে পা । বাবলু তাড়াতাড়ি একজন মৃতের পাগড়ি ছিঁড়ে ওর পা-টা শক্ত করে বেঁধে দিল । কিন্তু দিলে কী হবে ? গুলিটা তো বার করা দরকার ? আর গুলি বের করতে গেলে ওদের শহরে যেতে হবে । কিন্তু এই অবস্থায় ওকে নিয়েই বা যাবে কী করে ? একটা উটও ধারেকাছে কোথাও নেই । এবং এই দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমিতে ওরাও এখন দিশেহারা । চারদিকে শুধু বালি, বালি আর বালি । উঁচুনিচু ডিউনস । এখানে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সবই ওদের ধারণার বাইরে । আকাশের নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করতে ওরা পারে না । তাই মাথায় হাত দিয়ে বসল সবাই ।

বাবলু একটা ডিউনসের ওপর উঠে দেখল কোথাও কোনও আলোর রেখা দেখা যায় কি না । কিন্তু না, একমাত্র আকাশের চাঁদ ও নক্ষত্র ছাড়া কোথাও কোনও আলো নেই । তবে দূর দিগন্তে ও আবার কিছু আরোহীকে উটের পিঠে চেপে আসতে দেখল । বাবলু ডাকল, "বিলু, শোন ।"

বিলু যেতেই বাবলু বলল, "ওই দ্যাখ, কারা আসছে ।"

"মনে হচ্ছে আমরা ফিরিনি বলে এবং সাহেবদের মুখে খবর পেয়ে আমাদের উদ্ধারকারী কোনও দল আসছে ।"

বাবলু, বিলু ওদের দিকে তাকিয়ে ঘন-ঘন হাত নাড়তে লাগল ।

ওরা ওদের দেখতে পেয়েই গুলির আওয়াজ করতে-করতে ছুটে এল ওদের দিকে ।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ ! এ কাদের ডাকলাম আমরা । এরা তো সেই পলাতক মরুদস্যুরা । দলবল ডেকে এনেছে ।" বাবলু সঙ্গীদের উদ্দেশে হেঁকে বলল, "এই, যে যেখানে পারিস ডিউনসের আড়ালে লুকিয়ে পড় । সামনে শত্রু । খুব তাড়াতাড়ি ।

যে যতটা পারিস ছুটে পালা।"

সবাই তাই করল। পারল না শুধু রাধা।

বিলু বলল, "একে নিয়েই দেখছি যত গোলমাল।"

বাবলু বলল, "আমি একে সামলাচ্ছি। তুই ওদের দ্যাখ।"

বাবলুর নির্দেশমতো বিলু ছুটল ওদের সঙ্গে। বাবলুর কাছে তবু আগ্নেয়াস্ত্র আছে একাধিক। কিন্তু ওদের কাছে কিছুই নেই। বাবলু এই দস্যুগুলোর বন্দুক টেনে নিয়ে নলের মুখটা অল্প বের করে বালি চাপা দিল। এই সময় হঠাৎই ওর মনে একটা বুদ্ধি এল। ও রাধাকে ধরে প্রায় টেনে-হিঁচড়েই আর-একটা ডিউনসের আড়ালে নিয়ে এসে শুধু মুখটুকু বের করে বালি চাপা দিতে লাগল ওকে। ও তো পালাতে পারবে না। তাই এইভাবে যদি দস্যুদের চোখের আড়াল করা যায়!

মরুদস্যুরা তখন বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর রেখার দিকে ছুটেছে। ওরা বড়সড় একটা ডিউনসের আড়ালে লুকোতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই নজরে পড়ে গেল ওদের। আসলে এখানে বালির ওপর দিয়ে তো ছোটা যায় না। তাই চেষ্টা করেও পালাতে পারল না সময়মতো।

এদিকে মরুদস্যুরাও বেশ কয়েকজন। প্রথমবার দস্যুগুলোকে ওরা ভালই কবজা করে ফেলেছিল। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। এখন পঞ্চুর আক্রমণ বা বন্দুকের গুলি ওদের রক্ষা করতে পারবে না। ওদের এখন জোর লড়াই লড়তে হবে। বাবলু তখন একটা বন্দুক হাতে নিয়ে প্রায় বুকে হেঁটে একটা ডিউনসের মাথার ওপর উঠল। এইখান থেকে গুলি করার সুবিধা খুব।

বাচ্চু, বিচ্ছু আর ভোম্বলকে তুলে নিয়েছে তখন কয়েকজন। বিলু আর রেখা, পঞ্চুর সাহায্য নিয়ে ছুটোছুটি করছে। দস্যুরা বন্দুক তাগ করেও সুবিধা করতে পারছে না তাই। আসলে ওদের উদ্দেশ্য তো এখন গুলি করা নয়, অপহরণ করা। বিলু, রেখা আর পঞ্চু উটের পায়ের ফাঁক দিয়েই ছুটোছুটি করছে। বাবলু ওদের বাঁচিয়ে দস্যুদের লক্ষ করে ট্রিগার টিপল। টিসুম-টিসুম-টিসুম-টিসুম

একটি ছাড়া তিনটি গুলিই ফসকাল। আর মরুদস্যুরা মরুর বুকে ঝড় তুলে হারিয়ে গেল কোথায়। বাবলু দেখল একমাত্র পঞ্চু ছাড়া কেউ নেই সেখানে। ওরা সবাই এখন দস্যুদের কবলে। বাবলুর মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল। পঞ্চু উটের পেছনে অনেকটা ছুটেছিল। কিন্তু পেরে ওঠেনি। তাই একটা ডিউনসের মাথায় উঠে চিৎকারে মাত করে দিতে লাগল।

রণক্লান্ত বাবলু ধীরে-ধীরে নেমে এল ডিউনসের ওপর থেকে। তারপর রাধার কাছে গিয়ে ওকে বালিমুক্ত করল।

রাধা বলল, " খুব তিয়াস লেগে গেছে ভাইয়া। একটু পানি মিলেগা ?"

বাবলু বলল, "মরুভূমিতে জল কোথায় পাব ? এখন কোনও রকমে তোমাকে নিয়ে সামে পৌঁছতে পারলে বাঁচি।"

" ওরা কোথায় ?"

"মরুদস্যুরা ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। রেখাকেও।"

রাধা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বাবলু রাধার হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করাতেই ধুপ করে বসে পড়ল ও।

"কী হল ?"

"আমি দাঁড়াতে পারছি না। তুমি এক কাজ করো বাবলু ভাই, যেখান থেকে পারো একটা উট ধরে নিয়ে এসো। পঞ্চুকে আমার কাছে রেখে চলে যাও তুমি।"

"এই মরুভূমির বুকে তোমাকে একা রেখে তো আমি কোথাও যাব না। যেভাবেই হোক আমাকে ধরে-ধরে তুমি এসো।"

"আমি পারব না। আমার যে কী যন্ত্রণা তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। পা-টা মনে হচ্ছে অসাড় হয়ে গেছে। শুধু

আমি বলেই বোধ হয় এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি। আমার বোন হলে পারত না। তুমিও পারতে না।"

"তবুও তোমাকে যেতে হবে। সাম সন্দে তোমাকে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি ওদের খোঁজে যেতে পারব না। তোমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবু তুমি পেছন দিক দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে পিঠে ভর করে থাকো আমি, কষ্ট করেও বয়ে নিয়ে যাব তোমাকে।"

"তুমি পারবে না ভাইয়া।"

"পারতেই হবে। এসো।"

বাবলু বলল বটে,কিন্তু এইভাবে খানিক আসার পরই টের পেল এ-কাজ ওর পক্ষে অসম্ভব। সারা গায়ে ঘাম ছুটে গেল যেন। যেখানে নিজেকে নিয়েই চলা যায় না সেখানে আর-একজনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব ? তবুও ওর নাম বাবলু। নিজের জীবন দেবে তবু অন্যের জীবন বিপন্ন হবে দেবে না। এখানে শুধু ছায়া-কালো চাঁদের আলো আর ওরা ছাড়া কেউ নেই। আছে শুধু পঞ্চু।

হঠাৎ ডিউনসের আড়াল থেকে দু'জন দস্যু আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। পঞ্চু একজনকে ভীষণভাবে আক্রমণ করতে গেল যেই সে অমনই বন্দুকের নলটা পঞ্চুর দিকে এগিয়ে দিল। সেই নল কামড়েই ঝুলে পড়ল পঞ্চু। আর-একজনের বন্দুকের ঘা তখন বাবলুর মাথার ওপর পড়েছে। মাথাটা ঘুরে গেল।

এর পর কিছুই আর মনে নেই বাবলুর। ওর চোখের সামনে সবই তখন অন্ধকার।

॥ ১০॥

সেই জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখল একটা অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় শুয়ে আছে। একটু-একটু করে সব কিছু মনে পড়ল ওর। ভাগ্যে জিনসের টুপিটা ছিল মাথায়। না হলে মাথাটা কেটেই যেত হয়তো। ও ধীরে-ধীরে ওঠার চেষ্টা করতেই একটি গরম নিশ্বাস গায়ে পড়ল ওর।

"কে ?"

"ভাইয়া। আমি রাধা।"

"আমরা কোথায় ?"

"মরুভূমির বালির মধ্যে একটা অন্ধকার গুহায়।"

"পঞ্চু কই ? আমাদের আর সব কোথায় ?"

"জানি না।"

"তোমার পায়ের অবস্থা কেমন ?"

"ভাল নয়। ওদের একটা লোক গুলি বের করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। ইঞ্জেকশনও করেছে একটা।"

"আমার হাত-পায়ের বাঁধনটা একটু খুলে দেবে ?"

"অনেক আগেই খুলে দিয়েছি আমি। যদি ওরা কেউ আমাদের দেখতে আসে তাই আলগা করে জড়িয়ে দিয়েছি শুধু।"

বাবলু উঠে বসল তখন। তারপর খোলা দড়িটা কোমরে বেঁধে নিয়ে বলল, "যেভাবেই হোক পালাতে হবে এখান থেকে।" দূরে দেওয়ালের গায়ে একটা মশাল জ্বলছিল। সেইদিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, "তুমি এখানেই থাকো। আমি একটু ঘুরে দেখি বেরোবার কোনও পথ পাই কি না।"

রাধা বলল, "কোথাও একটা কোনও শক্ত লাঠি পেলে আমাকে এনে দাও না ভাইয়া। আমি তা হলে এক পায়ে লাঠিতে ভর করে যেতে পারব তোমার সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "মশাল যখন রয়েছে লাঠির অভাব হবে না।" ও ধীরে-ধীরে সেই মশালটার কাছে এগিয়ে গিয়েই দেখল তার পাশ দিয়ে একটা পাথরের সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। সে মশালটা নিয়ে এদিক-ওদিক করতেই এক জায়গায় কতকগুলো বল্লম আর ভাঙা বন্দুক জড়ো করা আছে, দেখতে পেল। সে একটা বল্লমের লাঠি এনে রাধাকে দিতেই রাধা বলল, "আমাকে একটু তুলে দাঁড় করিয়ে দাও ভাইয়া।"

বাবলু আস্তে করে তুলে ধরল রাধাকে।

রাধা বলল, "থ্যাঙ্কস।"

তারপর মশাল হাতে বাবলু, আর ওর পেছনে রাধা একটু-একটু করে এগিয়ে চলল। খানিক আসার পরই ওরা দেখল হাত-পা বাঁধা কে যেন একজন শুয়ে আছে। ওরা আলো নিয়ে ঝুঁকে পড়তেই দেখল যে শুয়ে আছে সে আর কেউ নয়, লর্না।

বাবলু লর্নার বাঁধন মুক্ত করতে যেতেই লর্না ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, "হু আর ইউ।"

বাবলু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "হিস্‌স্।"

লর্না ওদের চিনতে পারল এবার। বলল, "ইউ!" তারপর বলল, "হোয়াট মেকস মি হিয়ার, হোয়্যার আই অ্যাম ?"

"আন্ডার দ্য ডেজার্ট।"

"হাউ হ্যাভ ইউ কাম হিয়ার ? টু সেভ মি—ইজ ইট ?"

"এগজ্যাক্টলি সো। উই ওয়্যার ট্রাইং টু গেট রিড অব ডেঞ্জার—অ্যান্ড দিস হ্যাজ মেড দ্য ম্যাটার লাইক দিস।"

বাবলু বাঁধন মুক্ত করতেই উঠে বসল লর্না।

বাবলু বলল, "কাম। ফলো মি।"

ওরা তিনজনে একটু-একটু করে গুহার দেয়াল ঘেঁষে যেই না খানিকটা এগিয়েছে, অমনই এমন এক দৃশ্য দেখতে পেল যা দেখে ভয়ে শিউরে উঠল ওরা। একদিক থেকে লর্না অন্য দিক থেকে রাধা জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। বাবলুও ভয় পেল প্রচন্ড। ওরা দেখল ওদের চোখের সামনেই এক জায়গায় কতকগুলো নরকঙ্কাল জড়ো করা আছে। কোনওটি আবার হুকের সঙ্গে গাঁথা। কোনওটির গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো। দড়ি দিয়ে ঝোলানো কঙ্কালগুলোকে দেখলে মনে হয় কোনও কারণে কোনও সময়ে এখানে এদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। আর হুকে গাঁথা কঙ্কালগুলোকে নিশ্চয়ই হুকে গেঁথে মেরেছিল কেউ। কী পৈশাচিক দৃশ্য।

ওরা আরও খানিকটা এগোতেই দেখল একটি ঘরের ভেতর বাচ্চু, বিচ্ছু, আর ভোম্বলকে লোহার আংটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

বাবলু দেখামাত্রই ছুটে গিয়ে মুক্তি দিল ওদের। বলল, "বিলু কই ? রেখা কই ? পঞ্চু কোথায় ?"

"ওদের খবর জানি না। কিন্তু তোরা এখানে কী করে এলি ?"

"আমরাও তোদেরই মতো বন্দি হয়েই এসেছি। এখন এখান থেকে পালাবার তাল করছি। চল, সবাই মিলে পালাবার একটা পথ দেখি।"

"রেখা, বিলু, আর পঞ্চুকেও খুঁজে দেখি অমনই।"

"আমার মনে হয় ওরা ওদের ধরতে পারেনি।"

"বাচ্চু, বিচ্ছু বলল, "তা যদি হয় তা হলে এই মৃত্যুপুরী থেকে উদ্ধার আমরা পাবই। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কিছু করবে।"

ভোম্বল বলল, "অবশ্য যদি বেঁচে থাকে।"

ওরা ধীরে-ধীরে অন্ধকারে মশালের আলোয় পথ দেখে আরও এগোতে লাগল। এখানে গুহার ভেতরে দেওয়াল ছাদ সবই পাথরের। শুধু পায়ের নীচে পুরু বালি। এইভাবে খানিক এগোবার পর এক জায়গায় গিয়ে দেখল আর পথ নেই। পথটা সেখানে ঢালু হয়ে যেদিকে নেমেছে সেখানে শুধু জল আর জল। ওরা তাই ফিরে এল যে-পথে এসেছিল সেই পথে। এখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাইরে বেরনো সম্ভব হলেই পালাবে।

সবে কয়েক ধাপ উঠেছে। এমন সময় মাথার ওপর ধুপধাপ শব্দ। ওরা আর না উঠে দ্রুত নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। তারপর

মশালটা বালিতে গুঁজে দু'পাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বাবলু তখন কোমরে জড়ানো সেই দড়িটা খুলে একটা ল্যাসোর মতো করে নিল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল ওদের নেমে আসার।

একটু পরেই দেখা গেল মশাল হাতে জনাচারেক লোক নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। লোকগুলো যে শত্রুপক্ষের তা বুঝতে একটুও দেরি হল না। লোকগুলো নামামাত্রই ভোম্বল লাফিয়ে পড়ে একজনের হাত থেকে মশালটা কেড়ে নিয়েই গায়ে ছ্যাঁকা দিতে লাগল। সর্বশেষ যে-লোকটি ছিল, বাবলু ল্যাসোর দড়িটা আটকে দিল তার গলায়। দিয়েই একটা হ্যাঁচকা টান। লোকটির চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এল।

লর্নার তখন অন্য রূপ। একেবারে রুদ্রচণ্ডীর মূর্তি ধারণ করে ওদের দিকে রিভলভার তাগ করে বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

"বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "হোয়্যার হ্যাভ ইউ গেট দ্য রিভলভার ?"

লর্না বলল, "দিস হ্যাড বিন উইথ মি। দে অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাকড মি ফ্রম বিহাইন্ড হুইচ ডিড নট অ্যালাউ মি টু ইউজ ইট।"

বাবলু ওদের বলল, "তুম সব হামকো ইধার লেকে আয়া কিউ ?"

"তুমনে হামারা বহুত আদমি কো মারা। ইস লিয়ে।"

"ইঁয়াসে নিকালনে কা রাস্তা ?"

"ব্রেফ একই হ্যায়। ইয়ে হ্যায় ও মার্গ।"

"হামারা আউর দোস্ত কাঁহা হ্যায় ?"

"ইঁয়া তো আউর কোই নেহি।"

এমন সময় বাইরে কার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আরে জলদি করো। তুরন্ত লে আও ও ফরেন লেডি কো।"

বাবলু বলল, "ও কৌন হ্যায় ?"

"হামারা বস। থেরানিজি।"

ওরা আর কিছু বলার আগেই স্মার্ট ইয়ং লেডি লর্না রিভলভার উদ্যত করে উঠে গেল ওপরে।

ভোম্বল বলল, "মিস লর্না, ডোন্ট গো দেয়ার।"

"ডোন্ট বি সিলি।"

লর্না উঠে যেতেই গুলির শব্দ শোনা গেল। কিন্তু শোনা গেল না কারও আর্তনাদ। ততক্ষণে এরাও সবাই উঠে এসেছে। উঠেই বন্ধ করে দিয়েছে ডালাটা।

বাইরে তখন সে কী দৃশ্য। চারদিকে খুঁটিতে বাঁধা আছে অজস্র উট। চারজন মরুদস্যু বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আর দানবাকৃতি এক নৃশংস মানুষের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই চলছে লর্নার।

লোকটির চেহারা দেখে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল ওদের। পাণ্ডব গোয়েন্দারা নৃশংস মানুষ নেহাত কম দেখেনি। ভয়ঙ্কর মূর্তিও দেখেছে অনেক। কিন্তু এই মানুষটি যেন সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। লম্বায় অন্তত সাত ফুট। বৃষস্কন্ধ দানব। চাপ দাড়ি। মাথায় জালির কাজ করা অ্যারাবিয়ান টুপি। গোরিলার মতন মুখ আর বাঘের মতো চোখ। ওর বাঁ কাঁধে গুলি লেগে রক্ত ঝরছে। এই কি তবে থরের আতঙ্ক থেরানি ? ঘায়েল সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করছে সে।

বিদেশিনীর শরীরের আসুরিক শক্তির সঙ্গে বুঝি পরিচয় ছিল না থেরানিজির। অথবা দলের লোকেদের সামনে মর্যাদার লড়াইয়ের কাছে পিছু হটতে চান না। তাই বেদম মার খাচ্ছেন লর্নার হাতে। লর্না মেরে রক্তাক্ত করে দিচ্ছেন ওঁকে।

অদূরে বালির ওপর একটা হেলিকপ্টার নামানো আছে। আর বাবলুর পায়ের সামনে বালির ওপর পড়ে আছে লর্নার রিভলভারটা। ওর পিস্তলটা যে কোথায় পড়ে আছে তা কে জানে ? অথবা এরাই কেড়ে নিয়েছে। সে যাই হোক, বাবলু রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়েই তাগ করল থেরানির দিকে। ট্রিগার টিপেই বুঝল ফক্কা। রিভলভার আছে। কিন্তু গুলি কই ? গুলি তো নেই।

কান্দাহারের চোখে তখন আগুন জ্বলছে। লর্নাকে এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বালির ওপর। দিয়ে দলের লোকেদের বললেন, "মারো। বাঁধো। উঠাও কপ্টার 'পর।"

দস্যুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল লর্নার ওপর। লর্না আর পেরে উঠল না। বন্দিনী হল ওদের হাতে।

কান্দাহার ভীষণ মূর্তি ধারণ করে "আঁক,আঁক" করে এগিয়ে এলেন বাবলুর দিকে। তারপর সিংহগর্জনে বললেন, "ও। তুমি হো ওহি লেড়কা। যিনোনে হামারা বহুত লোকসান কর দিয়া। আভি হামারা হিসাব পুরা হো যায়গা। ইয়া হা—।" বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। তারপর তুলে নিয়ে ওকে একটা আছাড় মারতে যাবে যেই অমনই কোথা থেকে একটা মাঝারি সাইজের পাথর এসে লাগল ওর কপালে। পাথরটা যে কোন দিক থেকে এল তা বুঝতে পারল না কেউ। কান্দাহারের মুখ দিয়ে শুধু একটাই শব্দ বেরিয়ে এল, "ফায়ার।" ওর পোড়া-পোড়া কালচে মুখ রক্তের ধারায় বীভৎস হয়ে উঠল।

আর ঠিক সেই সময়ই টিলার ওপর থেকে শোনা গেল বিলুর কণ্ঠস্বর, "বাবলু, আমরা এসে গেছি। পঞ্চুও আছে আমাদের সঙ্গে। কোনও ভয় নেই।"

পঞ্চু তখন বিকট চিৎকার করে টিলার ওপর থেকেই লাফিয়ে পড়েছে সেই দস্যুগুলোর ওপর। ওরা বিলুকে লক্ষ করে একসঙ্গে ফায়ার করল। কিন্তু বিলু তখন কোথায় ? বন্দুকে হাত রাখামাত্রই পাথরের আড়ালে লুকিয়েছে সে। আর বন্দুক তোলামাত্রই পঞ্চুর আঁচড়-কামড়ের মাঝে ভোম্বল বাচ্চু, বিচ্ছু মুঠো-মুঠো বালি তুলে ছুঁড়ে মেরেছে ওদের চোখে। প্রায় অন্ধ হয়ে ওরা বালির ওপর বসে পড়ল সবাই।

বাবলু ছুটে গিয়ে লর্নাকে বন্ধনমুক্ত করল।

বিলু আর রেখাও ছুটে এসেছে তখন। রেখা, রাধাকে বলল, "হাল ক্যায়সা তুমহারা ?"

রাধা ওর পা দেখিয়ে দিল।

শিউরে উঠল রেখা।

বাবলু আর বিলু যখন দস্যুদের বন্দুক কেড়ে নিচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাধার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কান্দাহার। রাধার তো বাধা দেওয়ার শক্তি নেই। কান্দাহার এক ঝটকায় রেখাকে সরিয়ে দিয়ে হঠাৎই কোত্থেকে ওর রিভলভারটা বের করে ঠেকিয়ে ধরল রাধার বুকে। তারপর এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে চলল হেলিকপ্টারের দিকে।

রাধা চিৎকার করতে লাগল।

এই সময় একমাত্র রক্ষাকর্তা পঞ্চু ছাড়া আর কেই-বা হতে পারে ? ও ভৌ-ভৌ করে ছুটে আসতেই কান্দাহার রাধার দিক থেকে রিভলভারটা ঘুরিয়ে নিল পঞ্চুর দিকে। এইবার খেল দেখাল রেখা। রাধার লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ক্রিকেটের ব্যাট করার মতো নীচের দিক থেকে এমনভাবে মারল যে, হাত ফসকে সশব্দে শূন্যে উঠে কোথায় যেন ছিটকে গেল রিভলভারটা।

পঞ্চু তখন ছিঁড়ে খাচ্ছে কান্দাহারকে। হিংস্র পঞ্চুর আক্রমণে থরের আতঙ্ক থর-থর করে কাঁপছে। থেরানি ভয়ে ছোটা শুরু করল মরুভূমির ওপর দিয়ে। কিন্তু যাবে কোথায় ? পালাবার পথ নেই। ডান দিকে গেলে পঞ্চু। বাঁ দিকে গেলে পঞ্চু। সামনে পঞ্চু। পেছনে পঞ্চু।

পঞ্চু,পঞ্চু,পঞ্চু। পঞ্চুর হাত থেকে আজ আর পরিত্রাণ নেই।

নাটক যখন চরমে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল দলে-দলে

পুলিশ আর শয়ে-শয়ে মানুষ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

এই পুলিশের দলে ইনস্পেক্টর আনন্দও ছিলেন। আর ছিলেন সেই লোকটি। যিনি অম্বর কেল্লা থেকে যোধপুরের মাণ্ডোর পর্যন্ত ওদের দিকে নজর রাখছিলেন।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "আপনি!"

"হ্যাঁ, আমি। প্রশান্তকুমার বাজপেয়ী। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার বন্ধু আনন্দ আমাকে এই কাজে লাগিয়েছিল। তা কাজ করতে এসে দেখলাম তোমরাই উলটে আমার দিকে নজর রাখছ। তবুও কোন ফাঁকে যে তোমরা জয়শলমিরে পালিয়ে এলে তা ভেবে পাইনি। পরে রেলের রিজার্ভেশন কাউন্টারে গিয়ে জানতে পারলাম তোমরা রাতের গাড়িতে পালিয়েছ। ইতিমধ্যে এই দস্যুদের কবলে পড়ে সাহেবরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বিশেষ করে একজন বিদেশিনীকে অপহরণ করায় সরকারি মহলে ভয়ানক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। রাজস্থান পুলিশও তোলপাড় করছে চারদিক। সীমান্তে মিলিটারিরাও সতর্ক রয়েছে। তোমাদের দেখা না পেলে এখনই হয়তো বিমানে হেলিকপ্টারে তল্লাশি শুরু হয়ে যেত। হাজার হলেও থর মরু অভিযানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফরেনাররা এসে থাকেন। এইখানে এইরকম কাণ্ড ঘটলে শুধু রাজস্থানের নয়, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের বদনাম। কৈফিয়ত দিতে-দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে।"

"সে তো যাবে। আচ্ছা, যোধপুরের সরাইখানায় এই দস্যুটাকে কি আপনি গুলি করেছিলেন?"

প্রশান্তবাবু হাসলেন।

"সমস্ত লোকজন জড়ো করে এখানে আসতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল। তবু এসে যখন পড়েছি তখন আর তোমাদের কোনও চিন্তা নেই।"

বাবলু বলল, "সাম সন্দ থেকে কতদূরে আছি আমরা?"

"পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে।"

পুলিশের লোকেরা এক-এক করে গ্রেফতার করতে লাগল সকলকে। ইনস্পেক্টর আনন্দ এবং যোধপুর জয়শলমিরের পুলিশ অফিসাররা কান্দাহার খেরানির হাতে হাতকড়া পরালেন।

তারপর শুরু হল গুহায়-গুহায় তল্লাশি। বাবলুর পিস্তলটাও উদ্ধার হল। এইখানে অবশ্য একটি গুহা নয়। পর-পর চার-পাঁচটি গুহা আছে। সব গুহামুখের কাঠের পাটাতনগুলোর ওপর মরুভূমির বালি এমনভাবে ঢাকা দেওয়া থাকে যে, কেউ টেরও পায় না কোথায় কী আছে। গুহায় তল্লাশি করে শুধু-শুধু নরকঙ্কাল নয়, অনেক সোনাদানা এবং নিষিদ্ধ দ্রব্যও আটক করা হল। অবশ্য মারের চোটে দস্যুদের মুখ থেকেই হদিস পাওয়া গেল এসবের।

তখন রাত্রি শেষ।

জ্যোৎস্নাস্নাত মরুর বুকে ভোর হচ্ছে। এক জটাজূটধারী কৌপীন পরা সাধুবাবা দিগন্ত থেকে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। এসে বললেন, "খেল খতম?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"ম্যাঁয় জানতা থা একদিন অ্যায়সা হি হোগা। পাপ বহুত জায়দা হো গিয়া থা।"

বাবলু বলল, "আপনি কে বাবা?"

"এ মাত পুছো।" তারপর কথাচ্ছলে তিনি যা বললেন তা শুনে অবাক হয়ে গেল সকলে। সাধুবাবা বললেন, "আজ এখানে দিগন্তজোড়া মরুভূমি ধু-ধু করলেও আজ থেকে দু' হাজার বছর আগে এই জায়গাটা হরিৎশস্যে আবৃত ছিল। তখন এখানে বাস করত জোহিয়া নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি। জোহিয়াদের রাজধানী ছিল এইখানেই। নাম রংমহল। তা সেই রংমহলের রঙিন পাথরের ঘরবাড়ির চিহ্নও আর নেই। অথচ এই মরুভূমির বালির নীচে চাপা পড়ে আছে সেকালের এক রাজ-ঐশ্বর্য। কত মূল্যবান সম্পদ যে আছে এর নীচে, তা কে জানে। কাগার নামে একটা নদীও বইত এখানে। ওই যে দেখছ গুহাটা, ওই গুহার মধ্যে এখনও আছে কাগার-এর উৎস। তা মহাবীর সেকন্দর শাহ্ এই জোহিয়া রাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংস করেন এর সব কিছু। অ্যারিস্টটলের মতে, জোহিয়ারাজ সেকন্দর শাহ্‌কে নাকি একটি বিষকন্যা উপহার দিয়েছিলেন। সেই কন্যা বাল্যকাল থেকে দুধের বদলে বিষপান করত। ওলিয়ানের মতে, ওই গুহার ভেতর থেকে বৃহদাকার একটি সাপ সেকন্দরের পথ রুদ্ধ করে। এই দুই ঘটনাই রংমহল ধ্বংসের একমাত্র কারণ। অনেকে অবশ্য এই কারণ ভিত্তিহীন মনে করেন। সে যাই হোক, সেই সুফলা ভূমি আজ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানে কারও আধিপত্য বেশিদিন টেকে না। এই রংমহলকে ধ্বংস করতে সেকন্দর যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন তারই দ্বিতীয় নজির রেখেছেন এই কান্দাহার খেরানি। আমার তো মনে হয় সেকন্দরই এতদিন পরে মরে জন্মেছেন কান্দাহার হয়ে। এরও অত্যাচারের সীমা নেই। এই যে উঁচু-নিচু বালির স্তরে এক-একটি কাঠের ফলক পোঁতা আছে, আসলে ওর নীচে ঘুমিয়ে আছে অনেক মানুষ। মানুষকে খুন করে বালিতে পুঁতে তার কঙ্কাল নিয়ে বিদেশে পাচার করার এমন জঘন্য ব্যবসা দুষ্ট লোক ছাড়া আর কে করে? যাই হোক এই হল অতীতের সেই রংমহল আর আজকের এই রঙ্গভূমি। আজ থেকে এইখানে, এই গুহাতে আমি থাকব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিস্ময়ে সব কিছু শুনে প্রণাম করল সাধুবাবাকে। লর্নাও বাবাকে প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

এবার ফেরার পালা। সবাই এক-এক করে চেপে বসল উটের পিঠে। একটি উটে দু'জন করেই বসল এবার। এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাল।

লর্না কাছে এসে সকলের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "আই অ্যাম ভেরি মাচ প্লিজড উইথ ইউ। অ্যান্ড নেভার শ্যাল আই ফরগেট অ্যাবাউট ইউ ইভন, হোয়েন ব্যাক টু মাই ওন কানট্রি।"

"উট চলতে লাগল সাম সন্দের দিকে।

ওরা কাল সন্ধেবেলা থর মরুর বুকে সূর্যাস্ত দেখেছিল। এখন দেখল সূর্যোদয়। সে কী অপূর্ব দৃশ্য!

লর্না মনের আনন্দে একটা গান ধরল। ওদের দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান, "ইয়েস, ইট'স এ সুপার ডুপার লাইফ ইজ গেয়িং টু ফাইন্ড মি, সাইনিং লাইফ দ্য সান, ফিলিং হেভেনস ওন, ফিলিং লাইফ এ নাম্বার ওয়ান···।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সেই গানের সুরে সুর মেলাল।

পঞ্চু ডাকল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

উট চলতে লাগল।

পাখিরা

সুনীল বসু

পাখিদের নিয়ে এক অদ্ভুত ছবি
বানালেন সার আলফ্রেড হিচকক
সেই ছবি দেখে সব হল তাজ্জব
উৎসাহী যত ছিল লাখো দর্শক ।

পাখিরাও মোটে নয় নিরীহ বেচারি
তাদেরও ঠোঁটে বিষ ধারালো যে নখ
তারা হোক অপরূপ যত সে বাহারি
আচার ও আচরণে তারা ভয়ানক।

হলে তারা একজোট মানুষও নাকাল
খেপে গেলে ছিঁড়ে খায় শহর-পাহাড়
ইস্‌কুলে ছেলে-মেয়ে পালিয়ে উজাড়
ভূত হয়ে তারা ভরে গাছেদের ডাল ।

পাখিদের দলে আছে বাজ ও ডাকাত
ছড়াতেও পারে তারা ভয় বিভীষিকা
গোয়েন্দা ইশারায় তাদের সাঙাত
জুটে গিয়ে শহরেই টানে যবনিকা ।

যদি ভাবি পাখিরা তো ছোট এক প্রাণী
সংসারে এনে দেয় মিঠে কিচিমিচি
ভুল সব, পাখিরাও করে রাহাজানি
ঠুক্‌রিয়ে খুন করে চারিদিকে ছিছি ।

একদিন ছোট এক শহরে লোপাট
কী কাণ্ড করেছিল, ভয়ে স্তম্ভিত
মানুষেরা সব ফেলে বাড়ি ঘর মাঠ
স্বর্গীয় পাখিরাও হল ধিকৃত ।

কনিষ্কের মুণ্ডলাভ

সরল দে

ধড়ফড়িয়ে ধড়টা খোঁজে সেই কবেকার হারানো শির,
জট পাকাল অলিগলির গোলকধাঁধা বারাণসীর ।
বাড়ানো হাত ছাড়াল যেই দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ি,
হাতে ঠেকল কমণ্ডলু, পায়ে ঠেকল কাঠের পিঁড়ি ।

মগ্ন ছিলেন পুরাতত্ত্বের ধ্যানে ব্রহ্মদত্যিবাবা,
চমকে ওঠেন কনিষ্ক না ? যায় না এটা সত্যি ভাবা !
হারানো শির খোঁজেন রাজা ? খুঁজুন তবে অনন্তকাল ।
রাতদুপুরে পুরুষপুরে ধ্বংসাবশেষ খনন তো কাল
করে হস্তিমুণ্ড পেলাম—সেটাই হবে কার্যকরী ।
রাজা বলেন, "বাবাঠাকুর, আদেশ শিরোধার্য করি ।"

ধড়ের ওপর হাতির মাথা এঁটে যত্নসহকারে
বলেন ব্রহ্মদত্যিঠাকুর, "ভবিতব্য কহ কারে !"
অস্থিরতা কমে রাজার, মুণ্ডলাভে স্থিতি আসে,
কনিষ্ক তাই গনিষ্ক হন—যাই লেখা থাক ইতিহাসে ।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

তুলি, অলি, তিতলি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

তুলি, অলি, তিতলি দুরন্ত তিনটি
ডানপিটেদের দলে তোদের যে গিনতি
তুলি যবে বসে পড়ে
অলি তবে খেলা করে
তিতলি মাথায় চড়ে
তাক ধিনা ধিনটি ।
তুলি বসে গুটিসুটি
অলি হেসে লুটোপুটি

তিতলির খুনসুটি
টিন টিনা টিনটি ।
অলি যবে চুপ করে
তুলি যে ঝাঁপিয়ে পড়ে
তিতলি তখন শুধু
কেটে যায় চিমটি ।
তুলি, অলি, তিতলি
কখনও না হারলি

কত খেলা জিতলি
এই ভাব এই আড়ি
বই নিয়ে কাড়াকাড়ি
ঝগড়া ও মারামারি
এই নিয়ে কেটে যায়
কোথা দিয়ে দিনটি
ডানপিটেদের দলে
তোদের যে গিনতি ।

সময়ের গুহাচিত্র

জয়া মিত্র

পিরামিডের দেশে

অনেককাল আগে, সেই একেবারে আদিম যুগে যখন মানুষ সবেমাত্র মানুষ হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ কিনা দু' পায়ে চলতে পারছে সে পৃথিবীর পিঠের ওপর, আর স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারছে নিজের হাত, যখন সে গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে তৈরি করছে অস্ত্র আর পাথরের টুকরো ঠুকে, কেটে তৈরি করে নিচ্ছে হাতিয়ার, তখন হয়তো তারা কথা বলতে শেখেনি। তৈরি করে উঠতে পারেনি তার ভাষা। কিন্তু তারপর মানষের যেসব আবিষ্কার তাকে সভ্যতার দিকে ক্রমশ এগিয়ে দিয়েছে, যেমন আগুন জ্বালা কিংবা খাবার জমিয়ে রাখা, তার সঙ্গে-সঙ্গেই সে শিখেছে কথা বলে নিজের ভাব প্রকাশ করতে, ছবি আঁকতে। নানা দেশের নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলের গুহায় পাওয়া যায় অদ্ভুত সব গুহাচিত্র। গুহার ভেতরের পাথুরে দেওয়ালে প্রধানত লাল কিংবা সাদা রং দিয়ে আঁকা সব ছবি। বেশিরভাগই নানা জন্তুজানোয়ার, শিকার, নাচ কিংবা বাজনা বাজানোর ছবি। আমাদের দেশেও আছে এরকম বহু হাজার বছরের পুরনো গুহাচিত্র।

বিভিন্ন দেশেই এসব আদিম ছবির চেহারা দেখতে কিন্তু প্রায় একই রকম। খুব সোজা-সোজা রেখা দিয়ে আঁকা ছবি, অনেকটা যেরকম শিশুরা আঁকে। কিন্তু তা থেকে বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না, মানুষ, বাঘ, হাতির চেহারা। বোঝা যায় তাদের হাতের অস্ত্র, বাজনা বাজানো কিংবা নাচের ধরন।

এরকমই, নানা দেশে মানুষের সবচেয়ে পুরনো যে সভ্যতার সন্ধান পাই আমরা, যেমন ভারত, চিন, জাপান, মিশর, গ্রিস, রোম, কি আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল, এইসব দেশে কিছু-কিছু খুব পুরনো গল্পও পাওয়া যায়। কোনও-কোনও দেশে এই গল্পগুলি পরে লিখিত চেহারা পেয়েছে, ধর্মগ্রন্থের অংশ হয়েছে, কোথাও বা লোকের মুখে মুখে হয়ে উঠেছে উপকথা। দেবদেবী, মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা নিয়ে লেখা এইসব গল্প-উপাখ্যানকে মোটামুটিভাবে বলা হয় 'মিথ'। আজ আবার এইসব পুরাণ উপকথা থেকে যাঁরা এগুলো রচনা করেছিলেন তাঁদের চিন্তাভাবনা, জীবনযাত্রা বা বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি। হয়তো এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে সেইসব মানুষ তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অথচ রহস্যময় সমস্যার একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করত। যেমন, ধরা যাক, মৃত্যুর ব্যাপারটা। কখনও-কখনও একটা লোক চোখ বুজে নড়াচড়া বন্ধ করে শুয়ে থাকে, খানিক পরে বেঁচে ওঠে, আবার কখনই-বা ওরকমই শুয়ে পড়ে কিন্তু আর জেগে ওঠে না—ঘুম আর মৃত্যুর এই তফাত, হিংস্র পশুর থাবায় কি মাথায় পাথর পড়ে, কিংবা বাজ পড়েও মরে যায় একটা বেঁচে থাকা লোক! তা হলে আর কখনও কি সে জেগে উঠবে না? তার বেঁচে থাকাটা তা হলে কোথায় যাবে? এইসব প্রশ্ন থেকে মানুষ পুনর্জন্মের কথা ভেবেছে, অমরতার কল্পনা করেছে। সাধারণ বিজ্ঞানও তার কাছে ছিল তখন সম্পূর্ণ অজানা। কোনও

কোনও দেশে, বিশেষত পশ্চিমে, যেখানে শীত বেশি, সেখানে এই মৃত্যু-পুনর্জন্ম অমরতার ভাবনার সঙ্গে আরও একটা ভাবনা জড়িয়ে গেছে। সেটা শীত-বসন্তের ভাবনা। তীব্র শীতে এসব দেশে মাটি শক্ত হয়ে যায়, গাছপালা যায় মরে, আবার বসন্তে সব কিছু বেঁচে ওঠে। এমনই চলে বছরের পর বছর। এটা যেন অনেকটা প্রকৃতির মধ্যে মৃত্যু আর পুনর্জন্মের ছায়া দেখতে পাওয়া। অথচ আবার কিছু-কিছু সাধারণ মিল সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশের গল্পেই আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, চিন্তা কি প্রকাশের নিজস্ব ধরন। একই ভাবনার ওপর বিভিন্ন দেশের কয়েকটা গল্প পড়লে তোমরা নিজেরাই কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে।

গ্রিসের গল্প

গ্রিস-রোমের পুরাণে উর্বরতার দেবী হলেন ডিমিটর। পৃথিবীর ফল-ফসলের জননী তিনি। সৌন্দর্যে সুজলাসুফলা করে সাজিয়ে রাখেন তাকে। আর ডিমিটরের মন আনন্দে স্নেহে ভরিয়ে রাখে তাঁর কন্যা প্রসারপাইন। সকালবেলাকার প্রথম রোদ্দুরটির মতোই সে সুন্দর। আপন মনে সে ঘুরে বেড়ায় ফল-ফুলের বাগানে, ফুলের ঘাস-ঝলমল মাঠে। মাঠ, পাহাড়, ঝরনার জল যেন খুশি হয়ে ওঠে তাকে দেখে। এই প্রসারপাইনকে একদিন দেখলেন প্লুটো। স্বর্গের দেবরাজ জিউসের ছোট ভাই এই প্লুটো পাতালের মৃত্যুলোকের অধিপতি। দামি দামি ধাতুতে ভরা সেই পাতাললোক, কিন্তু অন্ধকার সেখানে চিরকাল। এমন আলোর ছটার মতো প্রসারপাইনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন প্লুটো। ইচ্ছে হল, নিজের রানি করে এই মেয়েকে নিয়ে যান পাতালে। এর সৌন্দর্যে হয়তো খুশি হয়ে উঠবে অন্ধকারও। কিন্তু কে সাহায্য করবে তাঁকে ? জিউস করবেন না। কেউই করবে না, কেননা কে না জানে ডিমিটরের ক্রোধ ? সৃষ্টি ছারখার করে দিতে পারেন ডিমিটর।

সুন্দর এক সকালে মাঠে-মাঠে বেড়াচ্ছিল প্রসারপাইন। ঘাসফুলগুলি যেন হেসে উঠছিল তার দিকে চেয়ে, মিষ্টি স্বরে গাছের ডাল থেকে গেয়ে উঠছিল পাখিরা। ঘুরতে-ঘুরতে একসময় মাঠের এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল প্রসারপাইন। একটি ছোট গাছে দোল খাচ্ছে একটি মাত্র মস্তবড় হলুদ ফুল। এই গাছ আর এমন ফুল কোনওদিন তো দেখেনি সে ? হাত বাড়িয়ে ফুলটি তুলতে গেল। কিন্তু টান লাগতে ফুলের বদলে উঠে এল গাছসুদ্ধই, আর মাটির সেই ছোট গর্তটি বাড়তে-বাড়তে হয়ে উঠল বিশাল এক গহ্বরের মুখ। প্রসারপাইনের

আইসিস

পুরনো সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এইসব শিল্পকর্মে

ফিরে এল বিপন্ন সরীসৃপ

গৌতম চক্রবর্তী

স্পিলবার্গের 'জস' ছবির সেই না-মানুষ নায়কের মতোই জন্তুটা আচমকা নদীর জলে তোলপাড় জাগিয়ে উঠে এল। এবং কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই এক তরুণীর আর্ত চিৎকার। পরমুহূর্তেই সে তলিয়ে গেল। তলিয়ে যাওয়ার সেই আলোড়নে নদীর জলের রং তখন শুধু লাল। প্রিন্স রিজেন্ট নদীর জল আর মানুষের রক্ত কয়েক মুহূর্তের জন্য তখন মিলেমিশে একাকার।

ভার্জিনিয়ার ২৫ বছর বয়সের তরুণী ফে মিডোস পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার এই শহরে সেবার শ্যুটিং করতে এসেছিলেন। বিখ্যাত এক কোম্পানির অ্যাড-ফিল্মের শ্যুটিং। প্রিন্স রিজেন্ট নদীর ধারে ছবির মতো এই সুন্দর শহরের নাম লাভারটন! ২৫ বছর বয়সেই ফে-র হাসিতে মুক্তো ঝরে, দু' চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে যখন-তখন সে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। কয়েক হাজার ওয়াটের উজ্জ্বল আলো, ক্যামেরাম্যান ও ডিরেক্টরদের ঘনঘন চিৎকারেও ২৫ বছর বয়সের এই তরুণীর সপ্রতিভতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। জীবনের ২৫টা বসন্ত ঋতু পার হতে-না-হতেই ফে আমেরিকার বিজ্ঞাপন জগতে নামকরা একজন মডেল। রুপোলি পরদায় তার চোখ-ধাঁধানো জৌলুসের ক্ষণিক উপস্থিতিতেই তখন বিক্রি হয়ে যায় কোটি-কোটি টাকার 'প্রোডাক্ট'।

শ্যুটিং সেরে সেদিন নদীতে সাঁতার কাটতে নেমেছিলেন ফে। এতক্ষণ তিনি একটি রবারের ভেলায় বসে অস্ট্রেলিয়ার এই নদী ও আকাশের মনোরম নিসর্গশোভা উপভোগ করছিলেন, স্রোতে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর মোটরবোট।

সুইমিং-কস্টিউম পরে, এক সময় ভেলা ছেড়ে নদীর ঠাণ্ডা জলের বুকে ঝাঁপিয়ে

পড়লেন ফে। কিছুটা সাঁতরে, মোটরবোটে উঠে তারপর তিনি নিজেকে শুকিয়ে নেবেন।
সাঁতার কাটতে-কাটতে ঘুণাক্ষরেও ফে টের পাননি, জন্তুটা একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। স্রোতে নিঃশব্দে ভাসতে-ভাসতে ভয়াবহ সেই মৃত্যুদানব ক্রমাগতই এদিকে এগিয়ে আসছে।
কুমিরটা তার বিশাল দেহে পাক দিয়ে প্রথমেই ফে-কে দাঁতে আঁকড়ে ধরল। বিশাল সরীসৃপের দেহের নিষ্পেষণ আর দাঁতের কামড়...আর্তনাদ করারও শক্তি নেই। ক্রমশ নিস্তেজ হতে-হতে অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন মডেল-জগতের কিংবদন্তি ফে মিডোস!
এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর, পাড়ের ধারে জলাভূমি থেকে কিছুটা ওপরে ছিটকে উঠল ছোট্ট একদলা মাংস।
কুমির একেবারে অনেকটা খেতে পারে না, এক টুকরো খাবার সে পয়সা টস করার মতো একটু ওপরে ছুঁড়ে দেয়, তারপর মুখ বাড়িয়ে সেটাকে লুফে নেয়। এরকমই তার খাওয়ার ধরন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিজ্ঞাপনের নারী তখন পরিণত হয়েছেন কুমিরের খাবারে।

মাদ্রাজ, ১৯৮৭

হিসাব করে দেখা গিয়েছিল, ১৭ মাসে ওরা ন'জন মানুষকে খেয়ে ফেলেছিল। ওরা মানে প্রিন্স রিজেন্ট নদীর সেই কুমিরগুলো।
অস্ট্রেলিয়ার নদী ছেড়ে এবার তা হলে ফিরে আসা যাক ভারতবর্ষে হ্রদ, জলাভূমি, পাহাড়, সবুজ মাঠ আর নদী নিয়ে এই যে বিশাল ভারত, সেখানেই তামিলনাড়ুর এক ছোট্ট গাঁয়ের কথা। নেয়ার বাঁধের লাগোয়া হ্রদের ধারে ছোট্ট এক গ্রাম। গ্রামের লোকেরা সেই হ্রদে পানীয় জল আনতে যায়, বাঁধানো ঘাটে স্নানার্থীরা গল্প করে। অস্ট্রেলিয়ায় নদীর সেইসব ইয়াট, রাবার-ক্র্যাফট আর মোটরবোট এইসব মানুষ কোনওদিন চোখে দেখেনি।
তবু এই দুই ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে কোথায় যেন আচমকা একটা মিল দেখা গিয়েছিল। মানুষের তীব্র আর্তনাদ আর নদীর জলের সঙ্গে ছেঁড়াখোঁড়া মাংসপিণ্ডের টকটকে লাল রক্ত একাকার হয়ে মিশে যাওয়ার মিল।
এক বছরের মধ্যে ১২ জন মানুষকে এরা খেয়ে ফেলে। এরা মানে নেয়ার বাঁধের লাগোয়া হ্রদের সেই কুমিরগুলো!

সরীসৃপ, না মৃত্যুর পরোয়ানা

"প্রত্যেক প্রাণীকে তার নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে জানতে হবে। বুঝতে হবে।" উত্তেজনায় একসময় প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন হ্যারি অ্যান্ড্রুজ। 'মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট'-এর কিউরেটর জীববিজ্ঞানী হ্যারি অ্যান্ড্রুজ।
বেসরকারিভাবে এ-দেশে একমাত্র কুমির গবেষণাগার 'মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক'।
হ্যারি অ্যান্ড্রুজের যুক্তিটা পরিষ্কার, জলের মতো স্বচ্ছ। মেসোজয়িক যুগে ফাইটোসর নামে একধরনের সরীসৃপ ছিল। প্রায় ৫০ ফুটের মতো লম্বা হত ডায়নোসরের দূর সম্পর্কের জাতভাই এই সরীসৃপগুলি। বিবর্তনের নানারকম কার্যকারণ ও জটিল সূত্র মেনে সেই ফাইটোসর থেকেই পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা সরীসৃপের উদ্ভব। সবচেয়ে লম্বা, শক্তিশালী এই সরীসৃপের নাম কুমির।
"জীববিজ্ঞান বিষয়ে বিন্দুমাত্র আইডিয়া আছে?" আর-এক জীববিজ্ঞানী খুব ধীরে-ধীরে বললেন, "থাকলে বুঝতেন, কুমির শুধু লম্বা সরীসৃপই নয়, এর এক-একটা ব্যাপার চমকে দেওয়ার মতো। শুধু অবাক হয়ে ভাবার মতো।"

কুমিরের ব্যাপার-স্যাপার

পৃথিবীতে একমাত্র পাখি ও স্তন্যপায়ীদের হৃৎপিণ্ডেই চারটে প্রকোষ্ঠ থাকে। দুটো অলিন্দ, দুটো নিলয়। এ ছাড়া উভচর, সরীসৃপ, এদের সকলের হৃৎপিণ্ডে মাত্র তিনটি করে প্রকোষ্ঠ!
কুমিরই একমাত্র বিশালদেহী সরীসৃপ, যাকে অনেকক্ষণ জলে থাকতে হয়। ফলে এর দেহে অক্সিজেনহীন রক্ত ও অক্সিজেনযুক্ত রক্তের মধ্যে সমান চাপ বা 'প্রেশার' থাকা উচিত।
প্রকৃতির বিবর্তন এই 'উচিত' কথাটার উত্তর দিয়েছে অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে। চাপ সমান রাখার জন্য কুমিরের হৃৎপিণ্ডে চারটি প্রকোষ্ঠ। আর, দুই মহাধমনীর সংযোগস্থলে রয়েছে 'ফোরামেন প্যানিজি' নামে ছোট্ট এক ছিদ্র। আর কোনও প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে এরকম ফোরামেন প্যানিজি নেই।
দু' নম্বর বৈশিষ্ট্য হল চোয়াল আর দাঁত। কুমিরের চোয়াল অসম্ভব শক্তিশালী, দাঁতগুলি এক-একটা 'সকেট' বা গর্ত-এর মধ্যে বসানো। সাপ তার বিষদাঁতের জোরে যত আস্ফালন করুক না কেন, কুমিরের দাঁতের কায়দার কাছে সব ঠান্ডা। পৃথিবীর আর কোনও সরীসৃপের দাঁত এরকম সুদৃঢ়ভাবে গর্তে প্রোথিত থাকে না। তার ওপর এক-একটা দাঁতের আকার এক-একরকম। কোনওটা বড়, কোনওটা ছোট, কোনওটা আর একটু বড়। সারা জীবন ধরেই এদের এরকম বিভিন্ন আকৃতির নতুন দাঁত গজায়। পুরনো ও ব্যবহৃত দাঁতগুলি একসময়ে ক্ষয়ে পড়ে যায়। পৃথিবীর আর কোনও সরীসৃপের এরকম বিভিন্ন আকারের দাঁত নেই।
"জেনে রাখুন, শোন বা ব্রহ্মপুত্র নদীর 'ঘড়িয়াল' বা আমাজনের 'অ্যালিগেটর', নিল নদের ভয়াবহ 'নাইল ক্রোকোডাইল'...." উত্তেজিতভাবে সেই জীববিজ্ঞানী বলেছেন, "তাই আমাদের কাছে ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। ওদের আমরা বাঁচাতে চাই।"
"শুধুই জীববিজ্ঞানের কারণে?"
"বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের জন্য।"
আর-এক জীববিজ্ঞানী এই আলোচনায় অদ্ভুতভাবে আমার চোখ খুলে দিয়ে বলেছেন, "কুমির কী খায়, জানেন?"
"এই মানুষ-টানুষ খায় বোধ হয়। লোকে সাঁতার কাটতে নামে আর পটপট করে তাদের কামড়ে খেয়ে ফেলে।"
হো-হো করে হাসতে-হাসতে সেই জীববিজ্ঞানী এবার বিজ্ঞানের কথা শুনিয়েছেন। "শুনুন, কুমির শিকার ধরে জলের সারফেস-লেভেলে। মানে, জলের ওপরে যেটা ভাসছে, কুমির সেটাকেই খাওয়ার চেষ্টা করে।"
জলের উপরিতলে সাঁতার কাটে বলেই কি ফে মিডোসের ওই দুর্ঘটনা?
পৃথিবীর এক লক্ষ মানুষের মতো আমিও একটা ভুল ধারণায় ভুগছিলাম। না, খাদ্য হিসাবে মানুষ একেবারেই অস্পৃশ্য। মেঠো ইঁদুর, জলের সাপ, ব্যাং, মাছ, পচা মাংস এগুলি কুমিরের নিজস্ব খাবার!

কুমির-সংরক্ষণ ও আমরা

১৯৭২ সালেই এ-দেশে চালু হয়েছিল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন। আর সেই আইনের শুরুতেই যেসব প্রাণীর অস্তিত্ব বিপর্যয়ের মুখে বলে জানানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে কুমিরের নামটাও আছে। রয়াল বেঙ্গল টাইগার, কস্তুরী হরিণের মতো কুমিরও তখন আইনের পরিভাষায় 'দ্য মোস্ট এনডেনজারড স্পিসিস'।
এই ঘটনার পর চার বছর কাটতে না কাটতেই ১৯৭৬ সালে ভারত সই করল

বন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ নিয়ে ব্যবসা বন্ধ করার এক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে। সেই চুক্তির অংশীদার এখন ১১২টি দেশ।

'গোরি' ভারতের গর্ব

কুমিরের গায়ের রং তো কালো। গায়ে কাঁটা-কাঁটা আঁশ, শক্ত চোয়াল আর দানবিক চেহারার এক কুৎসিতদর্শন প্রাণী।

'অ্যালবিনো' অর্থাৎ কি না সাদা কাক, সাদা বাঘ তো চিড়িয়াখানাতেই সবাই দেখেছে। কিন্তু যদি বলা যায় অ্যালবিনো বা সাদা কুমিরের কথা? সাদা অর্থে কিন্তু পুরোপুরি দুধের মতো সাদা নয়, সাদা আর কালোর মাঝামাঝি একটা রং।

সারা পৃথিবীতে এইরকম দুটিমাত্র কুমিরের অস্তিত্ব টিকে আছে। একটা আছে তাইল্যান্ডে, সেটি পুরুষ। আর প্যালাস্ট্রি প্রজাতির একমাত্র মহিলাটি রয়েছেন এই ভারতেই, ওড়িশার ভিতরকণিকা অভয়ারণ্যে। বনবিভাগের অফিসাররা তাঁরই নাম রেখেছেন 'গোরি'।

ওড়িশার ভদ্রক রেলস্টেশনে নেমে বাসে করে যেতে হবে চাঁদবালি। সেই চাঁদবালি থেকেই ভিতরকণিকাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৭ সালে এই ভিতরকণিকা অভয়ারণ্যেই খারখেরি ফার্ন আর সুন্দরী গাছের ঝোপের আড়ালে লোনা জলের এক কুমির ৬৮টা ডিম পেড়েছিল।

সেটাও রেকর্ড। কুমির একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়ে, কিন্তু পৃথিবীতে এত বড় কুমিরের ডিমের গোছা এর আগে কোনওদিন পাওয়া যায়নি।

ভিতরকণিকা অভয়ারণ্যের সুখবরটা আমরা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। ৩১ জুলাই ১৯৯০-এর ছোট্ট একটা খবর।

গোরি ডিম পেড়েছে। ওই ডিম ফুটেই হয়তো আবার কোনওদিন বেরোতে পারে দুষ্প্রাপ্য এক সাদা কুমির।

কুমির-গবেষণায় ভারত

ভারতে তিন ধরনের কুমির দেখা যায়। একটি হল লোনা জলের কুমির, 'ক্রোকোডাইলাস পোরোসাস'। এরা বেশ হিংস্র। অন্যটি হ্রদ বা মিঠে জলে থাকে। এর আর-এক নাম 'মাগার', বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'ক্রোকোডাইলাস পালুস্ট্রিস'। অন্যটি লম্বা-মুখ ঘড়িয়াল, জীববিজ্ঞানের ভাষায় 'গ্যাভিয়ালিস গ্যানজেটিকাস'। এই ঘড়িয়াল মাছ ছাড়া অন্য কিছু খায় না।

মাদ্রাজের ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক কৃত্রিম অবস্থায় তিন ধরনের কুমিরকে ডিম পাড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। এই কাজের জন্য ফ্রাঙ্কফুর্ট চিড়িয়াখানা একটি পুরুষ ঘড়িয়াল ধার দিয়েছিল, এয়ার ইন্ডিয়া ভারত সরকারের তরফে বিনা ভাড়ায় সে-ঘড়িয়ালটিকে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে মাদ্রাজে পৌঁছে দেয়। ৯ এপ্রিল ১৯৭৭, বন্দি-অবস্থায় জন্ম নিল পৃথিবীর প্রথম ঘড়িয়াল।

ওই মাদ্রাজেই।

ভারতের কুমির-গবেষণায় এর পর শুধুই সাফল্য। সারা দেশে কুমিরের জন্য তৈরি হল ১৩টা অভয়ারণ্য, তাদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ৩৫টা রিয়ারিং স্টেশন

ডিম পাড়ে। প্রায় ১১ থেকে ১৪ সপ্তাহ পরে সেই ডিম ফেটে কুমিরছানা বেরিয়ে আসে। মা-কুমির ডিমের ওপর মাটি চাপা দিয়ে কাছেই কোথাও বসে থাকে। তবু বিভিন্ন পাখি ডিম চুরি করে নিয়ে যায়। টিকটিকির মতো খুদে কুমির-শিশুরা যখন মায়ের সঙ্গে জলের দিকে এগিয়ে যায়, মায়ের চোখ এড়িয়ে অতর্কিতে তাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে ঈগল, বাজ ও অন্য সব পাখি।

কৃত্রিমভাবে ইনকিউবেটরে তা দেওয়ার কুমির-প্রকল্পে এই ঘটনার অনেকটাই রোধ করা গেছে।

শেষ পর্যন্ত ফল কী দাঁড়াল? সাতের দশকের গোড়ায় এ-দেশে যখন কুমির-প্রকল্প শুরু হল, তখন সরকারি হিসাবে সারা দেশ জুড়ে ছিল বড়জোর
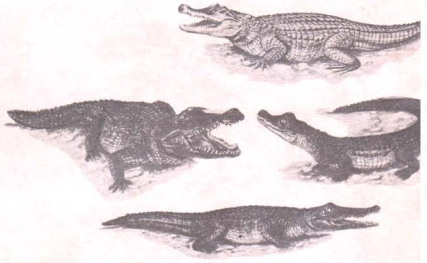
সবচেয়ে লম্বা ও শক্তিশালী সরীসৃপ—কুমির

আরও ২২টা অরণ্য তাদের রক্ষা করার জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দেবে স্থির হল।

এবং ১৯৮২ সালেই রেকর্ড করল পশ্চিমবঙ্গের ভগবতপুর কুমির প্রকল্প। লোনা জলের কুমিরের ক্ষেত্রেই ওটা হল। ভারতে কুমিরের প্রথম সফল কৃত্রিম প্রজনন।

এর আগে কৃত্রিম উপায়ে কুমিরের প্রজনন ঘটাতে পেরেছিল চারটে দেশ। হ্যারি এড্রুজের মতে, জঙ্গলে কুমিরের শতকরা ২ শতাংশ ডিম ফেটে বাচ্চা বের হয়, ৯৮ শতাংশ নষ্ট হয়। আমাদের হ্যাচারিগুলি ওই হিসাব উলটে দিয়েছে। এখন মাত্র ২ শতাংশ ডিম নষ্ট হয়।

স্ত্রী-কুমির গর্ত খুঁড়ে একবারে অনেকগুলি

কয়েকশো মাগার, লোনা জলের কুমির মেরে-কেটে ১০০, ঘড়িয়াল হয়তো ৭৫টা।

সব মিলিয়ে কুমিরের সংখ্যা আজ কিন্তু এ-দেশে প্রায় ২২,০০০-এরও বেশি। ১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী মাগার রয়েছে ১৫,০০০। লোনা জলের কুমির ৩০০০। ঘড়িয়ালের সংখ্যা পৌঁছেছে ৪০০০-এ।

ভারত, অস্ট্রেলিয়া ছাড়া কি পৃথিবীর আর কোথাও কুমির নেই? একেবারে ভুল! আফ্রিকাতেই আছে ভয়ঙ্কর 'নাইল ক্রোকোডাইল', চিনদেশে রয়েছে 'চাইনিজ অ্যালিগেটর', আর আমাজনের অরণ্যে ভয়ঙ্কর সেসব অ্যালিগেটর, 'কেম্যান'-দের কথা তো গল্পেই বহুবার পড়া গেছে।

বড়গল্প

থরহরির কীর্তি

দুলেন্দ্র ভৌমিক

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

মুড়াগাছা গ্রামের রামহরি সাহাকে চেনে না এমন লোক মুড়াগাছাতে তো নেইই, এমনকী, আশপাশের গ্রামেও তেমন লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত। চোখে না দেখলেও নাম শুনেছে। অথচ রামহরি এম· এল· এ, এম· পি নন, নামকরা ডাক্তার, অভিনেতা, খেলোয়াড় বা গাইয়ে-বাজিয়ে নন। তবুও মুড়াগাছা বাদ দিলে তার ডাইনে-বাঁয়ে মুগবেড়িয়া, আর সুখবেড়িয়া নামের যে দুটি গ্রাম রয়েছে, সে-গ্রামের প্রায় সবাই রামহরি সাহাকে চাক্ষুষ চেনে, না হয় নামে চেনে। রামহরি এম· এল· এ বা এম· পি নন, ডাক্তার, অভিনেতা বা খেলোয়াড়ও নন, সে-কথা ঠিক, কিন্তু গাইয়ে-বাজিয়ে নন এ-কথাটা আগে বলে বোধ হয় ভুল করেছি। রামহরি এটা জানতে পারলে খুশি হবেন না। রামহরি প্রতি সকালে আর সন্ধ্যায় খোল বাজান এবং হরিকীর্তন করেন। সেই হিসাবে তাঁকে গাইয়ে না বলে উপায় নেই।

মুড়াগাছা খুবই সাদামাঠা সাধারণ একটা গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে ইছামতী নদী। বাংলাদেশের আর-দশটা গ্রামের মতো এই গ্রামেও রথতলা, ষষ্ঠীতলা, পঞ্চাননতলা, শিবতলা এইরকম সব নামের জায়গা আছে। এই মুড়াগাছায় রামহরিবাবুরা কতদিন থেকে বাস করছেন, তা নিয়েও নানা তর্ক হয়ে গেছে। রামহরি নিজে আমাদের কাছে গল্প করেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষ নাকি পলাশির কাছে কোনও গ্রামে থাকতেন। একদিন ভর দুপুরবেলা সেই পূর্বপুরুষ, তখন তার বয়স বড়জোর বারো কি চোদ্দ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইট মেরে আলিবর্দি খাঁর বাগান থেকে কাঁচামিঠে আম পাড়ছিল। একেবারে অব্যর্থ টিপ। এক ঢিলে বোঁটা ছিঁড়ে একটা করে কাঁচামিঠে আম টুপ করে খসে পড়ছিল নীচে। একবার বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদে যাচ্ছিলেন আলিবর্দি খাঁ সাহেব, ভায়া পলাশির আমবাগান। তাঁর নজরে পড়ল দৃশ্যটা। পাইক-বরকন্দাজরা গিয়ে পাকড়াও করে আনল রামহরি সাহার সেই পূর্বপুরুষকে। বেচারা তো ভয়ে মরে। বৃদ্ধ আলিবর্দি খাঁ সুর্মামাখা চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?"

ছেলেটি ভয়ে-ভয়ে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, হুজুর, আমার নাম হরিচরণ সাহা।"

আলিবর্দি খাঁ বলে উঠলেন, "বাহা, বাহা, নামটি তো বেশ খাসা। তা তুমি ইট দিয়ে আম পাড়তে পারো?"

হরিচরণ ভয়ে-ভয়ে উত্তর দিল, "তা হুজুর, একটু-আধটু পারি।"

নবাবের মেজাজ বোঝা ভার। নবাব হরিচরণকে বাগানের কাছে নিয়ে এসে হুকুম করলেন, "পাথর লে আও।"

সঙ্গে-সঙ্গে নানা সাইজের ইটের টুকরো এল। নবাবসাহেব বললেন, "যেটা দেখাব সেটা পাড়তে হবে। কিন্তু হুঁশিয়ার, আমের গায়ে যেন পাথরের চোট না লাগে। শুধু বোঁটায় মারতে হবে।"

নবাবসাহেব একটা করে আম দেখান আর হরিচরণ তাক করে ঠিক তার বোঁটায় মারেন। এইভাবে সাত-সাতটা আম মাটিতে পড়ার পর নবাবসাহেব পরীক্ষা করে দেখলেন, একটি আমের শরীরেও ইটের দাগ পড়েনি। তারপর হরিচরণের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে হো হো করে হেসে উঠে হাঁক দিলেন, "সিপাহসালার।"

ডাক শোনার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়া ছুটল মুর্শিদাবাদের দিকে। নবাবসাহেব ঘোড়া থেকে নেমে শতরঞ্চ বিছিয়ে আমবাগানে বসলেন। খানদশেক গোলাপখাস আম খাওয়ার পর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলেন মিরজাফর। নবাবকে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই নবাবসাহেব বললেন, "এই ছেলেটার হাতের আন্দাজ বড় অদ্ভুত। একে এখনই সেনাদলে ঢুকিয়ে দাও। ট্রেনিং পেলে ছেলেটা মস্ত বড় যোদ্ধা হবে।"

রামহরির গল্প অনুযায়ী তাঁর পূর্বপুরুষ সেই প্রবাদপ্রতিম পুরুষ হরিচরণ নাকি মস্ত যোদ্ধা হয়েছিলেন। তাঁর হাতেই নাকি সিরাজের অসিযুদ্ধের আসল হাতেখড়ি। এর পরে যখন বর্গির আক্রমণ শুরু হয়, তখন বৃদ্ধ নবাব নাকি বর্গিদের রুখতে হরিচরণদের মুড়াগাছাতে পাঠিয়ে দেন—সেইসঙ্গে গোটা মুড়াগাছা গ্রামটাই দিয়ে দেন হরিচরণকে। কিন্তু সিরাজের অকালমৃত্যুর পর হরিচরণের পক্ষে কোনও উপযুক্ত সাক্ষী না থাকায় ক্লাইভসাহেব মুড়াগাছাটা কেড়ে নেন। তখন প্রাঞ্জল ভাষায় ক্লাইভের সঙ্গে নাকি অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। তবে হরিচরণ 'ইস্টুপিড' আর 'ভেরি গুড' ছাড়া আর কোনও ইংরেজি শব্দ জানতেন না বলে তর্কের মধ্যে মোট চোদ্দবার ইস্টুপিড আর একুশবার ভেরি গুড বলেছিলেন। সম্ভবত সেই কারণেই লালমুখো ক্লাইভ একেবারে বিনা বাধায় মুড়াগাছাটা পেয়ে গেলেন।

সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার পর হরিচরণ খুব মুষড়ে পড়েন। সেই সময় নাকি তিনি স্বপ্নাদেশ পান। বৈকুণ্ঠের শ্রীনারায়ণ তাঁকে ডেকে বলেন, "ওরে হরে, বিষয়ের মায়া ছাড়। মর্ত্যধামে আমার নাম

প্রচার কর। হরিনামই তোর বিষয় এবং আশ্রয়। আর সবই তুচ্ছ, স্রেফ মায়া। বিষয়ের ক্লেদ শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে গলায় তুলে নে খোল। প্রাণভরে বল হরিবোল।"

এর পর থেকেই হরিচরণ একেবারে পুরোপুরি হরিভক্ত হয়ে গেলেন। তাঁরই নির্দেশ অনুসারে বংশের সবার নামের সঙ্গে তাই আজও'হরি'শব্দটা জড়িয়ে আছে। হরি শব্দ বাদ দিয়ে এই বংশের কারও নাম রাখার উপায় নেই।

রামহরি সাহার এই গল্প গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই জানে। কেউ এ-নিয়ে কখনও কোনও প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু গোল বাধালেন হাই স্কুলের ইতিহাসের মাস্টারমশাই। তিনি একদিন উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আলিবর্দি খাঁ ভরদুপুরে পলাশির বাগানে বসে গোলাপখাস আম খেয়েছেন এর কোনও ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। বর্গি-আক্রমণ কখনওই মুড়াগাছার দিক থেকে হয়নি ফলে সেই আক্রমণ ঠেকাবার জন্য প্রয়াত হরিচরণকে মুড়াগাছাতে পাঠানোর কোনও প্রয়োজনই নেই। তা ছাড়া দশখানা গোলাপখাস আম খেতে আলিবর্দি খাঁর যে সময় লাগবার কথা, সেই সময়ের মধ্যে কখনওই মুর্শিদাবাদ থেকে মিরজাফর পলাশিতে এসে পৌঁছতে পারেন না। তা ছাড়া লর্ড ক্লাইভ যে সমস্ত সম্পত্তি ···

হাই স্কুলের ইতিহাসের মাস্টারমশাই গোপাল সামন্ত যখন উত্তেজিত হয়ে এসব কথা বলছিলেন, তখন রামহরিবাবু সেখানে দাঁড়িয়ে। তিনি কিছুটা শোনার পর আর থাকতে না পেরে গোপালবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "খামোখা বিদ্যে ফলাবেন না। আমি তো আগেই বলেছি, উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে গোটা মুড়োগাছা বেহাত হয়ে গেল। আজ যদি আলিবর্দিবাবু,মিরজাফর, সিরাজ, নিদেনপক্ষে ক্লাইভও থাকতেন তা হলে ওঁরাই আপনাকে বলে দিতেন কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে। আর গোলাপখাস আমের কথা বলছেন ? নবাব বাগানের আসল গোলাপখাস খাওয়া তো দূরের কথা, চোখে দেখেছেন কখনও ? তুলো দিয়ে মুড়ে রাখতে হয়। ওই আমের আঁটি চুষতে হয় বিশ মিনিট ধরে। তা দশটা আমের আঁটি চুষতেই তো দুশো মিনিট। সেইসঙ্গে রয়েছে আম, একটু কথাবার্তা। সাকুল্যে দাঁড়াল তা হলে কমপক্ষে চারশো মিনিট। তার মানে ছ' ঘন্টা চল্লিশ মিনিট। মিরজাফরের ঘোড়া কি মুর্শিদাবাদ থেকে পলাশিতে ছ' ঘন্টা চল্লিশ মিনিটেও আসতে পারে না ? এটা কি আপনার সরকারি বাস,না বনগাঁ লোক্যাল ?"

গোপালবাবু হকচকিয়ে গিয়ে বলে ফেললেন, "বেগবান অশ্বের এতটা সময়ই বা লাগবে কেন ?"

রামহরি সাহা ভেংচি কাটার মতো করে উত্তর দিলেন, "কেন লাগবে না। মিরজাফর তো ঘোড়ায় চেপে বসে ছিলেন না। যখন খবর গেল তখন তিনি বাথরুমে। ওই অবস্থায় তো আসতে পারেন না। তৈরি হয়ে সেনাপতির বেরুতে একটু সময় তো লাগবেই।"

গোপালবাবু একটু রেগে গেলেন। বললেন, "এসব কথা কোন ইতিহাসে লেখা আছে ? কোথায় পেয়েছেন এসব তথ্য ? ইতিহাস নিয়ে চালাকি করবেন না।"

এবার রামহরিবাবুও ফোঁস করে উঠে বললেন, "আপনিও আমার পূর্বপুরুষদের নিয়ে চালাকি করবেন না। সবকথা কি বইতে লেখা থাকে ?"

গোপালবাবু তর্কের ঝোঁকে বলে ফেললেন, "আলবত থাকে।"

রামহরি বললেন, "আলবত থাকে ?"

গোপালবাবু আবারও বললেন, "থাকে। থাকতে বাধ্য।"

রামহরিবাবু এবার কাঁধের গামছা কোমরে বেঁধে বললেন, "তাই যদি থাকে তবে বলুন তো ছেলেবেলায় সিরাজের কবে হাম হয়েছিল ? আমের দেশের লোক, পেটের গোলমালও নিশ্চয় হয়ে থাকবে। কবে, কোন সালে আলিবর্দির কঠিন পেটের অসুখ হয়েছিল ? ভাস্কর পণ্ডিতের ন' কাকিমার নাম কী ? লুৎফার সঙ্গে সিরাজের বিয়েতে কী মেনু হয়েছিল ? আলিবর্দির পিসেমশাই কে ? শাজাহানের ব্লাডপ্রেসার কত ছিল ? সম্রাট অশোকের

Adding elegance to convenience.

Gently press the button on the ***feather touch*** control panel and go shopping if you feel like. The Fully Automatic Videocon Washing Machine will wash and dry clothes, curtains, linen, small carpets, rugs etc. and shut itself off automatically, even without your presence. Thanks to the latest, ***state - of - the - art*** Micro-Computer based Technology. Manufactured in technical collaboration with world leaders in Washing Machine Technology, it offers you all the benefits you expect from a world class product. The superior ***'Pulsator Wash'*** eliminates the need for 'hot water' and thus increases fabric life. Other benefits include quiet operation, choice of wash programmes, feather touch control panel, special facility for using fabric softener and bleach. The fully automatic Videocon Washing Machine is backed by a two year warranty and a reliable countrywide after sales service network.

FEATHER TOUCH

VIDEOCON

Washing Machines

SJAS 91002

Manufactured in technical collaboration with Matsushita Electric Industrial Co. Japan, owners of the brand name National.

মুখেভাতে কে মুখে ভাত দিয়েছিলেন ? মামা, না ঠাকুর্দা, না কি জ্যাঠা ? চাণক্য কি কখনও ছোটবেলায় আলুভাতে ভাত খেয়েছিলেন ? তখন পোস্ত ক' টাকা সের ? কাটা পোনার দর কত ছিল ?"

রামহরির তখন উগ্রমূর্তি। অন্যদিকে ইতিহাসের মাস্টারমশাই গোপালবাবু হতভম্ব। এ ধরনের ঐতিহাসিক সঙ্কটে তিনি কখনও পড়েননি। তিনি গলা নিচু করে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই রামহরি বলে উঠলেন, "এর একটাও যদি ঠিক উত্তর দিতে পারেন তা হলে গামছা কাঁধে নিয়ে দণ্ডি কাটতে-কাটতে আমি মুড়াগাছা ছেড়ে চলে যাব।"

গোপালবাবু বলে উঠলেন, "আহা, যাবেন কেন। আর যদি যান তা হলে অত কষ্ট করে যাওয়ার দরকার কী ! দিব্যি বাসে করেই তো যেতে পারেন।"

শেষ পর্যন্ত গোপালবাবুকেই রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল। বলতে হয়েছিল, "না মশাই আপনার এই ধরনের ঐতিহাসিক প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে।"

রামহরি মুড়াগাছা গ্রামের খুবই জনপ্রিয় মানুষ সন্দেহ নেই, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে। তাঁর পূর্বপুরুষদের যে-কাহিনী তিনি স্বয়ং চালু করেছেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করলে কিংবা কটু মন্তব্য করলে তিনি রেগে যাবেন। কেউ যদি মুড়াগাছা গ্রামকে অন্য কোনও গ্রামের সঙ্গে তুলনা করে ছোট করতে চায় বা মুড়াগাছার কৃতিত্ব খর্ব করতে চেষ্টা করে তা হলেও তিনি বিষম রেগে যান। এ ছাড়া রয়েছে হরিনাম। এ-ব্যাপারে কোনও বিরূপ মন্তব্য তিনি সহ্য করতে পারেন না। আর রেগে গেলে তিনি যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেন। একবার পঞ্চাননতলার ধরণী ধর মশাই রামহরিবাবুকে হরিকীর্তন নিয়ে কী একটা বলতেই তিনি লাফ দিয়ে তাঁর দোকানের মাচা থেকে নেমে এসে প্রথমে বিকট গলায় চিৎকার করতে আরম্ভ করলেন, তারপর নিজের দোকান থেকে এক দোয়াত কালি এনে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "শোনো, শোনো, মুড়াগাছার নাগরিকবৃন্দ। হরিনামের অপবাদ সহ্য করতে না পেরে আমি আত্মঘাতী হলাম। এই পাপবাক্য শোনার চাইতে আত্মঘাতী হওয়া ঢের পুণ্যের। আমার দোকানে বিষ বিক্রি হয় না। তাই এক দোয়াত কালি খেয়ে আমি প্রাণত্যাগ করলাম।"

এই বলে এক দোয়াত কালি খেতে শুরু করেছিলেন। বিমূঢ় ধরণী ধর প্রায় ধস্তাধস্তি করে সেই কালির দোয়াতটি তাঁর হাত থেকে উদ্ধার করেন। কিছুটা কালি অবশ্য রামহরি খেয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ কালি ধস্তাধস্তির সময় উলটে পড়েছিল ধরণী ধরের সারা মুখে। রামহরিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তারবাবু ধরণীবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কালি খেল তো রামহরি, তা আপনার সারা মুখে এত কালি লাগল কেমন করে ?"

হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই রামহরি চিৎকার করতে লাগলেন, "সুইসাইড কেস। থানায় খবর দাও। আত্মহত্যার কারণ জানাতে হবে।"

ধরণীবাবু রামহরির পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে মিনতি করতে লাগলেন, "দোহাই আপনার। থানা-পুলিশ করবেন না। আর কস্মিনকালেও আপনার কেত্তন নিয়ে কিছু বলব না।"

পিতার পরিচয়েই পুত্রের পরিচয়। অতএব রামহরির ছেলেদের কথা বলবার আগে রামহরির বৃত্তান্তটা একটু বিস্তারিত করে বলতে হল। মুড়াগাছার বিখ্যাত কবিরাজ জীবনবল্লভ আচার্য মহাশয়ের দুটি বিষয়ে খুব নামডাক। এক, কবিরাজি চিকিৎসা। দুই, পাড়ার সমস্ত নবজাতক-জাতিকার নামকরণ। শেষোক্ত কাজটা তিনি নিজেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। পাড়ায় কেউ জন্মালে তিনি নিজে গিয়ে তার নামকরণ করে আসেন। আর এ-ব্যাপারে কোবরেজমশাইয়ের ওপর রামহরির গভীর আস্থা। রামহরির প্রথম ছেলের নাম রাখা হয়েছিল ভজহরি। কয়েক বছর পর যখন আবার ছেলে হল, তখন কোবরেজমশাই নাম রাখলেন থাকোহরি। সমস্যা দেখা দিল তৃতীয় ছেলের বেলায়। রামহরি ছেলে হতেই ছুটলেন কোবরেজমশাইয়ের কাছে। তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে। বারান্দায় বসে কোবরেজমশাই পাঁচন তৈরি করছিলেন। রামহরিকে দেখে চশমার ভেতর দিয়ে তাকালেন। বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, "কী সংবাদ ?"

রামহরি বললেন, "আজ্ঞে, এটিও ছেলে।"

কোবরেজমশাই বললেন, "সুসংবাদ। তবে নামকরণে বিস্তর সমস্যা দেখা দেবে। তোমার এই ছেলেকে হরি-ছাড়া হতে হবে।"

রামহরি হাত নেড়ে বলে উঠলেন, "দয়া করে ওটি করবেন না। হরি ছাড়া কোনও নাম আমাদের বংশে চলবে না।"

কোবরেজমশাই বিরক্ত গলায় বললেন, "চলবে না তো বুঝলুম, কিন্তু এত হরি পাব কোথায় ? তোমাদের অতি বৃহৎ বংশে হরি তো নেহাত কম নেই। হরিচরণ দিয়ে শুরু। এই হরিনামের মিছিল কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে।"

রামহরি কাতর কণ্ঠে বললেন, "উপায় আপনাকেই করতে হবে। এ-ব্যাপারে আর কার কাছে যাব।"

কোবরেজমশাই হাঁক দিয়ে বললেন, "বিল্টে, অ্যাই বিল্টে।"

কাজের ছেলেটা কাছে আসতেই তিনি বললেন, "এই পাঁচনটা নিয়ে যা। নিশ্চিন্দের ছালগুলো নিয়ে আয়। হামানদিস্তায় থেঁতো করতে হবে।"

বিল্টে একটু পরেই হামানদিস্তা দিয়ে গেল। কোবরেজমশাইয়ের সামনে কাঁধে গামছা নিয়ে রামহরি বসে। হামানদিস্তায় নিশ্চিন্দে গাছের ছাল থেঁতো করতে-করতে কোবরেজমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বড় ছেলের নাম কী দিয়েছিলুম যেন ?"

রামহরি উত্তর দিল, "আজ্ঞে, ভজহরি।"

কোবরেজমশাই বললেন, 'হুঁ, তার পরেরটির ?"

রামহরি উত্তর দিল, "আজ্ঞে, থাকোহরি ?"

কোবরেজমশাই বললেন, "রাখহরি নামটা কি ফ্রি আছে ?"

রামহরি বললেন, "আজ্ঞে, ওটা তো আমার বড় ভাইপোকে দিয়েছেন।"

কোবরেজমশাই হামানদিস্তায় ঘা মারতে-মারতে ভাবতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, "তোমার দাদার নাম তো প্রাণহরি, তাই না ?"

রামহরি বললেন, "আজ্ঞে, আপনি ঠিকই বলেছেন।"

আবার হামানদিস্তায় ঘা পড়তে লাগল। খানিকবাদে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের প্রথা অনুপাতে হরিকে তো অগ্রে রাখা যাবে না। নামের শেষে হরি রাখতে হবে তাই তো ?"

রামহরি বিগলিত ভঙ্গিতে বললেন, "আজ্ঞে, হরি তো বিশ্বময়। সংসারময়। তবে কিনা শেষে হরি দিলে বাপ-ঠাকুর্দার নামের সঙ্গে ছন্দটা মেলে। আমি রামহরি, দাদা প্রাণহরি, ছেলেরা সবাই ভজহরি, রাখহরি, থাকোহরি। আমার বাবা ছিলেন জীবনহরি। তৃতীয়টির নামের শেষে যদি হরি রাখেন তবে বড় কৃতার্থ হই।"

কোবরেজমশাই স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বললেন, "হরি হে, এবার আমায় বাঁচাও।"

কোবরেজমশাইয়ের সামনে গামছা কাঁধে অনেকক্ষণ বসে রইলেন রামহরি। বেলা বাড়তে লাগল। গায়ে তেল মেখে এবার স্নানে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন জীবনবল্লভ আচার্য। গায়ে তেল মাখতে-মাখতে একবার রামহরির দিকে তাকালেন। মুচকি হাসলেন। রামহরি বুঝলেন এইবার কোবরেজমশাই নাম খুঁজে পেয়েছেন। বসা অবস্থাতেই একটু এগিয়ে এসে শুধোলেন,

"মনে পড়েছে ?"

কোবরেজমশাই নাকে তেল দেওয়া শেষ করে বললেন, "একটা নাম মনে এসেছে, তবে এটা চলবে কিনা বলতে পারি না।"

রামহরি কৃতার্থ হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "বলেন কী! আপনারা মনে যে নাম এসেছে সেটা আবার অচল হবে কেমন করে। এই নিন কাগজ। লিখে দিন।"

কোবরেজমশাই গামছায় তেলহাত মুছে নিয়ে বললেন, "অগ্রে নয়, শেষে হরি রাখতে হবে তো। তাই নাম দিলুম থরহরি।"

ছেলের নামকরণ শুনে আঁতকে উঠলেন রামহরি। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবলেন। কোবরেজমশাই তো নামকরণ করে দিয়ে পুকুরে গেলেন স্নান করতে। রামহরি নিজের বাড়ি থেকে যখন ঘুরে আবার কোবরেজমশাইয়ের কাছে ফিরে এলেন তখন তিনি সবেমাত্র দুপুরের খাওয়া শেষ করে দিবানিদ্রার আয়োজন করছেন। কোবরেজমশাইয়ের শিয়রের কাছে একটি জানলা। সেই জানলা দিয়ে রামহরি মুখ বাড়ালেন। কাতর গলায় ডাকলেন, "কোবরেজমশাই।"

কোবরেজমশাই রামহরিকে দেখলেন। ছোট্ট একটা ঢেকুর তুলে বললেন, "আবার কী চাই ?"

রামহরি বললেন, "আজ্ঞে, ওই নামটার বিষয়ে যদি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করেন।"

কোবরেজমশাই বললেন, "নাম তো একটা দিয়ে দিলুম। একেবারে বাপ-দাদার সঙ্গে মেলানো নাম।"

রামহরি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, "তা একটা দিয়েছেন বটে। কিন্তু বাড়ির সবাই ওই নাম শুনে তো কেঁপে উঠছে।"

কোবরেজমশাই একটু অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, "কেন, কেঁপে উঠছে কেন ? হরি নামে তো কারও কেঁপে ওঠার কথা নয়।"

রামহরি বললেন, "আজ্ঞে, নামটার গায়ে বড্ড শ্মশানযাত্রীর গন্ধ। রাতবিরেতে ছেলেকে যদি গলা ছেড়ে ডাকি 'বলহরি, বলহরি' তা হলে তো পাড়াপড়শিরা খাটে কাঁধ দেওয়ার জন্যে গামছা নিয়ে ছুটে আসবে। বিভ্রাট বেঁধে যাবে কোবরেজমশাই।"

কোবরেজমশাই মুখে একটুকরো হরীতকী ফেলে বললেন, "বিভ্রাট হওয়া অসম্ভব নয়। একটু শ্মশান-শ্মশান গন্ধ আছে বইকী।"

রামহরি জানলার শিক ধরে প্রায় ঝুলে পড়ার মতো ভঙ্গি করে বললেন, "তা হলে ওটা বদলে অন্য একটা কিছু ভাবুন।"

মুখে হরীতকীর টুকরো নিয়ে চোখ বুজে চুষতে-চুষতে হঠাৎ বলে উঠলেন, "পেয়ে গেছি। ছোটটার নাম রাখো থরহরি। শ্রীমান থরহরি সাহা। রামহরি, বড় ছেলে ভজহরি, তস্য ভ্রাতা থাকোহরি এবং তস্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা থরহরি। একেবারে হরির লাগাতার নামকীর্তন।"

রামহরি ওই নাম নিয়েই খুশি হলেন এবং ক্রমে-ক্রমে নামটাও চালু হয়ে গেল মুড়াগাছা গ্রামে। থরহরি যে ভবিষ্যতে কেমন দাঁড়াবে তার কিঞ্চিৎ নমুনা শিশুকাল থেকেই সে দিতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু শৈশব পেরিয়ে মধ্য-কৈশোরে এসে থরহরি মুড়াগাছার কাছে সত্যিই থরহরি কম্পমান হয়ে উঠল। এবার সেই থরহরির মুখোমুখি হওয়া যাক।

॥ ২ ॥

মুড়াগাছা প্রাইমারি বিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছাত্র হিসাবে থরহরির নাম ছিল। যে-কোনও বিষয় একবার শুনলে বা পড়লে সেটা দিব্যি মনে রাখতে পারত। আর ছেলেটার জানবার কৌতূহলও ছিল অফুরান। খোল কেমন করে তৈরি হয় এবং তার মধ্যে কী এমন বস্তু থাকে যাতে অত সুন্দর বাজনা বেরোয় সেটা জানতে সে একদিন বাপের খোলটাকেই আছড়ে ভেঙে দিয়েছিল। বৃত্তি পরীক্ষার সময় 'একটি অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা দাও' শীর্ষক রচনা লেখবার জন্য বাবার খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে বসে থরহরি আগুন দেখছিল আর রচনা লিখে যাচ্ছিল। যেহেতু লেখাপড়ায় ছেলেটার মাথা ভাল, তাই রামহরি ছেলের এসব কাণ্ডে মনে-মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলতেন না। কিন্তু যেদিন রামহরির পোষ্য এবং অতি আদরের গোরুগুলিকে নিয়ে থরহরি বিদ্যাচর্চা করতে লাগল সেদিন আর তিনি রাগ সামলাতে পারলেন না। ঘটনাটা ঘটেছিল যখন থরহরি ক্লাস সেভেনে পড়ে। বাড়ির রাখাল রোজই গোরু নিয়ে মাঠে যায় আর বিকেলবেলা ফিরে আসে। থরহরি একদিন রাখালকে হটিয়ে দিয়ে নিজেই গোরু নিয়ে মাঠে গেল। তার মনে হল গোরুগুলো রোজই এক রাস্তা দিয়ে যায় আবার সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে আসে। এতে গাঁয়ের পথঘাট ভাল করে চেনা হয় না। গোরুদের পথ চেনাবার জন্য নিয়ে গেল অনেক দূরে এবং সব ক'টার গলায় নাম-ঠিকানা লিখে নিজে চলে গেল ফুটবল খেলতে। সন্ধ্যা পেরিয়ে যাওয়ার পরও গোরু ফিরল না দেখে রামহরি তাঁর দলবল নিয়ে গোরু খুঁজতে বেরোলেন। গোরুগুলো পাওয়া গেল বটে, তবে অনেক ঝামেলা করে। কয়েকটাকে পাওয়া গেল সুখবেড়িয়ার খোঁয়াড়ে, দুটো মুখবেড়িয়ার জঙ্গলে আর একটাকে গোহাটার কাছে একজনের বাড়িতে। সব কটা গোরুকে নিয়ে রামহরি বাড়ি ফিরলেন রাত্রি এগারোটা নাগাদ। রাগে তাঁর শরীর জ্বলছে। ছেলেকে উচিত শিক্ষা দিতে না পারলে তাঁর গায়ের জ্বালা জুড়োবে না। তিনি গোরুগুলোকে গোয়ালে ঢুকিয়ে ওদের খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারপর গেলেন দুধ দুইতে। সন্ধ্যাবেলার দুধ তো নেওয়াই হয়নি। কিন্তু দুধ কোথায় ? যে দুটি গোরু সুখবেড়িয়ার জঙ্গলে ছিল কেবল সেই দুটির বাঁট থেকে দুধ পাওয়া গেল। বাকিগুলোর দুধ বোধ হয় আগেই কেউ নিয়ে নিয়েছে। রামহরি রেগেই ছিলেন। এবার সেই আগুনে ঘৃতাহুতি হল। তিনি গর্জন করে ডাকলেন, "থরহরি, ব্যাটা থরহরি কোথায় ?"

থরহরির মা চিৎকার শুনে ঘরের বাইরে এলেন। অবাক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সে কী! তুমি ছোট খোকার খোঁজ করছ কেন ? ছেলেটা তো খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছে।"

রামহরি বেজায় রেগে ছিলেন। রাগের গলাতেই বললেন, "ওর ঘুম আমি দেখাচ্ছি। আমার পোষ্য গোরু, বিষ্ণুর বাহন, তাঁকে নিয়ে ওর ছেলেখেলা। কাল সকালে বাড়ি-বাড়ি যে দুধ দিতে হবে সে দুধ পাব কোথায় ?"

রামহরির স্ত্রী এবং তাঁর দাদা প্রাণহরি কোনওক্রমে রামহরিকে শান্ত করে খেতে পাঠালেন। সকালবেলা ছেলেকে এসব কথা বলতেই থরহরি বলল, "আমি ভেবেছিলুম ওরা পথ চিনে চলে আসতে পারবে। এতদিনেও যদি গাঁয়ের পথঘাট চিনতে না পারে তা হলে ওদের পুষে কী লাভ ? হয় ওদের জন্য একজন গাইড রাখো, না হয় বিক্রি করে দাও।"

রামহরি রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "ওরা তোর চাইতে উপকারী। তুই তো একটা আস্ত পাঁঠা।"

থরহরি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, "পাঁঠা তো বাবা আস্তই হয়। আধখানা পাঁঠা কি তুমি দেখেছ ? মাংস হতে পারে, কিন্তু পাঁঠা আধখানা হবে কী করে ?"

বাবার সামনে কথাগুলো বলে চলে যাওয়ার পর থরহরির মনে হল, জগতে পাঁঠা এবং গোরুর মধ্যে কে বেশি উপকারী ? পাঁঠা তো মানুষের বাসনা নিবৃত্তির জন্য নিজেকে সমর্পণ করে। বারোয়ারি কালীতলায় তো পুজোর সময় পাঁঠাকেই বলি দেওয়া হয়। এই গুরুতর চিন্তাটা দু-তিনদিন ধরে থরহরিকে বড্ড

জ্বালাতন করে চলল। তারপর থাকতে না পেরে একদিন অঙ্কের সার ভূদেববাবুকে জিজ্ঞেস করল, "সার, জগতে পাঁঠা এবং গোরুর মধ্যে কোনটা বেশি উপকারী ?"

অঙ্কের সার তখন ছাত্রদের আয়তক্ষেত্র বোঝাচ্ছিলেন। হঠাৎ থরহরির প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন, "কী বললি ?"

থরহরি আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করতেই ভূদেববাবু বললেন, "এদিকে আয়। এদিকে আয় চট করে।"

থরহরির পরনের প্যান্টটা একটু বেশি ঢোলা। মাঝে-মাঝেই কোমর থেকে নীচে নেমে আসে। তাই যখনই বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ায় তখনই দু' হাত দিয়ে প্যান্টটা ওপরে টেনে তুলতে হয়। ওটা এখন থরহরির মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। অঙ্কের সারের ডাক পেয়ে থরহরি উঠে দাঁড়াল এবং প্যান্টটা ওপরের দিকে টেনে তুলতে-তুলতে এগিয়ে এল অঙ্ক-সারের সামনে।

ভূদেববাবু বাঁ হাতে থরহরির ঘাড়টা ধরে গর্জন করে উঠলেন, "যা, বেরিয়ে যা আমার ক্লাস থেকে। তোর মতো বাঁদর যেন ক্লাসে না থাকে।"

থরহরি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ডাকল, "সার।"

ভূদেববাবু তখনও রেগে আছেন। হাতের ডাস্টার তুলে বললেন, "অ্যাই বাঁদর, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা।"

থরহরি খুব বিনীত ভঙ্গিতে বলল, "যাচ্ছি সার! কিন্তু একটা কথা বড্ড জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। বাবা বললেন পাঁঠা, আপনি বললেন বাঁদর। তা গোরু, পাঁঠা আর বাঁদরের মধ্যে কে বেশি ভাল ?"

থরহরির প্রশ্ন শুনে ভূদেববাবু কয়েক সেকেণ্ড স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে গর্জন করে উঠে বললেন, "তুই বাঁদর না,শুয়োর।"

থরহরি বলল, "সার, আপনি লেখাপড়াজানা মানুষ। কিন্তু আপনার কথার কোনও ঠিক নেই। যা বলবেন তা ভেবে বললেই হয়। ঘন-ঘন কথা পালটানো কি ভাল।"

ভূদেববাবুর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। গোটা ক্লাস নিস্তব্ধ। তিনি রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "ঘন-ঘন কথা পালটাই মানে ? আমি মিথ্যেবাদী। কী বলতে চাস তুই ?"

থরহরি বলল, "এক মিনিট আগে সবার সামনে বললেন আমি বাঁদর। ঠিক এক মিনিটেই আপনি মত বদলে বললেন, আমি শুয়োর। একসঙ্গে তো বাঁদর আর শুয়োর হওয়া যায় না। তাই ভেবে যে-কোনও একটা বলুন।"

থরহরির কথা শুনে ক্লাসসুদ্ধু সবাই শব্দ করে হেসে উঠতেই ভূদেববাবু আরও রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে হাতের ডাস্টারটা ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে সোজা চলে গেলেন হেডসারের ঘরে। টিফিনের সময় থরহরির ডাক পড়ল হেডসারের ঘরে। থরহরি নিজের প্যান্ট টেনে ওপরে তুলতে তুলতে হেডসারের ঘরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। পণ্ডিতমশাই হেডসারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে থরহরিকে দেখে বলে উঠলেন, "যা, সারের কাছে যা। বেয়াদপি করার মজা টের পাইবি। তুই একটা রামছাগল।"

হেডসারের সামনে ভূদেববাবু এবং আরও দু'জন সার বসে। হেডসার থরহরিকে দেখেই বললেন, "এই, তুই ভূদেববাবুর মুখে-মুখে তর্ক করেছিস কেন ? কেন ওঁকে অপমান করেছিস ?"

থরহরি হাতজোড় করে করুণ স্বরে বলল, "সার, আমি মোটেও ওঁকে অপমান করিনি। আমি শুধু ওঁকে বলেছি, সার যা বলবেন তা ভেবে বলুন। মিনিটে-মিনিটে কথা পালটানো কি ভাল ?"

হেডসার টেবিলের ওপর একটা চাঁটি মেরে বললেন, "সারকে কি এ-কথা বলতে পারো ? উনি কি ঘন-ঘন কথা পালটানোর মানুষ !"

থরহরি আগের মতোই করুণস্বরে বলল, "ক্লাসের সবাইকে ডাকুন। ওরা তো দল বেঁধে মিথ্যে বলবে না। আমি সারের সামনেই বলছি, উনি প্রথমে আমাকে বললেন, বাঁদর। মিনিট পার হতে-না-হতেই বললেন শুয়োর। এটা কি কথা পালটানো নয় ? একটা প্রাণী কি একই সঙ্গে বাঁদর আর শুয়োর হতে পারে ? আর যদি হতেই পারে তা হলে একটা সরল অঙ্কের দুটো উত্তর হলে নম্বর কাটা যাবে কেন ?"

হেডসার চোখ তুলে থরহরির দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বললেন, "বকাবকির সময় ওরকম হয়। তুই একটা গাধা, তাই বুঝতে পারিসনি।"

থরহরি যেন বিষম সমস্যায় পড়েছে তেমন ভাব করে কাতর কণ্ঠে বলল, "সার, আপনারা পণ্ডিত লোক, আমার পূজনীয়। আপনারা কেউ একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। অঙ্কের সার বললেন, আমি বাঁদর, পরে শুধরে নিয়ে বললেন শুয়োর। আপনার ঘরে আসবার আগে পণ্ডিতমশাই বললেন রামছাগল, আপনি বললেন গাধা। কারও সঙ্গেই তো কারও কথা মিলছে না। আপনাকে যদি পাঁচজনে পাঁচ নামে ডাকে তা হলে আপনার কেমন লাগবে ? আপনারা বসে যে-কোনও একটা নাম ঠিক করুন। একসঙ্গে অতগুলো প্রাণী কি কারও পক্ষে হওয়া সম্ভব ?"

হেডসার চোখ বড়-বড় করে থরহরির কথা শুনছিলেন। এবার চোখের চশমা খুলে টেবিলে রেখে বাঁ হাতটা টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে লম্বা একটি বেত বার করে এনে বললেন, "ঘুরে দাঁড়া। পিঠে পাঁচ ঘা বেত দিলে তোর পাকামো ঘুচবে।"

থরহরি হেডসারের কথামতো ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, তখনই অঙ্কের সার ভূদেববাবু বললেন, "পাঁচ নয় সার, দশ ঘা মারুন।"

সেই সময় ঘরে ঢুকছিলেন পণ্ডিতমশাই। তিনি বললেন, "বেতাবেতির দরকার কী! তার চাইতে আপনার ঘরের সামনে ছুটি পর্যন্ত নিল ডাউন করে রাখুন। স্কুলের বেবাক ছাত্র দেখুক।"

হেডসারের কথামতো ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও থরহরি শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়াল না। আগের মতোই হেডসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুব চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠল, "দেখলেন তো, এখানেও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। এক-এক সারের এক-এক মত। আপনি বললেন পাঁচ ঘা, অঙ্কের সার বললেন দশ ঘা, আবার পণ্ডিতসার হুকুম দিচ্ছেন নিল ডাউন। দোষ যদি করেই থাকি তবে একটা দোষের জন্য এতরকম শাস্তি হবে কেন ? একই সঙ্গে তো প্রাণদণ্ড আর কারাদণ্ড হতে পারে না। আপনারা ভেবে ঠিক করুন কী করবেন। পাঁচ ঘা, না দশ ঘা, না কি নিল ডাউন।"

হেডসার বেতটা টেবিলের ওপর রেখে ঘণ্টি বাজালেন। দফতরি সুবল আসতেই বললেন, "প্রথমে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল দে, তারপর এই হস্তিমূর্খটাকে আমার সামনে থেকে চলে গিয়ে ক্লাসে যেতে বল।"

থরহরি এবার অভিমানজড়ানো গলায় বলল, "আমি তো সাধ করে আসিনি, আপনিই ডেকে পাঠিয়েছেন।"

থরহরি চলে যেতে-যেতে পণ্ডিতসারকে বলল, "সার, হস্তিমূর্খ মানে কী ?"

পণ্ডিতসার থরহরির পিঠে একটা হালকা থাপ্পড় মেরে বললেন, "তাও জানো না। হাতির মতো মূর্খ। একেবারেই মূর্খ।"

থরহরি অবাক গলায় বলল, "হাতি আবার কবে স্কুলে গিয়ে শিক্ষিত হয়েছে ? পৃথিবীর কোনও হাতি কস্মিনকালেও মাধ্যমিক পাশ করেনি। ওঁরা বংশানুক্রমে অশিক্ষিত।"

হেডসার এবার থরহরির পরিবর্তে পণ্ডিতমশাইকে বললেন, "গোপেনবাবু ওকে আর বকাবেন না, যেতে দিন।"

হেডসারের বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে থরহরি দফতরি সুবলকেই দুঃখের সঙ্গে বলল, "দেখলে তো সুবলদা, হেডসার নিজেই কথা পালটান। প্রথমে গাধা বলে পরে বললেন

হস্তিমূর্খ। কেউই এখন পর্যন্ত আমার সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। বড়দের মন এত চঞ্চল হলে চলে ?"

মোটামুটি এইভাবেই গোটা স্কুলের সবাইকে সন্ত্রস্ত করে থরহরি মাধ্যমিক পাশ করে গেল। দশ ক্লাস পর্যন্ত ছোটখাটো ঘটনা কিছু ঘটালেও বড়রকমের উৎপাত সে একবার বই দ্বিতীয়বার করেনি। সেই উৎপাতের ঘটনাটা ঘটেছিল মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার পর। পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর পড়ার চাপ কিছুটা কমতেই থরহরি যথারীতি তার স্বভাব অনুযায়ী মাঠে, বাগানে আর বিষ্ণুপদদের বাঁশবাগানে খেলে বেড়াতে লাগল। ছেলেটা রাতদিন খেলে বেড়াচ্ছে দেখে ছেলেকে ডেকে রামহরি একদিন বললেন, "এত টো-টো করে ঘুরে বেড়াস কেন ? এটু পড়াশোনাও তো করতে পারিস ?"

থরহরি বলল, "টেস্টে যদি না উতরোই তা হলে তো আর পরীক্ষার তাড়া নেই। ফালতু কেন আগে থেকে পড়তে যাব।"

রামহরি ভেবে দেখলেন কথাটা খুব খারাপ বলেনি। তাই গলাটা নরম করে রামহরি বললেন, "দুপুরের দিকে তো এটু দোকানেও বসতে পারিস। সন্ধেবেলা বাপ-জ্যাঠার সঙ্গে বসে কেত্তন করলেও তো মনটা ভাল থাকে।"

এখানে বলে রাখা দরকার যে, রামহরি সাহার একটি বিচিত্র দোকান ছিল। সে দোকানে কী পাওয়া যায় তার দীর্ঘ ফর্দ দেওয়ার চাইতে কী পাওয়া যায় না সেটা বলাই বোধ হয় সহজ। মুদি-মশলা, চাল, স্টেশনারি দ্রব্যাদির সঙ্গে আলু, পেঁয়াজ, ডিম, কোক কয়লা, ঘুঁটে, উনুন, পাটকাঠি, মাটির বাসন, কলাপাতা, এমনকী মরবার পর ঘাটে নিয়ে যাওয়ার খাটিয়া পর্যন্ত। শবযাত্রায় যা-যা লাগে তার সবই রামহরির দোকানে পাওয়া যায়। রামহরি ভেবে-চিন্তেই এসব জিনিস দোকানে রেখেছে। ঘাটে নেওয়ার খাটিয়া মুড়াগাছা গ্রামে একমাত্র রামহরি সাহা ছাড়া আর কারও দোকানে পাওয়া যায় না। ওটি আনতে হলে মুগবেড়িয়া পেরিয়ে যেতে হবে গোবিন্দপুরের বড়বাজারে। সেখানে না পেলে এবার ছুটতে হবে আরও দু' কিলোমিটার দূরের স্টেশনবাজারে। ফলে শুধু মুড়াগাছা নয়, মুগবেড়িয়া এবং সুখবেড়িয়া গ্রামের কেউ মরলেও রামহরি ঠিক জানতে পারেন। খাটিয়া বেচতে বেচতে রামহরি বলেন, "তা আপনাদের কেত্তন পাটি লাগবে না ? আমার তো পুরো দল আছে। যদি বলেন তবে তৈরি হয়ে নিই।"

খাটিয়ার সঙ্গে কেত্তনের বায়নাও বেশ জুটে যায়। এই উপরি পাওনার লোভটুকু রামহরি ছাড়তে পারেন না। ছেলেকে অনুরোধ করতেই থরহরি বলল, "আগে ভেবে দেখি, পরে তোমায় বলব।"

দিন তিনেক পরে থরহরি এসে বসল বাবার দোকানে। রামহরি তো ছেলের সুবুদ্ধি দেখে বেজায় খুশি। দু'দিন দোকানে বসবার পর ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটাল থরহরি। রামহরি সেদিন তাঁর দলবল নিয়ে কীর্তন গাইতে গেছেন পঞ্চাননতলায়। বেশিদূর নয়, নিজের বাড়ি থেকে দেড় কি দু' কিলোমিটার হবে। দোকানের গদিতে বসেছে থরহরি, সঙ্গে দু'জন কর্মচারী। একজনের নাম কানাই, অন্যজন বলাই। দু'জন দু' জায়গার লোক, কিন্তু নামে মিল থাকলেও স্বভাবে একেবারে বিপরীত। কানাই এসে ফিসফিস করে থরহরিকে বলল, "আজ্ঞে ছোটবাবু, আপনি তো নতুন, তাই বলছি বলাইয়ের দিকে এটুখানি নজর রাখবেন।"

থরহরি বলল, "কেন ?"

কানাই আগের মতোই ফিসফিস করে বলল, "ব্যাটা একটা রাক্ষস। কাজ করে আর ভেলিগুড়ের ড্যালা সটকায়।"

থরহরি সোজা হয়ে বসে বলল, "সটকায় মানে ? চুরি করে ?"

কানাই বলল, "চুরি করে বাড়ি নিয়ে যায় তা বলছি না। ও তো গুড়খাদক। ড্যালা-ড্যালা গুড় খেয়ে নেয়। রোজ প্রায় হাফ কিলো গুড় খায়।"

থরহরি গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পরে বলাই এসে বলল, "ছোটকত্তা, একখান কথা ছ্যাল।"

থরহরি বলল, "বল।"

বলাই গলার স্বর খাটো করে বলল, "কানাইটার দিকে নজর রাখবেন। ব্যাটার মুখে সবই রোচে। কাঁচা পাঁপড় থেকে বস্তার মুগডাল পর্যন্ত সব চিবিয়ে-চিবিয়ে খায়। ওর গায়ে বনমানুষের মতো গন্ধ।"

থরহরি আরও গম্ভীর হয়ে গিয়ে দু'জনের দিকেই নজর রাখতে লাগল। একটু পরেই তার মনে হল, তিনটে কাজ একসঙ্গে করা যায় না। দুটো সেয়ানা লোকের দিকে নজর রাখা এবং দোকানদারি করা খুব সহজ কম্ম নয়। অথচ দোকানদারি না করলে টাকা আসবে না। অতএব সে ভেবেচিন্তে একটা নোটিস লিখে দোকানে টাঙাল। নোটিসে লেখা, 'বেলা এক ঘটিকা হইতে দুই ঘটিকা পর্যন্ত টিফিন। সেই হেতু উক্ত সময়ে বিকিকিনি বন্ধ'।

এক ঘণ্টা ছুটির খবর পেয়ে কানাই-বলাই আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু তখনও তারা জানত না তাদের কপালে কী ঘটতে চলেছে।

টিফিন শুরু হতেই থরহরি দু'জনকে ডেকে বলল, "তোরা বোস, তোদের খাবার আনছি।"

একটু পরে দুটো শালপাতার ঠোঙা নিয়ে থরহরি হাজির হল। একটাতে শুধু আধ কিলো ভেলিগুড় অন্যটাতে আধ কিলো মুগডাল। দুটো দু'জনকে দিয়ে থরহরি বলল, "নে, তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল।"

নিজেদের টিফিন দেখে কানাই-বলাই পরস্পরের দিকে করুণ চোখে তাকাল। শুধু বলাই বলল, 'চুকলি কাটার মজা দেখলি তো ! আমার কী, আমি এক কিলো ভেলি সাবড়ে দেব। তুই ব্যাটা কেমন কাঁচা মুগ সাবড়াস সেটা দেখব।"

না খেয়ে যেহেতু উপায় ছিল না, তাই অগত্যা দু'জনেই টিফিন খেয়ে ফেলল বটে, কিন্তু দোকান চালুর পর কানাই আর বেশিক্ষণ কাজ করতে পারল না। প্রথমে শুরু হল পেটে যন্ত্রণা, পরে বমি। তারপরেই চোখ উলটে নুনের বস্তার ওপর শুয়ে দাপাতে লাগল। থরহরি একটা সাইকেল-রিকশাভ্যান ডেকে কানাইকে পাঠিয়ে দিল কোবরেজমশাইয়ের কাছে। ওদিকে একসঙ্গে হাফ কিলো ভেলিগুড় খেয়ে গা গোলাতে আরম্ভ করেছে বলাইয়ের। শরীরের অস্বস্তি অনেকক্ষণ চেপে রেখেছিল, কিন্তু যখন পারল না তখন এসে থরহরির কাছে ছুটি চাইল। থরহরি কিছুতেই ছুটি দেবে না, আবার ছুটি না নিলে বলাইয়েরও চলছে না। তার গা গোলাচ্ছে। গা বমি-বমি ভাব শুরু হয়ে গেছে। ছুটি না পেয়ে বলাই মনে-মনে বিষম চটে গেল। রেগে গেলে আবার বলাইয়ের খিদে বেড়ে যায়। তাই প্রথমে সে দেড়খানা কাঁচা পাঁপড় খেল। তারপর একমুঠো চানাচুর। বলাইয়ের মনে হল শরীরটা সুস্থ হচ্ছে। অতএব, উৎসাহ পেয়ে সে এক খাবলা বাসমতি চাল চিবিয়ে ফেলল। বলাইয়ের মনে হল এই খাওয়াখাওয়ির ব্যাপারটা কেউই লক্ষ করেনি। কিন্তু থরহরি তো গোড়া থেকেই নজর রেখেছিল। কানাই চলে যেতে শুধু একজনের ওপরই নজর রাখতে হচ্ছে, আর থরহরির পক্ষে সেটা অনেক বেশি সুবিধাজনক।

দোকানে সন্ধ্যাবাতি দেওয়ার পর থরহরি ডাকল, "বলাই !"

বলাই সামনে এসে দাঁড়াল। থরহরি বলল, "খাবলে-খাবলে যত জিনিস খেলি সেটা হজম হবে তো ? যদি না হয় তার জন্য ওষুধ দিচ্ছি। যত পারিস খাবি, কিন্তু সব শেষে এই ওষুধটা

খেয়ে নিলেই দেখবি পেট 'পোসকার' হয়ে গেছে। নে হাঁ কর।"

বলাই হাঁ করল। থরহরি কাগজের ঠোঙা থেকে বলাইয়ের মুখে ওষুধ ঢেলে দিয়ে বলল, "আর ভয় নেই। সব পোসকার হয়ে যাবে।"

অদ্ভুত স্বাদের ওষুধটা গলা দিয়ে নামতে চাইছিল না। থরহরি জোর করে জল ঢেলে সেটা নামিয়ে দিতেই বলাই বলল, "বুক-পেট জ্বলে যাচ্ছে গো! এটা কী ওষুধ?"

থরহরি খুব শান্ত গলায় উত্তর দিল, "কাপড়-কাচা সোডা আর পল্টন সাবান। তোর পেট পোসকার হয়ে যাবে। যদি রাস্তায় আছড়ে-আছড়ে নিজেকে কম্বলের মতো এটু কাচতে পারিস তা হলে তো কথাই নেই।"

রামহরি সাহার, 'হরিভাণ্ডার' নামক বিচিত্র দোকানে কানাই-বলাইকে এর পর আর দেখা যায়নি। কানাই কোবরেজমশাইয়ের ওষুধে সেরেছিল, কিন্তু বলাইকে যেতে হয়েছিল সদর হাসপাতালে। কিন্তু সুস্থ হয়ে কেউই আর হরিভাণ্ডার-এ ফিরে আসেনি। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার পর রামহরিও আর কখনও থরহরিকে দোকানে বসবার কথা উচ্চারণ করা তো দূরে থাক, বসাবার চিন্তাও মাথায় আনেনি।

দোকানে বসার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে থরহরি পরমানন্দে আবার ঘুরে বেড়াতে লাগল। শুধু যে ঘুরে-ঘুরে বেড়াত তা নয়, মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের আগে ছাত্রদের জন্য সে একটা বই লিখে ফেলল। চিলেকোঠার ছাদে বসে শুরু হল বই লেখা। ছেলে বই লিখছে শুনে রামহরি মনে-মনে এত খুশি হল যে, দু'দিনের মধ্যেই সে গোটা গ্রামে খবরটা রটিয়ে দিল। পাড়ার লোকজন থরহরিকে দেখলেই জিজ্ঞেস করতেন, "ওহে থরহরি, তুমি নাকি বই লিখছ?"

থরহরি বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিত, "আজ্ঞে, চেষ্টা করছি।"

এর পরেই প্রশ্ন হত, "তা কী নিয়ে লিখছ? নাটক-নভেল, না কি পুরাণাদি নিয়ে কিছু? তোমার লেখ্য বিষয়টা কী?"

থরহরি জবাব দিত, "আজ্ঞে, আমি এমন কিছু লেখবার চেষ্টা করছি, যা জানা থাকলে আর কিছু জানার দরকার হয় না। ওইটুকু জানলেই বাকি জীবনটা মুড়াগাছায় কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আমার বইয়ের নাম 'বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার'।"

শুধু রামহরি নয়, গোটা গ্রামের প্রায় সকলেই এই বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে বেজায় কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। থরহরির স্কুলের শিক্ষক এবং হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছেও খবরটা পৌঁছল। একদিন রামহরির দোকানে সওদা করতে এসে হেডসার জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের থরহরি, মানে আপনার ছোট ছেলে নাকি এখন বইটই লিখছে?"

রামহরি মনে-মনে পুলকিত হলেন। জবাব দেওয়ার আগে আঙুল তুলে দোকানের বাঁশে টাঙানো একটা জিনিসের দিকে নির্দেশ করলেন। হেডসার দেখলেন এক খণ্ড মোটা পিজবোর্ডের ওপর রং-পেনসিল দিয়ে লেখা, 'শ্রীমান থরহরি সাহা প্রণীত 'বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। নির্জন চিলেকোঠায় রচনাকার্য চলিতেছে। অগ্রিম দুই টাকা দিয়া নাম লিখাইয়া যান।'

হেডসার গোপনে একটা ঢোক গিলে বললেন, "তা অগ্রিম টাকা কেউ দিচ্ছে?"

রামহরি উত্তর দিলেন, "বলেন কী সার! পঞ্চান্নজন অগ্রিম টাকা দিয়ে গেছেন। জ্ঞানের পিপাসা তো দারুণ পিপাসা। তা ছাড়া..."

রামহরি দম নেওয়ার জন্য একটু থামতেই হেডসার বললেন, "তা ছাড়া কী?"

রামহরি এবার বিনীত কণ্ঠে বললেন, "তা ছাড়া ধরুন, যাঁরা মাসকাবারি জিনিস নেন, গোটা মাস ধরে ধারে মাল নিচ্ছেন তাঁরা তো মুখ ফুটে চাইলে আর ফেরাতে পারবেন না। এই করে বই ছাপানোর খরচটা উঠে এলেই আমি খুশি। আপনি শুধু সার ছাপাতে দেওয়ার আগে একবার চোখ বুলিয়ে দেবেন। সব ঠিকই থাকবে, শুধু একবার চোখ দিয়ে চাখিয়ে নেওয়া আর কি !"

হেডসার আর কোনও কথা বললেন না। যে গতিতে দোকানে এসেছিলেন তার চাইতেও দ্রুতগতিতে তিনি বাড়িমুখো হাঁটা দিলেন। থরহরির বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার রচনা যতই অগ্রসর হতে লাগল স্কুলের শিক্ষকদের কৌতূহল এবং আশঙ্কা ততই বাড়তে লাগল। এক সময় রামহরি নিজেও শঙ্কিত বোধ করতে লাগলেন। শ্রীমান থরহরি বিশেষ কিছুই করেনি, কেবল দুই বালতি জল এনে এক বালতি নুনের বস্তায় আর এক বালতি চিনির বস্তায় ঢেলে দিয়ে দেখতে লাগল নুন এবং চিনির মধ্যে কে আগে গলে যায়। এই কাজটি না করে থরহরির উপায় ছিল না। কেননা, বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার রচনার জন্য এই পরীক্ষাটি নাকি অত্যাবশ্যক। থরহরির প্রথম পরীক্ষায় রামহরির লোকসান যা দাঁড়িয়েছিল সেটা কেত্তনের দর বাড়িয়েও পোষাতে পারেননি। দ্বিতীয় পরীক্ষাটি আর-একটু চড়া ধাঁচের হওয়ায় রামহরি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, "বাবা থরহরি, তোর বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার রচনার আগেই আমার হরিভাণ্ডার লাটে উঠবে এবং আমিও ঘাটে যেতে বাধ্য হব। অত লিখে দরকার নেই। জ্ঞানের কথা যত সংক্ষেপে হবে ততই লোকের মনে ধরবে। যদ্দূর লিখেছিস তাই ঢের। আর বেশি লিখে আমায় সর্বস্বান্ত করিস না।"

থরহরি যেন অবাক হয়ে গেল। বলল, "কেন, কী এমন করেছি !"

রামহরি গলার গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে বলল, "এমন আর কী করবে, হাঁদা প্যালারামের মতো আমার বারোটা দুগ্ধবতী গাভীকে রাত্তিরে গাদা-গাদা তেঁতুল খাইয়ে দিলে যাতে সকালে দুধের বদলে দই পাওয়া যায়। দই-দুধ তো খুবই পেলুম, এখন বদ্যি এনে গোরুগুলোর ব্যামো সারাতে হচ্ছে। এটা কি বাপের মাথায় বজ্রাঘাত নয় !"

থরহরি বলল, "ওঃ, এই কথা ! হাঁদা প্যালারাম সত্যিই হাঁদা ছিল কি না, ওর থিয়োরিটা কতখানি ভুল সেটা যাচাই করে দেখতে হবে না ? পরীক্ষার জন্য কত কিছু করতে হয়। তুমি এটুকু করতে পারছ না ?"

রামহরি এবার ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমার বিদ্যেচর্চা আমার বংশ লোপাট করে দেবে। বিষ খেলে মানুষ কেমন করে মরে এটা যাচাই করার শখ যদি তোমার কখনও হয় তা হলে তো বুড়ো বাপকে দিয়েই পরীক্ষাটা করবে। তাতে তুমি পিতৃহারা হবে আর আমি তোমার বিদ্যেচর্চার ফসল হয়ে খাটিয়া চেপে ঘাটে যাব। তাই বলছি ওসব পরীক্ষা-টরিক্ষা বন্ধ করো, নইলে তোমাকে চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে চিলেকোঠায় আটকে রাখব এই বলে দিলুম। এ আমার খোল-পেটানো হাত। একটি চড় গালে বসালে ষোলোখানা দাঁত উড়ে গিয়ে সুখবেড়িয়ার জঙ্গলে পড়বে, আর খুঁজে পাবে না।"

থরহরি এবার রেগে গেল। রেগে গিয়ে বলল, "বাবা, তুমি হচ্ছ কলিযুগের হিরণ্যকশিপু।"

রামহরি প্রশ্ন করলেন, "আর তুমি ?"

থরহরি উত্তর দিল, "আমি হচ্ছি পেহ্লাদ।"

॥ ৩ ॥

তখন মে মাসের মাঝামাঝি। সারা দুপুর গুমোট গরমের পর সন্ধ্যার মুখে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। মিনিটদশেক একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর সবেমাত্র থেমেছে। গাছের পাতা থেকে তখনও জল ঝরা থামেনি। এ-অঞ্চলে ঘন-ঘন বাতি চলে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। বৃষ্টির আগে দু-একবার দমকা বাতাস উঠতেই বাতি চলে গিয়েছিল। এখনও বাতি না আসায় চারপাশটা বিশ্রী রকমের অন্ধকার। হেডসার হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে জানলাটা খুললেন। তাঁর মনে হল অন্ধকার উঠোনে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে। দশ মিনিটের বৃষ্টিতেই কাঁচা উঠোনে জল দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ যেন সেই জল ভেঙে হাঁটছে। তিনি হ্যারিকেনটা জানলার কাছে তুলে হাঁক দিলেন "কে ?"

অন্ধকার উঠোন থেকে উত্তর এল, "আজ্ঞে,আমরা।"

হেডসার গলা চিনতে না পেরে বললেন, "আমরা মানে কারা ? নাম কী ?"

এবার উত্তর এল, "আজ্ঞে, সার, আমি রামহরি, তস্য পুত্র শ্রীমান থরহরি।"

হেডসার দরজা খুলে বারান্দায় এলেন। তিনি দেখলেন, পিতা-পুত্র দু'জনেই ছাতা মাথায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, "কী ব্যাপার, এখন এখানে !"

রামহরি বিগলিত হয়ে বললেন, "এখনই তো আসবার সময় হল সার। বৃষ্টি নামবার বাইশ মিনিট আগে, আর আলো চলে যাওয়ার সাত মিনিট পরে শ্রীমান থরহরির বাহুল্যবর্জিত জ্ঞান ভাণ্ডার রচনা সমাপ্ত হল। সঙ্গে-সঙ্গে আপনার কাছে নিয়ে এলুম চোখ বোলাবার জন্য। একেবারে ভিয়েন থেকে নামানো। এখনও কালির গন্ধ বেরুচ্ছে।"

থরহরি গম্ভীর গলায় প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল, "আমি ডট পেনে লিখি। ওতে কালির গন্ধ থাকবে না।"

হেডসার থরহরির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর জ্ঞানভাণ্ডারে কী-কী বিষয় আছে ?"

থরহরি বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল, "নানা বিষয় নানাভাবে রাখতে চেয়েছিলুম। কিন্তু কাজটা খুব গুছিয়ে করতে পারলুম না। বাবার উৎপীড়ন আমার কাজে নানা বিঘ্ন ঘটাতে আরম্ভ করল। তাই সংক্ষেপে সারতে হল। ভাবছি এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আরও বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।"

রামহরি ছেলের হাত থেকে বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে হেডসারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "সার, এট্টু চোখ দিয়ে চেখে দেখবেন। থরহরি বলছিল, বইটা পড়ে আপনি একটা ভূমিকা-টুমিকা যদি লিখে দেন তা হলে খুব বাধিত হই।"

হেডসার আর কথা বাড়ালেন না। পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিয়ে বললেন, "আগে তো পড়ে দেখি।"

থরহরির বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে এতরকমের আলোচনা তিনি শুনেছেন যে, তাঁর নিজেরও কৌতূহল ছিল লেখাটা পড়বার। হ্যারিকেনে নতুন করে তেল ভরে তিনি তখনই বসে গেলেন থরহরির লেখা পড়তে।

পরদিন দুপুরে খবর এল হেডসার গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মাঝে-মাঝে জ্ঞান ফিরলেই তিনি ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাচ্ছেন আর থরহরির জ্ঞানভাণ্ডার বলতে-বলতে আবার মূর্ছা যাচ্ছেন। হেডসারের মেয়ে ঝিমলি আর মিষ্টি বলেছে বাবা ওই থরহরির বই পড়তে-পড়তেই বার দুই "বাবাগো,মাগো, কী সাঙ্ঘাতিক" বলতে-বলতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান। সকালের দিকে আবার সুস্থ হয়ে উঠে দুধ-পাউরুটি খেয়ে টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে-গোছাতে যেই না থরহরির পাণ্ডুলিপির দিকে নজর পড়ে তখনই আবার "বাবাগো" বলে সেই যে জ্ঞান হারান, সেই জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর। হেডসারের জ্ঞান হারানো এবং হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে থরহরির প্রণীত বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার নামক পাণ্ডুলিপির

কোনও সম্পর্ক আছে কি না সে-কথা আমরা জানি না। কিন্তু হেডস্যারের আকস্মিক হৃদপীড়ার সুবাদে থরহরির পাণ্ডুলিপিটি সম্পর্কে সকলেই অতিশয় কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ইতিহাসের শিক্ষক পাণ্ডুলিপি পড়ার পর এক মাসের ছুটির দরখাস্ত জমা দিয়ে নিজের আদি গ্রাম দহিজুড়িতে চলে গেলেন। অঙ্কের স্যার অতুলবাবু সবটা পড়তে পারেননি, পড়লে কী হত জানি না, শুধু অঙ্কের বিষয়টুকু পড়ে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, পরে পণ্ডিতমশাইকে বললেন, "গো-হত্যায় যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তবে মানুষকে গোরু বানানোর জন্যও তো শিক্ষকের প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। আমি থরহরির অঙ্কের মাস্টার হিসাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।"

এর পর থরহরির পাণ্ডুলিপিটি মুড়াগাছার আরও অনেকের হাতে-হাতে ঘুরল। এক সময় গণদাবি উঠল, "পাণ্ডুলিপি পড়ে সবাইকে শোনাবার ব্যবস্থা করা হোক। তেমন যুগান্তকারী কিছু থাকলে পঞ্চায়েতের খরচে এটি ছাপানোর ব্যবস্থা হওয়া উচিত। গণদাবি তো অগ্রাহ্য করা যায় না। অতএব, অঞ্চল-প্রধান ডেকে পাঠালেন থরহরিকে। দিন ঠিক হল। 'গ্রামে-গ্রামে রটি গেল সেই বার্তা'র মতো রটিয়ে দেওয়া হল শ্রীমান থরহরি সাহা রচিত এবং বহু-প্রত্যাশিত বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি স্বয়ং থরহরি নিজকণ্ঠে পাঠ করে শোনাবেন। জ্ঞান অর্জনে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকতে পারেন।"

রথতলার কাছে বারোয়ারি পুজোর ঠাকুর দালানে পাণ্ডুলিপি পাঠের আয়োজন করা হল। ছেলেরা মাইক ভাড়া করল, সেই সঙ্গে জেনারেটরও। রীতিমত একটা উৎসব। ছেলে-ছোকরা এবং বড়রা মিলিয়ে প্রায় শ'পাঁচেক লোক। লোকজনের ভিড় দেখে দাশু মণ্ডল বারোয়ারিতলায় তেলেভাজার দোকান দিয়ে ফেলল। দাশুর দেখাদেখি পান-বিড়ি, ফুচকা আর চাকা লাগানো ভ্রাম্যমাণ রোল-কর্নার, যার আগে নাম ছিল টারজান রোল সেণ্টার, সেও রাতারাতি নাম বদলে 'থরহরি রোল সেণ্টার' নাম দিয়ে বারোয়ারিতলায় এসে রোল বানাতে লাগল। থরহরিকে রিকশা করে নিয়ে এলেন অঞ্চল-প্রধান নগেন বিষ্ণু। থরহরি যেন ভি. আই. পি.। সবার চোখ তার দিকে। থরহরি আজ বেজায় গম্ভীর। ঠাকুরদালানের চারপাশ থেকে থরহরিকে দেখা মাত্র ছেলেরা আওয়াজ দিল, "অ্যাই থরহরি, থরহরি..."

দু-একজন বয়স্ক লোক বললেন, "এইটুকুন ছেলে এমন বই লিখেছে যে, হেডমাস্টারের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। রামহরির পুত্র ভাগ্য ভাল বলতে হবে। হরি সত্যিই ওকে কৃপা করেছে। বংশ পরম্পরায় হরিনাম বিলিয়ে আসছে,তার ফল পাবে না ? এইবার সেই ফল ফলেছে।"

অঞ্চল-প্রধান নগেন বিষ্ণুমশাই মাউথপিসটা মুখের সামনে নিয়ে বার-দুই ফুঁ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, "হ্যালো,হ্যালো, সবাই শুনতে পাচ্ছেন তো।"

চারপাশ থেকে বিকট চিৎকার উঠল, "পাচ্ছি, পাচ্ছি, পাচ্ছি।"

নগেন বিষ্ণুমশাই বলতে লাগলেন, "প্রিয় পল্লীবাসীগণ ! আমি জানি এবং আপনারাও জানেন আজ আমরা কেন এখানে সমবেত হয়েছি। এ-ধরনের সমাবেশ এই মুড়াগাছা গ্রামে এই প্রথম। সমাবেশ নানা সময়ে, নানা কারণে বিস্তর হয়েছে। কিন্তু আজকে যে-কারণে সমাবেশ সেটা একেবারেই অভূতপূর্ব। আমি আমার এতখানি বয়সে এই মুড়াগাছা গ্রামে তো বটেই, এই বঙ্গের কোথাও ঠিক এই জাতীয় কারণে কোনও সমাবেশ হতে শুনিনি। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, মুড়াগাছার প্রবীণ মানুষ আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় জীবনবল্লভ আচার্য অর্থাৎ আমাদের কোবরেজমশাই, তিনিও হয়তো শোনেননি।"

নগেন বিষ্ণুর কথা শেষ হওয়ার আগেই হরীতকী চুষতে-চুষতে

কোবরেজমশাই উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "শুধু আমি কেন, আমার স্বর্গত পিতৃদেব প্রাণবল্লভ আচার্য এবং উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের কেউই এমন সমাবেশের কথা শোনেননি। সেদিক থেকে এটি একেবারেই নতুন। আমার আক্ষেপ, এমন একটা সমাবেশে কলকাতা থেকে বেতার এবং টিভিওলাদের এখানে আসা উচিত ছিল। আজ আমি গর্বিত যে, শ্রীমান থরহরির নামকরণ আমিই করেছি। আমার অনুরোধ, অকারণ বাক্যব্যয়ে সময়হরণ না করে পাণ্ডুলিপিটি পড়া আরম্ভ হোক।"

আবার জনতার চিৎকার উঠল, "পড়া আরম্ভ হোক, পড়া আরম্ভ হোক।"

নগেন বিষ্ণুমশাই দুই হাত ওপরে তুলে জনতাকে শান্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, "শান্ত হোন, শান্ত হোন। পাণ্ডুলিপিটি পড়ার আগে একটি কথা বলা আবশ্যক। এই পাণ্ডুলিপিটি মুড়াগাছা গ্রামের যে কয়েকজন ইতিমধ্যে পড়েছেন তাঁরা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।"

কথাটা বলেই জিভ কেটে ফেললেন নগেন বিষ্ণু। তৎক্ষণাৎ শুধরে নিয়ে বললেন, "মাফ করবেন, আমাদের মধ্যে নেই মানে, আজকে এখানে উপস্থিত নেই। একমাত্র আমি যে একবার পাণ্ডুলিপি পড়ার পর দ্বিতীয়বার সেটি শোনার জন্য এখানে উপস্থিত হওয়ার সাহস দেখাতে পেরেছি। আসলে আমি জনতার সেবক। জনতার দাবিকে অগ্রাহ্য করার অধিকার নেই বলেই এই সমাবেশ ডাকতে হয়েছে। যেহেতু আজ বিদ্যুতের অবস্থা বাড়ন্ত এবং জেনারেটরে পেট্রলের সঞ্চয় সামান্য সেই কারণে দেড়শো পাতার পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ পাঠ না করে আজ কেবলমাত্র অংশবিশেষ পাঠ করার প্রস্তাব রাখছি। যদি সেটি আপনারা সইতে পারেন তা হলে অন্য কোনওদিন আবার পাণ্ডুলিপি পাঠের ব্যবস্থা করা যাবে। নমস্কার। এইবার শ্রীমান থরহরি পাণ্ডুলিপি পাঠ করবে।"

ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিল—ঠিক যেমনটা বাজানো হয় যাত্রাপালা আরম্ভ হওয়ার আগে।

শ্রীমান থরহরি উঠে দাঁড়াল। মাউথপিসটা একটু নামিয়ে দেওয়া হল। থরহরি প্রথমেই বলল, "এটি কোনও মামুলি নাটক-নভেল বা ভূতের গপ্পো নয়। এটি জ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। ছাত্রজীবনে আমাদের এমন কিছু শিখতে হয় বা শেখানো হয়, যা অধিকাংশ সময়েই আমাদের কোনও কাজে আসে না। নিজে লেখাপড়া করতে গিয়ে নানা বিষয়ে নানা অসঙ্গতি, মানে এলেবেলে জিনিস লক্ষ করেছি। সেই কারণে আমি এই বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার রচনায় হাত দিই। সমস্ত জটিলতা এবং ঝামেলার ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে খুব সংক্ষেপে জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা এখানে রয়েছে। আপনাদের অনুমতি নিয়ে এবং অঞ্চল-প্রধানের নির্দেশ অনুসারে আমি আজ কেবল বিভিন্ন বিষয়ের কিছু স্যাম্পেল আপনাদের শোনাব। যদি ভাল লাগে তা হলে মুড়াগাছার হরিভাণ্ডারে অগ্রিম দু'টাকা দিয়ে বই কেনার জন্য সভ্য হয়ে যাবেন, এই অনুরোধ।"

এত বক্তৃতা ছেলে-ছোকরাদের ভাল লাগার কথা নয়। তাই ছেলেরা চিৎকার করে বলতে লাগল, "স্যাম্পেল দাও, স্যাম্পেল।"

কোবরেজমশাই বললেন, "বাবা থরহরি, ফ্রি স্যাম্পেল দিতে শুরু করো।"

পাণ্ডুলিপির খাতা খুলে থরহরি প্রথমে বলল, "প্রথমে ইংরেজি স্যাম্পেল দিচ্ছি। সাহেবরা নিজেদের খুশিমতো এক-এক জিনিসের এমন এক-একটা নাম করে গেছেন যার সঙ্গে মূল জিনিসটার কোনও সম্পর্ক নেই। যেগুলো পারেননি, সেগুলি বাদ দিয়ে গেছেন। আমি সেই ফাঁকগুলি পূর্ণ করছি এবং বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে জিনিসের নতুন ইংরেজি নাম করছি। যেমন 'বেগুন'কে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে 'ব্রিঞ্জল'। কিন্তু সেটা কোন বেগুন? মুড়াগাছা গ্রামেই তো তিন-চার রকমের বেগুন আছে। কুলি বেগুনকে তা হলে আমরা কোন নামে চিনব? যেহেতু ঢ্যাঁড়সের ইংরেজি 'লেডিস ফিঙ্গার' তাই কুলি বেগুনের নাম দেওয়া হল 'জেন্টস ফিঙ্গার'। কাঁঠাল যদি জ্যাকফ্রুট হয় তা হলে এঁচোড়কে কেন 'গ্রিন জ্যাক' বলব। এঁচোড়ের নাম হবে 'ইয়ং জ্যাকফ্রুট'। 'কলা'কে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে 'ব্যানানা' অথবা 'প্লানটেন' কিন্তু কাঁচকলাকে বলা হয় 'গ্রিন প্ল্যানটেন'। তা হলে সিঙ্গাপুরি কলাকে কী বলা হবে? আমার বইতে কলা মানে ব্যানানা, কাঁচকলা মানে, 'ইনফ্যান্ট ব্যানানা'। 'আন্‌ট্' বললে সাহেবরা একই সঙ্গে কাকিমা, মাসিমা, পিসিমা সবাইকে বোঝেন। আমাদের তা বুঝলে চলবে কেন। পিতৃকুল আর মাতৃকুল এক করে দিলে চলবে না। তা ছাড়া রাঙাপিসিকে কী বলব? ন' কাকিমাকে কোন নামে ডাকব? তাই আমার বইতে কাকিমা হচ্ছেন 'লিটল মাদার', জেঠিমা 'বিগ মাদার', ঠাকুমা 'ওল্ড মাদার'। ন' কাকিমাকে বলতে হবে 'এক্সেস মাদার'। আবার মাসিদের বলতে হবে 'সিস্টার মাম্মি', পিসিকে স্রেফ 'আন্‌ট্' বললেই চলবে। শুধু রাঙাপিসিকে বলতে হবে 'রেড আন্‌ট্'। 'আমড়া'কে কেন ইংরেজিতে 'হগপ্ল্যাম' বলা হবে? সাহেবরা কি আমড়া চেনে? মুড়াগাছা হচ্ছে আমড়ার দেশ। আমড়াকে ইংরেজিতে বলতে হবে 'বিগ প্ল্যাম'। অর্থাৎ প্ল্যাম মানে কুল আর কুল হচ্ছে টক। আমড়াও টক। সাইজে বড় বলে 'বিগ' শব্দটা বসাতে হবে। ডি এ টি ই 'ডেট' মানে তারিখ আবার 'ডেট' মানে খেজুর। এতে বিভ্রান্তি হয়। তাই খেজুরের ইংরেজি আজ থেকে হল 'অ্যারেবিয়ান ফ্রুটস'। এবার ইংরেজি থেকে আর দু-চারটি স্যাম্পেল দেব। জবাফুলকে বলা হয় 'চায়না রোজ'। জবা আবার চিনদেশে কবে আদর পাচ্ছে? কালীপুজোর এক নম্বর ফুল জবা, এটার সঙ্গে চায়নার সম্পর্ক কোথায়? জবার নাম দিয়েছি 'মাদার রোজ'। যে-কারণে শুঁটকি মাছ 'ড্রাই ফিশ'। সেই একই কারণে 'আমসত্ত্ব'র ইংরেজি 'ড্রাই ম্যাঙ্গো'। তোপসে মাছকে বলা হয় 'ম্যাঙ্গো ফিশ'। আমিষ-নিরামিষ এতে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ম্যাঙ্গো অর্থাৎ আমের সঙ্গে তোপসে মাছের সম্পর্ক কোথায়? আজ থেকে তোপসে মাছকে ইংরেজিতে বলা হবে 'টপলেস ফিশ', কইমাছকে 'ড্যানসিং ফিশ', ল্যাটাকে 'স্লিপারি ফিশ', শিং-মাগুরকে 'ডিসকো ফিশ' এবং গলদাকে 'আনটাচেবল ফিশ'। যেহেতু অত দামের গলদা কেনা তো দূরের কথা, ছোঁয়ারও সাধ্য নেই, তাই আনটাচেবল ফিশ বলা হচ্ছে।"

থরহরি ইংরেজি স্যাম্পেল বিতরণ করে যেই মাত্র থামল, অমনই কোবরেজমশাই তড়াক করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমায় মাফ করবেন। আমার বড্ড পেট কামড়াচ্ছে। আমি বাড়ি চললুম।"

পঁচাশি বছরের কোবরেজমশাই পঁচিশ বছরের যুবকের মতো লাফ দিয়ে মঞ্চ থেকে নামলেন আর নেমেই বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। সভাপতি সবেগে প্রস্থান করছেন দেখে পেছন থেকে কেউ-কেউ ডাকলেন, "কোবরেজমশাই, ও কোবরেজমশাই...।"

কোবরেজমশাই মনে মনে বললেন, 'আগে থরহরির ইংরেজিটা হজম করি। যদি করতে পারি তবে পরে কোনও একদিন আসব।'

॥ ৪ ॥

বারোয়ারিতলায় থরহরি সেদিন ইংরেজির সঙ্গে ইতিহাস আর অঙ্কের কিছু স্যাম্পেলও দিয়েছিল। বয়স্কদের অনেকেই সেদিন বুঝেছিলেন, থরহরি নামটা কোবরেজমশাই ভেবেচিন্তেই

দিয়েছেন। এ-নাম ছাড়া অন্য নামে এ-ছেলেকে ভাবাই যায় না। কিন্তু অল্পবয়েসী ছেলে-ছোকরারা শুধু স্যাম্পেল শুনেই থরহরির ভক্ত হয়ে গেল। ক্লাস ফাইভ থেকে নাইন পর্যন্ত ক্লাসের ছাত্ররা এসে ভিড় করল হরিভাণ্ডারে, থরহরির বইয়ের অগ্রিম সভ্য হওয়ার জন্য। বয়স্কদের মধ্যে কেবল মধু কয়াল, যে ইদানীং পোলট্রির ব্যবসা করে বড়লোক হয়ে গেছে, সেই কেবল বলল, "থরহরিকে নিয়ে ঠাট্টা-রসিকতা করার আগে ভেবে দেখুন, ছেলেটা কিন্তু কিছু-কিছু জিনিস যা বলেছে সেটা ভেবে দেখবার মতো।"

চণ্ডীমণ্ডপে রোজই তাস আর দাবার আসর বসে। তারা সবাই বয়স্ক লোক। সকলেই মধু কয়ালের কথায় প্রতিবাদ করে উঠে বলল, "ও-বই পড়লে মুড়াগাছার একটা ছেলেও আর মানুষ হবে না। ছেলেটাকে রাঁচির পাগলা গারদে পাঠিয়ে দাও।"

মধু কয়াল বলল, "আপনারা ভেবে দেখুন, থরহরি ইতিহাসের যে-স্যাম্পেল দিয়েছে, সেটা কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। থরহরি তার স্যাম্পেলে বলেছে, রাজা হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা কতদূর ছিল সে-বিষয়ে ঐতিহাসিকরাই যেখানে একমত নন, তখন নাবালক ছাত্রকে হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। সেক্ষেত্রে ছাত্রের উত্তর হওয়া উচিত, হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা এখনও অমীমাংসিত। কিংবা ধরুন, জাহাঙ্গিরের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে থরহরি বলেছে, তিনি কেমন ছিলেন, পত্নী নুরজাহানের হাতের পুতুল ছিলেন কি ছিলেন না এ-ব্যাপারে দুই ঐতিহাসিক মান্যবর ঈশ্বরীপ্রসাদ ও মান্যবর বেণীপ্রসাদ সর্বদাই দুই মত পোষণ করিয়াছেন। ছাত্ররা কাহার পক্ষ লইবে? অতএব, ছাত্রদের লেখা উচিত, বয়স্ক লোকের পারিবারিক ব্যাপারে এবং দাম্পত্যজীবনে ছাত্রদের নাক গলানো গর্হিত অপরাধ। তাঁহারা যেমন ছিলেন তেমনই ছিলেন। এতদিন পরে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটিয়া লাভ নাই।"

মধু কয়াল ছাড়া অন্যরা তাস খেলা বন্ধ করে এতক্ষণ মধুবাবুর কথা শুনছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, "এসব লিখলে কি ছেলেরা একজামিনে পাশ করতে পারবে? থরহরির সঙ্গে আপনাকেও রাঁচি পাঠানো উচিত।"

মধু কয়াল তর্ক করার ভঙ্গিতে বলল, "কেন, থরহরি যে বলেছে কার্জনের বঙ্গ বিভাগকে আন্দোলন করিয়া থামানো গিয়াছিল। কার্জন অতিশয় নিন্দনীয়। কিন্তু পরে সেই বঙ্গ তো বিভাগ হইল। তাহা থামানো গেল না। অতএব, কর্তারা যাহা করিবেন, তাহা নিজেদের স্বার্থে করিবেন। উহা লইয়া ছাত্রদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। ছাত্ররা লিখিবে, বিদেশি সাহেব যাহা করিতে পারেন নাই, স্বদেশি সাহেবরা তাহা করিয়াছেন। উহারা সকলেই বয়স্ক এবং মানী লোক। বড় এবং মানী লোকের সমালোচনা ছোটদের সাজে না। বড় হইয়া ইহার উত্তর লিখিব। মাননীয় পরীক্ষক যদি ততদিন বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে কুরিয়র সার্ভিসে উত্তর আপনার বাড়িতে পাঠাইয়া দিব। এ-কথাগুলো কি পাগলের মতো বলেছে?"

চণ্ডীমণ্ডপের কেউই মধু কয়ালকে সমর্থন করল না। বরং পঞ্চাননতলার গুরুপদ ঠাট্টা করে বলল, "আপনার সব হয়ে আপনি থরহরিকে পুষ্যি নিন। নইলে ওর বুদ্ধিতে আখের গুড় মাখিয়ে চুমু খান।"

মধু কয়াল মনে-মনে চটে গেলেও মুখে কিছু বলল না। বুঝল একা এতগুলো লোকের সঙ্গে পারবে না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে গুরুপদ গুছাইত বলল, "ওই থরহরির অঙ্কের স্যাম্পেল মনে আছে ? ও-ছোকরা বলল, তেল মাখানো বাঁশের ওপর একটি বাঁদর ওঠানামা করার যে অঙ্ক আছে ওটার উত্তর হবে, বাঁদরের বাঁদরামোতে আমাদের জড়াবেন না। বেআক্কেলে লোকেরা বাঁশে তেল লাগাচ্ছে বলেই বাজারে তেলের দাম নামছে না। আবার অনুপাতের অঙ্কে ওই ছোঁড়া বলল, প্রশ্নে আছে, একটি হাসপাতালের মেঝে পরিষ্কার করার জন্য ১৭ লিটার জলে ১ লিটার ৩ ডেসিলিটার ফিনাইল মেশানো হয়েছে। জল ও ফিনাইলের পরিমাণের অনুপাত নির্ণয় করো। এর উত্তরে আপনার থরহরি তার জ্ঞানভাণ্ডারে কী লিখেছে জানেন ?"

দু-একজন জিজ্ঞেস করল, "কী লিখেছে ?"

"থরহরি লিখল, 'যা একবার মেশানো হয়ে গেছে সেটা নিয়ে আর জল ঘোলা করার দরকার নেই। ওসব করতে গেলে হয়তো হাসপাতালের মেঝেটাই পরিষ্কার হবে না।'

"কিংবা, ধরুন, থরহরির অঙ্কের স্যাম্পেলের আরও দুটি অঙ্কের কথা। ও বলছে, বইতে প্রশ্ন আছে যদি ১২ কিলো ডালের দাম ৪৮ টাকা হয়, তবে ৩০ কিলো ডালের দাম কত হবে ? থরহরির বইতে উত্তর লিখেছে, ঘোর মিথ্যা কথা ! ৪৮ টাকায় ১২ কিলো ডাল কোনও দোকানে পাওয়া যায় না। অঙ্ক সত্যনির্ভর। যা এ-দেশে নেই তার উত্তর হবে কোত্থেকে ? অতএব লিখতে হবে, আগে চার টাকা কিলোয় এক কিলো অড়হর অথবা বিউলি কিনে আনুন, তারপর উত্তর লিখব। আর-একটা প্রশ্নে আছে, একটি বাল্ব তৈরির কারখানায় ৩৬৫ দিনে ১৪৬০০টি বাল্ব তৈরি হয়। ৪০ দিনে ওই কারখানায় কতগুলি বাল্ব তৈরি হবে ?

"শ্রীমান থরহরি লিখল, 'কারখানাটি বেআইনি এবং শ্রমিক আইনে ওই মালিকের সাজা হওয়া উচিত। এই বঙ্গে কোনও কারখানাই ৩৬৫ দিন খোলা থাকে না। ছুটি, বাংলা বনধ এগুলো কোথায় গেল ? অবিলম্বে লেবার কমিশন থেকে কারখানায় নোটিস পাঠানো উচিত। বেআইনি কারখানার উৎপাদনের হিসাব রাখার কোনও প্রয়োজন নেই।'"

"কিন্তু এসব উত্তর লিখলে কি পরীক্ষায় পাশ করা যাবে ?"

মধু কয়াল চুপ করে থাকতে বাধ্য হল। অন্যরা হাসাহাসি করতে-করতে তাস খেলায় আগের মতো মেতে উঠল। খেলা যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন গলা বাড়িয়ে চায়ের জন্য দোকানের ছোকরাটাকে বার-দুই ডাকা হল। কিন্তু ছোকরাটা এল অনেক

শব্দসন্ধানের সমাধান

অ	বা	ঙ	ম	ন	স	গো	চ	র		ম	হা	ভা	র	ত		চি	ত্ত	প	ট
লো	হা		হ	র	ফ		র		বৃ		র	স	মা	লা	ই			ত	ঙ্কা
ক	র	তা	ল		ল	লা	ম		ত্র	পা			না			অ	লি	ঞ্জ	র
সা		লে		মি	তা	লি		সা	হা	রা	গো	বি	থ	র		পা	টা	লি	
মা	ণ	ব	ক			ত্য						স			অ	প	র		অ
ন্য		র	সু	ই			অ	ন	ব	র	ত		শ	ক				পা	ন
	তো		র		মা	নী		বী	র			অ	স্কু	শ			তা	ঞ্জা	ম
আ	তা	ম্র			ত	ল	বা	না		র	মা				স	ল	জ্জ		নী
রা	কা		কা	পা	লি	ক			নি	বা	ত		অ	ত		ট	ব	র্গী	য়
কা	হি	নী	কা	র		ম	ক	র		ব		জ	মি	ন		ব			
ন	নী		বা		শা	ল	পি	য়া	ল		লা		ত্র	য়		হ	র	ত	ন
		বা	বু	রা	ম		ধ্ব	নি		ফ	ল	প্র	সূ		মু	র	জ		ব
চৈ	ত	ক		জ	লা		জ				ন		দ	ক্ষ			নী	লি	মা
ত		ল	হ	মা		শৈ		দে	উ	ল		মা	ন	ত			কা	ক	লি
ন্য			য়			ল		হ	ল		অ	কু				কু	স্ত	লি	কা
	ব	সু		বি	দে	শ							ন	বা	ব			কে	
গ	ড্ড	লি	কা	প্র	বা	হ		হা	জি			অ	ব	বা	হি	কা			ফ
স্ত		খি	লি		নু	র	জা	হা	ন			ধ	নী			লি	ও	না	র্দ
ব্য	তী	ত		ব	চ		ত	কা		কা	ম	রা		দ	ল	মা	দ	ল	
	র		ব	ন্ধু	র		ক	র		বা	তি		অ	ল	ক্ষ্য		ন	ক	ল

পরে। এনামেলের থালার ওপর খানসাতেক কাপ। দেরি করার জন্য একদফা ধমক খেয়ে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন গুরুপদ ডাকল, "অ্যাই, গোমুখ্যু কোথাকার! ঠাণ্ডা চা এনেছিস কেন? মেরে মাথার চাঁদি ফাটিয়ে দেব।"

চায়ের দোকানের ছেলেটা অভিমানজড়ানো গলায় বলল, "মারতে চান মারুন, কিন্তু মুখ্যু বলবেন না। আমি মুখ্যু নই।"

গুরুপদ বলে উঠল, "না, তুমি তো বিদ্যেসাগর। এই তুই কী জানিস রে?"

ছেলেটা দু'পা পেছনে হটে বলল, "আমি যা জানি তা আপনি জানেন? বলুন তো কোন বাড়ি ভাড়া দেওয়া যায় না?"

সবাই সবার মুখের দিকে তাকাল। ষষ্ঠীতলার বনমালী বলল, "কোন বাড়ি?"

ছেলেটা গড়গড় করে বলে গেল, "বেরুবাড়ি, বাড়াবাড়ি, যমের বাড়ি আর জুতোর বাড়ি।"

বারোয়ারিতলার সবাই যেন বিষম খেল। ওদের ঘোর কাটতে না কাটতেই ছেলেটা আবার প্রশ্ন করল, "কোন বরের সঙ্গে বরযাত্রী যেতে পারে না তা জানেন?"

বারোয়ারিতলার কেউ উত্তর দেওয়ার আগেই ছেলেটা আগের মতোই বলে গেল, "সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর আর ডিসেম্বর।"

চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া বন্ধ করে সবাই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে। ছেলেটা উৎসাহ পেয়ে বলল, "বলুন তো, কতরকমের তানি আছে আর এর মধ্যে কোন তানি বিখ্যাত?"

কে একজন শুধু বলল, "সেটা আবার কী জিনিস?"

ছেলেটা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা দোলাতে-দোলাতে বলল, "গুলতানি, রফতানি, মস্তানি, কিন্তু বিখ্যাত হচ্ছেন সাবাতানি।"

এবার গুরুপদ বলল, "তোর স্টকে আর কী কী আছে বাবা?"

ছেলেটা এবার মিটিমিটি হাসতে-হাসতে বলল, "কতরকমের রো আছে বলতে পারেন?"

সবাই ঘাড় নেড়ে জানাল, কেউ বলতে পারবে না। ছেলেটা বলল, "তবে শুনুন, কলেজ রো, বিডন রো, মিশন রো কিন্তু সবার সেরা ম্যাকেনরো।"

গুরুপদ জিজ্ঞেস করল, "এর পর?"

ছেলেটা এঁটো কাপ কুড়িয়ে নিতে-নিতে বলল, "এ তো হল গিয়ে স্যাম্পেল। আরও জানতে হলে হরি ভাণ্ডারে গিয়ে দু'টাকা অগ্রিম দিয়ে থরহরিদার বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার-এর জন্য বায়না করুন।"

ছেলেটা চলে যাওয়ার পর সবাই যখন চুপ মেরে বসে আছে তখন মধু কয়াল গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, "এবার থরহরির থুতনিতে মাখাবার জন্য আপনারাও আখের গুড়ের সন্ধান করুন।" মধু কয়াল খুব মিথ্যে বলেনি। ছেলেটা জিনিয়াস।"

থরহরি সত্যিই জিনিয়াস কি না তা জানি না, কিন্তু সেদিন বারোয়ারিতলায় জ্ঞানভাণ্ডারের স্যাম্পেল বিতরণ করার পর থেকে ছেলে-ছোকরাদের কাছে থরহরি রীতিমত হিরো হয়ে গেল। ওর লেখা বা সংগ্রহ করা ছড়াগুলো স্কুলে, মাঠে, বারোয়ারিতলায় সর্বত্রই ছেলেদের মুখে-মুখে ফিরতে লাগল। পণ্ডিতমশাই ক্লাস সেভেনের ক্লাস নিতে এসে শুনলেন ক্লাসের একদল ছেলে সুর করে বলছে, "দেদার রোজগার করেও কে থাকে বেকার?" আর-একদল চিৎকার করে উত্তর দিচ্ছে, "জার্মানির বরিস বেকার।" পণ্ডিতমশাই কস্মিনকালেও বরিস বেকারের নাম শোনেননি। তিনি গর্জন করে জানতে চান, "হেইডা আবার ক্যাডা? কোন পোলাডা?"

বারোয়ারিতলার মাঠে গাদি খেলতে-খেলতে ছেলেরা ছড়া কাটে, "ডানস, মিউজিক, অ্যাকশন, সব মিলে মাইকেল জ্যাকসন।"

গুরুপদ সকালবেলা বারান্দায় বসে দাড়ি কাটছিল। বারান্দার ওপর একটা পুরনো তক্তপোশ। তার ওপর বসে তার দুই ছেলে পড়া তৈরি করছে। হঠাৎ পড়া থামিয়ে বড় ছেলেটা বলে উঠল, "এই জ্বলে এই নেভে তার নাম জোনাকি। এই আছে এই নেই তার নাম জানো কী?"

ছোট ছেলেটা বলল, "বাবা তুমি জানো?"

গুরুপদ ভেবেছিল, এটা বুঝি বইয়ের কোনও পড়া। তাই সে বলল, "বইখানা তো সামনেই রয়েছে দেখে নে না।"

ছোট ছেলেটি এবার হাসতে-হাসতে বলল, "বাবা জানে না। তার নাম হল বিদ্যুৎ। থরহরিদার বইতে আছে।"

গুরুপদ গম্ভীর হয়ে গেল। প্রথমে ছেলেদের দিকে একটু কড়া দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর আয়নার মধ্যে দিয়ে নিজের মুখটা দেখতে-দেখতে ভাবল, "থরহরি ছোঁড়াটার এলেম আছে তো।"

॥ ৫ ॥

থরহরি যে সত্যিই এলেমদার ছেলে তার আরও প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েকদিন পরে। তবে সে-ঘটনাটা ছিল খুব সাঙ্ঘাতিক। গোটা মুড়াগাছা তো বটেই, মুগবেড়িয়া এবং সুখবেড়িয়া পেরিয়ে থরহরির সেই কীর্তিকাহিনী পৌঁছে গিয়েছিল মহকুমা সদরেও।

সেটা ছিল জুন মাসের দোসরা। আকাশে চাপ-চাপ মেঘ, অথচ ছিটেফোটা বৃষ্টির দেখা নেই। গাছগাছালির পাতায় পর্যন্ত হাওয়ার কোনও চিহ্ন নেই। গুমোট গরমে প্রাণ যেন আইঢাই করছে। রামহরি পাতকুয়োর জলে গা ধুয়ে এসে দোকানে বসে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন আর থেকে-থেকে কাঁধের গামছা দিয়ে গলার ঘাম মুছছেন। সন্ধ্যা তখন হব-হব করছে। রামহরি বসে ছিলেন দোকানের রকে। কর্মচারীরা ভেতরে কাজ করছে। হঠাৎ একটা ছেলে সাইকেল করে এসে আচমকা দোকানের রকের সামনে দাঁড়াল। সাইকেল থেকে নামেনি, শুধু একটা পা দিয়ে মাটি ছুঁয়েছে। রামহরি ছেলেটার দিকে ভাল করে দেখবার আগেই ছেলেটা একটা সাদা এনভেলাপ রামহরির কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে পাঁই-পাঁই করে সাইকেল চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রামহরি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে নিজের কোলের ওপর থেকে এনভেলাপটা তুলে নিয়ে দেখলেন। পরে দোকানের ভেতরে এসে ওই এনভেলাপটা খুলে ভেতরের চিঠিখানা, যেটি তাঁরই উদ্দেশে লেখা, সেটি পড়ে রামহরির বুকের মধ্যে কাঁপন শুরু হল। এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার কি এখনও ঘটে নাকি! এ তো নাটক-নভেলে ঘটে থাকে, বার-দুই এমন ঘটনার কথা খবরের কাগজে পড়েছেন ঠিকই কিন্তু সেটা যে, এই মুড়াগাছাতে তাঁর জীবনেই ঘটবে, এমন তো কখনও ভাবেননি। তাঁর প্রথমে মনে হল চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেন। কিন্তু সেটা করবার সাহসও তাঁর হল না। এমনিতেই ঘামছিলেন, এবার যেন ঘেমে নেয়ে উঠলেন। চিঠিখানা হাতে নিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে নিজের ঘরে এসে খাটের ওপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "হরি হে, এ কী ঘটালে!"

প্রথমে খবরটা শুনলেন থরহরির মা। শোনার পরই তিনি হিক্কা তুলে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। রামহরি চাপাস্বরে ধমক দিয়ে বললেন, "শব্দ করে কেঁদো না। লোক জানাজানি হলে প্রাণও যাবে।"

থরহরির দুই দাদা ভজহরি এবং থাকোহরিও ঘাবড়ে গিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠল। থরহরি নানা জায়গা ঘুরে বাড়ি ফিরে এল রাত্রি নটা নাগাদ। খেলার মাঠে শ্রীমান থরহরি রচিত, নির্দেশিত এবং অভিনীত 'রাবণবধ' পালার অভিনয় হবে বলে এই ক [illegible] দিন থরহরি বেজায়

ব্যস্ত। আজই ছিল পোশাক বায়না করার দিন। থরহরি বাড়ি ফিরে এসে দেখল ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে সবাই চুপ করে বসে। তার দুই দাদা দেয়ালের কোণে জড়াজড়ি করে বসে কাঁদছে। মা'র চোখ কেঁদে-কেঁদে ফুলে গেছে। থরহরি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ? এত কাঁদাকাটা কেন ?"

রামহরি প্রথমে বালিশের তলা থেকে চিঠিটা বের করে থরহরির হাতে দিতে-দিতে বললেন, "সাইকেলে করে এসে একটা ছোঁড়া এই চিঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে গেল।"

থরহরি চিঠি খুলে পড়তে আরম্ভ করল। চিঠিতে লেখা আছে, "৫ জুন রাত্রি ১টায় আমরা আসব আপনার বাড়িতে। বাইরে থেকে তিনটি টোকা দিলেই বুঝবেন আমরা এসে গেছি। আমাদের জন্য তিরিশ হাজার টাকা রেডি রাখবেন। টাকা না পেলে প্রাণ যাবে। যদি পুলিশ বা প্রতিবেশীকে জানান তা হলে আপনার গোটা বংশ লোপ করে দেব। দোকান আর বাড়িতে আগুন ধরাব। পুলিশ ক'দিন আগলে রাখবে। প্রাণের মায়া থাকলে তিরিশ হাজার টাকা রেডি রাখবেন। ইতি, ডাকাত সর্দার পল্টন।"

চিঠিটা পড়ে থরহরিও গম্ভীর হয়ে গেল। রামহরি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "হ্যাঁ রে, তুই পল্টনকে চিনিস ?"

থরহরি বলল, "ডাকাতকে চিনব কোত্থেকে ? তবে নাম শুনেছি। গেল মাসে ওরাই নাকি বাঁশবেড়িয়ার ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে দু' লাখ টাকা নিয়েছে।"

থরহরির মা কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "মাত্র এই ক'টা দিনেই অতগুলো টাকা ওদের ফুরিয়ে গেল ? দু' লাখ থাকতে আবার তিরিশ হাজার চাইছে কেন রে ?"

রামহরি বললেন, "এখন কী করবি ? থানায় যাবি, নাকি পঞ্চায়েতকে বলবি ? বললে পরে তো আবার বংশ লোপাট করে দেবে। তা হলে কী করব ?"

থরহরি বলল, "এখন কিছু করতে হবে না। ব্যাপারটা আগে ভেবে দেখি।"

রামহরি বললেন, "বেশি ভাবাভাবির সময় নেই। আজ দু' তারিখ গেল। কাল তিন, পরশু চার, আর তরশুতেই পল্টন এসে যাবে।"

থরহরি চিঠিটা নিজের পকেটে রাখতে-রাখতে বলল, "এসব ব্যাপারে না ভেবে কিছু বলা যায় না, করাও যায় না। এখন খেয়েদেয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকো।"

সে-রাত্রে কেউই ঘুমোতে পারল না। থরহরি সকালবেলা বেরোবার আগে বলে গেল, "কথাটা কাউকে বোলো না। আমি ভেবে দেখছি। তুমি কেবল তিরিশ হাজার টাকা জোগাড় করে রেখো।"

রামহরি নিজের কপাল চাপড়ে বলল, "আজ তিরিশ দিলে পরের মাসে এসে পঞ্চাশ চাইবে। তিরিশ হাজার জোগাড় করলে তোকে আর ভাবতে বলে লাভ কী !"

থরহরি শুধু বলল, "যা বলছি তাই করো।"

থরহরি কী ভাবছে কে জানে, কিন্তু সময় তো থেমে থাকছে না। তিন তারিখটাও চলে গেল। চার তারিখ সকালে রামহরি বলল, "ওরে থরহরি, আসছে কাল তো তেনারা আসবেন। তোর ভাবাভাবি শেষ হল ?"

থরহরি কথার কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেল। রামহরির তো খিদে-তেষ্টা গেছেই, এখন যেন মনে হচ্ছে পল্টন আসা পর্যন্ত তিনি হয়তো বেঁচেও থাকবেন না। বুকের মধ্যে এমন ওঠাপড়া করছে যাতে মনে হয় যে-কোনও সময় তিনি মারা যেতে পারেন।

সেইদিন থরহরি ফিরল রাত্রি দশটা নাগাদ। রামহরি কিছু বলবার আগেই থরহরি নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল তুলে চুপ করে থাকার ভঙ্গি করল। গোটা বাড়ি ক'দিন থেকে এমনিতেই চুপ মেরে গেছে। এখন থরহরির ইঙ্গিতে সবাই এমনভাবে চুপ করল, যেন নিজেদের নিশ্বাসের শব্দ নিজেরাই শুনতে পাচ্ছে।

থরহরি প্রথমে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করল। জানলা তো সেই দোসরা জুনের সন্ধ্যা থেকেই বন্ধ। ওটা দিনেও কেউ খোলে না। থরহরি বলল, "আমি যা-যা বলব, সেইমতো কাজ করতে হবে। একটু এদিক-ওদিক হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তিরিশ হাজার টাকাকে দু' টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা আর অল্প কিছু একশো টাকায় ভাঙিয়ে রাখো। যেন টাকার পুঁটলিটা দেখতে বেশ বড় হয় আর গুনতে সময় লাগে। টাকাগুলো প্লাসটিক কাগজে মুড়ে দড়ি দিয়ে বাঁধবে। তারপর কাপড় দিয়ে জড়াবে। তারপর টিনের বাক্সে রেখে তালা দেবে। আর সেই বাক্সটা রাখবে কাঠের বাক্সে। তাতে দেবে দুটো তালা। যাতে এতসব খোলাখুলি করতে একটু সময় লাগে। এবার যখন বন্ধ দরজায় গদাম করে একটি লাথির আওয়াজ পাবে তখন দরজাটা খুলে দেবে। পল্টন এলে দরজা খুলে দিয়ে কী করতে হবে সেটা গভীর রাত্রে তোমায় শিখিয়ে দেব।"

৫ জুন সন্ধ্যা থেকেই থরহরি উধাও। আর দুপুর থেকেই রামহরির বুকের কাঁপন বেড়ে যেতে লাগল। থরহরির ওপর আর কতটা ভরসা করা যায়। এটা তো আর বাহুল্যবর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার লেখা নয় যে, চিলেকোঠায় বসে লিখলেই ল্যাঠা চুকে গেল। এটা হচ্ছে ডাকাতির ব্যাপার। তিরিশ হাজার তো যাবেই, সেইসঙ্গে একটা-দুটো প্রাণও যে যাবে না সে-কথা কে বলতে পারে।

সন্ধ্যার পর থেকে রামহরি কাঁপতে আরম্ভ করলেন। রাত্রি দশটা পেরোবার পর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছেন না রামহরি। দু' পায়ের মালাইচাকিতে ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে। বার-দুই হরিকে ডাকবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। থরহরি যা শিখিয়ে দিয়ে গেছে সেটা মনে-মনে ঝালিয়ে নিলেন বটে, কিন্তু তাতে স্বস্তি পেলেন না। রাত্রি এগারোটা নাগাদ রামহরির স্ত্রী ভয়ে আর উত্তেজনায় বমি করতে আরম্ভ করলেন। ভজহরি আর থাকোহরির অবস্থাটা খুবই শোচনীয়। দু' ভাই দু'জনকে জাপটে ধরে সারা গায়ে নাইলনের মশারি জড়িয়ে বসে কাঁপছে। রামহরি তো ক্রমাগত কেঁপেই চলেছেন। যেন ছ্যাকরা গাড়িতে বসে কোথাও যাচ্ছেন। একবার তাঁর মনে হল, পল্টন এসে দরজায় তিন টোকা দেওয়ার আগেই হয়তো তাঁর শরীরের হাড়গুলো কাঁপতে-কাঁপতে খসে যাবে। এত কাঁপাকাঁপিতে কি হাড়ের জয়েন্ট ঠিক থাকে, না থাকতে পারে !

ঠিক বারোটা বাজতেই ভজহরি আর থাকোহরি একসঙ্গে গলা মিলিয়ে ডুকরে উঠল, "আমাদের কী হবে গো বাবা !"

রামহরি ধমকে উঠে বললেন, "তোদের বাবার কী হবে তা জানিস্ ! জুতিয়ে পিঠের ছাল তুলে দেব। পল্টনটা যদি সন্ধেবেলা আসত তা হলে যা হওয়ার এতক্ষণে হয়ে যেত। আর তো সহ্য হয় না।"

ভজহরি আর থাকোহরিও বলে উঠল, "আমাদেরও হয় না বাবা।"

রামহরি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর চল্লিশ মিনিট বাইশ সেকেন্ড।"

রামহরির ঘড়িতে যখন একটা বেজে দু' মিনিট তখন বন্ধ দরজার গায়ে তিনটে টোকা পড়ল। টোকার শব্দ শুনেই ভজহরি আর থাকোহরি পরস্পরকে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল। রামহরি কাঁপতে-কাঁপতে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। হাতে ভোজালি নিয়ে তিনজন মাঝারি চেহারার ছোকরা ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রামহরি কৃতার্থ হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "সন্ধে থেকে বসে

আছি। তা তোমরা মিনিটদুয়েক দেরি করলে কেন? বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?"

ওদের তিনজনের মধ্যে থেকে একজন বলল, "বাজে কথা রাখুন। আগে টাকাটা আনুন। তিরিশ হাজার টাকা, মনে আছে তো?"

রামহরি বললেন, "কেন মনে থাকবে না বাবা। কুড়িয়ে-কাঁচিয়ে তিরিশ জোগাড় করে রেখেছি। তা তোমাদের মধ্যে পল্টন কে গো?"

থুতনির কাছে অল্প দাড়িওলা একটি ছেলে বলল, "আমিই পল্টন।"

রামহরি পল্টনকে বললেন, "বেঁচে থাকো বাবা। বাঙালির ছেলে চোর-ছ্যাঁচোড় হয়, তুমি যে ডাকাত হতে পেরেছ এটা বাঙালির বড় গৌরব। সিনেমা-যাত্রায় সব ডাকাতই দেখি সিং-মার্কা। গব্বর সিং, মাধো সিং, রাম সিং, লখন সিং, মাখন সিং। তুমিই শুধু সিং-ছাড়া। শ্রীহরি তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন।"

পল্টন বলল, "আমি সিং নই, শিকদার। পল্টন শিকদার। এবার টাকাটা বার করুন।"

রামহরি বললেন, "টাকা তো গুনে-গেঁথে তোমাদের তরেই রেখে দিয়েছি। বুড়োমানুষ তো, এবার তোমরা এট্টু গুনে নাও। আর আমার হয়ে একটু উপকার করো।"

পল্টন বলল, "কিসের উপকার?"

রামহরি বললেন, "তোমাদের চিঠি পাই দোসরা জুন সন্ধের মুখে। বাড়ি এসে দেখি ওইদিন ঠিক ওই সময়েই বাড়িতে হুজ্জোত সিং বলে চম্বলের ডাকাত একখানা চিঠি দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছে। তারও আজ সোয়া একটায় আসবার কথা। এখন বাবা পল্টন, তিরিশের বেশি আমার নেই। সেটা আমি বাঙালি ডাকাতকে দিতে চাই। ওরা এলে তুমি যদি ওদের বুঝিয়েসুঝিয়ে ফেরত পাঠাতে পারো কিংবা ভাল কথায় না গেলে..."

ঠিক তখনই দরজায় গদাম করে লাথি মারার আওয়াজ হল। রামহরি বললেন, "ওই, হুজ্জোত সিং-ও এসে গেল।"

রামহরি দরজার কাছেই ছিলেন। পট করে দরজা খুলে দিতেই বিশাল চেহারার সাতজন দাড়ি-গোঁফওলা ডাকাত চাদর গায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকেই গায়ের চাদরের তলা থেকে নানা ধরনের পিস্তল বার করে দাঁড়িয়ে গেল। সবচেয়ে লম্বা চেহারার ডাকাতটা বলল, "আমার নাম হুজ্জোত সিং। পঞ্চাশ হাজার টাকা বার করো। এরা কারা?"

রামহরি বললেন, "আজ্ঞে, মিঃ হুজ্জোতজি, এরাও ডাকাত হ্যায়। বাঙালি ডাকাত। ভেরি ইয়ং অ্যাণ্ড প্রমিসিং। ওরা তিরিশ মাংতা। আপনি পঞ্চাশ মাংতা। লেকিন আমার কাছে কুড়িয়ে অ্যাণ্ড কাঁচিয়ে ওনলি তিরিশ হ্যায়। এখন ক্যায়া হোগা সেইটা শিকদার অ্যাণ্ড সিং বইঠকে-বইঠকে ফয়সালা করে ফেলুন।"

পল্টনের দল স্রেফ ভোজালি হাতে এসেছে। পিস্তলধারী সাতজন চম্বলের ডাকাতকে দেখে ওরা ঘাবড়ে গেল। হুজ্জোত সিং এগিয়ে এসে পল্টনের কাঁধে একটা থাপ্পড় মেরে বলল, "অব তেরা ক্যায়া হোগা পল্টন? হাম সাত হ্যায়, মেরা পাস পিস্তল অউর বম ভি হ্যায়। তেরা পাস ক্যায়া হ্যায়? কিতনা আদমি হ্যায়?"

পল্টন উত্তর দেওয়ার আগে হুজ্জোত সিং বলল, "হামি বাংলা জানি। দ্যাখ পল্টন, ডাকাতি কোনও শখের ব্যাপার নয়। কুড়ি-তিরিশ ডাকাতি করে তোরা ডাকাতের ইজ্জত নষ্ট করছিস। আমাদের দুনিয়াজোড়া ডাকাতির ব্যবসা। পাকিস্তানে আমাদের নিজেদের ব্যাঙ্ক আছে, তার নাম ডাকাত-ব্যাঙ্ক। পশ্চিমবাংলায় আমাদের কিছু ছেলে দরকার। তোরা খাওয়া-পরা, থাকা, সিকিউরিটি সব পাবি আর পাবি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে মাইনে। এইসব ছোটখাটো ধান্দা ছেড়ে আমার দলে ভিড়ে যা। নইলে আমরাই তোদের খুন করে ফেলব। পশ্চিমবাংলায় এখন আমাদের ব্রাঞ্চ খুলছি। তোদের তো থাকতে দেব না। ভেবে দ্যাখ কী করবি!"

পল্টনদের তিনজনের মাথার কাছে তখন পিস্তল ধরা। ওদের একজন হুমড়ি খেয়ে হুজ্জোত সিংয়ের পায়ের ওপর পড়ে বলল, "হুজ্জোতদা, আমি আপনার দলে জয়েন করব। হুজ্জোতদা যুগ-যুগ জিয়ো।"

হুজ্জোত সিং এবার পল্টনের থুতনির দাড়িতে নিজের হাতের পিস্তলটা আলতোভাবে বুলিয়ে নিয়ে বলল, "ক্যায়া রে পল্টন, ক্যায়া শোচ রাহা হ্যায়। জলদি তেরা ফয়সালা শুনা। মেরে পাস ওয়ক্ত জাদা নেহি। মেরা দুসরা ইউনিট আভি দু' লাখ রুপেয়া লুটকে ইধার আ যায়েগা। তু চাহে তো তুঝকো দো জেলা কা সর্দার বানা দুংগা।"

পল্টনের দ্বিতীয় সঙ্গীটি হাতের ভোজালি ফেলে দিয়ে বলে উঠল, "হুজ্জোতদা, হাম আপকা সাথ হ্যায়।"

হুজ্জোত সিং এবার তাকাল পল্টনের দিকে। পল্টন ছলছল চোখে বলল, "বড়া ভাই, মাফ কিজিয়ে। হাম আপকা সেবক হ্যায়।"

হুজ্জোত সিং বলল, "তো বাত পাক্কা হ্যায়। কালিয়া সিং অউর গড়বড় সিং দোস্ত লোককো পূজা কা লাড্ডু খিলাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে হুজ্জোত সিংয়ের দু'জন শাগরেদ তাদের ঝোলার ভেতর থেকে প্লাস্টিকের প্যাকেট বার করে ওদের দুটো করে লাড্ডু খাইয়ে দিল।

পল্টনদের যখন ঘুম ভাঙল, তখন তারা বীরপুর থানার লকআপে। ব্যাপারটা তখনও তারা বুঝে উঠতে পারেনি। বুঝল একটু পরে। হুজ্জোত সিংয়ের তৈরি লাড্ডুতে ছিল ঘুমের ওষুধ। লাড্ডু খেয়েই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমন্ত ডাকাতদের পাঁজাকোলা করে পুলিশ এসে শুইয়ে দিয়েছে লকআপে।

থরহরি মণ্ডলপাড়ার খাটাল থেকে যাদের ডাকাত সাজিয়ে হাতে যাত্রার পিস্তল দিয়ে নিয়ে এসেছিল ব্যাঙ্ক-ডাকাত ধরে দেওয়ার জন্য, তারা সবাই পুরস্কার পেল। থরহরিকে পুরস্কার দিলেন স্বয়ং জেলাশাসক। নিজে থরহরিকে নিয়ে এলেন গাড়ি করে তার বাবা, থরহরির গৌরবে গৌরবান্বিত রামহরিকে অভিনন্দন জানানোর জন্য।

থরহরি আর জেলাশাসক সুবীর মিত্র এসে দেখলেন রামহরি ঘুমোচ্ছেন। তাঁর বিশাল নাসিকাগর্জনে ঘরের দরজা-জানলা পর্যন্ত কাঁপছে। থরহরি বলল, "বলতে গেলে সেই দোসরা জুন রাত থেকে তো ঘুম নেই। তাই..."

জেলাশাসক বললেন, "ঠিক আছে। আমি বিকেলে মুগবেড়িয়াতে আসব। তখন ঘুরে যাব।"

বিকেলে এসেও শুনলেন রামহরি ঘুমোচ্ছেন। দরজার বাইরে থেকে তাঁর নাকের ডাক সকালে যেমন শুনেছিলেন তেমনই শোনা যাচ্ছে।

সুবীরবাবু বললেন, "এত ঘুম একসঙ্গে কেউ ঘুমোতে পারে!"

থরহরির মা লম্বা ঘোমটার ভেতর থেকে বললেন, "আজ্ঞে হুজুর, থরহরির বাবা সেদিন রাত্রে মনের আনন্দে হুজ্জোত সিংয়ের আনা লাড্ডুর প্যাকেট থেকে চারখানা লাড্ডু খেয়ে সেই যে নাক ডেকে ঘুমোতে লাগলেন আর উঠলেন না।"

হতাশ হয়ে জেলাশাসক ফিরে গেলেন। রামহরি এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন বলে ছেলের কীর্তিতে তাঁর প্রতিক্রিয়াটা জানা গেল না, এই যা আফসোস।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

দেখো এসে পড়ার টেবিলে

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

"চুপ করে বোসো—গুড্ডু, মাম্পি, বুকুন,
পড়াশুনাতে কি মন নেই একটুকুন ?
এই কি অঙ্ক ? শুধু কিছু সাদা পাতা ?
দিনে-দিনে দেখি হচ্ছ তোমরা যা-তা !
বার করো বই, হিস্ট্রি-ভূগোল-গ্রামার—
এত ফাঁকিবাজি পছন্দ নয় আমার ।
এমন করলে—মনে রেখো প্রত্যেকে—
ইস্কুলে নাম কাটা যাবে কাল থেকে ।"

দিদিমণি বড় বেশি রাগী, কড়া মাপের,
তিনটি পড়ুয়া ভয়ে থরথর কাঁপে ।
কে বলবে, এরা আসলে আসল নয়,
জমিয়ে তুলেছে খেলা-খেলা অভিনয় ?

পড়ুয়া তিনটি নিতান্ত গোবেচারা
খেলতে পারে না টুপুরদিদিকে ছাড়া,
তাই তো এদের ছাত্রের ভূমিকাতে
বসিয়ে দিদিটি বই নিয়েছেন হাতে ।
নইলে, যখন বিকেলের এই খেলা
শেষ করে দিয়ে সত্যি পড়ার বেলা,
পড়ার টেবিলে দেখো একবার এসে—
কী গভীর ঘুমে কাদা দিদিমণি
নিজে ছাত্রীর বেশে !
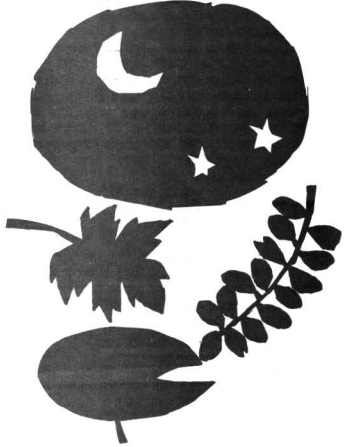
ছবি : সুব্রত চৌধুরী

চিনতে পারো ?

শ্যামলকান্তি দাশ

ছেলে খুব ঘুমকাতুরে, ঘুম যাই দিনের বেলা,
মাঝরাতে দুয়ার খুলে খেলি জ্যোচ্ছনার খেলা ।

আকাশে সাঁতরে বেড়াই, ওড়ে রে হাঁসবলাকা,
কেউ ভাবে আলোর ছায়া, কেউ ভাবে দীপশলাকা ।

খাই লবণাম্বুরাশি, খাই তিন্তিড়ীর পাতা,
মাঝে মাঝে গান হয়ে যাই, মাঝে মাঝে ছবির খাতা ।

যেই মেঘবাদল ফুঁড়ে নামে চাঁদ গগনতলে,
মুখ ঢাকি শালুকপাতায়, কিংবা থলকমলে ।

বাজে ঢাক তাকতা-দুদুম, বাজে কাঁসি ঝিনিক-ঝিনা,
দ্যাখো তো আগের মতো চিনতে পারলে কি না !

খ্যাতির ইতিহাস

টেনিসে খ্যাতি অর্জনের এক অসাধারণ কাহিনী !

স্কুলে এক নতুন ক্রীড়াশিক্ষক এলেন এবং তিনি স্কুলে টেনিস কোর্ট তৈরি করালেন...
টেনিস আমার প্রিয় খেলা...আমি ব্রিটিশ ডেভিস কাপ টিমে খেলেছি ! আমি তোমাদের টেনিস শেখাব ! হার্ভে, আগে তুমি খেলবে এসো !
আমমি ? কিন্তু...
শিক্ষক মিঃ স্পেনসার নাছোড়...
হার্ভে র‍্যাকেটটা ঠিকমতো ধরেছে এটাই আশ্চর্য !
কেলেঙ্কারি হতে চলেছে !
হার্ভে, তুমি বলটা ফেরত পাঠাবে তা আশা করি না। শুধু দ্যাখো কী করে সার্ভ করি আর শিখতে চেষ্টা করো...
কিন্তু সবাই চমকে গেল !
মারার লোভ সামলাতে পারছি না !
ওটা নিখুঁত ফোরহ্যান্ড ড্রাইভ ! কিন্তু ভেবেছিলাম তুমি আগে কখনও টেনিস খেলোনি !
ফ্র্যাঙ্কের কিছু একটা হয়েছিল !
আগে কখনও খেলিনি, স্যর... তবে কেন যেন মনে হচ্ছে কী করা উচিত জানি...
দারুণ সার্ভ... আবার মারো, দেখব !
অবিশ্বাস্য ব্যাপার !
ফ্র্যাঙ্ক আরও কিছু করল...ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোক...
চমৎকার !
এবং চাপ !
অবিশ্বাস্য !
এবং ভলি...
অপূর্ব !
মিঃ স্পেনসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ !
তোমার খেলার ভঙ্গি অবশ্য আনাড়ি, কিন্তু টেনিসে তোমার দারুণ প্রতিভা আছে, ফ্র্যাঙ্ক !
টেনিসে প্রতিভা...আমার ! তা হলে কি শেষ পর্যন্ত আমার হারের দিন শেষ হয়ে জয়ের দিন এল ?
এর পরে : ফ্র্যাঙ্কের চ্যালেঞ্জ !

খ্যাতির ইতিহাস

ফ্র্যাঙ্ক হঠাৎ খানিকটা সাহস খুঁজে পেল... এবং চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল !

আমি এক জনপ্রিয় দৈনিকের ক্রীড়াসম্পাদক। আমার সংগৃহীত তথ্য থেকে ফ্র্যাঙ্ক হার্ডের কাহিনী শোনাচ্ছি, যে খেলাধুলোয় আনাড়ি ছিল বলে স্কুলে সকলের হাসির পাত্র ছিল। তারপরে নতুন এক ক্রীড়াশিক্ষক তার মধ্যে টেনিস-প্রতিভা আবিষ্কার করলেন। ফ্র্যাঙ্ক বিমুঢ়...
ক্রীড়াসম্পাদক
ফ্র্যাঙ্ক হার্ডে

সবজির দোকান
খেলার সরঞ্জাম
টেনিস-প্রতিভা...আমি ! তবু আমি মিঃ স্পেনসারের বিরুদ্ধে খেলে ওঁকে চমকে দিয়েছি। একদিন চ্যাম্পিয়ানও হতে পারি !
আরে, দ্যাখো, ওখানে কে !

ফ্র্যাঙ্কের স্কুলের কিছু ছেলে তার পেছনে লাগল...
বছরের সেরা তামাশা... ফ্র্যাঙ্ক হার্ডে খেলার সরঞ্জাম দেখছে !
পরের ওলিম্পিকে তোমার সম্ভাবনার কথা ভাবছ, ফ্র্যাঙ্ক ?
ও স্বপ্ন দেখতে পারে বইকী !
GREENGROCER
তোমাদের মাথাব্যথা কেন ? কাজে যাও...

তোমাকে দেখলে করুণা হয় ! তুমি এত দুর্বল না হলে একটু মুষ্টিযুদ্ধ শেখাতাম !
উহহ ! দ্যাখো কী করলে !
হা, হা ! একটু জলকেও তোমার এত ভয়, ফ্র্যাঙ্ক ?

ফ্র্যাঙ্ক হঠাৎ একটু সাহস পেল...
শিগগিরই আমার সম্পর্কে তোমাদের ভুল ভেঙে দেব ! টেনিসে তোমাদের হারাব !
হাঁদার কথা শোনো...
দিনে-দিনে ও আরও হাস্যকর হয়ে উঠছে !

আচ্ছা, হার্ডে...স্কুলের টেনিস কোর্টে কাল বিকেলে দেখা হবে ! তোমাকে বলে রাখি, টেনিস আমার প্রিয় খেলার একটি !
কিথ অনেক বছর টেনিস খেলছে ! তুমি মজা বুঝবে !

বাড়ি ফিরে...
ফ্র্যাঙ্ক, এ কী দশা হয়েছে...তুমি জল ঘাটবে না ! ঠাণ্ডা লাগতে পারে।
দুঃখিত, মা... হোঁচট খেয়েছিলাম। টিভি প্রোগ্রামটা কোথায় ?

এবং পরে...
আশ্চর্য, ফ্র্যাঙ্ক টিভিতে টেনিস খেলা দেখছে !
বেচারা...কোনও খেলাই ভাল খেলতে পারে না বলে ও হতাশ হয়ে থাকে ।
এই প্রথম টেনিস খেলা দেখে আনন্দ পেলাম... আমি নিজেকে ওখানে কল্পনা করতে পারি ! হয়তো শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হব...
পরদিন ফ্র্যাঙ্কের আত্মবিশ্বাস রইল না...
এখন কিথের সঙ্গে না খেলাই উচিত ছিল । সত্যিই টেনিসের বিশেষ কিছু আমি জানি না । কিন্তু এখন পিছিয়ে এলে বোকা বনব...
শিক্ষকদের ঘর
মিঃ স্পেনসার আমার একমাত্র ভরসা...
কিন্তু...
দুঃখিত, ফ্র্যাঙ্ক । আজ লাঞ্চের সময় তোমাকে টেনিস শেখাতে পারব না... এত খাতা দেখতে হবে । তবে তোমার আগ্রহে আমি খুশি... কাল দেখা কোরো...
ধন্যবাদ, স্যার...
এবং বিকেলে...
হার্ভে, তুমি এসেছ ! সাহস আছে বলতে হবে...মার খাওয়ার জন্য তৈরি হও !
একে বলে নেট ! এর ওপর দিয়ে বল মারে তা জানো তো ?
ও পয়েন্ট গুনতেও জানে কি ?
কিথ প্রথমে সার্ভ করল...এবং...
দারুণ শট, কিথ !
ফিফটিন লাভ !
উফ, ও ভাল খেলে... আর দ্রুত...
পরের সার্ভে ফ্র্যাঙ্ক কোনওমতে বলে র‍্যাকেট ছোঁয়াল, তবে...
থার্টি লাভ !
বলে আমার নিয়ন্ত্রণ নেই । কালকের মতো খেলতে পারছি না...
তৃতীয় সার্ভেও ফ্র্যাঙ্ক পরাজিত !
ফর্টি লাভ !
কিথ প্রথম গেম জিতল !
হার্ভে বলেছিল, "তোমাদের ভুল ভেঙে দেব" ...হা, হা ! অন্য খেলার মতো টেনিসেও ও আনাড়ি !
আমার কী হয়েছে ? কাল যে প্রতিভা দেখিয়েছিলাম তা আজ কোথায় গেল ? এই খেলায় হারলে আরও বেশি হাস্যকর হব !
এর পরে : ফ্র্যাঙ্কের সংগ্রামী প্রত্যাবর্তন !

খ্যাতির ইতিহাস

এখন ফ্র্যাঙ্কের উচিত মনোভাবের পরিবর্তন করে খেলা শুরু করা !

উহ্‌ ! ও টপ-স্পিন দিয়েছে ! আমি বলের দিশা পাচ্ছি না !
তা হলে এইজন্যই ওভাবে মেরেছিলাম ! বল উঁচু হয়ে ফিরে আসছে !
ওখানে যাও !
ওই বল ঠেকাবার আশা করিনি !
ইস্‌ ! কী দারুণ চাপ ! হার্ভে সত্যি খেপে গেছে !
ফ্র্যাঙ্ক বারবার একই রকম টপ-স্পিন বল দিতে লাগল...
না, না... কী ঘটতে যাচ্ছে আমি জানি...
তোমাকে মুঠোয় পেয়েছি...
...আর আমার এটাই পছন্দ !
উহহ !
হার্ভে ক্রমেই চাপছে !
ফলাফল নাটকীয়ভাবে বদলে গেল...
আধ ঘণ্টায় পাঁচ গেম জিতে হার্ভে কিথের সমান... এবং মনে হচ্ছে হার্ভেই জিতবে।
কিথ আর বল থামাবার চেষ্টাই করছে না !
আমাকে আর আনাড়ি বলবে !
তখন...
হার্ভে, আমি হার মানছি। এত ক্লান্ত যে, র‍্যাকেট ধরতে পারছি না !
শাবাশ, হার্ভে ! তোমাকে আর ঠাট্টা করব না...
কিন্তু...
কাপুরুষ ! তোমাকে পিষে ফেলবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলে ! যাও, চলে যাও !
শশান্ত হও...
আআমরা যাচ্ছি...
বাড়ি ফিরে ফ্র্যাঙ্ক টিভিতে টেনিস খেলায় ডুবে গেল...
তোমার চা আর বিস্কুট, সোনা...
এবং আজকের টেনিস সত্যিই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে... ভাবছি ব্রিটেনের কোনও উঠতি তারকা কি টিভি দেখছেন ?
দেখলে, মরিস, ওর একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে... আমার এটা ভাল ঠেকছে না !
আমিও ব্রিটেনের সেই উঠতি তারকা হতে পারি ! সেটাই আমার লক্ষ্য হবে ! আজকের মতো এমনভাবে খেলে যেতে পারলে তা সম্ভব হবে এটা জানি !
পরের ঘটনা অনুসরণ করা যাক !

খ্যাতির ইতিহাস

ফ্র্যাঙ্ক এখন আর সেই শান্ত স্বভাবের ছেলেটি নেই...

স্বপ্ন...কিন্তু একদিন তাকে সত্য করে তুলব ! ওই ট্রোফি আমার হবে ! দেখিয়ে দেব আমাকে ঠাট্টা করে ভুল করেছে !
পুরুষদের উইম্বলডন ট্রোফি
টেনিসে প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ফ্র্যাঙ্ক তার শান্ত স্বভাব বিসর্জন দিল...
রাস্তা ছাড়ো, আমার তাড়া আছে !
উহুহু !
লেখাপড়ায় তার উৎসাহ রইল না...
হার্ভে, টেনিসের বই না পড়ে ক্লাসের পড়ায় মন দাও !
পড়ার চেয়ে এতে অনেক বেশি মজা... আমার টেনিস খেলা এই স্কুলকে খ্যাতি এনে দিতে পারে !
ক্রীড়াশিক্ষক মিঃ স্পেনসার ফ্র্যাঙ্ককে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিলেন...
তোমার দুর্বলতা ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোকে । ওর উন্নতি দরকার...
বেশিদিন থাকবে না বলতে পারি !
এবং প্রচুর অনুশীলনের পরে...
চমৎকার ! তোমার ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোকে এখন আর ত্রুটি নেই ! একেবারে নিখুঁত !
বলেছিলাম এটা করব !
কাউকে টেনিসের জন্য এত খাটতে অথবা এত তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে দেখিনি ! ভাবছিলাম কাউন্টি দলে তোমাকে ঢোকানো যায় কি না...
ওপরে উঠতে এটা খুব কাজে লাগবে । চলুন এক্ষুনি যাই !
ফ্র্যাঙ্ক এমন জিদ ধরল যে, মিঃ স্পেনসার এড়াতে পারলেন না !
সুপার মার্কেট
তোমাকে নেবে এমন কথা দিচ্ছি না । বেশি আশা না করাই ভাল...
দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ স্পেনসারের কথাই ঠিক...
মিঃ স্পেনসার, ছেলেটির প্রতিভা থাকতে পারে, কিন্তু দলে এখন আর জায়গা নেই...
দুঃখিত ফ্র্যাঙ্ক । আমি আগেই বলেছিলাম...
কিন্তু তখন...
ঠিক ! সেক্ষেত্রে আমি টেনিস ছেড়ে দিচ্ছি...আর কখনও খেলব না !
কাহিনীর চূড়ান্ত পর্বে আসছে রোমাঞ্চকর সব ঘটনা !

খ্যাতির ইতিহাস

ফ্র্যাঙ্ক শুধু টেনিস খেলতেই অস্বীকার করল না...সে স্কুলেও যাবে না !

কিন্তু তখন...
কী ব্যাপার... ? সাবধান, বাপু...
ওহহহ !
ওকে ধরে রাখুন, অফিসার ! ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই...
এবং...
ফ্র্যাঙ্ক, আমার কথা শোনো...এই বোকার মতো ব্যবহার বন্ধ না করলে বিপদে পড়বে ! বুঝতে চেষ্টা করো...টেনিসে প্রতিভার ভাগ্য যদি তোমার থাকে, তবে তা কাজে লাগাও ! তোমার সাফল্যের সম্ভাবনাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ো না !
কয়েক বছর বাদে, উইম্বলডনে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে...
মার্ক এলিয়টের ভাল সার্ভ...
এই ফাইনালে ওকে বিজয়ী ধরা হচ্ছে...
কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক হার্ভের কী মারাত্মক রিটার্ন !
ঠিক লাইনের ওপরে। মনে হচ্ছে ও যেখানে ইচ্ছে সেখানেই বল পাঠাতে পারে !
হ্যাঁ, হার্ভে আজ হারবে বলে ধরা হয়েছে...কিন্তু ওর দুর্দান্ত প্রাণশক্তি এলিয়টকে গ্রাস করেছে !
বলটা আস্তে ওধারে ফেলবে বলে ঝট করে নেটে চলে গেল !
তখন...
উঃ ! হার্ভের র‍্যাকেট নিশ্চয় বেঁকে গিয়েছে !
অবিশ্বাস্য ! কেউ কল্পনা করেনি... কিন্তু হার্ভে নতুন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান !
মিঃ স্পেনসার এখন হার্ভের পেশাদার কোচ...
তুমি উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান ! তোমার স্বপ্নের কথা মনে আছে, ফ্র্যাঙ্ক...
ভাগ্যকে ধন্যবাদ, আপনার উপদেশ শুনে স্কুলে ফিরে এসেছিলাম এবং টেনিস ছেড়ে দিইনি...নয়তো স্বপ্ন সত্য হত না !
ফ্র্যাঙ্ক হার্ভে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা তাকে এনে দিয়েছিল সাফল্য আর খ্যাতি। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, কোনও খেলায় জয়ী হওয়ার জন্য চাই সঙ্কল্প আর—ধৈর্য।
টেনিস
(সমাপ্ত)

বর্ণমালা বাংলা আমার

রত্নেশ্বর হাজরা

যখন রোদের শরীর জুড়ে দুপুর করে ঠা-ঠা
একলা চিলের কান্না ঘোরে শিমুলতলার দিকে
কিংবা যখন একটানা শিস দোয়েল দিচ্ছে হাওয়ায়
বিকেলবেলার রোদটুকু বেশ ফিকে,
তখন তোমরা কোথায় থাকো শুয়ে
কোন বিভুঁয়ে গভীর ঘুমে কাটাও সারা নিশি !
আমার গাঁয়ে রাত্রি হলেই তোমরা কেন জেগে
প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়াও সপ্তঋষি !
তোমরা বুড়ো—ভীষণ বুড়ো—মরীচি, অঙ্গিরা,
বশিষ্ঠ আর অত্রি মুনি,পুলস্ত্য, পুলহ
এবং ক্রতু—সাত বুড়োতে আকাশ তপোবনে
ঝিক্‌মিকিয়ে ঝিক্‌মিকিয়ে চলছ অহরহ ।

কোন্ নদীতে ডোবাও তোমরা পুজোর কমণ্ডলু ?
ঐখানে কি পথের ধারে বকুল পেকে থাকে !
কৃত্তিকারা দল বেঁধে যায় শিবঠাকুরের মেলায় !
ছোট্ট বউ কি একলা কাঁদে মনে পড়লে মাকে ?
ঐখানে কি হিম পড়ে খুব মাঘের রাত্রিবেলা
অলস ঘুঘুর ডাক শোনা যায় যখন ভরা দুপুর ?
ঠাক্‌মা কি রোজ গল্প শোনায় দস্যি খোকনটাকে !
টিনের চালায় বৃষ্টি টাপুরটুপুর !

প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে তাকাচ্ছ সাত ঋষি,
কোথায় থাকো যখন ঝড়ে দোলে বাবুইবাসা ?
আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ? বুঝতে পারো কিছু ?
বর্ণমালা বাংলা আমার, বাংলা মাতৃভাষা ।

ইচ্ছে করে

আশিস সান্যাল

ইচ্ছে করে কলকলিয়ে
নদীর মতন বেশ,
বরফ-সাদা পাহাড় থেকে
চলতে নতুন দেশ ।

দু'পাশ থেকে দেখবে চেয়ে
বনের সবুজ গাছ,
আমার বুকে করছে খেলা
কত রঙিন মাছ ।

বন পেরিয়ে গ্রামের ভেতর
আসব আমি যেই,
জলকে চলে গাঁয়ের বধূ
দেখব আমাতেই ।

নীল সাগরের লবণ-জলে
মিলবে যখন হাত,
দু'চোখ মেলে দেখব নিঝুম
তারায় ভরা রাত ।

দূর থেকে নীল পড়বে ঝরে,
স্বপ্ন রাশি-রাশি ;
ঢেউয়ের দোলায় দেখব হাজার
পরির মুখের হাসি ।

এঁকেবেঁকে এক নদী

রতনতনু ঘাটী

এঁকেবেঁকে এক নদী দূর দেশে ছুটছে
টগরের বনে আজ খই রঙ ফুটছে
একবার থামে যদি তক্ষুনি আঁকবে
তারপর খুশিমতো নানারঙে ঢাকবে
তিলফুল-বনে পরি উড়ে-উড়ে নামছে
রঙ-তুলি হাতে নিয়ে এক ছেলে ঘামছে ।

কাঁচটিপ ভেসে যায়, গোল-পাতা নৌকো
ছোট-ছোট ঢেউগুলো তেরছা ও চৌকো
নদীচরে ভাইবোন কানামাছি খেলছে
আকাশের কোণে ঘুম-তারা চোখ মেলছে
এই সব কল্পনা ছবি হয়ে নামছে
রঙ-তুলি হাতে নিয়ে এক ছেলে ঘামছে ।

নিঝ্‌ঝুম শুনশান রাত নেমে আসছে
দু' চোখের পাতা জুড়ে এক নদী ভাসছে
রুপো ফুল সোনা ফল গাছে পাতা খসল
কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে নদী বসল
ছবি আঁকা ভুলে ভাবে নদী কেন থামছে
রঙ-তুলি হাতে নিয়ে এক ছেলে ঘামছে ।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

এমনটি কেউ ভাবেনি

সমরজিৎ কর

আপাতত এটাই কি তা হলে শেষ অভিযান হবে ? যদি তাই হয়, তা হলে এত কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা খরচের কী দরকার ছিল ? আর এই বরফের রাজ্যে একটানা তিনমাস এত কষ্টই বা কেন ? একটা কিছু যে এখানে ঘটছে, সে তো বোঝাই যাচ্ছে ! সেই 'একটা কিছু'র রহস্য যখন হাতের মুঠোয়, ঠিক সেই সময় কিনা—"না না, এ অসম্ভব প্রস্তাব,"—কথাটা যেন নিজেকেই বললেন কর্নেল কুলশ্রেষ্ঠ। মানে শিউপ্রসাদ কুলশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁর পাশে যাঁরা দাঁড়িয়ে, ডঃ রসকট, ডঃ মেটা এবং ডঃ রায়—সে-কথা তাঁরাও শুনলেন।

"তা হলে আপনার শেষ নির্দেশটি কী দাঁড়াচ্ছে, ডঃ বাসু ?" যেন মরিয়া হয়েই প্রশ্ন করলেন কুলশ্রেষ্ঠ।

"আপনারা যেখানে আছেন, সেখানেই অবস্থান করুন। সব কাজ এখন বন্ধ। হয়তো আপনাদের ফিরেও আসতে হতে পারে।" রেডিও টেলিফোনে ডঃ বসুর দৃঢ় কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

"আমি বলছিলাম, যা ঘটেছে, হয়তো সেটা নেহাতই আকস্মিক ব্যাপার..."

"এক্ষেত্রে কিছু নিয়ে কল্পনা করাটা ঠিক হবে না, কর্নেল। যা বললাম, তাই করুন, পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন।" মনে হল ডঃ বাসু খুবই অনমনীয়।

"যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যই হয়তো রেডার আমাদের ভুল নির্দেশ দিয়েছে—মানে ডঃ রায়ের তো তাই ধারণা।"

"না।"

"তার মানে ?"

"সবুর করুন, সময়ে জানতে পারবেন।"

"আমাদের চারজন গবেষক সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারায়। ডঃ মেটা বলছেন, দিনের পর দিন এমন পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে সেটা হতে পারে।"

"দোহাই আপনার, কর্নেল। আপনি ঝানু সৈনিক। আপনার বয়সও কম। দলটির নেতা হিসাবে আপনার বলিষ্ঠ মনের যে পরিচয় দিয়েছেন, আমরা সবাই তার জন্য গর্বিত। জানি, সাফল্যের সামনে এসে সৈনিকরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই যে, এ ক্ষেত্রে ভাবাবেগকে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। গুড লাক।" বলেই ডঃ বাসু টেলিফোনের যোগাযোগ কেটে দিলেন।

রিসিভারটি কান থেকে সরিয়ে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে রইলেন কর্নেল। খুবই যে বিহ্বল হয়েছেন, সেটা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। রিসিভারটি ধীরে-ধীরে ক্র্যাডেলের ওপর নামিয়ে রাখলেন তিনি।

প্রকৃতির এই রাক্ষসী পরিবেশে আশ্রয় বলতে তো তিনটে গাড়ি। তিনটে ক্যারাভানও বলতে পারো। আন্টার্কটিকার ভারতীয় স্টেশনের নাম দক্ষিণ গঙ্গোত্রী। সে-জায়গাটা তবু ভাল। কিন্তু এখানে ? ডঃ বাসুর নির্দেশেই তো এখানে আসা। এই অভিযানের ছক তিনিই তো করেন।

দক্ষিণ গঙ্গোত্রী থেকে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার আরও দক্ষিণে—শুধু বরফেরই পাহাড়। এখানে আসার পথে কিছু-কিছু পাথুরে পাহাড় অতিক্রম করতে হয়েছে। ধূসর তাদের রং। মেরু প্রভার দরুন দিন-রাতে কোনও পার্থক্য নেই। সূর্য প্রায় মাথার ওপর—বৃত্তাকার পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেরুর কাছাকাছি বলেই এমনটি দেখায়। আর আবহাওয়া! এই গ্রীষ্মেও বাতাসের তাপমাত্রা শূন্যেরও নীচে, ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাঝে-মাঝে প্রচণ্ড ঝড়। তারও গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৭৫ কিলোমিটার। কী নিদারুণ অবস্থা!

এই পাঁচশো কিলোমিটার পথ আসতে কী প্রচণ্ড ঝুঁকিই না গেছে! যে-কোনও মুহূর্তেই তো পুরো দলটি বরফের নীচে চাপা পড়তে পারত।

দল! দল বলতে মোট আটজন। কুলশ্রেষ্ঠর বয়স চল্লিশ। ভারতীয় নৌবহরে প্রায় সতেরো বছরের অভিজ্ঞতা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্লাজমা ফিজিক্স-এ ডক্টরেট। টেলিকমিউনিকেশনে খুবই অভিজ্ঞ। ডঃ মেটা পেশায় চিকিৎসক। দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স-এর শারীরবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। নিম্ন তাপমাত্রায় মস্তিষ্কের কাজকর্মে কী-কী সমস্যা দেখা দিতে পারে, সে-বিষয়ে তাঁর গবেষণা বিজ্ঞানীমহলে খুবই কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। ডঃ রসকট ত্রিবান্দ্রমের মানুষ। বয়স তেতাল্লিশ। ইতিমধ্যে তিনি আন্টার্কটিকায় ঘুরে গেছেন দু'বার। কুমেরুর আবহাওয়া সম্পর্কে খুবই অভিজ্ঞ। ডঃ রায়, মানে অভিজিৎ রায়। বয়স পঁয়ত্রিশ। প্যাসাডিনায় জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরিতে প্রায় আট বছর স্যাটেলাইট ডেটা প্রসেসিং নিয়ে কাজ করেন। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ডক্টরেট। বাকি চারজনের মধ্যে দু'জন: অলোক নাগ, বয়স সাতাশ। ভূ-পদার্থবিজ্ঞানের গবেষক-ছাত্র; রামবাবু, বয়স পঁচিশ। ধাতুবিজ্ঞানী। বাকি দু'জন মাধবন এবং হরিরাম গাড়ির চালক।

ওঁদের সঙ্গে ছিল তিনটে মাঝারি আকারের সুন্দর ক্যারাভান। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। সেগুলির মধ্যে খাওয়া, শোওয়া এবং গবেষণা করার সব ব্যবস্থাই রয়েছে। আর রয়েছে ল্যান্ডরোভারের মতো একটি গাড়ি। বেশ শক্তপোক্ত করে তৈরি। চাকার পরিবর্তে এতে যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মতো ক্যাটারপিলার ব্যবস্থা রয়েছে। এটিরও ভেতরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। সামনে দুটি পৃথক আসন—মাধবন এবং হরিরামের। পেছনেও দুটি আসন অলোক নাগ এবং রামবাবুর। তাদের দু' পাশে নেভিগেশন যন্ত্র। গাড়িটির ছাদে প্রয়োজনে ঘোরানো যায় এমন একটি অ্যান্টেনা। তারের জাল দিয়ে তৈরি। ক্যারাভানগুলি চালানোর দায়িত্ব কুলশ্রেষ্ঠ, রসকট এবং রায়ের ওপর।

ডঃ বাসুর নির্দেশমতো যে-জায়গাটিতে এসে কুলশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সঙ্গীরা অপেক্ষা করছেন, আন্টার্কটিকার মানচিত্রে এখনও তা স্থান পায়নি। ডঃ বাসু জায়গাটির নাম দিয়েছেন 'পয়েন্ট জিরো'। ঠিক হয়েছে

কুলশ্রেষ্ঠ ক্যারাভান তিনটি নিয়ে এখানেই থাকবেন। আর অলোক, রামবাবু, মাধবন এবং হরিরাম রোভারটিকে নিয়ে লক্ষ্যস্থানে গিয়ে হাজির হবে।

রুটিন ধরে গতকাল সকালেই তারা বেরিয়ে পড়েছিল। এ-অঞ্চলে বরফ নেই। সর্বত্রই কঠিন শিলা। কুলশ্রেষ্ঠ তাঁর ক্যারাভান থেকে রেডার-সঙ্কেতের সাহায্যে রোভারটির গন্তব্যপথের নিশানা জানিয়ে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু ঘণ্টাতিনেক চলতেই ব্যাপারটা ঘটল। মাধবন আবিষ্কার করল, রোভারটি যেন ঠিক পথে যাচ্ছে না।

"আমাদের গাড়ি ঠিক পথে চলছে না।" অলোক সঙ্গে-সঙ্গে রেডিয়ো-ফোনে খবরটা কুলশ্রেষ্ঠকে জানায়।

"কী বলছ, তুমি! আমি তো ঠিক নির্দেশই দিচ্ছি।" বেশ বিরক্তির সঙ্গেই কথা বললেন কুলশ্রেষ্ঠ।

"আপনি ভুল বলছেন, কর্নেল। আপনার নির্দেশমতো মাধবন গাড়ি চালালে আর-একটু পরে আমরা নিকেশ হয়ে যেতাম। আমাদের সামনে প্রায় হাজার ফুট গভীর একটি খাদ;" অলোকের চিৎকার শোনা গেল।

"অসম্ভব।"

"ইটস্ দ্য ফ্যাক্ট।"

"লাল বড়ি খেয়ে তোমরা একটু অপেক্ষা করো। মনে হচ্ছে তোমাদের মনের ওপর চাপ চলছে। তাই রেডার-সঙ্কেত পড়তে ভুল হচ্ছে। বড়িটি খেলে সেটা সেরে যাবে।" বললেন ডঃ মেটা।

মেটার উপদেশমতো বড়ি খেল তারা। অপেক্ষাও করল আধ ঘণ্টা। না, কোনও ফল হচ্ছে না। রেডারের সঙ্কেত যা—মানে 'গাড়ি নিয়ে মৃত্যু গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ো'।

লাল বড়ি। অর্থাৎ দাওয়াই খেয়ে মেজাজকে শক্ত করে তোলা। তা আন্টার্কটিকার এই একঘেয়ে পরিবেশে মেজাজটা যে মাঝে-মাঝে খিটখিটে হয়, সে-অভিজ্ঞতা তো আগেই হয়েছে। মনের ওপর চাপ! তা পড়তে পারে। কোনও গাছপালা নেই। এক পোঁচ শ্যাওলা যে সবুজের স্বাদ মেটাবে—কোথায় সেই শ্যাওলা। প্রাণী? তা প্রাণী বলতে তো এই চারজন—অলোক, রামবাবু, রাঘবন এবং হরিরাম। গাড়ির চাকার নীচে ধূসর পাথর। যতদূর দৃষ্টি যায়—তার যেন শেষ নেই। এমন বিষণ্ণ পরিবেশে—হতে পারে, ডঃ মেটা যা বললেন, মানসিক চাপ ঘটা অসম্ভব নয়। তা থেকে পরিত্রাণ পেতেই বিশেষ একটু ওষুধের ব্যবস্থা করেছিলেন ডঃ মেটা—সেই লাল বড়ি।

কিন্তু তাতে কোনও ফলই পাওয়া গেল না। বরং চারজনই বুঝল, ওষুধ খাওয়ার কোনও মানে হয় না। মস্তিষ্ক তাদের ঠিকমতোই কাজ করছে। তা ডঃ কুলশ্রেষ্ঠ মানুন আর না মানুন।

রেডার যন্ত্রটি আবার পরীক্ষা করে দেখল অলোক এবং রামবাবু। বারবার দেখতে লাগল। "না, কোনও গোলমালই তো চোখে পড়ছে না।" বলল অলোক। আর ঠিক পরক্ষণেই—ওদের মনে হল, বাতাসে এক ঝাপটা ধুলো এসে লাগল তাদের চোখেমুখে। সঙ্গে-সঙ্গে রেডার-স্ক্রিনের ওপরকার সবুজ সঙ্কেতটি নিভে গেল।

কয়েক সেকেন্ড!

আবার ভেসে উঠল সবুজ সঙ্কেত। এবং খাপছাড়া ভাবে নাচতে লাগল স্ক্রিনের ওপর।

"হায় ভগবান।" প্রায় কেঁদেই উঠল হরিরাম—ভয়ে এবং হতাশায়।

"বুঝতে পারছেন, রামবাবু? অবস্থাটা—"

অলোকের কথা শেষ হল না। কথা বলল হরিরাম, "আমরা হারিয়ে গেছি, সার। তার মানে আমরা সাবাড়—!"

ধৈর্য ঘটে রামবাবুর। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা রাখতে পারেন।

"ব্যাপার কী, অলোক? হঠাৎ এমন কালো ধূলিকণা কোত্থেকে এল, বলুন তো?" তিনি বললেন।

আর সেই মুহূর্তেই রেডিয়ো-ফোনে ভেসে এল ডঃ কুলশ্রেষ্ঠর কণ্ঠস্বর।

"কী ব্যাপার, ডঃ কুলশ্রেষ্ঠ?" জিজ্ঞেস করল অলোক।

"গাড়িটি নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানেই থাকো। আমার পরবর্তী নির্দেশ ছাড়া জায়গা ছাড়বে না। ও.কে. ওভার।" কর্নেল কুলশ্রেষ্ঠ ফোনের যোগাযোগ কেটে দিলেন।

অজ্ঞাত এক আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে নিজ-নিজ আসনে বসে পড়ল চারজন—ল্যান্ডরোভারের সেই চারজন যাত্রী—অলক, রামবাবু, মাধবন এবং হরিরাম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা পুরু পোশাকে যেন সমাহিত তারা।

বলতে কি, একই অবস্থা ডঃ কুলশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর সঙ্গীদেরও। 'নমুনা পরীক্ষা করেছি, কর্নেল, ডঃ বাসুর অনুমান বোধ হয় মিথ্যে নয়'—রামবাবুর কাছ থেকে এমন একটা খবর পেয়ে তাঁরা সবাই যখন উৎফুল্ল, ঠিক সেই সময়ই এল কিনা ডঃ বাসুরই নির্দেশ—"বন্ধ করুন, মিশন বন্ধ করুন।" তারপর থেকে দুশ্চিন্তা এবং ক্ষোভের পাহাড় মাথায় নিয়ে তাঁরাও বসে রইলেন।

॥ ২ ॥

ভিক্টোরিয়া ল্যান্ডের পশ্চিমে ফুজিয়ামা বেসে পুরু কাঠের তৈরি গবেষণাগারের মধ্যে দুটি মানুষ একটি কম্পিউটারের সামনে বসে যেন মাথার চুল ছিঁড়ছিলেন তখন। ডঃ বাসু এবং ডঃ নিগুচি। আর তাঁদের দুই কাঁধের ফাঁক দিয়ে সাপের চোখে নিরিখ করছিলেন সিনর ভিক্তর পেরেলেস।

জাপানের বিশিষ্ট ভূ-পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ কাসামুরা নিগুচি মানুষটা বড় শান্ত। বয়স ডঃ বাসুরই মতো হবে—বছর পঞ্চান্ন। দু'জনের চরিত্রের সবচেয়ে বড় দিক, প্রচণ্ড সমস্যায় পড়লে তাঁরা মাথাটি ঠাণ্ডা রাখতে পারেন। আর পেরেলেস? মাদ্রিদের এই মানুষটি নিজের ছায়াকেও সন্দেহের চোখে দেখেন। তা বয়স পঞ্চান্ন হলে কী হবে, গোটা পৃথিবীটা চষে বেড়ালেও, সবকিছুর মধ্যেই তিনি সন্দেহজনক একটা কিছু দেখতে পান। "বুঝলেন কিনা, মানুষের চরিত্র হল গিয়ে কুকুরের লেজ। লেজটি যতক্ষণ টেনে রাখবেন, সোজা। ছেড়ে দিলেই গুটিয়ে গেল।" মানুষ সম্পর্কে এই তাঁর বিশ্বাস। এই মন নিয়েই তিনি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষক। তাঁর ধারণা, ঠেকায় পড়লে সবাই সৎ হয়, আর সুযোগ পেলেই বেশির ভাগ মানুষ নেকড়ে।

ভিশন প্লেটের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে ডঃ বাসু এবং ডঃ নিগুচি—প্রায় ঘণ্টা দুই একভাবেই চেয়ে রয়েছেন। প্লেটের ওপর ভেসে উঠছে বরফের ছবি, কখনও ধূসর ভূপৃষ্ঠ, কখনও তুষার ঝড়।

মনে হচ্ছে, সবটাই পণ্ডশ্রম! বিড়বিড় করে কথা বললেন ডঃ নিগুচি। কম্পিউটারের বোতামের ওপর তাঁর আঙুলের ডগা সমানে টিপে চলেছেন। ডঃ বাসু নিশ্চুপ।

আরও মিনিট কুড়ি কাটল—"গড!" বলেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন ডঃ নিগুচি। বললেন, "খেলা শুরু হয়েছে, ডঃ বাসু। তা হলে দেখা যাচ্ছে, আপনার কথাই ঠিক। আমাদের উপগ্রহ 'দ্য স্পাই' নজর দিতে পেরেছে।"

"ধরতে পেরেছেন, তা হলে?"

উত্তেজনায় পেরেলেসের চোখ দুটি চিকচিক করে উঠল।

ডঃ বাসু এবার মাইক্রোপ্রসেসরে কৃত্রিম উপগ্রহটি যেসব ছবি পাঠাচ্ছিল, সেগুলি বিশ্লেষণ করতে লাগলেন।

"উপগ্রহটি একটু উত্তর দিকে দেড় ডিগ্রির মতো সরিয়ে দাও তো?" জাপানের একটি অজ্ঞাত দ্বীপ থেকে উপগ্রহটির পরিক্রমণ-পথ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তোসিবা। এখান থেকে দ্বীপটির দূরত্ব প্রায় দু' হাজার কিলোমিটার। ডঃ নিগুচি বেতারে নির্দেশ দিলেন তোসিবাকে।

মিনিট তিন বিরতি। আর তার পরমুহূর্তেই—"ডঃ বাসু, এতক্ষণ যাকে বরফের আবরণ বলে মনে হচ্ছিল, দেখুন দেখুন—ব্যাপারটা অন্য কিছু বলে মনে হচ্ছে না?" প্রায় চেঁচিয়ে কথা বললেন ডঃ নিগুচি।

ভিশন প্লেটের ওপর বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তর। সেই প্রান্তরের এক জায়গায় এক পোঁচ সাদা জায়গা।

"ওটা বরফ যে নয়, সেটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি, ডঃ নিগুচি।" ডঃ বাসু বললেন।

"তা হলে কি মার্বেল পাথর?" ডঃ নিগুচি জিজ্ঞেস করলেন।

"না। ওই অঞ্চলে মার্বেল পাথর থাকা সম্ভব নয়।" আর তার পরক্ষণেই—"এই তো, বাছাধনকে পেয়ে গেছি আমরা। যেমনটি ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। আকাশে বাজপাখিটাও ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

বাজপাখিই বটে! ডঃ নিগুচি এবং পেরেলেস দেখলেন, দক্ষিণ আকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। ধীরে-ধীরে ভিশন প্লেটের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

"গুড গড।" বিস্ময়ে যেন ফেটে পড়লেন পেরেলেস।

মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা না করে পরক্ষণেই ডঃ কুলশ্রেষ্ঠকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ডঃ বাসু, "স্টপ মিশন। পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করুন।"

॥ ৩ ॥

নির্দেশ নয়। ঘন্টা পনেরো পর একটি হেলিকপ্টার এসে নামল ডঃ কুলশ্রেষ্ঠর ক্যারাভানের একেবারে ধার ঘেঁষে। সবার কাছেই, দীর্ঘ এই পনেরো ঘন্টা যেন পনেরো লক্ষ বছর। জাতিপুঞ্জের হেলিকপ্টারটি পেরেলেসই উড়িয়ে নিয়ে এলেন।

"কী ব্যাপার ডঃ বাসু?" যথেষ্ট উদ্বেগ নিয়েই প্রশ্ন করলেন ডঃ কুলশ্রেষ্ঠ।

"সবুর করুন, আগে আসল কাজ সেরে নিই আমরা।" ডঃ বাসুর এটাও এক বিশেষ চরিত্র। কাজের মাঝে এতটুকু সময় অপচয় করতে চান না। —"আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন।" বলেই আবার হেলিকপ্টারে চেপে বসলেন। তাঁর পেছন-পেছন গিয়ে উঠলেন ডঃ নিগুচি এবং পেরেলেস। অবশেষে ডঃ কুলশ্রেষ্ঠ।

পরমুহূর্তে হেলিকপ্টার মাটি ছেড়ে আকাশে উড়লে, ডঃ মেটা শুধু মন্তব্য করলেন, "আশ্চর্য! একেবারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হেলিকপ্টার! ব্যাপার কী বলুন তো, ডঃ রসকট?"

তাঁর কথায় ঠোঁট উলটে হাত দুটি প্রশস্তভাবে কাঁধবরাবর তুললেন শুধু ডঃ রসকট। ভাবটা—যেন বলতে চান সবই ধাঁধা।

॥ ৪ ॥

এবার আর যান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়। আদ্যিকালের মতো পুরোপুরি নিজের
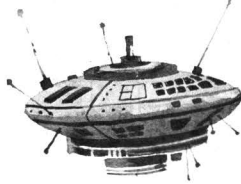
সাহায্যে রেডার ছাড়াই হেলিকপ্টারটি বেশ নিপুণভাবেই ওড়াতে লাগলেন পেরেলেস, একেবারে ঝানু পাইলটের মতো। কোলের ওপর সদ্য পেনসিলে আঁকা ম্যাপটির দিকে চেয়ে নির্দেশ দিতে লাগলেন ডঃ বাসু। ম্যাপটি জাপানি উপগ্রহের সাহায্যেই তৈরি করেছিলেন ডঃ নিশুচি এবং তিনি।

ঘণ্টাতিনেকের উড়ান। আর তারপর মাটিতে নামতেই—"আশ্চর্য! কোথায় গেল সেই সাদা পোঁচ। যাকে বরফের স্তর বলে মনে হয়েছিল?" হতাশায় যেন ভেঙে পড়লেন ডঃ বাসু। ডঃ নিশুচির তো ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা। পেরেলেস? হাতের মুঠোর মাছ ফসকে গেলে যেমন হয়, তাঁর অবস্থাটা যেন সেইরকমই।

শুরু হল অনুসন্ধান।

"আমরা ভুল জায়গায় এসে পড়লাম না তো?" বললেন পেরালেস।

"না মশাই, না।" বলতে-বলতেই মাটি থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে নিলেন ডঃ বাসু—আর তারপর, "এই তো, সবটাই পুড়িয়ে দিয়েছে," বলেই ধুলোসুদ্ধ মুঠোটি মেলে ধরলেন ডঃ নিশুচির সামনে।

"মনে হচ্ছে প্লাস্টিকের ছাই।" চোখ বুলিয়েই উত্তর দিলেন ডঃ নিশুচি।

"একেবারে মোক্ষম ধরেছেন।"

"তা হলে কি...?"

"বুঝতে পারছেন না, পুরো জায়গাটা পুরু প্লাস্টিকের আবরণ দিয়ে ঢাকা ছিল। সেই আবরণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?"

কিন্তু পরক্ষণেই আরও চমক অপেক্ষা করছিল, কেউ ভাবতেই পারেননি। সামান্য অনুসন্ধান করতেই ডঃ বাসুরই চোখে পড়ল—তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটি নল, নলের সঙ্গে একটি ব্রেয়ার। পাশেই ছোট্ট একটি ডিশ-অ্যান্টেনা এবং একটি কম্পিউটার যন্ত্র। নলটির মুখে কালো রঙের চূর্ণ। খুবই সূক্ষ্ম।

সবাই ওগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। "এ কী কাণ্ড!" ডঃ নিশুচি এবার বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন।

"কাণ্ডই বটে! আমার বন্ধুর কাজ।" ডঃ বাসুর সারা মুখে নেমে এল হিমালয়ের গাম্ভীর্য।

সবাই মিলে সেই নলটি এবং আর সব যা ছিল, কুড়িয়ে নিলেন। সেখান থেকে বেতারে অলোককে নির্দেশ দিলেন ডঃ কুলশ্রেষ্ঠ, "তোমরা বেস ক্যাম্পে ফিরে যাও।"

এর পর ডঃ বাসু সদলে ফিরে এলেন বেস ক্যাম্পে।

অনেকটা ধকল গেছে, বলতেই হবে। একটু বিশ্রাম তো নিতেই হয়। ক্যারাভানের ভেতর উষ্ণ পরিবেশে অতঃপর বিশ্রাম এবং উদরপূর্তি।

তারপর আসল রহস্যটি খুলে ধরলেন ডঃ বাসু: "শুনুন মশাইরা, খবরটা আমাকে প্রথমে দিয়েছিলেন ডঃ নিশুচি। তিনিই আমাকে জানান, আন্টার্কটিকার ওই অঞ্চলটি নাকি একেবারেই সারশূন্য। বেলে পাথর ছাড়া আর কিছুই নেই। জায়গাটি নিয়ে কয়েকটি গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকার একটি জার্নালে। পত্রগুলি পড়ার পর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা সেদিকে আর নজর দেননি। কিন্তু কেন জানি না, আমার তখন মনে হয়, ব্যাপারটা প্রচার নয় তো? মানে কারও যাতে ওই অঞ্চলটির দিকে নজর না পড়ে তার জন্যই এই প্রচার?

"তারপর ডঃ নিশুচি এবং আমি জায়গাটা গোপনে ঘুরে আসি। এবং কী বলব, আপনাদের। দেখলাম, আমি যা ভেবেছিলাম, তাই ঠিক। আসলে ওই এলাকাটি একেবারে রত্নভাণ্ডার। হিরে থেকে শুরু করে সোনা, রুপো, নিকেল, প্লাটিনাম, কী নেই সেখানে। আন্টার্কটিকার ওই বিশেষ এলাকায় কী করে এত মূল্যবান সম্পদ জমল, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন ডঃ নিশুচি। আমি তাঁকে বললাম, 'ব্যাপারটা গোপনে রাখুন।' তারপর কর্নেল কুলশ্রেষ্ঠর নেতৃত্বে পাঠালাম অনুসন্ধান-দল।"

"কিন্তু ওই সাদা পোঁচ?"

"আরে। সেইজন্যই তো আপনার সাহায্য নিয়েছি আমরা।" বললেন ডঃ বাসু। "আপনারা দেখুন, আন্টার্কটিকা নিয়ে কেমন লুকোচুরি চলছে। এসব আমার বন্ধু বব অ্যান্ডারসনের কাজ। পুরো জায়গাটা এক ধরনের প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যাতে করে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে ছবি তুললে মনে হবে জায়গাটায় বুঝি এক পোঁচ বরফ পড়ে রয়েছে। সেই প্লাস্টিকের আড়ালে ছিল ওইসব যন্ত্রপাতি। ওই যে নলটা—ওটা হল গিয়ে 'ম্যাগনেটিক গান'। ওটা তৈরি করতে আমিই অ্যান্ডারসনকে সাহায্য করি। উর্ধ্বাকাশে সৌরঝড় নিয়ে গবেষণার জন্যই ওই পরিকল্পনা। কিন্তু ওই যে, কথায় বলে না, উলটা বুঝলি রাম? অ্যান্ডারসনও তাই করেছে। বরং বলি রীতিমত শয়তানি।"

"তার মানে?" কর্নেলের প্রশ্ন।

"তা হলে খুলেই বলি। বছর দশ আগে টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যান্ডারসন এবং আমি বেশ জাঁকিয়ে মেটিরিয়াল সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করেছিলাম, জানেন তো ডঃ নিশুচি?" বললেন ডঃ বাসু।

"খুব জানি। সে-সময় অদ্ভুত এক ধরনের ধাতুসংকর তৈরি করেন আপনারা—"

"ঠিক তাই। অদ্ভুত ধাতুসংকরই বটে। তাই দিয়ে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কণা তৈরি করে অ্যান্ডারসন। চৌম্বক-কণা। জানেন তো, সূর্য থেকে প্রতি মুহূর্তে ছুটে আসে আয়নিত কণা, যার বেশির ভাগ প্রোটন। মহাকাশের কোন অঞ্চলে সেই কণা কখন বেশি দেখা যায় তা জানতে, অ্যান্ডারসন ওই চৌম্বক-কণা ব্যবহার করবে, সেটাই তো তার পরিকল্পনা ছিল।"

"তারপর?"

"তারপর তো দেখতেই পেলেন। যে নলটি সংগ্রহ করেছি, লক্ষ করুন, এর মুখে কালো রঙের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কণা।"

নলটি সবাই পরীক্ষা করলেন।

"অতএব, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সঙ্কেত পাঠিয়ে ইলেকট্রনিক যন্ত্র চালু করে অ্যান্ডারসন। সঙ্গে-সঙ্গে ওই নলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ফুলের রেণুর মতো চৌম্বক-কণা। তারপর বাতাসে ভর করে ছড়িয়ে পড়ে। কণার ঝড় তোলে বরং বলি। চৌম্বক-কণার সেই ঝড়ে তৈরি হয় চৌম্বকক্ষেত্রের ঘূর্ণি। কর্নেল, আপনার পাঠানো রেডার-সঙ্কেত সেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে দিক হারায়। ফলে সেই সঙ্কেত অলোকদের গাড়ি ভুল পথে নিয়ে যায়। সময়মতো এটা আমি জানতে পারি এবং আপনাকে জানাই বলেই, ওরা বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেল।" একনাগাড়ে কথা বলার পর নিশ্চুপ হলেন ডঃ বাসু।

পেরেলেস গম্ভীর। বললেন, "কাজটা খুবই খারাপ। খবর আছে, ওই অঞ্চলে মানুষ আনাগোনা করছে। সেটা যে কেন, আমাদের দফতরে এবার জানাতে পারব।"

"এ-কথাও জানাবেন, তারা কারা।" বললেন ডঃ বাসু।

বলব, "বিষয়টি অনৈতিক।"

ছবি : অনুপ রায়

গাবলু
গাবলু

গাবলু
গাবলু
সাবান
দুম!!

প্যারাসুট নারকোল তেল

PARACHUTE
COCONUT
OIL

LINTAS MIL PCNO DIW 2 2719 BG

ছবির অ্যালবাম
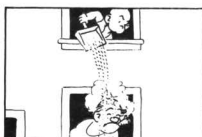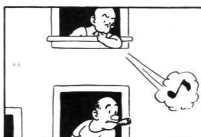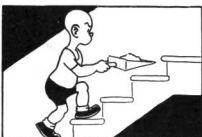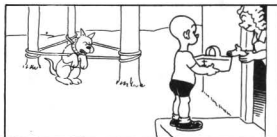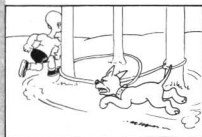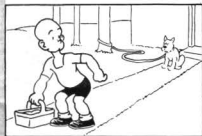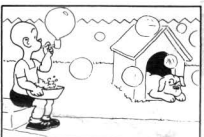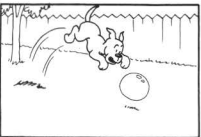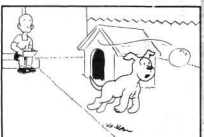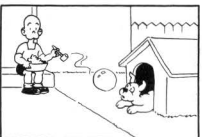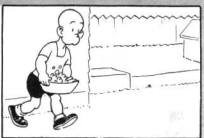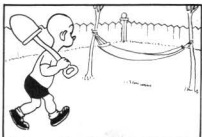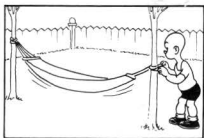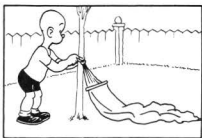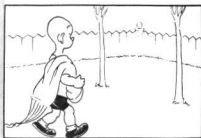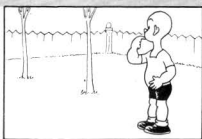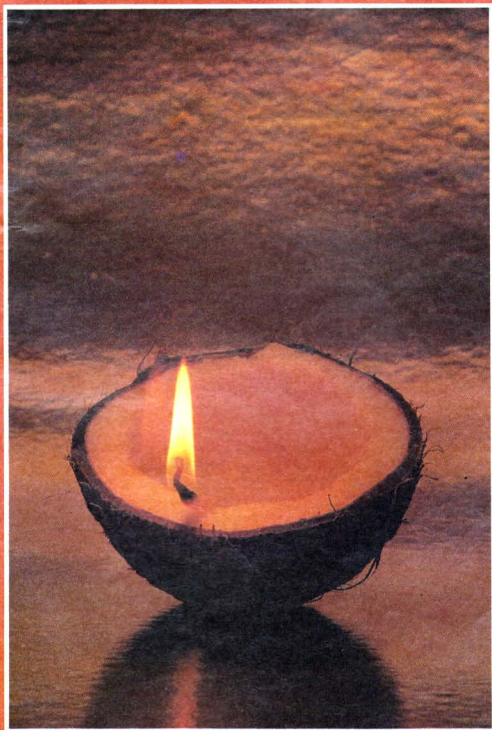
রত্নাকর

ধরো, আঁকন আর বৃষ্টি এবারেই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে একই স্কুলে। পনেরোই অগস্ট ওদের স্কুল ছুটি ছিল। ওইদিন আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল ইংরেজদের হাত থেকে তো, তাই ছুটি। তা বিকেলবেলা বৃষ্টিকে নিয়ে ওর বাবা-মা বেড়াতে এসেছিলেন আঁকনদের বাড়ি। বড়রা গল্প করছিলেন বসার ঘরে। আর আঁকন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কীভাবে বৃষ্টিকে

আপ্যায়ন করবে। একজন শিল্পী, আঁকন আর বৃষ্টির কাণ্ডকারখানা ছবিতে এঁকে দিয়েছেন। কিন্তু মজা করে শিল্পী ছবিগুলো এলোমেলোভাবে সাজিয়েছেন। তোমাদের করতে হবে কি, ছবিগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে ফেলতে হবে। তা হলে, ছবিগুলো থেকে তোমরাও একটা মজার গল্প পেয়ে যাবে।

বিকেলে একবার ফুটবল খেলতে না পেলে তোমাদের অনেকেরই মন নিরানন্দ হয়ে যায়। সেইসঙ্গে যদি মা বলেন, "আজ খেলতে যেতে হবে না, বরং কয়েকটা অনুপাতের অঙ্ক করো।" তা হলে তো মনটা আরও ভারী হয়ে যায় নিরানন্দে। ফুটবল খেলতে বললে ঠিক হয়ে যায় সব।

সে-কথা থাক, এই যে ধাঁধানো ছবিটি দেখছ, একজন বল নিয়ে দৌড়চ্ছে, তার জার্সি নম্বর পাঁচ। তোমাদের অনেকেরই হয়তো পছন্দ ১০ নম্বর জার্সি। কেন বলো তো ? হ্যাঁ, পেলে, মারাদোনা, গুলিট—এঁদের সকলের জার্সি নম্বরই ১০। আমি তো একটি খেলা-পাগল ছোট্ট ছেলেকে জানি, যে তার মাকে
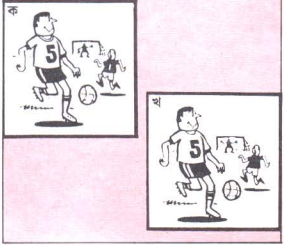
সেলাইয়ের বাক্সটা এনে দিয়ে বলেছিল, "আমার গেঞ্জির পেছনে সেলাই করে-করে একটা ১০ লিখে দাও তো মা।" থাক সে কথা, ওই ছবিটিতে যে দুটি ফুটবল মাঠের ছবি আছে এই ছবি দুটোর মধ্যে মোট ছ'টি অমিল আছে। পারবে খুঁজে বের করতে ? দ্যাখো তো চেষ্টা করে।

আয়নায় আমরা আমাদের যে প্রতিবিম্ব দেখি, সেটি কিন্তু আমাদের উলটো ছবি। একবার পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি ডান হাত তোলো, আয়নায় দেখবে তুমি বাঁ হাত তুলেছ। এখন আমরা এই প্রতিবিম্বের খেলা খেলব। বাঁ দিকের ছবিটির প্রতিবিম্ব আয়নায় পড়েছে, মনে করো ডান দিকের ছবিটি প্রতিবিম্ব। তা হলে নিয়মমতো বাঁ দিকের ছবিটির
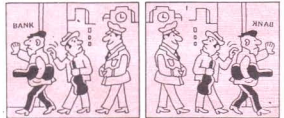
হুবহু উলটো ছবি আয়নায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ডান দিকের ছবিটিতে কোথাও-কোথাও সোজা প্রতিবিম্ব পড়েছে। আসলে শিল্পী ইচ্ছেমতো কয়েকটি ভুল করে আমাদের এই খেলাটি বানিয়ে দিয়েছেন। ডান দিকের ছবিটিতে মোট পাঁচটি এরকম ভুল আছে। খুঁজে বের করো তো কী-কী পাঁচটি ভুল ?

(সমাধান ৫১৬ পাতায়)

ছবির অ্যালবাম

রত্নাকর

চিড়িয়াখানায় যেতে তোমাদের নিশ্চয়ই দারুণ লাগে। বিশেষ করে তোমাদের ছোট ভাইবোনদের তো ভীষণ মজা হয় চিড়িয়াখানায় যেতে পারলে। এই যে ছবির খেলাটা দিচ্ছি, এটা কিন্তু তোমাদের জন্য নয়। তোমাদের ছোট ভাইবোনদের জন্য। তবে প্রথমে তোমরা সমাধানটা খুঁজে বের করবে, তারপর ভাইবোনদের সমাধান করতে বলবে। কেননা, তোমাদের ভাইবোনরাও কিন্তু তোমাদের মতোই বুদ্ধিমান।

এই যে ছবিটি দেখছ, এই ছবিটিতে রয়েছে মোট ২১টি জীবজন্তু। প্রথমে ভাল করে দেখে নাও। সব জীবজন্তুও তো তোমাদের চেনা। এবার নীচের ছবিটি দ্যাখো।

এই ছবিটিতে ১ নং ছবির তিনটি জীবজন্তু উধাও। কোন তিনটি উধাও হয়েছে খুঁজে বের করতে হবে। দ্যাখো তো চেষ্টা করে।

কতরকম বুদ্ধির খেলা, ছবির খেলার পরে সবশেষে দিলাম, একটি শুধুই খেলা। এতে বুদ্ধির কোনও মারপ্যাঁচ নেই, শুধুই আনন্দ। বিজয়ার দিন, তোমাদের বাড়িতে তো বাবা-মায়ের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুরা আসবে। এ ছাড়া, তোমাদের জেঠু-কাকু, পিসিমণি-মাসিমণি, মামার ছেলেমেয়েরাও আসবে তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে। বড়রা সবাই যখন বিজয়ার কোলাকুলি বা শুভেচ্ছা বিনিময়ে ব্যস্ত থাকবেন, তোমরা ছোটরা সব্বাই একটা ঘরে জড়ো হয়ে খেলতে পারো এই খেলাটা। একসঙ্গে সবাই মিলে দারুণ মজাও পাবে। তার আগে খেলাটা তৈরি করে রাখো।

ছবিতে যে ক'টি টুকরো ছবি রয়েছে সেগুলি একইরকমভাবে ১২টি করে এঁকে নাও সাদা কাগজে। এবার তোমার আঁকা ছবিগুলো পাতলা বোর্ডে আঠা দিয়ে লাগিয়ে সুন্দরভাবে কেটে নাও। এবার সমস্ত টুকরো একটা ব্যাগে ভরে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নাও। ব্যস, খেলাটা তৈরি। হ্যাঁ, তার আগে খেলার নিয়মটা বলে দিই। মোট আটটি ছবির টুকরো, প্রত্যেকটি ১২টি করে এঁকে নিয়েছ। টেবিলের মাঝখানে ছবি-ভর্তি ব্যাগটা রাখতে হবে। প্রতিযোগীরা বসবে চেয়ারে, চারপাশে। এবার প্রত্যেক প্রতিযোগীর যখন পালা আসবে, তখন সে ব্যাগের ভেতর থেকে একটা করে টুকরো তুলে তার সামনে টেবিলে সোজা করে সাজিয়ে রাখবে। তারপর অপেক্ষা করবে পরবর্তী পালা পর্যন্ত। পরের পালা এলে সে ব্যাগ থেকে আবার একটি টুকরো তুলে
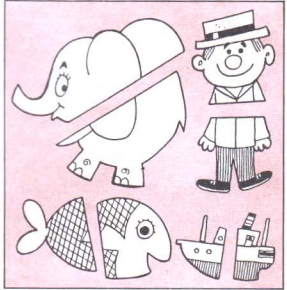
টেবিলে তার সামনে সাজিয়ে রাখা টুকরোটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে। যদি টুকরোটি মিলে যায়, তা হলে তার একটি ছবি তৈরি হয়ে গেল। অপেক্ষা করবে পরবর্তী পালার জন্য। আর যদি টুকরোটি আগের টুকরোটির সঙ্গে না মেলে তা হলে পরের তোলা টুকরোটি আবার ব্যাগে ভরে দেবে। অপেক্ষা করবে পরবর্তী পালার জন্য। এইভাবে পালাক্রমে যে প্রতিযোগী তিনটি ছবি সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারবে—সেই জিতবে। শুধু মনে রাখতে হবে, যদি প্রতিযোগীর সংখ্যা খুব বেশি হয়, তা হলে এই আটটি টুকরো ছবি ১২টি নয়, আরও বেশিসংখ্যক এঁকে নিতে হবে। ব্যস, বিজয়ার দিনের খেলাটি তৈরি। এই খেলাটি দিয়ে আনন্দে ভরে উঠুক তোমাদের বিজয়ার দিনটি।

(সমাধান ৫১৬ পাতায়)

সম্পূর্ণ উপন্যাস
চাঁদের রঙ
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

মা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে আদ্যিকালের পুরনো আমাদের অস্টিন গাড়িটা এতক্ষণ বেশ ভালই আসছিল। কিন্তু গাড়িটা যেন আর সামনে এগোতে চাইছে না। স্পিডটাই শুধু কমে গেল না, বনেটের ভেতর থেকে চাপ-চাপ ধোঁয়াও বেরিয়ে আসতে লাগল। ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা এক-একবার থেমে যায়, তারপর নিজের খেয়ালে এগোতে থাকে। মানুষের মতো গাড়িরও যদি মন থাকে, তা হলে বুঝতে হবে সে আর এগোতে চাইছে না।

আমরা গিয়েছিলাম মাইল-ষাটেক দূরে আমাদের গ্রামের বাড়িতে। কয়েক একর জমি কিনে ওখানে খামারবাড়ি তৈরি করেছিলেন আমার বাবা। শহরে থাকতে-থাকতে মাঝেমধ্যে তিনি হাঁফিয়ে উঠতেন। শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে তখনই তিনি ওই খামারবাড়ি তৈরির কথা ভেবেছিলেন। ওখানে গিয়ে কয়েকটা দিন ভারী সুন্দর কাটিয়ে আসা যায়। আধুনিক শহরজীবনের সব সুযোগ-সুবিধাই আছে ওখানে, অথচ পরিবেশটাও বেশ গ্রামীণ। কেয়ারটেকার রামবিলাসের তো তুলনাই হয় না। নিজের হাতে সে যেভাবে আমাদের যত্নআত্তি করে তা ভাবা যায় না।

তবে ইদানীং খামারবাড়িতে গিয়ে আমরা আর থাকতে পারি না। প্রতি রবিবার অবশ্য যাই। সেদিন দুপুরের আগে বেরিয়ে পড়ি, ফিরতে-ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। আজও গিয়েছিলাম। কিন্তু

ফেরার পথেই গাড়িটা গণ্ডগোল শুরু করল। আর এমন একটা জায়গায়, যেখানে জনমানুষের কোনও চিহ্নও নেই।

সত্যিই জায়গাটা অদ্ভুত। এমন পাহাড়ও সচরাচর দেখা যায় কি না সন্দেহ। চারপাশে গাছপালা তেমন নেই। শুধু পাথর আর পাথর। নানা আকারের পাথর একটার পর একটা খাড়া হয়ে আকাশে উঠে গিয়েছে। আকাশ অবশ্য ছুঁতে পারেনি, কিন্তু পাহাড়ের মাথাটা বেশ উঁচু। পশ্চিমে যখন সূর্য পাটে বসে, তখন এইসব পাথরের ছায়ায় চারপাশটা কেমন যেন অন্ধকার হয়ে যায়। একটাও পাখি ডাকে না। ডাকবে কোথা থেকে? গাছ তো নেই যে, ডালে এসে উড়ে বসবে, সময়ে, অসময়ে ডাকতে থাকবে! চারপাশ থমথমে, নিস্তব্ধ।

আগেও আমরা অনেকবার এই পথ দিয়ে গিয়েছি। আমাদের এই অস্টিন গাড়িতেই। কিন্তু আজ অন্ধকার একটু বেশি বলেই মনে হচ্ছে। আকাশও মেঘলা। মেঘের অন্ধকার, না সন্ধের অন্ধকার, ঠিক বুঝতে পারছি না। গাড়িটা এবার বিকট শব্দ করে থেমে গেল।

মা শুধু গাড়িই ভাল চালান না, গাড়ির কলকব্জারও খুঁটিনাটি খবর রাখেন। গাড়িটা কিনেছিলেন বাবা। কোলিয়ারির এক সাহেব-ম্যানেজারের কাছ থেকে। তখনও আমার জন্ম হয়নি। দিদির বয়স সবে এক। শুনেছি, সাহেব-ম্যানেজার দেশে ফিরে যাওয়ার সময় গাড়িটা বাবাকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কোলিয়ারির পুরো দায়িত্ব বাবাকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ওই প্রস্তাবটা করেছিলেন। বাবা রাজি হননি। বলেছিলেন, "সেটা ভাল দেখায় না। আপনি বরং গাড়িটা আমায় বিক্রি করুন।" বাবা যখন কোনওমতেই রাজি হলেন না, তখন সেই সাহেব-ম্যানেজার নামমাত্র মূল্যে গাড়িটা বাবাকে দিয়ে দিলেন।

সেই থেকে গাড়িটা আমাদের কাছেই আছে। ঝকঝকে অস্টিন গাড়ি। সাহেব ভদ্রলোক খুব যত্ন করতেন। গাড়ির গায়ে একটি আঁচড়ও পড়তে দেননি। বাবাও খুব যত্ন করতেন। নিজেই করতেন ধোয়া-মোছা। অফিস থেকে ফিরে গ্যারাজে গাড়ি রাখার আগেও দরকার হলে গাড়ির নীচে সটান শুয়ে পড়ে ছোটখাটো মেরামতির কাজ নিজের হাতেই সেরে নিতেন, যাতে পরের দিন রাস্তায় বেরিয়ে গাড়িটা নিয়ে কোনও অসুবিধা না হয়। বাবা আজ নেই। বছর কয়েক আগে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মা কিন্তু বাবার প্রতিটি জিনিসপত্রই সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দিয়েছেন। গাড়িটারও কোনও অযত্ন হতে দেননি। সবই সেই আগের মতো আছে। শুধু বাবাকেই আমরা হারিয়েছি।

মেঘের ছায়ায়, অন্ধকারে এই মুহূর্তে বাবার কথাই আমার বেশি করে মনে পড়ল। বাবাকে যে আমি খুব বেশিদিন কাছে পেয়েছিলাম, তাও নয়। সবে ক্লাস টু-তে উঠেছি। স্কুলের বাসে আমি যাওয়া-আসা করতাম। মনে পড়ে, সেদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ছিল গোমড়া। স্কুলে বেরনোর সময় ঝিপঝিপ করে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। ছাতা নিয়ে মা আমাকে বাসে তুলে দিয়ে এলেন। কোলিয়ারির কী একটা জরুরি কাজে বাবা সেদিন খুব ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন। আমার শুধু এটুকুই মনে আছে। আর মনে আছে, বাড়ি ফিরে আমি দেখলাম, একটা অ্যাম্বুলেন্স আমাদের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বাড়িটা ছিল বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে। সেটা আসলে বাংলো। বাস থেকে নেমে বাড়ির দরজায় পৌঁছনোর আগেই অ্যাম্বুলেন্সটা হুস করে বেরিয়ে গেল। চারপাশ তখন রীতিমত অন্ধকার। মেঘের ছায়া, না সন্ধের ছায়া সেদিনও বুঝতে পারিনি। আমি দেখলাম, অ্যাম্বুলেন্সের লাল আলো জ্বলজ্বল করতে-করতে এক সময় চোখের আড়ালে চলে গেল। বাবা সেই যে চলে গেলেন, আর ফিরে এলেন না। পরে শুনেছিলাম, অফিসেই বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ধরাধরি করে তাঁকে যখন বাড়িতে আনা হয়, তখনই প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে। কোনওরকমে প্রাণটা ধুকধুক করছিল। সুস্থ, ছটফটে একজন মানুষ এভাবে যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, তা আমরা কেউ কখনও কল্পনাও করিনি। কিন্তু এটাই জীবন। কে কী ভাবল, না ভাবল তাতে তার কিছু যায়-আসে না। সে চলে নিজের খেয়ালখুশিতে।

কিন্তু আজ এই অদ্ভুত পাহাড়ের ধারে বিকল অস্টিন গাড়িটার মধ্যে বসে থাকতে-থাকতে বাবার কথাই শুধু মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, বাবা আজ এখানে থাকলে এক মুহূর্তে তিনি আবার গাড়িটাকে চালু করে দিতে পারতেন। মুখ ফুটে কথাটা একবার বলেও ফেলছিলাম। সেই মুহূর্তে দিদি আমার হাতে আলতো একটা চিমটি কেটে বলল, "কী রে, অত ভাবছিস কেন! দ্যাখ না, মা এক্ষুনি গাড়িটাকে স্টার্ট করে দেবেন।"

মা সেই চেষ্টাই করছিলেন। একবার ড্যাশবোর্ডের চাবি ঘোরালেন, একবার গিয়ার দিলেন, খুটখাট এরকম আরও কী সব তিনি করছিলেন। কিন্তু আমাদের কমলালেবু রঙের অস্টিন গাড়িটা সেই যে গোঁ ধরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে, তার আর নড়নচড়ন নেই। মা এবার গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে বনেট খুললেন। কলকব্জা, ব্যাটারি সব পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

"না, সবই তো দেখছি ঠিকঠাক আছে।"

"তা হলে?" দিদিও এক সময় মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাটা দিদিই বলল। মায়ের চেয়েও তার চিন্তা বেশি। "তেল ফুরিয়ে যায়নি তো মা?"

"কী যে বলিস! জানিস তো ট্যাঙ্ক ভর্তি করে পেট্রোল না নিয়ে আমি বাইরে কোথাও বেরোই না। তুই বরং ভেতরে গিয়ে বোস। মান্তু একা আছে।"

দিদি কিন্তু মায়ের কথাটা একেবারে আমল দিল না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। একসময় গাড়ির এঞ্জিনের সামনে ঝুঁকে কী একটা নাড়তেই মায়ের ধমক খেল এক চোট। "যা, বিরক্ত করিস না। গাড়িতে গিয়ে বোস। আমি দেখছি।"

দেখার অবশ্য কিছুই নেই। যেটুকু-বা আবছা আলো ছিল, সেটাও মুছে গিয়েছে আস্তে-আস্তে। ড্যাশবোর্ডের ড্রয়ার খুলে টর্চটা নিয়ে আমি মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মা ওরই মধ্যে খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন। আমার গাল টিপে আদর করে বললেন, "লক্ষ্মী ছেলে।"

এক-একসময় মনে হয়, দিদির চেয়েও মা আমাকে বেশি ভালবাসেন। কথাটা স্বার্থপরের মতো ভাবতে আমার ভালই লাগে। তার মানে এই নয় যে, মা দিদিকে ভালবাসেন না। বা, আমি দিদিকে কম ভালবাসি। কিন্তু মা যখন আলাদাভাবে আমাকে আদর করেন, তখন তার আনন্দটাই আলাদা। সেই আনন্দটা আমার একার। তার মূল্য সব কিছুর চেয়ে বেশি। অনেক বেশি।

তবে পাহাড়ি নির্জন পথে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবাও যায় না। মুখ ফুটে কিছু না বললেও আমি যে মনে-মনে বেশ ভয় পাচ্ছিলাম, সে-কথা নিশ্চয় আর বলার দরকার নেই। ভয় পাওয়ার আরও একটা কারণ আছে। মহারাজ আজ আমার সঙ্গে আসেনি।

আমরা বাইরে যেখানেই যাই মহারাজ আমাদের সঙ্গে থাকে। মা আজ মহারাজকে বাড়িতে রেখে এলেন। প্রথম থেকেই আমার মনটা অস্থির হয়ে ছিল। মাকে কথাটা এতক্ষণ বলার সাহস পাচ্ছিলাম না, কিন্তু এবার বলে ফেললাম।

"মহারাজকে সঙ্গে আনলে এই অবস্থা হত না। ও খুব পয়া।"

"এই বয়সেই এত কুসংস্কার কেন? এ তো ভাল কথা নয়।" মা বললেন।

"গাড়িটা বিগড়ে যেত না, আমরাও এতক্ষণ বাড়ি পৌঁছে যেতাম।"

"কী আজেবাজে কথা বলিস! মহারাজ সঙ্গে থাকলে কী এমন হত শুনি।" মায়ের সঙ্গে দিদিও গলা মেলাল।

"বাবা বাইরে গেলেই মহারাজকে সঙ্গে নিতেন। মনে নেই?" আমি বললাম।

"মনে থাকবে না কেন? তা বলে, মহারাজ থাকলে গাড়ি ঠিকঠাক চলত, এটা মনে করার কোনও কারণ নেই।" দিদি বলল।

"আরে, এটা যান্ত্রিক গোলযোগ। যন্ত্র যে-কোনও সময় বিগড়ে যেতে পারে। একেবারে সাময়িক ব্যাপার। মেরামত করে নিলেই আবার সব ঠিক হয়ে যায়। তার জন্য একটু সময় লাগে, এই যা—" মা আমাকে আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু মনের মধ্যে ওই যে একটা কাঁটা বিঁধে থাকল, তা আর কিছুতেই দূর হয় না। বারবার মনে হচ্ছিল, মহারাজ একা বাড়িতে কী করছে এখন? কেন আমাদের দেরি হচ্ছে, সে কি তা বুঝতে পারছে? আমার তো মনে হয়, সে সব বুঝতে পারে। প্রকাশ করার ভাষাটাই শুধু ওর জানা নেই। না হলে হয়তো সব কথা আগাম বলে দিতে পারত।

কলকব্জা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর মা এবার গাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। গাড়িটায় স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করলেন। স্টার্ট নেওয়ার মতো দু-একবার শব্দও হল। কিন্তু তারপরই আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

এবার মা নিজেও মনে হয় খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। ঘাবড়ে গেলেও ভেঙে পড়লেন না। বাবার মৃত্যুর পর শক্ত হাতে যেভাবে সংসারের হাল ধরেছেন সেভাবেই স্টিয়ারিংটা আঁকড়ে ধরে থাকলেন অনেকক্ষণ। কী যেন ভাবছেন মা। গাড়িটা কেন এভাবে বিগড়ে গেল, সেই রহস্যই তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। গাড়িটার বয়স হলেও তার যত্নআত্তি তো কম হয় না। তা হলে? মা সেটাই ভেবে বের করতে চাইছেন। আমি আর দিদি ইতিমধ্যে গাড়ির পেছনের সিটে এসে বসেছি।

"দ্যাখ সোনালি, ব্যাটারি ডাউন হওয়ার কথা নয়। তাও যদি গাড়িটা ঠেলে-ঠুলে স্টার্ট করা যায়—" মা দিদিকে বললেন।

"সামনের রাস্তাটা তো ঢালু হয়ে নেমে গেছে। পেছন থেকে একটু ঠেললেই গাড়িটা গড়িয়ে যাবে। তখন মনে হয় স্টার্ট নেওয়ার আর অসুবিধা হবে না।" দিদি বলল।

"তারপরই তো রাস্তাটা উঁচু হয়ে ওপরে উঠে গেছে। তখন কে ঠেলবে?" কথাটা আমি বলতে চাইনি। মুখ ফুটে বেরিয়ে গেল।

"তুই এত ভয় পাস কেন মাস্তু?" মা পেছন ফিরে আমাকে মৃদু তিরস্কার করলেন। "সবসময় মনে জোর রাখবি। তা হলে দেখবি পরিস্থিতি অনেক সহজ হয়ে গেছে।"

এই আমার একটা বড় অসুবিধে। সবসময় কেমন যেন ভয় ভয় করে। পাহাড়ি নির্জন পথের অন্ধকারকে যেমন ভয় পাই, তেমনই আবার ভয় পাই অঙ্ক-স্যার, সংস্কৃত-স্যার কিংবা হেড-স্যারকে। অঙ্কে আমি সাতনব্বই পেয়েও দেখেছি অঙ্ক-স্যারকে ভয় পাচ্ছি। ওই তিন নম্বরের জন্য যদি তিনি আমাকে বকেন! শব্দরূপ, ধাতুরূপ বিলক্ষণ মুখস্থ করেও ভয় কাটে না। যদি কোথাও ভুল করে বসি। ভুল না করেও ভুলের ভয় আমাকে পেয়ে বসে। বাবা বলতেন, "মাস্তু, যা কিছুই করিস না কেন, আত্মবিশ্বাস কখনও হারাবি না। জীবনে কখনও ভয় পাবি না। মনের শক্তিটাই আসল।"

আমি কিন্তু সেই ভিতুটাই রয়ে গেলাম। মহারাজ সঙ্গে আসেনি, সেটাও আমার ভয়ের কারণ। মহারাজ সঙ্গে থাকলে কি আমি ভয় পেতাম না? তা তো নয়। তবে হয়তো কিছুটা অন্তত সাহস আমার হত। সন্ধেবেলা এই বিপদেই হয়তো পড়তাম না।

এ যে কত বড় বিপদ, তা আমরা তখনও পুরোপুরি টের পাইনি। গাড়িটা ঠেলার জন্য দরজা খুলে মা নামতে যাবেন, তখনই ঘটনাটা ঘটল। আমি ও দিদি তখনও গাড়ির ভেতরে। এমন সময় বিরাট একটা পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে প্রচণ্ড শব্দে রাস্তার মাঝখানে এসে পড়ল। আমরা যদি গাড়িটা একটু ঠেলে দিতাম, তা হলে পাথরটা গাড়ির ওপরেই পড়ত। আমাদের যে কী অবস্থা হত, ভাবতেই গা শিউরে উঠল।

এদিকে আর-এক বিপদ। গাড়ি যদি-বা স্টার্ট নেয়, তা হলেও আমরা পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারব না। পাথরটা রাস্তা জুড়ে আছে। তার বাঁ দিকে খাড়া পাহাড়, আর ডান দিকে সরু একটা রাস্তা। গাড়ি যাওয়ার প্রশ্নই নেই। যাওয়ার চেষ্টা করলেও কয়েকশো ফুট নীচে গিয়ে পড়তে হবে। মা যেভাবে স্টিয়ারিং ধরে বসে রইলেন তা দেখে বোঝা গেল তিনিও ভয় পেয়েছেন। দিদির মুখেও কথা নেই। আর আমার কথা নাই-বা বললাম। অন্যদের ভয় পেতে দেখলে ভিতু লোকের অবস্থা যে কী হয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অনেক পরে আমাদের সংবিৎ ফিরে এল। তখন আমাদের তিনজনের মনেই একটা প্রশ্ন: এখন আমরা কী করব। গাড়িটা

ঠেলার কথা ভাবতেই মনে-মনে আমি রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছিলাম। গাড়িটার তো ওজন কম নয়। পাথরটাও নিশ্চয় কয়েকশো টন ভারী। ঠেলাঠেলি করে ওটাকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তা হলে উপায়?

উপায় আর কী! গাড়িটাকে এখানে ফেলে রেখে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু তা কি সম্ভব? বাড়ি তো এখনও অনেক দূর। মনে জোর থাকলে উপায় নিশ্চয় কিছু একটা বের হবে। কিন্তু একটা কথা ভেবে আমরা তিনজনেই খুব খুশি হলাম। আর-একটু হলেই পাথরটা আমাদের গাড়ির ওপর পড়ে সেটাকে চিড়েচ্যাপটা করে দিত, না হয় আমরা তিনজনই পাথর চাপা পড়ে মারা যেতাম। তা যখন হয়নি, নিশ্চয় একটা আশা আছে।

অন্ধকার এখন আরও ঘন হয়ে উঠেছে। আমাদের সম্বল বলতে দু' ব্যাটারির একটা টর্চ। আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে সেটা জ্বালাতে লাগলাম। মা আবার ধমকে উঠলেন, "এভাবে ব্যাটারি

শারদবেলার
মিলনমেলায়
আনন্দময় এ দিনগুলিতে কামনা করি আপনার ও পরিবারের সকল সদস্যের আর্থিক নিরাপত্তা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত। আমাদের সঞ্চয় প্রকল্পগুলি সারাবছরই আপনাদের সেবায় নিযুক্ত।
ইউনিট স্কিম ৬৪ আয়ের বৃদ্ধির সাথে যে কোন সময় শতকরা ১০০ ভাগ ভাঙিয়ে নেওয়ার সুবিধা। এছাড়া বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক ঋণেরও সুযোগ। আর অবশ্যই আছে ইউ টি আই-এর বিশেষ নিরাপত্তা। গত বছরের ডিভিডেন্ড ১৯·৫%
ইউনিট লিঙ্কড্ ইনস্যুরেন্স প্ল্যান (ইউলিপ) জীবন বীমা ও বিনামূল্যে দুর্ঘটনা বীমা। উচ্চহারে প্রতিদান। ৮৮ ধারা অনুযায়ী কর ছাড়।
চিলড্রেন্স গিফ্ট গ্রোথ ফান্ড (সি জি জি এফ)
আপনার শিশু ২১ বছরে পৌঁছানো পর্যন্ত বিনিয়োগের ১২ গুণেরও বেশী বৃদ্ধি। শিশুর জন্মের বছর থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি বছর ১০০০ টাকা বিনিয়োগ করলে আপনার শিশুকে আপনি 'লাখপতি'ও করে দিতে পারেন। সাথে গিফ্ট ট্যাক্সেরও ছাড়।
মান্থলি ইনকাম ইউনিট স্কিম (এম আই এস জি)
সঞ্চয় বাড়ার সাথে সাথে মাসে মাসে আয়। বছরে ১৩% হারে প্রতিমাসে নিশ্চিত ডিভিডেণ্ড, যা অগ্রিম প্রদেয়, সঙ্গে দুটি বোনাস ডিভিডেন্ড এবং মেয়াদান্তে মূলধনের বৃদ্ধি অথবা বিনিয়োগের আড়াইগুণের অধিক বৃদ্ধি।
ক্যাপিটাল গেইনস্ ইউনিট স্কিম (সি জি এস '৮৩)
আয়কর আইনের ৫৪ই ধারা অনুযায়ী ক্যাপিটাল গেইন-এর উপর ১০০% ছাড়। উচ্চহারে ডিভিডেন্ড ও মূলধনের বৃদ্ধি।
এছাড়া মাস্টার ইকুইটি প্ল্যান, মাস্টার গেইন ও মনি প্ল্যান, ডেফার্ড ইনকাম ইউনিট স্কিম, চ্যারিটেবল এণ্ড রিলিজিয়াস ট্রাস্ট স্কিমের মত আরো নানান আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প। সবকটি প্রকল্পেই আয়করের ৮০ এল ধারা অনুযায়ী ১৩,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং সম্পদ করের ৫ ধারা অনুযায়ী ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত কর ছাড়ের সুবিধা। আবাসী ভারতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে উৎস থেকে কর কাটা হয় না।
বিশদ বিবরণের জন্য ইউনিট ট্রাস্ট অফিস, ইউ টি আই এজেন্ট বা মুখ্য প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
UNIT TRUST OF INDIA
ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া
এক কোটি ইউনিট হোল্ডারগণের সেবায়
কর্পোরেট কার্যালয়: ১৩, স্যার ভিঠলদাস থ্যাকারসে মার্গ, (নিউ মেরিন লাইন্স) বোম্বাই ৪০০ ০২০, ফোন - ২৮ ৬৩৭৬৭ জোনাল কার্যালয়: ২ ও ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন - ২০ ৯৩৯১, ২০ ৫৩২২। শাখা কার্যালয়: আশা নিবাস, ২৪৬ লুইস রোড ভুবনেশ্বর ৭৫১ ০১৪, ফোন ৫৬১৪১ ● ৩য় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ২য় তল, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩ ২১৬ ● জীবনদীপ, এম এল নেহরু রোড, পান বাজার, গৌহাটি ৭৮১০০১, ফোন ২৩১৩১ ● জীবনদীপ, একজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১, ফোন ২২২৪৭০
Sista s/UTI/069/91 BEN

নষ্ট করতে নেই, মান্তু।"

আমরা তিনজনই এখন গাড়ির ভেতরে। বসে থাকলেও বেশ ছটফট করছি তিনজনেই। এমন সময় সরু একটা আলোর রেখা আমারই প্রথম চোখে পড়ল। পাহাড়ের নীচ থেকে রাস্তাটা পাক দিয়ে ওপরে উঠে এসেছে। আমরা আছি পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। গাড়ির জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আলোর সেই সরু রেখাটা দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু একবার দেখা দিয়েই তা হারিয়ে গেছে। অন্ধকার ছাড়া দেখার কিছু নেই।

মা ও দিদিকে কথাটা বললাম, "আমি একটা আলো দেখেছি।"

"মনের ভুল।"

"না। মনে হল, আলোটা এদিকেই আসছে।"

দিদি তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজাগুলো ভেতর থেকে লক করে দিল। আর ঠিক সেই সময় সার্চলাইটের মতো একটা আলো আমাদের সামনে এসে পড়ল। আমরা দেখলাম, হেডলাইট ছাড়াও আরও দুটো আলো জ্বালিয়ে একটা জিপ পাথরের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। পাথরের পাশ কাটিয়ে সেই মুহূর্তে যিনি আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, তিনি আমার নাম ধরে ডাকছেন, "মান্তু! মান্তু!"

সামনে তাকিয়েএক ঝলক দেখে মনে হল, তাঁর বয়স বেশি নয়। বড়জোর চল্লিশ, বিয়াল্লিশ। স্নিকার, নীল জিনসের ট্রাউজার্স ও লাল রঙের টি-শার্টে তাঁকে সিনেমার নায়কের মতো দেখাচ্ছে। স্বপ্নময়, মায়াবী দুটি চোখ। হাওয়ায় উড়ছে চুল। আলোর ফোকাস যেন তাঁর ওপরেই পড়েছে। জিপটা থামিয়ে তিনি ধীর-স্থিরভাবে নেমে এসে পাথর, পাহাড় ও আমাদের মতো তিনজন অসহায় মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাঁটাচলায় কোনও ব্যস্ততা নেই, আচার-আচরণে নেই কোনও উত্তেজনা। ট্রাউজার্সের পকেটে দুটি হাত রেখে তিনি আমাকেই ডাকছেন, "মা ও দিদিকে নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসো মান্তু। ভয় নেই।"

সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। মাথার ওপর গ্রহ, তারা, নক্ষত্র তার সাক্ষী। সাক্ষী এই প্রাগৈতিহাসিক পাহাড় ও নিস্তব্ধ প্রকৃতি। আমরা গাড়ি থেকে নীচে নেমে দাঁড়ালাম। এর পর যা ঘটল তা দেখে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমরা দেখলাম, অজানা সেই ভদ্রলোক ভারী পাথরটাকে ঠেলতে শুরু করেছেন। পাথরটাকে ঠেলতে-ঠেলতে তিনি রাস্তার একপাশে সরিয়ে দেবেন, এ কী সম্ভব? কিন্তু সেই অসম্ভবটাই ঘটতে দেখলাম চোখের সামনে। পাথরটা নড়ছে। একটু-একটু নড়ছে। তিনি দু' হাতে সেটাকে ঠেলছেন। তাঁর গায়ে যে কী প্রচণ্ড শক্তি তা দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য এই ঘটনা দেখার জন্য সময়ও যেন এখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক জানি না, কতক্ষণ এভাবে কাটল। কিন্তু একসময় দেখলাম, বিরাট পাথরটা রাস্তার পাশে সরে গিয়ে আমাদের যাওয়ার রাস্তা করে দিয়েছে। লাল টি-শার্ট পরা ভদ্রলোক এর পর পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন, "চলো তো দেখি, তোমাদের গাড়ির কী গণ্ডগোল হয়েছে।"

মা ওঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি বনেট খুলে গাড়ির এঞ্জিনের সামনে ঝুঁকে পড়ে খুটখাট এটা-ওটা নাড়াচাড়া শুরু করে দিয়েছেন।

"কেন যে গাড়িটা থেমে গেল বুঝতে পারছি না। এঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। কী বিপদ বলুন তো?" মা বললেন।

"গাড়িটা থেমে গিয়ে তার চেয়েও বড় একটা বিপদের হাত থেকে আপনাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওসব ধোঁয়া-টোঁয়া কিছু নয়। আসুন, দেখুন।"

গাড়ির কলকব্জা এটা-ওটা দেখিয়ে এর পর উনি যা বললেন, তা শুনে আমরা চমকে গেলাম। গাড়ির টাই-রড কেটে গেছে। গাড়িটা নিজে থেকেই থেমে না গেলে স্টিয়ারিংয়ের ওপর আর কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হত না। পাহাড়ি পথ থেকে গড়িয়ে আমরা একেবারে নীচে গিয়ে পড়তাম কয়েকশো ফুট নীচে। প্রাণে বাঁচতাম কি না সন্দেহ।

"এখন কী করবেন?" মাকে উনি জিজ্ঞেস করলেন।

"গাড়ি তো এখন সারানো যাবে না।" মা উত্তর দিলেন।

"যেতে পারে। তবে সময় লাগবে। তার চেয়ে আপনারা বরং আমার জিপে চলে আসুন। গাড়ির দরজা লক করে রাস্তার একপাশে রেখে দিই। কাল সকালে মেকানিক পাঠিয়ে দেব। গাড়িটা সারিয়ে সে ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে। সকালেই গাড়িটা পেয়ে যাবেন।"

সারা রাস্তা আমরা কেউ কোনও কথা বলিনি। জিপের সামনের সিটে বসেছি আমি। মা ও দিদি পেছনে। পাহাড়ি পথ পেছনে রেখে আমরা এবার সমতলে নামলাম। ভদ্রলোকের সবকিছুই আমার ভাল লাগছে। এমন সুন্দর জিপ চালাচ্ছেন, এতটুকুও ঝাঁকুনি লাগছে না। জিপটা চালাচ্ছেনও বেশ জোরে। সত্তর-আশি স্পিড উঠছে। এভাবে চললে বাড়ি পৌঁছতেও আমাদের বেশি সময় লাগবে না।

দু'পাশে ধানমাঠ, আর দূরে গাছগাছালির আড়ালে কয়েকটা গ্রাম। রাত বেশি হয়নি। গ্রামের মানুষরা বোধ হয় এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। এমনকী, ঝিঁঝিও ডাকছে না। মাথার ওপর স্তব্ধ আকাশ ও নক্ষত্রলোক। পাথরের মতো জমাট অন্ধকারটা গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দু' টুকরো হয়ে দু'পাশে ছিটকে যাচ্ছে। বাঁকের সময়ও জিপের স্পিড কমছে না। পঁচাত্তর-আশি।

এবার স্পিড আরও বাড়ল। স্পিডোমিটারের দিকে চোখ পড়তেই আমি দেখলাম, আশির ঘরও কাঁটাটা পেরিয়ে গিয়েছে। পঁচাশি-নব্বই। পঁচানব্বই।

"তুমি এত ভয় পাও কেন মান্তু?" অ্যাকসিলেটরে আর-একটু চাপ দিয়ে ভদ্রলোক বললেন।

উনি আমার নাম জানলেন কী করে? বারবার আমাকে অবাক হতে হচ্ছে।

"তুমি ভাবছ, একশো মাইল স্পিডে গাড়িটা ছুটছে। মোটেই তা নয়। স্পিডোমিটারে দেখছ না কে এম কথাটা লেখা আছে। কিলোমিটার। তার মানে, তুমি যা ভাবছ তার চেয়েও অনেক কম স্পিডে আমরা যাচ্ছি।"

দিদির কিন্তু এই স্পিডটা ভাল লাগছে। সে বলল, "স্পিডোমিটারের স্পিড লিমিটটাও যদি আমরা ছাড়িয়ে যাই।"

"আচ্ছা, তোমাদের আমি একদিন লং ড্রাইভে নিয়ে যাব।"

লং ড্রাইভ? এর চেয়েও বেশি স্পিড? এখন থেকেই রোমাঞ্চ হচ্ছে। কিন্তু তার আগে ভয়টা যেভাবেই হোক আমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। পৃথিবীটা ভিতুদের জন্য নয়, এটা যত তাড়াতাড়ি আমি বুঝতে পারি ততই মঙ্গল। এর বেশি এখন আর ভাবা সম্ভব নয়। আমাদের শহরের আলোগুলো এখন জিপের উইন্ডস্ক্রিনে ফুটে উঠেছে। আমরা এসে পড়েছি।

চৌমাথায় পৌঁছে জিপটা আমাদের বাড়ির দিকে ঘুরতেই, মা বললেন, "আমাদের এখানেই নামিয়ে দিন। এখান থেকেই আমরা যেতে পারব।"

"এটুকু আর কষ্ট করবেন কেন? এসেই তো গেছি।"

ভদ্রলোক আমাদের বাড়িটাও চেনেন দেখছি। জিপটা সোজা তিনি আমাদের গেটের সামনে থামালেন। প্রথমে নামলেন মা, তারপর নামল দিদি, শেষে আমি। জিপের স্টার্ট উনি বন্ধ করেননি।

মা বললেন, "আসুন না একটু চা খেয়ে যান। কী বলে যে

আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব।"

"তার কি দরকার আছে কোনও?"

"আপনার নাম, আপনি কোথায় থাকেন—এসব কথা তো জিজ্ঞেসও করা হয়নি। নিজেরই খারাপ লাগছে।"

"আমি অবশ্য আপনাদের সবাইকে চিনি। আপনি পড়ান আশ্রমের স্কুলে, মান্তু পড়ে ড্রেকার অ্যাসেমব্লিতে, ক্লাস নাইনে। ব্রিলিয়ান্ট বয়। আর সোনালিও তো রীতিমত ভাল ছাত্রী। পল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে সে এখন সেরা কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই না সোনালি?"

"ঠিক কথা। এটাও ঠিক কথা যে, আপনি আপনার পরিচয়টা গোপন রাখছেন।" সোনালি হাসতে-হাসতে বলল।

"আর-একদিন সময় করে আসব।"

"যদি না আসেন! ঠিকানাও জানি না যে, আপনাকে ধরে নিয়ে আসব।"

"তার দরকার হবে না। কথা দিলাম আসব।"

মোরাম-ছড়ানো রাস্তায় জিপটা বাঁক ঘুরেই নিমেষে হারিয়ে গেল। আমি মনে-মনে হিসেব কষার চেষ্টা করলাম, এখন স্পিড কত? পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর!

জিপটার পথের দিকে চেয়ে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ওদিকে মা ও দিদি গেটের দরজা খুলে বাগানের রাস্তা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। বাগান পেরিয়ে আমাদের বাড়ি। আমি দৌড়ে মা ও দিদির মাঝখানের জায়গাটায় গিয়ে পড়লাম।

"দেখলি তো ভদ্রলোক ওঁর নাম-ঠিকানা জানিয়ে গেলেন না। সারাজীবন আমরা ওঁর কাছে ঋণী থেকে যাব।" দিদি বলল।

"আশ্চর্য! আমাদের সবাইকে চেনেন, অথচ আমরা ওঁকে চিনি না, আগে কখনও দেখিনি, এটা ভাবতেই কেমন লাগছে।" মা বললেন।

"একেবারে অজানা এক ভদ্রলোক—"

"তা কেন? কিছুটা পরিচয় তো আমরা ওঁর পেয়েছি।" আমি বললাম। "স্মার্ট, হ্যান্ডসাম চেহারা, গায়ে অসুরের মতো শক্তি, কিন্তু তার জন্য পেশি ফুলিয়ে বেড়ান না, কোনও অহঙ্কার নেই, দারুণ ড্রাইভ করেন, কথাবার্তায় অত্যন্ত মার্জিত—"

"তুই দেখছি মুগ্ধ হয়ে গেছিস।" দিদি আমাকে ঠেস দিয়ে বলল।

আমার যা মনে হয়েছে, সেটাই বললাম। সেটাই কি মুগ্ধতা? ঠিক জানি না। বাড়িতে তখন আমাদের জন্য আর-একটা চমক অপেক্ষা করছে। মহারাজকে পাওয়া গেল না। গিয়ে দেখলাম, ওর খাঁচার দরজাটা খোলা। মহারাজ নেই। এ-ঘর, সে-ঘর, খাটের নীচে, বাগানের গাছপালায়, ঝোপঝাড়ে তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কোথায় মহারাজ?

মহারাজ হল আমাদের পোষা ম্যাকাও পাখি। বাবা ওকে আমাজনের অরণ্য থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সে অনেককাল আগের কথা। লাতিন আমেরিকার একটা খনি-পরিদর্শনে গিয়ে বাবা ওকে নিয়ে এসেছিলেন। ওখানকার লোকেরা বাবাকে ম্যাকাও পাখিটা দিয়েছিলেন। বাবা যখন ভারতে ফিরে আসবেন সেই সময়। আমি তখনও পৃথিবীর আলো দেখিনি। আমরা তখনও কোলিয়ারির এই বাংলো-বাড়িটায় আসিনি।

কোথা থেকে এল মহারাজ? মায়ের কাছে একদিন জানতে চেয়েছিলাম। মা বলেছিলেন, আমাজন থেকে। সেই অরণ্য, সেই বর্ষণ-বন আমি কোনওদিন নিজের চোখে দেখতে পাব কি না জানি না। কিন্তু তার গল্প অনেক শুনেছি। বড়-বড় গাছের আড়ালে সূর্যের আলো সেখানে ঢাকা পড়ে যায়। বিচিত্র সব জীবজন্তু, পাখি আর পোকামাকড়ের বাসা সেখানে। সারাদিন অরণ্য থাকে নিস্তব্ধ। তারপর যখন সন্ধে হয়, তখন জীবজন্তুরা একে-একে ডাকতে শুরু করে। পোকামাকড়রা নানা ধরনের শব্দ করতে থাকে। পাখিরা ডানা ঝাপটায়। গাছের এক ডাল থেকে আর-এক ডালে লাফ দেয় বানরেরা। সেই বনে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। লতাপাতায় পা জড়িয়ে যায়। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ভিজে যায় পা। বিষাক্ত সব সাপের আড্ডা সেখানে। না, আমাজনের ওই অরণ্যে আমি কোনওদিন হয়তো ঢুকতে পারব না। আমাদের মহারাজই সেই অরণ্যের প্রতীক হয়ে থাকবে। তার চোখের তারার, নানা রঙের পালকে আমি আমাজনের অরণ্যকে দেখার চেষ্টা করেছি। সাধারণ একটা ম্যাকাওয়ের চেয়েও ওর দাম আমার কাছে অনেক।

কিন্তু কোথায় গেল মহারাজ? আমার চোখে জল এল। খুব রাগ হল মায়ের ওপর। তিনি কেন মহারাজকে আজ আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন না? অভিমানেই কি সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে? আর কি তাকে খুঁজে পাব।

মা নিজেও কম বিব্রত বোধ করছেন না। বারবার শুধু একটা কথাই বললেন, "ওর খাঁচার দরজাটা তো রোজ খোলাই থাকে। কখনও তো বাড়ি ছেড়ে পালায়নি।"

আমি যখন পড়তে বসি, তখন মহারাজ রোজ আমার টেবিলে এসে বসে থাকে। কিংবা চেয়ারের হাতলে। আমি যখন স্কুলে যাই, তখন সে খাঁচা থেকে বেরিয়ে বাগান পর্যন্ত আমার পেছনে পেছনে আসে। যতক্ষণ চোখ যায়, ততক্ষণ সে আমার পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। বিকেলবেলা স্কুল থেকে যখন বাড়ি ফিরে আসি, মহারাজ খুশিতে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। খাঁচা থেকে নেমে আমার কাঁধে এসে বসে। সন্ধেবেলা পড়ার সময় কোনও-কোনওদিন খুব ঘুম পায়। তখনও সে আমার কানের কাছে এসে ডাকত শুরু করে। আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমাকে সে বুঝিয়ে দেয়, এখন ঘুমনোর সময় নয়। পড়ার সময় পড়া, ঘুমনোর সময় ঘুম—এটাই নিয়ম।

সত্যিই, মহারাজের খাঁচার দরজা আমরা কখনও বন্ধ করে দিই না। সারাদিন সে বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। কখনও বইয়ের আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখে মনে হয় বইয়ের নামগুলো পড়ার চেষ্টা করছে, কখনও আবার ড্রেসিং টেবিলের পাশে গিয়ে বসে। দিদি যখন সেজেগুজে কলেজে যায়, সেই সময়। মা যখন রান্নাঘরে থাকেন, রান্না করেন, তখনও সে পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। মা বলেন, "এখান থেকে যাও, গায়ে গরম তেল ছিটকে পড়বে।" কিংবা বলেন, "চলো তোমাকে স্নান করিয়ে দিই, আমার রান্না হয়ে গেছে।" মা এর পর ওকে স্নান করিয়ে খেতে দেন। এতটুকুও জ্বালাতন করে না। আমাদেরই একজন আত্মীয় হয়ে গেছে মহারাজ।

সেই মহারাজকেই এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কান্না পাচ্ছে, গলা ফাটিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ফিরে এসো, মহারাজ, ফিরে এসো।

॥ ২ ॥

মহারাজ ফিরে এসেছিল সেদিনই অনেক রাত্রে। ওকে কোথায় খুঁজতে বেরোব, কার-কার কাছে খবর নেব, এ নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। সে কোথায়-কোথায় যেতে পারে, বাগানের কোনও গাছের ডালে গিয়ে বসে আছে কি না, তা নিয়েও আলোচনা হল। কিন্তু কোনও রাস্তাই আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ উড়ে-আসা মেঘ মাঝখানে কিছুক্ষণ বৃষ্টি দিয়ে গেল। টর্চটা নিয়ে বাগানে খুঁজে দেখার কথা ভাবছিলাম। সেটাও ভণ্ডুল হয়ে গেল বৃষ্টিতে।

আমরা যে কী কষ্ট পাচ্ছি, তা নিশ্চয় মহারাজ টের পেয়েছিল। হাজার হলেও এতদিন সে আমাদের সঙ্গে আছে। সেও নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে একটা সম্পর্কের টান অনুভব করে। কিন্তু মহারাজ একা ফিরল না। ফিরল একজনকে নিয়ে। বয়স্ক একজন

ভদ্রলোক। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সে-চুলে চিরুনির আঁচড় শেষ কবে পড়েছে, কিংবা আদৌ পড়েছে কি না, তা রীতিমত গবেষণার বিষয়। পরনে গলাবন্ধ পাঞ্জাবি ও মোটা ধুতি। চোখে পুরু কাচের চশমা। সব মিলে ভদ্রলোকের চেহারা এমন যে, দেখে মনে হয় ঝড়ের মাঝখানে গিয়ে পড়েছিলেন।

রাত অনেক হয়েছে। মহারাজের জন্য আমরা মন খারাপ করে বসে আছি। টেবিলে খাবার পড়ে আছে। খাওয়ার ইচ্ছেটুকু পর্যন্ত চলে গেছে। এমন সময় ডোর-বেল বেজে উঠল। দিদি দরজা খুলতে গেল।

মা বললেন, "আগে জিজ্ঞেস না করে দরজা খুলো না।"

দরজার এপার থেকে দিদি জানতে চাইল, "কে?" অমনই দরজার বাইরে ডানা ঝটপট করে উঠল। তারপরই পরিচিত সেই কণ্ঠস্বর। বহু বছর পর আমাজনের অরণ্যে ফিরে গেলে মহারাজ যেমন খুশি হত, যেভাবে ডানা ঝটপট করত, ডাকত, এখনও সেইভাবে ডানা ঝটপট করছে, ডাকছে। আমাদের খুশি আর ধরে না।

মা বললেন, "মহারাজ আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, তা কি হয়? আমি জানতাম ও ফিরে আসবে। নিশ্চয় ফিরে আসবে।"

আমিও মায়ের কথারই প্রতিধ্বনি করলাম, "তুমি ঠিক বলেছ মা। মহারাজ আমাদের খুব ভালবাসে। আমাদের ছেড়ে ও কোথাও যাবে না।"

দিদি ওদিকে দরজা খুলে যতটা খুশি হয়েছে, ততটাই হয়েছে অবাক। খুশি, কারণ মহারাজ ফিরে এসেছে। কিন্তু ওই ভদ্রলোক? মাঝরাতে এরকম উসকোখুসকো চেহারার একজন অপরিচিত লোককে দেখলে কে না অবাক হয়? ভদ্রলোক কিন্তু কোনও ভদ্রতা বা সৌজন্যের তোয়াক্কা না করে সোজা আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর ডান হাতের পাতায় দিব্যি আরাম করে বসে আছে মহারাজ।

ভদ্রলোকের কথাবার্তাও বেশ রহস্যময়। তিনি বললেন, "আপনারা কেমন আছেন দেখতে এলাম।"

"কেন, আমাদের হয়েছেটা কী?" মা জিজ্ঞেস করলেন।

"না, আমার মনে হল আপনারা বোধ হয় ভাল নেই।"

"ভাল থাকব না কেন? তবে—"

"বলুন না, আছেন কেমন?"

"হ্যাঁ, মহারাজের জন্য মন খারাপ হয়ে গেছিল। ভাবছিলাম, ও কোথায় গেল।"

"এখন নিশ্চয় আশ্বস্ত হলেন।"

"মহারাজকে আপনি ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন, এর জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনি আমাদের বাড়ি চিনলেন কী করে! মহারাজ যে এ-বাড়িতেই থাকে তা কি আপনি জানতেন?"

ভদ্রলোক হোহো করে হেসে উঠলেন। হাসি আর থামতে চায় না। হাসির দমক কাটতে-না-কাটতেই আবার নতুন করে হাসতে শুরু করলেন। মাঝরাতে বেশ মুশকিলে পড়তে হল দেখছি।

"শুনুন, আমি ওকে ফিরিয়ে আনিনি। ও নিজেই এসেছে।"

"কিন্তু আপনি তো ওর সঙ্গে এলেন।"

"হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমি ভাবলাম, যাই আপনাদের খোঁজখবর নিয়ে আসি। আপনাদের এই মহারাজই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।"

ভদ্রলোকের কি মাথা খারাপ নাকি? হোহো করে হাসছেন, উলটোপালটা কথা বলছেন! এর মানে কী? সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের কাছে হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক একবার বলছেন, "ভাবলাম, যাই আপনাদের খবর নিয়ে আসি", তারপরেই আবার বলছেন, মহারাজই তাঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এ-দুটো কথার মধ্যে মিল কোথায়? মহারাজ কেন ওঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবে? তা কি সম্ভব? ভদ্রলোককে মহারাজ

চিনল কী করে? কবে থেকে চিনল? পুরো ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। মাঝরাতে এ-নিয়ে চিন্তা না করাই ভাল। মহারাজ যখন ফিরে এসেছে তখন আর এ-নিয়ে মাথা ঘামানোও উচিত নয়।

ভদ্রলোককে দিদি জিজ্ঞেস করল, "আপনি থাকেন কোথায়?"

"কাছেই।"

"জায়গাটার নাম বলুন।"

"নাম একটা আছে। হ্যাঁ, কী যেন। এই দ্যাখো, কী মুশকিল। যেখানে থাকি সেই জায়গার নামটাই যে বেমালুম ভুলে গেছি।"

নিজের নামটাও কি ভুলে গেছেন? এ-প্রশ্ন অবশ্য তাঁকে করা যায় না। প্রশ্নটা ভাল শোনাবেও না। দিদি তাই জিজ্ঞেস করল, "আপনার নামটা কী জানতে পারি?"

"মণিময় তালুকদার। সবাই আমাকে মণিবাবু নামেই ডাকে। তবে, মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয়, আমার পুরো নাম বা পদবিটা কি ওরা জানে?" ভদ্রলোক আনমনা হয়ে গেলেন। "কখনও কি জানত? জেনেই বা কী লাভ?"

না, ভদ্রলোককে বেশি ঘাঁটানো ঠিক নয়! তাঁর কথার সব মানে আমরা বুঝব না।

"মাঝরাতে একা বাড়ি ফিরতে পারবেন?" মা বোধ হয় ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

"পারব না কেন? ঠিক পারব। একা-একা রাস্তা হাঁটতেই আমার ভাল লাগে। একা-একাই তো এতদিন হেঁটে এলাম। কতবার বাড়ি ফিরলাম, আর বাড়ি ফিরতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেললাম, তা কি মনে আছে? না, এর হিসেব রাখা সম্ভব। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাব।"

"আমরা যদি কেউ আপনাকে এগিয়ে দিতে পারতাম—" ভদ্রলোকের কথা শুনে মায়ের বোধ হয় মমতা হল।

"আমি তো কাছেই থাকি। আত্মীয়দের বাড়ি তো দূরে হয় না।"

ভদ্রলোক এবার গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। বাগানের মোরাম-ছড়ানো রাস্তায় তাঁর চপ্পলের মচমচ শব্দ আমরা শুনতে পেলাম। গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে গেটটা আবার লাগিয়ে দিলেন। সে-শব্দও আমাদের কানে এল। তাঁর চলার পথের দিকে তাকিয়ে আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাড়ির দরজাটা যে বন্ধ করতে হবে, সেটাও যেন আমরা ভুলে গেছি। হঠাৎ খেয়াল হল, মহারাজও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় উঁচু করে ভদ্রলোকের চলার পথের দিকে সেও তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। বাইরে অবশ্য অন্ধকার ছাড়া কিছুই এখন আর চোখে পড়ে না।

দরজা বন্ধ করে আমরা এবার মহারাজকে নিয়ে পড়লাম। "কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি? ভদ্রলোককে পেলে কোথায়? তুমি কি ওঁকে আগে থেকে চিনতে?" এ ধরনের সব প্রশ্ন মহারাজকে লক্ষ করে আমরা ছুঁড়ে দিতে থাকলাম। ও যেন জলজ্যান্ত একটা মানুষ, আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেবে! কারও কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় ওর নেই। সে কারও কাছে জবাব চায় না, কারও প্রশ্নেরও জবাব দেয় না। আমরাও যদি এরকম হতে পারতাম! আমি ভাবলাম।

ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে মহারাজ। যেন নতুন করে আমাদের এই বাড়িটার সঙ্গে পরিচয় করে নিচ্ছে। খাঁচায় ফিরে গিয়ে বাকি রাতটা যে ওকে কাটিয়ে দিতে হবে, সেদিকে একেবারে খেয়াল নেই। যত মুশকিল আমাদের। সবসময় নিয়ম মেনে আমাদের চলতে হয়। ভোরবেলা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠতে হয়, রাত্রে ঘুমোতেও যেতে হয় বাঁধাধরা সময়ে। স্নান, খাওয়া, লেখাপড়া, ঘুম—সবই নিয়মে বাঁধা। একচুলও এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই।

মানুষ নিজে নিয়ম সৃষ্টি করেছে নিয়মগুলো ভাঙার জন্য। তা যদি হত, তা হলে সত্যিই ভাল লাগত। কিন্তু নিয়ম ভাঙার মানুষ তো বেশি নেই। ফলে, নিয়মের মধ্যেই আমাদের গুমরে মরতে হয়।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না। একবার ভাবলাম, রাত তো আর বেশি বাকি নেই। বাকি সময়টা না হয় জেগেই কাটিয়ে দিই। কেমন দেখতে ভোরবেলা, যখন আলো একটু-একটু করে ফুটতে থাকে, আর অন্ধকার তার ডানাটা গুটিয়ে নেয়? খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কখনও কি এই দৃশ্য দেখেছি? আজ দেখব। সন্ধের পর থেকেই তো একের পর এক নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। নতুন-নতুন চমক আর রহস্য। পুরো একটা দিন যদি এভাবে কাটে? এক সন্ধে থেকে আর-এক সন্ধে?

এসব ভাবতে-ভাবতেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। কখন যে ডানা গুটিয়ে নিল অন্ধকার, একটু-একটু করে আলোর ফুল ফুটল, ঘুমের মধ্যে তা টেরও পেলাম না।

॥ ৩ ॥

কিছুই টের পাননি অরিন্দম সান্যাল। ভোর হতে-না-হতেই টেলিফোন বেজে উঠল তাঁর ঘরে। খুব ভোরবেলা তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। মাইল তিনেক 'জগিং' সেরে আবার ঘরে ফিরে আসেন। গায়ের ঘাম শুকোতে সময় লাগে। ততক্ষণ গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে বসে থাকেন বারান্দায়। শীত-গ্রীষ্ম কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। অবশ্য বৃষ্টি-বাদলের দিন তাঁকে ঘরে থাকতে হয়। তা বলে চুপচাপ বসে থাকেন না। ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করে দেন।

অরিন্দম সান্যালের সকালের এই রুটিনের কথা শুনলে মনে হবে, তাঁর বয়স হয়েছে। চাকরি কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অবসর নিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা রাখার জন্য এভাবে কসরত করে যাচ্ছেন নিয়মিত। অরিন্দম সান্যালের বয়স মোটে চল্লিশ। ছিপছিপে চেহারা। আধুনিক পোশাক-আশাকে সবসময় ধোপদুরস্ত থাকতে ভালবাসেন। তিনি বক্সার মহম্মদ আলির দলে। আলির যখন বয়স চল্লিশ, তখন তিনি বলেছিলেন, "লাইফ বিগিনস্ অ্যাট ফর্টি।" চল্লিশ বছর বয়স থেকেই জীবন শুরু হয়। আলি বলেছিলেন, জীবনে কখনও বার্ধক্য আসতে দিয়ো না। তারুণ্যটাই সব। কথাটা মনে রেখেছেন অরিন্দম সান্যাল। ছটফটে মানুষ। পুরো জীবনটাই এভাবে কাটিয়ে দিতে চান তিনি।

তবে হ্যাঁ, অরিন্দম সান্যাল কিন্তু বক্সার নন। একসময় তিনি ছিলেন বডিবিল্ডার। এখনও নিয়মিত ব্যায়াম করেন। পেশিবহুল চেহারা। গায়ে প্রচণ্ড জোর। কিন্তু ঢিলেঢালা ব্যাগি পোশাকের আড়ালে পেশিগুলো ঢাকা পড়ে যায়। কিংবা বলা যায়, নিজেকে জাহির করতে চান না অরিন্দম। শক্তিটাকে চোখের আড়ালে সংহত রাখতে চান। কে বলবে, খালি গায়ে এই লোকটাই দেখতে অনেকটা হি-ম্যানের মতো!

রুটিন-বাঁধা জীবনে সেদিন প্রথমেই একটা নিয়মছুট ঘটনা ঘটল অরিন্দমের জীবনে। তিনি জগিংয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। এক পায়ে সবে কেড্‌সটা গলিয়েছেন তিনি, তখনই ওই টেলিফোন। আর-এক পায়ে কেড্‌সটা পরেই তিনি টেলিফোন ধরলেন। ব্যায়াম-ক্লাবের এক ছাত্র তাঁকে ফোন করেছে।

"আমি? বিরাট একটা পাথর ঠেলে সরিয়ে দিলাম?"

"হ্যাঁ সার।"

"কী বলছ তুমি, আমি তো মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতেই পারছি না।"

"ওই যে টিয়াচরার পাহাড়ে। ভারী একটা পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে রাস্তা আটকে দিয়েছিল। এক ভদ্রমহিলা তাঁর ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে তখন গাড়িতে আসছিলেন। আর-একটু হলেই তাঁরা চাপা পড়তেন।"

অরিন্দম সান্যাল যদি শুনতেন কুতুবমিনার কিংবা হাওড়া ব্রিজ কারা চুরি করে নিয়ে গেছে, তা হলেও বোধ হয় এতটা অবাক হতেন না।

"কাল কখন ঘটনাটা ঘটেছে বলো তো?"

"সন্ধেবেলা। আপনি জিপে করে গিয়ে ওঁদের উদ্ধার করেছেন। পাথরটা ঠেলে সরিয়ে না দিলে সারারাত তাঁরা ওখানেই পড়ে থাকতেন।"

"আমি কিছুই মনে করতে পারছি না।"

"পুরো ঘটনাটা বেশ অদ্ভুত। ভদ্রমহিলার গাড়ির টাই-রড কেটে গিয়েছিল। কিন্তু গাড়িটা নিজেই থেমে যায়। না হলে ওঁরা পাহাড়ের নীচে গিয়ে পড়তেন। তারপর ওই ভারী পাথর।"

"কাল সন্ধেবেলা? সন্ধেবেলা আমি তো বাড়িতেই ছিলাম। কোথাও যাইনি। পুরো ব্যাপারটাই বেশ রহস্যময় মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু আমাকে আজ যিনি খবরটা দিলেন, তিনি তো মিথ্যে কথা বলার লোক নন। তিনি আপনাকে চেনেন।"

"কী নাম বলো তো?"

"মণিময় তালুকদার। সবাই ওঁকে মণিবাবু বলে ডাকে।"

"বেশ গোলমেলে ব্যাপার। উনি জানলেন কী করে?"

"তা অবশ্য বলেননি। কিন্তু এমনভাবে কথাটা বললেন যে, কথাটা বিশ্বাস না করে পারা যায় না।"

"সাতসকালে তিনি এসে খবরটা তোমাকে জানিয়ে গেলেন?"

"আমি ওঁকে অনেকদিন ধরেই চিনি। মর্নিং ওয়াক করার সময় উনি আমাকে কথাটা বললেন। আমি যখন ব্যায়াম-ক্লাবে আসছিলাম, তখন।"

"সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কাল সন্ধেবেলা আমি বাড়িতেই ছিলাম। ভি সি আর-এ ছবি দেখছিলাম। আমার দু'জন বন্ধুও তখন আমার সঙ্গে ছিল।"

"মণিবাবু কিন্তু অন্য কথা বললেন।"

"তুমি বলছ, মণিবাবু আমাকে চেনেন ? কিন্তু ওই নামে আমি কাউকে চিনি বলে মনে পড়ছে না।"

"আমাদের এখানকার অনেককেই কিন্তু মণিবাবু চেনেন।"

"বেশ ধাঁধায় ফেললে দেখছি। তুমি এখনই একবার আমার এখানে আসতে পারবে ?"

"আপনি তো জগিংয়ে বেরোবেন ?"

"হ্যাঁ। তবে আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি। তুমি এলে একসঙ্গে বেরোব।"

ফোন করেছে অসীম। সে এখানকার কলেজে বটানি পড়ে। অরিন্দমের ব্যায়াম-ক্লাবেরও সে সদস্য। ভোরবেলা ক্লাবে এসে ব্যায়াম করে। ক্লাব থেকেই সে অরিন্দমকে ফোন করেছে।

ক্লাব থেকে অরিন্দমের বাড়িটা খুব একটা দূরে নয়। অরিন্দম ভোরবেলা জগিং করতে-করতে ক্লাবে চলে যায়। কিছুক্ষণ থেকে আবার ফিরে আসে। ফোনটা নামিয়ে রাখার পরই অরিন্দমের মন হল, "আমি তো ক্লাবেই যাচ্ছি। ওখানেই তো অসীমের সঙ্গে দেখা হবে। আমার বাড়ি এসে পৌঁছতে অসীমেরও তো সময় লাগবে। সেই সময়ে আমিও তো ক্লাবে পৌঁছে যেতে পারতাম। না, ওভাবে ওকে আসতে বলার কোনও দরকার ছিল না।"

ফোনটা পাওয়ার পরই মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে অরিন্দমের। টিয়াচরার পাহাড়, পাথর, বিপন্ন এক ভদ্রমহিলা ও তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। অসীম যা বলল, তা কি সত্যিই ঘটেছে ? কিন্তু অসীমই বা অহেতুক মিথ্যে কথা বলতে যাবে কেন ? সকাল থেকেই রুটিনটা নষ্ট হয়ে গেল অরিন্দমের। এতক্ষণ সে জগিংয়ে বেরিয়ে যেত। অথচ এখন সে সাদা টেনিস শার্ট, হাফ প্যান্ট ও কেড্‌স পরে বসে আছে। বসে আছে অসীমের অপেক্ষায়। অসীম অবশ্য অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল।

"আচ্ছা অসীম, টেলিফোনে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। ভদ্রমহিলার নাম কী ?"

"তা তো জানি না। মণিবাবুকে জিজ্ঞেস করলে উনি নিশ্চয় বলতে পারবেন।"

"ওঁর ছেলে বা মেয়ের নামও তুমি জানো না ?"

"মণিবাবুকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।"

"মণিবাবুকে তুমি কতদিন চেনো ?"

"তা, ঠিক মনে নেই। অনেকদিন হল—"

"তুমি আমাকে ওঁর বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে ?"

"ওঁর বাড়িটা তো আমি চিনি না।"

"একজন ভদ্রলোককে অনেকদিন ধরে চেনো, অথচ তিনি কোথায় থাকেন বলতেও পারছ না ! এ কেমন চেনাজানা তোমাদের ?"

"মুখ-চেনা। আমি ওঁকে দেখছি বহুদিন ধরে, উনিও আমাকে দেখছেন।"

"আমি মণিবাবুর বাড়ি যেতে চাই। ভদ্রমহিলার ঠিকানাটাও দরকার।"

"ক্লাবের ছেলেরা কেউ-না-কেউ নিশ্চয় মণিবাবুর ঠিকানা জানে। আপনি তো ক্লাবেই আসছেন।"

"হয়তো দেখা যাবে তোমার মতো ওরাও ভদ্রলোককে চেনে, কিন্তু ওঁর ঠিকানাটা জানে না।"

"হতাশ হচ্ছেন কেন ? নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"সকাল থেকে রুটিনটাই নড়চড় হয়ে গেল, আমি বরং নিজেই চেষ্টা করে দেখি।"

"আমি খবর পেলেই আপনাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেব।"

"তার হয়তো দরকার হবে না। আমি এখনই বেরোব। ভদ্রলোকের ঠিকানা পেতে আমার বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।"

তারও দরকার হল না। অসীম চলে যাওয়ার পরই উসকোখুসকো চেহারার এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। সে-চুলে পড়েনি চিরুনির আঁচড়। চোখে পুরু কাচের চশমা। পরনে খদ্দরের মোটা পাঞ্জাবি ও ধুতি।

"আপনি আমার খোঁজ করছিলেন শুনলাম ?"

ভদ্রলোকের কথা শুনে রীতিমত অস্বস্তিতে পড়লেন অরিন্দম। ইনিই কি মণিবাবু ? ভদ্রলোকের কি কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে যে, ওঁর কথা আলোচনা হতে-না-হতেই উনি টের পেয়ে গেলেন ? না, আজকের দিনটা সকাল থেকেই গোলমেলে ঠেকছে অরিন্দমের। তিনি এক দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যেন সম্মোহিত হয়ে গেছেন। যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন পাথরের একটা মূর্তির মতোই। এমনকী, তাঁর চেতনাও যেন লোপ পেয়েছে।

"আমার বাড়ি না হয় আর-একদিন যাবেন। আজ আমি নিজেই চলে এলাম।" ভদ্রলোকের কথায় চেতনা ফিরে পেলেন অরিন্দম।

"আপনিই নিশ্চয় মণিবাবু ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমি যে আপনার ঠিকানা খুঁজছিলাম, আপনি জানলেন কী করে ?"

"আমি জানতে পারি। দরকার হলেই সব খবর আমার কাছে পৌঁছে যায়।"

"কীভাবে আপনি সব জানতে পারেন ? সব খবর কীভাবে আপনার কাছে পৌঁছে যায় ?"

"নিজেও ঠিক জানি না। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্য বলে মনে হয়। গভীর রহস্য।" ভদ্রলোক বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে বললেন।

মনে-মনে লজ্জিত বোধ করলেন অরিন্দম। মণিবাবুকে বসতে বলা উচিত ছিল। উনি নিজেই কষ্ট করে এতদূর এসেছেন। শুকনো ভদ্রতার চেয়েও বেশি কিছু তিনি দাবি করেন।

"মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় পুরো পৃথিবীটাই একটা রহস্য। বীজ থেকে কীভাবে গাছ হয়, সেই গাছ আস্তে-আস্তে কী করে বড় হয়ে ওঠে, ভাবলেই অবাক হতে হয়।"

মণিবাবুকে দার্শনিক বলে মনে হচ্ছে অরিন্দমের। তিনি অবশ্য জীবনে কখনও কোনও দার্শনিকের সংস্পর্শে আসেননি। শুনেছেন, দার্শনিকরা নাকি এরকমই হন। সাধারণ আর পাঁচজন মানুষের চেয়ে আলাদা। মণিবাবু যা বলছেন, তা সত্যিই চিন্তা করার বিষয়। তবু অরিন্দম প্রশ্ন না করে পারেন না, "বিজ্ঞানীরা তো অনেক রহস্যেরই সমাধান করেছেন।"

"সামান্য কিছু তাঁরা হয়তো করতে পেরেছেন। বেশিটাই রয়ে গেছে সমাধানের বাইরে। ধরুন, মহাকাশের সীমানা কোথায় শুরু, কোথায় শেষ, তা আমরা এখনও জানি না। আবার মহাকাশের চেয়েও বেশি রহস্য রয়ে গেছে সমুদ্রের নীচে। কত শ্যাওলা, কত গাছপালা, কত মাছ, আলো কখন কোথায় কতটুকু পৌঁছয়, তা কি আমরা আজও সব জানতে পেরেছি ?"

"চেষ্টার তো ত্রুটি নেই। হয়তো একদিন আমরা সব কিছু জানতে পারব।"

"সব কিছু জানার পরেও থেকে যাবে আরও কিছু অজানা রহস্য। তখন হয়তো নতুন-নতুন রহস্যের সৃষ্টি হবে।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছেন অরিন্দম। শুনতে-শুনতে একটা কথাই তাঁর মনে হল। যেসব সরল সত্য সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না, কিংবা যা তাঁরা উপলব্ধি করেন না, দার্শনিকদের কাছে সেটাই ধরা পড়ে। তাঁদের কথা সাধারণ মানুষ দর্শন বলে মনে করে, সেগুলোকে আলাদা মর্যাদা দেয়। কিন্তু তার কোনও দরকার ছিল না। সাধারণ মানুষের যেসব কথা বলা উচিত ছিল, যা তারা উপলব্ধি করতে পারত, তা তারা বলেনি বা করেনি। দার্শনিকরা এই কাজটাই করছেন সাধারণ মানুষের হয়ে।

কিন্তু পৃথিবীতে রহস্যটাই কি শেষ কথা ? অত বড় বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। সৃষ্টিরহস্যের কত কিছুই তো তিনি জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু জানলায় দাঁড়িয়ে যখন দেখতেন, ঝড়ের সময় গাছের ডাল কীভাবে নুয়ে পড়ছে, তখন তিনিও তাকে বড় রহস্য বলে মনে করতেন। অবসর সময়ে বেহালা বাজাতে-বাজাতে অনেক সময় থেমে যেতেন আইনস্টাইন। তাঁর মনে হত, সৃষ্টিরহস্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

মণিবাবু আরও একটা কথা শোনালেন, "সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সাধারণ কিছু মিল আছে। কিন্তু প্রতিটি মানুষই কত আলাদা। মানুষের স্বভাব, আচার-আচরণ ও মনের বিচিত্র গতিবিধির পুরোদস্তুর খোঁজখবর রাখা কম্পিউটারের পক্ষেও সম্ভব নয়।"

"মানুষের মগজটাই তো একটা কম্পিউটার।" অরিন্দম বললেন।

"কম্পিউটারের চেয়েও যদি বেশি কিছু থাকে তা হলে তাই। মগজেরও তো নানা রকমফের আছে। নেই কি ?" মণিবাবু বললেন। তিনি বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেন। এমনভাবে বলেন যে, তাঁর কথা উড়িয়ে দেওয়াই যায় না।

"কম্পিউটার কথাটা যদি পুরনো হয়ে যায় তা হলে বলতে হবে সুপার কম্পিউটার।" ভেবেচিন্তেই কথাটা বললেন অরিন্দম।

"কোন মডেল ? কোথায় তৈরি ?" মণিবাবুর কথায় চিন্তায় পড়লেন অরিন্দম। কী উত্তর দেবেন ? মণিবাবুই উত্তরটা জুগিয়ে দিলেন, "মেগাকম্পিউটার বললে মানানসই একটা শব্দ হয়তো আমরা খুঁজে পাব। কিন্তু মেগাকম্পিউটার বললেও কি সব কথা আমরা বোঝাতে পারব ? পারব না। হার্টকে কেউ-কেউ বলেন পাম্প। কিন্তু পাম্পের চেয়েও তার কারিগরি যে কত সূক্ষ্ম—"

এই বিতর্কের শেষ নেই। অরিন্দম অস্বস্তি বোধ করছেন। আসল কথাটা মণিবাবুকে এখন পর্যন্ত জিজ্ঞেসই করা হয়নি। তিনি কেন বলে বেড়াচ্ছেন, অরিন্দম সান্যাল কাল সন্ধেবেলা টিয়াচরার পাহাড়ে ভারী একটা পাথর দু' হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিপন্ন এক পরিবারকে রক্ষা করেছেন ? কেন এই গল্প তিনি বলে বেড়াচ্ছেন ? কী এর রহস্য ?

অরিন্দম প্রশ্নটা করার আগেই মণিবাবু তা টের পেয়ে গেছেন। তিনি বললেন, "মনের জোর থাকলে পঙ্গুও পাহাড় পেরোতে পারে। এই কথাটাই আমরা এতদিন শুনে এসেছি। অবিশ্বাস তো করিনি। তা হলে নামকরা একজন বডিবিল্ডার হয়ে আপনি দু' হাতে একটা পাথর ঠেলে সরাতে পারবেন না ? তা কি হয় ?"

কথাটা অরিন্দমকে ভাবিয়ে তুলেছে। বডিবিল্ডারের পক্ষে একটা পাথর ঠেলে সরানোর ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আসল কথাটা হল, অরিন্দম তো টিয়াচরার পাহাড়ে সন্ধেবেলা যাননি। তিনি বন্ধুদের নিয়ে সন্ধেবেলা ঘরেই ছিলেন। তা হলে কে অরিন্দম সেজে টিয়াচরার পাহাড়ে গেল ? সচরাচর হিন্দি সিনেমায় যেরকম দেখা যায়, প্রায় সেরকমই একটা ঘটিয়ে এল ?

"অরিন্দমবাবু, আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। জেনে রাখুন, আপনি একা নন, অনেকেই পাথর সরাতে পারেন। আসলে পাথর কে সরায় জানেন ? গায়ের জোর, না মনের শক্তি ? আমি যাই। কথাটা ভেবে দেখবেন।"

মণিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। অরিন্দম এবার সোজা ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু আমি এখনও পাইনি।"

"টিয়াচরার পাহাড়ে পাথর সরিয়েছে কে ? এটাই তো আপনার প্রশ্ন ?"

অরিন্দম মাথা নাড়লেন।

"অবিকল আপনার মতো দেখতে এমন কাউকে চেনেন ?"

"আমার যমজ ভাই নেই।"

"শোনা যায়, সৃষ্টিকর্তা নাকি একই চেহারার মানুষ দু'জন করে বানিয়ে থাকেন। তা হলে আর আপনার চিন্তার কিছু থাকল না। আপনি তো অন্যায় কিছু করেননি। বিপন্ন একটি পরিবারকে রক্ষা করেছেন। এতে চিন্তার তো কিছু দেখছি না।"

"এটা চিন্তার কথা নয় ? আমারই মতো দেখতে কেউ একজন আজ না হয় ভাল একটা কাজ করে হাততালি পেল, কিন্তু কালই ওই লোকটি যে খারাপ কিছু করে বসবে না, তার গ্যারান্টি কোথায় ?"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সেরকম ঘটনা ঘটবে না।" মণিবাবু দরজা পেরিয়ে যেতে-যেতে বললেন। "সেই অজানা লোকটির হয়ে আপনি কী করে এই গ্যারান্টি দিচ্ছেন ?"

"আপনাদের অসুবিধে হল, সব সময় প্র্যাকটিকাল টার্মে ভাবেন। তার বাইরেও যে কিছু ঘটতে পারে, সেটা আপনারা ভুলে যান। নিজেকেই সব সময় বেশি বুদ্ধিমান মনে করবেন না।"

কথাটা শুনে কার না রাগ হয় ! মুখে কুলুপ এঁটে এই খোঁচাটা সহ্য করবেন না অরিন্দম। মণিবাবুকে তিনি এর যোগ্য জবাব দেবেন। কিন্তু অরিন্দমকে সেই সুযোগ দিতে রাজি নন মণিবাবু। তিনি বললেন, "রাগ করতেও শিখতে হয়। মাঝে-মাঝে রাগ করা দরকার। কিন্তু আপনার রাগ যেন অপাত্রে বর্ষিত না হয়।"

মণিবাবুর পেছন-পেছন হাঁটতে থাকলেন অরিন্দম। লক্ষ করলেন, মণিবাবু বেশ জোরেই হাঁটছেন। কারণ, তাঁর পেছন-পেছন যেতে অরিন্দমকে অল্পবিস্তর ছুটতে হচ্ছে। ভোরবেলা জগিং করতে পারেননি বলে মনে একটা অস্বস্তি ছিল। সেই জগিংটাই এখন করতে হচ্ছে অরিন্দমকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন মণিবাবু। "আমার পেছন-পেছন আসছেন কেন ? আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেননি ? তা হলে শুনুন, উপদেশ নয়, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি। একটাই পরামর্শ। কল্পনা করতে শিখুন। কল্পনাপ্রবণ হোন। তা হলেই দেখবেন, চোখ-কান খুলে যাচ্ছে। অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন, যা এতদিন দেখতে পেতেন না। অনেক কিছু বুঝতে পারছেন, যা এতদিন আপনার বুদ্ধির নাগাল এড়িয়ে যেত। এখনও সময় আছে, নিজেকে এভাবে নষ্ট করবেন না।"

॥ ৪ ॥

মানুষের কল্পনা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তা জানার ইচ্ছে হয়। যদি কল্পনা করি আমি চাঁদে চলে গেছি, তা হলে কি সত্যিই চাঁদের মাটি আমি স্পর্শ করতে পারব ? নাকি কল্পনায় গড়ে নেব আর-একটা চাঁদ ? বাস্তবের সঙ্গে কি তার মিল থাকবে ? মাঝেমধ্যেই এরকম নানান প্রশ্ন আমার মনে দেখা দেয়। প্রশ্নের উত্তর যে খুঁজে পাওয়া যায় না, সে তো আর নতুন কথা নয়।

রবিবার বিকেলে আমি মহারাজকে নিয়ে বেড়াতে যাই। আজও ওরকম বেরিয়েছিলাম। আমার হাতের মুঠোয় মহারাজ আরাম করে বসে থাকে। এদিকে-ওদিকে তাকায়। খেলার মাঠ পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বেজির একটা বাসা আছে। মা-বেজি তার বাচ্চাটাকে নিয়ে সন্তর্পণে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে ওরা চোখের নিমেষে ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা-ঢাকা দিল। আমি দেখলাম, মহারাজ উসখুস করছে। সে হয়তো বেজির বাসায় গিয়ে অতিথি হতে চায়। মহারাজকে আমি আটকে রাখিনি। কিন্তু সে নিঃশব্দে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে অনুমতি চাইছে।

কিন্তু আমি তো ওকে ধরে রাখিনি। ও যদি যেতে চায়, যাক। আমি বাধা দেব না। সত্যিই আমার হাত থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল মহারাজ। কখনও হাঁটছে, কখনও আবার ডানা মেলে ওড়ার ভঙ্গি করছে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে মহারাজ ? বেজির বাসা যে অনেক পেছনে পড়ে রইল।

আমি ঠিক করেছি, মহারাজকে বাধা দেব না। যেখানে খুশি যাক। আমি তো ওর পেছনেই আছি। যদি দেখি অনেক দূরে এসে পড়েছি, সন্ধের অন্ধকার নেমে আসছে, তখনই ওকে ডেকে নেব। কিন্তু তার আগেই মহারাজকে কে যেন ডাকল। মহারাজ যেন সেই ডাক শোনার জন্যই এতদূর এসেছে।

মহারাজের পেছন-পেছন আমি এসে পড়েছি লোকালয়ের প্রান্তে। জায়গাটা বেশ ফাঁকা। উঁচু-নীচু ডাঙা, আর দূরে শালবন। সাঁওতালপাড়া থেকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। আকাশের একদিকে সূর্য ডুবছে, আর অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে একফালি চাঁদ। সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে নিঃসঙ্গ একটি তারা। ডাঙাটা যেখানে নিচু হয়ে নেমে গিয়ে আবার ওপরে উঠেছে, সেখান থেকেই মহারাজকে কেউ একজন ডাকছে। তার কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর। "মহারাজ", "মহারাজ"। একটি ডাক অনেক-অনেক প্রতিধ্বনি তুলে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে হল, নিঃসঙ্গ তারার আশ্রয় থেকে ভেসে আসছে ওই ডাক।

আর-একটু এগিয়ে চোখে পড়ল, লাল টালির একটি বাড়ি। মাটির বাড়ি ভারী সুন্দরভাবে নিকানো। বাড়ির চারপাশ দেওয়াল তুলে ঘিরে দেওয়া হয়নি। ছোট-ছোট গাছ লাগিয়ে বেড়া দেওয়া হয়েছে। ছোট্ট একটি ফটক। অস্ত-সূর্য পেছনে রেখে সেই ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মণিবাবু। মহারাজকে তিনি ডাকছেন।

মণিবাবুর বাড়িতে পৌঁছে বুঝলাম, মহারাজ নয়, তিনি আসলে আমাকেই ডাকছিলেন। তিনি জানতেন, মহারাজকে ডাকলে আমিও ওর পেছন-পেছন যাব। মহারাজই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ওঁর বাড়িতে।

স্বপ্নের বাড়ি বোধ হয় এরকমই হয়। বসার ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে কত বই, কত মূর্তি, পুতুল ও নানা ধরনের জিনিসপত্র। সবুজ কাচের একটি মূর্তির দিকে আমার চোখ আটকে গেল।

"তুমি ভাবছ ওটা কাচের। আসলে ওটা পোড়ামাটির। পোড়ামাটির রং তো লাল। কিন্তু এই শহর ছাড়িয়ে মাইল তিরিশেক দূরে তুমি যদি দোতারা নদীর ধারে যাও দেখবে ওখানকার মাটি নিয়ে হাটুয়ারা পুতুল গড়ছে। ওখানকার মাটি আগুনে পোড়ালেই সবুজ হয়ে যায়।"

কথাটা বিশ্বাস হল না। আমার চোখেমুখে নিশ্চয় একটা অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠছে। না হলে মণিবাবু বলবেন কেন, "ওই মাটির কথা শুধু আমি জানি, আর জানে পটুয়ারা।"

"পোড়ামাটির ওপর সবুজ রং লাগানো হয়নি তো?"

"কী কাণ্ড! যা বললাম বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি তোমাকে দোতারা নদীর ধারে নিয়ে যাব। পটুয়াদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। দেখবে ওরাও ঠিক আমার কথাই বলছে।"

আমি এবার আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম, একদিন আমাদের অস্টিন গাড়িটায় চেপে দোতারা নদী গিয়ে দেখে আসব। তখনই মণিবাবু বলে উঠলেন, "গাড়িতে নয়, পায়ে হেঁটে যাব। তা হলেই অনেক কিছু দেখতে পাবে। পায়ে ধুলো না লাগলে আর ভ্রমণ কিসের?"

"ভারী সুন্দর নাম। দোতারা।" আমি বললাম।

"কে ওই নাম রেখেছে, জানো?"

আমি চুপ করে থাকলাম। জানি না কথাটাও মুখ ফুটে বলতে ইচ্ছে হল না।

"দোতারা বাজিয়ে বাউলরা গান গায়, দেখেছ? নদীর স্রোতেও ওরকম দোতারা বাজে। নদীর আগের নামটা আমিই তাই বদলে দিয়েছি।"

"পুরনো নামটা আপনার মনে আছে?"

"থাকবে না কেন? নামটা বদলে ফেলেছি বলে যে মন থেকেও তাকে মুছে ফেলেছি, তা তো নয়। তুমি জানতে চাইছ, তাই বলছি। ওই নদীর নাম ছিল সহনা। ওই নামটাও সুন্দর। কিন্তু যখন বলি নদীর নাম দোতারা তখন একটা সুর মনের মধ্যে নিজে থেকেই গুনগুন করে ওঠে। বাউলরা যে সুরে গান গায়, সেই সুর। ভাল কথা। সবুজ মূর্তিটা তোমার ভাল লেগেছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওটা আমি তোমাকেই দিয়ে দিলাম।"

"মা বকবেন।"

"কেন?"

"মা বলেছেন, কারও কাছে কিছু চাইবে না।"

"তুমি তো চাওনি। আমিই দিলাম। আমি কী চাই জানো? তোমার মতো ছেলেরা এসে ওই বই, ওই পুতুল সব নিয়ে যাক। আমি আর ওগুলো কতদিন আগলে রাখতে পারব?"

"তখন তো আপনার এই বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাবে?"

"তা কেন? আর কারও বাড়ি তো ভরে উঠবে। ধরো, তোমার বাড়িটাই যদি আমি বই, পুতুল, খেলনা দিয়ে সাজিয়ে দিই?"

"বাবা আমাকে অনেক বই কিনে দিতেন। বলতেন, 'সব বইয়ের মানে তুমি এখন বুঝতে পারবে না। বড় হয়ে পারবে।' মা কলকাতা গেলেই আমার জন্য বই কিনে আনেন। দিদিও অনেক বই আমাকে পড়তে দেয়। বলে, 'এখন থেকেই পড়ার অভ্যেস কর। পরে কাজে লাগবে।' এই তো সেদিন দিদি আমাকে একটা অ্যাটলাস এনে দিল। কত নাম, কত দেশ। দেখে অবাক হয়ে যাই। দোতারা নদীর নাম কিন্তু ওই অ্যাটলাসে নেই।"

"অ্যাটলাসে তুমি ওই নামটা জুড়ে দিয়ো।"

"আমাদের এই শহরটার নামও খুঁজে পাইনি।"

"কত নাম যে বাদ গেছে! তুমি এখন থেকেই সব মনে রেখে দাও। সময় পেলেই তোমার রঙিন অ্যাটলাসে এক-একটা নাম জুড়ে দেবে। নতুন পৃথিবীর নতুন অ্যাটলাস তুমি তৈরি করবে। সেখানে থাকবে তোমার মনের মতো এক-একটা নাম।"

"আপনার নামও আমি লিখে রাখব। লিখে রাখব এই পুতুল ঘরের কথা।"

"নাও, সবুজ মূর্তিটা নিয়ে যাও। তোমার দেরি দেখে মা চিন্তা করবেন। আমি বরং তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"আমি একাই যেতে পারব।"

"ধরো, মহারাজ যদি বড় একটা পাখি হয়ে তোমাকে ওর পিঠে চাপিয়ে হুস করে উড়ে যেত।"

"তা কি সম্ভব?"

"কল্পনা করতে দোষ কী! ধরো, তুমি মণিবাবু হয়ে গেলে, আর আমি হয়ে গেলাম তুমি। পারবে, এরকম কল্পনা করতে পারবে?"

"তা যদি হত, তা হলে তো অনেক আগে থেকেই আমরা সে রকম হয়ে যেতাম।"

"তুমি চাঁদে যাওয়ার কথা ভাবো না?"

"কল্পনায় সত্যিকারের চাঁদ ধরা যায় না।" কথাটা বলেই আমি অবাক হলাম। আমিও এরকম গুরুগম্ভীর কথা বলতে পারি? নাকি কথাটা ফস করে জিভের ডগায় এসে গেল? ভেবেচিন্তে বলিনি?

"নদীর স্রোতে যদি দোতারার সুর শোনা যায়, তা হলে কল্পনাতেই বা আমরা চাঁদকে ধরতে পারব না কেন? এমন কী কঠিন কাজ? আমরা যদি বলি চাঁদের বুড়ি আর চরকা কাটে না, সে আসলে বুড়িও নয়, তার একটা নতুন চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা হলে?"

একফালি চাঁদ দেয় আলোর চেয়েও বেশি অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই আমরা পথ হাঁটছি। আমার হাতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে মহারাজ। ফুরফুরে হাওয়ায় ওর বোধ হয় ঘুম আসছে। বসে-বসে এখন ঢুলছে। আমার আর-এক হাতে সবুজ মূর্তিটা।

পেছনে মণিবাবু। তিনি মূর্তিটা জোর করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। কী কুক্ষণেই যে বলেছিলাম, ওটা আমার ভাল লেগেছে!

যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। মূর্তিটা দেখামাত্রই মা বকতে শুরু করে দিলেন। মূর্তিটা যে আমি চেয়ে আনিনি, বরং মণিবাবুই নিজে আমাকে ওটা উপহার দিয়েছেন, এই কথাটাই মাকে বোঝানো কঠিন।

মণিবাবু উপহার দিয়েছেন? মা আরও রেগে গেলেন। মণিবাবুকে উঁচু গলায় বললেন, "ছেলের অভ্যেস এখন থেকেই খারাপ করে দিচ্ছেন! আমি ওকে এতদিন ধরে শিখিয়ে আসছি কেউ কিছু দিলে নিতে নেই। এতদিন ধরে ও যা শিখল সব ভুল?"

"হ্যাঁ, ভুল।" মণিবাবু সহজে হারবেন না। "এতদিন ধরে যা শিখিয়েছেন, সব ভুল। কারও ভালবাসার দান ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে বীরত্ব নেই। সেটা সুশিক্ষার অভাব।"

এই প্রথম দেখলাম, মায়ের মুখের ওপর কাউকে কথা বলতে। বাবা এমন কোনও পরিস্থিতি হতে দিতেন না, যাতে মায়ের কথার প্রতিবাদ করতে হয়। মণিবাবুই মাকে প্রথম বুঝিয়ে দিলেন, কেউই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।

মণিবাবুর একটা বড় গুণ, কখন কোথায় থামতে হয় তিনি জানেন। কোনও বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা তাঁর পছন্দ নয়। তিনি এবার মাকে নরম গলায় বললেন, "মূর্তিটা রেখে দিন না। অনেক কাজে লাগবে। আপদে-বিপদে লোকের পাশে দাঁড়াতে পারবেন।"

বলার ভঙ্গিতে একটা আবেদন ফুটে উঠেছে। একটা অনুরোধ। পাথরের মনও বোধ হয় এভাবে জয় করা যায়। মূর্তিটা নিয়ে বাড়িতে রাখতে মায়ের আর কোনও আপত্তি আছে বলে মনে হল না। তাঁর কথায় বোঝা গেল, তিনি একটু নরম হয়েছেন।

"মূর্তিটা বাড়িতে রাখলে কী কাজে লাগবে শুনি?"

"আপনার বাড়িতে তো জায়গার অভাব নেই। কোনও একটা জায়গায় রেখে দিন না।"

"ভাল জায়গাতেই রাখতে হবে। মূর্তি বলে কথা।"

মা এবার মূর্তিটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। পোড়ামাটির মূর্তি যে এরকম সবুজ হয়, কে জানত! চোখে না দেখলে কি কেউ বিশ্বাস করবে?

মা প্রশ্ন করলেন, "কিসের মূর্তি বলুন তো? দেখে তো বেশ অদ্ভুত মনে হচ্ছে।"

সুঠাম চেহারার এক পুরুষের মূর্তি। সে দাঁড়িয়ে আছে। তার ছ'টা হাত। এক হাতে পুঁথি, এক হাতে দোয়াত-কলম, এক হাতে একটা চাবি। শালগাছের কচি দুটি পাতা ধরে আছে একটি হাত। বাকি দুটি হাতে ধানের ছড়া ও পাখির একটি পালক। এরকম মূর্তি আগে কখনও দেখিনি। ভারী সুন্দর দেখতে, চোখ জুড়িয়ে যায়।

"এ হল সিকালাদেবের মূর্তি। মানুষকে তিনি দিচ্ছেন বৃক্ষের ছায়া, শান্তি ও জ্ঞান। সিকালাদেবের অনেক কাজ। মানুষকে তিনি শুধু জ্ঞান বিতরণ করেই ক্ষান্ত নন। মানুষ চায় আশ্রয়, চায় শান্তি। না হলে সভ্যতা গড়ে উঠবে কী করে? সিকালাদেব হচ্ছেন পরিপূর্ণ সভ্যতার দেবতা। প্রয়োজনের সময় অন্যের পাশে দাঁড়াতে মানুষকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন।" মণিবাবু বললেন। সিকালাদেবের ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় তাঁর দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"এ কাদের দেবতা?" মা জিজ্ঞেস করলেন।

"সিকালাদেব সকলের। সভ্যতার তাৎপর্য যারা বোঝে তাঁরাই সিকালাদেবের ভক্ত।"

"আগে এই মূর্তি কখনও দেখিনি। সিকালাদেবের কথাও শুনিনি। আপনি ওকে পেলেন কোথায়?"

"আমিই ওই দেবতার নাম রেখেছি সিকালা। ইচ্ছে হলে, আপনি ওঁর অন্য একটা নাম দিতে পারেন। অন্য নামে ডাকলেও সিকালাদেব সেই আগের মতোই থাকবেন। আগের মতোই তিনি মানুষকে বিলিয়ে যাবেন আশ্রয়, জ্ঞান ও শান্তি। সিকালাদেবের মতো একা একজন দেবতা মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির যে দায়িত্ব নিয়েছেন, তা আর অন্য কোনও দেবতার পক্ষে সম্ভব হয়নি।"

মূর্তিটাকে মা আরও খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। টানা-টানা চোখ। মুখে প্রশান্তির উজ্জ্বলতা। বড় মমতা নিয়ে ধরে আছেন প্রতিটি বস্তুকে। শালগাছের কচি পাতাটিকে বাইরের ঝড়ঝাপটার হাত থেকে আড়াল করে রেখেছেন। পাখির পালকে শান্তির সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। মা এবার সিকালাদেবের মূর্তিটাকে আঁচল দিয়ে মুছে খুব যত্ন করে কিউরিও-র আলমারিতে তুলে রাখলেন।

আলমারির চাবি বন্ধ করার সময় একটা ঘটনা ঘটল। মণিবাবু হঠাৎ ছটফট করে উঠলেন। তাঁর দুটো চোখ লাল টকটকে হয়ে গেছে। দু' চোখের মণি যেন ছিটকে এখনই বেরিয়ে যাবে। তাঁর সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। এরই মধ্যে একবার আমার দিকে তাকালেন। আমার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। তারপরই মনে হল, সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই সব ঠিক হয়ে গেল। আমি দেখলাম, দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন মণিবাবু।

প্রথম দিন থেকেই আমরা তাঁর মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছি। তাঁর কথাবার্তা, আচার-আচরণ স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়। মহারাজের সঙ্গে যে-রাত্রে তিনি প্রথম এলেন, সেই তখনও তাঁর কথাবার্তা কেমন যেন হেঁয়ালির মতো মনে হয়েছিল আমাদের। তাই, এখন যেভাবে মুখ ঢেকে বসে আছেন, তা দেখে আমরা অবাক হলাম না। এক সময় দেখলাম, মুখ থেকে তিনি তাঁর হাত দুটো সরিয়ে নিয়েছেন। চোখের লাল রংটাও কেটে গেছে।

কিন্তু আমার শরীরে যেভাবে বিদ্যুৎ বয়ে গেল, যেভাবে কয়েক মুহূর্ত আমি অবশ হয়ে গেলাম, তার ব্যাখ্যা কী? শরীরটা ঠিক আছে, কিন্তু তারপর থেকেই মনে-মনে একটা পরিবর্তনও আমি অনুভব করছি। এই একটু আগেই যেমন সব কিছুতেই ভয় পেতাম, এখন দেখছি সেই ভয়-ভয় ভাবটাই কেটে গেছে। অর্থাৎ, আমি আর আগের মতো ভিতু নই। কী করে সম্ভব হল এই পরিবর্তন?

মণিবাবু নিশ্চয় আমার এই পরিবর্তনটা টের পেয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন, "মান্তু, তুমি কি নতুন কিছু টের পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি, আমার নিজের মধ্যে। মনে হচ্ছে, হঠাৎ আমি বড় হয়ে গেলাম।"

"না, তুমি সেই আগের মতোই আছ। ছোট্ট সেই মান্তু, সব সময় যে ভয় পায়।"

"আমি আর ভয় পাই না। কখনও আর কাউকে ভয় পাব না।"

"জানি। আমি বুঝতে পেরেছি। কোনও ঘটনাকে ভয় পাবে না? ধরো, একটা ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল এখন? কিংবা, বাগানের কাঁঠালগাছটার বড় দুটো ডাল ভেঙে পড়ে বাড়ির ছাদটা ধসিয়ে দিয়ে গেল? ধরো বাজ পড়ে সামনের তালগাছটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল? ভয় পাবে না বলো?"

"বললাম তো না।" আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

"মহারাজকে যদি এখন বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসি, সে যদি অন্ধকারে, দূরে, অনেক দূরে চলে যায়, তা হলে ওকে খুঁজে নিয়ে আসতে পারবে?" মণিবাবু যেন আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন।

"পারব, নিশ্চয় পারব।"

"দ্যাখো, আর-একবার ভেবে দ্যাখো।"

"বারবার একই কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না।"

"তা হলে সত্যিই আমি মহারাজকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসছি। আমি ফিরে আসার পর তুমি ওকে খুঁজতে বেরোবে। ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। এখনও ভেবে দ্যাখো, মহারাজ অনেক দূরে চলে যেতে পারে। সেখান থেকে আধ ঘণ্টায় ফিরে আসা যায় না। কিংবা ধরো, মহারাজ কাছেই কোথাও অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকল। তুমি ওকে খুঁজে পেলে না। খালি হাতে ফিরে এলে, ওদিকে আধ ঘণ্টা সময়ও পেরিয়ে গেল।"

"নিশ্চয় ওকে খুঁজে নিয়ে আসব। ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে। এক সেকেন্ডও দেরি হবে না।"

আমার মধ্যে দারুণ একটা শক্তি এখন ভর করেছে। নিজেকে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, টিয়াচরার পাহাড়ে যে পাথরটা রাস্তায় গড়িয়ে পড়েছিল, আমি নিজেই তা ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতাম। আজও যদি ওরকম ভারী পাথর কোথাও রাস্তা আটকে রাখে, আমি তা ঠেলে সরিয়ে দেব। তার জন্য কারও সাহায্যের দরকার হবে না।

"মান্তু, তুমি অপেক্ষা করো। আমি মহারাজকে নিয়ে বেরোচ্ছি। আমি ফিরে এলেই তুমি রওনা হবে।"

মহারাজকে নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন মণিবাবু।

॥ ৫ ॥

ফিরতে দেরি হচ্ছে মণিবাবুর। কতদূর যে তিনি গেলেন কে জানে!

দিদি বলল, "ফিরে আসবেন তো? ভদ্রলোক যে কী বলেন, কী করেন, তার কি ঠিক আছে?"

মাকেও দেখলাম সন্দেহ প্রকাশ করতে। "হয়তো ফিরবেন। কিন্তু কতক্ষণ পরে, তা বলা মুশকিল।"

মা আবার মূর্তিটার দিকে তাকালেন। আলমারির কাচের ভেতর থেকে সবুজ পান্না ঝিলিক দিচ্ছে। মূর্তিটাও বোধ হয় আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথা শুনছিল। এখন তার আগ্রহ রীতিমত উত্তেজনায় পরিণত হয়েছে। মূর্তিটার চোখে হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল। একটু আগে মণিবাবুর চোখ যেমন করমচার মতো লাল হয়ে গিয়েছিল, এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মূর্তিটার চোখও লাল। মুখের প্রশান্তিটাও নেই। আমি কি ভুল দেখছি?

তখনই মনে হল, আমি আমার কল্পনা দিয়ে মূর্তিটাকে ওভাবে দেখতে চাইছি। মণিবাবুর সঙ্গে এক করে মিলিয়ে দেখছি সিকালাদেবকে। যেন মণিবাবু ও সিকালাদেবের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। দু'জনেই এক। এ আমারই কল্পনা।

এরকম একটা কল্পনা করতে পেরে বেশ আনন্দ পেলাম। নতুন এক আনন্দ। কল্পনার কাছে যুক্তি ম্লান হয়ে যায়। যুক্তির শিকল দিয়ে সব সময় যে নিজেকে বেঁধে রাখা ঠিক নয়, অনেক আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার মানে হয় না, তাও প্রথম অনুভব করতে পারলাম। সত্যিই সেই আগের আমি আর নেই। কিছুক্ষণ আগের আমি, আর এখনকার আমির মধ্যে কত তফাত। মাঝখানে মাত্র কিছুক্ষণের ব্যবধান। তার মধ্যেই এত বড় একটা পরিবর্তন! ভাবা যায় না!

মা বললেন, "মান্তু, তোর এই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার দরকার ছিল না।"

"কিসের চ্যালেঞ্জ?"

"মহারাজকে উনি কোথায় ছেড়ে আসবেন, তারপর তুই সত্যিই ওকে খুঁজে পাবি কি না, মাথা ঠাণ্ডা করে এসব ভেবে দেখা উচিত ছিল। তা না করে তুই রাজি হয়ে গেলি। এখন সারারাত হয়তো আমাদের জেগে বসে থাকতে হবে।"

"মা, চলো আমরা খেয়ে নিই। রাত হয়েছে।" দিদি বলল। "চল মান্তু, খেয়ে নে। তোকে যদি আবার বেরোতেই হয়।"

"আমি এখন খাব না। ধরো, আমি খেতে বসেছি, তখনই মণিবাবু এসে গেলেন। তখন তো ভাতের থালা ফেলে রেখে আমাকে দৌড়তে হবে। একটা মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না।"

"তুইও কি পাগল হয়ে গেলি! ভদ্রলোক কখন আসবেন, আর তাঁর অপেক্ষায় তুই রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকবি, তা কি হয়?" দিদি আমার হাত ধরে টানল। "চল, খাবি চল। বোকার মতো বসে আছিস কেন?"

দিদি যখন আমার হাত ধরে টানল, ঠিক সেই সময় আমার অন্য হাতেও প্রবল একটা টান অনুভব করলাম। দিদি আমার হাত ছেড়ে দেওয়ার পরেও, আর-একটা হাতের টান থেকে গেল। কে আমাকে দরজার দিকে টানছে? আমি তাকিয়ে দেখলাম, মণিবাবু এসে পড়েছেন। সেই উসকোখুসকো চেহারা। কিন্তু দু' চোখে যেন একটা দুষ্টুমি খেলা করছে। নিরুচ্চার একটা চ্যালেঞ্জ তিনি ছুড়ে দিচ্ছেন আমার দিকে। তিনি দেখতে চাইছেন, আমি কতটা সাহসী হয়েছি, কিংবা আদৌ হয়েছি কি না। আজ আমার বড় পরীক্ষা। পরীক্ষায় খাতায় অঙ্কের উত্তর মেলানোর চেয়েও অনেক কঠিন এই পরীক্ষা। এখানে শুধু পাশ, অথবা ফেল। মাঝামাঝি কিছু নেই।

আর-একটা ঘটনা ঘটল। মা ও দিদি একসঙ্গে বলে উঠল, "যা মান্তু। মহারাজকে খুঁজে আনতেই হবে। ঘড়িটা নিয়ে যা। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরতে হবে। আমরা জানি তুই হারবি না।"

বাইরের অন্ধকার আজ আর তত গাঢ় মনে হল না। মনে হল, এখানকার সব পথঘাট, গলিঘুঁজি আমার চেনা। অন্ধকারের মধ্যেও সব ছবি আমার চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠল।

আমাদের এখানে সব রাস্তায় আলো নেই। যেসব রাস্তায় আলো জ্বলে, তা এত ক্ষীণ যে, অন্ধকারটাই বেড়ে যায়। এখন কিন্তু আমার কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না। তা ছাড়া, নতুন আর-একটা অভিজ্ঞতা হল। খেলার মাঠটাকে এখন আর তত বড় মনে হচ্ছে না। অথচ, এই মাঠটাকেই মনে হত কত বড়। চৌধুরিদের দিঘির পাড় দিয়ে যেতে-যেতে মনে হল, দিঘিটাও আগের চেয়ে ছোট হয়ে গেছে। আগে এই দিঘির জলে নামতে ভয় করত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ডুবসাঁতারেই আমি দিঘির এপারের বাঁধাঘাট থেকে ওপারে গিয়ে উঠতে পারব। এখন কোনও কিছুই আমার সাধ্যের বাইরে নয়। আমগাছ, কাঁঠালগাছগুলোর মগডালে ওঠার কথা আগে ভাবতেই পারতাম না। এখন মনে হচ্ছে, এক লাফে আমি ওদের টপকে চলে যাব।

তা বলে মহারাজকে খুঁজে বের করার কাজটা সহজ হয়ে যায়নি। এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। বেশ কয়েকবার "মহারাজ", "মহারাজ" বলে হাঁকও পাড়লাম। কিন্তু কোথায় কী? মহারাজ যদি কাছাকাছি কোথাও থাকত, তা হলে নিশ্চয় আমি ওর সাড়া পেতাম। মণিবাবু সত্যিই মহারাজকে এমন এক জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছেন, যেখান থেকে তাকে অল্প সময়ের মধ্যে খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য।

মহারাজকে উনি ওঁর বাড়িতে রেখে আসেননি তো? আধো-অন্ধকারে হাঁটতে-হাঁটতে ভাবলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা কথাও মনে হল। মণিবাবু আমার বুদ্ধির পরীক্ষা নিচ্ছেন। চালাকি করে তিনি আমাকে হারিয়ে দিতে চান না। তখনই মনে হল, আমাদের বাড়ি থেকে মণিবাবুর বাড়ির দূরত্ব সময়ের হিসেবে কত? যেতে-আসতে আধ ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে। সুতরাং ধরে নিতে পারি, তিনি যদি মহারাজকে ওঁর বাড়িতেই রেখে আসতেন তা হলে আমাকে আধ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিতেন না। ভদ্রলোক আর যাই হোক, আমাকে নিশ্চয় অন্যায়ভাবে হারিয়ে দিতে চান না। আমি নিশ্চিতভাবে ধরে নিলাম, মহারাজকে উনি ওঁর বাড়িতে রেখে আসেননি।

তা হলে কোথায় মহারাজ? এভাবে অন্ধকারে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালে হবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে হবে, কোথায় সে থাকতে পারে। হাটতলার একপাশে ডাকঘর। ডাকঘরের সামনে লেটারবক্স। ওই লেটারবক্সের ধারে দাঁড়িয়ে আমি সাত-পাঁচ ভাবছি। এমন সময় সঞ্জয়দার সঙ্গে দেখা।

"কী রে, রাত্রিবেলা তুই এখানে?"

"মহারাজকে খুঁজছি।"

"বাড়ি থেকে পালিয়েছে বুঝি?"

আমাদের এখানে সঞ্জয়দাকে চেনে না এমন লোক নেই। রীতিমত ডানপিটে। সুন্দরবনে গিয়ে একবার একটা বাঘের বাচ্চা ধরে এনেছিলেন। ধরে এনেছিলেন এ-কথা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। বাচ্চাটাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সঞ্জয়দা চেষ্টার ত্রুটি করেননি। সঞ্জয়দা নিজেই বলেছেন, সারা সুন্দরবন তন্নতন্ন করে খুঁজেও তিনি নাকি সেই বাঘিনীর দেখা পাননি।

এ সেই বছর-দুয়েক আগের কথা। সঞ্জয়দার কথা আমার বিশ্বাস হয়নি। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "অত বড় সুন্দরবন। তার পুরোটা খুঁজে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ রে। বিশ্বাস কর, সত্যিই দেখেছি।"

"সুন্দরবনে নাকি কেউ ঢুকতে পারে না?"

"আমি তো ঢুকেছি?"

"একটাও বাঘের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?"

"হয়েছিল। তবে তারা মানুষখেকো নয় বলেই আমার ধারণা। আসলে আমি বাচ্চার মাকে খুঁজতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, অন্য বাঘদের দিকে তাকিয়েও দেখিনি।"

"তা কী করে হয়? অন্য বাঘরা আপনাকে ছেড়ে দিল?"

"আমার কোলে বাঘের বাচ্চাটা ছিল। তাই হয়তো কিছু করেনি। ওরা ভেবেছিল, আমি বাঘের বন্ধু।"

"বাঘের বাচ্চাটাও ওর মাকে চিনতে পারেনি?"

"চিনতে পারলে কি আর ওকে সঙ্গে করে আনতাম? মায়ের কাছেই ফিরিয়ে দিতাম।"

"ওর বাবার সঙ্গেও আপনার দেখা হয়নি? তার কাছেও তো ফিরিয়ে দেওয়া যেত।"

"কী করব বল? বাচ্চাটা যে আমার কোল থেকে নামতেই চাইল না। ওকে কোলে নিয়েই ফিরে আসতে হল।"

সঞ্জয়দার বাঘের বাচ্চাটাকে দেখার জন্য ছেলেরা ওঁর বাড়িতে ভিড় করত। পোষা কুকুরের মতো বাঘের বাচ্চাটা ওঁর বাড়িতে ঘুরে বেড়াত। বোতলে করে ওকে দুধ খাওয়াতেন সঞ্জয়দা। তুলতুলে, নরম একটা বাচ্চা। এক মুহূর্তের জন্যও সঞ্জয়দার কাছছাড়া হত না।

সঞ্জয়দা বলতেন, "কী মুশকিল বল তো! আমারও তো কাজকর্ম আছে। কিন্তু কিশোরকে বোঝায় কে!"

সঞ্জয়দা বাঘের বাচ্চার নাম রেখেছিলেন কিশোর। কিশোরকে তিনি সাইকেলের রডে বসিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তুলোর মতো শরীর। দেখলেই মনে হত, গা টিপে দিই, একটু আদর করি। কিন্তু গায়ের ডোরাকাটা দাগটা দেখে আর সাহস হত না।

তখন সঞ্জয়দার ওই একটাই কাজ। কিশোরকে সাইকেলের রডে বসিয়ে টো-টো করে সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন। সামনের ছোট্ট দুটো থাবা দিয়ে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা ধরে থাকত কিশোর।

এরই মধ্যে সঞ্জয়দা একদিন চাকরি পেয়ে গেলেন কোলিয়ারিতে। হাজিরাবাবুর চাকরি। খাদে ক'জন শ্রমিক নামছেন, ক'জন উঠছেন এসব হিসেব তাঁকে রাখতে হত। তাঁর কাছে হাজিরা দিয়ে তবেই শ্রমিকরা খাদে নামতে পারতেন।

চাকরি পেয়ে কিন্তু আনন্দের চেয়ে দুঃখই বেশি হয়েছিল সঞ্জয়দার। দুঃখ কিশোরের জন্য। সে বেচারা সঞ্জয়দাকে ছাড়া

আর কাউকে চেনে না। সঞ্জয়দার বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই কিশোরকে ভালবাসত। কিশোর যে তা বুঝত না, তা নয়। কিন্তু সঞ্জয়দা ছাড়া আর কারও কাছেই সে যেত না। এদিকে সে একটু বড়ও হয়েছিল। শুধু দুধ খেয়ে আর তার পেট ভরত না। ওকে ভাত, রুটি এসব খাওয়ানোর অভ্যেস করাচ্ছিলেন সঞ্জয়দা। এমন সময় তাঁর ওই চাকরি। সকাল থেকে দুপুর, মাঝখানে দু' ঘণ্টা খাওয়াদাওয়ার বিরতি, তারপর আবার খাদের মুখে গিয়ে বসতে হত সঞ্জয়দাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি দেখতেন ডুলি নামছে, আর উঠছে। সেই ডুলিতে শ্রমিকরা নামছেন সেফটি ল্যাম্প নিয়ে কোলিয়ারির গভীর অন্ধকারে, আর সেই ডুলিটাই অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসছে আর-এক দল শ্রমিককে। এক দলের কাজ শুরু তো, আর-এক দলের ছুটি। সব হিসেব থাকত সঞ্জয়দার খাতায়। সঞ্জয়দা আর তখন আমাদের সঞ্জয়দা নন, তিনি তখন জবরদস্ত হাজিরাবাবু। তাঁর হাজিরাখাতায় শ্রমিকদের নাম ওঠা না-ওঠার সঙ্গে তাঁদের ভাগ্যের সবটাই ছিল জড়িয়ে।

এদিকে কিশোরের সময় আর কাটে না। গায়ে-গতরে একটু বড় হলেও সে তখনও আসলে সেই বাচ্চাটিই থেকে গেছে। সে তখনও চায় সাইকেলের রডে চেপে ঘুরে বেড়াতে, সঞ্জয়দার হাত থেকে ভাত-রুটি খেতে। কিন্তু তা তো আর হওয়ার নয়। একদিন কিশোর আর সহ্য করতে না পেরে সঞ্জয়দার বাবাকে তাড়া করল। সঞ্জয়দার বাবা তখন ওকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এক ঝটকায় সঞ্জয়দার বাবার কোল থেকে নেমে কিশোর গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল—হালুম। যেন তোপ দাগা হল। বাড়ির বড়রাও ভয়ে কেঁপে উঠলেন। কিশোর এর বেশি কিছু করেনি। হয়তো করতে পারত। কারণ, তার নখগুলো তখন একটু শক্ত ও ধারালো হয়ে উঠেছে। থাবার জোরও বেড়েছে বেশি। কিন্তু একবার সে জোর গলায় তার আপত্তি জানিয়ে চুপ করে গেল। শক্তিটাকে সংহত রাখল। সঞ্জয়দা বাড়ি ফিরেছিলেন তারও অনেক পরে।

বাড়ি ফেরামাত্রই ওঁকে ঘটনাটা প্রথম জানান ওঁর মা।

"না বাপু, ওকে আর বাড়িতে রাখা ঠিক নয়।"

"তা বলে, একটু রাগ দেখাতেও পারবে না?" সঞ্জয়দা কিশোরকে ডেকে কোলে তুলে নিতে-নিতে বলেছিলেন।

"বাঘের রাগ বলে কথা। কখন না সাঙ্ঘাতিক কিছু করে বসে—"

"ওইটুকু তো বাচ্চা। ও আর সাঙ্ঘাতিক কী করবে?"

"বিশ্বাস না হয়, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর।" মা কোনও আপত্তি-ওজরই শুনবেন না।

সঞ্জয়দার বাবা কমলেশবাবু বললেন, "আজ বরাত ভাল যে বেঁচে গেছি। তুই ওকে বিদেয় কর।"

সঞ্জয়দার ভাই ও বোনের তাতে আপত্তি। কিশোরকেও দেখা গেল সঞ্জয়দার কোলে বসে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। তার কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সঞ্জয়দার মা আবার বলে উঠলেন, "ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। তোর বাবা যা বলছেন, তাই কর। ওকে কোনও চিড়িয়াখানায় দিয়ে আয়। না হয় সার্কাসের দলে বিক্রি করে দে।"

সঞ্জয়দার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, কিশোরকে আর রাখা যাবে না। দু' দিনের ছুটি নিয়ে আবার ওকে সুন্দরবনে রেখে এলেন।

তাতেই যদি ওঁর মন ভাল হয়ে যেত তা হলে আর বলার কিছু থাকত না। সারাদিন সঞ্জয়দা মুখ গোমড়া করে থাকেন। চাকরিতে যান, বাড়ি ফেরেন। কিন্তু বাড়ি ফিরেই বুঝতে পারেন, কে যেন তাঁর জীবন থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে। সুন্দরবনে ফিরে গিয়েও তিনি যদি "কিশোর" "কিশোর" বলে ডাকেন, তা হলেও ওর আর সাড়া পাবেন না। বড় অভিমান নিয়ে সে চলে গেছে। সে আর দেখা দেবে না।

এর পর চাকরিতেও মন দিতে পারলেন না সঞ্জয়দা। চাকরি ছেড়ে দিয়ে একা-একা ঘুরে বেড়ান। এখন আর সাইকেলেও চাপেন না। দিন নেই, রাত নেই, শুধু ঘুরছেন আর ঘুরছেন। হাটতলার আলো-আঁধারে তাই ওঁকে দেখে অবাক হইনি। সঞ্জয়দা আবার প্রশ্ন করলেন, "চুপ করে আছিস কেন? মহারাজ কি পালিয়েছে? না,দুষ্টুমি করার জন্য তোরা ওকে শাস্তি দিয়েছিস?"

"আমি ওকে খুঁজছি। আর সময় নেই।"

"চল, আমিও তোর সঙ্গে যাই।"

"তোমাকে আসতে হবে না।"

"কেন, শুনি? কথা গোপন করছিস কেন? যা বলার স্পষ্ট করে বল।"

"আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। মহারাজকে আধ ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করব।"

"আমার তো এতদিন কেটে গেল। এখনও খুঁজে বের করতে পারলাম না।"

"সুন্দরবনে গেলেই পারতে। গেলে না কেন?"

"গেলেও কি আর দেখা পেতাম?"

"আমি কিন্তু মহারাজের দেখা পাব। চলি।"

"এই মান্তু, শোন। আমি তোর সঙ্গে যাব।"

সঞ্জয়দার জন্য অপেক্ষা না করে আমি সোজা বাড়িতে চলে এলাম। মণিবাবু বসে আছেন গুম হয়ে। মা বসে ছিলেন ঘরের এক কোণে। তাঁর সামনে দিদি। আমাকে দেখেই দিদি আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

"কী রে, পেলি?"

মায়ের খুশিও চাপা থাকল না। "ঠিক সময়েই এসে গিয়েছিস মান্তু।"

তারপরই দু'জনকে কেমন যেন হতাশ মনে হল। দিদি দেখতে পেয়েছে, মহারাজ আমার সঙ্গে নেই। মা বুঝতে পেরেছেন, মহারাজকে আমি খুঁজে পাইনি। যদি পেতাম, তা হলে মহারাজ আমার সঙ্গেই থাকত। রোজকার মতো এখনও সে আমার হাতের মুঠোয় বসে থাকত।

আমি কিন্তু হতাশ হইনি। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমি এখনও হেরে যাইনি। ঠিক এই মুহূর্তে মণিবাবুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। আমি বললাম, "মহারাজকে আপনার ওই ঢোলা পাঞ্জাবির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। ওকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন।"

ঘরে যেন বাজ পড়ল। মণিবাবু চমকে উঠলেন। চমকে উঠলেন মা। মণিবাবুর কাছে গিয়ে দিদি বলল, "আর একটুও দেরি না করে মহারাজকে ছেড়ে দিন। আপনি ওকে বন্দি করে রেখেছেন। ওর যদি কোনও ক্ষতি হয়, তা হলে আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব না।"

হোহো করে হেসে উঠলেন মণিবাবু। হাসতে-হাসতে বললেন, "আমি খুশি। দারুণ খুশি। মান্তুর দিব্যজ্ঞান হয়েছে। ওকে ফাঁকি দিতে পারবে না।" তিনি পাঞ্জাবির ভেতর থেকে মহারাজকে বের করে আনলেন। মহারাজ খুশিতে ডানা ঝাপটে সোজা আমার কাছে চলে এল।

আমার দিব্যজ্ঞান হয়েছে কি না জানি না। দিব্যদৃষ্টি বলে নাকি একটা কথাও আছে। কিন্তু কী করে বুঝতে পারলাম, মণিবাবু নিজের কাছে মহারাজকে লুকিয়ে রেখেছেন? তাও জানি না। জানার কি সত্যিই দরকার আছে? মহারাজ যে এখন আমার হাতের মুঠোয় এসে আশ্রয় নিয়েছে, আমার কাছে শুধু ওই ছবিটাই চিরদিনের জন্য থেকে যাবে। মহারাজের ডানা ও পালকের যত রং, এই ছবিটাও ঠিক তত রঙেই রঙিন।

॥ ৬ ॥

সঞ্জয়দার সঙ্গে পরে আবার আমার দেখা হয়েছিল। বেশ

কিছুদিন পরে। উনি আমাকে ওঁর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। গেটে ঢোকার মুখেই একটা চমক আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। লেখা আছে, 'বিওয়ার অব কোবরাজ'! বাড়িতে গোখরো সাপ আছে? সাপ পুষেছেন সঞ্জয়দা?

লোকেরা কুকুর পুষলে গেটে কিংবা বাইরের দরজায় লিখে রাখে, 'বিওয়ার অব ডগ'। সঞ্জয়দা যখন বাঘ পুষেছিলেন তখন কিন্তু গেটের বাইরে লিখে রাখেননি, 'সাবধান, বাড়িতে বাঘ আছে'। বাঘের বাচ্চার চেয়ে গোখরো সাপ নিশ্চয় আরও বিপজ্জনক। লেখাটা পড়েই তাই কেমন যেন অস্বস্তি হল। সঞ্জয়দাকে বিশ্বাস নেই। বাড়িতেই হয়তো সাপ ছেড়ে রেখেছেন!

কিন্তু অস্বস্তিটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের। মনের মধ্যে কে আমাকে বলে উঠল, "মাস্তু, তুমি তো আর ভয় পাও না। তা হলে গেটের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলে কেন?" তখনই আমি এগিয়ে গেলাম। সঞ্জয়দা আমার পেছনে।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, "সাপকে তুই ভয় পাস না?"

"না। ভয় পাব কেন?"

"যদি ছোবল দেয়?"

"শুধু সাপ নয়, আমি কাউকেই ভয় পাই না।"

"এই যে আমরা বাগান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, মনে কর, ঘাসের আড়ালে সাপ লুকিয়ে আছে। বিষধর সাপ। তুই না জেনেই সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেললি। তখন?"

"তোমার বাগানটা তো খুব পরিষ্কার। সাপের লুকনোর জায়গা দেখছি না।"

সঞ্জয়দা এবার আমার কাঁধে হাত রাখলেন। কাঁধটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, "তোকে একটু পরীক্ষা করে দেখলাম। শোন, কিশোর চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন আমি মনমরা হয়ে পড়েছিলাম। তখন আর কিছুই ভাল লাগত না। চাকরিটাও ছেড়ে দিলাম। বাড়িতে সবাই আপত্তি করেছিল। কিন্তু কারও কথাই শুনিনি। আমি যে কিশোরকে রাখতে চেয়েছিলাম, তা কি ওরা শুনেছিল? আমার কথায় কি আমল দিয়েছিল? আমিই বা ওদের কথা শুনতে যাব কেন?"

"কিন্তু তুমি সাপ পুষলে কেন শুনি?"

শোন না, সেটাই তো বলছি। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতাম। সেবার লোহাডাঙা স্টেশনে কী ঘটল শোন। ছোট্ট স্টেশনের নিচু প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া একটা বটগাছ। তার ছায়া পড়েছে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে। গ্রীষ্মের ঠা-ঠা দুপুরে ওই বেঞ্চে আমি ঘুমিয়ে আছি, স্টেশন দিয়ে তেমন লোকজন যাতায়াত করে না। তার ওপর আবার একটু আগেই ট্রেন চলে গিয়েছে। পরের ট্রেন আসবে সেই মাঝরাতে। বলতে পারিস, কেউ কোথাও নেই। স্টেশনমাস্টার, টিকিটবাবু, ঘণ্টাঅলা সবাই তখন বাড়িতে গিয়ে ঘুমোচ্ছে। এমন সময় আমার কানের কাছে হঠাৎ একটা শব্দ। ফোঁস। এক ঝলক গরম বাতাস আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। আবার সেই শব্দ—ফোঁস।

এবার আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। দেখলাম, বিশাল ফণা তুলে আমার হাঁটুর সমান সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক শঙ্খচূড়। আমি জেগে না উঠলে হয়তো আমার মাথাতেই ছোবল দিত। কী করব বুঝতে পারছি না। এমন সময় পেছন থেকে খিলখিল করে হাসির শব্দ ভেসে এল। আমি মরতে বসেছি, আর আমার এই অবস্থা দেখে কার হাসি পাচ্ছে? এমন অবস্থা যে পেছন ফিরেও তাকাতে পারছি না। সাপটাকে চোখে-চোখে রাখতে হচ্ছে।

"সে এক বিশ্রী অবস্থা। পেছন থেকে ডাক শুনতে পেলাম, "বাবু, ও বাবু"। এবার সত্যিই পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, দুটি ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে এক বেদে ও বেদেনি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সাপের কয়েকটা ঝাঁপি। বুঝতে দেরি হল না, মজা করার জন্য ওরাই ওই শঙ্খচূড়টা আমার কানের কাছে ছেড়ে দিয়েছে। ঘুমিয়ে ছিলাম বলে আমি কিছু টের পাইনি।"

"ওরাই কি তোমাকে সাপ পুষতে শেখাল?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আমার তো যাওয়ার কোনও জায়গা ছিল না। বাড়ি ফেরার কথা ভাবতেও খারাপ লাগত। বারবার মনে হত, কিশোর নেই, আমি আর বাড়ি ফিরে কী করব। বেদেদের সঙ্গেই গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ওরা কী করে সাপ ধরে, সাপের বিষদাঁত ভাঙে—সব আমি ওদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখেছি। তুই শুনলে হয়তো অবাক হবি মাস্তু, গোখরো, শঙ্খচূড়ের মতো বিষধর সাপও আমি ধরতে পারি। আমি নিজে কত সাপের যে বিষদাঁত ভেঙেছি।"

"তুমি নিশ্চয় সাপ নিয়ে খেলা দেখাতেও পারো?"

আমরা এখন সঞ্জয়দার বসার ঘরে কথা বলছি। বসার ঘরের আলমারিতে অনেকে বই, পুতুল ইত্যাদি সাজিয়ে রাখে। সঞ্জয়দা সাজিয়ে রেখেছেন কয়েকটা সাপ। আলমারির বদলে ঘরে কয়েকটা কাচের বাক্স। তার মধ্যেই সাপগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। জেগে আছে, না ঘুমোচ্ছে বোঝার উপায় নেই। একটা সাপকেই শুধু একটু-একটু নড়তে দেখলাম। সেটাও একটা শঙ্খচূড়।

"জানিস মাস্তু, বেদেরা আমাকে একটা সাপের ঝাঁপি দিয়েছিল। চলে আসার সময় সেই ঝাঁপির সাপগুলো সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

"সাপগুলো তো কাচের বাক্সে রেখেছ। তা হলে গেটের বাইরে কেন লিখে রেখেছ, বিওয়ার অব কোবরাজ? সাপগুলো তো আর কাচের বাক্স ছেড়ে বেরিয়ে আসছে না।"

"পোষা কুকুরও তো অনেক সময় শেকল বাঁধা থাকে। তাও তো দরজায় লিখে রাখতে হয়, কুকুর হইতে সাবধান।"

সাপ নিয়ে আর বেশি কথা বলতে ভাল লাগছিল না। সঞ্জয়দাকে বললাম, "যাক, তুমি যে আবার বাড়ি ফিরে এসেছ এটাই বড় কথা।"

"বাড়ি ফিরে এলেও পুরনো দিনগুলো তো আর ফিরে পাইনি। আগে যেমন কিশোরকে সাইকেলের রডে বসিয়ে সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়াতাম, এখনও সেরকম ইচ্ছে হয়।"

"বলো কী! সাইকেলের হ্যান্ডেলে একটা সাপ কিলবিল করছে, আর তুমি সেই সাইকেলটা চালাচ্ছ, এটা ভাবতেই কেমন লাগে।"

"আমি একটা ময়াল সাপ ধরে এনেছি। টিয়াচরার পাহাড় থেকে। ভাবছি, সাপটাকে সাইকেলের হ্যান্ডেলে জড়িয়ে ঘুরে বেড়াব। লোকেরা যেন বুঝতে পারে, তাদের সঞ্জয় এতটুকু বদলায়নি।"

টিয়াচরার পাহাড়ের প্রসঙ্গ উঠতেই আমার সেই সন্ধেবেলার ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে বড় একটা পাথর। রাস্তার বাঁ দিকে খাড়া পাহাড়, ডান দিকে গর্ত। পাথর সরিয়ে এক চুলও যাওয়ার উপায় নেই। তার ওপর আবার গাড়িটাও বেঁকে বসেছে। নেমে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার। গল্পে-পড়া নায়কের মতোই হঠাৎ তখন এসে পড়লেন এক শক্তিশালী পুরুষ। পাথরটাকে ঠেলে তিনি সরিয়ে দিলেন। নিজের জিপে আমাদের পৌঁছে দিলেন বাড়ি। গল্পে কিংবা সিনেমার পরদাতেই বোধ হয় এরকম ঘটনা ঘটে।

আমি পুরো ঘটনাটা সঞ্জয়দাকে বললাম। বললাম, মহারাজের কথা। অনেক রাত্রে সে কেমন ফিরে এল অদ্ভুত এক ভদ্রলোককে নিয়ে, সে-কথাও জানাতে ভুললাম না।

"এখানকার প্রায় সবাইকেই তো আমি চিনি। তা, ওই ভদ্রলোকের নাম কী বলো তো?"

"মণিময় সান্যাল। মণিবাবু।"

"হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। উনি নিজে এসে

আমার সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছেন। এই তো সেদিন। গেটের বাইরের লেখাটা পড়েই তাঁর কৌতূহল হয়। তারপর দরজা ঠেলে সোজা ভেতরে চলে আসেন।"

"ভদ্রলোক নিজেই দেখছি ঘুরে-ঘুরে সবার বাড়ি যান।"

"নতুন কিছু চোখে পড়লেই তিনি আর না এসে পারেন না।"

"কিন্তু আমাদের বাড়িতে তিনি আর নতুন কী দেখলেন!"

"ম্যাকাও পাখিটাকে হয়তো ওঁর ভাল লেগেছিল। আমাজনের অরণ্যের একটা জ্বলজ্যান্ত ম্যাকাওয়ের দেখা পাওয়া তো কম কথা নয়। কোলিয়ারির লোকেরা তো আর ম্যাকাও পোষে না। তোরাই ব্যতিক্রম।"

"ভদ্রলোক আমাকে একটা সবুজ মূর্তি উপহার দিয়েছেন।"

"আমাকে সে-কথা বলেছেন।"

"আমার কথা বলেছেন?"

"হ্যাঁ! বলেছেন, 'আমার বাড়িতে তো এত ছেলে আসে, এত লোক আসে, কিন্তু সবুজ মূর্তিটা শুধু ওই ছেলেটারই ভাল লেগে গেল। ওকেই মূর্তিটা দিয়ে দিলাম। ওর কাছেই মূর্তিটা ভাল থাকবে।' আরও কী সব যেন বলছিলেন।"

"আমি কিন্তু মূর্তিটা নিতে চাইনি।"

"আমিও কি ওঁর বাগান আর পুকুরটা নিতে চেয়েছিলাম। ওঁর বাগানে কত ফুল, কত গাছ। পুকুরে কত শালুক, কত পাখি। মাছরাঙা, পানকৌড়ি। দেখে খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু যেই বললাম, 'ভারী সুন্দর', তক্ষনই উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমাকেই দিলাম। এ-সবই তোমার। তোমার জন্যই এগুলো আমি এতদিন ধরে সাজিয়ে রেখেছি।' আমি তো অবাক। পুকুর, বাগান—এসব নিয়ে আমি কী করব? আমি নিতে চাইনি। কিন্তু আমার কোনও আপত্তিই উনি শুনতে চাইলেন না। এই তো কিছুক্ষণ আগে এসে দলিলটা দিয়ে গেলেন। বাগান ও পুকুর তিনি আমার নামে দলিল করে দিয়েছেন।"

"যত শুনছি, ততই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।"

"উনি যদি কিছু দান না করতেন, তা হলে কি তুই ওঁকে শ্রদ্ধা করতিস না?"

"করতাম। যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, সেটুকুই ওঁকে শ্রদ্ধা করার পক্ষে যথেষ্ট। তবে, সবুজ মূর্তিটা ছাড়াও তিনি আমাকে আর-একটা জিনিস দান করেছেন। মূর্তিটার চেয়ে তার দাম অনেক বেশি।"

"কী? তোকে আর কী দিয়েছেন?"

"আত্মবিশ্বাস। আমার ভয়টাই উনি কাটিয়ে দিয়েছেন। সবুজ মূর্তিটা নিয়ে মা যখন আলমারিতে রাখছিলেন, সেই সময় একটা ঘটনা ঘটল। মণিবাবুর সারা শরীর কেঁপে উঠল থরথর করে। তারই মধ্যে তিনি একবার আমার চোখের দিকে তাকালেন। আমার সারা শরীরে বয়ে গেল বিদ্যুৎ। মুহূর্তের মধ্যে কী একটা পরিবর্তন ঘটে গেল আমার মধ্যে। ঠিক তার আগে পর্যন্ত আমি খুব ভিতু ছিলাম। হঠাৎ আমার সেই ভয়-ভয় ভাবটাই কেটে গেল। আমার মনে হয়, মণিবাবু আমাকে বদলে দিয়েছেন।"

"উনি তোর সম্বন্ধে কী বলেছেন, জানিস? বলেছেন, 'আমার উত্তরাধিকারী, আমার সব শক্তি আমি এখন ওকেই দিয়ে রাখছি। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন অবশ্য আমার শক্তিটা ফুরিয়ে যাবে না। কিন্তু এখন থেকেই মান্তু তার অংশ পাবে।' কথাটা শুনে আমার ভাল লেগেছে। উনি তোকে খুব ভালবাসেন।"

"আমি তা বুঝতে পারি। কিন্তু এসব কথা উনি তোমাকে বলতে গেলেন কেন? কই, আমাকে তো কিছু বলেননি?"

"তুই একটু-একটু করে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারবি, সেটাই হয়তো তিনি চান। তাই তোকে আর মুখ ফুটে কিছু বলেননি।"

"কিন্তু তোমাকেই বা বলতে যাবেন কেন? এটাই তো বুঝতে পারছি না।"

"উনি জানেন, তোর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ। তাই, আমাকে বলা মানেই তোকে বলা'।"

"এটা আবার কেমন যুক্তি ? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাই বা ঘনিষ্ঠ হল কখন ? তোমার সঙ্গে তো আমার দেখা-সাক্ষাৎই হয় না।"

"সব সময় দেখা হলেই যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবে তার কী মানে আছে ? দূরে থাকলেই একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মাতে পারে। তাতে সম্পর্কটা আরও গভীর হয়। বড় হলে এসব কথা তুই আরও ভাল করে বুঝতে পারবি।"

"তুমি ঠিক বোঝাতে পারছ না।"

"এখন তোকে কিছু বুঝতেও হবে না। তোর তো দাদা নেই। ধর, আমিই তোর দাদা।"

সঞ্জয়দার দিকে আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। উনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "আজ থেকে তুই আমার নিজের ভাই।"

"তোমাকে তো আমি দাদা বলেই ডাকি। তুমি আমার নিজের দাদা।"

আবেগ এমন একটা বস্তু যা সহজেই সংক্রামিত হয়। সঞ্জয়দার আবেগ-অনুভূতি আমাকেই ভাসিয়ে দিল। কতক্ষণ পর জানি না, এক সময় সঞ্জয়দা বললেন, "শোন, আজ থেকে আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল।"

"কিসের দায়িত্ব ?"

"আমাদের দু'জনকেই একটা কাজ করতে হবে। কাজটা কঠিন, আর তা করতে হবে একেবারে গোপনে। মণিবাবু যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না পান।"

"কী কাজ, সেটাই বলো না !"

"মণিবাবুর শক্তিটা যে কী, সেটাই আমাদের জানতে হবে।"

"ওঁর কি বিশেষ কোনও শক্তি আছে ?"

"না হলে বলবেন কেন, 'আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন আমার শক্তিটা ফুরিয়ে যাবে না ?' কী সেই শক্তি, যার অংশ তুই এখন থেকেই পাচ্ছিস ?"

"কথাটা ভেবে দেখার মতো। বিশেষ কোনও একটা শক্তি না থাকলে উনি কেন তা বলতে যাবেন ?"

"আবেগের মুহূর্তে বলে বসেছেন। কিন্তু পুরোটা ভেঙে বলেননি।"

"ওঁকে কিছু জিজ্ঞেসও করা যাবে না।"

"তাই কি জিজ্ঞেস করা যায়, না, উনি উত্তর দেবেন ?"

"তা হলে ?"

"উপায় একটা বের করতেই হবে।"

আমরা দুই ভাই তারই শপথ নিলাম।

॥ ৭ ॥

"আমার শক্তিটা আসলে কী, কোথায় তার উৎস, তোমরা জানতে চাইছ। তাই না ?"

মণিবাবুর কথা শুনে আমি অবাক হলাম। হলেন না সঞ্জয়দা। দুপুরবেলা আমরা দু'জন ওঁর বাড়ি এসে দেখলাম ইজিচেয়ারে বসে উনি বই পড়ছেন। বই থেকে চোখ না তুলেই উনি ওই প্রশ্ন করলেন। "আপনি কি ঘরে বসেই সব টের পান ? কোথায় কে কী করছে, কী বলছে—সব আপনি বুঝতে পারেন ?"

আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না মণিবাবু। বইটা পাশের টেবিলে রেখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন সঞ্জয়দা। কিন্তু মণিবাবুর দৃষ্টি ওঁর দিকে নেই। তিনি শুধু আমাকেই দেখছেন। "কার কী শক্তি জানতে হলে নিজেকেও শক্তিমান হতে হয়। কথাটা তুমি নিশ্চয় মানবে ?" আমার দিকেই প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন মণিবাবু।

"শক্তি তো একরকমের হয় না। নানারকমের শক্তি।" আমার হয়ে উত্তর দিলেন সঞ্জয়দা।

"আমার মনে হয় তোমাদেরও শক্তি কিছু কম নেই। শুধু এখনও পর্যন্ত তা প্রয়োগ করার সুযোগ তোমরা পাওনি। জেনে রাখবে, মানুষের বুদ্ধিও একটা শক্তি। এতদিন পর্যন্ত পরীক্ষার খাতাতেই তোমরা তোমাদের বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ।"

"না, লেখাপড়ায় আমি তেমন ভাল ছিলাম না। পরীক্ষা দিতে আমার ভাল লাগত না।" সঞ্জয়দা বললেন।

"জানি। তাই বি.এ. পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় তুমি বসোনি। বাড়ির লোকেরা ভাবত, তুমি পরীক্ষা দিতে গেছ। কিন্তু তুমি তোমার সাইকেলে চলে যেতে টুলং নদীর ধারে। এখান থেকে পশ্চিম দিকে মাইলপঁচিশেক পথ। পরীক্ষার সময় তুমি নদীর ধারে বসে থাকতে। মনে-মনে হিসেব করে নিতে, কখন পরীক্ষাশেষের ঘন্টা বাজবে। তখনই তুমি আবার সাইকেলে বাড়ি রওনা হতে।"

"তাই বুঝি সঞ্জয়দা ? আমি তো তোমার এ-খবরও কখনও পাইনি।"

"টুলং নদীর ওপারে পাহাড়। আমার ইচ্ছে হত, টুলং নদীর হাঁটুজল পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ে হারিয়ে যাই। কিন্তু সময় পাইনি।" সঞ্জয়দা বললেন।

"হারিয়ে যাওয়ার জন্য আবার সময়ের কী দরকার ?" মণিবাবু ইজিচেয়ার ছেড়ে খোলা জানলার ধারে যেতে-যেতে বললেন।

এখন দুপুর। পৃথিবী নির্জন, শান্ত। পাতলা, নরম রেশমের চাদরের মতো রোদ কাঁপছে। মৃদু হাওয়ায় অল্প-অল্প কাঁপছে গাছের পাতা, পাখির পালক। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে এই ছবি দেখতে-দেখতে মণিবাবু ভাবছিলেন, এখানকার ক'জন ছেলেই বা প্রকৃতির এই রং ও রেখার খোঁজ রাখে ? টুলং নদীর উৎস খুঁজে বের করার আগ্রহই বা কার আছে ? ওই যে টিয়াচরার পাহাড়, ওখানে তো ছেলেরা দিব্যি রক ক্লাইম্বিং করতে পারে। কিন্তু কোথায় ওরা ? গরম বাতাসের বেলুনে কেউ কি এখানে আকাশে উড়তে চাইবে ? দেখতে চাইবে, প্রথম মানুষ কীভাবে আকাশে উড়েছিল ? ভাবলেই ওঁর কষ্ট হয়। শুধু পরীক্ষা, আর পরীক্ষা। তারপরই ছেলেরা হারিয়ে যায়। ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে তখন আর লাস্ট বয়ের কোনও তফাত থাকে না। হারিয়ে-যাওয়া মানুষের সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকে।

মণিবাবু এবার জানলা থেকে সরে এসে আমাদের বললেন, "নর্মাল ইজ বোরিং ! সেদিন কার টি-শার্টে লেখাটা দেখলাম ?"

সঞ্জয়দা বললেন, "সৌমেনের। আমেরিকা থেকে ওর দাদা পাঠিয়েছে।"

"কিন্তু সৌমেন করছেটা কী ? শুধু ওই টি-শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর স্কুলের পড়া করছে ? রাত জেগে মুখস্থ করছে বই আর ক্লাসের নোট। আমার বলার কথা একটাই। নেভার লেট স্কুল ইন্টারফেয়ার উইদ ইওর এডুকেশন। তোমাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে স্কুলকে নাক গলাতে দিয়ো না।"

"আমি তো লেখাপড়ার পাট সেই কবে চুকিয়ে দিয়েছি।" সঞ্জয়দা বললেন।

"এখনই তো আসল লেখাপড়ার সময়। যে-বুদ্ধিটা নিয়ে তুমি জন্মেছ, সেটা একবার যাচাই করে দেখবে না ? সাইকেলের রডে একটা ময়াল সাপকে চাপিয়ে টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোর কথা না ভেবে, বরং যাও না একবার টুলং নদীর ওপারটা দেখে এসো।"

"আমি তো যেতেই চাই। চল, মান্তু। তুই আর আমি একদিন বেরিয়ে পড়ি।"

"একদিন কেন ? আজকেই কেন নয় ?"

"এখন তো দুপুর। পৌঁছতে-পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। তারপর নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে-যেতেই সন্ধে। ফিরব কখন ? চারপাশটা ঘুরে দেখতেও তো সময় লাগবে।"

"এই তোমাদের দোষ। কোথাও যাওয়ার আগেই ফেরার কথাটা ভাবতে বসো। আমি বলছি, ফেরার কথা ভেবো না। কোনও পিছুটান রাখতে নেই। তুমি তো বেদেদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলে? তখন কি ফেরার কথা ভেবেছিলে?"

বুঝতে পারলাম, সঞ্জয়দার সব খোঁজখবর রাখেন মণিবাবু। কখন তিনি এত খোঁজখবর রাখলেন? অবাক হওয়ার কথা সঞ্জয়দার। কিন্তু এতটুকুও অবাক না হয়ে সঞ্জয়দা বললেন, "এবার আমার কাছে সব স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পেরেছি, কোথায় আপনার শক্তি।"

"বুঝতে পেরেছ? এত সহজেই সবকিছু বোঝা যায়?" হোহো করে হেসে উঠলেন। মহারাজের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসে প্রথমদিন যেভাবে হেসেছিলেন, এখনও ঠিক সেইভাবেই হাসছেন। হাসি যেন আর থামতে চায় না।

হাসি অবশ্য থামল। কতক্ষণ পর বলা মুশকিল। এখানে কোনও সময়ের হিসেব নেই। আমি শুনতে পেলাম গম্ভীর গলায় মণিবাবু বলছেন, "সে-ই আসল শক্তিমান, যে তার বুদ্ধিটা জাহির করে না।"

"আপনি জাহির না করলেও, আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার বিশেষ ক্ষমতাটা হল, আপনি ঘরে বসেই সব টের পেয়ে যান। কোথায়, কী ঘটছে, তা দেখতে পান। এমনকী, কে কী ভাবছে তাও বুঝতে পারেন। এটাই আপনার শক্তি। এটা জানার পর, আমরা যদি মিলিয়ে দেখি, আপনি কোথায় যান, কী করেন, কখন কাকে কী বলেন, তা হলেই আর কোনও সন্দেহ থাকবে না। পুরো ব্যাপারটাই দুই আর দুইয়ে চারের মতো মিলে যাবে।"

মণিবাবুর মুখ থমথমে হয়ে গেল। উনি কী যেন ভাবছেন। কিংবা এখন আর আমাদের সামনে উনি দাঁড়িয়ে নেই। ওঁর শরীরটাই আমাদের সামনে আছে, উনি চলে গেছেন অন্য কোথাও, অন্য কোনও একটা জায়গায়।

"আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমরা টুলং নদী পেরিয়ে চলে যাচ্ছ। মিলিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের ঘন বনের আড়ালে।"

"ভালই তো। স্কুলে আর যেতে হবে না।" আমি বললাম।

"যদি ইচ্ছে হয়, আবার যাবে।" মণিবাবু বললেন।

"আপনি তো আগেই বলেছেন, ফিরে আসার কথা ভাবতে নেই। ফিরে এলেই তো স্কুলে যেতে হবে। অঙ্ক কষতে হবে। তৎসম, তদ্ভব, সমাস, সন্ধি এসব পড়তে হবে।"

"যাও, তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি তোমাদের দু'জনের বাড়িতেই খবর দিয়ে দেব। ওঁদের বলে দেব, ওঁরা যেন চিন্তা না করেন। তোমরা এখনই বেরিয়ে পড়ো। ওখানে তোমাদের যাওয়া দরকার।"

মণিবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়েই সঞ্জয়দা বললেন, "আমার একটা কিট ব্যাগ আছে। সেটা সঙ্গে নেওয়া দরকার।"

"মণিবাবু তো বললেন, এখনই রওনা হতে।"

"হ্যাঁ, আমরা তো বেরিয়েই পড়েছি। তবে ওই ব্যাগটায় দরকারি কিছু জিনিসপত্র আছে। ওটা সঙ্গে নিলে ভাল হয়।" সঞ্জয়দা উত্তর দিলেন।

"তার মানে, তুমি এখন বাড়ি যাবে।"

"না রে। বাড়িতে আমি এক মিনিটও থাকব না কিট ব্যাগটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ব।"

"তোমার ওই পোষ্যদের কে খাওয়াবে? মানে, তোমার ওই সাপদের।"

"তা নিয়ে ভাবি না। মণিবাবু নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। সব দিকেই ওঁর নজর আছে। তোর মহারাজের জন্যও চিন্তা করিস না। তোর মা আছেন, সোনালি আছে। না, মহারাজকে নিয়ে চিন্তার কিছু দেখছি না।"

"আমি সঙ্গে আর একটাও জামা-প্যান্ট নিচ্ছি না। ব্রাশ, পেস্ট, টর্চ—কিছু আমার সঙ্গে থাকছে না।"

"দরকার নেই। কথায় বলে না, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা? আমাদেরও তাই করতে হবে। তা ছাড়া, আমার ব্যাগটা তো থাকছেই।"

আমরা আলপথ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলছি। সঞ্জয়দা ওঁর ব্যাগটা নিয়ে এসেছেন। ব্যাকপ্যাক। দুটো স্ট্র্যাপ দিয়ে ব্যাগটা পিঠে ঝুলিয়ে নেওয়া হয়েছে। ব্যাগে কী আছে জানি না। সঞ্জয়দা তো বলেছেন, দরকারি জিনিসপত্র। পরে বোঝা যাবে। হাঁটছি, আর দু'পাশের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। ধানখেত, ফসলের খেত, দূরে-দূরে গ্রাম। সবুজ গাছপালা। রোজকার চলার পথে এত সবুজ চোখে পড়ে না।

"দারুণ লাগছে।" আমি বললাম।

"বাড়ির জন্য মন খারাপ করেনি তো? মহারাজের জন্য?" সঞ্জয়দা জিজ্ঞেস করলেন।

"মন খারাপ করবে কেন? আমরা তো বেড়াতে বেরিয়েছি।"

"ধর, যদি সত্যিই আমরা আর বাড়ি না ফিরি?"

"এখন পর্যন্ত ঠিক আছে, বাড়ি ফিরব না।"

"তা নয়। ঠিক হয়েছে, আমরা আগে থেকেই বাড়ি ফেরার দিনক্ষণ ভেবে রাখব না। আমরা কোথায় যাব, কী করব, তার কোনও পরিকল্পনাও আমরা আগে থেকে করিনি।"

"পরিকল্পনা যে নেই, তা বলা যায় না। ঠিক হয়েছে, আমরা টুলং নদী পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ে যাব।"

"কিন্তু মণিবাবু কেন আমাদের ওখানে যেতে বললেন, সেটাই ভাবছি। ওঁর পরিকল্পনাটা কী?"

"উনি হয়তো ওখানকার কোনও একটা ছবি দেখতে পেয়েছেন। ওঁর চোখে সেটা ফুটে উঠেছে। তাই ভেবেছেন আমাদের ওখানে যাওয়া দরকার।"

"আমরা ওখানে গিয়ে কার কী কাজে লাগব?"

"কাজে লাগবই—এটা কি নিশ্চিতভাবে বলা যায়?"

"তা হলে আমাদের লাভটা হবে কী? দেশভ্রমণ করলে যে অনেক কিছু দেখা যায়, জানা যায়, অভিজ্ঞতা হয়—এটা তো আর নতুন কথা নয়। এটা সবাই জানে। আমার কথাটা হল, আমাদের এই বেরিয়ে পড়ার মধ্যে নতুনত্বটা কোথায়?"

"ধরো, উনি আমাদের সিকালাদেবের দেশে পাঠাচ্ছেন?"

"সেটাই বা নতুন কথা কী হল? তা ছাড়া, সিকালাদেবের দেশ বলে কিছু নেইও।"

"মণিবাবু হয়তো আমাদের কিছু একটা আবিষ্কার করতে পাঠাচ্ছেন?"

"আবিষ্কার করতে? আমরা কলম্বাস, না ভাস্কো দা গামা?"

"কলম্বাস না হয়েও অনেক কিছু আবিষ্কার করা যায়। বুঝলে?"

"বড়-বড় কথা বলিস না। যদি বলি, আমরা অভিযানে বেরিয়েছি, তা হলে বরং এর একটা মানে হয়। ওসব সিকালাদেবটেব বাজে।"

"মূর্তিটা বাড়িতে আনার পরই আমার সব ভয় কেটে গেছে।"

"ওটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার। আমি তোকে বলছি মান্টু, মূর্তিটাকে তুই কোনও গুরুত্ব দিস না।"

"মূর্তিটাই হয়তো মণিবাবুর শক্তির উৎস?"

"বড়জোর ওটা একটা প্রতীক। শক্তির প্রতীক।"

"মূর্তিটা কিন্তু বেশ অদ্ভুত। ওরকম মূর্তি দেখাও যায় না।"

"দেখতে অদ্ভুত হলেই যে তা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে, তার কোনও মানে নেই।"

সত্যিই, সঞ্জয়দা যা বলছেন, তা ভেবে দেখার মতো। মূর্তিটা আমাকে উপহার দিয়ে, মণিবাবু হয়তো আমার ওপর একটা

মানসিক প্রভাব ফেলতে চেয়েছেন। আমাদের বাড়িতে সেদিন মণিবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ লাল হয়ে গেল, তাঁর সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকল, সৃষ্টি হল রহস্যময় একটা পরিবেশ—এ-সবই কি তা হলে পূর্বপরিকল্পিত একটা নাটক ? যাতে আমার ভয়টা কাটিয়ে উঠি, সাহসী হই—তার জন্যই এই নাটকের প্রয়োজন ছিল ? টুলং নদীর দিকে যেতে-যেতে, অজানা পথে হাঁটতে-হাঁটতে এখন আমার শুধু এই কথাটাই মনে হল ?

কিন্তু মণিবাবু শুধু আমাকেই সাহসী করে তোলার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন কেন ? এত ছেলে থাকতে শুধু আমাকেই বেছে নেওয়ার পেছনে কি বিশেষ কোনও তাৎপর্য আছে ? কথাটা সঞ্জয়দাকে জিজ্ঞেস করব ভাবলাম। কিন্তু ইচ্ছে হল না। ভারী সুন্দর একটা জায়গায় এসে পড়েছি। এখন গাছের পাতা দেখার সময়, পাখি দেখার সময়। অদ্ভুত এক-একটা গাছের পাতা। কোনওটা রবারের মতো থলথলে, কোনওটা কোঁকড়ানো, সেখানে নানা রঙের ছিটে। কোনও-কোনও পাতা আবার স্বচ্ছ কাচের মতো। তার সব শিরা-উপশিরা দেখা যায়। ফিরে আসার সময় এইসব পাতার নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যাব। মনে-মনে ভাবলাম। বটানি বইয়ে নিশ্চয়ই এইসব গাছের নাম আছে। মিলিয়ে দেখতে হবে। না হলে আমি নিজেই ওদের নাম দেব। এমন নাম, যা ওদের সৌন্দর্যের সঙ্গে মানানসই হবে।

কিন্তু কথাটা সঞ্জয়দা কী করে টের পেলেন ? বাড়ি ফেরার সময় গাছের পাতার নমুনা সংগ্রহ করব—এই কথাটা তো আমি ওঁকে বলিনি। বা এখনও আমার মনের গভীরে ভাবনাচিন্তার স্তরে আছে, বাইরে এখনও যার বিন্দুমাত্র প্রকাশ ঘটেনি, তা তো সঞ্জয়দার টের পাওয়ার কথা নয়।

"কী রে, বাড়ি ফেরার সময় কয়েকটা গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চাস ?"

"না তো।" কথাটা আমি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বললাম।

"মিথ্যে কথা। তুই তো আগে মিথ্যে কথা বলতিস না।"

"তুমি কী করে বুঝলে যে, আমি গাছের কয়েকটা পাতা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি ?"

"আগে বুঝতাম না। কিন্তু এখন দেখছি, মণিবাবুর মতো আমিও মানুষের মনের কথা টের পাচ্ছি। এই যে তুই আমার পেছন-পেছন আসছিস। কিন্তু এরই মধ্যে একটা ছবি আমার মনের পরদায় ফুটে উঠল ? দেখলাম, তুই কোনওরকম মায়া-মমতা না করেই দু' হাতে গাছের পাতা ছিঁড়ছিস। পাতাগুলো ছিঁড়ে প্যান্টের পকেটে রাখছিস। আমি স্পষ্ট দেখলাম।"

না, মণিবাবু রীতিমত ভাবিয়ে তুললেন দেখছি। তাঁর যেসব গুণ আছে তিনি কী করে সেগুলো অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন ? না কি, অন্যরা তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয় ? মণিবাবু এমন লোকদের বেছে নেন, যাদের তিনি নিঃশব্দে প্রভাবিত করতে পারবেন ? নিজের গুণ চাপিয়ে দিতে পারবেন তাদের ওপর ? পুরো ব্যাপারটাই একটা রহস্য।

সঞ্জয়দাও ঠিক সেই কথাই বললেন। "দ্যাখ, আমি একটা কথা ভাবছি। মান্তু, তুই কী করবি, না করবি, তা আমি কী করে এখন থেকেই টের পেলাম ? ব্যাপারটা রহস্যময়, তাই না ?"

"আমিও তাই ভাবছি। মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল থাকলে, তবেই একের গুণ অন্যে পেতে পারে।"

"তার মানে, তোর বা আমার সঙ্গে মণিবাবুর মনের মিল আছে। সেইজন্যই তিনি আমাদের প্রভাবিত করতে পারছেন। এটাই তো তুই বলতে চাস ?"

"এটাই সম্ভব।"

"তা হলে তো আমরাও মণিবাবুকে প্রভাবিত করতে পারি। অর্থাৎ, আমরাও আমাদের ইচ্ছাশক্তি তাঁর ওপর প্রয়োগ করতে পারি।"

"আমার মনে হয়, এটা অসম্ভব নয়।"

"কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব যদি আমাদের চেয়ে প্রবল হয়, অর্থাৎ তাঁর মনের জোর যদি বেশি থাকে, তা হলে হয়তো আমরা তাঁর মনে কোনও প্রভাব ফেলতে পারব না। আমাদের ইচ্ছামতো কোনও কাজ তাঁকে দিয়ে করাতে পারব না।"

"সময় হলে দেখা যাবে।"

"দ্যাখ মান্তু, যেভাবে আমরা হাঁটছি তাতে মনে হয় সন্ধের আগে টুলং পৌঁছতে পারব না। বরং একটা কাজ করা যাক।"

আমরা একটা বাঁশবাগানের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। হাওয়ায় বাঁশগাছগুলো দোল খাচ্ছে। বাঁশের সঙ্গে আর-একটা বাঁশের ঘষাঘষি লেগে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে শব্দ হচ্ছে। তীরের মতো ছুঁচলো বাঁশপাতা। যেন সবুজ তীর।

সঞ্জয়দা কিটব্যাগ খুলে ভাঁজকরা একটা ছুরি বের করে আনলেন। চাপ দিতেই ছুরিটা খুলে গেল। চকচকে, ধারালো ফলা। মাঝারি সাইজের চারটে বাঁশ তিনি ঝটপট কেটে ফেললেন। ছুরিটার যে কী ধার, তখনই বোঝা গেল। বাঁশের ডালপালাগুলোও এর পর ছেঁটে ফেললেন সঞ্জয়দা।

"বাঁশগুলো কী কাজে লাগবে ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি।

এর পর আমার হাতে দুটো বাঁশ ধরিয়ে দিয়ে সঞ্জয়দা বললেন, "তোর জন্য একটু ছোট সাইজের বাঁশ কাটব ভেবেছিলাম। তা, এতে তোর খুব একটা অসুবিধে হবে না। নে, চেপে পড়।"

কীভাবে চাপতে হবে, তাও উনি দেখিয়ে দিলেন। বাঁশের গিঁটে পা রেখে বকের মতো লম্বা-লম্বা ঠ্যাং ফেলে এগিয়ে যেতে হবে।

"ডাকাতরা রন-পা চেপে একসময় ডাকাতি করতে আসত, জানিস তো ! অনেক দূর-দূর থেকে আসত। রন-পায়ে চেপে আসত বলে চটপট আসত, আর ডাকাতি করে উধাও হয়ে যেত। এ হচ্ছে রন-পা। রন-পায়ে চেপে আমরা এখন টুলং নদীর ধারে চলে যাব।"

রন-পায়ে চেপে আমার কিন্তু বেশ অস্বস্তি হল। পায়ে ব্যথা করছে। এর আগে অবশ্য জুতোজোড়া খুলে ফেলেছিলাম।

সঞ্জয়দা বললেন, "প্রথম-প্রথম একটু অসুবিধে হবে। তারপর দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। তোর জুতোজোড়া আমার কিটব্যাগে দিয়ে দে।"

"তুমি বরং রন-পায়ে যাও। আমি পেছন-পেছন দৌড়ই।"

"দূর বোকা ! কতক্ষণ আর দৌড়বে। একটু অভ্যেস কর, দেখবি তখন আর কোনও কষ্ট হচ্ছে না।"

সঞ্জয়দার কথা অমান্য করতে চাইলাম না। বেরিয়েছি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। সুতরাং এটুকুই বা বাদ থাকে কেন ? সঞ্জয়দাকে কিন্তু রন-পা নিয়ে দিব্যি হাঁটতে দেখছি। আগে কি তিনি রন-পা চেপে দূরে-দূরে পাড়ি দিয়েছেন ? জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হল। কিন্তু সঞ্জয়দা তখন আমাকে ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। দু' হাত মুখে লাগিয়ে চিৎকার করে ওঁকে ডাকার ইচ্ছে হল। কিন্তু তার উপায় নেই। দু' হাতে রন-পা আঁকড়ে আমাকে এগোতে হচ্ছে।

ঠিক কতক্ষণ লাগল জানি না। একসময় দেখলাম, নীল, সবুজ পাহাড়ের রেখা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। পাহাড় যখন দেখা যাচ্ছে নদী নিশ্চয় কাছাকাছিই আছে। ফসলের খেত আর ধানমাঠের আড়ালে নিশ্চয় কাছাকাছি আছে টুলং। নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। আরও কাছে গেলে হয়তো তার স্রোতের শব্দ শুনতে পাব। পাহাড়ের গায়ে গাছপালাগুলোও আরও স্পষ্ট হবে।

বেশ একটা আনন্দ অনুভব করলাম। মণিবাবুর কথা আমরা রাখতে পেরেছি। টুলংয়ের ধারে পৌঁছে গেছি। এদিকে রন-পা নিয়েও আমার আর তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একবার প্রায় পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম। তখনও সঞ্জয়দা

আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে। ভেবে দেখলাম, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। উনি না হয় আমার চেয়ে পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছবেন। তা পৌঁছন, আমি ওঁর পেছনেই আছি। একসময় দূরত্বটুকুও কমে গেল।

টুলংয়ের স্রোতের শব্দ কিন্তু কানে এল না। একসময় ধানমাঠ শেষ হয়ে গেল। সামনে এবড়োখেবড়ো খানিকটা জমি। রন-পা ছেড়ে জমি দিয়ে কিছুটা হেঁটেই টুলংয়ের মুখোমুখি হতে পারলাম। নদীর বুকে ছোট-বড় অনেক পাথর। সেই পাথর ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে ক্ষীণ স্রোত। বর্ষায় এই নদীই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। গর্জন করে ওঠে স্রোত। একূল, ওকূল ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু এখন টুলং ছোট্ট একটা মরা নদী। হাঁটুজলও নেই। পেরোতে গেলে গোড়ালিটুকুই ভিজবে।

"এখানেই রন-পাগুলো রেখে যেতে হবে।" সঞ্জয়দা বললেন।

"কেন ?"

"ফেরার সময় কাজে লাগবে।"

"তুমিও তো দেখছি ফেরার কথা ভাবছ।"

"আমরা কি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতে এসেছি ?"

"মণিবাবু কী বলবেন ? আমরাই বা ওঁকে গিয়ে কী বলব !"

"কিচ্ছু বলার দরকার নেই। যা বোঝার উনি বুঝে নেবেন। উনি যা বলবেন, তার সবটাই কি আমাদের মেনে চলতে হবে ?"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমাদের নিজেদেরও তো একটা ব্যক্তিত্ব আছে ?"

"ব্যক্তিত্বটা বড় নয়। আমরা কী করছি, কতটুকু করছি, সেটাই বড়।"

নদীর পাড়ে একটা বড় পাথর আছে। তার কাছে গিয়ে সঞ্জয়দা বললেন, "দু' জোড়া রন-পা এখানে রেখে যাব। এই পাথরের আড়ালে। তোর, আমার দু' জোড়া জুতোও এখানে রেখে যাব, বুঝেছিস !"

"জুতো নিয়ে গেলে কী হবে !" পাথুরে পথে খালি পায়ে হাঁটার কথা ভাবতেই আমি বলে ফেললাম।

"আমরা শুধু জামা-প্যান্টটাই পরে থাকব। শহুরে সভ্য মানুষের কোনও জিনিসই আমি ওপারে নিয়ে যেতে চাই না। সবদিক থেকে প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে চাই। শরীরে, মনে কৃত্রিমতার ছোঁয়াটুকু যেন না থাকে।"

"তা হলে তোমার ওই কিটব্যাগ ?"

"এখন মনে হচ্ছে, ওটা এনে ভুল করেছি। ওটাকেও আমি পাথরের আড়ালে রেখে যেতে চাই।"

"কেউ যদি নিয়ে যায় ?"

"মনটাকে অত ছোট করিস না। নিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কী। এমন কী দামি জিনিস আছে ওতে !"

নিজের ওপর লজ্জা হল। কে আর এখানে আমাদের এই সামান্য জিনিসগুলো চুরি করতে আসবে ! নিজেকে মনে-মনে প্রচণ্ড বকুনি দিয়ে বললাম, "সঙ্কীর্ণমনা মানুষের পক্ষে ভাল কিছু করা সম্ভব নয়। তুমি এখানে এসেছ ভাল কিছু করতে, নতুন কিছু করতে। তুমি তো ভালমানুষ। তোমার মনও উদার। সেখানে কোনও নীচতার জায়গা নেই। তবু তোমার সংস্কারটা হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এর পর থেকে তুমি আরও সাবধান হয়ে মনেপ্রাণে নতুন মানুষ হয়ে উঠবে।"

॥ ৮ ॥

এখন শেষ বিকেল। রোদ তির্যক হয়ে পড়েছে, ওপারের পাহাড়ের খাঁজে। একদিকে নরম রোদে গাছপালা টলটলে সবুজ, কোথাও এককণা ধুলো নেই। অন্যদিকে ধূসর ছায়া। সমস্ত পরিবেশটাই মায়াবী হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে গভীর বন। বড়-বড় গাছ। এখানে টুলংয়ের বুকে সোনালি বালি ও পাথর। পেরোতে গিয়ে দেখলাম, কোথাও হাঁটু ডুবে যাচ্ছে। নদীতে নামার আগে ভেবেছিলাম, প্যান্টটা গুটিয়ে নেব। তারপরই ভেবে দেখলাম, দরকার নেই। নদীর জলে সমস্ত শরীরটাই ভিজিয়ে নিলে ভাল হয়। কিন্তু তার তো উপায় নেই। এ নদী সাঁতারের নয়, এখন নয় স্নানেরও।

সঞ্জয়দা আমার পেছনে, আমি ওঁর চেয়ে কয়েক ফুট এগিয়ে। উনি বললেন, "আর-একটু পরেই সন্ধে নামবে। ভেবে দেখেছিস ?"

"নামুক না।"

"কিন্তু আমরা রাতটা থাকব কোথায় ?"

"ওপারে যদি আদিবাসীদের কোনও গ্রাম থাকে, সেখানে গিয়েই উঠব।"

"কিন্তু ওরা থাকতে দেবে কেন ? অচেনা লোককে ওরা যদি অবিশ্বাস করে ?"

"আমরা ওদের বন্ধু করে নেব।"

"রাতের অন্ধকারে হঠাৎ এক কিশোর ও এক যুবকের সঙ্গে ওরা বন্ধুত্ব পাতাতে যাবে কেন ?"

"এখন থেকে ভেবে লাভ নেই। গিয়ে দেখা যাবে।"

"ধর, যদি কোনও আদিবাসী গ্রাম না থাকে। যদি গিয়ে দেখি শুধু বন আর বন। তা হলে ?"

"নিজের চোখে না দেখে কিচ্ছু বলব না।"

ওপারে যে আদিবাসীদের গ্রাম আছে, তা একটু পরেই বোঝা গেল। নদীর ওপারে পড়ন্ত বিকেলে আট-দশ বছরের একটি শিশুকে দেখা গেল, মহিষ চরাচ্ছে। ছেলেটি বসে আছে বড় একটি পাথরের ওপর। গাছের ছাল কেটে ফিতে তৈরি করে তা সে মাথায় বেঁধেছে। সেখানে গুঁজে রেখেছে টকটকে লাল দুটো ফুল। ও ফুল আগে কখনও দেখিনি। কী নাম ফুলের ? ছেলেটিরই বা নাম কী ? জিজ্ঞেস করলে ও কি উত্তর দিতে পারবে ? ও কি বুঝতে পারবে আমাদের ভাষা ?

ছেলেটি এতক্ষণ দূর থেকে আমাদের দেখছিল। এবার আমরা ওর কাছাকাছি যেতেই সে পাথর থেকে নেমে পড়ল। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। টানা-টানা চোখ। খালি গা। যেন পাথর কেটে তৈরি একটা মূর্তি। মাথায় যেমন ফিতে বাঁধা, সেইরকমই একটা ফিতে দিয়ে সে কচি কয়েকটা শালপাতা কোমরের নীচে ঝুলিয়ে নিয়েছে।

ছেলেটি যে আমাদের দেখে ভয় পেয়েছে, তা নয়। সে সরাসরি আমাদের চোখের দিকেই তাকিয়ে আছে। একবার আমাকে দেখছে, একবার দেখছে সঞ্জয়দাকে। তাকে ঘিরে চার পাঁচটা মহিষ। মহিষগুলোকে সে হাত নেড়ে ইশারা করতেই সেগুলো পাহাড়ের পথ ধরল। ছেলেটিও ওদের পিছু নিল। যাওয়ার আগে অবশ্য এমন একটা চমক দিল, যার জন্য আমি বা সঞ্জয়দা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। ছেলেটি ওর মাথার টকটকে লাল ফুল দুটো আমার হাতে গুঁজে দিয়েএক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে পাহাড়ের পথে উঠে গেল।

সঞ্জয়দা খুব খুশি। আমার হাত থেকে একটা ফুল নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "এই তো তুই ওদের গাঁয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেলি। এখন থেকে তুই আমার গাইড। এখন তুই যেখানে যাবি, আমিও তোর পেছন-পেছন যাব।"

"আচ্ছা, তুমি কি ওই ফুলটার নাম জানো ?"

"ওদের কাছেই জেনে নিতে হবে। শুধু ফুল কেন, এখানকার সব খোঁজখবর নিয়ে তারপর ফিরব।"

ছেলেটির পেছন-পেছন আমরা হাঁটতে থাকলাম। পাহাড়গুলো এতক্ষণ মনে হচ্ছিল খুব কাছে। পাহাড়ের নুড়ি-পাথরের ছায়াও চোখে পড়ছিল। কিন্তু যত কাছে যাই, পাহাড় ততই দূরে সরতে থাকে। এখানে দূরত্ব ঠিক বোঝা যায় না। শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের পায়ের কাছে এসে পড়লাম আমরা। ছেলেটি মাঝেমধ্যেই পেছন

ফিরে আমাদের দেখছে। সন্ধের ছায়াও পৌঁছে গেছে এতদূর। এবার ছেলেটি চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

আমরা যাচ্ছি বনের মধ্যে দিয়ে। পায়ে চলার সরু একফালি পথ এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে গেছে। দু'পাশে বড়-বড় গাছ আকাশ ছুঁয়েছে। অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠেছে এখানে। সঞ্জয়দা বললেন, "ছেলেটির তো এত দেরি করে বাড়ি ফেরার কথা নয়।"

"হ্যাঁ। সন্ধের আগেই তো আমাদের রাখালরা বাড়ি ফেরে।"

"তা হলে ওর এত দেরি হল কেন? এখানে কি এটাই নিয়ম?"

"তা কেন হবে? বনে বাঘ থাকতে পারে, থাকতে পারে ভয়ঙ্কর নানা জন্তু।"

"থাকতে পারে বলছিস কেন? আছে, নির্ঘাত আছে। একটু আগে কয়েকটা পাখি ডাকছিল। এখন সব থেমে গেল। ঝোপ ঝাড়গুলো দু-একটা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। হয়তো যাওয়ার সময় হরিণের পিঠ ঘষে গেছে ঝোপের ডালে। কিংবা হয়তো কোনও হরিণের শিং জড়িয়ে গিয়েছিল ঝোপের লতায়। এখন সব চুপচাপ।"

আমরা চুপচাপ পাহাড়ে হাঁটছি। এমন সময় তীক্ষ্ণ একটা শব্দ। মুখে আঙুল দিয়ে সিটি দিলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা সেরকম। অন্ধকারে এখন আমরা কোনও কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সামনের ছেলেটি ও মহিষগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেছে। আবার বেজে উঠল তীক্ষ্ণ সিটির শব্দ। একটা পাখি সামনের গাছের ডালে ডানা ঝাপটে উঠল। আর ঠিক সেই সময়েই আমাদের সামনে, খুব কাছ থেকে সিটি বেজে উঠল। আরও তীক্ষ্ণ তার শব্দ। বুক কেঁপে উঠল আমাদের।

মনে হচ্ছে, সাঙ্ঘাতিক একটা বিপদ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু একবারও মনে হয়নি, মণিবাবুর কথা শুনে এতদূর এসে আমরা ভুল করেছি। কী হয়, দেখাই যাক না। আবার সিটির শব্দ। এবার সঞ্জয়দা পেছন থেকে আমার কানে ফিসফিস করে বললেন, "ওই ছেলেটি সিটি দিচ্ছে।" একটু আগে দু'বার যে সিটি শুনলি, তারই উত্তরে ছেলেটি সিটি দিয়ে জানাল, সে বহাল তবিয়তে আছে। বাড়ি ফিরছে।"

"আগের দু'বার কি ওর বাড়ির লোকে সিটি দিয়েছে?"

"নিশ্চয় তা'ই। ওরা এভাবেই দূর থেকে খোঁজখবর নেয়। এটা ওদের একটা ভাষা।"

"মনে হচ্ছে, টারজানের জঙ্গলে এসে পড়লাম।"

"টারজানের জঙ্গলও এতটা রোমাঞ্চকর নয়। গল্পের টারজান তো বানানো একটা চরিত্র।"

পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে ওপরে উঠতে-উঠতে বনটা হালকা হয়ে গেল একসময়। এতক্ষণ আকাশ দেখা যাচ্ছিল না। এবার চাঁদ দেখা গেল, দেখা গেল নক্ষত্রের সাম্রাজ্য। বনের ভেতরে ছিল গুমোট গরম। এবার একটু-একটু হাওয়া গায়ে লাগল। দেখলাম, কিছুটা দূরে আগুন জ্বলছে। আগুনের লাল শিখায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পাতার তৈরি কয়েকটা ঘর। সংখ্যায় বেশি নয়। গোটা পাঁচেক, কিংবা কিছু বেশি। বোঝা গেল, আমরা একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে গেছি। মহিষগুলো এবার হুসমুস করে গ্রামের দিকে এগোতে লাগল। ছোট্ট একটি ছেলে মহিষগুলোর সঙ্গে জোর কদমে এগিয়ে গেছে। চিনতে ভুল হল না। সেই ছেলেটি, যে আমাকে ফুল দিয়েছিল।

আমরা কি আরও এগিয়ে যাব? একটা গল্পে পড়েছিলাম, আদিবাসীদের তীরে বিষ মাখা থাকে। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, আগুনের সামনে দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা, ছিপছিপে

চেহারা। যেন মেহগনি কাঠের মূর্তি। তবে ওদের হাতে তীর-ধনুক নেই। ছেলেটি এখন ওদের সামনে পৌঁছে গেছে। ওদের নিশ্চয় বলছে, দু'জন অচেনা লোক ওর পেছনে-পেছনে এই গ্রামে এসে পড়েছে।

ছেলেটি এবার মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করল, "মাকাটো! মাকাটো!"

মাকাটো কথাটার মানে কী! সঞ্জয়দাকে জিজ্ঞেস করব ভাবলাম। জিজ্ঞেস করলেও সঠিক উত্তর পাব কি না, সন্দেহ। তবে, সঞ্জয়দাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না। উনি, দেখলাম, আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "ওরা আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। চেয়ে দ্যাখ, একটা লোক পাতার গোলঘরে ঢুকে গেল। হয়তো অস্ত্র আনতে গেল।"

মাকাটো, মাকাটো শব্দ শোনার পরই সব ঘর থেকে পুরুষ ও নারীরা বেরিয়ে এসেছে। সবার গায়েই পাতার পোশাক। আগুনের সামনে ওরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সংখ্যায় আট-ন' জনের বেশি নয়। কিন্তু কারও হাতেই অস্ত্র নেই।

"অস্ত্র না থাক, জীবজন্তুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য গাঁয়ের চারপাশে পাথরের যে বেড়া ওরা দিয়ে রেখেছে তার কয়েকটা ছুড়ে মারলেই তো আমরা মরে যাব। একটা পাথরও যদি গায়ে লাগে, তা হলে আর দেখতে হচ্ছে না।" সঞ্জয়দা বললেন।

"ওরা আমাদের আক্রমণ করবে না। ওরা ভয় পেয়েছে।"

"কী করে বুঝলি?"

"অজানা লোকদের দেখে ভয় পেতেই পারে।"

"তা না হয় হল, কিন্তু এখন আমরা কী করব? আমরা কি দু' হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব, না পিছু হটব?"

এর কোনওটারই দরকার হল না। সঞ্জয়দা আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই পেছন থেকে দু'জন লোক আমাদের জাপটে ধরল। লতাপাতা দিয়ে পিছমোড়া করে আমাদের বেঁধে ফেলতেও লোক দুটোর বেশি সময় লাগল না। এবার তারা পাঁজাকোলা করে আমাদের আগুনের সামনে নিয়ে গিয়ে ফেলল। পুরো ঘটনাটা ঘটতে সময় লাগল মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

আগুনে প্রায় ঝলসে যাওয়ার উপক্রম আমাদের। আশঙ্কা করছি, কমিক্‌স-বইয়ে সচরাচর যেসব ঘটনা ঘটে, এবার তারই কিছু বাস্তবে ঘটতে দেখব। আদিবাসীরা জংলি ঢাক এনে আমাদের ঘিরে নাচতে শুরু করবে। আমরা তাদের শিকার। সহজ শিকার। যখন খুশি আমাদের আগুনে ছুড়ে ফেলা যাবে। না হয় ধারালো অস্ত্র এনে আমাদের টুকরো-টুকরো করে ফেলবে ওরা। তার আগে চলবে পৈশাচিক নৃত্য। ভোজ শুরুর আগে কতক্ষণ যে এই নাচ চলবে তার ঠিক নেই। কমিক্‌স-বইয়ে জঙ্গলের এই ধরনের ছবিই দেখা যায়।

কেন জানি না, একটু পরেই আমার কিন্তু মনে হল, এতদিন ধরে যে-ছবিটা দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, তা ঠিক নয়। সামনের ওই কালো-কালো মানুষগুলোকে জংলি মনে করারও কোনও কারণ নেই। আমার অনুমান যে মিথ্যে নয়, তা আর কিছুক্ষণ পরেই বোঝা গেল।

"ইসা, আউসা কিসা মিসা।" এক আদিবাসী মহিলা তাঁর পাশের পুরুষটিকে বললেন।

"মবোটে ইসা মালেকুলা। সান কান ইগত ওরা।" পুরুষটি উত্তর দিলেন।

এর একটা বর্ণও আমরা বুঝি না। অদ্ভুত সব সংলাপ। "কিচান তুরা সেকাদি। দুরা মিচাও নিশা। বাউতে কে কুতান হু।" এই

ভাষা আগে কখনও শোনা তো দূরের কথা, এরকম ভাষা যে থাকতে পারে, তা কখনও ভাবিনি। পুরো ব্যাপারটাই ছিল আমার কল্পনার বাইরে। এর পর যা ঘটল সেটাও কি কল্পনা করতে পেরেছিলাম?

সেই আদিবাসী ছেলেটি এসে আমাদের বাঁধন খুলে দিল। প্রথম দেখায় এই ছেলেটিই আমাকে ফুল দিয়েছিল, নীরবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাদের দেশে। ইশারায় জানিয়েছিল, আমরা যেন ওর সঙ্গে আসি। তারপর এখন সে নিজেই আমাদের মুক্ত করে দিল।

এক আদিবাসী মহিলা ছেলেটির পাশে এসে দাঁড়ালেন। পিছমোড়া অবস্থায় ধুলোয় আমরা পড়ে ছিলাম। এবার উঠে দাঁড়ালাম। আদিবাসী মহিলা গাছের নরম একটা পাতা দিয়ে আমাদের ধুলো ঝেড়ে দিলেন। আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের কোনও বিপদ হবে না। ওরা আমাদের আশ্রয় দেবে। মনে হল, ওই মহিলা বোধ হয় ছেলেটির মা। কারণ ছেলেটি আমাদের বাঁধন খুলতে আসার আগে ওই মহিলাকে ডেকে এনেছিল। ওরা এখন নিজেদের ভাষায় কথা বলছে। "পারা সিনা কড়ম।" "টুলং জিলে সান"—এরকম আরও অনেক কথা।

টুলং কথাটা কানে আসায় বুঝতে পারলাম, আমাদের সঙ্গে ছেলেটির যে টুলং নদীর ধারে দেখা হয়েছিল, তা সে মাকে জানাচ্ছে। কী করে দেখা হল, তারপরে আমরা কী করে এখানে এলাম— তারই বিশদ বিবরণ সে দিচ্ছে মাকে। ওর দেওয়া ফুল আমি আমার প্যান্টের পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। এখন পকেট থেকে ফুলটা বের করে ওকে দিলাম। ফুলটা একটু থেঁতলে গেছে। ছেলেটি কিন্তু ফুলটা পেয়ে খুব খুশি। আরও খুশি ওর মা। তিনি এবার একজনকে ডাকলেন। লম্বা ছিপছিপে একজন পুরুষ তখনই সেখানে এসে দাঁড়ালেন। ওদের মধ্যে অল্প দু-একটা কথা হল। তারপরেই দেখলাম ছেলেটি আমাদের ডাকছে।

'মাকাটো' 'মাকাটো' ডাক শুনে এর আগে যাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, আগুনের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা এখন নিজেদের ঘরে ফিরে গেছেন। খোলা আকাশের নীচে আগুন এখন জ্বলছে। সারারাত জ্বলবে যাতে কোনও জন্তু-জানোয়ার এসে এখানে উৎপাত শুরু না করে। খোলা আকাশের নীচে এখন আমরা পাঁচজন। আদিবাসী পুরুষ, মহিলা ও একটি শিশু। এবং আমরা দু'জন, আমি ও সঞ্জয়দা। আমরা ওঁদের ভাষা বুঝি না, ওঁরা বোঝেন না আমাদের ভাষা। তবু সেই মুহূর্তে মনে হল, ভাববিনিময়ের জন্য কোনও ভাষারই প্রয়োজন নেই আমাদের। পৃথিবীর আদিম ও অকৃত্রিম ভাষা হচ্ছে আবেগ ও অনুভূতি। নামহীন এক জঙ্গলে এই অকৃত্রিম আবেগ-অনুভূতিই অপরিচিত কয়েকজন মানুষের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

ছেলেটি নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বারবার একটা কথাই বলতে লাগল— "লাপলাপ, লাপলাপ।"

সঞ্জয়দা বললেন, "কী বলছে বুঝেছিস?"

আমি মাথা নাড়লাম। ওর নাম লাপলাপ। আমি এবার নিজের নামটা ওকে জানালাম। ও যেভাবে জানিয়েছে ঠিক সেই ভঙ্গিতে। "মান্তু, মান্তু।"

"লাপলাপ, লাপলাপ।"

লাপলাপের মা আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। পাতায় ছাওয়া গোল ঘর। ঘরটা ফাঁকা। সঞ্জয়দা বললেন, "এই ঘরে কেউ থাকে না। উৎসব-অনুষ্ঠানে এটা কাজে লাগে। অতিথি হিসেবে আজ ওরা আমাদের এই ঘরটা ছেড়ে দিয়েছে। আদিবাসীদের এটাই নিয়ম।"

"এতই যদি জানো, তা হলে বলো তো এই আদিবাসীদের নাম কী?"

"সেটা এখনও জানতে পারিনি। আমাদের বাড়ির এত কাছে যে এরকম এক আদিবাসী সম্প্রদায় আছে, সে-খবরও রাখতাম না। এরা আমাদের এখনকার সভ্যতার কোনও কিছুই গ্রহণ করেনি।"

"ওই যে আগুন জ্বালিয়েছে—"

"ভাবিস না, ওটা কয়লার আগুন। ওরা আগুন জ্বালায় কাঠকুটো দিয়ে। মনে হচ্ছে, ওরা এখনও চকমকি ব্যবহার করে। পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালায়।"

ওদের ঘরে কি হাঁড়িকুড়ি কিছু নেই? পোড়ামাটির বাসন, কিংবা পাথরের জিনিসপত্র?"

"না থাকাই সম্ভব। যা শিকার করে তা ওরা এই আগুনেই ঝলসে নেয়। ফলমূল খায়।"

সঞ্জয়দার কথা শেষ হতে-না-হতেই লাপলাপের মা এক কাঁদি পাকা কলা ও কিছু ফল আমাদের জন্য নিয়ে এলেন। ফলগুলো দেখতে বেশ অদ্ভুত। একটা ফলের গায়ে হলুদ রোঁয়া। ফলের রং নীল। টুলং নদীর ধারে ঝাঁকড়া একটা গাছে এরকম ফল অজস্র ধরে থাকতে দেখেছি।

মায়ের সঙ্গে লাপলাপও আমাদের ঘরে এসেছে। নীল রঙের ফলটা নিয়ে আমাকে নাড়াচাড়া করতে দেখে সে বলল, "জুরিতা! জুরিতা!" সে হয়তো ফলের নামটাই আমাকে জানিয়ে দিল। আমি জুরিতা ফলে কামড় দিয়ে দেখলাম, দারুণ মিষ্টি। পাকা আম ও আপেল মেশালে যেমন স্বাদ হয়, জুরিতা ফলের স্বাদ অনেকটা সেরকম।

এর পর লাপলাপ আর-একটা অদ্ভুত ব্যাপার করল। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে দু' হাত ভরে নিয়ে এল কাঁচা গোবর। ঘরের শুকনো পাতার দেওয়ালে সেই গোবর থপ করে ছুড়ে দিল লাপলাপ। তারপরই আবার বেরিয়ে গেল। ফিরল বেশ কিছুক্ষণ পরে। তখন ওর দু' হাতে থোকা-থোকা জোনাকি ঝিকমিক করছে। সেই জোনাকিগুলো সে একে-একে দেওয়ালের গোবরে গুঁজে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জোনাকির ক্ষীণ আলোয় ঘরটা রহস্যময় হয়ে উঠল।

সঞ্জয়দা বলে উঠলেন, "পুরোপুরি প্রকৃতিনির্ভর এরকম কিছু মানুষ এখনও বেঁচে আছে, এটা ভাবতেই কেমন লাগছে।"

"বাবুই পাখিরা নাকি এভাবে ওদের বাসায় আলো জ্বালায়।" আমি বললাম।

"এখানে মানুষ ও পাখিরা একই অবস্থায় বেঁচে আছে।" সঞ্জয়দা বললেন। তিনি বেশ খুশি। যেন বিরাট কিছু আবিষ্কার করে বসেছেন! "ফিরে গিয়ে কোনও অ্যানথ্রোপলজিস্টকে এখানে পাঠাতে হবে।"

"তিনি এসে কী করবেন? গবেষণা করবেন? প্রবন্ধ লিখবেন? তাঁর লেখা যখন কোনও পত্রিকায় বেরোবে, তখন দেখো কী ঝামেলাটাই না বেধে যায়। লোকেরা ভিড় করবে এখানে। পুরো জায়গাটা একটা পিকনিক স্পট হয়ে উঠবে।"

আমরা কথা বলছিলাম নিচু স্বরে, যাতে আমাদের কথা বাইরের কেউ শুনতে না পায়। ইতিমধ্যে সঞ্জয়দা কয়েকটা জুরিতা ফল খেয়ে নিয়েছেন। তাঁর ভাল লেগেছে। তিনি বললেন, "ফেরার সময় কিটব্যাগ ভরে জুরিতা নিয়ে যাব। রীতিমত বিস্ময়কর একটা ফল। নামটাও সুন্দর। জুরিতা।"

জুরিতার চেয়েও আরও বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাত্রে তেমন ঘুম আসেনি। তারই মধ্যে সঞ্জয়দা বলেছিলেন, "আমরা পালা করে ঘুমোব। তুই আগে ঘুমিয়ে পড়।"

"আমার ঘুম আসছে না।" ঘরের মেঝেয় শুকনো পাতা গালিচার মতো বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাতার সেই গালিচায় গা

এলিয়ে দিয়ে আমি বললাম।

"তা হলে একটু বিশ্রাম নে। যদি ঘুমিয়ে পড়িস আমি তোকে জাগিয়ে দেব।"

তার অবশ্য দরকার হল না। ভোরবেলা আমিই সঞ্জয়দার ঘুম ভাঙালাম। মুখে স্বীকার না করলেও তিনি যে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন, তা তাঁর ভাবভঙ্গিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"দ্যাখ, সারারাত জেগেই ছিলাম। সবে একটু ঝিমুনি ধরেছিল। তা কী বুঝছিস ? আমাদের তো এবার ফিরতে হবে।"

"এখনই ফিরতে চাও ? টুলং নদীর উৎসটা কোথায় খুঁজে দেখবে না ? আর-একটা নদী আছে। দোতারা। কোথায় তার উৎস ?"

এখানে তো অনেক পাহাড়। ঝরনাও নিশ্চয় অনেক। ঝরনার জল গড়িয়ে এরকম অনেক নদীর সৃষ্টি হয়।"

"থাক না অনেক নদী। আমরা মাত্র দুটো নদীর উৎস খুঁজে দেখব। টুলং, আর দোতারা।"

"টুলং নদীতে সারা বছর জল থাকে না। শুধু বর্ষার সময় জল দেখা যায়। পাহাড়ে যখন বৃষ্টি নামে, তার ঢল গিয়ে পড়ে টুলংয়ে। বৃষ্টিশেষে আর জল থাকে না নদীতে। কিন্তু দোতারা নদীতে তো সবসময় জল থাকে। নৌকো পারাপার করে। একই পাহাড়ে দুটো নদীর উৎপত্তি, অথচ দুটোর মধ্যে কী তফাত!"

"একই জায়গা থেকে তো দুটো নদীর উৎপত্তি হয়নি। একই পাহাড়শ্রেণী থেকে হয়েছে।"

পাতার গালিচায় বসে আমরা যখন এইসব আলোচনা করছি, তখনই এসে পড়ল লাপলাপ। ওকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো আমরা জানতে পারতাম টুলং আর দোতারার উৎস কোথায়। ও তো পাহাড়েই ঘুরে বেড়ায়। হয়তো কোনওদিন ও দেখেও থাকবে দুটো নদীর উৎস। কিংবা ওর বাবা-মা কিংবা গাঁয়ের কেউ হয়তো সত্যিই দেখেছে কোথা থেকে বেরিয়ে আসছে দুটো নদী।

কিন্তু কথাটা আমরা লাপলাপকে জিজ্ঞেস করব কী করে ? সাত পাঁচ ভাবার আগেই সঞ্জয়দা বলে উঠলেন, "টুলং।"

আমি বললাম, "দোতারা।"

লাপলাপ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর হাত ধরে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। আঙুল তুলে ওকে দেখালাম উঁচু পাহাড়গুলো। আমরা যে এখনই ফিরে যেতে চাই না তা ওকে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম।

সে বলল, "হিদাকটু।" দু' হাতে সে ঢেউ খেলানোর ভঙ্গি করল।

ওই পাহাড়শ্রেণীর নাম কি হিদাকটু, আমি ও সঞ্জয়দা একসঙ্গে বলে ফেললাম "হিদাকটু। তুমি কি আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে ?"

পরের কথাটা অবশ্য লাপলাপ বুঝতে পারল না। তার বোঝার কথাও নয়। কিন্তু সে এক কথায় রাজি। আমার হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে যায় আর কি! বাড়িতে থাকলে হয়তো এখনও ঘুম থেকে উঠতাম না। কিংবা উঠলেও এখন হয়তো দাঁত মাজতাম, মুখ ধুতাম। এখানে দাঁত মাজা, মুখ ধোয়ার প্রয়োজনই হচ্ছে না। রাত্রে সেই যে নীল ফল খেয়েছি, সারা মুখে এখনও তার সুগন্ধ লেগে আছে।

আমরা এখন আবার পাহাড়ে উঠছি। বেশ কিছুটা ওঠার পর নীচের দিকে তাকালাম। পাতায় ছাওয়া ঘরগুলো চোখে পড়ল। সঞ্জয়দা বললেন, "আট-দশটা বাড়ি নিয়েই একটা গ্রাম। লোকসংখ্যাও বেশি নয়।" মনে-মনে একটা হিসেব কষে তারপর বললেন, "মনে হয় এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে তিনজন করে মানুষ থাকে। কলকাতার কথা ভেবে দ্যাখ। সেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা কত ?"

আমার জানা নেই। কিন্তু সঞ্জয়দা কোন অঙ্ক কষে বললেন, এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে তিনজন করে মানুষ থাকে ? জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হল। কিন্তু তখনই লাপলাপ একটা গাছের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। আমরা দেখলাম একটা ময়ূর বসে আছে। ঘন নীল তার রং। পালকে যেন মোম পালিশ করা হয়েছে। একটা কথা মনে হল। এই রঙের কি বর্ণনা দেওয়া যায় ? দেওয়া যায় না হয়তো, তাই আমরা ময়ূরকণ্ঠী রং কথাটা বলে থাকি।

পথে যেতে-যেতে আরও অনেক পাখি আমাদের চোখে পড়ল। চোখে পড়ল কয়েকটা হরিণ। আমাদের দেখে তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে নিমেষে হারিয়ে গেল। বাঘ, ভালুক অবশ্য চোখে পড়েনি। হয়তো ওরাও আছে চোখের আড়ালে। আমাদের সামনে বেরিয়ে এলে কী হত জানি না, কারণ আমাদের কারও হাতেই কোনও অস্ত্র নেই।

গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে সকালের রোদ এসে পড়েছে। রোদের জাফরি। একটা পাহাড় ছেড়ে আর-একটা পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছতেই আমরা দেখলাম, সামনের পাহাড়গুলো মেঘে ঢেকে গেছে। বোধ হয় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে রোদের চাঁদোয়া। এখানেই চোখে পড়ল, তিন-চারটে পাথরের বাঁধন আলগা করে সরু ফিতের একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে।

পাথরের ওপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লাপলাপ। ওর দেখাদেখি আমরাও সেই পাথরের ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে নীচের বনটা দেখা যাচ্ছে। সেই বনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। সরু স্রোত, রুপোলি বালি। এখান থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে বয়ে যাচ্ছে নদী।

লাপলাপ খুশিতে উচ্ছল হয়ে বলে উঠল, "টুলং।"

তারপর সে আমাদের ঝরনাটা দেখিয়ে দিল। একটা নুড়ি পাথর নিয়ে বড় পাথরের গায়ে আঁকাবাঁকা একটা রেখা টেনে আবার বলল, "টুলং! টুলং!"

মণিবাবুকে গিয়ে এবার অন্তত বলতে পারব, টুলং নদীর উৎস আমরা দেখে এসেছি। কিন্তু দোতারা নদীর উৎস ? তা কি ওই মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের কোলে ?

ওদিকে ঝিপঝিপে বৃষ্টি। আমরা সেই বৃষ্টির পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকলাম। পথের দু'পাশে মানকচুর মতো বড়-বড় পাতাঅলা গাছ। লাপলাপ দুটো পাতা ছিঁড়ে আমার ও সঞ্জয়দার হাতে ধরিয়ে দিল। নিজেও ছিঁড়ে নিল একটা পাতা। ছাতার মতো সেই পাতা মাথায় ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বৃষ্টির রাজ্যে এসে পড়েছি। এই বৃষ্টি গা সপসপ করে ভিজিয়ে দেয় না। গায়ে শুধু ঠাণ্ডা আঁচড় লাগে।

একটু পরেই বৃষ্টি ফুরিয়ে গিয়ে রোদ উঠল। পাহাড়ের ফাঁকে নীল আকাশ হালকা রোদে ঝিলমিল করছে। তার গায়ে তুলি দিয়ে আঁকা রামধনু।

"দ্যাখ, আমরা রামধনুর দেশে এসে পড়লাম।" সঞ্জয়দা বললেন। "এক পাহাড়ে রোদ, আর-এক পাহাড়ে বৃষ্টি। প্রকৃতির চেয়ে বড় শিল্পী আর কেউ নেই।"

কথাটা নতুন নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে কথাটা ভারী ভাল লাগল। রামধনুর দেশে এসে পড়েছি, ভাবতেই কেমন লাগে! কিন্তু লাপলাপ আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? সে কি আজ দোতারা নদীর উৎসও আমাদের দেখাবে ? এদিকে বেলা বেশ বেড়ে গেছে। খিদে পাচ্ছে। পাহাড়ে ওঠানামা করেও সারা শরীরে ক্লান্তি অনুভব করছি।

সঞ্জয়দাকে কথাটা বলতেই তিনি চটে গেলেন। সে কী রাগ! "খিদে-তেষ্টার ব্যাপারটা ভুলে যা। দেখছিস না, কোথায় এসে পড়েছি! আশ্চর্য! এখন কি কারও খিদে পায়, না খিদে লাগা উচিত। ভুলে যা, সব ভুলে যা।"

ভোলেনি লাপলাপ। সে একটা পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছে। আমরা ওকে খুঁজছি। এমন সময় দু' হাত ভর্তি ফল নিয়ে সে হাজির হল।

অনেকটা স্ট্রবেরির মতো দেখতে এই ফল। তবে, এর রং একেবারে হলুদ। লাপলাপ কয়েক থোকা ফল আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "ভিনতুর।" ফলের নামটাই সে হয়তো আমাদের জানিয়ে দিল। সঞ্জয়দা খেয়ে বললেন, "একটু টক-টক লাগছে।" খাওয়ার পর আমারও তা-ই মনে হল। পাকা কমলালেবুও কখনও-কখনও এরকম টক হয়।

কয়েকটা ফল আমরা খেয়ে ফেললাম। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ দুটোই হয়ে গেল। তারপর আবার পথ চলতে শুরু করলাম। আবার শুরু হয়েছে বৃষ্টি। সামনের পাহাড় ঝাপসা হয়ে গেছে। ছাই রঙের মেঘ পাহাড়ের প্রায় মাঝখানে নেমে এসে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে। দাঁড়িয়ে পড়লাম। বৃষ্টির এই ছবি দেখতে ভাল লাগল। এখানে যদি আমাদের একটা বাড়ি থাকত। জানলায় দাঁড়িয়ে তা হলে দিনের পর দিন এই বৃষ্টি দেখতাম। এতটুকুও ক্লান্ত হতাম না।

তবে, বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেল না। লাপলাপ আমার হাত ধরে টানতে লাগল। সে আমাদের দোতারা নদীর উৎস না দেখিয়ে ছাড়বে না। মণিবাবু বলেননি যে, "তোমরা ওই দুই নদীর উৎস দেখে এসো।" কিন্তু আমরা ওঁকে তাক লাগিয়ে দেব। এটা ভেবেই আমরা লাপলাপের সঙ্গ নিয়েছি। আমরা যে পরিশ্রম করছি, তা নিশ্চয় সফল হবে।

এবং সত্যিই তা-ই হল। আমরা দেখলাম, ছাই রঙের মেঘ যে পাহাড়ের প্রায় মাঝখানে নেমে এসে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে, সেখানেই দোতারা নদীর উৎস। শুকনো পাথরের আড়াল থেকে সে বেরিয়ে আসেনি। পাহাড়ের প্রায় মাঝখানটায় ছোট একটা হ্রদ। সেখান থেকেই জলের ধারা গড়িয়ে নীচে নামছে। তীব্র গতি জলের। যেন একটা বাঁধ ভেঙে গেছে। বোঝা গেল, দোতারা নদীর উৎসে প্রায় সব সময়ই বৃষ্টি হয়। তাই, দোতারার জলের অভাব হয় না।

এবার আমাদের ফেরার পালা। কিন্তু এখান থেকে টুলং নদীর ধারে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে। হয়তো আরও বেশি সময় লাগবে। সঞ্জয়দা বললেন, "আজকের রাতটা আমরা ওই গাঁয়েই কাটিয়ে দেব।"

আমি বললাম, "সেটাই ভাল। ফিরে যাওয়ার আগে লাপলাপের মা-বাবার সঙ্গে দেখা করা দরকার। না হলে ওঁরা কী ভাববেন।"

উৎস থেকে ফেরার সময় লাপলাপের কিন্তু আগের সেই চনমনে ভাবটা দেখা গেল না। মনে হচ্ছে, সে যেন আমাদের চেয়েও বেশি ক্লান্ত। মাথা সামনে ঝুঁকে পড়ছে। পা টলছে। মাঝেমধ্যেই হোঁচট খাচ্ছে পাথরে। ও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, এবার আমাদের ফিরে যাওয়ার সময় হল। সেইজন্যই কি ওর মন খারাপ? অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না? কথাটা ভেবে আমারও মন খারাপ হয়ে গেল।

"লাপলাপ, এই লাপলাপ!" আমি ওকে ডাকলাম। সে কোনওরকমে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। দুটো চোখ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। করুণ দৃষ্টিতে সে আবার আমাকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল।

"কী হয়েছে তোমার?" আমি ওর হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করা মাত্রই চমকে উঠলাম। তারপরই হাত রাখলাম কপালে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা।

সঞ্জয়দাকে বলা মাত্রই তিনিও ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "তাই তো। বেশ জ্বর। এতটা পথ ওকে এভাবে যেতে দেওয়া ঠিক নয়।" সঞ্জয়দা ওকে কোলে তুলে নিলেন।

কিন্তু এভাবে তো ওকে নিয়ে এতটা পথ হাঁটা যায় না। একে তো সরু পথ, তার ওপর সেখানে পাথর ছড়ানো। যে-কোনও সময় পা পিছলে যেতে পারে। আলগা পাথরে পা পড়লে হুমড়ি খেয়ে পড়ারও আশঙ্কা থেকে যায়। সরু পথের দু'পাশে ঝোপঝাড়। একটু টালমাটাল হলেই কাঁটাঝোপে গা ছড়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে জামা বা প্যান্ট। লাপলাপকে কোলে নিয়ে পথ চলতে সঞ্জয়দার প্রথমে অসুবিধেই হচ্ছিল। এবার তিনি ওকে অন্যভাবে বইতে লাগলেন। লাপলাপের মাথা ও দুটো হাত সঞ্জয়দার কাঁধের পেছনে লেগে থাকল। তিনি ওর কোমরটা জাপটে থাকলেন। এতে ওঁর চলার সুবিধেই হল।

লাপলাপকে নিয়ে আমরা দু'জনেই চিন্তায় পড়লাম। মনে হচ্ছে, ও অচেতন হয়ে পড়েছে। এদিকে পথও আর ফুরোতে চায় না। একবার তো মনে হল, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। কিছুক্ষণ থামলাম। এদিক-ওদিক দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর আবার চলতে শুরু করলাম। কোথায় যে একটু দাঁড়াব, বিশ্রাম নেব, তারও উপায় নেই। লাপলাপকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি পৌঁছে দেওয়া দরকার।

"তার আগে ওর মাথাটা ধুয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। কিছুটা আরাম পাবে।" সঞ্জয়দা বললেন।

"তা হলে সেই টুলংয়ের উৎসে যেতে হবে। তার আগে আর কোথায় জল পাবে?" আমি বললাম।

টুলংয়ের উৎসে সেই যে পাথরের চাতাল, সেখানে আমরা লাপলাপকে শুইয়ে দিলাম। তারপর আমি ও সঞ্জয়দা আঁজলা করে জল এনে ওর মাথায় দিতে থাকলাম। একবার ও চোখ তুলে তাকাল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। তারপরই চোখ বন্ধ করল আবার।

মাথায় কিছুক্ষণ জল দেওয়ার পর আমি আমার জামা খুলে ওর মাথা মুছিয়ে দিলাম। সঞ্জয়দা আবার ওকে কোলে তুলে নিলেন। সূর্য পশ্চিমের দিকে যেতে শুরু করেছে। সন্ধের আগেই আমাদের পৌঁছতে হবে। লাপলাপের বাবা-মা নিশ্চয় খুব চিন্তা করছেন।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম ওর গাঁয়ে। তখনও আকাশে সূর্যের শেষ আলোটুকু মুছে যায়নি। চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়নি নিঃসঙ্গ একটি তারা। সারা পথ আমরা ভাবছিলাম, লাপলাপের মা-বাবা কী বলবেন? ওঁদের সুস্থ, তরতাজা ছেলেকে নিয়ে আমরা বেরিয়েছিলাম, মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সেই ছেলেকে নিয়েই আমরা ফিরছি। তবে সে এখন অচেতন। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ওর গা। এতটা পথ চলার ধকল হয়তো ও সহ্য করতে পারেনি।

লাপলাপের মা-বাবা আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠকুটো সাজাচ্ছিলেন। রাতের অন্ধকারে ভয়ঙ্কর জন্তু-জানোয়ার এসে যাতে হামলা না করে, তারই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুরক্ষিত করছিলেন ওঁরা। সঞ্জয়দার কোলে লাপলাপকে দেখে ওঁরা দু'জনেই তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন। লাপলাপের মা কোলে তুলে নিলেন ছেলেকে। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা প্রথমেই দেখে নিলেন। নাকের নীচে হাত রাখার পরেই তিনি ওর কপালে, গায়ে হাত দিলেন। বুঝলেন জ্বর, প্রচণ্ড জ্বর। তখনই ওকে নিয়ে ওঁদের ঘরে ঢুকে গেলেন। পেছন পেছন দৌড়ে গেলেন লাপলাপের বাবা।

আমরা অনেকক্ষণ মরা আলোয় দাঁড়িয়ে থাকলাম। সঞ্জয়দা বললেন, "ওঁরা যদি ভাবেন যে, আমরা ওঁর ছেলের কোনও ক্ষতি করেছি? তা হলে আর আমাদের আস্ত রাখবেন না।"

"স্বার্থপরের মতো কথা বোলো না। আগে ছেলেটার কী হয় দ্যাখো।"

"ধরো, যদি খারাপ কিছু হয়?"

"খারাপ বলতে? তুমি কি ভাবছ, মরে যাবে?"

"না, আমি, মানে—" আমতা-আমতা করে কিছু একটা বলার

চেষ্টা করলেন সঞ্জয়দা।

"আজেবাজে কথা বোলো না।" আমি বললাম। টিয়াচরার পাহাড়ে আমাদের অস্টিন গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ার সময় মা আমাকে ঠিক এভাবেই বকুনি দিয়েছিলেন।

"আমি কী বলছি, তা ভাল করে না শুনেই—"

"দরকার নেই শোনার, আমি লাপলাপের বাড়ি যাচ্ছি।" আমি ওর বাড়ির দিকেই দৌড়লাম। কে আমার পেছন থেকে হাত টেনে ধরল? কিন্তু আমাকে আটকাতে পারবে না। আমার গায়ে এখন অসুরের শক্তি ভর করেছে। হ্যাঁচকা টানে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। পেছন থেকে যে আমার হাত টেনে ধরেছিল, সে আচমকা হাতটা ছেড়ে দিতেই আমি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়লাম।

কিছু বুঝবার আগেই চেনা একটা কণ্ঠস্বর আমার কানে এল। "মান্তু, আর যা'ই করো, বোকামি কোরো না।"

ধুলো থেকে কোনওরকমে শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে তুললাম। এখন আর কেউ নেই যে, গাছের নরম পাতা দিয়ে আমার গায়ের ধুলো ঝেড়ে দেবে। জীবনে মায়ের স্নেহের যে কী প্রয়োজন, তা এই মুহূর্তে আরও বেশি করে অনুভব করলাম।

"লাপলাপ এখন ওর মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। শিয়রে জেগে আছেন ওর বাবা। ও আস্তে-আস্তে সুস্থ হয়ে উঠবে। তুমি ওখানে গেলে ওঁরা বিব্রত বোধ করবেন। ওঁদের শান্তি নষ্ট করার কোনও অধিকার তোমার নেই।" গম্ভীর গলায় আমাকে এই কথাগুলো যিনি বললেন, তিনি আর কেউ নন, অরিন্দমবাবু। বডিবিল্ডার অরিন্দম সান্যাল। ভারী, বিরাট একটা পাথর যিনি অক্লেশে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারেন, তাঁর লৌহমুষ্টি যদি কারও হাত পেছন থেকে টেনে ধরে রাখে, তা হলে তা ছাড়ায় কার সাধ্যি।

মুখ থুবড়ে পড়ার যন্ত্রণাটা আপাতত ভুলে গিয়ে অস্ফুট গলায় আমি বলে উঠলাম, "আপনি এখানে এলেন কী করে?"

"আমি একা আসিনি। ওই দ্যাখো—" অরিন্দমবাবু এবার সঞ্জয়দাকে দেখালেন। সঞ্জয়দা দাঁড়িয়ে ছিলেন ওঁর পেছনেই। সঞ্জয়দাকে নয়, আমি দেখলাম সঞ্জয়দার কাঁধে নিশ্চিন্তে বসে-থাকা মহারাজকে।

মহারাজের সঙ্গে সঞ্জয়দার কতদিন পরে দেখা। সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে চেনা মানুষকে পেয়ে মহারাজ খুশি হয়ে ওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে।

॥ ৯ ॥

আমার অভিমান হল। মহারাজ তো প্রথমে আমার কাছে আসতে পারত। না এসে সে কেন আগে সঞ্জয়দার কাছে গেল? একে তো মুখ-থুবড়ে পড়ার ব্যথা, তার ওপর মহারাজের এই অবজ্ঞা? এ কি সহ্য করা যায়? অভিমান নয়, আমার কষ্ট হয়েছে।

কিন্তু তখনই মনের মধ্যে কে আমাকে বলে উঠল, "সংসারে বড় হতে হলে কষ্ট পেতে হবে। মানুষ অনেক কষ্ট পেয়েই বড় হয়। অবজ্ঞা, অবহেলা এসব সহ্য করতে না পারলে আর মানুষ কিসে!" গলাটা আমার চেনা। আমার বাবা কথা বলছেন। সেই যে অ্যাম্বুলেন্সে করে তিনি চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলেন, তারপর থেকে মাঝেমধ্যেই তিনি ফিরে এসেছেন আমার কাছে, আমার মনের মধ্যে। বুকের কাছে, খুব কাছে। তিনিই আমাকে বলেছিলেন, "মনের শক্তিটাই আসল শক্তি।" মনে-মনে বাবাকে আমি প্রণাম করে বললাম, "বাবা, তুমি আছ, আমার সব কাজের মধ্যে আছ। আমি আরও সাহসী হয়ে উঠব, কোনও আঘাত, কোনও অপমান আমাকে টলাতে পারবে না।"

মহারাজ এখন আমার কাছে উড়ে এল। প্রথমে আমার কাঁধে এসে বসল। আমি এক ঝটকায় ওকে নামিয়ে দিলাম। তখনই আবার হাতে এসে বসল। আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে থাকল। এবার আর ওকে ঠেলে ফেলে দিলাম না। মমতা হল। আহা, ওর কী দোষ! ও তো আমার জন্যই এতদূর এসেছে!

অরিন্দমবাবুও কথাটা বললেন, "মাস্তু, তুমি জানতে চেয়েছিলে, আমি এলাম কী করে? মহারাজই আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছে।"

"আপনাকে তো পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে? এই রাস্তায় তো আপনার জিপ চলবে না।"

"হেঁটে আসতে ভালই লাগল। মহারাজ এল আমার সামনে উড়ে-উড়ে, আর আমি ওর পেছন-পেছন এলাম।"

"রন-পা নেননি?"

"রন-পা নেব কেন? বলতে পারো, উড়ন্ত পাখির পেছন-পেছন জগিং করে আসতে হয়েছে।"

"মণিবাবু কি আপনাকে কোনও খবর দিয়েছিলেন?" আমি জানতে চাইলাম।

"মণিবাবু? আমাকে?" হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন অরিন্দমবাবু। কী যেন ভাবতে লাগলেন।

আকাশের আলো নিভে গেছে অনেক আগেই। চাঁদ উঠেছে, উঠেছে অনেক তারা। কাঠকুটোর আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক আগেই। তার লাল আভা লেগেছে পাতায় ছাওয়া ঘরগুলোর দিকে। খোলা আকাশের নীচে, এই আগুনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি। আগুনের তাপ বাড়ছে গায়ে। আমি একটু সরে দাঁড়ালাম।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, অরিন্দমবাবুর সেই আনমনা ভাবটা এখনও কাটল না। ওঁকে আবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মণিবাবু কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন? আমরা যে এখানে এসেছি, আপনি খবর পেলেন কী করে?"

অরিন্দমবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় লাপলাপের বাবা বেরিয়ে এলেন। তিনি হাত নেড়ে আমাদের বোঝাতে চাইলেন, লাপলাপ এখন একটু সুস্থ আছে। তারপর উনি দু'চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। আমাদের বুঝে নিতে হল, লাপলাপ এখন ঘুমোচ্ছে।

সুতরাং ওকে দেখতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। কাল যে ঘরে আমরা রাত কাটিয়েছি, সেই ঘরেই এখন আমাদের যাওয়ার নির্দেশ দিলেন লাপলাপের বাবা। বোবা মানুষ যেভাবে অঙ্গভঙ্গি করে নিজের মনের কথা বুঝিয়ে দেয়, উনিও তাই করছেন। হাত নেড়ে তিনি এটাও বুঝিয়ে দিলেন, আমরা যেন কাল ভোরেই এখান থেকে চলে যাই।

কেন? লাপলাপকে পুরোপুরি সুস্থ না দেখে আমি যাব না। সেটাই ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কোনও লাভ হল না। উনি বারবার হাত নেড়ে আমাদের বললেন, ভোরবেলার পর আমরা যেন এক মুহূর্তও এখানে না থাকি।

ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হল। অতিথি-আপ্যায়নে ওঁদের কোনও ত্রুটি নেই। আমাদের সঙ্গে ওঁরা সবসময় ভাল ব্যবহার করছেন। লাপলাপের সঙ্গেও আমার এক বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও উনি কেন আমাদের চলে যেতে বলছেন?

"আমরা থাকলে ওঁরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তাই ভোরেই আমাদের চলে যাওয়া উচিত।" অরিন্দমবাবু বললেন।

ওঁর কথাটা হেঁয়ালির মতো মনে হল। আমরা এখানে থাকলে ওঁদের কী ক্ষতি হচ্ছে? কেনই বা ওঁরা অসুস্থ হয়ে পড়বেন? অরিন্দমবাবুই এর ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন, "আমাদের সংক্রমণের হাত থেকে ওঁদের বাঁচাতে হবে। তোমাদের মতো বাইরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলেই লাপলাপ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মায়ের কোলে এখন ওর অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।"

"আমরা কি কোনও সংক্রামক রোগজীবাণু বয়ে এনেছি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"তোমার, আমার মতো বাইরের মানুষই ওদের কাছে বিপজ্জনক। লাপলাপের সঙ্গে তোমার কোনওদিনই বন্ধুত্ব হবে না। যদি ওর সঙ্গে মেলামেশা করো, তা হলে সে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে। বাইরের মানুষই ওদের সংক্রামিত করছে।" অরিন্দমবাবু বললেন। তিনি স্বাস্থ্যচর্চা করেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, তিনি অহেতুক মিথ্যে কথা বলছেন না।

"এই সংক্রমণ থেকে বাঁচার মতো কোনও প্রতিরোধক ব্যবস্থা ওদের শরীরে গড়ে ওঠেনি। এর আগে বহুবার এখানে মড়ক দেখা দিয়েছিল। যতবার ওরা বাইরের মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, ততবারই ওরা মহামারীর শিকার হয়েছে। দেখছ না, ওদের লোকসংখ্যা কত কম?"

অরিন্দমবাবুর কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। লাপলাপের সঙ্গে মেলামেশা করলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়বে, এই কথাটাই বিশ্বাস করতে মন চাইল না। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় কী!

রাতের বেলা আজও ঘুম এল না আমার। সঞ্জয়দা কিন্তু দিব্যি ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। বসে-বসে ঢুলছেন অরিন্দমবাবু। একটু নড়াচড়া করলেই শুকনো পাতার গালিচায় মচমচ করে শব্দ হচ্ছে।

এইরকমই এক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সঞ্জয়দার। তিনি আবার পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মাথার কাছেই এক কাঁদি পাকা কলা ও কয়েকটা ফল। সামনের দেওয়ালে আজও খানিকটা কাঁচা গোবর থাবড়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে আজও জ্বলছে থোকা-থোকা জোনাকি পোকা।

অরিন্দমবাবু একবার চোখ খুলে আমার দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ঘুমোওনি?"

"না। ঘুম আসছে না।"

"ভোর হয়ে এল।"

"ভোর হলেই আমরা চলে যাব?"

"হ্যাঁ।"

"লাপলাপের সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না?"

প্রশ্নের উত্তর দিলেন না অরিন্দমবাবু। মাঝেমধ্যেই তিনি এরকম নিরুত্তর থাকেন। আমি যখন ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মণিবাবু কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমরা যে এখানে এসেছি আপনি খবর পেলেন কী করে, তখনও তিনি এরকম নিরুত্তর ছিলেন। আমি ওঁকে আবার প্রশ্নটা করলাম, "মণিবাবু কি আপনাকে কোনও খবর দিয়েছিলেন? না হলে আপনি এখানে এলেন কী করে?"

এবার কিন্তু সরাসরি উনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বললেন, "হ্যাঁ। ভদ্রলোকের এই একটা বড় গুণ। কার কী দরকার, তা বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তোমাদের জন্যই এখানে আমার আসা দরকার। উনি ভয় পাচ্ছিলেন, যদি তোমরা কোনও বিপদে পড়ো!"

"না, উনি ভয় পান না। বরং যারা ভয় পায়, তাদের ভয়টা উনি কাটিয়ে দেন। একসময় আমিও খুব ভয় পেতাম। কিন্তু মণিবাবুই আমাকে সাহসী করে তুলেছেন।"

"এরকম মানুষ সত্যিই বিরল। টিয়াচরার পাহাড়ের সেই ঘটনাটা নিশ্চয় ভুলে যাওনি।"

"ভারী পাথরটা দু' হাতে ঠেলে আপনি সরিয়ে দিলেন। আমাদের গাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর-একটু হলেই আমরা দুর্ঘটনায় পড়তাম। আপনি আপনার জিপে লিফ্‌ট দিয়েছিলেন আমাদের।"

"এটা এখনও আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়।"

"কেন?"

"তার আগে মণিবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ঘটনার পরের দিন উনি আমার বাড়ি এসেছিলেন। সেদিনই প্রথম আলাপ। কিন্তু আসল ঘটনাটা কী জানো? মণিবাবুই সেই সন্ধেয় আমাকে টিয়াচরার পাহাড়ে পাঠিয়েছিলেন। অথচ তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পরেই পুরো ব্যাপারটা আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।"

"তা কি সম্ভব?"

"বিশ্বাস করো, সত্যিই তাই হয়েছিল। সেদিন আমি বাড়িতে বসে বন্ধুদের নিয়ে ফিল্ম দেখছিলাম। বন্ধুরাই পরে আমাকে বলেছিল, কার একটা ফোন পেয়ে আমি তখনই আমার জিপটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।"

"এত বড় একটা ঘটনা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া সম্ভব?"

"সেটাই তো রহস্য। যত ভাবি, ততই অবাক হই। অথচ আমার স্মৃতি এত দুর্বল নয়। মনে হয়, মুহূর্তে কিছু একটা ভর করেছিল আমার ওপর। না হলে অত বড় পাথর সরালাম কী করে। এক-একটা সময় আসে, যখন মানুষ অতিমানব হয়ে উঠতে পারে। পরিস্থিতি মানুষকে বদলে দেয়।

"এমন কী হতে পারে, মণিবাবু আপনার ছদ্মবেশে আমাদের উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন?"

"আমার বয়স, আর ওঁর বয়সে তো অনেক তফাত। বয়সটা উনি লুকোবেন কী করে?"

"কোনওভাবে কামুফ্লাজ করা যায় না? কোনও-কোনও প্রাণী তো দারুণ কামুফ্লাজ করে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু উনি অহেতুক ওভাবে কামুফ্লাজ করতে যাবেন কেন? সম্ভব, অসম্ভব তো পরের কথা। কেন করবেন, সত্যিই তার কোনও প্রয়োজন ছিল কি না, সেটাই মূল প্রশ্ন। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া?"

"উনি তো বিষ্ণু অবতার নন যে, নানা রূপ পরিগ্রহ করবেন? দরকার হলে একবার কাছিম হয়ে যাবেন, না হয় মাছ?" সঞ্জয়দা ধড়মড় করে উঠে কথাটা বলে বসলেন। "আসলে, ভদ্রলোকের নিখুঁত একটা পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা আছে। সেটাকেই তিনি কাজে লাগান। সেটাই তাঁর শক্তি।"

"কিন্তু কে কী ভাবছে, সেটাও তিনি আগেভাগে বলে দেন কী করে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বললাম তো, ওটাও ওঁর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার মধ্যেই পড়ে। তিনি এক-একটা লোককে ভাল করে স্টাডি করেন। এক-একটা লোকের স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ সব কিছু তিনি বোঝার চেষ্টা করেন। ফলে কে কী ভাবছে, কে কী বলছে বা করছে তার অনেকটাই তিনি আগেভাগে বলে দিতে পারেন। এখন পর্যন্ত তাঁর সব কথাই মিলে গেছে। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, এখনও কঠিন কোনও পরীক্ষায় তাঁকে পড়তে হয়নি।"

সঞ্জয়দার কথায় আমার গা-পিত্তি জ্বলে উঠল। আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, "এসব কথা আমি মানি না, মানব না।"

"তাতে কিছু যায়-আসে না।" সঞ্জয়দা চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাটা বললেন। "কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে সব কিছু ভালভাবে যাচাই করে নেওয়া উচিত।"

"এটা আর নতুন কথা কী!"

"পুরনো কথা কিন্তু সবসময় পুরনো হয়ে যায় না।"

"এভাবে ঝগড়া করার মানে হয় না।" অরিন্দমবাবু বললেন। "মণিবাবু তোমাদের দু'জনকেই খুব ভালবাসেন। তোমাদের কথা ভেবেই উনি আমাকে পাঠিয়েছেন। মান্তু, তোমার মায়ের অনুমতি নিয়ে উনিই আমার সঙ্গে মহারাজকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। উনি জানতেন, মহারাজ আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে।"

"কেউ নতুন কিছু করলে উনি সবসময়ই উৎসাহ দেন। এই নতুন দেশে উনিই আমাদের পাঠিয়েছেন।" কথাটা সঞ্জয়দা জানেন, জানেন অরিন্দমবাবু। তবু না বলে পারলাম না। আসলে, সঞ্জয়দার ওপর আমার রাগ তখনও কমেনি।

এসব কথা আরও অনেকক্ষণ এগোতে পারত। কিন্তু বাইরে তখন পাখিদের ঘুম ভেঙেছে। আলো ফুটে উঠেছে। ঘুম-জড়ানো চোখে দু-একটা তারা অবশ্য তখনও জেগে আছে আকাশে।

অরিন্দমবাবু বললেন, "মান্তু, এবার আমাদের যেতে হবে।"

"লাপলাপকে না দেখে যাব না। তাতে যা হয় হোক।"

"ওরা আপত্তি করবে। যাওয়ার আগে এভাবে কেন মিছিমিছি ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা খারাপ করছ? লাপলাপ তো তোমার বন্ধু। তুমি কি তোমার বন্ধুর ভাল চাও না?"

প্রচণ্ড মন খারাপ নিয়ে ঘর থেকে বেরোলাম। পাতার ঘরে শুকনো পাতার মতো পড়ে রইল চিরদিনের কিছু স্মৃতি। লাপলাপ ভাল হয়ে উঠুক, আমি শুধু এই প্রার্থনাই করলাম।

আলো আর-একটু পরিষ্কার হয়েছে। পাহাড়ের গাছপালায়, আকাশে কোথাও কোনও মলিনতা নেই। আমার সঙ্গে শেষ দেখা করার জন্য লাপলাপ তখন ওর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ওকে দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। প্রথম দেখার সময় সে আমাকে উপহার দিয়েছিল ফুল। আজ এই বিদায়ের মুহূর্তে আমার হাত শূন্য।

কিন্তু ওর দু' হাতে এখন নতুন কিছু ফল। দু' হাতের মুঠোয় যতটা ধরতে পারে, তার চেয়েও অনেক অনেক ফল নিয়ে সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওর বাবা ও মা পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি ওর দিকে এগিয়ে এলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "জ্বর ছেড়ে গিয়েছে তো?" তারপরে ওর কপালে হাত রাখলাম। জ্বর নেই। মাথা নেড়ে সেই কথাটাই জানিয়ে দিল লাপলাপ।

আমি বললাম, "ভাল থেকো, খুব ভাল থেকো। আবার আমি আসব। তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।"

আমার ভাষা সে এবারও বুঝল না। একবার শুধু হাত নাড়ল। আমি দেখলাম, ওর দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওরই মধ্যে সে আমার মহারাজের পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। ওকে আদর করল অনেকক্ষণ।

এর পরেই কি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হয়? আমি কি সত্যিই আবার লাপলাপের কাছে আসতে পারব? না কি, ওকে শুধু সান্ত্বনাই দিলাম?

আসার সময় বারবার পেছন ফিরে তাকালাম। পাহাড়ি পথে বাঁক ঘোরার আগে পর্যন্ত দেখলাম লাপলাপ ঠায় ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে পাথুরে মূর্তির মতো ওর মা ও বাবা।

চলে আসার আগে ওকে দিয়েছিলাম একগুচ্ছ ফুল। সেই ফুল নিয়ে লাপলাপ দাঁড়িয়ে থাকল সারাক্ষণ। তারপর একসময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

॥ ১০ ॥

টুলং নদী পেরিয়ে দেখলাম পাথরের আড়ালে আমাদের রন-পা, জুতো, কিটব্যাগ সবই সেই আগের মতো আছে। চুরি তো দূরের কথা, ওগুলো নাড়াচাড়া করে দেখার লোকও এখানে নেই। দু'রাত্রি পর আমরা এখানে ফিরে এলাম। কতটুকু বা সময়। এরই মধ্যে মনে হচ্ছে জুতো না পরেই তো দিব্যি হেঁটে বেড়ালাম। কোনও কষ্টই তো হয়নি। সঞ্জয়দা যে ওঁর কিটব্যাগ নিয়ে যাননি, তার জন্যও তো ওঁর কোনও অসুবিধে হল না। যেখানে গিয়েছিলাম, সেখানে এসব জিনিসের কোনও দরকারই নেই। আর এখন এসব জিনিস আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

টুলং নদী পেরিয়ে আসার সময় হাঁটু পর্যন্ত ভিজে গেছে। গায়ের জামা খুলে পা মুছে নিলাম। এবার জুতোজোড়া পরব।

এমন সময় সঞ্জয়দা বলে উঠলেন, "সাবধান মান্তু, জুতোজোড়ায় হাত দিস না।"

কেন উনি এরকম হুঁশিয়ারি দিলেন তা তখনও বুঝতে পারিনি। আমি দেখলাম সঞ্জয়দা নিচু হয়ে বসে জুতোজোড়া লক্ষ করছেন। ওঁর দেখাদেখি আমিও ঝুঁকে দেখতে লাগলাম, এমন কী ঘটল।

"ধুলোয় এই দাগটা দেখেছিস ?" সঞ্জয়দা বললেন।

সরু একটা চাকা ধুলোর ওপর দিয়ে গেলে যেরকম দাগ হয়, সেরকম একটা দাগ জুতোজোড়ার কাছে গিয়ে থেমে গিয়েছে। সঞ্জয়দা ওই দাগটাই আমাকে দেখালেন।

"দ্যাখ, জীবনে কোনও অভিজ্ঞতাই ফেলে দেওয়ার নয়। সেই যে বেদেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম মনে পড়ে ? তোকে তো বলেছিলাম ?"

"হ্যাঁ।"

"সেই অভিজ্ঞতাটাই এবার কাজে লাগবে। আমার চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। ওই জুতোজোড়ার একটায় পা ঢোকালে আর দেখতে হত না।"

"কেন ? কী এমন বিপদ ঘটত, শুনি।"

"ওই দাগটা দ্যাখ। দাগ দেখে আমি বুঝতে পারি কোনটা বিষধর সাপ, কোনটা নয়। বুঝতে পারছি, তোর এক পাটি জুতোর ভেতরে ঢুকে সে আরাম করে বসে আছে। হয়তো ঘুমনোর ভান করছে।"

আমি কিছু বলার আগেই ওই এক পাটি জুতোর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সঞ্জয়দা হাতদেড়েক লম্বা, লিকলিকে একটা সাপ বের করে আনলেন। সাপের গলার কাছটায় উনি এক হাতে চেপে ধরে থাকলেন। ওই অবস্থায় সাপটার সারা শরীর দুমড়ে-মুচড়ে পাক খেতে লাগল।

"কী সাপ জানিস ?" সঞ্জয়দা জিজ্ঞেস করলেন।

"জানব কী করে ? আমি তো আর বেদেদের সঙ্গে সঞ্জয়দার মতো গ্রামে-গ্রামে ঘুরিনি।"

"কালচিতি। মারাত্মক বিষ। এক ফোঁটা বিষেই আস্ত একটা মহিষ মরে যায়। তা হলে মানুষের কী হতে পারে ভেবে দ্যাখ।"

"ভেবে দেখার কিছু নেই। তুমি সাপটাকে কোথাও রেখে এসো।"

"ভাবছি আমার সাপের খামারে নিয়ে গিয়ে রাখব।"

"কেন যে তুমি ওই সাপগুলোকে পুষে রেখেছ ?"

"ঠিক বলেছিস, বাড়ি ফিরে প্রথমেই ওদের ছেড়ে দেব। এটাই হবে আমার প্রথম কাজ।"

"প্রথম কাজ হবে মণিবাবুর সঙ্গে দেখা করা। তারপর যা করার কোরো।"

"এর পর আর কী করার আছে ? আমরা দু-দুটো নদীর উৎস খুঁজে বের করলাম, এটা কি কম কৃতিত্বের ব্যাপার ?"

"এ তো বাড়ির কাছে সাদামাঠা একটা অভিযান। অভিযান না বলে ভ্রমণ বলাই ভাল।"

"তবে হ্যাঁ, সত্যি বলতে কি, আমরা তো আর নিজেরা খুঁজে বের করিনি। ছেলেটো দেখিয়ে দিল বলেই কাজটা সহজ হয়ে গেল। কী যেন নাম ছেলেটার ? কিছুতেই মনে রাখতে পারি না। গুলিয়ে ফেলি।"

"লাপলাপ।"

"অদ্ভুত নাম। হবে না-ই বা কেন ? দেশটাও যে অদ্ভুত।"

"এর পর আরও অদ্ভুত-অদ্ভুত দেশে আমাদের যেতে হবে।"

"মণিবাবু নিশ্চয় আমাদের আরও অনেক আইডিয়া দেবেন।"

মণিবাবুর বাড়িতে আমরা যাওয়ামাত্রই উনি কিন্তু বললেন, "না, এর পর থেকে কোনও আইডিয়াই আর তোমাদের দেব না। যা করার তোমরা নিজেরাই করবে। নরখাদকদের দেশে যাবে, না পাহাড়ের চুড়োয় উঠবে তা ঠিক করার দায়িত্ব তোমাদের। এর পর থেকে আমি আমার কাজটা করব।"

আমি ও সঞ্জয়দা একসঙ্গে বলে উঠলাম, "আপনি যে দায়িত্ব দেবেন, সেটাই আমরা খুশিমনে পালন করব।"

"আমি তো দায়িত্ব দিয়েছিলাম। সেটা তো তোমরা ভালভাবে পালন করেছ। আমার জন্য যে ফল এনেছ, সেটা যে অমৃতফল, জানো ? খবর রাখো ?"

আমরা চুপ করে থাকলাম।

"অবাক হচ্ছ, তাই না ? দোতারা নদীর উৎসে ফলটা ধুয়ে নিয়েছ বলেই ওটা অমৃতফল হয়ে গেছে ?"

"ওটা কি মানুষকে চিরদিনের মতো আয়ু দিতে পারে ?"

"চিরদিনের বলে কিছু আছে নাকি ? সবই সাময়িক। আজ আছে, কাল নেই।"

"কিন্তু ওই অমৃতফল ?"

"ওটাও থাকবে না। কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে আমি ভাবছি ওই ফল কাউকে দিয়ে যাব। কাকে দেব বলো তো ? দেখি, তোমরা আমার মনের কথা পড়তে পারো কি না ?"

আমি ও সঞ্জয়দা আবার একসঙ্গে বলে উঠলাম, "মহারাজকে।"

খুব খুশি হলেন মণিবাবু। উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, "এই তো, তোমাদের ট্রেনিং সম্পূর্ণ হয়েছে।"

ট্রেনিং ! আমি ও সঞ্জয়দা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কিসের ট্রেনিং ? মণিবাবু বললেন, "দোতারা ও টুলং নদীর উৎস দিয়ে তোমাদের হাতেখড়ি। 'এর পর তোমরা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মুখের ভেতরে চলে গিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে তার ঘুম ভাঙাবে।"

"এবার আপনাকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"আমি তো বলেছি, আমার নিজের কাজ আছে। আর দেরি করা যাবে না। এবার আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমার বাড়িঘর, জিনিসপত্র সব তোমরা নিয়ে নাও। এগুলো আর আমার দরকার নেই। মান্তু, আমি জানি তুমি বড় হয়ে আরও শক্তিশালী হবে, খুব গুণী হবে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার মধ্যে বেঁচে থাকব। সঞ্জয়ের মধ্যে থাকবে আমার প্রেরণা। সারাটা জীবন তুমি নিজের মতো কাটিয়ে দিতে পারবে। এটা কম কথা নয়। ক'জন লোকই বা তা পারে !"

মণিবাবুর কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। উনি কি আমাদের হাতে সব তুলে দিয়ে এখানকার পাট চুকিয়ে ফেলছেন ?

"আমার তো আর থাকার দরকার নেই। মান্তু, এবার থেকে আমার সব কাজই তুমি করতে পারবে ?"

"কিন্তু আমাদের ছেড়ে আপনি যাবেন কোথায় ? আমরা আপনাকে যেতে দিলে তো !"

আমাকে বুকে জড়িয়ে মণিবাবু এবার বললেন, "যাও, বাড়ি যাও। মা তোমার জন্য চিন্তা করছেন। সোনালি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি অবশ্য বলে রেখেছি তোমরা আজই এসে পড়বে। তবু তো মায়ের মন। ছেলের জন্য মা তো উতলা হবেনই। দিদি যদি তার ছোট্ট ভাইটির জন্য ব্যাকুল না হয়, তা হলে সংসারে মায়া-মমতা বলে তো কিছু থাকে না।"

এতক্ষণ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছিলাম। এবার আমার দু' চোখ বেয়ে জল নামল। টুলং আর দোতারা নদীর উৎসে জল কোনও বাধা মানে না। আমার দু' চোখ হয়ে গেল দুটি নদীর উৎস।

মণিবাবুর চোখেও জল। উনি আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছেন। আমরা দু'জনেই কাঁদছি। সন্ধে হয়ে এল। জানলার বাইরে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা তারা এক ফালি চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে।

আমি বললাম, "জ্যাঠামশাই, আপনি আমাকে পায়ের ধুলো দিন। আমি যেন আপনার মতো হই।"

"তুমি, সঞ্জয়, তোমরা সবাই আমার হিরের টুকরো। আকাশে ওই চাঁদ দেখছ, ওর রক্ত আমাদের শরীরে বইছে। যারা অনুভূতিপ্রবণ মানুষ, যারা কল্পনা করতে ভালবাসে, নতুন কিছু করার আনন্দে মেতে ওঠে, তাদের শিরায় বয় চাঁদের রক্ত। এটা আমার বিশ্বাস। মানুষ চাঁদে গিয়ে পা রেখেছে, তা বলে তো স্বপ্নের চাঁদকে আমরা ছুটি দিইনি।"

আমি ও সঞ্জয় মুগ্ধ হয়ে ওঁর কথা শুনছিলাম। উনি বললেন, "টুলং নদীর ওপারে, পাহাড়ের কোলে যে গ্রামে তোমরা গিয়েছিলে সেখানে আমিও গিয়েছিলাম ছেলেবেলায়। ওরা মানুষকে ভালবাসে। যেভাবে ওরা তোমাদের দুটো নদীর উৎস দেখিয়ে দিয়েছে, সেভাবেই ওরা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল, কার-কার শিরায় বয় চাঁদের রক্ত। চাঁদ যে আমাদের বড় ভালবাসার মানুষ।"

চলে আসার আগে আবার প্রণাম করেছিলাম জ্যাঠামশাইকে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপের চর। ঘূর্ণিঝড়ে, জলোচ্ছ্বাসে কয়েক লক্ষ মানুষ ওখানে মারা গেছে। যারা কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে গেছে, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

বাড়ি ফিরেই মাকে কথাটা বললাম। টুলং ও দোতারা নদীর উৎস, পাহাড়ে মেঘবৃষ্টির খেলা, লাপলাপের গ্রাম —কত কিছুই তো দেখে এলাম। কিন্তু ওসব কথা বলার সময় এখন নয়। মণিবাবু চলে গেলেন কুতুবদিয়ায়, সন্দ্বীপের চরে—এর চেয়ে বড় খবর আর কী থাকতে পারে!

মা বললেন, "মানুষের সঙ্কটের সময় তিনি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চান। এই গুণ সবার থাকে না।"

"আমাদের বড় একটা সঙ্কটের সময়ও তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন।"

"টিয়াচরার পাহাড়ে?"

"হ্যাঁ। অরিন্দমবাবুকে উনিই পাঠিয়েছিলেন।"

"মানুষ যখন নিজের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে, তখন আর সে উপকারী থাকে না। সে যদি তার বিশেষ গুণগুলোকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবে কাজে লাগাতে চায়, তখন আর তার পক্ষে কারও ভাল কিছু করা সম্ভব হয় না।"

"কিন্তু মা, মণিবাবু ওখানে গিয়ে কী করবেন। যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার কতটুকু তিনি পুষিয়ে দিতে পারেন?"

"সেটা বড় কথা নয়। তিনি তো আর পাঁচজন মানুষের মতোই বাড়িতে থেকে যেতে পারতেন। ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ে যদি সময়টা কাটিয়ে দিতেন, তা হলেও কি কারও কিছু বলার থাকত? মান্তু, আমার মনে হয়, তোমাদেরও ওখানে যাওয়া উচিত।"

"কেন, আমি একা যেতে পারি না?"

"তুমি যদি একা যেতে চাও, আমার আপত্তি নেই। তবে মনে হয়, অরিন্দম সান্যাল ও সঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভাল।"

"তা হলে আমরা কবে রওনা হব মা?"

"উনি তো আজই গেলেন। দু-একদিন পরে গেলেও ক্ষতি নেই।"

কিন্তু কোথায় গিয়ে ওঁকে খুঁজব। উড়ির চর, সন্দ্বীপের চর, কুতুবদিয়া সব তো তছনছ হয়ে গেছে।"

"তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। টুলং ও দোতারা নদীর উৎস খুঁজে বের করার চেয়েও কাজটা কঠিন। আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। শুনেছি, কাপালিকরা শিশুদের ধরে নিয়ে যায়, তাদের বলি দিয়ে সিদ্ধিলাভ করে। মণিবাবু তো কাপালিক নন। তিনি তোমার মধ্যে একটি ধারা বহমান রেখে দিলেন।"

"না মা, আমরা কালই রওনা হয়ে যাব।" সঞ্জয়দাকে খবর দিই, অরিন্দমবাবুর বাড়ি যাই।"

সোনালি বলল, "তুমি ওকে যেতে বলছ মা? কিন্তু ওর লেখাপড়া?"

"লেখাপড়া পরেও হতে পারে। এখন মান্তু যা শিখছে, তা হাজার বই পড়েও শেখা যায় না। দু' রাত বাইরে কাটিয়ে মান্তু একেবারে নতুন মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে।"

"ওর মধ্যে আর কী পরিবর্তন হবে?" সোনালি বলল।

"মনের পরিবর্তনটা কি সবসময় বাইরে থেকে বোঝা যায়? তোর বাবা আমাকে বলতেন, 'কারও জন্য কিছু থেমে থাকে না। হঠাৎ আমি যদি মরে যাই, তোমরা যেন ভেসে না যাও। সেইভাবেই তোমাদের তৈরি হতে হবে।' তোর বাবা নিঃশব্দে আমাকে বদলে দিয়েছেন। আমাকে শক্তি দিয়েছেন। আমি কি কখনও ভেবেছিলাম, এভাবে সংসারের হাল ধরতে হবে? মান্তুও আস্তে-আস্তে বদলে যাচ্ছে। স্বাবলম্বী হচ্ছে। মণিবাবু ওকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন।"

ভোরবেলা আমরা রওনা হয়ে গেলাম। কুতুবদিয়ায় ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব ভাষা আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রকৃতি যতটা উদার ততটাই নিষ্ঠুর। এই নিষ্ঠুরতা আমাদের স্তব্ধ করে দেয়। মনে পড়িয়ে দেয় জীবনের শেষ পরিণতির কথা।

ঘূর্ণিঝড় শেষ। মণিবাবুকে আমরা বিধ্বস্ত গ্রামে-গঞ্জে খুঁজলাম। দিন গেল, রাত গেল, খোঁজার আর শেষ নেই। কোথায় তিনি? আমাদের তিনি সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিজে কোথায় হারিয়ে গেলেন?

চারপাশে ভাঙা ঘরবাড়ি। বড়-বড় গাছ উপড়ে পড়ে আছে। জল এখনও নেমে যায়নি। এখানে-ওখানে পড়ে আছে মৃতদেহ। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আকাশ ঘোলাটে হয়ে আছে। এরই মধ্যে চাঁদ উঠছে আকাশে। লাল চাঁদ। যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক পাখির ডিমের কুসুম। মণিবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিধ্বস্ত মাঠপ্রান্তরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

লাল চাঁদ এখন আমাদের চোখের সামনে। এখনও সে জ্যোৎস্নাময় হয়ে ওঠেনি। চাঁদের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। মনে হল, লাল রক্ত টপ-টপ করে ঝরে পড়ছে তার গা থেকে।

মণিবাবু বলেছেন, চাঁদের রক্ত বইছে আমাদের শিরায়। আমরা বারবার তাঁকে স্মরণ করলাম।

ছুটির অ্যালবাম
সমাধান

ছুটির অ্যালবাম ❑ পৃষ্ঠা ১৩০

১ ১ নং টুপিটি খ-এর, ২ নং টুপিটি ঙ-এর, ৩ নং টুপিটি ঘ-এর, ৪ নং টুপিটি ক-এর এবং ৫ নং টুপিটি হচ্ছে গ-এর।

ছুটির অ্যালবাম ❑ পৃষ্ঠা ১৩১

১ প্রথমে সাজাতে হবে খ নং ছবিটি, তারপর ঘ নং ছবিটি, তারপর ক নং ছবিটি এবং সবশেষে গ নং ছবিটি।

২ ছায়াটি হল গ নং হকি-খেলোয়াড়ের।

৩ প্রতিটি সেটের বর্গক্ষেত্রগুলির মধ্যের সংখ্যাগুলি যোগ করলে যোগফল হবে ২০। তা হলে ডান দিকের সেটটিতে রয়েছে ৪ + ৫ = ৯। তা হলে ফাঁকা বর্গক্ষেত্রটিতে বসবে ২০ − ৯ = ১১। কেননা ৪ + ৫ + ১১ = ২০।

৪
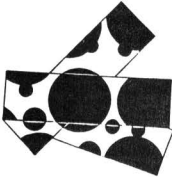
ছুটির অ্যালবাম ❑ পৃষ্ঠা ২৬৭

১ খ-নং ছবিটি।

৩ গ। একটি ক্যামেরা কিনেছেন রামবাবু।

ছুটির অ্যালবাম ❑ পৃষ্ঠা ২৯৪

১ প্রথমে ১ নং বিন্দু থেকে ৬ নং বিন্দু পর্যন্ত একটি সরলরেখা টানতে হবে। তারপর ৭ নং বিন্দু থেকে ৪ নং বিন্দু পর্যন্ত আর-একটি সরলরেখা। এইবার দুটি আয়তক্ষেত্রকে ছোট দুটি সরলরেখা টেনে ভাগ করতে হবে। ৫ নং বিন্দু থেকে ৭ নং — ৪ নং বিন্দুর সরলরেখা পর্যন্ত এবং ৮ নং বিন্দু থেকে ১ নং— ৬ নং বিন্দুর সরলরেখা পর্যন্ত। ব্যস, এইবার গুনে দ্যাখো পাঁচটি ভাগ একদম সমান এবং একটি ভাগ বড়, মোট ছ'টি ভাগ।

২ মোট ৪৮টি ত্রিভুজ আছে ছবিটিতে।

৩ ঘ নং ছবিটি বসবে ফাঁকা ঘরটির মধ্যে। এখানে যে ছবিগুলি রয়েছে, লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এদের তিনরকম মাথা, তিনরকম শরীর, তিনরকম লেজ এবং তিনরকম গোঁফ। উপর-নীচ এবং পাশাপাশি যেভাবে দেখা যাক না কেন—প্রত্যেক সারিতে প্রত্যেকটি একবার করে রয়েছে।

ছুটির অ্যালবাম ❑ পৃষ্ঠা ৪৮২

১ প্রথমে সাজাতে হবে ঘ-ছবিটি, তারপর খ-ছবি, চ-ছবি, ক-ছবি, ঙ-ছবি এবং সবশেষে গ-ছবি।

২ (১) প্যান্টে দুটো সাদা ডোরা। (২) একটি মোজায় সাদা ডোরা। (৩) এক নাম্বার জার্সি গায়ে খেলোয়াড়ের জার্সিতে নাম্বার নেই। (৪) গোলরক্ষকের পজিশন বদলে গিয়েছে। (৫) পাঁচ নাম্বার জার্সি গায়ে খেলোয়াড়ের গেঞ্জির কলার বদলে গিয়েছে,এবং (৬) একজনের বুটে ফিতে বাঁধার ব্যবস্থা নেই।

৩

ছুটির অ্যালবাম ❑ পৃষ্ঠা ৪৮৩

১ ২ নং ছবিটিতে কাঁকড়া, কচ্ছপ এবং গিরগিটি নেই।

কেলেঙ্কারি

হিমানীশ গোস্বামী
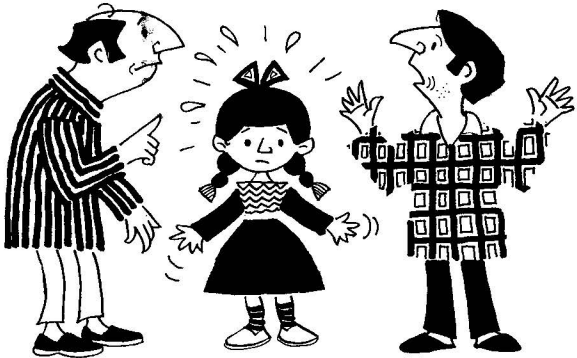
ইয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কেউ তাকে দেখতে য়নি, ভারী ঝামেলার পার। ঝুমু-ঝুমকির সঙ্গে বুইয়া এক াই শুয়েছিল। ওরা ভেবে পেল না, ও থায় গেল। ফ্ল্যাটের বাইরে যাওয়ার া আস্তে করে বন্ধ করে গিয়েছে যাতে য়াজ না হয়। বুইয়া তার বাবা বুর সঙ্গে নাগপুরে এসেছে দীপবাবুর তে। টটবাবু আর দীপবাবু দু'জনে তো-পিসতুতো ভাই। টট নামটা জি-ইংরেজি মনে হলেও আসলে এসেছে তথাগত থেকে। তথাগত ওঁর নাম হয়েছে টট। টটবাবু ছন তাঁর অফিসের কাজে। বুইয়াও ধরেছিল, সেও নাগপুরে যাবে, তার বন্ধু পিউ তার মামাবাড়ি চলে সেও নাগপুরেই। তাকে না বলে গলে ভারী মজা হবে এই মনে করে রেও বেশি করে আবদার জানাতে টটবাবুর কাছে। টটবাবু শেষ পর্যন্ত রয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, আচ্ছা একবার নাগপুরে—কিন্তু খুব গরম প্রেলের গোড়ায়, তাই বলেছিলেন, "এ নাগপুরে না যাওয়াই ওখানে এখন কেউ যায় না।" ব্যস্, আর যাবে কোথায়? সঙ্গে-সঙ্গে বুইয়া বলেছে, "কেন, পিউ তো গিয়েছে, তুমিও তো যাচ্ছ। তা ছাড়া, তুমিই তো বলো এখন নাগপুরে যাওয়ার টিকিটই পাওয়া শক্ত হবে। কেন শক্ত হবে? কেউ যদি নাগপুরে না যায় তা হলে ওইসব টিকিট নিয়ে লোকেরা কী করে?" এই কথার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি টটবাবু। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলেন, "আমার তো আপত্তি নেই, কিন্তু মা যদি মত না দেন তা হলে কিন্তু যাওয়া হবে না।"

বুইয়ার মা শুনে বললেন, "নিয়ে যাও না, যখন বলছে এত করে। চার-পাঁচদিনের ব্যাপার। আর গরম কাকে বলে ওকে যতই বলো ও বুঝবে না। একবার যাক, তখন ও নিজেই বলবে, কেন এসেছিলাম!"

বুইয়া কথাটা শুনে বলল, "কখনও না, আমি বলবই না ও-কথা। গরমে মরে গেলেও বলব না। আচ্ছা মা, সূর্য তো খুব গরম তাই না?"

মা বললেন, "হ্যাঁ, খুবই গরম।"

"তা হলে তার আঁচ কলকাতায় কম আর নাগপুরে বেশি কেন, নাগপুর কি সূর্যের আরও কাছে?"

যাই হোক, সেসব কথা এখন থাক। এখন কথাটা হল এই যে, বুইয়া নাগপুরেও এসেছে এবং ভারী গরমের মধ্যে সকলে যখন 'উঃ কী গরম রে বাবা, আর পারা যাচ্ছে না' বলছে, তখনও বুইয়ার কষ্ট হলেও সে কিছুই বলছে না, তবে যখন সকলে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা সব শরবত খাচ্ছে তখন অবশ্য বুইয়া তাতে আর না করছে না। একবার ভেবেছিল, বলবে শরবতের চেয়ে চা-ই ভাল, কিন্তু সত্যি-সত্যি যদি কাকিমা ওর জন্যই কেবল চা করে দেন, তা হলে খুব খারাপ হবে ভেবে সে-কথা আর বলেনি।

কিন্তু গেল কোথায় বুইয়া? ওর অচেনা জায়গা নাগপুর। রাস্তায় বেরোবে বলে মনে হয় না। সদ্য ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর দীপবাবু তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "ছাত! যাও, ছাত দেখে এসো। নিশ্চয় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাতে ছাতে গিয়ে ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়েছে।"

টটবাবু বললেন, "উঁহু! আমার মনে হচ্ছে সোমাদের বাড়িতে গেছে। কাল যখন ওদের বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম,

মনে নেই সোমার কুকুর প্রিন্সের সঙ্গে ওর ব্যবহার ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বুইয়া সোমাদের বাড়িতেই গিয়েছে। তা ছাড়া, পিউ আছে। ওখানেই আড্ডায় মেতেছে !"

ঝুমু বলল, "কিন্তু সোমাদের বাড়ি তো অনেক দূর !"

ঝুমকি বলল, "সাইকেলে ঠিক তিন মিনিট।"

দীপবাবু বললেন, "যাও তো ঝুমকি, সাইকেল নিয়ে সোমাদের বাড়িতে গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে এসো।"

টটবাবু সিগারেট হাতে ধরে বসে ছিলেন। অনেকক্ষণ পর মনে হল, তাই তো, টানাই হয়নি এতক্ষণ। সিগারেটটা মুখে নিয়ে জোর একটা টান দিলেন।

কিন্তু ধোঁয়া বেরোল না। দীপবাবু বললেন, "আগুনই জ্বালাইনি তো—এই নাও !" বলে লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন।

টটবাবু বললেন, "এইজন্যই ওকে আমি আনতে চাইনি। আরে কোথাও গেলে বলে যেতে কী ক্ষতি হয় ?"

ঝুমকি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঝুমু বলল, "এখন একটা কথা মনে পড়ছে।"

"কী কথা মনে পড়ছে ?" দীপবাবু প্রশ্ন করলেন।

"কাল রাত্রিবেলা বুইয়া প্রিন্সকে বলেছিল, 'কাল সকালেই আসব কেমন— ?'"

"প্রিন্স ! প্রিন্স কে ?" টটবাবু প্রশ্ন করলেন, তারপর বললেন, "ওই কেলে কুকুরটার নাম বুঝি প্রিন্স ?"

কেলে কুকুর শুনে ঝুমুরও মন খারাপ হয়ে গেল। সোমার ওই কুকুরটা খুব ভাল—খুব ভাল। সারা গা কালো রেশমের মতো লোমে ভর্তি। ঝুমু বলল, "প্রিন্স ভারী ভাল কুকুর। দেড়মাস বয়স, কিন্তু এরই মধ্যে খুব বুদ্ধিমান হয়েছে।"

দীপবাবু বললেন, "বুদ্ধিমান হয়েছে না ছাই হয়েছে। পাঁঠার মতো দেখতে হয়েছে।"

"হ্যাঁ বাবা, খুব বুদ্ধিমান হয়েছে। কাল দ্যাখোনি, সোমাদের বাগানে সোমা আপেল ছুঁড়ে দিচ্ছিল আর প্রিন্স সেটাকে কেমন সুন্দর মুখে করে আনছিল ?"

টটবাবু বললেন, "অ্যাঁ ? আপেল মুখে করে আনছিল কুকুর ? তা সেই আপেল কী হল, ফেলে দেওয়া হল নাকি ?"

ঝুমু বলল, "বাঃ রে, ফেলে দেওয়া হবে কেন ? আমরা তো পরে সেটাকে ধুয়ে কেটে খেলাম !"

দীপবাবু চমকে উঠে বললেন, "ওই আপেল কেটে খেলি ?"

ঝুমু বলল, "বাঃ রে, না কেটে ভাগ করব কেমন করে ? একটা তো আপেল ছিল।"

টটবাবু বললেন, "কেলেঙ্কারি ! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, কেলেঙ্কারি করে খাব !"

ঝুমু বলল, "কেলেঙ্কারি কী বাবা ?"

টটবাবু বললেন, "ও একটা সংস্কৃত কথা, তুই বুঝবি না।" বলে একটু হাসলেন।

দীপবাবু বললেন, "বুঝলি না তো কথাটা ?"

ঝুমু বলল, "কেলেঙ্কারি তো খুব খারাপ কথা। খারাপ কিছু গোলমাল পাকানো।"

টটবাবু বললেন, "সেটা তো বাংলায় বলা হয়, কিন্তু সংস্কৃত করলে কথাটা দাঁড়ায় কেলেঙ্কারি, অর্থাৎ কিনা কেলে নামক কুকুরের মাংস দিয়ে রান্না কারি !"

ঝুমু বলল, "আমি বুঝি আর জানি না, কারি কথাটা সংস্কৃত নয়—ও তো ইংরেজি ! আমি বুইয়াকে বলে দেব।" তারপর খুব দৃঢ়ভাবে বলল, "বলে দেবই !"

টটবাবু বললেন, "ওই প্রিন্সটা মহা দুষ্টু কুকুর। উঃ, কী সব কাণ্ড করছিল প্রিন্স। বিচ্ছিরি কাণ্ড।"

"বিচ্ছিরি কাণ্ড করেছিল, প্রিন্স ?" ঝুমু ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু অনেক ভেবে-ভেবেও সে প্রিন্সের কোনও বিচ্ছিরি কাণ্ডের কথা মনে আনতে পারল না। সে ভেবে দেখল, প্রিন্স আপেল মুখে করে এনেছিল, কিন্তু সেটা তো সে ইচ্ছে করে আনেনি। ওরা বলেছিল বলেই তো মুখে করে আনছিল। বেচারার মুখের চেয়ে আপেলটা বড় বলে প্রায়ই পড়ে-পড়ে যাচ্ছিল, আর দাঁতের দাগও আপেলের কয়েক জায়গায় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিচ্ছিরি কাণ্ড তাকে কিছুতেই বলা যায় না। তা ছাড়া, প্রিন্স ওদের চেটে দিচ্ছিল। কয়েকবারই চেটে দিয়েছে। হ্যাঁ, ওটা বিচ্ছিরি একটা অভ্যেস প্রিন্সের। কিন্তু মুখ তো সে বেশি চাটেনি, ও হাত-পা যতবার চেটেছে, মুখ তার চাইতে অনেক কমবার চেটেছে। তা ছাড়া, প্রিন্সের সঙ্গে খেলার পর তো ওরা খাওয়ার আগে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত-পা-মুখ ধুয়েছে। বিচ্ছিরি কাণ্ডটা তা হলে প্রিন্স কখন করল ? ঝুমু ভেবেই পেল না, কেন তার টটকাকা কথাটা বললেন ? আর তার বাবাই বা কেন ভাল একটা কুকুরকে অযথা পাঁঠা বললেন ?

একটু পরে টটবাবু জানলার কাছে গিয়ে বললেন, "ওই দ্যাখো, কে আসছেন ? ঠিক গিয়েছে সোমাদের বাড়িতে, আমাদের না বলে। ও আসুক না, ওকে এমন ধমক দেব যে, বুঝবেন ঠ্যালাখানা।"

ঝুমু চোখ-ছলছল করে বলে উঠল, "না টটকাকা, ওকে বোকো না, তাতে আমার ভারী কষ্ট হবে। তার চাইতে তুমি আমাকেই বোকো। আমি কিছু মনে করব না। আহা, বুইয়া তো প্রিন্সকে বলে এসেছিল সকালে উঠেই তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে !"

"বলেছিল ?" টটবাবু প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ টটকাকা, বুইয়া বলেছিল।"

"তা তুমি সেটা বলোনি কেন এতক্ষণ ?" দীপবাবু জেরা করলেন।

ঝুমু বলল, "এক্ষুনি মনে পড়ল কি না, তাই আগে বলিনি।"

"হুঁ।" টটকাকা বললেন, "এক্ষুনি মনে পড়ল !"

টটবাবু সিগারেটে টান দিলেন। রাগ-রাগ মুখ করে বসে রইলেন। এক্ষুনি বুইয়া আসবে, তাকে বকতে হবে।

ঝুমু বলল, "তুমি আমাকে বকলে না তো ?"

টটবাবু হেসে ফেললেন, আর ঠিক এই সময় বুইয়া এসে মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে রইল। টটবাবু মুখটাকে বেশ গম্ভীর করে বললেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?"

"প্রিন্সের কাছে বাবা !" বুইয়া বলল, "এমন চমৎকার কুকুরটা না বাবা, কী সুন্দর আমাকে চিনে ফেলেছে। খুব সুন্দর বুঝলে বাবা, ওকে আমি... ওকে আমি..."

টটবাবু বললেন, "কারি করে খেয়ে নেব। পাঁঠার চেয়ে প্রিন্সের মাংস অনেক স্বাদের হবে, না দীপদা ?"

দীপবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা তো হবেই। বিলাতি কুকুরের মাংস দিশি কুকুরের মাংসের চেয়ে অনেক ভাল।"

টটবাবু বললেন, "কেলের মাংস রান্না করব, সে হবে চমৎকার এক কেলেঙ্কারি।"

বুইয়া বুঝতে পারল কথাটা তাকে খ্যাপাবার জন্যই বলেছেন বাবা আর কাকা। সে তবু বলল, "কুকুরের মাংস কেউ খায় নাকি ?"

দীপকাকা বললেন, "খায় না ? পৃথিবীতে হাজার গণ্ডা মানুষ আছে যারা নানারকম মাংস খায়। কেউ গণ্ডারের

মাংস খায়, কেউ খায় হাতির মাংস। কুকুরের মাংস চিন দেশে খাওয়া হয়, তা ছাড়া আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও কত মানুষ আছে যারা কুকুরের মাংস আগ্রহের সঙ্গে খায়। এই তো নাগাল্যাণ্ডেও কারা যেন কুকুরের মাংস খায়।"

"কী ঘেন্নার কথা!" বলল ঝুমকি।

"ঘেন্নার কথা হবে কেন।" দীপবাবু বললেন, "খাবারের অভাব হলে কুকুরের মাংস খেয়েছে কত দুঃসাহসী অভিযাত্রী। ক্যাপ্টেন স্কট, ওর গল্প একদিন বলব, উনি কুকুর খেয়েছেন, ইঁদুর খেয়েছেন, তা ছাড়া জুতোর চামড়া পর্যন্ত খেয়েছেন।"

টটবাবু বললেন, "কিন্তু বুইয়া, সেসব কথা পরে হবে। এখন বলো তো তুমি না বলে বাড়ি থেকে চলে গেলে কেন?"

"না বলে তো আমি যাইনি।" বুইয়া বলল, "আমি ঘুম থেকে উঠলাম যখন, তখন দেখি পাঁচটা বাজে। তোমরা কেউই জেগে নেই। তোমার নাক ডাকছে কাকার নাক ডাকছে... ।"

"কক্ষনো না।" দীপবাবু বললেন, "আমার নাক ডাকে না।"

টটবাবু বললেন, "আমারও না।"

বুইয়া বলল, "সে তোমরা জানবে কেমন করে? নিজেদের নাকের ডাক কেউ কি শুনতে পায়? তা তোমাদের ঘুমন্ত দেখে ভাবলাম, আহা, কত রাত অবধি সবাই জেগেছো তোমরা, আরামে ঘুমুচ্ছ। তা তোমাদের ঘুম ভাঙার আগেই ফিরে আসব ভেবে একটা চিঠি লিখে গেলাম। পাওনি সে-চিঠি?"

"চিঠি?" টটবাবু বললেন, "কোথায় চিঠি?"

বুইয়া বলল, "এঃ যাঃ তাই তো চিঠিটা বাইরের ডাক-বাক্সে রেখে এলাম। তা খুললেই পেয়ে যেতে।"

টটবাবু বললেন, "যাও তো ঝুমু, ডাকবাক্স থেকে চিঠিটা নিয়ে এসো তো কী লিখেছে বুইয়া?"

একটু পরে একটা ভাঁজকরা কাগজ নিয়ে ওপরে এল ঝুমু। সত্যিই বুইয়া চিঠি লিখেছিল। চিঠি ঠিক যেমনভাবে লিখয় তেমনভাবেই লিখেছে, যদিও দু-একটা বানান এদিক-ওদিক হয়েছিল, সেগুলি ঠিক করে দিয়েছি। চিঠিতে লেখা,

'টমু বাবা,

আমি সোমাদির বাড়িতে যেতে হচ্ছে। পিউঙ্কে দেখা করব, তা ছাড়া প্রিন্সকে কথা সকালে যাব। এখন সকাল হল, তাই। না গেলে কেলেঙ্কারি হবে! আমি তার আগেই ফিরে আসব।'

তারপর পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে

'ওমা সূর্যটা উঠেই গেল—আসতে বেশি দেরি হবে না, ভেবো না কিছু। আমি সোমাদির বাড়ি ঠিক চিনে যাব। বাড়ির রং হলুদ আর ছাতের ওপর তিনটে টব।

ইতি বুইয়া।'

টটবাবু চিঠির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "কেলেঙ্কারি হবে! কেলেঙ্কারিই করব। জানো কেলেঙ্কারি কী? কেলেকে কেটেকুটে পাঁঠার মাংসের মতো রান্না করলে—মানে কারি করলে তবে হয় কেলেঙ্কারি।"

কেলে যে প্রিন্স তা অবশ্য বুঝতে পারল বুইয়া। কিন্তু সে জানে বাবা তাকে কেবল কষ্ট দেওয়ার জন্য কথাটা বলেছেন। আসলে কুকুরের মাংস তো আর বাবা রান্না করবেন না। সে বলল, "বাবা, আর করবনা, তা হলেই তো হল। এবারে যদি যাই তো তোমাদের ডেকে তুলে ঘুম ভাঙিয়ে যাব।"

টটবাবু হেসে ফেললেন, তারপর আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, "তা চিঠিটা লেটার-বক্সে দিতে কে বলেছিল তোমাকে?"

বুইয়া বলল, "বাঃ তোমরা সব ঘুমোচ্ছিলে, তাই তো আমি চিঠিটা লেটার-বক্সে রেখে গিয়েছিলাম। তোমরাই তো বলো জায়গার জিনিস জায়গায় রাখতে, বলো না?"

টটবাবু বললেন, "ব্যাপারটা ঠিক তাই বটে। তা তোমাকেও তো যে-জায়গায় রাখা হয়েছিল সেই জায়গায় থাকলেই তো পারতে।"

বুইয়া রাগ করে বলল, "বেশ তো, আমি আর কোথাও যাব না। এখানেই থাকব—না, সত্যি কোথাও যাব না, কোথাও না।"

দীপবাবু বললেন, "ব্যস, অমনই রাগ হয়ে গেল? আজ তো বিকেলে কেলকারকাকার বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন।"

"আমি যাব না। সত্যি যাব না।" বুইয়া বলল।

ওকে অনেক বোঝানো হল, কিন্তু বুইয়া কিছুতেই কথা শুনল না। ওর রাগ হয়েছে, ভারী রাগ হয়েছে। দীপবাবু বললেন, "ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি সবাই, বুইয়া একাই বাড়িতে থাক।"

দুপুরবেলা ঘুমিয়ে-টুমিয়ে ওঠার পর অবশ্য ওর মনে আর রাগ রইল না। বুইয়া তবু বলতে লাগল আমার বাড়িতে থাকতেই ভাল লাগে, আমি বাড়িতেই থাকব। কিন্তু একটু পরে যখন কেলকারকাকা তাদের নিতে এলেন গাড়ি নিয়ে, তখন ওর মনটা কেমন যেন করতে লাগল। কেলকারকাকাকে ওর বেশ ভাল লাগে, কলকাতায় ওদের বাড়িতে উনি দু-একবার এসেছেন। বাংলা একটু-একটু জানেন, খুব হাসিহাসি ভাব। কেলকারকাকা বললেন, "কী বুইয়াদি, তোমার মুখটা অমন গম্ভীর কেন?"

বুইয়া হঠাৎ বলল, "তোমাদের বাড়িতে কুকুর আছে?"

"কুকুর? না!" কেলকারকাকা বললেন, "তবে আমাদের বাড়িতে একটা বিড়াল আছে।"

"বলে ভাল করলে না কেলকার!" দীপবাবু বললেন, বুইয়া তোমার বাড়ি থেকে নড়তে চাইবে না, তা না হলে বিড়ালটিকে নিয়েই হয়তো চলে আসবে!"

"তা হলে তো বাঁচি!" কেলকারকাকা বললেন, "বিড়াল বাড়িতে রাখলে যা দুর্গন্ধ হয়! অনেক সেন্ট খরচ হয়ে যায়, তাও গন্ধ যায় না।"

বুইয়া বলল, "বিড়ালটা চলে গেলে তোমার ভাল লাগবে কেলকারকাকা?"

কেলকারকাকা বললেন, "মাঝে-মাঝে মন খারাপ হবে বইকী! তবে সহ্য হয়ে যাবে।"

বুইয়া বলল, "ওকে আমি কলকাতা নিয়ে যাব! তারপর টটবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "নিয়ে যাব বাবা? সে বেশ হবে। তুমি তো বলেছ আমি বড় হলে কুকুর কিনে দেবে, ছোট থেকে বিড়াল পুষে অভ্যেস করে নেব।"

যে কয়েকদিন বুইয়া নাগপুরে ছিল রোজই সে একবার কেলকারকাকা আর একবার সোমাদের বাড়িতে যেত। বিড়াল আর কুকুরের সঙ্গে খেলতে-খেলতে গরমকে গরমই বলে মনে হত না! তবে সে সোমাকে বলেছে বিড়ালের চেয়ে কুকুর অনেক বেশি ভাল। বিশেষ করে প্রিন্স-এর মতো কুকুর পৃথিবীতে আর নেই বলে বুইয়ার ধারণা। প্রিন্স কেমন সুন্দর ওর কথা শোনে, বুঝতে পারে, মাঝে-মাঝে বেশ হাসেও বলে তার মনে হয়। তবে বিড়ালেরা মৃদু হাসে, কম হাসে। অন্য সব সময়েই কেমন গম্ভীর মুখ করে থাকে। বিড়ালকে বকলে ওরা বিশেষ গ্রাহ্য করে না, কিন্তু প্রিন্সকে বকলে সে লজ্জা পায়, মুখ নিচু করে থাকে।

কয়েকদিন বেশ কেটে গেল। কলকাতায় ফেরার সময় বুইয়ার ভারী কষ্ট হল সে কী চোখের জল

বুইয়ার। কলকাতায় এসেও সে প্রিন্সের কথা ভুলতে পারল না। সে প্রিন্সকে একটা চিঠিও লিখে দিল

ভাই প্রিন্স, তুমি কেমন আছ জানাও। আমি তোমাকে যে হাড় দিয়ে এসেছিলাম চুষবার জন্য, সে হাড় এখনও আছে তো! তুমি কেমন ভৌ-ভৌ করছ, তোমার লেজ কেমন আছে? ভালবাসা জেনো,

ইতি বুইয়াদি।

আর কী আশ্চর্য, ওই চিঠি লেখার দিন পনেরো পর একটা উত্তর এসে গেল প্রিন্সের কাছ থেকে। প্রিন্স আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখেছে:

প্রিয় বুইয়াদিদি, তোমার চিঠি পেয়ে ভারী খুশি হয়েছি। তুমি আমাকে যেমন ভালবাস, এখানে তেমন কেউ আমাকে ভালবাসে না। এখন নাগপুরে আরও গরম। ওরা সবাই বরফ দিয়ে জল খায়, আমাকে দেয় না। আমি তোমার দেওয়া হাড় এখনও কামড়াই, চুষি, আর তোমার কথা মনে করি। আমাকে তুমি কলকাতা নিয়ে যাবে?

ইতি প্রিন্স।

কী খুশি বুইয়া! সে চিঠি নিয়ে কত লোককে যে দেখাল তার ইয়ত্তা নেই।

এর পর কয়েক মাস কেটে গেছে। দুটো চিঠি এর মধ্যে সে প্রিন্সকে লিখেছে, কিন্তু প্রিন্স তার উত্তর না দেওয়ায় বুইয়ার মন বেশ খারাপ হয়েছিল অনেকদিন। তারপর অবশ্য আস্তে-আস্তে যত পড়ার চাপ বাড়তে লাগল ততই সে নাগপুরের কথা ভুলতে লাগল। এমনই এক সন্ধেয় বুইয়া তার ভূগোল বই নিয়ে পড়ছে, হঠাৎ বিদ্যুৎ গেল বন্ধ হয়ে। সে তাড়াতাড়ি দুটো মোমবাতি জ্বেলে নিল। পড়া বন্ধ করা কিছুতেই চলবে না।

কিন্তু পড়া আর হল কই? এই সময় দরজা ধাক্কার আওয়াজ পাওয়া গেল। আরে কেলকারকাকা যে! খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বুইয়া। কত কী সে জিজ্ঞেস করবে ভাবল। বেড়ালের কথা, প্রিন্সের কথা—কিন্তু উনি রইলেন মাত্র তিন-চার মিনিট। চাও খেলেন না, বললেন, তাঁর বস ব্যানার্জিসাহেবের সঙ্গে আলিপুরে রাত্রেই দেখা করতে হবে। নীচে গাড়ি অপেক্ষা করছে। পরদিন বিকাল নাগাদ তিনি আসবেন বলে গেলেন। বললেন, মিসেস দীপ একটা টিফিন-ক্যারিয়ার পাঠিয়েছেন, আর একটা চিঠি। চিঠিটা টেবিলে রাখতেই সেটা হাওয়া লেগে উড়ে গিয়ে পড়ল পাশে রাখা একটা বুকশেলফের পেছনে। বুইয়া সেটাকে তুলতে চেষ্টা করতেই টটবাবু বললেন, "থাক, এখন অন্ধকারে খুঁজে কাজ নেই, আলো এলে খোঁজা যাবে।"

কেলকারকাকা চলে গেলেন। কিন্তু আলো এল না অনেকক্ষণ। টটবাবু বললেন, "টিফিন-ক্যারিয়ারে দু'রকম খাদ্য আছে। একটা হল মাংস—চমৎকার গন্ধ, আর-একটা হল সেই মলাট দেওয়া ডাল! মলাট দেওয়া ডাল কথাটা বুইয়া বলে। ও একদিন সবুজ খোসাসমেত মুগের ডাল বলতে গিয়ে বলে ফেলেছিল সবুজ মলাট দেওয়া ডাল! সেই থেকে খোসাওলা ডালকে ওরা সবাই বলে মলাট দেওয়া ডাল! তা কথাটা খারাপ নয়।

টটবাবু বললেন, "আজ আর সহজে আলো আসছে না। আমরা খেয়ে নিই। আঃ, যা চমৎকার রান্নার গন্ধ।"

খাওয়াদাওয়া শেষ হল, বিদ্যুৎ তখনও আসেনি। টটবাবু বললেন, "বারান্দায় গিয়ে আবার বসা যাক। বারান্দায় তবু হাওয়া আছে।"

বারান্দায় বসে দু-একটা কথা হতেই টটবাবু বললেন, "বুইয়া—চিঠি! চিঠি?"

বুইয়া বলল, "কী চিঠি?"

টটবাবু হেসে বললেন, "এই তোমার স্মৃতিশক্তি! ওই যে কেলকারকাকা যে-চিঠিটা আনলেন নাগপুর থেকে, সেটা শেলফের কোথায় পড়ে গেল?"

"আনছি বাবা।" বুইয়া ছুটে গেল। আলো অল্প হলেও একটু খুঁজতেই চিঠিটা পাওয়া গেল! চিঠিটা খামে নয়, খোলাই ছিল। টটবাবু বললেন, "আমার চশমা নেই বুইয়া, তুমিই পড়ো।"

বুইয়া মোমবাতির আলোয় চিঠিটা পড়ল। মোমবাতিও হাওয়ায় বেশ নিভে-নিভে যাচ্ছিল। বুইয়া পড়ল এবং পড়তে-পড়তে তার গা গুলিয়ে উঠল। কিন্তু চিঠিতে এ কী লেখা? কী সাঙ্ঘাতিক কথা! বুইয়া পড়ল

টট, আশা করি সবাই ভাল, মলাট দেওয়া ডাল আর মাংস পাঠালাম, সোমার কুকুরের মাংস, আমরা প্রায়ই খাচ্ছি। কুকুরের মাংস এত ভাল হয় আগে জানতাম না, তোমাদের কেমন লাগল জানিয়ো।

ইতি দীপদা।

পড়েই তো বুইয়া ছুটল বেসিনের দিকে। টটবাবুও কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলেন। বুইয়ার মা বললেন, "দীপদাদের ভারী অন্যায়।" বলে তিনিও বেসিনের দিকে গেলেন। বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ চলল নানারকম বিচ্ছিরি ব্যাপার। ভয়ানক কেলেঙ্কারি কাণ্ড।

সেই রাতটা খুব খারাপভাবে কাটল ওঁদের। বুইয়া বলতে লাগল, "কী নিষ্ঠুর ওরা। প্রিন্সকে কেটে, ওমা, কী বিশ্রি ব্যাপার। আবার আমাদের পাঠিয়েছে খেতে। এইরকম কি কোনও সভ্য মানুষ কখনও করে?"

পরদিনই টটবাবু তো অফিসেই গেলেন না। সারাদিন দু-তিন গ্লাস ঘোল খেয়েই কাটিয়ে দিলেন। বুইয়ার মায়েরও কিছু খাবার রুচি রইল না, বুইয়া সারাদিন কেবল কাঁদল আর ঝিম মেরে পড়ে রইল। বিকেলের দিকে অবশ্য ওঁরা সব একটু-একটু সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন।

সন্ধেয় কেলকারকাকা এলেন। হাসিখুশি চমৎকার একটা ভাব। বললেন, "টটবাবু এবারে ভারী সাকসেসফুল হয়েছে ট্রিপটা। চলো, তোমাদের নিয়ে যাই ভাল একটা হোটেলে, আজ বাইরেই খাওয়াদাওয়া হবে। ও কী, তোমরা অমনভাবে তাকাচ্ছ কেন? চেহারা সব উসকো-খুসকো কেন? অসুখ করেছে? মাংস খেয়ে? ফুড পয়জনিং? কী বললে, সোমার কুকুরের মাংস রেঁধে পাঠিয়েছেন মিসেস দীপ? ভেরি স্ট্রেঞ্জ! আমাকে বললেন দু-তিন সপ্তাহ আগে দিল্লি থেকে দীপবাবু দুশো টাকা দিয়ে একটা সোলার কুকার এনেছেন, এই মাংস তাতেই রেঁধেছেন মিসেস দীপ।"

তাই তো! ভারী একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তো। তখন চিঠিটা পড়া হল। কম আলোয় বুইয়া পড়েছে সোলার কুকারের মাংসের জায়গায় সোমার কুকুরের মাংস! বুইয়া চিঠিটা এবার পড়ে বলল, দ্যাখো আমার কী দোষ? কাকিমার এমন হাতের লেখা যে, সোলার জায়গায় মনে হচ্ছে সোমা। টট চিঠিটা নিয়ে বলল, "কই, এই তো স্পষ্ট লেখা সোলার কুকার। তা ছাড়া কুকারই তো লেখা আছে, কুকুর কোথায়?"

বুইয়া বলল, "আমি না সোমার পর কুকার লেখা আছে ভাবিনি—ভেবেছি নিশ্চয় কুকুরই লিখেছেন। আমারই ভুল, ইঃ, আরও একটা ভুল আমরা করেছি। চিঠিতে তো লেখা ছিল আমরা প্রায়ই খাচ্ছি... প্রিন্সের মাংস তো একদিন খেলেই ফুরিয়ে যাবে। প্রায়ই খাওয়া যাবে কেমন করে? আমরা ভারী বোকা, না বাবা? আর সোমার কুকুরের মাংস কি কাকিমা রান্না করবেন? কক্ষনো না! আবার রান্না করে আমাদের পাঠাবেন? আমরা সত্যিকারের বোকা, তাই না বাবা? তাই না কেলকারকাকা?"

কেলকারকাকা বললেন, "হ্যাঁ, বুইয়াদি, তোমরা সব সত্যিকারের বোকা। এখন সব রেডি হয়ে নাও। আমরা বেরোব।"

ছবি: দেবাশিস দেব

গোপন রহস্য...অন্ধকার রাত্রি

গোপন রহস্য... অন্ধকার রাত্রি

গোপন রহস্য... অন্ধকার রাত্রি

রোবু আর ভুতো

সিদ্ধার্থ ঘোষ

দেখে-দেখে ঠিক আজকেই মা অফিস থেকে ফিরতে বেজায় দেরি করছেন। দীপ বারবার উঁকি মারছে বারান্দা থেকে। নতুন কিছু করে ফেলার পর এই এক মুশকিল। কাউকে না দেখানো অবধি শান্তি নেই।

বুলাকে দীপ একরকম টেনে নিয়ে এসেছে খাওয়ার ঘরে। টেবিলের ওপর আচারের একটা খালি বোতল আর প্লেট ঢাকা দুটো জলের গেলাস। আর প্রত্যেকটার মধ্যে একটি করে বন্দি মাকড়সা।

ধমক খেল রীনার মা, "দেখলেই যখন এই কাণ্ড চলছে, আরও দুটো খালি বোতল খুঁজে পেলে না? ভাবো তো, ওই গেলাস দুটো কখনও যদি খাওয়ার গেলাসের মধ্যে মিশে..." কথা শেষ করার আগেই শিউরে উঠল বুলা।

দুটো খালি বোতল জোগাড় করা, দীপকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মাকড়সা দুটো তাতে ট্রান্সফার এবং বিষাক্ত গেলাস দুটো ভেঙে বাতিল করার আধ ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরেছে অলোক।

মায়ের চেয়ে বাবা ঢের সায়েন্টিফিক। একঘণ্টা ধরে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছে এই ভয়ানক জন্তুদের বন্দি করার কলা-কৌশল। কিন্তু শিখিয়ে কোনও লাভ হয়নি। একটা ফাঁকা বোতল এগিয়ে দিতেই বাবার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। নিজে হাতে মাকড়সা ধরার সাহস নেই।

দীপ টিভি দেখছে। পাশের ঘরে এসে অলোক বলল, "বুলা, কাল তোমার মাকে একবার জিজ্ঞেস করো তো, ফ্যামিলির মধ্যে কোনও পাগলামির নজির আছে কি না!"

"আগে তুমি তোমার বাড়িতে সেই খবর নাও। কেন, দু' বছর আগে যে বলতে, এটা প্রতিভার লক্ষণ!"

"আহা, পিঁপড়ে আর মাকড়সা কি এক হল? পিঁপড়েদের আচার-আচরণ স্টাডি করা, সেটা তো সত্যিই এনকারেজ করার মতো। কত বিজ্ঞানী এই নিয়ে..."

"হয়েছে। কোনও কিছুরই বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়। কেরোসিন দিয়ে পিঁপড়ে মারার পর কী কাণ্ড বাধিয়েছিল, মনে আছে? তাও তো লুকিয়েই করেছিলাম। দু' দিন বাদে পিঁপড়েরা নিজে থেকে দেখা না দিলে বোধ হয় বাড়িই ছাড়তে হত। পিঁপড়েওলা বাড়ি খুঁজতে হত!"

অলোক বলল, "ব্যাপারটা খুব সোজা। ক্লাস টু-এ জীববিজ্ঞান, তারপর এক বছর গ্যাপ, এবার আবার..."

"ভাগ্য ভাল যে, রসায়নবিদ্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছে।"

গত বছর দীপ প্রতি মাসে গড়ে একটা করে গ্যাস সিলিন্ডার ফাঁকা করেছে

জল-টল ফোটাতে আর রেফ্রিজারেটরটাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

অলোক ভুরু কুঁচকে বলল, "ওহ্, সে-কথা হচ্ছে না। ব্যাপারটা জীববিজ্ঞান বা কেমিস্ট্রি নয়। আসলে ওর কিছু করার নেই। সেই দুপুর বারোটা থেকে ছ'টা। অফিস থেকে আমাদের বাড়ি না ফেরা অবধি। বড় হচ্ছে—রীনার মা তো আর ঠিক বন্ধু নয়।"

"কী করতে বলো?"

"পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলুক বিকেলবেলা। কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। অন্তত বাড়িতে আটকে রাখার চেয়ে বেটার।"

গলির মোড়ে পা রাখতেই একটা বেজায় হেঁড়ে গলার চিৎকার বহুদূর থেকে কানে এসেছিল। বাড়ির সামনে পৌঁছবার পর বুলা একসঙ্গে একাধিক আবিষ্কার করল। আওয়াজটা আসছে তাদেরই তিনতলার ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে। আওয়াজটা তৈরি করছে দীপ। মাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যই গলা মোটা করে জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের কলি গাইতে লাগল।

অলোক বাড়ি ফিরতেই বুলা ঘোষণা করল, "সাপ ধরুক কি ব্যাঙ, বাড়িতেই থাকতে হবে ওকে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কিছুতেই মিশতে দেব না। পড়াশোনায় গোল্লা পাক তাতেও কিছু যায়-আসে না। এসব চলবে না বলে দিচ্ছি।"

সাতদিন সময় চেয়েছিল অলোক। কিন্তু তিনদিনের মাথায় রোবুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। দীপের সঙ্গী। বাড়িতে থাকবে। সারাক্ষণের সঙ্গী।

রোবুর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জমে গিয়েছে দীপের। রোবু মানেই যে রোবট সেটা দীপ ভালই জানে। যন্ত্র-মানুষ। কিন্তু চেহারা দেখে ধরার উপায় নেই। সেকেলে নাট-বোল্ট আর রিভেট-মারা খটমটে নকল মানুষ নয়। এরা হিউমেনয়েড। গায়ে হাত রাখলে নরম চামড়ার তলায় রক্তের আমেজ অবধি অনুভব করা যায়। বেজায় মানুষ।

সবচেয়ে বড় কথা, দীপের ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে বারোজনের রোবু-বন্ধু আছে। তাদের অনেক গল্প সে শুনেছে।

চাইনিজ চেকারের বোর্ড পেতে রোবুকে ডাক দিল। পর-পর চারবার জিতেছে দীপ। আবার ঘুঁটি সাজাচ্ছে দেখে রোবু বলল, "ন'টা বাজে। খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।"

"লাস্ট দান।"

রোবু এই প্রথম জিতল। দীপের রোখ চড়ে গেল, "প্লিজ, আর একবার।"
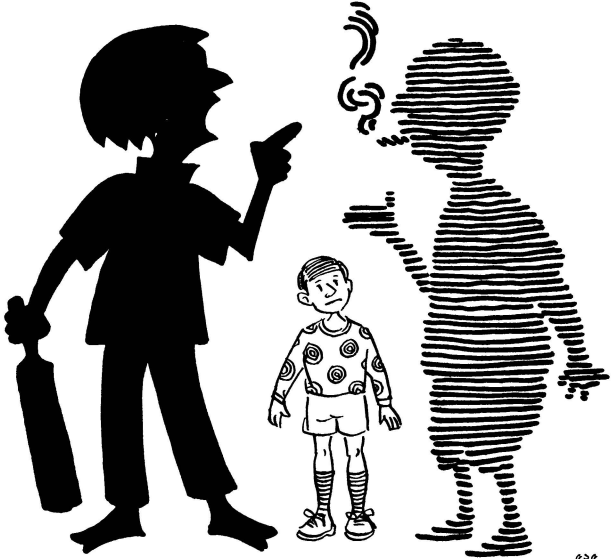
"তুমি কিন্তু বলেছিলে লাস্ট।"
"এবার সত্যি লাস্ট।"
"হেরে গেলেও তো?"
"হ্যাঁ।"
আবার দীপ হেরে গেল। রোবুর অবাধ্য হলে তাকে হারানো সম্ভব নয়।

সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে রোবু ক্রিকেট কোচিং শুরু করেছে। বল ও ব্যাট—দুটোতেই চৌকস। রোবুর দেখাদেখি এ-পাড়ায় দীপের আরও তিন বন্ধুর একটি করে রোবট-সঙ্গী জুটেছে। বাদ পড়ে গেছে নীল। রোবট-সঙ্গীর দাম তো কম নয়।

জামগাছের তলায় বসে আধ ঘণ্টা ওদের ক্রিকেট খেলা দেখার পর উঠে দাঁড়াল নীল। বেশ কয়েকবার বলেছে, কিন্তু রোবটগুলো স্বার্থপর। কিছুতেই নীলকে ওরা দলে নেবে না।

নীল ভুতোদার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁত বের করা পোড়ো বাড়ি। চারধারে কাঁটা ঝোপ। বুনো হলদে ফুল এখানে-সেখানে। এককালে জায়গাটায় ভাগাড় ছিল বলে কেউ বড় একটা ঘেঁষতে চায় না। না হলে কবে আকাশছোঁয়া বাড়ি উঠে যেত।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা বহুকাল আগেই ধসে গেছে। ভুতোদা সিঁড়িটিড়ির ধার ধারে না, কিন্তু নীলের তো আর সে ক্ষমতা নেই, কাঁঠালগাছটাই ওর ভরসা। ওটা বেয়েই ছাতে গিয়ে নামে। প্রথমদিনেও তাই করেছিল। অবশ্য সেদিন এসেছিল গুপ্তধনের সন্ধানে। বাড়িটার চেহারা দেখেই তার সন্দেহ হয়েছিল এর মধ্যে নিশ্চয় চোরাকুঠুরি আছে। তার মানেই ধনরত্ন। গুপ্তধন না পেলেও ভুতোদার দেখা পেয়েছিল নীল।

বেশ ক'টা তোবড়ানো সুটকেস, ঠ্যাং-ভাঙা খাট আর চেয়ার, ফুটিফাটা কাচওয়ালা একটা ড্রেসিং টেবিল। সমস্ত জিনিসের ওপর ধুলোর আর মাকড়সার কারিকুরি। কিন্তু ধুলোমাখা মেঝের ওপর অনেক টাটকা পায়ের ছাপ। মিশমিশে কালো বেড়ালটা নীলকে দেখেই আড়মোড়া ভেঙে এমনভাবে 'ম্যাঁও' করল যেন অনেকদিন বাদে বন্ধুর সঙ্গে দেখা। এখনও দিনের আলো পড়েনি, তাই ভুতোদাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু শূন্যে একবিন্দু আগুন মাঝে-মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আর ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠছে তারপরেই। ধূমপান করছেন ভুতোদা।

স্প্রিং-ভাঙা চেয়ারটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠল। নড়েচড়ে বসেছে ভুতোদা, "আরে নীল। এসো এসো। অনেকদিন পরে।"

গল্পে যেরকম পড়া যায়, ভুতোদার কথায় তেমন কোনও টান নেই। চন্দ্রবিন্দু যোগ করার প্রাচীন সংস্কার তিনি বর্জন করেছেন।

ভুতোদা জিজ্ঞেস করল, "তা হঠাৎ অবেলায়? খেলা ছেড়ে?"

"কী করব বলো। ওরা তো খেলতেই নিচ্ছে না।"

ওরা বলতে কারা থেকে শুরু করে নীল-এর কাছ থেকে রোবটদের কথা সব খুঁটিয়ে জেনে নেয় ভুতো। শেষে থমথমে গলায় বলে, "ভাগ্যিস আমি রিটায়ার করেছি, তাই খুব বেঁচে গেল!"

"তার মানে?"

"রিটায়ার করার পর ভূতেরা আর ভয় দেখায় না। না হলে রোবটদের দফা..."

"সত্যি ভুতোদা, দিনরাত ঘরে বসে-বসে বুদ্ধি তোমার একেবারে গিয়েছে। আরে রোবটরা কি মানুষ যে, ভূতের ভয় পাবে?"

একটু থমকে গেল ভুতো। নিশ্চয় আত্মসম্মানে লেগেছে। অবশ্য তারপরেই হেঁকে উঠেছে, "ভয় না পাক একশোবার অবাক হবে। চলো, দেখি কে কীরকম বীর!"

ভুতোদার ঠাণ্ডা হাত ধরে নীল খেলার মাঠে এসে দ্যাখে, দীপের হাতে বল, রোবু ব্যাট করছে।

ক্রিকেট খেলার নিয়মটা ছোট্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে নীল বলল, "দেখছ তো, দীপ কিছুতেই ওকে আউট করতে পারছে না। উইকেট না পড়লে..."

নীলের কথা শেষ হয়নি। যেন এক অদৃশ্য বলের আঘাতে উইকেট তিনটে ছিটকে গেল।

চমকে উঠল রোবু আর দীপ। নীল কিন্তু ভুতোর ওপর বেজায় খাপ্পা, "যাহ্, তুমি একেবারে আনাড়ি। দীপ হাত থেকে বলটা ছাড়ার আগেই উইকেট ফেলে দিলে কী করে হবে! বল করবে, ব্যাটসম্যান মিস করবে, তারপর সেটা উইকেটে লাগলে তবে না..."

এদিকে নীলকে দেখতে পেয়েই দীপ চেঁচাতে শুরু করেছে, "এটা কী হচ্ছে নীল? ঢিল ছুঁড়ে উইকেট ভাঙলি কেন?"

নীল দেখল, রোবুও বেশ বুক ফুলিয়ে দীপের পাশে এসে পোজ দিচ্ছে।

ভুতো বলে উঠল, "উইকেট আবার ভাঙল কোথায়? আস্তই তো দেখছি।"

ভুতোদা কোন ফাঁকে উইকেটগুলো যথাস্থানে ফিট করে দিয়েছে কেউই লক্ষ করেনি। দীপ এখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। রোবুর মাথায় অন্য চিন্তা, আপনমনে বিড়বিড় করছে, "স্পষ্ট দু'জনের গলার স্বর শুনেছি। অসিলোস্কোপের বিশ্লেষণ। ভুল হতে পারে না। অথচ একজনকে শুধু চোখে দেখছি। ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপারটা অতি সোজা। আমি ভূত।"

"ভূত? টাইটেল কী?"

"শোনো কথা!" ভুতোদা রেগে টঙ, "এ-ব্যাটা ভূতের নামই শোনেনি রে নীল!"

রোবু তবু থামে না, "আপনার বাবা-মা-র নামটা কি জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"নিশ্চয় পারিস। তার আগে তোর মা-বাবার নাম বল দেখি।"

রোবু দমেনি, "আমি কি মানুষ যে..."

"তা হলে তুই কোন আক্কেলে আমাকে সেই প্রশ্ন করিস?"

"মানে, অদৃশ্য মানুষ বলে কিছু থাকার তো লজিক নেই, তাই জানতে চাইছি।"

"আবার বলে মানুষ। বলছি, আমি ভূত, তবু সেই এক কথা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান।"

দীপ রোবুর হাত টেনে ধরে, "প্লিজ রোবু, শিগ্‌গির বাড়ি চলো। আমার ভয় করছে।"

দীপের কথা ঠেলতে পারে না। খেলার সাজসরঞ্জাম গুটিয়ে রোবু ফিরতি পথে পা বাড়ায়। তার মাথায় এখন ইলেকট্রন উঠে গেছে।

"নীল-এর বন্ধুরা সকলেই ভুতোদার কথা একটু-আধটু জানে। জানে, নীলের সঙ্গে তার বেজায় ভাব। কিন্তু ভুতোদা ভূত হলেও আজ অবধি কাউকে ভয় দেখায়নি। রাত্রিবেলা ইচ্ছে করলেই মিশমিশে দাড়িওলা কঙ্কাল হয়ে হাজির হতে পারে, কিন্তু করে না।" এইসব বলতে-বলতেই যাচ্ছিল দীপ।

"একদম অবাস্তব। অসম্ভব ব্যাপার। কোনও পদার্থবিদ্যায় এমন কথা পড়িনি।" রোবু মানতে চায় না।

"তুমি না পড়লে কী হবে! নিজে চোখে দেখেছি। ছিল তিনটে গোল্ড ফিশ। হয়ে গেল কুচকুচে কালো পপি।"

সত্যি বলতে, এর পর থেকেই নীলের পেছনে লাগা বন্ধ করেছিল দীপ। দোষের মধ্যে দীপ একদিন বলেছিল, "আচ্ছা নীল, তোর চৌবাচ্চায় আছে তো ক'টা তেলাপিয়া। অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ পোষার তুই কী জানিস? অ্যাঞ্জেল দেখেছিস? তিন-তিনটে আছে আমার।"

নীল হঠাৎ দৌড় লাগিয়েছিল। আবার ফিরেও এল হাঁপাতে-হাঁপাতে। বলল, "খুব গুল মারছিস তা হলে আজকাল? ভুতোদা বলেছে, তোর একটাও অ্যাঞ্জেল নেই। আছে তিনটে বিচ্ছিরি কেলে মলি।"

বাড়ি ফিরে দীপ দেখল, সত্যিই...।

রোবু বাধা দিল, "প্লিজ দীপ, আজগুবি গল্পগুলো এবার থামাও। না হলে আমার মাথাটাই বিগড়ে যাবে।"

পরের দিন দীপের বাবার কাছ থেকে তিনদিনের ছুটি চেয়ে নিল রোবু। ভূতের এস্পার-ওস্পার না করে ছাড়বে না সে। দু'দিন পড়ে রইল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। ভূত সম্বন্ধে ছাপার হরফের কিছু আর বাদ রাখেনি। সব পড়েশুনে রোবু বুঝেছে, মোদ্দা কথা একটাই। যারা সত্যিকার ভৌতিক কাণ্ড দেখেছে তারা স্বীকার করে যে, ভূত আছে। আর যারা বলে ভূত নেই, তারা কখনও স্বচক্ষে ভৌতিক কাণ্ড দেখেনি।

রোবুকে সবচেয়ে নিরাশ করেছে পদার্থবিদরা। ভূতের অস্তিত্বের সম্ভাবনা-তত্ত্ব নিয়ে আজ অবধি কেউ একটা থিওরিটিকাল পেপার লিখল না!

সায়েন্স কলেজে শোরগোল ফেলে দিল রোবু, "হয় ভূত থাকবে, নয় তো আমি। ভূত যা-তা কাণ্ড চালিয়ে যাবে আর আমি তার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাব না, এটা কী করে হয়? আর লোকেই বা তা হলে রোবট রাখবে কেন? এত খরচ করে? বইয়ে তো দেখছি অনেকেই বলছে যে, রোজ দু-তিনটে পচা মাছ কড়া করে ভেজে খাওয়ালেই ভূতেরা দিব্যি পোষ মানে।"

হাই-লেভেল মিটিঙের পরে সায়েন্স কলেজের প্রোফেসর তরফদার ভূত-বিরোধী কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। সাতদিনের মধ্যে তিনি রিপোর্ট পেশ করবেন।

তরফদারের রিপোর্ট পড়ার পর ভরসা ফিরে পেল রোবু। ভারী প্রাঞ্জল কোয়ান্টাম ভাষায় তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন কেন 'ভূত' বলতে যা বোঝায় সেরকম কোনও জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। শুধু বিজ্ঞানী আর রোবটদের মনের খোরাক জোগালেই তো চলবে না, সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছতে হবে। তরফদার জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি নিজে বিভিন্ন জনসভায় হাতেনাতে এক্সপেরিমেন্টের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে দেবেন, ভূত নেই।

তথাকথিত উপদ্রুত এলাকার ওপরেই জোর দিতে চান তরফদার। প্রথম জনসভার আয়োজন হয়েছে দীপেদের পাড়ায়। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে।

ব্লান্ডার করল রোবু। দীপের কথায় কান দিয়ে। ভুতোদা হয়তো এসব নিয়ে মাথাই ঘামাত না। কিন্তু ভুতোকে ওরা একেবারে ঘরছাড়া করে দিয়েছে। দীপের কথা ঠেলতে পারেনি রোবু। ভূত নেই জেনেও ভুতুড়ে বাড়িটাকে তারা কর্পোরেশনের মিস্ত্রি লাগিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। অবশ্য ভূতের নাম করেনি, বলেছে যে, বাড়িটার কন্ডিশন বিপজ্জনক।

নীল সময়মতো বিকল্প ব্যবস্থা না করলে ভুতোদাকে কোথায় যে যেতে হত বলা মুশকিল। চোদ্দতলা একটা বাড়ি পিসার হেলানো টাওয়ারের একটু অনুকরণ করার চেষ্টা করেছিল। ফলে পাঁচ বছর সেটা ফাঁকাই পড়ে আছে। সেইখানেই আপাতত আস্তানা গেড়েছেন তিনি। আর তৈরি হয়ে আছেন...।

মা দুর্গার বিসর্জনের পর ফাঁকা মঞ্চে একের-পর-এক ম্যাজিক দেখিয়ে যাচ্ছেন জাদুসম্রাট হরতন সরখেল। কাটা মুণ্ডুর খেলা, পায়রার ডিমের খেলা, ওয়াটার অব গ্যাঞ্জেসের খেলা। প্রোফেসর তরফদার আসছেন খেলার ফাঁকে-ফাঁকে। বুঝিয়ে দিচ্ছেন কীভাবে জাদুকর লোক ঠকাচ্ছেন।

শেষ খেলা শেষ হওয়ার পরে একটি বিনয়ী নমস্কার হাতে করে মঞ্চে এলেন তরফদার। বারো বছর ডুসেলডর্ফে গবেষণা করার পর থেকে বাংলায় কথা বলতে গেলেই ভাষাটা তাঁর শুদ্ধ হয়ে যায়। তরফদার শুরু করলেন, "হে দর্শকবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়াছেন যে, জাদুকর অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নহেন। এবং একই যুক্তি সম্প্রসারিত করিলেই প্রমাণিত হইবে যে, ভূত বলিয়াও কিছু নাই, থাকিতে পারে না, বিশ্বাসী মানুষের কল্পনাকে নির্ভর করিয়াই শুধু ভূত-প্রেতের..."

প্যান্ডেলের টিউবলাইটগুলো ঠিক এই সময়ে এমন দপ-দপ করে নেচে উঠল যেন তরফদারের অসমাপ্ত বাক্যের শেষে ডট্-ডট্-ডট্। আচমকা আলো নিভে যাওয়ার চেয়ে ব্যাপারটা অনেক বেশি গা-ছমছমে। তরফদার বোঝাবার চেষ্টা করেন, "ভোল্টেজের এবংবিধ লম্ফঝম্ফ দেখিয়া আপনারা ভ্রান্ত অনুমানের..."

আবার বাধা। টিউবলাইটের আলো অপরাজিতার মতো নীল হয়ে উঠল।

"ইহারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব নহে।"

কিন্তু তরফদারের ব্যাখ্যা শোনার জন্য খুব একটা আগ্রহ দেখা গেল না। জনা-পঁচিশ ছিল তখনও। আলো নীল হয়ে ওঠার ব্যাপারটা বোধগম্য হবে-হবে করছে, সভাগৃহ জবা ফুলের মতো লাল হয়ে উঠল। এবং সভাভঙ্গ।

রোবু নীলকে চোখে-চোখে রেখেছে সারাক্ষণ। সভা ভাঙার পরেই সে পেছন থেকে এসে নীলের হাত চেপে ধরল, "প্লিজ, তোমার ভুতোদার সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দাও।"

রোবু বোঝেনি যে, পাশেই ভুতো রয়েছে। ভুতো বেশ বিরক্ত, "যা বলার এখনই সেরে ফ্যাল।"

সসম্ভ্রমে বলল রোবু, "দেখুন, আপনি যে আছেন তা তো বারবারই টের পাচ্ছি। কিন্তু এইসব আশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করলেন কীভাবে? কিচ্ছু না ছুঁড়েই উইকেট ভেঙে দিলেন। আলোর রংই বা বদলে গেল কী করে?"

"ওং হ্রীং টকাস!"

"অ্যাঁ?"

"কিংবা অন্যরকমও আছে। এই ধর, ক্রিং কোরাম ফস।"

"এগুলো মন্ত্র বুঝি?"

"কে জানে! কোনটার যে কী মানে তাও ভুলে মেরে দিয়েছি। তবে এটা ঠিক যে, এগুলো খুব পাওয়ারফুল। এই তো আজকে 'কীং কোয়া বঙ্গাই' বলতেই আলো লাল হয়ে গেল। আর আগেরবার ওটা বলতেই তোর উইকেট চিতপটাং।"

"তার মানে কোন মন্ত্র কী ঘটাবে তা আপনি নিজেও জানেন না?" রোবুর গলায় হতাশা।

"কারেক্ট। তোর মাথায় বুদ্ধি আছে দেখছি।"

"তা হলে আর আমাদের কোনও আশা নেই। ভেবেছিলাম হয়তো শিখেটিখে নেওয়া যাবে। এবার সত্যিই আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি। শুধু তো আমার একার সমস্যা নয়। আমার মতো কুড়ি হাজার রোবট যদি বেকার হয়ে যায়...।"

"সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু তা বলে আমায় দোষ দিয়ে কী লাভ?"

"তুমিই তো দায়ী। এবার তো সবাই নীলের বিখ্যাত ভুতোদার মতোই সঙ্গী খুঁজবে, তাই না?"

"খুঁজতে পারে, কিন্তু লাভ হবে না। নীলের মতো যাদের রোবট নেই তাদের সঙ্গেই শুধু আমাদের ভাব।"

ছবি : দেবাশিস দেব

ব্যাঙপুকুর

শিবতোষ ঘোষ

হরিশপুরে একটা পুকুর আছে, শুধু ব্যাঙ। সেজন্য তার নাম হয়ে গেল ব্যাঙপুকুর। আশ্চর্য, ব্যাঙপুকুরে আর কিছু নেই, মানে একেবারে কিছু নেই, একটা ঢোঁড়া সাপও নেই। সাপের প্রিয় খাদ্য ব্যাঙ, না, বোধ হয় ইঁদুর, কিন্তু মনসামঙ্গলের বেহুলা যে দুধকলা দিয়েছিল, আমাদের প্রবাদ আছে দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা, 'তুমি দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছ!' তবে কোনও সন্দেহ নেই সাপের প্রধান খাদ্য ব্যাঙ। তবু হরিশপুরের সাপেরা কতবার কত চেষ্টা করল, কোনওরকমে একবার ওদের ভেতরে তেড়ে ঢুকে পড়তে পারলে··· ওরা ভয়ে এদিক-ওদিক পালাবে আর আমরা ক'জন সাপ দিব্যি ব্যাঙের ডেরার কাছাকাছি আশ্রয় পেয়ে যাব। একদিন যুক্তি করে গেলেও চার সাপবন্ধু, "সারাজীবন শুধু ধরব আর খাব হাঃ হাঃ হাঃ," খাওয়ার কায়দা দেখাল রানাসাপ—কপ!

কিন্তু গিয়ে দেখে কী ব্যাঙ, পুকুর মানে তো শুধু জল নয়, পাড়ের নীচে চারপাশ জুড়ে জায়গাও থাকে অনেকটা। সাপের গাত্রধ্বনি শুনে সব ব্যাঙ চারপাশ থেকে ঝাঁপ দেয়, বজ্র ফাটার শব্দ ওঠে।

তারপর যখন ধীরে-ধীরে চার বন্ধু নেমে এসে জলের ধারে মুখ বাড়িয়ে দেখে তখন তাদের চক্ষু চড়কগাছ। জল দেখা তো যাচ্ছেই না, উপরন্তু ··· আর সব খুদে নয় এক-একটা ব্যাঙের সাইজ হাঁ করল, যতবড় হাঁ করা সম্ভব, না ঢুকবে না, কিছুতেই...

চার বন্ধু কী করবে কিংকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছিল, জলে ঝাঁপ দেওয়ার আগে সবচেয়ে বেশি ভাবতে হয় সাপকে, তারা সাঁতার জানে বটে কিন্তু জলের প্রাণীর মতো অত জলের দম তো তাদের নেই।

দুটো কোলা ব্যাঙ বোধ হয় কোথাও বাইরে গিয়েছিল, "গুড নাইট" বলে যে যার বাসার দিকে এগিয়ে যাওয়ার মুখে হঠাৎ দেখে চার চ্যাংড়া-ছোকরা সাপ জিভে জল এসে যেতে হাঁ করে যেই রসসংবরণ করতে গেছে দাঁড়াশ, অমনই দুই কোলাব্যাঙই দু'দিকে থমকে দাঁড়ায়, থপ-থপ করে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে দুপাশ থেকে বিশাল বাড়গোলের মতো দু'জন। "আমরা তোদের বাপের বয়সী আর তোরা কি না আস্পর্ধা তো কম নয়!" তারা দেখে সেই যে ল্যাজ
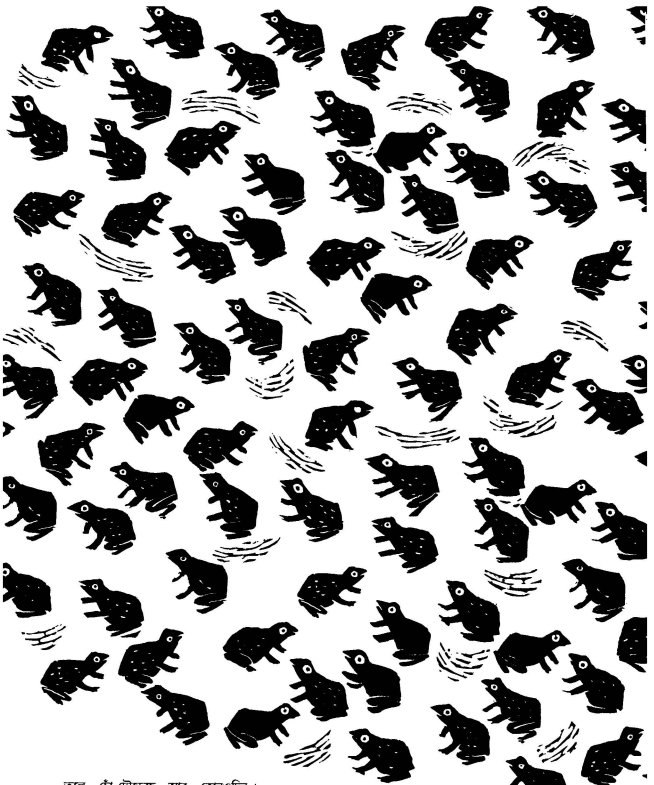
তুলে চোঁ-দৌড়েছে আর কোনওদিন ও-মুখো হয়নি।

বোধ হয় গল্পটা আরও ফলাও করে চাউর হয়ে গিয়েছিল সাপ-পাড়ায়, তারপর থেকে কত বছর হয়ে গেল ব্যাঙপুকুরে ব্যাঙ ছাড়া আর কেউ কিছু ভাবতেই পারে না। এখন সেই চার বন্ধু সাপ বুড়ো-অথর্ব, তাদের নাতি-নাতনিরাই জোয়ান, তারাই এখন বাঁশবাগানের রাজত্ব চালাচ্ছে। সাপেদের খুব মজার সংসার, এক-একটি ঢিপি এক-একজনের অধিকারে, যেখানে দুধ-খরিশ থাকে সেদিক দিয়ে কেউ কালো খরিশকে নিয়ে যেতে পারবে না, শত দুধ-কলা দিলেও না, নেউলের চেয়েও সাপ সাপের গন্ধকে বেশি ভয় পায়। আর সাপের খিদে-তেষ্টা জিনিসটা এত কম যে, তাদের বেশিদিন ঘর ছেড়ে বেরোতেই হয় না। আমাদের

যদি ওইরকম খিদে-তেষ্টা না থাকত...

যাকগে, এই সময়ের মধ্যে কিন্তু চারপাশে অনেক অদল-বদল ঘটে গেছে, লোকের জায়গা-জমি কমেছে, টাকার দাম কমেছে, গ্রামের লোক শহরের দিকে যাওয়া শুরু করেছে— এরকম অনেক। ব্যাঙপুকুরেরও মালিক বদল হতে যাচ্ছে, অবশ্য এসব কথা স্থানীয় ব্যাঙেরাও জানে না, সাপেরাও জানে না।

ব্যাঙপুকুর খুব বড় পুকুর নয়, বিঘেখানেক জল, হরিশপুরের হরিশ্চন্দ্র কয়াল খুব ধনী লোক ছিলেন, তাঁরই নামে হরিশপুর, হরিশ্চন্দ্র না বলে লোকে হরিশবাবুর বাড়ি যাচ্ছি কি আসছি বলতে-বলতে, তাঁর মৃত্যুর পর আরও বলতে হত কারণ তাঁর ছেলে ছিল প্রচণ্ড দুর্বৃত্ত টাইপের, লোকে পারতপক্ষে তার নাম ধরতে চাইত না। এই হরিশবাবুর অনেক জমি-জিরেত, অনেক বাগান-পুষ্করিণী, এই ব্যাঙপুকুরটিও তাঁরই অবিস্মরণীয় কীর্তির একটি। হরিশবাবু নাকি প্রথম-প্রথম মাছ ছাড়তেন, জল পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করতেন, পাড়ে ফুল-ফলের গাছ লাগাতেন, এসব অনেক পুরনো দিনের কথা, তারপর হরিশবাবুও আর নেই, জমিজমা সব বিক্রিবাটা করে কুলাঙ্গার ছেলে, মাছ ছাড়বে কি পুকুরই বেচতে লাগল ষাট-সত্তর হাজার টাকা দামের, মাহালিপাড়ার পুকুর বেচে দিল মাত্র বারো হাজার টাকায়। শুধু এই ব্যাঙপুকুরটা থেকে গেছে, এত ব্যাঙ যে, কোনও খদ্দের নিতে রাজি হচ্ছে না। ব্যাঙগুলো যেন পাট্টা পেয়ে গেছে এমন মনের সুখে মহা-উল্লাসে বসবাস করে আসছে। গোটা পুকুর এখন চাপ-চাপ ভীমরুলের মতো ছানাপোনায় ভর্তি।

প্রাণীমাত্রেরই সবচেয়ে প্রিয় পছন্দ স্বাধীনতা। যার যত বল সে তত স্বাধীনতা ভোগ করে, যে যত হীনবল তাকে তত ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়। সবাই জানে ব্যাঙ খুব দুর্বল, একটা ছোট হেলেসাপের বাচ্চাকে দেখলেও ত্রাস-ত্রাস করতে থাকে ব্যাঙকুল, কিন্তু ব্যাঙপুকুরের ব্যাঙ স্বাধীনতা পেয়ে-পেয়ে, স্বাধীনতা এমন এক জিনিস যে দ্রুত কী ভীষণ গায়ে-মনে জোর এনে দেয়। এই পুকুরের একটা টুনিব্যাঙও তার পাশ দিয়ে ছুঁচো কি ইঁদুর দৌড়ে গেলেও সে পরোয়া করে না।

এই পুকুরপাড়ে একদিন একজন লোক এল, কী বিকটকায় দৈত্যের মতো চেহারা, তার পিঠে পেল্লায় থলে, হাতে লোহার শিক। লোকটা ব্যাঙধরা লোক, ব্যাঙবালা। ব্যাঙধরা সাপ হয়, ব্যাঙধরা লোকও যে জন্মাতে পারে এ-কথা ব্যাঙেরা ভাবতেই পারল না। টুনিব্যাঙ দেখল বটে, কিন্তু বিশেষ গ্রাহ্য করল না, ছরছর করে চলে গেল বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে।

হরিশ্চন্দ্রর ছেলে কার্তিকেয়চন্দ্র, সে অবশিষ্ট যা জমিজায়গা, ভিটেমাটি, এমনকী, বাড়ির কড়ি-বরগা-টিন পর্যন্ত খুলে একেবারে বংশলোপাটের মতো বিক্রিবাটা করে দিয়ে শহরে চলে যাচ্ছে। ষাট হাজার টাকা কাঠা জায়গা কিনে, শহরের এক কাঠা জায়গা মানে গ্রামের দশ বিঘা জমি, বাবা সব ফালতু সম্পত্তি করে গেছেন এতদিন ধরে, শহরে এক বিঘে জমি করে গেলেও বুঝতাম কিছু করে গেছেন আমার জন্য। সারাক্ষণ মুখে বাবার সমালোচনা করতে-করতে একতলা একটা বাড়ি তুলেছে কার্তিকেয়। কয়লার গুদাম করবে, বাকি জমি, ডোবা-পুকুর যা আছে শস্তাগণ্ডায় ছেড়ে দিয়ে গ্রামের পাট চুকিয়ে চলে যাবে। গ্রামের লোক বলছে হরিশবাবুর খোয়ারে ছেলে বাবার চোখ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এত বিশাল সম্পত্তি সব ফুঁকে দিল। কার্তিকেয়চন্দ্র শুনে রেগে যায়, "শহরের নখের যুগ্যি তোরা, পচা কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছিস, থাক তোরা, আমি চললাম, আমি বাবু।"

কার্তিকেয়চন্দ্র খদ্দেরকে নিয়ে ব্যাঙপুকুর দেখাতে এসেছে, বাধ্য হয়ে তাকে আসতে হল, খদ্দেরকে লোকে দু'কান ভরে ভাঙচি দিচ্ছে, "আপনি আর যাই কিনুন শশধরবাবু, টাকা দিয়ে ব্যাঙ কিনবেন না।" শশধরবাবু ব্যাঙপুকুর কিনছেন শুনে প্রথমে হো-হো-হা-হা-হি-হি হর্ষধ্বনির শোরগোল পড়ে যায়!

"না মানেন তো নিজের চোখে একবার দেখে আসেন না!"

"হ্যাঁ গো বাবু শুধু ব্যাঙ, লাখ-লাখ, কোটি কোটি জল-ডাঙা কিচ্ছু দেখতে পাবিনি বাবু, কেউ খেলছে, কেউ গান গাইছে, ছাতা মাথায় দিয়ে বসে আরাম করছে কেউ। তা কত টাকা দর নিচ্ছে গো বাবু ব্যাঙপুকুরের?"

"তিন হাজার।"

খি-খি-খি

শশধরবাবু বললেন, "চলো তো কেউ আমার সঙ্গে, পান খেতে দুটো টাকা দেব ..."

"অ্যাঁ!"

"না বাবু, মাপ করবেন, আমরা কেউ ভুলেও কখনও ও-পথ মাড়াইনি।"

"হ্যাঁ বাবু, অত ব্যাঙ দেখলে আমাদের কেমন গা গুলোয়, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।"

"যার পুকুর, আপনি তাকেই সঙ্গে নিয়ে যান বাবু, আমরা পাড়ার লোকরা কেউ যেতে পারব না।"

সেই হিসাবেই কার্তিকেয়চন্দ্রের ব্যাঙপুকুরে আসা।

সেই চার বন্ধু বুড়ো সাপ, সাপেদের কোনও সংশয় নেই, কোনও সমাজ নেই, কারও সঙ্গে কারও চেনা-পরিচয় নেই, বাপ ছেলেকে চেনে না, সাপ ভীষণ একা, জন্মের পর থেকেই সে একা, মৃত্যু পর্যন্ত। সাপের জন্ম-মৃত্যু দুটোই অদ্ভুত, ডিম ফুটে ছিটকে-ছিটকে লাফ খেয়ে-খেয়ে বেরোয় আর মরে ঘুমোতে-ঘুমোতে গর্তের মধ্যে। তবু কী করে যেন এই চার বন্ধুর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তৈরি হয়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, দাঁড়াশ-কালো খরিশ-রানা আর হেলে। রানার আবার দু' দিকে মুখ, ঠিক মুখ নয়, কামড়ানোর অস্ত্র, যেমন বিছের থাকে, এদের মধ্যে কালো খরিশই একমাত্র ফণা তুলে দাঁড়ায়, আর বিষ মানে যমের মতো বিষ, কালো কুচকুচে কালো খরিশ যখন ফণা তুলে রাজকীয় চালে তিন বন্ধুর সঙ্গে হেলেদুলে বাতাস খেতে বেরোয়··· হেলের জন্যই আমরণ বন্ধুত্বটা টিকে গেল তাদের, সেই এসে ডাকে, "খরিশদা, মুখ আঁধারি হয়ে এসেছে, এসো, একটু ঘুরে আসি!" সে হেলে, তার বিষও নেই আর সে কামড়াতেও জানে না, সে ভাবে, আচ্ছা, বিষ নেই বলে হেলেজাতটা অত অনুশোচনা করে মরে কেন, তোর যা খাবার তা তো প্রকৃতি জগতে ছড়ানো রয়েছে। তুই ধর, খা, তা তুই বিষ দিয়ে কী করবি, আর অযথা কামড়ানোরই বা দরকার কিসের বুঝি না বাপু!

কিন্তু কালো খরিশকে হেলে সাপের দারুণ লাগে—কী ডমরু বাজনার মতো চলন, কী সুন্দর সুসজ্জিত খড়মপরা ফণা, দুলকি চালে সে যখন জিভ লকলক করতে-করতে হাঁটতে থাকে তখন তাকে সত্যি মহারাজ-মহারাজ লাগে। না, সাপরাজ্যে কোনও রাজা-মহারাজা নেই, এখানে সবাই রাজা।

আর হেলেকে মোহিত করে রানা-র গায়ের রং, যখন সে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকে, তখন মনে হয় ধরিত্রী-মা অনেকরকম ও অনেক রঙের ঝলমলে গয়না পরে সবুজ আঁচল ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

তবু তাঁর দাঁড়াশকেই সবচেয়ে ভাল লাগে, তার চক্কর নেই কিন্তু ফোঁস আছ,

কামড়াতে জানে কিন্তু বিষ নেই, সে সাপ কিন্তু প্রাণের মৃত্যু ডেকে আনে না।

হেলে সাপ এত তুচ্ছ তার দুটো পোকামাকড় হলে চলে যায়, তার জীবনীশক্তিও এত কম যে, বাঁচা-মরার মধ্যে খুব বেশি তফাত দেখতে পায় না, তাই সে অবাধ যাতায়াত করত কালোদা-রানাদা-দাঁড়াশদা-র অঙ্গন প্রাঙ্গণে।

একবার সে বন্যার খবর দিয়েছিল জলে ভাসতে-ভাসতে গিয়ে। নদীর কাছাকাছি হরিশপুর, কখন হুশ করে জল বেড়ে পাড় উঁচিয়ে চলে এসেছে। হেলের বাস নিচুস্থলে সরু কাঁকড়ার গর্তে কি কোনও পোকামাকড়ের গর্তে কিন্তু ওদের বাস··· বড়-বড় লোকের বড়-বড় ব্যাপার, কালো থাকেন বড়াম থানের বাঁশমুড়োর ভেতর, বিশাল হাঙর ঢুকে যাওয়ার মতো গর্ত, দাদার চেহারাটিও তো কম নয়, দাঁড়াশ থাকে শিরীষতলায় ইঁদুর-গর্তে, রানা আশ্রয়চ্যুত হয়েছে, আগে থাকত কৈলাসবুড়ির পরিত্যক্ত ভাঙা ভিটেয়, সে ভিটের মাটি কোদালে তেড়ে চেলে দেওয়া হয়, রাতের অন্ধকারে পালাতে পথ পায় না রানা। কিন্তু কোনও সাপের নতুন করে আশ্রয় জোগাড় করা খুব কঠিন, প্রথমে গন্ধ শুঁকে-শুঁকে জানতে হবে পাশাপাশি আর কোনও সাপ বাস করে কি না, যদি না করে তা হলে তখন গর্ত খোঁজার পালা, গর্তটি আবার এমন জায়গায় হওয়া চাই যা সর্বচক্ষুর অন্তরালে তো হবেই, সূর্যালোকেরও সামান্য অনুপ্রবেশ ঘটবে না। আলোর চেয়ে বড় শত্রু সাপের আর কিছু নেই।

যাই বলো সাপ বড় ভিতু, হ্যাঁ, না হলে দাঁতপাটিতে অমন বিষ থাকতে-থাকতে কেউ এতকালের বাস ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসে হলুদ বনে আশ্রয় নেয়!

এই হলুদ বনেই বুড়ো হয়ে গেল রানা, তাকে গর্তের কথা বললে সে হেসে বলে, "বুড়ো বয়সে আর গর্ত খুঁজতে পারব না, দিব্যি তো আছি, বছরে একবার হলুদ খুঁড়তে আসে চাষি, ওই সময়টা দিন-দুই একটু সরে থাকতে হয়।"

হেলে বলেছিল, "রানাদা, আমি দেখে এসেছি, দারুণ জায়গা, ওই মজা কুয়োপাড়ে, কেউ যায় না ওদিকে।"

রানা গেল না।

হেলে বন্যার দিন প্রত্যেককে ঘুম থেকে ডেকে-ডেকে তুলল, গর্তে জল ঢুকে গেলে আর বেরোতে হত না। চার বন্ধু গাছে ওঠে, সত্যি কী প্রলয়ঙ্কর বন্যা, চারদিক থেকে জলের স্রোত কুল-কুল ধ্বনিতে তেড়ে আসছে। তারা সকলেই সেদিন হেলে সাপের প্রতি ভীষণ আবেগ-উচ্ছল হয়ে যায়, সেদিনই হেলের কথামতো চার বন্ধু শপথ নেয়, আমৃত্যু তারা বন্ধু হয়েই কাটিয়ে দেবে।

অক্ষম এই চার বুড়ো সাপ সেইদিন গতর চলে না, অনন্যোপায় হয়ে তারা সহজ খাবার সন্ধানে ব্যাঙ পুকুর-পাড়ে এসে উপস্থিত হল। সেইদিন অর্থাৎ যেদিন একদিকে এসে দাঁড়িয়েছে কোমরে হাত দিয়ে, লোহার শলাকা নিয়ে পিঠে থলে দৈত্যাকায় ব্যাঙ-ধরা লোকটা আর এক পাড়ে এসে দাঁড়াল মালিক কার্তিকেয়চন্দ্রবাবু এবং তার পুকুর-ক্রেতা।

কার্তিকেয়চন্দ্র তার পুকুরপাড়ে এই উবো-ঝুবো লোকটাকে দেখে হাঁকাড় দিয়ে ওঠে, "এই,এখানে কী করছিস?" যেন কত মাছ আছে পুকুরে। তাকে বকতে-বকতে চলে আসে আর-একটা পাড়ে। ব্যাঙগুলো দেখছে তিন পাড়ে তিনজন, আর এক পাড়ে চার বন্ধু সাপ, খসখস করে এসে আশ্রয় নিয়েছে ধনচে ঝোপের আড়ালে। চারদিক থেকেই যেন আক্রমণের একটা গন্ধ পেল ব্যাঙগুলো, টুনিব্যাঙ খেলা ছেড়ে দৌড়ে পালাল মা-র কাছে।

ব্যাঙবালার মতিগতি ভাল লাগছে না কার্তিকেয়চন্দ্রের, ছদ্মবেশী চোর-ডাকাত নয়তো, কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো!"

শশধরবাবু অত ব্যাঙ দেখে শুধু বিস্মিত নন, পুকুর কেনা মাথায় থাক, তিনি পড়িমরি কী করে পালাবেন পথ খুঁজছেন। কিন্তু ব্যাঙ-ধরা লোকটার মুখে তার ব্যাঙ-ধরা কারবার শুনে তিনি পা-পা করে গেলেন ওই পাড়টায়, ওদের কাছে।

"ব্যাঙ ধরে কী করো?"

"বেচি বাবু।"

"বেচো! কে কেনে, কে?"

"খড়্গপুরে পাইকার আছে।"

শশধরবাবু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কত করে দাম পাও?"

"ও পাল্লা-হিসাব বাবু, সতেরো টাকা পাল্লা।"

"পাল্লা মানে পাঁচ কিলোর পাল্লা?"

"হ্যাঁ। দাঁড়ি মারে বাবু, বড়-বড় ব্যাঙ চল্লিশ-পঞ্চাশটা লাগে এক পাল্লায়।"

"চল্লিশ-পঞ্চাশটা ব্যাঙের দাম সতেরো টাকা, মানে চৌত্রিশ টাকা শ', তার মানে এক হাজার ব্যাঙ বেচতে পারলে···"

মনে-মনে হিসাব করেন শশধরবাবু। ব্যাঙ-পুকুর থেকে বছরে দু-তিন হাজার টাকা রোজগারের একটা যেন রাস্তা দেখতে পেয়ে যান। তিনি উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমাকে কত করে কিলো দেবে, আমি এই পুকুরটা কিনে নিচ্ছি।"

ঝট করে কার্তিকেয়চন্দ্র বলে বসল, "আমি পুকুর বেচব না। এই, তুই আমার সঙ্গে কথা বল, বল কত করে কুইন্টাল···"

ত্বরিত দুই ভদ্রলোকের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া বেঁধে গেল পুকুর পাড়ে।

"পুকুর দেখাতে নিয়ে এসে বলে বেচব না। তা হলে তোমার অন্য কোনও জমিও আর আমি কিনছি না, দেখি এই খরার বাজারে কে কেনে!"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ যাও, তোমার মতো ঢের খদ্দের আছে, ভাত ছড়ালে···"

ব্যাঙবালা না থাকলে হয়তো এই দুই ভদ্রলোকের মধ্যে চড়-চপেটাঘাত হয়ে যেত, ব্যাঙবালা কোনওরকমে হাতে-পায়ে ধরে থামিয়েছে।

কিন্তু সেই রাতেই শশধরবাবু ফলিডলের পুরো ভর্তি শিশিটা খুলে ব্যাঙ-পুকুরের জলে ছুড়ে দিয়ে চলে যান, পরদিন সকালে দেখা গেল, পুকুরের সব ব্যাঙ ওপর দিকে ঠ্যাঙ তুলে মরে ভেসে আছে।

চার বন্ধু-সাপও এই বিষক্রিয়ায় মারা যায়, বিষের জ্বালায় যত ব্যাঙ-ব্যাঙবাচ্চা ছোটাছুটি করছে, কেউ নেতিয়ে পড়ছে, কেউ ঢলে পড়ছে ক্যাঁ-ক্যাঁ করতে-করতে মৃত্যুর কোলে, তারা ভেবেছে দুর্বল ব্যাঙ, ভেবে অমনই যেই কামড়ে খেয়েছে আর সঙ্গে-সঙ্গে··· বন্ধু বিদায়, বিদায় বন্ধু, বড় জ্বালা! কালো খরিশ গর্জনে পুকুরপাড় কাঁপিয়ে দিয়েছিল, মাটির ওপর দাঁত কামড়ে চোট মারল পর-পর, কিন্তু সে আর কতক্ষণ, দেখতে-দেখতে সেও অবশ হয়ে পড়ল, কোনওরকমে ঘষটে-ঘষটে গিয়ে তিন বন্ধুর মৃতদেহের পাশে নিজেরও একটু জায়গা করে নেয়।

এখন আর ব্যাঙপুকুরে একটাও ব্যাঙ নেই। পুকুরের পুরনো জল বের করে নতুন জল ঢুকিয়ে চারাপোনার ব্যাপক চাষ হচ্ছে। আগের চেয়েও শস্তায় পুকুরটা বেচে দিয়ে শহরে চলে গেল কার্তিকেয়চন্দ্র।

ব্যাঙ মারা গিয়েছে, সাপও মারা গিয়েছে, নিশ্চয় ব্যাঙ-ধরা লোকটাও মারা গিয়ে থাকবে। এইটাই ছিল তার সংসারের একমাত্র জীবিকা।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী
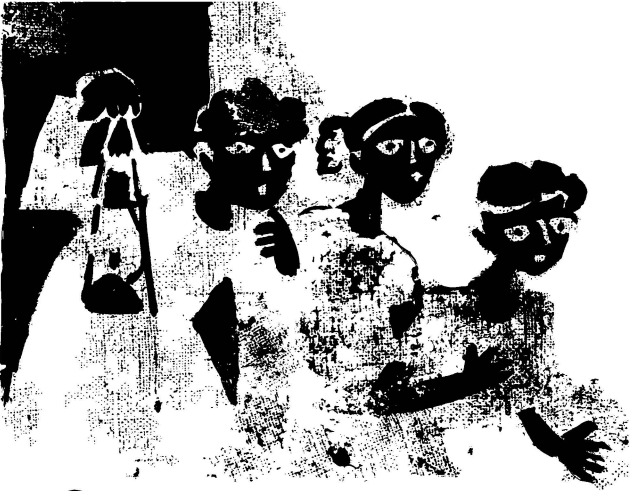
ষাটিপান্তার দেশে

আবুল বাশার

টিয়াডিহিতে চোর নেই,এমন কথা এতকাল আমরা গর্বের সঙ্গে বলেছি।এই দিগরে ওই এক কারণে আমাদের বড় সুনাম ছিল। টিয়াডিহির মানুষ রাত্রিতে বড়ই সুখে নিদ্রা যেত। দরজা-কপাট খোলা রেখে ঘুম দিত সবাই, কখনও কোনও কিছু চুরি হওয়ার একফোঁটা ভয়ও মনে আসেনি।কিন্তু হঠাৎ এ-বছর আষাঢ়ের গোড়ার দিকে কী করে যেন বাতাসে রটনা হয়ে গেল, এ-গাঁয়ে চোর ঢুকেছে।

মোল্লার চর চোরের জায়গা। টিয়াডিহি থেকে যোজন-যোজন দূর। শোনা গেল, সেখান থেকে শাহু নামে এক কুখ্যাত চোর সদরঘাট পেরিয়ে এ-গাঁয়ের শিবতলার হাটে এসে ক'দিন আগে ছুরি শান করাচ্ছিল লালু খাঁর চাক্কিতে। নিজেই সে নাকি দু' পা মেলে চটে বসে দুলে-দুলে ফিতে দু' হাতে টেনে ছেড়ে বালিঘষা চাক্কি ঘুরিয়ে ছুরি শান করিয়ে নিয়ে টিয়াডিহির মোড়ের দিকে রওনা দিয়েছে, তারপর তাকে আর কেউ দেখেনি।

এই যে আর তাকে দেখা যাচ্ছে না, এটাই নাকি খুব শঙ্কার কথা। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, একহারা মিহি গড়ন, মাথাটা দেহের তুলনায় ক্ষুদ্র আর তেলচকচকে টাকে ভর্তি, ক'গুছি চুল যেন কেউ অপ্রসন্নভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে টাকটির হেথাহোথা—নাকটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো, চোখ কুতকুতে। পরনে পাটের আঁশের ঝলমলে শস্তা লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া জ্যাকেট, পায়ে রবারের জুতো।বর্ণনা শুনতে-শুনতে মনের ওপর ভয় চেপে বসে।

রবারের জুতো পরে শাহু, তা নিশ্চয় যাত্রার আসরে গিয়ে কোনও বাবু পা থেকে খুলে রাখলে পর, হাতিয়ে নিয়েছে। নইলে চোরে কখনও রবারের জুতো পরে বলে শুনেছি কি, শুনিনি ! এই তোমরাই বলো বাপু, নগেনের কথার কোনও মানে হয় !

বিবরণ শুনতে-শুনতে আমার মাসি পদ্মরানি বাগড়া দিয়ে বসলেন। নগেন এ-বাড়ির একজন কিষেন-মাহিন্দর, জমিজিরেতের হিসাব পর্যন্ত রাখে। মাসির জমিদারি নেই, কিন্তু ভূসম্পত্তি বিশাল।তারই যত আবাদ-বিবাদ নগেনকেই করতে হয়। সে আমাদের চোখে মুরুব্বি লোক। গাঁয়ের লোক ওকে এই পরিবারের নায়েব মনে করে। কর্তা মেসো, কিন্তু হর্তাই যে নগেন পাঝরা। পাঝরা বোধ হয় ওর পদবি। আমরা তো বটেই, মেসো পর্যন্ত ওর কথায় মান দেন।

কেবল পদ্মমাসি মাঝে-মাঝে ওর কথার দোষ ধরেন। অবশ্য তাতে পাঝরার খুব একটা কিছু এসে-যায় না।

নিজে চোখে শাহুকে নগেন দেখেনি বটে, কিন্তু নানামুখে সাতসতেরো এত শুনেছে যে, ওর সব মুখস্থ হয়ে গেছে। মাসির কথায় ও একটুও দমল না।

বলল,"রবারের জুতোই খালি পরে না, জুতোর ভেতর জল ঢুকিয়ে পিচকারি মেরে হাঁটে।"

পদ্মমাসি মুখ মোচড়ালেন অবিশ্বাসে, "চোরের যত আদিখ্যেতা! তা কেন হবে না? ওই করে বাচ্চাদের ভুলিয়ে কাছে ডাকে। বাড়ির নানারকম তল্লাশি করে নেয় মুখে-মুখে। কত মন ধান উঠেছে এবার! কে কোথায় শোয়, খিড়কির দোর শেকলের, নাকি কাঠের হুড়ো লাগানো। বাড়ির যে কাজের মেয়ে সে কি বারান্দায় শোয়? নাক ডাকে? নাক ডাকলে কুকুরটা ভেই-ভুক করে কি না! করে না।" বলতে-বলতে থামল নগেন।

সবাই এবার কাজের মেয়ে বিলির দিকে চাইল সকৌতুকে। আমাদের গা কেমন ছমছম করে উঠল। নগেনের গলার স্বরও ক্রমশ রহস্যে জড়িয়ে পড়ছে। টিয়াডিহিতে কেউ কখনও চোর দেখেনি, বিলিও দেখেনি। চোর সম্বন্ধে ওর কোনও ধারণা নেই। চোর না চোর! পায়ে রবারের জুতো-পরা চোরকে কতটা ভয় পাওয়া উচিত সে ভেবে পেল না।

কেবল মস্ত করে চোখ পাকিয়ে বলল, "নাক ডাকবে আর চোর আসবে ভেবেছ, সে গুড়ে বালি, আমি সারারাত জেগে থাকব না! আমার নাক ডাকলে বাঘাটার নেশা হয়। নইলে বাঘা ঘুমোয় না। জেগে থাকল তো থাকলই।"

এ-কথা ঠিক, মানুষের ঘুমের সময় নাক ডাকলে কুকুরের নেশা হয়। ঢুলুনি

চাপে, ঘুম পেয়ে যায় । বাঘাটার স্বভাব বিচিত্র। সঠিক বলেছে বিলি। এখন বর্ষামাস। গতকাল শ্রাবণ শেষ হয়েছে। ভাদুরি পাকা ষাটি ধানে মরাই আর বাড়ির উঠোন, এমনকী নীচের তলার বারান্দা ম-ম করছে গন্ধে। সারা গাঁয়ে কোনও গেরস্ত-আঙিনায় পাকা ধান ওঠেনি, ওঠার কথাও নয়।

আজকাল হাই-ইল্ডিং হয়ে, উচ্চ ফলনশীল বীজ ষাটিকে নিপাত্তা করেছে। মেসো নগেনের চেষ্টায় সাগরদিঘির চরণ মণ্ডলের গোলা থেকে ষাটির বীজ জোগাড় করে শীতলসিসার ভুঁইতে বুনেছিলেন।

ষাটি হল ষাট দিনের ধান।ভাদুরি ধানই বটে, তবে বোনার ষাট দিনের মাথায় ফলে গিয়ে পেকে মরাইতে জড়ো হয়। ধানের এত দ্রুতি বাংলার আকালকে আগে কত ঠেকিয়েছে, এখন উচ্চ ফলনের নানা মরসুম বলে ষাটির কথা সবার আর মনেও থাকে না। মেসো কী মনে করে শখবশত ষাটির আবাদ করেছেন নগেনের তাগাদায়।

নগেন বলল, "ষাটি উঠল আর চোরও লাগল।আগে যেমন হত !"

"আগে হত মানে ?" পদ্মমাসি শুধোলেন।তারপর আপনমনে বিড়বিড় করে বললেন, "গেরস্তর খবর সবাই রাখে। আগে রাখত, এখনও রাখে। শাহু কি আজকার চোর ! তোদের জন্মের কত আগে থেকে ওই পোড়া নাম শুনেছি ! বাঘা এখন জেগে থাকলে বাঁচি !"

মাসির কথার ইঙ্গিতে বিলি সলজ্জভাবে নড়েচড়ে জুত করে বসল।যেন তারই সব দায়িত্ব। বিলি ভারী চতুর বুদ্ধির মেয়ে। ঘাড় এমন করে রইল, মনে হল কাঁধে তার জোয়াল পড়েছে।

"এত বিবরণ কোথা পেলে তুমি নগেন !"

হঠাৎ মেসো প্রশ্ন করলেন দুশ্চিন্তার চাপে । তারপর বললেন, "তোমার কথাই ঠিক। ষাটি ধানের সঙ্গে পুরনো চোরদের খুব সম্বন্ধ ছিল। আষাঢ় হল গেরস্তর দুঃখের মাস। ভাদ্রের আগে পকেটও খালি, গোলাও শূন্য। সব পয়সা খেতেও ঢালতে হয়, এদিকে গোলায় ধানও ফুরিয়ে আসে। চোরেরা তখন ঘটিবাটি চুরি করে বেড়ায়। ভাদ্র মাসে চুরির সাইত করে চোরেরা। কিছু না পেলে ষাটির খড় চুরির করে। খড় তো নয়। ও হল গাদানো খড়ের মাটিভাপা পোয়াল। তাই কী আর করে ! ওটা হল কথার কথা ! তা হ্যাঁ হে নগেন, শাহু কি সত্যিই ঢুকেছে টিয়াডিহিতে ?"

গলায় জোর দিয়ে নগেন বলল, "তবে আর বলছি কী ! ধানের গন্ধই বলছে চোর আসবে !"

রাত হয়েছিল। বাইরে অন্ধকারে ঝেঁপে এল কালো বৃষ্টির ধোঁয়াশা। বৃষ্টির ছাঁটে আকাশ উতলা হওয়ায় এলোমেলো করছে শাঁ-শাঁ টানা শব্দ। সারারাত জেগে রইল বিলি। নাক ডাকতে দিল না। বাঘাও যেন বুঝতে পারছিল চোরের মেঘলা বাদলা রাতের গভীর বিজলি-চমকানো সঙ্কেত।

ভোরে বৃষ্টির বেগ কমে সকাল দশটা নাগাদ রোদ উঠল মেঘের ফাঁকে।চারদিক জলে থই-থই করছে। খেতভুঁই সব ডুবে গেছে। খেত-মজদুরদের আর কাজ হবে না। গেরস্তকেও চুপ করে বসে থাকতে হবে। এ-বছর যদি অতি-ঝরা হয়, চোরের চোট বাড়বে।টিয়াডিহিতে চোর নেই, সেই মুখও আর থাকবে না।

মেসো গায়ে মোটা চাদর জড়িয়ে টিনের চেয়ারে বসে হলুদ বড় ব্যাঙ দেখছিলেন ডোবার পাড়ে চিৎকার করছে, মাটির উঠোনের কোণে ইঁদুর মাটি তুলেছে, সেখানে একটা মোটা কেঁচো নড়ছে।রাতভর বাঘাও ঘুমোতে পারেনি।

মেসো হঠাৎ বললেন, "এই সময়ে চোর জন্মায়।"

মেসোর কথায় আমি, সিদ্ধা আর বাবাই চমকে উঠলাম। সিদ্ধা আর বাবাই মাসির ছেলেমেয়ে। আমরা তিনজনই টুয়েল্‌ভের ছাত্রছাত্রী। চোর জন্মায় শুনে অবাক হই।

"চোর জন্মায় মানে ?" সিদ্ধা প্রশ্ন করল। মেসো চাষি বটে, ফের প্রাইমারি স্কুলের টিচারও। দার্শনিকের মতো কথা বলেন অনেক সময়। প্রশ্ন শুনেও চুপ করে রইলেন। কথা না বলে আকাশ দেখবার জন্য দোতলার ছাদে উঠে গেলেন।সহসা বাবাই উঠোনে নেমে গিয়ে একপাটি রবারের বিরাট জুতো এনে সবিস্ময়ে বলে উঠল, "এই দ্যাখো, শাহু এসেছিল !"

সিদ্ধা চেঁচিয়ে বলল, "ওই দ্যাখ দাদা, আরও একপাটি ঢেঁকিঘরে পড়ে আছে !"

বিলি রান্নাঘর থেকে ছুটে এল জুতো দেখতে। তারপর চিৎকার জুড়ে দিল।সবাই নীচের তলার বারান্দায় জড়ো হয়ে আশ্চর্য চোখে জুতোর দিকে চেয়ে রইল।

বংশীর মা এসেছিল ঢেঁকি পাড়বে বলে। আজ সাতদিন রোদের আকাল। এই আসে তো ওই নিবে যায়। সারাটা দিন কাটে মেঘে-রোদে-বৃষ্টিতে মাখামাখি হয়ে ঝিমোতে-ঝিমোতে, রোদের গা জ্যোৎস্নার মতো নরম। রোদের ভাদুরি গন্ধ যেন ষাটির মতো গুমোট ভ্যাপসা।

বংশীর মা মাসিকে রোজই এসে ককাচ্ছে, "দাও মা ! তিনগড় ভানি। সাতদিন আগে আধমন ভেনেছি, আর আধমন ভানলে তবে দেড় কিলো চাল দেবে বলেছিলে। কই দাও !"

"রোদ যে উঠল না বংশীর মা, কী করে ভানতে দিই ! সব চাল খুদ হয়ে যাবে। ষাটি ধান নরম হয়, রোদ উঠলে এসো !"

"তবে হাফ কিলো চাল আমায় দাও, বংশীকে রেঁদে দিই গে পদ্মবউ !"

এভাবে কতরকম করে ককাচ্ছিল বংশীর মা। মাসি ওকে চাল দিলেন না। বললেন, "তোমার তো মনের হিসাব বংশীর মা। আরও আধমন ভেনে তবে তো চাইবে ! অত যদি কেতরে মরো, সিদ্ধার বাবাকে তা হলে বলি,গঞ্জের কলে দিয়ে চাল করে আনবে এখন।"

"আমি তো জোর করিনি পদ্মবউ ! খালি দু' মুঠো রাঁদব বলে চেয়েছি।সেই চাওয়াতে কী ঘাট হয়ছে বুঝিয়ে দাও ! মেহনত করেছি, চাইব না ?"

"অত মুখে-মুখে কথা সহ্য হয় না, তোমার চাইবার কোনও ছিরি আছে ? দেখছই তো, নতুন ষাটি উঠেছে। বর্ষার ভয়ে পান্তা করে যে খাব সে আর হচ্ছে না। সিদ্ধার বাবা পান্তা খেতে ভালবাসে। ষাটিপান্তার স্বাদ... !"

"আহা, সে-কথা আর বোলো না পদ্মবউ ! গতজন্মের কথা ! বংশীর বাপ বেঁচে থাকতে সামসুদ্দিন চৌধুরীর বাড়ি থেকে এই শাওনের শেষে গামছা বেঁধে আনত।লোকটা নাই, ষাটিপান্তাও নাই !"

"নাও, আর আদিখ্যেতা কোরো না ! ষাটি কেবল এই ঘরেই আছে ? ওসব অত জন্মজন্মান্তর দেখাতে হবে না, আমরা চোরের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি। এখন যাও, কাল রোদ চড়া হলে এসো। আধমন ভেনে তোমার পাওনা নিয়ে যেয়ো।"

"তা যাই বাছা, গরিবের কি আর সেই মুখ আছে ! আমার বংশী ষাটিপান্তা খেলে তোমাদের জাত যায় যে পদ্মবউ ! এদিকে আমার মাটির চুলো গলে গেল। দু'দিন কিছু রাঁদিনি, চাইলাম বলে কত কথা শোনালে ! তা বলি কি, দেড়-দু' পো আটা দাও তা হলে , গুলে রেঁদে দিই গে বেটাকে !"

বংশীর মায়ের সকাতর আবেদন শুনে

পদ্মমাসির মন কিন্তু টলল না। মুখে একটা ঝটকা মারা ঝামটা দিয়ে মাসি রেগে গিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন, "নেই !"

ভয়ে একধাপ পেছনে সরে এসে দাঁড়াল বংশীর মা।আমরা তিন কিশোর-কিশোরী হতবাক হয়ে এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে দোতলা ছেড়ে নীচে চলে আসি। মাসির কড়া তর্জন শুনে নীচে চেয়ার ছেড়ে মামা রোদ দেখার নাম করে দোতলার ছাতে চলে যেতেই বাবাই উঠোনে নেমে রবারের লম্বা জুতোর পাটিখানা তুলে আনে। হলুদ ব্যাঙ ডাকছে ডোবায়।কেঁচো নড়ছে উঠোনে। মাটি-তোলা গর্তে একটা ইঁদুর মুখ বাড়িয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে গর্তের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। এখন কত বেলা বোঝা যায় না।

রাতের বর্ষার জল উঠোন ছাপিয়ে গিয়েছিল, স্রোত চলেছিল সারারাত। এখন স্রোত নেই, জল নেমে গিয়েছে, কাদার আস্তরণ মেখে পড়ে ছিল জুতোর একপাটি।অন্য পাটিটা কী করে ঢেঁকিশালে গেছে সে-ব্যাপারে মাথা খাটাবার অবস্থা কারও নয়। বাঘা কি টেনেছিল মুখে করে ?

সিদ্ধা আমাকে ওর কোঁচড় থেকে মুঠোয় তুলে ষাটিচাল খেতে দিয়ে বলল, "দেখো খেয়ে, কেমন আশ্চর্য গন্ধ ! তুমি শহরে থাকো, তোমার খুব মুখ ভরে যাবে। কখনও এই স্বাদ আর পাবে না।"

সিদ্ধার কথা শেষ না হতেই ওর চোখ ঢেঁকিঘরে গিয়ে থামে। অমনই সে বাবাইকে চেঁচিয়ে বলে, "ওই দ্যাখো দাদা, আরও এক পাটি ঢেঁকিঘরে পড়ে আছে।"

নগেন জল দেখে খেত থেকে এইমাত্র ফিরে রবারের জুতো দেখে থমকে গেল।

"আচ্ছা ! তোমরা তো কিছুই দিলে না। রবাটের চড়াতোলা জুতি জোড়া দাও দিকিন। বংশী পরে দেখবে ! জলে ভেসে এসেছে, জুতির গায়ে তো চোরের নাম লেখা নেই।"

বলেই বাবাইয়ের হাত থেকে একপ্রকার ছিনিয়ে নিয়ে বংশীর মা কোমর দোলাতে-দোলাতে ছপছপ করে হেঁটে চলে গেল উঠোন পেরিয়ে পথে।

পরের দিন ভোরে সহসা মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ উঠে পড়ল। শাহু ডাকাতের রবারের জুতো পরে ধানগোলার চাল ছাওয়ার কাজে এল ঘরামি বংশীলাল। ছাদ জুড়ে ষাটিধান মেলে দেওয়া হয়েছে। ঠিক দুপুরবেলা আবার মেঘ। পৃথিবী আঁধারে কালো হয়ে গেল।

চাল ছাওয়া অসম্পূর্ণ রেখে বংশী চলে গেল।

যাওয়ার সময় নাকি বিলিকে বংশী বলে গেছে, "আজ রাতে শাহু চুরি করতে আসবে।"

বংশী কী করে জানল শাহু আজ রাতেই আসবে ? এ-কথা শুনে নগেন ভয়ানক রেগে গেল। মেসোর দিকে চেয়ে থেকে গম্ভীর সুরে বলল, "বুঝলেন বড়বাবু ! বংশীকেই এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই জুতো পরে ও না শেষে চুরি করার ফাঁপরে পড়ে যায়। মানুষের মন তো !"

পরের দিন আবার ভোরে সাদা আকাশে সূর্য উঠল ঝলমল করে। সিদ্ধা বিলির কাছে কত কথা জেনেছে। শাহু ডাকাত নাকি ষাটিপান্তা বেজায় পছন্দ করে। যদি চুরির রাতে এসে পান্তা পায় তো অন্যকিছু নেয় না, ভাত খেয়ে চলে যায়।

সিদ্ধা বিলির কথায় বিশ্বাস করেছে। বাবাই অবাক হয়ে সব শুনে বলল, "শেষে বংশীর মতো একটা সাদা সরল মানুষ চোর হয়ে যাবে ! জুতোজোড়া সত্যিই কি শাহুর জুতো !"

সিদ্ধা বলল, "শাহুর চুরি করার নিয়ম আছে। যখন যে-গাঁয়ে ঢোকে, একটা করে শাগরেদ সঙ্গে নেয়। প্রথমে যাকে শাগরেদ করবে, তার উঠোনে রবারের জুতো ফেলে আসে। বিলিকে বলেছে বংশী। ওই জুতো নাকি পরশুর আগের রাতে বংশীদের বাড়িতে শাহু রেখে গিয়েছিল। ভয়ে বংশী বৃষ্টির রাতে বাইরে ফেলে দেয়, স্রোতে ভেসে এ-বাড়িতে ঢুকেছে।"

বাবাই মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি ! বংশীর মা কেন অমন করে জুতোজোড়া ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল ?"

তাই নিয়ে মা-ছেলের ভয়ানক ঝগড়া হয়েছে ! "কেন মা ওই জুতো ফের বয়ে নিয়ে গেল বাড়িতে।"

"এই কথা বলছিল বিলি !"

বাবাই অবাক বিস্ময়ে সিদ্ধার মুখের দিকে চাইল। যেন সে বিশ্বাস করতেই পারছিল না। সব শুনে মেসো দোতলায় বিলিকে তলব করলেন, "বল বিলি, কী শুনেছিস। বংশী তোকে কী বলে গিয়েছে ! এমন রহস্যময় রবারের জুতোর কথা আগে শুনিনি।"

বিলি বলল, "মিছে কথা নয় বাবু। ওই যে পেট-কাঁদানে জোয়ান দানোটা, বংশী ! আমাকে যা বলে গেল, তাই বলছি। এক হপ্তা ধরে বর্ষা থামে না। তাই শাহু এসে জুতো ফেলে গিয়েছে। আজ রাতে এই বাড়িতে চুরি হবে !"

রাত তখন দুটো। মেসো চোরের ভয়ে

দোতলা থেকে নামছেন না। এদিকে ঝিঁঝি ডাকছে তারস্বরে। নীচে একলা শুয়ে আছে বিলি। বারান্দায়। আমরা নীচের বড় ঘরে তিনজন ঘুমোতে না পারলেও রাত বেড়ে যাওয়ায় ঢুলছি। বাঘা চুপ করে আছে। বিলির নাক ডাকতে শুরু করেছে। হঠাৎ উঠোনে রবারের জুতোর জলভরা পায়ের শব্দ শোনা গেল। গভীর রাতে এমন শব্দে গা ছমছম করে উঠল।

টর্চের আলোর তেমন জোর ছিল না। জানলা দিয়ে টর্চ মেরে অস্পষ্ট দেখা গেল একটা লম্বা মতন কী যেন দাঁড়িয়ে আছে, আলো লাগতেই সরে গেল।

"কে ? আমি কিন্তুক বিলি। মোল্লার চরের মেয়ে। চোরকে ডরাই না। অমন জুতোগিরি অনেক দেখেছি, অ্যাই বংশী, আমার কাছে ভাত চাইলেই তো হত রে হতচ্ছাড়া ! অমন কেরদানির মুখে নুড়ো জ্বালি রে রবারের পা !"

নাকডাকা থেমে গিয়ে বিলির তীক্ষ্ণ তেজালো গলা রাত্তির গাঢ় কালো আকাশকে বিদীর্ণ করতে লাগল। মচমচ শব্দ তুলে চোরটা বাড়ির বাইরে পালাল।

"ইস্ ! এইভাবে বংশীটা চোর হয়ে যাবে। আমাদের গাঁয়ে কোনও চোর ছিল না !" ফিসফিস করে বলে উঠল বাবাই।

ঘণ্টাভর আবার নৈঃশব্দ্যে কাটে রাত্রি। বাবাই ঢুলতে-ঢুলতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। বিলির নাক ডাকতে শুরু করে। মনে হচ্ছিল সিদ্ধা আর আমিও জেগে থাকতে পারব না। রাত্রিচর পাখি আর প্রাণীদের ডানার ঝাপট আর গা-ঝাড়া দেওয়া কিংবা চলাফেরার অদ্ভুত শব্দ কানে আসে।

মৃদুস্বরে সিদ্ধাকে প্রশ্ন করি, "বিলি যে মোল্লার চরের মেয়ে সে-কথা আগে জানতে ?"

"না।" ছোট জবাব করে সিদ্ধা।

বললাম, "মেসো মাসি নগেন কারও জানা নেই, থাকলে নিশ্চয় কাজে নিতেন না।"

সিদ্ধা বলল, "সে-কথা আর বোলো না ! বাবা এত ভিতু ! যদি জানে বিলি মোল্লার চরের মেয়ে, এই ফ্যামিলিতে আর একদণ্ড রাখতে চাইবে না। বিলির সাহস যে কম নয়, গলার তেজ শুনেই বুঝতে পারছ ! চোরের ভয়ে নিজের পরিচয় বলে ফেলেছে।"

বললাম, "আমি ভাই কিছুই জানি না। শহরে থাকি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বংশী চোর হয়ে গিয়েছে। বিলি যে একলা আপনমনে তখন কথা বলে যাচ্ছিল, কার সঙ্গে ? বিলিও ধরে নিয়েছে বংশীই এসেছে।"

সিদ্ধা বলল, "স্বাভাবিক। বংশীর মা এমন করে ককাল যে, মায়া হয়। আমার মায়ের উচিত ছিল ওকে চাল দেওয়া। কিন্তু গেরস্তর কিসে মান, কিসে অসম্মান আমরা বুঝব না ! বাবা তবে সত্য বলেছে, অতিঝরা এমন সব রাতেই চোর জন্মায়। কাজ নেই, খাদ্য নেই।"

কী যেন সরসর করছে মনে হল। জলভরা জুতোর কোনও শব্দ কি না অথবা অন্যকিছু রাত্রির স্বর আসছে, বর্ষার রাতে, যদিও বৃষ্টি নেই, কোনও একটা জলভরা শব্দ হতেই পারে। নাক ডাকছে, যেন জলের স্বরের মতো ঘড়ঘড় করছে।

হঠাৎ মনে হল বংশীই এসেছে। নাক ডাকা থামতেই বাঘা ভুকভুক করল ক'বার। চোরটা রান্নাঘরে ঢুকে পড়তেই বিলি বুঝতে পারে, এ-চোর হাঁড়িখোর। মাথার চুল খামচে ধরে সজোরে। তারপর হিড়হিড় করে বাইরে টেনে এনে উঠোনে বসিয়ে বলে, "আহাম্মক ! চুপ করে বসে থাকো !"

খুবই কৌতূহলকর ঘটনা ঘটতে থাকে। আমি আর সিদ্ধা বাইরে নিঃশব্দে উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়াই। কালিপড়া লণ্ঠনের আলোয় সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। লোকটা ভয়ে উঠোনে বসে থাকে। বাঘা হঠাৎ সজোরে ডেকে ওঠে।

দোতলায় মেসো, মাসি, নগেন জেগে উঠেছেন। উঠোনে বিলি চোরের জন্য ভাত বেড়ে দিয়েছে। চোরটা লণ্ঠনের স্বল্পালোকে ঘাটিপান্তা গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে। দোতলার থেকে তিন ব্যাটারির টর্চের আলো এসে চোরটার গায়ে পড়তেই আমরা চমকে উঠলাম।

বিলি ককিয়ে উঠল উচ্চ গলায়, "কে তুমি গো ! তুমি বংশী নও ? তুমি কে ?"

বিলির চড়া স্বর শুনে বাঘা চিৎকার জুড়ে দিল। বিলির গলা চাপা পড়ে গেল। ছাদ থেকে সবাই নেমে এল। নগেন দোতলা পাহারা দিচ্ছিল, সে সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত চলে এসেছে টর্চ হাতে লাফাতে-লাফাতে।

দেখতে-দেখতে পাড়ার পড়শিরা উঠোনে এসে ভিড় জমিয়ে তুললে। অজস্র লণ্ঠন আর হ্যারিকেনের আলোয় সারা উঠোন ছয়লাপ। চোর বেচারি প্রথমে ভয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু যখন বুঝল লোকে তাকে ভয়ানক মারধোর করবে, তখন ফের ভাত খাওয়া শুরু করে দিল।

পরিবারের সম্মানবশত বললাম না যে, বংশীকে আমরা সন্দেহ করেছিলাম। বংশীর নামটা আমরা উচ্চারণ না করলেও বিলি বলল, আশ্চর্য বিস্ময় আর বেদনাহত গলায়, "তুমি বংশী নও !"

তারপরই আলোয় ভাল করে লোকটাকে দেখতে পেয়ে আপন কপালে করাঘাত করে দুর্বোধ এক মোল্লাচরি ভাষায় বিলাপ করতে লাগল।

আমার চোখের সামনে ক্রমশ ভোর হয়ে আসছিল। মাসির বাড়িতে এসে এমন এক অভিজ্ঞতার সামনাসামনি দাঁড়াতে হল যে, নিজেই কেমন অভিভূত হয়ে গেলাম। দড়ি দিয়ে চোরটাকে বাঁধল নগেন। কেউ কোনও কথা বলছে না। বাবাই দু'বার হম্বিতম্বি করে থেমে গিয়েছে।

চোর মারার দৃশ্য সত্যিই নাকি নিষ্করুণ হয়। চোরটার এঁটো মুখ, এঁটো হাত, সে ভ্যাবলার মতো চেয়ে আছে একদৃষ্টে, বিলির দিকে। বিলি কোনও কথা বলতে পারছে না।

হঠাৎ দেখলাম, চোখ গলে গাল গড়িয়ে অশ্রু পড়ছে বিলির। ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছে।

নগেন বলল, "তোমার ফের অত কান্নার ধুম লাগল কেন বিলি ! চোরকে ঘাটিপান্তা বেড়ে দিয়েছ, বড়বাবু তো তোমাকে কোনও মন্দ কথা বলেনি !"

"হায় ভগবান ! কী করে পেরকাশ করি নগেনদাদা, ওই পান্তাখেকো হুমদো ভূতটা আমার বোকা সোয়ামি ! বাবুর ঘরে সিঁদ কাটতে আসেনি গো। ও ছিঁচকে চোর। ওকে ছেড়ে দাও নগেনদা ! মেরো না।"

"তুমি বুঝতে পারলে না ?"

"কী করে পারব। অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না, ভাবলাম···।"

বিলি আর বংশীর নাম উচ্চারণ না করে থেমে গিয়ে ডুকরে উঠল।

আমি চোরটার পায়ের দিকে চেয়ে ছিলাম। কোনও জুতো নেই। লম্বা চেতানো পা, ডান পায়ের বুড়ো আঙুল কাটা। বাঁ-পায়ের কনিষ্ঠ আঙুলের আধখানা নেই। মাথায় টাক পড়েনি, ঝাঁকড়া চুল, এঁটো মুখে ধরা-পড়া বোকা হাসির ক্ষীণ রেখা। এতক্ষণও লোকটি একটিও কথা বলেনি। চুরিই সে করতে এসেছিল। বউয়ের হাতের বেড়ে দেওয়া পান্তা খেতে বসে ধরা পড়ে গিয়েছে।

দেখলাম, চোরও একজন মানুষই বটে। তারও বউ আছে।

নগেন আর ওকে মারতে পারল না।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ক্লিয়ারাসিল ত্বক মানে বেশী পরিষ্কার ত্বক!

আমি নিজের ত্বকের ব্যাপারে চিন্তা করি, তাইতো এবার ত্বকের ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত!

আমি বুঝেছি— আমার ত্বক ব্রণমুক্ত রাখার জন্যে যতটা গভীরে পরিষ্কার রাখা দরকার, সাবান ও জলে তা হয় না।

তাই, প্রতিবার নিজের মুখটি ধোয়ার পরে ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেঞ্জার দিয়ে পুরো পরিষ্কার করে নিই।

ব্যাপারটা হ'ল — ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেঞ্জার রোমকূপের এমন গভীরে ঢুকে লুকোনো তেল ও ময়লা বার করে আনে— যেখানে সাবান ও জল পৌঁছতেই পারে না। ফলে, আপনার ত্বক হয়ে যায় আরো পরিষ্কার, আরো পরিচ্ছন্ন — যা আগে কখনো হয়নি।

তাই, আপনিও যতবার নিজের মুখটি ধোবেন, ক্লিয়ারাসিল মেডিকেটেড ক্লেঞ্জার দিয়ে পুরো পরিষ্কার করে নেবেন। আমার কথা যদি শোনেন— ত্বকের ব্যাপারে যদি নিশ্চিন্ত থাকতে চান, তো আজ থেকেই তার যত্ন করে যান!

বেশী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ত্বক সম্বন্ধে আরো জানতে হলে ডাকখরচ বিনা এখানে লিখুন: Clearasil Advisor, P.O. Box No. 1919, Bombay - 400 001

ANANDAMELA PUJA NUMBER 1991
REGD NO. WB/CC-264 MH-BY-SOUTH 683 TN/MS